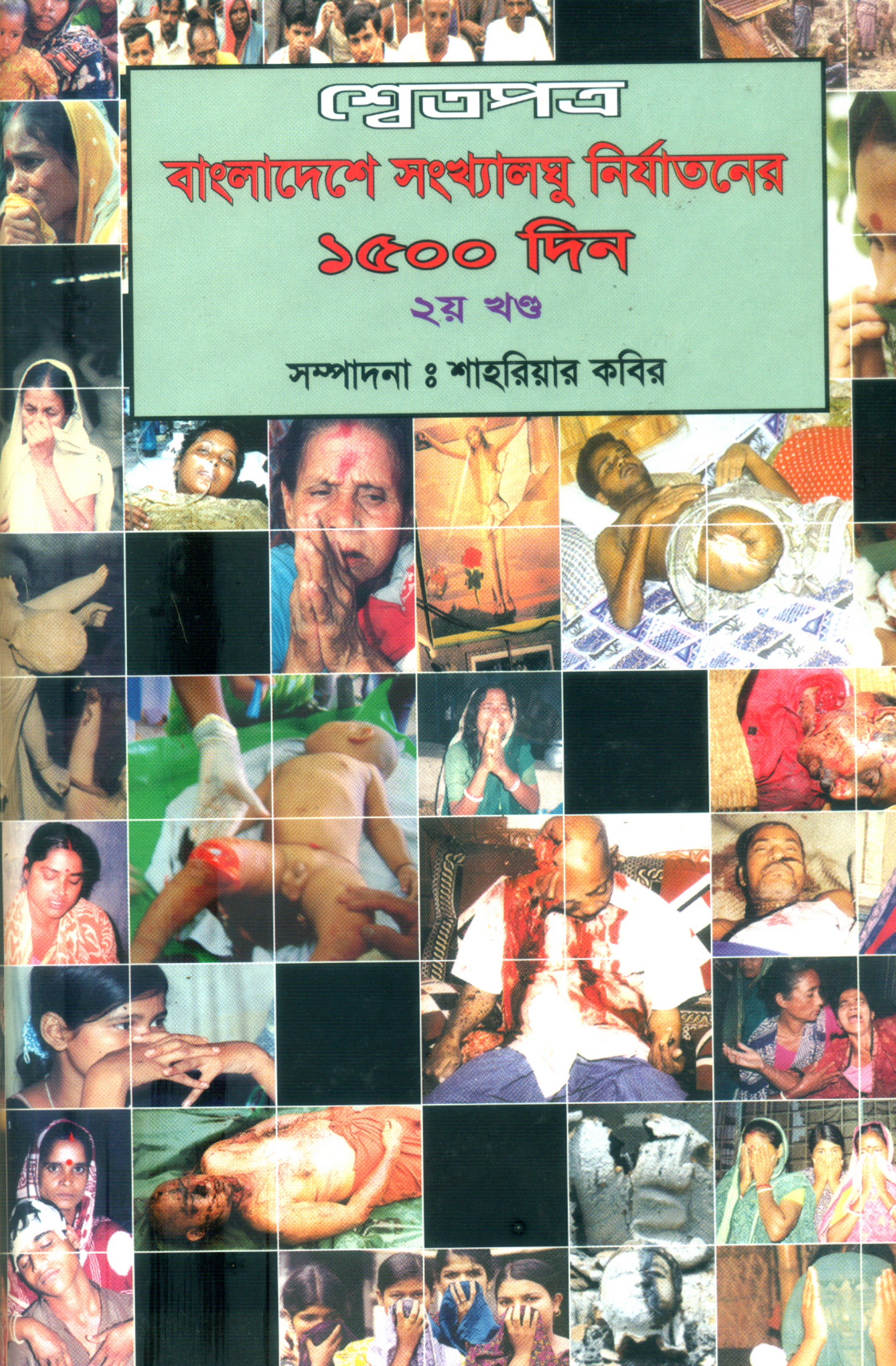
শ্বেতপত্র

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিন

২য় খণ্ড

সম্পাদনা ঃ শাহরিয়ার কবির



শ্বেতপত্র
বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিন
২য় খণ্ড

সম্পাদনা
শাহরিয়ার কবির

তথ্য সংগ্রহ ঃ ফজলুর রহমান, জুলফিকার আলি মাণিক
আবু সাঈদ, গৌরাঙ্গ নন্দী, ফরহাদ বাচ্চু, মহসিন আশরাফ
সমরেশ বৈদ্য, আবুল হোসেন খোকন, অরূপ সিংহ অপু
জাহাঙ্গীর আলম আকাশ, শওকত বাঙালি, মাকসুদুল আনাম
শিমন বাস্কে, কাজী বিপ-ব, শেখ মিরাজ, দুলাল কৃষ্ণ আচার্য
আবুল কালাম আজাদ ঠাণ্ডা, মোস্তাক আলম টুলু ও
আবদুল হাকিম পিয়াল

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০০৫

প্রকাশক
একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি

মুদ্রণ
ডানা প্রিন্টার্স লিমিটেড, গ-১৬ মহাখালী ঢাকা-১২১২

প্রচ্ছদ ঃ অমল দাস

পরিবেশক
প্যাপিরাস, ৬৮/৬৯ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০, ফোন ঃ ৮৮-০২-৭১৬৬৪৬১

মূল্য ঃ ৯০০.০০ টাকা

WHITE PAPER :
1500 days of minority persecution in Bangladesh
Volume-2
(A Collection of news clippings, articles, field reports, photographs and observation on minority persecution in Bangladesh)

Edited by
Shahriar Kabir

Published by
Ekattorer Ghatak Dalal Nirmul Committee
(Committee for Resisting Killers & Collaborators of 1971)
Ga-16 Mohakhali Dhaka-1212, Bangladesh
Phone : 0088-02-8828703, Fax : 0088-02-9884502
e-mail : <danaprnt@bdcom.com>
web site : <www.secularvoiceofbangladesh.org>

Cover design : Amal Das

Printed by
Dana Printers Limited
Ga-16 Mohakhali Dhaka-1212, Bangladesh

Distributor
PAPYRUS, 68/69 Pyaridas Road, Dhaka-1100, Bangladesh
Phone : 88-02-7166461

First Published : October 2005.

ISBN 984-8065-59-8

Price : Tk. 900.00 (Bangladesh) US $ 45.00 (Outside Bangladesh)

উৎসর্গ

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ
আন্তর্জাতিক অঙ্গনের যে সব মানবাধিকার সংগঠন
বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে সোচ্চার

সূচীপত্র

শেষকথা

বাংলাদেশে খালেদা-নিজামীর নেতৃত্বাধীন সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী-যুদ্ধাপরাধী অধ্যুষিত চতুর্দলীয় জোট যখন ঘটা করে সরকার গঠনের চতুর্থ বার্ষিকী পালন করছে সেই মহেন্দ্রক্ষণে আমরা শ্বেতপত্রের আকারে প্রকাশ করছি সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিনের খতিয়ান। স্মরণকালের ইতিহাসে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর এহেন নির্যাতন '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকাল ব্যতিত অন্য কোন সময়ে আমরা প্রত্যক্ষ করিনি। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের স্থায়িত্ব ছিল ২৬৬ দিন। ২০০১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতাগ্রহণ থেকে হিসেব করলে জোট সরকারের শপথ গ্রহণের চতুর্থবার্ষিকী অবধি এই সময় দিনের হিসেবে সাড়ে পনেরশ, মাসের হিসেবে প্রায় বায়ান্ন— নির্যাতন এখনও বন্ধ হয়নি। যেদিন এই শ্বেতপত্রের উপসংহার লেখা আরম্ভ করেছি সেদিনও খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে মুক্তাগাছায় দুর্গাপ্রতিমা ভাংচুরের সংবাদ।*

এই শ্বেতপত্রে বর্ণিত সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনাবলীর সময়সীমা হচ্ছে ১৫ জুলাই ২০০১ থেকে ২৫ আগস্ট ২০০৫। এ ধরনের সামাজিক দুর্যোগের যে কোন ঘটনার অভিঘাত প্রায়শঃ সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে। সময় ও সামর্থের কথা বিবেচনা করে আমরা শ্বেতপত্রের সময় ১৫০০ দিনের ভেতর সীমাবদ্ধ রেখেছি। শ্বেতপত্রের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও নির্বাচন নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডির ভেতর থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় এমনটি মনে করবার কোন কারণ নেই যে, ২৫ আগস্টের (২০০৫) পর বাংলাদেশে কোন সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেনি, সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা শুধু পনেরশ' দিনের ভেতর সীমাবদ্ধ।

যেদিন সংবাদপত্রে দুর্গাপূজার প্রাক্কালে প্রতিমা ভাঙার খবর বেরিয়েছে সেদিন বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহাসিক বয়ানের বিবরণও আমরা দেখেছি প্রধানমন্ত্রী তনয় তারেক রহমানের জবানিতে। বাংলাদেশকে 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত' হিসেবে আখ্যায়িত করে বিএনপির মহাক্ষমতাধর এই নেতা বগুড়ার এক সভায় বলেছেন— 'কোন কোন মহল দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের অভিযোগ করেন। এই অত্যাচারীর পরিচয় একটাই, তারা অত্যাচারী। তারা কোন ধর্মগোষ্ঠীর নয়। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই অত্যাচারীরা হিন্দু মুসলমান সবার উপর অত্যাচার করে। ... একটা বিশেষ মহল দেশে-বিদেশে বাংলাদেশকে মৌলবাদী দেশ হিসেবে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রচারে হিন্দু মুসলমান সবারই ক্ষতি হবে। ... আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে কোন সংখ্যালঘু নেই, সবাই বাংলাদেশী,' ইত্যাদি।**

---

* জনকণ্ঠ, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৫।

** জনকণ্ঠ, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৫।

তারেক রহমানের এই সব উক্তি অর্বাচীন অপোগণ্ড রাজনীতিকের কষ্টকল্পিত বয়ান বিবেচনা করে কেউ তা উপেক্ষা করতে পারেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা ও সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা নস্যাৎকারী এই বক্তব্য শুধু তারেকের নয়, বিএনপির সকল নীতি নির্ধারকের। দেশে বিরাজমান সাম্প্রদায়িক সহিংসতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে খোদ প্রধানমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে বিএনপি ও জোটের পাতিনেতারাও এমন কথাই বলেন। বর্তমান শ্বেতপত্রে সংখ্যালঘু নির্যাতনের যে কয়েক হাজার ঘটনার উলে-খ রয়েছে তার ভেতর শতকরা ৯৯ ভাগের জন্য দায়ী জোট সরকারের স্থানীয় নেতা-কর্মী-সমর্থক, প্রশাসনের বাধ্যতামূলক ঔদাসীন্য এবং সরকারের প্রশ্রয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, বোম প্রভৃতি ১৪টি সংখ্যালঘু জাতিসত্তার উপর নির্যাতনের সিংহভাগ দায় প্রধানতঃ সেনাবাহিনীকেই বহন করতে হবে।

এ কথা বহুবার বলা হয়েছে যে, শুরুতেই নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেয়া হলে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা এত দীর্ঘ সময় অব্যাহত থাকত না। সরকার প্রথম থেকে নির্যাতনের ঘটনা অস্বীকার করে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের হাতে বেঁধে দিয়েছে এবং নির্যাতকরা এই অস্বীকৃতির ভেতর নির্যাতন অব্যাহত রাখবার সবুজ সংকেত পেয়েছে।

এই শ্বেতপত্র জোট সরকারের আমলে সংখ্যালঘু নির্যাতনের পূর্ণ বিবরণ নয়। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আমাদের সীমাবদ্ধতার কথা উলে-খ করেছি। তারপরও যতটুকু এই শ্বেতপত্রে গ্রন্থিত হয়েছে তা থেকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের কারণ, ধরন ও বহুমাত্রিকতা উপলব্ধি করা যাবে। এই শ্বেতপত্র পাঠের পর কারও পক্ষে বলা সম্ভব হবে না যে আমরা 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দেশে' বাস করি। যারা এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে কাজ করছেন তারা প্রতিনিয়ত ক্ষুব্ধ হচ্ছেন নির্যাতনের প্রতিটি ঘটনায়, আরো ক্ষুব্ধ হচ্ছেন নির্যাতন সম্পর্কে প্রশাসনের নির্লিপ্ততায় এবং সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ হচ্ছেন দেশের প্রায় দেড় কোটি প্রান্তিক মানুষের প্রতি সরকারের বৈরিতায়। নির্যাতনের ঘটনা অস্বীকার করে নির্যাতকদের প্রশ্রয়দান নিছক বৈরিতা নয়, চরম বর্বরতাও বটে।

দুই

বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে প্রায় এক হাজার বছর আগে। এদেশে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে প্রধানত সুফী-দরবেশ-পীর-আউলিয়াদের দ্বারা, যাঁরা অন্য ধর্মের প্রতি কদাচ সহিংস ছিলেন। ইসলাম প্রচারের সময় এই সুফীরা জেহাদ, হত্যা, ভিন্ন ধর্মের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের কথা না বলে শান্তি ও সম্প্রীতির কথা বলেছেন। বহু ক্ষেত্রে তাঁরা হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম এবং লোকজ বিশ্বাস ও সংস্কৃতির উপাদান গ্রহণ করে ইসলামের একটি উদার ও সহনশীল ইমেজ দাঁড় করাতে চেয়েছেন। ইসলাম প্রচারের এই বৈশিষ্ট শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতবর্ষের অন্যত্রও লক্ষ্যণীয়। ভারতবর্ষে সুফী তরিকার ইসলামের সহনশীলতার কারণে বিভিন্ন পীর আউলিয়ার মাজারে মুসলিম ভক্তদের পাশাপাশি হিন্দু ভক্তদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন একটি সাধারণ বিষয়। শাসক শ্রেণী, বিশেষভাবে ব্রিটিশদের কলোনিকালে ধর্মীয় বিভাজন নীতি রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করেছিল যার পরিণতি হচ্ছে ধর্মীয় দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের বিভক্তি ও পাকিস্তান সৃষ্টি।

পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের ছয় মাসের ভেতর জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্ব সম্পর্কে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের মোহভঙ্গ ঘটে। পাকিস্তানকালে আমরা শাসকশ্রেণীর সাম্প্রদায়িক

আচরণের আরেক রূপ প্রত্যক্ষ করি, যা ছিল সার্বিকভাবে বাঙালি জাতিসত্তাবিনাশী। বাঙালির রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পাকিস্তানি শাসকরা হিন্দু, কমিউনিস্ট ও ভারতের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান এবং পাহাড়ী ও সমতলের আদিবাসীরা স্বাধীনতা ও সার্বিক মুক্তির জন্য যুদ্ধ করেছে, জীবন দিয়েছে। প্রত্যাশা ছিল সব ধরনের শোষণ-পীড়ন-বিভাজন-বিদ্বেষহীন এক সমাজ ও রাষ্ট্র— যেখানে ধর্ম-বর্ণ-বিত্ত-জাতিসত্তা নির্বিশেষে সব মানুষ সমান অধিকার ও মর্যাদা ভোগ করবে। ১৯৭২ সালে সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের জন্য যে সংবিধান রচিত হয়েছিল সেখানে মুক্তিযুদ্ধের এই চেতনা বহুলাংশে প্রতিফলিত হয়েছিল। তবে এই সংবিধানে বাংলাদেশের চলি-শের অধিক আদিবাসী জাতিসত্তার স্বাতন্ত্রের স্বীকৃতির ছিল না। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথাও ছিল না। এ ধরনের কিছু ত্রুটি বাদ দিলে '৭২-এর সংবিধান নিঃসন্দেহে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানবাধিকারের এক অনন্য দলিল। ধর্মের নামে নির্যাতন ও বিভাজন বন্ধ এবং বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের সমান অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করবার জন্য এই সংবিধানে রাষ্ট্রের অন্যতম নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। শুধু এইটুকু নয়, এতে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের উপরও নিষেধাজ্ঞা ছিল। ধর্মের নামে রাজনীতির সুযোগ থাকলে ধর্মের নামে হানাহানি থাকবে, সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন, বৈষম্য ও বঞ্চনাও থাকবে।

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় এসে সংবিধান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' খারিজ করে দিয়েছেন, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তাও প্রত্যাহার করেছেন। সংবিধানের শুরুতে সংযোজন করেছেন 'বিসমিল-াহির রহ্মানির রহিম'। সংবিধানে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিভাগে সংযোজন করেছেন— 'সর্বশক্তিমান আল-াহের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি।' জেনারেল জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী জেনারেল এরশাদ ইসলামকে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেছেন সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর দ্বারা।

যে দুই জেনারেল উর্দি ও অস্ত্রের জোরে বাংলাদেশের সেক্যুলার সংবিধানকে সাম্প্রদায়িক সংবিধানের রূপান্তরিত করেছেন তাঁরা বাংলাদেশের দেড় কোটি অমুসলিম নাগরিকের অধিকার-মর্যাদা-অস্তিত্ব কোন কিছুই বিশ্বাস করেন না। কোন প্রকৃত মুসলমান কখনও কোন অমুসলমানকে 'বিসমিল-াহ....' বলতে বাধ্য করতে পারেন না। একজন হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-আদিবাসী কি কখনও স্বীকার করতে পারেন 'আল-াহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি?' এ কথা মানতে গেলে কি তাঁদের ধর্ম থাকে? সাংবিধানিকভাবে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান আদিবাসীদের ধর্মীয় অধিকার ও মর্যাদা হরণ করবার পর দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে তাদের উপর বহুমাত্রিক নির্যাতন অব্যাহত রেখে তারেক রহমান বা তার দল ও জোটের লোকজনই কেবল বলতে পারেন— 'বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত!'

২০০১ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু নির্যাতনের যে তান্ডব আরম্ভ হয়েছিল এখন তা কমেছে বটে, কিন্তু সংবিধান যেখানে প্রতি মুহূর্তে বলে দিচ্ছে এ দেশ কোন অমুসলমানের নয় এবং এই সংবিধানও অমুসলমানের নয়—এর কী জবাব দেবেন আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধাররা? যে দেশে এ ধরনের সাম্প্রদায়িক সংবিধান বলবৎ থাকে সে দেশ কীভাবে 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত' হয়?

দেশের সংবিধান ছাড়াও সংখ্যালঘু নির্যাতনের আরও হাতিয়ার সরকারের হাতে রয়েছে। সংখ্যালঘুর নির্যাতনের অন্যতম আইনি হাতিয়ার—'শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন' এখনও বাংলাদেশে জারি আছে। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় ভারতকে শত্রু এবং এদেশের হিন্দুদের শত্রুর এজেন্ট গণ্য করে তাদের সম্পত্তি গ্রাস করবার জন্য চালু করা হয়েছিল 'শত্রু সম্পত্তি আইন'। যুদ্ধের শেষে তাসখন্দ ঘোষণায় স্বাক্ষর প্রদানের পর স্বাভাবিকভাবে ভারত আর শত্রু থাকেনি কিন্তু বাংলাদেশের শাসকদের বিবেচনায় হিন্দুরা ভারতের এজেন্ট ও শত্রু থেকে গেছে। যে কারণে এখনও বিভিন্ন জায়গায় মানবাধিকারের চরম লংঘনকারী এই কালাকানুন প্রয়োগের দ্বারা হিন্দুদের সম্পত্তি গ্রাস অব্যাহত রয়েছে। এই আইনের শিকার বহু হিন্দু পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের উপর রাষ্ট্রীয় নির্যাতন বন্ধ করবার জন্য বিগত আওয়ামী লীগ সরকার সংক্ষুব্ধ পাহাড়ী সম্প্রদায়ের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করেছিল, যেখানে তাদের কতগুলো মৌলিক দাবি মেনে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু জোট সরকার ক্ষমতায় এসে এই শান্তিচুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল না করলেও এর বাস্তবায়ন অগ্রাহ্য করছে। যার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর উপর সামরিক বাহিনী ও মুসলিম অভিবাসীদের নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে।

সংবিধানের ইসলামীকরণ, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের আশঙ্কাজনক উত্থান ও বিস্তৃতি, যে সব দল আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মভিত্তিক নয় তাদের কর্মকাণ্ডে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, পাঠ্যপুস্তক ও গণমাধ্যমে ইসলাম ব্যতিত অন্য ধর্মাবলম্বীর প্রতি বিরূপ ধারণা প্রদান বাংলাদেশে যে সাম্প্রদায়িক আবহ সৃষ্টি করেছে তা একদিনে হয়নি। মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তির অবস্থান সরকার, প্রশাসন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সহ যে ক্ষেত্রেই থাকুক না কেন দীর্ঘদিন ধরে তারা তাদের নীলনকশা অনুযায়ী বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতির ইসলামীকরণের পাশাপাশি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপর নির্যাতন, বঞ্চনা ও বৈষম্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। ২০০১ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু নির্যাতনের যে তান্ডব আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তার আপাত লক্ষ্য আওয়ামী লীগ হলেও মূলতঃ এই নির্যাতন ছিল সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার অভিব্যক্তি। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ছাড়া অর্থনৈতিক কারণেও বহু ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার হয়েছে, কিন্তু নির্যাতনের সামগ্রিকতা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্যাতকদের লক্ষ্য ছিল ধনী-দরিদ্র ও দল-মত নির্বিশেষে হিন্দুদের দেশছাড়া করা।

রাষ্ট্র ও সরকার ধর্মনিরপেক্ষ না হলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে কথা বলেছেন সেটি ইউরোপীয় ধর্মনিরপেক্ষতার মতো নয়। ইউরোপে সেক্যুলারিজমের অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্র, সরকার, সমাজ, ব্যক্তি—সর্বক্ষেত্রে ইহজাগতিকতা। ধর্ম সেখানে একান্তভাবে ব্যক্তিগত বিষয়। যদিও বিশ্বব্যাপী ইসলামী মৌলবাদের উত্থান এবং পশ্চিম গোলার্ধে তাদের জঙ্গী নেটওয়ার্ক বিস্তৃতির কারণে ইউরোপ ও আমেরিকায় খ্রিস্টান মৌলবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, কিন্তু আমেরিকা ছাড়া অন্য কোথাও রাষ্ট্র তাদের মদদ দিচ্ছে না।

'৭২-এর সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার সংযোজন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বহুবার বলেছেন ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা নয়, তবে রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাত করবে না, ধর্মকে রাজনীতি ও সরকারী কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখতে হবে। তখন তাঁর সমালোচক কিছু বাম বুদ্ধিজীবী বলেছিলেন এর দ্বারা সেক্যুলারিজমের চেতনা সংকুচিত

হয়েছে, সংজ্ঞা ও অভিব্যক্তিও পরিবর্তিত হয়েছে। পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষতার ভেতর ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ধর্মচর্চার অবাধ সুযোগ থাকলেও মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক প্রতিপক্ষ সব সময় ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতা বলেছে। তাদের এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা প্রচারের উপযুক্ত জবাব দিতে না পেরে নব্বইয়ের দশক থেকে আওয়ামী লীগ ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিএনপির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। সম্প্রতি আওয়ামী লীগের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা, ঢাকার প্রাক্তন মেয়র ও মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ প্রকাশ্যে বলেছেন তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা বিশ্বাস করেন না, একজন মুসলমান হিসেবে তিনি জামাতুল মুজাহিদীনের ঘোষণা— কোরান ও সুন্নাহভিত্তিক রাষ্ট্র ও সরকার সমর্থন করেন এবং নিজেকে তিনি 'মৌলবাদী' ও 'সাম্প্রদায়িক' বলেও দাবি করেছেন।*

আওয়ামী লীগের একজন প্রভাবশালী নেতা যেভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে জেহাদ ঘোষণা করে আওয়ামী লীগকে ধর্মনিরপেক্ষতা বর্জনের আহ্বান জানিয়েছেন এটাকে নিছক পাগলের প্রলাপ কিংবা হানিফের দলবদলের ইঙ্গিত বলে কেউ আত্মতৃপ্তিতে ভুগতে পারেন, তবে আমাদের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে আওয়ামী লীগের মতো বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবর্তক এবং ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারী দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলের ভেতরও সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার প্রসার ঘটছে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আবুল বারকাতের গবেষণায় আমরা দেখেছি আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় ছিল তখন 'অর্পিত সম্পত্তি আইন' ব্যবহার করে হিন্দুদের সম্পত্তি আত্মসাৎকারীর ভেতর ৪৪ ভাগ আওয়ামী লীগ এবং ৩২ ভাগ বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। এমনকি বিএনপি যখন ক্ষমতায় তখনও দেখা গেছে যারা অর্পিত সম্পত্তি আইনের দ্বারা হিন্দুদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছে তাদের শতকরা ১১ ভাগ আওয়ামী লীগের অনুসারী।**

আবুল বারাকাতের গবেষণা থেকে আমরা জেনেছি গত চলি-শ বছরে প্রায় দশ লক্ষ হিন্দু পরিবার শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা মোট হিন্দু জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ। এই আইনে ভূমিচ্যুতির পরিমাণ ২১ লক্ষ একর, যা হিন্দু সম্প্রদায়ের মূল ভূমি মালিকানার (আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আগের তুলনায়) ৫৩ শতাংশ। ক্ষতিগ্রস্ত ২১ লক্ষ একর ভূসম্পত্তির বর্তমান বাজার মূল্য ১,৪৫,১৫২ কোটি টাকা (২০০০ সনের বাজার মূল্যে)। এই আর্থিক ক্ষতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্ষতি পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টা (মামলা-মকদ্দমা-তদবির ইত্যাদি) এবং ভূমিচ্যুতির পাশাপাশি ব্যাপকহারে স্থানান্তরযোগ্য সম্পদচ্যুতি। পূর্বোক্ত ক্ষতি এবং শেষোক্ত ক্ষতির যোগফল— আবুল বারাকাতের হিসেবে 'কমপক্ষে ১,৮০,৬৪৪ কোটি টাকা, যা আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনের ৭৫ শতাংশ।'

আর্থিক ক্ষতির বাইরে মানবিক ও সামাজিক ক্ষতি সম্পর্কে বারাকাত লিখেছেন— 'আসলে শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রকৃত ক্ষতির আর্থিক মূল্যমান নিরূপণ সম্ভব নয়। কারণ শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনের ফলে সৃষ্ট মনুষ্য দুদর্শা, বঞ্চনা, জোরপূর্বক পারিবারিক বন্ধন বিচ্যুতি, মানসিক যন্ত্রণা, শারীরিক বিপর্যয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট, ভয়-ভীতির

* 'আমাদের সময়', 'জনকণ্ঠ', 'আজকের কাগজ', 'যুগান্তর' ২২, ২৩, ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৫।

** ২৮ জুলাই ২০০৫ তারিখে 'বাংলাদেশ আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক ইন্সটিটিউট (বিলিয়া) এবং 'অর্পিত সম্পত্তি আইন প্রতিরোধ আন্দোলন জাতীয় কমিটি' কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারের মূল প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কারণে বিনিদ্র রজনী যাপন, মা'-এর পুত্রশোক আর সন্তানের মাতৃশোক, মাতৃভূমি থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ, মানব সম্পদ বিনষ্ট, স্বাধীনতাহীনতা— এ সকল ক্ষতির আর্থিক মূল্যমান নির্ধারণ করা কোন অর্থনীতিবিদ, পরিসংখ্যানবিদ বা হিসাব বিশারদের পক্ষেই সম্ভব নয়।'*

তিন

জোট সরকার বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে হিন্দু সম্প্রদায়কে গত চার বছরের ধারাবাহিক নির্যাতনের মাধ্যমে এটা বুঝিয়ে দিতে পেরেছে যে, এদেশে থাকতে হলে তাদের যাবতীয় লাঞ্ছনা, বৈষম্য ও নিপীড়ন মেনে নিয়ে সংবিধান প্রদত্ত সকল মৌলিক অধিকারবঞ্চিত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের জীবন গ্রহণ করতে হবে। এই জীবন ও পরিবেশ তাদের পছন্দ না হলে তাদের সামনে তিনটি পথ খোলা আছে— ১) সংখ্যালঘুর ধর্ম ত্যাগ করে সংখ্যাগুরুর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা, ২) ঘরবাড়ি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও জমিজমা ফেলে দেশান্তরী হওয়া, কিংবা ৩) গণআত্মহত্যা করা।

গত চার বছর ধরে সংবাদপত্রের মাধ্যমে কিংবা কখনও উপদ্রুত এলাকায় গিয়ে নির্যাতিতদের সঙ্গে কথা বলে বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করবার এই প্রয়াস সম্পর্কে জেনেছি। নির্যাতিতরা যখন বিকল্প পথের সন্ধান জানতে চান তখন তাদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য যদিও আমরা বলি নির্যাতনের বিরুদ্ধে সবাইকে একজোট হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে, বাস্তব সত্য হচ্ছে— রুখে দাঁড়াবার মতো শক্তি এই দুর্বল, অসহায়, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নেই। অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলোও সংঘবদ্ধভাবে এবার নির্যাতিত সংখ্যালঘুর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়নি, যেমনটি দেখেছিলাম '৬৪ সালে, কিংবা সীমিতভাবে হলেও '৯২ সালে।

বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করবার কর্মসূচী জোট সরকার একদিকে গোপন করতে চেয়েছে, অপরদিকে চায়নি। ২০০১ সালের অক্টোবর থেকে সংবাদপত্রে যখন সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা প্রাত্যহিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে তখন থেকে সরকার বলছে বাংলাদেশে কোথাও কোন সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেনি, সংবাদপত্রে মিথ্যা খবর প্রকাশিত হচ্ছে কিংবা কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে যদি কিছু ঘটে থাকে সেসব আওয়ামী লীগ করেছে জোট সরকারের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করবার জন্য। কিন্তু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের কারণে বাংলাদেশে চলমান সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের সংবাদ দেশেও বিদেশের মানুষের কাছে গোপন থাকেনি।

সরকার যত খুশি অস্বীকার করুক বাংলাদেশের মতো আমেরিকা ও ইউরোপের গণমাধ্যমের কল্যাণে সংখ্যালঘু নির্যাতনের কথা বিশ্ববাসী জেনেছে। 'গার্ডিয়ান,' 'নিউইয়র্ক টাইমস', 'ওয়াশিংটন পোস্ট', 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল', 'টাইম' ও 'দি নেশন' সহ পশ্চিমের বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িকীতে বাংলাদেশে মৌলবাদের উত্থান, সাম্প্রদায়িক নির্যাতন এবং মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি সম্পর্কে বহু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ইউরোপের বিভিন্ন পত্রিকায় হয়েছে, বিবিসিতে হয়েছে, ভারতের সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে হয়েছে। পাকিস্তান সহ দক্ষিণ এশিয়ার অপরাপর দেশের পত্রিকাতেও হয়েছে। সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের সংবাদ গোপন করবার জন্য সরকার কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেও সফল হয়নি।

গত চার বছর ধরে সংবাদপত্রে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের খবর যেভাবে ছাপা হচ্ছে তার

* প্রাগুক্ত।

প্রধান কৃতিত্ব প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত সাংবাদিকদের, যাদের উপেক্ষা করা হয় ‘মফস্বল সাংবাদিক’ হিসেবে। এই সাংবাদিকরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে, সরকারী দল ও প্রশাসনের হুমকি অগ্রাহ্য করে যেভাবে নির্যাতনের সংবাদ সংগ্রহ করেছেন তাতে প্রতিটি বিবেকবান মানুষ তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন।

সরকারী দল ও প্রশাসনের প্রতিহিংসা ও নির্যাতনের হাত থেকে জেলা ও থানা পর্যায়ে কর্মরত সাংবাদিকরা যেমন রেহাই পাননি, সংবাদপত্রও রেহাই পায়নি। সাংবাদিকদের উপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছে, মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে, কিংবা হত্যার হুমকি দিয়ে এলাকাছাড়া করা হয়েছে। একইভাবে যে সব পত্রিকা সরকারের নীতি অগ্রাহ্য করে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের সংবাদ ছেপেছে তাদের সরকারী বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে এসব পত্রিকা □য় ও পাঠ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং প্রকাশক ও সম্পাদকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের মামলা দায়ের করা হচ্ছে। এর ফলে গত কয়েক মাস ধরে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা পত্রিকায় কম ছাপা হচ্ছে। ২০০২-এর মার্চে খবরের কাগজে পাবনার চাটমোহরে খ্রিষ্টান পল-ীতে হামলার খবর পড়ে উপদ্রুত এলাকা দেখতে গিয়েছিলাম, নির্যাতিতদের সাক্ষাৎকারও নিয়েছিলাম। এরপর চাটমোহরের একই গ্রামে আরও তিনবার হামলা হয়েছে, যার সংবাদ পত্রিকায় ছাপা হয়নি— জেনেছি ফাদার টীম ও রোজালিন কস্তার মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিবেদন থেকে।

এবারের সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ভয়াবহতার কারণে যে সব পত্রিকা নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের পরিবর্তে খালেদা-নিজামীর চার দলীয় জোট সরকারের বিজয় দেখতে চেয়েছে এবং এই লক্ষ্যে জনমত প্রভাবিত করেছে, সেই সব পত্রিকা প্রথম দিকে উপেক্ষা করলেও শেষ পর্যন্ত পারেনি। বিশেষভাবে ২০০১ সালের ২২ নবেম্বর আমাকে গ্রেফতারের পর সেই সব পত্রিকা ঢাকা থেকে প্রতিবেদক পাঠিয়ে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের সরজমিন প্রতিবেদন ছেপেছে। ব্যতি□ম ছিল বিএনপির মুখপত্র ‘দিনকাল’, ‘জামাতে ইসলামী’র মুখপত্র ‘সংগ্রাম’ এবং তাবৎ সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী অপশক্তির মুখপত্র ‘ইনকিলাব’। এই তিনটি পত্রিকার ভেতর বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের খবর অস্বীকার করে সবচেয়ে বেশি লিখেছে ‘ইনকিলাব’, যে পত্রিকা ’৯০ সালের অক্টোবরে ভারতে বাবরী মসজিদ ভাঙার মিথ্যা খবর ছেপে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক দুষ্কৃতকারীদের লেলিয়ে দিয়েছিল হিন্দুদের ঘরবাড়ি-মন্দির ধ্বংস এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান লুট করবার জন্য।

বাগেরহাটে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বহু সংবাদ ঢাকার বিভিন্ন দৈনিকে বেরিয়েছে। ১০ জুলাই ২০০৩ তারিখে ‘জনকণ্ঠে’ বাগেরহাট থেকে পাঠানো বাবুল সরদারের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। ‘মোরেলগঞ্জে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বীভৎস কাহিনী— চাঁদাবাজি শ-ীলতাহানি নিত্যঘটনা’ শিরোনামে এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে —

‘বাগেরহাটের অন্যতম অপরাধপ্রবণ উপজেলা মোরেলগঞ্জে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের আরেক বীভৎস কাহিনী জানা গেছে। সেখানে চিংড়াখালী ইউনিয়নের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বিভিন্ন গ্রামে একাধিক মামলার আসামী চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা রাম রাজত্ব কায়েম করেছে। চাঁদাবাজি, লুটপাট, ডাকাতি, চুরি, নারীর শ-ীলতাহানি, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় এখানে নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সন্ত্রাসীরা এতই শক্তিশালী যে, তাদের বিরুদ্ধে ডিসি, এসপি, এমপি কাউকেই জানিয়ে কোন ফল পাওয়া যায়নি। উল্টা নালিশের কথা জানতে পেয়ে সন্ত্রাসীরা আরও দ্বিগুণ তাণ্ডব শুরু করে। গত একমাসে

সেখানে কমপক্ষে ৫টি হিন্দু পরিবার অতিষ্ঠ হয়ে দেশান্তরী হয়েছে। সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ধরে নিয়ে যাওয়ার পর এখনও পর্যন্ত খোঁজ মেলেনি বৃদ্ধ ললিত মণ্ডল ও তাঁর স্ত্রীর। বুধবার বাগেরহাট প্রেসক্লাবে আহূত এক সংবাদ সম্মেলনে ওই এলাকার একাধিক গ্রামের উপস্থিত নির্যাতিত, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষরা এ অভিযোগ জানান।

‘গোপালপুর, চরগোপালপুর, সিংজোড়, মহিষচরনী গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষরা এদিন সংবাদ সম্মেলনে নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে অনেকেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তাঁদের ভাষায়, “থানা পুলিশ থেকে সংশি-ষ্ট সকলের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি। কিন্তু প্রতিকার পাইনি, বরং অত্যাচার আরও বেড়েছে।” এ সময় সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তারা বলেন, “শেষ আর্জি জানাতে নিরূপায় হয়ে আমরা আপনাদের কাছে হাজির হয়েছি। আপনারা আমাদের বাঁচান। নতুবা বাপ-দাদার ভিটামাটি ফেলে দেশত্যাগ করা বা মরা ছাড়া আমাদের কোন পথ নেই।”

‘সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন উত্তম কুমার মণ্ডল। এ সময় এলাকার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক, কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবীসহ নানা শ্রেণী ও পেশার প্রায় ২৫/৩০ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। লিখিত বক্তব্য এবং প্রশ্নোত্তরে জানা যায়, বিগত সংসদ নির্বাচনোত্তর ওই এলাকায় একাধিক মামলার আসামী চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনে মেতে ওঠে। বিশেষত গত ইউপি নির্বাচনে এ ইউনিয়নে জামায়াত নেতা মাওলানা আবুল কাশেম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবার পর সন্ত্রাসীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।’…

শুধু জনকণ্ঠ নয়, মোরেলগঞ্জের সংখ্যালঘু নির্যাতনের খবর অন্যান্য পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু একই দিনে (১০ জুলাই, ২০০৩) ‘ইনকিলাব’ লিখেছে ঠিক এর বিপরীত সংবাদ। শুধু তাই নয়, এর ভেতর তারা আবিষ্কার করেছে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র! জেলা সংবাদদাতার বরাত দিয়ে ‘বাগেরহাটে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ভূয়া ইস্যু সৃষ্টির অপতৎপরতা’ শিরোনামে ‘ইনকিলাব’ লিখেছে—

‘বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জের পল-ীতে সংখ্যালঘু নির্যাতনের নামে এক সংবাদ সম্মেলনে বানোয়াট ঘটনায় বাগেরহাটে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ বলছে, মোরেলগঞ্জের চিংড়াখালী ইউনিয়নের গোপালপুর ও চর গোপালপুর গ্রামে সংখ্যালঘু নির্যাতনের কোন ঘটনার সংবাদ তারা জানে না। এমন কি কোন ব্যক্তি থানায় এই নির্যাতনের কোন অভিযোগই করেনি। গত বুধবার বাগেরহাট প্রেস ক্লাবে ঐ গ্রামের উত্তম কুমার মালি নামের এক ব্যক্তি সংবাদ সম্মেলনে সংখ্যালঘু নির্যাতনের কথা তুলে ধরেন। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, এলাকার কতিপয় ব্যক্তির ইন্ধনে নতুন একটি ইস্যু তৈরির জন্য দাদারা খরচা দিয়ে এই সংবাদ সম্মেলন করে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ভূয়া কাহিনী বর্ণনা করে। উত্তম কুমার মালি স্বাক্ষরিত এই সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, উলে-খিত দু’টি গ্রামে চাঁদাবাজি, ডাকাতি, চুরি, শ-ীলতাহানি ও অপহরণের মত জঘন্য আইন-শৃঙ্খলা পরিপন্থী ঘটনায় সংখ্যালঘুরা অতিষ্ঠ, তারা থানায় অভিযোগ দিলে পুলিশ এসব অভিযোগ গ্রহণ করেন না। এমন কি স্থানীয় এমপি, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারকে বিষয়টি কুরিয়ারের মাধ্যমে ও সরাসরি জানানোর পরও কোন প্রতিকার মেলেনি। তবে পুলিশের ভাষ্য তথাকথিত সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ তাদের হাতে আসেনি। সূত্র জানায়, সংখ্যালঘু নির্যাতনের নামে একটি ইস্যু তৈরির জন্য কুরিয়ারের রসিদ দেখিয়ে তাদের অভিযোগ প্রেরণের বক্তব্য তুলে ধরার নেপথ্যে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। কারণ সরাসরি কিংবা

লিখিতভাবে কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির হয়ে অভিযোগ না দিয়ে কুরিয়ারে অভিযোগ প্রেরণের বিষয়টি এ সংবাদ সম্মেলনকে আরো রহস্যময় করে তুলেছে।'

গত বছর ভারতের গুজরাটে সংখ্যালঘু মুসলিম নিধনের সময় সেখানকার হিন্দু মৌলবাদীদের পত্রিকা যেমন এর পেছনে পাকিস্তান ও 'আইএসআই'-এর হাত আবিষ্কার করেছিল, 'ইনকিলাব' ঠিক একইভাবে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের কথা কেউ লিখলে তাকে ভারত ও 'র'-এর এজেন্ট বানিয়ে দেয়। ভারতের হিন্দু মৌলবাদী এবং বাংলাদেশের মুসলিম মৌলবাদীদের স্বার্থ যে অভিন্ন 'ইনকিলাব' পত্রিকাটি নিয়মিত পড়লে এই সত্যটি সকলের কাছে প্রতীয়মান হবে।

বাগেরহাটে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা 'ইনকিলাব' সরাসরি অস্বীকার করলেও জনকণ্ঠের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বিএনপির স্থানীয় সাংসদ 'নির্যাতনের বিষয়টি কঠোরভাবে দমনের জন্য' এসপিকে বলেছেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি স্থানীয় বিএনপি নেতা সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা অস্বীকার করেননি, বিশেষভাবে সেই সব এলাকায় যদি নির্যাতনের জন্য দায়ী হয় জামাতীরা।

চার

আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে পরিচিত কিছু বুদ্ধিজীবী মনে করেন মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা দুটি পৃথক বর্গ। তাদের মতে মৌলবাদ হচ্ছে ধর্মের মূলনীতির প্রতি আনুগত্য। এই মৌলবাদের সঙ্গে ক্ষমতা দখলের বিষয়টি যুক্ত হলে তারা স্বধর্মীদের হত্যা করতেও দ্বিধা বোধ করে না। উদাহরণ হিসেবে তারা বলেন জামাতে ইসলামীর আ□মণের লক্ষ্য অমুসলিম নয়, সেক্যুলার মুসলিম ও জামাতবিরোধী আলেম সমাজ। পক্ষান্তরে সাম্প্রদায়িক শক্তি ধর্মের কোন তোয়াক্কা করে না, বাংলাদেশের অমুসলিম মাত্রেই তাদের আ□মণের লক্ষ্য, মুসলমান কাদচ নয়। অমুসলিমদের আ□মণের উদ্দেশ্য তাদের সম্পদ দখল।

মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে এ সবই সনাতন ধারণা। বর্তমানে দুইয়েরই ধর্ম, চরিত্র ও কর্মকাণ্ড পরিবর্তিত হয়েছে, বহু ক্ষেত্রে একাকার হয়ে গেছে। বাংলাদেশে গত চার বছরের সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনাগুলো প্রত্যক্ষ করলে দেখা যাবে বহু ক্ষেত্রে জামাতে ইসলামী ও অপরাপর জঙ্গী মৌলবাদী সংগঠন সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস ও নির্যাতনের জন্য দায়ী। ২১ জুলাই ২০০৩ তারিখে আমরা সাতক্ষীরার তিন নির্যাতিতা গৃহবধূ রাধারাণী, বনলতা ও আদুরিকে দেখার জন্য কালীগঞ্জ গিয়েছিলাম। কালীগঞ্জের সরকার বাড়ির তিন গৃহবধূ এবং তাদের পরিবারের উপর কী ধরনের নির্যাতন হয়েছে ঢাকার কাগজে কিছুটা বেরিয়েছিল। জনকণ্ঠে এ ঘটনা সম্পর্কে লেখা হয়েছিল—

'কালিগঞ্জের সন্ত্রাসীরা মধ্যরাতে ঘর থেকে ধরে বেঁধে কাঁটাবন দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যায় গৃহবধূ রাধারাণী সরকারকে। বেড়ি বাঁধে নিয়ে চলে শ-ীলতাহানি ও নির্যাতন। 'ধর্মের বাবা' ডাকার কারণে একজন তার মুখে প্রস্রাব করে দেয়। অন্য দু'জন করে শরীর নিয়ে উল-াস। শনিবার মধ্যরাতে কালিগঞ্জের বিশ্বনাথপুর গ্রামে সন্ত্রাসীদের হামলা ও নির্যাতনের শিকার রাধারানী এখন মানসিক ভারসাম্য হারাতে বসেছে। সন্ত্রাসী হামলায় হাত ভেঙ্গেছে গৃহবধূ বনলতার। দায়ের কোপে তার দু' পা এখন অচল। সর্বাঙ্গে এখন নির্যাতনের চিহ্ন। ৪০ উর্ধ্বে বয়সী আদুরীর হাতে, মাথায়, পিঠে ও নিতম্বে আঘাত নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নির্যাতনে তার ছেলে বাসুদেব এখন আহত। এই মর্মান্তিক ও

বর্বর ঘটনা ঘটে গত শনিবার মধ্যরাতে ৪টি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর। সোমবার সাতক্ষীরা থেকে ৪৪ কিলোমিটার দূরের ঐ জনপদে গিয়ে দেখা যায়, সন্ত্রাসীদের লুটপাটের চিহ্ন। রবীন্দ্রনাথের ঘর পানিতে ভাসছে। পারিবারিক কালি মন্দিরটির ইট খুলে নেয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে যাওয়া কালিগঞ্জ সার্কেলের এএসপি শামসুল হুদা জনকণ্ঠকে বলেন, নির্যাতন, ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা সত্য। স্থানীয় জামায়াত কর্মী সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল গফুরের ইন্ধনে এই বর্বর ঘটনা ঘটেছে বলে তিনি সাংবাদিকদের জানান। তবে এই ঘটনায় মামলা হলেও কেউ গ্রেফতার হয়নি। অভিযোগ, মামলা রেকর্ড হয়েছে দুর্বল ধারায়।'*

এলাকার পুলিশ প্রশাসন সাংবাদিকদের জানিয়েছেন সরকার বাড়ির হামলা ও রাধারাণীদের নির্যাতনের জন্য জামাত নেতা দায়ী। আমরা কথা বলেছি স্থানীয় বিএনপি নেত্রী ডলি ইসলামের সঙ্গে। তিনিও আমাদের বলেছেন 'জামাতে ইসলামীর সন্ত্রাসীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে।' একই অভিযোগ শুনেছি সাতক্ষীরার গাভা গ্রামে।

জঙ্গী মৌলবাদী সংগঠন 'আল সাইয়্যেদ মুজাহিদ বাহিনী' দু'বছর আগে পিরোজপুরে মূর্তিপূজা না করার জন্য হুমকি দিয়েছে। সংবাদ-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে— 'পিরোজপুরে আসন্ন দুর্গাপূজা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। 'আল সাইয়্যেদ মুজাহিদ বাহিনী' (হালিশহর, চট্টগ্রাম) নামে একটি সংগঠন পিরোজপুর ও নাজিরপুরের প্রায় সব পূজামণ্ডপেই চিঠি দিয়ে মূর্তিপূজা না করার হুমকি দিয়েছে। তারা বলেছে, ১০ অক্টোবরের মধ্যে সব মূর্তি ভেঙে না ফেললে প্রথম পূজার দিন তারাই মূর্তি ভাঙার দায়িত্ব নেবে। তারা আরও বলেছে, সাঈদীর জন্মস্থান ও নির্বাচনী এলাকায় মূর্তিপূজা হতে পারে না। মূর্তিপূজা হলো কাফেরদের পূজা। এই চিঠি পাওয়ার পর সোমবার শহরের সব পূজা কমিটির নেতৃবৃন্দ স্থানীয় কালীবাড়িতে এক সভায় মিলিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে ঘটনা অবহিত করা হয়েছে।'**

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন হিন্দু শিক্ষককে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে মুসলিম জঙ্গী সংগঠন 'ইসলামিক সলিডারিটি'। (দ্রষ্টব্য ঃ শ্বেতপত্র ১ম খণ্ডের ১৩২৩নং সংবাদ) নারায়ণগঞ্জের কালীমন্দিরে আগুন লাগিয়ে সামনের গাছে বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে মূর্তি পূজা বন্ধ করে মন্দির ভেঙে মসজিদ বানাবার আহ্বান জানানো হয়েছে। (দ্রষ্টব্য ঃ শ্বেতপত্র ১ম খণ্ডের ১২৮৫ নং সংবাদ) নীলফামারীতে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের প্রাক্কালে মসজিদের ইমাম ফতোয়া দিয়েছেন—'হিন্দু প্রার্থীকে ভোট দেয়া মুসলমানের ধর্মীয় আচারের বহির্ভূত হবে।' (দ্রষ্টব্য ঃ শ্বেতপত্র ১ম খণ্ডের ১৪৬০ নং সংবাদ) মানিকগঞ্জে হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে বাড়ি বাড়ি চিঠি পাঠিয়েছে জঙ্গী মৌলবাদী সংগঠন 'হরকাতুল জেহাদ।' (দ্রষ্টব্য ঃ শ্বেতপত্র ১ম খণ্ডের ১৯৬৬ নং সংবাদ) ভোলায় বোরহানউদ্দিনে হাফিজ ইব্রাহিম কলেজের মিলাদে হিন্দু শিক্ষকরা অংশগ্রহণ না করায় তাদের লাঞ্ছিত করা হয়েছে, বাড়িতে হামলা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য ঃ শ্বেতপত্র ১ম খণ্ডের ১৭৭৭ নং সংবাদ)

এ ধরনের আরও বহু উদাহরণ দেয়া যায় যেখানে দেখা যাবে মৌলবাদীরা এবার কিভাবে সংখ্যালঘু নির্যাতনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। মৌলবাদীদের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশে কোরাণ ও সুন্নাহভিত্তিক ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম করা। এ কাজ করতে হলে সেক্যুলার

---

* জনকণ্ঠ, ৮ জুলাই ২০০৩

** সংবাদ, ৮ অক্টোবর ২০০২।

মুসলমানদের পাশাপাশি অমুসলমানদেরও নির্মূল করতে হবে।

সংখ্যালঘু অমুসলিম জনগোষ্ঠীকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করবার পাশাপাশি যেখানে সুযোগ পাচ্ছে সেখানে ধর্মান্তরিতকরণের কাজও মৌলবাদীরা মহা উৎসাহে করছে। জামাত নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর এলাকায় ডাঃ ডাকুয়া নির্মূল কমিটির তদন্তকারী দলের নিকট বিবরণ দিয়েছেন কীভাবে প্রকাশ্য বাজারে সাঈদীর লোকজন তাকে জোর করে লিঙ্গচ্ছেদ করতে চেয়েছে। জোর করে মুসলমান বানাবার বেশ কয়েকটি ঘটনা খবরের কাগজে এসেছে। যাদের বলপূর্বক মুসলমান বানানো হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা লোকলজ্জা ও অপমানে গোপনে দেশত্যাগ করেছে— যেমনটি হয়েছে ধর্ষিতাদের ক্ষেত্রে।

ধর্ষণের ক্ষেত্রে আগে বলেছি শতকরা ৯০ ভাগ ভিকটিম থানায় অভিযোগ করেনি, সাংবাদিকদের জানায়নি, রাতের অন্ধকারে দেশত্যাগ করেছে, অপমান ও লোকলজ্জার কারণে। বহু ক্ষেত্রে নির্যাতক নরপশুরা ধর্ষিতাকে উলঙ্গ করে রাস্তায় হাঁটিয়ে ছবি তুলেছে। ঠাকুরগাঁও-এর রাধারাণীকে ধর্ষণের পর তার দুই চোখ উপড়ে ফেলা হয়েছে। বাগেরহাটে ছবিরাণীর ধর্ষণপরবর্তী লাঞ্ছনার কথা যারা খবরের কাগজে পড়েছেন ক্ষোভে অপমানে তাদের মাথা হেঁট হয়ে গেছে।

পাঁচ

গত চার বছরে সারা দেশে দশ হাজারের বেশি সাম্প্রদায়িক নির্যাতন, হুমকি, হত্যা, ধর্ষণ, গৃহে অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন প্রভৃতি অপরাধমূলক ঘটনা সংঘটিত হলেও শতকরা দশ ভাগ অভিযোগ পুলিশ যথাযথভাবে নথিবদ্ধ করেছে কি-না সন্দেহ। কিছু দায়সারা গোছের মামলা হয়েছে, কয়েকটি ক্ষেত্রে অপরাধীদের কয়েকজনকে বিভিন্ন মেয়াদের সাজাও দেয়া হয়েছে, কিন্তু তারপর কী হয়েছে আমরা জানবার চেষ্টা করিনি।

গত চার বছরে সংখ্যালঘু নির্যাতনের নৃশংসতম ঘটনার ভেতর দুটি আলোড়িত সংবাদ হচ্ছে চট্টগ্রামে বর্ষীয়ান শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরির হত্যাকাণ্ড এবং সিরাজগঞ্জে কিশোরী পূর্ণিমার গণধর্ষণ। ২০০১ সালের ১৬ নবেম্বর চট্টগ্রামে জামাত-শিবিরের সন্ত্রাসীরা অধ্যক্ষ মুহুরিকে কাছে থেকে গুলি করে হত্যা করে। মুহুরির হত্যাকাণ্ডের খবর পত্রিকায় পড়ে এবং নিহত জ্ঞানতাপসের মৃতদেহের ভয়ঙ্কর ছবি কাগজে দেখে দেশে বিদেশে ক্ষোভ ও প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেছে। প্রশাসন বাধ্য হয়েছে আসামীদের কয়েকজনকে গ্রেফতার করতে। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ তারিখে চট্টগ্রামের দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মুহুরি হত্যার দায়ে চার জনের ফাঁসি, চারজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও প্রত্যেকের ৫০ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দেয়া হয়। যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত শিবির ক্যাডার সাইফুল ১৭ জুন ২০০৩ তারিখে হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করলে সরকারপক্ষ এর বিরোধিতা করেনি, ফলে সে জামিন পেয়ে জেল থেকে বেরিয়ে গেছে। (দ্রষ্টব্য ঃ শ্বেতপত্র ১ম খণ্ডের ২০২৬ নং সংবাদ)

সিরাজগঞ্জের উল-াপাড়ার চৌদ্দ বছরের কিশোরী পূর্ণিমাকে নির্বাচনের আটদিন পর বিএনপির ২৫/৩০ জন ক্যাডার পালা□মে ধর্ষণ করেছে। তাদের আ□মণ থেকে পূর্ণিমার মা বাবা বোন কেউ রেহাই পায়নি। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হলে থানায় নির্যাতনের কথা লিখেছে, ধর্ষণের অভিযোগ গ্রহণ করেনি। স্থানীয় সাংবাদিক, আওয়ামী লীগ ও নির্মূল কমিটির নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় পূর্ণিমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নেয়া হলে কোর্টে অভিযোগ গ্রহণ করা হয়। পূর্ণিমা যে পনেরো জন ধর্ষকের নাম বলতে পেরেছিল তাদের গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট। তারা সবাই বিএনপির স্থানীয়

ক্যাডার। স্থানীয় এমপির চাপে পুলিশ গ্রেফতারের কিছুদিন পরই আসামীদের ছেড়ে দেয়।

এমপি বার বার পূর্ণিমার পরিবারকে হুমকি দিয়েছেন। কখনও আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে বলেছেন ধর্ষণের ঘটনা অস্বীকার করতে। আমি যখন জেলে ছিলাম তখন বিএনপির লোকজন পূর্ণিমাদের ২০ হাজার টাকা সেধেছিল আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার জন্য— ওরা বলবে পূর্ণিমা ধর্ষিতা হয়নি, আমি অর্থের লোভে দেখিয়ে ধর্ষণের কথা সাংবাদিকদের বলবার জন্য তাদের ঢাকায় এনেছিলাম। পূর্ণিমা ও তার দরিদ্র মা এই টাকা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

পূর্ণিমার ধর্ষণের কথা তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও অস্বীকার করেছিলেন। স্থানীয় এমপি এরপর পূর্ণিমা ধর্ষণ মামলা পুনঃতদন্তের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেন। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ পুলিশ তদন্তের নামে নতুন চার্জশিট তৈরি করে সেই সব সাংবাদিক, আইনজীবী, নির্মূল কমিটি ও আওয়ামী লীগের নেতাদের আসামী বানিয়েছে যারা পূর্ণিমাদের দুঃসময়ে এই পরিবারটির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

পূর্ণিমার বাবা এই নতুন চার্জশিটের বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে আদালতে ‘নারাজির’ আবেদন জানিয়েছেন, এখনও তার শুনানি শুরু হয়নি, কোর্টে শুধু তারিখের পর তারিখ পড়ছে। দু মাস আগে পূর্ণিমার বাবা ভুগে ভুগে মারা গেছেন। চার বছর আগে মারের ধকল তিনি সামলে উঠতে পারেননি। পূর্ণিমারা জানে না এই নারাজি মামলার শুনানি কবে শুরু হবে। এই মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার আগে আসল মামলার কার্য□ম আরম্ভ করা সম্ভব নয়। সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্পর্কে হাতে গোনা যে কটি মামলা হয়েছে এভাবেই চলছে তার কার্য□ম। বহু ক্ষেত্রে বিচার বিঘ্নিত হচ্ছে বাদীর অনুপস্থিতির কারণে। আসামীদের হুমকির ভয়ে বহু বাদী আদালতে হাজির হতে পারছে না, আসামীরা নির্বিঘ্নে জামিন নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, মামলার ঠাঁই হচ্ছে আদালতের মহাফেজখানায়।

অপরাধীদের দায়মুক্তির যে সংস্কৃতি বাংলাদেশে বিরাজ করছে এর ফলে গোটা সমাজ অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠছে। ধর্ষণ করবার মতো হিন্দু মেয়ে না পাওয়া গেলে মুসলমান মেয়ে আ□ান্ত হচ্ছে। এভাবে হত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতনের মতো ভয়ঙ্কর অপরাধ □মশঃ গা সহা হয়ে যাচ্ছে।

ছয়

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের উপর যে নির্যাতন গত চার বছর ধরে আমরা প্রত্যক্ষ করছি তার বহুমাত্রিক অভিব্যক্তি এই শ্বেতপত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডে বিভিন্ন দৈনিকের নির্বাচিত সংবাদ, উপসম্পাদকীয়, নিবন্ধ এবং বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের সরজমিন তদন্ত প্রতিবেদনে পাওয়া যাবে। বাংলাদেশে অমুসলিম জনসংখ্যা দেড় কোটির উপরে। আমাদের দেশে দেড় কোটি মানুষের অধিকার, মর্যাদা ও অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

বর্তমানে বিশ্বের ২৩৯টি দেশের ভেতর ১৭৬টি দেশ রয়েছে যেখানে জনসংখ্যা দেড় কোটির নিচে।* সরকার যতই অস্বীকার করবার চেষ্টা করুক বিশ্বের এমন কোন শক্তি নেই দেড় কোটি মানুষের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারে।

বাংলাদেশের সংবিধানের যথেষ্ট পরিমাণে ইসলামিকরণ হওয়ার পরও এখনও সংখ্যালঘুদের অধিকার ও মর্যাদা সং□ান্ত যে ধারাগুলো অবশিষ্ট আছে সরকার তাও মানছে

* দ্রষ্টব্য ঃ সিআইওয়ার্ল্ড ফ্যাক্ট বুক, জুলাই ২০০৫।

না। ফলে বিপন্ন মানুষ আরও বিপন্ন হচ্ছে।

সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন বন্ধ করবার জন্য যে সব পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন সেগুলো আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। ১) আশু পদক্ষেপ এবং ২) দীর্ঘ মেয়াদী পদক্ষেপ। আশু পদক্ষেপের ভেতর যে কাজগুলো অবিলম্বে করা দরকার তা হল—

১) সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের যে সব খবর গত চার বছর ধরে বিভিন্ন পত্রিকায় বেরিয়েছে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের যে সব মানবাধিকার সংগঠন এ বিষয়ে সরজমিন তদন্ত করে প্রতিবেদন ও পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করেছে তা যাচাই ও পর্যালোচনার জন্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারক, স্বরাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রনালয়ের যুগ্ম সচিব পর্যায়ের প্রতিনিধি এবং মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিশন গঠন করতে হবে, যে কমিশন ছয় মাসের ভেতর তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করবে, যেখানে থাকবে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন ও বৈষম্য বিলুপ্ত করবার সুপারিশমালা।

২) 'অর্পিত সম্পত্তি আইন' অবিলম্বে বাতিল করতে হবে এবং এই আইনের অপপ্রয়োগের দ্বারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ তারিখে যে শান্তিচুক্তি করেছে তা অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪) গত চার বছরে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার কারণে ধর্ম ও জাতিসত্তা নির্বিশেষে যে সব ব্যক্তি ও পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। যে সব ঘর-বাড়ি-জমি-সম্পদ বেদখল হয়েছে সেগুলো দখলমুক্ত করে প্রকৃত মালিকদের ফেরত দিতে হবে।

৫) যে সব মামলা বিচারাধীন রয়েছে সেগুলো নিস্পত্তির ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তদন্ত ও বিচারের ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক গণসচেতনতা। বাংলাদেশ থেকে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও সংখ্যালঘু নির্যাতন স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে হলে আমাদের প্রয়োজন ঃ

১) ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান, যা ধর্ম-বর্ণ-বিত্ত-লিঙ্গ-ভাষা-জাতিসত্তার নামে মানুষের সঙ্গে মানুষের বৈষম্য সৃষ্টি করবে না। '৭২-এর সংবিধান এ ক্ষেত্রে যে কোন দেশের জন্য মডেল হতে পারে। তবে এই সংবিধানের একটি বড় অসম্পূর্ণতা ছিল। এতে সংখ্যালঘু জাতিসত্তা ও আদিবাসীদের স্বতন্ত্র সত্তার কোন স্বীকৃতি দেয়া হয়নি, যা যে কোন সভ্য দেশের সংবিধানে থাকা প্রয়োজন।

২) মানবিক মূল্যবোধসমৃদ্ধ একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই কেবল ধর্ম-বর্ণ-বিত্ত-ভাষা-জাতিসত্তা নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে পারে। সমাজে এই মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে পারে সংবাদপত্র, বুদ্ধিজীবী ও সিভিল সমাজের বিভিন্ন উদ্যোগ। সিভিল সমাজের শক্তিশালী অবস্থান ও আন্দোলন ছাড়া সেক্যুলার মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ হতে পারে না।

৩) শিক্ষাকে বলা হয় জাতির মেরুদণ্ড। দেশে এমন শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা উচিৎ নয় যা ভিন্ন ধর্মের, ভিন্ন ভাষার, ভিন্ন জাতিসত্তার মানুষের প্রতি শিক্ষার্থীদের ভেতর বিরূপ ধারণার জন্ম দেয়। দেশের মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগপোযোগী, বিজ্ঞানমনস্ক ও মানবিক করতে হবে।

৪) বহুকাল ধরে বঞ্চনা ও অবহেলার কারণে যে সব সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠী পিছিয়ে

পড়েছে তাদের জন্য শিক্ষা ও কর্মজীবনের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা প্রয়োজন যাতে দেশগঠনের কাজে এই বিপুল মানবসম্পদ সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

৫) সংবাদপত্রের প্রতিবেদন এবং নির্মূল কমিটি সহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা জেনেছি— এবার সংখ্যালঘু নির্যাতন শহরাঞ্চলের তূলনায় গ্রামাঞ্চলে বেশি হয়েছে। গ্রামীণ সমাজের কূপমণ্ডুকতা, রক্ষণশীলতা এবং অশিক্ষিত মোল-াদের দৌরাত্ম্য মোকাবেলা করবার জন্য প্রত্যন্ত এলাকায় মানবিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা কার্যম সহ প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংগঠিত ও বেগবান করবার লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের উদ্যোগে দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ প্রয়োজন।

৬) ধর্ম নয় যোগ্যতা হবে সরকারি বেসরকারি চাকুরিলাভের পূর্বশর্ত। যত দিন পর্যন্ত দেশের অমুসলিম নাগরিকরা রাজনীতি, প্রশাসন, অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন ততদিন দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি আমরা আশা করতে পারি না। এসব ক্ষেত্রে লিখিত/অলিখিত সকল বিধিনিষেধ ও সাম্প্রদায়িক মানসিকতা দূর করতে হবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে সরকার যেখানে মাগত বলছে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোন ঘটনা ঘটেনি সেক্ষেত্রে এসব কাজ কেন তারা করবে, বিশেষভাবে যা তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এর জবাব হচ্ছে বর্তমান বিশ্বে কোন দেশই বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে না। বাংলাদেশের মত একটি দরিদ্র জনবহুল দেশে ধারাবাহিক ধর্মীয় ও জাতিগত নিপীড়ন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় চিরকাল উদাসীন থাকবে এমনটি মনে করবার কোন কারণ নেই। নির্যাতনের ফলে মানুষ নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশের নির্যাতিত স্যংখালঘুদের ভেতর যাদের সামর্থ আছে তারা ইউরোপ আমেরিকায় গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে, যাদের সামর্থ নেই তারা প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে।

এই অভিপ্রয়ান এইসব দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধিজনিত সমস্যা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আইনশৃঙ্খলাজনিত সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, যার পরিণতি হচ্ছে অন্য দেশের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ। এই হস্তক্ষেপ বহুমাত্রিকও হাতে পারে, আমরা যা অনুমোদন করতে পারি না। কিন্তু আমরা না চাইলেও অন্য দেশের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ঘটতে পারে যদি তার কারণগুলো দীর্ঘ সময় বিদ্যমান থাকে।

বাংলাদেশের প্রতি জোট সরকারের বিন্দুমাত্র মমত্ব থাকলে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ করবার জন্য এবং ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-জাতিসত্তা নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন কালবিলম্ব না করে তা করতে হবে। সরকার যদি অনিচ্ছুক বা ব্যর্থ হয় দেশ ও দেশের মানুষকে বাঁচাবার জন্য সকল দেশপ্রেমিক শক্তিকে একজোট হয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, যাতে সরকার দাবি মানতে বাধ্য হয়।

সরকারকে এটা অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে অবাধ তথ্যপ্রবাহের এই আধুনিক যুগে রাজনৈতিক সামাজিক অভিঘাতসৃষ্টিকারী যে কোন ঘটনা গোপন বা অস্বীকার করবার প্রচেষ্টা নিতান্তই হাস্যকর। সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা অস্বীকার করে সরকার বহির্বিশ্বে নিজেদের এবং একই সঙ্গে দেশের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করছে।

সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর ধারাবাহিক নির্যাতন ও অভিপ্রয়ান দেশের রাজনৈতিক,

অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক মানচিত্র বদলে দিচ্ছে। দেড় কোটি নাগরিকের মর্যাদা, অধিকার ও অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করে সুশাসন ও উন্নয়ন কোনটাই নিশ্চিত করা যাবে না। নির্যাতনজনিত অভিঘাতের ফলে সংখ্যালঘু অমুসলিম জনসংখ্যা কমে যাওয়ার কারণে সংখ্যাগুরুও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাঙালি মুসলমানের তুলনায় বাঙালি হিন্দুর ভেতর শিক্ষার হার বেশি। সমতলের বাঙালিদের তুলনায় পাহাড়ী চাকমাদের ভেতর শিক্ষার হার বেশী। শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ধারাবাহিক অভিপ্রয়ান যে কোন দেশ ও সমাজের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

আমরা আশা করব এই শ্বেতপত্র সরকারকে দায়িত্ব ও কর্তব্যসচেতন করবে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া প্রায়শঃ বলেন বাংলাদেশে 'সংখ্যালঘু' 'সংখ্যাগুরু' বলে কিছু নেই, সবাই বাংলাদেশী। আমরাও এ কথা সব সময় বলেছি কোন মানুষকে সংখ্যালঘু মনে করা ঠিক নয়। সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু বিভাজন অত্যন্ত অমানবিক। আমরা সরকারের যাবতীয় আচরণে এই বক্তব্যের প্রতিফলন দেখতে চাই। সংখ্যালঘু অমুসলিম নাগরিকরা কখনো নিজেদের সংখ্যাগুরু মুসলমানদের সমান ভাবতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সংবিধান সহ অর্পিত সম্পত্তি আইনের মত কালাকানুন বহাল থাকবে। কাউকে সংখ্যালঘু বিবেচনা করে তার প্রাপ্য মর্যাদা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অতি বর্বর মানসিকতার অন্তর্গত।

সাত

শ্বেতপত্রের ২য় খণ্ডে চলমান সাম্প্রদায়িক নির্যাতন সম্পর্কে ৭টি বাংলা দৈনিকে প্রকাশিত উপসম্পাদকীয়, কলাম, নিবন্ধ ও অভিমত গ্রন্থিত হয়েছে। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে কোন কোন লেখকের দুই বা ততোধিক লেখা এই শ্বেতপত্রে স্থান পেয়েছে। মোট ৭১ জন লেখকের শতাধিক লেখায় সংখ্যালঘু নির্যাতনের বহুমাত্রিকতা মূর্ত হয়েছে। এ সব লেখা থেকে সংখ্যালঘুদের অবস্থান, প্রান্তিকীকরণ প্রক্রিয়া, নির্যাতনের কারণ, এর প্রতিক্রিয়া ও প্রতিকার সম্পর্কে তাঁদের অভিমত জানা যাবে।

চট্টগ্রাম থেকে শওকত বাঙালি ও আসাদ করিম খান প্রিয়-র সম্পাদনায় ২০০৩ সালের অক্টোবরে 'বিধ্বস্ত মানবতা' নামে সংখ্যালঘু নির্যাতন বিষয়ক লেখার একটি সংকলন বেরিয়েছে। এই সংকলনের অধিকাংশ লেখা কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে এই সংকলনের পাঁচটি লেখা শ্বেতপত্রে সংকলিত হয়েছে।

শ্বেতপত্রের দ্বিতীয় খণ্ডে আরও রয়েছে সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্পর্কে ঢাকার ১৬টি দৈনিকে যে সংবাদ বেরিয়েছিল তার শিরোনাম এবং একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি সহ কয়েকটি মানবাধিকার ও নাগরিক সংগঠনের সরজমিন তদন্ত প্রতিবেদন। 'প্রিপ ট্রাস্ট', 'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ', 'আইন ও সালিশ কেন্দ্র' ও 'নাগরিক অধিকার কমিটি'র প্রতিবেদন আমরা 'গণতদন্ত কমিশনের রিপোর্ট থেকে সংগ্রহ করেছি। 'বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম', 'হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনরিটিয' ও 'বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ঠাকুরগাঁও জেলা' আমাদের শ্বেতপত্রের জন্য নতুন প্রতিবেদন রচনা করেছেন। এই সব প্রতিবেদন ইতোপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। গণতদন্ত কমিশনের রিপোর্ট সাংবাদিকদের কাছে প্রকাশ করা হলেও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি।

সরজমিনে তদন্তকালে দেখা গেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্যাতনের ব্যাপকতা ও

ভয়াবহতা পত্রিকায় আসেনি, সম্ভবত স্থানাভাবে ছাপা হয়নি। সময় ও সামর্থের সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা দশ হাজার ঘটনার ভেতর খুব বেশি হলে ৫০/৬০টির ক্ষেত্রে তদন্ত করতে পেরেছি। কখনও প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে তদন্ত অর্ধসমাপ্ত রেখে আমাদের চলে আসতে হয়েছে।

শ্বেতপত্রের বর্তমান খণ্ডে আরও রয়েছে সংখ্যালঘু নির্যাতনের দুই শতাধিক আলোকচিত্র। ছবি কথা বলে। অন্য সব লেখা না পড়লেও শুধু ছবি দেখলেও কিছুটা আঁচ করা যাবে এবারের সংখ্যালঘু নির্যাতনের ব্যাপকতা ও নৃশংসতা সম্পর্কে। নির্মূল কমিটির নিজস্ব ছবির বাইরে যাদের ছবি ও সংগ্রহ এই শ্বেতপত্রে ব্যবহার করা হয়েছে তারা হলেন আলোকচিত্রগ্রাহক সাইফুল ইসলাম কলে-লাল, সমরেশ বৈদ্য, জাহাঙ্গীর আলম আকাশ, রোজলিন কস্তা, এডভোকেট রবীন্দ্র ঘোষ, গৌরাঙ্গ নন্দী ও সঞ্জিব দ্রং।

শ্বেতপত্রের পরিশিষ্টে রয়েছে নির্মূল কমিটি এবং সমমনা অন্যান্য মানবাধিকার সংগঠনের কয়েকটি ইশতেহার, ঘোষণা, ধারণাপত্র ও প্রাসঙ্গিক দলিল।

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা করেছে 'বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ,' 'নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি,' 'হটলাইন বাংলাদেশ', 'প্রিপ ট্রাস্ট', 'বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম', 'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ', 'হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনরিটিয' ও 'আইন ও সালিস কেন্দ্র'। এ ছাড়া 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি', 'মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলন' এবং 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ কেন্দ্র ট্রাস্টে'র কেন্দ্র ও জেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করেছেন। উপর্যুক্ত ব্যক্তি ও সংগঠনের সহযোগিতা ছাড়া এই শ্বেতপত্র প্রকাশ কঠিন হতো। এই সুযোগে এদের সকলকে জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আমাদের তথ্য সংগ্রাহকদের অনবধানতাবশত কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বাদ পড়ে যেতে পারে। কোন পাঠক যদি এ ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা করেন শ্বেতপত্রের পরবর্তী সংস্করণে তা সংযোজন করা হবে।

এই শ্বেতপত্র প্রকাশের উদ্দেশ্য হচ্ছে সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর সব ধরনের নির্যাতন, বৈষম্য ও বিদ্বেষের অবসান এবং সব মানুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। আমাদের আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের সকল অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে আমাদের লড়ে যেতে হবে নিরন্তর।

শাহরিয়ার কবির
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি
সাধারণ সম্পাদক, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলন
ঢাকা, ১ অক্টোবর ২০০৫

সংখ্যালঘু নির্যাতন
বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত
নির্বাচিত উপসম্পাদকীয় ও কলাম

১৫ জুলাই ২০০১ - ২৫ আগস্ট ২০০৫

তত্ত্বাবধায়ক সরকার কি সংখ্যালঘুদের ওপর হামলাকে সন্ত্রাস মনে করেন না?

এবিএম মূসা

ইংরেজিতে বলতাম, দে লিভড হ্যাপিলি এভার আফটার, অতঃপর তাহারা সুখে বসবাস করিতে লাগিলো। বাংলায় কাহিনীর শেষে বলা হয়, আমার কথাটি ফুরোলো নটে গাছটি মুড়োলো! 'প্রায় দশ বছর লেখালেখি করলাম, ভাবলাম রাজনৈতিক সরকারের আমলে অনেক সমস্যা বা ইস্যু থাকে লেখারও শেষ থাকে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসেছে, এবার খান্তি দেবো। অন্তত তিনটি মাস পুরোপুরি বিশ্রাম। নতুন সরকার এলে তখন অবস্থা বুঝে, তাদের মতিগতি হালচাল পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনে আবার কলম ধরা যাবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এলো, তারপর হা হতোস্মি, যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন, লেখার বিষয় যে আরো বেড়ে গেলো। এ যে দেখছি রাজনৈতিক সরকারেরও বাড়া। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতা ভোগ করে, কিন্তু অনেক দায়-দায়িত্বও তাদের নিতে হয়। জবাবদিহিতা থাকে, কৈফিয়ত দিতে হয়। ভুল কাজের মাশুল গুনতে হয়, উল্টাপাল্টা কাজ করলে আন্দোলন হয়, হরতাল হয়। এখন যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, সন্ত্রাস বাড়ছে, দ্রব্যমূল্য আকাশছোঁয়া, আগের মতোই বোমা ফাটছে আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বলছেন আমরা কি করবো। সন্ত্রাস নিয়ে শুধু একটুখানি কৈফিয়ত দিলেন, রাজনৈতিক দলগুলো হানাহানি করে সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটিয়েছে, তাঁরা অসহায়।

তারপর যদি মনে হয় কোনো দায়-দায়িত্ব নিতে তারা গররাজি, এমনকি নিস্পৃহ মনোভাব দেখান তা হলে অবস্থাটি কি দাঁড়ায়। আওয়ামী লীগ আমলে সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটেছিলো বলে অহরহ অভিযোগ শোনা গেছে। সরকারি দলের ব্যক্তিদের ও তাদের পরিজনদের যে বদনাম ছড়িয়েছিলো সেসব না হয় বাদই দিলাম। তবে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কারণে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছিলো। সে জন্য আওয়ামী লীগ নামক ক্ষমতাসীন দলটিকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সেই সমালোচনার জের আজো চলছে। আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ সন্ত্রাস করার জন্য যতোখানি নয়, তার দ্বিগুণ সমালোচিত হয়েছেন সন্ত্রাস দমনে ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারে ব্যর্থতার জন্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দেয়ার অভিযোগও উত্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কেউ সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত নন। তাদের বাহ্যত রাজনৈতিক স্বার্থ নেই। তারপরও তাদের দুর্বলতা বা পরোক্ষ প্রশ্রয়ে কেউ সন্ত্রাস করছে কিনা সেই প্রশ্নটিই সামনে এসে গেছে। তাঁরা সরাসরি হয়তো জড়িয়ে নেই, প্রসাসনকে ওলট-পালট করে বেছে বেছে বিভিন্ন স্থানে যাদের বসিয়েছেন তাদের কথা বলছি। দ্বিতীয়ত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে অপারগতা কতোখানি আর কতোখানি রয়েছে নিস্পৃহতা তাও ভেবে দেখতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই এক ধরনের সন্ত্রাস মাথাচাড়া নিয়ে উঠেছিলো। তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান তার উলি-খিত বক্তব্যে পরোক্ষ জানিয়েছেন সব রাজনৈতিক দলের সন্ত্রাসী আছে। ওরা সবাই মিলে

সন্ত্রাস করলে তারা কি করতে পারেন, এ ধরনের মনোভাবের কারণটি বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাদের অসহায়ত্ব সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করতে রাজি আছি, কিন্তু তাদের দূরদৃষ্টির অভাব, দুর্বলতা কোনো কারণেই মেনে নেবো না। কারণ জনকণ্ঠে আমি তিন মাস আগে এ ব্যাপারে তাদের সাবধান করে দিয়েছিলাম।

পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগের কর্মীদের ওপর হামলা শুরু হয়েছিলো। এই হামলা অবশ্য প্রতিশোধমূলক মনে হতে পারে। পাঁচ বছর যারা মার খেয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে তারা ভেবেছে, এবার যাবে কোথায়? এই প্রতিশোধস্পৃহা ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ অস্বাভাবিক মনে করছি না। তবে এজন্য তারা নিজেরা ক্ষমতা পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারতো। কিন্তু এর ফলে যে একটি ভিন্ন রকমের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার খেয়াল করেননি। তারা অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়, এ ধারকা মাল ওধার নিতে এতো ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে আসল কাজটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের জন্য সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী দমনে প্রথম থেকেই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা ভাবনার সময় পেলেন না। একদল সন্ত্রাসী মাঠ খালি করে গেলো, আরেকটি দল তা দখল করে নিলো, তত্ত্বাবধায়ক সরকার চেয়ে চেয়ে দেখলেন। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। অথচ তাদের দায়িত্ব ছিলো, দল নির্বিশেষে সকল সন্ত্রাসীর কবল থেকে মাঠ মুক্ত রাখা। যে কাজটি সেই সময়ে করলেন না এখন বলছেন, আমরা কি করতে পারি। তখন জনকণ্ঠে লেখার মাধ্যমে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছিলাম, 'সামাল দেন। তা না হলে সব দল একসঙ্গে পাল্টা মারামারি শুরু করলে হাত পা ছেড়ে দিয়ে শুধু অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকবেন।' তারা ভুলে গেলেন, রাজনৈতিক ব্যবস্থা পাল্টিয়ে তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি চালু করে তাদের ক্ষমতায় বসানো হয়েছে পক্ষপাতহীনভাবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য। 'অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী হয়ে কোনো কাজ করবেন না' এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন। এখন অনুরাগ বা বিরাগ দেখাচ্ছেন তা বলবো না, তবে উভয় বস্তুই শিকেয় তুলে রেখেছেন। অথচ অঙ্গীকার যা-ই করুন সন্ত্রাসীদের প্রতি 'বিরাগ' থাকলে অন্যায় হতো না। দেখা যাচ্ছে, তাও নেই এবং এই কারণে সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটেছে। নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে সন্ত্রাস দমন করতে না পেরে এখন বলছেন 'আমরা কি করবো?'

অনুরাগ তাদের থাকার কথা সংখ্যালঘু, নারী ও উপেক্ষিত গোষ্ঠীর প্রতি। আজ সর্বত্র সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা শুরু হয়েছে। এই অপকর্মটির সঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়টি যে জড়িত তা তারা নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না। জনকণ্ঠের শিরোনাম 'গানপয়েন্টে সংখ্যালঘুরা!' মন্তব্য করেছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধান করতে পারেনি। যদি কেউ প্রশ্ন করেন, তারা পারেননি নাকি করছেন না? সংখ্যালঘুদের ভোট যে নির্বাচনের ফলাফলে কি ধরনের প্রভাব ফেলে তা জেনেই বিশেষ দলের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না?' প্রথম আলো দুই কলাম শিরোনামে প্রশ্ন করেছে, 'সংখ্যালঘুরা কি ভোট দেবে না?' একটি বিস্ত ারিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, পাবনা-২ আসনে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর ভেঙে দেয়া হয়েছে। বাগেরহাটে হিন্দুদের বাড়ির ভেতর বন্ধ করে রেখে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ভোলায় লুটপাট হচ্ছে, চট্টগ্রামেও হিন্দুদের ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দেয়ার হুমকি এখনই শোনা যাচ্ছে। এদিকে টেলিভিশনে, সংবাদপত্রের পাতায় আর সংবাদ সম্মেলনে তত্ত্বাবধায়ক প্রধান ও নির্বাচন কমিশন প্রায় প্রতিদিন আত্মসন্তুষ্টির সঙ্গে বলছেন, 'আমরা সকলের ভোট দেয়া নিশ্চিত করবো।' অথচ এতসব ঘটনার কোনো প্রতিবিধানের খবর পত্রিকার পাতায় পড়িনি। আইন থাকলেও সংখ্যালঘুদের হুমকিদাতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। মহিলা ভোটারদের উদ্বুদ্ধ করেন, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো কোনো বক্তব্য দিলেন না।

সাম্প্রদায়িক ঘটনা কি সন্ত্রাস নয়? এ নিয়ে তবে তাদের হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে না কেন? দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের ভোটে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে না পারলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন পরিচালনা করতে পেরেছেন, এমন দাবিটি কি পরবর্তী আমলে বিশ্বাস করতে পারবেন? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নটি তাদের তখন করা হবে তা হচ্ছে, 'আপনারা কি সত্যি সত্যি এসব বন্ধ করতে পারেননি, কিংবা বন্ধ করার উদ্যোগ নেননি?' তারা নিশ্চয়ই অনুধাবন করেন নির্বাচনকে প্রভাবান্বিত করার উদ্দেশ্যেই সংখ্যালঘুদের ওপর পরিকল্পিতভাবে হামলা হচ্ছে। শুধু সন্ত্রাস নয়, সাম্প্রদায়িক প্রভাবমুক্ত নির্বাচন পরিবেশ তৈরির দায়িত্ব তাদের। এ জন্য তারা কি ব্যবস্থা নিলেন তা কি জনগণ জানতে ও বুঝতে পারবে না?

ক্ষমতায় এসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রায় সবাই সব ধরনের ক্ষমতা দেখাচ্ছেন। এর মাঝে কিছু প্রশংসনীয় কিছু সমালোচিত হয়েছে। অবৈধ বিদ্যুৎ লাইন কেটে দিচ্ছেন, সরকারি জমি মুক্ত করছেন, বুড়িগঙ্গার তীর পরিস্কার করার সাময়িক উদ্যোগ নিলেন। কোনো রাজনৈতিক দল এই কাজগুলো করতে পারতো না। কিন্তু আরো যে কাজ ছিলো যা রাজনৈতিক সরকারের দৃষ্টি এড়ায় না তা কি তত্ত্বাবধায়ক ক্ষমতাসীনেরা জানেন? চাঁদপুর শহর পানির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে, কোনো উপদেষ্টা সেখানে ছুটে গেলেন না। সদরঘাটে যাওয়া যদি প্রয়োজনীয় মনে করে থাকেন তবে চাঁদপুর শহরে একদিন ঘুরে আসাটা তার চেয়েও জরুরী ছিলো। সন্ত্রাসী ধরার জন্য ফেনীর মাস্টারপাড়া ঘেরাও করতে হয়েছে, বাগেরহাটে সন্ত্রাসী আটজনকে খুন করে গেলো যারা তাদের বিরুদ্ধে সেনা-বিডিআর অভিযান হলো না। প্রশাসনে থেকে কেউ ক্ষমতার আপেক্ষিক ব্যবহার করবেন, ক্ষমতা প্রয়োগের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা মনের মাঝে উঁকি দেবে, এমনটি যাতে না হয় সেজন্যই তো একটি অরাজনৈতিক, এমনকি ব্যাহত অগণতান্ত্রিক সরকারকে জনগণ সংবিধান সংশোধন করে ক্ষমতায় বসিয়েছে। এখন ভাবতে হচ্ছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটির জন্ম হয়েছে যে কারণে ও উদ্দেশ্যে তা কি বদলে যাচ্ছে? পুরো ধারণাটিই পাল্টে যাচ্ছে? তত্ত্বাবধায়ক হোক আর রাজনৈতিক দলীয় হোক, সিভিলিয়ান সরকারই দেশ চালাবে এটাই সবার মৌলিক ধারণা। সেই সরকার চালানোর জন্য তাদের নিজস্ব লোকবল আছে। রয়েছে লেজিসলেচার বা সংসদ, জুডিশিয়ারি বা বিচারব্যবস্থা এবং এক্সিকিউটিভ বা নির্বাহী বিভাগ। তত্ত্বাবধায়ক আমলে লেজিসলেচার নেই কিন্তু বাকি দুটি রয়েছে। তৃতীয়টি তথা নির্বাহী বিভাগ রয়েছে পুরো ক্ষমতা ও পরিপূর্ণ কাঠামো নিয়ে। তত্ত্বাবধায়ক আমলে কি এক্সিকিউটিভ ব্যর্থ হয়ে গেলো? তত্ত্বাবধায়কের সিভিলিয়ান সরকারের অযোগ্যতার কারণেই কি আজ সেনাবাহিনীকে মাঠে নামাতে হচ্ছে? একবার সবাই কল্পনা করুন, আওয়ামী লীগ বা বিএনপি সরকার যদি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য সশস্ত্রবাহিনীকে আহ্বান জানাতো কি হুলস্থুল কাণ্ডই না বেধে যেতো।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, বিএনপি আগে যা-ই বলুক এখন বলছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা খুব ভাল। তারা সবই ভাল কাজ করছে। এখানকার ওসি ওখানে পাঠিয়ে, ডিসিকে ওএসডি করে সব ঠিকঠাক করে ফেলেছে। তারাই বলছে, তাড়াতাড়ি সেনাবাহিনী নামান। সরাসরি কিন্তু বলছে না, 'একটি সিভিলিয়ান তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দিতে পারছে না। এখন কাজটি সেনাবাহিনীর হাতে ন্যস্ত তরা হোক।' প্রেসক্লাবে অবশ্য একজন অনুজ সাংবাদিক ঠাট্টা করে বললেন, 'এরপর বলবে না তো এরা সরকার চালাতে পারছে না, সেই ব্যবস্থাটিও তাদের হাতে তুলে দেয়া হোক।' আমি কিন্তু কথাটি পুরোপুরি ঠাট্টা বলে গ্রহণ করতে পারলাম না, হকচকিয়ে কথাটি ভাবতে বসলাম। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা না করে তিন মাস সেনাবাহিনীর হাতে সব ক্ষমতা তুলে দিলে কেমন হয়, এমনটিও যদি কেউ বলেন, তখন কি হবে? আর কেউ না হোক ব্যারাকে জন্ম নেয়া দলগুলো হয়তো এতে আপত্তি করবে না।

আমার সব ভাবনা আপাতত স্থগিত রাখলাম। আমার মূল বক্তব্যটিই শেষ করার আগে জানিয়ে দিতে চাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে। শুধু ক্ষমতা ভোগ করে যাবেন, এখানে-ওখানে হম্বিতম্বি করবেন, এর-ওর কথায় দু'একটি পদক্ষেপ নিয়ে দাপট দেখাবেন, অথচ দায়িত্ব নেবেন না তা কিন্তু হয় না। বাগেরহাটে বোমা বিস্ফোরণে আটজন মারা গেছে, এই দায়ভার তাদের নিতে হবে। কোনো বিশেষ দলের সন্ত্রাসীদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে, তাদের ভোট প্রদান নিশ্চিত করার ব্যাপারে অনীহা দেখাচ্ছেন, কেন এমন ধারণার সৃষ্টি হবে? এইসব অভিযোগের ব্যাপারে এখন আর রাখঢাক করার কিছু নেই। এখন যেমন বলা হয় অমুক সরকারের আমলে এতজন সন্ত্রাসের কারণে মারা গেছে, ভবিষ্যতে তাদের শাসনকালের ইতিহাসে এইসব ব্যর্থতা ও পক্ষপাতিত্বের কাহিনী লিপিবদ্ধ থাকবে। বলা হবে খালেদার আমলে এমন হয়েছে, হাসিনার আমলেও হয়েছে, একটি অরাজনৈতিক লতিফুর রহমান সরকারের আমলেও রাজনৈতিক কারণে সন্ত্রাস হয়েছে। সেই সরকার নিয়োজিত প্রশাসন কোথাও কোথাও সন্ত্রাসীদের পরোক্ষে মদদ দিয়েছে অথবা সন্ত্রাস দমনে পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছে। সর্বোপরি, অনেক কিছুই করেছে, অনেক কাজই করেনি। তবু বলবো, এতো কিছুর পরেও একটি নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু, অবাধ, পক্ষপাতহীন, সর্বোপরি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন করতে পারলে তাদের সব দোষ খণ্ডিয়ে যাবে। এজন্য শুধু ক্ষমতায় থেকে এর সকল সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করলেই হবে না, সংশি-ষ্ট সকল দায়ভার নিতে হবে। যদি তা না পারেন, এখন না হলেও নির্বাচনের পরে তো বটেই ব্যর্থতার হ্যাপা সামলাতে হবে।

আর দুদিন পরেই নির্বাচন, তাই তত্ত্বাবধায়কদের নিয়ে নির্বাচনপূর্ব ভাবনায় এখানেই ইতি, লেখালেখির ক্ষ্যান্তি ঘটলো। নির্বাচনের পর তাদের নিয়ে আর লেখালেখি করতে হবে না, এই কামনা করি। নির্বাচনের পর তারা 'লিভ হ্যাপিলি এভার আফটার' নিশ্চিন্ত শুধু নয়, নিরাপদ জীবন যাপন করুন এই আমার একান্ত প্রার্থনা।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০১

সংখ্যালঘু ঃ জন্মই আজন্ম পাপ
সোহরাব হাসান

গত শু□বার সকালে ঘুম ভাঙলো সূত্রাপুরের মিল ব্যারাক এলাকার এক বন্ধুর টেলিফোনে। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন, 'সারারাত আমি ঘুমুতে পারিনি। রাত দুটো পর্যন্ত এলাকায় বিএনপি প্রার্থী সাদেক হোসেন খোকার নির্বাচনী ক্যাম্প থেকে মাইক বেজেছে। সেই মাইকে সাদেক হোসেন খোকার পক্ষে ভোট চাওয়ার বদলে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছিল। সেই অপপ্রচারের ভাষা এত কুৎসিত ও জঘন্য যে ভদ্রলোক হলে কানে আঙ্গুল দিয়ে থাকতে হয়। আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনাকে গালাগালের স্টক ঠিক যখন ফুরিয়ে এলো তখন তারা কবর থেকে শেখ মুজিবকে টেনে তুললো। বিএনপির স্থানীয় গোছের এক নেতা মাইকে সর্বোচ্চ কণ্ঠে জানালো ঃ শেখ মুজিব একটা মীরজাফর। কেন মীরজাফর? শেখ মুজিব ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে পাকিস্তান ভেঙ্গেছেন। কেন মীরজাফর? শেখ মুজিব ইসলামকে নির্বাসনে পাঠিয়ে এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা জারি করেছিলেন। বিএনপির বাছুর নেতার কথা শুনে ইতিহাসের মীরজাফরও হেসে উঠবেন। কেননা ইতিহাসের মীরজাফর তথা মীর জাফর আলী খান বাংলার স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দিয়েছিলেন ইংরেজদের কাছে। আর শেখ মুজিব সেই

স্বাধীনতাকে পুনরুদ্ধার করেছেন। শেখ মুজিব বাঙালিকে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখিয়েছিলেন।

আমার সেই বন্ধুটি কোনদিন আওয়ামী লীগ করেননি। বরং প্রথম আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সরকারবিরোধী রাজনীতি করার জন্য জেলে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালেও তার রাজনৈতিক অবস্থান বদলে যায়নি। কিন্তু একটা ব্যাপারে তিনি আপোষহীন। তার মতে, শাসক হিসেবে শেখ মুজিবের যতই ব্যর্থতা থাক তিনিই ছিলেন স্বাধীনতার নেতা, বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ। একথাটি স্বীকার না করলে বাংলাদেশকে অস্বীকার করতে হয়। একথাটি স্বীকার না করলে আমাদের একাত্তর পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যেতে হয়।

বন্ধুটি তার ক্ষোভ প্রশমন করতে না পেরে বললেন, বিএনপি যেসব কথা বলছে তাতে আমার মাথাই গরম হয়ে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগের কর্মীদের কথা কি বলব?

সৌভাগ্যের বিষয়, সূত্রাপুর-কোতোয়ালী এলাকার আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগের কর্মীরা কোন অঘটন ঘটায়নি। নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকে ঢাকা-৭ আসনে যতগুলো অঘটন ঘটেছে বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের কর্মীরাই করেছে। তারা প্রতিপক্ষের মিছিলে হামলা চালিয়েছে। নির্বাচনী ক্যাম্প ভাঙচুর করেছে। প্রতিহিংসা দুর্বলের শেষ অস্ত্র। কিন্তু বাস্তবে কোতোয়ালি সূত্রাপুর এলাকায় সাদেক হোসেন খোকার অবস্থা খারাপ হওয়ার কথা নয়। ১৯৯১ সালে তিনি আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে পরাজিত করেছিলেন। ১৯৯৬ সালে ঢাকা মহানগরীতে আওয়ামী লীগের বাম্পার ফলাফলেও এ আসনটি দখলে নিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়েও তিনি আন্দোলন-সংগ্রামে ছিলেন। সেক্ষেত্রে রাজনীতিতে একেবারে নবাগত সাঈদ খোকনের বিরুদ্ধে তাকে হক না হক পথ বেছে নিতে হবে কেন? দলের স্থানীয় নেতা ও কর্মীদের এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তিনি যে একেবারে ওয়াকিবহাল নন তাও বলা যায় না। তারপরেও মনে করি সাদেক হোসেন খোকা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী নন। যার একমাত্র অবলম্বন হচ্ছে অস্ত্র, অর্থ ও রাজনৈতিক গণিকাবৃত্তি। কদিন আগে বিএনপিকে তালাক দিয়ে, এখন আবার বিএনপিতেই ফিরে গেছেন। সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এই ফিরে যাওয়ার কাহিনী বর্ণনা করে বলেছেন, বিএনপি ছাড়ার পর অনেকেই আমাকে দলে নিতে চেয়েছেন, যোগাযোগ করেছেন কিন্তু শেখ হাসিনা কোন যোগাযোগ করেননি। কেননা তিনি জানেন আমার পথ ও তার পথ এক নয়। একেবারে খাঁটি কথা। শেখ হাসিনা ও সা.কা চৌধুরীর পথ এক হতে পারে না। তবে আওয়ামী লীগ মাঝে মাঝে দুরত্বটা কমিয়ে ফেলে। তখনই মুশকিল হয়ে যায়।

সাদেক হোসেন খোকার এলাকার ঘটনাটি আমি উদাহরণ হিসেবে উলে-খ করেছি। দেশের মোট ৩শ' আসনের অধিকাংশ এ ধরনের সংঘাত সংঘর্ষ অপবাদ অপপ্রচারের ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই ঘটছে। আওয়ামী লীগও ধোয়া তুলশীপাতা নয়। তারাও সন্ত্রাস কম জানে না। সদ্য ক্ষমতা ত্যাগের বেদনা ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের খড়গহস্ত আওয়ামী লীগকে কিছুটা বেকায়দায় ফেলেছে। বলা যায়, আওয়ামী লীগ হঠাৎ করে অফেন্সিভ থেকে ডিফেন্সিভে চলে গেছে। গত শনিবার ঢাকা-৯ আসনে বিএনপি প্রার্থী খন্দকার মাহবউদ্দিন আহমদের গাড়ি ভাঙচুর করেছে আওয়ামী লীগের ক্যাডাররা। এর একদিন পর বাগেরহাটে আওয়ামী লীগ প্রার্থী শেখ হেলালের জনসভায় বোমা মেরে ৮ জনকে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। অল্পের জন্য বেঁচে যান শেখ হেলাল।

আওয়ামী লীগ ও বিএনটি কর্মীদের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ বেড়ে চলেছে। প্রতিদিন মানুষ মারা যাচ্ছে। বাড়িঘর দোকানপাটে আগুন লাগানো হচ্ছে। নেতা-নেত্রীদের উস্কানিমূলক বক্তব্যে আরো ক্ষেপে যাচ্ছে কর্মীরা। তারা জানের বদলে জান, ঘরের বদলে ঘর নিচ্ছে। এই রাজনৈতিক হাঙ্গামা দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে সীমিত থাকলে আমরা সাধারণ মানুষ ততটা উদ্বিগ্ন হতাম না। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর মারামারি, লাঠালাঠি, পিস্তল-রিভলভার

চালাচালির শিকার হচ্ছে নিরীহ সাধারণ মানুষ। আবার এই নিরীহদের মধ্যে নিরিহ যে সংখ্যালঘু হোক সেটা ধর্মীয় সংখ্যালঘু কিংবা জাতিগত সংখ্যালঘু-তারাই নৃশংসতার শিকার হচ্ছে বেশি। আমি সারা মাসের হিসেবে যাব না। গত কয়েকদিনের হিসাব এখানে তুলে ধরছি ঃ

১৯৯৬ সালে বাগেরহাট জেলার ৪টি সংসদীয় আসনেই আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা জয়লাভ করেছিল। জেলার প্রায় ৯ লাখ ভোটারের মধ্যে ২৫ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটারই আওয়ামী লীগের জয়লাভের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ কারণে ৪ দলীয় জোট নির্বাচনী ফলাফলে পরিবর্তন আনার জন্য প্রধান টার্গেট করেছে সংখ্যালঘুদের। চারদলীয় প্রার্থী আদম ব্যবসায়ী এইচএম সেলিমের অন্যতম সেনাপতি হিসাবে কাজ করছে বাগেরহাটের কুখ্যাত রাজাকার রজব আলী ফকিরের দুই ছেলে। তারা সদর উপজেলার ষাটগম্বুজ ইউনিয়ন, যাত্রাপুর, বারইপাড়া, রাখালগাছি, কাড়াপাড়া ও খানিপুর ইউনিয়নের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়কে অব্যাহত ভয়ভীতি দেখাচ্ছে ও নির্যাতন করছে। এদের মধ্যে উৎকুল গ্রামের সাহাপাড়ায় ৫টি পরিবারের ৬টি ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। (বাগেরহাট থেকে মানিক সাহা ও মুজিবর রহমানের রিপোর্ট, সংবাদ, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০১)।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে সংখ্যালঘুরা এদেশে থাকতে পারবে না। নির্বাচন এলেই একশ্রেণীর রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দল তাদের টার্গেট করে। আরো খোলাখুলি ভাবে বললে অতীতের মতো এবারেও বিএনপি নেতাকর্মীরা সংখ্যালঘুদের ওপর চড়াও হচ্ছে। তাদের অপরাধ? তারা নৌকায় ভোট দেয়। তাদের অপরাধ তারা এই মুসলমানের দেশে অমুসলমান। তাদের অপরাধ তারা বিএনপির গুণ্ডামি বদমায়েশি অবনত মস্তকে সমর্থন করে না। তাদের অপরাধ তারা রাজনৈতিক মস্তানদের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে ভোট কেন্দ্রে যায়।

সংখ্যালঘুরা কেন নৌকায় বা আওয়ামী লীগকে ভোট দেবে? আওয়ামী লীগ যে তাদের সুখ-দুঃখে, বিপদে আপদে পাশে দাঁড়ায় তা নয়। আওয়ামী লীগ, ছাত্র লীগের নেতা-কর্মীরাও সুযোগ পেলে তাদের ওপর এক হাত নিতে ছাড়ে না। কিন্তু বিএনপি, জামাত, জাতীয় পার্টি, মুসলিম লীগের দলীয় নীতি ও গঠনতন্ত্রই সংখ্যালঘুদের আওয়ামী লীগের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এসব দলের সার কথা হলো মুসলমানদের উন্নতির জন্যই সৃষ্টিকর্তা তাদের পাঠিয়েছে। তারা দেশে ইসলামী হুকুমত ও তাহজীব তমুদ্দুন প্রতিষ্ঠা করতে চায়, আন্তর্জাতিক পরিসরে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় উদগ্রিব। মুসলিম দেশগুলো তাদের বিন্দুমাত্র পাত্তা না দিলেও তাদের প্রেমে এরা দিওয়ানা। পদ্মা-মেঘমার পানির চেয়ে এদের কাছে ফোরাতের পানি অনেক বেশি মিষ্টি। বাংলার শস্য শ্যামল মাঠের চেয়ে এদের কাছে প্রিয় আরবের ধুধু মরুভূমি। বাংলাদেশে এই ঘরানার রাজনীতিকরা আওয়ামী লীগ, হিন্দু ও ভারতকে একই চোখে দেখে। রহস্যজনক কারণে এবারে তারা ভারতবিরোধী জিগির তুলছে না। একবার মওদুদ আহমদের ভিসা নাকচ হয়ে যাওয়ার পর বিএনটি এ পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে সমঝে চলার চেষ্টা করছে। আগে দলের নেতা নেত্রীরা ফেনী পর্যন্ত ভারত হয়ে যাওয়ার আতংকে থাকতেন। এখন পদুয়া রৌমারিতে হামলা হওয়ার পরও ভারতকে অভিযুক্ত করা হয় না। সব দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয় আওয়ামী লীগের নতজানু নীতির ওপর। অর্থাৎ ভারতকে পরোক্ষভাবে জানিয়ে দেয়া হয়, আমরা ক্ষমতায় এলে তোমাদের সঙ্গে সম্পর্কে কোন পরিবর্তন ঘটবে না। গঙ্গার পানি চুক্তি কিংবা পার্বত্য শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করেছি রাজনৈতিক কারণে। ক্ষমতায় এলে প্রতিবেশীর সঙ্গে 'সমমর্যাদার' ভিত্তিতেই তা সর্বতোভাবে মেনে নেব।

বিএনপির নেতা-কর্মী মাস্তান ক্যাডাররা হঠাৎ করে সংখ্যালঘুদের ওপর ক্ষেপে গেল কেন? নির্বাচনের তারিখ যত ঘনিয়ে আসছে সংখ্যালঘু পীড়নের মাত্রা বাড়ছে। এর কারণ বিএনপি

সংখ্যালঘুদের কোনভাবে বিশ্বাস করতে পারছে না। অথচ নির্বাচনের বছর খানেক আগে বিএনপি'র নেতাদের কথাবার্তায় মনে হয়েছিল সংখ্যালঘু বিশেষ করে ধর্মবিশ্বাসে যারা হিন্দু তাদের সম্পর্কে দলটির নীতি বদল হয়েছে। বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একাধিক সমাবেশে গিয়ে বলেছিলেন, আপনারা নৌকা ছেড়ে আসুন। আমাদের সঙ্গে আপনারা ভাল থাকবেন। শান্তিতে থাকবেন। আমরা সংখ্যালঘুদের সমান সুযোগ সুবিধা দেব। এমনকি ৪ দলীয় জোটের শরিকদের মতামতকে উপেক্ষা করে তারা লাঙ্গলবন্দের অষ্টমী ্নানের দিনে হরতালও প্রত্যাহার করেছিলো। নির্বাচন না আসতেই সংখ্যালঘুরা বিএনপির শান্তির নমুনা দেখেছেন। বিভিন্ন স্থানে বিএনপি জামাতচ কিভাবে তাদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন করছে। বিএনপি চেয়ারপারসনের তথ্য উপদেষ্টা রিয়াজউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, আওয়ামী লীগই সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার করেছে। তিনি সাংবাদিকদের কাছে কিছু পরিসংখ্যানও তুলে ধরেছেন। ভাবখানা এমন যে, আওয়ামী লীগ যেহেতু সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার করেছে এখন বিএনপির করাটাও অন্যায় নয়। আওয়ামী লীগ গত ৫ বছর বিএনপির ওপর অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েছে। এখন আওয়ামী লীগকে কিছু করতে না পারলেও সংখ্যালঘুদের শায়েস্তা করছে তারা। এ সম্পর্কে সহযোগী প্রথম আলো খবর দিচ্ছেঃ

সোনাগাজী, মতিগঞ্জ, সাতবাড়িয়া, গুণক, আড়কাইম, সমপুর, আনন্দপুর, লক্ষীপুর, বকুলতলা, চরশাভিখারি, চরচান্দিয়া, ফেনী সদর উপজেলার ধলিয়া, মাছিমপুর, দৌলতপুর, মজুপুর, দাগনভুঁইয়ার জয়লস্কর, পূর্বচন্দ্রপুর, লতিফপুর, প্রতাপপুর, নসরতপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে সোনাগাজীতে সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন গ্রামের নিয়ন্ত্রণ নেয়। সাবেক সরকারের আমলেও সংখ্যালঘুরা কমবেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছিলো। সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর থেকে তাড়িয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তারা বলেছে ১ অক্টোবরের আগে কেউ বাড়ি ফিরলে লাশ পড়বে।

পুলিশ সুপার হেলালউদ্দিনের উদ্ধৃতি দিয়ে পত্রিকাটি আরো জানায়, ফেনীতে সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ায় এসব হচ্ছে। আর সংখ্যালঘুরা দুর্বল বলে তাদের ওপর সবলরা সবসময় নির্যাতন চালায়। বিএনপির অনেকেই গত ৫ বছর ফেনীতে থাকতে পারেনি। ফলে তাদের মধ্যে চরম ঘৃণা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এসব কারণে এলাকায় সন্ত্রাস হতে পারে বলে পুলিশ সুপার ধারণা করছেন।

ফেনী ঘুরে এসে 'সংবাদ-এর নিজস্ব বার্তা পরিবেশক কৈলাস সরকার লিখেছেন ঃ জেলার সোনাগাজী, দাগনভুইয়া এবং ফেনী সদরের পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও চাপা ক্ষোভ লক্ষ্য করা গেছে। এই এলাকায় গত দুই মাসে শত শত কিশোরী, তরুণী ও গৃহবধূ ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকই বেশি। সন্ত্রাসীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা দাবি করছে, কেউবা বাড়ির মালিককে তাড়িয়ে দিয়ে অস্থায়ী ক্যাম্প বসিয়েছে। যেসব এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ভোটার বেশি সেসব এলাকায় অত্যাচারও বেশি হচ্ছে। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় এসব অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য পুলিশ বিভাগে জানালেও সংখ্যালঘুরা মুখ বুজে সব সহ্য করছে।

কি অদ্ভুত যুক্তি। পাঁচ বছর জয়নাল হাজারীর ক্যাডাররা বিএনপির লোকদের ওপর অত্যাচার নির্যাতন করেছে। বিএনপি সেই জয়নাল হাজারীর কেশাগ্র স্পর্শ করতে না পারলেও সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। নিরীহ সংখ্যালঘুদের মেরে হাতের সুখ মেটাচ্ছে। সন্ত্রাসীরা বলেছে, ১ অক্টোবরের আগে বাড়িঘরে আসা চলবে না। অর্থাৎ ঘটনাটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। অক্টোবরের নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর বিএনপি নেতারা বললেন, তোমাদের ভোট

ছাড়াই আমরা জয়ী হয়েছি, আমাদের জয়ের পেছনে তোমাদের কোন অবদান নেই। অতএব তোমাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব নেই। আর যদি বিএনপি জিততে না পারে তাহলে সংখ্যালঘুদের ওপর আরেক দফা অত্যাচার নির্যাতন হবে। যেমন হয়েছিল ১৯৯৬ সালে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বিএনপিকে প্রত্যাখ্যান করলেও তার দায়-দায়িত্ব সংখ্যালঘুদের ওপর পড়বে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের পথ কি? বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা এই রাজনৈতিক মস্ত ানদের কাছে ডবল জিম্মি হয়ে আছে। ভোট দিলেও বিপদ, না দিলেও বিপদ।

আমাদের মহামান্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান বলেছেন, যারা সংখ্যালঘু ও নারীদের ভোটদানে বাধা দেবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। তাদের গ্রেফতার করা হবে। বিচারপতি সাহেব ভেবেছেন কড়া ভাষায় একটা বক্তৃতা দিলেই সংখ্যালঘু ও নারী সম্প্রদায়ের ভোটাধিকার নিশ্চিত হয়ে যাবে। সন্ত্রাসীরা এরকম বক্তৃতা বিবৃতি থোড়াই কেয়ার করে। এই রাজনৈতিক মস্তান ও সন্ত্রাসীদের তিনি না চিনলেও তার আইজি, ডিআইজি, পুলিশ সুপার এসপিরা চেনেন। তারা কেন এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন না? কেন সংখ্যালঘু ও নারী নির্যাতনকারীদের ধরা হচ্ছে না? অপর এক ভাষণে বিচারপতি লতিফুর রহমান বলেছেন, রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা যদি একে অন্যের বিরুদ্ধে সহিংসতা চালায় তার দায়দায়িত্ব রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের নিতে হবে। রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা মাস্তান পোষে বলেই বিচারপতি লতিফুর রহমানকে তিন মাসের জন্য হায়ার করা হয়েছে। তিনি দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে এককভাবে অনেক বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, গোটা প্রশাসনকে তছনছ করে দিয়েছেন। তাহলে কোন রাজনৈতিক দলের কোন নেতা বা নেত্রী সন্ত্রাস করছে, কোন দল সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার, নির্যাতন চালাচ্ছে তা কেন তিনি চিহ্নিত করতে পারবেন না? শেষ বিচারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে যে কোন অঘটনের দায়-দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে। এ ব্যাপারে বিচারপতি লতিফুর রহমান কাগুজে হুংকার না দিয়ে যদি প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত করে তাদের নাম-ঠিকানা ও দলীয় পরিচয় দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতেন, তাহলে অনেক কাজ হতো। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যম একচক্ষু ঘোড়ার মতো। তিনি একদিকেই তাকান। বিচারপতি হিসেবে তাকে দুদিকেই তাকাতে হবে। ক্ষমতায় থাকাকালে আওয়ামী লীগ অনেক অনাচার করেছে। সে সব অনাচার বন্ধ করতে নতুন করে বিএনপির অনাচারকে উৎসাহিত করলে তা পক্ষপাতদুষ্ট হতে বাধ্য। এ রকম ঘটনা প্রশাসনে ঘটেছে ঘটছে। ফলে বিএনপি নেতা-কর্মীরা বেপরোয়া গয়ে গেছে। তাদের ভাবখানা এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো আছেই।

বিচারপতি লতিফুর রহমান জানিয়ে দিয়েছেন, রাজনৈতিক সংঘাত-সংঘর্ষের দায়িত্ব রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের নিতে হবে। আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা বিএনপি নেতা-কর্মীদের, কিংবা বিএনপি নেতা-কর্মীরা আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের খুন করলে তার দায়-দায়িত্ব বিচারপতি নেবেন না। তার এ অক্ষম যুক্তিও না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু আওয়ামী লীগ-বিএনপির হানাহানিতে যদি সাধারণ মানুষ আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়, তাদের ছেলেদের হত্যা ও মেয়েদের ধর্ষণ করা হয়, তার দায়-দায়িত্বও কি প্রশাসন নেবে না? অবশ্যই নিতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজ একটি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান। সম্প্রদায়বিশেষের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন সেই নির্বাচনকে কতটা নিশ্চিত করবে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সে কথা আরও একবার ভেবে দেখতে বলি। উট পাখির ন্যায় বালুতে মুখ লুকিয়ে থাকলে প্রলয় বন্ধ হবে না। প্রলয় বন্ধ করার সুকঠিন কাজটিই তাকে করতে হবে। অন্যথায় আরও একটি 'সাদেকালি' নির্বাচনের দায় তাকেই নিতে হবে। সেটি দেশ, জাতি কিংবা বিচারপতি লতিফুর রহমান কারও জন্যই ভাল হবে না।

সংবাদ, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০১

মরিয়া চিৎকার ও মিথ্যাচার

মুনতাসীর মামুন

দৈনিক জনকণ্ঠের হেডলাইন 'সংখ্যালঘুরা এখন গান পয়েন্টে' অনেককেই চমকে দিয়েছে। অনেকে মনে করতে পারেন এটি এক ধরনের স্টান্ট। আমিও হয়ত তাই বিশ্বাস করতাম যদি আমি ও আমার বন্ধুরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে না আসতাম। সংখ্যালঘুরা নির্বাচনের আগে সব সময়ই শঙ্কার মধ্যে কাটান; গয়েশ্বর রায়রা বিএনপি করা সত্ত্বেও। সবাই ধরেই নেয় তাঁরা আওয়ামী লীগের ভোটার, বিএনপি বা অন্য কোনো দলের নয়। তাই যে সব এলাকায় সংখ্যালঘুরা ফ্যাক্টর হতে পারেন সে সব এলাকায় সন্ত্রাস শুরু হয় এবং বিদ্যমান সরকার সাধারণত এসব বিষয়ে নীরবতা পালন করেন বা কিছু ঘোষণা দেন কিন্তু কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেন না। নেন, তাদেরও প্রমাণ করতে হবে তারা মুসলমান।

দেশজুড়ে যে অব্যাহত সন্ত্রাস চলছে তার দায়দায়িত্ব এখন আর মুয়িদ চৌধুরীরা নিতে চাচ্ছেন না। যদিও ক্ষমতা নিয়ে তাঁরা বলেছিলেন, সন্ত্রাস নির্মূল কোনো ব্যাপার নয়। এনজিও বা আদালত চালানোর মতো তাঁরা কিছু ফরমান জারি করে ভেবেছিলেন সব ঠাণ্ডা। কিন্তু দেশ তো আর এনজিও বা আদালত নয়। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এ রকম-সন্ত্রাস বাড়ছে, কিন্তু সরকার বা নির্বাচন কমিশন কোনো দায়দায়িত্ব নিচ্ছে না। এ রকমটি বাংলাদেশের মতো সব সম্ভবের দেশেই সম্ভব। সন্ত্রাস একতরফাভাবে বিএনপি-জামায়াত চালাচ্ছে এমন কথা বলব না। কিন্তু পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস চালাচ্ছে কারা? নির্বাচন যার অনুকূলে থাকবে সে সন্ত্রাস করে সব ভণ্ডুল করে দিতে চাইবে কেন? কেন্দ্র রক্ষাই তখন তার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। গত দু'সপ্তাহের খবরের কাগজ দেখুন। দেখবেন, উপর্যুপরি হামলা হচ্ছে আওয়ামী লীগের মিছিলে, ভাংচুর হচ্ছে তাদের নির্বাচনী ক্যাম্প, আরেকটি পরিসংখ্যান নিন। আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের ওপর হামলা বেশি হচ্ছে না বিএনপির প্রার্থীদের ওপর? বিএনপির জনসভায়ও তো অনেক লোক হচ্ছে। তাহলে সন্ত্রাসে বিএনপি এগিয়ে কেন? তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন সব তো তাদের পক্ষে, তাহলেও কেন অব্যাহত এসব কর্মকাণ্ড। তাহলে কি বিএনপি মনে করছে, জনসভায় যত ঢলই নামুক, ভোটের দিন মানুষ অন্য রকম সিদ্ধান্ত নেবে?

পত্র-পত্রিকায় যতই এ-ধরনের খবর আসছে বিএনপি নেতৃবৃন্দ ততই চিৎকার করে এমন সব মন্তব্য করছেন, যার সঙ্গে সত্যের কোনো সংযোগ নেই। কেন এত মরিয়া ভাব? গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বিএনপি এলে ক্ষতি কী? আওয়ামী লীগই জিতবে এমন কথা তো পত্রিকায় আসে নি। তাতেই মনে হচ্ছে, কোথাও একটা ঝামেলা হচ্ছে। হয়ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারও তা বুঝতে পারছে। পত্র-পত্রিকা জুড়ে যখন বিএনপি বলছে, "সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সহানুভূতি আদায়ের জন্য আওয়ামী লীগ এসব হামলা করে কৌশলে বিএনপির ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে"। (জনকণ্ঠ, ২৩.৯)। সংখ্যালঘুরা যদি আওয়ামী লীগেরই ভোটার হয় তা হলে আ. লীগ তাদের ভয়ভীতি দেখাবে কেন? তারা তো উৎসাহিত করবে ভোটারদের ভোট দেয়ার জন্য। বিএনপির মুখপত্র বলছেন, "দেশের সংখ্যালঘুদের ওপর বিএনপি কোনো চাপ সৃষ্টি করছে না, এমনকি সংখ্যালঘুদের ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার ব্যাপারে।"(ভোরের কাগজ, ২৬.৯)।

আমি আমার নির্বাচন কেন্দ্র কচুয়া (চাঁদপুর-১) থেকে মাত্র ফিরেছি। সংখ্যালঘুদের গ্রামগুলোতে অনবরত রাতের বেলায় হামলা হচ্ছে। ২৫ তারিখেও দোয়াটি গ্রামের দশজনের মাথা ফাটিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা কচুয়া বাজারেও যেতে পারছে না। পরশু বিএনপির প্রার্থী

কয়েকজনকে নিয়ে বাউছড়া গ্রামে এসেছিলেন। তার সঙ্গীরা রাস্তা থেকে চিৎকার করে বলেছে, "৩০ তারিখ পর্যন্ত খেয়ে নে। ১ তারিখ থেকে আর খেতে হবে না।" থানা প্রশাসন এসব ব্যাপারে দার্শনিকের মতো আচরণ করে। কর্মকর্তাদের সিলেকশন মুয়িদ চৌধুরী ভালোভাবেই করেছেন! এজন্য বিএনপি-তালেবান জোট তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। সেনাবাহিনী গ্রামগুলোতে টহল দেয়। সংখ্যালঘুদের কোনো গ্রামে গিয়ে তারা বলেনি, ১ তারিখ আমরা থাকব, আপনারা যে পথে ভোট দিতে আসবেন সে পথেও থাকব, আপনারা নির্ভয়ে ভোট দিন। কোনো সহিংসতাও তারা রোধ করতে পারেনি। সবকিছুর সঙ্গে লড়া যায় কিন্তু অনবরত মিথ্যার সঙ্গে লড়াই করা যায় না।

বাংলাদেশের সব সংখ্যালঘুকে বলব, আপনারা নির্ভয়ে একজোট হোন। এ দেশে থাকতে হলে নির্ভয়ে আপনাদের একজোট হতে হবে। ভোট পর্যন্ত রাত জেগে গ্রাম পাহারা দিন। সন্ত্রাসী আ□মণ হলে তা প্রতিরোধ করুন। প্রশাসনের কাছে সুবিচার আশা করবেন না। নিজেদের রক্ষা করতে না পারলে এ দেশে মাথা উঁচু করে থাকতে পারবেন না। ঢাকেশ্বরী মন্দিরে গিয়ে বেগম জিয়া আপনাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন। এখন দেখুন, তাঁদের আশ্বাস কী রকম! আপনারা ভোট নির্ভয়ে দিতে শিখুন। তবে পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, ঐক্যজোট ক্ষমতায় এলে সব ধরনের সংখ্যালঘুকে বাংলাদেশে দাসত্বের জীবন বেছে নিতে হবে। দাসের জীবন ভালো, না মুক্ত মানুষের?

পত্রপত্রিকার এসব খবরকে অবশ্য বিএনপি নেতৃবৃন্দ বলেছেন, "উদ্দেশ্যমূলক"। (সংবাদ ২৬,৯)। এ বিষয়ে এর পরে আর কিছু বলার থাকে না। কক্সবাজারে বিএনপি ও যুবদল প্রকাশ্য সভায় প্রশাসনকে জানিয়েছে, ১ অক্টোবর নির্বাচনী পরিচালনা কার্য□ম থেকে পুরোপুরি বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়েছে।" (ঐ)। এ খবরটিও কি উদ্দেশ্যমূলক? ভাগ্যিস বিএনপি বলছে না, ভারত থেকে হিন্দুরা এসে জোট দেয়ার জন্য তৈরি এবং আশ্চর্য, ভারতের বিরুদ্ধে বিএনপি এবারে নির্বাচনে কিছুই বলেনি। জানি না, ভারতের সঙ্গে তাদের কোনো যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে কীনা? তবে, নিশ্চিত থাকুন বিএনপি ক্ষমতায় না এলে এ কথা বার বার বলবে।

বিএনপি বা ঐক্যজোট কতটা মরিয়া হয়ে উঠছে তার প্রমাণ বেগম জিয়ার ঘোষণা, "আওয়ামী লীগ নির্বাচন বানচালের জন্য পূর্ব পরিকল্পিতভাবে বাগেরহাটে বোমা হামলা চালিয়েছে।" (আজকের কাগজ, ২৬.৯)। রমনা, উদীচীর বোমা বিস্ফোরণেও বেগম জিয়া এমনটি বলেছেন। পরে দেখা গেছে এর সঙ্গে তার দলের কোনো কোনো নেতা বা লাদেনপন্থীদের যোগসূত্র আছে। বিশ্বজুড়ে এখন লাদেনবিরোধী মনোভাব প্রবল হচ্ছে, বিএনপির পার্টনার এখন লাদেন জুনিয়ররা। সে কারণেই কি বেগম জিয়া এগুলো বলছেন? শেখ হেলাল নির্বাচনের আগে নিজেই নিজেকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন-এটি বিশ্বাসযোগ্য? এ কথা ঘোড়ায় শুনলেও হাসবে। তবে এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন, বিএনপি ও লাদেন জুনিয়ররা ক্ষমতায় এলে বিরোধীদের সব সভায়ই বোমা ফাটবে।

কুমিল-ায় বেগম জিয়া ঘোষণা করেছেন, "আ. লীগের হারামের টাকা নেবেন না। তারা কোনো ধর্মে বিশ্বাস করে না।" (ভো. কা. ২৬.৯)। এ কথা বলে বেগম জিয়া বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের মনে দুঃখ দিলেন এবং কাকে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে তিনি এ কথা বললেন? বহুবার দল বদলকারী, একাধিক মামলার আসামী কায়কোবাদকে। বাংলাদেশের মানুষের একটা বড় অংশ আওয়ামী লীগের সমর্থক। তাদের বিধর্মী বলাটা নির্বাচন নীতিরও বরখেলাপ নয়? অবশ্য আবু সাঈদ বাংলা বোঝেন কীনা আমার সন্দেহ। আর বুঝলেও কিছু করার নেই। তিনি ঐক্যজোটের কাছে জিম্মি।

এসব কথা বাতকে বাত বলে উড়িয়ে দেবার কোনো কারণ নেই। ঐক্যজোট তো বটে,

বিএনপির নেতাকর্মীরাও এসব গভীরভাবে বিশ্বাস করে। আমি জানি না, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ এসব বিশ্বাস করেন কি না। ১ তারিখ তা বোঝা যাবে। এসব মরিয়া চিৎকার ও মিথ্যাচারে যদি মানুষ বিভ্রান্ত হন তাহলে তা হবে দেশের জন্য চরম ট্রাজেডি। মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে এসব বিশ্বাস করতে পারেন, বিএনপিকে ভোটও দিতে পারেন, বিএনপিকে ক্ষমতায়ও আনতে পারেন। তা আমরা মেনে নেব। কিন্তু একটি কথা বলে রাখা ভালো, আধুনিক বিশ্ব এসব পছন্দ করে না। এ নেতৃবৃন্দ ক্ষমতায় এলে হয়ত বাংলাদেশের পরিণতি হবে আফগানিস্তানের মতো। যে যুবকরা উন্মুখ বিদেশ যাওয়ার জন্য, তাদের জন্য পৃথিবীর সব দেশের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

বাংলাদেশ কীভাবে একটি এ্যাবসার্ড দেশে পরিণত হচ্ছে সব শেষে তার একটা উদাহরণ দিই। '৭১-এর আলবদর প্রধান নিজামী ঘোষণা করেছেন, "আবু সাঈয়িদের চেয়ে অনেক বেশি মুক্তিযোদ্ধা আমার কাছে আছে।" (আজকের কাগজ, ২৬.৯)।

এরপর আর কী বলার থাকতে পারে?

জনকণ্ঠ, ২৭.৯.২০০১

এ আঘাত আমাদের জাতিসত্তার ওপর

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

নির্বাচন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিরীহ ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা শুরু হয়েছে। বাস্তুঘরে আগুন লাগিয়ে, লুটপাট করে, শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে, ঘরছাড়া করে যাদের চরম অসহায়ত্বের মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছে ও হচ্ছে, তারা আজ এ মুহূর্তে আমাদের সামনে একটিই বড় প্রশ্ন তুলে ধরেছেঃ আমাদের কি অপরাধ ছিলো যার জন্য এই শাস্তিকে আমাদের? আমরা বাংলাদেশের নাগরিক, অন্য ১০ জনের মতো আমাদের নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করেছি বা করতে চেয়েছি। এই নির্বাচন কি আমাদের সেই পরিচয় মিথ্যে করে দিলো? আমার সম্প্রদায়গত পরিচয়কেই বড় করে দিলো?

অতীতেও আমরা বিশেষ বিশেষ সময়ে সাম্প্রদায়িক হিংস্রতার ভয়াবহ প্রকাশ দেখেছি। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর যা ঘটেছিলো তা ভুলে যাইনি। সে সহিংসতার পেছনে স্বৈরাচারী শাসকের স্বার্থবুদ্ধিজাত কূটচিন্তা স□িয় ছিলো, কিন্তু এবার?

নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে ব্যাপক আয়োজন করেছিলেন, সে আয়োজন নির্বাচনের পরও এ মাসের ৫ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকার কথা। কেন থাকেনি? কেন অনুমাণ করা হয়নি যে দেশে সংখ্যালঘুদের ভোটকেন্দ্রে না আসার জন্য ভয়-ভীতি-বল প্রয়োগের নজির অব্যাহত আছে, যে দেশে নির্বাচনপরবর্তী দিনগুলোতে এদের ওপর হামলা হতে পারে এবং সে জন্য প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে হবে। এই সতর্কতা কোথায় ছিলো? কর্তব্য পালনে যারা ব্যর্থ হলো, তারা, প্রশাসনের সেই অংশকে আমি অভিযুক্ত করছি, তাদের উপযুক্ত শাস্তি চাই।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব শেষ হয়েছে, কিন্তু তাই বলে নির্বাচন-উত্তর এই সহিংসতার জন্য তাদের দায়িত্ব রইলো না, এ হতে পারে না। নতুন সরকারপ্রধান কি করেন, তার সরকার এই কলঙ্কজনক ঘটনাবলির উৎস সন্ধানের ও উৎপীড়িতের ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, আমরা তা দেখার জন্য অপেক্ষা করছি।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি বিগত সরকারের ও সরকারপ্রধানের দায়িত্ব কি তারা ভুলে গিয়েছেন? গান্ধীজি নোয়াখালীতে চলে এসেছিলেন উৎপীড়িতের সেবায়, সান্ত্বনা দিতে। একই কর্তব্য পালন কি জরুরি নয় শেখ হাসিনা ও তার দলের জন্য? রাজপথের আন্দোলন কি বেশি গুরুত্ব পায় আর্তের ও উৎপীড়িতের পক্ষে দাঁড়ানোর চেয়ে?

নাগরিক সমাজকে শুধু সভা-সমিতি, বিবৃতি দান করে দায়িত্ব শেষ করা চলবে না, দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে হবে। সকল রাজনৈতিক দলের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে, যেন যে আঘাত ব্যক্তিবিশেষ নয়, সম্প্রদায়বিশেষ নয়-হানা হয়েছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সত্তার ওপর, সে আঘাতের গুরুত্ব তারা উপলব্ধি করেন। এই সহিংসতার শিকার শুধু অসহায় নিরপরাধ একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় নয়-এর শিকার বাংলাদেশ, যে বাংলাদেশ আমাদের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সৃষ্টি। এ আঘাত আমাদের সকলের ওপর। বিপন্ন শুধু একটি সম্প্রদায় নয়- বিপন্ন আমাদের জাতীয় মর্যাদা, আমাদের জাতিসত্তা। এই অনুভূতি এই সঙ্কটে আমাদের এক করুক।

সংবাদ, ১২ অক্টোবর ২০০১

আর কতদিন সইতে হবে মানবতার এই চরম লাঞ্ছনা

শাহরিয়ার কবির

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দশ দিন পর শপথ গ্রহণ করেছে খালেদা জিয়ার জোট সরকার। শপথ গ্রহণের চার দিন অতি□ান্ত হওয়ার পরও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা ও নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। প্রতিদিন দৈনিক পত্রিকাগুলোতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কীভাবে হিন্দুরা আ□ান্ত হচ্ছে তার সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়ার মৌলবাদী তালেবানি জোটকে জয়ী করানোর জন্য যে নীলনকশা প্রণীত হয়েছিল সারা দেশে সুপরিকল্পিতভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর এই হামলা তারই অন্তর্গত।

প্রকৃতপক্ষে মধ্য জুলাই থেকেই হামলা শুরু হয়েছে, যখন থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তারা হয়তো বলবেন অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের স্বার্থে এসব হামলা জরুরি ছিল। ফেনীর হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন, ১৪ জুলাই রাতে পরশুরাম উপজেলার অনন্তপুর গ্রামে অমৃতনাথ, শিবুনাথ, বিমলনাথ ও সুধীরনাথের বাড়িতে প্রথম হামলা হয়। পশ্চিম অলকার নিকুঞ্জ পালের বাড়িতে হামলা হয় ১৭ জুলাই, ১৮ জুলাই হামলা হয় শালধর গ্রামের শীল বাড়িতে এবং ২১ জুলাই হামলা হয় শুকদেব সূত্রধরের বাড়িতে। সবগুলো বাড়িতে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা গিয়ে বিপুল অঙ্কের চাঁদা দাবি করেছে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় বাড়ির লোকদের মারধর করে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকারসহ যাবতীয় মূল্যবান সামগ্রী লুট করে নিয়ে গেছে। এরপর থেকে শুধু ফেনীতে নয়— নির্বাচনের আগে, নির্বাচনের দিন এবং নির্বাচনের পরে সারা দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর ব্যাপক হামলা, নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, গৃহে অগ্নিসংযোগসহ যাবতীয় ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে। আ□ান্তরা সাংবাদিকদের বলেছেন এই সব নির্যাতন তাদের ফিরিয়ে নিয়ে গেছে একাত্তরে। অনেকে বলেছেন একাত্তরের চেয়েও ভয়াবহ ছিল এই নির্যাতন।

সাম্প্রদায়িক নির্যাতন কত ধরনের হতে পারে তার কিছু উদাহরণ দেয়া যায় দৈনিক পত্রিকা থেকে। নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়ে বরিশালের বিভিন্ন এলাকা থেকে যে বিশ হাজার হিন্দু প্রাণভয়ে গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায় আশ্রয় নিয়েছিল জেলা প্রশাসন তাদের প্রতি

অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। 'স্থানীয় প্রশাসন এই আগমনের জন্য উষ্মা প্রকাশ করলে আশ্রয় গ্রহণকারীরা রামশীল এলাকা ছাড়তে শুরু করে। এরপর গতকাল কোটালিপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রামশীলে মাইকযোগে প্রচার করেছেন, সমস্ত আশ্রয় গ্রহণকারীদের সকাল ১০টায় পয়সারহাট বাজারে হাজির হতে। তারা ওইসব নির্যাতিত পরিবারগুলোকে বরিশাল জেলা প্রশাসনের হাতে হস্তান্তর এবং তাদের নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবে। সাথে এ কথাও বলেছেন যে, যারা হাজির না হবে তাদের গ্রেফতার করা হবে। ... সর্বস্ব খুইয়ে আসা এসব পরিবার প্রশাসনের ঘোষণা শোনার পরে আরো আশঙ্কায় ভুগছে। (আজকের কাগজ, ১২ অক্টোবর ২০০১)

'ভোরের কাগজ'-এ প্রকাশিত হয়েছে নির্যাতনের নতুন মাত্রার সংবাদ। সন্দ্বীপ থেকে ফিরে এই পত্রিকার প্রতিনিধি সাইদ ইসলাম মুছাপুর এলাকার এক প্রবীণের অভিযোগ সম্পর্কে লিখেছেন, 'কয়েকজন সংখ্যালঘুর কাছ থেকে সন্ত্রাসীরা বণ্ড নিয়ে তাদের এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এসব বণ্ডে তারা আর এলাকায় আসবে না বলে অঙ্গীকার আদায় করা হয়েছে। শুধু এলাকা ত্যাগেই তাদের বাধ্য করা হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাড়িঘরও সন্ত্রাসীরা লুট করেছে। (ভোরের কাগজ, ১৩ অক্টোবর ২০০১)

একই দিনের 'ভোরের কাগজ'-এর ফরিদপুর প্রতিনিধি জানিয়েছেন, 'আমাদের উপর কোনো হামলা বা নির্যাতন করা হচ্ছে না' — এই মর্মে এক বিস্ময়কর মুচলেকা প্রদান করতে হয়েছে বোয়ালমারি উপজেলার উত্তর হাসামদিয়া গ্রামের নির্যাতিত সংখ্যালঘু পরিবার প্রধানদের। মন্দিরে অগ্নিসংযোগ, দৈহিক লাঞ্ছনাসহ বিভিন্ন হিন্দু বাড়িতে হামলার ঘটনার পরও প্রভাবশালীদের চাপে গত বৃহস্পতিবার এই মুচলেকা দিতে বাধ্য হয়েছে গ্রামের ১৪টি হিন্দু পরিবারের প্রধানরা। এই মর্মে তারা পুলিশ সুপার বরাবর আবেদনপত্রে স্বাক্ষরও করেছেন।' সম্ভবত এই সব মুচলেকা সংগ্রহ করে নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন বলেছেন, 'সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার বিষয় একটি বিশেষ দল ও বিশেষ সম্প্রদায় গুজব আকারে অতিরঞ্জিত করে বাজারে ছড়াচ্ছে।' (ভোরের কাগজ, ১৩ অক্টোবর ২০০১) নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানেন না বহু ক্ষেত্রে আ□ান্তরা খবরের কাগজের প্রতিনিধি কিংবা পুলিশ প্রশাসনকে কিছু বলতে চায় না পরবর্তী হামলার আশঙ্কায়।

বাগেরহাট থেকে ফিরে 'দৈনিক জনকণ্ঠে'র ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি লিখেছেন— 'নরপশুদের পৈচাশিক আ□াশে বাগেরহাটের পুণ্যভূমি অপবিত্র হয়ে উঠেছে। বিএনপি-জামাতী লালসার কারণে বাগেরহাটের সংখ্যালঘু গ্রামগুলোতে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংখ্যালঘু গ্রামগুলোতে কোথাও মুখ বেঁধে এসে আবার কোথায় নিজেদের না লুকিয়ে এসে হিন্দু মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে। অভিযোগ—রামপালের গাওলা গ্রামে মেয়েদের গণহারে ধর্ষণ করা হয়েছে। আবার বারইপাড়া গ্রামে গর্ভবতী এক গৃহবধূকে ২০/২২ জন মিলে ধর্ষণ করেছে। আবার অনেক গ্রামে মা-মেয়েকে একসঙ্গে ধর্ষণের ঘটনাও ঘটেছে। নির্বাচনের পর থেকে এ পর্যন্ত এমন কোন গ্রাম নেই যেখানে হিন্দু মহিলাদের ধর্ষণের ঘটনা ঘটেনি। সন্ত্রাসীরা শুধু ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, সংখ্যালঘুদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিচ্ছে— 'এবার যে কয়টা সুন্দরী মেয়ে পাব তুলে নিয়ে যাব।' নরপশুদের এই ধর্ষণের ভয়ে হিন্দু যুবতী মেয়েরা এখন সম্ভ্রম হাতে নিয়ে শহর থেকে শহরে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বাগেরহাট জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংখ্যালঘু গ্রামগুলোর ভিতরের অবস্থা যে কত ভয়াবহ তা বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। বাইরে থেকে বলা হচ্ছে কোন সমস্যা নেই। পরিস্থিতি স্বাভাবিক। কিন্তু গ্রামগুলোর ভিতরে গিয়ে কেবল তাদের আস্থা অর্জন করতে পারলেই বেরিয়ে আসছে নির্যাতনের নানান লোমহর্ষক কাহিনী। ধর্ষিতা মেয়েদের বুকফাটা আর্তচিৎকারে এখন

বাগেরহাটের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামগুলোর আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে আসছে। কোন কোন গ্রামে নরপশুদের এই নির্যাতনের মাত্রা একাত্তরের নারকীয়তাকেও হার মানিয়েছে। অথচ এসব ধর্ষণের কোন অভিযোগ থানা-পুলিশ কিংবা স্থানীয় প্রশাসনের কাছে যাচ্ছে না। মুখ বুজে এই নির্যাতন সহ্য করে গ্রামের সহজ-সরল হিন্দু মেয়েরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কোন গ্রামেই কোন হিন্দু যুবতী মেয়ে ঘরে নেই। উদ্বিগ্ন পিতামাতারা তাদের আশপাশের শহরে কিংবা নিরাপদ এলাকায় পাঠিয়ে দিয়েছে। ফলে গ্রামাঞ্চলে হিন্দু মেয়েদের স্কুল কলেজে যাওয়া পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে।' (জনকণ্ঠ, ১৩ অক্টোবর ২০০১)

এবারের নির্বাচনে যে নীলনকশা রচনা করা হয়েছিল বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটকে ক্ষমতায় আনার জন্য সেটি ছিল বহুমাত্রিক। প্রশাসনের সর্বস্তরে নজিরবিহীন রদবদল ছিল এর একটি দিক। নির্বাচনী কার্য পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণের জন্য বিএনপি সমর্থক এনজিও এবং ব্যাপকহারে মাদ্রাসা শিক্ষক ও জামাত পরিচালিত ইসলামী ব্যাংকের কর্মচারীদের নিয়োগ করা ছিল আরেক দিক। আরও মাত্রা রয়েছে এই নীলনকশার, তবে সবচেয়ে মর্মান্তিক, অমানবিক ও বর্বরোচিত দিক ছিল সাম্প্রদায়িক নির্যাতন। যেহেতু এটা ধরে নেয়া হয় হিন্দুরা নৌকায় ভোট দেয়, যেহেতু ভোটার তালিকা অনুযায়ী এবার সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৮২ লক্ষ— এদের যদি ভোটকেন্দ্রে যাওয়া থেকে বিরত রাখা যায় তাহলে বহু আসনে আওয়ামী লীগের পরাজয় ঘটানো যাবে। এই বিবেচনা থেকেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতন। প্রথম দিকে হিন্দুদের ভয় দেখিয়ে ঘর-বাড়ি-গ্রামছাড়া করা হয়েছে। তারপর নির্বাচনের দিন যখন ঘনিয়ে এসেছে তখন শাসানো হয়েছে তারা যেন ভোটকেন্দ্রে না যায়।

এতসব হুমকি ও নির্যাতন সত্ত্বেও, হিন্দুরা সংখ্যায় নগণ্য হলেও এবার ভোটকেন্দ্রে গিয়েছে। রাজধানী ও বড় শহরগুলোতে আগের রাতে তাদের ভয়ভীতি দেখিয়ে ভোটকেন্দ্রে যেতে বারণও করা হয়নি। তবে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে অনেকে দেখেছে ভোটার তালিকায় নাম নেই, কিংবা ভোট হয়ে গেছে কিংবা বুথ জ্যাম করে তাদের ভোট দিতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বিদেশী পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের ক্যামেরার মুখোমুখি হওয়ার জন্য অনেক হিন্দু ভোটারকে বেলা দুটো পর্যন্ত ভোটকেন্দ্রে রেখে দেয়া হয়েছে।

নির্যাতিত, লাঞ্ছিত হিন্দু সম্প্রদায় ভেবেছিল নির্বাচনের পর হয়তো এ ধরনের হামলা ও অত্যাচার বন্ধ হবে। কিন্তু তা হয়নি, বরং বহু ক্ষেত্রে নির্বাচনের আগে যা ছিল পরে তা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অসহায় ভীত সন্ত্রস্ত হিন্দুরা এক জনপদ থেকে পালিয়ে আরেক জনপদে আশ্রয় নিয়েছে, সেখানে পুলিশের ধাওয়া খেয়ে আবার হয়তো গ্রামে ফিরে গেছে কিংবা দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যাচ্ছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে যেহেতু কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না— সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতন সম্পর্কে তারা তেমন কোনও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তাদের যদি সদিচ্ছা থাকতো প্রথম যারা হামলা করেছিল তাদের গ্রেফতার করলে দ্বিতীয়বার হামলার সাহস দুষ্কৃতকারীদের হতো না। সাম্প্রদায়িক হামলা সম্পর্কে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্লিপ্ত আচরণ হামলাকারীদের প্রশ্রয় দিয়েছে, আরও সাহসী ও বেপরোয়া করেছে।

সাম্প্রদায়িক হামলা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে যেমন হয়েছে, খালেদা জিয়ার চারদলীয় জোট সরকারের আমলে আরও বেশি হচ্ছে। অতীতে আমরা দেখেছি বিরানব্বই সালের ৬ ডিসেম্বর ভারতে হিন্দু মৌলবাদী দুষ্কৃতকারীরা যখন অযোধ্যার বাবরী মসজিদ ভেঙেছিল তখনও বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায় ব্যাপক হামলা, নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়েছিল। বেগম খালেদা জিয়ার চারদলীয় জোটের অন্যতম শরিক ইসলামী ঐক্যজোটের

চেয়ারম্যান শায়খুল হাদিস মওলানা আজিজুল হক তখন সাম্প্রদায়িক আগুন উস্কে দিয়েছিলেন এই বলে— 'ইসলাম নামক বৃক্ষটির গোড়ায় পানি নয় রক্ত ঢালতে হবে।' তাঁর এই উক্তি হামলাকারীদের জেহাদী জজবায় উদ্দীপ্ত করেছিল। এক বাবরী মসজিদ ভাঙার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তখন বাংলাদেশে হিন্দুদের কয়েক হাজার মন্দির ভাঙা হয়েছিল। হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনও চলেছিল সমান উদ্দীপনায়। তখন খালেদা জিয়া ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে হিন্দুদের উপর ভয়াবহ নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে ভাঙা মন্দির পুনর্নির্মাণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দানের দাবি জানিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বিরোধী দলের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশে চমৎকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রয়েছে।'

বিরানব্বইয়ের সাম্প্রদায়িক হামলার তদন্ত করতে গিয়ে শুনেছি বহু জায়গায় ভুক্তভোগীরা বলেছেন সেবার হামলার কোন দলীয় চরিত্র ছিল না। বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামাত, জাতীয় পার্টি প্রভৃতি দলমত নির্বিশেষে যার যেখানে সুবিধা হামলা করেছে। সেবার সন্ত্রাসীরা বিশেষ কোনও দলের ছিল না। নির্যাতনের চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক এবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এবং এখনও যে হামলা হচ্ছে সর্বত্র আ□ান্তরা বিএনপি ও জামাত-শিবিরের কথা বলছে। এ ধরনের হামলা ছিয়ানব্বইয়ের নির্বাচনের সময়ও হয়েছিল। সেবারও প্রায় সাত লক্ষ হিন্দু ভোটার ভোট দিতে পারেনি, এবার যা দশগুণ বেড়েছে। সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক মাত্রা।

বিরানব্বইয়ে সাম্প্রদায়িক হামলার সময় আওয়ামী লীগ ও বাম দলগুলো একজোট হয়ে 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কমিটি' গঠন করে উপদ্রুত এলাকায় বিপন্ন মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সাধ্যমতো সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে। এবার ঢাকায় বসে উদ্বেগ, অভিযোগ, ক্ষোভ ও নিন্দা জ্ঞাপন করা ছাড়া রাজনৈতিক দলগুলো তেমন কিছুই করেনি। আজ পত্রিকায় দেখলাম ছাত্র ইউনিয়নের কিছু সদস্য এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্ররা অনন্যোপায় হয়ে শহীদ মিনারে অনশন করছেন।

বিএনপি-জামাতের জোট ক্ষমতায় আছে বলে হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতারা তাদের কাছে প্রতিকার দাবি করেছেন, যদিও তারা ভাল করেই জানেন হামলা কারা কী উদ্দেশ্যে করছে। আওয়ামী লীগ ও বাম দলগুলোর কাছে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আবেদন করতে হবে কেন? হিন্দুরা শুধু আওয়ামী লীগকে নয়, বামদেরও ভোট দেয়। প্রার্থী পছন্দের হলে বিএনপিকেও দেয়। কিন্তু বিএনপি দলগতভাবে কখনও হিন্দুদের জন্য কিছু করেনি বরং সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা খারিজ করে, পরবর্তীকালে এরশাদের 'রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম' মেনে নিয়ে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে বুঝিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশে তারা যে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। বিরানব্বইয়ের সাম্প্রদায়িক হামলার সময়ও হিন্দু সম্প্রদায় বুঝেছিল তাদের প্রতি বিএনপির মনোভাব কী। দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে যে আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়ার অভিযোগে হিন্দুদের উপর এই নির্যাতন সেই দলেরও শীর্ষ নেতা বা নেত্রী আজ পর্যন্ত কোনও উপদ্রুত এলাকা সফর করেননি। এই পরিস্থিতি শুধু সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য নয়, বাঙালিত্বের চেতনায় বিশ্বাসী সমগ্র দেশবাসীর জন্য হতাশাজনক।

একটি বিষয় আওয়ামী লীগ, বাম দল, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির মুসলমানদের মনে রাখতে হবে— বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিচারে সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছে হিন্দুরা। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আ□মণের লক্ষ্য যদিও ছিল স্বাধীনতাকামী সকল বাঙালি, তারপরও অনেক মুসলমান কলেমা পড়ে তাদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে কিন্তু হিন্দুরা পায়নি। সর্বস্ব হারিয়ে প্রাণভয়ে যে এক কোটি শরণার্থী দেশত্যাগ

করে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল তার ভেতর বাহাত্তর লক্ষ ছিল হিন্দু, যা তৎকালীন হিন্দু জনসংখ্যার নব্বই ভাগেরও বেশি। ভারতের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণকারীরা কী অবর্ণনীয় দুঃসময় যাপন করেছে একমাত্র ভুক্তভোগীরাই তা জানে। যে বাংলাদেশের জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের এত ত্যাগ সেই বাংলাদেশ আজও তাদের বাসযোগ্য হয়নি। প্রতিনিয়ত তাদের দেশপ্রেমের পরীক্ষা দিতে হয়, আজও তাদের একাত্তরের মতো 'গণিমতের মাল' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আমরা কোন বাংলাদেশে বাস করছি? এই বাংলাদেশের জন্যই কি তিরিশ লক্ষ বাঙালি জীবন দিয়েছিলেন, আড়াই লক্ষেরও বেশি নারী চরম নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন?

বিএনপি-জামাত জোটের সমর্থক ঈমানদার মুসলমানরা কি একবারও ভাবেন না বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ভারতের মুসলমানদের কতটা উদ্বিগ্ন করে? মানবতা আর বাঙালিত্বের চেতনা তারা জাহান্নামে পাঠাবেন বলে ঠিক করেছেন, কিন্তু তারা কি প্রতিবেশী দেশের মুসলমানদের নিরাপত্তার কথাও বিবেচনা করবেন না? নীলনকশার বিশাল বিজয় তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে যদি না সাম্প্রদায়িক হামলাকারীদের এখনই কঠোর হস্তে দমন না করা হয়। উটপাখির মতো বালিতে মাথা গুঁজে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা অস্বীকার করে কিংবা অন্যের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে জামাত-বিএনপির জোট সরকার পরিত্রাণ পাবে না।

জনকণ্ঠ, ১৩.১০.২০০১

আকাশ প্রমাণ তরঙ্গ তুলে গর্জে উঠুক মানুষ

হাসান আজিজুল হক

কি দেখছি আমাদের চারদিকে, কি হচ্ছে আজ বাংলাদেশে? আগুনের হলকার মতো খবর আসছে সারা বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর উলঙ্গ আ□মণ শুরু হয়েছে। তাদের রক্তে মাটি ভিজছে, তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, তাদের ঘরের সম্পদ লুট হচ্ছে। তাদের নারী-শিশু-বৃদ্ধদের পঙ্গু করে ফেলা হচ্ছে, তাদের চোখের সামনে বেঁধে রেখে বা খুলে প্রকাশ্যে তাদের মা-মেয়ে-বধূদের ধর্ষণ করা হচ্ছে। ধর্ষণের পর হত্যা করা হচ্ছে, সর্বস্বান্ত করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে ঘরে আগুন দেয়া হচ্ছে। সেই আগুন ঘর থেকে ঘরে, পাড়া থেকে পাড়ায়, তারপর সারা গ্রাম, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। পুড়ছে ঘরবাড়ি, পুড়ছে সহায়-সম্বল, পুড়ছে মানবতা, পুড়ে ছাঁই হয়ে যাচ্ছে সমস্ত সভ্যতাজুড়ে মানুষ যা কিছু সম্পদ অর্জন করেছে তার সবই। হায়, একবিংশ শতাব্দী ধু-ধু করে জ্বলছে গোটা দুনিয়া আর বাংলাদেশ শত শত শতাব্দী পিছিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়েছে এক আদি আরণ্যক রাষ্ট্রে। হিংসা, উদরপূর্তি, আগ্রাসন, দখল-এই হয়েছে এদেশের মূলমন্ত্র।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন এদেশে নতুন নয়। নিষ্ঠুর নির্যাতন, অপরিসীম, বঞ্চনা, দুঃসহ অপমাণ বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের বহুদিনের সঙ্গী। বেশি পেছনে ফিরে না গিয়ে পাকিস্তানি আমল থেকেই দেখি শোষণ ও অপমানের বীজ রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতরেই লালন করা হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের মর্মে মর্মে মনে আছে পঞ্চাশের দশকের 'এনিমি প্রপার্টি', ইভাকুইজ প্রপার্টি আইনের কথা। পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্ম নিতে না নিতে দেশের মানুষদের মধ্যে বিভাজন নীতি চালু করে দেয়া হলো। সরকার দুরস্থান-

বিভাজন ঢুকে গেলো রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে। হাড়ে-বিষ হচ্ছে মৌল গরল, তা শোধরানো কঠিন। শুরুতেই পাকিস্তানি রাষ্ট্রে ঢুকেছিল সেই হাড়বজ্জাতি। শত্রু আছে দেশের আর সেই শত্রুর আছে সম্পত্তি, দেশত্যাগ করেছে যারা তাদেরও আছে সম্পত্তি-ফাঁকা রেখে যাওয়া দলের 'ফাঁকা সম্পত্তি'। কে পাবে এ সম্পত্তি-নিশ্চয়ই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়, যাদের আছে গায়ের জোর, লাঠির জোর, জোর-জবরদস্তির ভিত যখন রাষ্ট্রই পাক করে রেখেছে, তখন সবলই পাবে সেই সম্পত্তি। আশ্রয় তো রাষ্ট্রের, রাষ্ট্র তো সাধারণ মানুষের নয়, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির মালিকরাই রাষ্ট্রের মালিক। পঞ্চাশ-ষাট দুটি দশকজুড়ে বাংলাদেশের বিশাল গ্রাম এলাকাজুড়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কত পরিবার যে সর্বস্বান্ত হয়েছিলো, কত পরিবার যে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলো তার হিসাব তো কোনোদিন হয়নি, হবেও না। কি নীরব নিষ্ঠুর কুৎসিত মহোৎসব যে এখানে ঘটে গিয়েছিলো তার পুরো ইতিহাস তো কোনোদিনই আমাদের জানা হবে না। জোর করে বলতে পারি না, তবে বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘু একটি পরিবারও এর আওতার বাইরে থাকতে পারেনি বললে সেকথাটা সত্য থেকে বোধহয় তেমন দূরে হবে না।

বাংলাদেশের জন্মের পর এ আইনের নাম বদলে হয়ে গেলো একটি ভদ্রগোছের নাম 'অর্পিত সম্পত্তি আইন'। খবর পাই অল্পদিন হলো আইনটি রদ করা হয়েছে। রাষ্ট্র আর রাষ্ট্রের মালিকদের আইন নিযুক্ত যে ভাড়াটে আইনদাতারা, তারা কি সত্যি করেই কল্পনা করতে পারেন গত চার দশকজুড়ে এই আইনের বলে বলীয়ান হয়ে কি বিরাট এক দানব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ঘরে ঘরে হানা নিয়েছে, চূর্ণ করে দিয়েছে তাদের ঘরবাড়ি, গেরস্থি, পায়ের নিচে দুমড়ে-মুচড়ে ফেলেছে কত নারীর ইজ্জত, কত মায়ের হাহাকার, কত বৃদ্ধ, শিশু, রুগ্নের নিরুপায় কান্না। না, রাষ্ট্র জনগণের প্রভু। সংখ্যালঘু নিপীড়ন আজ এক অভ্যাসের ব্যাপার, এক বিকারগ্রস্ত মানসিকতা মাত্র। সাম্প্রদায়িকতা ঢুকে গেছে অস্থির মধ্যেম মজ্জার কোষে কোষে। আজ আমরা ভুলেই গিয়েছি, কেন এবং কেমন করে এ ব্যাধি এমন সর্বব্যাপ্ত হয়েছে। প্রবলের স্বার্থ থেকে উৎপত্তি এ ব্যাধি এখন ক্যানসার বিষের মতো মানুষের অন্ধকারনাশকবৃত্তির মধ্যে ঢুকে গেছে।

ঘটনা□মে ১৯৯২-এর ডিসেম্বরে আমি চট্টগ্রামের এক হোটেলে ছিলাম। শেষরাতে শহরের নিঝুম নির্জনরাত বারবার শিউরে উঠছিলো। হাজার ঘাতকের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত ধর্মের পবিত্র বাক্য আছড়ে পড়ছিলো অন্ধকারের মধ্যে আর ফালা ফালা করে দিচ্ছিল আকাশ। সেই চিৎকৃত পবিত্র বাক্যের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিলো নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। ঘর-পোড়ানো আগুনের হিস হিস শাসানি, বাঁশ ফাটার আওয়াজ আর ধোঁয়ার গা-গুলানো গন্ধ। কেউ কি কোনোদিন হিসাব করেছে এই ভয়ানক মানব-ক্ষতির। কোনো সরকার কি দিয়েছে কোনো কৈফিয়ত? কেন দেয়নি? এই কৈফিয়ত দেয়ার জন্য গণতন্ত্রের জন্যই কি তাদের ক্ষমতায় বসানো হয়নি?

এবারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অন্তত একটি তত্ত্বাবধানের কাজ চমৎকার সাফল্যের করতে পেরেছেন। তারা দেখিয়ে দিয়েছেন কেমন করে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পরিবেশে নির্বিঘ্ন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে হয়, যাতে নির্বাচন পরিণত হয়ে পড়ে রাষ্ট্র ও জনগণকে জামিন রাখা এক বিশাল ব্যবসায়িক লেনদেনে। এবার দেখা গেলো জনপ্রতিনিধি নয়-নির্বাচন হয় টাকার, স্বার্থের, ক্ষমতার। তারা অবশ্য বলতে পারেন এসব তাদের দেখার বিষয় নয়, বলতেই পারেন-তবে এটাও তাদের বলতে হবে যে, এ ধরনের একটা নির্বাচন করতে গেলে গত দশ বছরের গণতন্ত্রের খোলসে যে সন্ত্রাস চলছিলো-সেটাকে বহুগুণে প্রসারিত করার, তীব্র করার এবং হত্যা, লুণ্ঠন ও সন্ত্রাসকে অব্যাহত রাখার যে শর্ত ছিলো সেটা তারা ঠিকমতো তত্ত্বাবধান করতে পেরেছেন। আমরা জানি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা নির্বাচনের দু'মাস আগে থেকেই পুরোদমে চালু হয়ে গিয়েছিলো, অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে সেটাকে অবাধ রাখার একটা দায়িত্ব

ছিলো সরকারের। এ কথা আমরা বলি, কারণ কোনো ব্যবস্থা আমরা নিতে দেখিনি সরকারকে। নির্বাচন-পূর্ব সন্ত্রাস দমনের জন্য সরকারের তরফ থেকে একটি আঙুল তুলেও প্রতিরোধের কোনো চেষ্টা দেখেনি দেশের মানুষ।

যাক, নির্বাচন তো হয়ে গেছে। ফলাফল কি হয়েছে তার সবাই জানে। এখন কি আমরা সদ্যবিদায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে জিজ্ঞেস করতে পারি, নির্বাচনের পরে গত দশদিনে অতীতের সমস্ত দৃষ্টান্তকে পরাস্ত করে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর যে ভয়াবহ তাণ্ডব চালানো শুরু হয়েছে এবং এখনো যা একনাগাড়ে চলছে, এতো অগ্নিকাণ্ড, এতো পরিবারের উচ্ছেদ, এতো প্রাণহানি, এতো ধর্ষণ- কেন হচ্ছে? মেয়াদ শেষে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পার পেয়ে গেছে, এই সরকার কি করবে? কি বলবে? জনসাধারণের পক্ষ থেকে তোলা এসব প্রশ্নের জবাব কে দেবে? দুদিনের সরকার বই তো নয়- এই কথা হলে কি জনগণের প্রশ্নের রোষ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে? এ হামলা কি প্রতিশোধের? দেশের সংখ্যাগুরু মালিকদের এক অংশের □তদাসরা কোন সাহসে স্বাধীনভাবে ভোট দেয়- এই অপরাধের শাস্তি চলছে কি? খবরে তো দেখা যায়, ফলাফল যাদের পক্ষে গেছে, আ□মণ-নির্যাতন চালাচ্ছে তারাই। তা যদি হয়, তাহলে এটাকে শাস্তিবিধান এবং প্রতিশোধ গ্রহণই বলতে হয়।

সংখ্যালঘুদের ওপর আ□মণ, অমানবিক নির্যাতন আজ সমস্ত সীমা অতি□ম করেছে। বিপন্ন করে তুলেছে দেশের অস্তিত্ব। রাষ্ট্রশক্তি নিজে হাত লাগিয়েছে। কথা বলে, বিবৃতি দিয়ে, কলম চালিয়ে একে রুখতে পারা যাবে না। দেশের সমস্ত মানুষ গর্জে উঠুক, প্রতিরোধ করুক-হাতের, পায়ের শিকল ছিঁড়ে আকাশপ্রমাণ তরঙ্গ তুলে গর্জে উঠুক জনগণ। জনগণ বুঝুক এটাই একমাত্র বাঁচার পথ।

সংবাদ, ১৩ অক্টোবর, ২০০১

আমার বাংলাদেশ, আমাদের বাংলাদেশ
সনৎকুমার সাহা

আজ হঠাৎ করেই অনেক ত্যাগের মূল্যে পাওয়া এই স্বাধীন দেশটির অসহায় দুর্বল এক জনগোষ্ঠীর ওপর অন্যায় অবিবেক নারকীয় হামলার ঘটনা ব্যাপকভাবে ঘটতে শুরু করেছে। না, হঠাৎ করে নয়- বোধহয় ঠাণ্ডা মাথায় হিসাব করে সুপরিকল্পিতভাবেই। সাধারণ নির্বাচনের দিন যতো এগিয়ে এসেছে, ততোই তাদের ওপর হুমকি বেড়েছে। কোথাও কোথাও লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, পরিবার-পরিজনদের লাঞ্ছনা, বিক্ষিপ্তভাবে হত্যার চেষ্টা, এমনকি হত্যাও। বোঝা যায়, একটা ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করা ছিলো এসব অপকর্মের উদ্দেশ্য। নির্বাচনের পর তা লাগামহীনভাবে ছড়িয়েছে, গ্রামের পর গ্রাম তছনছ করেছে, জনপদের পর জনপদে ভীতসন্ত্রস্ত নিরীহ জনসমষ্টিকে উৎকট-উল-াসে মেরে-পিটে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। আদিম বর্বরতার নগ্ন বিভীষিকা আমাদের চোখ ও মনের ওপর আছড়ে পড়েছে। তার সর্বগ্রাসী বীভৎসতা ও সর্বনাশা পরিণামের আশঙ্কা আমাদের ভাবনা-চিন্তার ভিত পর্যন্ত নাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা আবার নতুন করে বিপন্নবোধ করতে শুরু করেছি। এ বিপন্নতা রাষ্ট্রভাবনায়, যা আমরা মনে করেছিলাম, একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামের প্রবলজোয়ার এবারে ধুয়ে-মুছে ভাসিয়ে নিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এখন দেখছি, আমাদের অনেকটাই ছিলো স্বপ্নবিলাস অথবা আমরা যথেষ্ট সতর্ক ছিলাম না,

বিকারের নতুন সং□মণে আমরা হতবিহ্বল হয়ে পড়েছি।

অথচ এই বিকার থেকে উদ্ধার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাতেই আমরা চেয়েছিলাম বাংলাদেশ। ভেবেছিলাম, সব নাগরিক এখানে সমান অধিকার নিয়ে বাঁচবে। ধর্ম বা বর্ণের ব্যবধান কোনো বাধা রচনা করবে না। সুস্থ সভ্য কল্যাণকামী এক রাষ্ট্রে, মত বা বিশ্বাস যার যা হোক না কেন, আমরা সবাই নিরাপদ বোধ করবো। সবাই নিরাপদ থাকলে রাষ্ট্রও নিরাপদ থাকবে। রাষ্ট্রের সংবিধান সবাইকে একইভাবে মর্যাদা ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা দিলে তার নিজের অস্তিত্বও সুদৃঢ় হবে। ভেতর থেকে কোন সংশয় তাকে দীর্ণ করবে না। সাধারণ মানুষ সবাই নিশ্চিন্তে নিজ নিজ কাজে মন দিতে পারবে। আমরা ছিলাম পাকিস্তানি বৈষম্যের শিকার। বৈষম্য কিভাবে বিপর্যয় ডেকে আনে তা আমাদের জানা ছিলো। কাজেই আমাদের শুভ চেতনা তেমন বৈষম্য সৃষ্টির ব্যাপারে শুরুতেই আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলো। সংবিধানে যে সতর্কতাকে আমরা মান্যও করেছিলাম।

আসলে পাকিস্তান যে আমাদের কাছে মিথ্যা হয়ে গেলো, তা তার ওই একগুঁয়ে দখলদারিত্বের আর বৈষম্যমূলক আচরণের কারণেই রাষ্ট্রক্ষমতায় বাঙালির অধিকার তারা মানেনি। বাঙালি মুখ ফিরিয়েছে। যারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু, তাদের মানবিক অধিকারটুকুও তারা হরণ করেছে। ফলে সংখ্যালঘুদের উদ্যম স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাষ্ট্রের সমৃদ্ধিতে তেমন অবদান রাখেনি। তারা বিচ্ছিন্নতাবোধের শিকার হয়েছে। তাতে কিন্তু পাকিস্তানের সংহতিই নষ্ট হয়েছে। রাষ্ট্রের চেহারায় ফাটল দেখা দিয়েছে। চূড়ান্ত বিচারে চরম মূল্য দিতে হয় পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটিকেই। থোঁতা মুখ ভোঁতা করে বাংলাদেশ থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে নিতে সে বাধ্য হয়েছে। পরাজয়ের অপমান আর ব্যর্থতার আ□াশ সে ভোলেনি। চ□ান্তের সুতো এখনো সে বাংলাদেশে ছড়ায়। সফল হলে বাংলাদেশ মার খায়। তার কিছু লাভ হয় না।

এ কথাগুলো আমরা যে জানি না, তা নয়। তবু আত্মহননের বিকৃত নেশায় বারবার রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের ধারায় পাকিস্তানি ঐতিহ্যে লালিত মানবতাবর্জিত কদাচার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে চলি। রাষ্ট্র তার মীমাংসিত সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে। তাতে নিজেকেই নিজে সে প্রশ্নসঙ্কুল করে তোলে। এতে তার মেধা ও সম্পদের অনর্থক অপচয় ঘটে। প্রত্যাশিত সমৃদ্ধি অনায়ত্তই থেকে যায়। আমরা কি এবং কেন, এই অপপ্রশ্ন নিয়ে নতুন করে যুঝতে যুঝতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। সহমতের সম্ভাবনাটুকুও হারিয়ে যায়। দেশ রসাতলে যেতে বসে। বাহাত্তরের সংবিধান এখন হাঁটু-ভাঙা-দ। সব মানুষের সমান অধিকারের ধারণা কোণঠাসা। রাষ্ট্র তাল ঠুকে ক্ষমতার দখল নেয়ার মল-ভূমি বিশেষ। যারা দুর্বল অথবা হঠাৎ বেকায়দায় পড়ে বেসামাল, তাদের ওপর ঘটে চলে নির্বিচার অপমান আর প্রাণঘাতী আ□মণ। কোথাও কোনো সভ্য আচরণের আড়াল আর থাকে না। বীরত্বের নামে বর্বরতা হাততালি পায়। ক্ষমতার গলিতে তারই দাপট। রাষ্ট্র তার কাছে সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য সাধনের বস্ত্র হয়ে ওঠে। গণমানুষের আস্থা সে হারাতে বসে। তাতে বিপদের আশঙ্কা আবার গণমানুষেরই। আজ হঠাৎ করে দুর্বল জনগোষ্ঠীর ওপর দুর্জনতার যে পৈশাচিক নগ্ন আ□মণ, তাতে যেন বাংলাদেশের ভবিতব্যের পূর্বগামিনী ছায়াই ফুটে ওঠে। দুর্বলের কি হবে, এ নৈতিক প্রশ্ন বাদ দিলেও বাংলাদেশ স্বয়ং যে দুর্বল হবে, এ সম্ভাবনার ভ্রুকুটি আমরা এড়াতে পারি না।

বাংলাদেশের অভ্যুদয় পাকিস্তানকে ভিন্ন জনগোষ্ঠীর ঝামেলা থেকে মুক্তি দিয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও কোনো চোখে কাঁটা হয়ে তাকে আর বিরক্ত বা হিংস্র করে না। এতে কি পাকিস্তান বেশি মজবুত হয়েছে? তার রাষ্ট্রব্যবস্থা কি স্থিতিশীল হয়েছে? কোনোটিই হয়নি। বরং ঠিক তার উল্টো। অসহিষ্ণুতার, বর্বরতার ও দখলদারিত্বের মানসিকতা এখন অপরকে ছেড়ে নিজেকেই খেতে বসেছে। পোকায় কাটা ঘুণে ধরা দেশটির রক্তক্ষরণই তাতে বেড়ে চলেছে।

অন্য কেউ নেই, তবু চলছে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীর নতুন নতুন দেয়াল তোলা, ক্ষমতার দখলদাররা একের পর এক কোনো অবস্থাতেই বিশ্বাস করতে পারছে না আপন দেশের জনসাধারণকে। জনগণেরও আস্থা থাকছে না সামরিক ক্ষমতাধরদের দুর্বিনীত দাপটের ওপর। এটা তারা বোঝে না, কাউকে তাড়িয়ে বা কাউকে ছোট করে রাষ্ট্র নিজেকেই ভেতরে ভেতরে দুর্বল করে ফেলে। তার স্বাভাবিক সংহতি আর আসে না।

কিন্তু বাংলাদেশও কি এখন পাকিস্তানের পথে চলতে চায়? শক্তিমদমত্ত উন্মত্তের দল নিরীহ জনসম্প্রদায়ের ওপর পাশবিক আ□মণ চালিয়ে তাদের বিপন্নতার ও হতাশার গভীর খাদে ঠেলে দিতে শুরু করেছে। তাদের লাঞ্ছিত অপমানিত আর্তমুখের ছবি দেখে কেউ কেউ 'কেল-া ফতে' বলে জান্তব চিৎকারে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করেছে হয়তো, মেরে-ধরে তাদের দেশছাড়া করার সুযোগ এসেছে বলে কেউ কেউ হয়তো নিষ্কন্টক নিশ্চিন্ততায় ভবিষ্যতে কিস্তিমাতের খোয়াব দেখায় মেতেছে, এদিকে ছিন্নভিন্ন বাংলাদেশ যে আত্মখণ্ডনে বিপর্যস্ত এটা কেউ খেয়াল করছে না। অথবা খেয়াল করলেও এটিই তাদের অভীষ্ট বলে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসছে। প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধ অনেকের চোখেই ধরা পড়ছে না। বিচারের বাণী এখানে নীরবে নিভৃতে কাঁদছে, নাকি ওই শক্তেরই মদদ যোগাচ্ছে, স্পষ্ট করে বোঝা যায় না।

তবে এটা কোনো সমাধান নয়, বরং নতুন করে বিষবৃক্ষের চাষ শুরু করা। ভবিষ্যতের পথ তাতে অনেক বেশি জটিল হয়ে পড়ার আশঙ্কা। সমস্যা ও সঙ্কট শতগুণ প্রচণ্ডতায় কোনো না কোনো সময়ে গোটা দেশকে যদি গ্রাস করে ফেলে তবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। হয়তো পিতৃপুরুষের কর্মফল বয়ে বেড়াবে উত্তর-পুরুষ। রাষ্ট্রের অকল্যাণ তাতে বাড়বে বই কমবে না। আর যাদের মনে করা হচ্ছে অবাঞ্ছিত, তাদের কাউকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললেও তার প্রতিটি রক্তকণিকা যুগ যুগ ধরে জানিয়ে যাবে, 'এ দেশ আমার, আমি এই দেশের। জন্ম-জন্মান্তরের পথ ধরে বংশপরম্পরায় আমি এই মাটির সন্তান। এই সত্য অবিনাশী।' যদি কাউকে দেশছাড়া করা হয়, তবু তার ছায়া পেছনে পড়ে থাকবে। এক সময় না এক সময় তা স্পষ্ট হয়ে জবাব খুঁজবে, জবাব চাইবে। মানুষের ইতিহাসে এইরকমই ঘটে। বাংলাদেশের মানুষ তার বাইরে নয়।

এ কথা আমাদের মনে রাখা দরকার, বাংলাদেশ নামে এই রাষ্ট্রটির প্রাথমিক ভিত্তি তার জনগণ-কাউকে বাদ দিয়ে নয়, তাদের সবাইকে নিয়ে। এ দেশ আমার এবং আমাদের সবার। একে স্বীকার করাতেই আমাদের গৌরব, অস্বীকার করাতে সমূহ দুর্বলতা। আমাদের সুখ, শান্তি ও সুস্থিতি, সবই তা বিনষ্ট করে।

সংবাদ, ১৪ অক্টোবর ২০০১

বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে

ড. অজয় রায়

এই ঘৃণ্য নির্যাতন আমাদের জন্য শুধু লজ্জা নয়, আমাদের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি। তিল তিল করে দীর্ঘ সময়ের পথ ধরে যে মানবিক মূল্য, অসাম্প্রদায়িক সমসমাজ গড়ার অনলস চেষ্টা, ধর্ম-সম্প্রদায়-জনগোষ্ঠী-অনপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্মাণ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার সকল অর্জন, আমাদের সকল সাফল্য, পরম যত্নে আমাদের লালিত স্বপ্নগুলো চিরতরে বিলীন হতে যাচ্ছে। বাঙালিত্বের চেতনা-ধারণা উন্মেষের লক্ষ্যে, বাঙালির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। বারবার প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে কার দোষে, কার অপরাধে, কাদের ব্যর্থতায় মানবিকতা, মনুষ্যত্ব পদদলিত হচ্ছে, অপমানিত হচ্ছে? অথচ আমরা বারবার দাবি করে এসেছি, বর্তমানে এবং অতীতে, আমাদের দেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ, পরমত পরধর্মমত সহিষ্ণুতার দেশ। অন্যদিকে এ সত্যটিকে তো উপেক্ষা করার উপায় নেই শুধু অন্য ধর্ম পালনের জন্য, একটি সম্প্রদায়ের মানুষকে অসহায়ভাবে নির্যাতিত হতে হচ্ছে বারবার, এ নির্যাতন নানা প্রকৃতির- শারীরিক, মানসিক, পার্থিব তাদের-বঞ্চিত করা হয়েছে ন্যায্য অধিকার থেকে কর্মক্ষেত্রে, কর্মসংস্থানের সুযোগ দানে, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, এমন কি নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা ক্ষেত্রেও। অথচ এই তথাকথিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ আমাদের সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি-শিক্ষা-বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় দ্যুতিময় অবদান রেখেছে। কৃষিক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের হিন্দু ক্ষত্রিয় সমাজের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের হিন্দু নমঃশুদ্র সমাজের কৃষকরা শত অপমান নির্যাতনের মুখেও আমাদের দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে শ্রম দিয়ে যাচ্ছে নিরলসভাবে, নীরবে। নিকোটি বর্গের মৎসজীবীরা, কামার-কুমার-তাঁতি সম্প্রদায়, অচ্ছুৎ বলে পরিচিত ঋষি সম্প্রদায় সমাজের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। আমাদের ক্লেদ ও ময়লা নিষ্কাশনে নতমুখে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু পশ্বাধমদের রুদ্ররোষ, নির্যাতনের খড়গ নেমে আসে তাদেরই ওপর সবচাইতে আগে। মানুষ অনেক নির্যাতন সহ্য করতে পারে, কিন্তু তার কন্যা, তার মাতা, তার সহধর্মিনীর ওপর সম্মানহীন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়। তখন সে জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে, দেশান্তরী হতে চায়।

নির্বাচনোত্তর এবারের নির্যাতন দূর অতীত ও সাম্প্রতিককালের সকল মাত্রাকে অতিক্রম করে গেছে পরিমাপে ও বিস্তৃতিতে। ঘটনাগুলো স্থানিক বা বিচ্ছিন্ন নয়। পঞ্চগড় থেকে উখিয়া, মাগুরা থেকে মৌলভীবাজার- সারাদেশ এই নরপশুদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র, তাদের মৃগয়ার চারণভূমি। সংখ্যালঘুরা জানলো তাদের অপরাধ তারা নাকি একটি বিশেষ দলের ভোটব্যাংক। তাদের অপরাধ তারা সনাতন ধর্মের অনুসারী, তাদের অপরাধ তাদের নাম বাংলা-আরবীয়, ফারর্সি বা তুর্কি নয়। গৌরনদী থানার উত্তর চাঁদশী গ্রামের সংখ্যালঘু পরিবারের দু'কন্যাসহ মাতাকে ধর্ষণ অথবা বাটাজোড় ইউনিয়নের বাছার গ্রামের মাতা-পিতার সম্মুখে তিন কন্যার ওপর পশুদের বলাৎকার অথবা কোটালীপাড়ার উজিরপুরের উত্তর মাদারকাঠী গ্রামের ডাক্তার সুনীল শীলের ওপর শারীরিক অত্যাচার ও তার গৃহদেবতার মূর্তি ভেঙে ফেলা অথবা নড়াইলের লোহাগড়ার অন্তর্ভুক্ত লাউদিয়া গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষককে মাস্তানভাবে পিটিয়ে গ্রাম থেকে বহিষ্কার করা অথবা পিতার সম্মুখে তার কন্যার শ্লীলতাহানি করে পিতাকে হত্যা করা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা স্থানীয় ঘটনা হতে পারে না। সারাদেশেই সংঘবদ্ধভাবে এ ধরনের অমানুষিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে অব্যাহতভাবে। কার কাছে প্রতিকারের দাবি জানাবে এই নির্যাতিত নিপীড়িত অসহায় মানুষেরা? বিএনপির বিপুল বিজয়ে বিপুল ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক

সম্মানিত শিক্ষক। কিন্তু সংখ্যালঘুদের ওপর সীমাহীন নির্যাতনে তাদের উদ্বিগ্ন হতে দেখি না, পাশে দাঁড়ানো তো দূরের কথা। টিভি পর্দায় দেখি শত নাগরিকের এক বিশিষ্ট নাগরিককে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে নির্লিপ্ততার সাথে জবাব দিতে- এ ধরনের দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটতেই পারে, তাছাড়া কাগজের অতিরঞ্জন। এই যদি বিজীয় দলের উচ্চমার্গের প্রান্তিক সমর্থকদের মনোভঙ্গি হয় তাহলে ৪ দলীয় সশস্ত্র ক্যাডার ও উগ্র সমর্থকদের কি মনোভাব হবে তা সহজেই অনুমেয়। তার স্থূল প্রকাশ তো নির্বাচনোত্তরকালে কদিন ধরেই দেখছি।

নির্বাচনোত্তরকালে দেশে কোনো সরকার ও প্রশাসন ছিলো বলে মনে হয় না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার, প্রখ্যাত কলামিস্ট গাফফার চৌধুরীর ভাষায়, 'তল্পিবাহক সরকার'। তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সার্থকভাবে পালনের আনন্দে বিভোর। অতএব এসব ছোটখাটো ব্যাপারে সময় দেয়ার মতো তাদের অবকাশ কোথায়? আর সে কারণে স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও তৎপর নয়। বিজিত দল নিজেরাই নিজেদের রক্ষায় ব্যস্ত, তাদের নেতাকর্মীরা আক্রান্ত। সুতরাং তারাও অসহায়। তবুও যে প্রতিবাদ আসছে তা তাদের কাছ থেকেই। আর প্রতিবাদ আসছে সচেতন নাগরিক সমাজ থেকে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যদের কাছ থেকে। কিন্তু এই প্রতিবাদ কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। যাদের সক্রিয়তায় এটি প্রশমিত হতে পারতো, সেই বিজয়ী দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা নিজ নিজ এলাকায় দ্রুত ছুটে গিয়ে এই আর্ত মানুষদের রক্ষা করতে পারতেন, তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারতেন, দলীয় কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারতেন। তাদের এই ব্যর্থতা সীমাহীন। তারা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এমপি হোস্টেলের ভালো ঘর দখলের প্রতিযোগিতায়। আর যিনি এই সহিংস ঘটনাবলির তাৎক্ষণিক অবসান ঘটাতে পারতেন তিনি বিজয়ী দলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। কিন্তু তিনি নিশ্চুপ রইলেন, সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন প্রধান উপদেষ্টার ওপর। দৃপ্ত আবেদন জানালেন না নেতাকর্মীদের ঝাঁপিয়ে পড়তে এই সহিংস ঘটনা বন্ধের। নিজে ছুটে গেলেন না পীড়িত, নির্যাতিত অসহায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের পাশে। তা যদি করতেন সংখ্যালঘু জনগণ কৃতজ্ঞ থাকতো।

বলা হয়, সংখ্যালঘুরা আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়। এটি তাদের মহা অপরাধ। কিন্তু কেন দেয় সে বিশে-ষণে কেউ যেতে চান না আন্তরিকভাবে। তাদের সমস্যা নিয়ে কেউ ভাবতে চান না। এদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়ন কোনো নতুন ঘটনা নয়। সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগও কোনো অজানা প্রতিভাস নয়। '৪৬-এর দাঙ্গার রেশ কাটতে না কাটতেই দেশ বিভাগ হলো '৪৭-এ। '৪৮ ও ৫০-এর দাঙ্গায় সংখ্যালঘুরা দেশত্যাগে বাধ্য হলো। তফসিলি নেতা যোগেন্দ্র মণ্ডল, যিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে নিরঙ্কুশ সমর্থন দিয়েছিলেন, তিনিও দেশত্যাগে বাধ্য হন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই দাঙ্গা রোধে ও শান্তি স্থাপনে সই হয় নেহরু-লিয়াকত চুক্তি, যার প্রধান অঙ্গীকার ছিল দু'দেশের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ধর্মীয় ভিত্তিতে জন বিনিময় হবে না, সংখ্যালঘুদের সকল অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু সংখ্যালঘুদের মনে নিরাপত্তাবোধ কোনো সরকারই জাগাতে পারেনি। ক্রমশ শনৈ শনৈ এদেরকে দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকে রূপান্তরিত করা হয়েছে। মুসলিম লীগ তাদের অধিকার রক্ষায় এগিয়ে আসেনি বরং তাদের অধিকার হরণের প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছে। দাঙ্গা-হাঙ্গামাকালে, তাদের রক্ষায় আওয়ামী লীগ ও পরে মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত ন্যাপ ও পরবর্তীকালে মোজাফফর ন্যাপ এদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ও সংখ্যালঘুদের আস্থা অর্জনে ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ দুটি দলের কোনোটিরই ব্যাপক জনভিত্তি ছিলো না। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলে, আর কোনো দল ছিলো না যার ওপর সংখ্যালঘুরা নির্ভর করতে পারে। সেকুলার রাজনীতিতে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগের বিকল্প কোনো জনভিত্তিক দল গড়ে উঠলো না। ১১ দল খাতাপত্রেই রয়ে গেল, বিকল্প তৃতীয়

শক্তিতে পরিণত হতে পারলো না। পঁচাত্তর পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী দল গড়ে উঠলো রক্ষণশীল মুসলিম লীগপন্থী, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ও কিছু সুবিধাবাদি উগ্র বামপন্থী উপাদানের যান্ত্রিক মিশ্রণে। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে এ দলটি আরও উগ্র ইসলামপন্থী দলে রূপান্তরিত হলো- যারই স্বাভাবিক পরিণতি ইসলাম পছন্দ ৪ দলীয় ঐক্যজোট। এই দলটির প্রতি স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যালঘুরা আকৃষ্ট হতে পারে না। জন্ম থেকেই বিএনপি সংখ্যালঘুদের আস্থা অর্জনে চেষ্টা করেনি, প্রয়োজনও বোধ করেনি। কারণ সেকুলারিজম তাদের রাজনৈতিক দর্শন নয়। এ দলটির রাজনৈতিক দর্শন হলো ইসলামি আদর্শভিত্তিক মুসলিম উচ্চাভিলাসের (Muslim aspiration based on Islamic principle) লালন। এ কারণেই বেগম জিয়া সহজেই নন-সেকুলার মুসলিম জনগণকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। পঁচাত্তর-পরবর্তী ঘটনা ও বেগম খালেদার লালন ও প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তি □মশ শক্তি বৃদ্ধি করেছে এবং বর্তমানে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি বেগম খালেদা জিয়ার যে দায়-দায়িত্ব নেই ইতিপূর্বেও তিনি তার প্রমাণ রেখেছিলেন। বিগত বাবরি মসজিদ ভাঙা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর, বিশেষ করে ভোলায় যে হাজার হাজার মানুষ নির্যাতনের শিকার হয়েছিলো, গৃহহারা হয়েছিলো এবং দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিলো তার জন্য তখনকার প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া কোনো সহানুভূতি প্রকাশ করেননি, না সংসদের অভ্যন্তরে, না প্রকাশ্যে। এরপরও কি সংখ্যালঘুরা তার দলের প্রতি আকৃষ্ট হবে?

এই সাম্প্রদায়িক শক্তি ১৯৪৭-এর পর থেকে বরাবর চেষ্টা করে আসছে বাংলাদেশকে সংখ্যালঘু মুক্ত মনোলিথিক ইসলামি জনগণের দেশে রূপান্তরিত করতে। সংখ্যালঘুরা বিতাড়িত হলে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, সুকান্ত, সত্যেন্দ্রনাথ, এমনকি নজরুলও নির্বাসিত হবেন, কারণ তিনিই তো বলতেন ঃ 'হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন? কাণ্ডারী! বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার!' যা ঐতিহ্যগতভাবেই আওয়ামী লীগ সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পর্কে উচ্চকণ্ঠ ছিলো। অন্য কোনো দল না থাকায় সংখ্যালঘুরা আওয়ামী লীগের ওপরই ভরসা রেখেছে অনেকটা অনন্যোপায় হয়েই, আওয়ামী লীগ যে তাদের জন্য অনেক কিছু করেছে তা নয়। কিন্তু নৈতিক সাহায্য ও সমর্থন তারা পেয়েছে, এদের কাছ থেকে মুখে মুখে হলেও।

যে দলটিকে সংখ্যালঘুরা সমর্থন দিয়েছে বলে যে দুর্যোগ তাদের জীবনে নেমে এসেছে, তারা নিজেরাই এবার ঘর সামলাতে ব্যস্ত। তবু তাদের বিশাল কর্মীবাহিনীকে নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে সর্বশক্তি নিয়ে। আজ সেই সিংহপুরুষের অনুপস্থিতি বড় বেশি করে মনে পড়ে, যার হুঙ্কারে '৬৪-র দাঙ্গা আইয়ুবশাহী ২৪ ঘন্টার মধ্যে বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

শুনেছি আওয়ামী লীগ নেত্রী পদযাত্রা করবেন দেশের এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে— আপনার যাত্রা শুরু হোক নির্যাতিত মানুষের উদ্দেশে ঃ ভোলার দিকে, কোটালীপাড়ার দিকে, বাগেরহাটের দিকে-বাংলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। সাধারণ মানুষ আপনার যাত্রায় শরিক হবে, আপনাকে শক্তি যোগাবে, আশীর্বাদ করবে নির্যাতিত-নিপীড়িত জনতা। আমরাও এই অভিযাত্রায় আপনার সাথে থাকতে চাই। আপনার কণ্ঠে ধ্বনিত হোক আপনার পিতার সেই দৃপ্তকণ্ঠ ঃ 'বন্ধ করো এই দাঙ্গা। নইলে বাংলা বন্ধ করে দেওয়া হবে'।

আর ইতোমধ্যে হাজারো মানুষের নীরব আর্তনাদ ধ্বনিত হতে থাকবেঃ 'আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন, শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।' সকলের সাথে আমার ক্ষুদ্র কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই, জাগো দেশবাসী, প্রতিহত করো এই অপশক্তি। আমাদের সম্মিলিত শুভশক্তির কাছে অশুভ শক্তির পরাজয় ঘটবেই।

সংবাদ, ১৫ অক্টোবর ২০০১

সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ঃ অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ থাকে না

শাহরিয়ার কবির

বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা যখন নজিরবিহীন সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের কারণে ঘরছাড়া, গ্রামছাড়া, দেশছাড়া, হাজার হাজার বিপন্ন মানুষ যখন আশ্রয় নিয়েছে লঙ্গরখানায়, সরকার তখন তাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা উদযাপনের। 'সংগ্রাম,' 'ইনকিলাব' আর 'দিনকাল' ছাড়া এমন কোনও দৈনিক পত্রিকা চোখে পড়েনি যেখানে গত পনেরো দিনে সাম্প্রদায়িক বর্বরতার খবর ছাপা হয়নি। এটা মনে করার কোনও কারণ নেই 'প্রথম আলো,' 'যুগান্তর,' 'ডেইলি স্টার' প্রভৃতি আওয়ামী লীগের কাগজ, বি-জা-ই-জা (বিএনপি-জামাতে ইসলামী-ইসলামী ঐক্যজোট-জাতীয় পার্টি) সরকারকে বিব্রত করার জন্য সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের 'অতিরঞ্জিত' ও 'কাল্পনিক' সংবাদ ছাপছে।

নির্বাচনের আগে দেখেছি, পরেও দেখেছি, প্রথমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে দেখা, নজিরবিহীন কারচুপির নির্বাচনকে 'অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ' বলা এবং নির্বাচনের পর সংক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগকে সংসদে নেয়ার ব্যাপারে যে সব বহুল প্রচারিত পত্রিকা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে খালেদা জিয়ার মৌলবাদী-তালেবানি সরকারকে বৈধতা প্রদানের চেষ্টা করেছে তারাও সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের খবর না ছেপে পারেনি। কারণ দুটো ঃ ১) পত্রিকার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ (এসব পত্রিকার হিন্দু পাঠকও আছে) এবং ২) খালেদা জিয়ার নতুন সরকারের ভাবমূর্তি বজায় রাখার পাশাপাশি সম্ভাব্য বিপর্যয় থেকে তাদের রক্ষা করা।

পেছনে যেতে চাই না, শুধু আজকের (১৬.১০.২০০১) কয়েকটি পত্রিকার খবরের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিএনপি সমর্থক যুগান্তর-এর একটি খবরের শিরোনাম হচ্ছে 'সংখ্যালঘুরা বিভিন্ন সীমান্ত পথে দেশ ছাড়ছে।' খবরে বলা হয়েছে, 'বৃহত্তর রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী ও দিনাজপুর অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সংখ্যালঘু লোকজনের উপর নির্যাতন, নিপীড়ন ও হুমকির মুখে গত ৭ দিনে বৈধ ও অবৈধ উপায়ে দেড় সহস্রাধিক লোক পরিবার পরিজন নিয়ে ভারতে পালিয়ে গেছে। বিভিন্ন সূত্র জানায় প্রতিদিনই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন সীমান্ত অতি□ম করছে। ...

'গত ১১ অক্টোবর দুপুরে মগালীবাড়ি সীমান্ত দিয়ে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পথে কথা হয় টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার গ্রামের রমেশ সাহা ও তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। তারা জানান, গত ৫ অক্টোবর রাতে একটি রাজনৈতিক দলের লোকজন এসে শাসিয়ে যায়। ৭ দিনের মধ্যে তাদের ছাত্র ও যুবদলের ফাণ্ডের নামে ১ লাখ টাকা চাঁদা না দিলে তাদের মেয়েকে তুলে নিয়ে যাবে হুমকি দেয়া হয়। তাই ভয়ে তারা পালিয়ে যাচ্ছেন ভারতে।'

১৬ তারিখে 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এ প্রকাশিত দুটি সংবাদের শিরোনাম হচ্ছে 'নরসিংদীতে পূজামণ্ডপে হামলা আরও কয়েক স্থানে সহিংসতা' এবং 'ঝিনাইদহের কালিগঞ্জের চিত্রঃ শতাধিক গ্রামে সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব ॥ নিহত ২, আহত ২০০ ॥ প্রায় ১০ হাজার লোক বাড়ী ছাড়া।'

একইদিনে 'প্রথম আলো'য় বরিশালে এক হিন্দু পরিবারের ৩ নারীর ধর্ষণের সংবাদ বেরিয়েছে যা 'ডেইলি স্টার'-এও ছাপা হয়েছে। আরেকটি খবর অন্য পত্রিকায় চোখে পড়েনি যা 'প্রথম আলো'য় এসেছে। তাদের ফেনী প্রতিনিধি কর্তৃক প্রেরিত এই সংবাদের শিরোনাম হচ্ছে— 'ফেনীতে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা, আহত ৫, গ্রেপ্তার ৩।' সংবাদে বলা

হয়েছে— 'সদর উপজেলার তুলাবাড়ীয়া গ্রামে গত রোববার গভীর রাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনের বাড়িঘরে হামলা ও লুটপাটের চেষ্টাকালে এবং সন্ত্রাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষে পাঁচজন গ্রামবাসী আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় স্বপন চন্দ্র দাস ও মাখন চন্দ্র দাসকে ফেনী সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মোশাররফ, রফিক ও আনোয়ার নামে তিন সন্ত্রাসীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

'গ্রামবাসীরা জানায়, কালিদহ ইউনিয়নের আলোকদিয়া গ্রাম থেকে ৩০ বা ৩৫ জনের একটি সন্ত্রাসী দল গত রোববার দিবাগত রাত আনুমানিক ৩টায় প্রথমে চেওরিয়া গ্রামে যায়। সেখানে গ্রাম প্রহরীদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হলে তারা দক্ষিণ সহদেবপুর ও তুলাবাড়ীয়াস্থ নরঘরিয়া গ্রামের সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা চালায়। এ সময় সন্ত্রাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষে পাঁচজন গ্রামবাসী আহত হয়। পুলিশ আলোকদিয়া গ্রামের তিন সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করে। এ ব্যাপারে ফেনী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক এ এফ এম সোলায়মান চৌধুরী ও পুলিশ সুপার হেলাল উদ্দিন বদরী গতকাল সোমবার বিকেলে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।'

১৬ অক্টোবর 'আজকের কাগজ'-এর প্রথম পাতায় নিজস্ব প্রতিবেদক লিখেছেন ফরিদপুরে নগরকান্দা উপজেলায় নির্বাচন পরবর্তী সাম্প্রদায়িক সহিংসতার খবর, যার শিরোনাম হচ্ছে 'সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা একাত্তরের ভয়াবহতাকেও হার মানিয়েছে।' 'আজকের কাগজ'-এর শেষ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে রূপগঞ্জের সরেজমিন প্রতিবেদন, যার শিরোনাম হচ্ছে 'সংখ্যালঘুদের জন্য চনপাড়া এখন আতঙ্কের জনপদ ॥ বিএনপি সন্ত্রাসীদের ভয়ে ঘরছাড়া তরুণরা ॥ মেয়েদের 'তুলে নিয়ে' যাওয়ার হুমকি।' 'আজকের কাগজ' আওয়ামী লীগপন্থি এমন কথা নিশ্চয়ই বিএনপির নীতিনির্ধারকরা বলবেন না।

গতকাল বি-জা-ই-জা সরকারের দুই গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া ও আলতাফ হোসেন যখন যৌথ সংবাদ সম্মেলনে দৈনিক পত্রিকাগুলোর বিরুদ্ধে বিষোদগার করছিলেন সেদিনও বিএনপিপন্থি দৈনিক পত্রিকাগুলোতে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের একান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। বিএনপির নীতিনির্ধারকদের একটি পুরোনো সত্য ভুলে যাওয়া উচিৎ নয়— 'অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ থাকে না।' উটপাখির মতো বালিতে মাথা গুঁজে তারা সত্যকে অস্বীকার করার যত চেষ্টাই করুন না কেন তাতে কোন ফল হবে না।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন সংবাদ সম্মেলনে পূজা উদযাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দের বরাত দিয়ে বলেছেন, তাঁর সঙ্গে বৈঠকে 'তারাও একমত হয়েছেন হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা বিষয়ে কিছু অতিরঞ্জিত খবর প্রকাশ হচ্ছে।' (আজকের কাগজ ১৬ অক্টোবর ২০০১) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই উক্তির প্রতিবাদ করে জাতীয় পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি অনিলচন্দ্র নাথ বলেছেন, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে গত রোববারের অনুষ্ঠিত বৈঠক কখনোই বলিনি পত্রপত্রিকায় সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে অতিরঞ্জিত রিপোর্ট হচ্ছে। রিপোর্টগুলো যথার্থই হচ্ছে বরং অনেক রিপোর্ট হচ্ছে না।' (দৈনিক সংবাদ ১৬ অক্টোবর ২০০১) এরপরও কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যা বলবেন তাই আমরা সত্য বলে গ্রহণ করব?

মন্ত্রীরা বলছেন সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা করার জন্য। কয়েকটি কাগজে হিন্দু সংগঠনকে তাদের পক্ষে কথা বলার জন্য বিএনপি আগে থেকেই তৈরি করে রেখেছে। এইসব বিভীষণদের চিনতে কারও বাকি নেই। এমনকি 'বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ' অনাড়ম্বরে দুর্গাপূজার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে— সাম্প্রদায়িকতার প্রত্যক্ষ শিকার যারা তারা এটুকুও অনুমোদন করতে রাজি নয়। গত ১৪ অক্টোবর সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের তথ্য সংগ্রহের জন্য একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নেতৃবৃন্দ ফেনী গিয়েছিলেন। ভুক্তভোগী যাদের সঙ্গে আমরা বলেছি তারা

জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত গ্রামে ফিরে যেতে পারবেন কিনা তারই কোনও নিশ্চয়তা নেই। সন্ত্রাসীরা এখনও গ্রামে গ্রামে ঘুরছে। যে তুলাবাড়িয়া গ্রামে আমরা ১৪ তারিখে গিয়েছিলাম পরদিন সেখানে আবার হামলা হয়েছে। যে পিতা নিজের চোখের সামনে কন্যাকে ধর্ষিত হতে দেখেছে, যাদের হত্যা করা হয়েছে, যাদের সর্বস্ব ডাকাতি হয়েছে, যাদের ঘরবাড়ি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের কারণে যারা গ্রামছাড়া, তাদের সাড়ম্বরে পূজা করতে বলার মতো বর্বরতা অতীতে শুধু রোমান সম্রাট নিরো, জার্মানীর চ্যান্সেলর হিটলার আর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানই প্রদর্শন করতে পেরেছিলেন।

সরকারের সদিচ্ছা থাকলে ২৪ ঘণ্টার ভেতর সাম্প্রদায়িক নির্যাতন বন্ধ করা যায় কিন্তু তা হচ্ছে না। বিভিন্ন হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় যারা লুণ্ঠন করছে, নরহত্যা করছে, নারীধর্ষণ করছে, গৃহে অগ্নিসংযোগ করছে তারা বিএনপির লোক বলেই প্রশাসন তাদের গ্রেফতার করতে গড়িমসি করছে। প্রশাসন দল নিরপেক্ষ হয়ে সততার সঙ্গে কাজ করলে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার কোনও কঠিন কাজ নয়। খুব বেশি হলে শ পাঁচেক সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করা হলে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন বন্ধ হয়ে যাবে। আ□ান্তরা প্রাণভয়ে থানায় কেস না করলেও পুলিশ সন্ত্রাসীদের চেনে। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসনও জানে এ হামলা পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানাবার সুদূরপ্রসারী নীলনকশার অধীনে। পারলেও তারা সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও হামলা বন্ধ করবে না, কারণ তাদেরও চাকরির মায়া আছে। পত্রিকায় বেশি লেখালেখি হলে লোক দেখানো কিছু গ্রেফতার হবে এবং দুর্বল মামলা ও সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে তারা অচিরেই ছাড়া পাবে, এরপর শুরু হবে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার হামলা।

বিএনপির সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের রক্ষার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গতকাল বরিশালের আগৈলঝাড়ায় আয়োজিত এক জনসভায় বলেছেন, 'নির্বাচনী ফলাফলকে বানচালের উদ্দেশ্যে এক সুগভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে নির্বাচনে পরাজিত শক্তি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের তথ্য প্রমাণ বহির্ভূত অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রকাশ করে ত্রাস ও ভীতির সৃষ্টি করেছে, দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে দাঙ্গা বাঁধাতে চাইছে।' (ভোরের কাগজ ১৬ অক্টোবর ২০০১)

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই উক্তি শুধু নির্লজ্জ মিথ্যাচারই নয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রেও বড় প্রতিবন্ধক। তিনি দাঙ্গার আশঙ্কা করছেন অথচ এ কথা তিনি জানেন না '৪৭-এর ভারতবিভাগের পর এতদঞ্চলে কখনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি, যা হয়েছে তা একতরফা সাম্প্রদায়িক নির্যাতন। দাঙ্গা বাঁধাতে গেলে প্রতিপক্ষের শক্তি প্রয়োজন। '৪৭-এর পর থেকে পাল্টা আঘাত করার এতটুকু শক্তি অবশিষ্ট নেই বাংলাদেশের হিন্দুদের। তারা নিরবে মার খায়, ধরে নেয় এদেশে থাকতে হলে এটাই ভবিতব্য, সহ্যের সকল সীমা অতি□ম করলে নিরবে দেশত্যাগ করে।

কোন দাঙ্গার আশঙ্কা করছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী? হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা এদেশে কখনও হবে না। তবে একাত্তরের মতো আরেকটি মুক্তিযুদ্ধের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যদি সেই 'দাঙ্গা'র সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন হন তাহলে তাঁকে বলব— এখনই বন্ধ করুন সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞ। অবিলম্বে গ্রেফতার করুন সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের। সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতনকে 'একটি দলের সাজানো নাটক' বলে আ□ান্ত, বিপন্ন মানুষকে উপহাস করবেন না। গতকাল বরিশালে পবিত্র সরকারের ক্লাস এইটে পড়া কিশোরী মেয়ে, তার স্ত্রী ও ভগ্নীকে যে দুর্বৃত্তরা পালা□মে ধর্ষণ করেছে তারা বিএনপির কর্মী, যাদের তিনজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি বলবেন এটাও আওয়ামী লীগ কিংবা পুলিশ আর পত্রিকাওয়ালাদের সাজানো নাটক?

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ান, দ্রুত বিপন্ন নির্যাতিত মানুষের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিন। আগে তাদের নিরাপদে ঘরে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন, তারপর বলুন 'সাড়ম্বরে' দুর্গাপূজা করার কথা।

এই সব হামলা যদি কোন নীলনকশার অন্তর্গত না হয় তাহলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জবাব দিতে হবে ক্ষমতা গ্রহণের সাতদিন পরও কেন ঘরছাড়া দুর্গত মানুষ ঘরে ফিরে যেতে পারছে না। মন্ত্রী বলছেন '৮০ ভাগ খবর ভিত্তিহীন,' আর আমাদের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে প্রকৃত নির্যাতনের ৫০ ভাগ খবরও পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে না। বহু ক্ষেত্রে আক্রান্তরা পুলিশ বা সাংবাদিক কাউকে নির্যাতনের কথা বলতে চান না, কারণ তারা 'দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক' হয়েও এ দেশে থাকতে চান।

মন্ত্রীদের সংবাদ সম্মেলনে পুলিশের আইজিও উপস্থিত ছিলেন। 'দৈনিক সংবাদ'-এর খবরে দেখলাম সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, 'ভারতে সংখ্যালঘুদের পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তার কাছে কোন তথ্য নেই।' অথচ এর আগে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে সীমান্ত অতিক্রম করার সময় কতগুলো হিন্দু পরিবার বিডিআর-এর হাতে ধরা পড়েছে যাদের আবার দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এই প্রতিবেদনের প্রথমেই বিএনপি সমর্থক দৈনিক যুগান্তরের খবর উদ্ধৃত করেছি, যেখানে বলা হয়েছে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের কথা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতো পুলিশের আইজিও কি মনে করেন যারা সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের কারণে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয় তারা সংবাদ সম্মেলন করে আইজিপিকে জানিয়ে দেশত্যাগ করবে?

সরকার ও প্রশাসনের নীতিনির্ধারক ও কর্মকর্তাদের আবারও বলি, অন্ধ হওয়ার ভান করবেন না। অন্ধ হলেও প্রলয় বন্ধ থাকে না।

ভোরের কাগজ, ১৬.১০.২০০১

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কথা নয় কাজই চাই

মতিউর রহমান

সদ্য গঠিত বিএনপি সরকারের নতুন-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলহাজ্ব আলতাফ হোসেন চৌধুরী নিজ দপ্তরে বসার আগেই (গত শুক্রবার) বিবিসিকে এক সাক্ষাৎকার দিয়ে বেশ আলোচিত হয়ে গেছেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর যেসব হামলা সন্ত্রাস চলছে সে সম্পর্কে তিনি বিবিসিকে বলেছেন, এসব 'কিছুটা ষড়যন্ত্রমূলক' 'কিছুটা গুজব' কিছুটা সত্যও আছে'। যেটুকু সত্য তাকেও তিনি দুভাগ করেছেন। একটি হতে পারে ব্যক্তি আক্রোশ, অপরটি রাজনৈতিক। তবে তিনি এ সবকিছু দমনে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর 'কঠোর নির্দেশের' ফলাফল কি হচ্ছে জানতে আমাদের হয়তো আরো দু-একদিন অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু গতকাল পর্যন্ত বিভিন্ন স্থান থেকে আমরা যে খবর পাচ্ছি তা কিছুতেই শুভ নয়। আমাদের সকলের জন্যই যে সব ঘটনা খুবই দুঃখজনক। দেশের নানা অঞ্চলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা নির্যাতনের লোমহর্ষক সব ঘটনার খবর পাচ্ছি। মন্দিরে আক্রমণ, পূজামণ্ডপ ভেঙ্গে দেওয়ার বেশ কিছু তথ্যও আসছে। অনেক জায়গায় সংখ্যালঘুরা তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। দেশত্যাগ করে চলে যাওয়ারও কিছু খবর পাওয়া যাচ্ছে। শুধু হিন্দু সম্প্রদায় নয়, কোনো কোনো স্থানে খ্রিস্টান এবং আদিবাসীদের

ওপরও নিপীড়নের খবর এসেছে। শুধু পত্রিকার খবর নয়, দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আমাদের বন্ধুরাও টেলিফোন করে আর্তকণ্ঠে, ব্যথিত হৃদয়ে আমাদের বলছেন তাদের ওপর নির্যাতনের কথা, অমানবিক আচরণের কথা।

আমার বহুদিনের অনেক দুঃখকষ্টের বয়োজেষ্ঠ সাথী অজয় দা প্রায় প্রতিদিন সকালে ব্যথাতুর কণ্ঠে ফোনে বলেন, মতি, পঞ্চাশ বছর পরও একই রকম ঘটনাই ঘটবে? এই সেদিন আমাদের অতি শ্রদ্ধেয় চিত্রা বৌদি যেভাবে দুঃখ ক্ষোভ মিশানো কণ্ঠে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের নানা কথা বললেন, তাতে আমি লজ্জিত হয়েছি, বিপন্ন বোধ করেছি। আমার কর্মস্থলের বহুদিনের সাথী প্রণব সাহা আর মলয় বিশ্বাসের দুচোখে থাকে বেদনার ছায়া, অসহায়ভাবে বলে গ্রামের কথা, বিপন্ন আত্মীয়ের কথা। বড় কষ্ট নিয়ে শুনি আমাদের সহকর্মী পবিত্র কুণ্ডের মা বাবাকে হুমকি দিয়ে গেছে।

আমার বন্ধুর বাড়িতে হামলা, বৌদির দুঃখের কথা আর আমাদের অফিস কর্মী বাবুল দেউরির বাড়ি লুট আর তার বাবা মায়ের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে আমরা অস্বীকার করতে পারব না। আমরা সংখ্যালঘুদের ওপর সকল হামলা নির্যাতনের সব ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। আমরা দাবি জানাই এখনই, দ্রুত, সংখ্যালঘুদের ওপর সকল হামলা-নির্যাতন বন্ধ করা হোক। এ সব কিছুর জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক দ্রুত।

দেশের নানা স্থানে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে যে হামলা, যে সন্ত্রাস চলেছে সে সম্পর্কে বিএনপি নেতৃত্বের মধ্যে বেশ উদ্বেগ লক্ষ করা যায়। আমরা পত্রিকায় দেখছি, বিএনপি নেতা, সাইফুর রহমান, আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য বারবার প্রশাসনকে বলছেন। অন্যান্য অনেক মন্ত্রী বা সাংসদরাও নিশ্চয়ই কিছু করছেন। অন্যদিকে আবার এ রকম প্রচারণাও দেখছি যে, এ সব কিছুই ষড়যন্ত্র-নতুন সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত করার পরিকল্পিত প্রচেষ্টা। একটি দৈনিকে আমরা দেখলাম, বিএনপির পক্ষ থেকে এ সব কিছুকেই একাধিক কারণ দেখিয়ে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এবং আওয়ামী লীগের ষড়যন্ত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সেই একই কথা, একই সুর যা আমরা শুনে আসছি সব সরকারের আমলেই। আমরা বলব, যেকোনো ঘটনার শুরুতেই গুজব বা ষড়যন্ত্র না খুঁজে সত্যের মুখোমুখি হোন, নিজেদের দোষ অপরের ওপর চাপিয়ে দেবেন না। তাতে শুধু ক্ষতিই বাড়বে।

দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর যে হামলা আর নির্যাতন চলছে, জোর করে চাঁদা আদায়, দোকান-ঘরবাড়ি ঘর দখল এসবের পেছনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত রেষারেষি বা আক্রোশ অথবা সম্পত্তি দখলের উদ্দেশ্য থাকতে পারে। এ সব কিছুর পেছনে সমাজবিরোধী সন্ত্রাসীরা থাকতে পারে নিশ্চই। কিন্তু অনেক জায়গায় যেভাবে ঘটনাগুলো ঘটছে তাতে দেখা যায়, তাদের ওপর রাজনৈতিক প্রতিশোধস্পৃহা পুরণ করা হচ্ছে। বহু ক্ষেত্রেই স্থানীয় পর্যায়ের বিএনপি বা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা এসব কিছুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছেন। আসলে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই এ ঘটনাগুলো ঘটছে। শুধু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নয় আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা কর্মীদের ওপরও হামলা-নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে।

আমরা লক্ষ্য করেছি নির্বাচনের পরপর যখন নানা ধরনের হামলা আর নির্যাতনের ঘটনা ঘটতে শুরু করেছিল তখন পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদের সঙ্গে যৌথ বৈঠকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সকল সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, ক্ষমতার পালাবদলের সময়ে পুলিশ আর প্রশাসন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে আর সংখ্যালঘু নির্যাতনসহ নানা ঘটনায় রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা থাকায় পুলিশ বা অন্যরা কিছু করছে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এ সব কিছুর বিরুদ্ধে দৃঢ় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের কর্তাব্যক্তিরা বলেছিলেন,

নির্বাচনে বিজয়ী দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে এ মুহূর্তে ব্যবস্থা নেওয়া হলে সরকার গঠনের পর তাদের রোষানলে পড়তে হবে। তাদের ফল ভোগ করতে হবে। এটা পরিস্কার যে তারা বিএনপি নেতা-কর্মীদের কথা মনে করেই এ কথাগুলো বলেছিলেন।

অন্যদিকে সরকার গঠনের আগে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি বলেছিলেন, এসব ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের।

এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার নেই। বিএনপি সরকার দায়িত্ব নিয়েছে ১০ অক্টোবর থেকে। কিন্তু সরকার এখনো পুরোপুরি কাজ শুরু করেনি। তারপরও বলব, দেশজুড়ে যেহেতু সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন অব্যাহত আছে, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে হামলা চলছে, এ সব কিছুই বন্ধ করতে হবে দ্রুত। একাধিক জায়গা থেকে আমরা এখন খবর পাচ্ছি, পুলিশ এখন কিছুটা সক্রিয় হয়েছে। সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার শুরুতেই বেগম খালেদা জিয়ার সরকারকে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। কারণ সন্ত্রাস নির্মূল করব-এটাই ছিল বিএনপির প্রধান নির্বাচনী প্রচারণা। এখন সরকার গঠন করে যেকোনো সন্ত্রাসকে শুধু ‘গুজব’, ‘ষড়যন্ত্র’ বলে দায়িত্ব শেষ করা যায় না। কোন ঘটনার পেছনে অতিরঞ্জন, অসত্য বা চক্রান্ত থাকলে সেটাকে প্রমাণ করতে হবে এবং তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। সত্য কি সেটাও দেশবাসীকে বলতে হবে। এখন আর শুধু কথায় কাজ হবে না।

এখানে আওয়ামী লীগের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দেয়। এ কথা তো সত্য যে, সংখ্যালঘুরা প্রধানত আওয়ামী লীগকেই ভোট দেয়। সেটা তাদের সিদ্ধান্ত। সেজন্যই বিএনপির স্থানীয় কর্মী সমর্থকরা অনেকে নানা উদ্দেশ্যে তাদের ওপর হামলা পরিচালনা করছে। কিন্তু তাদের দুঃসময়ে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা কোথায়? তারা কেন দুর্গতদের পাশে যাচ্ছেন না? অতীতে আমরা দেখেছি রাজনৈতিক কর্মী, সংস্কৃতিসেবী আর ছাত্ররা দল বেঁধে দুর্গত সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়িয়েছি।

নির্বাচনের পরপর সংখ্যালঘু বা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে হামলা নির্যাতনের পাশাপাশি আমরা লক্ষ করছি বিএনপি সমর্থক বা ছাত্রদলের নেতা কর্মীরা দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতালসহ অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর ছাত্রাবাস দখল করে তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো হলে ছাত্রদলের একাধিক গ্রুপের মধ্যে অস্ত্রের মহড়াও চলেছে, গোলাগুলিও হয়েছে। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা হাসপাতালের নানা কার্যক্রম তাদের দৌরাত্ম্য প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কোথাও ছাত্রশিবিরও এ কাজটি করছে। পরিবহন খাতে বাস টার্মিনালেও এ রকম হচ্ছে। এসব কিছু বিএনপি নেতৃত্বের অজানা থাকার কথা নয়। তারপরও কেন কোনো কিছু করা হচ্ছে না? নাকি এসব কিছুর পেছনেও ‘ষড়যন্ত্র’ কাজ করছে? বেগম খালেদা জিয়া বা নেতারা বলেন এক কথা আর কাজ হয় অন্যটা। আসলে বিগত দুসপ্তাহে এটা দেখা যাচ্ছে যে, বিএনপি বা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা নেতৃত্বের কথা শুনছেন না। আর শুরুতেই এসব বন্ধ না হলে তো আর হবে না।

সেজন্য ইতিমধ্যে সন্ত্রাস নির্মূলে বেগম জিয়া এবং বিএনপি নেতৃত্বের ঘোষণা শুরুতেই বেশ কিছুটা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। আর কিছুদিন এ রকম চললে অবিশ্বাস ও সন্দেহই বড় হয়ে দেখা দেবে। সন্ত্রাস নির্মূলে নেতৃত্বের কথাই হয়ে পড়বে অর্থহীন।

সেজন্য এ রকম পরিস্থিতিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) আলতাফ হোসেন চৌধুরী যখন একটি দৈনিকে বলেন, নির্ভীক সেনানীর মতো সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়ব, তখন কেন জানি তেমন উৎসাহী হতে পারলাম না। তিনি যখন আরো বলেন, নাসিমের মতো মাটির নিচ থেকে সন্ত্রাসী বের করে আনতে পারবেন না, কিন্তু মাটির ওপরের সন্ত্রাসীদের কোনো রেহাই নেই, তখন আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলব, বেশি কষ্ট করতে হবে না জিয়া হলে ছাত্রদলের যেসব

ছাত্র-অছাত্র সন্ত্রাসী অস্ত্র জমা করেছে তাদের ধরুন। বোঝা যাবে আপনার ক্ষমতা। যদি পারেন তাহলে দেশবাসী সাবাস বলবে। যদি না পারেন?

মানুষ এখন আর কারো কথায় আশ্বস্ত হবে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথাতেও নয়। মানুষ আর কথা শুনতে চায় না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলব, আপনি তপ্ত চেয়ারে বসেছেন, কথা বেশি নয় কাজ দেখতে চায় মানুষ।

প্রথম আলো, ১৫ অক্টোবর ২০০১

ধর্ষিত বালিকার চোখে চোখ রেখে কী বলবে বাংলাদেশ

মফিদুল হক

ধর্ষিত বালিকা তুমি, চোখ ফেরাও শরতের নীল আকাশের দিকে, দ্যাখো উজ্জ্বল রোদেলাত হয়ে কাশবনে জেগেছে কেমন মৃদুমন্দ দোলন। সুকন্যা আমার, তুমি তো এখনো ভোটাধিকার প্রাপ্ত হওনি, নেহায়েতই কিশোরী বয়সে মগ্ন ছিলে পাঠে, দুই বেণী দুলিয়ে তুমি যখন চলো বিদ্যালয়ের পথে, বুকে আঁকড়ে থাকো বইপত্রের বোঝা, তখন এর চেয়ে পবিত্র ছবি আর কী থাকতে পারে ত্রিভুবনে। কিন্তু এই দৃশ্যের বিপরীতে আছে আরো এক মহান দৃশ্য, জাতির আরো এক পূত কর্ম। ভোটাধিকারের বয়সের অনেক নিচে পড়ে থাকা অবোধ বালিকা, তুমি বুঝবে না আমাদের ভোটের রাজনীতির সেই মহত্ত্ব, বুঝবে না কতোটা নৃশংসতা ও বর্বরতাকে সঙ্গী করে, পাশবিকতার প্রতি কতোটা নতজানু হয়ে আমরা গণতন্ত্র চর্চার মহান পথে এগিয়ে চলছি। তুমি শ্রবণ করো আমাদের সমাজ-অধিপতিদের বাক্য, সাফদিলে গ্রহণ করো তাদের সদুপদেশ, তবে কিছুটা হয়তো বুঝবে গণতন্ত্রের এই অগ্রযাত্রায়, তোমার অবস্থান ও অবদান কোথায় এবং আবার তুমি ফিরে যেতে পারবে তোমার সেই পুরনো জীবনে, যদিও দৃশ্যের সেই পবিত্রতা আর থাকবে না। কেননা তুমি তো ইতোমধ্যে অপবিত্র করে ফেলেছো নিজেকে, সে তোমারই জন্মগত পাপে, তোমরাই ধর্মদোষে এবং এর কারণ নিশ্চিতভাবে জানবে তুমি যে সংখ্যালঘু।

সৈয়দ বংশজাত আমাদের শ্রেষ্ঠতম আইন মানস বলেছেন, হিন্দুরা ভয় পায় কেন? বালিকা তুমি ভয় পেও না, যখন হিংস্র পশু হয়ে উঠবে চারপাশের মানুষেরা, তোমার গৃহে লাগাবে আগুন, অসহায় পিতা-মাতার সামনে থেকে টেনে তুলবে তোমাকে, ভুলভাবে ভোটদানের জন্য দিতে চাইবে যথোচিত রাজনৈতিক শিক্ষা আর এই মহান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সামনে প্রশাসন হয়ে থাকবে স্থবির, তখন হে অপাপবিদ্ধ বালিকা আমার, তুমি ভয় পেও না, নির্ভয়ে তুমি বরণ করে নাও জীবনের সমুদয় দুর্ভাগ্য। কেননা, তুমি জানবে, ভয় পেতে নিষেধ করেছেন বিজ্ঞ আইনজীবী, অপরিসীম শ্রদ্ধায় যাকে আমরা অধিষ্ঠিত করেছি কর্তৃত্বের আসনে। আমাদের সমাজ-অধিপতি আরেক পরহেজগার পুরুষ, নিরপেক্ষভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার উপদেষ্টা হিসেবে রাষ্ট্র ও নাগরিকের হেফাজতের দায়িত্ব যিনি মনপ্রাণ ঢেলে পালন করেছেন, কোনোরকম ব্যর্থতা কিংবা পক্ষপাতিত্বের গ্লানি যাকে স্পর্শ করতে পারেনি, তিনি বলেছেন যে, ট্রানজিশনের সময় এমন এক-আধটু হয়েই থাকে। এই বক্তব্যেও তুমি যদি অভয়মন্ত্র খুঁজে না পাও, তবে জানবে হে অবোধ বালিকা আমার, অতি সম্প্রতি আমরা পালন করে এসেছি আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু বর্ষ, জানবে আমাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তোমার মতো কন্যাশিশুদের মঙ্গলের কতোরকম ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি। আর কন্যাশিশুদের কল্যাণে দেশের আদিতম ও বৃহত্তম যে

এনজিও প্রতিষ্ঠান প্রাণপাত করে চলেছে, তার প্রধান নির্বাহী পদে তো তিনিই সমাসীন হলেন। সমস্ত নৈতিকতার চিহ্ন দু'পায়ে মাড়িয়ে, জনতার আস্থাভাজন সর্বোচ্চ রাষ্ট্রক্ষমতার দায়িত্বভাগী হয়েও কন্যাশিশুর ধর্ষিত শিশুতে রূপান্তরের প্রতি উদাসীন থেকে বিবেকের বিন্দুমাত্র দংশন যিনি অনুভব করলেন না এবং এভাবেই কাণ্ডারি হয়ে উঠলেন উন্নয়নের বৃহত্তম বেসরকারি উদ্যোগের। নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার যাত্রার প্রথম মুহূর্তে প্রশাসন তোলপাড় করে যে রাজনৈতিক বিতর্কের সূচনা করেছিলেন, প্রস্থানকালে দেশের ব্যাপকসংখ্যক অসহায় মানুষের ওপর ঘৃণ্যতম হামলার প্রতি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থেকে নিজ রাজনৈতিক বোধের সামাজিক উৎসটুকু প্রকাশ করলেন। একাধি□মে সংঘটিত এসব বর্বরতার মুখে কোনোই ব্যবস্থা নিলেন না সরকারের সর্বোচ্চ পদাসীন ব্যক্তিবর্গ। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও নাগরিকজনের নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থতার জন্য তিরস্কার করলেন না কোন জেলা প্রশাসককে, বদলি করলেন না কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে, যে বদলির জন্য তাদের পারঙ্গমতার কোনো সীমা ছিল না। এমনকি উপদ্রুত এলাকার কোনো এক স্থানে প্রতীকীভাবে হলেও বিডিআর টহল করিয়ে আইনের শাসনের অবক্ষয় রোধে তাদের আগ্রহ ও নাগরিক জীবনে দুর্গতি নেমে আসায় উৎকণ্ঠার প্রকাশ ঘটালেন না। মহিলা শিল্পোদ্যোগী হিসেবে সফল ও নন্দিত নারী রোকেয়া রহমান ভোটদানে নারীদের আগ্রহে উল-সিত হলেন বটে; কিন্তু ভোটের কারণে নারীদের নিগ্রহ বিষয়ে একটি বাক্যও উচ্চারণ করলেন না। এরাই আমাদের সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, উচ্চ শিক্ষিত সফল আধুনিক মানব-মানবী, টাইয়ের নট ঠিকভাবে বাঁধতে পারঙ্গম, বাংলার চেয়েও ভালো বলেন ইংরেজি, পানীয় মিশ্রণের বিভিন্ন হকিকত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী এবং ধর্মানুসরণে একইভাবে সিদ্ধ। এদের হাতেই সূচিত হলো বাংলাদেশের ইতিহাসের কলঙ্কময় অধ্যায়ের। বর্বরতার নিরন্তর প্রবাহে সৃষ্টিকর্তার আরশ কেঁপে ওঠার উপ□ম হলেও ক্ষমতার তখ্‌তে তার কোনো ছাপ পড়েনি।

দিনের পর দিন অব্যাহতভাবে চলছে যে বর্বরতা, সংবাদপত্রের খটমটে ভাষায় তা চিহ্নিত হয়েছে সংখ্যালঘু পীড়ন হিসেবে, যদিও 'সংখ্যালঘু' কথাটা প্রয়োগেই রয়েছে বিভ্রান্তি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধর্মবিচারে সংখ্যায় ভারি কিংবা লঘু বলে কিছু থাকতে পারে না। যদি দশ কোটি হিন্দুর বিপরীতে দেশে মাত্র একজন মুসলিমের বসবাস থাকতো তিনি সংখ্যালঘু হতেন না, নিছকই মুসলমান থাকতেন। সর্বাংশে মুসলমান এবং বৃহত্তম ধর্মগোষ্ঠী ও একক ধর্মানুসারীর অধিকারের কোনো ফারাক নাগরিক সমাজ করতে পারে না। এই ফারাক যারা তৈরি করেন মানসিক ও আদর্শগতভাবে তারা পথ করে দেন সাম্প্রদায়িক কলুষ বিস্তারের এবং সে কলুষতা থেকে জেগে ওঠে হিংসাশ্রয়ী রাজনীতি ও বিকৃত ধর্মচিন্তা আঘাত হানে বটে এক সম্প্রদায়কে তবে ক্ষতি করে দেয় গোটা সমাজের।

তথাকথিত সংখ্যালঘুর ওপর পীড়ন দ্বারা সৃষ্ট কলঙ্ক গ্রাস করছে সমাজমানসকে। নইলে কিভাবে আধুনিক ও সফল এক পত্রিকায় কামনা করা হয় মুসলিম-প্রধান মধ্যবর্তী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি যেন থাকে অক্ষুণ্ন। মনে পড়ে, যৌবনে আমরা দেখেছিলাম 'টু ওমেন' ছায়াছবি। ধর্ষিত মায়ের ভূমিকায় সোফিয়া লরেনের অনবদ্য অভিনয় রক্ত হিম করে দিয়েছিল যখন দুর্ভাগা এই মা ধর্ষিত কন্যার মুখোমুখি হলো এবং বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করলো জীবনের বর্বর দংশনে পীড়িত বালিকা আর বালিকা নেই, হয়ে উঠেছে নারী। ধর্ষিতা বালিকা, এবার থেকে তুমি জানবে আমরা মধ্যবর্তী মুসলিম-প্রধান দেশ, মধ্যবর্তী আচরণের প্রকাশ হিসেবে তুমি ধর্ষিতা হয়েছো বটে, তবে তোমার মাকে আমরা ধর্ষণের হাত থেকে রেহাই দিয়েছি। যদিও আমি জানি না কাকে বলে মুসলিম-প্রধান মধ্যবর্তী, মুসলিম-প্রধান সভ্য দেশের মাপকাঠির কতোটা কাছে বা দূরে এর অবস্থান, জানি না একবিংশ শতকে কোনো রাষ্ট্রে

নাগরিকের অধিকার ও অবস্থান বিচারে ধর্মপ্রাধান্য উলি-খিত হতে পারে কি না, তবু এই সুনাম আমরা ক্ষুণ্ন হতে দেবো না। কারণ আমরা যে আধুনিক, আমরা যে সফল। বালিকা ধর্ষণের এ পাপ তোমার, এ পাপ আমার।

সংবাদ, ১৬ অক্টোবর ২০০১

'পতন দেয়ালের প্রথম ইট'
মুনীরুজ্জামান

ভদ্রলোক খুব ক্ষিপ্ত হয়েই টেলিফোন করেছিলেন। ফোন ধরতেই প্রথম যে কথাটি বললেন সেটি হলো, 'এখন লেখেন না কেন?' জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কি লিখি না কেন?' বললেন, আওয়ামী লীগের সময় লিখেছেন জয়নাল হাজারীর বিরুদ্ধে, শামীম ওসমানের বিরুদ্ধে, মায়া-পুত্র দীপু চৌধুরীর বিরুদ্ধে, লক্ষ্মীপুরের তাহেরের বিরুদ্ধে। এখন কেন লিখছেন না খালেদা জিয়ার সোনার ছেলেদের সোনার কীর্তির কথা? কেন লিখছেন না অসহায় এবং নিরস্ত্র সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে শহীদ জিয়ার সৈনিকদের সশস্ত্র বিপ-বের কথা? আওয়ামী দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে লিখেছেন, বিএনপি ক্যাডারদের দখল সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আপনার কলম চলছে না কেন? ভয় পেয়েছেন? না অন্যদিকে সুবিধা পাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে? দু'একটা কথা বলতে গিয়েছিলাম ভদ্রলোকের অভিযোগের ফাঁকে, কিন্তু তিনি শুনলেন না, বলতেই থাকলেন, 'দেখেন আওয়ামী লীগ করি না, আওয়ামী লীগের সদস্য বা কর্মীও নই; কিন্তু এই আপনাদের মতো কলামিস্টরাই খবরের কাগজে লিখেছিলেন, ফেনী আর নারায়ণগঞ্জের গডফাদারদের হাত থেকে রক্ষার জন্য সেখানে 'দোয়া ইউনুস' পড়ে যেতে হয়। নির্বাচন হয়েছে পনের দিনও হয়নি, এখন সারাদেশেই যে দোয়া ইউনুসের দরকার পড়ে গেছে-কই এ কথা তো সাহস করে লিখতে পারছেন না?

ভদ্রলোক এরপর তার (সরকারি) অফিসের গত কয়েকদিনের ঘটনা বললেন। নির্বাচন হয়েছে দুই দিনও হয়নি, তারপর থেকে প্রতিদিনই কয়েকটি তরুণ গ্রুপে গ্রুপে তাদের অফিসে আসছে। অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পর্কে একে জিজ্ঞাসা করে, ওকে জিজ্ঞাসা করে। কে নৌকা, কে ধানের শীষ খোঁজ-খবর নেয়। একদিন অফিসে ঢুকে দুই/তিনজনকে হুমকি দিয়ে গেলো, কাল থেকে অফিসে আসতে পারবে না। আসতে হলে (তাদের) চাঁদা দিয়ে রফা করে আসতে হবে। সারা অফিসে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়ে গেছে। ওই ছেলেগুলো কারা, সাহস করে এ কথাটাও কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে না। আতঙ্কে সবাই ধরেই নিয়েছে- ওরা বিএনপির ক্যাডার। বিএনপি ক্ষমতায় এসেছে, এখন ওই দলের ক্যাডারদেরকে চাঁদা দিয়ে সরকারি চাকরি করতে হবে। ভদ্রলোক মনে করেন, আওয়ামী লীগ আমলেও চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস হয়েছে, কিন্তু ক্যাডারদের চাঁদা দিয়ে সরকারি চাকরি করার মতো অবস্থা কখনো হয়নি। তার শেষ প্রশ্ন ছিলো, 'নির্বাচনের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই দখল-সন্ত্রাস, আওয়ামী লীগ কর্মী-সমর্থকদের মারপিট, হত্যা, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া, হাত-পা কাটা, আঙুল কাটা থেকে শুরু করে সংখ্যালঘুদের ওপর যেভাবে নির্মম নির্যাতন করা হয়েছে তাতে কি আপনি মনে করেন না আওয়ামী লীগ পাঁচ বছরে যে সন্ত্রাস করেছে বিএনপি-জামায়াত চ□ের ক্যাডাররা পাঁচ মাসের মধ্যে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজির সেই কোর্স পূরণ করে ফেলবে? আপনি কি মনে করেন না পাঁচ বছরের মেয়াদের বাজি চার বছর সাত মাস এই দেশকে 'দোয়া ইউনুস' পড়তে পড়তে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজির-বোনাস

পিরিয়ডের মধ্যে কাটাতে হবে?' বলার চেষ্টা করেছিলাম লক্ষণ তো সে রকমই দেখা যাচ্ছে। ইংরেজিতে যে কথা রয়েছে 'মর্নিং শোজ দ্য ডে' তার সামান্যও যদি সত্যি হয় তবে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, সরকারের শপথ নেয়ার আগ থেকেই বিএনপির ক্যাডাররা সন্ত্রাস-চাঁদবাজির যে নমুনা দেখাচ্ছে তাতে সন্ত্রাসের বোনাস পিরিয়ডের মধ্যেই আমাদের বসবাস করতে হবে।

অষ্টম জাতীয় সংসদের নির্বাচন হলো ১ অক্টোবর। পত্রিকার হিসাব থেকে দেখা যায়, নির্বাচন হওয়ার পর প্রথম ১০ দিনে সারাদেশে ১ হাজারেরও বেশি সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে। নিকট অতীতের দিকে যদি দেখি তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলের ১৫ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আড়াই মাসে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে ১ হাজার ৫০; অর্থাৎ আওয়ামী লীগ ক্ষমতা ছাড়ার পর ৭৫ দিনে যে সন্ত্রাস হয়েছে বিএনপি নির্বাচনে জয়লাভের পর ১০ দিনেই সেই সন্ত্রাস হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা অতীতের সকল সন্ত্রাস রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। সুতরাং এই রেটে চলতে থাকলে আওয়ামী লীগের পাঁচ বছরের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, রাজনৈতিক সহিংসতার রেকর্ড বিএনপি-জামায়াত জোট যে পাঁচ মাসেই সাফল্যজনকভাবে অতি□ম করতে সক্ষম হবে সে ব্যাপারে সন্দেহ করি কি করে?

নতুন সরকারের মেয়াদ শুরু হয় সংসদ সদস্য এবং মন্ত্রিপরিষদের শপথ গ্রহণের মধ্যদিয়ে। সরকার গঠন না করেই খালেদা জিয়ার সরকারের মেয়াদ শুরু হলো বহুমাত্রিক সন্ত্রাসের মধ্যদিয়ে। বিএনপি সন্ত্রাসের মাত্রা চারটি- এক. সারাদেশের সংখ্যালঘুদের নির্বিচারে নির্যাতন করা, দুই. সারা দেশের আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের নির্যাতন করা, তিন. সারাদেশে দখল-সন্ত্রাস এবং চার. আবার মন্ত্রীপুত্র ও সাংবাদিক পেটানো। শপথ নেয়ার পর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, 'সন্ত্রাস নির্মূল হবে প্রথম কাজ।' এই যদি সন্ত্রাস নির্মূলের নমুনা হয় তবে বলার কিছু নেই। শুধু বলতে হয়, 'দেখতে রাহো আগে আগে হোতা হ্যায় ক্যায়া!

সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে সন্দেহ নেই। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হতে যা দেরি, যেন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়েই ছিলো বিএনপি-জামায়াত চ□ের ক্যাডাররা। দেশব্যাপী শুরু হয়ে গেলো সংখ্যালঘু নির্যাতনের মহা উৎসব। মারপিট, দোকান ও বাড়িঘরে হামলা, ভাঙচুর, আগুন লাগানো, লুটপাট এবং নারী ধর্ষণের মতো বর্বর নির্যাতন সারাদেশেই শুরু হয়ে গেল এক সঙ্গে। এটা যে কেন্দ্রীয়ভাবে প-্যান করে কেন্দ্রীয় নির্দেশেই শুরু হয়েছে সেটা ঘটনা দেখে মনে হয়। সংখ্যালঘুদেরকে পিটিয়ে ঘরবাড়ি ছাড়া করা হলো কোটালীপাড়ায়, রামশীলে হাজার হাজার নিরাশ্রয় সংখ্যালঘু মানুষ গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। কার ভরসায়? একমাত্র খোলা আকাশের ভরসায়। সংখ্যালঘুদের ওপর হামলাকে বলা যায়, প্রতিশোধের হামলা। বিএনপিসহ চারদলীয় জোটের নেতা-কর্মীরা বিশ্বাস করে, সংখ্যালঘু মানেই আওয়ামী লীগের ভোটব্যাংক। এবার তাই নির্বাচনে বিজয়ের ঝালটা সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন করে মেটাতে চেয়েছে বিএনপি। উদ্দেশ্য একটাই-একটা মেসেজ পৌঁছে দিতে চেয়েছে বিএনপি; মেসেজটা হচ্ছে- এই 'দেশটা শুধু মুসলমানদের দেশ। এখানে সংখ্যালঘুদের স্থান নেই। তাদেরকে চলে যেতে হবে।' এই চলে যাওয়ার 'নির্দেশ'ই দেয়া হলো নির্বাচন উত্তর আতঙ্ক সৃষ্টির মধ্যদিয়ে। সংখ্যালঘুরা এ দেশে সবসময়ই নির্যাতিত। নির্বাচন এলেই তারা জিম্মি হয়ে যায়; কিন্তু এবার যেটা হলো সেই নির্যাতন আর বর্বরতা সর্বশেষ হয়েছিলো ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়। যখন বিনা প্রশ্নে, বিনা জিজ্ঞাসায় শুধু ধর্মীয় পরিচয়ের কারণেই পাকিস্তানি সেনারা সংখ্যালঘুদের ওপর গণহত্যাসহ বর্বর নির্যাতন করেছে। পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে বিএনপি ক্যাডারদের তফাৎ শুধু এটুকুই যে, তারা গণহত্যাটা করেনি। অন্য সব ধরনের

নির্যাতনের 'হুকুমতে পাকিস্তান-এর জওয়ানদের' সঙ্গে বিএনপি ক্যাডারদের পার্থক্য কোথায় ভাষা ছাড়া? এ ঘটনা থেকে আমরা কি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবো যে, ১৯৭১ সালে এবং তার আগে 'এই দেশে পাকিস্তানিদের যে নীতি ছিলো সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে, বিএনপিও এই একই নীতি নিয়েই অগ্রসর হবে আগামী পাঁচ বছর। তাহলে প্রশ্ন করতে হয়, আমরা কি স্বাধীনতার পরবর্তী এই ৩০ বছরে, বিশেষ করে ১৯৯১ সালে স্বৈরাচার পতনের পর গণতন্ত্রের যে নবযাত্রা শুরু হলো সেই যাত্রায় ভুতের মতো পেছনমুখী পা দিয়ে সামনের দিকে চলেছি? বিএনপির রাজনীতিতে কি কার্যকরভাবে পাকিস্তানের রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটল? অথচ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শপথ নেয়ার পর বলেছেন- 'সন্ত্রাস নির্মূল হবে প্রথম কাজ'। সন্ত্রাস নির্মূল করার বিএনপি স্টাইলটা বোধহয় সন্ত্রাস করেই বাস্তবায়িত হয়।

নির্বাচন-উত্তর সন্ত্রাস করার ব্যাপারে বিএনপি যে প্রশ্নাতীত দক্ষতা অর্জন করেছে সেটা প্রমাণিত হলো সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার পাশাপাশি আওয়ামী লীগের ওপর সমন্বিত ও সুপরিকল্পিত হামলার মধ্যদিয়ে। এ হামলায় আওয়ামী লীগের হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে এলাকা ছাড়তে হয়েছে। এ হামলা থেকে ৫০ বছরের বৃদ্ধাও রেহাই পাননি। লুটপাট হয়ে গেছে অনেকের বাড়ি। মুন্সিগঞ্জে আওয়ামী লীগ নেতার বাড়ি লুটপাটের পর 'বি□ি হবে' সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছে বিএনপির সন্ত্রাসীরা। কারো হাতের কবজি কেটেছে, কারো দশ আঙ্গুল কেটেছে। কারো হাত-পায়ের রগ কেটেছে। কারো মাথা ফাটিয়ে দেয়া হয়েছে। বাড়িঘর ভাঙচুর, লুটপাট করা তো বোনাস। অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে, যেন 'আওয়ামী লীগ করা' বা আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়াটা অপরাধ। এ অপরাধ যারা করেছে তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দেয়ার 'মহান কর্তব্য' বলে হাতে তুলে নিয়েছে বিএনপির ক্যাডাররা। সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার একটা পার্থক্য হচ্ছে, সংখ্যালঘুদেরকে হত্যা করা না হলেও সারাদেশে অনেক আওয়ামী লীগ কর্মী বা নেতাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে এবং লাশের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। আমি জানি বিএনপি সমর্থক যারা তারা বলবেন, 'এটা হচ্ছে পাঁচ বছরের আওয়ামী অত্যাচারের স্বাভাবিক প্র□িয়া।' ক্ষমতার পাঁচ বছরে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা বিএনপি নেতা-কর্মীদের ওপর যে অত্যাচার-নির্যাতন করেছে তারই ফলে আজ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের ওপর বিএনপি কর্মীরা 'স্বতঃস্ফূর্তভাবে' প্রতিশোধ নিচ্ছে। সংখ্যালঘু নির্যাতনের পক্ষে সাফাই গাওয়ার উদ্দেশ্যে আহূত সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির মহাসচিব এবং স্থানীয় সরকারমন্ত্রী বলেছেন, গত সরকারের আমলেই বিএনপি কর্মীদের ওপর নির্যাতন হয়েছে। অসংখ্য কর্মীকে হত্যা, পঙ্গু করা হয়েছে। সে কারণে বিএনপি কর্মীদের মনে ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক। এই 'স্বাভাবিক ক্ষোভ' প্রশমিত করার চেষ্টাও নাকি করেছেন বিএনপি নেতৃবৃন্দ, 'তা সত্ত্বেও কিছু কিছু জায়গায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হচ্ছে' বলে স্থানীয় সরকারমন্ত্রী উলে-খ করেছেন। ক্ষমতাসীন মন্ত্রী যখন বলেন, কিছু কিছু জায়গায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হচ্ছে তখন আমাদের বুঝতে হবে, সন্ত্রাস কর্মকাণ্ডের মাত্রাটা 'কিছু কিছু' নয়, ভয়ানক। আওয়ামী লীগ সন্ত্রাস করেছে বলে বিএনপিকেও প্রতিশোধ নেয়ার জন্য হাত-পা ভেঙে দিতে হবে, হাত-পায়ের রগ কেটে দিতে হবে- বাড়ি লুটপাট করে 'বি□ি হবে' সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিতে হবে- এটা কি সমর্থনযোগ্য? তাহলে আর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রায় বলা হচ্ছে কেন? রায়টা কি আসলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আরো বেশি সন্ত্রাস করার রায়? তাহলে বিএনপি ভিন্ন হলো কোথা থেকে, চাঁদাবাজকে সরিয়ে আরেক সন্ত্রাসীকে মসনদে বসানোর শিক্ষাটা নির্বাচনের পরদিন থেকেই দিতে শুরু করেছে বিএনপি।

বিএনপি জোটের বিপুল বিজয়ের পর যে দখল-সন্ত্রাস শুরু হয়ে গেল সারাদেশে সেটা দেখে একটা কথাই মনে হয়েছে, আওয়ামী লীগ শাসনের গত পাঁচ বছর বিএনপির সন্ত্রাসী

ক্যাডাররা একটা প-্যানই করেছে, নির্বাচনে আওয়ামী লীগ হেরে গেলে কিভাবে টার্মিনাল, ঘাট, ক্যাম্পাস, মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল, গণশৌচাগার, তালা ভেঙে এমটি হোস্টেল থেকে শুরু করে সর্বত্র জাতীয়তাবাদী দখলতন্ত্র কায়েম করা যায় এবং বাস্তবে যখন সত্যি সত্যিই আওয়ামী লীগ হেরে গেলো দখল সন্ত্রাসে মেতে উঠলো বিএনপির ক্যাডাররা। তবে এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগের চেয়ে বিএনপির গুণগত দক্ষতা প্রশ্নাতীত। শপথ নেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেনি ক্যাডাররা। প্রথম দিন থেকেই শুরু করে দিয়েছে। যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায়, যেন অভিযোগটা অস্বীকার করা যায়। যখনই পত্রপত্রিকায় শহীদ জিয়ার সৈনিকদের সুকীর্তির রিপোর্ট উঠেছে। তখনই বলা হয়েছে 'ওরা আমাদের কর্মী নয়'। আমরা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবো দখল-সন্ত্রাস আমরা তো এখনো সরকারই গঠন করিনি? বলা যায়, অত্যন্ত সুচতুরভাবে নির্বাচন এবং সরকার দখলিস্বত্ব কায়েমের ব্যাপারে কাজে লাগিয়েছে বিএনপি। এর জন্য তাদেরকে অভিনন্দন জানাতেই হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই ব্যাপক সংখ্যক সন্ত্রাসীকে নিয়ে বেগম খালেদা জিয়া জনগণের দেয়া সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রায়কে কার্যকর করবেন কিভাবে? হয়তো বিষে বিষক্ষয়ের মতোই সন্ত্রাস করিয়েই সন্ত্রাস নির্মূল করবেন। দুনিয়ার আর কোথাও সম্ভব না হলেও বাংলাদেশে নিশ্চয়ই সফল হবেন আমাদের নতুন প্রধানমন্ত্রী।

মন্ত্রীদের সোনার পুত্ররা আওয়ামী লীগকে ডুবিয়েছে, এ বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ নেই। 'সোনার পুত্র' যে বিএনপিতেও রয়েছে সেটা প্রমাণ করল কুষ্টিয়া থেকে নির্বাচিত এক প্রতিমন্ত্রীর পুত্র। বাপ প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে যা দেরি, সঙ্গী গুণ্ডাপাণ্ডাকে নিয়ে ঢাকা থেকে প্রকাশিত জাতীয় দৈনিকের সাংবাদিকের ভাইকে ধরে নিয়ে পেটাতে শুরু করে দিয়েছে প্রতিমন্ত্রীর সোনার ছেলে। মেহেরপুরের এক এমপির ভাইয়ের নেতৃত্বে আ□মণ করে পুলিশকে মারধর করেছে। এমপির ভাইকে এক সহযোগীসহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে এমপি হোস্টেল থেকে। সংবাদপত্রে রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর প্রতিমন্ত্রীর সোনার পুত্র বলেছে, তার সহযোগীরা ওই সাংবাদিকের ওপর নাখোশ, তাদের শান্ত হতে কয়েকদিন লাগবে এবং তার ভাষায়- 'আমার সহযোগীরা শান্ত না হওয়া পর্যন্ত ওই সাংবাদিক যেন বাড়ি না ফেরে।' তবে সাংবাদিক পেটানোর বিএনপির ক্যাডাররা যে আওয়ামী ক্যাডারদের চেয়ে কম ওস্তাদ নয়, সেটা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। প্রতিমন্ত্রীর এই সাবালক পুত্রটি কাজী আরেফ হত্যা মামলার আসামি। সাংবাদিক পেটানোর অভ্যাস এই সোনার ছেলেন বহু পুরনো। এবার বাবা প্রতিমন্ত্রী হওয়াতে অভ্যাসটা আবার ঝালাই করেছে মাত্র। কথায়-বার্তায় বুঝিয়ে দিয়েছে যে কুষ্টিয়ার ওই অঞ্চলটি তার পৈতৃক সম্পত্তি এবং এখানে তার কেশ স্পর্শ করার ক্ষমতা কারো নেই। 'সোনার ছেলেদের' এই ধরনের ঘটনা, বাপের রাজত্ব কায়েম এবং সন্ত্রাস আমরা আওয়ামী লীগ আমলেও দেখেছি। তাদের অনেককে গ্রেপ্তারও করেছিলো আওয়ামী লীগ সরকার। কিন্তু গ্রেপ্তারটা যে 'আইওয়াশ' ছিলো সেটা কিছুদিন পরই এলাকার জনগণ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলো। এমপির ভাইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, প্রতিমন্ত্রীর সোনার ছেলেকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। বাপের 'গদি' রক্ষার জন্য হয়তো শেষপর্যন্ত আত্মসমর্পণ করবেও; কিন্তু জামিনে বেরিয়ে কি করবে এই সোনার ছেলেরা, তার ওপর কি খালেদা জিয়ার নিয়ন্ত্রণ থাকবে? সন্ত্রাস আওয়ামী লীগ আমলেও হয়েছে, তবে শপথ নেয়ার আগে জাতীয়তাবাদী সন্ত্রাস সৃষ্টির রেকর্ডটা বিএনপির।

থাকবে যে না, সেটা বোজা যায় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য পড়ে। কোটালীপাড়া এবং রামশীল কোথাও না গিয়ে নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জাতিকে জ্ঞান দিলেন যে, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার যে সচিত্র রিপোর্ট পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে তার সবটাই বানোয়াট এবং অতিরঞ্জিত। আগৈলঝাড়ায় গিয়ে সংখ্যালঘুদের নিয়ে মিটিং করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করলেন- 'ঘটনা অতিরঞ্জিত করে রামশীল নাটক বানানো হয়েছে এবং রামশীলসহ যারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছে তারা বাবা হাজারীর সন্ত্রাসী। 'মানবতার প্রতি এর চেয়ে অমানবিকতা আর কি হতে পারে? সবকিছু যদি অতিরঞ্জিত হবে তবে বরিশাল শহরতলির বাজারচরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তিন মহিলাকে ধর্ষণের দায়ে বিএনপি ক্যাডার গ্রেপ্তার হয় কিভাবে? ওটাও কি নাটক। হাজার হাজার নির্যাতিত মানুষ যারা গৃহহারা, বাড়ি লুটপাট হয়েছে, ধর্ষিত হয়েছে যেসব নারী, কোথায় তাদেরকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করবেন স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী, অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে নির্যাতিত মানুষকে সাহস যোগাবেন; আস্থা ফিরিয়ে আনবেন নির্যাতিতের মনে। তা না করে তিনি সংখ্যালঘুদের দুর্দশাকে পুঁজি করে পলিটিক্স করলেন। কয়েকজন সংখ্যালঘুর সঙ্গে তথাকথিত সভা করে রায় দিয়ে দিলেন যে, পত্রিকায় খবর অতিরঞ্জিত বলতে গেলে কিছুই হয়নি। বাংলাদেশের কোন সংখ্যালঘু আছে যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ডিসি, এসপির সামনে দাঁড়িয়ে বলবে, তাদের ওপর বর্বর নির্যাতন হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও জানেন, এমন কেউ নেই। তার সামনে ভয়েই সকলে বলবেন যে 'স্যার কিছুই হয়নি।' কারণ এটাই সংখ্যালঘু হওয়ার সবচেয়ে বড় শাস্তি। ডিসি সাহেবরা রিপোর্ট পাঠিয়েছেন, কিছুই হয়নি। কোন ডিসি আছে যে বলবে, 'স্যার এখানে সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হচ্ছে।' বললে কি আর তার রক্ষা আছে। গায়ের জোরে বাস্তবকে অস্বীকার করা ক্ষমতাসীন সরকারের জন্মগত অভ্যাস। এমন ঘটনা অতীতে আমরা সব সরকারের আমলেই দেখেছি। কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা কেউ রক্ষা পায়নি। যে পথে যাত্রা শুরু করেছে খালেদা জিয়ার নতুন সরকার 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে' ঐতিহাসিক রায় পেয়ে সে পতনের পরিণতি আমরা '৯৬ এবং ২০০১ সালের নির্বাচনে দেখেছি। পতনের প্রথম ইটটা গাঁথা হয়ে গেছে জাতীয়তাবাদী সন্ত্রাস দিয়েই। এখন বিএনপিকেই ঠিক করতে হবে, পতনের দেয়ালটা তারা আরো পাকাপোক্ত করে তুলবে, না গাঁথুনিটাই উপড়ে ফেলবে।

সংবাদ, ১৭ অক্টোবর ২০০১

অভিমত
প্রসঙ্গ ঃ সংখ্যালঘু নির্যাতন এই বর্বরতার শেষ কোথায়
দেবব্রত চক্রবর্তী বিষ্ণু

কোনো উত্তাপ না ছড়িয়েই প্রশ্ন রাখলাম গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে শান্তিপ্রিয় নাগরিকের ওপর নির্যাতনের শেষ কোথায়? অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনোত্তর এই প্রশ্নটি পুনর্বার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে আমাদের সামনে। আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে সংখ্যালঘু মনে করি না। আমি দৃঢ়ভাবে দাবি করি এই স্বাধীন-সার্বভৌম গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের আমি একজন নাগরিক এবং আমি আমার মৌলিক অধিকারসমূহ থেকে কোনোভাবেই বঞ্চিত হতে রাজি নই।

এখন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনোত্তর দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রত্যক্ষভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন চলছে শুধু তাই নয়, প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের ওপরও শুরু হয়েছে নির্যাতন। নির্বাচনের অনেক আগে থেকে বিষয়টি দেশের জাতীয় পত্র-পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেলেও এর বিরুদ্ধে যাদের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা তাদের ব্যর্থতার দাগ এক্ষেত্রে খুব মোটা। নির্বাচনোত্তর এই পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আমি এই অনভিপ্রেত, অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাবলীর জন্য সুস্পষ্টভাবে প্রথমত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা

বিচারপতি লতিফুর রহমানকে অভিযুক্ত করছি। কারণ তার শাসনামলেই এই অত্যাচার শুরু হয় এবং রহস্যজনক নীরবতার কারণে তার বিস্তার ঘটে। যিনি এতোদিন বিচারকের আসনে বসে বিচার কাজ সম্পাদন করেছেন আজ তিনি আসামির কাঠগড়ায়। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে শপথ নেওয়ার পর তিনি বহুবার দম্ভের সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন, সংখ্যালঘু ও মহিলাদের ভোটদানে বাধা দিলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রধান নির্বাচন কমিশনারও এই উচ্চারণ করেছেন বহুবার। উভয়ের উদ্যোগে এবং তত্ত্বাবধানে নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে সেলও গঠন করা হয়েছিল। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ক'জন সদস্যকে নিয়ে বিচারপতি লতিফুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত ঐ সেলকে (যারা এখন ক্ষমতার বাইরে) বিদ্যমান অবস্থার আলোকে প্রশ্ন করতে চাই। দেশজুড়ে যে অত্যাচার-নির্যাতন চলছিল সেসব কি আপনাদের কানে পৌঁছেনি? প্রতিদিনের পত্রপত্রিকায় ব্যাপকভাবে সেসব রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পরও কেন নীরব ছিলেন? আপনি এবং আপনার পরিষদবর্গ ক্ষমাহীন নীরবতা প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু কেন? নির্দলীয় সরকার তো কোনো রাজনৈতিক দলের কাছে দায়বদ্ধ ছিল না এবং সংবিধান সে অধিকারও দেয়নি। এই ঘটনা যাদের মাধ্যমেই ঘটুক তাদের চিহ্নিত করতে সরকার ও প্রশাসন যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এবং প্রায় সব ক্ষেত্রে রহস্যজনকভাবে উদাসীন থেকে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা থেকে অবশ্যই প্রশ্ন জাগে গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের বিড়ম্বনার শেষ কোথায়? প্রধান উপদেষ্টা স্থূল বা সূক্ষ্ম কারচুপি বোঝেন না। না বুঝুন, তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আমরা খুব সাধারণ মানুষ, এতোকিছু আমরাও বুঝতে পারি না। কিন্তু কথা হচ্ছে, দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের যেসব খবর আসছিল, পত্রপত্রিকায় সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছিল সেসব দেখেও কি আপনি বোঝেননি যে এগুলো কিসের আলামত? যদি তাও না বুঝে থাকেন বলতেই হয় আপনি পুরোপুরিই একজন ব্যর্থ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান ছিলেন। আর যদি বুঝে থাকেন, তবে কেন নীরব ছিলেন সে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দায় আপনার। নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজনীয়তা আছে তা আপনি খুব ভালো বোঝেন। অথচ প্রতিদিন প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলেপুড়ে ছারখার হচ্ছিল মানুষের জীবন-সম্পদ সেটি বুঝতে চাননি, আপনার বিবেক নাড়া দেয়নি, এ বড়ো আশ্চর্যজনক এবং বিস্ময়কর। নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পরও এই অপ্রক্রিয়া বন্ধ হয়নি।

কেউ কেউ আক্ষেপ করে ইতোমধ্যে বিভিন্ন পত্রিকায় কলাম লিখেছেন সংখ্যালঘুরা যাবে কোথায়। আমি এরও বিরোধিতা করি। যাওয়ার প্রশ্ন আসছে কেন? নিরাপত্তার সঙ্গে বাস্তুভিটায় বসবাস করার অধিকার দেশের প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে। সেই অধিকার নিশ্চিত না করে, সেই আন্দোলনকে বেগবান না করে ভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করা হচ্ছে। সম্প্রতি সংঘটিত কয়েকটি আক্রমণ-হামলার উদাহরণ তুলে ধরছি, যা ইতোমধ্যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

১. পিরোজপুরের উমেদপুর, দুর্গাপুর, টোনা, ডাকাতিয়া ও হুলারহাটে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের হাতে আহত হয়েছে ৩৩ জন।
২. বাগেরহাটে হামলা-নির্যাতনের শিকার বাস্তুচ্যুত সংখ্যালঘুদের জন্য লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে।
৩. রংপুরের পীরগাছা, হারাগাছা, কাউনিয়া, তারাগঞ্জ, বদরগঞ্জে ভোটদানে বাধাদান এবং হামলায় ২৫ জন আহত হয়েছে।
৪. ভোলার লালমোহন থানার লর্ডহার্ডিঞ্জ গ্রামে ৪/৫ জন মহিলাকে ধর্ষণ ও শত শত ঘরবাড়ি লুটপাট করা হয়েছে। ভয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন চরফ্যাশন থানায় আশ্রয় নিয়েছে। ৪ অক্টোবর ভোলার চরফ্যাশনের উমরাবাদে স্বপন দাসকে কুপিয়ে আহত করা হয়েছে।

৫. মুগরার শ্রীপুর ও মালিখা উপজেলায় নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় কৃষ্ণপদ সরকার ও শিখা রাণীসহ ১১ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক আহত হয়।
৬. যশোর সদর উপজেলার বিজয়নগর, অভয়নগর উপজেলার কেতাবপুর, আন্দা বেদভিটা ও কেশবপুর উপজেলা সদরসহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকায় হামলায় বহু পরিবার সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে।
৭. সিলেট শহরের শিববাড়ির পথ্যপাড়াতে ১৫টি সংখ্যালঘু পরিবারকে তালা দিয়ে আটকে রেখে ভোটদানে বাধা প্রদান করা হয়।
৮. নারায়ণগঞ্জের ফতুল-া থানার পঞ্চবটিতে প্রায় ১২৫টি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর বর্বরোচিত হামলা, দোকানপাট ভাঙচুর ও লুটপাটসহ দুই তরুণীকে লাঞ্ছিত করা হয়।
৯. কুমিল-ার চান্দিনা, দেবীদ্বার, মুরাদনগর ও বরুড়া থানার বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে।
১০. ঢাকার রায়েরবাজারের ঋষিপাড়ায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুবচনসহ প্রায় ২০ জনকে মারধর করে দেশত্যাগের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।
১১. পটুয়াখালী জেলার বাউফলে নির্মল দেবনাথ, কেশব ডাক্তার, কল্যাণ রায়সহ প্রায় ২০ জনকে মারধর করে দেশত্যাগের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। বাউফলের দাসপাড়ায় উপাসনালয় ভাঙচুর করা হয়েছে। অভিযোগ আছে তারা ভোট দিতে পারেনি।
১২. গাজীপুরের কালিয়াকৈরের বোয়ালী ইউনিয়নের রঘুনাথপুর, গোলায়া, সূত্রাপুর ইউনিয়নের সূত্রাপুর, বলিয়াদী, ভেঙ্গুরাজ গ্রামে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা হয়েছে এবং আহত ছয় জনকে গাজীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
১৩. বাগেরহাটে পুণ্যভূমি অপবিত্র করা হয়েছে, সংখ্যালঘুদের গ্রামে চলছে ধর্ষণ, লুট।
১৪. ডিসি-এসপিদের আশ্বাস সত্ত্বেও সংখ্যালঘুরা গ্রামে ফিরে যেতে পারছে না।
১৫. বন্ড নিয়ে এলাকা ছাড়া করা হয়েছে সংখ্যালঘুদের।

এ চিত্রই সব নয়। আরো বহু ঘটনা আছে, আছে বহু উপাখ্যান। প্রতিদিনই অসংখ্য ঘরবাড়ি পোড়ানোর খবর আসছে। পুরুষদের মারধর করা হচ্ছে, মেয়েদের করা হচ্ছে লাঞ্ছিত। ১৯৭৪ সালে এদেশের মানুষ যে লঙ্গরখানার সঙ্গে পরিচিতি হয়েছিল বিচারপতি লতিফুর রহমানের আমলে তার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যেসব অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলো এবং হাজার হাজার মানুষ হামলা-নির্যাতনের এখনো শিকার হচ্ছেন, লাঞ্ছিত হচ্ছেন তাদের পাশে সরকার দাঁড়ায়নি, এখনো দৃঢ়ভাবে দাঁড়াচ্ছে না। এই অপরাধের দাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান কিভাবে মুছবেন জানি না। রাজনৈতিক দলগুলোর, বিশেষ করে চারদলীয় জোটের রহস্যজনক নীরবতা বড়ো অদ্ভুত।

সবকিছু দেখে মনে হয় নির্বাচন একটি উপলক্ষ মাত্র। এই দলীয় মাস্তান ও সন্ত্রাসীদের উদ্দেশ্য ও ষড়যন্ত্র অনেক গভীরে প্রোথিত। নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে লাখ লাখ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল। তার মধ্যে বিদেশী ছিলেন অনেক। ঐ বিদেশীরা কি আমাদের জাতীয় চরিত্র ও সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো এতো বোঝেন? না, বোঝেন না। আমাদের স্বভাবসিদ্ধ ধুর্তমির তারা কতোটুকু জানেন বোঝেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার কি এই ঘটনাবলীকে উৎসব মনে করেছিলেন? এই লেখাটি যখন লিখছি তখনো দেশের কয়েকটি এলাকায় পরিচিতজনদের সঙ্গে ফোনে কথা বলে জ্ঞাত হয়েছি অপক্রিয়া চলছে। কষ্ট হয়, রাতে ঘুম হয় না। অসহায়ের ক্ষোভ নিয়ে আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না এই দেশে। আমি অতি নগণ্য একজন মানুষ। আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, আমি বিখ্যাত হতে চাই না। ঐ রাজনীতির কাছে কেন যাবো

যে রাজনীতি আমাকে আশ্রয় দেয় না, নিরাপত্তা দেয় না। জনগণ জাগ্রত হোক। মানুষ জাগুক। ভাইয়ের পাশে ভাই দাঁড়িয়ে দুর্বৃত্তকে নির্মূল করুক। সেই দুর্বৃত্তের নাম যা-ই হোক। জাতিভেদ নয়, বাঙালি জাগুক তার বাঙালিত্ব নিয়ে। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী দেশের কোনো নাগরিকের প্রতি ধর্মের কারণে বৈষম্যমূলক আচরণ করার কোনো সুযোগ নেই। অথচ এই কাজটিই এখন ঘটে চলছে দেশের বিভিন্ন স্থানে। দুই-তৃতীয়াংশ আসনে বিজয়ী জোট নীরব। তারা সরকার গঠন করে এ ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেও ফলাফল ইতিবাচক নয়। কেন? সবই বড়ো অদ্ভুত। অতীতে কখনো নির্বাচনোত্তর এমন অবস্থা পরিলক্ষিত হয়নি। জোট সরকার ও যেসব রাজনীতিবিদরা বলছেন নাম ভাঙিয়ে এসব করছে একটি অশুভচ□, তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, নাম ভাঙিয়ে যদি ওরা করছেই তবে প্রতিরোধ না গড়ে নীরবে আপনারা তা হজম করছেন কেন? এটি কি আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নয়? এই জঘন্য কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদের ভাষা জানা নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোন কারণে নীরব ছিলেন তার ব্যাখ্যা চাই। প্রত্যেকটি ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চাই। আমি এদেশের নাগরিক। স্বাধীনভাবে বসবাস করা, মতামত ব্যক্ত করা আমার জন্মগত অধিকার, আমার অধিকার যে হরণ করতে চায় আমি তার বিচার চাই। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান নয় মানুষ পরিচয়ে পরিচিত হতে চাই। যারা সংখ্যালঘু বলে আমাকে শ্রেণীভুক্ত করতে চায় তাদের আমি ধিক্কার দেই। আমি সংখ্যালঘু নই, আমি এদেশের নাগরিক এবং এটাই বড়ো পরিচয়। সংখ্যালঘু এই শব্দটির দ্বারা যাতে আর পরিচয় নির্ণয় করা না হয় সে দাবিও জানাই। আমরা বাঙালি, বাংলাদেশের মানুষ এই পরিচয়ই আমাদের বড়ো পরিচয়। এখানে কিসের সংখ্যালঘু, কিসের সংখ্যাগুরু? এদেশে সবারই সমান অধিকার। মনে রাখা প্রয়োজন, প্রতিবেশীর মৃত্যুযন্ত্রণা বা আর্ত চিৎকার আরেক মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি। স্বাধীনতার ৩০ বছর পর এ কোন চ□ান্ত শুরু হলো যা দুই-তৃতীয়াংশ আসনে বিজয়ী দল এবং সরকার রাজনৈতিকভাবে প্রতিহত করতে পারছে না। তাহলে কি বুঝতে হবে এই উদাসীনতা, এই নীরবতা এক ধরনের সম্মতি? সরকার নীরব, প্রশাসন নীরব, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ জোট সরকার কেন যথাযথ কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না শুধুমাত্র উচ্চারণ ছাড়া এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ব্যাখ্যা চাওয়ার অধিকার সংবিধানই দিয়েছে।

ভোরের কাগজ, ১৮ অক্টোবর ২০০১

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই আনন্দধারায়
রাজনৈতিক ভাষ্যকার

"Free elections give democracy a foothold, but true democracy means more than simply the rule of the majority. It means an irrevocable Commitment to democratic Principles. It means equal rights for minorities. And above all, it means the sanctity of even a single individual against the unjust power of the state. The will of the majority must never degenerate into the whim of majority. This fundamental Principle transcends all bordes."

President Geroge Bush.

2."Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; This right includes freedom to change his religion or belief and freedom either alone or in community with others and in public or private to manifest his religion or belief in teaching practice, worship and observance.

Universal Declaration of Human Rights Article 18.

১৯৯২-এর ৩১ জানুয়ারি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের যে প্রথম শীর্ষ সম্মেলনটি হয়, সেখানে এখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, বর্তমান প্রেসিডেন্টের বাবা জর্জ বুশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে নিরাপত্তা পরিষদে যে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন, সেই বক্তৃতা থেকেই উপরের প্রথম উদ্ধৃতিটি নেয়া হয়েছে।.ায়ুযুদ্ধের অবসান এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর তখন সুখ, সমৃদ্ধি, অগ্রগতির নতুন বিশ্ব সম্পর্কে আশাবাদী মানুষের প্রতিধ্বনিই করেছিলেন সিনিয়র জর্জ বুশ সেদিন। নির্বাচন, গণতন্ত্র, সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পর্কে তার এই কথাগুলো তখন বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের গণতন্ত্র, মানবাধিকার বঞ্চিত মানুষদের প্রচণ্ডভাবে আশাবাদী করে তুলেছিলো। তখন অনেক মানুষ ভেবেছিলো ৯০-এর দশকটি এবং নতুন মিলেনিয়ামটি হবে গণতন্ত্রের, পরিবেশ রক্ষার এবং মানবাধিকার চর্চার।

এসব আশা করার অনেক শক্ত যুক্তি এবং কারণ ছিলো। তার প্রথমটি ছিলো নিরাপত্তা পরিষদের এমন একটি শীর্ষ সম্মেলন জাতিসংঘের ইতিহাসে এই প্রথম হলো। ১৯৯২-এর জানুয়ারি মাসে নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি ছিলো যুক্তরাজ্য। তখন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জন মেজর এই একদিনের শীর্ষ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। আর যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের নামগুলো দেখুন-অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর (প্রধানমন্ত্রী) ড. ফ্রানজ ভ্রানিটস্কি, বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী উইলফ্রেড মার্টেনস, কেপভার্দের প্রধানমন্ত্রী ডা. কার্লোস আলবার্দো ওয়াহ্নন্ ডি কারভালহো ভেইগা, গণচীনের প্রধানমন্ত্রী লী পেং, ইকুয়েডরের প্রধানমন্ত্রী ড. রাড্রিগো বোর্জা-সিবালে-াস, ফ্রান্সের মিতেঁরা, হাঙ্গেরির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. গিজা জেসজেনস্কি, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও, জাপানের প্রধানমন্ত্রী কিচি মিয়াজাওয়া, মরক্কোর বাদশা হাসান, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ, ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট ড. কার্লোস আন্দ্রেজ-পেরেজ, জিম্বাবুইয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. নাথান সামুইয়ারিরা। আর ছিলেন জাতিসংঘের নতুন মহাসচিব ড. বুট্রোস ঘালি, মাত্র ৩০ দিন আগে তার পূর্বসুরি পেরেজ কুয়েলারের কাছ থেকে দায়িত্বভার নিয়েছেন।

নতুন পৃথিবীটা কেমন হওয়া উচিত তা নিয়েই জাতিসংঘের সবচাইতে শক্তিশালী অঙ্গ নিরাপত্তা পরিষদের- উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের, দুনিয়ার সব মানুষের-শীর্ষতম নেতারা সেদিন সকাল-সন্ধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত তাদের আনুষ্ঠানিক বক্তৃতায় এবং অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় দুনিয়ার আমজনতাকে এক নতুন বিশ্বের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। দিনব্যাপী তাদের এই আলোচনায় সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আর কি কি করা যায়, বিশ্বের এই শীর্ষ নেতৃবৃন্দের কাছে তাও গুরুত্ব পেয়েছিলো প্রত্যাশিতভাবেই। অভিজ্ঞতা থেকে তাদের প্রত্যেকেই দেখেছেন যে, অধিকার বঞ্চিত মানুষ তাদের ক্ষোভ প্রকাশের সুযোগ পেলেই তা প্রকাশ করবে বিভিন্ন ভাবে, কখনো শান্তিপূর্ণ উপায়ে যেমন সভা, সমিতি, মিছিল-মিটিংয়ের মাধ্যমে এবং তাতে কাজ না হলে সহিংস হয়ে। গত ৫৫ বছর ধরে ফিলিস্তিনীরা দু'ভাবেই তাদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সংগ্রাম করে চলেছে।

দুনিয়ার প্রতিটি দেশে সংখ্যালঘুদের বাস আছে। তারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু হতে পারে; হতে পারে ভাষাগত বা জাতিগত সংখ্যালঘু। এই সংখ্যালঘু বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে অধিকার বঞ্চিত হয়। ইউনিভার্সেল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস-এর আলোকে এমন সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা করার জন্য মানবাধিকার কমিশনের মধ্যে আছে, ২৬ সদস্য-বিশিষ্ট "Sub-commission on Prevention of Discrimination and protection of Minoritioes."

হিউম্যান রাইটস্ কমিশন এবং তার সাব-কমিশন অন মাইনরিটিজ জেনেভাতে প্রতিবছর নিয়মিত সভায় মিলিত হয়ে দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের এবং বিভিন্ন ধর্ম, জাতি, গোষ্ঠী, পেশা, লিঙ্গ এবং বয়সের মানুষদের বিশ্বস্বীকৃত অধিকারগুলোর লঙ্ঘন নিয়ে আলোচনা করে, লঙ্ঘনকারী দেশগুলোর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করে, মানবাধিকার বাস্তবায়নের লক্ষে বিভিন্ন সুপারিশ প্রস্তাবও গ্রহণ করে।

জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ এক কর্মকর্তা হলেন হিউম্যান রাইটস্ হাইকমিশনার। আমরা ইউএন হাইকমিশনার ফর রিফুজিস বালায় জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার পদবির সঙ্গে বেশি পরিচিত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের যে কোটি কোটি শরণার্থী জীবন-জীবিকার অধিকার হারিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন তাদের দেখানোর দায়িত্ব হচ্ছে জাতিসংঘ শরণার্থী হাইকমিশনারের। মোটামুটিভাবে এমন আর একটি পদ হচ্ছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের খবর পেলে এই হাইকমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস্ সরেজমিন তদন্ত করার জন্য সে দেশ সফরে যেতে পারেন, অথবা একজন প্রতিনিধি পাঠাতে পারে। বর্তমান এই হিউম্যান রাইটস্ হাইকমিশনার হচ্ছে ম্যারি রবিনসন। ১৯৯৭-এর সেপ্টেম্বরমাসে এই পদে আসার আগে তিনি আয়ারল্যান্ডের প্রেসিডিন্ট ছিলেন। একটি দেশের রাষ্ট্রপতির পদ থেকে হাইকমিশনার পদে! এই উদাহরণটি থেকে কিছুটা ধারণা করা যায়, বর্তমান দুনিয়ায় মানবাধিকারের গুরুত্ব কতো বেশি।

২

বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিশেষ করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত কর্মকাণ্ডের মহোৎসব চলছে এখন। ১ অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনের আগে শুরু হওয়া এই মহোৎসব নির্বাচনের পর আরও গতি পেল। ইনকিলাব এবং ইনকিলাব জাতীয় পত্রিকাগুলো বাদে আর সব পত্রিকার বিভিন্ন পৃষ্ঠায় টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত বিভিন্ন জনপদের যে মর্মান্তিক বর্ণনা ছাপা হচ্ছে তা নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী এবং বিএনপি মহাসচিব, এককালের শীর্ষ বামনেতা, মান্নান ভূঁইয়ারা বিশ্বাস করছেন না। এত পত্রিকায় প্রকাশিত এত প্রতিবেদন,তার পর বিবিসি বাংলা অধিবেশনগুলোতে প্রতিদিন চারবার এ ধরনের খবর প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু এককালে বামপন্থী জবরদস্ত নেতার তাতে বিচলিত হওয়ার কোনো

কারণ নেই। সেদিন এক হিন্দু ধর্মাবলম্বী বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম মাননীয় মন্ত্রীদের এসব হাল্কা করে দেখার বিষয়টির দিকে। এই বন্ধুটি বলেছিলেন, জয়নাল হাজারী, আবু তাহের, আবুল হাসনাত আব্দুল-হদের সন্ত্রাসের ওপর এই একই পত্রিকাতে যখন এত সব খবর প্রকাশিত হয়েছে তখন তো এ বিএনপি মহামান্যরা তা অবিশ্বাস করেননি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী আমাদের একজন সাবেক বিমানবাহিনী প্রধান। একই এয়ার ভাইস মার্শাল উপাধিধারী আরও অন্তত তিনজন অতীতে বাংলাদেশের মন্ত্রী ছিলেন। বিমানবাহিনীতে সাধারণত স্মার্ট, চৌকস ছেলেরা যোগ দিয়েছে এবং আমার ধারণা এখনও দেয়। তারপর তারা যখন আবার উপরের দিকে উঠতে থাকে তখন তাদের জ্ঞানগরিমা, স্মার্টনেস আরও বাড়ে। কিন্তু চার-পাঁচদিন আগে এই সাবেক বিমানবাহিনী প্রধানকে যখন একটি টিভি চ্যানেলে দেখলাম, লক্ষ্য করলাম তিনি বাংলা বর্ণ 'চ' এবং 'ছ'-এর উচ্চারণ ঠিকমতো করতে পারছেন না। আমজনতার বক্তৃতায় তিনি যে কোনো আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতেই পারেন। বলাটাও প্রত্যাশিত। কিন্তু একটি টিভি সাক্ষাৎকারে এককালের স্মার্ট এয়ারফোর্স ক্যাডেট ঠিকমতো শুদ্ধ উচ্চারণে বাংলা বলতে পারেন না; তার কাছ থেকে তাই আমার তেমন প্রত্যাশাও নেই। কিন্তু মান্নান ভূঁইয়ারা?

প্রশ্ন হলো, অন্ধ থাকলেই কি প্রলয় বন্ধ থাকে? বাংলাদেশে আমাদের গণতন্ত্রের প্রহরীরা, বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী রাষ্ট্রদূতরা, কূটনীতিবিদরা কি তা দেখছেন না? বিদেশী রাষ্ট্রদূতরা, কূটনীতিবিদরা কি তা দেখছেন না? আমাদের এই নতুন সরকারের মন্ত্রী-সচিবদের অবগতির জন্য একটি কথা জানা জরুরি এবং তা হলো জেনেভাতে অবস্থিত মানবাধিকার কমিশনের কাছে যে কোনো ব্যক্তি বা দল মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করতে পারে এবং এসব অভিযোগ প্রাপ্তির পর মানবাধিকার কমিশন নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে তার তদন্ত করতে পারে। জেনেভাতে মানবাধিকার কমিশন এবং সাব-কমিশনের যে সভাগুলো হয়, সেগুলোতে গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা এবং অভিযোগকারীরা উপস্থিত থাকতে পারেন। বিভিন্ন শ্রেণী, গোষ্ঠী এবং এনজিওগুলোও এই কমিশন ও সাব-কমিশনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা যথাযথ তদন্তের জন্য জানাতে পারে।

৩

গত ১৫ অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যায় বিটিভির বাংলা খবরে সংখ্যালঘুদের কয়েকজনের মধ্যে এককালে এরশাদের মন্ত্রী সুনীল গুপ্তকেও দেখলাম। তিনি বলছিলেন, তাদের কোনোই অসুবিধা হচ্ছে না কোথাও; তারা ভালোই আছেন। তাকে এমন ভূমিকায় দেখে তিনটি কথা মনে পড়লো। এক. বিটিভি যথাযথ ভূমিকায় সরকারের চোঙ্গা হিসেবেই আছে। সরকার যেভাবে বিটিভিকে নাচতে বলে, বিটিভি তেমনভাবে নাচে। সব আমলেই তা ঘটেছে, এখনও ঘটছে। সুতরাং ড. মঈন খানের এতসব শক্ত শক্ত ঘোষণার পরও এই প্রশ্নে তেমন প্রত্যাশা নেই। দুই. এরশাদ আমলের শেষদিকে মানুষ যখন প্রবলভাবে এরশাদের পতন এবং অপসারণ চাচ্ছে, তখন দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির ষড়যন্ত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে এক মন্ত্রীর গাড়িতে বোমা হামলা হয়েছিলো। সেই মন্ত্রীর নাম সুনীল গুপ্ত। এরশাদ সরকারের কোন এজেন্সি এই বোমা হামলার পরিকল্পনাকারী তখন মোটামুটি তা জানা ছিলো সচেতন লোকদের। হামলার লক্ষ্যবস্তু হিসেবে তখন এরশাদীয় মন্ত্রীদের মধ্যে নিরীহতম মানুষটিকেই বেছে নেয়া হয়েছিলো। সেদিন সন্ধ্যায় সুনীল গুপ্তকে হাসপাতালের বেডে শুয়ে হাতে-মাথায়-পায়ে ব্যান্ডেজ অবস্থায় সাক্ষাৎকার দিতে দেখেছিলাম। দশ-এগারো বছর পর তিনি সুস্থ অবস্থায় সাক্ষাৎকার দিলেন দেখে অন্তত একটু ভালো তো লাগলো! তৃতীয় কথাটি একটি গল্প; আইয়ুব খানের সামরিক

শাসনের প্রথম দিকে পাকিস্তান ন্যাপের গুরুত্বপূর্ণ এক নেতাকে কেউ প্রশ্ন করেছিলেন, ‘কেমন আছেন’। উত্তরে তিনি বলেছিলেন- ‘আইয়ুব খান হুকুম দিয়েছেন ভালো থাকতে, তাই ভালো আছি’। আমাদের সংখ্যালঘুরাও সরকারি হুকুমের দাস, তাদের হাসতে হুকুম দেয়া হয়, তারা ক্রীতদাসের মতো হাসে।

আমাদের এই দেশটিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঝর্ণাধারা বইছে, এমন একটি কথা প্রায়ই শুনি। সংবিধানে বর্ণিত শীর্ষস্থানে আসীন মহামান্য যেমন বলেন; মিনিস্টার, প্রাইম মিনিস্টার, দলপতি, স্কুল-কলেজের হেড মাস্টার, সম্পাদক, সাংবাদিক, রিকশাচালক, বাস ড্রাইভার, পথচারী, ফেরিওয়ালা, সকলেই। কিন্তু বলেন না তারা, যাদের সম্পর্কে প্রশ্নটা করা হয়। বললেও তাদের মনের কথাটা কেউ জানতে চায় না, মনের কথাটা কেউ জিজ্ঞাসা করে না। আমাদের সাবেক সামরিক এক দেশপতি সংবিধান থেকে বন্ধুদের খোঁচায় ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিলেন; আর এক সামরিক দেশপতি ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম বানালেন। এই দ্বিতীয় দুর্বৃত্ত তার আমলে শেষদিকে চট্টগ্রামসহ আরও অনেক জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটান তার পতন ঠেকাতে। তারপর ’৯২-এর ডিসেম্বরে অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ ধ্বংসের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে চার-পাঁচ হাজার হিন্দু মন্দির এবং উপাসনালয় ধ্বংস করা হলো। এ বিষয়ের ওপর যখন জাতীয় সংসদে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হলো, মনে পড়ে খুব সম্ভব বিএনপি সরকারের এক ক্ষমতাশালী মন্ত্রী মাজেদুল হক তখন জাতীয় সংসদে বলেছিলেন, ভারতের তুলনায় বাংলাদেশে তেমন কিছুই ঘটেনি এবং এমন সব সংখ্যালঘু বিরোধী প্রতিটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর তা আমাদের নেতা-মন্ত্রীরা বলেই চলেছেন বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল এক দৃষ্টান্ত। এখানে সকল রকমের সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধিতেই সংখ্যালঘুরা, হিন্দুরা বসবাস করছে। ডাহা মিথ্যা ভাষণ আর কারে কয়? নির্বাচনের আগে-পরে তারা আক্রান্ত এমন অবস্থায় কোন মানুষটি নিরাপদ বোধ করতে পারে?

সংখ্যালঘুরা অবশ্যই সুখে আছে, তবে তুলনামূলকভাবে। পাকিস্তানের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের চাইতে ভালো আছে; কারণ ওখানে সিন্ধু প্রদেশের কয়েকটি জায়গা ছাড়া কোনো হিন্দুই নেই। আফগানিস্তানের চাইতে ভালো আছে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা। কারণ আফগানিস্তানে কোনো সংখ্যালঘুই নেই।

রুয়ান্ডা-বুরুন্ডিতে কয়েক বছর আগে লাখ লাখ জাতিগত সংখ্যালঘুকে হত্যা করা হয়েছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা তার চাইতে অবশ্যই ভালো আছে। বাংলাদেশে কোনে সংখ্যালঘুই নিরাপদ নয় কেন, এই প্রশ্নটি জোরেশোরে করার সময় এসেছে। এখানে হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, চাকমা, গারো, হাজং, শিয়া, কাদিয়ানী-সবাই সংখ্যালঘু তারা কেন বার বার বিভিন্ন ধরনের হামলার শিকার হচ্ছে এখানে সেখানে। কয়েক বছর আগেও কয়েকশ চীনা পরিবার ছিলো এই দেশে, তারা কোথায় গেলো? আমরা তাদের নিরাপত্তা দিতে পারিনি, পারিনি মর্যাদার সঙ্গে দেখতে।

তবুও তারা সুখে আছে, কারণ আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র তাদের সুখে থাকার হুকুম দিয়েছে। রাষ্ট্রযন্ত্রটি যে কি ভয়ঙ্কর জিনিস এখন তার একটি উদাহরণ দিই। আবুল হাসানাত আবদুল-াহ, শামীম ওসমান, জয়নাল হাজারী, রাষ্ট্রযন্ত্র যখন এদের পক্ষে ছিলো, তখন এক একজনের ক্ষমতা, দাপট আমরা দেখেছি, এক একজন তখন সিংহ গর্জন করে যাচ্ছে। আর যে মুহূর্তে রাষ্ট্রযন্ত্র পক্ষ পরিবর্তন করলো, তখন এক এখন সিংহ দেখলাম ইঁদুর হয়ে গেল, কেউ গর্তে ঢুকলো, কেউ পালালো।

রাষ্ট্রযন্ত্র যখন স্বীকার করবে যে সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হচ্ছে, রাষ্ট্রযন্ত্র যখন এসব বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়াবে তখনই তারা সম্পূর্ণ ইজ্জত নিয়ে না হলেও অন্তত কিছুটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে

দাঁড়াতে পারবে। তখন হিন্দুরা ‘আসসালামু আলায়কুম’ না বলে ‘নমস্কার’ বা ‘আদাব’ বলে শুভকামনা জানাবে। যেমন জানাতো আইয়ুব খান, মোনায়েম খানের আমলেও সেই পাকিস্তান জামানায়। সংখ্যালঘুরা যদি জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ হয়, তাহলে জাতীয় সংসদ ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদপত্র, সামরিক বাহিনী-এসবে কি শতকরা ১০ ভাগ প্রতিনিধিত্ব আছে, বা পাঁচ ভাগ?

ইনকিলাবীরা, জামায়াতীরা, মুফতি, লাদেনরা একটি কথা প্রায় বলে থাকে, শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের এই দেশ মুসলমানদের ঈমান-আকিদা অনুসারেই চলবে। তাদের কথার অর্থ এই দাঁড়ায় আগে মুসলমান, তারপর অন্যরা। কথাটা যদি ঠিক হয় তাহলে যে সব দেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু, সেই সব দেশে মুসলমানরা কি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবেই বসবাস করবে? বাংলাদেশকে তারা ইসলামী রাষ্ট্র বানাতে চায়; কিন্তু তাদের দাবি ভারত হিন্দু রাষ্ট্র হতে পারবে না। ভারতে সকল নাগরিকের সমান অধিকার থাকতে হবে। যুক্তিটা কি উন্মাদের কথা নয়। আরও একটি উদাহরণ দিই। ইনকিলাবীদের সর্দার সেই মাওলানা আবদুল মান্নানের এক জামাতা ওয়াশিংটনে বাস করে। তার নাম গোলাম আরশাদ। এই গোলাম আরশাদ নামের লোকটার ছবি প্রায়ই থাকে ইনকিলাবে। সে আজ ওয়ার্ড কমিশনারের সঙ্গে দেখা করছে, কাল বাস ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছে, এসব ছবি। সে নাকি ওয়াশিংটন ন্যাশনাল প্রেসক্লাবের কিছু একটা এই গোলাম আরশাদের হক আছে ইনকিলাবে, মাওলানা মান্নানের জামাতা বাবাজি হিসেবে, বাহাউদ্দিন, বাকীউল-াহদের মতোই। তবে গোলাম আরশাদ যে মাওলানা মান্নানের জামাতা তা কখনও ইনকিলাবে উলে-খ থাকে না। তা যা-ই হোক, গোলাম আরশাদের খবর ইনকিলাবে থাকবে না তো কি জনকণ্ঠে থাকবে? প্রথম আলো, যুগান্তর, সংবাদে থাকবে? কিন্তু এখানে এই জামাতা সম্পর্কেই একটি প্রশ্ন করি-ইনকিলাবীদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার যদি সিদ্ধান্ত নেয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নামের দেশটিতে শুধু খ্রিস্টানরাই তাদের ঈমান-আকিদা নিয়ে থাকতে পারে, অন্য সংখ্যালঘুরা শুধু দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকদের মর্যাদা পাবে, তাহলে এই ইসলামের গৌরব হযরত মাওলানা আবদুল মান্নানের জামাতা বাবাজি গোলাম আরশাদ এবং গোলাম আরশাদের বিবিজানের অবস্থাটা কি দাঁড়বে?

শুধু বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের কথাই ভাবছে কেন ইনকিলাবীরা, জামায়াতীরা? দুনিয়ার কত দেশে আরও যে মুসলমান বাস করছে,তাদের কথা কি তারা ভাববে না? আমরা আমাদের সংখ্যালঘুদের যথাযথ মর্যাদা না দিলে ঐসব দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠরা তাদের দেশের সংখ্যালঘু মুসলমানদের যথাযথ মর্যাদা দেবে-এমন দাবি করার আমাদের কোনো নৈতিক অধিকার কি থাকে?

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন নীরবে চোখের পানি মুছতে মুছতে কেন তাদের এত বছরের ভিটাবাড়ি, মাটি, পুকুর পাড়ের গাছটি ছেড়ে চলে যাচ্ছে বছরের পর বছর, কেন আমাদের ইনকিলাবীরা জামায়াতীরা, ভাবে না?

দুনিয়াটা যেমন শুধু আমেরিকানদের জন্য নয়, তেমনি শুধু মুসলমানদের জন্যও নয়। নয় শুধু সাদাদের বা শুধু মালদারদের। আমরা সবাই বিশ্ব পরিবারের সদস্য, আমরা সকলেই লালন ফকিরের অনুসারী, এমনটি ইনকিলাবীরা, মান্নান মাওলানা আর মান্নান ভূঁইয়ারা ভাবতে শিখবে? আলতাফ চৌধুরী আর মান্নান ভূঁইয়ারা বলেছেন, সংবাদপত্রের এসব রিপোর্টের শতকরা ৮০ ভাগ অতিরঞ্জিত। তা বাকি ২০ ভাগ যা সত্য, তা সংখ্যায় কত? দশ, একশ’, এক হাজার, এক লাখ? বলি সংখ্যাটি যদিও একও হয়, তার সমর্থন এই দায়িত্বশীল মানুষগুলো করে কি করে? তাদের পরিবারে শুধু একজন মানুষকে নিয়ে কোনো মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেনি?

আরও একটি প্রশ্ন। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার জন্য এত লাখ লোক কত কোটি টাকা খরচ

করলো? ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইউএনডিপি, কত সব ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে কত কোটি কোটি টাকা দিল? কিন্তু সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধ করার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইউএনডিপি কি তাদের কয়েকজন কূটনীতিবিদকে উপদ্রুত এলাকাগুলোর অন্তত কয়েকটিতে পাঠাতে পারে না?

৪

বাংলাদেশে সরকারে সংশি-ষ্ট কর্মকর্তা, নেতামন্ত্রীদের একটু হুঁশিয়ার করতে চাই। Universal declaration of Huamn Rights মানতে বাংলাদেশ বাধ্য। বাধ্য এই ধরনের অন্য সব ঘোষণা, চুক্তি বা প্রোটোকল মানতে। এসব চুক্তির ধারা লঙ্ঘন করলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক সমাজ এবং প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করতে পারে। মানবাধিকার কমিশনের নিন্দা প্রস্তাব শুধু তার একটি ব্যবস্থা। হয়তো এমন দিন আসবে যখন মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে বাংলাদেশের দায়ী ব্যক্তিকে কোনো আদালতে দাঁড় করানো হবে। রুয়ান্ডা-বুরুন্ডিতে এমন ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিধান করার জন্য বিশেষ যে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছিলো তার একজন বিচারক ছিলেন বাংলাদেশের। তার নাম বিচারপতি টি. এইচ. খান। একাত্তরে তিনি জাতিসংঘে পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে নিউইয়র্কে অপতৎপরতা চালিয়েছিলেন, তা অবশ্য তার আর একটি পরিচয়। আমাদের সকলকে মনে রাখতে হবে গার্মেন্টস কারখানায় শিশুশ্রম বন্ধের দাবিতে যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাধা আসে, তাহলে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধের দাবিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের রপ্তানি বন্ধ করে দেয়া হতে পারে।

কবি শামসুর রাহমানের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে এ লেখাটি শেষ করছি। কঙ্কর সিংহ রচিত 'সাম্প্রদায়িকতা ও সংখ্যালঘু সঙ্কট' (প্রকাশক-অনন্যা) বইটির ভূমিকায় কবি শামসুর রাহমান '৯৭-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি লিখেছিলেন "এখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাংলাদেশকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল বলে মনে করতে পারছে না। যেখানে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলকে ভোট দেয়ার অপরাধে যাদের জীবন বিপন্ন, বাস্তুভিটা ছেড়েছুড়ে, বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে হয়, জমিজমা হারাতে হয়, সাম্প্রদায়িক মুসলমানধারী ব্যক্তিদের হাতে লুণ্ঠিত হয় নারীদের সম্ভ্রম, সেখানে সংখ্যালঘুর সঙ্কট ঘনীভূত না হয়ে পারে না।"

প্রায় পৌনে পাঁচ বছর আগে আমাদের এই জনপ্রিয় এবং নন্দিত কবি সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে কিছু কথা বলেছিলেন, তা কেমন কঠোর সত্য হয়ে দেখা দিলো এই গত কয়েক সপ্তাহে, তা এখন প্রতিটি হিন্দু পরিবারের সদস্যরা দিন রাত বুঝতে পারছে, বুঝতে পারছি আমি নিজেও। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন দেশব্যাপী পরিচিতি সাংবাদিক আমার সাহায্য চেয়েছিলেন তার কিছু আত্মীয়-স্বজনের আক্রান্ত এলাকা থেকে উদ্ধার করে ঢাকায় আনতে। সুশ্রী চেহারার তার দুই নিকট তরুণী আত্মীয়াকে নিয়ে এই সাংবাদিক পরিবারের করুণ আর্তিতেও আমি কোনো সাহায্য করতে পারিনি; কারণ সাহায্য করার আমার কোনো ক্ষমতা নেই। আর একজন তরুণ ১ অক্টোবর সন্ধ্যায় বন্ধুর সাথে নির্বাচন ফল দেখতে সেই যে বাড়ি থেকে বের হয়েছে এখনও বাড়ি যেতে পারেনি। ঢাকাতে তার বন্ধুর বাসায় আশ্রয় নিয়ে আছে। জামায়াত, বিএনপি তাকে খুঁজছে তার শহরে। সে এখন অন্তত কিছুদিনের জন্য বিদেশে পালানোর চেষ্টায় আছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ অক্টোবর ২০০১

সাম্প্রদায়িক ও অভিশপ্ত জাতি হতে চাই

ফয়েজ আহ্মদ

সন্দেহাতীতভাবে জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যপদ অর্জনের পর বিএনপির জোট সরকারকে তাদের এই অর্জনের সাফল্য প্রমাণ করতে হবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিপর্যয় স্কন্ধে নিয়ে তারা ক্ষমতায় এসেছেন। এই অবস্থা স্বাভাবিকভাবেই তাদের শাসনকে জনগণ একদিকে হাসিনা সরকারের শাসনের সঙ্গে তুলনা করবে ও অপরদিকে দেশের পরিস্থিতি সুশাসনের অন্তর্ভুক্ত কিনা সেদিকেও দৃষ্টি রাখবেন। এভাবে ব্যাপক ভোটের মাধ্যমে কোনো একটি সরকারকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেই সচেতন জনগণ ক্ষান্ত থাকবে না।

তাদের দৃষ্টি থাকবে শান্তিপূর্ণভাবে দেশ গঠনের যে আশা ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই সরকার ক্ষমতায় আসীন হয়েছে তার কোনো ফল ভোগ তারা করছে কিনা! এদেশের জনগণ বহু প্রকারের দুঃশাসন অতীতে দেখেছে। তারই ফলশ্রুতিতে ব্যাপক ভোট লাভের মাধ্যমে এই সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান সরকারকে সে কারণে কঠোর হস্তে সন্ত্রাস দমন, দুর্নীতির মূলোৎপাটন ও জনগণের কল্যাণের দৃষ্টিতে সার্বিক উন্নয়ন সাধনের প্রচেষ্টায় ব্রতী হওয়াই স্বাভাবিক। এ কথা যে কোনো কল্যাণধর্মী সরকারের জনই প্রযোজ্য।

কিন্তু এই সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পূর্ববর্তী কাল থেকেই যে অস্ত্রের ঝংকার ও সন্ত্রাস দেখা দিয়েছিলো বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়ে তা দেশের মৌলিক শাসনতন্ত্রের দিকে অনেকটা আঘাত হেনেছে। সরকার ক্ষমতার অফিসে বসার পূর্বে এবং নির্বাচনের পরদিন থেকেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রাতৃঘাতী রাজনৈতিক সহিংসতা শুরু হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ওমরা পালনে সৌদি আরবে যাওয়ার পূর্বে দেশের শান্তি রক্ষার জন্য যে সতর্ক বাণী দিয়েছিলেন, সেদিকে সংশি-ষ্টরা বিশেষ কর্ণপাত করেছেন কিনা সন্দেহ। স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে যে অপ্রতুল ও সতর্ক শান্তি রক্ষা ব্যবস্থা করা হয় সে ব্যাপারে আমরা এখনই যোগ্যতার প্রশ্ন উত্থাপন না করেই বলতে পারি যে, এই বিএনপি সরকারের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর রাজনৈতিক আক্রমণের ব্যাপারে সঠিক ও দৃঢ় নেতৃত্বের অভাব দেখা দিয়েছে। মনে হয় যেন দেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাবর্তন না হওয়া পর্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও নৃশংসতা বন্ধের ব্যাপারে যোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনে কোথাও যেন ঘাটতি ছিলো। দেশের যেসব অঞ্চলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বসবাস, নির্বাচনের পরপরই তাদের ওপর এক শ্রেণীর সশস্ত্র সন্ত্রাসী হামলা চালাতে শুরু করে। এমনিতেই তারা এদেশে ২য় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বসবাস করে আসছিলেন। রাজনৈতিক সহিংসতার সঙ্গে সংশি-ষ্টরা স্থানীয়ভাবে বলছেন যে, এসব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে ভোটদান করায় এই সহিংসতা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ভোটের ফলাফলে দেখা গেছে, জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ মাত্র ৬২টি আসনে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। সংখ্যালঘুরা শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী সমঅধিকারে যে কোনো প্রার্থীকে ভোট দেয়ার অধিকার রাখেন। সব ক্ষেত্রেই যে সংখ্যালঘুরা আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছেন তার কোন সঠিক প্রমাণ নেই। আর সে ভোট যদি তারা বিরোধী দলকে দিয়েও থাকেন তা কোনোদিনই অগ্রহণযোগ্য বা ন্যায়নীতি বিরোধী নয় বরং কোনো অপরাধও নয়। এখানে কেবল তারা অধিকার প্রয়োগ করেছেন। যদি সংখ্যালঘুদের ওপর এ কারণেই আক্রমণ ও প্রতিহিংসায় সন্ত্রাসীরা মত্ত হয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে আমরা কোনো শ্রেণীর গণতন্ত্র বা ন্যায়নীতির পৃষ্ঠপোষক নই। এ ক্ষেত্রে সরকারকে সন্ত্রাস দমনের প্রশ্নে এক আদর্শ ও কঠোর নীতি-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করতেই হবে। নতুন সরকারের শুরুতেই এ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ নিশ্চিতভাবে একটি বিপদাপন্ন

পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ হয়েছে ঠিকই কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো প্রকার প্রতি আক্রমণ হয়নি। স্বার্থপরতার দৃষ্টিকোণ থেকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের ওপর এই আক্রমণ হয়েছে। চিরাচরিত ধারায় রাজধানীতে নিরাপদ রাস্তায় এই নির্যাতনের প্রতিবাদ ও প্রতিকার দাবি করে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে। নির্বাচনকে উপলক্ষ করে যে প্রতিহিংসা ও সন্ত্রাস চলছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সম্পত্তি ও অর্থের লোভে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এ সন্ত্রাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সন্ত্রাসকবলিত স্থানীয় সুস্থ সমাজের কোনো ব্যক্তিকেই রুখে দাঁড়াতে দেখা যায় না। শুধু তাই নয়, আক্রান্ত সংখ্যালঘুরাও প্রমাণিতভাবে কোথাও সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধ করেনি- তারা দল বেঁধে পলায়নপর। কারণ, তারা এককেটি অঞ্চলে সংখ্যায় এত অল্প যে, নিরস্ত্র অবস্থায় সন্ত্রাসীদের মুখোমুখি হতে পারেনি। কিন্তু স্থানীয় সংখ্যাগুরুদের দায়িত্ব এখানে শূন্যের কোঠায় কেন? তাছাড়া যারা নির্বাচনে স্থানীয়ভাবে জয়লাভ করেছেন তাদের দায়িত্ববোধের অভাব দেখা গেছে। মন্ত্রীত্বের তদবিরে তারা এখন সবাই ঢাকায়। আর বিরোধী দলের বিজয়ী প্রার্থীরাও নিজ নিজ এলাকা ছেড়ে দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন।

দুটি প্রধান দলই বলে যে, সন্ত্রাসীগণ কোনো রাজনৈতিক দলের নয়, তারা সন্ত্রাসধর্মী ক্ষুদ্র এক জনশক্তি। উপদ্রুত এলাকাগুলোতে সন্ত্রাস করে যারা সংখ্যালঘুদের নির্যাতন করছে এবং করেছে, ঠিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নির্বাচনের সময় তাদের কোনো অস্তিত্ব প্রকাশ্যভাবে দেখা যায়নি। রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে-বিপক্ষে এসব সন্ত্রাসীর অস্তিত্ব। রাজনৈতিক ছত্রছায়াতেই এরা লালিত পালিত হয়, একথা অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই। হঠাৎ করে একদল সন্ত্রাসী গজিয়ে উঠতে পারে না। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে আর্মি নিয়োগসহ কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার কারণে এরা সাময়িককালের জন্য নির্বাচনের দিন পর্যন্ত আশ্রিত অবস্থায় আত্মগোপন করে ছিলো। তারা নির্বাচনের বেসরকারি ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই কোন দিকে স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে তা লক্ষ্য করে এবং তারা পূর্বের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আসে। নিজেদের নিরাপত্তা ও আধিপত্যকে পূর্বের ন্যায় স্থির রাখার জন্য এসব সন্ত্রাসী চিরাচরিত পদ্ধতিতে সমর্থন বদল করে ফেলে।

কোনো মুসলমানের সম্পত্তি দখল অস্ত্রের মুখেও এখন আর পূর্বের ন্যায় সহজ নয়। সেসব বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতেই তারা একদিকে আনুগত্য বদল করেছে অপরদিকে দুর্বল নাগরিকদের মধ্যে সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এদের কোনো প্রতিরোধ নেই। অনেকেরই ফসলের জমি ও নির্ধারিত বাড়িটুকু আছে। বিশেষ করে ষাটের দশক থেকে বাংলাদেশে ৩০ বছরের মধ্য সংখ্যাগুরুরা ক্রমান্বয়ে শক্তি প্রয়োগ করে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তির অধিকাংশই নীরবে লুণ্ঠন করছে। এখন অবশিষ্ট দরিদ্র সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি ও সামান্য অংশ ধনী সংখ্যাগুরুদের আশ্রয়ে সন্ত্রাসীদের লুণ্ঠন, নির্যাতন, হত্যা এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে নারীদের ওপরও তারা পাশবিক অত্যাচার করেছে। অনেক ক্ষেত্রে এই নির্মম ঘটনাগুলো রাজনৈতিক সংঘাতকে অতিক্রম করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একপেশে রূপলাভ করেছে। এই চিত্র সংখ্যাগুরু হিসেবে আমাদের সবার জন্যই লজ্জাজনক ঘটনা। নির্বাচিত ও অনির্বাচিত কেউই আমরা দূরাঞ্চলে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে পারিনি। এ ঘটনাগুলো কারও জন্যই যেমন গৌরবের নয়, সরকারের জন্যও এই অবস্থা লজ্জাজনক ও বিব্রতকর। উপদ্রুত অঞ্চলগুলোর সন্ত্রাসীরা সবাই পূর্ব থেকেই চিহ্নিত ও স্থানীয়ভাবে পরিচিত, তবুও ওইসব অঞ্চলে থানা পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার প্রশ্ন উঠেছে। এ ক্ষেত্রে কঠোর সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিলম্ব করে তাহলে আরও নৃশংস ঘটনার চিত্র হয়তো আমরা দেখতে পাব। আর সরকারের শাসন ব্যবস্থায় যে কালো ছাপ পড়বে তা মুছে যাওয়ার নয়।

পাকিস্তান আমল থেকেই এই বাংলাদেশ অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সূত্রপাতের চেষ্টা করত স্বয়ং সরকারই। পঞ্চাশের দাঙ্গার সময় এই ঢাকা শহরের মধ্যস্থলে কালী মন্দিরের কাছে ফোল্ডার স্ট্রিটের পাশে ট্রেন থামিয়ে হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছিলো। সে সময় নবাবপুর ও ওয়ারি অঞ্চল ছিলো ধনী ও অবস্থাপন্ন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, বাড়ি-ঘর ও দোকান লুণ্ঠন এবং দখলই ছিলো প্রধান লক্ষ্য। তার জন্য তারা বহুশত হত্যা চালায়। শাসক মুসলিম লীগ সেই ক্ষত নিয়ে ৫৪ সালের নির্বাচনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ এবং তাদের পরে প্রথম মার্শল ল'য়ের প্রবর্তক জেনারেল আইয়ুব খান বাংলাদেশ অঞ্চলে তার সমর্থকদের দুর্বলতা প্রকাশ পেলেই দাঙ্গার প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন।

কিন্তু আইয়ুব খানের প্রতিনিধি গভর্নর মোনায়েম খানের আমলে মধ্য ষাটে নির্বাচন ও ভারতের সঙ্গে যুদ্ধকে কেন্দ্র করে এক পর্যায়ে ঢাকা ও অনান্য স্থানে দাঙ্গা চালানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। বহু সংখ্যালঘুর প্রাণহানি ও অগ্নিসংযোগ প্রতিরোধ করার জন্য দেশের সচেতন নাগরিকগণ ঢাকাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ঢাকায় 'বাঙালি রুখিয়া দাঁও'-এই শ্লোগানও এর ভিত্তি সুবৃহৎ দাঙ্গা প্রতিরোধ শান্তি মিছিল হয়েছিল। এই মিছিলের ওপরও ঠাঁটারিবাজারে আক্রমণ করা হয়। সে সময় একজন বিশিষ্ট শান্তিবাদী সংখ্যাগুরু নাগরিককে ঠাঁটারিবাজারের কাছে দাঙ্গা প্রতিরোধ প্রচেষ্টার সময় দাঙ্গাকারী মুসলমানরাই কুপিয়ে হত্যা করে। আমাদের দাঙ্গা প্রতিরোধ শান্তি মিছিল ঠাঁটারিবাজারের পাশ কাটিয়ে ওয়ারির রেংকিং স্ট্রিটে প্রবেশ করে। এ মিছিলে রেংকিং স্ট্রিটে আক্রমণের প্রস্তুতির সময় কয়েকজন শান্তিকামী নাগরিক আমাদের জানিয়ে যান যে, পার্শ্ববর্তী মানিক বাবুর বাড়িতে বহুসংখ্যক হিন্দু আশ্রয় নিয়েছে। দিনের বেলায়ই তাদের ওপর কয়েকবার আক্রমণের চেষ্টা হয়েছে। আমরা দলবেঁধে সে বাড়ির বাইরে দরজায় কড়া নাড়তে থাকি। বন্ধু অহেদুল হক ও আরও কয়েকজনকে নিয়ে সিদ্ধান্তই করা হয় যে, বাড়িটিতে প্রবেশ করতে হবে। আমরা দেয়াল টপকিয়ে বাইরের দরজা খোলার সময় প্রায় এক ডজন দাঙ্গাকারীকে অপরদিকে দিয়ে পালিয়ে যেতে দেখি। বাড়ির প্রধান বিল্ডিংয়ে প্রধান দরজায় আমরা কড়া নেড়ে দাঙ্গাবিরোধী শ্লোগান দেয়া সত্ত্বেও ভেতর থেকে দরজা খোলার সাহস পাচ্ছিল না কেউ এবং কোনো প্রকার শব্দও ছিলো না। চিৎকার করে বহু আশ্বাস দেয়ার পর একটি কক্ষের দরজা খোলা হয়। আমাদের দেখে তারা বিশ্বাস করেন যে, আমরা দাঙ্গাকারী নই এবং দাঙ্গাতে আক্রান্তকারীদের উদ্ধারের জন্যই আমরা এসেছি। সেই বাড়ি থেকে তখন আমরা ৪৭ জন সংখ্যালঘু নারী-পুরুষ ও শিশুকে উদ্ধার করতে সক্ষম হই।

তখনকার এই দাঙ্গাকে প্রতিরোধ করেছিলো এই ঢাকারই নাগরিকগণ। অনেক পরে এই স্বাধীন বাংলাদেশেও স্বৈরাচারী এরশাদের আমলে বিরোধী দলের আক্রমণের তীব্রতার মুখে আবারও এদেশে দাঙ্গার ব্যবস্থা করা হয়, যাতে আন্দোলনের মোড় অন্যদিকে ফেরানো যায়। সেই সময় চট্টগ্রাম, ভোলাসহ অন্যান্য অঞ্চলেও সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ চলে এবং তাদের বাড়ি-ঘরসহ অনেক উপাসনালয় ধ্বংস করে দেয়া হয়। আবার আমরা রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক, অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিবর্গ দাঙ্গাবিরোধী প্রতিষ্ঠান গঠন করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উপস্থিত হয়েছিলাম। আমি ভোলা দ্বীপাঞ্চলে অন্যদের সঙ্গে হিন্দু পরিবারের সম্পত্তি লুণ্ঠন ও আক্রমণের নিদর্শন দেখেছি এবং বহুজনের অভিযোগ শুনেছি। পার্শ্ববর্তী দ্বীপাঞ্চল থেকে সংখ্যাগুরুরা সরাংগা-নৌকা করে এসে তারা দু'দিনব্যপী হত্যা, লুণ্ঠন চালায়। তারা সব শস্য এমনকি ঘর-বাড়ির চালসহ ওই সরাংগা নৌকায় করে নিয়ে যায়। জীবিত আক্রান্তরা সেদিন দাঙ্গার বর্ণনা দিয়ে বলেছিলেন যে, আমরা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হবো। এসব বিষয় পরে আমরা নিবন্ধ ও সংবাদাকারে পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলাম।

এখনও আমাদের মধ্য থেকে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিসমাপ্তি ঘটেনি। এই অবস্থায় কোনো সরকারের মৌন সম্মতি পেলে নানা অজুহাতে সংখ্যালঘুদের ওপর আ্রমণ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আশঙ্কা থেকেই যাবে। খালেদা জিয়ার নতুন সরকার এ মুহূর্তেই যদি উপযুক্ত ও কঠোর ব্যবস্থা না নেয় তবে ভবিষ্যতে আমরা এক অভিশপ্ত ও পশ্চাৎপদ জাতি হিসেবেই চিহ্নিত থেকে যাবো। ১৪.১০.০১

যুগান্তর, ১৯ অক্টোবর, ২০০১

সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার কারণ কী?

অজয় রায়

দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে এই লেখাটি লিখছি। ১ অক্টোবর নির্বাচন শেষ হতে না হতেই দেশের বিভিন্ন জায়গায় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর যে তাণ্ডব বয়ে গেল এবং এখনও যার জের চলছে, তার পটভূমিতে সারা দেশের সংখ্যালঘুদের মনে যে গ-ানি, ক্ষোভ, বেদনা সৃষ্টি করছে তাতে দুর্গাপূজা হবে কি হবে না অথবা হলে কিভাবে হবে তা নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে স্বাভাবিকভাবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অর্থাৎ ১ তারিখ থেকে যতদিন না নতুন সরকার গঠিত হয় ততদিন এই তাণ্ডব অবাধে চলল। পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তারা কড়ে আঙুলটি নাড়লেন না। 'অবাধ নিরপেক্ষ' নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছেন এই আনন্দে তারা মাতোয়ারা রইলেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সাম্প্রদায়িক সরকার বলব কি বলব না, জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেদিন গঠিত হলো তার দু'দিনের মধ্যে ভোলায় সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ির ওপর বেশ ব্যাপক ধরনের হামলা হয়। সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের পক্ষ থেকে অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ, জনাব চৌধুরী খোরশেদ আলম ও পংকজ ভট্টাচার্য ভোলা যান এবং সরেজমিনে ঘুরে এসে একটি সংবাদ সম্মেলন করেন। শুধু ভোলায় নয়, সারা দেশে নির্বাচনের আগে ও বিশেষ করে নির্বাচনের পরে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার শঙ্কা প্রকাশ করা হয় সংবাদ সম্মেলনে। সংবাদ সম্মেলনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এক উপদেষ্টার সাথে দেখা করেও একই কথা বলে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল সে সময়। প্রধান উপদেষ্টা বা প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সাথে দেখা করার অনুরোধ জানিয়ে কোন ফল হয়নি, কারণ তাঁদের সময় হয়নি সেদিন। তবে যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের পর বলতে পারেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আমাদের দেশে অতীতে অনেক সময়ই হয়েছে তার সাথে দেখা করেও কোন লাভ যে হতো না, তা বলা বাহুল্য। এ সবই অবশ্য নিকট অতীতের ব্যাপার।

নতুন সরকার গঠিত হবার পর সম্প্রতি সরকারের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী অবশ্য সাড়ম্বরে পূজা উদ্‌যাপনের আহ্বান জানিয়েছেন। সরকার থেকে নাকি পূজা যাতে নির্বিঘ্নে হয় তার জন্য জোরেশোরে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতা সহ্য করা হবে না এই নাম ও বক্তব্য উথাপন করতে মন্ত্রীরা। ভুল কথা। অন্যদিকে পূজা পরিষদও সিদ্ধান্ত নিয়েছে আড়ম্বরহীন অবস্থায় পূজা করার। ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের কাছে সবিনয়ে বলতে চাই, তারপরেও কথা থাকে। কারণ যদি সরকারের কথা মতো সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যায় এবং তারাও দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে প্রকৃতই অবস্থান নেন তার পরও মনে রাখা দরকার এবার ক্ষত অনেক গভীর-সহজে আস্থা ফিরে আসবে না। নির্বাচন হয়ে গেল। চারদলীয় জোট দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসনে বিজয়ী হলো।

তার পরেও সংখ্যালঘুদের মার খেতে হলো নৌকাকে ভোট দেয়ার অপরাধে। চারদলীয় জোটের এক প্রার্থী এক সময় জমিদারী মেজাজে তিনি ঘোষণা করেছেন, সংখ্যালঘুরা যেহেতু তাকে ভোট দেয়নি, সেহেতু তার জমিদারীতে সংখ্যালঘুরা থাকতে পারবে না। তার বাড়ি সংলগ্ন বড় বাজারে এই লেখা শেষ হওয়া পর্যন্ত হিন্দু ব্যবসায়ীরা দোকানপাট খুলতে পারেননি। পার্শ্ববর্তী গ্রামের ৩শ' পরিবারকে বাস্তুচ্যুত হয়ে দেশের মধ্যেই অন্যত্র আশ্রয় নিতে হয়েছে। নির্বাচনের পরে সংখ্যালঘুদের ওপরে যত নির্যাতন হয়েছে তার প্রায় সবই করেছেন চারদলীয় জোট বিশেষত বিএনপির কর্মীরা। পত্রিকার খবর তাই এবং যারা নির্যাতিতদের সাথে গেছেন তাদেরও খবর তাই। আমার কথা হলো, মন্ত্রিসভা গঠনের আগে মূল সরকারি দলের নেতারা নিজেদের কর্মীদের সংযত করতে চেষ্টা করেননি কেন? এখনও বা নিজেদের কর্মীদের সংযত না করে খবরের কাগজে যা বেরুচ্ছে তা অতিরঞ্জন বলে প্রমাণ করতে চাইছেন কেন? যারা উৎপীড়িত, যারা নির্যাতিত, যাদের শঙ্কার সাথে বাস করতে হয় তাদের যদি কর্তৃপক্ষ থেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হয় আপনাদের ওপর অত্যাচার হয়েছে কি, তাহলে কি জবাব পাবেন, তা কি বলে দিতে হয় কাউকে? কোন আমলা তা না বুঝতে পারে, কিন্তু রাজনীতির লোক মাত্রই জানে আমি যে কথা বললে কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হবে নির্যাতিতরা সাধারণত সে কথাই বলে। খুব কম লোকই মুখের ওপর সত্য কথা বলতে পারে। আর যে কাকে ধরে সরকারি দলের নেতারা যদি মনে করেন এতে করে সংখ্যালঘুদের মনে আপনারা আস্থা সৃষ্টি করতে পারবেন তাহলে মূর্খের স্বর্গরাজ্যে বাস করেন আপনারা। শুধু সংবাদপত্রের রিপোর্ট নয়, দেশের অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কোটালিপাড়া, বাগেরহাট, ফেনী, নোয়াখালী গেছেন। তারা জানেন কি হয়েছে। মেয়েরা যে নির্যাতনের শিকার হয়েছে তাও তারা জানেন। ১৯৯২ সালে যখন সারা দেশে মন্দির ভাঙ্গা হলো তখনও বর্তমানে যারা ক্ষমতাসীন তাদের মধ্যে প্রধান দল ক্ষমতায় ছিলেন। তখনও দেশে যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়েছে তারা তা স্বীকার করেননি। এখনও হয়ত অতিরঞ্জন বলে অথবা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের চ্রান্ত বলে বিষয়টাকে লঘু করে দেবার চেষ্টা হবে। তাতে লাভ হবে না। শুধু দুর্গাপূজা সাড়ম্বরে পালনের আহ্বান জানালেই তার গ-ানি মুছে যাবে না। দেশের মধ্যে মানুষ যে উদ্বাস্তু হয়েছে তা মিথ্যা হয়ে যাবে না। মানুষ সহজে নিজের ঘরবাড়ি ছাড়ে না, জীবন ও সম্ভ্রম বিপন্ন না হলে কেউ ঘর ছাড়ে না-এটা কি সরকারি কর্তারা জানেন না?

আমার কাছে প্রশ্ন নির্বাচনে জেতার পরেও নৌকাকে ভোট দেয়ার অপরাধে কেন সংখ্যালঘুর ওপর এই জুলুম? এটা কি শুধুমাত্র সম্পত্তিলোভী শাসক নামধারী কিছু দুষ্কৃতকারীর কাজ অথবা জমিজমার লোভ না কি এর আরও গভীর তাৎপর্য বিদ্যমান? এবারকার হাঙ্গামার পর শুধু দেশের মধ্যে নয় প্রতিবেশী ভারতে পাড়ি জমাবার প্রবণতা বাড়বে এটা নিঃসন্দেহ। অতীতে তাই হয়েছে। ১৯৫০ সালে দাঙ্গা-হাঙ্গামার পর যখন দেশত্যাগের প্রবণতা ব্যাপকভাবে বাড়ল তখন সম্পাদিত হয়েছিল লিয়াকত-নেহরু চুক্তি। এই চুক্তির বদৌলতে এক দেশের সংখ্যালঘুদের আইনসঙ্গতভাবে অন্য দেশে থাকার অধিকার স্বীকার করে নেয়া হয়েছিল। ঐ চুক্তিতে দেশ বিভাগের ফলে উদ্ভূত মানবিক বা সামাজিক সমস্যার বিশেষত্ব স্বীকার করে নেয়া হয়েছিল। এই চুক্তি ১৯৭১ সালের মার্চে যখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় তখন বাতিল করা হয়। কিন্তু তাতে বাস্তুত্যাগের মাত্রা কমেনি। তা অব্যাহত ছিল। কখনও কম, কখনও বেশি-সংখ্যালঘুদের বাস্তুত্যাগ অব্যাহতই ছিল পুরো সময়কাল জুড়ে। তবে তার পরও এ দেশে দেড় কোটির মতো ধর্মীয় সংখ্যালঘু এখনও বাস করছেন। প্রচার করা হয় এরা আওয়ামী লীগের রিজার্ভ ভোট। কাজেই মনে করা হয় এদের সংখ্যা যত কমবে তত বিএনপি বা অন্যদের পক্ষে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মোকাবিলা করা সহজ হবে। অন্যদের বলতে এখানে অন্যান্য দক্ষিণপন্থী দলের কথা বোঝাচ্ছি। বামপন্থীরা এখন আর নির্বাচনে কোন ফ্যাক্টর নয়। এই প্রসঙ্গ

এখানে উত্থাপন করছি নির্বাচনের পরে নিজেদের দলের কর্মীদের সংযত করতে চেষ্টা করলেন না কেন- সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে। এটা কি শুধুই দলের কর্মীদের বা প্রভাবাধীনদের সংযত করার ক্ষেত্রে নেতৃত্বের অপারগতা না কি এ প্রশ্নে তাদের অনীহা ছিল। আর অনীহা যদি থেকে থাকে তাহলে তা কেন? এই প্রশ্ন সচেতন মানুষ, বিশেষত নির্যাতিতদের কাছে যে আছে সেটা প্রধান সরকারি দলের নেতাদের বুঝতে হবে। সাড়ম্বরে দুর্গাপূজার আহ্বান নিঃসন্দেহে শুভ, তবে এটুকুই যথেষ্ট নয়। আস্থা না বাড়াতে পারলে উৎসব হয় না। হুকুম দিয়ে তা কখনো হয় না।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগ সম্পর্কেও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অভিযোগ নেহায়েত কম নয়। ক্ষমতায় থাকাকালীন তাদের স্থানীয় নেতাকর্মীরা এলাকায় এলাকায় দাপট কম দেখাননি। কালিদাস বড়ালের হত্যাকাণ্ডের কথা শুধু বাগেরহাট নয় দেশের মানুষও ভোলেনি। তারপরও সংখ্যালঘুরা তাদের ভোট দিয়ে নির্যাতনের শিকার হলো। তাদের কেউই কার্যকরভাবে পাশে দাঁড়ালেন না। স্থানীয় নেতাকর্মীরা হামলার মুখে প্রতিরোধ রচনা না করে পালিয়ে গেলেন। আর কেন্দ্রীয় নেতারা শুধু কথায় সহানুভূতি প্রকাশ করে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের ঘটনাটি থেকে রাজনৈতিক ফায়দা আদায় করতে চাইলেন। অন্তত সংখ্যালঘুদের অনেকে তাই মনে করে। সংখ্যালঘুদের এই মানসিকতার সুযোগে পৃথক নির্বাচনের কথাটা সামনে নিয়ে আবার চেষ্টা যে হতে পারে, সেটা আশঙ্কা করা অমূলক নয়। তা যদি হয় তাহলে সংখ্যালঘুদের স্থায়ীভাবে রাজনীতির মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে। এবারের হাঙ্গামার পিছনে এটাই কি উদ্দেশ্য?

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০১

সবই অতিরঞ্জিত আর নাটক—সত্যটা কী

নির্মল সেন

বক্তৃতা তো কম দিচ্ছেন না। ক্ষমতায় বসেই ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করতে শুরু করেছেন। কঠিন কঠিন ভাষণ দিয়ে বিএনপি নেতারা বাজার গরম করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ গরম ভাষণ আদৌ দেশের বাস্তব পরিস্থিতির প্রতিফলন ঘটায় কি! দেশের নির্বাচন-উত্তর হাঙ্গামাকে আপনারা অতিরঞ্জিত বলে আখ্যায়িত করছেন। অতিরঞ্জনের অর্থ হচ্ছে- হ্যাঁ একটু কিছু ঘটছে। তবে অত বেশি নয়, যেমন করে পত্রিকায় আসছে। তাহলে মন্ত্রিসভার সদস্যরা পরিষ্কার করে বলুন না, সত্যি সত্যি কোথায় কি ঘটেছে। আপনাদের কথায় মনে হচ্ছে আপনাদের কাছে সত্য ঘটনার খবর আছে। দয়া করে সেই সত্য ঘটনার বর্ণনা দিলে ভাল হয় না? আপনারা বারবার বলছেন খবর অতিরঞ্জনের কথা। আদৌ বলছেন না আপনাদের জানা ঘটনার কথা।

আমার অভিজ্ঞতা ভিন্ন রকম। আমি ইতোমধ্যে কিছু কিছু এলাকায় গিয়েছি। সর্বত্রই একটা ভয় এবং শঙ্কার পরিবেশ লক্ষ্য করেছি। আর বিধ্বস্ত দেখেছি গ্রাম-গ্রামান্তরে প্রশাসন ব্যবস্থা। জেলা শহরের কথা বললে মনে হয় সবাই সবকিছু জানেন, তারা পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তারা রাজনীতি করেন না। তাই বুঝে উঠতে পারছেন না। ডিসি, এসপি আর কিছু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নিয়ে সফর করলে কোনো কিছু জানা যায় না। যারা জানে তারা মুখ খুলছে না। কারণ তাদের মুখ খোলার পর নিরাপত্তা কে দেবে? ডিসি, এসপি আর আমাদের মতো দূর থেকে যাওয়া নেতারাও তাদের কাছে গিয়ে ২/১০ মিনিট থেকেই

উধাও। তারপরই সেই একই মুখ। একই পাড়া-পড়শি। কে তাদের বাঁচাবে? মফস্বলে দেখেছি বিপদগ্রস্ত পুলিশ। একটি থানায় তাদের সংখ্যা কতজন। কটা হাতিয়ার। ক'টা হাঙ্গামা তারা সামাল দিতে পারবে। তাদের জীবন আছে। তাদের জীবনের প্রতিও হুমকি আছে। রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ বাঁচতে না পারলেও তাদের বদলি করতে পারে। বিষিয়ে তুলতে পারে তাদের জীবন এবং এ পরিস্থিতি চলছে আজ গ্রামবাংলায়। এবং এ পরিস্থিতি শুরু হয়েছে নির্বাচন শেষ হওয়ার পর-পুলিশের করার কিছু নেই।

দেখা গেলো নির্বাচন শেষ হওয়ার পর দেশে কোনো সরকার নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদের বলতে শোনা গেলো-তাদের কেউ মানছে না। কেউ শুনছে না। সব মহলের ধারণা হচ্ছে এদের কথা শুনে কি হবে। এরা আজ আছে কাল নেই। এদের কথা শুনে পরবর্তী সরকারের ধমক শোনার কোনো প্রয়োজন আছে কি? কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং নতুন চার জোটের সরকারের নীতি একই হবে তার নিশ্চয়তা কোথায়। হয়তো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্দেশে পুলিশ গ্রাম-গ্রামান্তরে কাউকে গ্রেপ্তার করে। তারপর দেখা গেলো নতুন সরকার বলছে, ওদের ছেড়ে দাও। সব ঘটনা অতিরঞ্জিত। তোমরা জান না যে, ওই ঘটনা আদৌ ঘটেনি। পত্রিকাওয়ালারা প্রথম থেকেই আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে।

তাই আমি মন্ত্রী মহোদয়দের বলছি, দয়া করে তথ্যনির্ভর মন্তব্য করুন। আপনারা কোথাও যাওয়ার আগে পুলিশ যে ব্যবস্থা নিয়েছে সে সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিন। পর্যালোচনা করুন। আপনারা হুট করে ঢাকায় বসে যে মন্তব্য করেন তা যে অনেক এলাকায় পুলিশকে বিপর্যস্ত করে তা আপনারা বুঝতে পারেন কি। ধরুন আপনারা ঢাকায় থেকে বললেন, বাগেরহাটে কিছু হয়নি। সবই অতিরঞ্জিত। অপরদিকে আপনাদের থানা পুলিশ বিভিন্ন ঘটনায় কাউকে হয়তো গ্রেপ্তার করেছে। আর আপনারা বললেন কিছু হয়নি। তাহলে পরিস্থিতি কি দাঁড়ায়। এবার আপনাদের ভাষণ শুনে আপনাদের চেলাচামুণ্ডারা তো থানা পুলিশের ওপর চড়াও হবে। এ ঐতিহ্য এতদিন আপনারা দেখিয়েছেন। তখন কি আপনারা কেউ পুলিশকে বাঁচাবেন। বাড়তি বলবেন, ব্যাটা আওয়ামী লীগের দালাল-আমাদের ছেলেদের গ্রেপ্তার করে আমাদের দুর্নাম দিচ্ছিস। তাই বলছিলাম যারা উঁচুস্থানে আছেন, মন্ত্রী হয়েছেন, একেবারে হেলিকপ্টারে চড়ে বন্যা দেখার মতো না দেখে কোথাও নেমে বাড়ি বাড়ি গেলে পারতেন। আপনারা আমাদের দেশের মানুষ। গ্রামের পথে হাঁটাচলার নিশ্চয়ই অভ্যাস আছে।

এই যে সংবাদপত্রে ছাপা হলো প্রায় শ'খানেক নারী-শিশু ভারতে যাওয়ার পথে সাতক্ষীরার কলারোয়ায় ধরা পড়েছে। শুনলাম ওরা নাকি নারী-শিশু পাচারকারীদের খপ্পরে পড়েছে। কিন্তু এ খবর সত্য কি। আমিও খবর নিয়ে জানলাম, ওরা প্রাণভয়ে ভারতে চলে যাচ্ছিল। এ কথা আমি লিখলে নিশ্চয়ই বলা হবে এটা আর এক ধরনের অতিরঞ্জন।

গত বুধবার এগার দলের পক্ষ থেকে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়ায় গিয়েছিলাম। দেখলাম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ। তার ক'দিন আগে কোটালীপাড়া সদরে যাওয়ার কথা ছিলো। কথা ছিলো স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের। অসংখ্য মানুষ ভিড় জমাল। না তিনি এলেন না। রাতে টেলিভিশনে দেখা গেলো তিনি কোটালীপাড়া সফর করেছেন। বিক্ষুব্ধ মানুষ ওই টিভির কাছে জানতে চাইল- এ মিথ্যাচার কেন। টিভি কর্তৃপক্ষ বললেন, আমাদের বলার কিছু নেই। কেউ কি বলবেন কেন আপনারা এ ধরনের কর্মসূচি দেন? এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রথম, সফর হয় মিথ্যাচার পরিপূর্ণ। এ মিথ্যাচারে এবং কোটালীপাড়ায় এ নিয়ে ক্ষোভ আদৌ কোনো মন্ত্রিসভার পক্ষে শুভ সূচনা নয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোটালীপাড়ায় গেলেন না। তিনি কোটালীপাড়ার রামশীল গেলেন হেলিকপ্টারে। নিজ কানে খবর শুনলাম, তিনি নিচ দিয়ে উড়ে গিয়েছিলেন। কাউকে কোথাও দেখেননি। দেখেছেন মাত্র কিছু মানুষকে হেলিকপ্টার দেখে ছুটে পালাতে।

আমি বলবো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সত্য কথা বলেছেন, তিনি হয়তো তার বিমানবাহিনীর চাকরির অভ্যাস থেকে বুঝতে পারেননি তার জন্য কেউ কোটালীপাড়ার রামশীলের মাঠে-ময়দানে অপেক্ষা করেনি। হাজার হাজার আশ্রয় প্রার্থী। হ্যাঁ, আবার জোর দিয়ে বলছি হাজার হাজার আশ্রয় প্রার্থী বিভিন্ন বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের তো মাঠে-ময়দানে মন্ত্রীর হেলিকপ্টার দেখার জন্য দাঁড়িয়ে থাকার কথা নয়। তবে এ দৃশ্য তিনি দেখতে পারতেন যদি তার সংগঠন বিএনপির ওখানে অস্তিত্ব থাকতো বা পুলিশকে নির্দেশ দেয়া হতো লোক জমা করার। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনীতি করেননি। তাই এ কৌশল হয়তো তার মাথায় আসেনি। তবে সত্যি সত্যি ওই এলাকায় সাহায্য করার নামে যদি সাহায্য দ্রব্য নিয়ে তিনি যেতেন, যদি তা মানুষ জানত তাহলে নিরাশ্রয় মানুষগুলোকে দেখা যেত। তারা তাদের অভিযোগ জানাতে আসত। কিন্তু এ কাজটি কর্তৃপক্ষ কি করেছেন? তারা কি রামশীলের মানুষকে জানিয়েছিলেন যে, ওইদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যাবেন-আশ্রিত মানুষগুলো তাদের কথা বলতে পারবে।

আমার মনে হয়, সরকারি মহলের মাথায় এ বুদ্ধি আদৌ খেলেনি। নইলে এককালের বিমানবাহিনী প্রধান আজকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এভাবে শূন্য চোখে ফিরে আসতে হতো না। কেউ তাকে বুঝানোর চেষ্টা করেনি যে, যুদ্ধক্ষেত্র আর বিপর্যস্ত মানুষ দেখা এক নয় বা বিমান থেকে বন্যাদুর্গত এলাকা দেখা এক নয়। এমনি কিছু না দেখে তিনি ঢাকায় ফিরলেন। শুনেছি তিনি আগৈলঝাড়ায় একটি মতবিনিময় সভা করেছেন এবং একেবারে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ফিরেছেন যে, ওই এলাকায় কোনো কিছু ঘটেনি। সবই অতিরঞ্জিত, সবই নাটক। তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বিঘ্নে এ কথাগুলো বলে গেলেন।

কিন্তু এমন মন্তব্য কি করা যায় কোথাও না গিয়ে, কিছুক্ষণ হেলিকপ্টারে উড়ে। এ কথা বলার জন্য জানি না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হেলিকপ্টারের তেল কেন খরচ করছেন। এ কথা বলার জন্য ঢাকায় থাকাই যথেষ্ট নয় কি। জেলায় জেলায় আপনাদের ডিসি আছে, এসপি আছে, তাদের কাছে ফোন করলেই তো জানা যায় এবং সরকারিভাবে এ কথাগুলো প্রথম থেকে বলা হচ্ছে তারপরও আমার একটি প্রশ্ন-জনাব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আপনাদের ওই এলাকার নির্বাচিত সংসদ সদস্য কোথায়। তিনি কি আপনার সঙ্গে ছিলেন। তিনি কি কখনও রামশীলে গেছেন। শুনেছিলাম এবার তিনি সংখ্যালঘুদের ভোটও পেয়েছেন। এটা তার নৈতিক দায়িত্ব ছিলো। আপনার উচিত ছিলো তাকে নিয়ে এলাকায় যাওয়া, সবার সুখ-দুঃখের কথা শোনা। আপনি তা না করে সিনেমার ভঙ্গিতে আকাশে এক চক্কর মেরে ঢাকায় এসে বললেন-সব নাটক। সব অতিরঞ্জিত। কাগজে পড়েছি আপনি আগৈলঝাড়ায় মতবিনিময় সভা করেছেন। টেলিভিশনে যাদের চেহারা দেখেছি তারা বড্ড পুরনো। বরাবর এদের কথার সঙ্গে কিছু চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্ক ছিলো এবং থাকে। একেবারে পুরনো সরকারগুলোর মতো এ পরিচিত চামচাদের কেন এনেছিলেন ওই মতবিনিময় সভায়? ওরা সত্যি করে মিথ্যা কথাগুলো বলেছেন সবিনয়ে। অথচ পূর্বনির্ধারিত কোটালীপাড়ার মতবিনিময় সভায় আপনি যাননি। যেখানে সত্য কথা শুনতে পারতেন তাদের পরিহার করেছেন।

তবে আমার প্রশ্ন আপনাকে নিয়ে নয়। আমার প্রশ্ন আবদুল মান্নান ভূঁইয়াকে নিয়ে। তিনি বড্ড চেনা। এককালের আন্দোলনের সাথী। আমি ভাবতে পারিনি 'তিনিও সেদিন সাংবাদিক সম্মেলনে একই কথা বলবেন। বলবেন সব অতিরঞ্জিত এবং নাটক। আমি বিশ্বাস করি জনাব মান্নান ভূঁইয়া ওই এলাকায় গেলে তার অতীত জীবনের অনেক রাজনৈতিক সাথীর সাক্ষাৎ পেতেন। তারা আজ বরিশাল জেলা থেকে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ার রামশীলে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের অনেকে এখন ফিরতে চেষ্টা করছে। ভয় এবং শঙ্কায় পারছে না। এ পরিবেশে তাদের এলাকায় দুর্গাপূজা হওয়ার পরিবেশ নেই। জোর করে বা টাকা দিয়ে ধর্মের কাজ করানো

যায় না এবং উচিত নয়।

তা হলে ঘটনাটি কী। ঘটনার শুরু নির্বাচনের পূর্বে। গৌরনদী এলাকা বরাবর আওয়ামী লীগ-বিএনপি সংঘর্ষের জন্য বিখ্যাত। এ সংঘর্ষ তীব্র হয় নির্বাচন প্রাক্কালে। এলাকার সংখ্যালঘুরা আওয়ামী লীগকে ভোট দেয় বলে নির্বাচনের পর তাদের ওপর শুরু হয় দানবীয় হামলা। কারও পা ভেঙে দেয়া হয়, কারও ঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়, কারও গরু নিয়ে যায়। আবার কোনো বাড়িতে মেয়েরা হয় ধর্ষিতা। ফলে প্রাণভয়ে সংখ্যালঘুরা পালিয়ে আসে কোটালীপাড়ার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত রামশীলে। ওদিকে যাদের তারা ভোট দিয়েছে তাদের নেতা সাবেক সংসদ সদস্য হাসানাত আবদুল-াহ পালিয়েছে দেশ থেকে। বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয় গ্রহণকারীদের সংখ্যা হাজার হাজার।

তবে এখানে একটি বিশেষ ঘটনাও আছে। এদের বলা যেতে পারে ২০০১ সালের রাজাকার। এরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক। এরা বিএনপি করে বলে দাবি করে। এরা এতদিন কোণঠাসা ছিলো। এরা এবার প্রতিশোধ নিচ্ছে। এরা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সন্ত্রাসীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে এলাকায়। তারপরও চলছে তাণ্ডব। এরা সবাই চিহ্নিত। এই ২০০১ সালের রাজাকাররাই এখন প্রবল পরা□ান্ত। রামশীলে আশ্রয় গ্রহণকারী সংখ্যালঘুরা জানে না কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। যুবতী মেয়ে বা অন্য মহিলারা বাড়ি থাকে না। কোনদিন দিনের বেলা পুরুষরা বাড়ি ফেরে। সন্ধ্যায় আবার ফিরে যায়।

কোনো দেশে এ পরিস্থিতি চলতে পারে না। এর বিহিত প্রয়োজন। যে মন নিয়ে পূজা করা যায় সে মন কোথাও নেই এরপর আছে পূজা করার অনুরোধ এবং প্রচ্ছন্ন হুমকি।

তবে এ সমস্যার সমাধান নেই তা নয়-এ কথা আমি পত্রিকান্তরে লিখেছি। কিন্তু যদি বর্তমান মন্ত্রিসভা মনে করে সব অতিরঞ্জিত এবং নাটক তাহলে মনে করব আপনারা সমাধান চান না। এ পরিস্থিতি বজায় রেখে আপনারা একটি সম্প্রদায়কে ভিটেমাটি ছাড়াতে চান। আপনাদের কথাবার্তা আমাদের এমনি করে ভাবতে বাধ্য করছে। এরপর আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং স্থানীয় সরকার ও সমবায়মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করব- বলবেন কি দেশে কি ঘটেছে? কতটুকু আপনারা জানেন। বলুন কোন কোন ঘটনায় রং লাগিয়ে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। তাই এদেশে সংখ্যালঘুদের দিয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পূজা করাতে হলে আপনাদের সত্য তথ্য নিয়ে সামনে আসতে হবে। অনেক কথা বানানো আর নাটক আর আপনার সত্যবাদী সেই মহাভারতের যুধিষ্ঠির-এ কথা বিশ্বাস করানো যাবে কি। এ ব্যাপারে আন্তরিক হতে হবে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। অবিশ্বাস দূর করতে হবে। এলাকায় জনপ্রতিনিধি এবং গণ্যমান্য লোকদের নিয়ে বসতে হবে। তা না করে সব অতিরঞ্জিত আর নাটক বললে কোনো সমস্যার সমাধান হবে না।

যুগান্তর, ২০ অক্টোবর ২০০১

‘সংখ্যাগুরু’ ‘সংখ্যালঘু’ বিভাজনের জন্য দায়ী বেগম খালেদা জিয়ার দল

শাহরিয়ার কবির

মধ্য জুলাইয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিশেষভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর যে সুপরিকল্পিত হামলা ও নির্যাতন শুরু হয়েছে একশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও পরিস্থিতির তেমন কোনও পরিবর্তন হয়নি। বিএনপি, জামাতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট নির্বাচনের আগে থেকেই হিন্দুদের হুমকি দিচ্ছিল— নৌকায় ভোট দিলে তাদের দেশছাড়া করা হবে, হিন্দুদের ভোট দিলে নামাজ কবুল হবে না, তাদের জানাজাও পড়ানো হবে না, এবারের নির্বাচন হচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের লড়াই, ধুতি আর টুপির লড়াই প্রভৃতি। হিন্দুদের হুমকি দিয়ে, তাদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়ে, তাদের উপর বিভিন্নভাবে হামলা চালিয়ে বিপুল সংখ্যক হিন্দু ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে যেতে দেয়া হয়নি। তারপরও বহু হিন্দু ভোটার ভোট দিয়েছেন, যারা ভোট দিয়েছেন কিংবা যারা ভোট দিতে পারেন নি সবাই বিত্ত বয়স ক্ষেত্র নির্বিশেষে নজিরবিহীন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর এই নির্যাতনের বাহ্যিক কারণ হচ্ছে আওয়ামী লীগের প্রতি তাদের সমর্থন। যদিও বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও বাম দলগুলোকে ভোট দেয় কিন্তু সাধারণভাবে তারা আওয়ামী লীগের সমর্থক হিসেবে পরিচিত। অধিকাংশ হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় দেখা গেছে প্রবল বাধা ও ভয়ভীতি সত্ত্বেও নৌকার প্রার্থীরা বেশি ভোট পেয়েছেন। এরই মাশুল তাদের গুণতে হচ্ছে নির্বাচনের রাত থেকে আজ অবধি। হত্যা, ধর্ষণ, শারীরিক নির্যাতন, সম্পদ লুণ্ঠন, গৃহে অগ্নিসংযোগ, বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ, সর্বশেষ মন্দির ও প্রতিমা ভাঙচুর— প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কোনও পথই বাকি নেই। তবে এই সাম্প্রদায়িক নির্যাতন নিছক আওয়ামী লীগকে ভোটদানের কারণে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বললে প্রকৃত সত্য আড়ালে থেকে যাবে। বিএনপিসহ বাংলাদেশে পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে যে কোন অজুহাতে হিন্দুদের উপর নির্যাতন চালিয়ে তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করা, বাংলাদেশকে ঠিক পাকিস্তানের মতো হিন্দুশূন্য করে একটি মনোলিথিক ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করা।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দায়িত্ব গ্রহণের পর গত ১৯ অক্টোবর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তাঁর প্রথম ভাষণে বলেছেন, ‘এ দেশের মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টানসহ সকল ধর্মের, সকল আদিবাসী প্রতিটি মানুষই বাংলাদেশী। এই চমৎকার ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশে যারা সংখ্যালঘু শব্দটি ব্যবহার করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমাদের মাঝে বিভক্তির দেয়াল তুলতে চায় তাদের বিষয়ে দেশবাসীকে আমি সতর্ক করে দিচ্ছি। আমি বলতে চাই বিএনপি ও চারদলীয় জোটের এই বিশাল বিজয়ের পেছনে এ দেশের সকল ধর্মের, বর্ণের এবং নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অকুণ্ঠ সমর্থন আছে। ... বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সম্প্রীতির দেশ।’

কিংবদন্তী বলে রোম যখন আগুনে পুড়ছিল রোমান সম্রাট নিরো তখন বাঁশী বাজাচ্ছিলেন। যখন বাংলাদেশে নজিরবিহীন সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার হয়ে আক্রান্ত হিন্দুরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে দেশ থেকে দেশান্তরে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে বেড়াচ্ছেন, আশ্রয় না পেয়ে খোলা আকাশের নিচে আর লঙ্গরখানায় এসে ঠাঁই নিচ্ছেন তখন প্রধানমন্ত্রী পরিস্থিতি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ না করে বেমালুম বলে ফেললেন, ‘বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সম্প্রীতির দেশ!’

প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যে আমরা ক্ষুব্ধ হলেও বিস্মিত হইনি। বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানাবার নীলনকশা অনুযায়ী কাজ করতে গেলে নির্বাচনে যেমন অদৃশ্য ও দৃশ্যমান বিভিন্ন ধরনের কারচুপির আশ্রয় নিয়ে সংসদে দুই তৃতীয়াংশের বেশি আসন কব্জা করতে হয়, একইভাবে বিশেষ দলের সমর্থক এই অজুহাতে হিন্দুদের উপর নির্যাতন চালিয়ে তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করতে হয়। ’৯২ সালে ভারতে বাবরী মসজিদ ভাঙার অজুহাতে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল। সেই সুযোগে সাম্প্রদায়িক দুষ্কৃতকারীরা কয়েক লক্ষ হিন্দুকে দেশছাড়া করেছিল। তখনও সাম্প্রদায়িক সহিংসতার আগুনে সারা দেশ যখন জ্বলছিল— জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেছিলেন, কোথাও কিছু ঘটেনি, বাংলাদেশে চমৎকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজ করছে!

বাংলাদেশকে পাকিস্তানের মতো একটি মনোলিথিক ইসলামিক রাষ্ট্র বানাবার চক্রান্ত শুরু হয়েছে ’৭৫-এ বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর জেনারেল জিয়ার ক্ষমতা গ্রহণের কাল থেকে। সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর দ্বারা প্রজাতন্ত্রের চার মূলনীতির অন্যতম ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ ও ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদ’ খারিজ করে এবং মুখবন্ধে ‘বিসমিল-হ ...’ সংযোজন করে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও আদিবাসীদের বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে— এ সংবিধান তাদের নয়। ধর্মীয় কারণেই একজন অমুসলিম কখনও সংবিধানের মুখবন্ধে ‘বিসমিল-হ ...’ গ্রহণ করতে পারে না, ‘বিসমিল-হ ...’ খচিত সংবিধানকে নিজের ভাবতে পারে না। ’৭২-এর সংবিধানে রাষ্ট্রের চার মূলনীতির অন্যতম হিসেবে ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদ’ ও ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ গ্রহণ করতে হয়েছিল মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্মের মানুষের সমমর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। যে মুহূর্তে বাংলাদেশের একজন হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টানের বাঙালিত্বের পরিচয় থাকে না, যখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃতি দেয়া হয় সংখ্যাগুরুর ধর্মকে তখন সাংবিধানিকভাবেই গুরু-লঘু বিভাজন সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রে এই বিভাজন সৃষ্টি করেছে বিএনপি ও জাতীয় পার্টি, যাদের নিয়ে এবার গঠিত হয়েছে বেগম জিয়ার বি-জা-ই-জা সরকার।

‘সংখ্যালঘু’ শব্দটি অপমানজনক শুধু নয়, গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও মানবিক মূল্যাবোধেরও পরিপন্থী। আমরা কেউ চাই না বাংলাদেশে কোন সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু হিসেবে চিহ্নিত করা হোক। বাংলাদেশে বসবাসকারী মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান সবাই জাতিগত পরিচয়ে বাঙালি এবং নাগরিকত্বের পরিচয়ে বাংলাদেশী। বাঙালি জাতিসত্তা ছাড়াও বাংলাদেশে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভেতর চলি-শটিরও বেশি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অধিবাসী রয়েছে, সংবিধান যাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেনি। সংবিধানের এই অস্বীকৃতির কারণেই বাংলাদেশ আজ বিশ্বের কাছে ‘ইসলামিক রাষ্ট্র’ হিসেবে পরিচিত।

জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় এসে বাংলাদেশকে শুধু হিন্দুশূন্য করার প্রক্রিয়াই আরম্ভ করেননি, একই সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী আদিবাসীদের বিতাড়ন করে সেখানে সমতলের বাঙালিদের উপনিবেশ স্থাপন করেছেন। ’৭৫ থেকে ’৯৬ পর্যন্ত বিএনপি ও জাতীয় পার্টির শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী আদিবাসীদের জনসংখ্যা ৮৩ ভাগ থেকে কমে শতকরা ৫২ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। একুশ বছরে ষাট হাজারেরও বেশি চাকমা, ত্রিপুরা ও মারমা সম্প্রদায়ের মানুষকে ভারতে দুর্বিসহ উদ্বাস্তু জীবন যাপন করতে হয়েছে, যারা স্বদেশে ফিরেছে আওয়ামী লীগের আমলে শান্তি চুক্তির পর।

পার্বত্য চট্টগ্রামকে আদিবাসীশূন্য করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ’৪৭-এর পর থেকে। ’৪৭-এ পাকিস্তান সৃষ্টির পর পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জনসংখ্যা ছিল ৯৭ ভাগেরও বেশি। আইয়ুব খানের আমলে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করতে গিয়ে লক্ষাধিক আদিবাসীকে জমিহারা করা হয়েছে।

চলি-শ হাজারেরও বেশি আদিবাসী তখন স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল, যারা আর ফিরে আসেনি। বাংলাদেশ পর্বে জেনারেল জিয়া, জেনারেল এরশাদ ও খালেদা জিয়ার প্রথম সরকার সেই পাকিস্তানি নীতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও জাতিসত্তাসমূহকে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়নের মাধ্যমে। ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ও পরে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন (যার কবল থেকে আদিবাসীরাও রেহাই পায়নি) বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের পাকিস্তানিকরণ প্রক্রিয়ার অন্তর্গত।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেছেন, চারদলীয় জোটের এই বিশাল বিজয়ের পেছনে সকল ধর্মের মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন আছে। তাঁর কথা যদি সত্য হয় তাহলে নৌকায় ভোট দেয়ার অপরাধে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর কেন এই নজিরবিহীন নির্যাতন এর জবাব তাঁকে দিতে হবে। আক্রান্তকারীরা বলেছেন সন্ত্রাসীরা হামলার সময় নৌকায় ভোট দেয়ার জন্য তাদের অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেছে। সাম্প্রদায়িক হামলার যতগুলো ঘটনা ঘটেছে তার দশভাগের এক ভাগও থানায় নথিবদ্ধ করা হয়নি। অভিযুক্ত যে কজনকে পুলিশ এ পর্যন্ত গ্রেফতার করেছে তারা সবাই বিএনপির কর্মী। গত একশ দিনে আক্রান্ত একজন হিন্দুও এই মর্মে অভিযোগ করেননি যে, আওয়ামী লীগের কেউ তাদের উপর আক্রমণ করেছে। বরং নির্বাচনের পর বিভিন্ন জায়গায় আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের উপরও নির্যাতনের খড়গ নেমে এসেছে।

বেগম খালেদা জিয়া যদি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন হিন্দুরা তাদের ভোট দিয়েছে বলে তাদের উপর এই নির্যাতন তাহলে তো সবার আগে আক্রান্তদের পাশে দাঁড়ানো উচিৎ ছিল তাঁর। এই সুযোগে আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা যেতো। তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সে চেষ্টা করেছিলেন এবং ব্যর্থ হয়েছেন। গত ২০ অক্টোবর একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সংবাদ সম্মেলনে সিরাজগঞ্জের এক নির্যাতিত পরিবার উপস্থিত ছিল। ধর্ষিতা কিশোরী পূর্ণিমা শীলের মা বাসনা রানী শীল কান্নাভরা গলায় সাংবাদিকদের বলেছেন নির্বাচনের আগে যখন তাদের হুমকি দেয়া হয়েছিল ভয়ে তারা বলেছিলেন ধানের শীষে ভোট দেবেন। তারপরও পাশবিক নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পায়নি উল-াপাড়া থানার অনিলচন্দ্র শীলের পরিবার। থানায় বসে বিএনপির স্থানীয় সাংসদ ২০ হাজার টাকার বিনিময়ে অভিযোগ প্রত্যাহারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন কিন্তু সফল হননি। বাসনারাণী বলেছেন টাকার বদলে ইজ্জত ফিরে পাওয়া যায় না। তার কিশোরী কন্যা বলেছে— সে এর বিচার চায়, যেন আর কেউ তার মতো লাঞ্ছিতা না হয়। পূর্ণিমাকে যারা গণধর্ষণ করেছে তাদের অধিকাংশের নাম সে বলেছে। তারা সবাই বিএনপির সন্ত্রাসী, যে কারণে বিএনপির সাংসদ চাপ দিচ্ছেন অভিযোগ প্রত্যাহারের জন্য। এদের দিয়েই কি বেগম খালেদা জিয়া সন্ত্রাস দমন করবেন, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করবেন?

বাংলাদেশে সকল ধর্মের মানুষ সমান অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে বাস করবে— এরই জন্য একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। পাকিস্তান ছিল 'ইসলামিক রাষ্ট্র' এবং এর চরিত্র সাম্প্রদায়িক। পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ স্বাধীন করার প্রয়োজন ছিল এ কারণে যে আমরা ধর্মরাষ্ট্র চাইনি। ধর্মের নামে নির্যাতনের অবসান চেয়েছিল সাড়ে সাত কোটি বাঙালি। আমরা সব সময় বলেছি বাংলাদেশে সকল ধর্মের মানুষের অধিকার ও মর্যাদা সমান হতে হবে। '৭২-এর সংবিধানের মুসলমানিকরণের জন্য বাংলাদেশ স্বাধীন হয়নি। যারা এ কাজ করেছে, যারা এ কাজ সমর্থন করে তাদের জবাব দিতে হবে ৩০ লক্ষ শহীদের বিদেহী আত্মার কাছে। বাংলাদেশকে যদি মুসলিম রাষ্ট্রের অভিধায় পরিচিত হয় তাহলে পাকিস্তান ভাঙবার কী প্রয়োজন ছিল? বাংলাদেশকে ইসলামিক রাষ্ট্র বানিয়ে যারা অমুসলিমদের সংখ্যালঘু, প্রান্তিক বিপন্ন জনগোষ্ঠীতে পরিণত করেছে তাদের একদিন জনতার আদালতে দাঁড়াতে হবে।

সংখ্যায় কম, নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় বলেই হিন্দুদের বার বার নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে। ভারতে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হলেও সাম্প্রদায়িক হামলা হলে তারা রুখে দাঁড়ায়। কারণ সেখানে তারা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক শক্তি হিসেবে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের শক্ত জমিনের উপর দাঁড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ও আদিবাসীদের পায়ের নিচে সেই জমিন নেই। সন্ত্রস্ত, বিপন্ন এই মানুষদের তাই শওকত ওসমানের উপন্যাসের মতো ('ক্রীতদাসের হাসি') চাবুক মেরে হাসাতে হয়, ধমক দিয়ে সাড়ম্বরে উৎসব করতে বলা হয়। মানবতার এই অপমান বাঙালি আর কতকাল মাথা নত করে সহ্য করবে?

জনকণ্ঠ, ২১.১০.২০০১

কাফফারা সবাইকে দিতে হবে আগে অথবা পরে
মুনতাসীর মামুন

ছবিটি অনেক দেখেছেন, জনকণ্ঠ বা সংবাদের পাতায়। সংবাদের প্রথম পৃষ্ঠার ওই ছবিটি পূর্ণিমার, যখন চোখে পড়ল সকালে, তখন আপনা-আপনি চোখে পানি চলে এল। কিন্তু কেন? এতো বছর এতো বিপর্যয়, এতো হুমকির মুখেও তো কখনো বিপর্যস্ত বোধ করিনি। খানিক পর অনুধাবন করলাম, আমারও একটি মেয়ে আছে পূর্ণিমার বয়সী এবং আমি ভেবেছিলাম, এই ছবিটি তো আমার মেয়েরও হতে পারতো। তার পর সারাদিন, ফোন পেয়েছি অনেক, রাস্তাঘাটে কথাবার্তা হয়েছে অনেকের সঙ্গে। প্রায় সবাই বলেছেন, মেয়েটি তো আমার মেয়ে বা আমার বোন হতে পারতো। যারা মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে ছিলেন, তাদের অনেকে সমষ্টিগত ডিপ্রেশনে ভুগছেন। পূর্ণিমার একটি ছবি মুখঢাকা দুহাত দিয়ে, কিন্তু কী সাহস এসে হাজির হলো আমাদের সামনে, যেন চড় মেরে গেল বাংলাদেশকে। আমরা কেউ তা বুঝি না। আজ মধ্যবয়স শেষে মনে হয়েছে, এতো দেশ থাকতে কেন বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করলাম? না, এটা আপনাদের কাউকে উদ্দেশ্য করে নয়, এটি নিজের খেদোক্তি মাত্র।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরেও দৈনিক পত্রিকায় ঠিক এমন একটি ছবি বেরিয়েছিল। মুখঢাকা কিশোরীর। সে ছবি দেখেও অনেকে কেঁদেছিল। পাকি কর্তৃক ধর্ষিত বিধ্বস্ত বাংলাদেশের ছবি। কোনো অমিল নেই ছবি দু'টির। পাঞ্জাবি পাকি নেই বটে, কিন্তু তাদের সহযোগী, প্রত্যক্ষ সহযোগী অনেকের বাড়ী-গাড়িতে এখন বাংলাদেশের পতাকা। অনেকে আওয়ামী বিরোধিতায়, প্রবল প্রতিহিংসার কারণে এসব ভুলে গেছেন। কিন্তু জাতি হিসেবে আমরা যে না এগিয়ে পিছিয়েছি এটিই তার প্রমাণ। পাকিস্তান করে কি কোন লাভ হয়েছিল আমাদের? বা হবে কখনো? ১৯৭১-এ পাকি সেনাদের টার্গেট ছিল সব বাঙালি, নির্দিষ্টভাবে হিন্দুরা। অধিকাংশ হিন্দু তখন পালিয়েছে, অনেকে নাম ভাড়িয়ে থেকেছে। মুসলমানদেরও তথৈবচ অবস্থা। জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তুম মুক্তি হ্যায়, আওয়ামী হ্যায়? কারণ, তা হলেই সে হিন্দু নাম মুসলমান হতে পারে। তবে মুসলমান বলে পার পেয়ে গেছেও অনেকে, হিন্দুরা পায়নি। সে সময় পাকি সেনা সরকার বলেছিল, এ-ধরনের সংবাদ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, অতিরঞ্জিত ও মিথ্যা (দি এলিগেশন অফ ডেলিবারেট একসপালশন অফ পিপল ফ্রম ইস্ট পাকিস্তান গ্রু এ ক্যাম্পেইন অফ টেরর ইজ টোটালি ফলস, ম্যালিশাস অ্যান্ড আনওয়ান্ডেড; ১.৬.১৯৭১) বর্তমানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও একই সুরে একই কথা বলেছেন, 'সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের ব্যাপারে পত্রিকাগুলো

অতিরঞ্জিত খবর ছেপেছে। পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের ৮০/৯০ ভাগ ভিত্তিহীন। খবরের কাগজের রিপোর্টের সঙ্গে ডিসি-এসপিদের পাঠানো রিপোর্টের কোনো মিল নেই।' (সংবাদ, ১৬.১০.২০০১) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একজন প্রাক্তন সৈনিক এবং জেলা প্রশাসনের প্রধানরা নিয়োজিত লতিফুর-মুয়ীদ চৌধুরীর দ্বারা।

১৯৪৭ থেকে হিন্দু নির্যাতনের শিকার। সব সময় দাঙ্গায় তাদের সম্পত্তি দখলের জন্য তাদের ওপর হামলা হয়েছে। ১৯৭১ সালে তা চরমে ওঠে। তার পর থেকে হিন্দুরা কখনো নির্যাতিত হয়নি এ কথা বলা সত্যের অপলাপ। আওয়ামী, বিএনপি, জাতীয়, সামরিক-সব আমলেই হিন্দুদের বেছে নেয়া হয় শিকার হিসেবে। তারা ঠিক মানুষ হিসেবে বিবেচিত হয় না। তারা হিন্দু বা সংখ্যালঘু। ১৯৭১-এর পর্যায়ে মিলটা আসছে এখন, যা শুরু করেছিল ঠিক পূর্ববর্তী সরকার। বর্তমানে সেটা চরমে উঠেছে। হিন্দু এবং আওয়ামী লীগের সবাই মার খাচ্ছে। কারণ হিন্দু ও আওয়ামী লীগ ও হিন্দু ভারত তাদের ধারণায় এক। অন্তত আওয়ামী লীগ বিরোধীদের ভাষ্য তাই। এটি ঠিক হলে বলতে হয় গৌতম চ□বর্তী, গয়েশ্বর রায় বা নিতাই রায়রা হিন্দু নয়। বিএনপি-জামায়াত একটি কথাও বলেনি ভারতের বিরুদ্ধে, যা ত্রিশ বছরে অভূতপূর্ব ঘটনা এবং বলা হচ্ছে এখন ভারতে গ্যাস বি□ হবে। তা হলে বিএনপি-জামায়াত হিন্দু ভারতের দালাল? যে মুসলমানরা এদের সমর্থন করছে, তারাও কি মীর নাসিরের ভাষায় 'ভারতীয় রাজাকার?' এখন যেমন আওয়ামী ও হিন্দুদের পিটানো হচ্ছে তাদেরও কি সেভাবে পিটাতে হবে? শিক্ষিত, ভালো কাপড়চোপড় পরা ওসব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমালোচক স্মার্ট ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের বক্তব্য এখন কী?

ইউরোপীয় কমিশন আবার বেশ খানিকটা ইয়ার্কি করেছে। সংখ্যালঘুদের ওপর কোনো ধরনের নির্যাতন বা প্রতিশোধমূলক আ□মণ থেকে বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরত রাখার জন্য তিনি (প্রতিনিধি) বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতাদেরও অনুরোধ করেছেন।' (জনকণ্ঠ ১৪.১০) কিন্তু কেন? আসলেও কিছু ঘটছে কি? আগে, নির্বাচনের সময় ঘটেনি। প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়াও কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন সংখ্যালঘুদের ওপর আ□মণে বিরত থাকার জন্য। নির্বাক প্রেসিডেন্ট হঠাৎ জনাব মান্নান ভুঁইয়াকে ডেকে নির্দেশ দিলেন সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধের জন্য, যা তিনি পারেন না। তার ক্ষমতা ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় যা তিনি করেন নি। আর তাদের কথাবার্তা শুনে ও পত্রপত্রিকা থেকে মনে হয় নির্যাতন হচ্ছে, কিন্তু আলতাফ হোসেন চৌধুরী যে বলছেন, 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনা বিক্ষিপ্ত, ছিটেফোঁটা' (জনকণ্ঠ ২১.১০) তা হলে প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট যা বলছেন তা সত্য নয়। আর ডি সুজা তো ইয়ার্কি করছেন। কারণ, নির্বাচনের আগে ও নির্বাচনের দিন হামলা মামলা চোখে পড়েনি, এখন পড়লো। হিন্দুরা, আমার ব্যক্তিগত মত, যদি পারে দেশ ছেড়ে চলে যাক। আর যদি যেতে না চায়, কারো দিকে প্রত্যাশা না করে নিজের পায়ে দাঁড়াক। বাংলাদেশে কেউ কাউকে সাহায্য করে না, নিজেকে ছাড়া। ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালে বলেছিলেন, সংখ্যালঘুদের দেশে ফেরার ব্যাপারে কোনো ইতস্তত করা উচিত নয়, তাদের পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হবে, কারণ তারা পাকিস্তানের একই ধরনের নাগরিক। 'দে উইল বি গিভেন ফুল প্রটেকশন অ্যান্ড এভরি ফ্যাসিলিটি অ্যাজ দে আর ইকুয়েল সিটিজেন অফ পাকিস্তান অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো কোয়েশ্চেন অ্যানি ডিসা□মিনেটরি ট্রিটমেন্ট।' (১৯.৬.৭১) পেয়েছিল কি? আমার ব্যক্তিগত মত, হিন্দুদের যদি থাকতে হয় তাহলে তাদের ভোটাধিকার রহিত করা হোক। তাহলে আওয়ামী লীগও শায়েস্তা হবে এবং তাদের ওপর জিজিয়া কর বসানো হোক যা অনেক মুঘল সম্রাট বসিয়েছিলেন। তাতে যে অর্থ আসবে তাতে বাজেট ঘাটতি ঠেকানো যাবে। অথবা তাদের ভারতে যেতে দেয়া হোক এবং ভারতীয় মুসলমানদের বদলে বাংলাদেশে আনা হোক, তাতে বাংলাদেশের মুসলমানদের আপত্তি হওয়ার কথা নয় এবং এতে জামায়াত-বিএনপির

ভোটব্যাংকও বাড়বে। উলে-খ্য, ১৯৭১ সালে ভারতীয় মুসলমানরা মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করেনি। না হলে হিন্দু ফ্যাক্টর সব সময়ই ঝামেলা বাঁধাবে।

আওয়ামীবিরোধী এক বন্ধু আমাকে পূর্ণিমার ছবিটি দেখে বলেছিলেন, এগুলো কী হচ্ছে? তিনি কোথায় খবরটি পেয়েছিলেন জানি না। কারণ তিনি ডেইলি স্টার ও ইনকিলাব পড়েন। হয়তো জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ বা সংবাদের কোনো পাঠক তাকে বলেছিল। আমি বললাম, যা হচ্ছে ঠিকই হচ্ছে। তিনি বললেন মানে? মানে নির্বাচনটা হচ্ছে আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগ বিরোধীদের যুদ্ধ। তখনো যেমন মুসলমান ও অবিশ্বাসীদের যুদ্ধ হতো, সে রকম যুদ্ধে পরাজিতরা হচ্ছে গনিমতের মাল। তো আজ বিএনপি ক্ষমতায়; আওয়ামীরা পরাজিত। তাদের ও হিন্দুদের ঘর-সম্পত্তি বৌ-বাচ্চা সব গনিমতের মাল। আবার কখনো আওয়ামী লীগ এলে অন্যদের তা-ই মনে করবে। তার বোধ হয় এ নিয়ে একটু সন্দেহ হচ্ছিল। ওই আর কি মানবিকতাবোধ ছিল। আমি বললাম, আমার ধর্মে যদি এটা বৈধ না হয় তাহলে যে দেশের ৯০ ভাগ মুসলমান, তারা প্রতিবাদ করে না কেন? কোনো মুসলি-, আল-াওয়ালা এর প্রতিবাদ করেছেন?

নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের মুসলমানরা তো লাদেনের হয়ে লড়বে বলেছিল। জামায়াত তো জান কুরবান করেছিল। কিন্তু লাদেন তো প্রায় শেষ। পথে দেখি আমিনী-নিজামী কেউ নামে না। স্মার্ট ড্রেসের মুসলমানরাও-যারা মনে করে হিন্দু আওয়ামীদের উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে, তারাও চুপচাপ। সুরা বাকারায় আল-াহ বলেছেন, 'নিশ্চই, যারা বিশ্বাস করে ও আল-াহর পথে স্বদেশ ত্যাগ করে ও জিহাদ করে, তারাই আল-াহর দয়ার আশা রাখে, আর আল-াহ ক্ষমতাশীল, পরম দয়ালু।' আমাদের মতো ভণ্ড আর কই পাবেন? শাবানা আজমী কয়েক দিন আগে ভারতে বলেছিলেন, এতো জিহাদের ডাক দেন দিল-ী জামে মসজিদের ইমাম, কিন্তু যান না তো। তাকে প্যারাসুটে করে কাবুলে ফেলা উচিত। শাবানা জানেন না, আমাদের এখানকার অনেকের মত যে, মুরগি খেয়ে, ঘুম থেকে উঠে ধর্মের নামে মিছিল করে জিহাদ ডাকা আরামের। ধর্মকর্মও হয়, নিরাপদেও থাকা যায়। কাবুলে তো গুলিগালা। খাওয়া পাওয়া যায় না। আর মরে গেলে ধর্মকর্ম করবে কে?

১৯৭১ সালে অগাস্টেই পাকি সরকার আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমানের বিচার শুরু করেছিল 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য।' আজ দেখলাম সরকার নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছে আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ হাসিনার বিদেশ যাওয়ার ওপর। দেশে যা চলছে তা চলবে, বাড়তেও পারে। এর জন্য কাউকে অভিযুক্ত বা দোষী করছি না। সে সাহস বা ক্ষমতাও আমার নেই। আমি নিজে যে জাতির অংশ, সে জাতি সম্পর্কে আমার সম্যক ধারণা আছে। এক হাজার বছরের ইতিহাসে এ জাতিকে কেউ নন্দিত করেনি। ১৯৭১ সাল ছাড়া। সেটি ব্যতি□ম। আমাদের এক পুরনো সাংবাদিক বন্ধু আবু সালেহ বোধহয় খুব সম্ভব একটা ছড়া লিখেছিলেন, 'রক্ত দিয়ে পেলাম শালার এমন স্বাধীনতা।' তিনি অনেক আগে এটি বুঝেছিলেন, আমরা অনেকে বুঝিনি। তবে এতটুকু বুঝেছি, আল-াহ বলেন, ভগবান বলেন, গড বলেন, তাতে বিশ্বাস রাখেন কি না রাখেন, মানুষের চোখের জলের একটি অভিশাপ আছে। আওয়ামী লীগ যদি মানুষের চোখের জলের কারণে চলে গিয়ে থাকে তাহলে আজ যারা আছে তারাও ওই পথে যাবে। পূর্ণিমার ছবিটি আপনি ছুড়ে ফেলে দিতে পারেন, তারপর কন্যাকে আদর করে স্ত্রী নিয়ে পার্টিতে যেতে পারেন, কিন্তু আমাকে আপনাকে একটি কাফ্ফারা দিতে হবে। কারণ আমরা এমন অনেক কথা বলেছি যা রাখিনি। 'শপথ করে কথা না রাখলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে' (সুরা মায়িদা)। এরপর আমার আপনার স্ত্রীকে যখন অপহরণ করা হবে, কন্যাটিকে তুলে নেয়া হবে, বোনটিকে গায়েব করে দেয়া হবে, তখন বুঝবেন পূর্ণিমা আসলে কি বলতে চেয়েছিল।

জনকণ্ঠ, ২৪.১০.২০০১

চাই সুস্থ অসাম্প্রদায়িক সামাজিক রাজনৈতিক মেলবন্ধন

মালেকা বেগম

সাম্প্রতিক সংখ্যালঘু পরিস্থিতি উদ্বেগজনক

নির্বাচনের কিছুদিন আগে থেকে শুরু করে নির্বাচনের পর আজ অবধি একটা অস্থির সময় যাচ্ছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিবারের ওপর নির্যাতন, ধর্ষণ, লাঞ্ছনা চলেছে খবরে জানতে পারছি, প্রত্যক্ষদর্শী আস্থাভাজন, শ্রদ্ধেয়, নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের কাছ থেকে শুনছি। এ বড় অসহনীয় যাতনা। তার চেয়ে বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি বিবেকের দংশনে। জনগণের, প্রগতিশীল সংগঠনগুলো, রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলোর, নারী সংগঠনগুলোর প্রতিরোধ নেই, লাঞ্ছিত মানুষের পাশে ছুটে গিয়ে দুর্বৃত্তদের রোধ করার কোনো শুভ উদ্যোগ নেইনি আমরা কেউ। আমিও শুধু ভেবেছি কোনো উদ্যোগ নেইনি। রাজধানীতে আমরা দেখেছি সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে নারী-মানবাধিকার সংগঠন, সচেতন নাগরিক সমাজের নামমাত্র মানববন্ধন ও সভা, ছাত্রদের অনশন, রামশীল এলাকায় প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দের সভা। ১৩ কোটি মানুষের দেশে এ যেন একটুখানি বুদ্বুদ তোলার প্রয়াস।

কেন এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে আমরা বাস করছি যেখানে রাষ্ট্র থেকে একদিকে অসাম্প্রদায়িক মেলবন্ধনের আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে অথচ সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর সাম্প্রতিক নির্যাতনের ঘটনাকে 'কিছুটা সত্য, কিছুটা গুজব ও কিছুটা ষড়যন্ত্র' বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বারবার বলছেন। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ থেকে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে যেন সংখ্যালঘুদের জন্য শুধু আওয়ামী লীগই একমাত্র আশ্রয়স্থল। এরকম রাষ্ট্রীয় সাফাই ও বিরোধী দলীয় অভিযোগ, পদক্ষেপ দুই-ই সংখ্যালঘু সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক শক্তির ষড়যন্ত্রে ফেলছে। এমন বেড়াজালে ওদের আটকাতে দেখে যন্ত্রণায় কাতর আমরাও।

কেমন ছিলেন ওরা সুদূর অতীত থেকে সাম্প্রতিক অতীত পর্যন্ত?

অতীত বিশে-ষণের জন্য নয়, কিন্তু তবু ফিরে তাকাচ্ছি আমার শৈশব-কৈশোর-যৌবনের এবং তারও পরের সময়গুলোর দিকে। দেশভাগের পর বাবা ভারত থেকে চাকরির সূত্রে প্রদত্ত সুযোগ গ্রহণ করে পূর্ব পাকিস্তানের বরিশালে চলে আসেন বিশাল পরিবার-ছেলেমেয়ে মিলিয়ে ১২ জনকে নিয়ে।

মা বলতেন, মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর বরিশালে শোকের সাগর বয়ে গিয়েছিল। হিন্দু-মুসলিম সবার চোখে পানি। হায় হায় হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেশজুড়ে ছিল। এরপর ফরিদপুরের কথা শুনেছি, কিছুটা মনে আছে। কোনো এক গোপালবাবুর বিরাট ফল বাগানসহ বিশাল এক বাড়িতে (সরকারি) আমরা থাকতাম। এখন বুঝি দেশভাগের পর তিনিও প্রদত্ত সুযোগ গ্রহণ করে বাড়ি বেচে বা ব্যবস্থা করে ভারতে চলে গিয়েছিলেন। এরপর ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী স্কুলে পড়েছি, বিশাল 'রাজার বাড়ি' দেখেছি। পূজা-পার্বণে যোগ দিয়েছি। সাম্প্রদায়িক ঘটনার কথা জানিনি বা বুঝিনি তখন।

ঢাকায় আমরা এলাম '৫২ সালে। ভর্তি হলাম 'নারীশিক্ষা মন্দির' স্কুলে। ওয়ারী পাড়ায় বাবা বাড়ি কিনলেন তখন। শুনেছি তিন ভাই পাশাপাশি তিনটি বিশাল বাড়ি (প্রতিটি এক বিঘা জমির ওপর) বিি করে ভারতে চলে যান। হিন্দুসম্প্রদায় অধ্যুষিত ওয়ারীপাড়ায় আমরা এবং আর হাতগুনতি দু-চারটি মুসলিম পরিবার সে সময় থেকে বাস করতে শুরু করি। শৈশব-কৈশোর যৌবনের দীর্ঘ ২৬টি বছর এবং পরেও প্রায় ৯৪ সাল পর্যন্ত ওয়ারিতেই থেকেছি এক

নাগাড়। কী মধুর শৈশব-কৈশোরের স্মৃতি। প্রতিবেশী ছিলাম আমরা শ্রদ্ধেয় মানিক ঘোষ (প্রয়াত), তার স্ত্রী ডলি ঘোষ (প্রয়াত), আমার বড় বোন মমতার সতীর্থ দেবব্রত দাদাদের। পাড়ায় গুণীজন ডা. মন্মথ নাথ নন্দী, তার স্ত্রী 'নারী শিক্ষা মন্দির' স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী শান্তি নন্দী, (জাস্টিস) দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, তার স্ত্রী চিত্রা ভট্টাচার্য (সাবেক সাংসদ), রাজনীতিবিদ ভবেশ নন্দী প্রমুখ ব্যক্তির বাড়িতে যাতায়াত ছিল। তাদের ছেলেমেয়ের সঙ্গে গড়ে উঠেছিল সৌহার্দ্যময় প্রীতির সম্পর্ক। যা আজও অটুট আছে। জাস্টিস দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্যকে ভাইফোঁটা দেওয়ার মধ্য দিয়ে তার সঙ্গে প্রীতিময় অটুট সম্পর্ক অনাবিল আনন্দ দিয়ে যাচ্ছে আমাকে। তাদের ছেলেমেয় শিশু দেবলীনা, দেবপ্রিয় ও দীপেন আজ স্বপ্রতিষ্ঠ যার যার পেশায়-সংসারে। ডা. নন্দী, শান্তি নন্দী ও তাদের ছেলেমেয়েরা ভারতে স্থায়ীভাবে থাকতে বাধ্য হয়েছেন ১৯৬৫'র ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর। এখনো শ্রীমতি শান্তি নন্দী, মন্দিরা-ইন্দিরা এলে দেখা-সাক্ষাৎ-আন্তরিকতায় কেটে যায় কয়েকটা দিন।

কবি সুফিয়া কামাল এক সময় 'তারাবাগ' (গোপীবাগ) এলাকায় থাকতেন। নারীশিক্ষা-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী লীলা নাগের সঙ্গে দুই-তিন বছর ওয়ারী মহিলা সমিতির সাংগঠনিক নেতৃত্ব দিয়েছেন। সুফিয়া খালাম্মা বলতেন, সেসব দিনের ('৫০-এর দাঙ্গা) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ রক্তপাতের কথা। সেই দাঙ্গা প্রতিরোধ সামাজিক-রাজনৈতিক নারী সংগঠনের নেত্রী-কর্মীরা জীবনপণ করে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। লীলা নাগ তার রাজনৈতিক কর্মকান্ডে বাধা পেয়েছেন দেশভাগের পর। মুসলিম লীগ সরকারের রাজনৈতিক বাধা ও সাম্প্রদায়িক উসকানির ফলে তিনি দেশত্যাগ করেন। আশালতা সেন অসুস্থ হয়ে ছেলে সমর সেনের কাছে চিকিৎসার জন্য গেলেন ১৯৬৬/৬৭ সালে। কিন্তু আমেরিকায় অবস্থানকালে ১৯৭১ সালে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সংগ্রাম করেছেন। ১৯৫০ সালের পর ১৯৬৪-৬৫, এরপর ১৯৭১ এবং পরবর্তী সময়ে থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সংখ্যালঘুদের লাঞ্ছনা-নির্যাতনের নেপথ্যে রয়েছে দুর্বৃত্তদের দ্বারা হিন্দু জনগোষ্ঠীর জমি-বাড়ি-অর্থসম্পদ লুট-দখলের সন্ত্রাস।

বিগত সরকারের শত্রু সম্পত্তি নিস্পত্তিবিষয়ক বিল মূলত হিন্দু জনগোষ্ঠীর সম্পত্তির মালিকানা-অধিকারের প্রতিষ্ঠা। এই অধিকার হরণ করা হয়েছিল ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময়। কিন্তু স্বাধীনতার পরও তা অব্যাহত রাখা হয় আওয়ামী লীগ সরকার বা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলেও। কাজেই আমরা দেখেছি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জান-মালের ওপর দেশবিভাগের পর থেকে দাবানল জ্বলছে। ব্রিটিশরা হিন্দু দেশ, মুসলমানের দেশ হিসেবে রাষ্ট্র ভাগ করে দিয়ে চলে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রীয় সংবিধান আমরা অর্জন করেছিলাম কিন্তু ভেতরে ভেতরে সংখ্যালঘু জনগণের ওপর রাজনৈতিক চাপ গোপনে চলছিল। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর রাষ্ট্রীয় সংবিধানে অসাম্প্রদায়িক নিশ্চয়তা হরণ করা হয়েছে। কিন্তু ১৯৯০-এর পরও বিএনপি (১৯৯১-১৯৯৬), আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেও (১৯৯৬-২০০১) সংবিধানের সেই নিশ্চয়তা হরণের 'ধর্মবিল' বাতিলের কোনো পদক্ষেপ আমরা দেখিনি। অন্যান্য রাজনৈতিক দলেরও কোনো দাবি ছিল না, নেই। শুধু 'নারীপক্ষ' মামলা করেছিল কিন্তু ন্যায়বিচার পায়নি। মহিলা পরিষদ প্রতিবাদ জানাচ্ছে। উগ্র ধর্মান্ধতা নারীর অধিকার হরণে সর্বাধিক আগ্রহী হয়। এটা মূলত আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিরই বিকৃত একটি চরিত্র।

এই দীর্ঘ ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে (১৯৪৭-২০০১) হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে বৈরিতার উর্ধ্বে রাজনৈতিক ক্ষমতাধররা তাদের দলকে পরিচালিত কেন করতে পারলেন না, সেই গভীর অনুসন্ধিৎসা আজ বড় প্রয়োজন। কেননা সাম্প্রতিক সংখ্যালঘু নির্যাতন ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পূজাউৎসব নির্বিঘ্নে করতে দেওয়া-না দেওয়ার রাজনৈতিক বিবাদ-সন্ত্রাসী কার্যকলাপ-এসবই

রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় ঘটে চলেছে। সাধারণ মানুষ এসব সন্ত্রাস করছেন। এই পরিবেশে অসহায় নারী পুরুষ-শিশু মানুষগুলো অনিশ্চিত জীবনযাপন করছে। সম্পদ, জীবন হারানোর বেদনার সঙ্গে সঙ্গে তারা 'মানুষের তৈরি সাম্প্রদায়িকতার দুর্যোগের' শিকার হয়ে হতবিহ্বল হয়ে গেছেন। ওরা রাজনৈতিক দলগুলোকে বিশ্বাস করে অবিশ্বাসের আগুনে পুড়ছেন।

নেই সেই সামাজিক সম্প্রীতি ও প্রতিরোধ

নারীশিক্ষা মন্দির স্কুলে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত পড়েছি, বহু হিন্দু সম্প্রদায়ের মেয়েদের সঙ্গে ও শিক্ষয়িত্রীদের কাছে। উর্দু-আরবির শিক্ষক একা হলেও মুসলিম লীগ রাষ্ট্রীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বেশ ক্ষমতাবান ছিলেন। স্কুলে পূজা ও শবেবরাত অনুষ্ঠান দুটোই হতো। পাড়ায় ও রামকৃষ্ণ মিশনে পুজো দেখতে যেতাম আমরা। খেতাম বেশ তৃপ্তির সঙ্গে। ঈদ-পার্বণে হিন্দু ধর্মের বন্ধুরাও আসত। অর্থাৎ আমার শৈশবে হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ দেখিনি। প্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শী হলাম ১৯৬৪ সালে ওয়ারীপাড়ায় মানিক (ঘোষ) দাদার, দেবব্রত দাদার বাড়িতে, ডা. নন্দীর বাড়িতে ঢাকার কসাইদের রক্তাক্ত ছুরি-চাকু নিয়ে হামলার ঘটনার। 'ছায়ানট'-এর উদ্যোগে কবি সুফিয়া কামাল, সনজিদা খাতুন, ওয়াহিদুল হক প্রমুখ ব্যক্তিত্ব এই হামলা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রতিবেশী আমরাও যোগ দিয়েছিলাম। একই সময় রোকেয়া হলের এক্সটেনশন হলের মেয়েদের ওপর সুযোগ-সন্ধানী দুর্বৃত্তদের হামলা রোধে সে সময়ের প্রভোস্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও হল সংসদের পক্ষ থেকে সময়মতো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে রোকেয়া রহমান কবির ও অন্যান্য প্রতিবাদী সামাজিক-সাংস্কৃতিক সচেতন ব্যক্তি জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে তুলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধ করেছিলেন।

কপালে 'টিপ' পরার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাকে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সনজিদা খাতুন। তার নেতৃত্বে আমরাও আন্দোলনে যোগ দিয়েছি। মেয়েদের মৌলিক নানা অধিকারের ক্ষেত্রে এখনো হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ধর্মের 'পার্সোনাল ল'-এর বিধিনিষেধ নারীর ওপর সাম্প্রদায়িক আঘাত বজায় রেখে চলছে।

দশকে দশকে রাজনৈতিক দলীয় উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতির ঘটনা ঘটেছে। জনগণের প্রতিরোধও গড়ে উঠেছে পাড়ায় পাড়ায়। বাবরি মসজিদের ঘটনায় ঢাকায় বাংলাদেশে এরশাদ সরকারের রাজনৈতিক রাষ্ট্রীয় মদদে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অপঘটনা আমরা দেখেছি। কিভাবে মিস্টির দোকানগুলো লুট হয়ে গেল হামলায়, তাও দেখেছি আমরা। সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক-রাজনৈতিক প্রগতিশীলরা রুখে দাঁড়িয়ে বন্ধ করেছি সেসব দাঙ্গার প্রচেষ্টা।

রোকেয়া হলে হিন্দু-মুসলিম ছাত্রীরা এক সঙ্গে মিলেমিশে থেকেছি, পড়াশোনা করেছি। হিন্দু ছাত্রদের জন্য আলাদা জগন্নাথ হল থাকলেও হিন্দু মেয়েদের আলাদা হল-হোস্টেলের এখন পর্যন্ত প্রয়োজন দেখা দেয়নি। হলের সহসভানেত্রী হিসেবে (দুবার নির্বাচিত ১৯৬৫-১৯৬৮ সময়কালে) প্রভোস্ট আখতার ইমামের সহায়তায় রোকেয়া হলে হিন্দুধর্মীয় ছাত্রীদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে 'গোমাংস' রান্না বন্ধ রাখা সম্ভব হয়েছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ছাত্রীরাও তা সমর্থন করেছিল। রোকেয়া হলে পুজা অনুষ্ঠান হয়েছে। মিলাদ মাহফিলও হয়েছে। ঈদে পুনর্মিলনীও হয়েছে। সব ছাত্রী, হাউস টিউটর, প্রভোস্ট এসব অনুষ্ঠানে হৃদ্যতা-আনন্দের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। কোনো অঘটন হলের ভেতর ঘটেনি কোনো দিন। সুমিতা নাগ, আভা মণ্ডল, দীপা দত্ত বন্দনা, সুনন্দাসহ শত শত মেয়ে আমাদের সঙ্গে একত্রভাবে কাজ করেছে। ছাত্রত্ব শেষে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ পরিচালনায়, নারী আন্দোলন করতে গিয়ে, কমিউনিস্ট পার্টির কাজ করতে গিয়ে সারা দেশে হিন্দু নারী-পুরুষদের একান্ত করে পেয়েছি সহকর্মী রূপে, নেতা-

নেত্রীরূপে। মনোরমা বসু মাসিমা, উপ দাশ পুরকায়স্থ, ঝর্ণা, অনিমা সিংহ, হেনা দাশ, শান্তি দত্ত, রাণী ভট্টাচার্য, সুহাসিনি দাস, জ্যোৎস্না নিয়োগী, চিত্রা ভট্টাচার্য, চিত্রা বিশ্বাস, রমাদত্ত, অঞ্জলী, রাখী দাশ পুরকায়স্থ, লক্ষ্মী চ্রবর্তী, জয়ন্তী রায়, রুনু দাশ প্রমুখ শতশত নেত্রী-কর্মী জেলায় জেলায় ঢাকা শহরে নারী আন্দোলনে, মুসলিম পারিবারিক আইন নিয়ে, ইউনিফর্ম ফ্যামেলি কোড নিয়ে, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সনদ (সিডও) বিষয়ে, যৌতুক, ধর্ষণ, অপহরণ বিষয়ে, হিন্দু আইনী অধিকারের দাবিতে বাংলাদেশের নারী সমাজের আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন, আছেন। বারবার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তৈরি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলিম জনগণ এর প্রতিরোধে জীবনপন করে সংগ্রাম করেছেন। আজ বড় দুঃসময়ে সেই প্রতিরোধ নেই।

নির্বাচন ও নির্বাচনোত্তর এই রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের উৎস বন্ধে একুশ শতকেও যদি আমরা মানবিক-রাষ্ট্রীয়-রাজনৈতিক সততার পরিচয় না দেই তবে কিভাবে গণতন্ত্র অব্যাহত থাকবে?

প্রথম আলো, ২৫ অক্টোবর ২০০১

সত্যকে সবার এতো ভয়?

আবেদ খান

সাতচলি-শে যারা মাটি কামড়ে পড়ে ছিলো, একাত্তরে যারা চলে গিয়েও ফেরত এসেছিলো স্বাধীনতার পর, নব্বইয়ের দাঙ্গাও যাদের ভিটেচ্যুত করেনি; এবার এই দুই হাজার এক সালের অক্টোবরে তারা বিচলিত হয়ে পড়েছে। এ দেশ যে তাদেরকে নিরাপত্তা দেবে এমন ভরসা করতে পারছে না তারা। করবে কি করে? আবার যাবেও বা কোথায়? যারা এতদিন এতো কষ্টের পরেও কামড়ে রয়েছে এ দেশের মাটি, তারা তো কখনো চায়নি তাদের পরিচয়পত্র পাল্টে যাক, নাগরিকত্ব পাল্টে যাক, অবস্থা পাল্টে যাক। কয়েকদিন আগে একটি জাতীয় দৈনিকের চিঠিপত্র কলামে এক পাঠক লিখেছিলেন, দোহাই, নির্যাতন বন্ধ করুন, আমরা আর ভোট দিতে চাই না। ওই পাঠক কি কেবল নিজের কথা বলেছিলেন, না অনেকের মনের কথাই প্রকাশ করেছিলেন?

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই সবকিছু ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, ওসব কিছু না, ওসব অতিরঞ্জিত, ওসব কারো কারো মনগড়া তথ্য। তিনি দীর্ঘদিন বিমানবাহিনীর দায়িত্ব পালন করেছেন, বিমানে উড়ে বেড়িয়েছেন। আকাশে থাকলে বাংলার মাটির শ্যামলিমা চোখে পড়ে, মানুষ চোখে পড়ে না। আকাশে ওড়ার অভ্যাস থাকলে মাটির মানুষের দীর্ঘশ্বাস ওখানে গিয়ে পৌঁছায় না। সিরাজগঞ্জের পূর্ণিমার কান্নার শব্দ আড়াল করে দেয় বিমানের গর্জন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি করে অনুভব করবেন সেসব?

অদ্ভুত ব্যাপার, অক্টোবরের এক তারিখের পর থেকে যতো অত্যাচার, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, লুন্ঠন আর অপকর্মের ঘটনা ঘটলো এসবই অতিরঞ্জন? দেশের প্রায় সব কয়টা জাতীয় দৈনিকে প্রতিদিনকার অসংখ্য সংবাদই অতিরঞ্জন? তবে কি এই অতিরঞ্জিত সংবাদের ওপর ভর করেই রাষ্ট্রপতি সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন? তিনি বিএনপির মহাসচিবকে ডেকে নিয়ে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন কেন? বিএনপির কথা- এ কাজ করছে আওয়ামী লীগের পরাজিত অংশ। সংখ্যালঘুরা তাদের

ভোট দেয়নি বলে প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে তারা এসব করে চারদলীয় জোটের ওপর দোষ চাপাচ্ছে। তাহলে তো রাষ্ট্রপতির উচিত হয়নি বিএনপির মহাসচিবকে এই নির্দেশ দেয়া। কই তা তো তিনি নিশ্চিত হয়েছেন, কারা করে বেড়াচ্ছে এসব?

সংখ্যালঘুদের সব সময়ই বলির পাঁঠা বানানো হচ্ছে। তাদের ওপর নির্যাতনের ব্যাপারে কেউ কোনো কথা বলতে গেলেই তারস্বরে বলা হয়, ভারতের দালাল। আজ যারা মুখে বলছে এ দেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ তাদের কাছে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়, হিন্দুদের কি আপনারা কখনো এ দেশের নাগরিক হিসেবে দেখেছেন, তাদের প্রতি যে আচরণ করেছেন বা করে চলেছেন, তাদের প্রতি আপনাদের মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি কি অসাম্প্রদায়িক কিংবা মানবিক? এ কথা আমি কেবল চারদলীয় জোটকেই বলছি না, বলছি আওয়ামী লীগেরও অনেকের উদ্দশ্যে। কিসের জন্য এসব করছেন? ভোটের জন্য? সম্পত্তির জন্য? রাজনীতির জন্য? ধর্মের জন্য? এখানে অনেকে গর্ব করে বলেন, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় না। কথাটা ঠিক। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে তাকে, যখন দুই পক্ষই একে অন্যকে মারে। কিন্তু এখানে তো দু'পক্ষ নেই। তাই এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় না, সাম্প্রদায়িক নির্যাতন হয়। প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে দেয়া তাঁর প্রথম ভাষণে, যে ভাষণ শুনে মনে হয়েছে আমি কোনো সামরিক আইন প্রশাসকের ভাষণ শুনছি, বলেছেন এ দেশে সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু বলে কিছু নেই। ভাবতে অবাক লাগে, একদিকে সংখ্যালঘুদের ওপর বেধড়ক মার চলছে, ওদের বাড়িঘর ধ্বংস করা হচ্ছে, মেয়েদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে, দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য হুমকি দেয়া হচ্ছে, অন্যদিকে শুনছি তাঁর নির্লিপ্ত ঘোষণা! প্রধানমন্ত্রী যদি তাঁর জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া প্রথম ভাষণে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলতেন, নির্বাচনের পর জোটের কোনো নেতাকর্মী যদি পরাজিত পক্ষের কোনো ভোটার তা সে যে ধর্মেরই হোক না কেন, তার ওপর কোনো ধরনের নির্যাতন-নিপীড়ন করে তাহলে তাকে প্রচণ্ড শাস্তি পেতে হবে, পুলিশ প্রশাসন কিংবা স্থানীয় প্রশাসন যদি এক্ষেত্রে চক্ষুবন্ধ নীতি গ্রহণ করে তাহলে তাদেরও পেতে হবে কঠোর সাজা, তাহলে অন্তত বুঝতাম দেশের প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনছি। যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসমেত মন্ত্রীদের অনেকেই গলা বাড়িয়ে বলেন, দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর কোনো নির্যাতনই হচ্ছে না, তখন মনে হয় না আমরা কোনো বিবেকবান সরকারের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি।

এখন দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গাপূজা হচ্ছে। সরকারের অনেক রথী-মহারথী যাচ্ছেন পূজামণ্ডপে, সরকারি টেলিভিশনে বড় করে দেখানো হচ্ছে সেসব দৃশ্য, সাক্ষাৎকার নেয়া হচ্ছে সাজানো কিছু মানুষের যারা বলছে মহাফূর্তিতে তারা এই উৎসব উদযাপন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, পুলিশ প্রশাসন, স্থানীয় প্রশাসনের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, আপনারা তো ভালোই জানেন, এসব সত্যি নয়। বরং আপনারা যদি সত্যি কথাটি বলেন এবং তারপর বলেন যে, এ ধরনের ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তাদের শাস্তি দেয়া হবে, আপনারা যদি সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আশ্বাস দিয়ে পরিষ্কার ভাষায় বলেন, যে অঞ্চলে এ ধরনের সামান্যতম অভিযোগ পাওয়া যাবে সেই অঞ্চলের প্রশাসনকে, নির্বাচিত প্রতিনিধিকে, জোট নেতৃত্বকে সুস্পষ্টভাবে দায়ী করা হবে, তাহলেই কেবল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করবে। চোখ বন্ধ করে কিংবা মুচলেকা আদায় করে, কিংবা মধুর বাণী দিয়ে কোনো লাভ নেই। আমরা যারা জন্মগত কারণে সুবিধাজনক অবস্থানে আছি তাদের পক্ষে কিছুতেই বোঝা সম্ভব নয়, সংখ্যালঘুরা কেন অসহায়, কেন নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। তথ্যমন্ত্রী তো সজ্জন মানুষ হিসেবে পরিচিত। তিনি কি জানেন, কেবল হিন্দু হওয়ার কারণে অরাজনৈতিক শিল্পীও টেলিভিশনে কালো তালিকাভুক্ত হয়ে গেছে? আপনারা এই অসাম্প্রদায়িকতার বুদ্ধিজীবীরা কেন সাংবাদিক সম্মেলন করে দুর্গতদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন না। এক্ষেত্রেও কি কথা বললে ভারতীয় দালালের লেবেল পড়তে পারে বলে আশঙ্কা? আমি বুঝি না, আমরা আসলে কি চাই। সত্যকে সবার

এতো ভয়? এতো ভয়?

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬ *অক্টোবর* ২০০১

আজ বিপন্ন মানবতা

কে. এম. সোবহান

রামশীল একটি অখ্যাত জনপদ। এই জনপদে হঠাৎ অনেক লোকের সমাগম হয়েছে। এরা এসেছে আশপাশের ৮/১০টা গ্রাম থেকে। এরা কোনো স্কুলঘর বা এ ধরনের জায়গায় আশ্রয় নেয়নি কিন্তু সবাই আশ্রয়প্রার্থী। এদের সবারই ঘরবাড়ি আছে, জমিজমা আছে, ব্যবসা আছে, ছোটখাটো দোকান আছে। এরা হঠাৎ করেই উদ্বাস্তু হয়ে গেলো অন্তত সাময়িকভাবে। এরা সবাই ফিরে যেতে চায় নিজ গ্রাম, নিজ আলয়ে কিন্তু সাহস পাচ্ছে না। স্বল্প সময়ের জন্য জেলা প্রশাসক এবং জেলা পুলিশ প্রধান এদের বলে গেছেন যার যার ঘরে ফিরে যেতে। কিন্তু তবু ফিরতে পারছে না। ফিরতে পারছে না কারণ ফেরার মতো পরিবেশ নেই, পরিস্থিতি নেই। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রায় আদেশের সুরেই বললেন ফিরে যেতে। তাদের নি কর্মকর্তারাও ভয় দেখিয়েছেন, ফিরে না গেলে তাদের গ্রেপ্তার করা হবে। কেন গ্রেপ্তার করা হবে? কি তাদের অপরাধ? এই প্রশ্নটিই আসছে বাংলাদেশে একবিংশ শতাব্দীর এক নির্মম প্রশ্ন। নির্মম কেন? নির্মম এ কারণে যে, এরা গৃহছাড়া তাদের নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করার জন্য। নাগরিক অধিকার হচ্ছে ভোটাধিকার। এরা একবিংশ শতাব্দিতে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিয়েছে। ভোট দিয়েছে তাদের নিজ পছন্দের প্রার্থীকে। এই অপরাধেই তারা গৃহছাড়া। ১ অক্টোবরের মধ্যরাতের অন্ধকারে তাদের ওপর নেমে আসে এক অজানা আশঙ্কা। গ্রামাঞ্চলে সাধারণত রাত নয়টার মধ্যেই লোকেরা শয্যা গ্রহণ করে। কিন্তু সে রাত ছিলো ভিন্ন। রাত ১২ টার পরেও টিভিতে নির্বাচনের খবর প্রকাশিত হচ্ছিলো। একশ্রেণীর লোক যখন নিশ্চিত হলো যে, নির্বাচনে জোটের জয় হচ্ছে বিপুলভাবে তখন এরা বেরিয়ে পড়লো সে জয়ের ফসল আদায় করতে। হামলা করলো ওইসব গ্রামের লোকজনের ওপর। পরদিন থেকে রীতিমতো উচ্ছেদ অভিযান চালাল এরা।

মারধর করে সহায়-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়, দোকানপাট লুটপাট বা যেখানে লুটপাট করা যায়নি সেখানে দোকানপাটের জিনিসপত্র ফেলে দিয়ে নষ্ট করে দিয়েছে। ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে বলা হয়েছে, আর ফিরে না আসতে, নিজের বাড়িতে ফিরতে বারণ করেছে অস্ত্রধারীরা। কারা এই অস্ত্রধারী? এরা সবাই নবনির্বাচিত সরকারি দলের হয় সমর্থক, না হয় কর্মী বা নেতা। এরা অন্তত দাবি করছে যে, এরা জোটের সঙ্গে সম্পৃক্ত। হয়তো এর আগে ছিলো বিদায়ী দলের সমর্থক-কর্মী বা নেতা। তাহলে গতবারও কি তারা একই ভূমিকা পালন করেছিলো? না করেনি। কারণ তখন সন্ত্রাস বা দখল রাজনীতির নামে আতঙ্ক হয়নি। এসবের সূত্রপাত হয়েছিলো কিন্তু ব্যাপকতা লাভ করেনি। ব্যাপকতা লাভ করল বা বলা যায় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হলো বিগত সরকারের উঁচু পর্যায়ের দলীয় নেতা ও তাদের অকালকুষ্মাণ্ড পুত্রেরা। এদের কেউ বাড়ির একাংশ ভাড়া নিয়ে গোটা বাড়িটিই গ্রাস করার মতলব আঁটছিলো। কেউবা জমি দখল করে মার্কেট স্থাপন করেছিলো। এগুলো মাতা-পিতার অজ্ঞাতে করেছিলো-এ কথা বললে একটি গুরুতর বিষয়কে হালকা করে ফেলা হয়। দখলের খবর প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকায়। এগুলো দণ্ডনীয় অপরাধ ছিলো। কিন্তু তাদের কোনো আদালতের সম্মুখীন হতে হয়নি। এক প্রতিমন্ত্রীর পুত্র এক খুনের মামলায় গ্রেপ্তার হলেও পরে জামিন পায়। বর্তমানে সে জেলে। আর এক সংসদ সদস্যের পুত্র খুনের অভিযোগে দেশান্তর হয়েছে।

এ সন্ত্রাসের ধারাবাহিকতা চলে আসছে সেই পঁচাত্তরের পর থেকেই। '৮০ সাল থেকে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হতে থাকে। '৮২-তে এসে তা এমন অবস্থা ধারণ করে যে, জে. এরশাদ ওই অজুহাতে সামরিক আইন জারি করে সামরিক শাসন চালু করেন। জে. এরশাদের সময় আইন-শৃঙ্খলার আরও অবনতি হয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে হত্যাকে প্রশ্রয় দেয়া হয়। আওয়ামী লীগ নেতা এবং রেডক্রসের ভাইস চেয়ারম্যানকে প্রকাশ্য দিবালোকে তাড়া করে ছুরিকাহত করে হত্যা করলেও খুনির সাজা মাফ করে দেয়া হয়। সবচেয়ে গ্লানিকর এবং বিপজ্জনক সন্ত্রাসের নেতৃত্বে আসে ছাত্র রাজনীতির নামে। জে. এরশাদ এর সূত্রপাত করেন। এর সঙ্গে যোগ হয় চাঁদাবাজি। চাঁদাবাজির সঙ্গে ছাত্রনেতা এবং রাজনীতির অঙ্গনে রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রীর আশ্রয়-প্রশ্রয়ে তারা শক্তিশালী হয়। এরা ধরা পড়লেই সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে তদবিরে পুলিশ এবং অনেক সময় আদালত এদের জামিন দিতে বাধ্য হতো। ছাত্রদের হল দখল এবং চাঁদাবাজি নিত্যনৈমিত্তিকভাবে সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ধর্ষণের মতো ঘটনা নিয়ে গর্ব করে। এরা একদল থেকে অন্যদলে অনায়াসে চলে যেতো সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে। এদের জন্য জনগণের কাছে সরকার বদনামের অংশীদার হলেও এদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ সরকার নেয়নি। এটাই বাস্তবতা।

বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে দেয়ার পর তার জের বাংলাদেশেও পড়ে। মন্দির ধ্বংস, বিগ্রহ ভাঙার ঘটনা ঘটতে থাকে বিনা বাধায়। তারপর '৯২-এ আর একবার সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার শিকার হয় ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা। আবার মন্দির ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, বিগ্রহ ভাঙার উৎসব চলে। ধর্ষণের ঘটনাও ঘটে। খুন হয় একজন কিন্তু মারধর এবং সম্পত্তি দখল চলে প্রায় বিনা বাধায়। এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হয় যখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবিকার ওপর হস্তক্ষেপ করা হয়, বাড়িঘর দখল হয়ে যায়। দোকানপাট ভাঙচুর ও লুটপাট চলে। তবে তদানীন্তন সরকার পদক্ষেপ নেয়ায় তা বন্ধ হয়ে যায়। ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাহীন হয়ে যায়। এর পেছনে ছিলো মৌলবাদীদের প্রচার এবং তাদের অংশগ্রহণ।

এবারের নির্বাচনের পর যে সংখ্যালঘু নির্যাতন চলছে তা আগের নির্যাতন থেকে কিছুটা পৃথক এবং অনেক বেশি ব্যাপক। নির্যাতিতরা কোনোরকম আইনের আশ্রয় নিতে পারছে না এবং পুলিশ নীরব দর্শক। এবারের এই নির্যাতনের সঙ্গে '৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা ৬৪-এর দাঙ্গার কোনো মিল নেই। '৪৬-এবং '৬৪-তে এর সঙ্গে দুই সম্প্রদায়ই যুক্ত ছিলো।

'৯০ ও '৯২-এর সাম্প্রদায়িক নির্যাতন অত্যাচার ছিলো, তা ব্যাপক হলেও পুলিশ প্রশাসন বন্ধ করার চেষ্টা করেছে এবং ধর্ষণের অপরাধ ছিলো কিন্তু এবার যা হয়েছে তার সঙ্গে তুলনা চলে না। '৪৬-এ সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করতে। সেই দাঙ্গার সঙ্গে রাজনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলো। দেশ বিভাগের প্রধান সহায়ক কারণ ছিলো ওই দাঙ্গা। ওই দাঙ্গার পেছনে নীরব সমর্থন ছিলো ব্রিটিশ সরকারের এবং রাজনৈতিক দলগুলোর। '৬৪-তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সিভিল সমাজের সক্রিয় প্রতিরোধ তা বন্ধ হয়ে যায়। '৯০ ও '৯২-তে ছিলো সাম্প্রদায়িকতা। তখনো সিভিল সমাজ বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে আসে ওই সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং সরকারকে বাধ্য করে ওই সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে। ২০০১ সালের সাম্প্রদায়িক নির্যাতন অত্যাচারের পেছনে যতো না আছে রাজনীতি, তার চেয়ে বেশি আছে রাজনীতির মুখোশের আড়ালে সম্পদ লুট, বাড়িঘর দখল, দোকানপাট দখল, আছে নারী নির্যাতন এবং যথেচ্ছভাবে সন্ত্রাস।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে বা করেনি- এ অজুহাতে তাদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে রাজনীতির নামে, রাজনৈতিক দলের নামে। বর্তমান সরকারি দলের

সমর্থকরা ধরেই নেয় যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটাররা আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়। এই অপরাধে তাদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালানো হচ্ছে নির্বাচনের দু'সপ্তাহ পরেও। সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে, সরকারি দলের সংশ্লিষ্ট নেতা-মন্ত্রীরা বলছেন যে, ঘটনা অতিরঞ্জিত হচ্ছে। ঘটনাগুলো বানোয়াট ও মিথ্যা। এই সংখ্যালঘু নির্যাতনে বিদেশী পর্যবেক্ষকরা পরোক্ষভাবে ইন্ধন যুগিয়েছে। তারা এসেছিলো দেখতে বাংলাদেশের নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হয় কিনা। তারা তাদের অজ্ঞানতার কারণে তাদের প্রতিবেদনে বললো যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নির্বিঘ্নে ভোট দিয়েছে। তারা যে চেক লিস্ট বানিয়েছিলো তাতে একটি কলাম ছিলো-নির্বাচনে ভয়ভীতি দেখানোর ঘটনা দেখা বা শোনা। অনেক করেও তোদের বোঝানো যায়নি যে নির্বাচনে সন্ত্রাস বা ভয়-ভীতির ঘটনা সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং দুটিকে কোনোভাবে এক করা যায় না। কিন্তু তাদের এজেন্ডায় এটা ছিলো না। যার ফলে তারা নির্বিবাদে বলতে পেরেছিলো যে, এসব ঘটনা এক অষ্টমাংশ বা তার কাছাকাছি- সংখ্যালঘুদের সংখ্যা যদি পৃথকভাবে বিচার্য হতো তাহলে দেখা যেতো শতকরা ষাট শতাংশ ক্ষেত্রে সন্ত্রাস হয়েছে। বিদেশী পর্যবেক্ষকদের এই সার্টিফিকেট উৎসাহিত করেছে সন্ত্রাসীদের।

সারা দেশে এই নির্যাতন হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। নাগরিক অধিকার প্রয়োগ যা গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার অপরিহার্য অংশ, তার জন্য যে নির্যাতন ও অত্যাচার তাদের ওপর চলছে তাতে তারা যদি বলে, 'আমরা ভোটাধিকার চাই না, আমরা দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হতে চাই না', তাহলে তাদের আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না। বস্তুত পত্রিকায় এ ধরনের চিঠি লেখা হচ্ছে। এবারের ধর্ষণের রকম সেই হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর মতো। মাতা-পিতার সামনে মেয়ে ধর্ষিত হচ্ছে। মেয়ের সামনে মা ধর্ষিত হচ্ছে। একই বাড়িতে পঞ্চাশ বছরের মা, মেয়ে ও বিধবা পিসি ধর্ষিত হয়েছে। ধর্ষণের কথা অস্বীকার করেছে যেখানে তা করা সম্ভব হচ্ছে। এর থেকে বলা হচ্ছে ধর্ষণ হচ্ছে না। ধর্ষণের কথা স্বীকার করার মধ্যে যে অমানবিকতা, লজ্জা ও অপমান আছে তা অনুভব করতে হবে। এবারের নির্যাতন হচ্ছে সরকারি দলের কর্মী পরিচয়ে। যদিও সরকার থেকে বলা হয়েছে, কোনোরকমের দখল-সন্ত্রাস বরদাশত করা হবে না। তবু প্রতিদিন ছাত্র-ছাত্রীদের হল দখল থেকে বাস টার্মিনাল এমনকি টয়লেট পর্যন্ত দখল হয়ে যাচ্ছে। পুলিশ নির্বিকার। এটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যাপার। একজন নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য একটি নেতাসুলভ উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি একটি হল থেকে বহিরাগতদের বহিষ্কার করেছেন। তিনি একটি হলেই তার নেতৃত্ব সীমিত করলেন কেন? তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা অণুকরণীয় এবং তিনি যদি সব হল থেকে বহিরাগতদের, যারা তার দলের নামে হল দখল করেছেন তাদের তাড়াতে পারেন তাহলে ছাত্র রাজনীতিতে একটি নতুন দিক উন্মোচিত হবে। তার দৃষ্টান্ত অন্য সব ক্ষেত্রেও পালিত হবে।

এটি অত্যন্ত দুঃখের ও ক্ষোভের কথা যে, সরকার পক্ষ থেকে যে অবর্ণনীয় অত্যাচার-নির্যাতন হচ্ছে তা ওখানকার কর্মকর্তাদের রিপোর্টের ওপর নির্ভর করে বলা হচ্ছে 'অতিরঞ্জিত'। কোনো জেলা কর্তৃপক্ষ স্বীকার করবেন না যে তার এলাকায় এসব হচ্ছে। এটা তার চাকরির জন্য ক্ষতিকর। রামশীলে জেলা কর্তৃপক্ষ বলেছেন সবাইকে তাদের নিজ গ্রামে ফিরে যেতে। নিজ গ্রামের ফিরতে গেলে পথে সন্ত্রাসীরা বলছে, চাঁদা দিলে তবে তারা যেতে দেবে নচেৎ নয়। এদের সবারই আর্থিক অবস্থা করুণ। চাঁদা দেয়ার ক্ষমতা নেই। নিজ গ্রামে ফিরতে না পারায় থানার কর্মকর্তারা বলেছেন, গ্রামে ফিরে না গেলে তাদের জননিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হবে। এই দুয়ের মধ্যে তারা রামশীলে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রামশীলের অধিবাসীরা চাঁদা তুলে এদের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করেছেন। এদের অবস্থাও কোনোমতেই ভালো নয়। অন্ত ত দিনের পর দিন অতিথি সেবার অবস্থা নয়। এদের কয়েকজন বললেন, রাতের অন্ধকারে

জলপথে তারা গ্রামে গিয়ে দেখে আসছেন নিজ বাড়িঘর। রামশীলে নেতৃস্থানীয়রা একটি দলের কাছ থেকে আর্থিক এবং খাদ্যদ্রব্য সাহায্য পেলেও তা স্বীকার করার মতো সাহস এদের নেই। স্বীকার করলে তাদের ওপর নির্যাতন আরও বাড়বে, চাঁদার দাবি আরও প্রবল হবে। সরকারি দল নিজ দলের কোনো টিম কেন পাঠাচ্ছেন না সরেজমিন এদের অবস্থা দেখার জন্য। এই নির্যাতন বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চলছে। এটা বন্ধ করতে না পারলে সন্ত্রাসীরাই সরকারকে চ্যালেঞ্জ করবে। এবারের এই অত্যাচার-নির্যাতন মানবতাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করছে। নির্যাতিতরা এই দেশের নাগরিক। বিস্তীর্ণ এলাকার নাগরিকরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অপরাধে আর কতোদিন কাঁদবে?

যুগান্তর, ২৭ অক্টোবর ২০০১

এই সহিংসতা কি সাম্প্রদায়িক প্রচারণার ফল নয়?

আবুল মোমেন

যদি সংখ্যালঘুর কথাই হবে তো দেশে কতো রকমের সংখ্যালঘুই তো আছে। গরিবের দেশে ধনীরা তো সংখ্যালঘু। ঋণখেলাপি ধনীরা তো সংখ্যালঘুতর। শিক্ষিতরাও সংখ্যালঘু, শহুরেরাও। কিন্তু সমস্যা তাদের কারো নয়। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের, তাও বিশেষভাবে হিন্দুদের। তার কারণ? না, একটু পেছন থেকে শুরু করতে হয়।

পাকিস্তান বলে কয়েই সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র। '৪৭-এ পূর্ববাংলাসহ পাকিস্তান সৃষ্টি হলো দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে। পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালি যখন ধীরে ধীরে তার ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রের দাবি উত্থাপন করতে থাকে তখন পাক শাসকরা এর মধ্যে হিন্দুয়ানির দোষ আবিস্কার করতে শুরু করে। বাঙালির হাজার বছরের সাধনার বৈশিষ্টই হলো সমন্বয়ধর্মী উদার মানবতাবাদ, যেখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মহৎ উত্তরাধিকার। এ কথা এমনকি বিএনপিপন্থী শতনাগরিকদেরও বলতে শোনা গেছে। বাঙালিকে গোঁড়া মতবাদে দীক্ষিত করে মুসলিম জাতীয়তার স্বাতন্ত্রচর্চায় টানার সব চেষ্টা ব্যর্থ করেই ছয়দফার জনপ্রিয়তা, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচনী বিজয় এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। কিন্তু ওই চব্বিশ বছর কিছু প্রগতিশীল বাঙালি যেমন বাঙালি সংস্কৃতির চর্চার জন্য নিন্দিত হয়েছেন শাসকের কাছে, তেমনি এ দেশের হিন্দু সম্প্রদায় রাষ্ট্রীয় বিপক্ষতা ও প্রত্যক্ষ নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। চাকরি, শিক্ষা, ব্যাংক সুযোগসহ সর্বক্ষেত্রে তারা বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। ছয়দফা এবং স্বাধীনতার সংগ্রাম কোনোটিই কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দিক থেকে আসেনি। কিন্তু বায়ান্ন থেকে সূচিত এসব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যেহেতু ছিলো অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল আন্দোলন তাই তাতে রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতায় নিপীড়িত হিন্দু জনগোষ্ঠী সার্বিকভাবে যুক্ত হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে কিছু পাকিস্তানপন্থী ছিলো। কিন্তু হিন্দুদের সবাই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলো। এই ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। ফলে হিন্দুদের মধ্যে একাত্তরে কোনো রাজাকার ছিল না। সম্ভবত অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুর মধ্যেও দালাল-রাজাকার তেমন মিলবে না। পাকিস্তান একাত্তরে হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে আর অন্যান্যের মধ্যে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলো। আজ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরে ঠিক একাত্তরের অনুরূপ ঘটনা কেন ঘটছে? হিন্দুমাত্রই আ□মণ-নির্যাতনের লক্ষ্যস্থল, আর বাকিদের মধ্যে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বিরুদ্ধে কেন এই সর্বাত্মক হামলা? আজ রাষ্ট্রশক্তির ভূমিকা কি?

এটি তো স্বাধীনতা-উত্তর এমনকি '৯০-এর গণআন্দোলন-উত্তর গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার। কিন্তু এসব ঘটছে কেন? তারও গোড়ায় যাওয়া দরকার।

বিএনপির নির্বাচনী প্রচারণায় সাম্প্রদায়িকতা ছিলো প্রধান উপাদান। বিপক্ষ দলকে আ□মণের ক্ষেত্রে বিএনপি নেত্রী বারবার সাম্প্রদায়িক ধুয়া তুলেছেন। আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে দেশ ভারত হয়ে যাবে, মসজিদে আজান বন্ধ হয়ে উলুধ্বনি হবে, হিন্দুদের প্রাধান্য হবে এমন উদ্ভট কিন্তু বিপজ্জনক কথা তিনি ও তার সহযোগীরা একটানা বলে গেছেন। এই কথাগুলোর অন্তর্নিহিত ভাবটা কি? হিন্দু খারাপ, হিন্দু শত্রু এসবই তো! আমার ধারণা ছিলো □মে □মে এই ভারতীয় ও হিন্দুর জুজুর ভয় এ দেশের রাজনীতি থেকে কেটে যাচ্ছে। কিন্তু বেগম জিয়া ও তার দল বিএনপি ধারাবাহিক চর্চার মাধ্যমে তাকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। আওয়ামী লীগের এবারের পরাজয়ের পেছনে একটি কারণ, অশিক্ষিত ধর্মান্ধ মুসলিম নারী সমাজের ব্যাপক হারে ভোট প্রদান। তারা বিএনপির প্রচারণায় সত্যিই বিভ্রান্ত। বিএনপি এবার নির্বাচনের সময় থেকে সব কাজই অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে কৌশলের সঙ্গে করছে। পরিকল্পিত ও কৌশলী কাজ তো ভালোই কিন্তু তা যদি খেলার নিয়মভঙ্গ করে তাহলেই কথা উঠবে। সেদিক থেকে খালেদা জিয়া ও বিএনপি প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে যে সাম্প্রদায়িক প্রচারণা চালিয়েছেন তা গণতান্ত্রিক নিয়ম-রীতির পরিপন্থী কাজ, কিন্তু হয়তো কৌশল হিসেবে কাজের ছিলো।

আমার ধারণা, নির্বাচনের পর এতোদিন ধরে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা চলতে থাকাও তাদের সুপরিকল্পিত কৌশলেরই অংশ। সরকার শুনেও না শোনার ভান করছে। যেখানে এ ধরনের একটি ঘটনাকে নিয়মের বরখেলাপ হিসাবে ধরে নিয়ে কঠোর হাতে দমন করার কথা, সেখানে হাজার হাজার ঘটনা ও লাগাতার প্রায় এক মাস ধরে সহিংসতা চলার পরও সরকার খুব স□িয় হচ্ছে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন আর বলার চেষ্টা করছেন যে, সংবাদপত্র অতিরঞ্জিত করছে, যতোটা রটেছে ততোটা ঘটেনি। যেখানে একটি মাত্র সাম্প্রদায়িক ঘটনায় সরকারের ব্যস্ত হয়ে ওঠার কথা, সেখানে যখন হাজার হাজার ঘটনার পরও খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অতিরঞ্জন হচ্ছে তখন অপরাধী স্বভাবতই মনে করবে এতোসবেও যখন সরকার যথেষ্ট মনে করছে না তখন তো আরো চালানো যায়। অপরাধী সরকারের কাছ থেকে এই ইশারাটাই এবার পাচ্ছে। কারণ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেমন তেমনি দলের মহাসচিবও একই কথা বলছেন। তখন মনে হয় এটা সুপরিকল্পিত এবং বিএনপির কৌশল। ওরা আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংককে শিক্ষা দিচ্ছে। এই ধাক্কায় অন্তত কয়েখ লাখ হিন্দু দেশত্যাগ করবে আর বহু লোক আগামীতে ভোট দিতে যাবে না। বিএনপি-জামায়াত জোট তাতে আগামী দিনেও স্বস্তি পাবে।

না, বিএনপি কৌশল এবং পরিকল্পনা ছাড়া চলছে না। হিন্দুদের ওপর বর্বরোচিত হামলা ও কৌশল পরিকল্পিত কাজ। দেশে বেকার থাকে, সন্ত্রাসী-অপরাধীর সংখ্যাও বহু। তাদের চাই উসকানি আর সরকারের প্রশ্রয়, দুটিই বিএনপি দিয়েছে। নির্বাচনের আগে থেকে উসকানি দিয়ে এসেছে আর এখন দিয়ে চলেছে প্রশ্রয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় বিভিন্ন জেলায় গিয়ে পত্রপত্রিকা ও বিভিন্ন সংগঠনের তোলা অভিযোগ হালকা করে দিচ্ছেন।

অন্য অনেক কাজ-অকাজের মতো এই অকাজেও তাদের সহযোগী হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নজিরবিহীন রাজনৈতিক সহিংসতার মাধ্যমে প্রায় তিন শতাধিক খুন হয়েছে। সরকার গা করেনি, নির্বাচনের সপ্তাহখানেক আগে থেকে অনেক স্থানে হিন্দুপাড়ায় সন্ত্রাস শুরু হয়েছে, সরকার পাত্তা দেয়নি, এমনকি নির্বাচনের পর যখন রীতিমতো ধর্ষণ, লুন্ঠন, অগ্নিসংযোগ, খুন-যখম শুরু হয়ে গেছে, তখনো এই সরকার ছিল নিষ্ক্রিয়। বিএনপির পরিকল্পনা যেন সুষ্ঠুভাবে শুরু হতে পারে তারই পাহারাদারি তারা করলেন? এটাও

কি মহাপরিকল্পনার অংশ?

অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাঙালি শক্তি কখনোই আন্দোলন ছাড়া কিছু অর্জন করেনি। সেই বায়ান্ন থেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে আন্দোলনের ফল হিসেবেই এসেছে '৫৪-এর নির্বাচনী বিজয়, '৫৬-এর সংবিধান ও বাংলাভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে বঙ্গবন্ধুসহ সবার অব্যাহতি, আইয়ুবের পতন ও '৭০-এর নির্বাচনী বিজয় এবং সব স্বাধীনতা। এমনকি '৯০-এর গণআন্দোলন।

আন্দোলনের ফলেই এসেছে সংসদীয় গণতন্ত্র আর '৯৬-এর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলনের পরে দীর্ঘ একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছিলো। এবারে রাজনৈতিক অঙ্গনে বাঙালি কোনো কর্মসূচিতে আন্দোলনে ছিলো না বলেই রাষ্ট্রক্ষমতায় চলে এলো জামায়াত আর অন্যদিকে চলছে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর অকথ্য নির্যাতন।

মনে হচ্ছে, বিএনপি অনেক বছরের জন্য ঘর গোছাতে চাইছে। খালেদা জিয়া আঁকড়ে ধরছেন জামায়াতকে, তারই ফল শিবির ও ছাত্রদলকে একযোগে কাজ করার নির্দেশ। যদিও জামায়াতের কোনো কোনো নেতা (যেমন দেলোয়ার হোসেন সাঈদী) প্রবলভাবে হিন্দু ও অমুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষপ্রবণ ভাষণ দেন কিন্তু সরাসরি হিন্দুবিরোধী নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ডে তাদের যোগ দিতে বেশি দেখা যায়নি। মনে হয় সন্ত্রাসীদের পেছন থেকে উসকানি দিয়েছে ও দিচ্ছে বিএনপিরই একশ্রেণীর নেতা-কর্মী এবং আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী ভাষণ সে উস্কানির কাজ করেছে। এমনকি বিএনপির প্রথম সারির অনেক নেতাও একইভাবে সাম্প্রদায়িক লাইনে প্রচারণা চালিয়েছেন।

বলা হচ্ছে, এ নির্বাচন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনমতের প্রকাশ। তাহলে বর্তমান অবস্থা দেখে তো বলতে হবে জনগণ বিভ্রান্ত হয়েছে। সারা দেশের বিভিন্ন জনপদে ব্যাপক হারে সন্ত্রাস চলছে, একাত্তরের পরে আবার মানুষ ভিটেমাটি ছাড়া হয়েছে, বাড়িতে অগ্নিসংযোগ হয়েছে, ব্যাপক হারে নারীরা ধর্ষিত হয়েছে, বয়স্ক মানুষ সম্মান ও মর্যাদা হারিয়েছেন, নিজ দেশে কোটি মানুষ পরবাসী বেদনায় আক্রান্ত হয়েছেন। জয়নাল হাজারী অবশ্যই সন্ত্রাসী। আইনের কাছে তার ক্ষমা নেই। তাকে সমর্থন জানিয়ে শেখ হাসিনা অবশ্যই অন্যায় করেছেন। কিন্তু কোটি প্রাণকে সন্ত্রস্ত করা কোনো মাপের সন্ত্রাস জানতে পারি কি? যে সরকার, যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যে প্রধানমন্ত্রী এতো সন্ত্রাসে, এতো মানুষের দুঃখে বিচলিত হন না, তারা কি সত্যিই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রায় নিয়ে এসেছেন?

এই তো মুখোশ ছিলো তাদের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার। কতো পূর্ণিমা লাঞ্ছিত হলে, কতো ক্ষুদিরাম খুন হলে, কতো কোয়েপাড়া ভস্মীভূত হলে, কতো করুণামোহন অপমাণিত হলে তাদের মনে হবে পত্রিকাগুলো অতিরঞ্জন করছে না? তারা এভাবে আর কতো সন্ত্রাসীকে আর কতোদিনের জন্য লাইসেন্স দেবেন? যা অধিকাংশ স্থানে পুলিশ, ডিসি, কেউই ঠিকমতো কাজ করছেন না। যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর সরকারি দলের মহাসচিব অতিরঞ্জন বলে মানুষের চরম লাঞ্ছনা ও সর্বনাশকে হালকা করে দেন, তখন তাদেরই বা দোষ দেয়া যায় কিভাবে?

বাংলাদেশ বাঁচবে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পকে কবর দিয়েই। অতীতে যেসব ঐতিহাসিক ঘটনা আমাদের অগ্রগতিতে সহায়ক হয়েছে, যেমন ভাষা আন্দোলন কিংবা উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সবই ছিলো অসাম্প্রদায়িক গণআন্দোলন। আজ বাংলাদেশের সমাজ ধসে পড়ছে। কারণ সেই অসাম্প্রদায়িক মানবিকতার উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে এসেছে। না, হিন্দুরা আর দেশ ছেড়ে যাবে না, কোথায় যাবে গ্রামীণ স্বল্পআয়ের দরিদ্র মানুষেরা? কেন তারা এভাবে অন্যায় মারের শিকার হবে? এখানে কি বর্বর যুগ ফিরে এলো? ইসলামের মহৎ উত্তরাধিকার কি কেউ

বহন করবে না? করবে না বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনার মানবতা ও সম্প্রীতির মহান ঐতিহ্য?

এই তো সময় প্রকৃত রাজনীতির প্রকৃত দেশপ্রেমিক মানুষের উঠে দাঁড়ানোর, দুর্গত অসহায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানোর। এই তো সময় উদার মানবতার শাশ্বত বাণী উচ্চারণ করার। প্রতিটি জনপদে ভীত সন্ত্রস্ত অসহায় মানুষ ছড়িয়ে আছে। রাষ্ট্র ধূর্ত-চালাকির আশ্রয় নিলে, সমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে। তবেই রাজনীতি লাভজনক ব্যবসার পরিবর্তে সমাজ ও মানবতার সেবার মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। ক্ষমতার রাজনীতির অনেক চমক ও অনেক প্রহার মানুষ গায়ে সয়েছে। এবার চাই জনতার রাজনীতির উদ্বোধন। যারা এ পথে এগোবেন তারাই বাঙালির প্রাণের মানুষ হয়ে থাকবেন নতুবা অতীতের বহু জবরদস্ত বহিরাগত ক্ষমতাদখলকারীর বেশি ভূমিকা কারো হবে।

এই দেশ মানবতার, সম্প্রীতির, হিন্দু-মুসলমানের। নজরুলই সঠিক কথাটি বলেছেন ঃ

এক বৃন্তে দুটি ফুল
হিন্দু মুসলমান
মুসলিম তার নয়নের মণি
হিন্দু তাহার প্রাণ

প্রথম আলো, ২৭ অক্টোবর, ২০০১

বাংলাদেশের হৃদয় যে ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে

আতিউর রহমান

'আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দিতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের ওপর দিয়া বন্যার মতো বহিয়া গেল, তবু আমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পশুর মতো করিতে পারে নাই। সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্বদেশী সমাজ')।

বহু বছর আগে আমাদের সমাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে 'সার্টিফিকেট' দিয়ে গেছেন তাকে আজ আর সত্যি বলে মেনে নিতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। আমাদের চারপাশে বর্তমানে যা ঘটছে, মানবতার যে বিপর্যয় দেখতে পাচ্ছি তারপরও কি বিশ্বাস করা সম্ভব যে আমাদের 'ধর্ম নষ্ট হয়নি' 'আমাদিগকে পশুর মতো করিতে পারে নাই?' গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশে সরকার আসবে সরকার যাবে। সমাজ সচল থাকবে। কিন্তু সে জন্য গরিব-দুঃখী সাধারণ মানুষের কেন এতো কষ্ট হবে? তাদের চলা, বলা, ধর্মাচরণ কেন বাধাগ্রস্ত হবে? তাদের মনে কেন আতঙ্ক বাসা বাঁধবে? প্রবলের ভয়ে দুর্বল কেন এমন ম্রিয়মাণ হবে? প্রবল কেন পরিপূর্ণ হওয়ার পথ পরিহার করে দুর্বলের ওপর এমন করে চড়াও হবে? তারা নিজেকে আরো অপূর্ণ করার তৎপরতায় কেন মেতে উঠবে? দুর্বলের ওপর সবলের এই আক্রমণে সমাজের মর্মস্থানটিই যে আজ অনাবৃত হয়ে পড়েছে সে খবর কী ক্ষমতাবানরা রাখেন? আজ আমরা বাংলাদেশের হৃদয়কে ভেঙে খান খান করার কাজে ব্যস্ত রয়েছি। আমাদের এই বিবেকহীন অমানবিক সাম্প্রদায়িক অপতৎপরতার জন্য জাতিকে একদিন চড়ামূল্য দিতে হবে।

আজ যারা ঘটনাক্রমে জন্ম নিয়েছে হিন্দু পরিবারে তাদের বুকে যে ব্যথা তা যদি আমরা

বুঝতে না পারি তাহলে ধিক এই আমাকে। ধিক তোমাকে। ধিক সংখ্যাগুরু সবাইকে। আজ আমি লজ্জায় আমার হিন্দু সহকর্মীর মুখের দিকে তাকাতে পারি না। তিনি যখন বলেন, 'আমি আর কপালে টিপ পরে ঘরের বার হবো না।' তখন আমি মাটির দিকে তাকিয়ে অশ্রু সংবরণ করি। কিন্তু যখন দেখি পাশের আরেক সহকর্মী তাকে বলেন, 'আপনার মতো এলিট হিন্দুর কিছু হবে না' তখন লজ্জায় আরো সঙ্কুচিত হয়ে যাই। তাহলে কি অভাজন হিন্দুরা এ দেশের নাগরিক নয়? তাদের দুঃখে আমাদের সমব্যথী হওয়ার কি প্রয়োজন নেই? শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে বিশেষ সম্প্রদায়ের ওপর শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক নির্যাতন কি মানবাধিকারের লঙ্ঘনের পর্যায়ে পড়ে না? বসনিয়া, রুয়ান্ডার ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের ওপর আঘাত ঠেকানোর জন্য জাতিসংঘের শান্তি বাহিনীতে অংশগ্রহণ করার গৌরব করি আমরা। কিন্তু আমার দেশের সামাজিক শান্তি বিনষ্টের এই পৈশাচিক উল-াস ঠেকানোর কী কেউ নেই? কোথায় ঘুমিয়ে রয়েছেন আমাদের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরা? অবশ্যি নাগরিক সমাজের কেউ কেউ এরই মধ্যে উপদ্রুত এলাকা ঘুরে এসেছেন। ফিরে এসে সংবাদ সম্মেলনও করেছেন। তবে এ ধরনের উদ্যোগ আরো বেশি হওয়া উচিত ছিল। আফগানিস্তানে বোমা হামলায় নিহত নিষ্পাপ শিশুদের জন্য নিশ্চয় তাদের মতো আমারও মন কাঁদে। কিন্তু আমার পাশের বাড়ির পূর্ণিমার কষ্টও কেন আমার কষ্টের কারণ হয় না। ওই বয়সী আমারও তো কন্যা রয়েছে। তা হলে পূর্ণিমার মুখ কেন আমার মেয়ের মুখের আদল পায় না? এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের আজ হোক কাল হোক খুঁজে পেতেই হবে। এই পাপ থেকে আমাদের মুক্তি নেই। একাত্তরে আমাদের কন্যাদের ওরা উঠিয়ে নিয়েছিলো। স্বাধীন বাংলাদেশে কেন আবার সেই একই কায়দায় তাদের তুলে নেওয়া হবে? যে শিশুদের এখন স্বপ্ন দেখার বয়স তাদের কেন দুঃস্বপ্নের শিকার হতে হবে? শিশু মনে সাম্প্রদায়িক আ[illegible]মণের কী যে আতঙ্কের সৃষ্টি করে, তা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কেউ অনুভবও করতে পারে না। আমার সেই সহকর্মীকে একাত্তরে দেশ ছাড়তে হয়েছিলো মূলত সাম্প্রদায়িক আ[illegible]মণ এড়ানোর জন্য। পঁচাত্তরে তাকে আবার দেশ ছাড়তে হয়েছিলো সেই একই আতঙ্কে। সে সময় যে শিশুটি তার জন্মেছিলো তাকেও এই আতঙ্ক পিছু নিয়েছে সর্বক্ষণ। মাত্র ষোল বছর বয়সে সে যখন মার্কিন মুল-ুকে পড়ালেখা করছে তখন ঘটলো বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনা। বিদেশে বসেও আত্মীয়-স্বজনের ওপর কী ধরনের মানসিক ও শারীরিক চাপ পড়তে পারে সে আতঙ্কে সে তখন উতলা। সেই কিশোর মনে কী ধরনের চাপ অনুভূত হয়েছিলো তা সে লিখে রেখেছে। ওর মা সেটি আমাকে দশ বছর পর পড়তে দিয়েছে। সে লিখেছে, 'মুসলিম দেশে হিন্দু হওয়ার কারণে ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে বেঁচে আছি আমরা। আমাদের জীবনের সকল সত্ত্বায় মিশে আছে এই দুর্ভাবনা। সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসেও আমার আত্মীয়-স্বজনদের দুঃসহ জীবনের কথাই ভাবছি। জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ানো এবং আবার ফিরে আসার এই দোলকের কারণে আমার শান্তি পূর্ণ শৈশব কোথায় যে হারিয়ে গেছে তাও জানি না। আমি এমন এক জীবন চাই যেখানে আমাকে পালিয়ে বাঁচতে হবে না। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান কাউকে যেন কারো ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে না হয়, আমি সে রকম এক জীবন চাই।'

একজন এলিট হিন্দু সন্তানেরই যদি দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা হয় এমন তাহলে গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য হিন্দু অভাজনের মনের কী অবস্থা তার কি আমরা খোঁজ রাখি? ১১ সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে সন্ত্রাসী হামলা হওয়ার পর প্রবাসী বাঙালিদের ওপর সামান্য ধমক দেওয়া হয়েছিলো। তাতেই আমরা কতোই না বিচলিত হয়েছিলাম। আর এখন প্রতিদিন পত্রপত্রিকায় যেসব দুঃসংবাদ ছাপা হচ্ছে কিংবা লোক মারফত যেসব খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মনের ওপর দিয়ে কী ধরনের ঝড় বয়ে যাচ্ছে তা কী আমরা অনুমান করতে পারছি? ভীতসন্ত্রস্ত সেই সসম্প্রদায়কে আজ আবার হাসি-খুশি থাকার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

সাড়ম্বরে আনন্দ করতে বলা হচ্ছে। পূজামণ্ডপে বিস্তর বিডিআর-পুলিশ পাহারা বসিয়ে তাদের 'আনন্দঘন পরিবেশে' পূজার অনুষ্ঠানাদি পালনের দৃশ্য দেশবাসী ঠিকই দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু শুধু দেখতে পাচ্ছেন না ভোলার প্রভারানীদের অসহায় মুখচ্ছবি।

'পত্রিকায় কিছু লেখার দরকার নেই। কাউকে বলতে চাই না, আমাদের জীবনে কী ঘটে গেছে। কোনো বিচার চাই না, ক্ষতিপূরণ চাই না। শুধু প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে বলবেন, আমাদের কোনো উপায় নেই কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। আমরা এ দেশেই থাকতে চাই। শুধু তিনি যেন আমাদের বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করেন, আমরা একটু শান্তি চাই। তাকে বলবেন, মা-মেয়ে যেন নিরাপদে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি। আমাদের স্বামী, ছেলেমেয়েদের নিয়ে দু'বেলা খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে চাই। আমরা রাজনীতি করি না, ভোট দিতে যাইনি। ভবিষ্যতেও কোনো দিন ভোট দেবো না। আপনাদের মাধ্যমে তাকে কথা দিলাম। তিনি যেন শুধু আমাদের দিকে একটু করুণা করেন। আমরা এ দেশেরই মানুষ। আর কতোকাল নিজ দেশে পরবাসী থাকবো। এতো অত্যাচার, নির্যাতন আর সহ্য হয় না। এমন যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে না। না পারি কাউকে বলতে, না পারি কাউকে দেখাতে। শুধু ঈশ্বর জানেন, আমরা কেমন আছি। স্বামী-সন্তান, ছেলেমেয়ে কে কোথায় আছে জানি না। তারা আর কোনোদিন ফিরে আসতে পারবে কি-না জানি না। আর কতোকাল এভাবে থাকতে হবে? (সংবাদ,২৩ অক্টোবর, ২০০১)।

প্রতিদিনই সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক সংশি-ষ্ট অসংখ্য নির্যাতনের খবর আসছে। আমাদের দু'জন গবেষণা কর্মকর্তা তাদের নিজেদের এলাকার যে দু-একটি ঘটনার খবর দিলেন তাতেই আমার মনটা খারাপ হয়ে গেছে। একজন জানালেন, শৈলকূপা থানার বাদালশে গ্রামের এক পিতা তার সামনেই মেয়েকে ধর্ষণের দৃশ্য সইতে না পেরে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। ক্ষমতার দাপট দেখাতে পারে এমন এক ব্যক্তির সাঙ্গপাঙ্গরাই এই অমানবিক কাজ করেছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। মোল-ারহাট থানার পাওলা ইউনিয়ন মূলত হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। সেখানে তাদের মাছ, হাঁস, মুরগি ও নারকেলের খামার লুট হয়ে যাচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্য স্থবির হয়ে আছে। নির্বিচারে চাঁদা ধার্য করা হচ্ছে। অনেক বর্গাদারের যুবতী মেয়েদের মুসলমান ধনী কৃষক পরিবারে সাময়িক আশ্রয় নিতে হয়েছে। কিন্তু যারা এই আশ্রয় খুঁজে পায়নি তাদের ওপর নেমে এসেছে অবর্ণনীয় নির্যাতন। একই ইউনিয়নের নির্যাতিত একজন শিক্ষককে তারই ছাত্রসম সন্ত্রাসীরা হাতুড়ি দিয়ে মেরেছে।

হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে এমন বহু ঘটনা পত্রপত্রিকাতেও আসছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যদিও এসব সংবাদকে অতিরঞ্জিত বলেছেন, তবু যেহেতু এসবের বিরুদ্ধে প্রেস কাউন্সিলে চ্যালেঞ্জ করেননি তাই এগুলোর বিশে-ষণ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না। নির্বাচনের পর ৬ থেকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত প্রথম আলো, সংবাদ, ভোরের কাগজ ও আজকের কাগজের মোট ৬৭টি প্রতিবেদন, বিশেষ প্রতিবেদন ফলোআপ, চিঠিপত্র মন্তব্য প্রতিবেদন ও উপসম্পাদকীয়ের ওপর আলো ফেলে আমরা যে চিত্র পেয়েছি তা সত্যি দুঃখজনক। দক্ষিণাঞ্চলের খবর বেশি থাকলেও অন্যান্য অঞ্চল থেকেও দুঃসংবাদ কম হলেও আসছে। 'তেমন কিছুই হয়নি' এই আত্মতুষ্টি যেন পেয়ে না বসে ক্ষমতাসীনদের। বরং কী করে সামাজিক শান্তি বিনষ্টকারী এই ভয়াবহ অপতৎপরতা দ্রুত বন্ধ করা যায় সেদিকে সচেষ্ট হওয়া উচিত। এই প্র[illegible]য়া অব্যাহত থাকলে সমাজের ভেতরের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। সমাজ তখন প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। সমাজের অন্তর থেকে ভরসার উৎস হারিয়ে যাবে। মানুষ তখন আর মানুষকে বিশ্বাস করবে না। নিরাপত্তাহীনতা পুরো সমাজকে কুরে কুরে খাবে। এমন সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্য করার খরচ বেড়ে যায়। চাঁদাবাজদের দখলে চলে যায় সমাজ ও অর্থনীতি। তখন বিনিয়োগ

কমে আসে। বাজার সঙ্কুচিত হতে থাকে।

অনেক কষ্টের পর গণতন্ত্র এসেছিলো বাংলাদেশে। গণতান্ত্রিক শাসনামলের একদশককে দেশের অর্থনীতি শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছিলো। দারিদ্র্যের হার কমে আসছিলো। শিক্ষার হার বাড়ছিলো। শিশু মৃত্যুর হার কমছিলো। জীবনের আয় বেড়েছিলো। রপ্তানিও বেড়ে চলছিলো। এমন এক সময় নেমে এসেছে বিশ্বমন্দা। বিরাট এক চ্যালেঞ্জের মুখে বাংলাদেশও। এই সময়টাতে জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন ছিলো সবচেয়ে বেশি। কিন্তু সে রকম সময়েই চলছে বাংলাদেশের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ। পথে পথে আমরা বিভক্ত ও বিপর্যস্ত হচ্ছি। জানি না, বাঙালির আত্মহননের এই নষ্টযাত্রা কবে শেষ হবে?

এই নষ্টযাত্রাই কী বাঙালির ললাটে চিরদিনের সত্যি হয়ে থাকবে? নব্বইয়ে একজন স্বৈরশাসক যখন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করেছিলো তখন তো আমরা দলমত নির্বিশেষে সকলেই সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলাম। তাহলে 'গণতান্ত্রিক' এই পরিবেশে আমরা কেন প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবো না? চৌষট্টি সালে 'বাঙালি রুখিয়া দাঁড়াও' ব্যানার নিয়ে যে দীর্ঘ শান্তি মিছিলের আয়োজন করেছিলেন আমাদের পূর্বসূরিরা তার কোনো চেতনাই কী আজ আর অবশিষ্ট নেই আমাদের সমাজে? যদি তা সত্যি না হয় তাহলে আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব কেন সামাজিক শান্তির পক্ষে অনুরূপ মিছিলের আয়োজন করতে পারছে না? যেসব হতভাগা মানুষ নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে নাগরিক উদ্যোগ কেন চোখে পড়ছে না? বন্যা বা ডেঙ্গু প্রতিরোধে আমরা যদি রাস্তায় নামতে পারি, সামাজিক শান্তি বিনষ্টকারী এই ভয়াবহ ভাইরাস বা ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো বিবেকবান মানুষের কি খুবই অভাব মুক্তিযুদ্ধের এই বাংলাদেশে? আগামী দিনের বাংলাদেশের নাগরিক তথা তরুণ প্রজন্মও কি এরই মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছে?

প্রথম আলো, ২৮ অক্টোবর ২০০১

বাংলাদেশ ঃ অপরিণামদর্শী সাম্প্রদায়িকতার কবলে

মোহাম্মদ আবু জাফর

নির্বাচনের আগে পরে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প আক্রমণ করেছে বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়কে। এদেশে অনেকেই মনে করে, বাংলাদেশের হিন্দুরা সবাই আওয়ামী লীগের স্থায়ী ভোটার। যারা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তারা অনেকেই তাই হিন্দুদেরও বিরুদ্ধে—এ রকম একটি ধারণা সর্বত্র প্রচলিত। বলা বাহুল্য, এ ধারণা সর্বাংশে সত্য নয়। তবে যারা চিন্তা-চেতনায় সাম্প্রদায়িক তারা যে হিন্দুবিরোধী, এতে সন্দেহ করার অবকাশ নেই এবং এদের ধারণা, এ দেশ থেকে হিন্দুদের উৎখাত করতে পারলেই বাংলাদেশের মুসলমানরা সব দিক দিয়ে উন্নতি করবে, হবে সুখী। এমন অনেক দেশ আছে যেখানে কেবল এক ধর্মেরই লোক বাস করে। সে সব দেশ যে রাতারাতি উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছে এবং সেখানকার সব লোকই যে বাস করছে পরম সুখে, এমন প্রমাণ তো মেলে না। যারা বিশ্বাস করে সাম্প্রদায়িকতায়, তারা আসলে মানবতায় আস্থা রাখতে সক্ষম নয়। এ একটি রোগ বিশেষ, মারাত্মক রোগ। এই রোগে একবার আক্রান্ত হলে আর রেহাই মেলে না।

কাউকে না কাউকে সে শত্রু বানাবে। বিধর্মী বিতাড়িত হলে, সে তখন ধরে স্বদেশীকে, স্বধর্মীকে। এ কারণে সাম্প্রদায়িকতা কখনো বিলুপ্ত হয় না। ওইসব রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ধ্বংস না

হওয়া পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতা যে ধ্বংস হবে, এমন আশা করা যায় না। পাকিস্তানে তো হিন্দু নেই বললেই চলে, খ্রিস্টানদের সংখ্যাও বেশি নয়। সে দেশটি কি মুক্ত হতে পেরেছে ওই মারাত্মক রোগ থেকে? তারা কি পেরেছে আমাদের চাইতে বেশি উন্নতি করতে? পেরেছে যদি তা হলে তাদের টাকার দাম আমাদের চেয়ে বেশি নয় কেন? কেন সেখানে জ্বলছে হিংসার আগুন।

যখন এ দেশে বিদেশিরা ছিলো পোশাকের পরাক্রম নিয়ে, তখন ভাবা গিয়েছিলো যে, তারা বিতাড়িত হলেই দেশে আসবে সুখ। সে সময়েও যে এ দেশে হিন্দু বিরোধিতা ছিলো না, এমন নয়। কিন্তু সে সাম্প্রদায়িকতা আমরা রুখেছি সম্মিলিতভাবে। নানা আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যখন আমরা পৌছালাম মুক্তিযুদ্ধে, তখন এ দেশের সকল বাঙালি একত্র হলো এক কঠিন ইস্পাত ঐক্যে। তার সামনে কোনো ক্ষুদ্রতাই দাঁড়াতে পারেনি। যারা সে সময় দাঁড়িয়ে ছিলো মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে তারা ক্ষতি সাধন করেছে বহুতর উপায়ে; কিন্তু জনসাধারণের ঐক্য ও তাদের বিজয় রুখতে পারে নি। রুখতে পারে নি বলে তারা যে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো, এমন নয়। এ দেশের গণতন্ত্রের চর্চা কমবেশি অব্যাহত ছিলো; বিপরীত আদর্শী সরকারসমূহ নানা সময় দেশ শাসন করেছে।

এমনকি যারা প্রতিকূল ছিলো ওই সাম্প্রদায়িক শক্তির, তারাও অবলম্বন করে নি হত্যা বা গুমহত্যার পথ। সে কারণে অন্ধকারের বাসিন্দারা অনেকটা নিরুপদ্রবে পরিচালিত করেছে তাদের কর্মকাণ্ড। অন্যদিকে, ডানপন্থী সরকারগুলো সব সময়ই মনে করেছে, সাম্প্রদায়িক শক্তি তাদের আপনজন, বামপন্থী শক্তি তাদের পর জন। ফলে সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিবর্গ বরং ভোগ করেছে এমন ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা। ডানপন্থীদের হাতে দু'দুজন রাষ্ট্রপতি ও তাদের মন্ত্রী, আত্মীয়বর্গ নিহত হয়েছেন। তারপরও অনেকের চৈতন্যোদয় হয়নি। সে জন্যই, বামপন্থীরা কোনো নির্বাচনেই খুব একটা পৃষ্ঠপোষকতা পায় না। তাদের বলা হয়, দলের পতাকা নামিয়ে ঢুকে পড়ো খোঁয়াড়ে অথবা ধ্বংস হও। অন্যদিকে বামপন্থীরা বিদেশীদের নগ্ন লেজুড়বৃত্তি করতে করতে হারিয়েছে আমছালা সবই। অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে, এবারের নির্বাচনে একজনও বাঁচাতে পারেনি জামানত। সব মিলেয়ে বাংলাদেশ এখন সাম্প্রদায়িকতার অনুকূল ক্ষেত্র। কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতা ও কর্মি সাম্প্রদায়িকতার উলঙ্গ প্রকাশে নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয় মনে করেছেন।

সম্প্রতি পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, বেশ কিছু অপরাধীকে ধরা হয়েছে। কিন্তু সে যে বাস্তব অবস্থার চাইতে অনেকখানি অপ্রতুল তা সহজেই অনুমেয়। হিন্দুদের যদি ঘরবাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নিতে হয় অন্য জায়গায়, তাহলে তা যে এক ভয়াবহ অবস্থারই পরিণতি, তা অতি সহজবোধ্য। কোনো ব্যাখ্যাই এ ক্ষেত্রে সন্তোষজনক হতে পারে না। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বর্তমানে বাংলাদেশ একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়ে নিপতিত হয়েছে। মেরামতি কাজ করে এই কলঙ্ক মুছে ফেলার কোনো উপায় আছে বলে মনে হয় না। বাবরি মসজিদ ভাঙার সময় একটা মারাত্মক অবস্থা গেছে। ভারতে তো মাঝে মধ্যেই ঘটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সে সব অনেকটা গা সওয়া হয়ে গেলেও বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে বিজেপি যে কুৎসিত কাজটি করেছিলো, তার প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় দারুণভাবে। সে সময়ও আমরা বারবার চেষ্টা করেছি যে, একের অন্যায় অন্যের ঘাড়ে চাপতে পারে না। যে সংখ্যালঘু, যে দুর্বল তার ঘাড়ে লাফিয়ে না পড়ে পড়ো তারই ঘাড়ে যে করেছে ওই অপরাধটি। সেটি যারা পারে না, তারাই হত্যা ও পীড়ন চালায় দুর্বল সংখ্যালঘুর ওপর।

অথচ, ওয়াকিবহাল ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে, এবার বহু হিন্দুই ভোট দিয়েছে ধানের শীষে। নির্বাচনের বেশ আগে থেকে হিন্দু নেতা ও কর্মী যোগ দেন বিএনপিতে। তা দেখে অনেক আওয়ামী লীগ সমর্থক ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। বেগম খালেদা জিয়াও হিন্দুদের সমান অধিকার

নিশ্চিত করার ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং তিনি নিজে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে সে কথাই বলতে ও প্রমাণ করতে গিয়েছিলেন। হিন্দু নেতারাও তাকে সেখানে স্বাগত জানান যথোচিতভাবে। সুতরাং নীতি ও কৌশলগত দিক থেকে বিএনপির হিন্দু নির্যাতন করার কথা নয়। তারপরও যদি কেউ কেউ তা করে থাকে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেয়াই এখন বিএনপির প্রথম পদক্ষেপ হবে। কারণ, বিএনপি নেতৃত্ব বারবার সে ধরনের ঘোষণাই দিচ্ছে। বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বিজেপির ভূমিকা নিয়েও নানা কথা উঠছে।

অন্য সময় বিজেপি সরকার এবং ভারতীয় পত্রপত্রিকা এসব ব্যাপারে এমন তোলপাড় শুরু করে যে, ঘটনা যাচাই করার সময়টুকু পর্যন্ত যেন পাওয়া যায় না। অনেক সময় সেটা যে অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নগ্ন হস্তক্ষেপ পর্যন্ত হয়ে যায়, এটা তারা খেয়াল পর্যন্ত করতে চায় না। এবার দেখা যাচ্ছে, তারা এখানকার হিন্দুদের ব্যাপারে কোনো কথাই বলতে আগ্রহী নয়। কারণ হিসেবে অনেকে বলেছেন, তেল ও গ্যাসের জন্য তারা ত্যাগ করেছে এখানকার হিন্দুদের। তবে এছাড়াও অন্য কারণ আছে বলে কেউ কেউ ভাবেন। এবং সেটি হলো এই যে, ভারতের অধিকাংশ অবাঙালি বাঙালিদের দেখতে পারে না দু'চোখে। তা সে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিই হোক আর বাংলাদেশের বাঙালিই হোক। দিলি-সহ ভারতের যেখানেই যাওয়া যাক না কেন, প্রায়ই একই ধরনের সংবর্ধনা মেলে। গালি ছাড়া কথা নেই পশ্চিমবঙ্গ। যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এক ধরনের কমিউনিস্ট সরকার চালিয়ে যাচ্ছে কয়েক দশক ধরে, এটাও ঘি ঢেলে দিয়েছে আগুনে। ফলে পশ্চিমবঙ্গে বাঙালিদের প্রতি প্রেমময় দৃষ্টি অব্যাহত রাখবে বিজেপি বা অন্যরা, এটা ভাবার কোনও ভিত্তি নেই। প্রতিটি দেশই তাদের জাতীয় স্বার্থ আগে দেখে।

সেক্ষেত্রে অন্য দেশে বসবাসরত ধর্মীয় ভাইদের কথাও মনে থাকে না প্রায়ই। এই বাস্তবতা মনে রাখাটা ভালো। এবার যে অনেক হিন্দু ভোট দিয়েছে ধানের শীষে, এ কথাটি বিএনপি সমর্থকদের ভুলে যাওয়া ঠিক নয়। এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে হিন্দু মাত্রই আওয়ামী লীগের আমরণ ভোটার-এ কথা মনে করার সুযোগ থাকবে না। কিন্তু বিএনপি আমলে যদি হিন্দু নিধন ও নির্যাতন বন্ধ না হয়, তাহলে ওই প্রবণতা মার খাবে সাংঘাতিকভাবে। কেউ কেউ অবশ্য বলছেন যে, গ্যাস পাওয়ার আশায় বিজেপি এখানকার হিন্দুদের ধানের শীষে ভোট দিতে বলেছে। যদি কেউ এ ধরনের পরামর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে, তাহলে তা যে একটি ভুল কাজ তা বলাই বাহুল্য। অন্তর থেকে কাজ না করলে তার সুফল তো ফলতে পারে না। তারচেয়েও বড় কথা হলো অন্য রাষ্ট্রের দাবার ঘুঁটি হওয়ার মধ্যে কোনো মর্যাদা নেই। এদেশে মানুষ বাস করে পাশাপাশি। কোনো কথা ও কাজ কারও জানতে বাকি থাকে না। সুতরাং কোনো মতলবে চলা আর নিজের বিপদ ডেকে আনা একই কথা। নির্বাচন হওয়া এবং বিএনপির ক্ষমতায় বসার মধ্যে যে সময়টি অতিবাহিত হয় তার মধ্যেই অপরাধীরা যে নৃশংস হত্যা, পীড়ন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠনের দোজখ নামিয়ে দিয়েছে সংখ্যালঘুসহ অন্যান্যের ওপর, তার সমস্ত ভারটি চেপেছে এখন বর্তমান সরকারের ওপর।

বিএনপি বারবার বলছে যে, তাদের কেউ ওই দুষ্কর্মে জড়িত নয় এবং যদি কেউ জড়িত থেকে থাকে, তাহলে তার রেহাই নেই। বলা বাহুল্য, এ ধরনের ঘোষণা প্রমাণ করতে বিএনপিকে অতি কঠোর হতে হবে। কেবল তা হলেই তাদের ওপর মানুষের আস্থা সৃষ্টি হবে।

ইত্যবসরে যে শর্তটি হালে পানি পাচ্ছে না তা হলো এই যে, সাম্প্রদায়িকতা শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগুরুদেরই ধ্বংস করে ছাড়বে। ভারতের মতো বিশাল দেশে এ দেশের সকল হিন্দুর জায়গা হওয়াটা অসম্ভব নয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের সাম্প্রদায়িক অত্যাচার করার প্রতি□িয়া যে কতো মারাত্মক হতে পারে, সে সম্পর্কে সাম্প্রদায়িক শক্তি ও তাদের দোসরদের

হয়তো কোনো ধারণা নেই। পাকিস্তান এক সময় বড় সাধ করে আফগানিস্তানে তালেবানদের পৃষ্ঠপোষক সেজেছিলো। আমেরিকানদের ঠেলায় ফেলা থু থু তাদের এখন গিলতে হচ্ছে। খোদ পাকিস্তানেই ঢুকে বসে আছে মার্কিন সৈন্য। মুশাররফের কুশপুত্তলিকা দাহ করছে পাকিস্তানিরাই। শেষ পর্যন্ত সবটা চাপ যে পড়বে পাকিস্তানিদেরই ওপর, তা বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। পাকস্তানি অর্থনীতি অনেক সাহায্য পাবে হয়তো মার্কিনিদের, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব ক্ষতি যে পড়বে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের ওপর, তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে? একটি সরকার যদি ধর্মভিত্তিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, তাহলে তার পরিণতি কি হয় আজকের পাকিস্তান তার প্রমাণ। আমাদের কোনো কোনো মহল বিজেপি-র ওপর অনেক আস্থা রাখে। সাম্প্রদায়িক শক্তি হিসেবে বিজেপি যে কতো ভয়াবহ রূপ নিতে পারে, ভারতের মানুষ তা জানে। সাম্প্রদায়িক শক্তিই হত্যা করেছিলো গান্ধীকে। প্রয়োজনে এরা পৌঁছে যেতে পারে নিকৃষ্টতম পর্যায়ে।

যদি কোনো কারণে আমরা পড়ে যাই কোনো প্রতি□িয়ার সামনে তাহলে আমাদের অস্তিত্ব যে হবে বিপন্ন এবং আমাদের অর্থনীতিও যে হয়ে যাবে ধ্বংস, এই আশংকা কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয়। সংখ্যালঘুদের কখনো খাটো করে দেখা উচিত নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিলো, সেটা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। সাম্প্রদায়িক চিন্তা ও সংঘাত দেশের জন্য সব সময়ই ক্ষতিকর। সংখ্যালঘুরা যদি নিজেদের বিদেশি ভাবতে বাধ্য হয়, তাহলে তা দেশের জন্য বিরাট বিপদ যে ডেকে আনবে, সে কথাটি বিস্মৃত হওয়া ঠিক নয়। অন্যের গায়ে হাত তোলার আগে নিজের গা-টি বাঁচানো যাবে কি না, তা বেশ করে তলিয়ে দেখা আবশ্যক।

সাম্প্রদায়িকতার অনুশীলন কখনো মঙ্গল আনে না। বিধর্মীরা বিতাড়িত হলে তখন তা খুঁজে বেড়ায় আর একটি ক্ষেত্র। মুসলমানদের মধ্যে আছে নানা ফেরকা। সেখানেও তা অনুকূল পরিবেশ পেয়ে যেতে পারে। কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে তো আছেই কিছু লোক। শিয়া-সুন্নি বিরোধও পুরনো। তারপর নানা বিবাদ লাগতে পার বিভিন্ন ফেরকার মধ্যে। আঞ্চলিকতার মধ্যে আরাম পেতে পারে সাম্প্রদায়িকতা। আঞ্চলিকতা কিছুটা তো আছেই। সেখানেও ঘাঁটি গাড়তে পারে সাম্প্রদায়িক চিন্তা। বস্তুত, যারা দীক্ষা নেবে সাম্প্রদায়িকতায় তাদের তো কাজ দরকার, মানবতাবিরোধী কাজ। একটি জমি যদি লোপাট হয়ে যায়, তাহলে তারা খুঁজে নেবে আর একটি জমি। এভাবেই চলতে থাকবে হিংসার কর্মসূচি।

এ কারণেই, যে দেশে সংখ্যালঘু নেই, সেদেশেও থেকে যেতে পারে সাম্প্রদায়িকতা। আছেও। এবং এ জন্য সাম্প্রদায়িকতা কখনো একটি রাষ্ট্রের নীতি হওয়া উচিত নয়। তুরস্কে প্রায় সবাই মুসলমান। তারা তাই বলে কোনো সাম্প্রদায়িকতাকে গ্রহণ করেনি। তাদের দেশের নামও তারা ইসলামি গণতন্ত্র রাখেনি এবং সে কারণেই তারা দ্রুত এগিয়ে চলেছে উন্নতির দিকে। পেছনে টানার মতো কোনো শক্তিতে তারা পাত্তা দিতে রাজি নয়। সংখ্যালঘু প্রসঙ্গে একটি অভিযোগ প্রায়ই তোলা হয়। মাঝখানে তাদের কারো কারো ঔদ্ধত্য নাকি খুব বেড়ে গিয়েছিলো। কয়েকটি তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত এক ব্যক্তিকে উপাচার্য নিয়োগ, কয়েকটি সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ নিয়োগ, কয়েকজন সচিব নিয়োগ অথবা অন্যান্য উঁচু পদে কিছু নিয়োগ নিয়ে দেশের সবখানেই মহা হইচই পড়ে গিয়েছিলো।

আতঙ্ক ছড়ানো হলো এই বলে যে, সংখ্যালঘুরা দেশটি দখল করে ফেলেছে। বলা বাহুল্য, এটি সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনো সংখ্যালঘুর পক্ষে কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়, যদি না সংখ্যাগুরু তাকে কিছু দিতে মনস্থ করে। যোগ্যতা থাকলে অথবা সংখ্যার অনুপাতে এসব ক্ষেত্রে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত হতেই পারে। সংখ্যালঘুদের প্রাপ্তির কথা উঠলেই অনেকে বলে

বসেন- কই, ভারতে অথবা পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘুদের তো সংখ্যানুপাতে কিছু দেয়া হচ্ছে না? অর্থাৎ পুরনো সেই সাম্প্রদায়িক চিন্তা, ইটের বদলে পাটকেল, একটি অন্যায় দেখিয়ে আরো একটি অন্যায় করা। এখন ভারত যদি বিনষ্ট হয় সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে, তাহলে আমাদেরও কি যেতে হবে ওই কুপথে? কোনো একটি জেলার সব চাকরি নিতে থাকলে আমরা যেমন সেটি অন্যায় বলে প্রতিবাদ করি, তেমনি কেউ সাম্প্রদায়িকতার চর্চা করলে তা একই কারণে নিন্দনীয় মনে করি। কারণ, দুটিই ন্যায় ও মানবতাবিরোধী।

এ ক্ষেত্রে পাশের রাষ্ট্র কি করলো না করলো, সেটা মোটে বিবেচ্য হতে পারে না। 'তুমি অধম বলিয়া আমি উত্তম হইবো না কেন'? একাধিক তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপাচার্য হন নি। সংখ্যাগুরুদেরই এক সদস্য তাকে ওই পদে বসিয়েছিলেন এবং তাদের একই দলের বহু সদস্য লিখিতভাবে এবং মৌখিকভাবে এ ব্যাপারে প্রচুর সমালোচনামূলক বক্তব্য রেখেছিলেন। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। যদি কোনো অযোগ্য ব্যক্তি নানা অপকৌশল অবলম্বন করে কোনেরা উঁচু পদ বাগিয়ে নেন তাহলে তা সমালোচনার বিষয় হতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে যারা তার মতো লোককে উঁচু জায়গায় বসান তাদেরও সমালোচনা করা দরকার। উঁচু পদে কেউ যদি অস্তরিতা দেখায়, তাহলে তার প্রতি ক্রোধটি কেন পড়বে নিরীহ সংখ্যালঘুদের ওপর? দুঃখের বিষয়, যারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করে তারা সব সময়ই এক জায়গার রাগটি অন্য জায়গায় দেখিয়ে বসে। মুখে আমরা বলি গণতন্ত্রের কথা অথচ ভোট না পেলে ভোটারদের মাথা ফাটাতে চাই।

নিজেরা স্বৈরাচার বলেই যে এটা আমরা করে বসি, তা অনেক সময় নিজেরাই বুঝতে সক্ষম হই না। সংখ্যালঘুদের আমরা যদি কিছু না দিতে চাই, তাহলে তারা কিছুই পাবে না। তার ওপর যদি আমরা কেড়ে নিই তাদের জানমাল, সম্ভ্রম ও সম্পত্তি, তাহলে তো মানুষ বলে পরিচয় দেয়ার কিছুই আর থাকে না। হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও ভিটে থেকে বিতাড়নের মাধ্যমে আমরা কি আমাদের স্বাধীনতার মর্যাদা রাখতে পারবো, পারবো কি আমরা আমাদের স্বাধীনতা ও শান্তি টিকিয়ে রাখতে? যে মরবে, নির্যাতিত হবে, ধর্ষিত হবে, হবে লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের শিকার- সে কি বলবে না 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়'?

যারা সংখ্যালঘুদের নিয়ে নোংরা রাজনীতি করে, তারা সমালোচিত হতে পারে; কিন্তু সংখ্যালঘুরা মার খাবে কেন? তাদের কি স্বাভাবিকভাবে বাঁচার, উন্নতি করার এবং ইচ্ছেমতো ভোট দেয়ার অধিকার নেই? তারা কি এদেশের সমান অধিকারপ্রাপ্ত নাগরিক নয়? এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উলে-খ্য যে, কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতি নারীর সম্ভ্রমহানি কখনো মেনে নেয় না। ধর্ষণের অপরাধ মানুষ কখনো ক্ষমা করে না, ওই অবমাননা মানুষ কখনো ভুলতে পারে না। আজ হোক কাল হোক, নরী ধর্ষণের প্রতিক্রিয়া ফিরে আসবেই। যে দুর্বল সে অবমানিত হলেই যে ছেড়ে দেবে এমন মনে করার বাস্তব কোনো কারণ নেই।

দুর্বল যদি রুখে দাঁড়ায় তাহলে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া অতো সহজ হয় না। পাহাড়িরা যে রুখে দাঁড়িয়েছে, তাদের কি পিটিয়ে ঠাণ্ডা করা গেছে, না যাবে? শ্রীলঙ্কায় কি সংখ্যালঘু তামিলদের শায়েস্তা করা গেছে? অসংখ্য নারী যে সম্ভ্রম হারিয়েছে তার বিষময় প্রতিক্রিয়া থেকে যে আমাদেরই রেহাই মিলবে, এমন ভরসা হয় না। উনিশ'শ একাত্তর সালে নারী ধর্ষণ করার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানিরা বাঙালিদের সমর্থন চিরকালের জন্য হারিয়ে ফেলে এবং লাখ লাখ বাঙালি তরুণ ওই অবমাননার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য অস্ত্র হাতে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ সামনে থাকতে কেন সেই বিপজ্জনক পথে পা বাড়ানো?

আজকের কাগজ, ২৮ অক্টোবর ২০০১

সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ঃ ভারতের বিজেপি কী চেয়েছিল?

শাহরিয়ার কবির

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের রাত থেকে বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর যে নজিরবিহীন নির্যাতন আরম্ভ হয়েছিল ১১১ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের হামলাও হুমকির কারণে যারা ঘরছাড়া ও এলাকাছাড়া হয়েছেন তাদের অনেকের উদ্বাস্তু জীবন এখনও অব্যাহত রয়েছে। অনেকে পিতৃপুরুষের ভিটা ছেড়ে চিরদিনের জন্য দেশত্যাগ করেছেন।

গত ১১১ দিনে হিন্দু সম্প্রদায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনাড়ম্বর পরিবেশে তাদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা আয়োজন করেছেন। লক্ষ্মীপূজাও করেছেন। সামনে কালীপূজা, নিয়ম রক্ষার জন্য তাও করতে হবে। বিএনপি-জামাতের জোট সরকার যদিও বার বার বলেছে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের বিষয়টি অতিরঞ্জিত, হিন্দুদের সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা করতে হবে এবং পূজার পর সরকারী প্রচার মাধ্যমে বলা হয়েছে সারা দেশে সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা হয়েছে— বাস্তব পরিস্থিতি ছিল এর বিপরীত। দুর্গাপূজা উদযাপনের প্রাক্কালে বহু পূজামণ্ডপে প্রতিমা ভাঙা হয়েছে, পূজার আয়োজকদের হুমকি দেয়া হয়েছে আলোকসজ্জা, আনন্দোৎসব না করলে দেশছাড়া করা হবে। শুধু দুর্গা প্রতিমা নয়, বিভিন্ন জায়গায় লক্ষ্মী প্রতিমাও ভাঙা হয়েছে। কোথাও বাধ্য হয়ে কাউকে গ্রেফতার করা হলেও সরকার সব সময় বলেছে এবং এখনও বলছে বাংলাদেশে 'চমৎকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ' বিরাজ করছে।

গত সপ্তায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর বিশেষ দূত জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রজেশ মিশ্র বাংলাদেশ সফরে এসে যখন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনার সময় নির্বাচনোত্তর সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন, তখন তাঁকেও বলা হয়েছে কোথাও বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটলেও বাংলাদেশে 'চমৎকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি' বিরাজ করছে। বরং মিশ্রের কাছে পাল্টা অভিযোগ করা হয়েছে দিল-ীতে বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিক্ষোভ সম্পর্কে। সেই বিক্ষোভে বাংলাদেশের পতাকা পোড়ানোর ঘটনায় ব্রজেশ মিশ্র দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

গতকাল ভারতের অমৃতসরে বিজেপির এক কর্মী সমাবেশে দলের সভাপতি কৃষ্ণমূর্তি বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নিপীড়নের খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়ন নির্যাতনের ঘটনা ঘটার পর ভারতের ক্ষমতাসীন হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল বিজেপির পক্ষ থেকে এই প্রথম বড় ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ ও প্রতিবাদ।' (ভোরের কাগজ, ৩-১০-২০০১)

ভারতের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিক্রিয়া আরও তীব্র ও উদ্বেগজনক। নয়াদিল-ী থেকে জনকণ্ঠের প্রতিনিধি শর্মিষ্ঠা রায় লিখেছেন, 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর যে নির্যাতন চলছে তা দেখে আসার জন্য তারা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সেখানে এক সংসদীয় প্রতিনিধি দল পাঠাতে বলেছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা অশোক সিংহল বলেছেন, বাংলাদেশে অবিলম্বে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার বন্ধ না হলে এ দেশে ওই একই ঘটনা ঘটার

আশঙ্কা রয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার বন্ধের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা যথেষ্ট নয়। তাঁর মতে বাস্তবের সঙ্গে খালেদা জিয়ার প্রতিশ্রুতির কোন মিল নেই। বরং খালেদা ক্ষমতায় আসার পর নির্যাতন বেড়ে গেছে। এক সংবাদ সম্মেলনে শ্রী সিংহল মন্তব্য করেছেন যে, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সেনারা সংখ্যালঘুদের ওপর যে নির্যাতন চালিয়েছিল সাম্প্রতিক কালে মৌলবাদীদের আচরণ তাকেও ছাড়িয়ে গেছে। ইতোমধ্যেই ৪০ হাজার হিন্দুকে সে দেশ থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য করা হয়েছে এবং আরও এক লাখ মানুষ দেশ ছেড়ে চলে আসার জন্য উন্মুখ। .... এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ দেশের মানুষের মনে যদি প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে ওঠে তবে আমাদের পক্ষে সেই আগুন নেভানো কঠিন হবে বলে সিংহল মন্তব্য করেছেন।' (দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩-১০-২০০১)

এ কথা আমরা বহুবার বলেছি— উপমহাদেশের যে কোন একটি অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি ঘটলে প্রতিবেশী দেশগুলোতে তার প্রতিক্রিয়া ঘটবেই। এবার বিএনপি-জামাতের মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক জোট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চক্রান্ত করে নীলনকশার নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে, যাদের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করে পাকিস্তানের মত একটি মনোলিথিক ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করা। এবার আক্রমণের অজুহাত হিসেবে তারা বলেছে হিন্দুরা নৌকায় ভোট দেয়। অধিকাংশ হিন্দু আওয়ামী লীগের সমর্থক হলেও অনেক হিন্দু অন্যান্যবারের মতো এবারও বিএনপি ও বামপন্থী ১১ দলের প্রার্থীদের ভোট দিয়েছেন। আক্রান্তদের অনেকে আমাদের বলেছেন, তারা আক্রমণের সময় যদিও বলেছিলেন নৌকায় নয় ধানের শীষে ভোট দিয়েছেন, তারপরও তাদের পরিত্রাণ মেলেনি। সবচেয়ে বড় কথা এবার হিন্দু সম্প্রদায়ের সিংহভাগ নির্যাতন ও হামলার কারণে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। তারপরও বাংলাদেশকে পাকিস্তানে রূপান্তরিতকরণের নীলনকশা অনুযায়ী হিন্দুদের উপর মধ্য জুলাই থেকে যে নির্যাতন শুরু হয়েছে তার জের এখনও চলছে।

বিএনপি-জামাত জোটের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচনের অনেক আগেই বলেছেন তারা ক্ষমতায় গেলে বাংলাদেশের তেল ও গ্যাস বিক্রি সম্পর্কে শেখ হাসিনা যে অনমনীয় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা মানা হবে না। শেখ হাসিনা বহুবার বলেছেন, পঞ্চাশ বছরের মজুদ না রেখে তাঁরা বিদেশী কোম্পানির কাছে তেল ও গ্যাস বিক্রি করবেন না। তাঁর এই অনড় মনোভাব আমেরিকা ও ভারত কাউকে সন্তুষ্ট করেনি, যারা বাংলাদেশের তেল ও গ্যাস উত্তোলন ও ক্রয়ে আগ্রহী। যৌক্তিক কারণেই পাকিস্তানের মতো আমেরিকা ও ভারতও চেয়েছে এবার আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ বিএনপি ক্ষমতায় আসুক যাতে তারা নির্বিঘ্নে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর তাদের অধিকার ও আধিপত্য কায়েম করতে পারে। এই ভাবে তারা বিএনপি-জামাত জোটকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার প্রক্রিয়ায় নিজেদের যুক্ত করেছে। বাংলাদেশে 'অবাধ ও নিরপেক্ষ' নির্বাচনের ব্যাপারে মার্কিন প্রশাসনের নজিরবিহীন আগ্রহ, নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণার আগেই ভারতের প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন প্রেরণ এবং নতুন সরকারের প্রতি ভারত, পাকিস্তান ও আমেরিকার অকুণ্ঠ সমর্থনকে কোন অবস্থায় বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের পাকিস্তানিকরণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আধিপত্য কায়েমের চক্রান্ত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়।

ভারত ও আমেরিকার ক্ষেত্রে বিএনপি-জামাত জোটকে সমর্থন বুমেরাং হয়েছে। তেল ও গ্যাস পাওয়ার জন্য বাংলাদেশে যে মৌলবাদী সরকারকে ভারত সমর্থন দিয়েছে তারা বাংলাদেশ থেকে হিন্দু বিতাড়ন করে ভারতে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে পারে এটা দিল্লীর নীতি নির্ধারকরা কতটুকু ভেবেছেন জানি না। তবে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের জন্য এই

পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে হুমকি স্বরূপ। একইভাবে পাকিস্তান বা ভারতের মতো আফগানিস্তানে লাদেন ও তালেবানদের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধ বিএনপি-জামাত জোটের পক্ষে সেভাবে সমর্থন করা সম্ভব হচ্ছে না, যদিও তত্ত্বাবধায়ক সরকার আফগানিস্তানে তালেবানি সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে আমেরিকাকে সমর্থন দানের অঙ্গীকার করেছিল বিএনপির সঙ্গে পরামর্শ করেই। আবার পাকিস্তানে জামাতে ইসলামী যেভাবে লাদেন ও তালেবানদের সমর্থন করছে বাংলাদেশের জামাতীরা তা করতে পারছে না পাছে আমেরিকা নাখোশ হয় সেই ভয়ে। বাংলাদেশে লাদেনের পক্ষে বিভিন্ন মৌলবাদী সংগঠন প্রতিদিন মিছিল মিটিং করছে এবং দিন দিন তা বাড়ছে, যা বিএনপি-জামাত জোট কিংবা তাদের প্রভু আমেরিকার জন্য স্বস্তিদায়ক নয়। ভারত ও আমেরিকা এখন বুঝতে পারছে কেউটে সাপের লেজ দিয়ে কান চুলকোনোর বিপদ, যার প্রতিফলন ঘটেছে বিজেপির উদ্বেগ ও আমেরিকার ভ্রূকুটিতে।

বিএনপি-জামাতের জোটকে ক্ষমতায় বসিয়ে ভারত কিংবা আমেরিকা খাল কেটে কীভাবে তারা কুমির এনেছে দিন দিন তা স্পষ্ট হচ্ছে। খালেদা-নিজামীদের সরকার বলেছে তারা তেল ও গ্যাস বিক্রি করবে আমেরিকা ও ভারতের কাছে। আওয়ামী লীগ ও বাম দলগুলো এর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। ১১টি বাম দল তেল গ্যাস বিক্রির প্রতিবাদে ১৫ নবেম্বর হরতালও ডেকেছে, যার প্রতি যে কোন দেশপ্রেমিক নাগরিকের সমর্থন থাকবে। সিলেটের অধিবাসীরা বলেছেন তেলের পাইপলাইন দিয়ে তেল নয় তাদের রক্ত যাবে। শুধুমাত্র তেল ও গ্যাস পাওয়ার জন্য যারা বিএনপি-জামাতের চার দলীয় সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী জোটকে ক্ষমতায় বসিয়েছে তারা সাম্প্রদায়িক ও আফগান ইস্যুতে বুঝতে পারছে কত বড় ভুল তারা করেছে। এই ভুল তারা কীভাবে সংশোধন করবে এটা তাদের বিবেচ্য বিষয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী কোন বাঙালি যেমন নিজেদের জীবন থাকতে বাংলাদেশকে আফগানিস্তান বা পাকিস্তান বানাতে দেবে না, একই ভাবে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরও বিদেশী আধিপত্য তারা মেনে নেবে না।

ভোরের কাগজ, ৩.১১.২০০১

যে হও বাঙালি তুমি রুখিয়া দাঁড়াও ...

হারুন হাবীব

এমন একটি স্লোগান দিয়ে কোনো লেখা শুরু করতে হবে, কখনও ভাবিনি। ভাবিনি, যে দেশের স্বাধীনতার বয়স ত্রিশ বছর পেরুচ্ছে, যে দেশের মানুষ শিক্ষাদীক্ষায় আগের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছে, সেদেশে ধর্মের নামে, রাজনীতির নামে মানুষকে এমন বর্বরোচিত আক্রমণ করা হবে, ঘরবাড়িতে আগুন দেয়া হবে, আশ্রয়হীন করা হবে, সেই সঙ্গে নিরীহ গৃহবাসী নারীদের ওপর পশুশক্তির এমন নির্লজ্জ ব্যবহার হবে কখনও।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, পাকিস্তান আমলের সেই উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতি গ্রাস করতে শুরু করেছে স্বাধীন বাংলাদেশকে নতুন করে, যা আমাদের কারোরই কাম্য নয়। কাজেই পুরনো সেই স্লোগান জেগে উঠেছিলো সেদিনকার বিপন্ন পূর্ববাংলা, পূর্ব পাকিস্তান অশুভ সমাজশক্তির বিরুদ্ধে। এ সেই স্লোগান যা জাগরিত করেছিলো আমাদের মনুষত্ব, বাঙালির অসাম্প্রদায়িক শাসন ও শোষণ ভেঙে এই রক্তার্জিত প্রিয় বাংলাদেশকে।

দেশের খ্যাতিমান আইনজীবী ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলামের প্রতি আমার সবিশেষ

শ্রদ্ধা আছে। জাতির মহান মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে সেদিনকার তরুণ ব্যরিস্টার ও পার্লামেন্ট সদস্য আমীর-উল-ইসলাম হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি **১৯৭১** সালে বাঙালি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রধান সংগঠক ছিলেন। পাকিস্তানি সেনাশাসকদের হাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আকস্মিক গ্রেফতার ও সেদিনকার পূর্ব পাকিস্তানে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর নির্বিচার গণহত্যা শুরুর পর বাঙালির জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় সমর্থন আদায়ে সেদিনকার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাজউদ্দিনের প্রথম বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আমীর-উল-ইসলাম। তারপর নয় মাস যুদ্ধকালীন পালন করেন তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দায়িত্ব।

খুব একটা দেখা হয় না। কিন্তু যখন হয়, বলি, আপনার স্মৃতিগুলো লিখে ফেলুন। অন্তত একটি বই তো প্রকাশ হোক। জাতীয় স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণের স্বার্থেই এসব স্মৃতি লিখে রাখার বিকল্প নেই। বিশেষ করে আজ যখন দেশে উগ্র-ধর্মীয় রাজনীতির পুনরুত্থান লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তরুণ প্রজন্মের কাছে জাতীয় চেতনার বিকৃতি ঘটানো হচ্ছে কিংবা আবারও হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে তখন তো আপনার ব্যক্তি স্মৃতি অনেক বেশি মূল্যবান। কিন্তু তিনি তা লিখতে পারেননি বলেই জানি। হয়তো লিখবেন।

সাম্প্রতিক নির্বাচনে ব্যারিস্টার ইসলাম কুষ্টিয়ার একটি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ফলাফল প্রকাশের পর দেখা গেলো তিনি পরাজিত। নির্বাচনী এই ফলাফল অনেকের কাছে বিস্ময়কর মনে হলেও বঙ্গবন্ধু মন্ত্রিসভার সদস্য এবং মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রধান এই সংগঠককে আরও অনেকের মতোই সে পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে। কিন্তু তিনি তো তার মানুষকে ভুলতে পারেন না, যারা তাকে ভোট দিয়েছেন এবং ভোট দেয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই আজ তারা বিপন্ন। তাই তিনি গিয়েছিলেন তার এলাকায় নির্বাচন উত্তর ভ্রমণে। ভোটারদের কাছে বিজয়ী এবং বিজিত দু'পক্ষেরই যাওয়া উচিত। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে এমনটা না হলে গণরায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা জানানো হয়।

বলতে কি, আমার হাতে এখন কাজকর্ম বলতে খুব একটা নেই। সদ্য বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের 'নিরপেক্ষতা'র কল্যাণে আমি এর অর্থে এখন চাকরিচ্যুত। আমি জানি, আমার একমাত্র অপরাধ জাতির মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং সেই চেতনাকে আমৃত্যু লালন করা আমারই প্রকাশ্য অঙ্গীকার। বহুল বিতর্কিত যে, অন্তর্বতীকালীন সদ্য বিগত রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ, তারা অবশ্য জানে না, জানার তাদের সুযোগও হবে কিনা জানি না। হাজার বছর ধরে চেষ্টা চালিয়েও তার বা তাদের অনুগত দাশ শ্রেণীর প্রাণীগুলো কোনদিনও আমার মতো মানুষকে পরাজিত করতে পারে না। কারণ জাতির মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের যে অহঙ্কার, জন্মভূমির স্বাধীনতার বেদীতে নিজের রক্ত দেয়ার যে গর্ব, তা আমার প্রজন্মকে আমৃত্যু অপরাজিত রাখতে বাধ্য প্রগাঢ় এক বিশ্বাস ও সুবিশাল আস্থায়।

যা হোক, ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলামের সাম্প্রতিক কুষ্টিয়া ভ্রমণে তিনি আমন্ত্রণ জানালে আমিও সঙ্গী হয়েছিলাম। অনেককাল আগে শিলাইদহের রবীন্দ্র কুঠিবাড়িতে গিয়েছিলাম। বালিপড়া যে গড়াই পাড় হয়েছি সেদিন গাড়িতে বসে আজ সে মরা নদীতে এই অক্টোবরেও এখন বেশ পানি। গঙ্গাচুক্তির শুভ ফল বলেনও সবাই এককালের বৃহত্তর কুষ্টিয়ার মুজিবনগরেও গিয়েছিলাম, স্বাধীন বাংলাদেশের 'প্রথম সরকারের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছিলো যেখানে **১৯৭১** সালের **১৭** এপ্রিল। সেও বহুকাল আগে। তাই এবারের ভ্রমণে কুষ্টিয়ার নানান জনপদ ঘুরতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, ভালবাসার এই মৃত্তিকা, এই সবুজ গাছগাছালি, পাখি আর নদী-খাল-বিল যেন বারবার বাংলাদেশকে ভালবাসার প্রেরণা দেয়। অবকাঠামোগত বেশ উন্নয়ন হয়েছে গ্রাম-গঞ্জে বিগত বছরগুলোতে। রাস্তাঘাট, সেচ ব্যবস্থা আর

যানবাহন এখন যথেষ্টই উন্নত বলতে হয়। এ অঞ্চলটিকে 'সন্ত্রাসের জনপদ' বলা হলেও বৃহত্তর কুষ্টিয়া আজও মরমী বাংলার সুপ্রিয় এমন এক জনপদ যেখানে দুই বাঙালি মহাপুরুশ লালন ও রবীন্দ্রনাথ তাদের জায়গা করে নিয়েছিলেন। এই অপরূপ গ্রামবাংলায় একজন আরেকজনের ঘাতক হতে পারে কি করে, ভাবতে সত্যিই বিস্ময়কর লাগে! এবারের পূজার অষ্টমী আর নবমীতে নানা গ্রাম আর শহরগঞ্জ ঘুরেছি কুষ্টিয়ার। শহর থেকে দূরের গ্রামগুলোতে ঘুরতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, যে সমাজ দর্শনকে শ্রদ্ধা জানাতে জাতি ত্রিশ বছর আগে স্বাধীনতার বেদীতে ত্রিশ লক্ষ দেশপ্রেমি কে উৎসর্গ করেছিলো, সেই সমাজদর্শন আজ যেনো লুণ্ঠিত **১** অক্টোবরের নির্বাচনী ফলাফলের মাঝ দিয়ে। অথচ কোনো একটি নির্বাচনের ফলাফলে তো এমনটি হওয়ার কথা ছিলো না? নির্বাচনতো কেবল একটি গণরায় মাত্র, যার মধ্য দিয়ে একটি দল বা একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী একটি সীমিত সময়ের জন্যই কেবল রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হয়। কিন্তু প্রধান জাতীয় দৈনিকগুলোর ধারাবাহিক প্রতিবেদন আর অসাম্প্রদায়িক সমাজশক্তির উৎকণ্ঠার বিবরণ পড়ে যে কোনো বিবেকবান মানুষই আজ আতঙ্কিত না হয়ে পারে না। এ কোনো অশুভ শক্তির আবির্ভাব, যারা কেবল রাজনীতির নামেই প্রতিপক্ষকে খুন-জখম আর আ□মণ করছে না একই সঙ্গে ধর্মের নামেও লুণ্ঠিত করছে নারীকে, ঘরবাড়ি ছাড়া করছে মানুষকে, মেতে উঠছে সেই একই বর্বর মনোবৃত্তিতে, যারা মানুষের অর্জিত সভ্যতাকে বর্বর যুগের দিকে ধাবিত করতে ধর্মকে জিঘাংসার হাতিয়ার বানাতে চায় কুষ্টিয়ার শিবপুর, হরিনারায়ণপুর, দাশপাড়া, বারোইতলা আর হরিপুর থেকে শুরু করে শহরাঞ্চলের কমপক্ষে ত্রিশটি পূজামণ্ডপে গিয়েছি আমরা দলবেঁধে। প্রায় প্রতিটি পূজামণ্ডপে গিয়ে শুনলাম প্রতিবছরই যেখানে উপচে পড়া ভিড় থাকে, সেখানে আজ ভক্তদের উপস্থিতি নিতান্তই নগণ্য। পূজার আনন্দে মানুষ এতটা ম্রিয়মাণ থাকবে ভাবতেই অবাক লাগে! ঢুকতেই প্রথম চোখে পড়ে হাতে লেখা একটি পোস্টার ঃ 'মাগো তুমি ফিরে যাও, ধর্ষিতা মা-বোনকে ঘরে রেখে আমরা তোমায় বরণ করতে পারবো না।' প্রায় প্রতিটি মণ্ডপেই চলছিল গণঅনশন, মানববন্ধন। নির্বাচন পরবর্তী অত্যাচার আর বর্বরতার বিরুদ্ধে নারী পুরুষদের সম্মিলিত প্রতিবাদ। মুসলিম জনগোষ্ঠীরও একটি বড় অংশ যোগ দিয়েছে এই প্রতিবাদে। মণ্ডপের নানা কোনায় আঁটা হিন্দুধর্মাবলম্বীদের আকুতি ঃ 'দয়া করে আমাদের জন্মগত অধিকার হরণ করবেন না। আমরা এদেশেরই মানুষ। আমরা পূর্ণ নাগরিক অধিকার চাই।'

ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বাংলাদেশের পূর্ণ নাগরিক নয়, ভোট দেয়া কিংবা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্য নয়, স্বাধীন রাজনৈতিক অধিকার তাদের থাকতে পারে না এমনটি ভাবার মাঝে যে উগ্র মানসিকতা ও বিকলাঙ্গ রাষ্ট্রচিন্তা কাজ করে তার দৃষ্টান্ত খুঁজতে খুব বেশি দূর নয়, সেদিনের ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের সেনা আমলাতান্ত্রিক রাজনৈতিক চলচ্চিত্র দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু কথা হচ্ছে, সেই বন্যতাকে বাংলাদেশ গ্রহণ করতে যাবে কোন যুক্তিতে? কোন যুক্তিতে আমরা এটি মানতে যাবো যে, হিন্দু প্রাধান্য বলেই ভারতের মুসলমানদের এবং মুসলিম প্রাধান্য বলেই বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর অত্যাচার চালানোর অধিকার আছে সংখ্যাগরিষ্ঠদের?

সাম্প্রতিককালের ঘটনাপ্রবাহে এটি মানতেই হয় যে, পাকিস্তানের আরোপিত যে ধর্মান্ধতা আর সংকীর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে আমরা বাঙালিরা জাতিগতভাবে, ইতিহাসগতভাবে, সভ্যতা ও কৃষ্টি ঐতিহ্যগতভাবে অস্বীকার করে আমাদের জাতিসত্তার পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছিলাম, সেই আত্মশুদ্ধির পুনর্জাগরণ আবারও আমাদের প্রয়োজন। বিশেষ দলীয় রাজনীতির নামে নয়, বিশেষ কোনো নির্বাচনের নামে নয়, আমাদের জাতিসত্তার অন্তর্গত বোধ ও পরিচয় আমাদের কখনই এতটা নিচু করে তোলেনি যতটা করেছে সাম্প্রতিক এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। কে কিভাবে গ্রহণ করবেন জানি না, আমার নিজের উপলব্ধি হচ্ছে, সাম্প্রতিক নির্বাচনের আগে ও পরে,

বিশেষত ফলাফল বেরোবার পর থেকে দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর যে পরিকল্পিত নির্যাতন করা হয়েছে তা আমাদের অর্জিত সভ্যতার মুখে থু থু ছুঁড়ে দিয়েছে। জানি না কবে আমরা এ অপরাধ থেকে মুক্ত হতে পারবো।

দেশের নাগরিক সমাজ, মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা ও নানা সংগঠন ও প্রায় প্রতিটি খবরের কাগজে নিত্যদিন পড়তে হচ্ছে মানবতার লাঞ্ছনার খবর। মানুষ যে এতটা বন্যজন্তুতে পরিণত হতে পারে তা পত্রপত্রিকার রিপোর্টগুলো না পড়লে বিশ্বাস করা যায় না। শুধু নারী নিগ্রহ নয়, একই সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, মারপিট, লুণ্ঠন ও হত্যা, আমার বিশ্বাস, ১ অক্টোবরের নির্বাচনকে কলঙ্কিত করেছে।

নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে দেশী-বিদেশী সমর্থন যেমন আছে, তেমনি আছে একক বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের পরিপূর্ণ অগ্রহণযোগ্যতার দাবি। বিষয়টি নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাইনে, শুধু এই বলি, আমরা যেন এই দুই দাবির ন্যায্যতার প্রশ্নটিকে সময়ের নিরপেক্ষ মানদণ্ডের হাতেই ছেড়ে দেই। বিচারপতি লতিফুর রহমানের অন্তবর্তীকালীন প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশন কতটা নিরপেক্ষ কিংবা পরাজিতরা কেবলই পরাজয়ের যন্ত্রণা প্রশমনের জন্যই নির্বাচনী ফলাফলকে প্রত্যাখ্যান করছে কিনা, এই দুই ধারার একটি অন্তত প্রত্যাখ্যাত হবে সময়ের বিচারে। এ বিচার হয়তো বা খুব দেরি নয়। কারণ সকলেরই জেনে রাখা ভাল ১ অক্টোবরের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের যেমনি শুরু নয় তেমনি শেষও নয়। আমরা একটি সুষ্ঠু নির্বাচন চেয়েছিলাম, যাতে আমাদের গণতন্ত্রের ভিত আরও খানিকটা শক্ত হয়। তাতে কে জিতবে, কে হারবে সেটি বড় নয়। বড় যা তা গণরায়। আমরা তা পেয়েছি কি পাইনি তার একটি সমাধান তো পেতেই হবে।

বলতেই হয়, এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ত্রিশ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসে জাতির মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘাতক ও ধর্মীয় মৌলবাদী অপশক্তি একটি সরকারে যোগ দেয়ার সাফল্য অর্জন করেছে। যে ব্যক্তি ছিলো কুখ্যাত আল-বদর বাহিনীর প্রধান সে আজ নতুন সরকারের একজন মান্যবর মন্ত্রী। নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এটি এক প্রভূত তাৎপর্যময় ঘটনা, যার প্রতিক্রিয়া এ সমাজে হতে বাধ্য, আজ বা কাল। সময়ই বলে দেবে আমরা কি ধর্মীয় মৌলবাদী আর জাতীয় স্বাধীনতার সক্রিয় বিরোধীদের নিয়ে 'ওয়ান নেশন' গড়ব নাকি ধর্মীয় সহনশীলতা আর স্বাধীনতার সপক্ষের গণতান্ত্রিক শক্তিকে একত্র করে গড়ে তুলবো এই প্রিয় স্বদেশভূমির ভবিষ্যৎ। দেশের বৃহত্তর মানুষ যা চায় জাতির আগামী রাজনীতি সেভাবেই অগ্রসর হবে। এখানে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ক্ষোভ হয়তো খুব একটা প্রাসঙ্গিক নয়।

ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলামকে কুষ্টিয়ায় রেখেই আমি ঢাকার পথে রওনা হয়েছি। কুষ্টিয়াতেও দেখেছি, দলীয়ভাবে নানা কোন্দল তাকে পোহাতে হয়েছে। নির্বাচনে তার দলের ভোট তাৎপর্যময়ভাবে বাড়লেও বহু জায়গায় দলীয় কোন্দল এবং প্রবল অন্তুষ্টি দেশের ঐতিহ্যবাহী এই রাজনৈতিক সংগঠনকে কম ক্ষতিগ্রস্ত করেনি। কিন্তু সদ্য অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ আদৌ জিততে পারত বলে এখানকার বেশির ভাগ মানুষও মনে করেন না। কারণ তাদের যুক্তি, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বাতাবরণে এই দলটির এবারের পরাজয় ছিলো পূর্ব নির্ধারিত। যারা সাম্প্রদায়িকতাকে পুঁজি করে রাজনীতির ফায়দা লুটতে চায়, যারা ধর্মীয় মৌলবাদকে উস্কে দিয়ে, সর্বাত্মক সমর্থন দিয়ে আবার তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার প্রয়োজন বোধ করে, তারা তো তাদের নিজ স্বার্থের নিরিখেই নীতিনির্ধারণ করবে। কিন্তু এটিও তাদের বিশ্বাস, এই নীতির পরিবর্তন সময়ের দাবিতেই ত্বরান্বিত হবে। আর যদি তা না হয় তাহলে সাম্প্রদায়িকতা গোটা অঞ্চলকে গ্রাস করবে।

কুষ্টিয়া থেকে ঢাকায় ফিরতে গিয়ে ২৩ অক্টোবরের একটি পুরনো দৈনিক পেলাম আগের

কোনো এক বাসযাত্রীর আসনে। ভোলা ও পটুয়াখালী থেকে ফিরে ঐতিহ্যবাহী দৈনিক সংবাদের প্রতিবেদক নির্বাচন-উত্তর ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের আহাজারি লিপিবদ্ধ করেছেন প্রথম পৃষ্ঠার এক রিপোর্টে। প্রতিবেদনটি পড়তে গিয়ে আতঙ্কে আমি কেঁপে উঠেছি। জনৈক পরেশ চন্দ্র মিস্ত্রির স্ত্রী প্রভারাণী কাঁদতে কাঁদতে বলেছেন, ... পত্রিকায় কিছু লেখার দরকার নেই। কাউকে বলতে চাই না, আমাদের জীবনে কী ঘটে গেছে। কোনো বিচার চাই না, ক্ষতিপুরণ চাই না। কেউ তা দিতেও পারবে না। আপনারা শুধু প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে বলবেন, 'আমাদের কোনো উপায় নেই। আমরা এদেশে থাকতে চাই। শুধু তিনি যেন আমাদের বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করেন, আমরা একটু শান্তি চাই। তাকে বলবেন, মা-মেয়ে যেন নিরাপদে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি। আমাদের স্বামী, ছেলেমেয়েদের নিয়ে দু'বেলা খেয়েপরে বেঁচে থাকতে চাই। আমরা রাজনীতি করি না, ভোট দিতে যাইনি। ভবিষ্যতেও কোনোদিন ভোট দেবো না। আপনাদের মাধ্যমে তাকে কথা দিলাম। তিনি যেন আমাদের দিকে একটু করুণা করেন। আমরা এদেশেরই মানুষ। আর কতকাল নিজে দেশে পরবাসী হয়ে থাকবো? এত অত্যাচার, নির্যাতন আর সহ্য হয় না। এমন যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হয় না।'

আরও অনেক আহাজারি আছে প্রভারাণীর, যার বৃত্তান্ত উলে-খ করার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই প্রতিটি কাগজের প্রতিটি দুঃসংবাদ তুলে ধরার। আমার মনে কেবলই প্রশ্ন জেগেছে, ১ অক্টোবরের নির্বাচনের মাঝ দিয়ে এমনকি কিছু ঘটেছে এই বাংলাদেশে, যে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আর ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের এভাবে পরাস্ত করতে সন্ত্রাসী শক্তি প্রয়োগ করতে হবে? আর যাই হোক, বাংলাদেশ তো এদেশের মানুষের এমন কোনো শত্রু নয় যে, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সে ভূমি বিজয় করে শত্রুকে সমূলে উৎখাত করতে হবে? হায় বাংলাদেশ, কে জানত যে পাকিস্তানি বর্বরতাকে আমরা স্বদেশভূমি থেকে বিতাড়ন করলাম, তারই প্রেতাত্মা আজও ভর করে আছে সারা বাংলার লাখো শহীদের গোরস্থানে!

জানি না মানবতার বিরুদ্ধে এ অপরাধের কী প্রায়শ্চিত্ত?

যুগান্তর, ৮ নবেম্বর, ২০০১

বাংলাদেশ কি 'হিন্দুশূন্য' করা হবে?

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

কয়েক দিন যাবৎ দারুণ ফ্লুতে ভুগছি। ফ্লুর প্রকোপ যতটা, তার চাইতে বেশি শারীরিক দুর্বলতা। দু-তিনদিন আগে ঠিক করেছিলাম আজ আর লেখাজোখার কাজ করব না। সোফায় শুয়ে বই পড়ব আর ঘুমুব। আমার এক বন্ধু আমাকে একটি বই উপহার দিয়েছেন। স্যামুয়েল পি হান্টিংটনের লেখা The clash of civilizations and the remaking of world order। বাংলায় যার অর্থ 'বিভিন্ন সভ্যতার দ্বন্দ্ব এবং বিশ্ববিধান পুনর্নির্মাণ।' উপন্যাসের চাইতেও আগ্রহোদ্দীপক বইটি পড়তে পড়তে শীতের অপরাহ্নেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল স্ত্রীর ডাকাডাকিতে, 'তোমার টেলিফোন। কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকা থেকে।'

রিসিভার তুললাম। আমার অনেক দিনের পরিচিত বন্ধুর কণ্ঠস্বর। 'স্টেটসম্যানে'র প্রবীণ সাংবাদিক। বললাম, হ্যালো কি খবর? বন্ধু বললেন, বাংলাদেশের খবর কিছু রাখেন? বললাম, রাখতেই হয়। নইলে কলম চালাব, পেট বাঁচাব কি করে? বন্ধু বললেন, বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু-বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর যে অত্যাচার চলছে তাতে আমরা খুব বিচলিত। ভয় হয়, এসব খবরের প্রতিক্রিয়া ভারতে-বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে আবার দেখা না দেয়।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কি মনে হয় প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে? বন্ধু বললেন, বলা মুশকিল। তবে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় এখন অনেক বেশি সচেতন। তারা সহজে সাম্প্রদায়িক উসকানির ফাঁদে পা দেবে না। এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার অত্যন্ত সতর্ক। অধিকাংশ সংবাদপত্রও তাই। তারা বাংলাদেশের খবরগুলো এখনও অনেক রেখেঢেকে ছাপছেন। একটা উদাহরণ দি, বাংলাদেশ থেকে এ পর্যন্ত যেসব হিন্দু উদ্বাস্তু পরিবার পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় ঢুকেছে তাদের সংখ্যা ১৫ হাজারের বেশি হবে। কিন্তু এই সংখ্যাটিকেও ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়েছে।

বললাম, খুবই দুঃখজনক এবং শংকাজনক খবর। কিন্তু এত দূরে বসে সামান্য লেখালেখি ছাড়া আমি আর কি করতে পারি?

'স্টেটসম্যানে'র প্রবীণ সাংবাদিক বললেন, আমি আপনাকে এই ব্যাপারে লেখালেখির অনুরোধ জানাতে টেলিফোন করিনি। করেছি একটা ব্যাপারে আপনার কাছে আমার একটা বিস্ময় প্রকাশের জন্য। বাংলাদেশ তো সেই ১৯৫০ সাল থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে পশ্চিমবঙ্গকে পথ দেখাচ্ছে। আপনাদের হাসান হাফিজুর রহমানের দ্বারা সম্পাদিত এবং ১৯৫০ সালেই প্রকাশিত 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিরোধী পাঁচটি গল্প' নামক বইটি এখনও কলকাতায় অনেক পুরনো গ্রন্থাগারে সযত্নে রক্ষিত।

বললাম, এই বইয়ে হাসান হাফিজুর রহমানের লেখা 'আরও দু'টি মৃত্যু' গল্পটি আপনি পড়েছেন?

কলকাতার বন্ধু বললেন, না পড়িনি। তবে অনেক বন্ধুর মুখে এই অমর গল্পটির কথা শুনেছি। কেবল তো হাসান একা নন। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা, সচেতন ছাত্র ও যুবসমাজ সেই ১৯৬৪ সালেও আইয়ুব-মোনেম সরকারের চক্রান্তে আয়োজিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। আপনাদের সেই আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রচারপত্রটির শিরোনাম এখনও আমার মনে আছে। 'পূর্ববঙ্গ রুখিয়া দাঁড়াও।' বাংলার হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টানের মিলিত সংগ্রামেরই ফল তো ১৯৭১। বাংলার স্বাধীনতা। তারপর এই ২০০১ সালে এমন কি হল, স্বাধীন বাংলাদেশে ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতার আবার অভ্যুত্থান ঘটল? কিন্তু কই সেই সচেতন

বুদ্ধিজীবী, সংগ্রামী ছাত্র ও যুবসমাজ? কেবল বিবৃতি দেখছি কাগজে। কোন আন্দোলন তো দেখছি না?

আওয়ামী লীগের একটি নির্বাচনী পরাজয়ের মধ্য দিয়েই কি বাংলার বিবেক স্তব্ধ হয়ে গেল? তাদের সব সংগ্রামী চেতনা কি নিঃশেষ হয়ে গেছে? আমার মনের এই প্রশ্ন এবং বিস্ময়টি জানানোর জন্যই আজ এত দূর থেকে আপনাকে টেলিফোন করলাম।

আমি স্টেটসম্যানের বন্ধুকে টেলিফোনে তার প্রশ্নের জবাব দেইনি। বলেছি, আমি একটু ভাবি। শিগগিরই আপনার সঙ্গে আবার আলাপ করব।

টেলিফোনের রিসিভার রেখে টেবিল থেকে ঢাকার 'ডেইলি স্টারের' একটা ম্যাগাজিন হাতে তুলে নিলাম। ম্যাগাজিনের এই সংখ্যাটিতে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু-নিধনের ভয়াবহ সচিত্র প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। 'স্টারের' সম্পাদক মাহফুজ আনামের সঙ্গে আমার রাজনৈতিক মতামতের দূরত্ব ইদানীং সুমেরু-কুমেরু হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দেশের এই দারুণ দুর্দিনে তার সচেতন সাংবাদিকতার প্রশংসা না করে পারলাম না। অন্তত এই সচিত্র প্রতিবেদনটি দ্বারা পত্রিকাটি আমাদের লুপ্তপ্রায় বিবেকে একটি কষাঘাতের কাজ করেছে। প্রতিবেদনটি একবার পড়েছি; আরেকবার পড়তে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সেই বহু পঠিত, বহু-উদ্ধৃত কবিতার ক'টি লাইন মনে পড়ল;

'আমি যে দেখেছি তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরিছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে
কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশি সঙ্গীত হারা
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে

মনে হল আমি তো হাসান হাফিজুর রহমানের পঞ্চাশের দাঙ্গার ওপর লেখা 'আরও দু'টি মৃত্যু'র মতো গল্প লিখতে পারব না। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও দেশে থেকে যাওয়া হতভাগা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, পাহাড়িয়া সম্প্রদায়গুলো যে বৈষম্য ও নির্যাতনের 'অমাবস্যার কারা'র মধ্যে বাস করছে, তার অসংখ্য ঘটনা তো আমি জানি। অনায়াসে তা নিয়ে একটি বড়সড় উপন্যাস লেখা যায় এবং তার নাম দেয়া যায় 'অমাবস্যার কারা।'

সেদিন আর বিশ্রাম নেয়া হয়নি। হান্টিংটনের বইটাও পড়া হয়নি। ঢাকা থেকে আসা কাগজগুলোর পাতায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছিলাম সংখ্যালঘু নির্যাতন ও নিধনের কাহিনী। আবার চোখ পড়ল 'ডেইলি স্টারে'র পাতায়। 'ওপিনিয়ন' বিভাগে একটি লেখা, নাম 'কম্যুনালিজম রিভিজিটেড।' লিখেছেন নিউইয়র্ক থেকে মাহফুজুর রহমান নামে বাংলাদেশের এক অর্থনীতিবিদ। তার লেখার প্রথম প্যারাতেই বলা হয়েছে, 'আমি ঢাকার এক হিন্দু বাঙালি পরিবারকে চিনি। নির্বাচনের দিন ভোট শেষ হলে গৃহকর্ত্রী তার বাসার মুসলমান কাজের মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন, সে কাদের ভোট দিয়েছে? মেয়েটি বলল, আমি বিএনপিকে ভোট দিয়েছি। গৃহকর্ত্রীর কৌতূহল হল। জিজ্ঞেস করলেন, কেন বিএনপিকে সে ভোট দিয়েছে? কাজের মেয়েটি বলল, আওয়ামী লীগ তো 'হিন্দু পার্টি।' (ইংরেজি থেকে অনূদিত)।

আমি মাহফুজুর রহমান সাহেবের এই বিবরণকে একটুও অত্যুক্তি মনে করি না। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আরও মারাত্মক। ঢাকা থেকে লন্ডনের এক ইউনিভার্সিটিতে ডক্টরেট করতে এসেছে আমার এক বন্ধুপুত্র। শিক্ষিত, সজ্জন এবং মন-মানসিকতায় অত্যন্ত আধুনিক। ক'দিন আগে সে আমার কাছে এসেছিল দেশে ফেরার আগে বিদায় চাইতে। চা খেতে বসে সে খুব আনন্দ প্রকাশ করল। বলল, 'আঙ্কল, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।' বললাম, কেন, ডক্টরেট করা শেষ করে দেশে ফিরছো বলে? সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'না, সেটা বড় কারণ নয়, আনন্দ

হচ্ছে স্বাধীন দেশে ফিরছি বলে!' আমি কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেছি, কেন, দেশ কি এতদিন স্বাধীন ছিল না? সে কোনরকম দ্বিধাপ্রকাশ না করে বলল, 'না, দেশটাকে তো আওয়ামী লীগ ভারতের তাঁবেদার করে রেখেছিল। এবারের ইলেকশনে দেশ আবার স্বাধীন হল।' আমি স্তম্ভিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। তার পরপরই ডেইলি স্টারে মাহফুজুর রহমানের লেখাটা পড়ার সময় ভেবেছি ঢাকার ওই কাজের মেয়ে নিশ্চয়ই অশিক্ষিত অথবা অর্ধশিক্ষিত। কিন্তু আমার এই বন্ধুর ছেলে আধুনিক শিক্ষায় সর্বোচ্চ শিক্ষিত। ডক্টরেটধারী। কিন্তু ঢাকার এক অশিক্ষিত কাজের মেয়ের সঙ্গে বিলেতে উচ্চশিক্ষা লাভের অধিকারী এক তরুণের মন-মানসিকতার কি আশ্চর্য মিল! তাহলে বাংলাদেশ কি আমার অজ্ঞাতসারে সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে? তাহলে আমি কি সেই রিপ ভ্যান উইস্কল, যে কুড়ি বছর ঘুমিয়ে জেগে উঠে দেখেছে তার স্বদেশ সম্পূর্ণ বদলে গেছে? সে তার স্বদেশকে চিনছে না এবং তার স্বদেশের মানুষও চিনছে না তাকে।

বাংলাদেশের হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুর জন্য গত ৩০ বছরের মধ্যে গত ২৬ বছরের ইতিহাসই যেন এক নববিষাদসিন্ধু। কেবল সেই বিষাদসিন্ধু লেখার জন্য আরেকজন মীর মশাররফ হোসেন জন্ম নেননি আমাদের দেশে। আমার নিজের জেলার পাতারহাট থেকে প্রাইমারি স্কুল জীবনের এক হিন্দু সহপাঠী আমাকে চিঠি লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, 'তুমি একবার দেশে আসো। দুই দিন গ্রামে থাকিয়া যাও। নইলে আমাদের দুঃখের কথা বুঝিতে পারিবে না।... গ্রামের দুর্গাপূজার মণ্ডপটি নির্বাচনের দিনের আগেই ভাঙিয়া ফেলা হইয়াছিল। প্রতিমাটি ভাঙা হইয়াছে নির্বাচনের পরে। আমরা ভয়ে ভোট দিতে যাই নাই। ... বাবুর চৌদ্দ বছরের মেয়েটিকে বাড়ি হইতে তুলিয়া নেওয়া হইয়াছিল। সাত দিন পর যখন ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তখন তাহাকে মরা লাশের সঙ্গে তুলনা করা চলে। নির্বাচনের পর নতুন ধমক আসিল, আমাদিগকে পূজা করিতে হইবে। শুধু পূজা করিলেই চলিবে না, ঢোল বাজাইয়া, আনন্দ-স্ফূর্তি করিয়া পূজা সারিতে হইবে। এই জন্য পাঁচশ' টাকার মতো দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে হাসিব না কাঁদিব? আমার দুই মেয়েই সোমত্ত। তাহাদের এক মুসলমান বন্ধুর বাড়িতে রাখিয়াছি। তোমাকে যখন চিঠি লিখিতেছি, তখনও ছাত্রদল ও জামাতের যুবকরা বোমা ফুটাইতে ফুটাইতে আসিয়া বলিয়া গেল, আমরা যদি আনন্দ-স্ফূর্তি করিয়া পূজা না করি, তাহা হইলে এই বোমা আমাদের মাথায় ফাটাইবে। আরও বলিয়া গেল, শহর হইতে ক্যামরাম্যান আসিবে পূজার ছবি তুলিতে। আমরা যেন তাহাদের সামনে হাসিখুশি মুখে ঢোল বাজাইয়া গান করি এবং পূজা সারি।'

আমি এই চিঠিটা অন্য আরও কয়েকটি চিঠিসহ ইংরেজিতে অনুবাদ করে ব্রিটিশ এমপি, ইউরো এমপি এবং হিউম্যান রাইটস কমিশনের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছি। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের অবস্থা সম্পর্কে লন্ডনের বাঙালি-অধ্যুষিত ইস্টএন্ডে একটি সভা ডাকার চেষ্টা করেছিলাম। খবরটা শুনেই কয়েকজন বাঙালি বন্ধু (তাদের মধ্যে দু'জন আবার ভূতপূর্ব বাম) আমাকে টেলিফোনে জিজ্ঞেস করলেন, 'আফগানিস্তানে যখন হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হচ্ছে, তখন বাংলাদেশের হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানদের জন্য আমার এত দরদ কেন?' আমি তাদের প্রশ্ন করেছি, গত মাসে আফগানিস্তানে বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে লন্ডনে যে বিরাট বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে, তাতে কি আপনারা ছিলেন?

দুই বন্ধুই আমতা আমতা করে বলেছেন, তারা বিশেষ কাজে আটকে যাওয়ায় যেতে পারেননি। তাদের বলেছি, আমি আমার আর্থারাইটিস-আ▯ান্ত পা নিয়ে মিছিলে গেছি এবং দু'মাইল হেঁটেছি। আমার ইংরেজি এবং বাংলা দু'ভাষার লেখাতেই এই বোমা-বর্বরতা এবং সন্ত্রাস দমনের অজুহাতে একটা দেশ ও জাতিকে ধ্বংস করার এই সভ্যতাবিরোধী, মানতাবিরোধী তাণ্ডবের নিন্দা করেছি। ব্রিটেনে বাস করেও বে-য়ার ও বুশকে একুশ শতকের

যুদ্ধাপরাধী বলে নিজের লেখায় উলে-খ করেছি। বন্ধুদের কাছে প্রশ্ন রেখেছি, আফগানিস্তানে মুসলমান নিধনে সাহায্য জোগাচ্ছে মুসলিম দেশগুলোই। তারপরও আমার নিজের দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপরে যে নির্মম নির্যাতন চলছে, সেদিকে চোখ ঘুরিয়ে বসে থাকতে হবে?

এক বন্ধু বলেই বসলেন, ওরা দল বেঁধে আওয়ামী লীগকে ভোট দিতে গিয়েছিল কেন?

এই একুশ শতকে একজন বিলেতবাসী, উচ্চশিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের মুখে এরকম প্রশ্ন শুনব তা আশা করিনি। বিস্ময়ে কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেছি, আপনাকে কে বলল, বাংলাদেশের সব ধর্মীয় সংখ্যালঘু আওয়ামী লীগকে ভোট দিতে চেয়েছিল? আর যদি চেয়েও থাকে সেটা কি তাদের অপরাধ? ভোট দেয়া তাদের নাগরিক অধিকার। সেই অধিকার তারা তাদের ইচ্ছামতো যে কোন দলকে ভোট দিয়ে প্রয়োগ করতে পারে। সেজন্য কি তাদের ওপর পাইকারি হারে নির্যাতন চালানো চলে?

সেদিন মনের ক্ষোভ মেটানোর জন্য বন্ধুদের অনেক কথাই বলেছিলাম। বলেছি, বিলেতে আজ ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে এশিয়ানদের বলা হয় লেবার পার্টির ভোট ব্যাংক। বস্তুত এশিয়ান- বিশেষ করে বাঙালিরা বছরের পর বছর কাউন্সিল নির্বাচন থেকে শুরু করে সাধারণ নির্বাচনে লেখার পার্টিকেই ভোট দিয়েছে। (ইদানিং অবস্থা একটু পাল্টেছে)। সেজন্য টোরি পার্টি ক্ষমতায় এসে তো এশিয়ানদের ওপর কোন নির্যাতন চালায়নি, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেনি।

প্রতিবেশী ভারতের দৃষ্টান্তও তুলে ধরেছি। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই ভারতীয় মুসলমানদের কংগ্রেসের ভোটব্যাংক হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। কংগ্রেস যেহেতু সেক্যুলার রাজনীতির প্রবক্তা সেহেতু ভারতের মুসলমানরা ভেবেছে কংগ্রেস শাসনেই তারা তাদের নাগরিক অধিকার ও ধর্মীয় অধিকার নিয়ে ভারতে নিরাপদে বাস করতে পারবে। ভারতে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হলেই দিলি-র জামে মসজিদের পেশ ইমাম খুতবা প্রচার করে মুসলমানদের কংগ্রেসকে ভোট দিতে আহ্বান জানাতেন। সেজন্য হিন্দু মহাসভা শিবসেনা, রাষ্ট্রীয় সেবকসংঘ বা বিজেপির মতো সাম্প্রদায়িক দলগুলোর হাতে নিগৃহীত হতে হয়নি তাকে। আবার সত্তরের দশকের এক নির্বাচনে (যে দল মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বে দিলি-তে সরকার গঠন করেছিল) দিলি-র জামে মসজিদের পেশ ইমামই ভারতের মুসলমানদের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। যে কারণেই হোক কংগ্রেস সেই নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিল। এই পরাজয়ের জন্য ভারতের কোন রাজ্যেই কংগ্রেস দল মুসলমানদের ওপর হামলা চালায়নি। ভারতের কোন কোন রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়নি তা নয়। তার কারণ অন্য। নিজেদের পছন্দমতো নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে ভারতের মুসলমানদের কোথাও নির্যাতিত হতে হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে তো বামফ্রন্টের একটা শক্তিশালী ভোটব্যাংক মুসলিম ভোট। তাই বলে গত নির্বাচনের আগে কিংবা পরে কি মমতা ব্যানার্জীর দল বা বিজেপি ও শিবসেনা মুসলমানদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছে? মুসলমান পরিবারের মেয়েদের গণধর্ষণের শিকার করেছে? তাদের ঈদগাঁ' কিংবা মসজিদ ধ্বংস করেছে?

দীর্ঘক্ষণ বক্তৃতা দিয়েও আমি বিলেতপ্রবাসী ওই কয়েকজন বাঙালি বন্ধুর মত পরিবর্তন করতে পারিনি। গত ৩ নবেম্বর পূর্ব লন্ডনে যুক্তরাজ্য শাখা একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির উদ্যোগে বাংলাদেশের চার জাতীয় নেতার মৃত্যু দিবসের (জেলের অভ্যন্তরে হত্যাকাণ্ড) আলোচনা সভায় যোগ দিতে গিয়েছিলাম। সভায় জাতীয় নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে দেশের নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের কথা উঠেছিল। আমার বক্তৃতায় বলেছিলাম, ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়, কিন্তু বাংলাদেশে যা হচ্ছে তাকে দাঙ্গা বলা চলে না। বলা চলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর একতরফা নির্যাতন।

ভারতে মুসলমানরা এখনও নেতৃত্বহীন হয়নি এবং তাদের মধ্যে কমবেশি হোক প্রতিরোধ শক্তি এখনও অটুট আছে। গুজরাটের দাঙ্গাতেও দেখা গেছে তাদের ওপর হামলা হওয়ার পর তারা তা প্রতিরোধের চেষ্টা করেছে। কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দু-বৌদ্ধ খ্রিস্টান এবং উপজাতীয় সংখ্যালঘুরা সম্পূর্ণ নিঃসহায়। একমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া আর কোথাও তাদের নেতৃত্ব ও সংগঠন নেই এবং কোথাও তারা হামলা হলে তা প্রতিরোধের ক্ষমতা রাখে না। এ বছর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় থেকে বর্তমান জায়াত-বিএনপি সরকারের আমলেও যে সংখ্যালঘু নির্যাতন চলছে তাতে দেখা যাচ্ছে এই নির্যাতন থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য সরকার ইচ্ছুক অথবা সক্ষম নয়। এই হামলা চালাচ্ছে সরকারের সমর্থক সশস্ত্র মাস্তান ও দুর্বৃত্তরা। পুলিশ নিষ্ক্রিয় দর্শক এবং স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই নির্যাতনের ভয়াবহতা চাপা দেয়ার কাজে ব্যস্ত। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর এই অসহনীয় অত্যাচার বন্ধ করার জন্য একমাত্র কাগুজে বিবৃতি দেয়া ছাড়া কোন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংগঠন শক্তভাবে এগিয়ে আসেনি। যেসব সাংস্কৃতিক দল ও নারী সমিতি সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এগিয়ে গেছে, তারাও সরকারি মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীর হুমকির মুখে তিষ্ঠাতে পারছে না। উদীচীর একটি দল একটি এলাকায় গিয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে বলে কাগজেই পড়েছি। আমাকে ঢাকা থেকে পরিচিত এক কলেজছাত্রী চিঠিতে জানিয়েছেন, তারা মহিলা সমিতির উদ্যোগে ঢাকায় সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে একটা মিছিল বের করেছিলেন। একটি যাত্রীবাহী বাসের পাশ দিয়ে মিছিলটি যাওয়ার সময় ওই বাসের যাত্রীরা মেয়েদের গায়ে থুথু ছিটিয়েছে এবং অকথ্য ভাষায় গালি দিয়েছে।

পূর্ব লন্ডনের যে সভায় আমি এই বক্তৃতাটি দিয়েছি, সে সভা শেষ হলে অনেকেই আমার কাছে জানতে চেয়েছেন, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ভোটদাতারা কি সত্যই এবার দল বেঁধে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে? আমি তাদের বলেছি, তারা আওয়ামী লীগকে ভোট দেবে কি, অধিকাংশ স্থানেই তো তাদের ভোট দিতে যেতে দেয়া হয়নি। কোথাও কোথাও মোতায়েন সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিতেই তাদের ওপর অত্যাচার হয়েছে। আর তারা এবার ভোট দিতে পারলেও অধিকাংশ ভোট আওয়ামী লীগের বাক্সে পড়ত তা নয়। আমি যতদূর জানি এবার সংখ্যালঘু ভোট দ্বিধাবিভক্ত ছিল। বহু জেলায় আওয়ামী লীগের কার্যকলাপে ত্যক্ত-বিরক্ত সংখ্যালঘুরা বিএনপি-প্রার্থীকেই ভোট দেবে ঠিক করেছিল।

কেউ কেউ জানতে চেয়েছেন, তাহলে সংখ্যালঘুদের ওপর বিএনপি জোটের এই মারমুখি হামলা চলছে কেন? তারা কি চায় বাংলাদেশ হিন্দুশূন্য হয়ে যাক?

নিজের ধারণার কথা প্রকাশ্যেই তাদের কাছে বলেছি। এই হিন্দু নির্যাতন অথবা সংখ্যালঘু নির্যাতনের পেছনে একটি নীলনকশা কাজ করছে। সেটি হচ্ছে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুমুক্ত করা। যে শতকরা ১৫ ভাগ ধর্মীয় সংখ্যালঘু এখনও এদেশে আছে, তাদের ভারতে ঠেলে দেয়া। সাতচলি-শের ভারত ভাগের পর থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানো হয়েছে তার পেছনে বড় কারণ ছিল অর্থনৈতিক। হিন্দুদের জায়গা জমি দখল করা, বিভিন্ন পেশা ও ব্যবসা বাণিজ্য থেকে তাদের শক্তিশালী অবস্থান হটিয়ে দিয়ে প্রতিযোগীবিহীনভাবে সেসব শূন্যস্থান দখল করা।

কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যত দাঙ্গা বাধানো হয়েছে তার পেছনের উদ্দেশ্য মূলত রাজনৈতিক। '৭১-এর পরাজিত সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী দলগুলো মনে করে, বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির একটা বড় শক্তি ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা। নির্বাচনের সময় এরা যে দলকেই ভোট দিক, মূলত এরা সেক্যুলার ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের পক্ষে। এদের বিতাড়ন করা না গেলে বাংলাদেশকে কখনোই একটি সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী রাষ্ট্রে পরিণত

করা যাবে না। এরা সবসময় নিজেদের স্বার্থেই অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক শক্তির পক্ষে থাকবে। ভারতের মুসলমানরা যেমন থাকে অসাম্প্রদায়িক দলগুলোর পক্ষে।

'৭৫-এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার উচ্ছেদ এবং রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ইসলামকে সংবিধানে যুক্ত করার পরই জিয়াউর রহমান থেকে এরশাদ পর্যন্ত সামরিক শাসকরা দেশের সিভিল এবং মিলিটারি প্রশাসনকে পুরোপুরি সাম্প্রদায়িকীকরণ শুরু করেন। সেক্যুলারিজমকে তারা দেশের এবং ইসলামের স্বার্থবিরোধী এজেন্ডা হিসাবে দাঁড় করান। সেক্যুলারিজম দুর্বল হলে স্বাভাবিকভাবেই গণতান্ত্রিক প্রি্রয়া শক্তিশালী হতে পারে না। জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পরও তাই বিএনপির একটি প্রধান কাজ ভারতবিদ্বেষ প্রচারের আড়ালে সাম্প্রদায়িকতা ও জিঙ্গোইজম প্রচার। জামায়াত ও অন্যান্য মৌলবাদী দলের সঙ্গে বিএনপির শক্ত আঁতাতের ফলে এই জিঙ্গোইজমের বিষবৃক্ষই এখন ফলেফুলে সুশোভিত হয়েছে। এই আঁতাতের নীলনকশার প্রথম পর্যায় সফল হয়েছে। একটি সাম্প্রদায়িক এস্টাবলিসমেন্টের সহায়তায় আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে হটানো হয়েছে। এখন নীলনকশার দ্বিতীয় পর্যায়ের লক্ষ্য বাংলাদেশকে হিন্দুবিহীন করা। বর্তমান ক্ষমতাসীন অক্ষশক্তির ধারণা, তাহলে বাংলাদেশে অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির সহায়ক শক্তিটি ধ্বংস হবে। আওয়ামী লীগ কেন আর কোন অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক শক্তি তাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে পারবে না।

লন্ডন ॥ ১০ নবেম্বর ২০০১

সন্ত্রাসী তৎপরতা ও সংখ্যালঘু নির্যাতন রোধে নৈতিক পুনরুত্থান প্রয়োজন

মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম

আমরা এমন এক দুঃসহ পর্যায়ে উপনীত হয়েছি যে, কেউ নৈর্ব্যক্তিকভাবে কোন বিষয়ে কিছু বলতে ও লিখতে সাহস করেন তা কর্তাব্যক্তি ও তাদের আশ্রিত বুদ্ধিজীবী বিশ্বাসই করতে চান না। যেকোন বক্তব্যে ও লিখনে তারা এ ঘরানার বা ওই ঘরানার গন্ধ পান। হয় আওয়ামী লীগপন্থী নয় বিএনপিপন্থী। এভাবে যারা দলাদলি করে কর্তা বা ভোটারের কৃপা পেতে সচেষ্ট থাকেন তারা আসলে কোন আদর্শে উদ্বুদ্ধ নন। দল তাদের কাছে স্বার্থ উদ্ধারের নিমিত্ত মাত্র। কর্তারা কথিত 'অনুগত'দের প্রশ্রয় দেন, ভাবেন এভাবেই দলকে বা সরকারকে শক্তিশালী করার মোক্ষম উপায়। 'অমুক' আমাদের লোক, তাকে ওই আসনে (পদে) বসান এবং 'সে' তাদের লোক, তাকে সরান। গত এক দশক ধরে এই প্রবণতাই আমরা দেখে আসছি, যা দেশের ও জনগণের কোন হীতসাধন করেনি।

ক'দিন আগে সুশীল সমাজের এক বৈঠকে কথা হচ্ছিল যে পেশাজীবী, শিক্ষাঙ্গন ও প্রশাসন সকল ক্ষেত্রেই এই বিভাজন মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। এ পক্ষ বলেন অপর দল ক্ষমতায় থাকাকালে তাদেরকে বঞ্চিত ও নির্যাতন করেছে। এখন সবকিছু ফেরত পাওয়ার পালা ও 'প্রতিশোধ' নেয়ার সময়। শীর্ষস্থানীয় এক আইনজীবী বলেছিলেন, আইনের শাসন সকল পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে দলীয়করণ পরিহার করে যিনি যে কাজের যোগ্য তাকে ওই পদে বসাতে হবে। যদিও 'প্রতিশোধ স্পৃহা' মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা, তবুও কষ্ট করে ওই শুভ কাজটি তো শুরু করতে হবে। তার কথা সংশি-ষ্ট আইনজীবীরা যে সাদরে গ্রহণ করেন তা নয়;

অনেকে সামনাসামনি বিরক্তি প্রকাশ করেন। কেউ কেউ পেছনে বলেই ফেলেন 'উনি তো সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী হয়েছেন এবং খ্যাতিও পেয়েছেন, এখন আদর্শের বুলি ছাড়েন সহজে।' আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমেদ বলেছেন, সরকার যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে বিভিন্ন পর্যায়ে আইন অফিসার নিয়োগ দেবেন। যদি ধরেও নেয়া যায় তিনি নিষ্ঠার সাথে নিয়োগ দেবেন; যদি ধরেও নেয়া যায় তিনি নিষ্ঠার সাথে তার কথা কার্যে পরিণত করবেন, তবুও প্রশ্ন থেকে যায় বিভিন্ন প্রকার দলীয় চাপের মুখে তিনি কতটুকু সফল হবেন। সময়ই তা বলবে। সামনে মামলার গতি দ্রুততার সাথে নিষ্পন্ন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে আইনমন্ত্রী ও তার নিয়োজিত আইন কর্মকর্তাদের অবশ্যি সকল স্তরের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে ধন্যবাদ জানাবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধে ও নৈতিকতার ভিত পুনঃস্থাপনে বিভিন্ন সরকার ও শিক্ষক নেতৃবৃন্দের অনীহা ও কোন্দল সকল অভিভাবককে ও সাধারণ মানুষকে পীড়িত করেছে। বিশেষ করে সম্প্রতি সংখ্যালঘু নির্যাতনের যে খবর ও ছবি পত্র-পত্রিকায় এসেছে, এর প্রতি□িয়ায় শিক্ষক-ছাত্রসমাজ যারা জ্ঞানচর্চায় লিপ্ত তাদের এমন নির্লিপ্ততা কেউ আগে দেখেননি। মানুষ গড়ার কারিগর; শিক্ষক সম্প্রদায়ের প্রতি আবহমানকাল থেকে বাঙালি সমাজের শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। গত ষাট দশকের শেষ অবধি তাতে কোন চির ধরেনি। পরবর্তী তিন দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা স্বায়ত্তশাসনের নামে ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশবলে দলীয় রাজনীতি করতে গিয়ে পুরনো ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলায় শিক্ষাঙ্গনেও মূল্যবোধের অবক্ষয় শুরু হয়। নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য পদে পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে উচ্চাভিলাষী শিক্ষকরা বিভিন্ন চাপ প্রয়োগ করছেন। দলীয় ছাত্রদের অর্থাৎ ক্যাডারের মাধ্যমেও সরকারের ওপর চাপ দেয়া হচ্ছে। যেহেতু সরকার সরাসরি 'নির্বাচিত' উপাচার্যকে ওই আইনের আওতায় সরিয়ে দিতে পারে না, সেহেতু সংশি-ষ্ট শিক্ষকরা বিকল্প পন্থা অবলম্বন করেছেন, শোনা যায়। সেটি হলো এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে উপাচার্য পদত্যাগে বাধ্য হন। এমনটি চললে বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈতিক পরিবেশ থাকবে কেমন করে? মজার ব্যাপার হলো শিক্ষকদের কোন দলই ওই অধ্যাদেশটি বাতিলের কথা বলছেন না। যদিও আইনটির মুখ্য প্রণেতা উলি-খিত আইনজীবী স্বীকার করেছেন এটি বাতিল (repeal) করা প্রয়োজন। যা মনে করে আইনটি বাতিল করবে আশা করা কঠিন। কারণ বিভিন্ন দলের শিক্ষকরা তখন 'ঐকমত্য' করে সুবিধাদি রক্ষার্থে এক জোটে আন্দোলনে নেমে পড়তে পারেন।

আমাদের মতো ৬০+ বছর বয়স্ক একজন ব্যক্তিকে যখন ৩০ বছরের একজন যুবক প্রশ্ন করে, বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগের ২৪ বছর সাম্প্রদায়িক অবস্থা কেমন ছিল। তখন এর উত্তর দিতে সত্যি বিব্রতবোধ করি। কেন এই প্রশ্ন তাদের মনে উদিত হয়েছে? যে একাত্তরে বাঙালি চেতনায় পাকিস্তান ভেঙে একটি নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হলো সেখানে আজ সাম্প্রদায়িক ও দলীয় নিপীড়ন কেন? এর একটি কারণ উপরে উলে-খ করেছি। সাবেক পূর্ব পাকিস্তান আমলে যখনই কোন মহল সাম্প্রদায়িক উসকানি দিয়ে, প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের কোথাও কোন ঘটনাকে দেখিয়ে, হানাহানি ও স্বার্থান্বেষী তৎপরতা চালাতে যেত তখনই তাদেরকে প্রতিহত করা হতো। ছাত্র, শিক্ষক ও রাজনৈতিক দল সমস্বরে প্রতিবাদ জানাতো। পরক্ষণেই উপদ্রুত স্থানে মিছিল করে গুণ্ডা প্রকৃতি লোকদের তাড়িয়ে দিতো। ইতোমধ্যে যারা নির্যাতিত হয়েছেন তাদের সেবায় সকলেই নিয়োজিত থাকতো। পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে এনে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য স্থাপনে কেউ পিছপা হতেন না। ইতিহাস এর সাক্ষ্য দেয়, যার ফলশ্রুতি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ।

১৯৬৪-র অভিজ্ঞতায় ফিরে যাচ্ছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে ১৯৬১ সালে বেরিয়ে সরকারি দপ্তরে অর্থনীতিবিদ হিসেবে কাজ শুরু করেছি। সতীর্থ বন্ধুরা সন্ধ্যায় পল্টন

ময়দানে আড্ডা দিতাম। দাঙ্গার খবর পেয়ে যে যার মতো প্রতিরোধে এগিয়ে গেলেন। আমার বড় বোনের বাসায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের আবাসিক ছাত্র অমূল্য চন্দ্র বিশ্বাস তার দু' একজন বন্ধু নিয়ে দাঙ্গার সময় ছিলেন। তিনি আমার ভাগ্নেদের পরম যত্নে পড়াতেন। আমি তখন বড় বোনের বাসায় থাকি বলে তার সাথে ঘনিষ্ঠতা ছিল। শিক্ষাজীবন শেষে তিনি নটরডেম কলেজে ভূগোল বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। সেই দাঙ্গার সময় তিনি আমাকে তার হলে ও অন্যান্য জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তখনকার জনপ্রিয় গণসঙ্গীতশিল্পী সুখেন্দু চ□বর্তীর (খোকা দা) সাথে 'বাফা'সহ বিভিন্ন স্থানে গিয়েছি। প্রতিটি স্থানে দেখেছি অপূর্ব মনোবল ও সকলেই দাঙ্গা প্রতিরোধ করার জন্য একপা এগিয়ে। ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) নেতৃবৃন্দ সন্ত্রাসীদের রুখতে ও দুর্গতদের সহায়তাদানে লেগে গেছেন। সে কথা সংবাদ সাময়িকীতে প্রকাশিত অগ্রজ সনজীদা খাতুনের লেখায়ও উলে-খ আছে (সংবাদ ১ নবেম্বর ২০০১)। তখন বিপদে মানুষ ছাত্রদেরকে ডাকতো, তাদেরকে পাশে পেতো। আর এখন? বলা নিষ্প্রয়োজন। সেই সময়ের ছাত্র ইউনিয়নের কয়েকজন বর্তমানে বিভিন্ন দলে, যেমন সিপিবি বা আওয়ামী লীগ, বিএনপি, গণফোরামের নেতা। মাঠপর্যায়ে তাদের ভূমিকা কই? অপরকে দোষ দিয়ে কি লাভ। নিজেই-বা কী করেছি। প্রতিবাদে 'নাগরিক সমাজ'-এর বিবৃতিদান ও অনশনকারীদের দেখতে গিয়ে কিছু শিখে আসা। সত্যি কথা বলতে কি এর বেশি কিছু করা আমাদের সামর্থ্যে ও সাহসে কুলায়নি। আমরা নিজেরাই সন্ত্রাসীদের ভয়ে কাতর ও জবর দখলে সন্ত্রস্ত। কে কাকে সাহয্য করবে! একাত্তরের পর আমরা এতই অসহায়!

পত্রিকায় সম্প্রতি সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। একজন লেখক ১১ দলকে ব্যঙ্গ করে লিখেছেন, তাদের অবস্থা সংখ্যালঘুদের মতো অসহায়, তাদেরকে বলে কিছু লাভ নেই। অন্যজন আরো এক ধাপ এগিয়ে লিখেছেন ওরা গণবিচ্ছিন্ন, একটি আসনও গত নির্বাচনে পাননি। এসব সত্য জেনেও বলতে হয় প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক শক্তিকে এভাবে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে তারা কি সমাধান পেতে চান তা বোধগম্য নয়। বড় কোন দলের দুয়ারে কিছু চাওয়া যদি তাদের একমাত্র কাম্য হয়, তবে আমাদের বলার কিছু নেই। তারা নিশ্চয়ই জানেন গত অষ্টম সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে প্রধান দুটি দল কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছে। কেউ কেউ হিসাব কষে পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন যে, দেশে মোট নির্বাচনী ব্যয় দু' হাজার কোটি টাকার মতো হয়েছে। কেন প্রার্থীরা এতো টাকা ঢেলেছেন তা সকলেরই জানা, বিশেষত অধ্যাপক ও কলামিস্টদের তো বটেই। তাদের অনুনয়-বিনয়ে প্রধান দুটি দল কতটুকু টলেছেন তারাই র্নিধারণ করুক। এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে ১১ দলের পক্ষে সাফাই দেয়া। নিশ্চয়ই অভ্যন্তরীণ কোন দুর্বলতা আছে; যে কারণে দলগুলো বিকশিত না হয়ে লীন হচ্ছে! এ বিষয়টি সকলেরই খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। ১১ দলে রয়েছে গণফোরাম, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল, গণতন্ত্রী পার্টি, গণআজাদী লীগ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল, বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল, গণতান্ত্রিক মজদুর পার্টি ও কমিউনিস্ট কেন্দ্র।

অপরজনের লেখা ও বক্তব্য হৃদয়স্পর্শী। তিনি ছাত্র ইউনিয়ন করতেন এবং স্বাধীনতা-উত্তর ১৯৭৩-এর নির্বাচনে এক ন্যাপ প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট ছিলেন। তার পছন্দের বড় দলটি ছোট হতে হতে এখন আর মাঠে নেই বললেই চলে। পঞ্চাশ ও ষাট দশকে যে বলিষ্ঠ ধারায় এ দলটি বহমান ছিল তা যদি পরবর্তী দশকগুলোতে অব্যাহত থাকতো তা হলে রাজনৈতিক মূল্যবোধ মুখথুবড়ে পড়তো না। তিনি ইচ্ছে করলে দেশ ছেড়ে যেতে পারেন; কিন্তু কেন যাবেন! তার এই দৃঢ় প্রত্যয়ের জন্য অভিনন্দন জানাই। সাম্প্রদায়িক বিভাজনে তিনি ও উপরে উলি-খিত দু'জন লেখক হিন্দু। আমার এক বন্ধু বললেন তাদের এই সাম্প্রদায়িক পরিচয় লিখে

দিতে। কারণ তিনিই নিজের দলটির নাম অর্থাৎ ন্যাপ উলে-খ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। ইদানীং অপরাজনীতিকরা এমন একটি ধারণা দিতে চান যে, হিন্দুমাত্রই আওয়ামী লীগের সমর্থক ও ভোটার। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মনের গহিনে 'পাকিস্তান বিদ্বেষের ফলে' আওয়ামীপন্থী। কিন্তু নির্বাচনী তথ্য তা বলে না। নিরীহ গরিব মুসলমান ভোটার ও নিরীহ গরিব হিন্দু ভোটারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তারা কোন মানসিক দীনতায় ভোগেন না; যা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ভেতর দেখা যায় অব. আমলা ও কোটিপতি বড় দলীয় মনোনীত প্রার্থীরা নিরীহ-নিরক্ষর ভোটারদের সাম্প্রদায়িকতায় চোখ ঝলসে দিয়েও ভোট পেতে চান। এটা অগণতান্ত্রিক ও অমানবিক। সংশি-ষ্টদের মতে নির্বাচনোত্তর সংখ্যালঘু নির্যাতন এ থেকেই শুরু হয়েছে। সন্ত্রাসীরা এই সুযোগে তাদের ওপর আঘাত হেনে অর্থ মানসম্ভ্রম, জমি ও বাড়িঘর লুট করেছে। কেবল সরকারের শীর্ষপর্যায়ের আদেশ বা বিবৃতি দুর্বৃত্তদের নিবৃত্ত করবে না। সংশি-ষ্ট জেলার ডিসি, এসপি ও থানার ওসি নির্দলীয় ও নির্ভীকভাবে প্রতিটি ঘটনার সাথে জড়িত সন্ত্রাসীদের পাকড়াও করে কঠোর ব্যবস্থা নিলে সংখ্যালঘুদের মনে নিরাপত্তা বোধ ফিরে আসতে পারে। নতুবা চলমান সন্ত্রাসের আরেক রূপ নির্বাচনোত্তর সংখ্যালঘু নির্যাতন আমাদেরকে তথা দুই বাংলার বাঙালিকে কোথায় নিক্ষেপ করে কে জানে!

১৯৪৭-এ দেশভাগের পর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে যেসব বিহারি (অবাঙালি) ও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি উদ্বাস্তু হিসেবে এসেছিলেন তাদের মনে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব থাকা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কিন্তু এ দেশের স্থানীয় বাসিন্দারা কখনও তাদের সায় দেয়নি। সনজীদা খাতুনের উলি-খিত লেখায় সে বর্ণনাও আছে। ১৯৭১-এ সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর বিহারি বা অবাঙালিরা আর এখানে রইল না। বরং আইন করে তাদেরই পরিত্যক্ত সম্পত্তি এ দেশের বাঙালিরাই ভোগদখল করছে। নির্বাচন ২০০১-এর পর দেশব্যাপী যে দলীয় সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িক নির্যাতন চলছে তা কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। গত এক দশক ধরেই দেখে আসছি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা রদবদলের পর ক্ষমতাসীন দলের সুবিধাভোগী নেতাকর্মীরা দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহায়তায়, জমি দখল, পদ দখল, হল দখল, বাস টার্মিনাল দখল, চাঁদাবাজি ইত্যকার সন্ত্রাস করে। এসবই পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদনে নিয়মিত এসেছে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ঐকমত্যের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ওই অপতৎপরতা হয়েছে। বর্তমানে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর সেই একই পন্থা অনুসরণ করা হচ্ছে। এর সাথে এবার বিশেষভাবে চলছে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন করে তাদের জায়গাজমি দখলে নিয়ে এদেশ ছাড়া করা। কেউ কেউ অসহ্য যন্ত্রণায় ওপারে চলে গেছেন। ফলে সঙ্গতভাবেই পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় বাসিন্দা ও বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। এ ব্যাপারে দূরদর্শন বাংলায় প্রচারিত 'খাস খবর' ও 'সংবাদ'-এ দেখেছি তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়কে প্রতি□য়া দিতে। বিরোধীদলগুলো রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রকে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কথা বলতে আহ্বান জানিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখছেন। দুঃখের সাথে স্বীকার করতেই হয় এ দেশের কতিপয়ের স্বার্থান্ধতায় পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট বিপাকে পড়েছে। তাই প্রশ্ন ওঠে আমরা বাঙালিরা কি মানুষ!

আগেই বলেছি, দলীয়ভাবে নির্মম দখলি মনোবৃত্তি সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে। বুদ্ধিজীবীরা কি বিবেকের দংশন অনুভব করছেন? কার কাছে যাবে অসহায় মানুষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ব্যস্ত 'উপাচার্য' পদ নিয়ে। ছাত্র ক্যাডাররা দলীয় হুকুমবরদার ব্যস্ত টেন্ডারবাজি চাঁদাবাজি আর দখলবাজিতে। সাংসদরা ব্যস্ত এমপি হোস্টেল দখলে। আমলারা অবসরপ্রাপ্তির পর পেনশন পেয়ে রাজনীতি করার রসদ যোগাতে তৎপর। সম্প্রতি প্রধান

বিচারপতি মাহমুদুল আমিন চৌধুরী বলেছেন, দুর্নীতি আজ আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। তা থেকে বিচারক ও আইনজীবীরাও বিচ্ছিন্ন নন, একমাত্র বিবেকের দ্বারা তাড়িত হয়েই বিচারক ও আইনজীবীরা বিশুদ্ধ থাকতে পারেন।

একইভাবে শিক্ষা, প্রশাসন, রাজনীতি, এনজিও তথা জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্বে অবস্থানকারী মহাজনরা নিজেদের বিবেককে প্রশ্ন করে পরিশুদ্ধিতে রপ্ত হলে সাধারণ মানুষ সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িক নির্যাতন থেকে মুক্তি পাবে।

সংবাদ, ১১ নবেম্বর ২০০১

এথনিক ক্লিন্‌জিং চলছে, চলবে

ওয়াহিদুল হক

ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম নায়কদের নাম শুনলে আজও ছাত্রছাত্রী শিউরে ওঠে। হালাকু, আত্তিলা, চেঙ্গিস, তৈমুর। তাদের সবাইকে নিরতিশয় লজ্জা দিয়েছে একা হিটলার ও তার নাৎসী। নাৎসী জার্মানি শুধু রাশিয়ায় হত্যা করেছে দুই কোটি, শুধু পোল্যান্ডে জীবন্ত পুড়িয়েছে ষাট লাখ ইহুদী বন্দীকে। মধ্যযুগীয় নিষ্ঠুর নায়কদের হত্যালীলার পিছনে কোনো রাজনৈতিক কিংবা জাতিবৈরঘটিত যথার্থ্য আবিস্কার প্রচেষ্টা কাজ করেনি। কিন্তু হিটলারি হনন□য়া কোটি কোটিতে বিস্তৃত হতে দু'টি মিথ্যা ও অপরাধমূলক তত্ত্বচেহারার মানসিক ব্যাধি কাজ করেছে। এক. জার্মানরা (অথবা আর্যরা, নিজেদের তারা আর্য মনে করতো) হচ্ছে মাস্টার রেস প্রভুত্ব করবার জন্য জন্ম তাদের। দুই. এই আর্য জাতির বিশুদ্ধতা নষ্ট করে তাদের হীনবীর্য ও হীনবল ও দরিদ্র করে ফেলছে ইহুদী নামের যে প্রাচ্যীয় সেমীয় গোষ্ঠীর মানুষেরা (আরবরাও তাই) তাদেরকে নিঃশেষে ধরাধাম থেকে বিদায় না করলে জার্মান জাতি জাগবে না। ফলে ইহুদীসহ কোটি কোটি মানুষ খুন করতে নাৎসী জার্মানদের বাধেনি, নারী-পুরুষ, শিশু, তরুণ-তরুণী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মার্চ করে গ্যাসচুলি-তে ঢোকাতে কারও চোখ চকচক করে ওঠেনি। আহা, নির-পরাধ মৃত্যুর পক্ষে সজ্ঞানে যাচ্ছে, স□টিসের মতো, ক্ষুদিরাম, প্রফুল- চাকী, উল-াস কর দত্তের তার মতো সৌন্দর্য, তার মতো পবিত্রতা কোথায়? ইতিহাসের সব মানুষ মাথা নত করো সেই শহীদদের কাছে। ঈশ্বরের কী ক্ষমতা আছে হিটলার এবং তাদের জল-াদদের জন্য উপযুক্ত জাহান্নাম বানাবেন? সেই একই হিটলারি খেলা খেলেছে মিলোশেভিচ ও কারাদজিচ বসনিয়ার, কসোভোর মানুষদের ওপর, তারা বিজাতীয় দুষ্টরক্ত মুসলমান বলে। বসনিয়ার মুসলমানের দিনে হাজার হাজার বলিদানে কাঁদেনি একটি মুসলিম রাষ্ট্রের রাজা-উজির, সেনা, সাধারণ মানুষ। কারণ সেই রাষ্ট্র সেই একই হিটলারি নীতিতে জাতিবৈরকে সম্বল করে জাতিগত শুদ্ধি অভিযান চালিয়েছে, নয় মাসে মেরেছে ন্যূনপক্ষে ত্রিশ লাখ, দিনে গড়ে দশ হাজার। হিটলার ইহুদী উৎসাদনের নামে মেরেছিলো, পাকিস্তান শাসক এবং সেনা মেরেছে বাঙালি নামের অস্পৃশ্যকে সে হিন্দু হোক কি মুসলমান। হিন্দুকে তারা বন্দী করেনি, গুলিও খরচ করেনি, চৌদ্দই ডিসেম্বরের বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মতো জীবন্ত কেটে মেরেছে। বাঙালি মুসলমানকে কোনোদিনই তারা মুসলমান মনে করেনি, তাদেরও মেরেছে হিন্দু বলেই। এই রকম অশিক্ষিত সেনাকে শিখিয়েছিলো উচ্চশিক্ষিত পাকিস্তানি সেনানী, পশ্চিম পাকিস্তানি সাংস্কৃতিক আবহাওয়া।

আজ হালাকু, চেঙ্গিস (যিনি একটা তক দিল-ীবাসীকে কেটে নরমুণ্ডের পাহাড় গড়েছিলেন

পরমোল-ানে) হিটলার, মিলোশেভিচের পাশে ভুবনমোহিনী হাসি হাসতে হাসতে নাম লেখালেন এক নারী। তাঁরও সেই হিটলারি তত্ত্বের হাতিয়ার। হিন্দুকে দেশছাড়া করো, নইলে এই মিশ্র জাতি বাঙালি অবিমিশ্র বাংলাদেশীতে পরিণত হয়ে চিরকাল একমাত্র তাঁর দলের শাসন মেনে চলবে না। হিন্দুকেও যারা এই দেশের অধিকারসম্পন্ন মানুষ মনে করে, অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির সেই মুসলিম নৌকা ভোটারও মরুক, শিক্ষা পাক। বুঝুক এ দেশ শুধু এক ধর্মের লোকের জন্য এবং শুধু জিয়াউর রহমানের দল এবং তার বরকন্দাজদের দ্বারা শাসিত হবার জন্যই এ দেশে তাদের জন্ম হয়েছে। (যদিও জঙ্গী জামায়াত অর্থাৎ আপাতত বিএনপির জুনিয়র পার্টনার মনে করে সৌদি আরব নিদেনপক্ষে পাকিস্তানের মতো একটা ইসলামী প্রজাতন্ত্রে বাস করাই এ দেশের মানুষের বিধিলিপি। ইসলামী হুকুমত উর্দুআইজ করাটাও বাঙালি ধর্মব্যবসায়ীর কাছে ইসলামাইজ করা। হিন্দুরা না মেনে চলতে পারলে তারা তাদের দেশেই হিজরত করুক মেনে চললে ইসলাম কবুল করলেই হয়।)

বর্তমান সরকারের সিনিয়র পার্টনারদের লোভ-লালসা-উচ্চাভিলাষের বিষয় অনেক বেশি সেকুলার। সেই সব চরিতার্থ করবার জন্য বিএনপি ইসলাম ও ভারতবিদ্বেষকে ব্যবহার করে। তাদের এই ব্যবহারবিধির একটি পুরনো নাম আছে হিটলারি নাৎসীদেরই দেয়া এথনিক ক্লিনজিং। জাতিসত্তাঘটিত বিশুদ্ধিকরণ। ম্লেচ্ছ হিন্দুরা মুসলিমদের আবাসভূমি এই সভ্যতর পাকিস্তানকে (আবুল মনসুর আহমদ-উক্ত এবং সাহাবুদ্দীন আচরিত) নানাভাবে অপবিত্র করেছে, ভোগাচ্ছে, টাকাপয়সা জমিজমা চাকরিবাকরি জুড়ে আছে— এদের হটানোর কার্যক্রমে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের ঐচ্ছিক লাভ তা নয়, আওয়ামীরাও চিরতরে কবরচাপা পড়ে তাতে। অবশ্য সেই জন্য নৌকা মার্কা-আলাদেরও শায়েস্তা করতে হবে। তাদের তো আর ভারত নেই যে যাবে, তাদেরকে মেরে ফেলা ছাড়া কোনো ভালো উপায় নেই।

কিন্তু হিন্দু মেরে হাত ময়লা করলে গন্ধও ছড়াবে, নাকে যাবে ভারতের, বিশ্বের। হিন্দুদের বেলায় যে বিধান হাওয়া মহল থেকে চালু হয়ে কার্যকর হচ্ছে বাংলাদেশের হাজার হাজার গ্রামে, তার নাম 'ডলুনি'। নির্দেশদাত্রী ভাদ্রবৌয়ের, বয়স্ক প্রাচীন লোক হিসাবে নাম না নিয়ে, নির্দেশটা যা হাওয়ায় ভাসছে তাই বলি, মারিস না মালুদের, তা ছাড়া যা পারিস করিস। ঠিক তাই করা হচ্ছে। নিতান্তই কোনো হিন্দু দিগদারি করা না ছাড়লে তার তো ব্যবস্থা একটা করতে হবে। কিন্তু ওকে সইয়ে সইয়ে ভোগ করা সবার জন্যই লাভজনক। মাসিক চাঁদা আসতে থাকলো, মাস্তানির জন্য, বিনে পয়সায় ইচ্ছামতো জমাজমি-বাড়ি পাওয়া গেল, বাড়ির লোকেরা মাঠে বনে বাদাড়ে থাকলো তপোবন মনে করে, আর স্বর্গসুখে থাকলো দেশেই ঐ বিধর্মীদের মেয়েরা।

বাংলাদেশে এখন এথনিক ক্লিনজিং চলছে। রেখেঢেকে নয়, খোলাখুলি। পৃথিবী জানলে কিসসু যায় আসে না। মুক্তিযুদ্ধ, শেখ হত্যা আর হাসিনা আমলের কারণে বাংলাদেশের নাম পৃথিবীর জিওপলিটিক্যাল মানচিত্রে উঠে পড়েছিলো বটে। সেখানে ব্যাক গিয়ারে চলছে গাড়ি বাংলাদেশের মধ্যযুগীয়করণটা সবার চোখের আড়ালে হওয়াটাই মঙ্গলজনক। ছোট ফিজি সম্ভবত ইস্টার আইল্যান্ডের পরেই পৃথিবীর নির্জনতম দ্বীপ কাছে ধারে হাজার মাইলে আর কোনো দেশ নেই। লোকসংখ্যা? সানমারিনো, ভ্যাটিকান সিটির চাইতে অবশ্য বেশি। সাত হাজার বর্গমাইলের দ্বীপটাতে বাস করে সাড়ে ছয় লাখ মানুষ। তার খবর পৃথিবীর তাবত কাগজে ছাপে মোটা শিরোনামে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। আর আমার এই পোড়া দেশের তেরো কোটি মানুষের প্রায় ২০ শতাংশ নির্যাতিত হচ্ছে, ন্যূনতম মানবাধিকার পাচ্ছে না তা পৃথিবীতে কারও নজরে পড়লো না, পড়ছে না। মানবাধিকার সংস্থা বলে বাংলাদেশে যা কিছু আছে তা অধিকারহরণকারীদেরই মদদে পুষ্ট। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আওয়ামী অপকর্মের খুব ঢাক পিটিয়েছিলো। এবারে গত পনেরোই জুলাই থেকে

বারোই নভেম্বর পর্যন্ত তাদের টিকিটি দেখা গেল না বাংলাদেশের খুনে ধর্ষণে জর্জরিত হাজার দশেক গ্রামে। বিশ্বে নগন্য হবার কতো সুখ! তৃণাদপি ক্ষুদ্র দ্বিপদ জন্তু কতো কোটি কোটি মানুষকে চরায়, অপমানে বঞ্চনায়। বেলজিয়ামও ছোট দেশ, বাংলাদেশের চেয়েও। মাত্র এক কোটি মানুষ সেখানে বাস করে ১১ হাজার বর্গমাইলে। হল্যান্ডের বিশ্বসাম্রাজ্য ছিলো এককালে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাদেরকে সঠিক নামে ডাকতো ওলন্দাজ, ইংরেজদের মতো ভুল নামে (ডাচ) নয়। সে দেশটা বুঝি বড়ই হবে। পনেরো হাজার বর্গমাইলে বাস করে হয়তো এক কোটি দশ লাখের মতো। আইন্ডহোফেনের, ফিলিপসের হল্যান্ড, লিউয়েনহুক থেকে লোরেনৎসের হল্যান্ড, রেম্প্রান্ট ভারমিয়ারের দেশ হল্যান্ড, দেকার্তের কর্মস্থল। আমরা এতো ছোট রইলাম কেন? ছোট কি চিরকাল ছিলাম? বঙালাহ বলতে তো Eldorado-র মতোই এক স্বর্ণপুরী বুঝিয়েছে। তা হলে? একটা বড় ব্যাখ্যা ছোট সঙ্কীর্ণ মানবতা উদারতাহীন স্বল্পপরায়ণ দ্বিপদ জন্তু রাজত্ব করবে বলে দেশটাকে নানা অমানবিক কৌশলে ছোট করে নিয়েছে। এক শ' দেড়শ' বছর আগেও পরাধীন ভারতের তস্য পরাধীন বাংলা প্রদেশ বিজ্ঞানে সাহিত্যে দর্শনে মননে জগতের শীর্ষস্থানীয়ের মধ্যে ছিলো। কেন আমরা এতোটাই পতিত হলাম? আমাদের উঠতি বয়সেও সৌদি আরব মিসকিনদের দেশ ছিলো। লোক হজ করতে গিয়ে দুম্বা, উট জবাই করতো। সেইগুলো আরবরা খেতো সারা বছর। হজের ট্যাক্সের টাকায় চলতো রাজ্য। তেল পেল, ধনী হলো, আমাদের মিসকিন ডাকতে আরম্ভ করলো। কিন্তু তার, সেই রাজ্যের আরবদের কোনো মানসিক বিকাশ হলো না, লাম্পট্যে ভরে ফেললো পৃথিবী। আমরা তেল গ্যাস পেয়েছি, এবারে বুঝি আমাদের শেখদের মতো অপচয়ী উদ্ধত লম্পট হবার পালা। সৌদি আরবে স্বল্পসম্মানে দৃপ্ত বেদু সেই দরিদ্র যাযাবর বেদু রয়েছে। সাইফুর রহমান তেল বেচে যদি বিশ হাজার কোটির বদলে বিশ টাকাও আনতে পারেন, তা তো জাতীয় বিকাশে যাবে না। এ জাতির নতুন ক্ষত্রিয় সন্তানরা ও নতুন বৈশ্য ব্যবসাদাররা সব খেয়ে ফেলবে।

ব্যক্তিমানুষের ক্ষুদ্রতা-নিচতা কীভাবে সমাজকে-জাতিকে ছোট করে আনে তার জ্বলন্ত প্রমাণ মরহুম ফজলুল কাদের চৌধুরীর (আল-াহ তার জন্য জান্নাতুল ফিরদাউসের বিশেষ সম্মানিত স্থান বরাদ্দ করুন, তিনি তার ফরজন্দ বহু বেদ্বীনকে কতল করে দেশকে কুফর করবার চেষ্টায় জান কোরবান করেছেন) এক কীর্তিমান পুত্র গত সাতই নবেম্বর, বিএনপির ভাষায় সিপাহী জনতা বিপ-ব দিবসে (বিপ-ব, ইনকিলাব, সংগ্রাম তাবত কমিউনিস্ট শব্দকে তারা কী সুন্দর ইসলামাইজ করেছেন!) রাউজানের আপন তালুকদারিতে ঘোষণা করলেন, আমি আর হিন্দুদেরকে রক্ষা করতে পারবো না।

পৃথিবীর কেউ জানতো না তাঁকে হিন্দুদের রক্ষা করবার দায়িত্ব কে দিয়েছিলো। রাষ্ট্রের, সমাজের তা করবার কথা তো। তা তিনি তো এই দুইয়েরই বাইরে। হিন্দুরা নিশ্চয়ই কোনো গুরুতর অপরাধ করেছে যার জন্য তিনি আর সেই দায়িত্ব পালন করবেন না। সম্ভবত তার সন্দেহমতো, হিন্দুরা তার মতের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে থাকবে। সেই পাপে এই গুরুদণ্ড, গিকাচৌ আর তাদের ত্রাণকর্তা থাকবেন না। ত্রাণকর্তা লাগবে কেন হিন্দুদের? নিজেদের বাড়িতে নিজেদের অধিকারে আছে, সমাজসভ্যতা, সুনীতি-আইনসম্মতভাবে জায়াপুত্রকন্যাসহ জীবন নির্বাহ করছেন কৃষিকার্যে হয়তো। তার ত্রাণকর্তা লাগবে কেন? এ তো বড় বোকার মতো হলো। সম্প্রদায়ে হিন্দু, আছে মুসলমানদের দেশে, তায় এখন বিএনপি আমল; ত্রাণকর্তা লাগবে না? জীবনরক্ষা ট্যাক্স দিতে হবে না? হিন্দু আবার নাগরিক কিসের! উদার বিএনপিরা হয়তো বলবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক তো বটেই। তা উদারনৈতিকদের বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়েই হিন্দুদের খেয়ে বড় হওয়া ফজলুল কাদের পুত্র সালাউদ্দিন তো খালেদার সব চেয়ে কাছের মন্ত্রণাদাতা উপদেষ্টা। হিন্দুরা আবার নাগরিক কিসের? ধার্যমতো পয়সা ফেলবে, থাকবে।

এই সুব্যবস্থা মেনে নিতে হয়তো হিন্দুদের কিছু অসুবিধা হয়ে থাকবে, গিকাচৌ আর তাদের সুরক্ষা দিলেন না, তাঁর কথামতোই এবং তাঁর বাহিনী এসে গত শনিবার ৩৩টি হিন্দু বাড়িতে হামলা করে যা নেবার নিয়ে গেছে (জীবনের সর্বসঞ্চয়), যা না নেবার ভেঙ্গে চুরমার করেছে। গিকাচৌ কেমন এক কথার লোক। আইন নেই, আইন প্রয়োগকারী পুলিশ নেই, প্রশাসন নেই, মন্ত্রী নেই, ম্যাগও নেই সবার ওপর গিকাচৌ তাহার উপর নাই সাকাচৌ ছাড়া অবশ্য।

বাংলাদেশে কি কেবল হিন্দু ত্রাসে আছে? শহীদ মিনারে মাঝেমধ্যে 'প্রগতিশীল' কিংবা বিরুদ্ধবাদীদের সভা হয় শ'খানেক লোকের। চিনেবাদাম চিবুতে চিবুতে বিখ্যাত লোকদের কথা শুনতে অনেকের হয়তো উপাদেয় লাগে। কিন্তু সত্যিকার প্রতিরোধী চরিত্র যে আসে না তা নয়। কিন্তু বক্তারা গা বাঁচিয়ে বক্তৃতা করেন। হয়তো সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের নিন্দাই বিষয় কিন্তু কে বা কারা সেই নির্যাতক সে কথা মাননীয় সারোয়ার মুর্শিদও বলেন না, অন্য, পরের কথা। শামসুর রহমান গাফফারের এক ধাক্কায় 'সমাজের বিবেক' হওয়ার বোঝা ত্যাগ করেছেন। সকলেই স্বতন্ত্র ভুল বুঝলেন সন্ত্রাসিত। এরই মধ্যে এসে গেলো রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। বিএনপি দল, যার নাম বাংলার ত্রাসের ঘেরাটোপে বসে কেউ নেয় না, সেই সমাজবিরোধী সহিংসতায় বিশ্বাসী, সমাজকে পাশবিকীকরণে, ক্রিমিনালাইজেশনে যার একচেটে কীর্তি, সেই সরকারি দল দলীয় লোককে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করছে। মানুষের ভুল হয়, শয়তানের নাকি হয় না। আমার একটু বেশি হয়, ক্ষণে হওয়া উচিত, বোধহয় আমি একটু কম শয়তান। আমার এই নতুন রাষ্ট্রপতিকে মানুষ হিসেবে গণ্য মনে হয় না। তাঁর আওয়ামী লীগার পিতা, আমার পিতৃবন্ধু, মনে পড়ে ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। স্পষ্ট বক্তা ছিলেন প্রায় সবাইকে কথা দিয়েই ছিলে দেবার মতো। তাঁর ছেলে ভালো ছাত্র হলো, মার্জিত হলো এবং হলো বড় ডাক্তার। চামার ডাক্তার নয়, বিবেকবান এবং সংস্কৃতিমনা, সদাশিল্পমনস্ক। আমার এক ছাত্রী ছিলো, বৃষ্টি। কী অপূর্ব কণ্ঠ। কী তার মেধা। সমস্যা ছিলো একটাই কী করি বলেন তো, যাতে হাত দিই তাতেই নাকি এক নম্বর। কোনদিকে যাই? বদরুদ্দোজা গান গাইতেন, এখনও গান, হাসান ইমামের মতো স্বভাবগায়ক, আবৃত্তি করতেন, হয়তো অভিনয়ও। ড্রইংয়ের হাত দেখে বুঝি চাইলে চিত্রকর হতেন, নিদেনপক্ষে খুবই ভালো ডিজাইনার যে কোনো বিষয়ে। সব ছেড়ে তিনি জীবনের ব্রত করলেন শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সর্বনাশ করে ছাড়বেন। তার মানে আওয়ামী লীগেরও। তাঁর সব গুন রইলো পড়ে, তিনি দেলোয়ার গং প্রভৃতি (তাঁর তুলনায় গ্রাম্য লোকদের) সঙ্গে ছুটলেন জাতীয় সংসদে স্পীকার হুমায়ুন রশীদকে মারতে। ডাক্তার সাহেবকে, থুড়ি মহামান্য (সম্ভাব্য) রাষ্ট্রপতিকে মনে পড়লেই আমার সেই দৃশ্য মনে পড়ে। আর কানে আসে তাঁর অনন্য বাকভঙ্গি। এখনকার সিনেমায় শুটিয়য়ে সংলাপ, শব্দ কিছু নেয়া হয় না, পরে ঢোকানো হয়। ফলে অভিনেতা-অভীনেত্রী নিজে পাঠটুকু মুখস্ত করা দূরে থাক, পড়েই আসে না। একজন প্রমটার চেঁচিয়ে একটা বাক্যাংশ (ছোট হওয়া চাই, অর্থ হোক বা না হোক) বলেন তো নট কিংবা নটী অতোটুকু বলেই বাকিটুকু শোনার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। ফলে আজকালকার বাংলা ছবির সংলাপে কোনো বাক্যই পূর্ণ বাক্য হয় না, অর্থ পায় না কোনো। রাষ্ট্রপতির এর কাছাকাছি একটা বাকভঙ্গি আছে নিঃসন্দেহে তাতে তাঁকে বেজায় স্মার্ট লাগে। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর নিত্য অমৃতভাষণ ও জিয়া পরিবার-বশ্যতা মানুষের সাধ্যাতীত পর্যায়ের এক গুণ যা তাঁর প্রজ্ঞা ও প্রকাশ, বিকাশ ও পরিণতিকে বাধা দেয়, আমাদেরকে করে আশাহত। অতিরিক্ত প্রতিভা অনেকানেক বিষয়ে সে ছেলেমেয়ের শেষ গতি সুবিধার হয় না। অবশ্য রাষ্ট্রপতি হিসাবে তিনি নিশ্চয়ই ভণ্ড, প্রতারক এবং কৃতঘ্ন হবেন না। জড়ভরত অবশ্যই তিনি হবেন না। না হয়েই বা বিএনপিতে ঢুকে তিনি কি করলেন। এক ব্রত পূর্ণ হয়েছে বৈ কি আওয়ামী লীগের ভরাডুবি। খালেদার চরম ব্রতটি বুঝি তাঁরও চূড়ান্ত ব্রত আওয়ামী লীগের কোমর এমনভাবে ভেঙ্গে দেয়া যাতে যদিবা আদৌ টেকে, যেন একটা চলচ্ছক্তিহীন প্যারাপে-জিক জীবন হয় তার। আহা কী অপূর্ব গণতান্ত্রিক ভিশন এই হরিহর যুগলের। হরি (বিষ্ণু), হর (মহাদেব) দুই-ই দেবতা, একজন অনন্ত দেবী হলে উপমাটি খাটতো। তা বলে তাঁদেরকে রাধেশ্যাম বলাও তো রুচিবিরুদ্ধ, অসত্য এবং অসভ্য হবে। নজরুল মহাকবি এই জন্যও যে এই সব বিপদেও তিনি মোক্ষম বিপত্তারণ। শ্যাম ও শ্যামার মিলের তাঁর গানে একাধিকবার এসেছে শ্যামের গায়ের রং তো কৃষ্ণ, শ্যামা তথা মা কালীর তো ঘোর কৃষ্ণ এই মিলের কথা হচ্ছে না। শক্তি ও বৈষ্ণব সাধনার পূজার আধার যে একই ঈশ্বরসত্তা-বহুপ্রাচীন একটা সমন্বয় প্রয়াসের সূত্রে এসেছে এই উপমা এবং আরও অজস্র উপমা। কিন্তু জিয়া এমন এক শক্তি যার ওপর অচলা ভক্তিবিশ্বাস থাকায় আজকের প্রধানমন্ত্রী ও সম্ভাব্য রাষ্ট্রপতির কোনোই আশঙ্কা নেই কখনও দ্বিমত হবার। হায়, ডাক্তার চৌধুরী এভাবেই যাবে আপনার জীবন!

ইন্দ্রপতন খুব বড় ঘটনাকে বলে। তা ইন্দ্রোত্থান কি তার চেয়ে ছোট নাকি! ডাক্তার চৌধুরী (আমি নাকে কানে খৎ দিচ্ছি তাঁকে আর কক্ষনো বদ চৌধুরী বলবো না, কারণ তাতে আমার যতোই ক্রিমিনাল অফেন্স হোক তার চেয়ে অনেক বেশি অপরাধ হবে বাংলাদেশের অপমান।) রাষ্ট্রপতি হলেন বাংলাদেশের, কতো বড় ঘটনা। বুদ্ধের জন্মসময়ে কতো কিছু ঘটেছিলো অশ্বঘোষের বুদ্ধিচরিতমে আছে। ডা. চৌধুরী রাষ্ট্রপতি হবার প্রাক্কালেও উপযুক্তমতো বড় ঘটনা ঘটেছে।

১. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উত্তরাস্থ অফিস বন্ধ করে দিয়েছে সরকার।

২. আওয়ামী আমলের বার্ষিক দুই লাখ টন সার আমদানির জায়গায় বৈদেশিক মুদ্রাহীন বাংলাদেশ সাড়ে পাঁচ লাখ টন সার আমদানি করছে এ বছর যাতে কেউ না খেয়ে না মরে, উৎপাদন না কমে।

৩. রাজধানীতে তিন খুন বিষয় সন্ত্রাসীদের চাঁদাবাজির বখরা (১৫ জুলাইয়ের পর সন্ত্রাসীর স্থলে বিএনপি ক্যাডার পড়লেও শুদ্ধ হবে)।

৪. মন্ত্রীপুত্র ও আত্মীয়স্বজন অপকর্মে পূর্ববর্তীদের ধরে ফেললো প্রায়।

৫. চাঁদাবাজি ও দখল ব্যবসায় এবারে বিএনপি ছাত্রী কাডার।

৬. অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের অভিযান প্রহসনে পর্যবসিত। কিন্তু দেশের বাস্তব ছবির পাশে এ নিতান্তই ম্-ান চিত্র। একটি পত্রিকায় লেখক কয়েকটি পত্রিকার শিরোনাম দিয়ে কিছু ছবি আঁকবার চেষ্টা করেছেন, তাই বরং নতুন রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দনস্বরূপ উপহার দিই।

ঝিকরগাছার সোনাভান জানে না কী তার অপরাধ, প্রাণনাশের ভয়ে উদ্বাস্তু হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে ইউনিয়নের আওয়ামী সমর্থকরা। সন্ত্রাসীরা ইচ্ছামতো পুকুর-বাঁওড়ের মাছ, দোকানের পণ্য লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। মসজিদ দখল করে ইমাম-মুয়াজ্জিনকে মসজিদ থেকে ঘাড় ধরে ধাক্কা দিয়ে বার করে দিচ্ছে।

তাড়াশে সরকারদলীয় সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব চরমে বাজারে লুটপাট ধর্ষণ, গণচাঁদা আদায়।

কেবলমাত্র দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের আট জেলায় নির্বাচনের পরে ৩৬ খুন।

শবে বরাতের দিন রায়পুরায় নারকীয় সন্ত্রাস, ঘরবাড়ি বাজারে লুটপাট।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলে প্রভোস্টকে (ছাত্রদের) গালিগালাজ, হুমকি শিক্ষক দম্পতি (বিএনপি ক্যাডারের অনুমতি ছাড়া কোয়ার্টারে ওঠায়) নাজেহাল।

চাটখিল বাজারে বিএনপি ক্যাডারের অস্ত্রের মহড়া, দুই আওয়ামী নেতা প্রহৃত। গৌরনদীতে চাঁদার দাবিতে সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব। চাঁদার দাবিতে চারজনকে কুপিয়ে আহত।

মাণিকগঞ্জের পরেশ হালদার চাঁদা ধার্য ২০ হাজার টাকা, নইলে মাথা। স্ত্রী ছবি রাণীকে শরীফ রাজাকারের (প্রকাশ্যে) কুপ্রস্তাব।

সেনবাগে ইউএনওসহ কর্মকর্তারা বিএনপি এমপির অন্যায় আবদার ও অবৈধ কাজের তদ্বিরে দিশাহারা।

ইউএনওকে এমপি সেনবাগে চাকরি করতে হলে সপ্তাহে তিন দিন গাড়ি ও জ্বালানি দিতে হবে।

কালিয়াকৈর এখনও বিভীষিকায় আচ্ছন্ন দেদার চাঁদাবাজি, সেই সঙ্গে হত্যা ও ধর্ষণের হুমকি।

মীরসরাইয়ের দাশপাড়ায় বিএনপি সন্ত্রাসী হামলা, সেবাইত খুন, আহত ৩০।

পীরগাছায় লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

নাটোরে হোমিও ডাক্তারকে মারধর।

টাঙ্গাইলে গ্রামছাড়া করেছে পাকা ধানভর্তি ক্ষেতের মালিককে নৌকায় ভোট দেয়াতে।

গলাচিপার হরিপদ শীলকে দিগম্বর করে বাজারে ঘোরানো হয় বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামীর ছোট ভাইয়ের নির্দেশে।

ঈশ্বরগঞ্জে দাড়ি রেখে নৌকায় ভোট দেওয়াতে তার দাড়ি টেনে ছিড়ে ফেলা হয়। আহত নারী-পুরুষদের হাসপাতালেও নিতে দেয়া হয়নি। মামলা নেয়নি পুলিশ। পনেরোই জুলাই থেকে তিন মাস ধরে অনবরত এই একই অত্যাচার, লাঞ্ছনা, জবরদখল, খুনজখম, ধর্ষণের খবর। নিয়ম করে টাকা ছিনতাই, অর্থাৎ সন্ত্রাস ট্যাক্সের বিনিময়ে গিকা চৌধুরীর মতো সুরক্ষা য়। এমন একটা দেশের রাষ্ট্রপতি হলেন ডা. চৌধুরী! নাঃ আপনার লজ্জা পাবার কিছু নেই, আপনি কি এই অপনায়কদেরই একজন নন, আপনাদের মতো মান্যবর মানুষেরাই কি এসব কর্মকাণ্ডের ইন্ধন এবং ছত্রছায়া যোগাচ্ছে না? আপনার নেত্রীর নীতি ও কৌশলের বাইরে কি কিছু ঘটছে? কার ঘাড়ে কটা মাথা। জেনারেলের স্ত্রী হিসেবে তিনি একটি যোগ্য নীতির কথা বলেছিলেন, (এ দেশের) মানুষ শক্তের ভক্ত নরমের যম। সেই তাঁর একমাত্র নীতিহীন নীতির ফসল। আপনিও ভাগ পেলেন তার। আচ্ছা মি. রাষ্ট্রপতি, চিরদিন কি এই নীতিতেই চলবে দেশ আর মানুষ, এই কুকুরের মতো মার খেতে প্রভুভক্ত হওয়া? মনে কি হয় পাঁচ বছর আপনারা পূর্ণ করতে পারবেন, দেশ বিকি না করে?

আমাদের কৃচ্ছ-অভ্যস্ত সাবেক রাষ্ট্রপতি নিজ গ্রাম এলাকায় জনপ্রিয় নন। কঞ্জুসপনার জন্য হতে পারে। হতে পারে তাঁর এলাকায় তাঁর এক পয়সার কাজও নেই বলে। নিজে তো কম কামাননি, তা দিয়ে কী করেছেন কে জানে। আমি হাসিনাকে এই লেখায়ই বলছিলাম হাসিনা, তুমি গণভবন ত্যাগ করো। তিনি করেছিলেন। আমি আপনাকে বলছি আপনি বাড়ি ভাড়ার লক্ষ টাকা নিতে অস্বীকার করুন। যে দেশে হেলথ কমপে-ক্সে ওষুধ থাকে না সে দেশে বিনা কাজের জন্য এতো টাকা কি দেয়া যায়!নীতিবান সাহাবুদ্দীনের তো দশ হাজার টাকার ভাড়া বাড়িতেই চলে। যদি এক লাখ টাকাই তাঁর চাই (শুধু বাড়ি ভাড়া, তা বাদে মোটা পেনশন তো থাকবে) তবে তিনি কেবল ভণ্ড প্রতারক এবং কৃতঘ্ন নন, তিনি একটি অপকৃষ্ট তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ নবেম্বর ২০০১

মুরগি চুরির ঘটনায় জাতি লজ্জিত হবে কেন?
মুনতাসীর মামুন

উমা মুহুরী এ কাজটি করলেন কেন বুঝলাম না। নিহত অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীর লাশ ঢাকা দেয়ার জন্য চাদর খুঁজছিলেন বিমান বাহিনীর প্রাক্তন সদস্য, বর্তমানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ চৌধুরী। উমা কাপড় তো দিলেনই না; বরং তাকে বললেন, 'কাপড় দিয়ে বীভৎসতা ঢাকার দরকার নেই, আপনাদের সরকারের আমলে জনগণের নিরাপত্তা কতটুকু আছে, দেশবাসী দেখুক।' (সংবাদ, ১৭.১১.০১)। তার সঙ্গে আরেকজন মন্ত্রী জনাব নোমানও ছিলেন। অন্যরা আসার আগে লাশটি ঢেকে ফেললে ভালো হতো। আলতাফ চৌধুরী তাহলে বলতে পারতেন, ঘটনাটি ঘটেনি।

নোমান বলতে পারতেন, বিষয়টি অতিরঞ্জিত। পুলিশ বলতে পারতো, এরকম ঘটনা ঘটেছে কি-না। যেমন আওয়ামী আমলে ডিবি অফিসের পানির ট্যাঙ্কে লাশ পাওয়া গেলে সবাই ধরে নিয়েছিল কাক সেটা ফেলে গেছে। আরো মুশকিলে পড়েছে ইনকিলাব ও 'প্রগতিশীল' পত্রিকাগুলো, তারা প্রথম পাতায় বাধ্য হয়ে খবরটি ছেপেছে। সাধারণত আফগানিস্তানই প্রাধান্য পায় বাংলাদেশে। অন্য খুনোখুনি বা টেররিজম নয়। অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী রাষ্ট্রপতি হয়ে গেছেন। নয়তো ইনকিলাব যেমনটি ইঙ্গিত করেছে, যেমন করে বলতো, ছাত্রলীগ ঘটনার জন্য দায়ী। উমা দেবী আপনি এতো লোককে বিব্রত করেছেন। তার ওপর আপনি মুসলমান নন। থাকেন চট্টগ্রামে, সেখানে মন্ত্রী সংখ্যা শুনেছি ছয়-সাতজন এবং সবাই বিশ্বাস করেন গত ৩০ দিনে যা ঘটেছে সবই অতিরঞ্জিত, সেখানে আপনি এ কাণ্ডটি না করলেই পারতেন। এখন বিমান সেনা চৌধুরীর দোস্ত, প্রাক্তন সৈনিক ও বর্তমান পুলিশ প্রধান তদন্ত শুরু করতে হয়তো বাধ্য হবেন এবং পুলিশি তদন্ত বোঝেন? দেখা যাবে, মেয়র মহিউদ্দিন বা বিপ-বী বিনোদ বিহ-ারী হয়তো এ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। জানি না, উমা মুহুরী থাকতে পারবেন কি-না সে এলাকায়। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে নিবেদন, সংবাদের এ রিপোর্টটি যারা করেছেন তারা মুসলমান নন, সুতরাং আপনি বা আপনার সরকার তা অগ্রাহ্য করতে পারেন।

সমস্যা বাঁধিয়েছেন ওই এলাকার লোকজনও ঃ মন্ত্রীরা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুকরণে জনগণকে বলছিলেন, সন্ত্রাসীরা যে দলেরই হোক তারা রেহাই পাবে না। হত্যাকারীদের খুঁজে বের করা হবে।' এলাকার লোকজনের উচিত ছিল একথা বিশ্বাস করা। কিন্তু কেন যেন 'হাজার হাজার জনতা রোষে ফেটে পড়েন। তখন বিক্ষুব্ধ জনতা শ্লে-াগান দেয় ও জুতা-স্যান্ডেল প্রদর্শন করে।' (আজকের কাগজ, ১৭.১১.০১)।

বিএনপি-জামায়াত জোট ও পুলিশ যখন বেয়াদব জনতার (!) খোঁজ করবে তখন এ জনতা থাকবে? তাদের অনেককেই তখন অপরাধী হিসেবে চালান দেয়া হতে পারে।

ভুল করলেন বিনোদ বিহারী চৌধুরীও। তিনি যখন চট্টগ্রাম বিদ্রোহে যোগ দেন, তখন আলতাফ চৌধুরীরও জন্ম হয়নি। আলতাফ চৌধুরীরা এসব ব্যক্তিকে চেনেনও না। সেটি ভালো ছিল। এখন এই নব্বই বছর বয়সে কে বলেছিল আপনাকে এতো বড় স্বারাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখের ওপর বলতে, 'আপনি দেশের সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবের ঘটনাগুলো সংসদে অস্বীকার করেছেন, মীরেরসরাইর দাশপাড়ায় ঘটে যাওয়া সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবকে সংসদে বক্তৃতা দিয়ে বলেছেন মুরগি চুরির ঘটনার মতো হবে কি-না জানি না। .... আমরাও সংসদ সদস্য ছিলাম। সংসদে অসত্য কথা বলা অন্যায় বলে জানি .....।' (ঐ)

জনাব আলতাফ চৌধুরী, অনুগ্রহ করে শ্রী চৌধুরীর কথায় কান দেবেন না। বৃদ্ধ মানুষ

উত্তেজিত হয়ে কী বলে ফেলেছেন। আপনাদের ক্যাডারদের যদি একটু জানিয়ে দেন যে, বিনোদ বাবুর গায়ে যেন হাত না তোলে, তাহলে ভালো হয়। দেখছেনই তো তারা পুরো দেশকে কেমন লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছে। বিনোদ বাবু কিন্তু কোনো দল করেন না। উনি তো আর জানেন না আজকের রাজনীতির মূলই হলো মিথ্যা বলা! চট্টগ্রামে সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মোহাম্মদ উদ্রিস আবার জনাব আল নোমানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনারা কি দেশে কোনো মুক্তিযোদ্ধার চিহ্ন রাখবেন না?' [আজকের কাগজ] একজন সাংবাদিক হয়ে তিনি কীভাবে এ প্রশ্ন করলেন জানি না। জামায়াত-বিএনপি সরকার গঠনের পর তারা মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় করেছে। মুক্তিযোদ্ধা না থাকলে এ মন্ত্রণালয় কী করবে? মুক্তিযোদ্ধা থাকবে তবে তাদের হতে হবে জামায়াত-বিএনপি ঘরানার।

আসলে সবকিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি করা আমাদের একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। লতিফ-মুয়ীদ কোম্পানী যখন জাতিগত ও রাজনৈতিক শুদ্ধি অভিযানের পটভূমিকা তৈরি করেছিল [যা হয়েছিল পুরনো যুগোস্-াভিয়ায়], তখন কি অনেকে মনে করেননি এটি অতিরঞ্জন? তার পর নির্বাচনে যখন রাষ্ট্রপতি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন মিলে ম্যান্ডেট দিল জামায়াত ও বিএনপিকে তখনো তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। 'প্রগতিশীল পত্রিকাগুলো' ও ইনকিলাবও বলেছে এগুলো ঠিক নয়। নির্বাচনের সময় নাকি এম. এ. সাঈদের 'দুষ্টু'গুলো চলে গিয়েছিল। নির্বাচনের পর আবার তারা ফিরে যখন লতিফ-মুয়ীদের আরব্ধ কাজ সমাপন করছে, তখন সাঈদ বলেছিলেন নির্বাচনের পর এ রকম এক-আধটু হয়। সুতরাং অধ্যক্ষ মুহুরীর নিহত হওয়াটা সেভাবে দেখুন। ক্ষমতায় গেছে বিএনপি ও পঞ্চাশ বছরের জামায়াত প্রথম। তারপর আনন্দ-উদ্দীপনায় এ রকম এক-আধটু হবেই। তার ওপর তিনি মুসলমান ছিলেন না। হিন্দু বা আওয়ামী সমর্থক মারা গেলে এতো মাতমের কী আছে?

আলতাফ চৌধুরী এতোদিন যা বলেছেন আমরা সেটা বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করার হুকুম আছে। জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ, সংবাদ বিশ্বাস করে না। কারণ তারা শেখ হাসিনার পক্ষ, তাদের মালিকরা/সম্পাদকরা শক্তিশালী। আমরা ছাপোষা, আমরা বাঁচতে চাই। আলতাফ চৌধুরী আগে বলেছেন, তিনি উল্কার মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন। কই হিন্দু ও আওয়ামী নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ তো চোখে পড়েনি। মীরেরসরাইর ঘটনা মুরগি চুরি থেকে উদ্ভূত। এটিও আমরা বিশ্বাস করি আমরা ছাপোষা মানুষ। আমরা গুলি খেতে চাই না। 'হাসিনা কণ্ঠ' বলে পরিচিত কয়েকটি পত্রিকা লিখেছে, এ হত্যা নাকি শিবিরের লোকজন করেছে। আমরা তা বিশ্বাস করি, আসলে ঘটনাটা হয়েছিল মীরেরসরাইতে কয়েকজন হিন্দু কয়েকজন হিন্দুর মুরগি চুরি করে। এর ফলে কলহ, সংঘাতে সৃষ্টি হয়। বিএনপি-জামায়াতের কর্মীরা হিন্দুদের এ সংঘাত থামাতে গিয়েছিল। যাক, যাদের মুরগি চুরি হয়েছিল তাদের মনে হয়েছিল নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী এতে ইন্ধন যুগিয়েছেন। তিনি আবার বাম দল করেন। বাম দল আবার হরতাল ডেকেছিল ভারতের কাছে গ্যাস বিি্র উছিলায় বিএনপি-জামায়াতের দেশ বিি্র প্রতিবাদে। এতে আরেক দল হিন্দু ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। কারণ দেশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলে তারা যাবে কোথায়? এ হচ্ছে প্রকৃত ঘটনা। পত্রপত্রিকা যাই বলুক, আমরা এটাই বিশ্বাস করি। আমাদের যেন গুলি করা না হয়। শুনেছি অধ্যাপক, লেখক, শিল্পী, সরকারি কর্মচারি, সাংবাদিক- সবমিলিয়ে হাজার তিনেক জনের একটি লিস্টি দেশের ভবিষৎ এক তরুণ নেতা আপনার কাছে পাঠিয়েছে টাইট দেয়ার জন্য। সে জন্যই এ কথা বার বার বলছি। আপনারা যা হুকুম করছেন আমরা তাই বিশ্বাস করি।

আলতাফ চৌধুরী হঠাৎ বলে ফেলেছেন, 'নির্মম এ ঘটনার জন্য আমি লজ্জিত, সরকার লজ্জিত এবং জাতিও লজ্জিত। আলতাফ চৌধুরীও বিনোদ বিহারী চৌধুরীর মতো ভাবাবেগে এ

কথা বলে ফেলেছেন। কেন তিনি, সরকার এতে লজ্জিত হবে? গত তিন মাসে কি হাজার হাজার মানুষ জাতিগত ও রাজনৈতিক শুদ্ধির কারণে গৃহহারা হয়ে এলাকা ত্যাগ করেনি, বাঙালি নারী-রা কী ধর্ষিত হয়নি? কয়েকদিন আগেও চাঁদপুরের কচুয়ায় একজন হিন্দু রমণীকে ধর্ষণ ও হত্যা করে ফেলে দেয়া হয় কচুয়ার রাস্তায়। পুলিশ তো মামলাও করেনি। আওয়ামী লীগ পাঁচ বছরে যা করতে পারেনি জামায়াত-বিএনপি ৩০ দিনে তা সমাপন করে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করেছে। এতে লজ্জিত হওয়ার কী আছে? আর এ জাতিও বা লজ্জিত হবে কেন? একটি মুরগি চুরির ঘটনায় একটি হত্যাকাণ্ড হয়েছে, নিহত ব্যক্তি মুসলমানও না, এতে জাতির লজ্জার কী আছে? আলতাফ চৌধুরীর [যিনি সংসদে অবলীলায় সত্য নয় এমন কথা বলেন] স্বরাষ্ট্রমন্ত্রিত্বে জাতির লজ্জা হয় না, এথনিং-পলিটিক্যাল ক্লিনসিংয়ে জাতির লজ্জা হয় না, নিজামী পতাকা উড়িয়ে ঘুরে বেড়ায় জাতির লজ্জা হয় না, একটা সামান্য ফরেনও নয়, দেশি মুরগির চুরিতে জাতি লজ্জিত হবে কেন?

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ নবেম্বর ২০০১

ঢাকার মিলোসেভিচদেরও আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো উচিত

আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী

চট্টগ্রামের নাজিরহাট কলেজের সদ্যপ্রয়াত অধ্যক্ষ শহীদ গোপাল মুহুরীর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের লেখাটা শুরু করছি। ১৬ নবেম্বর শু্বার সকালে দুর্বৃত্তরা তার চট্টগ্রাম শহরের বাড়িতে ঢুকে একটা ঘরে তার ছেলেমেয়ে-স্ত্রীকে তালা মেরে বন্দি করে রেখে অধ্যক্ষ গোপাল মুহুরীকে গুলি করে হত্যা করে। এই দুর্বৃত্ত কারা তার পরিচয় প্রদানের দরকার নেই। এরা বিএনপির দুঃশাসনের অনুচর। বিএনপি-জামায়াত গত মাসে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর দেশময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী ও নেতাদের ওপর একাত্তরের কায়দায় যে হত্যা ও নির্যাতন চলছে, গোপাল মুহুরীকে হত্যা তারই একটা অংশ মাত্র।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার এবং তাদের আলবদর অনুচররা (তাদের একটা অংশ এখন বর্তমান সরকারের পার্টনার) যেভাবে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের দানবীর বৃদ্ধ রায় বাহাদুর আর.পি. সাহা এবং চট্টগ্রামে কুণ্ডেশ্বরীর নতুন সিংহকে বাসভবনে ঢুকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করেছিলো ঠিক সেই একই কায়দায় একই ঘাতক চ্রে নতুন রি্টরা গোপাল মহুরীর মতো একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষককে হত্যা করেছে। গোপাল মুহুরীর অপরাধ, তিনি ছিলেন এক সাহসী ব্যক্তিত্ব। অক্টোবর নির্বাচনের পর থেকে দেশময় যে সংখ্যালঘু নির্যাতন চলছে, তিনি তার প্রতিবাদ এবং এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামে যে হরতাল হয়েছে, সেই হরতালের আহ্বানকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

শু্বার ১৬ তারিখ সকালে যুগান্তরের জন্য লিখতে বসেছি। ইচ্ছে ছিলো কোনো সিরিয়াস বিষয়ে না লিখে পাঠকদের জন্য একটি রম্য রচনা লিখবো। কলম ধরার আগেই ঢাকার টেলিফোন। এক বন্ধু ভগ্নকণ্ঠে জানালেন, বাংলাদেশে এথনিক (রিলিজিয়াস) ক্লিনসিং এখনো সমানে চলছে। আজ খুব সকালে (বাংলাদেশ সময় সাত কি সাড়ে সাতটা হবে) চট্টগ্রামে নাজিরহাট কলেজের প্রিন্সিপালের বাসায় ঢুকে গুলি করে তাকে হত্যা করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

এবং বিএনপির স্থানীয় এমপি ঘটনাস্থলে গেছেন । কিন্তু এই অব্যাহত পাশবিকতা দমনে তাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতা আছে বলে মনে হয় না ।

আমাকে লেখার সাবজেক্ট বদলাতে হলো । কিন্তু কলম ধরার আগে বহু চেষ্টা করে টেলিফোনে একজন ইউরো এমপি এবং একজন ব্রিটিশ লেবার দলীয় এমপির সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হলাম । সারা বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ও বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের ওপর যে অমানুষিক নির্যাতন চলছে তার বিবরণ তাদের জানালাম । তার আগে তাদের কাছে হিন্দু নিধনযজ্ঞের সচিত্র প্রতিবেদনসহ ২৬ অক্টোবর তারিখে ঢাকার ডেইলি স্টার যে ম্যাগাজিন প্রকাশ করেছে তার কপি পাঠিয়েছিলাম । ৬ নবেম্বর চট্টগ্রামের মিরেরসরাইতে সুনীল দাশকে (সান্টু) নির্মমভাবে হত্যার খবরযুক্ত ডেইলি স্টারের কপিও তাদের কাছে পাঠিয়েছি ।

লেবার দলীয় এমপি একজন ফ্রন্ট বেঞ্চের প্রভাবশালী পার্লামেন্ট সদস্য । তিনি বললেন, এ তো দেখছি বসনিয়া, চেচনিয়া, কসোভোর কায়দায় নির্মম এথনিক ক্লিনসিং । ওখানে বলি হয়েছে মুসলমানরা, বাংলাদেশে হিন্দুরা । সারা দেশটাকে একাত্তরে কিলিং ফিল্ড (Killing field) করে তোলা হয়েছিলো । বর্তমানেও তা-ই করার চেষ্টা চলছে নাকি? নতুন সরকার ক্ষমতায় বসে কী করছে?

বললাম, এই সরকারে একাত্তরের ও একাত্তরের পরের কয়েকজন কুখ্যাত ঘাতক আছে । মইত্যা রাজাকার নামে একাত্তরের কুখ্যাত ঘাতক মতিউর রহমান নিজামী এখন এই সরকারের মন্ত্রী । একাত্তরের অভিযুক্ত ঘাতক ও কোলাবরেটর ফজলুল কাদের চৌধুরীর পিতৃপদাঙ্কের অনুসারী সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এখন মন্ত্রীর পদমর্যাদায় বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা । বৃটেনের কুখ্যাত ফ্যাসিস্ট নেতা মোসলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার ত্রিশ বছরের মধ্যে টোরি অথবা লেবার কোনো মন্ত্রিসভার সদস্য হলে আপনাদের প্রতিক্রিয়া কী হতো?

এমপি টেলিফোনের মধ্যেই শঙ্কাজনক একটা ধ্বনি করলেন ওহ গড, নো ইট কুড নেভার হ্যাপেন । ভবিষ্যতেও কোনোদিন ঘটবে না । ইনোখ পাওয়েল একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী রাজনীতিক ছিলেন । কিন্তু তিনি ছিলেন বর্ণবাদী । শুধু এইটুকু অপরাধে তাকে টোরি মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নিতে হয়েছিলো ।

বললাম, কিন্তু আমার দেশে এই ঘটনাটি ঘটেছে । একাত্তরের পর এটাই আমাদের ইতিহাসে সবচাইতে ট্রাজিক ইভেন্ট ।

এমপি বললেন, কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান সরকারে অনেক ফ্রিডম ফাইটার আছেন বলে শুনেছি । তারাও কি মুখ বুঁজে এই অবস্থাটা সহ্য করছেন? দেশটাকে আবার কিলিং ফিল্ড হতে দিচ্ছেন?

বললাম, তারা এখন আর ফ্রিডম ফাইটার নন । এককালে ছিলেন । মাছের মাথা থেকেই প্রথম পচন শুরু হয় জানেন তো ।

এমপি বললেন, পুত্তর চ্যাপস! আমি ভাবছি, এরা যদি এই সংখ্যালঘু নিধন সম্পর্কে সতর্ক না হয়, তাহলে তো এই সরকারের ভবিষ্যতে এই বলে পরিচিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে যে, "A Government of the Killers, for the killers and by the killers."

বললাম, সেই চিন্তাভাবনা তাদের নেই । মুখে তারা খুব ভালো ভালো কথা বলছেন, কিন্তু তাদের প্রকৃত চরিত্র জানতে পারলে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের ইয়ারো আনভিজিটেড এবং ভিজিটেড কবিতা দুটির কথাই আপনার মনে পড়তো ।

তিনি এবার চুপ করে রইলেন । ব্রিটিশ এমপিকে বেশি সময় টেলিফোনে ধরে রাখার সুযোগ আমার ছিলো না । তাই অন্য কথায় আর সময় নষ্ট না করে বললাম, আমি বাংলাদেশের নিপীড়িত মানবতার পক্ষ থেকে আপনার সাহায্য চাই । লর্ড পিটার শোর এখন বেঁচে নেই ।

তিনি ছিলেন বাংলাদেশ ও বাঙালির একজন শ্রেষ্ঠ বন্ধু । তার অবর্তমানে আপনি এবং আপনার মতো ব্রিটিশ এমপিদের সাহায্য ও সমর্থনই আমাদের ভরসা ।

তিনি বললেন, আপনি কি জর্জ গ্যালোওয়ে এমপির সঙ্গে কথা বলেছেন?

বললাম, তার সঙ্গে আমি যোগাযোগের চেষ্টা করছি । তিনি ইরাক ও আফগানিস্তানের দুর্গত মানবতার সাহায্যকার্যে বেশ কিছুকাল যাবৎ দারুণ ব্যস্ত । তিনি আমাকে খুব ভাল করে চেনেন । তিনি যে বাংলাদেশের ব্যাপারেও আমাদের সাহায্য করতে রাজি হবেন, সে সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ । তাছাড়া ভিয়েতনাম ও গালফ ওয়ার সম্পর্কে বিশেষ রিপোর্টিং এবং মার্কিনি বর্বরতার ছবি সারা বিশ্বে যিনি তুলে ধরেছিলেন, সেই বিখ্যাত কলামিস্ট জন পিলজারকেও অনুরোধ জানাবো অবিলম্বে বাংলাদেশে পর্যবেক্ষণ ট্যুরে যাওয়ার জন্য । তিনি এখন লন্ডনের বাইরে । ফিরে এলেই এই অনুরোধ জানাবো ।

ব্রিটিশ এমপি বললেন, তাহলে তো আপনি অনেকটা কাজই এগিয়ে রেখেছেন । আমার কাছ থেকে এখন কী বিশেষ সাহায্য চান?

বললাম, আপনাকে যে আমি বাংলাদেশের এথনিক ক্লিনসিং ও পলিটিক্যাল রিপ্রেশন সম্পর্কে খবরটা জানিয়েছি এবং আপনি তাতে সহানুভূতি ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, এই খবরটা আমি ঢাকার সংবাদপত্রে পাঠাতে চাই । আপনার নাম প্রকাশের অনুমতি দিলে খবরটা ঢাকায় পাঠাবো । তাতে নিপীড়িত সংখ্যালঘুরা মনে একটু আশা ও সাহস পাবে । এখন তারা দলে দলে দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যাচ্ছে । দ্বিতীয়ত আশা করবো, আপনি প্রধানমন্ত্রী টনি বে-য়ারকে বাংলাদেশের নির্বাচন-পরবর্তী মর্মন্তুদ ঘটনাবলী অবহিত করবেন । আমি কনজারভেটিভ পার্টির নতুন নেতা ডানকান স্মিথের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছি । শিগগিরই পাবো । কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আফগানিস্তানের ব্যাপারে এখন এতোই ব্যস্ত যে, আমি ছমাস অপেক্ষা করলেও অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবো না । সুতরাং তাকে আপনার পক্ষেই বাংলাদেশের পরিস্থিতি জানানো সম্ভব ।

এমপিকে আমার দ্বিতীয় অনুরোধটি জানালাম, বাংলাদেশে অবিলম্বে সরেজমিন অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি টিমের যাওয়া প্রয়োজন । তাতে নির্যাতিত সংখ্যালঘু এবং পলিটিক্যাল ভিকটিমরা মনে সাহস পাবে । এই মুহূর্তে তাদের পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই । আওয়ামী লীগ সদ্য নির্বাচনী পরাজয় এবং ভয়াবহ সন্ত্রাসের মোকাবেলায় ছত্রভঙ্গ এবং বিপর্যস্ত, দেশের বাম দলগুলো খুবই শক্তিহীন । এই অবস্থায় কমনওয়েলথ-প্রধান বৃটেন এবং সাহায্যদাতা ইউরোপীয়ান অন্যান্য দেশের চাপ ছাড়া বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষা করা যাবে না ।

ব্রিটিশ এমপি বললেন, আমাকে অনুগ্রহ করে সাতটা দিন সময় দিন । প্রধানমন্ত্রী টনি বে-য়ার এবং বলতে গেলে গোটা ক্যাবিনেট এখন আফগান যুদ্ধ, উদ্বাস্তু সমস্যা, ত্রাণকার্য শুরু করা ইত্যাদি নিয়ে সর্বক্ষণ ব্যস্ত । আমিও চেষ্টা করলে যে দু-একদিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ পেতে পারবো, তা নয় । তবু আমি চেষ্টা চালাবো । ঢাকার ব্রিটিশ হাইকমিশনের সঙ্গে আমাদের কথা বলা দরকার । তারপর শুধু আমি নই, আমরা সাবেক ট্রিবিউন গ্রুপের কয়েকজন লেবার দলীয় ব্রিটিশ এমপি একটি যুক্ত বিবৃতি দেবো । সেটি তখন আমাদের নামেই বাংলাদেশেও প্রচার করতে পারবেন । তাছাড়া সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটা আমরা করতে পারি তা হলো ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অবিলম্বে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়টি তুলে ধরা । এই ব্যাপারে সবকিছু আনুষ্ঠানিকভাবে ঠিক হয়ে গেলে আপনাকে জানাবো । আপনার টেলিফোন নম্বরটি হাউস অব কমন্সে আমার সেক্রেটারিকে জানিয়ে রাখবেন ।

আনন্দের আতিশয্যে এই ব্রিটিশ লেবার দলীয় এমপিকে তিনবার ধন্যবাদ জানালাম ।

বললাম, আমি তার কাছ থেকে পজিটিভ কিছু জানার জন্য সাতদিন অপেক্ষা করবো। তারপর আশা করছি বাংলাদেশের কাগজে দেশের জন্য আশাপ্রদ খবর পাঠাতে পারবো। ব্রিটিশ এমপি টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখার আগে বললেন, মি. চৌধুরী, এই একুশ শতকে পৃথিবী একেবারেই বদলে গেছে। অনেক বিপর্যয় ঘটছে। তবু আশা হারাবেন না। এ যুগে তো বর্বর এথনিক ক্লিনসিঙয়ের জন্য মিলোসেভিচকে আন্তর্জাতিক আদালতে ধরে এনে বিচার এবং দণ্ড দেয়া সম্ভব হয়েছে। ঢাকাতেও যদি এই জাতীয় মিলোসেভিচদের অভ্যুদয় ঘটে, তাহলে আজ হোক কাল হোক তাদের কেন বিচার এবং দণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা করা যাবে না?

মনে একটা দারুণ প্রত্যয় নিয়েই টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখেছি। এক বন্ধু জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি যে যুগান্তরে লিখেছেন বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করার চক্রান্ত চলছে, এই চক্রান্ত কতোটা সফল হবে মনে করেন?

বলেছি, এই চক্রান্ত তো অনেকটাই সফল হওয়ার পথে। জামায়াত বিএনপি সরকার তাদের বর্তমান শাসনামলে চক্রান্তটা পুরোপুরি সফল করে যাবে কিনা আমি জানি না।

তাকে দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বর্তমান অবস্থার একটা হিসাব দিলাম। এই হিসাবটাও ঢাকা থেকে পাওয়া। এই হিসাবে বলা হয়েছে; ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যা ক্রমাগত কমছে। '৫১ সালের লোক গণনা অনুযায়ী এই সংখ্যা ছিলো ২৩.১ ভাগ। '৬১ সালে ১৯.৬ ভাগ। '৭৪ সালে ১৪.৬ ভাগ। '৮১ সালে ১৩.৪ ভাগ। '৯১ সালে ১১ ভাগের মতো। অর্থাৎ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যা না বেড়ে ক্রমাগত কমছে। প্রতিদিন গড়ে ৪৭৫ জন হিন্দু দেশত্যাগ করে বলে একটি ব্যক্তিগত জরিপ থেকে জানা যায়। এবারের নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন-উত্তর ঘটনাবলীর পর দেশত্যাগের ঘটনা আরও ব্যাপক। ইতিমধ্যেই কয়েক হাজার চলে গেছেন। আরও অনেকেই যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। মান-সম্মান নিয়ে যারা বাঁচতে চান তারাও যেমন আর দেশে থাকতে চাচ্ছেন না, তেমনি যারা একেবারে নিরুপায় তারাও এখন দেশত্যাগের জন্য একপায়ে খাড়া। জাতিগত সংখ্যালঘুদের অবস্থাও প্রায় একই। পার্বত্য চট্টগ্রামে যেখানে শতকরা ৯৮ ভাগ পাহাড়ি জনগণ ছিলো, সেখানে এখন পাহাড়ি-বাঙালি অনুপাত প্রায় ৫৫ ঃ ৪৫। গারো, হাজং, সাঁওতাল সম্প্রদায় বিলুপ্তির পথে।

সাবেক যুগোস্-াভিয়ার মিলোসেভিচ ও তার বর্বর সার্বিয়ান অনুচররা যা করেছে, বাংলাদেশে নব্য মিলোসেভিচরা এখন তা-ই করে চলেছে। আফগানিস্তানে তালিবানরা সাংস্কৃতিক বর্বরতাও শুরু করেছিলো। আফগান সভ্যতার যে হাজার হাজার বছরের জাতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ বলে সংরক্ষিত বৌদ্ধমূর্তি ও জাদুঘরগুলো ছিলো, সেগুলো তারা ধ্বংস করা শুরু করে। ভারতে একটি বাবরি মসজিদ ভাঙার দোহাই দিয়ে (সেটিও ভারত সরকারের প্রশ্রয়েই হয়েছিলো) সেই এরশাদের আমল থেকে বর্তমান বিএনপি আমল পর্যন্ত বাংলাদেশে কত শত হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে, তার কোনো হিসাব আছে কি? সম্প্রতি লন্ডনের একটি দৈনিকের সাপি-মেন্টে আফগানিস্তানে তালিবানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আগ্রাসনের প্রমাণ হিসেবে হাজার বছরের পুরনো সভ্যতার পীঠস্থানগুলো ভাঙচুরের সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। তা দেখে এক ব্রিটিশ সাংবাদিক বন্ধুকে আমি বলেছি, তোমাদের এখন প্রয়োজন পড়েছে তোমাদেরই সৃষ্ট তালিবানদের অসভ্য ও বর্বর প্রমাণ করা। তাই তোমরা এসব সচিত্র প্রতিবেদন ছাপছো। বাংলাদেশেও কিভাবে শত শত বছরের পুরনো মন্দির ও প্রাচীন যুগের সভ্যতার নিদর্শন, প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ ধ্বংস করা হয়েছে এবং হচ্ছে, তার কোনো খবর নেয়া তোমরা প্রয়োজন মনে করো না। তিনি স্বীকার করলেন, এ সম্পর্কে তারা মোটেই অবহিত নন। বাংলাদেশে নব্য মিলোসেভিচরা যা শুরু করেছে, তাতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং পাহাড়ি উপজাতিগুলোকে দেশ থেকে বিতাড়নের মাধ্যমে 'ইসলামিস্তান' প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। বরং

বর্তমানে আফগানিস্তানের মতোই দেশটি এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। তার সব লক্ষণ এখন একে একে দেখা যাচ্ছে। অনেকের চোখেই তা হয়তো ধরা পড়ছে না। কিন্তু যাদের চোখে ধরা পড়ছে তারা বাংলাদেশ সম্পর্কে গভীর শঙ্কা অনুভব করছেন। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে সাপের হাতেই ওঝার মৃত্যু হয়। যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ক্ষমতায় বসে, সন্ত্রাসের মাধ্যমে ক্ষমতায় থাকতে চায়, শেষ পর্যন্ত সন্ত্রাসের মধ্য দিয়েই ক্ষমতা থেকে তাদের বিদায় নিতে হয়। তারা নিজেরা ধ্বংস হয় এবং সঙ্গে নিজেদের দেশকেও ধ্বংস করে ফেলে। মিলোসেভিচের যুগোস্-াভিয়া এবং তালিবানদের আফগানিস্তান তার প্রমাণ।

সাবেক অখণ্ড ভারতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যখন অবাস্তব এবং মধ্যযুগীয় ধর্মীয় দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগ এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন, তখন তার বন্ধু বিখ্যাত সমাজতন্ত্রী নেতা ইউসুফ মেহের আলী তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন জিন্নাহ, আপনি একজন পাশ্চাত্য-শিক্ষিত আধুনিক জীবনধারার মানুষ। আপনি কি সত্যই ধর্মীয় জাতিতত্ত্বে বিশ্বাস করেন এবং দেশ ভাগ করে একটা অবাস্তব ধর্মীয় স্থান প্রতিষ্ঠা করতে চান?

জিন্নাহ জবাব দিয়েছিলেন, আমি ধর্মীয় জাতিতত্ত্বে বিশ্বাস করি কিনা সে প্রশ্ন এখন থাক। তবে ধর্মীয় রাষ্ট্রে আমি বিশ্বাস করি না এবং ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতেও চাই না। আমি ভারতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই, যেখানে অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুর সমান নাগরিক অধিকার থাকবে।

ইউসুফ মেহের আলী বলেছিলেন, কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ের গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে কোনো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে সেখানে গণতন্ত্র প্রাধান্য পেতে পারে না। আধুনিক গণতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে সে রাষ্ট্র কার্যত হবে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র। আপনি কার্যত পাকিস্তান নামে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন। পরিণামে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র মধ্যযুগীয় ধর্মরাষ্ট্রে পরিণত হয়। পাকিস্তানও কালক্রমে তা-ই হবে।

জিন্নাহ তার সঙ্গে একমত হননি। কিন্তু জিন্নাহ আজ বেঁচে থাকলে পাকিস্তানের পরিণতি দেখে নিজেই হয়তো আত্মহত্যা করতে চাইতেন। পাকিস্তান কালক্রমে শুধু ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়নি, ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। সেই ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের থাবা আজ বাংলাদেশ পর্যন্ত প্রসারিত। পাকিস্তান নামক ফ্যাসিবাদী দেশে তেমন উলে-খযোগ্য সংখ্যক ধর্মীয় সংখ্যালঘু না থাকায় নিজেদের ধর্মমতের মধ্যেই সংখ্যালঘু তৈরি এবং অমুসলিম ঘোষণা করে তাদের ওপর চালানো হচ্ছে অমানুষিক নির্যাতন। পাকিস্তানে আহমদীয়া, কাদিয়ানি এমনকি বাহাই ও শিয়া সম্প্রদায়কে 'অমুসলিম সংখ্যালঘু' সম্প্রদায় ঘোষণা করে তাদের ওপর চালানো হচ্ছে অত্যাচার। সেই '৫০-এর দশকেই জামায়াত নেতা মওলানা মওদুদীর এক ফতোয়াকে ভিত্তি করে লাহোরসহ পাঞ্জাবে কাদিয়ানি বিরোধী যে দাঙ্গা শুরু করা হয়, তাতে ৫০ হাজার নরনারী নিহত হয়েছিলো এবং পাকিস্তানের উচ্চ আদালত এই হত্যাকাণ্ডের জন্য মাওলানা মওদুদীকে অপরাধী সাব্যস্ত করে তাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছিলো। সউদি আরবের বাদশাহর হস্তক্ষেপে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান মওদুদীর প্রাণদণ্ডাদেশ মুওকুফ করেছিলেন।

বাংলাদেশেও এরশাদের শাসনামল থেকে এবং বিএনপি আমলেও পাকিস্তানের অনুকরণে শুরু হয়েছিলো আহমদীয়াদের ওপর নির্যাতন। তাদের মসজিদে অগ্নিসংযোগ, আহমদীয়াদের অমুসলিম ঘোষণার দাবি বাংলাদেশেও সরব হয়ে উঠেছিলো। আওয়ামী লীগের শাসনামলে সরকারের সতর্ক নীতির দরুণ আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলন এবং তাদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা বাড়তে পারেনি। এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের সঙ্গে সঙ্গে কাদিয়ানি, বাহাই, শিয়া প্রভৃতি একেবারেই সংখ্যাল্প সম্প্রদায়গুলোর ওপর যদি

নির্যাতন শুরু হয় তাহলে বিস্মিত হবো না।

বাংলাদেশ এখন মানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হলেও আসলে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র। সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের স্বাভাবিক প্রবণতাই হলো মধ্যযুগীয় ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া। বাংলাদেশ এখন সেই পথেই যাত্রা শুরু করেছে। এই দেশ থেকে ভীতি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিতাড়নের কাজটি শেষ হলেই দেশে সন্ত্রাস সমাপ্ত হবে এ কথা যারা ভাবেন তারা বোকার স্বর্গে বাস করেন। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও পাহাড়িদের দেশছাড়া করা গেলে তখন নিজেদের ধর্মমতের অনুসারীদের মধ্য থেকে নতুন অমুসলিম সংখ্যালঘু তৈরি করা হবে। পাকিস্তানে যেমন তৈরি করা হয়েছে আহমদিয়া ও কাদিয়ানিদের। তারপর শুরু হবে তাদের ওপর নির্যাতন ও মধ্যযুগীয় অত্যাচার।

বাংলাদেশে পাকিস্তানের ঘটনার বা ট্রাজেডির পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে অথবা ঘটতে চলেছে, এই বাস্তবতা সম্পর্কে দেশের দল-মত নির্বিশেষে গণতান্ত্রিক সকল মানুষ যদি সময় থাকতে সচেতন ও সক্রিয় না হয় এবং ঢাকার মিলোসেভিচদের এই রাজনৈতিক নির্যাতন ও সংখ্যালঘু দলনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে না তোলে তাহলে শুধু বর্তমান নয় ভবিষ্যতেও দেশটির ভাগ্যে অনেক দুঃখ ও ভোগান্তি রয়েছে। '৭১-এর ঘাতকদের বিচার ও দণ্ড হয়নি বলেই '৭৫-এ তাদের অভ্যুত্থান এবং ২০০১ সালে তাদের পক্ষে ক্ষমতার অংশীদার হওয়া সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে দেশে যদি কোনো সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী আন্দোলন হয়, সেক্যুলার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার পক্ষে জনজমায়েত গড়ে তোলা সম্ভব হয়, তাহলে তারও লক্ষ্য হওয়া উচিত হবে '৭১, '৭৫ ও ২০০১ সালের ঘাতকদের বিচার ও দণ্ডদানের দাবি তোলা। আন্তর্জাতিক আদালতে মিলোসেভিচের বিচার ও দণ্ডের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। আদালতের কাঠগড়ায় তাদের দাঁড় করানো প্রয়োজন হবে।

যুগান্তর, ১৯ নবেম্বর, ২০০১

চাই অসাম্প্রদায়িক নতুন প্রজন্ম

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

আহমদ ছফা আমার 'কলাম লেখক' পরিচয়টি খুব অপছন্দ করতেন। ছফা ভাই মারা যাওয়ার পর ঠিক করেছিলাম আসলেই এই মোটামুটি অর্থহীন কাজটি আমি ছেড়ে দেবো, কিন্তু নির্বাচনের পর পর আমাদের দেশে যা ঘটছে সেটি দেখে আমার মনে হলো ছফা ভাইয়ের বিদেহী আত্মার বিরাগভাজন হয়ে গেলেও আমি আরো কয়েক দিন লিখি। তার কিছু কারণ আছে। কেউ যখন মারা যায়, তখন তার সব প্রিয়জনেরা একত্র হয়ে কষ্টটা ভাগাভাগি করে নেয়। এই প্রক্রিয়াটিতে নিজেদের ভেতরে এক ধরনের সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়া যায়, ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি পাওয়া যায়। বাংলাদেশের মাটিতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে সম্প্রতি যেসব ঘটনা ঘটেছে, সেটি অনেকটা প্রিয়জনের মৃত্যুর মতো। মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাসের যখন মৃত্যু ঘটে, তার সঙ্গে সত্যিকার মৃত্যুর খুব একটা পার্থক্য নেই। আমার মতো যারা বিশ্বাস করেন বাংলাদেশের মাটিতে কিছুতেই এই ঘটনাগুলো ঘটা উচিত হয়নি, তাদের সঙ্গে মনের দুঃখটা ভাগাভাগি করার জন্য এই লেখা। অন্যের জন্য নয়, আমার নিজের জন্যই লেখা।

২

আমি জানি না আমার ভুল হতে পারে কিন্তু আমার মনে হয়েছে নির্বাচনের পর পর হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের যতো খবর ছাপা হয়েছে সেই তুলনায় লেখালেখি হয়েছে খুব কম। হতে পারে আমি নিজে যে কাগজ পড়ি সেখানে যারা লেখেন তারা লিখছেন না অন্য কাগজে লেখা হয়েছে, সেগুলো আমার চোখে পড়ছে না। তবে সম্ভাবনাও খুব বেশি নয়, কারণ হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছেন যে, খুব বেশি লেখালেখি হয়নি। আমাদের দেশে ডেঙ্গুজ্বর বা গাছকাটা নিয়ে সামজিক আন্দোলন গড়ে তোলা হয় কিন্তু এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটি নিয়ে সামাজিক আন্দোলন দূরে থাকুক-সেরকম লেখালেখিও কেন হয়নি আমি ব্যাপারটির কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না। খবরের কাগজের মানুষেরা শুধু কাগজের কাটতি বাড়ানোর জন্য এসব লিখছে না। আসলেই হিন্দুদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে এটি আমরা সবাই কমবেশি জানি। সত্যি কথা বলতে কী, মাঝখানে একটা সময় গেছে যখন কাগজের পুরো খবরটুকুই ছিল হিন্দুদের ওপর (না হয় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীর ওপর) নির্যাতনের খবর। তারপরেও আমাদের দেশে বুদ্ধিজীবীরা এই ব্যাপারটি নিয়ে বেশি কথা বলেননি, তার কারণটা কী? হতেপারে একেবারে প্রথমেই বিএনপি সরকার এই নির্যাতনের পুরো ব্যাপারটুকু অস্বীকার করে এটাকে একটা রাজনৈতিক অপপ্রচার হিসেবে গ্রহণ করেছে, কাজেই যারা সাধারণত লেখালেখি করেন তারা একটু বিপদে পড়ে গেছেন। কিছু একটা লিখলেই তাকে বিএনপি-বিরোধী এবং সহজ সমীকরণে আওয়ামী লীগপন্থী বলে চিহ্নিত করে ফেলবে বলে দুশ্চিন্তায় ছিলেন। যারা বিবেকবান মানুষ কিন্তু কোনো না কোনভাবে সরকারের ওপর নির্ভর করেন তারা আরো বৃহত্তর কোনো উদ্দেশ্যের জন্য ঝুকি নিতে চাননি, মর্মবেদনাটুকু সহ্য করেছেন। কিংবা এমনও হতে পারে, যারা মনের দিক থেকে আওয়ামী লীগের কাছাকাছি মানুষ, তারা মনের যাতনা সহ্য করে হলেও চুপ করে ছিলেন কারণ তারা হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে, তারা মুখ খুললেই বিএনপি সরকার আরো সহজে রাজনৈতিক অপপ্রচার বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করবে।

সত্যিকারের কারণটি কী আমি জানি না, কিন্তু এ কথাটি কেউ অস্বীকার করতে পারবে না ভয়ঙ্কর একটি অমানবিক ব্যাপার নিয়ে সে রকম লেখালেখি হলো না। তার কারণে এই দেশের অনেক মানুষ মনে খুব কষ্ট পেয়েছে। যে অন্যায়টুকু হয়েছে সেই ব্যাপারটি নয় অন্যায়টিকে যেভাবে মেনে নেয়া হলো সেই ব্যাপারটিই হচ্ছে বড় কষ্ট। আমি নিজেকে এ দেশের একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী হিসেবে কল্পনা করে দেখেছি যে, এরকম পরিবেশে আমার মনে নিশ্চয়ই একটি গভীর অভিমানবোধের জন্ম নিতো।

৩

আমি প্রায় ১৮ বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলাম। এই ১৮ বছরে বাংলাদেশের নামটি সে দেশের পত্রপত্রিকায় আমি ১৮ বারও খুঁজে পেয়েছি কিনা সন্দেহ। কিন্তু যখন তসলিমা নাসরীনকে মুরতাদ ঘোষণা করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের মৌলবাদী সংগঠনগুলো আন্দোলন শুরু করেছিলো তখন সেই খবরটি প্রথমবার বাংলাদেশকে পাশ্চাত্যে পরিচিত করেছিলো। আগে পাশ্চাত্যের লোকজন বাংলাদেশকে চিনতো না দেশের নাম বলার পর অবধারিতভাবে দেশটির পরিচয় বলতে হতো। তসলিমা নাসরীনের ঘটনার পর সবাই বাংলাদেশের পরিচয় জেনে গেলো কিন্তু সেটি ছিলো আমাদের জন্য খুব লজ্জার একটি পরিচয়। আমরা জানি, আমাদের দেশের মানুষ একেবারেই বাড়াবাড়ি পছন্দ করে না সেটা যেদিক দিয়েই হোক। এটাকে কোনোভাবেই মৌলবাদীদের দেশ বলা যায় না, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের কাছে আমাদের দেশের সেই পরিচয়টিই ছাপ মারা হয়ে গেলো। দেশের লাখ লাখ আধুনিক শিক্ষিত রুচিশীল সহনশীল মানুষের এতোদিনের চেষ্টাকে ধুলায় লুটিয়ে অল্প কিছু উগ্র মৌলবাদীর

প্রচেষ্টাই প্রাধান্য পেয়ে গেলো। সবাই জেনে গেলো, বাংলাদেশ হচ্ছে সেই দেশ, যেখানে একজন মহিলা লেখককে নিগৃহীত করা হয় এবং মৌলবাদীদের অত্যাচারে তাকে দেশছাড়া হতে হয়, দেশের সরকার বা মানুষ তাকে রক্ষা করতে পারে না।

এবারেও তা-ই হলো। আমরা জানি, অল্প কিছু দুর্বৃত্ত এই দেশের হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করছে কিন্তু সারা পৃথিবীর সামনে আমাদের সবার মুখে কিন্তু কালিমা লেপে দেয়া হলো। সেই দুর্বৃত্তগুলোকে খুব সহজে খুব শক্ত হাতে দমন করা যেতো কিন্তু সেটি করা হলো না। নির্বাচন কমিশনার বললেন, এটা তো হবেই; তত্ত্বাবধায়ক সরকার বললেন, এটা আমাদের দায়িত্ব না; নবনির্বাচিত বিএনপি সরকার বললেন, এটা হয়নি এবং সারা দেশের বিবেক বলে আমরা আমাদের যে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের দিকে তাকিয়ে থাকি, তিনিও বিশেষ কিছু করলেন না। (অবশ্য এতোদিনে আমরা জেনে গেছি, তিনি কোন ভাষায় কথা বলবেন সে ব্যাপারেও তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না 'বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক' এই চমৎকার বাংলা বাক্যটির বদলে শেষে তাকে বলতে হয় 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ'। কাজেই তার হয়তো আসলেই কিছু করার ক্ষমতা ছিল না।)।

কিন্তু যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। সারা পৃথিবীতে জানাজানি হয়ে গেছে যে, বাংলাদেশ একটি সাম্প্রদায়িক দেশ, এখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই। বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ বিদেশে থাকে এখন অন্যরা যখন তাদের দিকে ঘৃণাভরে তাকায় তখন তারা কোথায় গিয়ে মুখ লুকাবে সেটা কি কেউ ভেবে দেখেছে? বিদেশের সামনে মুখ উজ্জ্বল করার জন্য জোড়াতালি দিয়ে কিছু কাজ করা হয়েছিলো দুর্গাপূজার সময়। হিন্দুরা খুব আনন্দ করে পূজা করছে প্রমাণ করার জন্য রাষ্ট্রদূত বা বিদেশী কূটনীতিক জাতীয় কিছু মানুষকে দেশের কিছু কিছু পূজামণ্ডপে নেয়া হয়েছিলো, সে সব পূজামণ্ডপকে রাতারাতি সাজিয়ে নেয়া হয়েছিল, গেট তৈরি করে মাইক বাজানো শুরু করা হয়েছিলো, প্রশাসনকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো হিন্দুরা যেন আনন্দ করে, সেই ব্যাপারটি নিশ্চিত করার জন্য জোর করে হলেও করতে হবে। হিন্দু সম্প্রদায় আগে শুধু নির্যাতনের বস্তু ছিলো এখন ব্যাপারটি আরো বিকট হয়ে গেলো, দেশের সুনামের স্বার্থে জোর করে হলেও তাদের আনন্দ করতে হবে। কী ভয়াবহ রসিকতা!

৪

সেদিন ঢাকায় একটি মিছিলকে শাহবাগ থেকে প্রেসক্লাবের দিকে যেতে দেখেছিলাম। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে মহিলা পরিষদের বেশ কিছু মহিলা মুখে কাপড় বেঁধে হাতে ফেস্টুন নিয়ে যাচ্ছেন। আমার চোখে পড়লো মিছিলটির পেছনেই একটি দোতলা বিআরটিসি বাস। হঠাৎ করে দেখি বাসের ভেতর থেকে মাথা বের করে একজন কুৎসিত অশ্রাব্য ভাষায় মিছিলের মহিলাদের গালিগালাজ করছেন। ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য নিজের চোখে দেখে বিশ্বাস না করে যাবো কোথায়? ঢাকা শহরের মতো জায়গায় দল বেঁধে মিছিল করে যাওয়া কিছু মহিলার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে দোতলা বাসের উপর থেকে একজন মানুষ কুৎসিত কিছু বাক্য উচ্চারণ করার দুঃসাহস পেয়েছে সেটি কিন্তু উড়িয়ে দেয়ার মতো ঘটনা নয়। মানুষটি জানে সে এমন একটি দেশে বাস করে যেখানে প্রকাশ্যে এরকম ভয়ঙ্কর একটি সাম্প্রদায়িক এবং অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করার জন্য এখন কেউ তাকে কিছু বলবে না। দেশ এমন একটি দিকে মোড় নিয়েছে, যেখানে এই বাক্যটি এখন প্রকাশ্যে বলা যায়, উপস্থিত মানুষেরা এখন প্রতিবাদ করে না।

ঘটনাটি দেখে শিহরিত হয়েছি, বাংলাদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা-রুচি সবকিছুর

কেন্দ্রস্থল ঢাকা শহরে প্রকাশ্যে যদি এরকম একটি ঘটনা ঘটতে পারে, তাহলে দেশের একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কী হচ্ছে কেউ কী কল্পনা করতে পারেন?

আমাদের অনেকের ধারণা দু-চারজন হিন্দুকে খুন করা, তাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া, তাদের সহায়-সম্পত্তি, দোকানপাট লুট করে নেয়া, তাদের মেয়েদের রেপ করাই হচ্ছে একমাত্র সাম্প্রদায়িক নির্যাতন। ভুল, একশ ভাগ ভুল। উপরের ঘটনাগুলো যখন ঘটে তখন সেগুলো জানাজানি হয়। কখনো কখনো সেগুলো খবরের কাগজে চলে আসে। কখনো কখনো পুলিশ হস্তক্ষেপ করে, আইনের সাহায্য নেওয়া হয়। আমরা জানতে পেরে শিহরিত হই, বেশিরভাগ সময়েই কিছু করতে পারি না অক্ষম [illegible]াধে জর্জরিত হই। এই সাম্প্রদায়িক নির্যাতন হচ্ছে প্রকাশ্য এবং স্থূল কিন্তু এর পাশাপাশি আরো একটি নির্যাতন হয় চোখের আড়ালে। সেটি কখনো খবরের কাগজে আসে না। হিন্দু ধর্মের বলে যখন তাদের প্রতি তুচ্ছার্থে একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়, সিঁথিতে সিঁদুর কিংবা শাঁখা দেখে যখন একটা অশালীন উক্তি ছুড়ে দেওয়া হয়, বাংলা নামটি শুনেই যখন ইন্টারভিউ বোর্ডে একজন মানুষের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়া হয় বংশ পরম্পরায় এদেশে থাকার পরেও "ভারতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত" বলে যখন তাদের প্রতিনিয়ত খোটা দেয়া হয়। পারিবারিকভাবে শিখে যখন ছোট একটি শিশু হিন্দু ধর্মাবলম্বী অন্য একটি শিশুর সঙ্গে নিষ্ঠুর একটি ব্যবহার করে বসে, সেগুলোও ঠিক একই রকম ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িকতা। একই রকম নিষ্ঠুর সাম্প্রদায়িকতা। এই সাম্প্রদায়িকতার কথা কেউ প্রকাশ করতে পারে না, কেউ লিখতে পারে না। যারা এর ভুক্তভোগী তারা সেটি নিয়ে কারো কাছে অভিযোগ করতে পারে না, দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেই অপমান এবং যন্ত্রণাটুকু বুকের ভেতর পুষে রাখে। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোনদিন এই সাম্প্রদায়িকতার কথা জানবেন না, এ ব্যাপারে কোনদিন কোনো থানায় জিডি করা হবে না। কোনো খবরের কাগজে কখনোই এই সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে সম্পাদকীয় লেখা হবে না, কখনোই এর জন্য মৌন মিছিল হবে না, অনশন হবে না। যারা ভুক্তভোগী এর ভয়ঙ্কর বিষ শুধু তাদের ভেতরটুকু কুরে কুরে খেতে থাকবে, তাদের ম্রিয়মাণ করে তুলবে, বিষণ্ন করে তুলবে।

৫

আমাকে একটি অনুষ্ঠানে 'কলাম লেখক' হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়ায় আমি খুব অবাক এবং বেশ বিচলিত হয়েছিলাম। ('কলাম লেখক' বললেই আমার সামনে সবজান্তা ছিদ্রান্বেষী এবং নিন্দুক ধরনের একটি মানুষের ছবি ভেসে ওঠে!) আমার মুখে ঘটনাটির কথা শুনে প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান হেসে বলেছিলেন, 'আপনার একটি বই কয় কপি বি[illegible] হয়? বড়জোর কয়েক হাজার। তার পাঠক কয়েক হাজার। কিন্তু একটা পত্রিকা ছাপায় কয়েক লাখ, তার পাঠক আরো কয়েক লাখ। কাজেই আপনার বইয়ের পাঠক থেকে কলামের পাঠক কয়েক শত গুন বেশি। আপনি যতোই আপত্তি করেন কিছু করার নেই সংখ্যার হিসেবে আপনি প্রথমে কলাম লেখক, তারপর বইয়ের লেখক!'

একেবারে অকাট্য যুক্তি এবং সেই যুক্তি ফেলে দেয়ার কোনো উপায় নেই। ছফা ভাইয়ের প্রতি সম্মান দেখিয়ে এসব লেখালেখি বন্ধ করার ইচ্ছে থাকার পরও আমি আবার লিখছি, কারণ মনের কষ্টটি কয়েক লাখ মানুষের সঙ্গে ভাগাভাগি করার এই সুযোগ আমাকে আর কেউ দেবে না। হয়তো যারা আমার লেখাটি পড়ছেন, তাদের কেউ কেউ হঠাৎ করে আমার সঙ্গে একমত হবেন। হয়তো তাদের মাঝে কেউ কেই কম বয়সী, তরুণ হয়তো এই দেশে তাদের ভেতর থেকে একেবারে অসাম্প্রদায়িক একটি নতুন প্রজন্ম বের হয়ে আসবে পৃথিবীর সব মানুষই যে এক সেটা বোঝার জন্য তাদের দেহকোষের [illegible]মোজম সংখ্যা গুনতে হবে না, একজন মানুষের

দিকে তাকালেই তার চেহারা, গায়ের রং, ভাষা, ধর্ম, অর্থবিত্ত সবকিছু উপেক্ষা করে ভেতরের মানুষটিকে দেখতে পাবে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন বর্ণবিদ্বেষী একটি সরকার ছিলো তখন এই সম্পূর্ণ অমানবিক ব্যাপারটির বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে এক ধরনের আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিলো। নেলসন ম্যান্ডেলার লেখা লং ওয়াক টু ফ্রিডম বইটিতে তার খুব হৃদয়গ্রাহী একটি বর্ণনা রয়েছে, সেখানে তারা কোনো মানুষকে বর্ণনা করার জন্য কালার ব-াইন্ড কথাটি ব্যবহার করেছেন। আমরা সবাই জানি 'কালার ব-াইন্ড' শব্দটি মানুষের দেখার এক ধরনের সীমাবদ্ধতাকে বোঝায়, রেটিনার এক ধরনের ক্রটির কারণে তারা কোনো রং দেখতে পারেন না। কিন্তু তৎকালীন দক্ষিণ আফ্রিকাতে এ শব্দটি খুব হেভরে কিছু মানুষের জন্য ব্যবহার করা হতো যারা সত্যি সত্যি একেবারে হৃদয়ের ভেতর থেকে মানুষের গায়ের রঙের বিভাজনটি দেখতে পেতেন না। তাদের কাছে সাদা এবং কালো মানুষের মাঝে কোনো পার্থক্য ছিলো না বলা যেতে পারে, তাদের গায়ের রঙটি যে ভিন্ন সেটি দেখার ক্ষমতাই তাদের ছিলো না। গায়ের রংয়ের পার্থক্যের ব্যাপারে তারা ছিলেন অন্ধ কালার ব-াইন্ড। আমার বড় ভাবতে ইচ্ছে করে আমাদের গায়ের রঙের পার্থক্য নেই, সেজন্য তার প্রয়োজন নেই। কিন্তু অন্য সবদিক দিয়ে তারা হবে অন্ধ! এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে বুঝি দেশে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ধর্মের ব্যাপারে অন্ধ। ধর্মান্ধ বলতে আমরা যা বোঝাই তা নয়, মানুষ যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের সেই পার্থক্যটুকুতে অন্ধ। অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি কোনোরকম মায়া, সমবেদনা বা করুণা নয় একেবারে হৃদয়ের ভেতর থেকে এক ধরনের উপলব্ধি যে, এই পৃথিবীতে সব মানুষের সমান অধিকার- ঘটনা□মে এই দেশে এক ধর্মের মানুষের কম অন্য ধর্মের মানুষ বেশি। কিন্তু সেজন্য কারো অধিকার একবিন্দু বেশি বা কম নয়। নতুন প্রজন্ম বড় হোক সব ধর্মের মানুষের জন্য গভীর ভালোবাসা নিয়ে। ধর্মের, সংস্কৃতির বা আচার-আচরণের বৈচিত্র্যটুকুর প্রতি গভীর কৌতুহল নিয়ে, গভীর শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে।

এখনো কেউ কেউ বলছেন, আমাদের দেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের খবরগুলো অতিরঞ্জিত-আমি তাদের হজরত মুহম্মদ (স.)-এর একটি বাণী স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। (১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর একজন বেদনাহত মুসলমানের লেখায় আমি এটি প্রথমবার দেখেছি, যদিও ঠিক এই কথাটি একটু ভিন্নরূপে নাৎসীদের কবল থেকে অসহায় ইহুদিদের উদ্ধারকারী শিন্ডলারকে নিয়ে তৈরি করা চলচ্চিত্রে ব্যবহার করা হয়েছে)। কথাটি এরকম ঃ একজন নির-পরাধ মানুষকে হত্যা করা সমস্ত মানবজাতিকে হত্যা করার মতো। এই অত্যন্ত মানবিক কথাটির সুর ধরে বলা যায় 'একজন' নিরপরাধ মানুষকে নির্যাতন করা, সহায়-সম্পত্তি লুণ্ঠন করা বা সম্ভ্রমহানি করা সমস্ত মানবজাতিকে নির্যাতন করা, তাদের সহায়-সম্পত্তি লুণ্ঠন করা বা সম্ভ্রমহানি করার মতো। একটি অত্যন্ত অমানবিক ব্যাপার ঘটার জন্য অসংখ্য ঘটনার প্রয়োজন হয় না। একটিও যদি ঘটে থাকে, সেই ঘটনার জন্যও সবাইকে দায়-দায়িত্ব নিতে হয়।

যারা এখনো হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের ব্যাপারটির গুরুত্বটি ধরতে পারছেন না, তাদের কাছে আমার একটি প্রশ্ন তারা কী বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন এই দেশে এরকম একটি ঘটনাও ঘটেনি? যদি ঘটে থাকে, তাহলে আমার প্রশ্ন সেটি কেন ঘটবে? কেন ঘটতে দেয়া হবে?

প্রথম আলো, ২১ নবেম্বর ২০০১

বিপন্ন মানবতা

আয়শা খানম

মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দ যখন ভোলার লালমোহন থানার অন্নদাপ্রসাদ, ফাতেমাবাদ ইত্যাদি গ্রামের লাঞ্ছিত নির্যাতিত বিধ্বস্ত নারী পুরুষের সঙ্গে তাদের চরম লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণার অভিজ্ঞতার ভাগাভাগি করছেন, ঠিক তখনই বাংলাদেশের সদ্য মনোনীত পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিবেশী দেশ ভারতে যাওয়ার কোনো ঘটনাই তার জানা নেই। এর আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মাধ্যমে জানলাম, এসব ঘটনার খবর সংবাদপত্রের অতিরঞ্জন। মন্ত্রী মহোদয়ের উক্তি এবং আমাদের বাস্তব চোখে দেখা, কানে শোনা, প্রায় সব দৈনিকের পাতায় প্রকাশিত ঘটনার মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই। সরকার ও সরকারি প্রতিনিধিরা যেভাবেই বলুন না কেন, নির্বাচনের সময় ও নির্বাচন পরবর্তী সময়ে ভয়াবহ সহিংস বর্বর পাশবিক অত্যাচার-নির্যাতনের এক কলঙ্কজনক, লজ্জাজনক অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাসে।

১ অক্টোবর '০১ বা তারও আগে থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষের ওপর, বিশেষভাবে নারী-শিশুদের ওপর যে নির্যাতন চলেছে তা অভাবনীয় ও অকল্পনীয়।

আজ আমরা প্রায় সকলেই জানি যে, ৭ থেকে ৭০ বছরের নারী শিশুরা সব প্রকার দৈহিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ধর্ষণ, গণধর্ষণ, লুণ্ঠন, ঘরবাড়ি লুট, বিষয়সম্পত্তি আত্মসাৎ সবকিছু হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৩০ বছর পরে যেন একটা নতুন ইতিহাস তৈরি হলো। তবে এই ইতিহাস আমি মনে করি মানবতার লাঞ্ছনার এক ঘৃণ্য ইতিহাস। আজ কতোগুলো গ্রাম, কতোগুলো জনপদ, কতোগুলো নারীর নাম শুনছি— নামগুলো আমি বারবার উচ্চারণ করতে চাই না।

দেশের শাসনতন্ত্রে স্বীকৃত সার্বজনীন নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করেছে বাংলাদেশের নাগরিকরা। তারা তাদের ইচ্ছামতো নির্বাচনে ভোট দিতে চেয়েছে— ভোট দিয়েছে। তার ফলাফল, তার প্রতি□য়া যদি হয় এই ধরনের পাশবিক নির্যাতন, তাহলে আজ প্রশ্ন, বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি কোন লক্ষ্যে, কোন উদ্দেশ্যে আমরা একদিন তৈরি করেছিলাম?

বাংলাদেশ আজ এক গভীর প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। বাংলাদেশের ইতিহাস আজ এই প্রশ্নের কি উত্তর দেবে?

যাদের ওপর এই অত্যাচার তারা কারা? নৃতাত্ত্বিক বিচারে বাঙালি বলে যে জাতি তারই একটি অংশ। ধর্মীয়ভাবে তারা হিন্দু। তাহলে তাদের ওপর যে অত্যাচার, যে নির্যাতন তা কি ১৯৭২ সালে ঘোষিত বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের মৌলনীতি ও ভাবাধারার পরিপন্থী নয়? নাগরিক হিসেবে তারা জীবনের নিরাপত্তা পাচ্ছে না, এটা কি মৌলিক মানবাধিকার বিরোধী কাজ নয়? তাহলে কি বলা যায়, বাংলাদেশ তার নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে? আর নারীরা? কেউ কেউ ইতিমধ্যে বলেছেন, বাংলাদেশে নারী ধর্ষণ অতীতেও হয়েছে। আমি স্বীকার করি অতীতে হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে, হয়তো ভবিষ্যতেও হবে— সেটা অবক্ষয়ী পিতৃতান্ত্রিক শোষণবাদী সংস্কৃতির জের হিসেবে ঘটবে। তবে গত এক-দেড় মাসে নির্দিষ্ট কতোগুলো এলাকা, বাড়িতে, নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ওপর এবং একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কারণে যে বর্বরতা তা চরিত্রগতভাবেই ভিন্ন। রাজনৈতিক প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যম হিসেবে যে নির্যাতন তাকে ভিন্ন দৃষ্টিতেই বিচার করা প্রয়োজন। তার গুণগত পার্থক্য চিহ্নিত করতে হবে। তার ভয়াবহতা ও পাশবিকতা লক্ষণীয়।

বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা, খুলনা, গোপালগঞ্জ, সাতক্ষীরা, নাটোর, নড়াইলসহ প্রায় সারা বাংলাদেশের অনেক এলাকায় নারীদের ওপর যে পাশবিক নির্যাতন হয়েছে, যে গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছে তাদের শরীরে-মনে তার ভয়াবহ জের তারা কতোদিন বয়ে বেড়াবেন তাদের জীবনে! তাদের জীবনের এই ভয়াল অভিজ্ঞতা আমরা কি উপলব্ধি করতে পারি? আমরা কি হলফ করে বলতে পারি, তারা ভবিষ্যতে শারীরিক-মানসিকভাবে সুস্থ-সুখী জীবনযাপন করতে পারবে? নারী নির্যাতন প্রতিরোধের বাস্তব কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, সকল প্রকার স্বাস্থ্যগত, আইনগত, অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়েও এসব ক্ষেত্রে একজন নারীকে সুস্থ-সুখী জীবন ফিরিয়ে দেওয়া বাস্তবে অত্যন্ত কঠিন ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসম্ভব। আর এক্ষেত্রে তো ঘটনার এক মাসের মধ্যেও তাদের অধিকাংশই ভয়ে-লজ্জায়-অপমানে কাউকে বলতেই পারেনি তার সমস্যার কথা। প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যগত সাহায্য তারা অনেকেই পায়নি। কি গভীর মানবিক সমস্যা আমরা তৈরি করেছি আমাদের সমাজে। তবে কেউ হয়তো ভাবতে পারেন ওরাতো হিন্দু। আমি জানি—এরা বাঙালি।

আমার প্রিয় বোন দেবাহুতী চক্রবর্তী আজ গভীর বুকভাঙা দুঃখে-ক্ষোভে-অপমানবোধে প্রশ্ন তুলেছেন, মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার দেশপ্রেম? সেই দেশপ্রেমে কি আজ চিড় ধরবে? আমাদের বাংলাদেশের সচেতন সমাজ, আজ আমরা কি উপলব্ধি করতে পারি জীবনের কোন পরিস্থিতিতে গেলে একজন সচেতন দেশপ্রেমিকের বিশ্বাসের ভিত নড়ে ওঠে? কখন কোন পরিস্থিতিতে নিজ দেশে নিজেকে পরবাসী মনে হয়? এ প্রশ্ন শুধু দেবাহুতির নয়, আমারও।

সাত বছরের শিশুসন্তানের গায়ে বর্বরতার যে ক্ষত তৈরি করা হয়েছে, আমি মনে করি সেই ক্ষত এই শিশুর নয়, সেই ক্ষত বাংলাদেশের চলমান গণতন্ত্রের চরম ব্যর্থতার ছাপ। এর মাধ্যমে উলঙ্গভাবে ফুটে উঠেছে আমাদের দেশের বিকৃত নোংরা রাজনৈতিক নষ্ট সংস্কৃতির চেহারা। বল প্রয়োগের মাধ্যমে পরমত, ভিন্নমত দমনের অসহিষ্ণু বিকৃত রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটেছে এতে। আমরা লজ্জিত দঃখিত অপমানিত ক্ষুব্ধ এবং গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। যাদের যেভাবে এগিয়ে আসা প্রয়োজন ছিলো আমার মনে হয় তারা সেভাবে এগিয়ে আসেননি। একদিকে এমন এক লজ্জাজনক অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে গভীর দুঃখের বিষয় যে, এই ঘটনার সত্যতা সঠিকভাবে স্বীকার করা হচ্ছে না। সরকার-প্রশাসনের যেভাবে যতো দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া দরকার ছিলো তা এখনো নিচ্ছে না। এগিয়ে আসছেন না দেশের অপরাপর রাজনৈতিক দল ও শক্তি। দলমত নির্বিশেষে আজ সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। ভয়াবহ এই বিপর্যয় যারা মোকাবিলা করছে তাদের কাছে যাওয়া, স্বাস্থ্যগত, আইনগত, রাজনৈতিক সকল প্রকার সাহায্য তাদের দেওয়া দরকার। নির্যাতনের শিকার যারা তারা প্রশাসনকে ভয় পাচ্ছেন। এটা কেমন কথা? এটা কেন? প্রশাসন কি তাহলে তার ভূমিকা পালন করছে না? এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমার মতে কিছু ন্যূনতম করণীয় ঃ

১। সরকারকে প্রথমেই খোলা মনে অকপটে স্বীকার করতে হবে যে এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে।

২. পাশবিক এই বর্বরতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে হবে। ৩. প্রশাসনকে, দেরিতে হলেও যথাযথ কার্যকর ভূমিকা নিতে সরকারি সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকতে হবে। ৪. প্রশাসনকে স্বাধীন দেশের প্রশাসন হিসেবে সামাজিক ও মানবিক দায়িত্ববোধে এগিয়ে আসতে হবে। ৫. সরকারি দল, বিরোধী দল, অন্যান্য রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন, আপামর দেশবাসী সকলকে সামাজিক-মানবিক দায়বোধ থেকে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। ৬. ক্ষতিগ্রস্ত দের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা সরকারি ও বেসরকারিভাবে করতে হবে। ৭. দোষী ব্যক্তিদের যথাযথভাবে চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। ৮. অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার

নরনারীর মনে আস্থা ও জীবনের নিরাপত্তাবোধ ফিরিয়ে আনার সর্বাত্মক ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের সবধরনের সহায়তার উদ্যোগ নিতে হবে। এ কাজে সচেতন নাগরিক সমাজকে আরো এগিয়ে আসতে হবে। ৯. স্বাস্থ্যগত ও আইনগত দিকেও অনেক করণীয় রয়েছে যাতে তেমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে তা ভাবাও হয়নি। যেমন ধর্ষিতার স্বাস্থ্যগত দিক, মন, পরিবেশ, পরিবেশের নাজুকতা ইত্যাদি। বাস্তব জীবন অনেক রূঢ় ও কঠিন। সুতরাং কালবিলম্ব না করে আক্রান্ত প্রতিটি পরিবারের অভিভাবকদের আমি অনুরোধ করবো যতোদ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া। যার পক্ষে যতোটুকু সম্ভব, কেউ পাশে না দাঁড়ালেও এই বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যেও আমি অনুরোধ করবো আপনারা উদ্যোগী হবেন। ১০. আইনি সাহায্যের ক্ষেত্রে প্রথমেই যা দরকার তা হলো স্থানীয় প্রশাসনের সামাজিক দায়বদ্ধ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি।

প্রশাসনের কাছে অনুরোধ ও দাবি, আপনাদের কাছে অভিযোগ এলে তা গ্রহণ করবেন। কোনো নারী তার নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে এলে প্রচলিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর অধীনে তা নেবেন। পরাধীন দেশের প্রশাসনের মতো আচরণ করবেন না। ইতিমধ্যে বেশ কিছু অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছে। কোথাও কোথাও প্রশাসন মামলা নিচ্ছে না, নিলেও সঠিক ধারায় নিচ্ছে না।

এই প্রসঙ্গে বলা একান্ত জরুরি যে, প্রচলিত ধর্ষণ আইনের সংস্কার ও পরিবর্তন দরকার। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, বাংলাদেশের কোনো নারী কোনো সত্য কারণ ছাড়া জনসমক্ষে ঘোষণা করবে না যে, সে ধর্ষিতা হয়েছে, কারণ এটা কোনো গৌরবের বিষয় নয়। বিষয়টি সীমাহীন লজ্জা ও গভীর অপমানের। ইতিমধ্যে কেউ কেউ কোনো কোনো নারী ও মানবাধিকার সংগঠন এগিয়ে এসেছে। আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই সংবাদপত্রের সাংবাদিক ভাইবোনদের, যাদের সচেতন সক্রিয় প্রতিবাদী ভূমিকার ফলে সম্ভব হয়েছে এই ঘটনার তথ্য জানা, সরেজমিন যাওয়া এবং সামান্যতম হলেও প্রতিরোধ গড়ে তোলা। তবে আমাদের প্রয়োজনীয় আরো ধারাবাহিক কাজ বাকি রয়েছে। এসব কাজের মূল লক্ষ্য— যা হয়েছে তার প্রতিকার, প্রতিরোধ ও সুষ্ঠু সমাধান যতোটুকু সম্ভব, এবং প্রচার ও জনমত গঠন যাতে ভবিষ্যতে এমন বিকৃত রুচি ও মানসিকতার উদয় সমাজে না ঘটতে পারে।

বাংলাদেশ আজ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য, অনেক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কর্মসূচির দলিল ও ঘোষণায় স্বাক্ষরকারী, অনুমোদনদানকারী দেশ। সেখানে বিশেষ নির্ধারিত সংখ্যায় সাময়িক রিপোর্ট পাঠাতে হবে। বাংলাদেশে নারীর মর্যাদার বিষয়ক দলিল সিডও (CEDAW) কমিটিতে বেইজিং কর্মপরিকল্পনার ১০ বছর পূর্তি সম্মেলনে আগামীতে কি রিপোর্ট পাঠাবেন? মানবাধিকার কমিশনে, মেরি রবিনসনের কমিশনের কমিশনে কি রিপোর্ট দেবেন? বলা হবে বাংলাদেশে নাগরিকের অধিকার, মৌলিক মানবাধিকার অক্ষুণ্ন আছে? নারীর মর্যাদা ও সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হয়নি?

এ প্রশ্ন আজ আমাদের নিজেদের বিবেকের কাছে রাখা উচিত। যা ঘটেছে তাতে কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর নরনারীর অপমান হয়নি, অবমাননা হয়েছে মনুষ্যত্ববোধের, অপমান হয়েছে মানবতাবাদের। আমরা একটি সভ্য সমাজের ভিত কতোটুকু তৈরি করতে পেরেছি এই মৌল প্রশ্নের সমাধান আজ সমগ্র বাঙালি জাতির জন্য জরুরি।

রাজিহার ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য শেফালী সরকারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমিও বলতে চাই, সমাজের, দেশের সব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানবতাবাদী গণতন্ত্রমনা প্রগতিবাদী মানুষ এক হোন। বাঙালি জাতির বিবেক জাগ্রত হোক। মানবতার উত্থান হোক আমাদের রাজনীতি ও সমাজনীতিতে।

আদলতের কাঠগড়ায় শৃঙ্খলিত মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িকতা

মুনতাসীর মামুন

আসামী পক্ষের আইনজীবীরা বললেন, তিনি রাষ্ট্রীয় সম্পদ। সরকার পক্ষের পুলিশ ইন্সপেক্টরও বললেন, তিনি রাষ্ট্রীয় সম্পদ। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সম্পদ শাহরিয়ার কবিরের হাতে তখন হাতকড়া, পুলিশবেষ্টিত অবস্থায় কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। পৃথিবীর একমাত্র সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশেই ঘটনাটি ঘটেছে গত পরশু। এতে বোঝা যায়, বাংলাদেশের শাসকরা রাষ্ট্রীয় সম্পদকে কিভাবে দেখেন।

শাহরিয়ার কবির দীর্ঘ ত্রিশ বছর সংগ্রাম করে আসছেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে, অসাম্প্রদায়িকতার পক্ষে। তাঁর সাংবাদিকতা, লেখালেখি, ডকুমেন্টারি, সাংগঠনিক কাজকর্ম-সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দুই ছিল এ দু'টি বিষয়। রাজনীতিকরা তাঁকে পছন্দ করতেন না কিন্তু ব্যবহার করতে চাইতেন এবং যেহেতু তিনি আবেগী, ব্যবহৃতও হয়েছেন। ভদ্র সংস্কৃতি কর্মীরাও তাঁকে এড়িয়ে চলতেন। কারণ তাঁর কর্মে কোনো আপোস ছিল না।

বিএনপি ১৯৯১ সালে তাঁকে চাকুরিচ্যুত করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করায়, আজ এক দশকেও তিনি আর কোথাও চাকরি পাননি। কারণ পত্রিকা মালিকরাও তাঁর সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। বেকার জীবন চলেছে, চিত্রকলা সংগ্রহ বি করে, লেখালেখির টাকায়। কিন্তু কাঁধ থেকে নামাতে পারেননি মুক্তিযুদ্ধ এবং অসাম্প্রদায়িকতা। দেশের রাজাকার বা যুদ্ধাপরাধী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক তিনি। মানবতাবাদ বিরোধীর বিপক্ষে আপোসহীন যোদ্ধা। তিনি শাসক, ভীরু মধ্যবিত্তের পছন্দের নয়। কিন্তু বাংলাদেশে তিনিই এক ধরনের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ও অসাম্প্রদায়িকতার। বিশেষ করে বর্তমান নির্বাচনের পর সেই শাহরিয়ার কবিরকে হাতকড়া পরা অবস্থায় কাঠগড়ায় থাকার অর্থ মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িকতাকে হাতকড়া পরিয়ে আদালতে হাজির করা। এ দৃশ্য দেখে আদালত কক্ষে অনেকের চোখ ভরে উঠেছিল পানিতে, 'শেম শেম' ধ্বনি উঠেছিল আদালত কক্ষেই। এমনকি সারা আদালতে পুলিশদেরও দেখেছিলাম ম্-নমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে, যে পুলিশকে মানুষ এখন সবচেয়ে অপছন্দ করে।

বিএনপির একটি অবসেশন হলো রাষ্ট্রদ্রোহী খোঁজা। এর কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না। কারণ বিএনপির স্রষ্টা ক্ষমতায় এসেছিলেন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে, যা রাষ্ট্রদ্রোহিতা। বিএনপির নেতৃত্বের একটি বড় অংশ ছিল মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী। সমাজে নিজেদের চেহারা ঢাকতে তাদের সব সময় দরকার হয়ে পড়ে রাষ্ট্রদ্রোহী খোঁজা। ১৯৯২ সালে বিএনপি ২৪ জন শিল্পী-সাহিত্যিককে আদালতে দাঁড় করায় রাষ্ট্রদ্রোহী মামলায়। এবারও ক্ষমতায় গিয়ে তারা খুঁজে পেয়েছে একজন রাষ্ট্রদ্রোহীকে। উলে-খ্য, তারা কোনো ঋণখেলাপী মাস্তান, রাজনীতিবিদদের মাঝে রাষ্ট্রদ্রোহী খুঁজে পায়নি, খুঁজে পেয়েছে শুধু লেখক শিল্পীদের মাঝে। আগেও এবং এখনও।

শাহরিয়ারকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৫৪ ধারায়। এ ধারায় সাধারণত সন্দেহজনক গতিবিধির মানুষজনকে ধরা হয়। পুলিশ সাধারণ পতিতা, দালাল, ভবঘুরে এ ধারায় ধরে। যেমন সীমা চৌধুরীকে ধরা হয়েছিল এবং পরে চট্টগ্রাম জেলে যাকে মেরে ফেলা হয়। শাহ-রিয়ারকেও অনেকের ধারণা গুম করে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল কিন্তু তরুণ সাংবাদিকরা তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতে থাকলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। থানার অভিযোগে বলা হয়েছে,

শাহরিয়ার "বাহিরে অবস্থান করিয়া বাংলাদেশে নির্বাচনোত্তর কিছু সহিংস-ঘটনা স্থিরচিত্র কতিপয় সংখ্যালঘু লোককে প্ররোচিত করিয়া কথিত সহিংস ঘটনার ব্যাখ্যা তৈরি পূর্বক জনগণের বিভ্রান্তি ক্ষোভ সৃষ্টি করার লক্ষ্যেও" কিছু ভিডিও ধারণ করে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন যা "বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টসহ আইনশৃঙ্খলার পরিপন্থী ও রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর এবং তিনি এই ক্ষতিকর" কাজে লিপ্ত রহিয়াছেন। তাহার এই বিভ্রান্তিকর ধারণকৃত ছবি ও বক্তব্য প্রচারিত হইলে সমাজে মাত্মক আইন-শৃঙ্খলা অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।" তাঁকে ১৯৭৪ সালের বিশেষ আইনে আটকেরও আবেদন জানানো হয়েছে। এই তৃতীয় শ্রেণীর বাংলায় লেখা আবেদনের মূল বিষয় হলো—শাহরিয়ার কলকাতায় গেছেন। বাংলাদেশ থেকে সমস্ত নির্যাতিত হিন্দু চলে গেছে সেখানে তাদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছেন এবং তা নিয়ে এসেছেন। এতে রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হতে পারে। জনগণের মাঝে ক্ষোভ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে, রাষ্ট্রের পক্ষে তিনি ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত অর্থাৎ রাষ্ট্রদ্রোহী। এখানে লক্ষণীয়, এর কোনো কিছুই প্রদর্শিত হয়নি এবং একজন সাংবাদিকের মৌলিক অধিকার হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ।

প্রথম কথা লতিফ-মুয়িদের আমল থেকে হিন্দু ও আওয়ামী নির্যাতন শুরু হয়েছিল কিনা? তাদের সেই প্রকল্প বিএনপি-জামায়াত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কার্যকর করেছে। লতিফুর এখন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় যমুনার আর মুয়িদ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ব্র্যাকের প্রধান নির্বাহী। এখন প্রশ্ন নির্বাচনের পর বিএনপি-জামায়াতরা হিন্দু শূন্য ও আওয়ামী শূন্য করার জন্য আমণ্ডক কার্যকলাপ গ্রহণ করেছিল কিনা? এ সরকার যদি বলে তা করেনি, তাহলে বাংলাদেশের সমস্ত খবরের কাগজ (ইনকিলাব ও দিনকাল বাদে) মিথ্যা সংবাদ প্রচার করছে। হাসিনাকণ্ঠ বলে পরিচিত কাগজগুলোর কথা বাদ দিলাম কিন্তু মাহফুজ আনাম, মতিউর রহমান ও গোলাম সারোয়ার সম্পাদিত কাগজেও তো ছিটেফোঁটা এসব খবর এসেছে। তাহলে তারা কি সমাজে বিশৃঙ্খলা ছড়াচ্ছেন। বিবিসি নিত্য এ সংবাদ প্রচার করছে। শেখ হাসিনা চিৎকার করে বলছেন। বীর আলতাফ চৌধুরী তাদের গ্রেফতার করছেন না কেন? কারণ এদের পিছনে আছে রাজনৈতিক শক্তি, সামরিক-বেসামরিক আমলা, বড় কোম্পানি, ঋণখেলাপী। শাহরিয়ারের পিছে তেমন কোনো শক্তি নেই।

সমাজে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে বা ছড়াচ্ছে কে? আলতাফ চৌধুরী প্রথম থেকে হিন্দু নির্যাতন, আওয়ামী নির্যাতনকে উপেক্ষা করে প্রকৃত অবস্থা খাটো করে দেখিয়েছেন ও দেশে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন। পূর্ণিমার কাহিনী যদি বানোয়াট হয় যা বলেছেন এতদিন বিএনপি নেতৃবৃন্দ তাহলে আজ কেন পূর্ণিমা ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে? মান্নান ভূঁইয়া ৯টি ঘটনার ২টি স্বীকার করে কেন সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন? দেখা যায়, নির্বাচনোত্তর কালে সমাজে আলতাফ চৌধুরী, মান্নান ভূঁইয়া, বিএনপি নেতৃত্বরা বিভ্রান্তি ছড়িয়েছেন। তাঁরা রাষ্ট্রদ্রোহিতার পর্যায়ে পড়েন না, পড়ে শাহরিয়ার। আজ (২৬ নবেম্বর) 'প্রথম আলো'য় ছাপা হয়েছে বাংলাদেশে নির্যাতিত হিন্দু পরিবারের কলকাতায় আশ্রয়ের কাহিনী। এই কাহিনীটি শাহরিয়ার হয়ত ভিডিও বন্দি করেছেন। তো আলতাফ চৌধুরী বা গোয়েন্দা সংস্থার কোমরে জোর আছে মতিউর রহমানকে হাতকড়া বেঁধে আদালতে হাজির করার?

সমাজে সহিংস আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটিয়েছে এবং ঘটাচ্ছে কারা। সহিংসার মাস্টার প-্যান শুরু হয়েছে লতিফুর-মুয়িদের আমল থেকে। তাদের কাঠগড়ায় আনা হবে না কেন? প্রেসিডেন্ট বদরুদ্দোজা চৌধুরী অশালীন ভাষায় সাবাস বাংলাদেশ প্রচার করে সমাজে সহিংসতার বীজ কী ছড়াননি যাতে অনুপ্রাণিত হয়ে বিএনপি ক্যাডাররা বাংলাদেশে ত্রাসের রাজত্ব ঘটিয়েছে। জামায়াত ক্যাডাররা অধ্যক্ষ মুহুরীকে হত্যা করে, আড়াইহাজারে পুলিশ

ডাকাতি করে। মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী তালামিস্ত্রী ও পুলিশ নিয়ে সংসদ দখল করে। বেগম জিয়া ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকে শৌচাগার থেকে সংসদ ভবনের কক্ষ সব দখল হয়ে যায়, চাঁদাবাজিতে অনেকে গৃহহারা, নির্যাতনে কাতর-এগুলো কি অপরাধের কোটায় পড়ে না। শাহরিয়ার কোনো কিছু দখল করেননি, স্মাগলিংয়ে যুক্ত নন-তিনি সমাজে বিশৃঙ্খলা ছড়াচ্ছেন আর অন্যরা ভালোবাসা বিলাচ্ছে? কই গোয়েন্দা সংস্থা বা আলতাফ চৌধুরীর তো সাহস হয় না তাদের বিরুদ্ধে কথা কলার। প্রতিদিন ইনকিলাবের মিথ্যা, হ্যাঁ, মিথ্যা প্রচার করে মুসলমানদের মধ্যে হিংসাদ্বেষ সৃষ্টি করছে। আলবদর পরিচালিত এই পত্রিকাটি তো মঈন খান বন্ধ করেননা। পুরো দেশটাকে হাওয়া ভবন যদি ভাবেন আর ভাবেন সব মানুষ হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে তাহলে তো মুশকিল।

আসলে মূল বিষয় অন্য। পত্রিকায় দেখেছি, অনেকে অনুমাণ করছেন কারও চাপে পড়ে কলকাতার বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনার শাহরিয়ারের বিরুদ্ধে রিপোর্ট পাঠান। ভারত এখন বাংলাদেশের হিন্দুদের হরিজন মনে করে। এতদিনে ভারত পেয়েছে একটি সরকারকে যে তার হুকুমে চলবে এবং চিরশত্রু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করবে। সে জন্য গ্যাস বিক্রির অছিলায় দেশ বিক্রি তো আছেই, হুকুমও তামিল করতে হয়। এ রকম চললে উপমহাদেশে বিএনপি-জামায়াত বাংলাদেশকে ভারতের সেবাদাসীতে পরিণত করবে সন্দেহ নেই। শাহরিয়ার সেখানে হিন্দু নির্যাতনের কথা বলবেন এটি এখন আর ভারতীয়দের পক্ষে মানা সম্ভব নয়। এখানে মানবিকতার প্রশ্ন গৌণ। অন্য বিষয়গুলো আদালতেই তুলে ধরেছে শাহরিয়ারের আইনজীবীরা।

১. "রাজাকার আলবদররা রাষ্ট্রক্ষমতায় বসেছে বলেই মুক্তিযোদ্ধদের অপমানিত করা হচ্ছে।"

২. "একাত্তরের ১৪ ডিসেম্বর দেশকে ধ্বংস করার জন্য রাজাকার আলবদরেরা যেভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল সেই নীলনক্সায় আবারও বুদ্ধিজীবীদের হত্যার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।"

৩. শাহরিয়ার মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তাই "রাজাকার আলবদররা তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে শাহরিয়ারকে আটক" করেছে।

৪. আদালতে জাতীয় জীবনে লাথির ভূমিকা তুলে ধরা হয়। বলা হয়, এই এজলাসেই লাথি মেরে দরজা প্রায় ভেঙ্গে ঢোকা হয়েছিল যাতে আসামীদের জামিন দেয়া হয় এবং দেয়া হয়েছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রেও লাথির ভূমিকা আমাদের অজানা নয়। লতিফুরের দরজায় বিএনপি অ্যাকটিভিস্টরা লাথি মেরেছিল, প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীনকে অপমান করেছিল, জুতা ছুড়েছিল, এমএ সাঈদকেও পদাঘাত করা হয়েছিল। যার ফলে তারা সবাই জামায়াত-বিএনপির পক্ষে কাজ করেছেন বলে রটনা রয়েছে।

৫. আদালতে এও বলা হয়, ১৯৯২ সালে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় জামিন হয়েছে। হাইকোর্ট হিন্দুদের নির্যাতনের প্রশ্নে রুলনিশি জারি করেছে। সুতরাং হিন্দু নির্যাতন হয়েছে তা বাস্তব ও সত্য ঘটনা। সেটি যদি কেউ তুলে ধরে [যা ব্যাপকভাবে তুলে ধরছে পত্র-পত্রিকায়] তাহলে তা রাষ্ট্রদ্রেহিতা হবে কেন?

আদালতে গতকাল বিচারের সময়ই আইনজীবীরা ও সাধারণ দর্শকরা বলেছিলেন, শাহরিয়ারকে জামিন দেয়া হবে না। মামলার কোনো বিষয়বস্তু নেই প্রতীয়মান হওয়ার পরও জামিন হয়নি। তার মানে সবার কাছে সরকারের ইচ্ছা স্পষ্ট যে সরকার প্রতিশোধ গ্রহণে ইচ্ছুক। এক তরুণ আমাকে বলছিলেন, স্যার মন খারাপ নাকি আপনাদের? রাজাকারদের দেশে তো এ রকম হবেই। না, আমার মন খারাপও না, দেশটাকে পুরোপুরি রাজাকারের দেশও আমি ভাবি না।

একজন আইনজীবী বলছিলেন, "১৯৯৭ সালে জানুয়ারি মাসে এই আদালতে বঙ্গবন্ধুর খুনীদের হাজির করা হয়েছিল। তখনও তাদের তাজকড়া পরানো ছিল না। আজ দেশের বিশিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহরিয়ার কবিরকে আদালতে হাতকড়া পরিয়ে হাজির করা হয়েছে। এ লজ্জা গোটা জাতির।" হায়, ইতিহাস পড়লে তিনি জানতেন, এ জাতির চোখের চামড়া নেই। থাকলে এ জাতির সরকার পরিণত হতো না ধর্ষণকারী ও মানবতাবিরোধী সরকার হিসাবে যে কারণে এদের পরম মিত্র বুশ প্রশাসন ও বাজপেয়ীও এখন কুণ্ঠিত। যেখানে নিজেদের কেউ ধর্ষিত না হলে মন্ত্রীরা বোঝেন না ধর্ষণ কি, সন্ত্রাস কি, যেখানে সরকারি দলের রাজনৈতিক এজেন্ডা জাতি শুদ্ধি ও রাজনৈতিক শুদ্ধি, সে জাতির আবার লজ্জা কি।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৭.১১.২০০১

সংখ্যালঘু নির্যাতন ঃ দায় কার

সালাম আজাদ

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরদিন থেকেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের হিন্দুদের ওপর হামলা নির্যাতন, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি শুরু হয়েছে। আজ পর্যন্ত সহস্রাধিক নারী ধর্ষিত হয়েছে। ধর্ষিতাদের মধ্যে ৭ বছরের শিশু থেকে ৬৫ বছরের বৃদ্ধাও রয়েছে। প্রায় ৩০ হাজার হিন্দু নাগরিককে তাদের বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। গত ৫ ডিসেম্বর অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের ওপর রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। প্রিপ ট্রাস্ট নামে একটি বেসরকারি সংস্থার রিপোর্ট, প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সচিব কমিটি গঠন এবং সর্বোপরি প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সংসদে দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের স্বীকারোক্তি প্রমাণ করে দেশে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন হয়েছে। যদিও সরকার তা স্বীকার করছে না। সচিব কমিটির রিপোর্টেও তা স্বীকার করা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী যদিও স্বীকার করেছেন, কিন্তু দায় চাপিয়েছেন আওয়ামী লীগের ওপর। আইন ও সালিশ কেন্দ্র হাইকোর্টে যে রিট দাখিল করেছিল তার সঙ্গে নির্যাতনের ৩৫৭টি ঘটনার তালিকা দিয়েছিল। সেই তালিকা ধরে স্থানীয় প্রশাসন ও চারদলীয় ঐক্যজোটের নেতাকর্মীরা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে বলে খবর এসেছে। এই ৩৫৭টি পরিবারের কাছ থেকে যেকোনোভাবে স্বীকারোক্তি নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে যেন তারা বলে যে তাদের ওপর নির্যাতনের কথা যেভাবে বলা হয়েছে, লেখা হয়েছে তা সত্য নয়। এই লিখিত স্বীকারোক্তি আগামী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে হাইকোর্টে জমা দেওয়ার জন্য তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। কারণ হাইকোর্ট ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সরকারকে সময় দিয়েছে। নির্যাতিতদের ওপর নতুন করে এই যে খড়্গ নেমে এলো তা কি কাটা ঘায়ে লবণ ছিঁটানোর মতো অত্যাচার নয়? তবে আশার কথা, কিছু কিছু স্থানীয় ব্যক্তি, আইনজীবী এবং জাতীয় পর্যায়ের কিছু বেসরকারি সংস্থা নির্যাতিতদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। যাতে কোনো চাপের মুখে নির্যাতিতদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করতে না পারে প্রশাসন কিংবা চারদলীয় ঐক্যজোটের নেতাকর্মীরা। এ উদ্যোগ প্রশংসনীয়। কিন্তু বাস্তবে তা কতোটা কার্যকর হবে এ নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

সারা দেশে হিন্দুদের ওপর যে নির্যাতন হয়েছে তার একটি মোটামুটি তালিকা এখানে তুলে ধরা হলো সেপ্টেম্বর ৩০ তারিখে বিএনপি এবং তার শরিকরা খুলনার দামুড়হুদা, ফুলতলা, তেরখাদা ও রূপসার হিন্দুদের ভয়ভীতি দেখিয়েছে। হামলাও করেছে। এ সংক্রান্ত খবর ছাপা

হয়েছে ১ অক্টোবরের আজকের কাগজে। বরিশালের বানারীপাড়া, কুষ্টিয়ার খোকসা, চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি-রাউজান, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর, মনিরামপুর, মোড়দহ, ভোলার চরপাতা, কুমিল-ার বরুড়া। হিন্দুদের ওপর নির্যাতন ভয়ভীতির খবর ছাপা হয়েছে জনকণ্ঠ, প্রথম আলো, আজকের কাগজ পত্রিকায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্তোষ কুমার সাহাকে ইসলামী ছাত্র শিবির শারীরিকভাবে নির্যাতন করেছে। ২ অক্টোবরের ডেইলি স্টার, আজকের কাগজ, সংবাদ, জনকণ্ঠ দেশে হিন্দু নির্যাতনকারীদের রাজনৈতিক পরিচয় দেওয়া হয়েছে বিএনপি ও তার শরিক দলের স্থানীয় নেতাকর্মী হিসেবে। ৩ অক্টোবরের প্রথম আলো ও আজকের কাগজ পটুয়াখালী, পিরোজপুর, ভোলার যে হিন্দু নির্যাতনের খবর ছেপেছে, তার নির্যাতনকারীদের পরিচয় বিএনপি ও জামাতের স্থানীয় নেতা কর্মী। ৪ অক্টোবরের ভোরের কাগজ, আজকের কাগজ, প্রথম আলো, ডেইলি স্টার যশোর, চট্টগ্রাম, নরসিংদী, কক্সবাজার, ভোলা, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকার হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের যে খবর প্রকাশ করেছে তাতে নির্যাতনকারীদের রাজনৈতিক পরিচয় দেওয়া হয়েছে চারদলীয় ঐক্যজোটের স্থানীয় নেতাকর্মী। ৫ থেকে ১০ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন পত্রিকায় হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের ১১৬টি খবর ছেপেছে ভোরের কাগজ, আজকের কাগজ, ইত্তেফাক, জনকণ্ঠ, সংবাদ ও ডেইলি স্টার। এসব নির্যাতনকারী সবাই চারদলীয় ঐক্যজোটের স্থানীয় নেতাকর্মী বলে কাগজগুলো লিখেছে। ১১ অক্টোবর থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত উলি-খিত কাগজগুলো লিখেছে চারদলীয় ঐক্যজোটের নেতাকর্মীরা সারা দেশে ৯৭টি নির্যাতনের ঘটনা ঘটিয়েছে। পরের ৫দিন সারা দেশে ৭টি নির্যাতনের খবর ছেপেছে উক্ত পত্রিকাগুলো। হিন্দুদের ওপর যারা এই সব নির্যাতন করেছে তারা সকলেই চারদলীয় জোটের নেতাকর্মী। অক্টোবরের শেষ ১১ দিন ৮৪টি নির্যাতনের খবর ছেপেছে উলি-খিত জাতীয় দৈনিকসমূহ। খবর অনুযায়ী নির্যাতনকারীদের সকলেই বিএনপি ও শরিক দলসমূহের সদস্য।

নবেম্বর ১ থেকে ১৬ তারিখ পযন্ত ১৩৪টি নির্যাতনের খবর ছেপেছে ভোরের কাগজ, আজকের কাগজ, সংবাদ, জনকণ্ঠ ও ডেইলি স্টার। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দুদের ওপর এই নির্যাতনের ঘটনা ঘটিয়েছে বিএনপি-জামাত ও তাদের শরিক অপর দুটি দল। এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে বিএনপি ও জামাতের স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

১ মাস ১৬ দিনের যে ২ তালিকা উপরে দেওয়া হলো তাতে কি প্রমাণিত হয় এর দায় বিএনপি ও তার শরিকদের। কিন্তু কি অবলীলায় দায় আওয়ামী লীগের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হলো।

ভোরের কাগজ, ৯ ডিসেম্বর ২০০১

সংখ্যালঘু পীড়নযজ্ঞ কি এবার আর থামবে না?

বিনোদ দাশগুপ্ত

এবারের সংখ্যালঘু তথা হিন্দুবিরোধী সাম্প্রদায়িক অভিযান শুরু হয়েছে অনেকদিন। ১ অক্টোবর অষ্টম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের বেশ আগে অর্থাৎ ঐ নির্বাচনী প্রচারণা শুরুর লগ্ন থেকেই প্রায় এই সাম্প্রদায়িক অভিযানের সূত্রপাত। নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে নতুন সরকারের প্রশাসনও চলছে বেশ পূর্ণোদ্যমে। কিন্তু থামছে না সংখ্যালঘু নির্যাতন। এক এক জায়গায় এক এক রূপে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। চাঁদাবজি, দোকান বা বাড়িঘরে লুটপাট, বসতবাটি ও অন্যান্য সম্পত্তি জবরদখল এবং ঘরের বৌ-ঝির ওপর পাশবিক ধর্ষণ ইত্যাদি কোনটাই বাকি থাকছে না। বাকি থাকবে কি করে? সেগুলোই তো এ দেশবাসীকে ভাল করে শেখানোর চেষ্টা হয়েছে পাকিস্তানের জন্ম প্রস্তুতি আরম্ভের পর থেকে। হ্যাঁ, এদেশের বেশ কিছু মানুষ অবশ্য পাকিস্তানীদের সেই মৌলিক শিক্ষার শিকল ছিঁড়ে বের হয়ে গিয়েছিল এবং এদেশের বুকে ধর্মনিরপেক্ষতা (অসাম্প্রদায়িকতা), জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ইত্যাদি চার মূল স্ত স্তকে গ্রহণ করে দেশ শাসন প্র্রিয়াও শুরু করে দিয়েছিল।

কিন্তু পাকিস্তানপন্থী তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যারা এই যুদ্ধের বিরোধিতা করে সরাসরি পাকিস্তানের পক্ষে যোগ দিয়েছিল তাদের শক্তি ও চ্রান্তের ক্ষমতা যে কত বেশি তা প্রমাণ করতে সময় লাগেনি বেশি। স্বাধীনতার চার বছর পূর্ণ না হতেই তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষমতার মঞ্চেও এসে যায়। এবার তো বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় বলে পরিচিত যে জোটটি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা (দুই-তৃতীয়াংশ) নিয়ে ক্ষমতাসীন হয়েছে তাদের মধ্যে তিনটিকেই মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এর পাশাপাশি দেশের সব নাগরিকই জানেন যে নির্বাচন প্রচারণাকালেই অনেক সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী বা তাঁদের পক্ষে প্রচারণাকারী সংখ্যালঘুদের প্রত্যক্ষ হুমকি দেয় যে জোটকে ভোট না দিলে (অর্থাৎ বিশেষ একটি দলকে- যেটাকে সংখ্যালঘুদের ভোটব্যাংক বলে ধরা হয়) তাদের সোজা ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

যাদের বিরুদ্ধে এরূপ হুমকি দেয়া হয়েছিল তাদের অনেকেই আজ নির্বাচন পরবর্তী এই অত্যল্পকালের মধ্যে ঐ ভারতেই পাড়ি জমাতে বাধ্য হয়েছে (স্বেচ্ছায় বা আনন্দে যায়নি), যেখানে বিগত প্রায় ৫৪/৫৫ বছর ধরে এ দেশের সংখ্যালঘুরা বারে বারে ছুটে গেছে শেষ আশ্রয় হিসাবে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন এবং বাংলা ও বাঙালি হন্তা পাকিস্তানীরা বাংলার নরম পলিমাটিতে সাম্প্রদায়িকতার এমন বিষাক্ত ফলা ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে যে মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সম্মিলিত মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ত বা আত্মদানে ধৌত হয়ে স্বাধীন হওয়ার পরও মাত্র অল্পকালের ব্যবধানে দেশটি আবার খুব জোরালো গতিতেই পাকিস্তানী দীক্ষার দিকেই ছুটে গেল। বহুদিনের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাওয়া চেতনার মতো সাম্প্রদায়িক সব লালসা বা বীভৎসতাগুলো নিজেদের প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে গেছে যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক গণ্ডিতে এদ্দিন হয়ত বিভিন্ন কঠোর পরিস্থিতির কারণে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি, তাও দেশজুড়ে বৃহত্তর সুযোগের ছত্রচ্ছায়া পেয়ে মাথা ঝেড়ে লাফিয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ চট্টগ্রাম ফটিকছড়ি কলেজের অধ্যক্ষ হত্যার কথা ধরা যায়। খবর-বার্তা ও আলোচনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মনে হয়, হত্যাকারীদের তরফে খতমের তালিকায় তার নামও সংযোজিত রয়েছে বেশ কিছুদিন পূর্ব থেকেই। সুযোগের জন্য তো অপেক্ষা করতেই হয়। এখন যাদের খুনি বলে সন্দেহ করা হচ্ছে তা যদি সঠিক হয় তবে তাদের তো একটা রাজনৈতিক পরিচয়ও আছে। সেদিক

থেকে তাদের দল ক্ষমতাসীন জোটভুক্ত দল হিসাবে সরকারেরও অংশীদার। কাজেই অধ্যক্ষ হত্যার ব্যাপারে সন্দেহভাজনরা যদি জোটভুক্ত উলি-খিত দলটির সাথে সত্যি সংশি-ষ্ট হয়ে থাকে তবে তাদের জন্য অধ্যক্ষ হত্যার স্থান ও সময় নির্বাচনে কিছু ভুল হয়েছে বলা যাবে না। যথার্থ অপরাধী শেষপর্যন্ত সঠিকভাবে চিহ্নিত হওয়া অথবা অপরাধীর ন্যায্য সাজা হওয়া-না হওয়া সম্পর্কে কারও কিছু ধারণা করাও সম্ভব নয়। ওটা বড় জটিল ও দুরূহ ব্যাপার।

কিন্তু আমার প্রশ্ন ভিন্ন। বিশেষ কোন কেস-এর সুষ্ঠু ও সঠিক বিচার হলো কি হলো না সেটা অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো- সামগ্রিক একটি জাতীয় সমস্যা চিহ্নিতকরণ বা দূরীকরণের ব্যাপারে কদ্দুর কি হলো।

আমাদের বিবেচনায় সাম্প্রদায়িকতাই এই মুহূর্তে দেশের সামনে বিরাট এক জাতীয় সমস্যা আকারে দেখা দিয়েছে। সাধারণ মানুষের স্থূলদৃষ্টিতে ধরা না পড়লেও এর অদৃশ্য আঘাত সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবনে যে কীভাবে লাগছে সেটা খতিয়ে দেখার মানসিকতাটাই যেন আমরা ক্রমে হারিয়ে ফেলছি। আমরা হাজার বছর ধরে সমাজে ভ্রাতৃপ্রতিম সহৃদয়তা নিয়ে পাশাপাশি বসবাস করছিলাম। এমনকি ১৯৪৭ সালে আমাদের উপমহাদেশের বুকের মাঝখান দিয়ে নৃশংস ছুরি চালিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা একে ভৌগোলিকভাবেই যখন সীমানাতেই সীমিত থাকেনি। সীমান্তে দুই দিকের দেশেই সব সম্প্রদায়ের মানুষের দেহে এবং অন্তরে যে আর্তনাদপূর্ণ ক্রন্দনের রোল শুরু হয়েছিল, স্তিমিত হয়ে পড়লেও যে রোল এত বছর পরেও আসলে কোনদিন থামেনি, স্বাধীন বাংলাদেশও তা সম্পূর্ণ থামাতে পারেনি। বরং মাঝে মধ্যেই তা উদ্যত শিরে দাঁড়াতে চেয়েছে।

কিন্তু এবার যেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাপূর্বকালীন ভ্রাতৃঘাতী হিংস্র চেতনার কালো সাপগুলো একসাথে গর্ত থেকে লাফিয়ে বের হয়ে এসেছে সাম্প্রদায়িক জিঘাংসা মেটাবার জন্য।

এতে সামাজিক শান্তি ও সৌন্দর্য তো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে এবং যাচ্ছেও। সমাজের সহজাত উৎপাদনমুখিনতা তথা অর্থনীতিও যে ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য সে হুলিয়াটি অবশ্যই ইতোমধ্যে এসে যাওয়া উচিত ছিল অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকে।

কিন্তু এখনও সেরূপ কোন হুঁশিয়ারি এসেছে বলে আমার জানা নেই (এমন কোন হুঁশিয়ার এসে গেলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী)। ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে আমাদের ঐতিহ্যবাহী প্রচলিত সমাজে সাধারণ সক্ষম মানুষেরা প্রত্যেকেই এক একজন সক্রিয় কর্মী (অর্থাৎ উৎপাদনমুখী কর্মে নিয়োজিত)। ওকালতি, ডাক্তারী দর্জিগিরি প্রভৃতি ছোট পেশাদারী, উঁচু-নিচু চাকরি, ছোট-মাঝারি বা কুটির শিল্প থেকে দোকানিরা পর্যন্ত প্রত্যেকেই অর্থোপার্জনমূলক কিছু না কিছু করে। বর্তমান সাম্প্রদায়িক উৎপাতে কত অসংখ্য লোকের কি পরিমাণ নিয়মিত আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে গেছে সেটা জানার প্রয়োজন কেবল সংশি-ষ্ট নিরীহ ব্যক্তিদের দুর্ভোগ চিত্র জানার জন্য নয়, এতে যে আমাদের মোট জাতীয় আয়ের গায়ে গিয়েও আঘাত লাগছে। হয়ত মাত্র এক বেলা খাওয়া যে দরিদ্রতম জেলেটি তার ভাঙ্গা নৌকাটি ও বহু-দীর্ণ পুরনো জালটির সাহায্যে নদী-নালা থেকে সারা দিনের শ্রমে সামান্য কিছু মাছ ধরে এনে তা পানির দরে ব্যাপারীর হাতে তুলে দিয়ে রাতে অন্তত দুটো ভাত পেটে দেয়ার জন্য ক'টা চাল কিনে নিয়ে যায় সেও যদি ঘরে গিয়ে দেখে যে তার মাথা গোজার ঘর বা পাড়াটি পুড়িয়ে বা অন্যভাবে ছারখার করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের জোয়ান বউ ও মেয়েদের ধরে নিয়ে ধর্ষণ করা হয়েছে তাতে বাংলাদেশের কোন সমাজ, অর্থনীতি বা সংস্কৃতির কিভাবে কোন সুফল আসতে পারে- আমরা জানি না। লুটতন্ত্রের সাহায্যে বিশেষ কিছু স্বার্থবাজ চক্রের ব্যক্তি পর্যায়ে কিছু অর্থ সম্পদ লাভ হতে পারে। কিন্তু জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এতে কোন সুফল আসার তো প্রশ্ন নেই। বরং নৈতিক, রাজনৈতিক ও মানবিক দায় হিসাবে ঝামেলা এবং আর্থিক ব্যয় বেড়ে যায়।

দেশে অশান্তি ও অস্থিরতা বজায় রেখে সেই ঘোলা পানিতে আর্থ-রাজনৈতিক সুবিধা (মাছ) শিকার করাই যাদের প্রধান লক্ষ্য, ধর্মকে মানুষের অন্তরের উৎকর্ষতা সাধন ও সমগ্র মানব কল্যাণে নিয়োজিত করার বদলে যারা ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে একে (ধর্ম) রাজনৈতিক ফায়দা লুণ্ঠনের কাজে লাগায় তারা ছাড়া আর কারো সাম্প্রদায়িক সংঘাতকে এভাবে দীর্ঘস্থায়ী টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে কোন স্বার্থ থাকতে পারে না।

এতে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে সেটাও আমার বিবেচনায় খুব বড় ব্যাপার নয়। ভাবমূর্তি নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো লোকও হয়ত খুব বেশি নেই দেশে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস এই যে দীর্ঘস্থায়ী সাম্প্রদায়িক উৎপাত ও উত্তেজনা দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের অন্যতম এক প্রধান কারণ। 'এই ধারণাটি নির্ভুল' এমন দাবি করার শক্তি সাহস বা ধৃষ্টতা আমার নেই। কিন্তু আমি মনে করি, সাম্প্রদায়িক সমস্যাটি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এ দেশের বহু পুরনো এক রাজনৈতিক রোগ। সমাজ দেহের বহু রোগেরই কারণ এবং তা প্রতিকারের পথনির্দেশনার দায়িত্ব অর্থনীতিবিদদের। অথচ আমাদের অর্থনীতিবিদরা এ সম্পর্কে গুরুত্বসহকারে বিশেষ কিছু বলতে চেয়েছেন কিনা আমার জানা নেই। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সিনিয়র শিক্ষক ড. আবুল বারাকাতের নেতৃত্বে তাঁর সহযোগী অন্যান্য শিক্ষকের সহায়তায় "শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তির" ওপর আন্তরিক গবেষণা সংবলিত যে প্রশংসনীয় বড় কাজটি হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার ওপরও সেরূপ গভীর গবেষণাধর্মী একটা গ্রন্থের দরকার আছে। এই কাজটির জন্যও হয়ত কোন রাজনৈতিক উৎসাহ-উদ্দীপনা কিংবা প্রেরণা পাওয়া যাবে না কোন মহল থেকে। আর যাকে বলে প্যাট্রনাইজেশন তা পাওয়ার চিন্তা সুদূরপরাহত। সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে সত্য কথা বলারও প্রয়োজন নেই বলে মনে করেন এখানে অনেকে। কেউ কেউ তো তা ঝুঁকিপূর্ণ বলেই মনে করেন। কাজেই এ থেকে ফায়দালোটাই যাদের প্রধান কাজ তাদের পোয়াবারো হবেই, আর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ফায়দা লোটাই হলো দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধান কাজ। জনগণকে সাম্প্রদায়িকতার বাষ্পে আচ্ছন্ন রেখে সংখ্যাগুরু-লঘু সকলের ওপর নির্বিচারে শোষণ চালিয়ে যাওয়া ডান প্রতিক্রিয়াশীলদের জন্য এ কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু অর্থনীতিবিদদের কাছে তাঁদের স্বদলীয় চিন্তার (যদি সেরূপ কিছু থাকে) উর্ধ্বে উঠে জাতীয় স্বার্থ চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়ে এ সম্পর্কে কিছু পক্ষপাতহীন সত্য উপস্থাপনের আশা করা যায়। এ ক্ষেত্রে বিদেশীদের (অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ নামের পরামর্শদাতা) কাছ থেকেও বিশেষ কোন সহায়তা লাভের আশা ভ্রমাত্মক। বিশ্বব্যাংক বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সুপারিশে পাঠানো এসব বিশেষজ্ঞকে যতই উচ্চমূল্যের সুবিধা দেয়া হোক না কেন ওরা মুখ্যত পশ্চিমাদাতাদের স্বার্থের কাজটি সম্পন্ন করেই চলে যায়। অধিকন্তু ঐ পরামর্শ দাতারা দেশে আরও নতুন নতুন সমস্যার জট পাকিয়ে দিয়ে যায়। পৃথিবীর একটি দেশও আজ পর্যন্ত জি-৭ নামক শীর্ষোন্নত পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ-পাহাড়ার প্রধান নির্বাহী বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের নির্দেশিত বটিকা সেবনে দারিদ্র্যমুক্তিতে সফল হয়েছে বলে শোনা যায়নি। বরং বিভিন্ন বিশ্বসংস্থার হিসাবেও দেখা যাচ্ছে যে ক্রমে দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যাওয়া লোকের মোট সংখ্যা ও হার দেশে দেশে এবং সামগ্রিকভাবে পৃথিবী জুড়ে বেড়েই চলেছে। সেই সঙ্গে বিভি-ন্ন ধরনের সাম্প্রদায়িক সংঘাতও নব নব রূপে আত্মপ্রকাশ করে চলেছে বিশেষত বিভিন্ন পশ্চাৎপদ দেশে। এগুলো যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ এবং দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের মিলিত চক্রান্তের পরিণতি তা বর্তমানে সাধারণ জনসমাজেরও মোটামুটি জানা। কিন্তু তারা এখনও দৃঢ়ভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে এটা প্রতিরোধ করার মতো সচেতনতা অর্জন করতে পারেনি। এই অবস্থার মধ্যেই প্রোথিত রয়েছে দেশে দেশে প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষমতায় টিকে থাকার মূল খুঁটি।

বিচিত্রমুখী সাম্প্রদায়িকতার এই খুঁটি উৎপাটন করে ফেলতে পারার মধ্যেই দেশের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক মুক্তির চাবি অনেকটা নিহিত রয়েছে। সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী প্রকৃত বামপন্থী এবং পক্ষপাতিত্ব বর্জিত অর্থনীতিবিদরা এই চাবি উদ্ধারে যথেষ্ট সহায়তা করতে পারেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪ ডিসেম্বর ২০০১

সন্ত্রাসীদের হাত থেকে উত্তরহাট শহর কালীপূজার মেলাও রেহাই পায়নি

ভানু ভূষণ চক্রবর্তী

শত বছরেরও অধিককাল ধরে জয়পুরহাট জেলার উত্তর হাটশহর গ্রামে জাঁকজমকপূর্ণভাবে কালীপূজা উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। এ উপলক্ষে প্রতিবছরই সেখানে কালীর নামে দেবোত্তর ষাট শতাংশ এবং তারই সেবাইতদের আশপাশের জমির ওপর একটি ধর্মীয় মেলা বসে। গ্রামের এই মেলাটি অনুষ্ঠান করতে জেলা প্রশাসনের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। পূজা কমিটি/সেবাইতগণের মধ্য থেকে একজন প্রতিবছর মেলা অনুষ্ঠানের অনুমতিপত্র নিয়ে গ্রামবাসী সকল হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে মেলা পরিচালনা করে থাকে। এবারও তার ব্যতি□ম হয়নি। পূজা ও মেলা অনুষ্ঠানের সকল আনুষ্ঠানিকতা প্রায় সম্পন্ন, এমন সময় গত ১২-১১-২০০১ বাগড়া বাধায় স্থানীয় ক্ষেতলাল থানা ও বড়তারা ইউনিয়ন বিএনপির চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা। তারা দাবি করে মেলায় জুয়ার আসর বসাবে, এতে রাজি না হলে মেলা করতে দেয়া হবে না। ধর্মীয় একটি মেলা এবং এর ঐতিহ্যের দিকে তাকিয়ে পূজা কমিটি তাদের অযৌক্তিক এ প্রস্তাবে রাজি হয়নি। এতে তারা ক্ষিপ্ত এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে। পূজা কমিটি স্থানীয় বিএনপির উর্ধ্বতন নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারাও জানান যে, জুয়া বসাতে না দিলে মেলার আয়ের অর্ধেকভাগ তাদের দিতে হবে, টাকার পরিমাণ হিসেবে তারা ৫০ হাজার টাকা দাবি করে। এসব প্রস্তাবে পূজা কমিটি রাজি না হওয়ায় তারা ভীষণ ক্ষিপ্ত ও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। প্রায়শ হুমকি প্রদর্শন করতে থাকে এবং বলতে থাকে যেকোনোভাবে হোক তারা মেলা প্রতিহত করবে।

এবার কালীপূজা হয়েছে গত ১৪ নবেম্বর। প্রতিবছরই পূজার একদিন পর থেকে মেলা শুরু হয়। অনুমোদন নেয়ার প্র□িয়া শুরু হয় পূজার এক সপ্তাহপূর্ব থেকে। অনুমতিপত্র নেয়ার প্র□িয়া হলো প্রথমত জেলা প্রশাসক বরাবর দরখাস্ত করতে হয়। তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য এডিসিকে প্রেরণ করেন। এরপর এনডিসি জেলা প্রশাসকের পক্ষে পুলিশ সুপার টিএনও-র কাছ থেকে স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতির ওপর রিপোর্ট ও সুপারিশপত্র চেয়ে চিঠি পাঠান। স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ সুপারের এসবি শাখার প্রেরিত রিপোর্টের ওপর সন্তুষ্ট হলে তখনই দরখাস্ত কারীর দরখাস্ত বিবেচনা করে জেলা প্রশাসক অনুমতিপত্র ইস্যু করেন। সে মতোই জেলা প্রশাসন ১৫ নবেম্বর ১০ দিনব্যাপী মেলা অনুষ্ঠানের অনুমতি দেন। এটা সন্ত্রাসীরা জানতে পেরে গোপনে অন্য ফন্দি আঁটতে থাকে। থানা ও জেলা প্রশাসনে তারা প্রভাব খাটাতে থাকে এবং রমজান মাসে মেলায় খোলা দোকানে মিষ্টি বি□ ও কাঠের আসবাবপত্রের ওপর অস্বাভাবিক হারে জমা তোলা হচ্ছে মর্মে নিজেদের মনগড়া অযৌক্তিক, অগ্রহণযোগ্য কারণ উপস্থান করে জেলা প্রশাসনকে প্রভাবিত করে এবং ডিসি কর্তৃক দেয় ১০ দিনের অনুমোদন সংশোধন করিয়ে ৮ দিনে কমিয়ে আনে। পূজা কমিটি এতেও ভীতসন্ত্রস্ত হয়নি। কারণ ১০ দিনের জায়গাতে ৮ দিনের মেলা হলেও

কোন ক্ষতি হবে না। এই ভেবে পূজা কমিটি মেলা চালাতে থাকে। এদিকে সন্ত্রাসীরা তাদের সন্ত্রাসের জাল আরো বিস্তৃত করতে থাকে এবং পরিকল্পিতভাবে মেলায় আ□মণ চালাবে বলে পুরো প্রস্তুতি নিতে থাকে।

১৯ নবেম্বর সকাল ১১টায় লিয়াকত বাহিনী আকস্মিক মেলায় এসে চাঁদা দাবি করে টোল আদায় বন্ধ করতে হুমকি প্রদান করে এবং মেলা পরিচালনা করার কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে। পূজা কমিটির সদস্যদের বলে মেলাতে টোল আদায়ের আইনত অধিকার কমিটির নেই তাই তারা এটা বন্ধ করবে। সন্ত্রাসীদের এই উত্তপ্ত কথাবার্তার এক পর্যায়ে পূজা কমিটির একজন প্রবীণ ব্যক্তি বাধা দেন। এতে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে মারপিট শুরু করে। এই খবরটি মুহূর্তের মধ্যে মেলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং কমিটিসহ মেলার উপস্থিত জনগণ সন্ত্রাসীদের ধরে গণপিটুনি দেয়। দু'জন সন্ত্রাসীকে স্থানীয় স্কুল ঘরে আটক করে রাখে। অন্যান্য সন্ত্রাসী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

দুপুর ২.৩০ মিনিটের দিকে পুনরায় সন্ত্রাসীরা শক্তি বৃদ্ধি করে সংঘবদ্ধভাবে সশস্ত্র অবস্থায় মেলায় প্রবেশ করে। ইতোমধ্যে থানা প্রশাসন খবর পেয়ে মেলায় উপস্থিত হয়। ইউএনও এবং ওসি এসময় উপস্থিত থাকলেও সন্ত্রাসীদের রুদ্র মূর্তি ও তাণ্ডবলীলার কাছে শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। তাদের উপস্থিতিতেই সন্ত্রাসীরা পূজা/মেলা কমিটির লোকজনদের আ□মণ চালিয়ে এলোপাতাড়ি মারপিট করে এবং একপর্যায়ে ঠাকুরবাড়ির কয়েকজনকে অস্ত্র নিয়ে ধাওয়া করে। তারা আত্মরক্ষার জন্য বাড়িতে দৌড়ে পৌঁছে অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচে। ঠাকুরবাড়ি আ□মণ করে ভাঙচুর করে এবং বাড়ির ভেতরে আত্মরক্ষাকারীদের বের করে তাদের হাতে তুলে দিতে বলে। বাড়ির লোকজন তাদের কথায় সাড়া না দিলে বাড়িতে উপস্থিত নারীদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। যাওয়ার সময় তারা হুমকি দেয় এখন দিনের বেলা বেঁচে গেলেও রাতে বাঁচতে দেবে না। ঘরে পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেবে। সন্ত্রাসীরা যখন পূজা কমিটি ও মেলা পরিচালনা কমিটির লোকজনদের আ□মণ করে তখন অনেকে দৌড়ে নিজ নিজ বাড়িতে আশ্রয় নেয়। তারা বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করে তাদের বাড়িতে ভাঙচুর করে সকলকে ধরার জন্য কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। ফিরে যাওয়ার সময় সকলকে প্রাণনাশের হুমকি দেয় এবং থানা সদর ও ক্ষেতলাল শিড়ট্টি রোডে হাটশহর গ্রামবাসীর যাতায়াতের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তারা নিজের হাতে এদের বিচার করবে। প্রশাসনের কাছ থেকে তারা তাদের মনঃপুত আশ্বাস না পেয়ে ১৯-১১-০১ সন্ধ্যায় ক্ষেতলাল থানায় পূজা/মেলা কমিটির ১৬ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করে।

এরপর সন্ত্রাসীরা রাত ১২টায় ঠাকুরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় যখন গ্রামে আর দশজনের মতো ওই বাড়ির লোকজনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। মেলার এক দোকানি আ. রশিদ রাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ওঠে দেখে ঠাকুর বাড়িতে আগুন জ্বলছে। সে তাৎক্ষণিক চিৎকার করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মেলায় উপস্থিত নাইট গার্ড, চৌকিদার ও টহল পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে গ্রামবাসীর সহায়তায় আগুন নিভিয়ে ফেলে। এতে ওই বাড়ির লোকজন অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যায়।

১৯ নবেম্বর বিকেল থেকেই তারা মেলার সর্বময় কর্তৃত্ব জোরপূর্বক দখল করে নেয় এবং প্রতিদিন সন্ত্রাসীরা এলাকায়, রাস্তায়, মেলায় এবং থানা প্রশাসনে মহড়া দিতে থাকে। চেষ্টা করে কোথাও কাউকে পেলেই হয়, যা করার করবে। ঘটনার পর পুলিশি গ্রেফতার এবং সন্ত্রাসীদের হামলার আশংকায় গ্রামটি পুরুষশূন্য হয়ে পড়ে। ভীতসন্ত্রস্ত গোটা উত্তর হাটশহর গ্রামের সকল পুরুষ মানুষ ঘরছাড়া হয়েছে। সন্ত্রাসীদের অপকর্মের বিরুদ্ধে থানায় জিডি করতেও কেউ যেতে পারেনি।

সন্ত্রাসীরা তাড়াহুড়ো করে থানায় মামলা করে। কারণ তারা এটা দিয়ে নিজেদের দোষ পূজা/মেলা কমিটির ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছে। সন্ত্রাসীরা রাস্তাঘাট থানা প্রশাসন দখল রেখেছিল কারণ তারা ভেবেছিল এতে পূজা কমিটি তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন মামলা করার সুযোগ পাবে না।

স্থানীয় বড়তারা ইউপি'র চেয়ারম্যান মো. আবদুল বারিক মণ্ডলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং বিশেষ সহায়তায় পূজা কমিটির প্রবীণ সদস্য রমণী ভূষণ চ⃞বর্তী জয়পুরহাট জেলা সদরে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট জয়পুরহাট 'খ' অঞ্চলের কোর্টে সন্ত্রাসী ১৮ জনের নাম উলে-খ করে একটি মামলা গত ২৪-১১-০১ দায়ের করেন। এই মামলা দায়ের করার কথা শুনে সন্ত্রাসীরা বাদী রমণী ভূষণ চ⃞বর্তীকে হত্যা করবে বলে হুমকি দিতে থাকে।

এক সপ্তাহে সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব

মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে তারা মেলায় জুয়া বসানো ও চাঁদা দাবি করে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালনা করে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে ফেলে।

আলামপুর ইউনিয়নের একটি গুচ্ছগ্রামের লিজ নেয়া দুস্থ পরিবারের পুকুর থেকে জোর করে ৪০ মণ মাছ তুলে বি⃞ করে এবং এ ব্যাপারে থানা প্রশাসনকে যেন জানানো না হয় এই বলে হুমকি প্রদর্শন করে।

মেলার মধ্যে এক বাড়ি থেকে কলেজ ছাত্রীকে হাইজ্যাক করে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

চাঁদাবাজি ও বাড়িতে অগ্নিসংযোগের মতো গর্হিত কাজের বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মামলা করায় বাদি রমণী ভূষণ চ⃞বর্তীকে তুলে নিয়ে যাবে এবং প্রাণে মেরে ফেলবে বলে হুমকি দেয়।

সাব-রেজিস্ট্রি অফিস থেকে দলিল অনুযায়ী চাঁদা দাবি করে।

টিএনও অফিসে অন্য কাউকে কোন লিজ/টেন্ডারের অংশগ্রহণ করতে বাধা দেয়।

টিএনও এবং ওসি ক্ষেতলালকে বান্দরবান/খাগড়াছড়িতে বদলি করবে বলে হুমকি প্রদর্শন করে। মেলার ঘটনায় তাদের স্বার্থে কাজ না করার জন্য তাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজও করে।

উলে-খ্য, ওসি ক্ষেতলাল আগের দিন ১৮ নবেম্বর চৌকিদার দ্বারা ভানু ভূষণ চ⃞বর্তী এবং পূজা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুকমল চ⃞বর্তীকে মেলা অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিস্থিতির অগ্রগতি জানার জন্য ডেকে পাঠান। সকাল ১১টায় পূজা কমিটির ওই দুইজন সদস্য থানার ওসির রুমে তার সঙ্গে আলাপরত ছিলেন ৫নং আসামি মাঠে ধান কাটা মজুরের সঙ্গে সহযোগিতা করছিল। গোলজার রহমান জয়পুরহাট কলেজে এইচএসসি পরীক্ষার ফরম ফিলাপের কাজে কলেজে উপস্থিত ছিল। নূর আলম (প্রাক্তন ইউপি মেম্বার) পার্শ্ববর্তী ঘোরশাল গ্রামের সালিশে ব্যস্ত ছিল। নুর ইসলাম অন্যের বাড়িতে দিনমজুর হিসেবে মাঠে ধান কাটার কাজ করছিল। আনিসুর রহমান স্থানীয় গণমঙ্গল মোড়ে নিজস্ব ওষুধের দোকানে বসেছিল। সোহাগ মণ্ডল দিনমজুর, প্রসন্ন বর্মন ছাত্র/বাড়ির কাজে সহযোগী, বাবলা শাহ ছাত্র, ছানা মিয়া ছাত্র, ভারত বর্মন দিনমজুর, তারা চন্দ্র বসাক-কৃষক, বিপুল কুমার বেকার, সুকুমার শীল বেকার, রবিন শীল ঘরামী।

ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে গত ২৪ নবেম্বর ১৮ জনের বিরুদ্ধে পূজা কমিটির তরফ থেকে মামলা করা হয়েছে। তাদের ১২ জনের নাম ও পরিচয় পাওয়া গেছে। তারা হলো ঃ লিয়াকত আলী, থানা বিএনপির সভাপতি; রানু, ইউনিয়ন বিএনপি সাধারণ সম্পাদক; নুরুজ্জামান, থানা যুবদলের সভাপতি; আ. হামিদ, থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক; চপল উকিল, যুবদলের সাধারণ সম্পাদক এবং বিএনপি সমর্থক নজরুল, রাকু, পুতুল, সাজ্জাদুল মেম্বার, জাহেদুল ইসলাম, পলাশ, আলমগীর হোসেন।

সংবাদ, ২৬ ডিসেম্বর ২০০১

মানবতার কাছে আমাদের অপরাধ

ইমতিয়ার শামীম

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে এবারকার সংখ্যালঘু নির্যাতনের শুরু। ওই সময় একবার বিবিসির প্রতিনিধি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এক বিজ্ঞ উপদেষ্টার সাক্ষাতকার নিয়েছিলেন। তাকে বলেছিলেন, 'সংখ্যালঘুদের তো ভয় দেখানো হচ্ছে।' উত্তরে বিজ্ঞ উপদেষ্টা বলেছিলেন, 'ভয় না পেলেই হয়।'

সংখ্যালঘুরা ভয় না পাওয়ার চেষ্টা করেছে। তার প্রতিফল এই যে, ৪০ লাখ সংখ্যালঘু কমবেশি নির্যাতিত হয়েছে এবার। চারদলীয় জোট সরকার গঠনের পর শুরু হয় মূল তাণ্ডব। সেই তাণ্ডব এত ভয়াবহ যে মানিকগঞ্জের ঘিওরের কুসুন্ডা মাঝিপাড়ার পরেশ হালদারের স্ত্রী ছবি রাণী হালদারকে তুলে নেয়ার কথা বলার সাহস জুটেছে সেখানকার শরীফ রাজাকারের। অথচ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে শুরু করে কয়েক মাস আগেও ঘিওরে চেহারা দেখা যেত না এই শরীফ রাজাকারের।

শরীফ কাদেরের চেয়ে অনেক বড় যুদ্ধাপরাধী গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী। সাতই নবেম্বর তাদের 'জাতীয় বিপ-ব ও সংহতি দিবসে' রাউজানের মুন্সীরঘাটা এলাকায় সে সমাবেশে ঘোষণা দেয়, 'রাউজানের সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তা দেয়া সম্ভব নয়, তবে মুসলমানরা দরজা খুলে ঘুমাতে পারবে।' এর পরেই রাউজান আর মীরসরাইয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন তীব্র হয়ে ওঠে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসব ঘটনাকে চাপা দেয়ার চেষ্টা করেন 'মুরগিচুরির' ঘটনা বলে। উল্কাগতিসম্পন্ন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এ জাতীয় মন্তব্যের কয়েকদিনের মধ্যেই নৃশংসভাবে নিহত হন শিবির ক্যাডারদের গুলিতে কলেজ অধ্যক্ষ মুহুরী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তখন বলেছিলেন, 'তাকে বিশেষ মর্যাদায় দাফন' করার কথা। এর পর বোধ করি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অবস্থা এই সরকারের শাসনামলে কেমন হবে তা আর লেখার অপেক্ষা রাখে না।

আক্রান্ত জেলাসমূহ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার (২০০১) ও পরবর্তী সময়ে চারদলীয় জোট গঠিত সরকারের আমলে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ সবচেয়ে নির্যাতিত নিপীড়িত হয়েছেন ভোলা, বাগেরহাট ও বরিশাল জেলাতে। নির্যাতনের সোপান⃞মে দ্বিতীয় সারিতে রয়েছে চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, রাজশাহী ও পটুয়াখালী জেলা। তৃতীয় সারিতে রয়েছে নাটোর, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, ফেনী, ঝিনাইদহ, লালমনিরহাট, গোপালগঞ্জ ও মেহেরপুর জেলা। এ ছাড়া অন্যান্য জেলাতেও কমবেশি সংখ্যালঘু নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে।

গৃহহীন সংখ্যালঘু

নির্বাচনপূর্ব ও নির্বাচনোত্তর সময়ে (২০০১) বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় তিন হাজার হিন্দু নাগরিককে গৃহহীন করা হয়েছে। ঘরছাড়া এই নাগরিকরা সন্ত্রস্ত জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছেন। নওগাঁর ২০০, পাবনার ৪০০, সিরাজগঞ্জের ৩০০, রাজশাহীর ৬০০, পিরোজপুরের ১৫, বরিশালের ৪৪০, ময়মনসিংহের ৩০০ ও চট্টগ্রামের ৩০০ জন হিন্দু নাগরিককে সন্ত্রাসীরা ঘরছাড়া করেছে প্রচণ্ড সন্ত্রাস চালিয়ে। এ ছাড়াও বগুড়ার ৭৭টি, মাগুরার ৭টি পরিবারসহ প্রায় ১০০টি হিন্দু পরিবার নির্যাতনের মুখে বাড়িঘর ছেড়ে পলাতক জীবন কাটাচ্ছে।

দেশত্যাগী নিপীড়িতজন

একটি বেসরকারি সংস্থা তাৎক্ষণিক অনুসন্ধান পরিচালনা করে রিপোর্ট উপস্থাপন করেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে নাটোরের ১২ হাজার, কুমিল-ার ১০ হাজার, চট্টগ্রামের ৫ হাজার, বগুড়ার ৫৫০, ঝিনাইদহের ৫০০ ও পাবনার ৪০০ হিন্দু নাগরিক সম্প্রতি দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। অর্থাৎ গত দেড় মাসে তত্ত্বাবধায়ক ও চারদলীয় জোটের নেতৃত্বাধীন সরকারের ছায়ায় অপ্রতিরোধ্য সন্ত্রাসীরা প্রায় ৩০ হাজার হিন্দু নাগরিককে বাধ্য করেছে দেশ ছেড়ে চলে যেতে। তার মানে এই দেড় মাসে প্রতিদিন দেশত্যাগ করেছেন গড়ে ৬৫০ জন সংখ্যালঘু।

ধর্ষণ গাথা

সাম্প্রতিক সময়ে সারা দেশে ধর্ষিত হয়েছে প্রায় এক হাজার হিন্দু নারী-যাদের মধ্যে রয়েছেন শিশু থেকে বৃদ্ধা। তবে বিষয়টি তীব্রভাবে আলোচিত হতে থাকে এবং এ ধরনের ঘটনায় বিবেকবান মানুষ প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন ২০ অক্টোবর ২০০১ তারিখ থেকে। ওইদিন এক সাংবাদিক সম্মেলন করে সিরাজগঞ্জের উল-াপাড়া থানার পূর্বদেলুয়া গ্রামের কিশোরী ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী পূর্ণিমা তার নির্মম অভিজ্ঞতার কথা সবার সামনে তুলে ধরে। নির্বাচনের পর গত ৮ অক্টোবর বিএনপির চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা পূর্ণিমাকে ধর্ষণ করে তার জীবনে যে কালো দাগ বসিয়ে দেয় সারা পৃথিবীর মানুষ সে দাগ দেখে- কেউ কাঁদে, কেউ বোবা হয়ে যায় কয়েক মুহূর্তের জন্য অবর্ণনীয় সেই নির্মম অত্যাচারের কথা শুনে। যদিও কয়েকটি পত্রিকা এই সংবাদ সম্মেলনের খবর গুরুত্বহীনভাবে প্রকাশ করে। সংবাদটিকে তাৎপর্যহীন করার চেষ্টা করে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সচেতন পাঠক হারানোর ভয়ে এই সংবাদপত্রগুলোও বাধ্য হয় সিরিজ আকারে সংখ্যালঘু নিপীড়ন ও নির্যাতনের প্রতিবেদন ছাপতে।

১৩ নবেম্বর ২০০১ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ওয়াহিদুল হকের নেতৃত্বে ৪০জন সাংস্কৃতিক কর্মীর একটি দল 'পূর্ণিমা যাত্রা' করেন এবং উল-াপাড়ায় পূর্ণিমার কাছে গিয়ে ওয়াহিদুল হক বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, পূর্ণিমা 'বাঙালির শৌর্যের মুখ।' পূর্ণিমার জন্য সবার চোখ সজল হয়ে উঠলে সে সবাইকে সান্ত্বনা দেয়- 'আপনারা যদি এভাবে ভেঙ্গে পড়েন তাহলে ওই পশুদের সঙ্গে আমি একা লড়াই করব কী করে? আপনারাই যে আমার শক্তি।'

এই অমানবিক ধর্ষণযজ্ঞে ধর্ষিত হয়েছে ভোলার অন্নদা প্রসাদ গ্রামের আট বছরের শিশু রীতা রাণী দাস, বণ্টনবাড়ির অসহায় জয়িতাসহ ৬৫ বছরের বৃদ্ধাও। ধর্ষিত হয়েছে বরিশালের লিটল ম্যাগাজিন সংগঠক, তরুণ কবি অভিজিৎ দাসের পিসি।

ওয়াহিদুল হকের মতো ক্ষমা প্রার্থনা করেও কি সম্ভব এসব ধর্ষণের দহন থেকে মুক্তি পাওয়া?

আইনি পদক্ষেপ

বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্বাচনপূর্ব সময় থেকে শুরু করে নির্বাচনোত্তর সময়েও সংঘটিত নির্যাতন, নিপীড়ন, ধর্ষণ ও হয়রানি সং্রান্ত সংবাদ পাশাপাশি স্বউদ্যোগে পরিচালিত অনুসন্ধানভিত্তিক প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এক রিট পিটিশন করে। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে মামলা পরিচালনা করেন ড. কামাল হোসেন ও ড. এমএ জহির। মামলা পরিচালনায় তাদের সহযোগিতা করেন অ্যাডভোকেট তবারক হোসাইন, আবু ওবায়দুর রহমান ও নীনা গোস্বামী।

বিচারপতি এমএ মতিন ও মারজি-উল-হক সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ গত ২৪ নবেম্বর এ ব্যাপারে রুলনিশি জারি করে। কেন দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সন্ত্রাসী হামলা ও হয়রানি থেকে রক্ষা করার জন্য যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে সরকারকে নির্দেশ দেয়া হবে না তা পরবর্তী চার সপ্তাহের মধ্যে জানতে চেয়ে এই রুলনিশি জারি করা হয়।

ভারতের ও আমেরিকার প্রতিক্রিয়া

২৪ নবেম্বর ২০০১ ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী সরাসরি বাংলাদেশ সরকারকে আহ্বান জানান, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে। ওইদিন বিজেপির মুখপাত্র সাংসদ বিজয় কুমার মালহোত্রার বাড়িতে এক মধ্যাহ্নভোজে গিয়ে সাংবাদিকদের কাছে এই প্রতিিয়া জানান প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী। ভারতের রাজনীতিকরা সংখ্যালঘু নিপীড়নের এসব ঘটনায় উদ্বিগ্ন হলেও এখনও বিষয়টিকে বাংলাদেশের নিজস্ব ব্যাপার বলে মনে করছেন, তাই সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেয়া দেশত্যাগী হিন্দু নাগরিকদের 'শরণার্থী' হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়নি সরকারের পক্ষ থেকে। অন্যদিকে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি বুশের পক্ষ থেকে হ্যারি থমাস এক চিঠিতে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর মাইনরিটিসের এক প্রতিনিধির কাছে এই নির্যাতন সম্পর্কে জানার পর বাংলাদেশে মানবাধিকার লাঞ্ছিত হওয়ায় দুঃখিত হয়েছেন। জানিয়েছেন নতুন সরকারের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হবে।

প্রতিবাদী মানুষেরা

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের পর সংঘবদ্ধভাবে প্রথম প্রতিবাদ করে এ দেশের তরুণ লেখক-শিল্পীরা। শাহবাগ থেকে প্রতিবাদী মিছিল নিয়ে রাজপথ প্রদক্ষিণ করে তারা অক্টোবরেই।

পরে ৬ নবেম্বরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে একত্রিত হয় উদ্বিগ্ন নাগরিকরা। নির্যাতিতদের পক্ষে কাজ করার জন্য এই সভা থেকে উলে-খযোগ্য নাগরিকদের নিয়ে একটি কমিটি ও বিভিন্ন নির্যাতনমূলক ঘটনা তদন্তের জন্য একটি গণতদন্ত কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এই সভাতে। প্রস্তাবিত কমিটির আহ্বায়ক হন আনিসুজ্জামান। সম্প্রতি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছেন সংঘটিত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' শীর্ষক জাতীয় কনভেনশন করার। ইতোমধ্যেই এ কনভেনশনের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ মতবিনিময় করেছে সিপিবি, সাম্যবাদী দল ও ওয়ার্কার্স পার্টির সঙ্গে। এ ছাড়া গত ১৫ নবেম্বর বামফ্রন্ট হরতাল পালন করে, যাতে গ্যাস রফতানির চান্তের প্রতিবাদ মূল ইস্যু হলেও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০ ডিসেম্বর ২০০১

এবারের সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এবং বর্তমান বাংলাদেশ

রণেশ মৈত্র

২০০১ সালের সেপ্টেম্বরের শেষভাগ থেকে ২০০২ সালের জানুয়ারি প্রায় শেষ হতে চলেছে। এই চার মাসের অধিককাল ধরে আমাদের এই দেশটিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের ওপর চলছে নানা ধরনের নিপীড়ন-নির্যাতন। সবচাইতে বেশি দুর্ঘটনা ঘটেছে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহে। তবে বাদ যায়নি চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের অনেকগুলো জেলাও। উত্তরবঙ্গে অর্থাৎ রাজশাহী বিভাগের জেলাগুলোতে পূর্ববর্ণিত অঞ্চলসমূহের তুলনায় অনেক কম ঘটনা ঘটলেও যেগুলো ঘটেছে তা অতীতে কোন সময় ঘটেনি অন্তত স্বাধীন-উত্তর যুগে। সর্বাপেক্ষা লজ্জাজনক ঘটনা ঘটেছে সিরাজগঞ্জের উল-াপাড়ায়।

পূর্ণিমা নামক স্কুল ছাত্রী নির্যাতিত হয়ে গণধর্ষণের শিকার হয়ে তা দেশবাসীর কাছেই শুধু নয় বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেছে ঢাকায় এসে জাতীয় প্রেসক্লাবে একটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে। এভাবে প্রকাশ্যে এ জাতীয় ঘটনা কোন ধর্ষিত মেয়েই অতীতে এত খোলামেলা মানুষের কাছে বর্ণনা করার ঘটনা কদাপি দেখিনি-শুনিও নি। সবাই কম বেশি নিজের ভবিষ্যত জীবনের কথা ভেবে, সামাজিক কুনজরে পড়ার ভয়ে অথবা দুর্ঘটনার নায়কদের পুনরায় নির্যাতনের আশঙ্কায় মেয়েরা গোপন করেই রাখতে চায় সর্বপ্রযত্নেই গোপন রাখবার চেষ্টা করে। কিন্তু অসম সাহসী পূর্ণিমা সব কথা অকপটে সকলকে জানিয়ে জাতির বিবেককে অনেকাংশে জাগ্রত করেছে নরপশুদের মুখোশ খুলে দিয়েছে ঘটনার নায়কদের সকলের নাম-ঠিকানাও বলে দিয়ে। আমাদের ধর্ষিতা বোনটি গোটা জাতিকে যেমন লজ্জায় মাথা হেঁট করাতে সক্ষম হয়েছে তেমনি সে পেরেছে আমাদের অসীম শ্রদ্ধা অর্জন করতে তার সাহসিকতার জন্যে। আর সমাজের কদর্য রূপটি তুলে ধরে এ ব্যাপারে অনেক দায়িত্ব তুলে দিয়েছে আমাদের কাঁধে। কিন্তু ইতিমধ্যেই সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে সম্ভবত আমরা অনেকেই ব্যর্থ হয়েছি দেশজুড়ে পূর্ণিমা এবং পূর্ণিমাদের জীবনে এমন ঘটনার পুনঃসংঘটন রোধ করাতে ব্যর্থ হওয়ার মাধ্যমে।

উত্তরবঙ্গের পাবনাতেও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ঘটেছে। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে ওই জেলার সুজানগর থানার সাতবাড়িয়া ইউনিয়নের নিশ্চিন্তপুর গ্রামের সাতটি হিন্দু পরিবারের বাড়িঘর এক রাতে লুটপাট করে ওই বাড়িগুলোর বাসিন্দাদেরকে নারী-পুরুষ-শিশুসহ পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়। অক্টোবরের ৩ তারিখে প্রকাশ্য দিবালোকে একই থানার নাজিরগঞ্জ ইউনিয়নের নাজিরগঞ্জ বাজারে কয়েক শ' সশস্ত্র লোক সংখ্যালঘুদের দোকানপাট তছনছ লুটপাট করে। পার্শ্ববর্তী বড় খাঁপুর গ্রামের হিন্দু পাড়ার সবগুলো বাড়িতেই হামলা, তছনছ, লুটপাট এবং অনেককে আক্রমণ করে আহত করা হয়। অনেকে চিকিৎসা ও নিরাপত্তার জন্যে পালিয়ে যায়। পরে শুরু হয় চাঁদাবাজি। বলরাম ঘোষ নামক ওই গ্রামেরই একজন বাসিন্দাকে আহত করে পরবর্তীকালে চাঁদাবাজির শিকারে পরিণত করা হয়।

অতঃপর তিনি পালিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়ে থাকতে আজতক বাধ্য হচ্ছেন। নাজিরগঞ্জ বাজারে একটি স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প আছে। সে পুলিশ ওই ঘটনার ব্যাপারে নীরব ও নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এমন কি থানাতে ওসিকেও কোনো রিপোর্ট দেওয়া থেকে স্বেচ্ছায় এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিরত থাকে ঐ ক্যাম্পের পুলিশ কর্মকর্তা। ভয়ে কেউ কোন মামলাও করেনি। নির্যাতন চলতেই থাকে সুজানগর থানার বিভিন্ন ইউনিয়নের অনেকগুলো গ্রামে অক্টোবর মাস জুড়ে। আজও চলছে নীরবে চাঁদাবাজি। এ ছাড়াও পাবনা শহরে একটি দুর্গা প্রতিমা রাতের আঁধারে ভাঙচুর করা হয়। আতাইকুলা থানার কুচিয়ামোড়া গ্রামে রাতের অন্ধকারে পাশাপাশি দু'টি মন্দিরে দু'টি মূর্তি ভাঙচুর করা হয়। আটঘরিয়া থানার গোড়ুরী গ্রামেও রাতের অন্ধকারে একটি মন্দিরে মূর্তি ভাঙ্গা হয়। চাটমোহর থানার হরিপুর গ্রামে চৌধুরী জমিদার বংশের বিশাল মন্দিরে নির্মিত দুর্গাপ্রতিমাসহ কাঠামোতে নির্মিত সকল দেব-দেবীর মূর্তিই ভেঙ্গে (মুণ্ড ও হাত পা) ফেলা হয়। ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা আতঙ্কিত হয়। প্রতিবেশী শান্তিকামী মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা এগিয়ে আসেন, সাহস দেন, সহযোগিতার হাত বাড়ান এবং সে কারণে ভগ্ন হৃদয়ে হলেও শেষপর্যন্ত এই সকল স্থানে অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে দুর্গাপূজা অবশ্য অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু যারা এই অত্যাচার করলো, যারা প্রতিমা ভাঙ্গলো, যারা লুটপাট, বাড়ি-দোকান ভাঙচুর করল সেই দুর্বৃত্তরা কোথায়? তাদেরকে তো ধরা হলো না- দেওয়া হল না কোন শাস্তি। আইন মুখথুবড়ে পড়ে থাকল। কোন রাজনৈতিক দল ছুটে যায়নি তাদের পাশে, একমাত্র গিয়েছে সীমিত গতিসম্পন্ন গণফোরাম। তারা যেখানেই দুর্ঘটনার খবর পেয়েছে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ছুটে গেছে। প্রশাসন ও পুলিশ কর্তৃপক্ষকে সক্রিয় করার পাশাপাশি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল প্রতিবেশি মানুষকে নিয়ে বৈঠক করেছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় মানুষকে সাধ্যমত উদ্বুদ্ধ করেছে।

অপরদিকে পাবনাতে নানাস্থানে আয়োজিত (পাবনা শহরসহ) ওয়াজ মাহফিল থেকে কোন কোন মাওলানা প্রকাশ্যে বলেছেন, "মূর্তিপূজা ইসলামে হারাম- তাই মূর্তি ভাঙ্গা মুসলমানের জন্যে জায়েজ"। এই কথা ঠিক কিনা বলে মাতম তুলে বিশাল ওই মাহফিলগুলো থেকে শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে এক আবেগের সৃষ্টি করে তাদের হাতও তুলিয়েছেন প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামবিরোধী, আইনবিরোধী, সংবিধানবিরোধী ওই বক্তব্যের সমর্থনে। সুখের বিষয় আবেগে হাত তুললেও ধর্মপ্রাণ মানুষরা ইসলামের নামে তখনই ছুটে গিয়ে আশপাশের মন্দিরগুলোতে ঢুকে বহু মূর্তি ভাঙ্গার কাজে নেমে পড়েনি। কিন্তু যারা ওই কথা বললেন পবিত্র ধর্মের নামে তাদের বিরুদ্ধে তো কোন আইনগত বা সামাজিক বা ধর্মীয় বিধানেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল না। এভাবেই দুর্বৃত্তরা এবং ধর্মের নামে যারা ব্যবসা করেন তারা মদদ পেয়ে থাকে। সময় সুযোগ বুঝে তারা কুমতলব হাসিল করে, সামান্যতম প্রতিরোধও তাদের বিরুদ্ধে পরিলক্ষিত হয় না। তেমনই ঘটেছে রাজশাহী ও নওগাঁয় আদিবাসীদের ওপর, নাটোরের কোনো কোনো গ্রামে হিন্দুদের ওপর, তাড়াশেও কিছুটা আদিবাসীদের ওপর এবং ঠাকুরগাঁয়ে ব্যাপক এলাকা জুড়ে আদিবাসীদের ওপর। ঠাকুরগাঁয় যতটুকু জেনেছি, আদিবাসী এলাকায় গিয়ে বারংবার সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা বলেছে, "ইসলামে মদ খাওয়া হারাম তাই মদ খেলে এখানে থাকতে পারবে না।" এই হুমকির পর (যেহেতু তাদেরই তৈরি ওই দেশী মদ খাওয়ায় তারা অভ্যস্ত, তারা তা রোজ খায়, তা দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করে এবং ওই মদ খাওয়া তাদের সংস্কৃতির অঙ্গ) তারা অনেকে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে চলে গেছে, অনেকে যাবার প্রস্তুতিও নিচ্ছে। তারা শংকিত, তাদেরকে এভাবে দেশছাড়া করার মতলব তো ইসলাম কায়েম করার কথা নয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাদেরকে দেশ ছাড়া করে তাদের জমি-জমা, বাড়ি-ঘর, সয়-সম্পত্তি দখল করা। এর বিরুদ্ধে ঠাকুরগাঁওয়ের রাজনৈতিক দলগুলো আজও সরেজমিন কোন ভূমিকা গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়নি। তবে ঠাকুরগাঁ শহরে ১১ দল আয়োজিত গত ১৬ জানুয়ারি তারিখের জনসভায় এর বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়।

কিন্তু ওই প্রতিবাদ যতই সোচ্চার হোক না কেন তা যথেষ্ট নয়। এখানে উলে-খ্য, মদ্যপান ইসলামে বা বাঙালি, ভারতীয়, পাকিস্তানি সংস্কৃতিতেও আপত্তিকর হলেও এই সব দেশগুলোতেই আইন সম্মত ও লাইসেন্সধারী মদের দোকান আছে, সন্ত্রাসীরাসহ আরও অনেকেই তা নিয়মিত পানে অভ্যস্ত। বিদেশী মেহমান এলে কি জামাত-বিএনপির সরকার, কি অন্য দলের সরকার সবাই ত তাদেরকে দামী দামী মদ দিয়ে প্রতিদিন আপ্যায়ন করে থাকেন

কারণ ওই মেহমানরা তাতে অভ্যস্ত এবং গ-াসে মদ নিয়ে সবাইকে গ-াসে তা সবরাহ করে এবং এটা তাদের সংস্কৃতির অঙ্গ। কিন্তু ওই সন্ত্রাসীরা তাতে ত আপত্তি করে না বরং ভিআইপি সন্ত্রাসীরা ও তাদের গডফাদাররা তো ওই সকল আসরে বসে বিদেশী সভ্যাগতদের সঙ্গে মনের সুখে বেশ স্বস্তির সঙ্গেই ওইরূপ "স্বাস্থ্যপানে" শরিক হয়ে থাকেন। যা হোক, এ কথাগুলো আর বাড়িয়ে লাভ নেই। নিত্যদিন সংবাদপত্রসমূহে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার খবরাদি প্রকাশিত হচ্ছে কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ত আজতক জানা যাচ্ছে না। কোন রাজনৈতিক দলই এর বিরুদ্ধে দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণ করছেন না। বুদ্ধিজীবীরা এ নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে উচ্চকণ্ঠ হচ্ছেন না, সাংস্কৃতিক কর্মী ও সংগঠনগুলোও উপদ্রুত এলাকাসমূহে ছুটে গিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিমূলক এবং সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে উদ্দীপক সঙ্গীত পরিবেশন করে মানুষকে উদ্দীপ্ত করে তুলছেন না। এই অবস্থাটা এবং এর পরিণতি সত্যই মারাত্মক, ততোদিক ভয়াবহ এর সামাজিক প্রতি্িয়া।

এ কথা অবশ্যই সত্য আমাদের দেশে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী অসংখ্য ব্যক্তি আছেন। আছেন অনেক রাজনৈতিক দল বহু নেতা ও কর্মী। আছে অনেক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন। এভাবে নানা সংগঠনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এবং অসংগঠিত অসংখ্য ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাস করেন। তারাই তো '৪৮ সালে, '৫২ সালে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন করেছেন।

১৯৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, সাম্প্রদায়িক ও ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বের দেশ পাকিস্তানের কবর রচনা করেছেন তারাই সুদীর্ঘ ২৩ বছরের ধারাবাবিহক লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমে নবীন রাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটিয়েছেন, ১৯৭২ এর পবিত্র সংবিধান রচনা করেছেন তাতে চার মৌলনীতির মধ্যে "ধর্মনিরপেক্ষতাকে" একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলনীতি হিসেবে ঘোষণা সম্বলিত বিশ্ব-নন্দিত একটি সংবিধান রচনা ও তার জাতীয় অনুমোদন এবং প্রয়োগ শুরু করেছিলেন।

এ কথাও তো সত্যি যে, আমাদের হারিয়ে যাওয়া জাতীয় নেতারা শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ বিভাগোত্তর যুগে অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত করার আন্দোলনে এক ঐতিহাসিক ও অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন। পাকিস্তানের সংবিধানে যখন পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করে হিন্দু হিন্দুকে, মুসলমান মুসলমানকে ভোটদানের প্রথা চালু করে সাম্প্রদায়িকতাকে স্থায়ীরূপ দানের চেষ্টা করে তখন প্রকাশ্য অগণিত বৃহৎ বৃহৎ জনসভায় যারা পাকিস্তানব্যাপী জনসভা করে ওই সাম্প্রদায়িক বিধান বাতিল করে যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনে সক্ষম হল রাষ্ট্রের নাম যখন "ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান" সংবিধানে প্রস্তাবিত হল তখনও ওই নেতাদের সমগ্র পাকিস্তানব্যাপী সভা-সমিতি করে প্রকাশ্যে বলেছেন, "ইসলামিক রিপাবলিক" নয়, "আমরা চাই ডেমো্যাটিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান"। বলেছেন, ধর্মান্ধতা নয়, সাম্প্রদায়িকতা নয়, জাতির বিভক্তিকরণ নয় সকল নাগরিকের সম-অধিকার প্রবর্তনের জন্যে পাকিস্তানকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ওই সকল বিশাল বিশাল জমায়েত থেকে লাখো লাখো হিন্দু-মুসলমান হাত তুলে নেতাদের ওই বক্তব্যের প্রতি দ্বিধাহীন সমর্থন ঘোষণা করেছেন- লাখো হাতে করতালি দিয়ে আমাদের দেশের মানুষ অকুণ্ঠ চিত্তে "ধর্মনিরপেক্ষ পাকিস্তান" দাবি করে সমাবেশগুলোতে উত্থাপিত প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছেন। এভাবেই কোণঠাসা করা সম্ভব হয়েছিল পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোকে সাম্প্রদায়িক রাজনেতিক দল মুসলিম লীগ; নেজামে ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী প্রমুখ রাজনৈতিক দলগুলোকে। সাহস নিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে

সেদিন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন সেদিনকার বুদ্ধিজীবী সমাজ, সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ এবং অন্ত তপক্ষে তখনকার তিনটি প্রভাবশালী সংবাদপত্র "দৈনিক সংবাদ" "দৈনিক ইত্তেফাক", "দৈনিক পাকিস্তান অবজার্ভার"।

আর আজ? আজ আমরা তো কোন দ্বিজাতিতত্ত্ব ভিত্তিক রাষ্ট্রে বাস করছি না? আমাদের রাষ্ট্রটির নাম তো "পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ" যা সমুদ্র প্রমাণ রক্তের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি। আজ তো সেদিনের মত শুধু দু'টি অসাম্প্রদায়িক দল নেই (আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) তার সংখ্যা বেড়ে অনেক হয়েছে। যেমন ১১ দল, আওয়ামী লীগ, জাসদ, ন্যাপ (মো), কৃষক-শ্রমিক জনতা দল এবং এমন কি, বিএনপিও কোন সাম্প্রদায়িক দল নয় তার মেনিফেস্টো তা বলে না, তার লক্ষ্যও "ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ" প্রতিষ্ঠা করা নয়। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষও সাম্প্রদায়িক নন, তারা হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবাই মিলে মিশে সম্প্রীতির সঙ্গে, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বাঁচতে ও থাকতে চায়। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও কেনো আজ সাম্প্রদায়িক সহিংসতাকে এত ব্যাপকভাবে আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছে- কেনই বা ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো এত দীর্ঘমেয়াদী নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন আর কেনই বা ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো এত দীর্ঘমেয়াদী নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন আর কেনই বা তারা অনেকে দেশত্যাগ করেছেন এবং অনেকে তার প্রস্তুতি নিচ্ছেন?

এর কারণটি হলো ক্ষমতান্ধ স্বার্থান্ধ হয়ে পড়েছে দু'টি বৃহৎ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি। বর্তমান বাংলাদেশের শক্তির ভারসাম্য যেমনটি রয়েছে তাতে এই দু'টি দল সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধে এবং অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। কিন্তু তারা তা করছেন না করবেনও না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানি নীতি আদর্শ পরিত্যাগ করে শুধু ক্ষমতা দখলের এই অপরাজনীতি আওয়ামী লীগের মধ্যে অনেকেই পছন্দ করছেন না কিন্তু তাদের কিছু করার বা বলার ক্ষমতা নেই কারণ সন্ত্রাস কালো টাকা, আত্মীয়করণ প্রভৃতির মাধ্যমে নীতিবান-অসাম্প্রদায়িক আওয়ামী লীগাররা আজ দলের মধ্যে কোণঠাসা।

তেমনই অবস্থা বিএনপির অভ্যন্তরেও। সেখানেও অনুরূপ চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী অসাম্প্রদায়িক অনেকে আছে কিন্তু তারাও উগ্রপন্থী জামায়াতের কাছে, দক্ষিণপন্থী বিএনপি নেতাদের কাছে তাদের সন্ত্রাস-সাম্প্রদায়িকতা-কালো টাকার প্রভাব ও দৌরাত্ম্যের কাছে অসহায় জিম্মি হয়ে পড়েছেন। অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো যেমন ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বাধীন গণফোরাম ছাড়াও সিপিবি, ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ, বাসদ, কৃষক-শ্রমিক-জনতা দল অনেক বেশি নীতিনিষ্ঠ সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে, '৭২ এর সংবিধানের চার মৌলনীতির প্রশ্নে। কিন্তু তাঁদের শক্তি প্রয়োজনের তুলনায় এতই কম, তাঁদের রসদও এতই সীমাবদ্ধ যে ইচ্ছে থাকলেও তাঁরা তা পূরণ করে উঠতে পারছেন না। তবে এদেরকেই পারতে হবে কারণ এরা অনেক নীতিনিষ্ঠ এবং বহু ত্যাগে সমৃদ্ধ। তবে তাদেরকে যেমন দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, অর্থবহ এবং গ্রহণযোগ্য পন্থায় আন্দোলন ও ধারাবাবিহক কার্যকলাপের মাধ্যমে, তেমনি ব্যাপক গণতান্ত্রিক শক্তির, সকল পেশাজীবী শক্তির, সকল কল্যাণকামী বুদ্ধিজীবী, শিল্পী-কবি-সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, চেতনা ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ এক বিশাল প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তির সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলে ধারাবাহিক নীতিনিষ্ঠ আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যদিয়ে একটি বিকল্প গণতান্ত্রিক শক্তির অভ্যুদয় ঘটাতে হবে সকল দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ওঠে। এভাবে এক বিপুল গণজাগরণ সৃষ্টি করতে হবে, জনতার জোয়ার সৃষ্টি করতে হবে সকল প্রকার সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে।

বড় দলগুলো কেন পারবে না তাহলে? উত্তর-পারবে না কারণ পারতে চাইছে না। পারতে চাইছে না কারণ তারা ক্ষমতানির্ভর এবং ক্ষমতাভিত্তিক বা ক্ষমতা-কেন্দ্রিক রাজনীতি করছে।

পারবে না কারণ ক্ষমতায় যাওয়া বা ক্ষমতায় থাকার জন্য তারা মরিয়া হয়ে ক্ষুদ্র ও পরাজিত স্বাধীনতাবিরোধী, উগ্র সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী, ফ্যাসিবাদী শক্তির সঙ্গে ঐক্য গড়ে তুলে তাদের সঙ্গে ক্ষমতার স্বার্থে প্রকাশ্য ও গোপন আপস বা আঁতাত করে, মানুষের ওপর আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন না করে তারাও সচেতন বা অচেতনভাবে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে সুড়সুড়ি দেয়, একইভাবে বক্তৃতা ভাষণ ইত্যাদি শুরু করে।

ঘন ঘন হজ, ওমরাহ হজ প্রভৃতি পালন করে লোককে দেখানোর স্বার্থে এবং রাষ্ট্র ক্ষতাকে প্রধান বিষয় হিসেবে মাথায় রেখে। যখন তারা ক্ষমতার বাইরে থাকে তখন তারা সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে বললেও ক্ষমতায় গিয়ে তাকে হারাবার ভয়ে ওই সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা ও কালো টাকার ওপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সে কারণেই প্রবল শক্তিশালী দলও যখনই ক্ষমতাচ্যুত হয় তখন তারা আ□মণের বা দৈহিক নির্যাতনের শিকার হলেও দলের কেউ তাদেরকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে না। কারণ ক্ষমতায় থাকাকালে তারা দলীয় নিষ্ঠাবান অংশকে কোণঠাসা করে রেখে নীতি-আদর্শহীন বা নীতি আদর্শ বিরোধী সশস্ত্র দুর্নীতিবাজদেরকেই লালন পালন করে থাকে।

আর ওইভাবে লালিত-পালিত সুখের পায়রারা তো দুঃখের দিনে কখনও কাছে আসে না, আরও সুখের সন্ধানে ওই পায়রারা নতুন যথার্থ স্থানে চলে যায়? নইলে কী করে যে নৌকায় বঙ্গবন্ধু চড়তেন নীতিনিষ্ঠ তাজউদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এএইচএম কামরুজ্জামান, এম মনসুর আলী, ড. কামাল হোসেন, প্রফেসার রেহমান সোবহান প্রমুখ ব্যক্তিত্বকে সঙ্গে নিয়ে সেই নৌকার কাণ্ডারী আজ ওই নৌকার সহযাত্রী বানাতে পারেন জয়নাল হাজারী, হাজী সেলিম, হাজী মকবুল, ইকবাল, শামীম ওসমান প্রমুখকে? এমন সব সহযাত্রীদের নিয়ে এবং গোলাম আযমদের দোয়া কামনা করে, তাদের সঙ্গে আপস করে কখনও কখনও ক্ষমতায় যাওয়া গেলেও যাওয়া যেতে পারে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চার নীতির বাংলাদেশ বা সুখী-সমৃদ্ধ অগ্রসরমান বাংলাদেশ গড়া যায় না এবং জনগণের ভালবাসা আস্থাও অর্জন করা যায় না।

তেমনি গোলাম আযম, এরশাদ, আজিজুল হকদের সঙ্গে ঐক্যজোট করে, কালো টাকা, মাস্তান, সন্ত্রাসীদেরকে অবলম্বন করে, ধর্মের নামে রাজনীতি করে সাময়িকভাবে ক্ষমতায় যাওয়া অবশ্যই সম্ভব (যেমন হয়েছে ভারতেও) কিন্তু তার দ্বারা কোন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী বা জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণোপযোগী কোন কাজ করা সম্ভব হয় না, জাতীয় ঐক্যও গড়া যায় না। সাম্প্রদায়িকতা-সন্ত্রাস দূর করাও সম্ভব হয় না বা ক্ষমতাও স্থায়ী করা যায় না। আফগানিস্তান তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তালেবানী আফগানিস্তানে কোন অসাম্প্রদায়িক শক্তি, গণতান্ত্রিক শক্তি, জাতীয়তাবাদী শক্তি, বামপন্থী শক্তি কেউ টিকতে পারেনি। তাই আজ বিএনপি ওই অপশক্তিগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ক্ষমতাসীন হয়ে যে মৌলবাদী শক্তির প্রসার ও পুষ্টি জোগাতে দ্বিধাহীন সহযোগিতা দিচ্ছেন ওই অপশক্তিগুলো সংহত হওয়া মাত্রই তারা সকলকেই আঘাত করবে নিশ্চিহ্ন করবে সবাইকেই। তখন অন্যরা তো নয়ই, বেগম খালেদা জিয়া মান্নান ভূইয়া বা হাসিনা- রেহানা-জিল-ুর রহমানরা কেউই রেহাই পাবেন না।

এদেশ বহুকাল থেকে অসাম্প্রদায়িকতার দেশ। তাই সাম্প্রদায়িক সহিংসতা অবশ্যই প্রতিরোধ করা সম্ভব, সাম্প্রদায়িকতা দূর করাও সম্ভব।

আজকের কাগজ, ২৭ জানুয়ারি ২০০২

স্বাধীনতা ঘোষণা ঃ সংবিধান এবং পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস সংসদে হিন্দু নির্যাতন আলোচনার দাবি

রাজেন ঠাকুর

গতকাল অর্থাৎ ২০০২ সালের প্রথম মাসের শেষদিনে অষ্টম সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়েছে। রোজ বৃহস্পতিবার ৩১ জানুয়ারি ২০০২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৭৩(২) মতে জাতীয় সংসদে ভাষণদান করেছেন। এবার বছরের প্রথমবারের মতো সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক এ. কিউ. এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী ভাষণদান করেন। ক'দিন আগে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে রাষ্ট্রপতির ভাষণে কতিপয় সংশোধনীর পর উপস্থাপন করতে বলা হয়েছে। একটি দৈনিকের শিরোনাম ঃ নেপথ্য কাহিনী ঃ যে কারণে রাষ্ট্রপতির ভাষণের খসড়া নতুন করে লেখা হচ্ছে' রিপোর্টে বলা হয় ঃ উন্নয়নকর্মে আওয়ামী লীগ সরকারের পরোক্ষ স্বীকৃতি বঙ্গবন্ধুকে জাতীয় নেতাদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রথমে তার নাম লেখা এবং জিয়াউর রহমানকে বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অতি উচ্চে স্থাপনে ব্যর্থ হওয়ার কারণে নতুন রাষ্ট্রপতির প্রথম ভাষণের খসড়াটি মন্ত্রিসভা অনুমোদন না দিয়ে নতুন করে লেখার নির্দেশ দিয়েছে। খসড়াটিতে রাষ্ট্রপতির মৌখিক সম্মতি থাকার পরও তিন মন্ত্রী, এক প্রতিমন্ত্রী এবং এক সচিবের বাধা ও নতুন নতুন প্রস্তাব সংযোজন দেয়ার লক্ষ্যই হচ্ছে ভাষণটি অনুমোদন না দেয়ার নেপথ্য কাহিনী।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সরকারের কার্যপ্রণালী বিধি-১৯৯৬ (Rules of Business-1996)-এর সিডিউল ৪ নম্বরের প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির সমীপে উপস্থাপনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওপর অর্পিত দায়িত্ব নং ৪-এ বলা আছে 'The Presidents addresses and messages to the parliament' এবং সংবিধানের 'অনুচ্ছেদ-৭৩(২) সংসদ সদস্যদের প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বৎসর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণদান করিবেন' উলে-খ রয়েছে। অতএব সমস্ত বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ এবং রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের দায়িত্ব। এসব নিয়ে আমাদের জানার বা বলার কিছু নেই। 'নেপথ্য কাহিনী'র কারণে আমরা রাষ্ট্রপতির ভাষণ শোনার জন্য অপেক্ষায় আছি। এককালের সার্থক টেলিভিশন উপস্থাপক, সদালাপী, সুরসিক, ধীমান চিকিৎসক, রাজনীতিক আমাদের রাষ্ট্রপতি, সে কারণে তার কাছে আমাদের প্রত্যাশাও অনেক। তিনি চিন্তা-চেতনায় ভূতপর্ব রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে আসবেন। বিশেষত রাষ্ট্রপতির অবস্থান রাষ্ট্রের অন্য সকলের উর্ধ্বে বা সর্বোচ্চ। তিনি আর কোন দলীয় রাজনীতির প্রবক্তা নন। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অভিভাবক (Custodian)। রাষ্ট্রের স্বার্থেই তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হয়ে থাকবেন। তিনি তা হবেন এবং তার পারিবারিক ঐতিহ্যে তিনি ইতিহাসে স্থান করে নেবেন।

দুই

আমার বন্ধু হরনাথ বাবুর কথা ইতোপূর্বে লিখেছি। সেদিন তিনি আমার সাথে দেখা হতেই ইতিহাস নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিলেন। দুঃখ করে বললেন, জানেন Henry james..ইতিহাস সম্মন্ধে কি বলেছেন। আমি বললাম, না ভাই আমি সাধারণ ছাপোষা কলমচি, ইতিহাসের খোঁজ কোথায় পাব! তিনি উদ্ধৃতি দিলেন, 'The historian, essentially, wants

more documents than he can really use; The dramatist only wants more liberties than he can really take'

হরনাথ বাবু বললেন, বক্তব্যটা আপনাকে জানিয়ে রাখলাম। আমি বললাম, কিন্তু কেন বলুন তো। বাংলাদেশের ইতিহাস নতুনভাবে লেখা হচ্ছে, এজন্য কি? ইতিহাস লেখা হবে এতে বিস্ময়ের কি আছে এটা তো ধারাবাহিকভাবে লেখা হয়। এর জন্য ইতিহাসবেত্তাদের উপাদান সংগ্রহের নানা দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তাছাড়া ইতিহাসের উপাদান গ্রন্থনার জন্য বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিনির্ভর হতে হয়। তবে সমকালীন ইতিহাস লেখা খুবই কঠিন। কেননা সমসাময়িককালের ইতিহাসের নট-নটিরা ক্ষেত্রবিশেষে তার উত্তরসূরিরা থাকেন উপস্থিত সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এই জীবিতদের ইতিহাস ক্ষমতাবলয়ের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থানগত কারণেই সঠিক কথাটি সহজভাবে সরল উপস্থাপন করা যায় না। আপনি তো জানেন, হেগেল কি বলেছে? হেগেল বলেছেন, 'But what experience and history teach is this, that peoples and governments have never barbed anything from history.' এ কথায় বলতে হচ্ছে আমরাও কিছুই ইতিহাসের কাছ থেকে শিখিনি। হরনাথ বাবু একটি দৈনিকের রিপোর্ট পড়তে বললেন, শিরোনাম ঃ স্বাধীনতা বাস্তব ঘোষণা বিতর্ক অহেতুক'। 'ইতিহাসে মাস্তানি চলে না' মুনতাসীর মামুনের সংবাদভাষ্য। মুনতাসীর মামুন পেশায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। তিনি লিখেছেন, 'এমনভাবে মিথ্যা চাপিয়ে ইতিহাস বদল করা হয়নি। গত দু' দশকে বাংলাদেশে পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস মোটামুটি একই রকম ছেপেছে, সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হয়েছে। ১৯৯৬ সালে সব ধরনের মতামতের (যা সত্য) সমন্বয় করা হয়েছিল। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সন্ত্রাস, লুট, ধর্ষণের সঙ্গে যে এজেন্ডা গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে তা হলো ইতিহাস বদল। বদল না বলে দখল বলাই শ্রেয়। ... জোট সরকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পাঠ্যবইয়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছে। বিশেষ করে যেখানে যেখানে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। তাদের আ□মণের বিষয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, আ□মণের বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক ও সে ঘোষণার তারিখ'।

এ বিষয়টি বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে লেখা হয়েছে, 'প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ১৭টি বইয়ে পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং দলীয় দৃষ্টিকোণ প্রক্ষেপের কারণে অন্যান্য বিতর্কযোগ্য বিষয় ছাড়াও সরাসরি তথ্য বিকৃতি ঘটেছে।' সাবেক ছাত্রনেতারা বিবৃতি দিয়ে স্কুলের পাঠ্যবইয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসকে বিকৃতি করে উপস্থাপনের জন্য বিএনপি-জামাত জোটের ষড়যন্ত্রের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এক যুক্ত বিবৃতিতে তারা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপট উলে-খ করে বলেছেন, '২৭ মার্চ '৭১ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বাঙালি সেনা কর্মকর্তা হিসেবে মেজর জিয়াউর রহমানকে কালুরঘাটে ডেকে এনে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ঘোষণাটি পাঠ করান। ২৬ মার্চ '৭১ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে আসেননি জিয়া। অথচ আজ শিশুদের সামনে ২৬ মার্চকে টেনে আনা হয়েছে জাতি ধ্বংসের হীন ষড়যন্ত্র হিসেবে।' অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন তার সংবাদভাষ্যে সযুক্তি বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত ১৫ খণ্ডের দলিলপত্র প্রকাশিত হয়েছিল জেনারেল জিয়ার আমলে। তিনি দলিলপত্রে মেজর জেনারেল (অব.) মীর শওকত আলী, বর্তমান পররাষ্ট্র সচিব, জিয়ার সহযোদ্ধা শমসের মবিন চৌধুরী, প্রয়াত ঐতিহাসিক আজিজুর রহমান মলি-ক এবং আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান জানাচ্ছেন, '২৭ মার্চ বিকালে মেজর জিয়াউর রহমানও রেডিও মারফত স্বাধীনতা ঘোষণা করেন' উলে-খ করেছেন।

আমি ইতিহাসবেত্তা নই। গত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে একাত্তরের বাংলাদেশের

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অনুসরণ করেছি। একাত্তরের বাংলাদেশের অভ্যুদয় খুব কাছ থেকে দেখেছি, জেনেছি। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় উলে-খ করতে চাই ঃ

ক) ১০ এপ্রিল ১৯৭১ জনপ্রতিনিধি দ্বারা গৃহীত স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রে (Proclamation of Independence) উলে-খ করা হয় যে, যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান... এবং 'আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।' (স্বাধীনতার পর ২৩শে মার্চ মে ১৯৯২-এ বাংলাদেশের গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত)। সুতরাং পাঠ্যবইয়ে ২৬শে মার্চ জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন বলে যা সংযোজিত হয়েছে তা অসত্য এবং অবৈধ। এমনকি ১৯৭৭ সালের বিজয় দিবসের ভাষণে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলেছিলেন, 'এই পবিত্র মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে ১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চের কথা সেদিন চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে আমার বলবার সুযোগ হয়েছিল।' শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিজে ইতিহাস বিকৃত করেননি, আজ তার দল ইতিহাস দখল নিচ্ছে।

খ) স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রটি আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রথম অস্থায়ী সংবিধান, যাকে বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী বলেছিলেন, '১০ই এপ্রিল ১৯৭১ সালে মুজিবনগরে ঘোষিত ও জারিকৃত 'স্বাধীনতার সনদের ক্ষমতাবলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্য মুজিবনগরে ১৭ই এপ্রিল শপথ গ্রহণ করেন এবং সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতিকে (সর্বাধিনায়ক) নিয়োগদান করা হয়।

গ) স্বাধীনতার সনদের ক্ষমতাবলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আইনের ধারাবাহিকতা আদেশ ১৯৭১' জারি করেন এবং মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা নির্বাহী ক্ষমতা আরোপ এবং আইন প্রণয়নের অধিকারী হয়; আন্তর্জাতিকভাবে এই স্বাধীনতা সনদপত্র ও বাংলাদেশের সরকার বৈধ বিবেচিত হবে।

ঘ) স্বাধীন বাংলাদেশে ১০ই জানুয়ারি '৭২ বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করার পর ওই স্বাধীনতা ঘোষণা মোতাবেক রাষ্ট্রপতির পদে শপথ গ্রহণ এবং বাংলাদেশের গণপরিষদ আদেশ জারি করেন। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগ এবং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ওই সনদ মোতাবেক রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতি শপথ গ্রহণ করেন।

ঙ) ১০ই এপ্রিল ১৯৭২ গণপরিষদের অধিবেশনের প্রথম বৈঠক হয়। গণপরিষদে স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কীয় প্রস্তাব উথাপন করা হয়, আলোচনা ও প্রস্তাবে সংশোধন করা হয়। স্পিকার ধ্বনিভোটে স্বাধীনতার ঘোষণার প্রেক্ষাপটের বর্ণনা দেন। গণপরিষদ বিতর্ক প্রথম খণ্ডে বিস্তারিতভাবে উলে-খ রয়েছে। স্বাধীনতা ঘোষণা সং□ান্ত প্রস্তাবটি ছিল নিরূপ ঃ

"বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের যে বিপ-বী জনতা, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী, বীরাঙ্গনা, প্রতিরক্ষা বিভাগের বাঙালিরা, সাবেক ইপিআর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও বীর মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের রক্ত দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। আজকের দিনে বাংলাদেশের গণপরিষদ সশ্রদ্ধচিত্তে তাদের স্মরণ করছে।

"১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার যে ঘোষণা করেছিলেন এবং যে ঘোষণা মুজিবনগর থেকে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল স্বীকৃত ও সমর্থিত হয়েছিল এই

সঙ্গে এই গণপরিষদ তাতে একাত্মতা প্রকাশ করছে।

"স্বাধীনতা সনদের মাধ্যমে যে গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল আজ সে সনদের সঙ্গেও এ পরিষদ একাত্মতা ঘোষণা করছে।

"এক্ষণে এই পরিষদ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সেইসব মূর্ত আদর্শ, যথা জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা, যা শহীদান ও বীরদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তার ভিত্তিতে দেশের জন্য একটি উপযুক্ত সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করছে।' (গণপরিষদ বিতর্ক ঃ খণ্ড-১, ১৯৭২ কিংবা বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ ঃ প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা)। স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সংকলিত হয়েছে। কারো দলীয় স্বার্থে দেশের বেসিক স্ট্রাকচারের পরিবর্তন করা যায় না। অতঃপর বাংলাদেশ গণপরিষদের স্থিরিকৃত আকারে সংবিধান বিলটি গৃহীত হয় ৪ঠা নবেম্বর ১৯৭২, ১৮ কার্তিক ১৩৭৯ সপ্তদশ বৈঠকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয় এবং ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২ কার্যকর হয়। সর্বমোট ৩শ' ৯৭ জন গণপরিষদ সদস্য সংবিধানে স্বাক্ষর করেন।

মুজিবনগরে বাংলাদেশের সরকার প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল বলে বিনয়ের সাথে জানাতে চাই, মুজিবনগর ১০ই এপ্রিল '৭১ ঘোষিত স্বাধীনতার সনদ (ঘোষণাপত্র)-এর ক্ষমতাবলে বিপ-বী বাংলাদেশ সরকার গঠন, পরিচালনা, আইনের ধারাবাহিকতা-১৯৭১, গণপরিষদ গঠন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকর হয় এবং সেক্ষেত্রে মুজিবনগরের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে ২৬শে মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন তা সম্পূর্ণভাবে সংবিধানের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। স্বাধীনতার ৩১ বছর পর যদি পাঠ্যপুস্তকে নতুন ইতিহাস সংযোজন করা হয় তা কতটা বৈধ! তার ওপর শিক্ষার্থীদের জন্য ইতিহাস একরকম আর 'বাংলাদেশের সংবিধান'-এ জনপ্রতিনিধি সর্বজনসম্মতি□মে সংযোজিত তথ্য, যা শুধুমাত্র ইতিহাসই নয় তা আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে বীজমন্ত্র ও প্রথম অস্থায়ী সংবিধানও বটে। তাহলে কি যেমনভাবে সংবিধানে ১৩ বার সংশোধন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপাদান সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছে। এবার কি আমাদের নতুন ইতিহাস 'সংবিধানে স্থান পাবে।' দেশের সংবিধান সংশোধনযোগ্য হলেও স্বাধীনতার ঘোষণা কোনরকম পরিবর্তনযোগ্য নয় এটা অসংশোধনযোগ্য। ২২শে এপ্রিল ১৯৭৭ তৎকালীন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, সেনাবাহিনীর প্রধান, রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের টেলিভিশন ভাষণ দিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি নতুন করে সংশোধন করা হয়েছিল। ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দেয়া হয়েছিল। এবার ২৫ বছর পর আমাদেরকে ইতিহাসে নতুন তথ্য (পাঠ্যপুস্তকে) আর সংবিধানের জন্য অন্য তথ্য এই দ্বিবিধ তথ্যের সহাবস্থান বজায় রাখতে হবে।

সংবিধানের তৃতীয় তফসিল (১৪৮ অনুচ্ছেদ) অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী (মন্ত্রিসভার সদস্য), স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, প্রধান বিচারপতি বা বিচারকগণ শপথ ও ঘোষণায় ঃ (সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ) 'আমি বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করিব এবং ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী যথাবিহীত আচরণ করিব।' সংবিধানের কাছে আপনারা সকলেই দায়বদ্ধ অঙ্গীকারবদ্ধ। সেজন্য আবেদন জানাচ্ছি যে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৬ মোতাবেক মহামান্য রাষ্ট্রপতি এই সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের সদয় মতামত গ্রহণ করতে পারেন। বাংলাদেশের বিশিষ্ট আইনজীবীদের মধ্যে অনেক গণপরিষদ সদস্য রয়েছেন, তারা আমার উত্থাপিত প্রস্তাবগুলো নিয়ে একটু ভাববেন। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে যোগদানকারী বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীগণ আমার প্রস্তা

বগুলো একটু বিবেচনা করবেন। আমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একজন কলমচি বিরাট ক্ষতির আগে (স্বাধীনতার মূল প্রস্তাব গ্রহণ করা না হলে) একটু সতর্কবাণী উচ্চারণ করলাম মাত্র। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এই আবেদনটি সদয় বিবেচনা করবেন এবং জাতিকে তিনি ইতিহাস দখলের হাত থেকে রক্ষা করবেন এবং কার্যকর নির্দেশ দেবেন বলে আশা করি।

তিন

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর পূর্ব বাংলার আইন পরিষদের প্রথম বৈঠক হয় ২৩শে মার্চ ১৯৪৮। এই প্রাদেশিক আইন সভার প্রথম সভায় 'পূর্ব বাংলার হিন্দুদের সমস্যা' নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। সেদিনের আলোচনায় ডা. প্রতাপ চন্দ্র গুহ রায়, বিনোদ চন্দ্র চ□বর্তী, জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য, আশালতা সেন, গোবিন্দ লাল ব্যানার্জি, সুরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত, ব্রজমাধব দাশ, মওলানা আবদুল হামিদ খান, যতীন্দ্রনাথ ভদ্র, মনোরঞ্জন ধর এবং অক্ষয় কুমার দাস প্রমুখ আইন সভার সদস্যগণ যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, আজ চুয়ান্ন বছর পর দু' দু'বার স্বাধীন হওয়ার পর আমাদেরকে একই ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। সেদিনের বক্তব্যের একটি অংশ উলে-খ করতে চাই, আইন সভার সদস্য প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ি বলেন, আজ সংখ্যালঘুদের মনে একটা আশংকা হয়েছে যে বর্তমানে পূর্ব বাংলায় দুটি গভর্নমেন্ট চলছে একটা নাজিমুদ্দিন সাহেবের গভর্নমেন্ট এবং আর একটা মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের গভর্নমেন্ট এবং এই দুই গভর্নমেন্টের মধ্যে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড গভর্নমেন্টই অধিকতর শক্তিশালী।

তাছাড়া তিনি নির্যাতন, উৎপীড়ন ও অত্যাচারের ফলে দেশত্যাগ, কায়দে আযম ফান্ডের চাঁদা, বন্দুক প্রত্যাহার, সম্পত্তি রিকিউজিশন, অফিস-আদালতে অনেক অপমানজনক ঘটনার উলে-খ করেছেন। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের ১০০ দিনে বাংলাদেশের মানুষ কেমন ছিল? বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা এ বিষয়ে গত ২৬শে জানুয়ারি এক ভাষণে বলেন, 'সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন করা, বিরোধীদলকে নজিরবিহীন নির্যাতন করে ঘরছাড়া, এলাকাছাড়া, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দখল, পুকুরের মাছ, গোয়ালের গরু, মুরগীর খামার, জমির পাকা ধান কেটে নেয়া এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির ব্যাপারে সরকার অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়েছে।' তিনি প্রসঙ্গান্তরে বলেন, 'আপনারা এও জানেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পাশাপাশি সমান্তরাল আরেকটি 'হাওয়া' প্রশাসনের কথা সংবাদপত্রেই লেখা হচ্ছে। প্রশ্ন উঠেছে কোন্‌টা বেশি ক্ষমতাধর? প্রশ্ন উঠেছে প্রশাসনে প্রধানমন্ত্রীর নিকট আত্মীয়দের ভূমিকা সম্পর্কে।' ২৩শে মার্চ ১৯৪৮ পূর্ববাংলায়ও আইন সভার প্রথম অধিবেশনের কার্যবিবরণী থেকে দেখা যায় তৎকালীন পূর্ব বাংলায় দুটি সরকার ছিল। সেদিনের আইন সভার বিতর্কে হিন্দুদের সমস্যায় যেসব বিষয় উত্থাপিত হয়েছিল আর এবার নির্বাচনোত্তর হিন্দু নির্যাতনে একই কদর্যরূপ প্রকাশ পেয়েছে। তাহলে কি আমরা (হিন্দুরা) ১৯৪৮-এ ফিরে গেলাম। নেতৃত্বের নির্বুদ্ধিতার খেসারত আর কতকাল দেবে হিন্দুরা! এটা সত্য, চুয়ান্ন বছর আগে হিন্দু প্রতিনিধিরা সংসদে, দেশের কর্ণধারকে অভিযোগ জানাতে পারতেন। ১৯৫০-এর দাঙ্গায় প্রায় ৩৮ লাখ হিন্দু পূর্ব বঙ্গ ত্যাগ করে; কিন্তু ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার আইন পরিষদের জন্য যে নির্বাচন হয় ফলে লোকসংখ্যা অনুপাতে প্রাদেশিক আইন পরিষদের মোট ৩০৯ আসনের মধ্যে সংখ্যালঘু হিন্দুরা পায় ৬৯টি, বৌদ্ধরা পায় ২টি এবং খ্রিস্টানরা পায় ১টি আসন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর সংখ্যালঘুরা কেবল পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে নয়, সমগ্র পাকিস্তানের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। ১৯৫৪-৫৮ (প্রাক-সামরিক শাসন) সময়কালে হিন্দুরা কেন্দ্রীয় ও পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পেতেন। পাকিস্তান গণপরিষদে ৯ জন হিন্দু সংখ্যালঘু সদস্য ছিলেন। যেহেতু আইন পরিষদে হিন্দু সদস্যদের উপস্থিতি balance of power রক্ষা

করতেন, মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব নির্ভর করত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আইন পরিষদের সদস্যদের ওপর। মন্ত্রিসভায় উলে-খযোগ্য সংখ্যক হিন্দু মন্ত্রী থাকায় এবং প্রায় জেলায়ই সংখ্যালঘুদের একটা উলে-খযোগ্য উপস্থিতি ছিল। আইন পরিষদের সদস্য ছিল, নিজস্ব রাজনৈতিক দল ছিল, ছিল প্রশাসনে ২৩% আসন সংরক্ষণ। শিক্ষা, আইন, ব্যবসাসহ সমাজের সর্বক্ষেত্রে হিন্দুদের উপস্থিতি ছিল (অনেক জেলার ৭০%) গড় ৫০%। এ সময়ে হিন্দুদের দেশত্যাগ ছিল শূন্যের কোঠায়। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের দ্বারা ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল হলো; কিন্তু যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করে হিন্দুরা যে সামাজিক বিশ্বাস ও পরস্পরের প্রতি আস্থা স্থাপন করেছিল সামরিক শাসন তা সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করল। রাজনীতিতে ভারত পাকিস্তানের শত্রু অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু কমিউনিস্টদলের সদস্য এবং ভারতপন্থী, অতএব পাকিস্তানের শত্রু এভাবে নানা অজুহাতে হিন্দু নির্যাতন, সম্পত্তি অধিগ্রহণ চলতে থাকে। চলতে থাকে হিন্দুদের দেশত্যাগ। মৌলিক গণতন্ত্রের রাজনীতিতে তারা অপাঙক্তেয় হয়ে যায়। ১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু নেতৃবৃন্দের হুশ হয় যখন তারা দেখেন যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তারা Marginalised হয়ে গেছেন। ওই বছরে জুন মাসে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের (ভাষা আন্দোলনের যাজ্ঞিক, একাত্তরে শহীদ) নেতৃত্বে ২২ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তাহীনতা, আইন পরিষদে সদস্যপদ সংখ্যা, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্যের সমস্যা নিয়ে গভর্নর মোনেম খানের সঙ্গে আলোচনা করেন। এখানে উলে-খ করা যায় যে, ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে কাশ্মিরের 'হযরতবাল' দারগায় রক্ষিত হযরত মোহাম্মদের (দ.) পবিত্র চুল চুরির গুজবে ঢাকা জেলায় ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। এতে কিছুসংখ্যক হিন্দু নাগরিকের ঢাকায় মৃত্যু হলেও নারায়ণগঞ্জ এলাকায় প্রচণ্ড রক্ষক্ষয়ী দাঙ্গা হয়, যার বিবরণ আতাউর রহমান খানের 'স্বৈরাচারের দশ বছর' বইয়ে উলে-খ আছে। এ দাঙ্গা ঠেকাতে গিয়ে ত্রিশজন মুসলমান যুবক আত্মাহুতি দেন। এতদিন জানা ছিল ওই দাঙ্গায় বেগম রোকেয়ার ভাগ্নে আমির হোসেন চৌধুরী নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। সরকার চার হাজার দুষ্কৃতকারী হাঙ্গামাকারীকে গ্রেফতার করে। দশজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। বাঙালি নেতৃত্ব 'বাঙালি রুখিয়া দাঁড়াও' আহ্বান জানান।

এবার নির্বাচনোত্তর হিন্দু নির্যাতন, অত্যাচার, নারীর সম্ভ্রমহরণ, চাঁদা ধার্যকরণসহ অসংখ্য ঘটনা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্টে স্থান পেয়েছে, আমরা তা জানি। আমরা জানি এ কারণেই যেসব ঘটনা আমাদের স্পর্শ করে, সম্প্রদায়ের সদস্য বলে আমাদেরকে জানতে হয়। অষ্টম সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে আমাদের নির্যাতনের কথাগুলো কোন সদাশয় সাংসদ উত্থাপন করবেন কি? মনে পড়ে কবি শেলির কবিতা

"I silently laugh at my own cenotaph,
and out of the caverns of rain,
like a child from the womb, like a ghost
from
The tomb,
I arise and unbuild it again."

সংবাদ, ২ ফেব্রুয়ারি ২০০২

সাম্প্রদায়িকতার উৎস সন্ধান এবং বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নিপীড়ন

আবুল হাসানাত

'আজকের কাগজ'-এর কেরানীগঞ্জ প্রতিনিধি জানিয়েছেন, (২৭ জানুয়ারি ২০০২, পৃষ্ঠা ৯) উপজেলা রাজেন্দ্রপুর এলাকায় সন্ত্রাসীরা বিএনপির ছত্রছায়ায় সংখ্যালঘুদের জমি দখল করেছে। আওয়ামী লীগ নেতা গিয়াসউদ্দিন ও হাজী ফিরোজ আলমের বাড়ি লুটপাট করেছে। ওই সন্ত্রাসীরা গত ১০ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ নেতা ও মুক্তিযোদ্ধা ডা. নূর মোহাম্মদের একটি মার্কেট ও তার মেডিসিন কর্নার (একটি ফার্মেসী) দখল করে নিয়ে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। তাদের দাবি ২ লাখ টাকা; এটা দিলে দোকান খুলে দেয়া হবে। তারা বাঘৈর এলাকায় সংখ্যালঘু শোভা রাণীর দু' একর জমি দখল করেছে এবং ফসলও বুনেছে। এসবের কোনো প্রতিকার পায়নি ভুক্তভোগীরা না স্থানীয় লোকজনের, না ইউপি চেয়ারম্যানের, না আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সদস্যদের কাছ থেকে। ওই প্রতিনিধি জানিয়েছেন, শোভা রাণী ও তার পরিবার ঢাকার তাঁতী বাজার এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতারাও তাদের পরিবারসহ সন্ত্রাসীদের ভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

নির্বাচন হয়েছে অক্টোবরে। সরকার শপথ নিয়েছে ১০ অক্টোবর। সরকারের একশ দিনের সময়সীমা শেষ হয়েছে। সন্ত্রাস দমন করার প্রতিশ্রুতি ছিল বিএনপির নির্বাচনী প্রচারে এবং সরকার গঠনের পর প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে সন্ত্রাসকে এক নম্বর সমস্যা বলে চিহ্নিত করে তা দমন করার অঙ্গীকার করেন। তবুও সন্ত্রাস হচ্ছে; সংখ্যালঘু নির্যাতিত হচ্ছে। বাড়িঘর ও জমিজমা দখল করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং সংখ্যালঘু কেবল নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠকেও অনুরূপ ব্যবহার দ্বারা আপ্যায়িত করা হচ্ছে।

কেন এমনটা হয়? কার জন্যে? এটি একটি জটিল ও কুটিল প্রশ্ন। আমরা জানি, এই বিশাল ভারতবর্ষ, যাকে উপমহাদেশ বলা হয়, তা ছিল বিদেশী শাসিত। তুর্কী-মোঘল আমলে দেশের প্রায় সব এলাকা সামন্তশাসনের অধীন ছিল, ব্রিটিশরা এদেশে বেড়াতে বা হাওয়া খেতে আসেনি, এসেছে বাণিজ্য করতে, তারপর শাসক হয়ে বসেছে। ভেদনীতিতে রাজস্ব রক্ষার প্রধান ও প্রথম হাতিয়ার মনের মাধুরী মিলিয়ে ইতিহাস রচনা করা। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা তা করলেন। ইতিহাসকে ভাগ করলেন প্রাচীন যুগ, হিন্দু যুগ, মুসলিম যুগ ও ব্রিটিশ যুগ বলে; খ্রিস্টান যুগ বলা হল না। জেমস মিল তার 'ব্রিটিশ-ভারতের ইতিহাস'-এর 'সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক বোধহয় তা এক হিসাবে ভারতীয় ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার সূচনা করেছিল এবং পরে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ঐতিহাসিক সমর্থন যুগিয়েছিল। ঐতিহাসিকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় ইতিহাসকে তিন পর্বে ভাগ করার রীতি প্রচলন করেন। এই তিনটি অধ্যায় হল হিন্দু সভ্যতা, মুসলমান সভ্যতা এবং ব্রিটিশ সভ্যতা (বিচিত্র হলো, খ্রিস্টান সভ্যতা নয়) রমিলা থাপার, সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত ইতিহাস রচনা, পৃঃ ১৪। আশ্চর্যের ব্যাপার, ঐতিহাসিকরা এ পর্ব বিভাগ ক্ষেত্রে নিয়েছেন এবং একেবারে এখানকার কথা বাদ দিলে এই পর্ব-বিভাগের যৌক্তিকতা বিচারের কোন চেষ্টাই ভালভাবে করা হয়নি (ঐ পৃঃ ১৪)। আবার অনেক ঐতিহাসিক এই ইতিহাসকে অতীত, মধ্য ও আধুনিক যুগ হিসেবে ভাগ করে থাকেন। ভারতীয় ইতিহাসকে এভাবে ভাগ করার স্থলে যে হিসাব, সে হিসাব খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হলো হিন্দু যুগ, কারণ শাসকবংশ হিন্দুধর্মী ছিলেন। কিন্তু রাজবংশের ইতিহাসের ভিত্তিতে এ যুগকে হিন্দু যুগ মনে করা সঠিক নয়, কারণ যৌথ, ইন্দোগ্রিশীয়, শক, কুষাণ প্রভৃতি

বহু প্রধান রাজবংশই অহিন্দু ছিল।

অনেক রাজাই ছিলেন বৌদ্ধ এবং হিন্দু বিদ্বেষী না হলেও তারা সচেতনভাবে নিজেদের বৌদ্ধ বলে পরিচয় দিতেন। তাহলে কি আমরা মনে করবো যে খ্রিস্টপর্ব ৫০০ সাল থেকে ৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একটি বৌদ্ধ যুগও ছিল? আজকের ভারতে যদি যথেষ্ট সংখ্যক বৌদ্ধ থাকতেন, তা হলে হয়ত এ ধারণাটিও স্বীকৃতি পেত [ঐ পৃ: ১৮]। লক্ষণীয়, হিন্দু (ইন্ডিয়া) দেশে যারা বাস করতেন তাদের বর্ণনার জন্যে আরবরা এটি ব্যবহার করেন, পরে অন্যরা। 'হিন্দু' সংজ্ঞাটি গোড়ায় হিন্দুরা নিজেরা সৃষ্টি বা ব্যবহার করেননি, এটি ছিল একটি বিদেশী শব্দ যা পরে হিন্দুরা গ্রহণ করেছেন। আজকের দিনে আমরা যাকে হিন্দু বলে স্বীকার করি, অতীত যুগে তার প্রায় কোন পরিচয়ই মিলবে না। আজকের অর্থে হিন্দুরা উন্মেষ ঘটে গুপ্ত যুগের পরে, পঞ্চম খ্রিস্টাব্দে (ঐ, পৃ: ১৮)। লক্ষণীয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে দু'জনকে মহান সম্রাট বলা হয়ে থাকে তাদের একজন বৌদ্ধ (অশোক) এবং অন্যজন মুসলমান (আকবর)। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম চালু ও জনসাধারণকে ধর্মান্তরিত করার ক্ষেত্রে সরকারিভাবে রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ব্যবহার করেন। তিনি সামরিক অভিযানের পর ধীরে ধীরে অহিংসা নীতি গ্রহণ করেন এবং অহিংসাভিত্তিক রাজনীতির সূচনা করেন। কিন্তু মধ্যযুগীয় ভারতে রাষ্ট্র কখন ধর্ম প্রচারে কোন আগ্রহ দেখান নি-তবু জনমানসে তা কেবল ইসলাম ধর্ম প্রসারের একটি মাধ্যম হিসেবেই রয়ে গেছে। প্রসঙ্গ□মে উলে-খ্য, 'জাতীয়তাবাদ' বলতে আমরা এখন যা বুঝি তা আঠারো শতকের পরবর্তী সময়ের ধারণা এবং 'জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা একই ধরনের একটি আধুনিক প্র□িয়ার ফল' (বিপনচন্দ্র, আধুনিক ভারতের ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা, পৃঃ ৫৩)। সুরেন্দ্রনাথ, তিলক প্রমুখ নেতারা জাতীয়তাবাদী যে সম্পূর্ণ নতুন সাংগঠনিক নীতি ও মতবাদ এটা মানতেন এবং ভারতবর্ষকে এরা মনে করতেন সবে গড়ে ওঠা একটি জাতি।

মতবাদ হিসাবে জাতীয়তাবাদ স্বার্থকতা পেলো এই কারণে যে তা প্রকৃত সত্যের যথার্থ প্রতিফলন ভারতীয় জনসাধারণের সমগ্র স্বার্থ বিশেষ করে একটি শত্রুর (বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ) বিরুদ্ধে গিয়ে □মশ এক হয়ে মিশে যাচ্ছিল। এমন কয়েকটি বিশেষ বিশেষ স্থানে ও স্তরে আবির্ভূত হলো যেখানে এই নতুন জাতীয়তাবাদী চেতনা গড়ে উঠতে পারেনি। অন্যভাবে বলা যায় যে, জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদ গভীরে প্রবেশ করতে পারলো না বলেই সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হলো (ঐ, পৃ: ৫৪)। লক্ষণীয়, সেখানে বিজ্ঞানসম্মত জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অভাব রয়ে গেছে, সেখানে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদের আবেদন লোকের ওপর রেখাপাত করবে না। সাম্প্রতিক চেতনার ওপর এই ধরনের আবেদন ব্যর্থ হয় অথচ প্রাত্যহিক জীবনের ধর্ম এত প্রভাবশালী বলে লোকে সাম্প্রদায়িকভাবে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক মনে করে। গোড়ার দিকের জাতীয়তাবাদী নেতারা এ ব্যাপারটি খুব ভালো করে বুঝতেন। তাই জাতীয়তাবাদী চেতনাকে গড়ে তোলার ও তার সম্প্রসারণের চেষ্টা করতেন। অন্যদিকে জহরলাল প্রমুখ উনিশশ কুড়ি ও তিরিশের নেতারা ভুল করে ভাবলেন যে পাশ্চাত্য সমাজের মতো এখানেও জাতীয়তাবাদ সমাজের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গেছে। কাজেই তাদের কর্তব্য হলো তাকে লড়াইয়ের স্তরে উপনীত করা। তাই সাম্প্রদায়িকতা হল জাতীয়তাবাদবিরোধী। কিন্তু যেসব লোক আদৌ জাতীয়তাবাদী নন, তাদের মধ্যে একথা একেবারেই সাড়া জাগালো না। উনিশশ' সাতচলি-শের পরও এ ভুলটি রয়ে গেল (ঐ, পৃ: ৩৮)। তাই হিন্দু মুসলমান সমস্যাটি যা গভীর হয়েছিল ব্রিটিশের ভেদ নীতিতে তা জাতীয়তাবাদী নেতারা ধর্মচেতনার প্রতি আবেদন রাখলেন। একথা সত্যি যে তাদের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণই আধুনিক এবং মহৎ। কিন্তু এভাবে তারা যে শুধু জনগণের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে দুর্বল করে দিলেন তা নয়, তাদের নিজেদের চিন্তা ও লেখক সাম্প্রদায়িকতা দোষেদুষ্ট হয়ে উঠলো।

এই সব কারণে এবং মুসলমানদের আর্থিক দুরবস্থা, শিক্ষার অভাব, উত্তর প্রদেশের জমিদার জোতদার নবাবদের হাতে মুসলিম লীগের চাবিকাঠি, জিন্নাহ পাকিস্তান আন্দোলন, ধর্ম ও ইসলামের অপব্যবহার, বাঙলার ও পাঞ্জাবের মুসলিম নেতাদের ভুল ভূমিকা, ফজলুল হক-হাশিম-সোহরাওয়ার্দী-নাজিমুদ্দিন দ্বন্দ্ব, হিন্দু নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা, (দেখুন, সৎপ্রণীত দ্বিখণ্ডিত রক্তাক্ত ভারতবর্ষ) সর্বোপরি বিদেশী শাসকের বিভেদ নীতি এবং শেষ বড়লাট মাউন্টব্যাটেনের চটপট ভারত ভাগ করে (দেখুন, ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম) তার নিজস্ব চাকরিতে যোগদান করে নৌবাহিনীর সর্বোচ্চ পদে অভিষিক্ত হওয়া ভারত ভাগকে অনিবার্য করে তুলল। সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্পে ভরে গেল ভারতবর্ষ। বিষাক্ত ভয়াবহ ঘায়ের মতো জ্বলজ্বল করতে লাগল কলকাতা রায়ট, (১৯৪৬) নোয়াখালী ও বিহারের মুসলিম হিন্দু নিধন (১৯৪৬)। তাই সাম্প্রদায়িকতা হিন্দু মুসলিম সমস্যার সমাধান করলো না, তা বাড়িয়ে দিল, জিইয়ে রাখল। ভারত ভাগ হওয়ার পর পর কলকাতা, দিলি-, পাঞ্জাবে যা হলো তা কোন সভ্য দেশে হতে পারে না। 'আমরা ১৯৪৭-এর বিভাগের দিনগুলির মধ্যদিয়ে এসেছি এবং প্রতিনিয়তই জাতীয় সংহতির প্রয়োজন অনুভব করছি। আমাদের বুঝতে হবেই যে সাম্প্রদায়িকতা আমাদের প্রায় কিছুই দিতে পারে না। এর ফলে শুধু যে প্রচণ্ড ক্ষতি হতে পারে। যেমন মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রণয়নের আগেই ব্রিটিশ ও ভারতীয় ঐতিহাসিকরা তার একটি পূর্বতম সংস্করণ খাঁড়া করেছিলেন, যাকে বলা যেতে পারে একজাতিতত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে ভারতীয় জাতির মানে হলো হিন্দু জাতি, ভারতীয় জনগণ বললে হিন্দু জনগণকে বোঝায়, মুসলমান শাসন ছিল বিদেশি শাসন, সুতরাং ভারতে মুসলমানরা বহিরাগত বিদেশী শাসক ছিলেন, ইত্যাদি (ঐ, পৃ: ৭১)।

তাই পাকিস্তান সৃষ্টি সমস্যার সমাধান করলো না বাড়ালো। যে ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসার ভেতর দিয়ে দেশ ভাগ হলো তাতে সাম্প্রদায়িকতা জিইয়ে রইলো। পূর্ব বাংলার বড়লোক হিন্দুরা তো আগেই চলে গিয়েছিলেন ভারতে যারা ছিলেন তারাও চলে যেতে শুরু করলেন, সাধারণ হিন্দুরাও অসহায় অবস্থা লক্ষ্য করে দেশ ত্যাগ করলো। এখানে ১৯৫০, ১৯৬৪তে দাঙ্গা হল। আর পাকিস্তান শাসকদের ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধ করে পূর্ব পাকিস্তানকে পরিণত করলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রূপে। মনে করার কোনো কারণ নেই। বাংলাদেশ হওয়ার পর এবং ভারত (যাদের বিপুল অংশ হিন্দু) এবং পশ্চিম বাংলার হিন্দু ও ত্রিপুরার হিন্দু যারা বাংলাদেশের মানুষের পিছনে দাঁড়িয়েছিল, শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছিল, ভারত সরকার করেছিল সাহায্য-সহযোগিতা, তার ফলে সাম্প্রদায়িকতার বিষ বুঝি নিঃশেষ হয়ে গেছে। হয়নি। নীরবে, সরবে, চুপে চুপে হিন্দুদের দেশ ত্যাগের কাহিনী প্রমাণ করে সাম্প্রদায়িকতা আমাদের সমাজে কমবেশি টিকে আছে। এখনো যোগ্য হিন্দু বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত হলে শিক্ষিত মুসলমানদের চোখ টাটায়। এই সঙ্গে একথা মনে রাখতে হবে ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে জানুয়ারি ২০০২ পর্যন্ত যেসব সরকার এসেছে তারা হয় লেবাসধারী গণতন্ত্রী, না হয় স্বৈরশাসক। ১৯৯১-২০০২ পর্যন্ত ইতিহাস নিকট অতীতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই পর্যালোচনা করলে একথা বিশ্বাস করা যায় যে, বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের উপাসক, সমর্থক ও নিবেদক। গণতন্ত্রের জন্যে প্রয়োজন কেবল নির্বাচন প্র□িয়া তা শেষ করে তারা কি স্বৈরতন্ত্রী হয়ে যায় না? মূল উদ্দেশ্য ক্ষমতায় বসা।

কাজেই যে দলটির ভেতরে নেই গণতন্ত্র, এখনও বাকশাল-আওয়ামী লীগ টানাপড়েন চলছে। যে বিএনপিতে মুক্তিযোদ্ধা থেকে রাজাকার, প্রগতিশীল ব্যক্তি থেকে প্র□িয়াশীল ব্যক্তির সমাবেশ তাদের পক্ষে ক্ষমতারোহণের পর, নিপীড়ন তো স্বাভাবিক কর্ম। অর্থ-সম্পদ-ধনদৌলতের পাহাড় গড়ে তোলাই তো মুখ্য কর্ম। সরকারের এই লুটেরা চরিত্র তার সমর্থকদের, দলীয় লোকদের প্রভাবিত করবে এবং করেছেও। এরা ব্যাংক লুট করেছে, বিদেশী

সাহায্যের টাকার বিপুল অংশ ভাগ করে নিচ্ছে, নিয়েছে ক্রয়-বিক্রয়ে হাতের তালু ভিজিয়ে নিয়েছে, সেখানে সন্ত্রাসীরা সাধারণ মানুষদের অত্যাচার করবে, ঘরবাড়ি লুট করবে এটা তো স্বাভাবিক। হিন্দু যেহেতু সংখ্যালঘু তাই তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া সহজ। বিএনপি সরকার সন্ত্রাস দমন করতে পারেনি। আওয়ামী লীগ একটি শক্তিশালী দল হিসেবে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারেনি। ১৯৬৪ সালে 'বাঙালি রুখিয়া দাঁড়াও' যারা বলতে পারে এবং কার্যকর করে ফেলে, তারা আজ এত অসহায় কেন? হিন্দু তো দূরের কথা, খোদ আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন? লুকিয়ে আছে কেন? উৎপীড়ন তাদের ওপরও বর্ষিত হচ্ছে কেন? ক্রিয়া ছাড়া কি প্রতিক্রিয়া হয়?

অতএব বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিএনপি তথা চারদলীয় জোট সরকারকে হিন্দু নিপীড়ন বন্ধ করতেই হবে। আওয়ামী লীগ কর্মী-নেতাদের ওপর যে অত্যাচার হচ্ছে তাও বন্ধ করতে হবে। সন্ত্রাসীদের কোনো দল নেই, অতীতে আওয়ামী লীগ সরকার একথা বলেছে, এখন এ সরকার বলছে। যেহেতু বর্তমান সরকারের দায়িত্বই প্রধান, সেহেতু সন্ত্রাসীদের কঠোর হস্তে দমন করতে হবে; তাদের গ্রেফতার করে বিচার করে শাস্তি দিতে হবে; সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা অবশ্যই দিতে হবে। কারণ সমাজে অস্থিরতা ও নিপীড়ন অব্যাহত থাকলে তার ফল শুভ হয় না, হতে পারে না।

আজকের কাগজ, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০২

মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ

এম আমীর-উল ইসলাম

বিগত পহেলা অক্টোবরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ও পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের জনগণ যে নারকীয় সন্ত্রাস ও সহিংসতার জঘন্যতম ঘটনা প্রত্যক্ষ করছে, তা কেবলমাত্র ১৯৭১ সালের ভয়াবহ দিনগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও মহান ত্যাগের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে বিশ্ব মানচিত্রে একটি স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে বাংলাদেশের অভ্যুদয়। তথাপি ভাগ্যের পরিহাস যে, জন্মলগ্ন থেকে সুদীর্ঘ ৩১ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর, আজও 'এ দেশ প্রতিষ্ঠার মূল আদর্শ ধ্বংসের ষড়যন্ত্র' হতে বাংলাদেশ নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। মহান শহীদদের চরম আত্মত্যাগে অর্জিত স্বাধীনতার আদর্শ ও মূল্যবোধ অসহিষ্ণু মৌলবাদী শক্তির আক্রমণ ও রোষানলের শিকার হয়েছে। এরা একই শক্তি, যারা এই দেশ সৃষ্টির বিরোধিতা করেছিল এবং ১৯৭১ সালে ঘটিয়েছিল ইতিহাসের এক জঘন্যতম গণহত্যা। অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং আইনের শাসন ও মৌলিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম এরা বারবার বাধাগ্রস্ত করেছে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে প্রতিফলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র-অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক ভিত্তি নস্যাৎ করার অপচেষ্টায় এরা লিপ্ত।

খবরের কাগজে বিভিন্ন রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ৮৭ দিনে ২৪৮৩টি সহিংসতার ঘটনা ঘটে যার মধ্যে ছিল ৯০৬টি হত্যাকাণ্ড। ১৫৬১৬ জন হয় আহত। বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক খবরের কাগজে প্রকাশিত ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত সংকলিত বিভিন্ন রিপোর্টে প্রতীয়মান হয় যে, জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর কয়েকশ হত্যাকাণ্ড ঘটে, হাজার হাজার ব্যক্তি আহত হয়, ৪১০০০ নির্যাতিত হয়, এবং কয়েকশ নারী হয় ধর্ষিত। প্রতি দিনের দৈনিকে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী হত্যা, ধর্ষণ ও নিগৃহীত হওয়ার সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

রাষ্ট্রযন্ত্র এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও পুলিশ প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। তাদের উপস্থিতিতে ক্ষমতাসীন দলের সন্ত্রাসীরা নির্বিচারে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংগঠন করে চলেছে। নির্যাতিতরা সুবিচার ও প্রতিকার থেকে বঞ্চিত। পুলিশ কিংবা সাংবাদিকের নিকট অভিযোগ আনয়ন কেবলমাত্র দমন-নিপীড়নই বৃদ্ধি করেছে। এর পরও পুলিশের নিকট যাওয়ার সাহস সঞ্চয় করে কেউ যদি মামলা করতে যায় তা রুজু হতে দেওয়া হয় না এবং পুলিশ তা এক্তিয়ারভুক্ত করতে অস্বীকার করে। অপরদিকে রাজনৈতিক নিপীড়নের যারা শিকার হন, তাদেরকে আবার অধিকতর হয়রানি ঘটানোর লক্ষ্যে মিথ্যা মামলায় জড়ানোর মাধ্যমে নতুন আতঙ্ক সৃষ্টির কাজ অব্যাহত রয়েছে। এই কারণে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা গৃহছাড়া, এলাকা ও গ্রামছাড়া। এই সকল হাজার হাজার নির্যাতিত ব্যক্তি রাজধানী ও জেলা সদরে আশ্রয় গ্রহণ করছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে যে, এসব রাজনৈতিক নিপীড়নের যারা শিকার হচ্ছেন তাদের পুকুর ও ঘের থেকে মাছ, মাঠ থেকে ফসল, শস্য বাগান থেকে শাকসব্জি এবং দোকান থেকে মালামাল লুট করে তাদের রাতারাতি চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন করা হয়েছে। গত সপ্তাহে শুধুমাত্র ঢাকা থেকে ওয়ার্ড কমিশনারসহ ওয়ার্ড পর্যায়ের প্রায় ২৫০ জন আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আরো বহু তালিকাভুক্ত রয়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। ১১ দলের জোটের প্রায় ৫০ জন কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একইভাবে সারা দেশে গ্রেফতার চলছে। প্রথমে তাদের ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখানো হয় এবং পরে বিশেষ ক্ষমতা আইনের অধীনে আটকাদেশ দেওয়া হয়েছে। যারা এলাকায় জনমত গঠনের মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষমতা রাখে, তারাই মূল লক্ষ্য।

খবর প্রচারের প্রধান উৎস, সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের ওপর প্রচণ্ড চাপ ও হয়রানি সৃষ্টি করা হচ্ছে। শাহরিয়ার কবিরের নিগ্রহের অপর উদ্দেশ্য অন্য সকলের নিকট ভীতিকর বার্তা পৌঁছে দেওয়া যে, এসব বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ, রিপোর্ট ও প্রচার করার জন্য তাদের ভাগ্যেও এমনটি ঘটতে পারে। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক এমনকি বৌদ্ধ সংঘের ন্যায় একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকেও অনুরূপ হয়রানির শিকার হতে হয়। বৌদ্ধ সংঘের নির্বাচিত কমিটিকে অবৈধভাবে বাতিলের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তাদের দ্বারা বৌদ্ধ সংঘের কমিটি গঠনের অবৈধ আদেশ সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হয়। এমনিভাবে নির্বাচিত ভাইস-চ্যান্সেলারদের পদচ্যুত করা হয়েছে। এখন সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। সহিংসতার ঘটনার স্থির চিত্র ও ভিডিও ধারণকারী সংগঠনসমূহকেও নানা চাপ ও বিপদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ও পুলিশ প্রশাসনের ক্ষেত্রে বিশেষত তাদের চাকরির শর্তাবলীতে দীর্ঘ ঐতিহ্য হচ্ছে যে, তাদের চাকরির মেয়াদকাল কোনো হঠকারিতামূলক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পরিবর্তন করা যাবে না। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারির নির্বাচন ফলাফল প্রত্যাখানের দাবিতে জনতার মঞ্চে যোগদানের অজুহাত তুলে স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গণহারে অভিযোগ আনা হচ্ছে। যাদের চাকরিকাল ২৫ বছর হয়েছে তাদের নির্বিচারে বাধ্যতামূলক অবসরদান। সরকারি কর্মকর্তাদের চাকরির মেয়াদের নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করেছে। এদের প্রায় সকলেই মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সরকারি কর্মচারী।

এছাড়া জুলাই ২০০১ থেকে আজ অবধি সকল পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তাদের যত্রতত্র বদলি সমগ্র প্রশাসনকে করেছে আতঙ্কিত ও দুর্বলচেতা। কেননা প্রশাসনের সকল পদক্ষেপ আজ নির্ভর করছে তাদের রাজনৈতিক প্রভু কী দৃষ্টিতে যে পদক্ষেপকে দেখবে তার ওপর।

সারাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কর্মী ও সমর্থকদের উপর

নির্যাতনের প্রেক্ষাপটে দেশের বেসামরিক ও পুলিশ প্রশাসনকে সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে ব্যবহার করা শুধুমাত্র যে নির্যাতিতদের জন্যে দুর্ভোগ বয়ে আনছে তাই না। এটা সর্বক্ষেত্রে এক চরম অরাজকতা, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে, যা থেকে কারো নিস্তার নেই।

এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় যে, অপরাধ সংঘটনের প্রতি এক ধরনের 'সহিষ্ণু' মনোভাব গড়ে উঠেছে। সহনশীলতার মাত্রা এতখানি বৃদ্ধি পেয়েছে যে দেশজুড়ে হত্যা, খুন, লুট, ধর্ষণ, সহিষ্ণুতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো অপরাধও মানুষের মনে সাড়া জাগাতে পারছে না এবং এহেন অবস্থার অবসানকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে এক ধরনের নির্লিপ্ততা।

আন্তর্জাতিক মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচার নিশ্চিত করার ব্যর্থতাই পরবর্তী সময়ে অনুরূপ অপরাধ সংগঠন ও পুনরাবৃত্তির অন্যতম প্রধান কারণ। একইভাবে এই কারণ 'সহনশীলতা' বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজে অপরাধপ্রবণতা বাড়িয়ে তুলেছে। মানবতাবিরোধী অপরাধের প্রতি সহিষ্ণু মনোভাব অপরাধকে প্রশ্রয় দেওয়ার শামিল। এর সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা প্রয়োগকারী সংস্থার নির্লিপ্ততার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে এবং সে কারণেই রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে রাষ্ট্রযন্ত্র এই ধরনের অপরাধ সংগঠনের ক্ষেত্রে অপব্যবহৃত হচ্ছে। এই দুইয়ের মাঝে সীমারেখা অতীব ক্ষীণ, যা সহজে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ক্ষমতাসীন দলের বিকৃত রাজনৈতিক এজেন্ডা প্রশাসনকে প্রভাবিত করছে। কারণ বাংলাদেশের অস্তিত্ববিরোধী চরম মৌলবাদী শক্তির মদদপুষ্ট 'জোট সরকার' ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এটা আরো বিপজ্জনক রূপ নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর নির্যাতন-নিপীড়নের পাশাপাশি চলছে স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃতি। শিশু ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের টেক্সট বুক পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে স্বাধীনতার ইতিহাসের নামে এক ধরনের মিথ্যাচার, যাতে নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা তাদের নিজস্ব ইতিহাস সম্পর্কে থাকে অজ্ঞ। জাতিকে এমনিভাবে ইতিহাসের কানাগলির দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

রাজনৈতিক পক্ষ-প্রতিপক্ষ সৃষ্টি করে কাউকে দোষারোপ করা বা কোনো নেতিবাচক উদ্দেশ্য নিয়ে এ সম্মেলন ডাকা হয়নি, কেননা আমরা সকলেই জানি এবং এই মর্মে ঐক্যমত্য পোষণ করি যে, রাজনীতিকে অপরাধমুক্ত রাখা এবং অপরাধকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা একান্ত আবশ্যক। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনকারী যেখানেই থাকুক না কেন বা যে দলই করুক না কেন তার বিচার নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এই কনভেনশনের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রতিটি মানবতাধর্মী মানুষের বিবেকের কাছে এই মর্মে আবেদন জানানো যে, একটি মুহূর্তে নিরালায় ভাবা প্রয়োজন যে, এ ধরনের সহিংস ও সংঘাতময় পরিস্থিতি সমগ্র জাতিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। আমরা যদি দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে এগিয়ে যেতে না পারি তাহলে অন্ধকারাচ্ছন্ন ধর্মান্ধ ও অসহিষ্ণু শক্তির কাছে পরাভূত হতে হবে। এর ফলশ্রুতিতে সকল ক্ষমতার উৎস যে জনগণ, তারা সন্ত্রাসীর হাতে জিম্মি হয়ে পড়বে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, আজ এই সকল ঘটনা সংঘটনের কারণ উদ্ভাবন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। সেই সঙ্গে সকল সন্ত্রাস ও মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ার লক্ষ্যে পন্থা উদ্ভাবন করাও প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, যেসকল কারণে নিরীহ ব্যক্তি তাদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য অপরাধের শিকার, তা বিশে-ষণের প্রয়োজন রয়েছে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য এই বিশে-ষণ আজ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মানবতার বিরুদ্ধে তাদের এই ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উদঘাটন ও দেশ-বিদেশে তাদের যোগসূত্রের জাল চিহ্নিত করার লক্ষ্যে তদন্ত অত্যাবশ্যক। এমনি তদন্তে

র মাধ্যমে এই ষড়যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও তাদের আঞ্চলিক ও বিশ্বব্যাপী যোগসূত্রের জালকে চিহ্নিত করা সম্ভব। এই সমস্যার জাল অতীব গভীরে বিস্তৃত। সে কারণে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা ও নীতিমালা গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। আশা করা যায়, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটন প্রতিহত করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধ করতে পারবে।

অপরাধীদের ধরপাকড়-বিচার অনুষ্ঠানসহ অপরাধের যারা শিকার হয়েছেন, তাদের ক্ষতিপূরণ দান ও এর যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এই জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি, মানসম্মান ও অস্তিত্বের জন্য অতি জরুরী। এমনই একটি জরুরী আবশ্যকতার উপলব্ধি থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি নিবেদনের লক্ষ্যে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' শীর্ষক জাতীয় কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছে।

প্রথম আলো, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২

ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে

ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক ও বাসুদেব ধর

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক হামলা ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তি সব সময় তৎপর, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এই তৎপরতা ব্যাপকতা লাভ করবে। সম্প্রতি অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িক শক্তি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর ব্যাপক হামলা চালায়, নির্যাতন নিপীড়ন করে। এ হামলা এখনো অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান সরকার প্রথম থেকে এই সাম্প্রদায়িক হামলার কথা অস্বীকার করায় সাম্প্রদায়িক অপশক্তি, সমাজবিরোধী ও দুস্কৃতকারীরা প্রকারান্তরে মদদ পায়। ফলে গোটা পরিস্থিতি এক জটিল রূপ নেয়। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বের প্রশ্নটিই এখন সামনে চলে এসেছে। এভাবে জনসংখ্যার এক বিরাট অংশের অস্তিত্ব বিপন্ন করে গোটা জাতিকে কার্যত এক অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলেও গোড়া থেকে রাজনীতিতে দুটি ধারা কাজ করে আসছে। একটি হচ্ছে বাঙালির হাজার বছরের ঐক্যবোধের চেতনাসমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা, যা ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধের দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভিত্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছে। পাকিস্তানি আমলে যে সাম্প্রদায়িক অগণতান্ত্রিক ধারা গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে কাজ করে আসছিল, সেটিই পরবর্তীকালে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল রাজনীতির বিরোধী প-াটফর্মে শামিল হয়ে মূল শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক গ্রুপ যাদের প্রধান রাজনীতি আওয়ামী ধারার বিরোধিতা এদের মধ্যে অবশ্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অনেকেই আছেন। ইউরোপ, আমেরিকায় রাজনীতিতে দুটি মূলধারা থাকলেও রাষ্ট্রীয় নীতিগত অবস্থান, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও ইতিহাস চেতনার ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে মৌলিক কোনো ব্যবধান নেই। বিবর্তনের মাধ্যমে দুই ধারাই আধুনিক উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আরো পরিপুষ্ট হয়েছে। প্রতিযোগিতা হচ্ছে জনস্বার্থ রক্ষা ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই দৃষ্টিভঙ্গি, সচেতনতা ও বাস্তবতার অভাব লক্ষ করা যায়।

এই প্রেক্ষাপটেই বাংলাদেশে বর্তমান সাম্প্রদায়িক হামলা ও রাজনীতির বিচার করতে হবে। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হামলা নতুন নয়। পাকিস্তানি আমলের মতো বিভিন্ন সময়ে নানা ইস্যুকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা করা হয়েছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে কয়েক দফা ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হামলা হয়, লাখ লাখ ধর্মীয় সংখ্যালঘুকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়। এসব হামলা চালানো হয় রাষ্ট্রীয় মদদে। এর উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি জাতিকে তার সমৃদ্ধ এতিহ্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস থেকে বিচ্যুতি ও বিচ্ছিন্ন করে ধর্মান্ধ ও সাম্প্রদায়িক ধারায় নিয়ে যাওয়া। এই পরিকল্পনারই অংশ হিসেবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও নিপীড়ন চালানো হয়, ধর্মের ভিত্তিতে জনসংখ্যা বিনিময়ের উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং পৃথক নির্বাচনসহ বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে ধর্মীয় বিভাজনকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। তৎকালীন পাকিস্তান থেকে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের নির্মূল এবং গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সাম্প্রদায়িকীকরণই ছিল এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। কিন্তু তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধিকার ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হওয়ায় এবং মুক্তিযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাওয়ায় সাম্প্রদায়িকীকরণ ও 'এথনিক অ্যান্ড রিলিজিয়াস ক্লিনজিং' সফল হয়নি। তবে '৪৮, '৪৯ ও ৫০ সাল এবং '৬৪ সালের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হামলায় বহু ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। পাশাপাশি ধর্মীয় বৈষম্য, নিরাপত্তাহীনতা ও অনিশ্চয়তার কারণে প্রতি বছরই দেশত্যাগের ঘটনা ঘটেছে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের অবসান ঘটিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণীত হয়, কিন্তু সমাজ, রাজনীতি ও প্রশাসন থেকে ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করা যায়নি। রাজনৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সংবিধানের গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র পাল্টে দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়ায় সাম্প্রদায়িক শক্তি মদদ পায়। ফলে পাকিস্তানি ধারা অনুসরণ করে সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতন-নিপীড়ন চালানো হয় এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দেশ থেকে বিতাড়ন করা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা আবার অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়। তবে আশি ও নব্বইয়ের দশকের গণআন্দোলনে গণতান্ত্রিক চেতনা বিকশিত হওয়ায় সাম্প্রদায়িকতা বাধাগ্রস্ত হয়। '৮৯, '৯০, '৯১ও '৯২ সালে গণআন্দোলন ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের আশান্বিত করেছিল।

গণদাবির প্রেক্ষিতে ১৯৯১, ১৯৯৬ এবং ২০০১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সাংবিধানিক নিয়মে। অভিন্ন শত্রু স্বৈরশাসনের পাশাপাশি রক্ষণশীল, অগণতান্ত্রিক, ধর্মান্ধ ও সাম্প্রদায়িক শক্তি রাজপথে থাকায় প্রগতিশীল ধারার বিরুদ্ধে সংঘাতে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে অগণতান্ত্রিক, ধর্মান্ধ ও সাম্প্রদায়িক শক্তি বিভক্ত অবস্থায় নির্বাচনে অংশ নেয়, মূলত নিজেদের গোছাতেই তারা ব্যস্ত ছিল। এরপরও নির্বাচনের পূর্বে ও পরে সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটে, তবে অনেকটা বিচ্ছিন্নভাবে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপি জামায়াতের সমর্থনে ক্ষমতায় যায়, তবে রাজপথে আন্দোলন শুরু হলে জামায়াত দলকে চাঙ্গা করতে কৌশলগত কারণে সমর্থন প্রত্যাহার করে রাজপথে অবস্থান নেয়। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপরীতে দক্ষিণপন্থী ও সাম্প্রদায়িক দলগুলো বিভক্ত অবস্থায় অংশগ্রহণ করে। এই নির্বাচনেও সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু গণতান্ত্রিক ধারার প্রধান শক্তি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাওয়ার সহিংসতা তীব্র হয়ে ওঠেনি। প্রশাসনে অসাম্প্রদায়িক শক্তির অবস্থান এবং রাজপথে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ধারা সমান্বয়ে শক্তি সঞ্চয় করায় দক্ষিণপন্থী ও সাম্প্রদায়িক দলগুলো অস্তিত্ব রক্ষায় জোটবদ্ধ হয়। জোটের ঘোষণা ও প্রচারণায় মূলত ধর্মীয় বিভাজন ও সাম্প্রদায়িকতাই রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, ধর্মান্ধ ও সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উসকে দেওয়া হয়। অসাম্প্রদায়িক ধারায় বিভক্তি এনে দলীয় শক্তিকে ভারি করার জন্য জোটের নেতৃত্বদানকারী বিএনপি মাঝে মাঝে মুক্তিযুদ্ধ ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কথা বলেছে, মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় গঠনের কথা বলেছে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে তদানীন্তন বিরোধীদলীয় নেত্রী, বিএনপির চেয়ারপারসন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এক সমাবেশে সকল ধর্মের সমমর্যাদা ও সবাইকে নিয়ে দেশগড়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এতে অনেকেই প্রত্যাশা করেছিলেন, বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট নির্বাচন ও রাজনীতিতে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করবে না, একটা উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিই দুটি প্রধান রাজনৈতিক ধারায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নিয়ে। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। জোটের নির্বাচনী প্রচারণায় ইসলামী শাসন ও মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার কথাই প্রাধান্য পেয়েছে।

বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতির দুর্বলতম দিক হচ্ছে, সামাজিক ও রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় সন্ত্রাসীরা লালিত ও ব্যবহৃত হয়। প্রধান দলগুলোই প্রতিপত্তি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করে। সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২৩ জন শীর্ষ সন্ত্রাসীর তালিকা প্রকাশ করে তাদের ধরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে দেখা যাচ্ছে এদের মধ্যে ১৮ জন বিএনপির সঙ্গে এবং ৫ জন আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশি-ষ্ট। অন্যান্য দলেও সন্ত্রাসীদের অবস্থান রয়েছে। ক্ষমতায় যাওয়া এবং ক্ষমতায় থাকার জন্য অর্থ ও অস্ত্র ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। একদিকে রাজনৈতিক লক্ষ্যপূরণ এবং অন্যদিকে এ লক্ষ্যে সন্ত্রাসের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সমাজের দুর্বলতম শ্রেণীসমূহ। ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা এভাবেই সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়।

সাম্প্রদায়িক শক্তি বাংলাদেশে দীর্ঘদিন থেকেই তৎপর। গণতান্ত্রিক সংবিধানকে ধর্মীয় বিভেদ ও বৈষম্যমূলক করে রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিকভাবে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হয়েছে। জীবন-জীবিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি, সাম্প্রদায়িক হামলা, নির্যাতন-নিপীড়ন এবং দেশত্যাগে বাধ্য করা মূলত সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক পরিকল্পনারই অংশ। এই পরিকল্পনা পাকিস্তানের 'এথনিক অ্যান্ড রিলিজিয়াস ক্লিনজিং'-এরই ধারাবাহিকতা। পাকিস্তানি ধারার সঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক শক্তিই এ অঞ্চলে পাকিস্তানের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তান 'এথনিক অ্যান্ড রিলিজিয়াস ক্লিনজিং'-এর মাধ্যমে সেখানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের হার আজ ৩ শতাংশে নামিয়ে এনেছে। পাকিস্তানি মদদে আফগানিস্তানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মধ্যযুগীয় ও ধর্মান্ধ এই ধ্যানধারণায় শুধু ধর্মীয় ও জাতিগত দিক থেকে সংখ্যালঘুরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, সামগ্রিকভাবে ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত হয়েছে। পাকিস্তানি পৃষ্ঠপোষকতায় আফগানিস্তানে প্রতিষ্ঠিত তালেবানি শক্তি সেখানে কীভাবে মানব সভ্যতার অর্জন এবং দেশের সর্বজনীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে বিশ্বসভ্যতার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল, তা আমাদের সামনে এখনো নজির হয়ে আছে। এই হঠকারিতা ও ধর্মান্ধতা দেশ ও জাতির জন্য চরম বিপর্যয় ডেকে আনে।

প্রথম আলো, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০২

সাম্প্রদায়িকতা ও সংখ্যালঘু প্রসঙ্গ

অপু সারোয়ার

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা বিরাজ করছে, অথবা ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার হচ্ছে এটা নিয়ে বিজ্ঞজনের মাঝে বিতর্ক রয়েছে। বিতর্ক যাই থাকুক না কেন এ ভূখণ্ডে বসবাসরত ধর্মীয় সংখ্যালঘু, জাতিগত সংখ্যালঘুরা ভাল নেই। বিগত তিন দশকে হিন্দু সম্প্রদায়ের নীরব দেশত্যাগ ঘটেছে। দেশত্যাগের সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া দুষ্কর। তবে শহর-গ্রামে এখন হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা কমেছে। এটা বোঝার জন্য গবেষকদের উপাত্তের প্রয়োজন পড়ে না।

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের (হিন্দু-মুসলমান আলাদা জাতি) ভিত্তিতে ভারত ভাগ হল। ভারত ভাগ হওয়া বড় বিষয় নয়। ধর্মের ভিত্তিতে বাংলা, পাঞ্জাব ভাগ হল। অপরাধ একটাই। ওরা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী!

১৯৪৭ সালের পর এ ভূ-খণ্ডের হিন্দুরা ভাল নেই। নিরাপত্তাহীনতা তাদের নিত্যসঙ্গী। কখনও শত্রু সম্পত্তি আইন, কখনও সংবিধানের পরিবর্তন, রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা তাদের নিরাপত্তাহীনতাকে স্থায়ী করেছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্ম নিয়ে সমস্যাটা স্থায়ী রূপ নিয়েছে। হাজার হাজার বছর আগে ভারতে আর্যদের আগমন বর্ণবাদী সমস্যার সৃষ্টি করে। বর্ণবাদ থেকে জাতপাতের সৃষ্টি। কাল□মে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের আগমণে জাতপাতের সমস্যা সাম্প্রদায়িক সমস্যায় রূপান্তরিত হয়। এসব ক্ষেত্রেই শোষকশ্রেণী নিজেদের প্রয়োজনে এসব বিভাজন তৈরি করেছে। মানুষে মানুষে বিভাজন থাকলে শোষণ করা সহজ বিষয়টি শাসকরা সভ্যতার শুরুতেই বুঝেছিল।

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীনকালে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে বিরাজিত দ্বন্দ্ব কয়েক শতাব্দী স্থায়ী ছিল। আড়াই হাজার বছর আগে হিন্দু ও বৌদ্ধদের সংঘাতে পরাজিত বৌদ্ধদের একটা বড় অংশ বর্তমান শ্রীলংকাতে বসতি স্থাপন করে। বিজয় সিংহের নেতৃত্বে সিংহলী নামে পরিচিত হয়ে ওঠে তারা। প্রাচীন কালে এই সংঘাত রাজ্য নিয়ে হলেও এর সঙ্গে ধর্ম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল।

এ অঞ্চলে ইসলামের আগমন ঘটে তুর্কী, ইরানীদের রাজ্য বিস্তারের অনেক আগে। যখনই মুসলমানরা শাসক হয়ে উঠলো তখন অন্য শাসকদের সঙ্গে তাদের বিরোধ বাঁধল। এই বিরোধ ছিল ক্ষমতার। তবে এগুলো পরিচয় পেল হিন্দু-মুসলমানদের সমস্যা হিসাবে। মধ্যযুগে রাজাদের সম্পদ উপাসনালয়ে রাখা হত। সে সময় রাজায় রাজায় লড়াইয়ে উপাসনালয় লুট হবার ঘটনা ঘটেছে। আজকাল কেউ কেউ উপাসনালয় আ□মণের ঘটনাকে বর্তমান সময়ে নিজেদের সৃষ্ট হানাহানির অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করে থাকে।

মোঘল আমল থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থিতি অবস্থা নেয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে স্থায়ী করতে সম্রাট আকবর সব ধর্মকে সমন্বিত করে নতুন ধর্ম দীন-ই-ইলাহী প্রচারের চেষ্টা করেন। আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার কিছু অভিযোগ রয়েছে। তবে আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিরপেক্ষ দৃষ্টি থেকে তোলা হয়েছে তিনা তা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে।

ইংরেজদের উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টাতে থাকে। ইংরেজ শাসকরা ‘ভাগ কর ও শাসন কর’ নীতিতে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে। ইংরেজদের ক্ষমতা দখলকে মুসলমান শাসক শ্রেণী মুসলমানদের পরাজয় হিসাবে চিত্রিত করতে সক্ষম হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের উপরিভাগ ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে থাকে। ইংরেজ

শাসনামলের প্রথম একশ’ বছর সামাজিক অস্থিরতায় মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে পড়ে। ইংরেজদের শাসনামলের পুরো সময় জুড়ে নানাভাবে সাম্প্রদায়িকতা, হিন্দু সম্প্রদায়ের জাতপাতের সমস্যা, মুসলমানদের আশরাফ-আতরাফ সম্পর্ককে উৎসাহিত করা হয়। ইংরেজদের দশ বছরের শাসনামলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নানান ধরনের সাম্প্রদায়িকতা সমাজে স্থায়ী রূপ নেয়। ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ গঠিত হয়। দুটো রাজনৈতিক দলই ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের মধ্যদিয়ে বেড়ে ওঠে। কংগ্রেস মূলত হিন্দি বলয়ের সামন্ত ও পুঁজির প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে ওঠে। হিন্দু বলয়ের পুঁজির সাথে পাঞ্জাবের পুঁজির দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিনের। প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাবী পুঁজি টিকতে না পেরে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, বার্মার বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তর করেছে। এ সব দেশে আজও ক্ষুদ্র পুঁজির প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে পাঞ্জাবী মধ্যবিত্তের অবস্থান নজরে পড়ে। ইংরেজ শাসনে পশ্চাৎপদ মুসলমানদের পাশে দাঁড়ায় পাঞ্জাব ও বর্তমান পাকিস্তানের সামন্ত প্রভু ও পুঁজির বিকাশ। এই দুই অংশের পুঁজির প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাম্প্রদায়িকতায় রূপ নেয়। যা দেশ ভাগের মধ্যদিয়ে নতুন রূপ পায়।

ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিনগুলোতে ভারতের বিভিন্নাংশে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতার সংগ্রাম গড়ে ওঠে। এই আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতার লড়াইয়ের সঙ্গে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িকতা ও দেশভাগের কোনও সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাগাল্যান্ডে স্বাধীনতার সংগ্রাম তুঙ্গে ওঠে। ঠিক ভারত বিভক্তির কয়েক মাস আগে কাশ্মিরি কর বিরোধী সংগ্রাম বিদ্রোহের রূপ নেয়। এগুলোর কোনও সমাধান হওয়ার পূর্বেই ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করে। ভারত-পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত হয়। পূর্ববাংলা পাকিস্তানের অংশ হয়। ব্রিটিশ শাসনের শেষ পঞ্চাশ বছরে বাংলার বিভক্তি ঘটে দু’বার।

১৯০৩ সালে ব্রিটিশ শাসনের সুবিধার্থে বাংলাদেশ ভাগ করা হয়। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য বাংলা ভাগ রদ আন্দোলন হয়। তবে এই আন্দোলনের অর্থনৈতিক দিক ছিল। কলকাতাবাসী জমিদার, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার উঠতি ধনিকরা পূর্ববাংলা ব্যবসা হারানোর আশঙ্কা বাংলা ভাগ রদ আন্দোলনের অর্থনৈতিক দিক। এই অর্থনৈতিক দিকের সঙ্গে পশ্চাদপদ মুসলমান সমাজের হাতে ব্যবসা-বাণিজ্য চলে যাওয়ার ঈর্ষা কাজ করেছে। বাংলা ভাগ রোধ সম্ভব হয়েছিল। তবে বাংলা ভাগ ও রদ দুটোই সাম্প্রদায়িকতাকে পোক্ত করে। যা পরবর্তী ঘটনাসমূহকে ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত করেছে।

১৯৪৭ সালে গান্ধী-জিন্নাহ-নেহেরুর আপোষরফায় দ্বিতীয়বার বাংলা বিভক্ত হল। ভারত-পাকিস্তান সৃষ্টি হল। প্রথমবারে বাংলা ভাগের বিরোধিতাকারীরা নিষ্ক্রিয় থাকলেন। মা-মাটি নিয়ে কাব্য-কবিতা দেশাত্মবোধ কোনও কিছুই টিকলো না। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির জয় হল। পূর্ববাংলা হল পাকিস্তানের অংশ। পশ্চিম বাংলায় উড়লো ভারতের পতাকা। এই আলোচনা পূর্ববাংলাকেন্দ্রিক।

পাকিস্তান খোলামেলাভাবেই মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার পক্ষে ছিল। এখান থেকেই সংখ্যালঘু সমস্যার সৃষ্টি। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সমস্যাটা পূর্ববাংলাকেন্দ্রিক। সিন্ধুসহ অন্যান্য প্রদেশে সংখ্যালঘুর সংখ্যা কম থাকায় নীরবে দেশ ত্যাগ ঘটতে থাকে। বিভিন্ন প্রগতিশীল আন্দোলনকে ‘হিন্দুদের চ□ান্ত’ হিসাবে চিহ্নিত করে প্রচার চালাতে থাকে পাকিস্তান সরকার। ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম সব কিছুতেই পাকিস্তান সরকার ‘হিন্দুদের চ□ান্ত’ খুঁজে পেত। ঠিক আজ যেমন কাশ্মিরে ভারতীয় আধিপত্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে ভারত ‘পাক ষড়যন্ত্রের’ গন্ধ খোঁজে। কিংবা সিন্ধী জাতীয়তাবাদের মধ্যে পাকিস্তান খুঁজে ফেরে ‘ভারতীয় ষড়যন্ত্র! পূর্ববাংলার হিন্দুদের উলে-খযোগ্য অংশ ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষকতাসহ

প্রতিনিধিত্বকারী পেশায় যুক্ত ছিল। দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে এদের দেশত্যাগ ঘটে। হিন্দু সম্প্রদায়ের 'অগ্রসর' অংশের দেশত্যাগ পুরো সম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থাহীনতার জন্ম দেয়। এই আস্থাহীনতায় ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার সমস্যাকে জটিল থেকে জটিলতর করে।

পাকিস্তানের প্রথম দিন থেকেই পূর্ববাংলার ওপর বৈষম্যমূলক আচরণ চলতে থাকে। প্রথমেই আসে ভাষা সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা আসে। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে হিন্দুদের ঐতিহ্য হিসাবে নাকচ করে দেওয়ার রাষ্ট্রীয় চেষ্টা চালানো হয়। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলার রাজনীতি পরিবর্তিত হতে থাকে। এই পরিবর্তনের ধারায় মুসলিম লীগের অপেক্ষাকৃত উদারপন্থীরা আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করে। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগে এর রূপান্তর ঘটে। কালক্রমে একাধিক গণতান্ত্রিক সংগঠনের জন্ম হয়। পাকিস্তানে কমিউনিস্টরা কখনও সংগঠিত হতে পারেনি। দেশ বিভাগ পরবর্তী কমিউনিস্ট পার্টির হঠকারী রাজনীতির চর্চা দলকে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করায়। কমিউনিস্ট পার্টির উচ্চ পর্যায়ের প্রায় সকল নেতাই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায় থেকে আগত। হিন্দুরা পাকিস্তানের শত্রু, মুসলমানদের শত্রু এই অজুহাতে কমিউনিস্ট নির্যাতন সহজ হয়ে দাঁড়ায়। নির্যাতনের ফলে ব্যাপকহারে দেশান্তর ঘটে। কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে ময়মনসিংহের গারো পাহাড় এলাকা ও রাজশাহীর নাচোল এলাকায় সংখ্যালঘু জাতি গারো, হাজং ও সাঁওতালদের সংগঠিত আন্দোলনকে পাকিস্তান সরকার দমনপীড়নের মাধ্যমে সহজেই নির্মূল করতে পারে। এই আন্দোলনগুলো দমন করতে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করা হয়। ব্যাপক মানুষ দেশান্তরিত হয়। কমিউনিস্টদের দমনপীড়ন ভেদ করে সংগঠিত রূপে দাঁড়াতে কয়েক দশক লেগে যায়। পূর্ববাংলায় কংগ্রেস নেতারা সংখ্যালঘু নেতাদের সুবিধাভোগে লিপ্ত থাকেন। অসাম্প্রদায়িক দল হিসাবে এটা গড়ে ওঠার কোন চেষ্টাই করেনি। এ অবস্থায় আওয়ামী লীগ একক 'অসাম্প্রদায়িক' দল হিসাবে রাজনীতির মাঠে থেকে যায়। যারা মুসলিম লীগকে পছন্দ করেন না তাদের সমর্থন আওয়ামী লীগের দিকে যায়। আওয়ামী লীগ নাম থেকে সাম্প্রদায়িক শব্দ 'মুসলিম' বাদ দেয়। ঘোষণা-গঠনতন্ত্র থেকে কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে পক্ষপাত না করার নীতি গ্রহণ করে। তবে অভ্যন্তরীণভাবে দলকে অসাম্প্রদায়িক করার কোনও উদ্যোগ আওয়ামী লীগ নেতারা নেয়নি।

আওয়ামী লীগের রাজনীতি হয়ে দাঁড়ায় মুসলিম লীগ বিরোধী। একই শ্রেণীর দুটি রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ এবং আওয়ামী লীগ। সংখ্যালঘুরা প্রতিবাদের অবলম্বন হিসাবে আওয়ামী লীগকে মনে করতে থাকে। পাকিস্তানের দুই যুগের শাসনামলে (১৯৪৭-৭১) আওয়ামী লীগ বড় ধরনের ভূমিকা রাখে।

১৯৭১ সালের মুক্তিসংগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের দোদুল্যমানতা, পরিকল্পনাহীনতা সত্ত্বেও নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের হাতে থেকে যায়। ১৯৭১ সালের যুদ্ধটা হয়েছিল অসাম্প্রদায়িক চেতনায়। অসাম্প্রদায়িক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতি আস্থাবান করেছিল। সংখ্যালঘুরা নতুন রাষ্ট্রের নেতৃত্বদানকারী সংগঠন হিসাবে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেছে।

শ্রেণীগতভাবে আওয়ামী লীগ উঠতি ধনিক শ্রেণীর সংগঠন। শ্রেণী অবস্থানের সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর আওয়ামী লীগের পক্ষে ভূমিসংস্কার, অসাম্প্রদায়িক শিক্ষাব্যবস্থা, সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে স্বনিয়ন্ত্রণের অধিকার, হিন্দু সম্প্রদায়কে নিপীড়নের অস্ত্র শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল করতে পারেনি। উপরন্তু ঢাকার রমনা কালীমন্দির ধ্বংসসহ বিভিন্নভাবে হিন্দু সম্প্রদায় নির্যাতিত হয়। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় উদ্বাস্তু হয়ে যে সমস্ত হিন্দু ভারতে গিয়েছিল ফেরার পর অনেকের সম্পত্তি বেদখল হয়ে গিয়েছিল। এই বেদখলদারদের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। অনেকেই আওয়ামী লীগের আশ্রয়ে ছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের

সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা কাউকে কাউকে ক্ষুব্ধ করে। এ সময় ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক ভাল থাকায় অনেক কিছুই প্রকাশ্যে আসেনি। যে কোনও সমস্যাতেই আওয়ামী লীগ 'নতুন রাষ্ট্র' 'সময় প্রয়োজন' ইত্যকার অজুহাত তোলে। ১৯৭১ সালের মুক্তিসংগ্রামে ভারতের জড়িয়ে পড়া, সাময়িকভাবে বাংলাদেশে ভারতীয় সৈন্যদের অবস্থান, পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের পর ভারতীয় বাহিনীর অবাধ লুন্ঠন ও সম্পদ পাচার রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে পাল্টে দেয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই ভারতবিরোধী মনোভাব তুঙ্গে ওঠে। ভারতের আচরণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ঢালাওভাবে বিরোধিতা করে। দক্ষিণপন্থীরা হিন্দুদের বিরোধিতায় প্রচারণা চালায়। এ পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করে তোলে। সামরিক সরকার জিয়াউর রহমান সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে নির্বাসন দেয়। সংবিধানে বিসমিল-াহ স্থান পায়। ইতিহাসের চাকা, পিছনের দিকে ঘোরানো হয়। পরিস্থিতি স্বাধীনতাপূর্ব অবস্থায় ফিরে যায়নি। তবে জটিল বিশ্বব্যবস্থার সমান্তরালে পরিস্থিতি জটিল হয়েছে। জিয়াউর রহমান ১৯৭১'র যুদ্ধে পাকিস্তানপন্থীকে রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ চালু করেন। ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার বেড়ে যায়। এ পরিস্থিতি সংখ্যালঘুদেরকে আওয়ামী লীগের ঘরে ঠেলে দেয়। বামপন্থীদের কোনও অংশই সাধারণ সংখ্যালঘুদের আস্থা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়।

১৯৮০ সালে জিয়াউর রহমান ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হন। দুই বছরের মাথায় বিএনপি ক্ষমতাচ্যুত হয়। এরশাদের সামরিক শাসন আসে। সামরিক সরকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে 'প্রতিবেশী দেশের ষড়যন্ত্র' বাংলাদেশকে ভাগ করে স্বাধীন বঙ্গভূমি' আন্দোলনের অস্তিত্ব প্রচার করা হয় রাষ্ট্রীয়ভাবে। স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন দমনের নামে এরশাদ সরকার ফরিদপুর, বরিশাল, যশোর, খুলনা অঞ্চলের হিন্দুদের ওপর নির্যাতন চালায়। সর্বশেষ সামরিক সরকার ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ঘোষণা দেয়। জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসনে মানুষের আস্থা ছিল না। তবে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার নিয়ে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো জনতম গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অজুহাতে কোনও অংশই সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক শক্তির জোরালো বিরোধিতা করেনি। উপরন্তু যুগপৎ আন্দোলনের নামে জামাতে ইসলামী সমাজ ও রাজনীতিতে স্থান করে নিয়েছে। রাজনীতিতে ধর্মের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

১৯৯০ সালে সামরিক-বেসামরিক আমলাদের আপসরফায় 'নিরপেক্ষ' সরকারের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয় জেনারেল এরশাদ। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত সরকার গঠন করে। বামপন্থী দলগুলো নির্বাচনে হেরে যায়। ১৯৯১-৯৬ এ সময় প্রতিটি ধাপে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার বাড়তে থাকে। ১৯৭১'র যুদ্ধাপরাধীদেরকে রাজনৈতিক পুনর্বাসনের শেষ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপি-জামাতের ঐক্য আওয়ামী লীগকে অতিদ্রুত দক্ষিণ দিকে ঠেলে দেয়। সকল রাখঢাকের অবসান ঘটিয়ে আওয়ামী লীগ ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারে সক্রিয় হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক মিত্র হিসাবে জামায়াত ইসলামকে কাছে টেনে নেয়।

রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দেয়। এই সুযোগে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরা সংখ্যালঘুদের নানাভাবে হেনস্তা করে। সংখ্যালঘুদের সরিয়ে দিতে পারলে সম্পত্তি পাওয়া সম্ভব-এই ধারণা সংখ্যালঘু নির্যাতনকে বাড়িয়ে তোলে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় শত্রু সম্পত্তি আইনের খড়গ।

বিগত ত্রিশ বছরে মাদ্রাসা শিক্ষার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ধর্মের রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতা উৎসাহিত করেছে। সংখ্যালঘুদের সমস্যা নিয়ে স্পষ্টভাবে কোনও জেনারেল আন্দোলন হয়নি। ধর্মীয় সংখ্যালঘু, জাতিগত সংখ্যালঘু, আন্তঃধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সমস্যাকে পৃথকভাবে সামনে

আনা সম্ভব হয়নি। সমাজ থেকে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার ও সাম্প্রদায়িকতা দূর করার জন্য সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা ও সকল ধর্মের জন্য পৃথক সম্পত্তি ও বিবাহ আইনের অবসানের জন্য সংস্থার আন্দোলন কাগজেই রয়েছে; বাস্তবায়নের মত সংগ্রাম গড়ে ওঠেনি। ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলোও এ জনপদে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। যা সব সময়ই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য হুমকিস্বরূপ। বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো সংখ্যালঘু সমস্যা নিয়ে সোচ্চার হওয়ার কথা থাকলেও সেটা পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। এর কারণ ব্যক্তিজীবনে স্যেকুলার চেতনার অভাব, মুসলমান সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ভয় ও সঠিক রাজনৈতিক কর্মসূচির অভাব। এছাড়া রয়েছে বামপন্থী শক্তিগুলোর সাংগঠনিক দুর্বলতা ও সরকারি নিপীড়ন। একদিকে বিএনপি গং অন্যদিকে আওয়ামী লীগ। প্রথম শক্তি প্রকাশ্যই ইসলাম রাষ্ট্রধর্মের পক্ষে। দ্বিতীয় শক্তি ধর্ম নিয়ে খেলতে অভ্যস্ত কিন্তু কাগজে কলমে এখন ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এই দুইয়ের মাঝখান থেকে সঙ্গত কারণে আওয়ামী লীগকে ভোটের জন্য বেছে নেয়।

তা সত্ত্বেও ১৯৯৬-২০০১ আওয়ামী লীগের শাসনামলে সন্ত্রাস চরম পর্যায় ওঠে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ প্রতিশোধের অপেক্ষায় থাকে। নির্বাচনে চার দলীয় জোট রাজনৈতিক পেশীশক্তির খেলায় বিএনপির পাল-কে ভারি করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিহিংসা চলতে থাকে। প্রথমে প্রতিহিংসার শিকার আওয়ামী লীগের মুসলমান কর্মীরা জাতিগোষ্ঠীর সহায়তা পান। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশে জাতিগোষ্ঠী দাঁড়ানোর মত কেউ থাকে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম দিকেই আওয়ামী লীগের ব্যাপক সংখ্যক নেতা-কর্মী যারা বিগত পাঁচ বছরের সন্ত্রাস লুটপাটের সঙ্গে যুক্ত ছিল তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এলাকা ছেড়ে দেয়। পেশীশক্তির এই ভারসাম্যহীনতা নির্যাতন-হাঙ্গামাকে বাড়িয়ে তোলে। বিএনপির বিজয় নির্যাতন প্র[]িয়াকে প্রশাসনের নীরব ভূমিকায় নিশ্চিত করে।

নির্যাতনের পরিমাণ বেশি হয় সেই সমস্ত জেলায় যেখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভোট নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। প্রথমে রাজনৈতিক কর্মী নির্যাতন থেকে সংখ্যালঘু রাজনৈতিক কর্মী। যা পরে সাধারণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নেমে আসে।

নির্বাচনপূর্ব সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করেছে। এগারো দলীয় জোটের পক্ষে মনোযোগ হওয়ার মতো সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচির অভাব ছিল। নির্বাচন বহির্ভূত বামপন্থীরা নির্বাচনকালীন সময়ের রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে উদাসীন থাকতেই অভ্যস্ত। নির্বাচন পরবর্তীকালে নির্যাতনের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রগতিপন্থীদের টনক নড়ে। বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই সরব হয়ে ওঠেন। ততদিনে ঘটনা বহুদূর গড়িয়েছে পূর্ণিমা, শেফালীরা সম্ভ্রম হারিয়েছে।

বিএনপি-জামায়াত সরকার প্রথমে সংখ্যালঘু নির্যাতনকে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছে। পূর্ণিমা, শেফালীদের সম্ভ্রমহানিকে তুচ্ছ করে দেখতে উদ্যোগী হয়েছে। বিএনপির এই উদ্যোগের পরিপূরক হিসাবে ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীদের সমর্থনও মিলেছে। নির্যাতিতদেরকে রাজনৈতিক পণ্য ও বাগাড়ম্বরের বিষয়ে পরিণত করেছে। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে ভারতের সাম্প্রদায়িক শক্তি রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক শক্তির সৃষ্ট সমস্যা ভারতের সাম্প্রদায়িক শক্তিকে সমস্যা তৈরির মাল-মসলা তৈরি করে দিয়ে লাভবান করে। বিপরীত বিষয়ও ঘটে। ভারতের সমস্যায় পাকিস্তান/বাংলাদেশের ধর্মান্ধরা দাঙ্গা/ নির্যাতন বাঁধিয়ে ফয়দা লুটে থাকে।

ভোরের কাগজ, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২

সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ঃ একটি চিঠি ও বহুমাত্রিক বর্বরতা

শাহরিয়ার কবির

২০০১-এর অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে যে নজিরবিহীন সাম্প্রদায়িক নির্যাতন শুরু হয়েছে ২০০২-এর মধ্য মার্চে আট মাস অতি[]ান্ত হওয়ার পরও তা বন্ধ হয়নি। এখনও প্রায় প্রতিদিন সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস ও নির্যাতনের ঘটনা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। এই সব নির্যাতনের একটি নিষ্ঠুর ও অমানবিক দিক হচ্ছে নির্যাতিতদের কাছ থেকে মুচলেকা লিখিয়ে নেয়া বা তাদের এ কথা বলতে বাধ্য করা যে, তারা নির্যাতনের শিকার হয়নি, আর ক্ষেত্রবিশেষে হলেও এসব নির্যাতনের জন্য জোট সরকারের সন্ত্রাসীরা নয়, আওয়ামী লীগ দায়ী।

গত সপ্তাহে বরিশালের বনমালী গাঙ্গুলী ছাত্রীনিবাসের এক ছাত্রী আমাকে চিঠি লিখেছে কীভাবে সরকার নির্যাতিতদের বাধ্য করছে নির্যাতনের ঘটনা অস্বীকার করে জবানবন্দি দিতে। অনুজাপ্রতিম এই ছাত্রী লিখেছে'১৪ তারিখ রাতে প্রায় ন'টার দিকে আমাদের হোস্টেলে ইনকিলাব পত্রিকা ও বিটিভির দু'জন সাংবাদিক ক্যামেরাম্যানসহ চারজন আর বরিশাল জেলা বিএনপির সশস্ত্র ক্যাডার গ্রুপের সদস্যরা প্রায়ই সব্বাই আসেন। তাঁরা এসে আমাদের হোস্টেলের ছাত্রদলের সব নেত্রীদের (যারা কিনা হোস্টেলের সিট বণ্টন থেকে শুরু করে, কারা কোন রুমে থাকবে ও কারা চলে যাবে বৈধ হওয়া সত্ত্বেও নির্ধারণ করে) ডেকে বৈঠকে বসেন। তারা অবশ্য সবসময়ই আসেন, তবে সেদিন বৈঠক শেষে ঠিক করেন যে হোস্টেলের সব সংখ্যালঘু ছাত্রীদের কথা, মতামত সংগ্রহ করে সাংবাদিকগণ নিয়ে যাবেন ও প্রচার মাধ্যমে প্রচার করবেন (বিটিভি ও ইনকিলাব পত্রিকায়)। তাঁরা প্রায় সব হিন্দু ছাত্রীদের ডেকে নেন, রাজীই হয়নি যেতে অনেকে, তারপর বলেন যে কিছু প্রশ্ন সাংবাদিকগণ করবেন তার উত্তর দিতে হবে। তারা যে সব প্রশ্ন করেন তা হোল (১) পূজো ঠিকমতো হয়েছিলো কিনা (২) কোন সরকারের সময়ে তাঁরা খুব ভালো আছেন (৩) বর্তমানে কোন সমস্যা আছে কিনা, বাংলাদেশের ইতিহাসে সকল সরকার, যাঁরা দেশ পরিচালনা করেন তাদের মধ্যে বর্তমান সময়ই কি ভালো নয়? (৪) সংখ্যালঘুদের আদৌ কোন সমস্যা হয় কিনা এ দেশে, এই সব।

'মেয়েরা একজন একজন করে এর জবাব দেন ও তা ভিডিও করা হয়। আমাদের হোস্টেলে ভোলা, বাগেরহাট, আগৈলঝরা, রামশীল, বরগুনা, পিরোজপুর, হাতিয়া, ভাণ্ডারিয়া এই সব এলাকার মেয়েরা অধিকাংশই। প্রায় প্রত্যেকেই বলে যে ওরা "অসম্ভব ভালো" আছে, কারণ ক্যাডার গ্রুপের সদস্যরা, বরিশাল জেলার বিএনপি-এর সকল নেতা ও হোস্টেলের নেত্রীদের সামনেই তাদের কথা বলতে হয়। এর মধ্যে কয়েকজন সত্যি ঘটনা বলতে গিয়েও বলতে পারেনি। এরা দু'একটি আসল কথা বলতে গেলে সামনের নেতানেত্রীগণ এমনভাবে আচরণ করে যে, কি তাদের বলতে হবে এটা যেন বুঝে নেয়। এর মধ্যেও যারা দু'একটা সত্যি কথা বলেছে তাদের হুমকি দেয়া হয়েছে এরপর তারা কিভাবে হোস্টেলে থাকে, দেখা হবে।

'আমাদের সাথে পড়ে এমন বেশ কয়েকজন আমায় বলেছে যে ওদের বাবা-মা সবার নামে মিথ্যে মামলা দেয়া হয়েছে, মামলার অভিযোগ হচ্ছে (১) মসজিদ ভাঙ্গা (২) ভোট কেন্দ্র ভাঙ্গা ও হামলা চালানো (৩) চাঁদা আদায় ইত্যাদি। অনেকেই জামিন পাচ্ছেন না। ভোলায় চাঁদা আদায় হচ্ছে এখনও। আমাদের হোস্টেলের প্রত্যন্ত এলাকার মেয়েরা বলেছে যে ওরা বাড়িই যেতে পারেনি ভোটের পর থেকে। যারা দু'একটা সত্য কথা বলেছিলো তারা ভয়ে হোস্টেলে নেই। আর হয়ত আর আসতেও পারবে না ....।'

বরিশাল থেকে পাঠানো এই চিঠির সমর্থন পাওয়া যাবে গত ১৮ ফেব্রুয়ারির জনকণ্ঠে। 'সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা মিথ্যা প্রমাণে মাঠে নেমেছে সরকার' শিরোনামে বরিশাল থেকে শওকত মিলটন লিখেছেন কীভাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দৈনিক 'ইনকিলাব'-এর এক সাবেক প্রতিবেদক ও যুবদল কর্মীকে বরিশাল পাঠিয়েছে সরকারের পক্ষে নির্যাতিত হিন্দুদের সাক্ষ্য নেয়ার জন্য। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ ধরনের কিছু সাক্ষ্য তারা বরিশালে ভিডিও ক্যামেরায় ধারণ করেছে, এরপর একই উদ্দেশ্যে ভোলায় গিয়েছে এবং স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন এ কাজে তাদের সবরকম সহযোগিতা করেছে।

ভিডিওতে এ ধরনের সাক্ষ্য গ্রহণের ঘটনা পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হলেও নির্যাতিতদের কাছ থেকে মুচলেকা লিখিয়ে নেয়ার বহু ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেছে। এ বিষয়ে পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে আমি 'আর কতদিন সইতে হবে মানবতার এই চরম লাঞ্ছনা' শিরোনামে গত ১৪ অক্টোবর লিখেছিলাম ''ভোরের কাগজ'-এ প্রকাশিত হয়েছে নির্যাতনের নতুন মাত্রার সংবাদ। সন্দ্বীপ থেকে ফিরে এই পত্রিকার প্রতিনিধি সাইদ ইসলাম মুছাপুর এলাকার এক প্রবীণের অভিযোগ সম্পর্কে লিখেছেন, 'কয়েকজন সংখ্যালঘুর কাছ থেকে সন্ত্রাসীরা বণ্ড নিয়ে তাদের এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এসব বণ্ডে তারা আর এলাকায় আসবে না বলে অঙ্গীকার আদায় করা হয়েছে। শুধু এলাকা ত্যাগেই তাদের বাধ্য করা হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাড়িঘরও সন্ত্রাসীরা লুট করেছে। (ভোরের কাগজ, ১৩ অক্টোবর ২০০১)

'একই দিনের 'ভোরের কাগজ'-এর ফরিদপুর প্রতিনিধি জানিয়েছেন, 'আমাদের উপর কোনো হামলা বা নির্যাতন করা হচ্ছে না' এই মর্মে এক বিস্ময়কর মুচলেকা প্রদান করতে হয়েছে বোয়ালমারি উপজেলার উত্তর হাসামদিয়া গ্রামের নির্যাতিত সংখ্যালঘু পরিবার প্রধানদের। মন্দিরে অগ্নিসংযোগ, দৈহিক লাঞ্ছনাসহ বিভিন্ন হিন্দু বাড়িতে হামলার ঘটনার পরও প্রভাবশালীদের চাপে গত বৃহস্পতিবার এই মুচলেকা দিতে বাধ্য হয়েছে গ্রামের ১৪টি হিন্দু পরিবারের প্রধানরা। এই মর্মে তারা পুলিশ সুপার বরাবর আবেদনপত্রে স্বাক্ষরও করেছেন।' সম্ভবত এই সব মুচলেকা সংগ্রহ করে নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন বলেছেন, 'সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার বিষয় একটি বিশেষ দল ও বিশেষ সম্প্রদায় গুজব আকারে অতিরঞ্জিত করে বাজারে ছড়াচ্ছে।' (ভোরের কাগজ, ১৩ অক্টোবর ২০০১)

গত ১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' সম্পর্কে যে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে, মঞ্চে উপস্থিত ভুক্তভোগীরা নির্যাতনের যে ভয়ঙ্কর ও হৃদয়বিদারক বর্ণনা দিয়েছেন কোন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে তা উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। গত জুলাইয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে নবেম্বর পর্যন্ত আমরা দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকাসমূহ ঘুরে এমন একজন ভুক্তভোগী পাইনি যে বলেছে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা এবার সাম্প্রদায়িক নির্যাতন করেছে। অথচ বিরানব্বই সালে ভোলায় গিয়ে আমরা কিছু নির্যাতিত হিন্দুর কাছে শুনেছি হামলাকারীদের ভেতর বিএনপি, জামাত, জাতীয় পার্টি, আওয়ামী লীগ সবাই ছিল। সন্ত্রাসীদের দলীয় পরিচয় সেবার মুখ্য ছিল না, কিন্তু এবার ছিল। এবার ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা অভিযোগ করেছে নৌকায় ভোট দেয়ার জন্য তাদের দায়ী করে নির্যাতন চালানো হয়েছে।

ভারত সফরকালে কলকাতার পার্শ্ববর্তী এলাকায় আমি এমন কিছু পরিবারের সাক্ষাৎ পেয়েছি যারা বলেছে, নির্যাতিত হয়ে তারা থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়েছিল। থানা অভিযোগ গ্রহণ করেনি বরং উল্টো চাপ দিয়েছে মুচলেকা দেয়ার জন্য। কেউ কেউ মুচলেকা দেয়ার পরও দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার হামলার শিকার হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত টিকতে না পেরে ঘর-বাড়ি, জমি-জমা সব ফেলে রাতের অন্ধকারে দেশত্যাগ করেছে।

আ□ান্ত যে সব মানুষের সাক্ষাৎকার আমি গ্রহণ করেছি, তারা সবাই যে বিএনপি-জামাতের নাম উলে-খ করেছে তা নয়। অনেকে বলেছে, ওরা রাতের অন্ধকারে এসেছে, কাপড় মুখ ঢাকা ছিল, চেনা যায়নি। বার বার জানতে চেয়েছি আওয়ামী লীগের কেউ হামলার সঙ্গে যুক্ত ছিল কি না। তারা নেতিবাচক জবাব দিয়েছে। আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ হচ্ছে অতীতে হামলার সময় কিংবা হামলার পরে নেতা কর্মীরা দেখতে আসতো, এবার তারা আসেনি। অনেকে অবশ্য বলেছে তাদের উপরও তো হামলা হয়েছে।

আমি যখন জেলে ছিলাম তখন সিরাজগঞ্জের পূর্ণিমাদের উপর এ ধরনের নির্যাতন হয়েছে। ঢাকা থেকে সরকার সমর্থক একটি পত্রিকার সাংবাদিকরা গিয়ে বলেছে, তারা যদি লিখিতভাবে এবং ক্যামেরার সামনে এ কথা বলে যে পূর্ণিমাকে ঢাকায় আনার জন্য আমি তাদের বিশ হাজার টাকা দিয়েছি তাহলে তাদের প্রচুর টাকা দেয়া হবে। পূর্ণিমার মা বাসনারানী আমার সঙ্গে সাক্ষাতের আগে স্থানীয় সাংসদের অর্থ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কারণ বিএনপির সাংসদ বলেছিলেন অভিযোগ প্রত্যাহার করতে হবে। এবারও পূর্ণিমারা সরকারের এই হামলা প্রতিহত করেছে। সরকার সমর্থক পত্রিকার সাংবাদিকরা পূর্ণিমাদের কাছ থেকে আমার বিরুদ্ধে কোন কথা আদায় করতে পারেনি। এ কথা পূর্ণিমারা আমাকে জানিয়েছে কনভেনশনে যোগ দিতে এসে। তারপরও আমি জেলে থাকতে শুনেছি সরকার সমর্থক পত্রিকাটি পূর্ণিমাদের বরাত দিয়ে লিখেছে আমি নাকি তাদের টাকা দিয়ে নির্যাতনের কথা বলিয়ে নিয়েছি। সরকারের এই মানসিকতার জবাব দিতে গিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলাম, ধর্ষণের মতো নৃশংস ঘটনাকে যারা এভাবে আড়াল করতে চায় কিংবা এ নিয়ে উপহাস করে, তারা ইতর পশুরও অধম।

গত ফেব্রুয়ারির কনভেনশনের পাল্টা কনভেনশনে খালেদা-নিজামীর মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক জোট সরকার একটা কিছু যে করতে চায় তার খবর পত্রিকায় দেখেছি। আওয়ামী লীগের পাঁচ বছরের দুর্নীতি ও সন্ত্রাস নিয়ে যদি বস্তুনিষ্ঠ কোন কনভেনশন সরকার করতে চায় এতে আপত্তির কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু আগামী এপ্রিলে অনুষ্ঠিতব্য সরকারের কনভেনশনের উদ্দেশ্য যদি হয় এবারের সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা মিথ্যা প্রমাণ করা, কিংবা এবারের নির্যাতনের জন্য আওয়ামী লীগকে দায়ী করা সেটা শুধু রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নয়, সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও বর্বরতার স্বতন্ত্র মাত্রা হিসেবে চিহ্নিত হবে। কারণ এবার সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ আওয়ামী লীগের ছিল না, সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মতো আওয়ামী লীগও এবার সরকারের নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। এবার বিভি-ন্ন জনপদে হিন্দুশূন্যকরণ ও আওয়ামী লীগ নির্মূলন অভিযান একযোগে চলেছে। যে সব হিন্দু ধানের শীষ, কাস্তে, হাতুড়ি বা লাঙ্গলে ভোট দিয়েছে তারাও সাম্প্রদায়িক নির্যাতন থেকে রেহাই পায়নি।

ভোরের কাগজ, ১৮ মার্চ ২০০২

ফৈলজানার খ্রিস্টানপাড়ায় সন্ত্রাসীদের নজিরবিহীন হিংস্রতা

রণেশ মৈত্র

গানে অসংখ্যবার শুনেছি "মানুষ মানুষের জন্যে"। অবিস্মরণীয় এই বাণী আমরা সবাই শুনেছি অসংখ্যবার এবং আজও শুনছি- "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"। কবিতায় কত শতবারই না পড়েছি: "কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক-কে বলে তা বহুদূর?/মানুষেরই মাঝে স্বর্গ নরক- মানুষেতেই সুরাসুর"। কবিতা, গান, মহামানবদের বাণী, বিভিন্ন ধর্মের এবং ধর্মগ্রন্থসমূহে বর্ণিত ওই উক্তিসমূহ গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের সংজ্ঞা, আমাদের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উলে-খিত মৌলিক অধিকার, দেশের প্রচলিত আইনসমূহ এবং আইনের শাসনের Concept, বাঙালি সংস্কৃতির চিরাচরিত ঐতিহ্য-সব কিছুই বরবাদ হতে দেখছি আমাদের এই মাতৃভূমিতে রক্তমূল্যে কেনা আমাদেরই বাংলাদেশের মাটিতে বেশ অনেকদিন যাবতই। তা নিয়ে যেমন পীড়িত বোধ করি, সাধ্যানুযায়ী তার অবসানের জন্য কখনও রাজপথের আন্দোলনের দ্বারা, কখনও বা লেখনীর দ্বারা আবার কখনও বা বৈঠকি আলোচনার দ্বারা আমাদের সকল ঐতিহ্য অহংকার যারা বরবাদ করতে কয়েক দশক ধরে সি্রুয় তাদের বিরুদ্ধে কাজও করে যাচ্ছি। নিপীড়িত নির্যাতিত-লাঞ্ছিত-অত্যাচারিতদের পাশে সাধ্যমত ছুটেও যাচ্ছি কখনও দলীয় পরিচয়ে কখনও বা কোনও না কোনও সামাজিক পরিচয়ে। তবে যে পরিচয়েই যাই না কেন- তা একই আদর্শিক কর্তব্যবোধের তাগিদে একই মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে এবং একই উদ্দেশ্য সাধনে আজীবনের ব্রত নিয়ে। আর তা হল- মানুষ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি এবং সকল মানুষই হল সম-অধিকার ও সমমর্যাদাসম্পন্ন। এ অধিকার, মর্যাদা পৃথিবীব্যাপী মানুষের জন্মসূত্রে অর্জিত। এই অধিকার ও মর্যাদা মানুষ নামধারী এই শ্রেণীর অসুর অর্থাৎ দুর্বৃত্ত পৃথিবীর নানা দেশেই হরণ করে চলেছে এবং তাই নানা দেশেই সেই তথাকথিত মানুষ নামধারী অসুর তথা দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে প্রকৃত মানুষেরা লড়াই করে চলেছে। বিজয়ও অর্জিত হচ্ছে। আমাদের দেশেও আমরা দীর্ঘদিন যাবত এ লড়াই চালাতে চালাতে শেষপর্যন্ত ১৯৭১-এ অস্ত্র হাতে নিয়ে সকল অসুর তথা দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াই করে আমাদের পবিত্র স্বাধীনতা ও স্বপ্নের বাংলাদেশ অর্জন করেছি। সে অর্জন ও বিজয় নস্যাতে অসুরেরা অনেকদিন যাবতই সি্রুয়। তাই তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধও করছি। সকল দেশপ্রেমিক শক্তিই সাধ্যানুযায়ী এই প্রতিরোধ কাজে নানামুখী ভূমিকাও রাখছেন।

ফেব্রুয়ারি, ২০০২ ছিল আমাদের অতি প্রিয় অত্যন্ত গৌরবের ভাষা আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তীর মাস। এবার তা তেমনভাবে উদযাপিত হল না বলে মনে গভীর পীড়া অনুভব করছিলাম সারাটি মাস ধরে। হঠাৎ এক অতি ঘনিষ্ঠজনের ভায়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ পেলাম। বিয়েটি ২৮ ফেব্রুয়ারি হবে জয়পুরহাট শহরে। কনের পিত্রালয় সেখানে। রাজী হয়ে গেলাম বরযাত্রী হিসাবে জয়পুরহাট যেতে। ২৮ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১ টার দিকে বরপক্ষের গাড়িও এল আমার বাসায় আমাকে নিতে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গাড়িতে চড়ে রওনাও হলাম- প্রথমে নাটোরে (যেখানে বরের পিত্রালয়), পরে সেখান থেকে বিকেলে অপরাপর বরযাত্রীদের বহরের সঙ্গে জয়পুরহাট রওনা হওয়া কিন্তু বিবেকের একটি দংশন অনুভব করছিলাম। বিয়ের আনন্দ- দু'পক্ষের বহু লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়-আদর-সম্মান সবকিছু ছাড়িয়ে উঠেছিল এক গভীর মানসিক যন্ত্রণা, একটি নৈতিক বোধ ও বেদনা। এই যন্ত্রণা-বেদনার কারণটির উৎস হলো ওই ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখেই বিয়েতে রওনা হওয়ার ঘণ্টা দুয়েক আগে পত্রিকার মারফত জানতে পারি আমারই পাবনা জেলার চাটমোহরে ফৈলজানা গ্রামের খ্রিস্টান পল-ীতে কয়েকটি বাড়ি সরকার-

দলীয় সন্ত্রাসীদের দ্বারা আ্রান্ত-বাড়িঘর ভাংচুর- লাখ লাখ টাকার সম্পদ লুণ্ঠিত এবং বেশ কয়েকজন খ্রিস্টান নারী পুরুষ আহত এবং তাদের মধ্যে দু'জন পাবনা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অবস্থা তাদের আশংকাজনক। কোনও গ্রেফতার নেই। এই খবরটি পড়ার পরই ওই বেদনা ও যন্ত্রণা আমাকে আ্রমণ করে, দ্বিধান্বিত করে তোলে: বিয়েতে যাওয়া নাকি ঘটনাস্থলে ছুটে যাওয়া। কিন্তু যেহেতু আমার ওই ঘনিষ্ঠ জনটি (তিনিও একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা) নাটোরের অধিবাসী এবং সেখান থেকে গাড়ি পাঠিয়েছেন এবং তাকে ক'দিন আগেই কথা দিয়েছি বিয়েতে বরযাত্রী হব, বরযাত্রী হয়েই চলে গেলাম। তাৎক্ষণিকভাবে ফৈলজানা ছুটে যাওয়ার কর্তব্য পালন করতে না পারায় যুক্ত হলো নৈতিক অপরাধবোধও। এ কথাগুলো নাটোর এবং জয়পুরহাটে যাদের সঙ্গেই নানা বিষয়ে কথা হয়েছে তাদেরকেও বলেছি। সবার কাছেই প্রকাশ করেছি তাৎক্ষণিকভাবে ফৈলজানা ছুটে না যেতে পারার জন্য একটি নৈতিক অপরাধবোধ, যা আমাকে সর্বক্ষণ তাড়া করে ফিরছিল।

যা হোক, জয়পুরহাট-নাটোর হয়ে পাবনা ফিরে আসি পরদিন ১ মার্চ রাত প্রায় ১১টায়। যেভাবেই হোক যাতায়াত জনিত কারণে বেশ ঠাণ্ডায় আ্রান্ত এবং অসুস্থ হয়ে পড়ি পাবনায় এসে। জ্বর-সর্দি-কাশি-সারা শরীরে যন্ত্রণা ইত্যাদি। তাই দু' দিন বিশ্রাম নিতেই হলো, ওষুধপত্র চিকিৎসা ইত্যাদিরও শরণাপন্ন হতে হলো।

অবশেষে দু'দিন বিশ্রামের পর ৪ মার্চ আমার দলীয় দু'জন সহকর্মী (পাবনা জেলা গণফোরামের যুগ্মসম্পাদক ফরহাদ হোসেন ও সদস্য মোঃ রমজান আলী) সহ দুপুর দু'টায় একটি ডায়েরি বই আর ছোট একটি সার্বক্ষণিক ব্যবহারযোগ্য ক্যামেরা নিয়ে গণফোরামের পক্ষ থেকে বেলা দু'টার দিকে রওনা দিলাম। রাস্তা তো বেশি নয়। পাবনা সদর পেরিয়ে আটঘরিয়া থানা এবং আটঘরিয়া পেরিয়ে চাটমোহর উপজেলার এক প্রান্তে (চাটমোহর সদর থেকে অবশ্যই বেশ পূর্বে) একটি প্রত্যন্ত গ্রাম (এবং ইউনিয়নও) হলো ফৈলজানা। মোটমাট পথের দূরত্ব বোধ করি ১৬/১৭ মাইল হবে। কিন্তু প্রথমে রিকশা, তারপরে বাস তারপর ভ্যান, তারপর হেঁটে বাঁশের সাঁকো পার হয়ে তবে ফৈলজানা গ্রাম এবং সেখান থেকে আবার ভ্যানযোগে খ্রিস্টানপাড়া। ফলে কমপক্ষে ঘণ্টা দু'য়েক সময় লেগে যায় ঘটনাস্থলে পৌঁছতে।

যাওয়ার পথে সাঁকোটি হেঁটে পার হয়েই ফৈলজানা হাইস্কুল ও বিরাট মাঠ, হাট-বাজার। স্কুলের এলাকায় পা রাখতেই দেখি কয়েকজন পুলিশ। একজন এএসআই বয়সে তরুণ, এগিয়ে এসে আদাব দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "দাদা এখানে কোথায় যাবেন?" বললাম, "খ্রিস্টানপাড়ায়-ক্ষতিগ্রস্তদের দেখতে।" তাকে ধন্যবাদ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি খ্রিস্টানপাড়ার দু'তিনজন যুবককে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমাদের সঙ্গে তাদেরকে যেতে বললেন। প্রথমে ভেবেছিলাম ওই লোকেরা দালাল নয় তো। বস্তুত তারাই ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারভুক্ত। পরিচয় করিয়ে দিয়ে তরুণ পুলিশ অফিসারটি আমাদের কাজ অনেক সহজ করে দিলেন।

স্কুল-বাজার এলাকা থেকে ভ্যানে চড়িয়ে ওই যুবকেরা আমাদেরকে নিয়ে গেল সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত সুবল মণ্ডলের বাড়িতে। বাড়ির আঙ্গিনায় ঢুকে দেখি বিশাল টেবিল এবং বেশ কয়েকটি চেয়ার পাতা রয়েছে। ওখানেই আমাদেরকে বসতে বলা হলো। বাড়ির জড়তাহীন মহিলারাসহ অন্যান্য সদস্য এবং প্রতিবেশীরাসহ বেশ একটা বড়সংখ্যক নারী-পুরুষের জমায়েত তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে গেল। আমি বিস্মিত। আমরা তো কোনও খবর দিয়ে আসিনি। ওখানে আমরা পরিচিতও না। নিজেদেরকেই পরিচয় দিতে হচ্ছে। পরিচয়টা জানা মাত্র তাৎক্ষণিকভাবে অত মানুষ এসে জড়ো হবেন সন্ত্রাসী হামলার শিকারে পরিণত ওই খ্রিস্টান বাড়িতে- তা কিছুতেই ধারণা করতে পারিনি। যে যুবকেরা স্কুলমাঠ থেকে আমাদেরকে নিয়ে এলেন তারা প্রথমেই পরিচয় করিয়ে দিলেন সুবল মণ্ডলের স্ত্রী পরী মণ্ডলের সঙ্গে। সুবল ও তার শ্বশুর ৭৫

বছর বয়স্ক পোউল বৈদ্য গুরুতর আহত অবস্থায় পাবনা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ কথা জানলাম পরী মণ্ডলের কাছে যিনি সুবলের স্ত্রী।

সবাই বসতে বললেন। কিন্তু ক্যামেরায় ভাংচুর করা ঘরগুলো ধরার লক্ষ্যে এবং সূর্য অস্ত মুখী হওয়ায় আলোর অভাব হবে বলে বসার আগে ওইগুলো দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলাম। পরী মণ্ডল এক এক করে মাম্লকভাবে বিধ্বস্ত ঘরগুলো দেখালেন। দু'টি ঘর তারা ভেঙেছে- দালান ঘর- তাই ঘর না ভাঙতে পেরে ভেতরের যত কিছু আসবাবপত্র- সবই মূল্যবান, ভেঙে চূরমার করেছে। এলাকায় জনপ্রিয় এই পরিবারটিকে দেখতে প্রতিদিনই আশপাশের গ্রাম থেকে অসংখ্য নারী-পুরুষ আসছে, আসছে সমবেদনা জানাতে। তাই সকলের দেখার সুবিধার্থেই ভাঙ্গাচোরা যা যেমন রেখে গেছে সন্ত্রাসীরা সেগুলো সেই অবস্থায়ই রেখে দিয়েছেন বাড়ির মালিকেরা। বিশাল শোকেস দু'তিনটি ঘরে ছিল তাতে নানা জাতীয় মূল্যবান দর্শনীয় বস্তু। শো-কেসগুলোসহ সবকিছু ভেঙে গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। যে ঘরে ফসলাদি-ধান-কলাই প্রভৃতি থাকত, সেগুলো সব বস্তা খুলে মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। চেয়ার-টেবিল-খাটগুলো সব ভেঙে ফেলে রেখে গেছে। ফ্রিজ নির্মমভাবে ভাঙা। বৈদ্যুতিক পাখা-আলোর ঝাড় সব কিছু। এখন বাড়ির লোকেরা সব মাদুর পেতে রাতে ঘুমায়। ঘুম আসে কি তাদের চোখে ওই ভয়াবহ আ□মণের শিকার হয়েছেন যারা?

যতটা পারলাম ছবি তুলে নিয়ে এসে চেয়ার টেবিলে বসলাম বাড়ির অভ্যন্তরের আঙিনায়। ইতোমধ্যে আরও লোক এসে জমেছে। কিন্তু ঘটনা তো শোনা হয়নি তখনও। সবাইকেই বসতে অনুরোধ জানালাম অন্তত মুরুব্বী পুরুষ-মহিলাদেরকে। যতগুলো চেয়ার বেঞ্চ ইত্যাদি ছিল (বেশ ভাল সংখ্যক) তাতে ঠাঁই হলো না সবার। অন্যরা বিশেষত কিশোর-কিশোরী-শিশুরা সবাই দাঁড়িয়েই আমাদের কথাবার্তা শুনল।

হঠাৎ দেখি এক পাত্র ভর্তি নানা জাতীয় ফল ও বিস্কুট প্রভৃতি এসে হাজির। গ্রাম-বাংলার সেই সনাতনী আতিথেয়তা। বললাম, আপনাদের দুর্দিন, আমরা তো আর কিছু করতে পারব না। তাই এগুলো রেখে দিন অন্তত ছেলে-মেয়ে এবং আহতদের দেবেন। আমরা, আপনারা যদি না-ছাড়েন তবে শুধু এক পেয়ালা করে চা খেতে পারি- যদি তা দেওয়ার সুযোগ থাকে। আমাদের চাপে শেষ পর্যন্ত ফলমূলের পাত্রটি ফেরত গেল। একটু পরেই চা এল। চা খেতে খেতেই কথা বললাম বেশ ক'জনের সঙ্গে।

স্বভাবতই পরী মণ্ডল (৪০) সুবলের স্ত্রী বিস্তারিত কথা বলছিলেন। উলে-খযোগ্য আর যারা ওখানেই আমাদের সঙ্গে কথা বলেন তারা হলেন মনোয়ারা বেগম (৪৭), আলী মোল-া (৬৫), সুরঞ্জন বৈদ্য (৪০), পেবেজা বৈদ্য, শামসুল হক, চাঁদ আলী, সানোয়ার, কনকলতা বৈদ্য প্রমুখ।

পরী মণ্ডল জানান, ২৬ ফেব্রুয়ারি রাতে অতর্কিতে পার্শ্ববর্তী গ্রাম মরাহড়ার অধিবাসী তারই ভগ্নিপতি সুশান্ত প্যারোরা ও গগন রোজারিওর বাড়ি সন্ত্রাসীরা আ□মণ করে। তারা অতর্কিতে গিয়ে ৫,০০০ টাকা দাবি করে চাঁদা হিসেবে। ওই টাকা নিয়ে তারা মদ খাবে একথা বলে। মদ খাওয়ার টাকা ওরা কেন দেবেন তা জিজ্ঞেস করলে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা সংখ্যায় প্রায় ৩০/৪০ জন সোজা-সাপটা বলে, "ভোটে আওয়ামী লীগের পক্ষে তোমরা কাজ করেছ। আমরা বিএনপি করি, এখন মদ খাব। উলে-খ্য, ওই এলাকায় বিএনপি প্রার্থী জিতেছেন। টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে বেদম আ□মণ হয় বাড়ি দু'টির ওপর। কিন্তু আঁটসাঁট বাড়ি হওয়ায় তারা তা ভেঙে ঢুকতে না পেরে বাইরে থেকে যতটা সম্ভব ক্ষতি সাধন করে চলে যায়। পরদিন (২৭ ফেব্রুয়ারি) ওই আ□মণের খবর পেয়ে একটি মোটর সাইকেলে করে গ্রামবাসী (ফৈলজানা) শামসুল হকসহ সুবল মণ্ডল ছুটে যান তার ভায়রা ও শ্যালিকাদের দেখতে। দেখাশোনা করে নিজ বাড়িতে ফিরে

আসার পথে সাঁইপাই স্কুলের কাছে বিপরীত দিকে দু'টি মোটর সাইকেলে ৬ জন সশস্ত্র আরোহী সামনা-সামনি এসে নেমে যায়। ওই ছয়জনই সশস্ত্র সন্ত্রাসী। তারা বেদম আঘাত শুরু করে সুবলকে। বলে "তুই ব্যাটা বড় আওয়ামী লীগার- আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিস- তাদের পক্ষে ক্যানভাস করেছিস- ভোটও জোগাড় করেছিস। তোর দু'টি হাত কেটে নিয়ে এমপি সাহেবকে দিতে হবে।" এই পর্যায়ে আনোয়ারা বেগম বললেন, তিনি ওই সময় খেতের ফসল দেখতে গিয়ে ওই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। আলী মোল-া বলেন, তিনি ওদেরকে (সন্ত্রাসীদেরকে) বলেন, "গ্রামে নিজেরা নিজেরা গণ্ডগোল না করে কাল রাতের ঘটনা আলাপ-আলোচনা করে মিটিয়ে নাও।" কিন্তু সন্ত্রাসীরা তাদের হামলা অব্যাহত রাখে। পরী মণ্ডল বলেন, বেলা তখন প্রায় ৯-৩০। তিনি রান্না করছিলেন। স্বামী আ□ান্ত শুনে তিনি ছুটে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কয়েকশ' সশস্ত্র লোক ইতোমধ্যে তার বাড়িতে এসে প্রথম তাকে আ□মণ করে। গলা থেকে সোনার চেইন ছিঁড়ে নেয়। পিঠে হকিস্টিক দিয়ে আঘাত করে। শাড়িটা সরিয়ে তার কাঁধের পিছন দিকের রক্ত জমে থাকা কালো (অন্তত ৩/৪ ইঞ্চি) দাগটি দেখালেন। এরপর তাণ্ডব-সারা বাড়ি ভাঙচুর, তছনছ এবং লুটপাট-অবশেষে ১০ ভরি সোনা, ৫০ হাজার টাকা ও অন্যান্য দামি জিনিসপত্র যার সাকুল্য বাজারমূল্য প্রায় ৫ লাখ টাকা নিয়ে তারা চম্পট।

গ্রামের প্রত্যক্ষদর্শী (নামগুলো আগেই উলে-খ করেছি) সবাই ওই কথায় সায় দেন। তারা সবাই অসহায়ের মতো ওই আ□মণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বললেন কারও কারও হাতে পিস্তল, অন্যদের হাতে হকিস্টিক, লাঠি ও অন্যান্য অস্ত্র। একজনের হাতে রাইফেলও ছিল।

শিক্ষিকা মহিলা পরী মণ্ডলকে সরাসরি প্রশ্ন করলাম, "আপনি কি মনে করেন যে এই ঘটনা সাম্প্রদায়িক? যেহেতু আপনারা খ্রিস্টান এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত তাই কি আপনাদের ওপর এ হিংস্র আ□মণ?" সঙ্গে সঙ্গে পরী বললেন, "আদৌ সাম্প্রদায়িক নয়। যেহেতু আমরা আওয়ামী লীগ করি তাই।" বললাম, "আওয়ামী লীগ কি এ এলাকায় শুধু আপনারাই করেন? মুসলিম কেউ করে না?" জবাবে পরী বললেন, "অনেকেই করে, কিন্তু সুবলই প্রভাবশালী ও প্রধান। সুবলকে শেষ করতে পারলে আওয়ামী লীগ দুর্বল হবে, বিএনপি-জামাত শক্তিশালী হবে তাই।"

উপস্থিত সবাই বললেন, ফৈলজানা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা শাজাহান আলীর হুকুমে ও প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে এই ভয়াবহ হামলা সংঘটিত হয়। পুলিশ নিজ থেকে (suo-mo-to) একটি মামলা দায়ের করে- আ□ান্তদের এজাহার না নিয়ে। উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত আসামিদের আড়াল করা। কিন্তু পর পর ক'দিন ধরে সাংবাদিকদের লেখালেখির চাপে পুলিশ মামলা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। উপস্থিত বিপুল সংখ্যক গ্রামবাসীর মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন মুসলিম। পুরুষ-মহিলা উভয়েই। তারাও সমব্যথী। তারাও তো একই ধরনের কথা বললেন, পরীর সকল কথায় সায় দিলেন।

আমরা সকলকে উদ্দেশ্য করে বললাম, যারা আ□ান্ত - যারা আহত- যারা ক্ষতিগ্রস্ত, আমরা তাদের প্রতি সমবেদনা জানাই। আমরাও সমব্যথী। অন্য কোনওভাবে সাহায্য করার সামর্থ্য আমাদের নেই তবে এ ঘটনার উপযুক্ত ও দ্রুত তদন্ত এবং বিচার দাবি করি, সকল সন্ত্রাসীর আশু গ্রেফতার আমরা দাবি করি।

আরও বললাম, আমরা সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আসছি। সে আন্দোলনে আপনাদের সকলকেও পেতে চাই কারণ সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ ছাড়া দেশে কারও নিরাপত্তা নেই। গ্রামে গ্রামে আপনারাও সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হোন। আহত সবার সঙ্গে দেখা হল না, তাদেরকে আমাদের সহানুভূতি জানাবেন এবং যখনই প্রয়োজন বোধ করেন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। বিস্ময়কর হলেও সত্য, মূল আসামিরা আজও

ধরা পড়েনি। যা হোক সকলের প্রতি পুনরায় সহানুভূতি জ্ঞাপন করে সূর্যাস্তের আগেই আমরা রওনা হলাম পাবনার দিকে। পথে খবর পেলাম ফৈলজানা সংলগ্ন আটঘরিয়া উপজেলা দেবোত্তর ইউনিয়নের একটি গ্রামের একজন বস্ত্র ব্যবসায়ী তরুণকে দু'দিন আগে রাত ন'টায় হাট থেকে বাড়ি ফিরে আসা মাত্র নিজ বাড়ির উঠানেই তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। গ্রামের সবাই বলল যে কোনও রাজনীতি কদাপি সে করত না। কিন্তু আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয়েই নিজ নিজ দলের লোক বলে মৃত্যুর পর দাবি করছে। লাশ নিয়ে এই নোংরা রাজনীতি এবং তার ফাঁক দিয়ে মূল হত্যাকারীদেরকে বাঁচিয়ে দেয়ার এ নোংরা খেলা আজও চলছে দেখে মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। গ্রামবাসীও এই খেলা দেখে স্তম্ভিত।

আজকের কাগজ, ২০ মার্চ ২০০২ বুধবার

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সাম্প্রতিক নির্যাতন

আনিসুজ্জামান

আমাদের রয়েছে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার একটি দীর্ঘ ইতিহাস। দীর্ঘতর ইতিহাস রয়েছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির।

আরও কিছু বলার আগে আমাকে উলে-খ করতেই হয় যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক শব্দটি বিশেষ অর্থলাভ করেছে। ইংরেজি ভাষার ব্যবহারে শব্দটি যেখানে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের কোনও কিছুকে বোঝায়, কোনও সম্প্রদায়ের পক্ষে বোঝায় অথবা সাধারণভাবে সম্প্রদায় সম্পর্কে বোঝায়, সেখানে কিন্তু আমাদের বাচনরীতিতে শব্দটি বোঝায় যিনি নিজের সম্প্রদায় ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন ব্যক্তিকে, ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতামূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে অথবা কমপক্ষে দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘটিত সংঘাতকে। এভাবে আমরা সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি অথবা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিপরীতে অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি অথবা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলি। অথবা আইনি কাঠামোর মধ্যেই যখন কোনও বিশেষ সম্প্রদায়কে কতগুলো বিশেষ সুযোগ এবং অধিকার দেয়া হয় তখন আমরা বলি সাম্প্রদায়িক সুবিধা প্রদানের কথা।

এই উপমহাদেশে বিভিন্ন কারণে সাম্প্রদায়িক বিরোধের উৎপত্তি হয়ে এসেছে। ইসলাম ধর্মকে অনৈসলামিক আচার থেকে মুক্ত করার আন্দোলন, হিন্দু জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার উত্থান, মসজিদের সামনে বাদ্য বাজানো অথবা মুসলমানদের নামাজের সময় শাঁখ বাজানো; মন্দির অপবিত্র করা অথবা মূর্তি ভাঙা; গরু জবাইয়ের রীতি এবং তা বন্ধ করার জন্য আন্দোলন। এই তালিকা আর দীর্ঘ করা যায় সহজেই; কিন্তু তার কোনও প্রয়োজন নেই। এ ধরনের সংঘাতের জন্য সত্যকার আমরা ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের অথবা ধারণাপ্রসূত ভাগ ও শাসনের নীতিকে দায়ী করেছি, হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের অসম অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বলেছি, যেখানে প্রথমোক্ত সম্প্রদায় পরেরটিকে শোষণ করার অবস্থায় ছিল, একটি সম্প্রদায়ের সদস্যদের চেতনার গভীরে প্রোথিত বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং এ ধরনের অনুভূতিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছি। খুব দূর অতীতের কথা নয়, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পরের সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, ১৯২৬ সাল থেকে অবিরাম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিশেষ করে কলকাতা এবং ঢাকা সংঘাত এবং ১৯৪৬ সালে 'দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং ও পরবর্তীকালে নোয়াখালীর ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। এখানে একজন ঐতিহাসিকের

পর্যবেক্ষণ উদ্ধৃত করা প্রাসঙ্গিক হবে: 'যেখানে প্রাক-১৯৪১ সালের দাঙ্গাগুলো তুলনামূলকভাবে কম সংগঠিত ছিল এবং অর্থনৈতিক ও শ্রেণীগত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের সঙ্গে অধিকতর সম্পর্কিত ছিল, ১৯৪১-পরবর্তী দাঙ্গাগুলো ছিল সংগঠিত, সরাসরি যুক্ত ছিল সংগঠিত রাজনীতির সঙ্গে এবং পরিণতিতে প্রকাশ্যেই সাম্প্রদায়িক রূপ ধারণ করেছিল। দুই সময়ের সাম্প্রদায়িক সহিংসতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল বৈধতাকরণের প্রক্রিয়া- যাতে বাংলায় দাঙ্গাকারীরা তাদের সংঘবদ্ধ কাজের বৈধতা অর্জন করে নিয়েছে।' (সুরঞ্জন দাশগুপ্ত ও শেখর বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কাস্ট অ্যান্ড কমিউবাল ভায়োলেন্স ইন ইন্ডিয়া', কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১৯৩-৯৪।)

এসবই অবশ্য আমাদের এই বাস্তবতা থেকে দূরে সরিয়ে নেয় না যে, ধর্মীয় সহনশীলতা ও সমন্বয়বাদ ছিল আমাদের জীবন ধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শত শত বছর ধরে বিভিন্ন বিশ্বাসের মানুষ সাধারণত শান্তিপূর্ণভাবে একসঙ্গেই বসবাস করে এসেছে। বাঙালি সংস্কৃতি অপরিহার্যভাবেই যৌগিক। সে সংস্কৃতিতে অবদান রেখেছে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী, কাছের ও দূরের অনেক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, নানান ধর্ম এবং বিভিন্ন দর্শন শ্রেণী, ধর্ম-বর্ণ ও অঞ্চলের মতো উপাদানগুলোর ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক পার্থক্য আগেও ছিল এবং এখনও আছে; কিন্তু তারপরও প্রধানত ভাষার ওপর ভিত্তি করেই একটি ঐক্য গড়ে উঠেছিল এবং এখনো তা আছে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বহুল উচ্চারণে- বিবর্ণ এই বাক্যে অবস্থাটা যথাযথভাবেই প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এমনি একটি বৈচিত্র্য বা ভিন্নতাধর্ম, তার ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমির দাবি উত্থাপন করা হয়েছিল এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হয়েছিল। পাকিস্তানের শাসকদের অনুসৃত নীতি পূর্বাঞ্চলের জনগণের মোহভঙ্গ ঘটিয়েছিল এবং ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ঐক্য ক্ষণস্থায়ী বলে প্রমাণিত হয়েছিল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের মানুষ তাদের বাঙালি পরিচয়ের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছে এবং প্রবলভাবে চেয়েছে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং এক ধরনের সামাজিক সাম্য। এটা ঠিক যে, ১৯৫০ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল; কিন্তু ১৯৬৪ সালে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বে জনগণ সেই গ-ানির পুনরাবৃত্তি রোধ করেছিল। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা যে আত্মত্যাগের কারণে সম্ভব হয়েছিল, গ্রাম ও শহরের প্রায় সকল শ্রেণীর সব ধর্মের অনুসারীগণই তার অংশীদার ছিল।

বাংলাদেশের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা ভেবেছিলাম, সামরিক অভ্যুত্থান এবং সাম্প্রদায়িক সহিংসতার হাত থেকে চিরদিনের জন্য রেহাই পেয়ে গেলাম। দুঃখজনকভাবে আমাদের সে আশা মিথ্যা বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ১৯৭২ সালে গৃহীত বাংলাদেশের সংবিধান রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিল; কিন্তু সামরিক শাসকেরা শুধু সেই বিধান বাতিল করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা ইসলামকেও রাষ্ট্রধর্ম করেছে। সামরিক শাসকদের এ পদক্ষেপ ১৯৭১-এর বাংলাদেশবিরোধী এবং তাদের উত্তরসূরিদের একেবারে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মূলে আঘাত করতে সহায়তা করেছে, অমুসলিম নাগরিকদের সংখ্যালঘুর পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। রাষ্ট্রধর্মের সংবিধিবদ্ধ বিধান থাকার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে ১৯৮৮ সালে গঠিত হয় হিন্দু বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ। এর দু'বছর পর একটি মাত্র পত্রিকায় বাবরি মসজিদ ধ্বংস হওয়া সম্পর্কিত একটি মিথ্যা রিপোর্ট- যে রিপোর্টটি সরকারি অনুপ্রেরণায় প্রকাশিত হয়েছিল বলে মানুষের বিশ্বাস প্রকাশিত হলে হিন্দুরা আক্রান্ত হয়। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ যখন সত্যিই ভেঙে ফেলা হয়, বাংলাদেশে তখন ব্যাপক সহিংসতা হয়। যদিও এই সহিংসতার শিকার হয় প্রধানত হিন্দুরা, কিন্তু বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টানদের উপাসনাগুলোও তখন রেহাই পায়নি।

২০০১ সালে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা অনেক বেশি। এ শুধু ১৯৭১ সালের খুনি পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর আক্রমণের সঙ্গেই তুলনীয়। ওই সময়ে হিন্দুরা ছিল তাদের প্রিয় লক্ষ্যবস্তু; কিন্তু তারও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘৃণা এবং

প্রতিশোধের রাজনীতিতে তাদের উদ্বুদ্ধ করার মধ্যে; কিন্তু তিরিশ বছর পর স্বাধীন বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর যা ঘটে গেল সেটা সকল বোধগম্যতার অতীত।

২

একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে বাংলাদেশের অষ্টম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ছিল ২০০১ সালের ১লা অক্টোবর। ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকেই পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশ হতে লাগল হিন্দুদের এবং তাদের বাড়িঘরের ওপর আক্রমণের (সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন থেকে প্রকাশিত 'নির্যাতনের দলিল' ঢাকা, ২০০২ দ্রষ্টব্য।) এসব রিপোর্ট থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে, হিন্দুদের আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক হিসেবে গণ্য করে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দল তাদের মধ্যে প্রবল ভীতি সঞ্চারের চেষ্টা করছে। সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এবং বাংলাদেশ পূজা পরিষদের নেতৃবৃন্দ এবং আওয়ামী লীগের নির্বাচনপ্রার্থী ও দলীয় নেতৃবৃন্দ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অন্যদিকে বিএনপি'র নির্বাচনপ্রার্থীরা ঘটনার জন্যে আওয়ামী লীগকে দায়ী করেন। শেষ বক্তব্যিতে অন্তত স্থানীয় বিএনপি নেতৃত্বের পরোক্ষ স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় যে, ঘটনাধারার গতি ছিল ভুল পথে। কোন কোন জায়গায়, সরকারি কর্মকর্তারা, যেমন ফেনীর এসপি এবং ভোলার ডেপুটি কমিশনার স্বীকার করেছেন, এমন ঘটনা ঘটছে। ঢাকার কর্তৃপক্ষ যে কোনও রকম নিবৃত্তির চেষ্টা করেছে তেমনি মনে হয়নি; বরং তারা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রেখেছে এমন একটি ভঙ্গি যে, তাদের কর্তব্য হচ্ছে সাধারণ নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসতেই নির্যাতন ছড়িয়ে পড়ল আরও বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এর মাত্রাও গেল বেড়ে। কিন্তু ১লা অক্টোবরে নির্বাচনে বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন জোটের বিজয়ের পর যা ঘটল একদিন আগেও সেটা ছিল কল্পনার অতীত।

১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত ঢাকা থেকে প্রকাশিত ১০টি দৈনিক পত্রিকা (জনকণ্ঠ, সংবাদ, ইত্তেফাক, যুগান্তর, প্রথম আলো, ভোরের কাগজ, বাংলাবাজার পত্রিকা, ডেইলি স্টার, ইনকিলাব ও দিনকাল) ঘেঁটে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫৭টি জেলায় কমবেশি সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় আক্রান্ত হয়েছে। ঘটনার সংখ্যার হিসাবে বরিশালই তালিকার শীর্ষে। এ সময়কালের মধ্যে আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে ৯১টি, লুটপাটের ঘটনা ৮৭টি, আগুন লাগানোর ঘটনা ১৩০টি, বোমা হামলার ঘটনা ৯টি, হামলা করে জখম করার ঘটনা ৯৪টি, ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা ১১০টি, ৪৭টি চাঁদাবাজির ঘটনা এবং ৪৫টি অন্যান্য ধরনের সন্ত্রাসী ঘটনা হিন্দুদের ওপর ঘটানো হয়েছে। এ ছাড়াও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর সংঘটিত ১৫টি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের নির্যাতনের ঘটনা এবং খ্রিস্টানদের ওপর সংঘটিত একটি ঘটনার কথা জানা গেছে, ১৭ জনের নিহত হওয়ার খবর জানা গেছে, ৬৬৬ জন আহত হয়েছে, ১৩ জনকে অপহরণ করা হয়েছে, ৬১ জন ধর্ষিত হয়েছে এবং ৬৪ জন যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছে ৯৬৩ বসত বাড়ি, ১৪৮টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ৭০টি উপাসনালয়। এছাড়াও ১৯৬টি অন্যান্য স্থানে আক্রমণ চালানো হয়েছে। (আইন ও সালিশ কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত 'বুলেটিন', ডিসেম্বর ২০০১।)

একটি মানবাধিকার এবং আইনি সহযোগিতা প্রদানকারী সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র ২৪ নভেম্বর ২০০১ সালে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা প্রশ্নে আদালতের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে রিট আবেদন করে। আবেদনকারী ২০০২ সালের ১৪ জানুয়ারি আদালতের কাছে একটি সম্পূরক হলফনামা পেশ করে। এ দু'টি আবেদনে আইন ও সালিশ কেন্দ্র ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সংবাদপত্রের প্রকাশিত রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়েছে এবং খোদ

আইন ও সালিশ কেন্দ্র ও অন্যান্য বেসরকারি সংস্থা এবং সুশীল সমাজের অন্তর্ভুক্ত গ্রুপগুলি যে অনুসন্ধান করেছে তার থেকে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে। এগুলো শুধু ইতোমধ্যে তুলে ধরা ঘটনার সংখ্যাই বাড়ায়নি; বরং এর সঙ্গে সঙ্গে স্থানান্তর, দেশত্যাগ এবং আমাদেরই এক অংশের নির্দোষ মানুষকে যে মানসিক আঘাতের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তারই চিত্র প্রকাশ করেছে।

শুধু সংখ্যা পরিস্থিতির ভয়াবহতা প্রকাশ করতে পারে না। আমি শুধু একটি দৃষ্টান্ত দেব- হত্যা, ধর্ষণ বা নির্যাতনের নয়; কিন্তু প্রবল মানসিক আঘাতজনিত অভিজ্ঞতার। লালমোহন উপজেলার গজারিয়ার জাহাজমারা গ্রামের কাঠমিস্ত্রী সুভাষ মাঝির স্ত্রী ১৮ বছর বয়স্ক জয়ন্তী ২ অক্টোবর ২০০১ তারিখের বিকেলে প্রসব বেদনায় কাতর। হঠাৎ করে তার গ্রামের সব লোক পালাতে শুরু করে। গজারিয়া বাজারের দিক থেকে কুড়াল, লাঠি এবং ছুরি নিয়ে প্রায় ৬০ জন তরুণ উন্মত্তের মতো গ্রামে ঢুকে পড়ল। জয়ন্তী যখন ওর প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে যাচ্ছে তখন শুনছে যে শে-াগান দিয়ে আশপাশের বাড়ির দরজা ভাঙ্গা হচ্ছে। সাহায্য করার জন্য যে ধাত্রী এসেছিল সে আর থাকতে রাজি হলো না, চলে গেল। বাড়িতে রইল শুধু সে আর তার শাশুড়ি মুক্তি।

শিশুর যখন জন্ম হলো, মুক্তি তাকে একটি শাড়িতে জড়াল, ঘরের এক কোণের বেড়া ভেঙে ধাক্কা দিয়ে টেনে বের করল জয়ন্তীকে। তখনো ব্যথায় কাঁতরাচ্ছে জয়ন্তী, দৌড়ানো তার পক্ষে অসম্ভব। এক হাতে শাড়িতে জড়ানো নবজাতক অন্য হাতে জয়ন্তীকে ধরে শাশুড়ি টানছে পাশের ধানক্ষেতে আশ্রয়ের জন্য। তখন নাড়ি কাটারও সময় বা উপকরণ, কোনটাই তাদের ছিল না। ('ডেইলি স্টার' ১০ নভেম্বর ২০০১।)

বাংলাদেশের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা ভেবেছিলাম, সামরিক অভ্যুত্থান এবং সাম্প্রদায়িক সহিংসতার হাত থেকে চিরদিনের জন্য রেহাই পেয়ে গেলাম। দুঃখজনকভাবে আমাদের সে আশা মিথ্যা বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ১৯৭২ সালে গৃহীত বাংলাদেশের সংবিধান রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিল; কিন্তু সামরিক শাসকেরা শুধু সেই বিধান বাতিল করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা ইসলামকেও রাষ্ট্রধর্ম করেছে। সামরিক শাসকদের এ পদক্ষেপ ১৯৭১-এর বাংলাদেশবিরোধী এবং তাদের উত্তরসূরিদের একেবারে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মূলে আঘাত করতে সহায়তা করেছে।

সংবাদপত্রের প্রকাশিত রিপোর্ট পড়ে এবং নির্যাতিত মানুষের সঙ্গে কথা বলার জন্য তিনটি এলাকায় গিয়ে যা দেখেছি তারপর নিচের সিদ্ধান্তগুলোই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

১. সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সন্ত্রাস হয়েছে, যার বেশির ভাগ সহ্য করতে হয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়কে।

২. ঘটনার তাৎক্ষণিক কারণ মনে হয়েছে রাজনৈতিক; কিন্তু আসলেই এটা সাম্প্রদায়িক। কারণ যেসব হিন্দু বিএনপির পক্ষে ভোট দিয়েছে বলে জানা গেছে তাদেরকেও রেহাই দেয়া হয়নি। অনেক জায়গায়ই যে শে-াগানটি শোনা গেছে, সেটি হচ্ছে : হিন্দুরা বাংলাদেশে থাকতে পারবে না। এ ঘটনাগুলো রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপ্রসূত অথবা অন্তর্বর্তীকালীন সুযোগে সংঘটিত সাধারণ অপরাধ, এসব যুক্তি গ্রহণযোগ্য হয় না।

৩. অভ্যন্তরীণভাবে ব্যাপক স্থানচ্যুতি ঘটেছে; শুধু তাই নয়, এএফপির রিপোর্ট যেমন লিখেছে :
'শত শত বাংলাদেশী হিন্দু পরিবার সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে পালিয়েছে' কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার আংশিকভাবে এর সত্যতা স্বীকার করেছেন।

৪. অন্যান্য সময়ে আমরা দেখেছি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় নগরে। তারপর তা

মফস্বল শহরে ছড়িয়ে পড়ে; কিন্তু গ্রামগুলো তুলনামূলকভাবে শান্তিতেই থাকে। এবারে ঘটনা সবগুলোই ঘটেছে গ্রামাঞ্চলে এবং নির্যাতিতের অংশই খুবই গরিব। এটা এ সত্যেরই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, নির্যাতনের উদ্দেশ্য শুধু সম্পত্তি দখল নয়। হিন্দুদেরকে এমন ভয় দেখানোই ছিল উদ্দেশ্য যেন তারা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

৫. সবক্ষেত্রেই পুলিশ ছিল নিষ্ক্রিয় এবং থানায় মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানানো, ঘটনা গোপন করতে নির্যাতিতদের নির্দেশ দেয়া এবং সাধারণভাবে তাদের অনাগ্রহ বা সহানুভূতির অভাব সব জায়গায়ই একই রকম দেখা গেছে। প্রশাসনের এমন নিষ্ক্রিয়তা এবং প্রতিবেশীদের নীরবতা অপরাধীদেরকে একধরনের বৈধতা দিয়েছে।

৬. অল্পসংখ্যক ব্যতি□ম ছাড়া নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়ানোর ব্যাপারে সকল ধরনের রাজনীতিবিদের ব্যর্থতা ছিল একেবারেই প্রকট। এটা ছিল জনগণের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও অঙ্গীকারের দুঃখজনক অভিব্যক্তি।

৭. এ নৃশংসতায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আত্মবিশ্বাস দারুণভাবে নড়ে গেছে। এতই ভীত হয়েছে তারা যে অনেক জায়গায়ই প্রশাসন, গণমাধ্যম অথবা সিভিল সোসাইটি প্রতিনিধিদের কাছে নিজেদের নির্যাতনের কারণ বলতে সাহস পায়নি। আমাকে অনেকে ব্যক্তিগতভাবে বলেছে, প্রচার মাধ্যমেও এমন খবর বেরিয়েছে যে, তারা বরং ভোটার তালিকা থেকেই নিজেদের নাম কাটিয়ে দিতে ইচ্ছুক। কারণ শুধু এ পন্থাই তাদেরকে কিছু নিরাপত্তা দিতে পারে বলে তারা মনে করে।

৮. স্থানীয় প্রশাসন কোথাও কোথাও স্বীকার করেছে যে, 'কিছু' বিশৃঙ্খলা হয়েছে; কিন্তু সামগ্রিকভাবে প্রশাসন অস্বীকারই করেছে যে, এ ধরনের নির্যাতন ঘটেছে। বাস্তবকে স্বীকার করার এ অস্বীকৃতির চরম অভিব্যক্তি হলো অভিযোগগুলোর যথার্থতা সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিখ্যাত উক্তি ঃ 'অংশত অতিরঞ্জিত, অংশত গুজব, অংশত সত্য'। অনেকের কাছে এটা কাটা ঘায়ে লবণ ছড়িয়ে দেয়ার মতো লেগেছে।

এখন বাস্তবে এটা আর আশা করা ঠিক হবে না যে, সরকার নির্যাতিতদের সঠিকভাবে পুনর্বাসনে কোনরকম সাহায্য করবে অথবা তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেবে অথবা অপরাধীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবে। এ পরিস্থিতিতে আমি শুধু সিভিল সোসাইটিকে আহ্বান জানাতে পারি গভীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠতে পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলাতে এবং ২০০১ সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন বাংলাদেশ আর কখনও না হয় তার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির ভিত্তিটাই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে।

(এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ঃ জাতীয় কনভেনশনে পঠিত প্রবন্ধ)

(ইংরেজি থেকে অনুবাদ ঃ মুনীরুজ্জামান)

সংবাদ, ১৮ এপ্রিল ২০০২

হিন্দু বৌদ্ধ ধর্মনেতার হত্যার দায় কার?

ওয়াহিদুল হক

অবশ্যই অপ্রত্যাশিত ছিল তা এই সবকিছু-সম্ভবের দেশে। কর্তব্যরত পুলিশকে মসজিদের ভেতরে টেনে নিয়ে গিয়ে ইমামসহ সকলে মিলে তাকে জবাই করা এদেশেই সম্ভব হয়েছিল। এবং তারপর এদেশেই হয়েছে বিচারের দীর্ঘসূত্রতায় তার কোনোই কূল না হওয়া। দেশে এখন কোন কোন পুলিশ সরাসরি সন্ত্রাস করে, সন্ত্রাসীকে মদদ দেয়, আড়াল করে, আশ্রয় দেয়। পুলিশ কী, পুলিশ কে? সরকারের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। মানে গায়ের জোরে আইন খাটানোর সংস্থা। আইনের জন্যে প্রয়োজন হলে সে লাঠিপেটা করে, জেলে নেবে, আরো কিছু করবে। সবই সিদ্ধ হবে তা যদি আইনকে প্রতিষ্ঠা করে। পুলিশ বেআইনকে প্রতিষ্ঠা করে চলেছে, দুষ্ট পালন করছে, শিষ্টকে দমন করছে। ব্যতি□ম পাওয়া যাবে যেখানে পুলিশ ভালোও করতে চেষ্টা করে। হয়তো এখনো করছে। কিন্তু মন্দের সাগরে কিছু ভালো দ্বীপও আছে বলে সাগরকে দ্বীপ বলব? পুলিশ যদি একটা ব্যক্তি হয়, তাকে সমুচিত বিচারের পরে, ফাঁসিকাঠে ঝোলানো যেতেই পারে, নিদেনপক্ষে যাবজ্জীবন দেয়া যেতে পারে। কিন্তু পুলিশ তো স্বাধীন কিছু নয়, তার ভালোমন্দের শক্তিকে পায়ই-বা কোথা থেকে? পায় সরকার থেকে, পায় সংবিধান থেকে। পুলিশ সরাসরি গণপ্রজাতন্ত্রের বেতনভুক কর্মী। দেশে যদি প্রতিষ্ঠিত সরকার থাকে তবে তাকে পুলিশের যাবতীয় দুষ্কৃতি সুকৃতির দায় নিতে হবে। সে-ই পুলিশের একমাত্র নিয়ন্ত্রক। সরকারের হয়ে পুলিশকে সরাসরি ব্যবহার করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যদি পুলিশের কৃতকর্মের দায় না নেয় তবে সে দায় বর্তাবে প্রধানমন্ত্রী তথা সমগ্র সরকারে। যতই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দায় না নিচ্ছে প্রধানমন্ত্রীও না নিচ্ছে, ততই প্রতিষ্ঠিত সরকারের ক্ষয় হচ্ছে, দেশ সরকারবিহীন অরাজক ও মাৎস্যন্যায়ের দিকে দ্রুত ছুটে যাচ্ছে।

চট্টগ্রামে সন্ত্রাসীরা ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি মহাথেরকে হত্যা করলো, ধড় থেকে মুণ্ডটা আলাদা করে, সেই ভিক্ষুরই পরিচালিত আশ্রমের ভেতরে। এ পর্যন্ত অনেক কিছুই বাংলাদেশে হয়েছে, কিন্তু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতৃত্বের গায়ে এখনো হাত পড়েনি। চিন্তাই করা যায়নি এমনটা হতে পারে এই চরম সাম্প্রদায়িকতা দুষ্ট দেশে পর্যন্ত। হলো তা। ঘটনাস্থল রাউজান। গাছের একটি পাতাও সেখানে নড়ে না সাকা-গিকার আদেশ ছাড়া। অর্থাৎ সরকারদলীয় সন্ত্রাসীর দ্বারা ঐ বৌদ্ধ ভিক্ষুর নৃশংস হত্যাকর্ম সম্পন্ন হয়েছে। গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ঐ খুন হওয়া ভান্তের ভাইকে, ভ্রাতৃবধূকে। পুলিশের অপার মহিমা! শুধু গ্রেপ্তারই করেনি, দিয়েছে প্যাদানি। কোন অধিকারে? আসল খুনি রইল কোথায়? আর ভান্তের ভাইয়ের বৌটিকে?

তার ওপর অত্যাচারের কথাও এসেছে কাগজে।

এই রকম একটা কাণ্ড, যে সে কাণ্ড নয়, অতিরঞ্জনও বলা যাবে না মুরগিচুরি ঘটিতও বলা যাবে না, একেবারে বৌদ্ধ clergyর মাথা - ব্যক্তিত্বকে খুন করা এবং সরকারি সন্ত্রাসী দ্বারা ঘটলো আপনারই আমলে হে চক্ষুচর্মহীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ চৌধুরী। আপনি কি এতদিনেও শিখে উঠতে পারেননি যে গুরুত্বে যদি এর অর্ধেকও যদি ঘটতো, সভ্য দেশ হলে আপনার বিহিত কর্ম হত সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করা। তা করলে আপনি মান পেতেন সকল দিক থেকে। কিন্তু সরকারের দায়দায়িত্ব বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীও কি এতই অবোধ যে তিনি নিজেকে কিঞ্চিৎ দায়মুক্ত করবার চেষ্টায় তার এই স্বদেশমন্ত্রী পুঙ্গবকে, লোক দেখানো মত করে হলেও, সরিয়ে দিতে পারছেন না। উল্টো গীত গাওয়াতে তিনি অবশ্য একটা দক্ষতা পেয়ে গিয়েছেন। কিন্তু

শুধু তাই দিয়ে যে তিনি আলতাফের সমস্ত ব্যর্থতার দায়ভার নিজের কাঁধে জমিয়ে তুলছেন, তার থেকে মুক্তি পাবেন । রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালনের দুটা মাত্র পথ । আধুনিক রাষ্ট্রের চল অনুযায়ী, সভ্য দেশের মান অনুযায়ী নিজকে রাষ্ট্রস্থিত সকল নাগরিকের ভালোমন্দের জন্য দায়ী করা । আরেক পন্থা, মধ্যযুগীয় কিংবা প্রাচীন ভারতীয় পন্থা- নাগরিকের কোনো কিছুরই সঙ্গে যুক্ত না থাকা, শুধুই পররাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ করা, নিজের আমির-ওমরা বিলাসঐশ্বর্য নিয়ে ব্যস্ত থাকা । রাজারা এই রকম হতেন, কিন্তু সকল নাগরিকের নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করবার ব্যাপারে দুই ধরনের রাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, রাজা কারোই কিছু আলতাফ চৌধুরীরা যত দায় এড়াবেন, সেগুলো লাফিয়ে উঠবে খালেদার কাঁধের ওপর । ধর্মীয় যাজক কি কর্মকর্তা নিধনের মত ঘটনার দায়দায়িত্ব নেয়ার কি কেউ নেই বাংলাদেশে? বাংলাদেশ কি রাষ্ট্র নয়, জোট সরকার কি সরকার নয় । কিন্তু আমরা এত দিনে জেনে গেছি, চাপাচাপির ফলে খালেদা যদি একটুকুও দায় বোধ করেন, তিনি বলে বসবেন ওসব আওয়ামী লীগ ঘটিয়েছে । রাউজানে? সম্ভব-অসম্ভব জ্ঞান তার কোন দিনই ভালো ছিল না ।

এখানে একটা কথা না চাইলেও চলেই আসে । এই যে বৌদ্ধ ভিক্ষু হত্যা, এর প্রভাব তো জাপানের ওপরে পড়বেই । আরো কতো জায়গায় যে পড়বে । বৌদ্ধ ভিক্ষুকে হত্যা করবে সাকা চৌধুরীর ক্যাডাররা, আর সারা বাংলাদেশকে তার মূল্য দিতে হবে? বাইরে বাংলাদেশ বিরূপ প্রচারণা পাচ্ছে/ বিদেশী কাগজের বিরুদ্ধে মামলা করো । করে সুবিধা হবে না? বিদেশিদের দেশে আনাগোনা নিয়ন্ত্রণ করো, মিয়ানমার পারলে আমরা পারবো না কেন । তাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ হবে? হোক । মান বড় না পয়সা বড় । দেশের মানুষেরও বাইরে যাওয়া সঙ্কুচিত করতে হবে । পৃথিবী থেকে বাংলাদেশকে ছেঁটে বাদ দিতে হবে । পাসপোর্ট সঙ্কট বাঁধালো সরকার । কিন্তু বৌদ্ধ ভিক্ষু হত্যাটা সরকার হজম করবে কী করে? তার তো অপপ্রচার (!) লাগবে না, তার ঢাক আপনি বাজবে । না জানি তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে সরকার নিজের নাগরিককুলের আর কতো অভিনব এবং দুর্বহ দণ্ডবিধান করেন । মূলে তো সরকারের সন্ত্রাসী তোষণ । সেটা বন্ধ করলেই সরকার বেঁচে যান অপপ্রচার থেকে এবং মানুষও বাঁচে সরকারের ক্ষ্যাপামি থেকে । কিন্তু তা করতে পারলে তো বিএনপি বিএনপিই থাকে না । কৌশলে জিয়া সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশকে সেনাশাসনের অধীন করলেন । সেটা অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের রাষ্ট্রীয় মাপের সন্ত্রাস । সংবিধান নিয়ে চালালেন সন্ত্রাস, নির্বাচন নিয়েও তাই । জিয়া আমলে দেশে একজন মাত্র মানুষ ছিল, জিয়া নিজে এবং সেটা জিয়া বাংলাদেশের প্রতিক্ষেত্রে বুঝিয়ে ছেড়েছেন । আশ্চর্য বাঙালি বাংলাদেশের । জিয়ার সংসর্গে গেছেন তার ক্ষমতার কালে এমন কেউ নেই বাঙালির মধ্যে যার অসম্মানের মানুষগুলো দেশের সবকিছুর মালিক ঠাওরাচ্ছে নিজেদেরকে এবং বোধগম্য কারণেই, কারো কোনো রকম অসম্মান থাকতে পারে তা ভাবতেই পারছে না । শাহরিয়ার কবির, বাহাউদ্দিন নাছিম, মহীউদ্দীন দায়েই (নাছিম তো বিদেশে যেতেই পারেনি, কল্পিত অপরাধে দণ্ড) রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা এবং নির্যাতন সইতে হয়েছে, হচ্ছে । সত্যি মিথ্যার মালিক সেই তিনি । সন্ত্রাসের তথা পারস্পরিক অপমান ও অশ্রদ্ধার, ভয়ভীতির বিএনপি তা প্রতিষ্ঠা পেলো, পরিপুষ্ট হলো কাল□মে পাকিস্তানি মদদে ও সাম্প্রদায়িক প্রবণতাগ্রস্ত দেশবাসীর পাকিস্তানি পিছুটানকে বিবেকহীনভাবে উসকে দেয়ার মাধ্যমে । আজ সেইসব সূক্ষ্ম চ□ান্ত পার হয়ে খোলামেলাভাবে, দ্ব্যর্থহীনভাবে বিএনপি সন্ত্রাস করছে । পনেরই জুলাই, ২০০১-এ সন্ত্রাসের আরম্ভ । এবং এ বাড়ছেই । অরুন্ধতী রায় লিখেছিলেন আমেরিকা ছুতো পেয়েছে বটে একটা দুনিয়াকে শায়েস্তা করবার । সন্ত্রাসের ধুয়া তুলে চড়াও হলো পররাজ্যের ওপরে । সন্ত্রাসীকে পাবে না । ক্ষেপবে, আরও গরম হতে হতে কেবল আপন সন্ত্রাসী সত্তাটিকেই প্রকাশ করবে । জোট সরকারেরও সন্ত্রাস কেবলই বাড়ে যত কেননা সন্ত্রাসকে দমন করবার ঘোষণা দিক-না ।

নির্বাচনে বিএনপির প্রধান ইস্যু ছিল সন্ত্রাস দমন । এখন বাংলাদেশের জনজীবন জোড়া সন্ত্রাসে মনোপলি সরকারের ।

আল-াহ সর্বশক্তিমান । শক্তিমতী পৃথিবীতে কেউ থেকে থাকেন জারিনা ক্যাথারিন দি গ্রেট, ইংল্যান্ডেশ্বরী প্রথম এলিজাবেথ হয়ে আমাদের ঘরের পাশের ইন্দিরার শিরোপাটি যদি কারো মাথায় শোভা পেয়ে থাকে তো সেই এই আমাদের প্রধানমন্ত্রীর । এমনি শক্তিমতী তিনি কিন্তু তিনি সন্ত্রাসকে পারেন না কিছু করতে । আজ বলে নয় । কোনদিনই ছাত্রদল তার কথা শোনেনি । সশস্ত্র গৃহকোন্দলের পথ তারা ত্যাগ করেনি । অক্টোবরের আসন্ন নির্বাচনের দিনে সন্ত্রাসী জিয়া সৈনিকদের প্রতি যেন একটা ‘পলিসি প্যাকেজ’ উপহার দেয়া হলো । তত্ত্বাবধায়কের আমলে যত পারো মারো, আমরা সরকারে এলে যত পারো ভোগ করো । তাতে যদি সন্ত্রাসের সঙ্গে একটা রফা হয় । হিংসাতন্ত্রে ঘৃতাহুতি দিল বিএনপি । তত্ত্বাবধায়কের দুই মাসে অন্তত এক হাজার আওয়ামী নেতাকর্মী খুন হলেন । এবং নির্বাচন হলো কে কত খেলেন কত পেলেন কত করলেন তিনজন । কালে কালে ঐহিক লাভের ব্যাপারটা প্রকাশ হচ্ছে । কিন্তু তাঁরা তো বাংলাদেশেরই আটি বি□ করে দিলেন, তার দেহটির সঙ্গেই অবশ্যই । চূড়ান্ত অস্বচ্ছ একটি নির্বাচনে, মিলিটারি দিয়ে ঠেঙ্গিয়ে ইচ্ছে মতো গণনা করে না করে পোলিং এজেন্টের ভূমিকাবিহীন একটি বানানো খেলায় বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনা চলে গেল বাঙালির গণতন্ত্র ও জাতীয়তার সাধনার শত্রুদের হাতে । পূর্বের কথা মতো এবার সন্ত্রাসীদের ভোগের পালা । আরম্ভ হলো সংখ্যালঘু নির্যাতন । ভোগের চূড়ান্ত । বাড়িঘর, জোতজমি, নগদ টাকাকড়ি এবং নারী । সেই যে আরম্ভ হলো এখনো থামলো না । বরং প্রসারিত হলো সমাজের সর্বত্র ।

সপ্তাহ না যেতে, রাউজানের পর খাগড়াছড়িতে হিন্দু আশ্রমের পুরোহিতকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে হত্যা করল আবারো সরকারি সন্ত্রাসীরা । এই হত্যাকাণ্ডে সরকারের কী লাভ । কোনই লাভ নেই, ক্ষতি ছাড়া । কিন্তু পথটা তো বাতলেছেন সরকার, পথে তো নামিয়েছেন সরকার । সংখ্যালঘুরা মার খেয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে থাকলে সরকারের তো পোয়াবারো, আওয়ামী রসাতলে যাবে । সরকার এখন বুঝেছে ব্যাপার তত সোজা নয় । যতই থামাতে চাইছে, ভবী তো থামতে চাইছে না । ব্যাঘ্র নরমাংসের স্বাদ পেয়েছে । জামাত এবং খালেদার সোনার টুকরা ছেলেরা এবং সেই সাকা চৌধুরী যে খালেদাকে জমাখরচ না দিয়ে নিজের মূল্যে নিজের রাজনীতি করে- বিএনপিকে খাবে বাংলাদেশেই থাকবে- জেগে উঠবে একটা দীর্ঘ দুঃস্বপ্ন থেকে ।

এই চিত্রনাট্যটা ইচ্ছা করলেই যে দেখতে পারতো সাদা চোখে সেই কামাল হোসেন, সমস্ত রকম চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে এখন মহানগরের নির্বাচনের ব্যাপারে নড়েচড়ে উঠেছেন । তাঁর না হোক । তিনি বলেছেন আওয়ামী অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে দেশের মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে বিএনপিকে ভোট দিয়েছিল । সেই বিএনপি কি না রাজশাহীতে বাদশাকে কারচুপি করে হারিয়ে দিল! আর কোনভাবে তোমার বোধোদয় হলো না । সন্ত্রাস কাকে বলে, কারচুপি কাকে বলে এই প্রথম বুঝলেন আপনি? হায়! কামালকে দলীয় রাজনীতির পঙ্কিলতাবর্জিত বলেই সবাই ভাবতে চেয়েছে, প্রমাণ করলেন তিনি যে সেই প্রত্যাশার যোগ্য নয় ।

বাংলাদেশের এই ঘোর দুর্গতির দিনের একটি মাত্র আলোর ঝলকানি মহানগর নির্বাচনে মানুষের যোগ না দেয়া । তিন মহানগর মিলিয়ে সম্ভবত ২০ শতাংশ ভোট দিয়ে থাকবে নির্বাচকরা । এটি অবশ্যই একটি চপেটাঘাত । এবং বুদ্ধির দোষে জোট সরকার যা ছিল নিতান্ত একটা চড়, তাকে জুতার বাড়ি করে ছাড়লেন, নিজেরই গালে জাতীয় নির্বাচনে যে বিশ্বাসযোগ্যতা প্রচণ্ড ঘাটতি দেখা দিয়েছিল, সুযোগ ছিল এবারে তা সত্যিকারের নির্বাচনানুষ্ঠানের মাধ্যমে অনেকটাই কাটিয়ে ওঠা । সরকার আবার দুর্নীতির পথে গেলেন ।

এবারে ডোজটা বোধহয় এম. এ সাঈদের জন্যেও বেশী হয়ে গেছে। বেচারী দু'দিন মনের দুঃখে অফিসেই আসেননি। সাঈদের মত বি্ত কিংবা বিকৃত মানুষকে পর্যন্ত বিএনপি তথা সরকার বোধ হয় লজ্জা দিল, বিবেকহীনতার ব্যাপারে।

এর মধ্যে পনের সাবেক সচিব একযোগে নিন্দা করেছেন সরকারের জেলে নিজের হাওলায় মানুষকে অমানুষী নির্যাতন করবার। সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী পরিষদও কাপাসিয়ার ফকির জামালউদ্দীনের ব্যাপারে শক্ত অবস্থান নিয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনা মানে তো খেয়ালখুশি চরিতার্থ করা নয়। দেশের সর্বোচ্চ শক্তির আপন ক্ষুদ্র স্বার্থে যথেচ্ছ অপচয় নয়। বৌদ্ধ ভিক্ষু হত্যা, হিন্দু পুরোহিত হত্যা, পুলিশ কর্তৃক জামাল ফকির হত্যা- এই তিনটি হত্যার দায় ঝুলছে আপনার ঘাড়ে হে মহামহিম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আপনি যতই ভাঁড়ের ভূমিকায় চমৎকার পার্ট করুন, এর থেকে নিস্তার নেই। আপনি দায় না নিলে তা যাবে প্রধানমন্ত্রীর ঘাড়ে। এটা তো রাষ্ট্র, তাই না? ঘটনা ঘটবে কিন্তু কেউ দায়ী হবে না, এতো হবে না এবং প্রধান দায়িত্বশীল লোক তো প্রধানমন্ত্রী। তারপরেই আপনি। দায়িত্ব স্বীকার করতে সবচেয়ে বেশী লাগে চরিত্র, লাগে নৈতিক বল। আপনারা ঘোরতর একটা পরীক্ষার মধ্যে আছেন। যদি মনে হয় ফেল করবেন, ছেড়ে দিন এসব। পাস করতে হলে দায়িত্ব নিতে হবে পহেলা অক্টোবর তাবৎ খুন জখম ধর্ষণ অপহরণ জবরদখল-চাঁদাবাজির। একজনকে মারলে ফাঁসিতে যেতে হয়। শতসহস্রকে মারলে, ঘরছাড়া করলে, ইজ্জতহারা করলে? ভেবে দেখবেন।

ভোরের কাগজ, ৪ মে ২০০২

চট্টগ্রামের তিন খুন কি বলতে চান কর্তৃপক্ষ!

নির্মল সেন

ঘটনা ঘটেছে চট্টগ্রাম জেলায়। ঘটনা হত্যাকাণ্ড। ১৯৯১ সালের পর কত হত্যাকাণ্ড হয়েছে চট্টগ্রামে, তার কি হিসাব আছে কোন মহলে? হত্যার দায়ে কতজন গ্রেফতার হয়েছে? কারও কি শাস্তি হয়েছে। কারা ছাড় পেয়েছে অভিযোগ থেকে? কেন বা কার নির্দেশে? এ খবর আমি অন্তত জানি না। চট্টগ্রাম জেলা কর্তৃপক্ষ এমন একটি হিসাব দিলে বাধিত হব। এ ধরনের কোন হত্যাকাণ্ড ঘটলে বলা হয় এ জন্য দায়ী সন্ত্রাসীরা। কিন্তু সন্ত্রাসীদের তো নাম ধাম আছে। পুলিশের খাতায় পরিচয় আছে। তাহলে তাদের ধরা হয় না কেন? এবার ক্ষমতার পরিবর্তনের পর পুলিশ কর্তৃপক্ষ বলতে পারে-আমরা সন্ত্রাসী বলব কাকে। এ দেশে সন্ত্রাসী হিসাবে যারা এক সময় পরিচিত হয়, পরবর্তীকালে তারা সংসদ সদস্য পদে প্রার্থী মনোনীত হয়। সংসদ সদস্য হয়। কেউ কেউ মন্ত্রী হয়। তাদের সন্ত্রাসী বলতে বা তাদের বিরুদ্ধে মামলা দেবার সাহস কোথায় পাব। এমনও হয় যে ক্ষমতার পরিবর্তনের সাথে সন্ত্রাসের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা পরবর্তীকালে পুলিশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে যায়। তার পর!

এ কথা আমার মনে হয়েছিল ক'দিন আগে চট্টগ্রাম গিয়ে। সম্প্রতি কয়েকটি হত্যাকাণ্ড হয়েছে চট্টগ্রামে। এই হত্যাকাণ্ড আলোড়িত করেছে বিভিন্ন মহলকে। কিন্তু এই হত্যাকারী কারা? একমাত্র জবাব সন্ত্রাসীরা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এই সন্ত্রাসীদের পিছনে গডফাদার আছে। এই গডফাদাররা পরিচিত এবং শক্তিশালী। তাই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই কার্যকর হয় না। তারা গ্রেফতার হলে জামিনে মুক্তি পায়। তারপর এক সময় বেকসুর খালাস হয়ে যায়।

এমন একটি ঘটনার কথা সেদিন শুনেছিলাম চট্টগ্রামে। বেশ কিছুদিন আগে অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী তাঁর চট্টগ্রামের বাসভবনে খুন হয়েছিলেন। তাঁর বাসায় তখন মানুষের ঢল নেমেছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সন্ত্রাসীদের ধরা হবে। তাদের বিচার হবে। তাদের কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।

তারপর কয়েক মাস কেটে গেছে। সেদিন চট্টগ্রামে নিহত অধ্যক্ষের বাড়ি গিয়েছিলাম। দেখা হয়েছিল তাঁর স্ত্রী এবং কন্যার সাথে। শুনলাম অধ্যক্ষ মুহুরীকে খুন করার দায়ে যারা গ্রেফতার হয়েছিল তারা সবাই জামিন পেয়েছে। মামলা এখন আর চলছে না। পুলিশ কর্তৃপক্ষ বলেছে, এখন চারদিকে অনেক ঝামেলা। আপাতত এই মামলা নিয়ে কিছু করা যাচ্ছে না। কথাগুলো আক্ষেপের সুরে বলছিলেন নিহত অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীর স্ত্রী। তিনি বললেন, সকলেই বলে আমার স্বামী সৎ। উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। অজাতশত্রু ছিলেন। অথচ তিনি নিহত হলেন। কেন হলেন সে কথা আমি জানি না। দেশবাসীর কাছে আমার প্রশ্ন, তাহলে এত ভাল মানুষটা খুন হলো কেন, আর এ খুনিদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না?

সেদিন তখন চট্টগ্রাম শহরে সন্ধ্যা নেমেছে। ইতোপূর্বে ঐ বাসায় কখনও যাইনি। অধ্যক্ষের স্ত্রীর কথা শুনে আমি একটু বিস্মিত হলাম। কারণ আমি তো শুনেছি তাঁর অধ্যক্ষ পদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরাই তাঁকে খুন করেছে এবং আমার বিশ্বাস সরকারও এ কথা জানে এবং জেনেশুনে অপরাধীদের আড়াল করা হচ্ছে।

চট্টগ্রামের এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। অনেক লেখালেখি হয়েছে। বিচারের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোন প্রতিশ্রুতি কাজে আসছে না। তাহলে কি আমি মনে করব ঐ হত্যাকারীদের অঙ্গুলি হেলনেই এই হত্যা মামলা হিমাগারে চলে গেছে? চট্টগ্রামের সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে আমাদের অবহিত করলে খুশি হব।

শুধু অধ্যক্ষ মুহুরীর হত্যাকাণ্ড নয়, সম্প্রতি চট্টগ্রামের আরও দু'টি হত্যাকাণ্ড সারা দেশে অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। সম্প্রতি রাউজান থানায় এক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে হত্যা করা হয়েছে। মানিকছড়িতে হত্যা করা হয়েছে এক হিন্দু পুরোহিতকে। ঘটনা দু'টি বিচ্ছিন্ন কিন্তু অনেকের মনে হয়েছে এই হত্যাকাণ্ড ভিন্ন অর্থ বহন করে। আমি যেখানেই কর্তৃপক্ষের কাছে জিজ্ঞাসা করেছি, তারা বলেছে, সব হত্যাকাণ্ড সন্ত্রাসীদের কাজ। কিন্তু এই সন্ত্রাসীদের সম্পর্কে কেউ মুখ খুলছে না।

আমি ১১ দলের নেতাদের সাথে রাউজান থানার হিঙ্গুলী ইউনিয়নে নিহত বৌদ্ধ ভিক্ষু জ্ঞান জ্যোতি ভিক্ষু অনাথাশ্রমে গিয়েছিলাম। সে আশ্রমে ৯৬ জন অনাথ শিশু থাকে। তাদের ভরণ-পোষণ এবং শিক্ষার ব্যবস্থা ঐ আশ্রম থেকেই করা হয়। জ্ঞান জ্যোতি ভিক্ষু বিভিন্ন মহল থেকে সাহায্য নিয়ে ঐ আশ্রমটি চালাতেন। শুনেছি তিনি আশ্রমটি সম্প্রসারণের জন্য কিছু জমিও য় করেছেন। এ কথাও শুনেছি যে, বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম প্রতিষ্ঠান ঐ আশ্রমকে সাহায্য দিত। পুলিশ কর্তৃপক্ষের অভিমত হচ্ছে, টাকার লোভে সন্ত্রাসীরা ঐ হত্যাকাণ্ড করেছে। যুক্তি হিসাবে এ কথা শুনতে মন্দ নয়। কিন্তু আমার প্রশ্ন ভিন্ন।

আমার প্রশ্ন হচ্ছে পুলিশ বলছে, সন্ত্রাসীরা হত্যা করেছে। তাহলে এই সন্ত্রাসী কারা, পুলিশ কি তাদের খোঁজ করেছে? একজন সন্ত্রাসীও কি গ্রেফতার হয়েছে? আমি ৭ মে ঐ আশ্রমে গিয়েছিলাম। তখনও শুনিনি কোন সন্ত্রাসী গ্রেফতারের খবর। শুনলাম আশ্রমের একজন সদস্য এবং ঐ ভিক্ষুর একজন ভাইয়ের স্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের কেন গ্রেফতার করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা আদৌ দেয়া হয়নি। বাংলাদেশের একশ্রেণীর দৈনিকে কোন সূত্র উলে-খ না করে বলা হচ্ছে ঐ বৌদ্ধ ভিক্ষুর সাথে তার ভ্রাতৃবধূর অবৈধ সম্পর্ক ছিল। আমি চট্টগ্রামে সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিক বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এ খবর আপনারা কোথায় থেকে

পেলেন? এ খবর কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য? আপনারা কি খেয়াল করেননি যে কোন মহিলা সম্পর্কিত এমন অপমাণিত অভিযোগ তার জীবন শেষ করে দিতে পারে? সে নির্দোষ প্রমাণিত হলেও সমাজে পুনর্বাসিত হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। আপনারা কি লক্ষ্য করেননি সম্প্রতি ধর্ষিত রমণীর ছবি পত্রিকায় ছাপানো হচ্ছে না। তাদের নাম-ধাম গোপন রাখার চেষ্টা হচ্ছে। তাহলে আপনারা এমন কাজটি করলেন কেন। কোন মহল কি আপনাদের প্রভাবিত করেছে? তাহলে আপনারা কি মনে করেন ঐ অবৈধ সম্পর্কই বৌদ্ধ ভিক্ষুর হত্যার একমাত্র কারণ? আপনারা এ কথাও লিখেছেন যে, জমিজমা সম্পত্তি নিয়ে ঐ পরিবারে বিরোধ ছিল। সেই বিরোধের জন্যই জ্ঞান জ্যোতি ভিক্ষুকে প্রাণ দিতে হয়েছে। কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, জ্ঞান জ্যোতি ভিক্ষু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। যাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণ করে তাঁদের সহায়-সম্পত্তি থাকতে নেই। আশ্রমের সম্পত্তি পারিবারিক সম্পত্তি নয়। সুতরাং বৌদ্ধ ভিক্ষুর সম্পত্তি নিয়ে যে সংবাদ আপনারা পরিবেশন করেছেন সে সংবাদের ভিত্তি জানালে আমি বাধিত হব। নইলে আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য হব যে আপনাদের এই খবরের পিছনে খবর আছে এবং সেই খবরের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

এ কথা সাংবাদিক সম্মেলনে বলার পর আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তাহলে আপনি সন্ত্রাসীদের নাম বলুন। আমার প্রথম জবাব ছিল যদি একশ্রেণীর সাংবাদিকের ভাষা অনুযায়ী বৌদ্ধ ভিক্ষুর স্বজনরাই তাকে হত্যা করে থাকে, প্রশ্ন উঠবে, স্বজনরা কি নিজের হাতে বৌদ্ধ ভিক্ষুকে খুন করেছে। নাকি ভাড়াটে সন্ত্রাসী দিয়ে তাকে খুন করা হয়েছে। আশ্রমের মানুষগুলো বলেছে, সেদিন রাতে ডজনখানেক বাইরের লোক এসেছিল। তারাই খুন করে চলে গেছে। আমার প্রশ্ন, সকলের দেখা এই ঘটনা বড় করে না দেখিয়ে পারিবারিক বিরোধ বা এক মহিলার চরিত্র নিয়ে টানাটানি কেন করা হলো? কোন কোন পত্রিকায় সন্ত্রাসীদের প্রশ্নটি একেবারেই আড়াল করা হলো কেন?

সাংবাদিক সম্মেলনে আমাকে চট্টগ্রামের সন্ত্রাসীদের নাম বলতে বলা হয়েছে। আমি অপারগতা প্রকাশ করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, আপনারাই সন্ত্রাসীদের চিনেন। আপনারা বার বার কাগজে লিখেছেন আপনাদের শহরের টপটেররদের কথা। বিভিন্ন দলের নেতা এবং সন্ত্রাসীদের ক্ষমতার পরিবর্তনের সাথে কেউ সাধু এবং কেউ সন্ত্রাসী হয়ে যাবার কথা। এ ব্যাপারে আপনারাই ভাল করে বলতে পারবেন। রাউজানের এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে কোন্ সন্ত্রাসীরাই ছিল এবং তাদের গডফাদাররা কে। এ কথা আপনারা জানেন না এই বিশ্বাস করি কি করে?

৮ মে খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি গিয়েছিলাম। সঙ্গে ১১ দলের নেতৃবৃন্দ। মানিকছড়ির আশ্রমে মদন গোপাল গোস্বামীকে হত্যার পটভূমি বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। শুনেছি সেখানে নাকি সন্ত্রাসীরাই কাজ করেছে। একদল সন্ত্রাসী নাকি চাঁদা দাবি করেছিল। চাঁদার অঙ্ক নিয়ে নাকি দরকষাকষি হয়েছিল। বনিবনা হয়নি। তারপর খুন হয়েছে মদন গোপাল গোস্বামী। ৮ এপ্রিল চট্টগ্রামের একজন মন্ত্রী ঐখানে গিয়েছিলেন। পুলিশ নাকি তাঁকে জানিয়েছে, একজন চাঁদাবাজকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ঐ চাঁদাবাজ নাকি কিছু তথ্য জানিয়েছে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে। আমাদের সেখানে বলার তেমন কিছুই ছিল না, ছিল শুধুমাত্র দেখার ও অনুভব করার। কত মানুষ ভয়ে কাঁপছে। তারা জানে না আগামীকাল সেখানে কি ঘটবে। আমরা ফিরে এসেছিলাম চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবি জানাতে চট্টগ্রাম শহরে। আমি একটা অদ্ভুত ভয়ের পরিবেশ দেখেছি মানিকছড়ি ও রাউজানে। পুলিশ কর্তৃপক্ষকে বলছি মনে কিছু করবেন না। আপনাদের উপস্থিতি কাউকে সাহস দেয় না। নতুন করে শঙ্কার জন্ম দেয়। বিনা কড়িতে আপনারা কোথাও অবস্থান

করতে চান না। আপনারা সন্ত্রাসীদের চেয়ে তাদের গডফাদারদের বেশি ভয় করেন। চট্টগ্রামের গডফাদারদের রাজত্ব অবাধ ও প্রশ্নাতীত।

তবে চট্টগ্রামের ব্যাপারে মনে হচ্ছে এবার কিছুটা ভয় পেয়েছে ক্ষমতাসীন সরকার। রাউজান থানায় জ্ঞান জ্যোতি ভিক্ষু খুন হওয়ায় শঙ্কিত বাংলাদেশ সরকার। জাপানীরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এ ব্যাপারে তাঁরা স্পর্শকাতর। বৌদ্ধ ভিক্ষু হত্যায় তাঁরা উদ্বিগ্ন। ইতোমধ্যেই তাঁদের প্রতিনিধি রাউজান আশ্রম সফর করেছেন। আমাদের বিদেশী সাহায্য আসে জাপান থেকে। তাই রাউজানের ঐ অনাথ আশ্রমে গিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এ ব্যাপারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভিন্ন উক্তি করেছেন। আমরা যাঁরা রাজনীতি করি তাঁদের ধারণা, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভয় পেয়ে আবোল-তাবোল বলছেন। এই নিবন্ধ লেখার দিনে কাগজে পড়লাম, পুলিশ প্রধান চট্টগ্রামে গিয়েছেন। এবার তাঁরা নাকি নিদারুণ অভিযান করবেন চট্টগ্রামের সকল এলাকায়। আর আমার মনে হয় বিদেশী ঋণ না পাওয়ার ভয়ে সরকার এখন নিদারুণ অভিযানের কথা ভাবছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন, এতদিন কোথায় ছিলেন। আমি যতদূর জানি কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রাম প্রত্যন্ত অঞ্চল এখন আর শান্তিতে বসবাসযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে আপনারা উদ্বিগ্ন হলেন। অনেক আগেই উদ্যোগ গ্রহণ করতেন। সে কাজ না করে দুধকলা দিয়ে সাপ পুষেছেন। সাপ এখন আপনাদের ছোবল মারতে চাচ্ছে। এ মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়, আপনাদের লালিত-পালিত সন্ত্রাস দেশকে কোথায় নিয়ে যাবে। শুধু অপেক্ষায় থাকব। দেখতে চাইব। সম্প্রতি তিন হত্যাকাণ্ড নিয়ে আপনারা কতদূর যাবেন।

সর্বশেষ

চট্টগ্রাম জেলা কর্তৃপক্ষ বলবেন কি আপনারা বৌদ্ধ ভিক্ষুর লাশ তড়িঘড়ি পুড়িয়ে ফেলার জন্য কেন চাপ দিয়েছিলেন? বৌদ্ধরা অনেক বিধি পালন করে লাশ দাহ করে। এ সময়টুকু আপনারা দেননি। আপনাদের এ আচরণ সন্দেহের সৃষ্টি করারই কথা, কারণ লাশ পুড়িয়ে ফেললে সবশেষ। আমাদের দেশে দ্বিতীয় পোস্টমর্টেম করার ঘটনা কম নয়। আপনারা সে পথ বন্ধ করেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ মে ২০০২

'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল'-এর সর্বশেষ রিপোর্টে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন
মহিউদ্দিন আহমদ

আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোরশেদ খানকে নিয়ে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন ইস্যুতে গত সপ্তাহে সুসংবাদ-দুঃসংবাদ দুটোই ছিল। ২৮ মে ইনকিলাব নামে বাংলাদেশের মৌলবাদী পত্রিকাটির প্রথম পৃষ্ঠায় ওয়াশিংটন থেকে গোলাম আরশাদের বাইলাইনে প্রকাশিত এক খবরে দেখা যায়, পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৃহস্পতিবার ২৩ মে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন প্রসঙ্গে বলেন, 'বাংলাদেশে কোন সংখ্যালঘু নির্যাতন নেই।'

আপেক্ষিক অর্থে এটি একটি সুসংবাদ, কারণ এতদিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশে কোন সংখ্যালঘু নেই। বাংলাদেশে কোন সংখ্যালঘু নেই অবস্থান থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর কোন নির্যাতন নেই। আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর জন্য এটি অবশ্যই একটি ইতিবাচক উত্তরণ। পররাষ্ট্রমন্ত্রী তো বলতে পারতেন, বাংলাদেশে কোন সংখ্যালঘুই নেই, সুতরাং সংখ্যালঘু সমস্যা কি আবার; যেমন তিনি বলে আসছেন দেশে কিছুদিন ধরে।

আমাদের নেতা-মন্ত্রীদের আচরণ দেশে-বিদেশে যেমন উলটাপালটা হয়, এখানে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ক্ষেত্রে তার সর্বশেষ উদাহরণ দেখলাম। দেশে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সংখ্যালঘুদের অবস্থান এবং উপস্থিতি কেমন জোরের সঙ্গে অস্বীকার করলেন কয়েকবার, আর বিদেশে গিয়ে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন প্রশ্নে বলার সাহস পেলেন না যে, বাংলাদেশে কোন সংখ্যালঘু নেই। বিদেশে এমন বলতে বাধ্য হয়েছেন, কারণ অন্যরকম কিছু বললে শ্রোতারা হয়ত বক্তার শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতা নিয়েই প্রশ্ন তুলত।

এবার মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সংখ্যালঘু সম্পর্কিত দুঃসংবাদটি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোরশেদ খান বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের কথা অস্বীকার করেছেন ২৩ তারিখে ওয়াশিংটনে, আর তা ছাপা হয়েছে মৌলবাদী পত্রিকাটিতে ২৮ মে, পুরো পাঁচদিন পর।

মৌলবাদী পত্রিকাটির মালিক, এরশাদের বর্ণনায় সেই 'দাড়িওয়ালা খচ্চর', মান্নান নামের লোকটির জামাতা গোলাম আরশাদকে ওয়াশিংটনে মৌলবাদী পত্রিকাটির ব্যুরো চিফ হিসেবে পরিচয় দেয়া হয় মৌলবাদী পত্রিকাটিতেই। তা এই বাবাজি খবরটি পাঠাতে এত দেরি করল কেন বা আব্বা হুজুরের পত্রিকায় এই খবরটি এতদিন পর কেন ছাপা হলো বা জামাতা বাবাজি গত এক বছরে ব্যুরো চিফ হয়েও গত ১১ সেপ্টেম্বরে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস এবং আমাদের নেতা-মন্ত্রীদের ওই দেশে এতসব সফরের ওপর কোন খবরের কিছুই পাঠালো না কেন, জামাতা বাবাজি ইনকিলাবের ওয়াশিংটন ব্যুরো চিফ পরিচয়ে গোলাম আরশাদ ওখানে আসলে কি করে, এসব বিষয় নিয়ে আলাদা একটি বিস্তারিত কলাম লেখার ইচ্ছা রইল। ঢাকার সাংবাদিক মহলে শোনা যাচ্ছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোরশেদ খানকে ইনকিলাবে কাভারেজ দিয়ে জামাতা বাবাজি ওয়াশিংটনে আমাদের বাংলাদেশ দূতাবাসে কয়েক মাস ধরে খালি প্রেস মিনিস্টারের পদটি দখল করতে চাইছে।

দুর্ভাগ্য আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ২৮ মে'তে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ওপর মৌলবাদী তালেবানদের পত্রিকাটিতে এই খবরটি ছাপা হওয়ার দিনই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ২০০১ ক্যালেন্ডার বছরের বার্ষিক রিপোর্টটি প্রকাশ করে 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল'-এর ঢাকা শাখার পরিচালক গোলাম মোস্তফা ঢাকায় আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে। অবশ্য এই রিপোর্টটি একই দিন দুনিয়ার আর সব দেশেও প্রকাশ করা হয়েছে। পরদিন বুধবার ২৯ মে ঢাকার কয়েকটি পত্রিকায় এই প্রকাশনা অনুষ্ঠানের ওপর যেসব শিরোনামে খবর প্রকাশিত হয়েছে তার কয়েকটি এমন ছিল ঃ

১। দৈনিক প্রথম আলো- 'অ্যামনেস্টির বার্ষিক প্রতিবেদন, বাংলাদেশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ব্যাপক নির্যাতনের শিকার'; প্রথম পৃষ্ঠায়।

২। দৈনিক যুগান্তর ঃ বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা সহিংসতার শিকার হচ্ছে ঃ অ্যামনেস্টির রিপোর্ট; প্রথম পৃষ্ঠায়।

৩। দৈনিক জনকণ্ঠ ঃ 'নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে ব্যাপক সংখ্যালঘু নির্যাতন চলছে' অ্যামনেস্টির রিপোর্ট; প্রথম পৃষ্ঠায়।

৪। দৈনিক ভোরের কাগজ ঃ 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বার্ষিক রিপোর্ট, সংখ্যালঘু, নির্যাতনকারীরা রেহাই পেয়ে গেছে'; প্রথম পৃষ্ঠায়।

৫। দৈনিক সংবাদ ঃ 'অ্যামনেস্টির বার্ষিক রিপোর্ট, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সহিংসতার শিকার'; শেষ পৃষ্ঠায়।

৬। ইংরাজি দৈনিক ডেইলি স্টার 'Al (Amnesty International) alleges attacks on minorities, custodial torture, violence.' শেষ পৃষ্ঠায়।

প্রত্যাশিতভাবেই মৌলবাদী দৈনিক ইনকিলাব অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের ওপর যেসব কথা বলেছে, তার ওপর বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা পরিবেশিত একটি ছোট খবর ছিল। অন্য পত্রিকাগুলো নিজস্ব সাংবাদিক পাঠিয়ে গোলাম মোস্তফার অনুষ্ঠান 'কাভার' করেছে; কিন্তু মওলানা মান্নানের ইনকিলাব এই প্রকাশনা অনুষ্ঠানে নিজস্ব সাংবাদিক পাঠানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ মনে করেনি। উলে-খ করা প্রয়োজন যে, মওলানার ইনকিলাব ভবন আর কমলাপুরের কবি জসীমউদ্দীন রোডে অ্যামনেস্টির ঢাকা অফিসের দূরত্ব মাত্র এক বা দেড় কিলোমিটার।

দুই

২০০১ ক্যালেন্ডার বছরের জন্য সদ্য প্রকাশিত এই রিপোর্টের পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে ৩০৭। (২০০০ সালের মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর ২০০১ সালে যে বার্ষিক রিপোর্টকে অ্যামনেস্টি প্রকাশ করেছিল, তার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩০২।) ২০০১ সালের এই অ্যামনেস্টির রিপোর্টে দুনিয়ার ১৫৩টি দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর প্রতিবেদন আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপরও আছে।

অ্যামনেস্টি মৃত্যুদণ্ডের ঘোরতর বিরুদ্ধে। বস্তুত দুনিয়াব্যাপী অ্যামনেস্টির অভিযান, 'ক্যাম্পেন চলছে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে। যেকোন দেশে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতে যাচ্ছে এমন খবর পেলে অ্যামনেস্টি রুটিন হিসেবে দণ্ডিত ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড মাফ করে দিতে ওই দেশের রাষ্ট্রপতির কাছে একটি আবেদন পাঠাবেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে মৃত্যুদণ্ডের ঘোরতর পক্ষে, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রতিবছরের রিপোর্টে তার কঠোর নিন্দা করে থাকে। দুনিয়ার কোন্ দেশে কতজনকে ২০০১ সালে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো, এই বছরটিতে কতজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো তার বর্ণনাও থাকে অ্যামনেস্টির বার্ষিক রিপোর্টে। ২০০১ সালে বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ২ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়, আরেকজনের হয় নবেম্বর মাসে। ২০০১ সালে অন্তত ২০ জনকে আদালত মৃত্যুদণ্ড দেয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২০০১ সালে মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে এ বছরের রিপোর্টে বলা হয়, ২০০১ সালে ৬৩ জন পুরুষ এবং ৩ জন মহিলার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম

কোর্ট ১৯৭৬-এ মৃত্যুদণ্ডের ওপর এত বছরের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে নেয়ার পর এ পর্যন্ত এই ৬৬ জনকে নিয়ে ৭৪৯ জনের ওপর মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করল। যেমন একটু আগেই উলে-খ করেছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই মৃত্যুদণ্ড প্রথা এবং ব্যবস্থার ওপর সদ্য প্রকাশিত রিপোর্টে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে অনেক কঠোর কথাবার্তা আছে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এসব মন্তব্যকে তেমন 'কেয়ার' করে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য নিজ দেশের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুকেই কেয়ার করে না। তারা অবশ্য এমন অবজ্ঞা উপেক্ষা দেখিয়ে পার পেয়ে যায়। কারণ তাদের সেই সামরিক অর্থনৈতিক শক্তি আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো আর কেউ এমন অবজ্ঞা উপেক্ষা দেখাতে পরে না। আমরা তো পারিই না।

তিন

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ২০০১ সালের জন্য এই বার্ষিক রিপোর্টে বাংলাদেশ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে এখন তার একটু আলোচনা।

এই ১৫৩টি দেশের ওপর আলাদা আলাদা রিপোর্টের শুরুতে সেই দেশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিও এমনভাবেই দেয়া হয়েছে ঃ

Peoples Republic of Bangladesh

Head of State: Badruddoza Chowdhury (replaced Shahabuddin Ahmed in November)

Head of Government : Begum Khaleda Zia (replaced Sheikh Hasina in October)

Capital : Dhaka

Population : 140-4 million

Official language : Bangla,

Death Penalty-retentionist.

এমন একটি পরিচিতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই পরিচিতিটা দিয়ে শুরু না করলে সেই দেশের ওপর মূল রিপোর্টটি বুঝতে অবশ্যই অসুবিধা হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও প্রতিবছর বিভিন্ন দেশের ওপর যে মানবাধিকার রিপোর্ট প্রকাশ করে থাকে, সেখানেও রিপোর্টের শুরুতে সেই দেশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকে একই বিবেচনায়; দেশের শাসন ব্যবস্থা, সরকার পদ্ধতি, জনসংখ্যা ইত্যাদি মৌলিক তথ্যগুলো না থাকলে রিপোর্ট বুঝতে অসুবিধা হবে।

বাংলাদেশের ওপর অ্যামনেস্টির সদ্য প্রকাশিত গত বছরের রিপোর্টে মোট ৬টি অংশ আছে, 1. Political developments (রাজনৈতিক অবস্থা); ২. Violence against minorites (সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা), ৩. Womens rights (মহিলাদের অধিকার), ৪. Torture and prison conditions (নির্যাতন এবং জেলখানাগুলোর অবস্থা), ৫. Death penalty (মৃত্যুদণ্ডাদেশ), ৬. A. I. (Amensty International) reports/visits; বাংলাদেশের ওপর আলোচ্য বছরে অ্যামনেস্টির আর কোন বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে কিনা এবং আলোচ্য বছরে অ্যামনেস্টির কোন প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করেছে কিনা তা এই অংশে বর্ণিত হয়েছে। প্রায় ৭৮০ শব্দের এই রিপোর্টের শুরুতেই মোটা গাঢ় কালো হরফের রিপোর্টের 'সামারি' দেয়া হয়েছে। সামারিটি এমন ঃ

Political violence in advance of elections resulted in about 150 deaths. There were high levels of violence against minorities, particularly Hindus.

Impunity for perpetrators of human rights violations was widespread. Religious groups sought to overturn a landmark High Court judgement which banned *fatwas,* religious edicts most often issued against women. Women continued to be subjected to violent attacks in their homes and communites. Three executions were carried out, the first for over three years.

[বাংলা তর্জমা ঃ সাধারণ নির্বাচনের আগে বিভিন্ন সহিংসতায় প্রায় ১৫০ জনের মৃত্যু ঘটে। সংখ্যালঘু, বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর বড় মাত্রায় সহিংসতা ঘটেছে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের প্রায় সকলেই পার পেয়ে যায়। ধর্মীয় গ্রুপগুলো ফতোয়ার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্তকে পালটিয়ে দিতে চেয়েছিল। এই ফতোয়াগুলো প্রায়ই মহিলাদের বিরুদ্ধেই জারি করা হয়ে থাকে। ঘরে-বাইরে মহিলারা বিভিন্নভাবে সহিংসতার শিকার হয়েছে। আলোচ্য বছরে তিনটি মৃত্যুদণ্ড করা হয়, প্রথমটি ৩ বছরেরও বেশি সময়ের পর।]

লক্ষ্য করুন, বাংলাদেশের ওপর রিপোর্টের শুরুতেই, সামারিতে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের কথা উলে-খ করা হয়েছে।

তারপর বাংলাদেশের ওপর রিপোর্টের দ্বিতীয় অংশে 'Violence against minorities', শিরোনামে অ্যামনেস্টির এই রিপোর্টে যা বলা হয়েছে তার পুরোটাও এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করি- 'Following the elections, hundreds of Hindu families were reportedly subjected to violent attacks, including rape, beatings and the burning of their property. They were allegedly attacked by BNP supporters because of their perceived support for the Awami League. In November, a prominent member of the Hindu community was killed while hundreds of families reportedly fled to India. The police failed to take effective measures to protect the community, some arrests were made but most assailants were not brought to justice. No information was provided about an official investigation into the atrocities, promised in November and December. In response to a petition in November by the legal aid organization, Ain-o-Salish Kendra, the High Court gave the government one month to explain why it did not protect Hindus. No explanation was provided by the end of the year.

বাংলা তর্জমা ঃ সাধারণ নির্বাচনের পর শত শত হিন্দু পরিবারকে আ্রমণ করা হয় বলে খবর পাওয়া যায়। এসব আ্রমণের মধ্যে ধর্ষণ, শারীরিক আঘাত এবং বাড়িঘর, ধনসম্পদে অগ্নিসংযোগও ছিল। আওয়ামী লীগকে এরা সমর্থন করে এমন একটি ধারণার বশবর্তী হয়েই বিএনপি সমর্থকরা যেমন সব আ্রমণ চালায় বলে অভিযোগ রয়েছে। নবেম্বর মাসে হিন্দু সম্প্রদায়ের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়; শত শত হিন্দু পরিবার ভারতে পালিয়ে যায় বলে খবর পাওয়া যায়। হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের রক্ষা করতে পুলিশ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয় বটে, তবে খুনিদের প্রায় কাউকেই বিচারে দাঁড় করা হয়নি। নবেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে সরকার অঙ্গীকার করেছিল, এসব নৃশংস ঘটনার তদন্ত করা হবে; কিন্তু এই তদন্তের কি হলো, এই সম্পর্কে আর কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। কেন্দ্র কর্তৃক হাইকোর্টে দায়ের করা এক মামলায় সরকার হিন্দু সম্প্রদায়কে রক্ষা করল না কেন কারণ দেখাতে হাইকোর্ট সরকারকে এক মাস সময় দিয়েছিল। আলোচ্য বছরের শেষপর্যন্তও হাইকোর্টকে কোন কারণ দেখানো হয়নি।'

এখানে উলে-খ করা প্রয়োজন যে, ২০০০ সালের জন্য প্রকাশিত অ্যামনেস্টির রিপোর্টে Minority, সংখ্যালঘুদের নিয়ে কোন সেকশন বা উলে-খ ছিল না।

অ্যামনেস্টির আলোচ্য রিপোর্টে শাহরিয়ার কবিরের ওপরও একটি প্যারাগ্রাফ আছে। বাংলাদেশী হিন্দুরা কি পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল, তা শাহরিয়ার কবির ভারতে গিয়ে তদন্ত করে দেখছিল, এ অভিযোগেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। বিশেষ ক্ষমতা আইনে তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বছরের শেষ দিনেও আটক আছেন এসব কথা আছে রিপোর্টে।

এখানে উলে-খ করা প্রয়োজন যে, শাহরিয়ার কবিরকে অ্যামনেস্টি গত বছর কারাবন্দি বিবেক Prisoner of conscience আখ্যা দিয়ে তার মুক্তির দাবিতে সারা দুনিয়ায় আন্দোলন গড়ে তুলেছিল।

বাংলাদেশের ওপর অ্যামনেস্টির এই রিপোর্টের সবশেষে 'Al country reports/visits' শিরোনামের অংশে Bangladeshi Attacks on members of the Hindu minority (Al index: ASA 13/006/2001-এর উলে-খ আছে।

গত সাধারণ নির্বাচনের পর বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর যে ব্যাপক নির্যাতন চলে তার ওপর অ্যামনেস্টি গত বছর ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখে যে শেষ রিপোর্টটি প্রকাশ করে, উপরে তার সূত্র নম্বরটিই উলে-খ করা হয়েছে। কেউ এই রিপোর্ট পেতে চাইলে, এই নম্বরটি উলে-খ করে অ্যামনেস্টির লন্ডন সদর দপ্তরে লিখলে রিপোর্টটি পেতে পারেন।

বিশেষ অবস্থার উদ্ভব হলে অ্যামনেস্টি বিশেষ রিপোর্ট প্রকাশ করে। গত অক্টোবর, নবেম্বর মাসে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর যে ব্যাপক নির্যাতন, হত্যা, খুন, ধর্ষণ চলে তার প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তখন অ্যামনেস্টি এই রিপোর্টটি প্রকাশ করেছিল। এই রিপোর্টটির শব্দসংখ্যা ছিল প্রায় ২৬০০, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭। এই রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল Bangladesh : Attacks on member of Hindu minority. এই বিশেষ রিপোর্ট প্রকাশকালে অ্যামনেস্টি যে প্রেস রিলিজ ইস্যু করেছিল তার শিরোনাম ছিল, Bangladesh : Hindu minority must be protected. এই প্রেস রিলিজটিও পুরো এক পৃষ্ঠার ছিল, শব্দসংখ্যা প্রায় ৪০০।

এখানে একটা কথা বলা খুব জরুরি। বাংলাদেশের ওপর রিপোর্টটি কিন্তু অ্যামনেস্টির বাংলা শাখা কর্তৃক রচিত নয়। অ্যামনেস্টি তার অনেক সূত্র, সোর্স থেকে খবর নিয়ে সেই দেশের ওপর রিপোর্ট তৈরি করে। সংশি-ষ্ট দেশের তৈরি রিপোর্ট নিরপেক্ষ হয়তো হবে না, এ ধারণাতেই এ ব্যবস্থা।

উপরে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ২০০১ সালের রিপোর্ট থেকে হুবহু যা উদ্ধৃত করা হলো, তারপরও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোরশেদ খান বলবেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর কোন নির্যাতনের ঘটনা ঘটেনি? আর এমন কথা তো শুধু অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলছে না। বিবিসি কি বলেছে, আমাদের নিজেদের দেশের পত্রপত্রিকা বিশেষ করে ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টার কি বলেছে, সংখ্যালঘু নির্যাতনের ওপর? এমন কথাবার্তা বলে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কি নিজেকে হাসির খোরাকে পরিণত করছেন না? এমন ডাহা বিকৃত অসত্য কথাবার্তা বলে তিনি তারপরও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে বহির্বিশ্বের নেতা-মন্ত্রীদের আস্থা-বিশ্বাস অর্জন করতে পারবেন?

এতে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তির অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? ভাবমূর্তিটা এখন কোথায় আছে?

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবতে অনুরোধ করি।

চার

এই লেখাটি প্রথম কিস্তি যখন ৩০ মে বৃহস্পতিবার দৈনিক 'সংবাদ' অফিসে পাঠাই, তারপর দিন শুক্রবার ৩১ মে'র পত্রপত্রিকায়, অ্যামনেস্টির গত বছরের রিপোর্টে বাংলাদেশ সংক্রান্ত যেসব মন্তব্য করা হয়, তার সরকারি প্রতিক্রিয়া ছাপা হয়। সরকারি তথ্য বিবরণীর বরাতে এদিন দৈনিক প্রথম আলোতে প্রথম পৃষ্টার প্রথম কলামে দ্বিতীয় শীর্ষ শিরোনাম ছিল, 'অ্যামনেস্টির রিপোর্ট সম্পর্কে সরকারের প্রতিক্রিয়া'। প্রায় ২২০ শব্দের এই ছোট খবরে দেখা যায়, অ্যামনেস্টির বিভিন্ন মন্তব্য তথ্যের মধ্যে ভুলত্রুটি ধরার চেষ্টা করেছে আমাদের সরকার। খবরের শুরুটাই এমন, 'বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে- অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের এরকম একটি প্রতিবেদনে সরকার একটি ভাষ্য দিয়েছে। এতে বলা হয়, বাংলাদেশে গত অক্টোবরের নির্বাচন ও সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সংখ্যালঘু প্রসঙ্গ, সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, নারীর অধিকার- এসব বিষয়ে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ২০০২ সালের প্রতিবেদনের সঙ্গে বাস্তবতার মিল নেই।

অ্যামনেস্টির এতসব ইস্যুর ওপর সরকারি প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বাংলাদের শুধুমাত্র সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রশ্নে সরকারি প্রতিক্রিয়ার অংশটুকু নিয়েই আমি আজকের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রশ্নে সরকারি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, 'নির্বাচনের পর সংখ্যালঘু বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর সহিংস হামলা হয়েছে এবং এসবের জন্য বিএনপি সমর্থকরাও দায়ী- অ্যামনেস্টির এই বক্তব্যকে ভিত্তিহীন অভিহত করা হয়েছে। সরকারি ভাষ্যে বলা হয়, কয়েকটি জেলায় বিচ্ছিন্ন সহিংসতা হলেও তা ব্যাপক ছিল না, কিংবা হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেতেই ওইসব ঘটনায় একটি সমাজবিরোধী মহল, যাতে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই জড়িত ছিল। এছাড়া পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার কঠোর ব্যবস্থাও নেয়'। সরকারি প্রতিক্রিয়ার এই অংশে ৬২টির মতো শব্দ আছে।

আমার আলোচনার শুরুতেই সরকারি প্রতিক্রিয়া একটি 'ও' শব্দের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সরকারি প্রতিক্রিয়ায় বলা হচ্ছে, 'এসবের জন্য বিএনপি সমর্থকরাও দায়ী', এখানে 'ও' শব্দটি অতিরিক্ত যোগ করে সরকার বাহাদুর ইচ্ছাকৃতভাবেই একটি বড় বিকৃতি ঘটিয়েছে মনে হচ্ছে। অ্যামনেস্টির রিপোর্টে ইংরেজিতে বাক্যটি হচ্ছে, 'They (The Hindus) were allegedly attacked by BNP supporters, because of their perceived support for the Awami League.' এই ইংরেজি বাক্যটিতে BNP supporters শব্দ দু'টির আগে বা পরে 'also' ইংরেজি শব্দটি নেই। তাহলে বাংলায় 'বিএনপি সমর্থকরাও'-এর 'ও' শব্দটি আসে কি করে? সরকারি ভাষ্যের বদমতলবটা হচ্ছে, 'বিএনপি সমর্থকরাও' বলে এমন একটি ধারণা দেয়া যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজনের ওপর যারা আক্রমণ চালিয়েছে, তাদের মধ্যে বিএনপি সমর্থকদের বাইরের মানুষজনও ছিল কিন্তু বাস্তব সত্য কথাটি হলো, অ্যামনেস্টি এই আক্রমণের জন্য বিএনপি সমর্থক ছাড়া আর কাউকেই দায়ী করেনি। ইংরেজি বাক্যটিতে পরিষ্কারভাবে এবং এককভাবে বিএনপি সমর্থকদেরই দায়ী করা হয়েছে।

তারপর সরকারি ভাষ্যে বলা হচ্ছে, কয়েকটি জেলায় বিচ্ছিন্নভাবে সহিংসতা হলেও তা ব্যাপক ছিল না বা হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ছিল না। তাহলে সরকার বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করতে হয়, ব্যাপক কাহাকে বলে? কত শ', হাজার, লাখ বা কোটি মানুষ সহিংসতার শিকার হলে 'ব্যাপক' বলা যাবে? গয়েশ্বর রায়, গৌতম চক্রবর্তী জাতীয় বাংলাদেশী হিন্দুদের কয়েকশ'কে বাদ দিলে বাকি দেড় কোটির মতো হিন্দু সংখ্যালঘু যে দিনেও নিরাপদে ঘুমাতে পারল না, রাতে তো দূরের কথা, দিনেও স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে ঘর থেকে বের হতে পারল না, প্রতিটি হিন্দু বালিকা, যুবতী মেয়ে এবং কোথাও কোথাও বৃদ্ধরাও যে ধর্ষণের

আতঙ্কে দিনের পর দিন বিনিদ্র থাকল 'তা কি ব্যাপক নয়? জাতিসংঘের প্রায় ১৯০/৯২টি দেশের মধ্যে কয়টি দেশের জনসংখ্যা দেড় কোটি, মানে ১৫ মিলিয়নের ওপর? ইউরোপ, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া এইসব মহাদেশের কয়টি দেশের লোকসংখ্যা ১৫ মিলিয়নের বেশি? অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের লোকসংখ্যা কত?' তাহলে কি বুরুন্ডি, রুয়ান্ডার মতো লাখ লাখ সংখ্যালঘুকে নিহত করা গেলে তা ব্যাপক হতো? অথবা যুগোস্-াভিয়ার নতুন স্বাধীন দেশগুলোর কয়েকটিতে, যেমন বসনিয়া, কসভোতে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, তেমন করলে ব্যাপক হতো? বা সম্প্রতি গুজরাটের মতো অন্তত এক হাজারকে হত্যা করলে ব্যাপক বলা যেত?

এই প্রসঙ্গে গত বছরের ১১ নবেম্বর দৈনিক 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত এই খবরটি উদ্ধৃত করতে চাই ঃ খবরটির শিরোনাম ছিল, "বিএসএফ-এর গুলি-সীমান্ত পার হওয়ার সময় হিন্দু পরিবারের কিশোরী নিহত।"

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর দিনাজপুরের বাহার অঞ্চলে শু□বার রাতে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্যদের গুলিতে বাংলাদেশীর মৃত্যু হয়েছে। কিশোরীর ভাই গুলিতে আহত হয়।

বিবিসি বলেছে, বাংলাদেশ থেকে একটি হিন্দু পরিবার সীমান্ত অতি□ম করে ভারতে প্রবেশ করার সময় এ ঘটনা ঘটে। খবরে বলা হয়, বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার খনগাঁও গ্রামের সুভাষ ক্ষেত্রী তার স্ত্রী বাসন্তি, দুই ছেলে শান্ত ও সত্য এবং মেয়ে দয়ারানীকে নিয়ে ভারতীয় সীমান্ত পেরিয়ে যাওয়ার সময় বিএসএফ তাদের গুলি করলে দয়ারানী মারা যায়। বাংলাদেশে অত্যাচারিত হয়ে এবং আরও অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে তারা ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করে বলে জানিয়েছে। শান্ত হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। বিএসএফ বলেছে, পরিবারটির কাছে চকচকে অস্ত্র দেখে তারা গুলি করছে।"

দেশে কেমন নিরাপত্তাহীনতায় পড়লে একটি পরিবার এমন একটি ঝুঁকি নিতে পারে? পরে আর কোথায় যেন পড়েছিলাম বা ভারতীয় বাংলা টিভির কোন চ্যানেলে শুনেছিলাম, এই পরিবারটির প্রধান সুভাষ ক্ষেত্রী বিএসএফ-এর ভয়ে তখন পালিয়ে রয়েছে। অবস্থাটি বিবেচনা করুন, কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে, আর কিশোরীর ভাই, সেও এক কিশোর, হাসপাতালে। তাদের মা কোথায়, বাবা কোথায়, তারা জানে না। একটি পরিবার এমনিভাবেই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তাদের এমন বিপর্যয়ে তারা যে একত্রে কাঁদবে সে সুযোগও ছিল না। পালাতে গিয়েও বাঁচতে পারল না পরিবারটি। এরা এবং আরও লাখ লাখ মানুষ গত ১ অক্টোবর আমাদের দেশে 'গণতন্ত্র' এসেছিল বলে বিপন্ন হয়ে পড়ে। আবারও মনে পড়ে কবি শামসুর রাহমানের কথা। তার কাছে মাফ চেয়ে তার সেই অসাধারণ পঙক্তিগুলোর কিছুটা পরিবর্তন করে বলতে চাই 'তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে গণতন্ত্র, কত বাসন্তি বিবির কপাল ভাঙলো।' তোমাকে পাওয়ার জন্য আর কতবার ভাসতে হবে রক্ত গঙ্গায়? আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?

পাঁচ

সরকারি ভাষ্য মোতাবেক 'এই সহিংসতা' হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ছিল না। কথাটি আংশিক সত্য, সহিংসতা শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ছিল না, আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধেও ছিল এই সহিংসতা। যেমন একাত্তরে পাকিস্তানি বাহিনীর প্রথম টার্গেট ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন, তারপর আওয়ামী লীগের সমর্থক। আওয়ামী লীগ আর হিন্দু যদি একই ব্যক্তি হয়ে যায়, তার চেয়ে উত্তম কিছু ছিল না একাত্তরে, ছিল না ১ অক্টোবরে দেশে আবার 'গণতন্ত্র' আসার পর।

তারপর সরকারি ভাষ্যে বলা হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওইসব ঘটায় একটি সমাজবিরোধী মহল, যাতে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায় জড়িত ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'সমাজবিরোধী মহল'? তাহলে বাকি অল্প ক্ষেত্রে কারা ঘটায়? তারা কোন্ ধরনের 'সমাজহিতৈষী মহল'? তারপর 'হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষ জড়িত ছিল?' বিএনপির অঙ্গসংগঠন যুবদল নেতা গয়েশ্বর রায় জগন্নাথ হলের কিছু ছাত্রকে নিয়ে মাত্র সেদিন রমনা কালী মন্দিরের জায়গাটি দখল করেছে। বলতেই হবে 'সাহসী' মানুষ। তবে ১ অক্টোবরের পর গয়েশ্বর রায়ও তো মনে হয় পালিয়েই ছিল। হিন্দু সম্প্রদায় বা মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর হামলা করলে সে-ই তার নেতৃত্ব দিতে পারত; কিন্তু তার খবর কোথাও তো ওই কয়েক সপ্তাহে কোন পত্রপত্রিকায় দেখলাম না। বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় মাস্তান তো এই রায় বাহাদুর। এই রায় বাহাদুরই যখন সেই দিনগুলোতে মুখ বের করতে পারেননি, তখন হিন্দু সম্প্রদায়ের আওয়ামী লীগ সমর্থক অন্যদের ওপর আ□মণ চালানোর হিম্মত দেখাতে পারত? হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পরিচালিত নির্যাতন প্রশ্নে সরকারি ভাষ্যের আখেরি বক্তব্য হচ্ছে, পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার কঠোর ব্যবস্থাও নেয়। তা এই কঠোর ব্যবস্থাটা কি ছিল? কতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, কতজনকে বিচারে দাঁড় করানো হয়েছিল, শেষপর্যন্ত কতজন সমাজবিরোধীকে জেল-জরিমানা, দণ্ড দেয়া হলো? এতবড় সরকারের কাছে নিশ্চয়ই তার পরিসংখ্যান আছে। আমাদের সরকার বাহাদুর এই পরিসংখ্যান অ্যামনেস্টিকে দিল না কেন? তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে সেই যে একটি কমিটি করা হয়েছিল। তার কি হলো?

অ্যামনেস্টি অনেক চেষ্টা করেও যখন সরকারের কাছ থেকে এই তথ্যগুলো পেল না, তখন আগের কিস্তিতেও যেমন উলে-খ করেছি, তারা এই বার্ষিক রিপোর্টটিতে লিখতে বাধ্য হলো ঃ

"The police failed to take effective measures to protect the (Hindu) community, some arrests were made but most assailants were not brought to justice. No information was provided about an official investigation into the atrocities, promised in November and December. In response to a petition in November by the legal aid organisation, Ain-o-Salish kendra, The High court gave the government one month to explain why it did not protect Hindus. No explanation was provided by the end of the year."

[বাংলা তর্জমা ঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের রক্ষা করতে পুলিশ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয় বটে, তবে খুনিদের প্রায় কাউকেই বিচারে দাঁড় করানো হয়নি। নবেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে সরকার অঙ্গীকার করেছিল, এসব নৃশংস ঘটনার তদন্ত করা হবে; কিন্তু এই তদন্তের কি হলো? এই সম্পর্কে আর কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। আইনি সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠান আইন ও সালিশ কেন্দ্র কর্তৃক হাইকোর্টে দায়ের করা এক মামলায় সরকার হিন্দু সম্প্রদায়কে রক্ষা করল না কেন কারণ দর্শাতে হাইকোর্ট সরকারকে এক মাস সময় দিয়েছিল। আলোচ্য বছরের শেষ দিন পর্যন্তও হাইকোর্টকে কোন কারণ দেখানো হয়নি।

আসলে তদন্ত করার জন্য সরকারের কোন সদিচ্ছাই ছিল না তখন। এখনও নেই। সদিচ্ছা ছিল না বলেই তখন এসব সমাজবিরোধী পার পেয়ে গেল। এখানেই যে কোন সভ্য মানুষ আতঙ্কিত হবেন।

প্রত্যেক সমাজেই সমাজবিরোধী আছে, অপরাধী থাকবে। সব যুগে, সব সমাজে ও সব পেশাতেই ছিল এরা এবং এখনও আছে। তবে সব সমাজে সবকালেই শান্তিপ্রিয় আইন

মান্যকারী মানুষজনকে রক্ষার উদ্দেশ্যে সমাজবিরোধী এবং অপরাধীদের ঠেকানোর ব্যবস্থা ছিল, বাংলাদেশে এখনও কাগজে কলমে আছে। তবে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংঘটিত এই ব্যাপক আ্রমণের দুর্বৃত্তদের ধরার বা বিচার করার তেমন কোন সদিচ্ছা ছিল না আমাদের চারদলীয় সরকারটির। থাকলে অ্যামনেস্টিকে এই তথ্যগুলো সরকার দিতো। দেয়নি, কারণ বিচার করতে গেলে যে নিজেদের লোককেই দাঁড় করাতে হত। তথ্যগুলো দিতে পারল না বলেই তো অ্যামনেস্টি তার রিপোর্টে তা উলে-খ করতে বাধ্য হলো।

ছয়

২০০১ ক্যালেন্ডার বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয় গত ২৮ মে, যেমন বলেছি এই লেখাটির প্রথম কিস্তির শুরুতে। বাংলাদেশ সম্পর্কে এসব মন্তব্য ছাপার হরফে প্রকাশিত হওয়ার আগে গত বছর ডিসেম্বর মাসে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিব আইরিন খান বাংলাদেশ সফর করেন। এখানে উলে-খ করা প্রয়োজন যে, আইরিন খান একজন বাংলাদেশী নাগরিক; তার বাড়ি সিলেটের সদর থানার বিরাহীপুর গ্রামে। এই সংগঠনের প্রায় ১২ লাখ সদস্য ছড়িয়ে আছে দুনিয়ার ১১৫টি দেশে, ৬৪টি দেশে আছে শাখা। এমন একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের মহাসচিব আইরিন খান। বড় গৌরবের কথা আমাদের সকলের।

আমাদের একজন সাবেক নৌবাহিনী প্রধান, মরহুম অ্যাডমিরাল এম এ খান এবং আইরিন খানের বাবা সিকান্দার আলী খান সহোদর। এই সুবাদে তারেক জিয়ার স্ত্রী এবং আইরিন খান আপন চাচাতো জেঠাতো বোন। গত বছর ডিসেম্বর মাসের ২০ তারিখে দশ/বারো দিনের জন্য আইরিন খান যখন বাংলাদেশে আধা ব্যক্তিগত আধা সরকারি সফরে আসেন তখন তিনি সরকারি-বেসরকারি অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গেও আনুষ্ঠানিকভাবে দেখা করেন। পত্রপত্রিকায় সেই ক'দিন তার সম্পর্কে অনেক খবর উঠেছে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎকারের সচিত্র খবরও ছাপা হয়েছে বিভিন্ন পত্রিকায় গত ২৭ ডিসেম্বর। প্রধানমন্ত্রীর কাছে তখনও কারাবন্দি শাহরিয়ার কবিরের মুক্তি দাবি করেছেন আইরিন খান। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তাকে এখন মুক্তি দেয়া সম্ভব নয়। সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন মন্তব্য অ্যামনেস্টির শীর্ষ পর্যায় থেকে নিশ্চিত হয়েই বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছে। অ্যামনেস্টির প্রতিবেদন ক্ষমতালোভী রাজনীতিবিদের বক্তব্য নয় যে, যা মনে এল বলে দিলাম। আগে যেমন বলেছি, বিভিন্ন সূত্র থেকে চেক, স চেক করার পরই তা ছাপা হয়।

অ্যামনেস্টির শীর্ষ নির্বাহী আইরিন খান ছাড়াও এ বছর মার্চ মাসে অ্যামনেস্টির লন্ডন সদর দপ্তরের বাংলাদেশের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও গত বছর মানবাধিকার লজ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার সর্বশেষ অবস্থা জানতে বাংলাদেশ সফর করেন। তখনও তিনি সরকারের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে দেখা করে এসব তথ্য চেয়েছেন। এ কর্মকর্তা দেখা করেছেন যোগাযোগমন্ত্রী নাজমুল হুদার সঙ্গে। এই কর্মকর্তা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল আলতাফ হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে যখন তার বাড়িতে দেখা করতে যান তখন সেখানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোরশেদ খান এবং স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরও উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তিনজনের সঙ্গে দেখা করেন এই কর্মকর্তা। সরকারের আরেকজন অতি গুরুত্বপূর্ণ আইনের মানুষ, আমাদের অ্যাটর্নি জেনারেলের সঙ্গেও আনুষ্ঠানিকভাবে দেখা করেছেন এই ভদ্রলোক। এই ভদ্রলোক যেসব জায়গায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজনের ওপর হামলা হয়েছে বলে খবর পেয়েছিলেন, তার কয়েকটিতেও সরজমিনে তদন্ত করতে গেছেন।

তো এমন ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে বাংলাদেশে খবর এবং তথ্য যোগাড় করে এমন কয়জন মানুষ বা কয়টি সংগঠন আছে? কিন্তু অ্যামনেস্টি করে; কারণ তাই তাদের নিয়ম, তাই

তাদের পদ্ধতি। এটি কোন রাজনৈতিক সংগঠন নয়, নয় কোন ধর্মীয় বা জাতিগত সংগঠন। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করে যাওয়াই ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটির ব্রত। দুনিয়ায় বেসরকারি পর্যায়ে এত বড় আন্তর্জাতিক আর একটি সংগঠনও নেই। এই মহান কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ অ্যামনেস্টি নোবেল শান্তি পুরস্কারও পায় ১৯৭৭ সালে।

আইরিন খান বাংলাদেশ সফর করেছেন; তারপর সফর করেছেন মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে আফগানিস্তান এবং ইসরায়েলি সৈন্যবাহিনীর হাতে বিধ্বস্ত প্যালেস্টাইনের জেনিনের শরণার্থী ক্যাম্পও। এসব জায়গায় মানবাধিকার লজ্ঘনের ওপর যেসব ঘটনা ঘটছে, তার ওপরও রিপোর্ট প্রকাশ করেছে বা করবে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। অ্যামনেস্টি চলতি বছরের বাজেট ২১ মিলিয়ন ডলার (বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ১২০ কোটি টাকা)। এর প্রায় পুরোটা সদস্যদের চাঁদা এবং কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের অনুদান থেকে সংগৃহীত হয়। এসব প্রতিষ্ঠান আবার সকল রকমের বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকলে তবেই অনুদান গ্রহণ করা হয়। প্রভাবিত হতে হবে এই আশঙ্কায় অ্যামনেস্টি কোন সরকারের কাছ থেকে কোন রকমের অনুদান বা সাহায্য গ্রহণ করে না এবং চায়ও না। যতভাবে এবং যেমনভাবে সম্ভব, অ্যামনেস্টির প্রতিবেদনকে বস্তুনিষ্ঠ এবং নিরপেক্ষভাবে তৈরি করার চেষ্টা করা হয়।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ওপর অ্যামনেস্টির রিপোর্টে যুক্তি এবং তথ্যসহ মন্তব্য করা হয়েছে। ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টার-এর শু্বারের সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনটি প্রচ্ছদ কাহিনী হয়েছে এই বছরের ১১ জানুয়ারি। এখানে তার একটি বড় সাক্ষাৎকারও আছে। বড় সাক্ষাৎকার দিয়েছে দৈনিক প্রথম আলোতেও ৩ জানুয়ারি ২০০২। আইরিন খান বাংলাদেশ সফরকালে শক্ত শক্ত কথা বলেছেন। শুধু এ দু'টি সাক্ষাৎকার দেখলেই বাংলাদেশের মানবাধিকার এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে তার ক্ষোভ, দুঃখ-বেদনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেছেন, তিনি আবার এবছর অবস্থা দেখতে আসবেন। বাংলাদেশে ব্যাপক মানবাধিকার লজ্ঘন এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর এর বিপরীতে অ্যামনেস্টির এই রিপোর্ট খণ্ডনে সরকারি তথ্য বিবরণীর কথাগুলোর সমর্থনে তেমন কোন যুক্তি বা তথ্য নেই।

সাত

বাংলাদেশের গত বছরের ১ অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনের পর সংখ্যালঘুদের, বিশেষ করে হিন্দুদের মানবাধিকার যেমন ব্যাপকভাবে লজ্ঘিত হয়েছিল, তেমনটি আরেকবার দেখা গিয়েছিল একাত্তরে। গত নির্বাচনের পর সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে কেমন সোচ্চার নিন্দা প্রতিবাদ হয়েছে তার কিছুটা বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করেছি আমার চার কিস্তি তে সমাপ্ত, 'বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প-াবন বইছে' শিরোনামে দৈনিক 'সংবাদ'-এ শনিবার ২৭ এপ্রিল থেকে পরবর্তী চার শনিবার প্রকাশিত লেখাটিতে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রণালয়ের ২০০১ সালের বাংলাদেশের ওপর মানবাধিকার পরিস্থিতির ৪৫ পৃষ্ঠার রিপোর্টেও সংখ্যালঘুদের ওপর ব্যাপক অত্যাচার-নির্যাতনের ওপর পুরো এক পৃষ্ঠা আছে। এই রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় চলতি বছরের ৪ মার্চ। মোট ৬টি সেকশনে বিভক্ত এই রিপোর্টে রাজনৈতিক অধিকার, পুলিশি নির্যাতন, মহিলাদের অধিকার, শ্রমিকের অধিকার, শিশু অধিকারের অবস্থাও বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

এই ৬টি সেকশনের ৫ নম্বর সেকশনটির শিরোনাম হচ্ছে 'Discrimination Based on Race, Sex, Religion, Disability. Language or Social Status' এই সেকশনটির তৃতীয় সাবসেকশন হচ্ছে, 'Religious Minorities'. এই অংশে বাংলাদেশে আহমদীয়াদের

বর্তমান অবস্থাও বলা হয়েছে।

অ্যামনেস্টির বার্ষিক প্রতিবেদন মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রতিবেদনের তুলনায় অনেক ছোট। বাংলাদেশের ওপর অ্যামনেস্টির পুরো প্রতিবেদনটি মাত্র এক পৃষ্ঠার, আগেই যেমন বলেছি। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের এই রিপোর্টটিতে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন এবং অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ওপর সম্ভব হলে পরে আরেক দিন আলাদা আলোচনা করব; কিন্তু আজ এই লেখাটি ব্রিটিশ পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিষয়াদি দেখার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বেন ব্র্যাড়শ এমপি বাংলাদেশে গত বছর সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন সম্পর্কে আরেক ব্রিটিশ এমপি ডোনাল্ড এন্ডারসনকে লিখিত এক চিঠিতে কি বলেছিলে, সেখান থেকে তিনটি প্রাসঙ্গিক প্যারাগ্রাফের উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করতে চাই। ডোনাল্ড এন্ডারসনের আগে লেখা এক চিঠির উত্তরে ব্রিটিশ মন্ত্রীর এই বছরের ১১ জানুয়ারির লেখা চিঠির ৭টি প্যারাগ্রাফের এই তিনটি প্যারাগ্রাফ এমন ছিল?

On Bangladesh, we have concerns about reports of human rights violations and raise these regularly with the Bangladeshi authroities. The Prime Minsiter discussed human rights, including the treatment of minorities, with Prime Minister Zia during his visit to Dhaka on 3-4 January.

Staff at out High Commission in Dhaka monitor closely reports of human rights abuses. They have rised allegations of attacks against minorities on Several occasions with The Government of Bangladesh, encouraging them to investigate all allegations fully. Most recently, our High Commissioner raised this matter with Bangladeshi Home Minister Chowdhury on 3 December.

Folowing reports of attacks on minorities after the 1st October parliamentary elections, High Commission staff visited several of the regions where abuses were alleged to have taken place. Although it was not possible to investigate all allegations, a number of cases that had been published in the press and which were investigated were shown to be false or misleading. Nevertheless, we remain concerned about the contiuing number of allegations of human rights abuses against minority communities. Our High Commission will continue to monitor the situation carefully, vissiting the regions again if necessary.

[বাংলা তর্জমা ঃ বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের খবরে আমরা উদ্বিগ্ন। এ ঘটনাগুলো আমরা নিয়মিতভাবেই বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করছি। সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণসহ মানবাধিকারের বিষয়গুলো প্রধানমন্ত্রী টনি বে-য়ার তার গত ৩ ও ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ সফরকালে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

ঢাকায় আমাদের হাইকমিশনের কর্মকর্তারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ওপর কড়া নজর রাখছেন। সংখ্যালঘুদের ওপর আ্রমণের অভিযোগগুলো আমাদের হাইকমিশনের কর্মকর্তারা কয়েকবারই বাংলাদেশ সরকারের কাছে তুলে ধরেছেন। এ ধরনের সকল অভিযোগের যেন পুরো তদন্ত হয় তা আমরা বাংলাদেশ সরকারকে বলে আসছি। এই তো মাত্র সেদিন ঢাকায় আমাদের হাইকমিশনার এই বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (আলতাফ হোসেন) চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

গত ১ অক্টোবরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সংখ্যালঘুদের ওপর আ্রমণের খবর সরেজমিন তদন্ত করে দেখতে ঢাকায় আমাদের হাইকমিশনের কর্মকর্তারা কতগুলো জায়গায় গিয়েছিলেন। সব জায়গায় যাওয়া সম্ভব না হলেও, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত কতগুলো রিপোর্ট তদন্তে মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর দেখা গেছে। এতদসত্ত্বেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অব্যাহত মানবাধিকার লঙ্ঘনের খবরে আমরা উদ্বিগ্ন। আমাদের হাইকমিশন অবস্থার 'মনিটরিং' করতে থাকবে এবং দরকার হলে ওইসব এলাকায় আবার তদন্ত করতে যাবে।'

অ্যামনেস্টির রিপোর্টের প্রতি্রিয়ায় আমাদের সরকার অনেক অসত্য এবং বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলেছে। তো বেন ব্যাডকা'র কথাগুলো তো ব্রিটিশ সরকারের সরকারি অবস্থান। ব্রিটিশ সরকারের এই কথাগুলো আমাদের সরকারি ভাষ্যের ঘোরতর বিপরীত। এখানে আমাদের সরকারের বক্তব্যটা কি?

সবশেষে গত সপ্তাহের শেষ দিকে, সাতক্ষীরার গোবিন্দ সরদার এবং তার মা সুন্দরী সরদারকে জামাতে ইসলামীর কয়েকজন স্থানীয় নেতা যেমন বিবস্ত্র করে ছবি তুলেছে বলে অনেকগুলো পত্রপত্রিকার খবরে দেখলাম তাতে সরকার বাহাদুরের প্রতি্রিয়া কি? সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন তো চলছেই। আমাদের পত্রপত্রিকাগুলোও যদি সরকার বাহাদুরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা পড়তেন, তাহলে দেশটির অনেক মঙ্গল হতো। দেশে যা এখনও চলছে, এসব ঘটনার বর্ণনা দিয়ে আগামী বছর যে রিপোর্টটি অ্যামনেস্ট্রি ইন্টারন্যাশনাল প্রকাশ করবে সেখানে যেন গত বছরের মতো ঘটনার বর্ণনা এবং মন্তব্য না থাকে, তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করতে কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানাই। সেটি একটি মহৎ কাজ হবে।

সংবাদ, ১ ও ৮ জুন ২০০২

সংখ্যালঘুর জন্য নিরাপত্তা নয়, ক্ষমতায়ন দরকার

এস. এস চাকমা

২০০১ সালের অক্টোবর মাসে সাধারণ নির্বাচনের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের পর থেকেই দেশের কোন কোন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন শুরু হয়, যার জের এখনও কোন কোন জায়গায় চলছে। এতে দেশে ব্যাপক প্রতি্রিয়া সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান, মানবাধিকার সংগঠন, মানবাধিকার কর্মী, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী এবং অন্য অনেকেই সে নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, কোন কোন সময় বিক্ষোভ, সভা-সমাবেশ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকের জন্য নিরাপত্তা দাবি করেন। কিন্তু তারা কেউ সংখ্যালঘুদের ক্ষমতায়নের কথা বলেননি। তাদের কেউ পার্লামেন্টে সংখ্যালঘুদের জন্য এমনকি তফসিলি জাতি-উপজাতি এবং আদিবাসীদের জন্যও সংরক্ষিত আসন দাবি করেননি। যদিও তাদের অনেকেই মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য সংসদে সংরক্ষিত আসন দাবি করেন। তারা কেউ সংখ্যালঘুদের আনসার-ভিডিপি, পুলিশ-বিডিআর, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং অন্যান্য সরকারি, আধা-সরকারি চাকরিতে লোক নেয়ার দাবি করেন না। তারা সরকারকে প্রশ্ন করেন না, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ৩০ বছর পরও কেন কোন সংখ্যালঘুকে বিভাগীয় কমিশনার, পুলিশের ডিআইজি, অতিরিক্ত আইজি, আইজি এবং অন্য গুরুত্বপূর্ণ পদে নেয়া হয়নি। সংখ্যালঘুরা এখনও দেশের মোট জনসংখ্যার ১২.৫%। অথচ ৬০ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভায় কেন তাদের থেকে একজন পূর্ণমন্ত্রী নেয়া হয়নি-সে প্রশ্নটিও তারা করেন না। গত

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেও ১ কোটির অধিক জনসংখ্যাবিশিষ্ট হিন্দু সম্প্রদায় থেকে একজন পূর্ণ মন্ত্রী ছিল না। তখনও তো সুশীল সমাজ অওয়ামী লীগ সরকারকে অন্তত একজন পূর্ণমন্ত্রী নেয়ার জন্য অনুরোধ করেনি। গত আওয়ামী লীগ সরকার খুবই ঢাকঢোল পিটিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সঙ্গে শান্তিচুক্তি করেছিল; কিন্তু চুক্তি সম্পাদনের পর চুক্তির মূল ধারাগুলোর কয়েকটি বাস্তবায়ন করেনি। ওই সময় তো কোন মানবাধিকার সংস্থা অথবা সুশীল সমাজের কেউ আওয়ামী লীগ সরকারকে চুক্তির সব ধারা বাস্তবায়নের জন্য চাপ অথবা অনুরোধ করেননি। তারা কেবল সংখ্যালঘুরা ব্যাপকভাবে আ□ান্ত হলে অথবা দেশ ত্যাগ করলে তাদের জন্য নিরাপত্তা দাবি করেন, ক্ষমতায়ন দাবি করেন না। ভারত বিভাগের সময় বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলার সংখ্যালঘু রাখাইন সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৬০ হাজার। এখন তাদের সংখ্যা ১০ হাজারেরও কম। আর বৃহত্তর বরিশাল জেলায় ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে রাখাইনদের সংখ্যা ছিল ৫০ হাজারেরও অধিক। এখন তাদের সংখ্যা ৪ হাজারেরও কম। এ রাখাইনরা কোথায় গেল আমাদের দেশে কেউ জিজ্ঞেস করে না, পত্রপত্রিকায়ও লেখা হয় না। কেবল সংখ্যালঘু মুসলমানদের জোর করে বাংলাদেশে পাঠায়। আরও লেখা হয়, রোহিঙ্গা মুসলমানদের নানা নির্যাতনের কথা, তাদের মানবাধিকারের বিষয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি এবং অ-উপজাতি আনুপাতিক হার ছিল ৯৭.৫ ঃ ২.৫। এখন সে হার হয়ে গেছে ৫১.৫ ঃ ৪৯.৫। আর তখন বাঙালি মুসলমান ছিল জেলার মোট জনসংখ্যার মাত্র ১.৫। এখন বাঙালিরা পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট ২৫টি থানার মধ্যে ১৪টি থানায় সংখ্যাগুরু হয়েছে। সেসব কথা আমাদের দেশের কোন মানবাধিকার কর্মী অথবা সংগঠন কোন খবরের কাগজে লেখেন না।

খবরের কাগজ পড়লে মনে হয়, এদেশে সংখ্যালঘুদের কেবল নিরাপত্তা দরকার, তাদের জন্য বন্যপ্রাণীদের মতো অভয়ারণ্য দরকার। বেঁচে থাকার জন্য তাদের চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য করার প্রয়োজন নেই। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, সংসদের সদস্য, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হওয়ারও কোন দরকার নেই। আনসার, পুলিশ, সরকারের নিম্নপদে-উচ্চপদে আসীন হওয়ারও দরকার নেই। মনে হয়, সংখ্যালঘুরা এসব পদ চায় না। তারা কেবল নিরাপত্তা চায়। এদেশে সুশীল সমাজ, মানবাধিকার কর্মী-সবাই মনে করেন, এসব দরকার কেবল মহিলাদের জন্য। মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য তাদের বিভিন্ন সার্ভিসে কোটা, যুগ্ম-সচিব, সচিব পদে কোটা, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশনে কোটা দরকার এবং সেজন্য কোটা রাখা হয়েছে। তাই তাদের আরও ক্ষমতায়নের জন্য সংসদেও সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য সুশীল সমাজের সঙ্গে আমার কিছুটা ভিন্নমত রয়েছে। আমার তো মনে হয়, এদেশে সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হয়, তারা দেশ ত্যাগ করে অথবা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, তাদের জায়গা-জমি জোর করে দখল করা হয়, মাঠের পাকা ধান কেটে নেয়া হয়, মেয়েদের অপহরণ করা হয়, জোর করে বিয়ে করা হয়। তারা সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে নয় অথবা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, উপজাতি, আদিবাসী হওয়ার কারণে নয়, উৎপীড়নের শিকার হয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদার নয় বলে, রাষ্ট্র কর্তৃক তারা অবহেলিত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক তাদের অপাংক্তেয় করে রাখা হয়েছে বলে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন জানে, রাষ্ট্রে তারা অবহেলিত, রাষ্ট্র থেকে তারা সুরক্ষা পাবে না। কারণ পাকিস্তান আমল থেকে এদেশে বহু দাঙ্গা হয়েছে এবং সংখ্যালঘুরা সবসময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; কিন্তু কোন দাঙ্গাবাজের বড় ধরনের সাজা হয়েছে বলে শোনা যায়নি। তাই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন দাঙ্গা হলে প্রতি আ□মণ তো দূরের কথা, প্রতিরোধও করে না। বরং আ□ান্ত হলে পালিয়ে যায় অথবা গোপনে দেশ ত্যাগ করে। যারা তাদের নির্যাতন করে, তাদের মেয়েদের অপহরণ করে, মাঠের পাকা ধান কেটে

নিয়ে যায়, বাড়িঘর, জমি-জমা পর্যন্ত দখল করে, অনেক সময় মন্দির-মূর্তি ভেঙে দেয় অথবা অপবিত্র করে, তারা ভাল করে জানে, এসব করলে তাদের সাজা হবে না, বড়জোর দু'এক মাস হাজতবাস হবে, সংখ্যালঘুরাও প্রতিরোধ করবে না-তাই তারা এসব দুষ্কর্ম করে। উলে-খ্য, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরও দু'একজন দারোগা, পুলিশের এএসপি, এসপি অথবা আরও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আছেন। কই দুষ্কৃতকারীরা তাদের জমি তো দখল করে না, তাদের মাঠের পাকা ধান কেটে নেয় না, পুকুরের মাছ নেয় না, বাড়িঘরও দখল করে না। কারণ দুষ্কৃতকারীরা ভালভাবে জানে, এসব লোক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হলেও তারা ক্ষমতাবান, শাসন ক্ষমতার তারা অংশীদার। এসব ক্ষমতাবান সংখ্যালঘুর ওপর আঘাত করা হলে তাদের ওপরও আঘাত আসবে। এসব দুষ্কৃতকারী কেবল দুর্বল সংখ্যালঘুদের নয়, তারা দুর্বল মুসলমানদের ওপরও নির্যাতন চালায়, তাদের জায়গা-জমি দখল করে, পুকুরের মাছ নিয়ে যায়, এমনকি জমির পাকা ধানও কেটে নেয়।

গত সাধারণ নির্বাচনে দু'জন হিন্দু সাংসদ হয়েছেন, উপ-নির্বাচনে আরও একজন জয়ী হয়েছেন। কেউ তো তাদের বাড়িঘরে এমনকি তাদের আত্মীয়-স্বজনের বাড়িঘরেও হামলা করেনি অথবা মাঠের পাকা ধানও কেটে নেয়নি। কারণ তারা হিন্দু হলেও ক্ষমতাবান এবং শাসন ক্ষমতার অংশীদার। এমনকি বিরোধীদলের সংখ্যালঘু সাংসদের বাড়িতেও কোন দুষ্কৃতকারী হামলা করেছে বলে খবর বেরোয়নি। দুষ্কৃতকারীরা ভালভাবেই জানে, কার সম্পত্তি তারা বিনা প্রতিরোধে দখল করতে পারবে, কোন্ মেয়েকে ধর্ষণ করলে তাদের শাস্তি হবে না, আইনের বেড়াজালে তারা আটকাবে না। ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে ফেনী শহরে সাংসদ জয়নাল হাজারীর ভয়ে লোকজন আতঙ্কগ্রস্ত থাকত, অনেকেই তার ভয়ে ফেনী শহর ত্যাগ করেছিল, আর নির্বাচনে হেরে গিয়ে সেই জয়নাল হাজারী নিজেই ফেনী ছাড়া। একই অবস্থা বরিশালের আবুল হাসানাত আবদুল-াহ এবং নারায়ণগঞ্জের শামীম ওসমানের। নির্বাচনের আগে একজনের ভয়ে বরিশাল শহর কম্পমান থাকত, অন্যজনের ভয়ে নারায়ণগঞ্জ কাঁপত; কিন্তু নির্বাচনে হেরে গিয়ে তারা নিজেরাই দেশছাড়া। নিজ নিজ শহরে কেন দেশেও ফেনীর জয়নাল হাজারী, নারায়ণগঞ্জের শামীম ওসমান এবং বরিশালের আবুল হাসানাত আবদুল-াহ, নিরাপদ বোধ করেননি। কারণ তারা আর শাসন ক্ষমতার অংশীদার নন। সেজন্য নির্বাচনে হারার পরপরই দেশত্যাগ করেছেন।

শাসন ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার জন্যই তো ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় মুসলমানরা তাদের জন্য কেবল পৃথক নির্বাচন, প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে সংরক্ষিত আসন শুধু নয়, সরকারি চাকরির উচ্চপদ যেমন ভারতীয় পলিটিক্যাল সার্ভিস, পুলিশ সার্ভিসসহ অন্য পদে nomination-এর মাধ্যমে চাকরি চেয়েছিলেন এবং পেয়েছিলেন। তবুও অখণ্ড ভারতে তাদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে না, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের দ্বারা শাসিত হবে, অত্যাচারিত হবে আশঙ্কা করে মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র পাকিস্তান দাবি করেছিলেন এবং ব্রিটিশ সরকার সে দাবি যৌক্তিক মনে করে মেনে নিয়েছিল। আবার পাকিস্তান হওয়ার পর বাঙালিরা বুঝতে পারে, তারা স্বাধীন হলেও সে স্বাধীনতা তাদের জন্য পরাধীনতার নামান্তর, সব ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানিদের, সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের ভাষা বাংলাকেও দেশের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দেশের শাসন কর্তারা মানতে রাজি নয়। বাঙালিরা আরও দেখতে পায়, সারা পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানিরা, বিশেষ করে পাঞ্জাবিরা শনৈই শনৈই উন্নতি করছে আর বাঙালিরা নিজেদের মাতৃভূমিতে কোণঠাসা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেজন্যই তারা প্রথমে ভাষা আন্দোলন, এরপর ২১ দফা আন্দোলন এবং আরও পরে ৬ দফা আন্দোলন শুরু করে, যেটি শেষপর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় তো বর্তমান বাংলাদেশে ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং অন্য বড়

শহরগুলোতে হিন্দুরাই ছিল সংখ্যাগুরু। তাদের হাতেই তো ছিল সকল আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা এবং ব্যাংকিং ব্যবসা। পূর্ব পাকিস্তানের সবক'টি বড় শিল্পকারখানা, যেমন ৯টি কটন মিল, ২টি গ-াস ফ্যাক্টরি, ৪টি দেশলাই কারখানা এবং একটি সিমেন্ট কারখানার মালিক তো হিন্দুরাই ছিল। চট্টগ্রাম বাদে অন্য শহরগুলোতে বাঙালি মুসলমানরা তো কেবল টুকটাক ব্যবসা করতো। আইন ব্যবসা, ডাক্তারি, শিক্ষকতার পেশা তো হিন্দুদের একচেটিয়া ছিল বলা যায়। পাকিস্তান হওয়ার পর এমনকি বাংলাদেশ হওয়ার পর হিন্দুরা নতুন শিল্পকারখানা তো করতে পারেনি, যেগুলো ছিল সেগুলোও তারা হারিয়েছে এবং লাখে লাখে দেশ ত্যাগ করেছে। কেবল ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত যুক্তফ্রন্টের সময় হিন্দুরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদার ছিল বলে ওই সময় কোন দাঙ্গা হয়নি এবং হিন্দুদের ভারতে হিজরত করাও অনেক কমে যায়। ১৯৪১ সালের আদমশুমারিতে বর্তমান বাংলাদেশর হিন্দুর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ১৭ লাখ ৪৭ হাজার, ১৯৫১ সালের লোক গণনায় তাদের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৯২ লাখ ৩৯ হাজার; কিন্তু ১৯৬১ সালের আদমশুমারিতে সেই সংখ্যা বেড়ে হয় ৯৮ লাখ ৯০ হাজার।

১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা গ্রহণের পর হিন্দুসহ অন্য সংখ্যালঘুরা আবার নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। কারণ আইয়ুব খান ক্ষমতা গ্রহণের পর সেক্যুলার মুসলমান নেতা যেমন আবু হোসেন সরকার, শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা ভাসানীসহ অনেক হিন্দু নেতাকে গ্রেফতার করে। ফলে নিরাপত্তার অভাবে, বিশেষ করে ১৯৬৪ সালে দাঙ্গার পর এবং ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর সংখ্যালঘুদের ব্যাপক হারে ভারতে চলে যাওয়া বৃদ্ধি পায়। এমনকি ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান ক্ষমতা গ্রহণের পর পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র হিন্দু সিএসপি এ, কে, দত্ত চৌধুরী, যিনি এক সময় বরিশাল জেলায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের একমাত্র হিন্দু বিচারপতি নির্মল চন্দ্র নন্দীও ভারতে চলে যান।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর সময় সংখ্যালঘুরা আবার শাসন ক্ষমতার অংশীদার হয় এবং মন্ত্রিসভায় দু'জন হিন্দু মন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর ও ফনী মজুমদার গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান। তাছাড়া ক্ষিতিশ চন্দ্র মণ্ডলকে প্রতিমন্ত্রী করা হয়। ফলে হিন্দুদের মনোবল আবার বৃদ্ধি পায়। তবু সে সময়ও হিন্দুরা মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানিদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রায় ৩শ' বছরের পুরনো রমনা কালী মন্দির নির্মাণের অনুমোদন আদায় করতে পারেনি। শত্রু সম্পত্তি আইনও বাতিল হয়নি, সেটা নতুন আঙ্গিকে অর্পিত সম্পত্তি আইন করা হয়।

পাকিস্তান আমলে তো একজন বাঙালি মুসলমানও কোটিপতি ছিলেন না; কিন্তু এখন তো বাংলাদেশে কোটিপতির সংখ্যা কয়েক হাজার, হিন্দু অথবা অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোটিপতির সংখ্যা কি খুঁজে পাওয়া যাবে? সংখ্যালঘু কোটিপতির সংখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদার নয়, ফলে রাষ্ট্রের সকল সুযোগ-সুবিধা হতেও তারা বঞ্চিত।

ব্রিটিশ আমলে ইংরেজরা দেশের সকলের জন্য নিরাপত্তার পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের ক্ষমতায়নেরও পদক্ষেপ নেয়। সেজন্য তারা সংখ্যালঘুদের জন্য প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহ ও কেন্দ্রীয় আইন সভায় পৃথক নির্বাচনের এবং সেই সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আসনের ব্যবস্থা করে। মুসলমানদের জন্য তারা পৃথক স্কুল-কলেজ এমনকি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করে। সেসব স্কুল এখনও ঢাকা এবং চট্টগ্রাম শহরে রয়েছে। সেসব স্কুল-কলেজে ছাত্র-বেতনও কম ছিল। তাছাড়া সরকার মুসলিম ছাত্রদের জন্য আলাদা হোস্টেল এবং বৃত্তির ব্যবস্থা করে। নি¤বর্ণের হিন্দুদের জন্যও প্রাদেশিক আইন সভায় এবং কেন্দ্রীয় আইন সভায় সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করে।

উপজাতিদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েল

নামে একটি শাসনবিধি চালু করে। সে ম্যানুয়েল অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার বাইরের অ-উপজাতীয়দের পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় প্রবেশ করতেই জেলার ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে নির্ধারিত সময়ের জন্য পাস সংগ্রহ করতে হতো। সেরকম বিধি ভারতের স্বাধীনতার পর ভারত সরকার তার উত্তর-পূর্বের উপজাতি অধ্যুষিত রাজ্য যেমন মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ইত্যাদিতে চালু করেছে। ভারতীয়দের সেসব রাজ্যে প্রবেশ করতে সেসব রাজ্য সরকারের কাছ থেকে বিশেষ পারমিট সংগ্রহ করতে হয়। সে সময় অ-উপজাতীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে কৃষি জমি য় অথবা বন্দোবস্ত গ্রহণের অধিকার ছিল না। কোন অ-উপজাতীয় পাহাড়িদের স্বার্থবিরোধী কোনকাজে লিপ্ত হলে তাকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে জেলা থেকে বহিষ্কারের ক্ষমতা ডেপুটি কমিশনারের ছিল। তখন অ-উপজাতীয়রা কেবল হাট-বাজারগুলোতে ব্যবসা করার জন্য বাজার ফান্ড এলাকার ভেতর প-ট বন্দোবস্ত অথবা য় করতে পারত। পার্বত্য চট্টগ্রামে ১০/১২টি উপজাতি গোষ্ঠীর বাস। অনেক সময় একই মৌজায় একাধিক উপজাতি গোষ্ঠীর লোক বাস করতো এবং এখনও বাস করছে। সেক্ষেত্রে ডেপুটি কমিশনার সে মৌজার হেডম্যান নিয়োগ করার সময় সংখ্যালঘিষ্ঠ উপজাতি থেকে নিয়োগ করতেন। উদ্দেশ্য, যেন সংখ্যালঘু উপজাতি লোকজন সংখ্যাগুরু উপজাতি দ্বারা উৎপীড়িত না হয়।

ব্রিটিশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য আলাদা পুলিশ বাহিনী ছিল। সেই পুলিশ বাহিনী কেবলমাত্র পাহাড়ি জনগোষ্ঠীভুক্ত লোক দ্বারা গঠিত হতো। তখন চট্টগ্রাম জেলার বর্তমান রাউজান থানার পাহাড়তলি গ্রামে বিখ্যাত মহামুণি বৌদ্ধমেলা চৈত্র সংান্তির দিন থেকে শুরু হতো। মেলা ১৫ দিন ধরে চলত। তবে মেলার প্রথম ৩ দিন পার্বত্য চট্টগ্রামের পুলিশ বাহিনী মেলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকত। তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের সরকারি অফিসও ১০ দিনের জন্য বন্ধ থাকত।

জেনারেল এরশাদের শাসন আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলার প্রত্যেকটির জন্য জেলা পরিষদ গঠন করা হয়। প্রত্যেক জেলা পরিষদে একজন চেয়ারম্যান এবং ৩০ জন সদস্য রাখার বিধান রয়েছে। বিধান রয়েছে, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে অবশ্যই একজন উপজাতি হতে হবে। তাছাড়া ৩০ জন সদস্যের মধ্যে কোন সম্প্রদায়ের/উপজাতির কতজন সদস্য থাকবেন তারও বিধান রয়েছে। উদ্দেশ্য, যেন ওই জেলার বসবাসকারী সকল সম্প্রদায় থেকে প্রতিনিধি থাকে। একইভাবে গত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় যে শান্তিচুক্তি হয়, তাতেও আঞ্চলিক পরিষদে কোন সম্প্রদায়ের কতজন সদস্য থাকবেন তারও বিধান রাখা হয়।

ব্রিটিশ আমলে বর্তমান পটুয়াখালী এবং বরগুনা জেলায় ৫০ হাজার রাখাইন ও বর্তমান বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার উলে-খযোগ্যসংখ্যক গারো এবং হাজং উপজাতি বাস করত। রাখাইনদের স্বার্থ দেখার জন্য তখন খেপুপাড়ায় একজন বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট এবং গারো-হাজংদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য একজন বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে শেরপুর শহরে নিয়োগ দেয়া হতো। বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটদের অনুমোদন ছাড়া রাখাইনদের এবং গারো ও হাজংদের জমি হস্তান্তর করা যেত না। উদ্দেশ্য, যাতে ছলচাতুরি করে বাঙালিরা উপজাতিদের জমি হস্তগত করতে না পারে। কেবল তাই নয়, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে গারো পাহাড় অঞ্চলের বিস্তীর্ণ ১৭ বর্গমাইল জুড়ে ৫টি থানা-শ্রীবর্দী, নলিতাবাড়ী, হালুয়াঘাট, দুর্গাপুর এবং কলমাকান্দা আংশিক শাসনবহির্ভূত এলাকা ছিল ও সেসব এলাকায় উপজাতীয়দের ছাড়া অন্যদের প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল।

১৯৪৭ সালের বিভিন্ন সময় ভারত সরকার তার উত্তর-পূর্ব প্রদেশ আসামকে পুনর্গঠন করে। ফলে নাগা অধ্যুষিত নাগা হিল, মিজো অধ্যুষিত লুসাই হিলস, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, গারো অধ্যুষিত গারো হিলসকে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যে রূপান্তরিত করা হয়। তাছাড়া মণিপুরকে এটি পূর্ণাঙ্গ

রাজ্যে এবং North East Frontier Agency কেও পৃথক রাজ্যে রূপ দেয়া হয়। এসব উপজাতি অধ্যুষিত রাজ্যগুলোতে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের অধিবাসীদের এসব রাজ্যের সরকারগুলোর বিশেষ পারমিট ছাড়া প্রবেশও নিষিদ্ধ করা হয়, যা ইতোপূর্বেও বলা হয়েছে।

তাছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতিদের জন্য রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল নিয়ে একটি আলাদা Autonomous Council রয়েছে। আসামের বোরো উপজাতিদের জন্যও Autonomous Council রয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলাতে একটি পৃথক গুর্খা Autonomous Council রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে গত নির্বাচনের পর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে যে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়, তখন নবনিযুক্ত মন্ত্রীরা সবাই নিজ নিজ মাতৃভাষার কেউ উর্দুতে, কেউ হিন্দিতে, কেউ বাংলায়, কেউ নেপালি, কেউ সাঁওতালি ভাষায় শপথ গ্রহণ করেছিলেন— পশ্চিমবঙ্গে তো ইংরেজি, হিন্দি ছাড়াও উর্দু, নেপালি এবং বাংলা সরকারি ভাষার মর্যাদা পেয়েছে। উদ্দেশ্য, বিশাল ভারতে উপজাতি এবং অন্য সংখ্যালঘুরা জাতে স্বাতন্ত্র রক্ষা করতে পারে। এমনকি কিছু দিন আগে বিহার রাজ্যকে দুভাগ করে সাওতাল এবং অন্য আদিবাসীদের জন্য ঝাড়খণ্ড নামে একটি পৃথক রাজ্য গঠন করা হয়েছে।

বর্তমানে সারা ভারতে উপজাতি এবং তফসিলি সম্প্রদায়ের জন্য ভারতের জাতীয় সংসদে ও প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলোতে আসন সংরক্ষণসহ সকল সরকারি, আধা-সরকারি চাকরিতেও আসন সংরক্ষণ সরকারি, আধা-সরকারি চাকরিতেও আসন সংরক্ষণ করা আছে। চাকরি সংরক্ষিত আসনগুলোতে যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে অন্যদের দ্বারা সেসব শূন্যপদ করা যায় না। পরবর্তীতে যোগ্য প্রার্থী পাওয়া গেলে সেসব শূন্যপদ পূরণ করা হয়ে থাকে। ভারতের বর্তমান পররাষ্ট্র সচিব চোকিলা আয়ার ভারতের অন্যতম ক্ষুদ্রতম রাজ্য সিকিমের ভুটিয়া উপজাতিভুক্ত এবং তিনি কোটায় পররাষ্ট্র সার্ভিসে চাকরি পেয়েছিলেন। আর ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার হলেন মেঘালয়ের খাসিয়া উপজাতিভুক্ত লিংডো। বর্তমান বাংলাদেশেও উপজাতিদের জন্য সরকারি এবং আধা-সরকারি চাকরিতে কোটা রয়েছে অর্থাৎ সংরক্ষিত আসন রয়েছে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোটা রয়েছে।

এখন ভারতের রাজ্যসভায় মোট আসনের সংখ্যা ২শ' ৪৫। এ ২শ' ৪৫টি আসনের মধ্যে ১২টি আসনে ভারতের রাষ্ট্রপতি দেশের ১২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিয়ে থাকেন। এ ১২ জনের মধ্যে মুসলমান, শিখ সম্প্রদায় থেকেও নেয়া হয়। ভারতের Anglo Indianদের সংখ্যা খুবই সামান্য। এজন্য তাদের পক্ষে নির্বাচন করে সংসদে প্রতিনিধি পাঠানো সম্ভবনয়। তাই ভারত সরকার ৫শ' ৪৫ আসনবিশিষ্ট লোকসভায় ২ জন Anglo Indianকে মনোনয়ন দিয়ে লোকসভার সদস্য করে থাকে, যেন তারা Anglo Indian সমাজের দুঃখ-বেদনা, অভিযোগ লোকসভায় প্রকাশ করতে এবং সেসবের প্রতিকারও চাইতে পারেন।

ভারতের সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন অভিযোগ শোনা এবং সেসব অভিযোগের প্রতিকার পাওয়ার জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি Minority Commission এবং তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য আরও একটি পৃথক কমিশন রয়েছে। এ দু'টি কমিশনের চেয়ারম্যান দুইজনের পদমর্যাদা ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সমান। দু'টি কমিশনই সংখ্যালঘুদের সম্পর্কিত যে কোন সরকারি অফিসের নথি তলব করতে পারেন। তাছাড়াও ভারতে Commissioner for linguistic minorities নামে আরও একটি পদ রয়েছে। তার কাছেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তি বিভিন্ন অভিযোগের প্রতিকার চেয়ে আবেদন করতে পারেন।

বর্তমানে পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে জাতীয়

পরিষদের ২শ' ১৭টি আসনে হিন্দু, পার্শি এবং বৌদ্ধদের জন্য ৪টি ও খ্রিস্টানদের জন্য ৪টি আসন সংরক্ষিত রয়েছে এবং পাকিস্তানের প্রত্যেক মন্ত্রিসভায় একজন খ্রিস্টান অথবা হিন্দুকে রাখা হয়। জেনারেল আইয়ুব খানের ক্ষমতা গ্রহণের আগে তো, গিবন নামে এক পাঞ্জাবি খ্রিস্টান পাকিস্তানের ডেপুটি স্পিকার ছিলেন।

১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের সময় তো বর্তমান বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলায় রাখাইনদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০ হাজার। তখন বর্তমান কক্সবাজার জেলার রামু ছিল সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু গ্রাম এবং ওই গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল রাখাইন সম্প্রদায়ের। সে সময় তারা কি রকম অর্থ-বিত্তের অধিকারী ছিল এখন তাদের পরিত্যক্ত বৌদ্ধ মন্দিরগুলো দেখলে অনুমান করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে অর্থাৎ ১শ' বছরেরও আগে ওই গ্রামেরই কাজরী মহাজন নামে একজন রাখাইন একটি হাইস্কুল স্থাপন করেছিলেন। তার প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি এখনও তার নাম বহন করছে। জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের ক্ষমতা গ্রহণের পর মৌলিক গণতন্ত্রী ব্যবস্থা চালু করেন। সে সময় বর্তমান কক্সবাজার শহরের জন্য টাউন কমিটি গঠন করা হয়। তখন টাউন কমিটিতে একজন চেয়ারম্যান এবং আর একজন ভাইস চেয়ারম্যান থাকতেন। তারা উভয়েই কমিটির সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। তখন উচিত মং নামে একজন রাখাইন কক্সবাজার টাউন কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। কারণ তখনও শহরে উলে-খযোগ্যসংখ্যক রাখাইন সম্প্রদায়ের লোক বাস করত। এখন বৃহত্তর চট্টগ্রামে রাখাইনদের মোট জনসংখ্যা মাত্র ১০ হাজার। পাকিস্তান হওয়ার সময় বৃহত্তর বরিশাল জেলায় রাখাইনদের সংখ্যা ছিল ৫০ হাজারেরও বেশি। এখন সেই সংখ্যা কমে ৪ হাজার ৫শ'-এ দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশের অন্যান্য উপজাতি যেমন বৃহত্তর সিলেটের খাসিয়া, ত্রিপুরা, মণিপুরী প্রভৃতি, বৃহত্তর ময়মনসিংহের গারো, হাজং, কোচ, উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা, বৃহত্তর কুমিল-া এবং ফরিদপুর জেলায় প্রচুর ত্রিপুরা ছিল। ভারত বিভাগের পর উপজাতিরা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান এবং পরে স্বাধীন বাংলাদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কারণ হলো উপজাতিদের কোনদিন শাসন ক্ষমতার অংশীদার করা হয়নি। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের কিছু দুর্বৃত্ত নানা কৌশল অবলম্বন এবং অনেক সময় প্রশাসনতন্ত্রের সাহায্যে তাদের ভিটেবাড়ি বাড়তে বাধ্য করে। সরকারও তাদের রক্ষা করতে চেষ্টা করেনি।

ভারতের লোকসভার সাবেক স্পিকার পি এ সাংমা তো বৃহত্তর ময়মনসিংহের অধিবাসী ছিলেন। ১৯৬৪ সালের রায়টের পর তিনি ভারতে চলে যান। পরবর্তীতে তিনি সেখানে রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী হন। পরে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, অতঃপর লোকসভার স্পিকার নির্বাচিত হন। এখনও তিনি লোকসভার একজন সদস্য। বাংলাদেশে থাকলে তো তিনি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

আমাদের দেশের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন, রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিক কর্মী, বুদ্ধিজীবী এবং অন্য অনেকেই সংখ্যালঘুদের জন্য নিরাপত্তা চান, যেমন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবাদীরা বন্যপ্রাণীদের সংরক্ষণের জন্য নিরাপত্তা এবং অভয়ারণ্য চান। কিন্তু বন্যপ্রাণীরা অভয়ারণ্যে থাকলেও যেমন তাদেরও সবসময় চোরা শিকারিদের হাত থেকে রক্ষা কর যায় না, তেমনি সংখ্যালঘুদের অমানুষের হাত থেকে তাদের রক্ষা করা সম্ভভ নয়। সংখ্যালঘুরা এখন রাজনীতির দাবার ঘুঁটিতে পরিণত হয়েছে। অনেক সংখ্যালঘু রাজনীতিবিদ সংখ্যালঘুদের স্বার্থের চেয়ে নিজের স্বার্থ নিয়ে বেশি ব্যস্ত। আবার তাদের অনেকেই বাম রাজনীতি করতেন। তাদের কেউ মাওবাদী, কেউ লেনিনবাদী। অথচ চীন-রাশিয়া উভয় দেশই মাও সেতুং এবং লেনিনকে বাদ দিয়েছে।

তাই আমি সংখ্যালঘুদের জন্য নিরাপত্তা চাই না, চাই তাদের ক্ষমতায়ন। তাদের

ক্ষমতায়ন করা হলে নিরাপত্তা এমনিতেই এসে যাবে, তার জন্য দরকার পৃথক নির্বাচন এবং জাতীয় সংসদে তাদের জন্য সংরক্ষিত আসন। লোকসংখ্যা অনুপাতে সংখ্যালঘুদের সংরক্ষিত আসন রাখা হলে ৩শ' আসনের সংসদে তাদের সদস্য থাকবেন কমপক্ষে ৩০ জন। তখন সকল দলই তাদের খাতির করবে। আর পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হলে নির্বাচনের সময় কোন বিশেষ দলকে ভোট দেয়ারও অভিযোগ থাকবে না। ফলে সংখ্যালঘু ভোট না পাওয়ার জন্য তাদের ওপর অত্যাচারের খোঁড়া যুক্তিও থাকবে না।

এক সময় বাংলাদেশ বৌদ্ধ রাষ্ট্র ছিল এবং দেশের ৯০% লোকই ছিল বৌদ্ধ; কিন্তু এক সময় বাংলাদেশে থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। বাংলাদেশ যে এককালে বৌদ্ধ রাষ্ট্র ছিল, দেশের অনেক লোক সেটা জানেও না। সংখ্যালঘুদের ক্ষমতায়ন করা না হলে আরও ৩০/৪০ বছর পর এদেশ প্রায় সংখ্যালঘুশূন্য হবে। তখন ১৯৪৭ সালে এ দেশের ৩০% লোক যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছিল এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের ৯৭.৫% লোক যে উপজাতি ছিল তা জানতে গবেষণার প্রয়োজন হবে। বাংলাদেশের উপজাতি এবং আদিবাসীরা সংখ্যালঘুদের মধ্যেও সংখ্যালঘু। তাদের মোট জনসংখ্যা মাত্র কয়েক লাখ। তাই তারা সবাই আগে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এ অবস্থায় বর্তমান চারদলীয় সরকারের কাছে আমার আবেদন, আগামী বাজেট অধিবেশনেই বাংলাদেশের উপজাতি এবং আদিবাসীদের জন্য জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা হোক।

সংবাদ, ১৫ ও ১৬ জুন ২০০২

বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

ফণীন্দ্র সরকার

বাংলাদেশের রাজনীতিকদের বক্তৃতা-বিবৃতি পড়লে জানা যায় বাংলাদেশ এখন ভাবমূর্তির সঙ্কটে নিমজ্জিত। কিছুদিন আগে ষাটনলে সালাউদ্দিন নামক লঞ্চটি মেঘনার পানিতে নিমজ্জিত হয়ে প্রায় শতাধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। এমভি সালাউদ্দিনের মতো দেশের ভাবমূর্তি যদি নিমজ্জিত হয় তবে ১৫ কোটি মানুষের প্রাণহানি ঘটানোর সমূহ সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। ভাবমূর্তিহীন দেশের নাগরিকের মর্যাদা লাশতুল্য। এক অর্থে আমরা লাশ হয়েই আছি। রাজনীতিকদের কথাবার্তা অনুযায়ী এ সত্যটি দিন দিন উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। ভাব এবং মূর্তি-এ দু'টি শব্দের আভিধানিক ব্যাখ্যা হলো- ভাব হচ্ছে প্রেম, ভালবাসা আর মূর্তি হচ্ছে প্রতীক। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ভাবমূর্তি হচ্ছে দেশের প্রতি প্রেম-ভালবাসা বা দেশ-জাতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ। দেশের প্রতি ভালবাসা বা আনুগত্য না থাকলেই ভাবমূর্তির প্রসঙ্গটি এসে যায়। বর্তমানে বাঘা বাঘা রাজনৈতিক নেতারা ভাবমূর্তি নষ্টের কথাটি জোরেশোরে প্রকাশ করছেন। সরকার বলছে, বিরোধীদল দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। বিরোধীদল বলছে সরকার দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হলে যে দেশ ও জাতির মানমর্যাদা থাকে না-এ কথাটি সরকার ও বিরোধীদল এবং জনসাধারণ বোঝে। এদেশের রাজনীতি হচ্ছে পরনির্ভরশীল। রাজনৈতিক এবং দেশের নানাবিধ সঙ্কট প্রসঙ্গে পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করে এখন বৈদেশিক মুখপাত্রের কাছে বিচার চাওয়া হচ্ছে এদেশের রাজনীতির মূলকথা।

দেশের সঙ্কট নিরসনে ঐকমত্যের ভিত্তিতে কোন উদ্যোগ না নিয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ার সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত এ দেশের রাজনীতিকরা খামোখা ভাবমূর্তি নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে

যাচ্ছেন। তাদের বোঝা উচিত, যা কোনদিন ছিল না তা নষ্ট হওয়ার প্রশ্নই আসে না। এই ভাবমূর্তি নষ্টকেন্দ্রিক উপাত্ত হিসেবে সরকার এবং বিরোধীদল বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়কে ব্যবহার করে আসছে দীর্ঘদিন থেকে। যদিও বর্তমান চারদলীয় জোট সরকারের সংখ্যালঘু শব্দটি ব্যবহারে আপত্তি রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সংখ্যালঘু বলতে এখানে কিছু নেই বলে ঘোষণা করেছেন। এখানে সকলেই বাংলাদেশী, সকলেরই সমান নাগরিক অধিকার। তার রেশ ধরে সকল মন্ত্রীই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংখ্যালঘু শব্দটি বর্জন করে চলেছেন। তবে বিদেশের মাটিতে এবং বিদেশীদের কাছে সরকার বাংলাদেশকে উদার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবেও উপস্থাপন করছে। বিদেশীরা তাতে সায়ও দিচ্ছে। বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন বরাবরই এ কথা বলে আসছে। সরকার তাদের সার্টিফিকেট পেয়ে বাহবা কুড়াচ্ছে। একদিকে বলছে সংখ্যালঘু বলতে কিছু নেই, অন্যদিকে মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশ হিসেবে উপস্থাপন করে আত্মতৃপ্তি লাভ করছে-এটা স্ববিরোধী কিনা তা ভেবে দেখার ভার ছেড়ে দিলাম জনগণের ওপর। সকলের সমান অধিকারের কথা বলা হলেও এদেশে স্বাধীনতার পর গুরুত্বপূর্ণ কোন পদে সংখ্যালঘু হিন্দু বা অন্য কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে দায়িত্ব দেয়া হয়নি। রাষ্ট্রপতি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সেনাপ্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে হিন্দু সম্প্রদায় থেকে কাউকে নেয়া হয়নি যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও। স্বাধীনতার পর ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেও ওই নীতি কখনও অনুসরণ করা হয়নি। ভাবমূর্তি নষ্টের ক্ষেত্রে এটি একটি বড় কারণ-একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

পয়লা অক্টোবর ২০০১ জাতীয় নির্বাচনে চারদলীয় জোট সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গেই সারাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর বর্বরোচিত নির্যাতনের ঘটনা এখন সর্বজনস্বীকৃত। জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পূর্ব থেকেই নির্যাতন শুরু হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে, সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধ করার ন্যূনতম উদ্যোগও গ্রহণ করেনি। হিন্দুদের রক্ষায় কোন রাজনৈতিক দলই কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেনি। এমন নিন্দনীয় ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধের গৌরবকে কতটুকু ম্-ান করেছে তা একটু ভেবে দেখতে হবে। জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর নির্যাতন অব্যাহত থাকলেও দায় স্বীকার করতে চায়নি। আধুনিক তথ্য প্রবাহে নির্যাতনের কাহিনী ছড়িয়ে গেলে সরকার দিশেহারা হয়ে নির্যাতনের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং এজন্য প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলকে দায়ী করতে থাকে। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষ আওয়ামীও সরকারকে দায়ী করে। যে যাকেই দায়ী করুক না কেন সংখ্যালঘুদের ওপর নানাভাবে নির্যাতন হচ্ছে তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের ধরন পালটে বর্তমানেও তা অব্যাহত আছে।

সম্প্রতি গুজরাটে ভয়াবহ দাঙ্গায় নিরীহ মুসলমানদের প্রাণহানি ঘটেছে। উলে-খ্য, চলন্ত ট্রেনে হিন্দু মহাসভার ৫৭ জন সদস্যকে পুড়িয়ে মারার কারণে গুজরাটে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। ওই ৫৭ জন হিন্দু হত্যার জন্য গুজরাটের নিরীহ মুসলমানরা দায়ী নয়। গুজরাটের দাঙ্গা দমনে ভারত সরকারের ব্যর্থতাকে ইতিহাস কখনও ক্ষমা করবে না। গুজরাটের দাঙ্গার প্রভাব বাংলাদেশে পড়েছে বলে জোট সরকার বাহবা নিলেও প্রকারান্তে ভিন্ন কায়দায় এদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়কে নির্যাতন করা হচ্ছে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে। এদেশের সাধারণ মানুষ সাম্প্রদায়িক নীতিতে বিশ্বাসী নয়, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক নেতাদের কূটচালে পড়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে যাচ্ছে। আমাদের আর বুঝতে বাকি নেই যে, এদেশের শীর্ষ রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধান পুঁজিই হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হলে রাজনীতিকরা বেকার হয়ে যাবেন। রাজনীতি হয়ে যাবে অর্থহীন। সেজন্যই যতটা সম্ভব সাম্প্রদায়িকতাকে জিইয়ে রাখা হচ্ছে। গুজরাটে দাঙ্গার পর

আমাদের সরকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারোধে সফল হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর যথার্থ পদক্ষেপে তা সম্ভব হয়েছে বলে সরকার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী গর্ব করেই সরকারের কৃতিত্ব বর্ণনা করছেন। আমরাও স্বীকার করছি সরকারের এ সফলতা। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, নির্বাচনোত্তর সংখ্যালঘুদের ওপর যে সহিংস ঘটনা ঘটেছে সে বিফলতা কার?

গুজরাট প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারোধে সরকারের সফলতা যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে নির্বাচনোত্তর অব্যাহত সাম্প্রদায়িক নির্যাতন সরকারের ইচ্ছায়ই হয়েছে-একথা বলা কি অযৌক্তিক হবে?

আওয়ামী লীগ হেরে গিয়ে ইস্যু তৈরি করার জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন করার সরকারি অভিযোগ সত্য হয়ে থাকলে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা কার? জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী কতিপয় হিন্দু নেতাকে মুখপাত্র হিসেবে ব্যবহার করে হিন্দু নির্যাতনের দায় থেকে সরকারের মুক্তিলাভের হীন প্রচেষ্টায় সফল হওয়ার কোন সুযোগ নেই। চারদলীয় জোট সরকার এবং আওয়ামী লীগ হিন্দু সম্প্রদায়ের কতিপয় বিপথগামী লোককে পরস্পরবিরোধী অবস্থানে দাঁড় করিয়ে গোটা হিন্দু সম্প্রদায়কে বিভাজন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ষড়যন্ত্র কখনও স্থায়ীভাবে সফলতার মুখ দেখে না-এ বোধ এদেশের নেতাদের না থাকলে এ দোষ কার?

স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের কথা ভুলে গেলে চলবে কি? মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী কোন্‌টি? সেটা কি আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে?

'৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় সারাদেশে হিন্দুদের ওপর যে নির্যাতন হয়েছে বর্তমান নির্যাতন সে চিত্রকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। খুন, ধর্ষণ, মন্দির দখল তখনও যেমন হয়েছে এখনও এর ব্যতিক্রম নয়। ২২ মে, ২০০২ দৈনিক জনকণ্ঠে দেখলাম-ঢাকার ফরাশগঞ্জে পাঁচ বাড়িতে মন্দিরের জমি দখলের পর ঘর তৈরির কাজ এগিয়ে চলছে। একই দিনের ওই পত্রিকায় উঠেছে তেঁতুলিয়ায় মন্দির গুঁড়িয়ে সম্পত্তি দখল, সংখ্যালঘুদের মারধর, শরীয়তপুরে কালীমন্দির ভাঙচুর-লুটপাট। এ তো গেল একদিনের পত্রিকার সংবাদ। এরকম অসংখ্য খবর প্রতিদিনই আসছে। আর একটি রহস্যজনক সংবাদ হচ্ছে, জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকারি চাকুরে অনেক হিন্দু অফিসারকে ওএসডি করা হয়েছে— এটা কিসের আলামত? দেশের ভাবমূর্তিকেন্দ্রিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিয়ে টানাটানিতে পারঙ্গম শীর্ষ দু'টি রাজনৈতিক দল নতুন খেলায় মেতে উঠেছে কি? জোট সরকারের সমর্থনপুষ্ট কতিপয় হিন্দু নেতাকে তারা কাছে টেনে নিয়েছে, কার্যত তাদের দেখাবে কাঁচকলা। এতবড় বৃহৎ মন্ত্রীসভায় একটি মাত্র প্রতিমন্ত্রীর পদ দিয়ে হিন্দু কল্যাণের কথা বলা হাস্যকর-এটা পাগলেও বোঝে। ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই প্রথম জোট নেতারা হিন্দুবিরোধী ও ভারতবিরোধী কোন কথা প্রচার করেনি। হিন্দুদের যথার্থ সম্মান ও মর্যাদার কথা বলে জোট নেত্রী হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছুটা বিশ্বাস অর্জন করাতে এবার হিন্দুরা ধানের শীষে ভোট দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীসহ জোট নেতারাও হিন্দুরা তাদের ভোট দিয়েছে একথা স্বীকারও করেছেন। পরবর্তীতে হিন্দুদের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জনে তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণের উদারতার পরিচয় দিতে পারেনি। এখন ভাবমূর্তির সঙ্কটে আবর্তিত দেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় কতটা ভাল আছে বা থাকতে পারবে। দেশের ভাবমূর্তি রক্ষা বা পুনরুদ্ধারে হিন্দু সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এ দায়িত্ব এখন কার্যত হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর বর্তেছে।

সংবাদ, ২৪ জুন ২০০২

ছবি রানী মণ্ডলের দুঃসহ যন্ত্রণার ইতিবৃত্ত

কে. এম. সোবহান

এসবের শেষ কবে হবে? এ প্রশ্ন আর কেউ উচ্চারণ করে না। জনগণ উদ্বিগ্ন এ কারণে যে, এসবের বৃদ্ধি হচ্ছে। যে বিষয়টি নিয়ে জনগণ উদ্বিগ্ন বহু বিষয়ের মধ্যে সেটি হচ্ছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বিকট বর্বর রূপ। যে ঘটনাটি ঘটে গেল সেদিন রামপালে তা কোন সভ্য দেশে-যেখানে আইন-আদালত আছে, আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী আছে সেখানে কখনও ঘটে না। বাগেরহাটের বর্বর ঘটনার শিকার স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেত্রী ছবি রানী। তার ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের প্রধানত তিনটি কারণ আছে। প্রথমটি হল- তার চিংড়ি ঘের আছে, যা নিয়ে স্থানীয় বিএনপি নেতার সঙ্গে মামলা আছে বাগেরহাট আদালতে। এই চিংড়ি ঘেরটি ছবি রানী মণ্ডলের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, তিনি আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেত্রী এবং তার বাবাও আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন। তৃতীয় ও শেষ কারণটি হচ্ছে, তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। ছবি রানী একই সঙ্গে এই তিনটি ধারণ করেন। গত অক্টোবরের নির্বাচন থেকেই বিজয়ী জোটের মুখপাত্ররা বা তাদের সন্ত্রাসীরা সারাদেশে বিশেষ করে ভোলা এবং বাগেরহাট অঞ্চলে ভয়াবহ সন্ত্রাসী আক্রমণ চালিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের জমিজমা, বাড়ি-ঘর ও দোকানপাট দখল করেছে নির্বিচারে। এর সঙ্গে তারা ধর্ষণ করেছে সহস্রাধিক নারীকে, যাদের বয়স ৬০ থেকে ৬ বছর পর্যন্ত। এদের র্ধষণ করা হয় তাদের নিকটাত্মীয় যেমনঃ মাতা-পিতা, ভাই-বোন, শ্বশুর-শাশুড়ির সামনে এবং প্রকাশ্য দিবালোকে। গৃহের মালিকের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা হয় চাঁদা দাও নয়তো বাড়ির মেয়ে দাও। এ দাবি থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় ছিল না এবং এখনও নেই। হিন্দুদের পরে আক্রান্ত হয়েছে একইভাবে আওয়ামী লীগের ছাপ যাদের গায়ে আছে। এছাড়া খুন-জখম তো আছেই।

সরকার এসবের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। পুলিশ কোন কেস গ্রহণ করেনি বললেই চলে এবং এখনও করছে না। অর্থাৎ মানবতার বিরুদ্ধে এসব অপরাধ ঘটেছে বিনা প্রতিকারে। সরকার নির্বিকার থাকার ফলে পুলিশ প্রশাসন নীরব থাকায় এসব সন্ত্রাসী আজ ১০ মাস পরও একইভাবে এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে। যেসব ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরী, একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং একজন হিন্দু পুরোহিতের উদাহরণ দেয়া যায়। এই তিনটি বীভৎস খুনের আরও অনেক খুনের মতো তদন্ত ঝুলে গেছে। সরকার থেকে বলা হয়েছে যে, কাগজে এবং অন্যান্য লেখালেখিতে অতিশয়োক্তি করা হয়েছে। ঘটনা ঘটেছে, তবে সে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি এবং তা রাজনৈতিক সম্পর্কহীন ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত রেষারেষির ফল। একজন মন্ত্রী এ কথা বলবেনই এবং তাকে বলতেই হবে- কারণ যে সরকার এসব দুর্বৃত্তকে ও তাদের সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে তারাই সরকারি দলের অংশ। একটি শিশুর হত্যাকাণ্ডে একজন মন্ত্রী উঁচু দরের দার্শনিকের মতো বলেছিলেন যে, আল-ার মাল আল-াহ নিয়ে নিয়েছে। এই বক্তব্যে দেশব্যাপী দারুণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, যার ফলে মনে হয় তিনি উঁচু কোন মহলের বকা খেয়েছিলেন। এরপর তিনি অকুস্থলে যাওয়া ছেড়ে দেন। কোন বক্তব্য তো দেনই না। কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে এসব অস্বীকার করা হলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, আমেরিকায় এবং কানাডায় ওইসব মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য বেশক'টি সেমিনার হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের একজন সিনেটরের নেতৃত্বে অধ্যাপক, সমাজকর্মী প্রমুখ সংবলিত, একটি টিম বাংলাদেশে এসেছে ঘটনাগুলো যাচাই করতে। সিনেটরের নাম গিলমোর, যিনি বাংলাদেশের ডেক্স দেখেন বা তদারকি করেন। ওই টিমে একজন বাঙালি খ্রিস্টান অধ্যাপিকা

আছেন, যার পূর্বতন বাড়ি ছিল ভোলায়। তিনি সরেজমিন তদন্তে গেছেন বলে খবরে প্রকাশ। ওইসব ঘটনা দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, যা ইন্টারনেটে মারফত পৃথিবীব্যাপী প্রচার লাভ করেছে। কাজেই মন্ত্রীরা যাই বলুন তা দেশের বাইরে গ্রহণীয় হয়নি।

প্রারম্ভে যে ঘটনাটির কথা বলা হয়েছে তা শুধু ব্যাপক প্রচার লাভই করেনি, তা সরকারকেও বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছে। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং বিষয়টি সম্পর্কে জোর তদন্তের কথা বলেছেন। শুধু তাই নয়, স্থানীয় ডিসি এবং এসপির ওপর কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে। সংশি-ষ্ট দারোগাকে ক্লোজ করা হয়েছে। ঘটনাটি বর্বরতার উলঙ্গ প্রকাশ। ছবি রানী চিংড়ি ঘের মামলার তদবির করে বাগেরহাট থেকে সন্ধ্যা ৭টার বাসে করে রামপালে ফেরেন। বাস থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে বাশার কাজী নামে স্থানীয় বিএনপি নেতার লোকজন ছবি রানীর চুল ধরে বাসের সঙ্গে বেশ কয়েকবার জোরে মাথা ঠোকে। তারপর তাকে টেনেহিঁচড়ে বিএনপি অফিসে নিয়ে যায়। সেখানে জোটের সন্ত্রাসীরা ছিলা, যার মধ্যে জামায়াতের স্থানীয় নেতাও ছিলেন। বিবিসির কাছে তার উপস্থিতি একজন রাজাকার মন্ত্রী অস্বীকার করেছেন। বিবিসিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে ছবি রানী কষ্টের সঙ্গে হলেও অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছেন যে, অন্যান্য সন্ত্রাসীর মধ্যে জামায়াতের আমীরও ছিলেন। ছবি রানীর অবস্থা দু-একদিন আগেও সংকটাপন্ন ছিল বলে খুলনা হাসপাতালের ডাক্তাররা পত্রিকাকে জানিয়েছেন। কয়েকদিন আগে ছবি রানী অচেতন ছিলেন এবং তাকে মাঝে মাঝেই অক্সিজেন দিতে হচ্ছিল। বিবিসি তার কণ্ঠস্বর শোনায়, যা ছিল প্রায় অবোধ্য প্রথমদিকে। ছবি রানীকে বাগেরহাট থেকে খুলনা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তাকে জায়গার অভাবে মেঝেতে রাখা হয়েছিল, পরে কেবিনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং একটি মেডিকেল বোর্ড গঠিত হয় তার চিকিৎসার জন্য তখনই, যখন সারাদেশ এই বর্বরতার নিন্দায় সোচ্চার হয়। এর ১০ জনকে আসামি করে একটি কেসও পুলিশ করেছে, তবে তার মাত্র ৩ জন ধরা পড়েছে। প্রথমে বাশার কাজীর বিরুদ্ধে কোন মামলা হয়নি। কিন্তু পরে এর জন্য পুলিশকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় এবং পুলিশ তাকেও আসামি করেছে ওই কেসে। তবে সে ধরা পড়েনি। ঘটনাটি সরকারকে বিশেষ নাজুক অবস্থায় ফেলেছে। ছবি রানীকে বিএনপি অফিসে নেয়ার পর তাকে বিবস্ত্র করা হয় এবং তার যৌনাঙ্গে, তলপেটে এবং শরীরের অন্যান্য জায়গায় হাতুড়ি দিয়ে মারা হয়। তার বিবস্ত্র শরীরের ছবি তোলে স্থানীয় একজন স্টুডিওর মালিক। তিনিও একজন বিএনপি সমর্থক। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তার মাথার চুল কাটার জন্য আনা হয় একজন নরসুন্দরকে। অচেতন অবস্থায় ছবি রানীকে থানায় দেয়া হয় নষ্টা মেয়ে বলে।

খবরে প্রকাশ, ঘটনাস্থলের কাছেই পুলিশ ছিল কিন্তু তারা যথারীতি এর প্রতি আমল দেয়নি। পরবর্তী সময়ে পুলিশ প্রশাসনের যে গাফিলতি আছে তার বড় প্রমাণ ডিসি ও এসপিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান। ছবি রানীর মলমূত্রের সঙ্গে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল এবং ডাক্তাররা সন্দেহ করছিলেন, তার শরীরের ভেতর রক্তক্ষরণ হয়েছে। সে মাঝে মাঝেই বমি করছিল। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এর যে অর্থ বহন করুক না কেন, তার অবস্থা যে সংকটাপন্ন তা বুঝতে যেমন কষ্ট হয় না ঠিক তেমনি কষ্ট হয় না এটা বুঝতে যে, সরকার প্রধান বিষয়টির কারণে বিব্রত। এ ঘটনার সঙ্গে নির্বাচনোত্তর ঘটনাগুলোর যোগাযোগ খুব বেশি। নির্বাচনের পর যদি ওইসব সন্ত্রাসী ঘটনার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হতো তাহলে ছবি রানীর ভাগ্যে ওই নির্যাতন ঘটত না। ছবি রানীর মা সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছেন যে, তার মেয়েকে ওরা মেরে ফেলতে চেয়েছিল। তিনি নিজেও প্রচুর চাপের মধ্যে আছেন এবং তিনি আদৌ তার মেয়েকে নিয়ে তার বাসস্থানে ফিরে যেতে পারবেন কিনা তা তিনি জানেন না। পুলিশ একটি পথ অবলম্বন করেছে, যখন কোন ধর্ষণ বা অন্য কোন গুরুতর অপরাধের কথা তাদের জানানো হয় তখন পুলিশ হয়

মামলা গ্রহণ করে না বা করলেও অপরাধীকে গ্রেফতার করতে অনীহা প্রকাশ করে। এর ফলে অপরাধীরা বাদীকে হুমকি দেয় মামলা তুলে নেয়ার জন্য বা তাকে মেরে ফেলবে বলে। এর ফলে বাদীর অবস্থা অপরাধীর চেয়েও খারাপ হয়ে যায়। বাদী গৃহছাড়া হয়ে পলাতকের মতো জীবনযাপন করে। এ ধরনের ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কর্তৃপক্ষ এসব গ্রাহ্যে কেন আনে না তার কোন উপযুক্ত যুক্তি দেখানো হয় না কর্তৃপক্ষের দিক থেকে। পুলিশ এখন সেই ঔপনিবেশিক মেজাজে চলে। তারা বলে, তারা আইনের ঊর্ধ্বে এবং তাদের জবাবদিহিতার দায়-দায়িত্ব নেই। রাষ্ট্রে যদি আইনের শাসন থাকে তাহলে পুলিশ এ ধরনের ব্যবহার করে না। ২৮ আগস্টের 'জনকণ্ঠে' দুই কলামব্যাপী একটি খবরের শিরোনাম, যার সঙ্গে খবরের যথার্থতার জন্য একটি ছবিও ছাপা হয়েছে। শিরোনাম হচ্ছে- 'বুয়েটে ছাত্রদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ লাথি ঘুষি।' ছবিতে দেখা যায়, ছাত্রদের ধর্মঘট চলাকালে একটি ছাত্র মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে গেছে এবং তার সামনে লাঠি হাতে উদ্যত পুলিশ। শিরোনামে সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার লংঘনের উৎকট গন্ধ।

পুলিশকে দেখা গিয়েছিল একেবারে ঔপনিবেশিক আমলের পুলিশরূপে, যখন তারা শামসুন্নাহার হলে গভীর রাতে ছাত্রীদের ওপর আ[illegible]মণ করে লাঠিচার্জ করে অশ-ীল ভাষায় গালিগালাজ করে। ধর্ষণ বাদে আর সর্বতোভাবে ছাত্রীদের লাঞ্ছিত করে। ঘরের পোশাক পরিহিত মেয়েদের টেনেহেঁচড়ে পুলিশ ভ্যানে তোলা হয় একটি মিথ্যা এজাহারের ভিত্তিতে। শামসুন্নাহার হলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর প্রয়োজন জনস্বার্থের একটি মামলা করা পুলিশ এবং বাদী বা বাদীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করার জন্য এবং সেই মিথ্যা মামলার ভিত্তিতে ছাত্রীদের ওপর নির্যাতন এবং হাজতে আটক করার জন্য পুলিশের বিরুদ্ধেও মিথ্যা মামলা এবং অবৈধভাবে গ্রেফতার ও বন্দি রাখার জন্য। জনস্বার্থে এ মামলা করা প্রয়োজন। আইনমন্ত্রী একজন খ্যাতমান আইনজীবী ছিলেন। তিনি উদ্যোগী হয়ে এর বিহিত করতে পারেন। অপরদিকে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ সুয়োমোটো নোটিশ করতে পারেন পুলিশ ও বাদীদের বিরুদ্ধে।

ছবি রানীর মামলায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, যা দেরিতে হলেও প্রশংসনীয়। কিন্তু ছবি রানীর মতো এত সাংঘাতিক ও ভয়াবহ না হলেও গত ৫/৬ দিনের মধ্যে ধর্ষণের খবর দৈনিকে ছাপা হয়েছে যা যে কোন সভ্য দেশের জন্য লজ্জাকর। ২৮ আগস্টের 'জনকণ্ঠের' প্রথম পাতায় দুই কলামব্যাপী আরও একটি খবর ছাপা হয়েছে, যার শিরোনাম-'কলারোয়ায় গাছে বেঁধে মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছে ৪ বিএনপি কর্মী, বিবস্ত্র করে চুল কেটে দিয়েছে।' এই খবরের নিচে দুই কলামব্যাপী আরেকটি খবর ছাপা হয়েছে, যার শিরোনাম- 'সাত মাসে ৫৬৮১ নারী ধর্ষিত বা নির্যাতিত'। একই দিনের আরেকটি খবর, যার শিরোনাম- 'ভোলায় কিশোরীকে গণধর্ষণ, পার্বতীপুরে গৃহবধুকে ফের ধর্ষণ।' মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীকে ধর্ষণের ৪ ধর্ষক, যাদের রাজনৈতিক পরিচয় বিএনপি কর্মী তাদের কাউকে পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি।

দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে জয়লাভের মধ্যে যে অভিসম্পাত আছে তার প্রমাণ পাওয়া গেলো বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের অবস্থা দেখে। যেখানে যত ধর্ষণ, খুন, ছিনতাই, গোলাগুলি তারও দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ক্ষেত্রে আছে ক্ষমতাসীন দলের লোকজন। এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এদের যে আগামীতে পোষ মানানো যাবে তার সম্ভাবনা ক্ষীণ। একই সঙ্গে পুলিশ প্রশাসন একেবারে পোষমানা প্রভুভক্ত জীব হয়েছে। তাদের যে হুকুম করা হচ্ছে তাই তারা লেজ নেড়ে পালন করছে। তারা আজ্ঞাবাহী জীবে পরিণত হয়েছে। এর সবেচেয়ে বড় প্রমাণ শামসুন্নাহার হলের ঘটনাগুলো। পুলিশ মিথ্যা মামলা করেছে এ কথা তদন্ত

কমিশনের বক্তব্য থেকে জানা গেছে। ঘটনা ঘটার আগেই তারা মামলা নিয়েছে। এর উত্তরে হয়তো পুলিশ প্রশাসন বলবে যে, আগের সরকার আমলে তারা একইভাবে উপরের আজ্ঞা পালন করেছে। নাগরিক সমাজের প্রশ্ন হবে, তারা কার সেবা করার চেষ্টা করবে-সরকারের না জনগণের? তাদের মধ্যে যদি এ সম্পর্কে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকে তাহলে তাদের মনে করিয়ে দেয়া প্রয়োজন তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব। সংবিধানে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে ঃ 'সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য' [২১(২)]। তাদের সব সময় মনে রাখা প্রয়োজন, যেমন প্রয়োজন প্রশাসন যারা চালান তাদের যে, সাংবিধানিকভাবে বলা হয়েছে ঃ 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে হইবে' [৭(১)]। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে।

আইনের শাসন যদি রাষ্ট্রে থাকে তাহলে পুলিশ বা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হবে জনগণের স্বার্থে কাজ করা। কোন দলের স্বার্থে নয়। সিভিল সার্ভিসের কোন রাজনৈতিক দলের আজ্ঞা বহন করার দায়িত্ব নয়। তারা যদি সরকারি দলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করে, যা জনগণের স্বার্থে নয়-তাহলে তারা সংবিধান লংঘন করে। অতি সম্প্রতি পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠেছে। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় পুলিশ প্রশাসনসহ রাষ্ট্রের প্রশাসনযন্ত্র চলে। জনগণের স্বার্থ ও সরকারি দলের স্বার্থ এক নাও হতে পারে। এই সত্য উপলব্ধি করেছে জনগণ প্রতিনিয়ত। সরকারের হুকুম প্রশাসন মানতে বাধ্য যতক্ষণ তা জনগণের স্বার্থে। সরকারি হুকুমে যদি মেয়েদের হলে পুলিশ গভীর রাতে গেটের তালা ভেঙে মেয়েদের ওপর আ□মণ করে তাহলে তার দায়-দায়িত্ব পুলিশ প্রশাসনকে বহন করতে হবে।

ছবি রানী মণ্ডলকে দেখতে গিয়েছিলেন আওয়ামী লীগ প্রধান ও সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী। তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন ছবি রানীর চিকিৎসার ব্যাপারে। তিনি বলেছেন, প্রয়োজনে তিনি ছবি রানীকে বিদেশে পাঠিয়ে চিকিৎসা করাবেন। শেখ হাসিনা যখন কলারোয়ায় যাচ্ছিলেন মুক্তিযোদ্ধার ধর্ষিত স্ত্রীকে দেখার জন্য, তখন তার গাড়ি ব্যারিকেড দিয়ে আটক করা হয় এবং গুলি ছোড়া হয়। স্থানীয় সাংবাদিকরা এই সন্ত্রাসীরদের ভয়ে থানায় আশ্রয় নেন। সেখানে এই সন্ত্রাসীদের নেতৃত্ব দেন একজন বিএনপি নেতা। সেখানে সাংবাদিকদের গালিগালাজ এবং মারপিট করা হয়।

বর্তমান সরকারের প্রশাসনযন্ত্র বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। সরকার দলীয় সন্ত্রাসীরা যে বীভৎসতার জন্ম দিয়েছে এবং দিচ্ছে, তার দায়-দায়িত্ব সরকারি দলকেই নিতে হবে।

যুগান্তর, ৭ সেপ্টেম্বর ২০০২

সংখ্যালঘু নির্যাতনের বর্বরতা কখন থামবে?
মাহমুদুল বাসার

নৌকায় কি শুধু হিন্দুরাই ভোট দিয়েছে? মুসলমানরা দেয়নি? পত্র-পত্রিকায় তো দেখেছি অনেক বিএনপি নেতা 'জয়বাংলা' বলে ধানের ধীষ ছেড়ে নৌকার বৈঠা ধরেছেন। অনেক হিন্দু নেতা নৌকা থেকে নেমে পায়ে হেঁটে ধানের শীষ নিয়ে নির্বাচন করেছেন, জয়ী হয়েছেন, মন্ত্রীও হয়েছেন। তাহলে সংখ্যালঘু নর-নারীর ওপর এমন পাশবিকতা নেমে এলো কেন? এই বর্বরতার উৎসমূল কোথায় তা একটু তলিয়ে দেখা দরকার।

জিন্নাহ সাহেবের দ্বিজাতিতত্ত্ব এমন এক আগাছা যে তা সম্পূর্ণ উৎপাটন হবার নয়। আগাছার বৃদ্ধি বেশি। স্বাধীনতার ৩০ বছর পর দ্বিজাতিতত্ত্বের আগাছা এমন বৃদ্ধি পেয়েছে যে, বাংলাদেশের আবহমান মানবপ্রীতির উর্বর জমিন এখন আগাছায় পরিপূর্ণ।

৩০ লাখ শহীদের রক্তেভেজা বাংলাদেশের মাটি থেকে সাম্প্রদায়িকতার শেকড়বাকড় উৎপাটনের কাজ হয়নি। সেই শেকড় থেকে গিয়েছিল '৭১-এর পরাজিত গোষ্ঠী আত্মার মধ্যে, নাড়ির মধ্যে। তা বিষবৃক্ষরূপে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর, পরিবর্তিত রাজনৈতিক পটভূমিতে।

জিয়া, এরশাদ, খালেদা জিয়া তিনজনই রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক উস্কানি ব্যবহার করেছেন। শুধু সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ছেঁটে ফেলেননি; ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষকে পর্যন্ত তারা সাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন। পরিবেশের চাপে শেখ হাসিনাও ধর্মের লেবাস পরতে, ধর্মের জিগির তুলতে বাধ্য হন। পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়ালো যে, জনগণের ভেতরে অসাম্প্রদায়িক চেতনার চোখা, প্রখর রূপটি ভোঁতা হয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় উপনীত হয়েছে। তা না হলে ২০০১ সালের ১ অক্টোবর নির্বাচনের পর নৌকায় ভোট দেবার অপরাধে নির্বিরোধী, নিরীহ, নম্র হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর যে পাশবিক অত্যাচার নেমে এসেছে সাধারণ মানুষ কেন এই বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে না?

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, যে আওয়ামী লীগকে ভোটটি দিয়ে অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে সংখ্যালঘুরা সেই আওয়ামী লীগও নির্যাতিতদের রক্ষার ব্যাপারে ভূমিকা পালন করেনি বা করতে পারছে না। আওয়ামী সংগঠনের এটা একটি অবক্ষয় বলে মনে হচ্ছে।

২০০১ সালের নির্বাচনে যে কোন কৌশলেই হোক নিরঙ্কুশ বিজয়ী বিএনপি সংখ্যালঘুদের ওপর এতটা হিংস্র হয়ে উঠলো কেন? বেগম জিয়া বলেছিলেন, 'আওয়ামী লীগকে ৫০ বছরের মধ্যে ক্ষমতায় আসতে দেয়া হবে না।' হ্যাঁ, সেই ব্যবস্থাই তো হয়েছে। এরপরও এমন জিঘাংসাবৃত্তি জাগলো কেন?

বিএনপির নেতা-নেত্রী ও মন্ত্রীরা যতই অস্বীকার করার চেষ্টা করুণ না কেন সংখ্যালঘুদের বুকফাটা আর্তনাদে আকাশ-বাতাস, প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লজ্জায় আধোবদন হয়েছে, মানবতা ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছে। সবচেয়ে জঘন্য বর্বরতার ব্যাপার হচ্ছে নারী ধর্ষণের প্রসঙ্গটি। জাতীয় দায়িত্বশীল দৈনিকগুলোতে ধর্ষিতা, আর্তনাদরত নারীর ছবি ছাপা হয়েছে। মা, মেয়েকে পালা□মে ধর্ষণ করা হয়েছে, এমন খবর পাওয়া যাচ্ছে। প্রশাসন নির্বিকার ভূমিকা পালন করছে।

চরমোনাইয়ের মিস্ত্রিবাড়িতে তিন মহিলা ধর্ষিত হওয়ার খবর দিয়েছে দৈনিক সংবাদ। বলা হচ্ছে শনিবার গভীর রাতে ১০/১২ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী মিস্ত্রি বাড়িতে হানা দেয়। তারা বাড়িতে অবস্থানকারী চতুর্দশী মেয়েকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যাবার পর তিন ব্যক্তি ধর্ষণ করে।

সন্ত্রাসীরা ৩৫ বছর বয়স্ক ৪ সন্তানের জননী গৃহকর্ত্রী এবং তার চলি-শোর্ধ্ব স্বামী পরিত্যক্ত ননদকে পর্যায়□মে ধর্ষণ করে' (১৫-১০-২০০১)।

দৈনিক জনকণ্ঠ জানাচ্ছে যে, 'সংখ্যালঘু নারী ধর্ষণের উন্মাদনায় মেতেছে সন্ত্রাসীরা। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মহিলাদের রাতের ঘুম হারাম, নির্বাচনোত্তর ধর্ষিতা ৫০' (৩০ আশ্বিন ১৪০৮)।

ফেনীর চেয়েও জঘন্য ভয়াবহ সন্ত্রাসের জনপদে পরিণত হয়েছে এখন বাগেরহাট। বাগেরহাটে চলছে সংখ্যালঘুদের ওপর সীমাহীন উৎপীড়ন এবং নারীধর্ষণ। খবরে বলা হয়েছে যে, গত ৯ অক্টোবর রাতে কোড়ামারা গ্রামের নারায়ণ দাসের বাড়িতে হানা দিয়ে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকার লুটে নেয়। এ সময়ে তারা স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ির সামনে নারায়ণ দাসের পুত্রবধূকে গণধর্ষণ করেছে। হাজার কাকুতি মিনতি উপেক্ষা করে ২০/২৫ জন সন্ত্রাসী বধূটির ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায়' (জনকণ্ঠ, ৩০ আশ্বিন ১৪০৮)।

মন্দির ও প্রতিমা ভাঙচুরের খবর পাওয়া যাচ্ছে প্রতিদিন। ভিটামাটি ত্যাগ করে ভাবতে চলে যাওয়ারও হুমকি দেয়া হচ্ছে। খাবার পাওয়া যাচ্ছে অনেক সংখ্যালঘু পরিবারই ব্যাংকের একাউন্ট ক্লোজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। তারা নীরবে ভারতে চলে যাবেন।

সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে বর্তমান সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী ও নেতা-নেত্রীরা সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের বাস্তবতাকে অস্বীকার করার চেষ্টা করছেন, না হয় আমতা আমতা করে স্বীকার করছেন, না হয় চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী আওয়ামী লীগকে দোষারোপ করছেন।

নির্বাচনে পরাজিত হয়ে আওয়ামী লীগ তার ভুলের মাসুল গুনছে। কিন্তু এতবড় বিজয়ের মুকুট মাথায় নিয়েও বিএনপি সন্ত্রাসীদের দ্বারা আ□ান্ত সংখ্যালঘুদের জীবনের নিরাপত্তা, জানমাল ইজ্জত এবং সম্ভ্রমের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। বিএনপির যে যুব ক্যাডাররা অস্ত্রবাজি করে ভোট সংগ্রহ করে দিয়েছে তারাই নারী ধর্ষণ করছে, সংখ্যালঘুদের উৎখাত করছে, তাদের জীবন বিষিয়ে তুলেছে। বিএনপির মন্ত্রীদের বিনম্র, তৃপ্ত, মিষ্টি প্রতিবাদের তোয়াক্কা যেমন প্রশাসন করছে না, তেমনি সন্ত্রাসীরাও করছে না। সন্ত্রাস চলছেই তার নিজস্ব গতিতে। কবে কখন এই বর্বরতা থামবে তা কেউ বলতে পারছে না

সংবাদ, ২১ অক্টোবর ২০০২

২০০১ সাম্প্রদায়িকতা

ফজলুল বারী

সাম্প্রদায়িকতা আর ধর্মীয় সংখ্যালঘুর ওপর হামলা-এসব ছিল বিগত বছরে জাতির লজ্জার শিরোনাম। ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর বছরটিতে দেশের বিভিন্ন এলাকায় যত্রতত্র হামলা হয়েছে। ধারণা করা হয়, একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের পর এক বছরে এত হামলার ঘটনা এর আগে বাংলাদেশে আর ঘটেনি। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতার দিক থেকে ঘটনাগুলো ছাড়িয়ে গেছে একাত্তরকেও। এসব হামলায় মুক্তিযুদ্ধে দেশ স্বাধীন হবার ত্রিশ বছর পর এসে শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক কারণে নাগরিকদের অনিবার্য অংশ হিন্দু সংখ্যালঘু সদস্যদের আবার প্রাণ গেছে, সম্ভ্রম গেছে অসংখ্য নারীর। লুট-তছনছ হয়েছে তাদের বাড়িঘর, সম্পদ। আগুনে বাড়িঘর পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে সংখ্যালঘু উলে-খযোগ্যসংখ্যক পরিবারকে দেশত্যাগে পর্যন্ত বাধ্য করা হয়েছে। বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক শাহরিয়ার কবির রাজনৈতিক কারণে ভাগ্যবিড়ম্বনার শিকার সীমান্ত অতি□ম করা এসব দেশান্তরী সংখ্যালঘুর নির্মম জীবন কাহিনীর সেলুলয়েড বন্দী ফুটেজ সংগ্রহে ছুটে গিয়েছিলেন ভারতে। দেশান্তরী পরিবারগুলোকে ফিরিয়ে আনার নাম-উদ্যোগ নেই। দেশে ফেরার পর উল্টা সরকার তাঁকেই 'দেশদ্রোহী', 'রাষ্ট্রদ্রোহী' অপবাদ দিয়ে আটক করেছে। বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর নামে কারাগারে বন্দী রেখে তাঁকে এখন নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। বিএনপি-জামাতের জোট সরকার ক্ষমতায় বসার পরই স্বীকৃত খুনীদের, এমনকি সাংবাদিক শামসুর রহমান হত্যা মামলার চার্জশীটভুক্ত আসামীদেরও একের পর এক জামিনে মুক্তি দেয়া হচ্ছে। শাহরিয়ার কবিরের মতো একজন দেশবরেণ্য সিনিয়র সাংবাদিক, সাহিত্যিককে জামিনও দেয়া হচ্ছে না। আন্ত র্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সে জন্য শাহরিয়ার কবিরকে বাংলাদেশের 'বন্দী বিবেক' আখ্যা দিয়ে তাঁর নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেছে।

মধ্য জুলাইতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে দেশ জুড়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা শুরু হয়। অন্তর্বর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শিথিল প্রশাসন, নির্লিপ্ত আচরণের সুযোগে তখন যে পরিস্থিতির সূত্রপাত হয়, নির্বাচনী ডামাডোলে নষ্ট রাজনীতির প্রচার-প্রপাগাণ্ডায় তা আরও উৎসাহিত, বেপরোয়া হয়েছে। মনে করা হয়, এর অন্যতম একটি কারণ ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নীতিনির্ধারকদের মধ্যে শুরু থেকেই এমন একটি ধারণা প্রতিষ্ঠা করা হয় যে দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুমাত্রই সদ্য ক্ষমতা থেকে বিদায় নেয়া রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের ভোটার অথবা সমর্থক শ্রেণী। আর এবারে নতুন অন্তর্বর্তী দায়িত্বপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিশেষ উদ্দেশ্য বা দৃষ্টিভঙ্গিটি ছিল এমন যে, সরকারি দায়িত্ব থেকে সদ্য বিদায় নেয়া রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ সংশি-ষ্ট বা তার সমর্থক গোষ্ঠীকে বিব্রত, বিপর্যস্ত করাই যেন ছিল নিরপেক্ষতার মাপকাঠি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর কয়েক ঘন্টার মধ্যে সচিব পর্যায়ে রদবদল থেকে শুরু করে প্রশাসনে বদলি ঝড়, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী-সমর্থক এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের ওপর হামলা-নির্যাতন-সবকিছুই 'বিনি সুতোর মালার' মতো ঘটে গেছে একই সূত্রে। দেশের রাজনৈতিক পটভূমি, সর্বশেষ কিছু সমীকরণ-মেরুকরণের বিষয়াদিও সংখ্যালঘুদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা-নির্যাতনকে উৎসাহিত-প্রভাবিত করেছে। আওয়ামী লীগ এবং তার রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সমর্থক-শরিকদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত-অপসারণের উদ্দেশ্যে সংগঠিত চারদলীয় জোটের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় নির্বাচনী জোটও হয়েছে। রাষ্ট্রক্ষমতায় শরিক হবার লোভে এই

জোটে বিএনপির সঙ্গে প্রথম থেকেই অবস্থান করছিল স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ উদ্দেশ্য বিরোধী মৌলবাদী সংগঠন জামায়াত ইসলামী, কট্টর তালেবানপন্থী সংগঠন ইসলামী ঐক্যজোট এবং এরশাদের সামরিক শাসনের সুবিধাভোগী জাতীয় পার্টির একটি খণ্ডাংশ। এদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোটের মতো শরিকদের ধরে রাখতে বিএনপি তাদের সম্ভাবনাময় পুরনো কিছু আসনও বিনা দ্বিধায় ছেড়ে দিয়েছে। নির্বাচনের আগে আরেক ধর্মীয় মৌলবাদী নেতা চরমোনাইর পীরের আট দফা একটি কর্মসূচীও মেনে নেয় বিএনপি। যাতেও ছিল একটি ধর্মীয় মৌলবাদী কর্মসূচীর চরম কিছু সুড়সুড়ি। নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে নিজস্ব বক্তব্যে স্বয়ং বেগম খালেদা জিয়াও মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তিকে তোষণের নীতি সরাসরি অনুসরণ করেন। জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল এবং বর্তমান সরকারের মন্ত্রী আলী আহসান মুজাহিদ ছিলেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের বেশকিছু নির্বাচনী ট্যুরের সফরসঙ্গী। বেগম জিয়ার উপস্থিতিতে জামায়াত নেতারা বিভিন্ন নির্বাচনী জনসভায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর প্রকাশ্যে চরম আক্রমণাত্মক বক্তব্যও দিয়েছেন। কারণ তাঁরা আগেভাগেই ভালভাবে জানতেন, ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা তাঁদের ভোট দেবে না বা তাঁদের তারা নিরাপদও মনে করে না। যেমন পিরোজপুরে বেগম জিয়ার উপস্থিতিতে নির্বাচনী জনসভায় দেয়া বক্তৃতায় জামায়াতের বিশেষ আলোচিত-সমালোচিত কট্টর মৌলবাদী নেতা এবং ওই এলাকার প্রার্থী দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, 'এখানে ভোট হবে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে। হিন্দুরা বলে তারা অত ভোটার, আসলে তাদের তথ্য ঠিক নয়। তাদের মোট ভোটার সংখ্যা আসলে অত এবং মুসলমান ভোটার সংখ্যা আড়াই লাখ।'বেগম খালেদা জিয়ার মতো বিশিষ্ট, গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নেত্রীর সামনে এ ধরনের একটি সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্য দেয়া থেকে সেদিন দেলওয়ার হোসাইন সাঈদীকে কেউ বিরত করার চেষ্টা করেনি। উল্টা করতালির মাধ্যমে তাঁকে বাহবা দিয়েছে। নির্বাচনে সেখানে সাঈদী বিজয়ীও হয়েছেন। জয়-পরাজয়ের এই গণতান্ত্রিক রীতিনীতির বিষয়টি কিন্তু সেখানেই থেমে থাকেনি। সাম্প্রদায়িক উস্কানিসমৃদ্ধ নির্বাচনী প্রচার-প্রপাগাণ্ডার অনিবার্য পরিণতিতে ভোটের পর সেখানকার গ্রামে গ্রামে সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর ওপর হামলা-নির্যাতনের খড়গ নেমে এসেছে। বরিশাল, পিরোজপুর, বাগেরহাটসহ বিভিন্ন অঞ্চলের নির্যাতিত সংখ্যালঘু অনেক পরিবার আত্মরক্ষার্থে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ার রামশীল নামের একটি গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল। পত্রপত্রিকার সরেজমিন প্রতিবেদনের গুনে পাদপ্রদীপের আলোয় উঠে আসে দুর্গম এলাকার সেই অখ্যাত গণ্ডগ্রাম রামশীল।

কিন্তু সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ, এমনকি স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর এই হামলা-নির্যাতনের বিষয়গুলোকে অসত্য, অতিরঞ্জন, অপপ্রচার বলে উড়িয়ে দেন। দুর্গত এলাকা দেখার নাম করে ঢাকা থেকে অনুগত মিডিয়ার সাংবাদিকদের নিয়ে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রামশীল না নেমে হেলিকপ্টার থেকে সেই গ্রাম দেখে এসে উল্টা সত্যানুসন্ধানী অন্যসব মিডিয়াকে দোষারোপ-অভিযুক্ত করে বলেছেন, তারা রামশীল নাটক সাজিয়ে সংখ্যালঘু নির্যাতনের কল্পকাহিনী প্রচার করছে। অতএব সরকারী মহলের এ ধরনের অর্বাচীনের মতো ভূমিকার কারণে সংখ্যালঘুদের ওপর দেশ জুড়ে নির্যাতনের বিষয়টি আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। কারণ এই নির্যাতন হয়রানির সঙ্গে সংখ্যালঘুর সম্পত্তি দখললাভের মতো অর্থনৈতিক লাভালাভের বিষয় জড়িত ছিল। সরকারী রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় পরিকল্পিত সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাদের বাড়িঘরে হামলা, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ, লুটতরাজ- এসবের মাধ্যমে সখ্যালঘুদের ভীতসন্ত্রস্ত, ভিটামাটি ছাড়া করার বাতিকটি জোরদার হয় সারা দেশে। এসব বাতিকের অংশ হিসাবে সিরাজগঞ্জের উল-াপাড়ার পূর্ণিমার মতো ধর্ষিত তরুণীদের সৃষ্টি হয় সারা

দেশে। সৃষ্টি হয় ভোলার লাজপাতার মতো গ্রাম ট্র্যাজেডিসমূহের। ফেনী, লক্ষিপুর থেকে শুরু করে বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলও বাদ থাকেনি হামলা-আক্রমণের তালিকা থেকে। আবার সামাজিক-রাজনৈতিক সমর্থনের অভাবে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে নির্যাতনের ঘটনা তুলনামূলক কম ঘটেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব শ্বেতসন্ত্রাসের শিকার ভিটামাটি ছাড়া নির্যাতিত সংখ্যালঘুরা স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে রিপোর্ট-মামলা করার সাহস-সময়ও পায়নি। থানায় যেহেতু মামলা নেই সেহেতু পুলিশের দেয়া তথ্য অনুসারে পুলিশমন্ত্রীও জোরের সঙ্গে বলেছেন ঘটনা ঘটেনি, ঘটনা ঘটলে তো মামলা হতো-এসব অপপ্রচার ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপরও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা-নির্যাতনের ঘটনা লুকোচাপা দিয়ে রাখা যাচ্ছিল না। জান বাঁচাতে তাদের দেশত্যাগের ঘটনা শুরু হবার পর। সাতক্ষীরা থেকে শুরু করে দিনাজপুর-পঞ্চগড় পর্যন্ত সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে নির্যাতিতরা যেভাবে পারছিল দেশত্যাগ করছিল। দেশত্যাগের সময় অনেক পরিবার ওই সময় দু'দেশের সীমান্তরক্ষীদের হাতে ধরাও পড়েছে। বিএসএফের গুলিতে প্রাণও গেছে অনেকের। বিডিআরের হাতে ধরাপড়া এসব দেশান্তরী হতে ইচ্ছুকদের নিয়ে বিশেষ কিছু পত্রিকায় তখন অন্য রকম রিপোর্টও ছাপা হয়েছে। ওইসব রিপোর্টে বলা হয়েছে এরা আসলে বাংলাদেশী নয় ভারতীয়। নির্বাচনের আগে জাল ভোট দিতে এপারে এসেছিল। ভোটের পর ওপারে ফিরে যাবার সময় ধরা পড়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তার পরও যখন দেশান্তরী নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের নিয়ে নানা রিপোর্ট ছাপা হতে থাকে বিভিন্ন বিদেশী মিডিয়ায়, তাতে পশ্চিমবঙ্গের রাজপথে এদের নিয়ে প্রতিবাদী মিছিল হয়। বিষয়টি গড়ায় ভারতের লোকসভা-রাজ্যসভা পর্যন্ত তখন লুকোচাপার সুযোগটি আরও সীমিত হয়ে আসে। বিবিসির ঢাকা অফিসের এক সিনিয়র সাংবাদিকও নির্যাতিত দেশান্তরী সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর সঙ্গে আলোচনা, তাদের অবস্থা নিয়ে রিপোর্ট করার জন্য ওই সময় পশ্চিমবঙ্গে যান। হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন নিয়ে অতঃপর সরকার বিশেষ বেকায়দায় পড়ে গত দুর্গাপূজার সময়। দুর্গাপূজা বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। কিন্তু নির্বাচনোত্তর দেশ জুড়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হয়রানি-নির্যাতনের প্রতিবাদে সম্প্রদায়টির কেন্দ্রীয় নেতারা প্রথমে পূজা বর্জন করে অনাড়ম্বর পরিবেশে উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন সরকার থেকে আড়ম্বরপূর্ণ উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে জোরজবরদস্তিমূলক আচরণ-তৎপরতাও দেখানো হয়। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারদলীয় নেতৃবৃন্দ বাদক দল, আলোকসজ্জার আয়োজন-প্রস্তুতি নিয়ে হাজির হন পূজামণ্ডপে। তাঁদের এসব কিছু গ্রহণে বাধ্যও করা হয়। পূজা সাড়ম্বরে হচ্ছে তা দেখাতে এই প্রথমবারের মতো কুটনীতিকদের হেলিকপ্টারে করে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলা-উপজেলা শহরের বিশেষ কিছু মণ্ডপে। মুখে না বললেও এর মাধ্যমে সরকার প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেয় নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় দেশ জুড়ে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অস্তিত্ব, যা কমে এসেছে বা আর হচ্ছে না, এটা দেখাতেই তারা এই প্রথম এ উপলক্ষে কুটনীতিকদের নিয়ে গেছে ঢাকার বাইরে। এত কিছুর পরও দুর্গাপূজার সময় দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে।

নির্বাচনোত্তর পরিবেশে নির্যাতিত, বাস্তুচ্যুত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে কিভাবে সাহায্য করা যায়, ভরসা দেয়া যায়-এর একটি পথ খুঁজে বের করতে ঢাকায় বিশিষ্ট নাগরিকরা একটি বৈঠকেও বসেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুষ্ঠিত সেই বৈঠকে নির্যাতিত সম্প্রদায়টির বিক্ষুব্ধ কয়েক সদস্য আইন করে বাংলাদেশের ভোটার তালিকা থেকে সংখ্যালঘু ভোটারদের বাদ দেয়ার প্রস্তাবও করেছেন। সেখানে তাঁদের বক্তব্য ছিল অভিজ্ঞতাটি হচ্ছে বাংলাদেশের একেকটি নির্বাচন মানেই তো সংখ্যালঘুদের ওপর নতুন বিপদ-হামলার ঝুঁকি নিয়ে আসে। কাজেই সংখ্যালঘুরা আর ভোট দিতে চায় না। ভোটের সাংবিধানিক নাগরিক অধিকারের নামে

তারা এভাবে বার বার ক্ষতিগ্রস্ত, সর্বস্বান্ত হতে চায় না। শুধু নিরিবিলি তার জন্মভূমিতে বেঁচে থাকার অধিকার চায়। এ ধরনের একটি প্রস্তাবকে সাধারণভাবে সংশি-ষ্টদের ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ক্ষোভ বলে মনে করা হলেও এর থেকে দেশের সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক-মানসিক অবস্থান সম্পর্কে একটি ধারণা করা হয়। বিশিষ্ট নাগরিকদের ওই বৈঠকে সমস্যার প্রতিকারমূলক নানা বিষয়-প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা একটি আহ্বায়ক কমিটিও হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের অনেক সমস্যা-সীমাবদ্ধতার মতো এক্ষেত্রেও কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়নি। গত নির্বাচন দেশের রাষ্ট্রক্ষমতার মালিকানা পরিবর্তনকে উপলক্ষ করে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষতিগ্রস্ত হবার আলোচনা-প্রচারণার বিষয়টিও এর মাঝে মিইয়ে এসেছে। জাতির বিবেক বলে কথিত নাগরিক-বুদ্ধিজীবী সমাজও সে জন্য এ ইস্যু নিয়ে এখন আর আগের মতো সংগঠিত-সা্িয় নয়। এই সুযোগে 'বন্দি বিবেক' শাহরিয়ার কবিরকে সংখ্যালঘু নির্যাতনের রাজনৈতিক মদদদাতা-প্রতিভূ বর্তমান রাষ্ট্রযন্ত্র 'দেশদ্রোহী, 'রাষ্ট্রদ্রোহী' শিরোনামে তো হেনস্তা করতেই পারে এবং তারা তা ভালভাবেই করছে। কিন্তু এসবের মাধ্যমে ২০০১ সালের ললাটে সাম্প্রদায়িক হামলা, নির্যাতনের বছর হিসাবে যে শিরোনাম-তিলকটি লেখা হয়ে গেছে ভবিষ্যতের দায় থেকে তার মুক্তি নেই।

বিধ্বস্ত মানবতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৩

"সব জিনিসের শেষ আছে নেই মানুষের অধিকারের"
ওয়াহিদুল হক

সবাই জানে এদেশের মানুষেরা বড়ই অপ্রপরায়ণ হয়ে পড়েছে। এই সেদিন একাত্তরেও এমনটা ছিল না। শহর থেকে পলায়নরত অন্তরী উচ্চম্মন্য, শহুরে স্বচ্ছলতা ও অভ্যাসের লক্ষ্য মানুষকে নিজের জীর্ণ কুটিরে আশ্রয় দিয়েছে। গ্রামের মানুষ, বাড়ির মুরগী সব শেষ করে অতিথি সৎকার করেছে পরম সঙ্কোচভরে। সাহেবরা বাবুরাও তাদের পক্ষে ভেবেছেন, দেশে এমন সোনার মানুষ, আমাদের অবহেলায় এত কষ্টে থাকে, আহা! ফিরতে যদি পারি, জীবনের ধারা বদলে ফেলব, 'সুখদুখ সমভাগ করে নেব মোরা সবাই।' ঠিক তিন দশকে দেশের কোটি মানুষ ভুলেই গেল 'মোরা সকলেই ভাই।' এক থেকে আর কেবল বিচ্ছিন্ন হল না, প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি বিদ্বিষ্ট হল বিষম। নানা কারণে সারাক্ষণ অপরের প্রতি অনিষ্ট চিন্তা ও আচরণ বাড়তে বাড়তে ঠেকলো এসে আজকের এই মিনি-একাত্তরে, বাঙালির ওপর বাঙালিকে লেলিয়ে দেওয়া এই একাত্তরের নবসংস্করণে।

সেই যে কবে বৈভবের ওপর ব্যক্তির পারিবারিক কিংবা একক স্বত্ব, অন্তত কুড়ি হাজার বছর আগে, কৃষি ও স্থায়ী বসবাস অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে এসে মানুষকে স্বার্থসচেতন করে তুললো, তারপর থেকে মানুষে মানুষে চলেছে শ্রেণী বৈষম্য, অর্থাৎ শ্রেণীর উচ্চাবচতা। মানব সমাজের একটি ধ্রুবক দাঁড়ালো অর্থনৈতিক শ্রেণীগত শোষণ। তার থেকে হাজার হাজার বছর ধরে অন্যসব পীড়ন দাঁড়াল। কিন্তু অর্থনীতিই শোষণবৈষম্যের একমাত্র ভিত্তি কখনোই ছিলনা। বিজয়ী সংখ্যালঘু আর্য বিজিত সংখ্যাগুরু অনার্যকে তাঁবে রাখবার জন্যে সমাজকে চতুরাশ্রমে উঁচু-নিচু চার-ঠাঁই করল। তিন হাজার বছর এই শোষণবঞ্চনা ভিত্তিক ভাগ প্রবল পরা্মে চলবার পরে, বিংশ শতাব্দী এসে বর্ণবৈষম্যহীন পাশ্চাত্যের শ্রেণীবৈষম্য সর্বস্বতার অভিঘাতে বর্ণব্যবস্থাকে দন্তনখরহীন করে তুলল। শুদ্রপুত্র নারায়ণ ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন। বাংলায় কে যে ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথ, বাঁড়ুজ্জে-বামুন), কে যে বসু (জগদীশচন্দ্র, সৎকায়স্থ), কে যে সাহা (মেঘনাদ, উচ্চবর্ণ নয়), কে যে শীল (ব্রজেন্দ্রনাথ ক্ষৌরকারকুলে জন্মেও সকলের আচার্য) বিংশ শতকের গোড়ায়ই তা অর্থহীন হয়ে পড়ে। বিংশ শতক অর্ধেক পেরোতে না পেরোতে শূদ্র-অন্ত্যজের ঢল নামে অভঙ্গ বঙ্গ সমাজের উপরিতলে। পাকিস্তান, বাংলাদেশ কালেও বর্ণাশ্রম দ্বারা 'এক্সক্লুডেড' লোকেরা সমানে 'ইনক্লুডেড' হতে থাকল। কিন্তু শোষণবঞ্চনার এই কল দুর্বল হলে, পাকিস্তান নামের অন্য প্রবল কলে কিছু কাল দাপটে চলে সেও বিদায় হলে শোষণবঞ্চনা কী কমে গেল? বস্তুর লয় হয় না, রূপান্তর হয় মাত্র। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে পূর্বাংশকে পশ্চিমাংশ যেভাবে আঞ্চলিকতা দিয়ে শুষে ছিবড়ে করে ফেলল তার কাছে সাম্প্রদায়িক অর্থনৈতিক পীড়নের ব্যাপারটি গৌণ হয়ে গিয়েছিল। (বাংলাদেশ হওয়াতে, পাকিস্তান অপসৃত হলে, অর্থনৈতিক লোভ লালসা সাম্প্রদায়িকতাকে ভর করল। প্রধানত বাঙালিকে বাঙালিরই শোষণ, আরম্ভ হল সাম্প্রদায়িক ভিন্নতার দোহাই দিয়ে। যেন এক জাতি আরেক জাতিকে, স্বদেশীয় বিদেশীয়কে নিপীড়ন করছে, যেমন ব্রাহ্মণে এককালে করেছিল শূদ্রকে। মুসলমান নামের সম্প্রদায় সংখ্যাগুরু সংখ্যাগুরু চিল-াতে চিল-াতে নিজেকে জাতি বলে কল্পনা করে ফেলল। হিন্দু সম্প্রদায়কে বানাল অন্য এক জাতি, যেন তারা সত্যিসত্যি গারো চাকমাদের মত নৃতাত্ত্বিকভাবেই অন্য কিছু। এবং এদেশে বহিরাগত। এই কল্পিত বাঙালি মুসলমান জাতি রইল বাংলা রাষ্ট্রের কেন্দ্রটি জুড়ে, আর সব জাতিই হল প্রান্তিকীকৃত। সম্প্রদায় ফুলে ফেঁপে জায়গা রাখল না রাষ্ট্রে সম্প্রদায় বহিঃস্থ কোটি কোটি মানুষের জন্যে। ফলে তাদের জন্য করা হল 'সরো নয় মরো' এই নীতি। এথনিক ক্লিনজিং। জিয়াউর রহমান যখন বাঙালিকে বাংলাদেশী বলে নামকরণ করলেন তখনকার তাঁর চিন্তাটা ছিল এই। তা না হলে বাঙালি "জাতিতে" তার কোন অসুবিধা হবার কথা ছিল না। এই ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, নৃতত্ত্বসম্মত সংস্কৃতিতে স্বাস্থ্যপ্রদ আগমণ-নির্গমণের সদাতৎপর লক্ষ ফুটো সংবলিত বাঙালিত্ব তাঁর পক্ষে পরিত্যাগ করে ভেক ধারণ করবার প্রয়োজন ছিলনা। কিন্তু তিনি বাংলাদেশিতা নাজেল করলেও, সব বাঙালির পক্ষে তো তাতে ঈমান আনা সম্ভব হলনা। বিশেষ করে যারা নিজ দেশেই পাকিস্তানী আমল থেকেও অধিক 'এক্সক্লুডেড' হয়ে পড়ল। সর্বনাগরিক মেনে চলতে বাধ্য যে চূড়ান্ত জিনিসটি-সংবিধান-তার কপালে এঁটে দিলেন ভিন জাতীর ভাষায় একটি অনুষ্ঠানারম্ভের ধর্মীয় মন্ত্র-যে ধর্ম বাংলাদেশের সকলের নয়। যতবার এই সংবিধানকে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, প্রকৃতিপূজক অজ্ঞায়াবাদী মানবিকতাধর্মী নাস্তিক্যধর্মী মানছে ততবার সে নিজ ধর্ম ও বিশ্বাস, নিজের জীবন পথকে লঙ্ঘন করছে। কিংবা মানছে বলে বলছে, মানছে না। অথচ ওই সংবিধান থেকে বেরোচ্ছে আইন যা অনিঃশেষ মান্যতার মধ্যে সমাজকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রাষ্ট্র বলে একটা আকৃতি দিচ্ছে-ভালোর জন্যে হোক মন্দের জন্যে হোক।

হ্যাঁ সেই জিয়া সংবিধানকে আদালত ছাড়া খুব কমই নাগরিক মেনেছে। আল-াহর নামে আরম্ভ করা সংবিধান মুজিব হত্যাকারীদের আশ্রয় দিল অনন্তর, এ রাষ্ট্রকে সত্বর ঘোষণা দিল সাম্প্রদায়িক বলে। কিন্তু কিছুতে কিছু হয়না, জীবন চলে, দিন চলে যায়-এক অপরিবর্তনীয় ধারাবাহিকতায়-হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান মানিয়ে নিয়েছে নিজেদের কিছু যায় আসে না মার্কা অবহেলা দিয়ে। বাংলারই অন্তরে বৈচিত্রসাধক নানা জাতিসত্তা আছে, প্রকৃতই এক্সক্লুডেড-তারা নিজেদের সরিয়ে রাখলো এইমত সব মানববিরোধী ষড়যন্ত্রকে অবজ্ঞা তুচ্ছতা দিয়ে।

জিয়া এরশাদ খালেদা গণবিরোধী উর্দিধারী-উর্দি মোল-ামৌলবীরও আছে, এবং তারাও গণবিরোধী-ঈশ্বরের নামে শঠতা ছলচাতুরী করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশ চায়-এই সমস্ত প্রচণ্ড সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, মুজিব-হত্যালীলা সত্ত্বেও এক্সক্লুডেড মানুষ সরলোও না, মরলোও না। সালাম দিতে শিখলো, খোদা হাফেজ আল-া হাফেজ করতে শিখল, সর্বত্র মালাউন শব্দ শুনতে শুনতে সর্বক্ষণ বুকের ভিতর জখম হতে হতে তারা তবু থাকল।

কেন থাকে? আর কোন অষুধ চাই? কলেমাটা পড়লেই কিন্তু ল্যাঠা চুকে যায়। যা করে পূর্বপুরুষ মরেও নি, সরেনওনি। এই তৃতীয় সহস্রাব্দের বাঙালি, বাংলাদেশে অমুসলিম নাগরিক তাও করতে চায় না। অথচ বৌদ্ধরাও তা করেছিল। পালিয়ে গিয়েছিল কিন্তু বাকিরা হিন্দু বনে নিজের জায়গায় নিজেদের জীবনচর্চা বজায় রেখেছে। বিকাশও পেয়েছে বৈকি-কিন্তু এ আপদ তো নতুন কালের-যখন রাষ্ট্রের সংবিধান থাকতে হয়, তাতে থাকতে হয় আপন আপন ধর্মপরিচয়ে তিষ্ঠে থাকার অধিকার, নিজেদের ভাবন-চিন্তন বিশ্বাস কথায় বা লেখায় প্রচার করবার অধিকার। এখানকার হিন্দু বৌদ্ধ তথা অমুসলিম বাঙালি নাগরিকের কথা, আমরা ধর্ম কতটা করি বা না করি, কতটুকু করি সে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু ধর্ম পরিচয়ের কারণে বৈষম্যের শিকার না হতে চাওয়া আমার এই কীটদষ্ট সংবিধান দ্বারাও স্বীকৃত অধিকার। আমাকে কেন ধর্মান্তর করে দেশে থাকতে হবে। আমি কেন কোন অবস্থায়ই সম অধিকার ভোগকারী নাগরিক হতে পারবো না?

আমি কি বাঙালি নই? এদেশে বসবাসকারী বাঙালি এবং অন্য সকলের জন্যেই এই দেশের জন্ম হয়নি কি? নাকি কেবল মুসলমানের জন্যে হয়েছে? আমরা কি রক্ত দিইনি দেশসৃষ্টিতে, দেশরক্ষার্থে? তোমাদের চাইতে বেশি দিয়েছি, হে ক্ষমতাধর নীতিহীন লোভী মানুষের দল। আমার পূর্ণ অধিকার এই রাষ্ট্রের নাগরিক হবার ন্যায় ও বিচার পাবার, বাঙালি হিসেবে, হিন্দু বৌদ্ধ-খ্রিস্টান চাকমা তথা সকল অমুসলিম পরিচয়ের মানুষ হিসেবে বিকশিত হবার, প্রসারিত হবার। কে আমাকে মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করবে? সে সকলি আমার রাষ্ট্র আমার জন্য নিশ্চিত করেছে যা পারেননি জিয়াউর রহমানের মত প্রতিভাবান অ্যাডভাঞ্চারার (বাংলা জানিনা) তা পারলেন তাঁর সুন্দরী বেগম। সুন্দরী বলেই তিনি বাংলার নারীদের কাছে প্রিয়, আমার চোখে যতই নিকট হোন। সুন্দরের কথাটা এখানে প্রসঙ্গ□মেই এসেছে। তিনি সারা জীবন আরো আরো সুন্দর হবার সাধনা করেছেন, সমাজের রাষ্ট্রের সৌন্দর্য তাঁর ভাবনার বিষয় ছিলনা। যখন জিয়ার উত্তরাধিকারিনীকে, আওয়ামী ও বাঙালি বিরোধীদের পড়ে পাওয়া ধন হিসেবে, রাজনীতিতে আনা হল, সৌন্দর্যচর্চা বিঘ্নিত না করেও তিনি আরেকটি জিনিসের চর্চার দিকে মন দিলেন, দিতে হল তাঁকে। ক্ষমতা। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। যা কিনা আল-ইহর ক্ষমতার পরেই। রাষ্ট্র তিনি বোঝেন না, ক্ষমতা খুব বোঝেন। তাই সহজেই ধরতে পারলেন ক্ষমতায় যাবার পথটি। জনগণের মঙ্গলের বুলিগুলি লিখবার জন্যে ভাড়াটে লোক যথেষ্ট আছে, এই কই মাছের ঝাঁক বাঙালিকে দমন করবার ক্ষমতা কারো নেই। তিনি লেখালেন সব ভালো ভালো কথা, গেলেন ক্ষমতা খাটানোর পথে। কি উদ্দেশ্যে খাটাবেন তা? উদ্দেশ্য ছাড়াও ক্ষমতা খাটাবার একটা নিজস্ব বিশুদ্ধ আনন্দ তো আছেই, যত পিউডাল আনন্দ সবার আনন্দ। কিন্তু খালেদার ও তার অনুবর্তীদের একটা উদ্দেশ্যও ছিল। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা তথা একটা সমাজতন্ত্র প্রবণতাগ্রস্ত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক (সকলের সমঅধিকার) যারা করেছিল, সুযোগসুবিধার পাকিস্তান (পবিত্রভূমি) কে ভেঙে, সেই মানুষগুলির মূল সংগঠনকে ভেঙে, তাদের সহযোগীদের মাথায় সুযোগ সুবিধার বিষ ঢুকিয়ে বাংলাদেশকে কার্যকরভাবে অ-বাংলাদেশে পরিণত করা ও এটাকেই এদেশীয় বাঙালি ও সকল জাতি সম্প্রদায়ের চিরন্তন ভবিতব্য বলে প্রতিষ্ঠা করা।

রাস্তাটা জিয়াউর রহমানও চিনতেন কিন্তু তিনি এগোচ্ছিলেন ধীরে ধীরে। এরশাদও সে পথেরই লোক। আর জামাত তো এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশকে নাম না বদলিয়েও অন্তত ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করবার জন্যে-সউদী আরব, ব্রুনাই, লিবিয়া ও ইরানের আদর্শে। কিন্তু রাস্তায় মস্ত কাঁটা বিছানো- এই দেড় দুই কোটি হিন্দু-মরিয়া না মরে রাম এ কোন বৈরী? খালেদা, সব দোষ কিংবা কৃতিত্ব বোধ করি তাঁর ওপরে চাপানো ঠিক নয় কারণ আমার চোখে তিনি অত্যল্প প্রায় তরুণী বয়সেই যেন মানসিক অশক্তির কবলে পড়ে (যাকে ইংরেজিতে সেনিলিটি বলে) যাচ্ছেন □মে, তবুতো এই শক্ত কাঁটা উপড়াবার শক্ত কাজটি করবার শক্তি এবং সাহস—

এবং অজ্ঞতা-সকলেই একসঙ্গে ধারণ করেন।

নতুন সহস্রাব্দেই নির্বাচন-দেশটা চলেছিল ভালোই, যে নতুন সরকার গড়বে তার জন্য রইলো একটা চ্যালেঞ্জ— এরও চাইতে ভালোতর বাংলাদেশ উপহার দেবার। কিন্তু খালেদা সে পথে গেলেন না। ‘মুসলমানের দেশ বাংলাদেশ’ এই দেশের প্রধান শত্রু আওয়ামী লীগকে উচ্ছন্ন করতে হবে। অন্তত পঞ্চাশ বছর তারা যেন ক্ষমতার মুখ না দেখে। এ রকম একটা স্বপ্ন রাজতন্ত্রে দেখা যায়, আর যায় কম্যুনিস্ট রাজ্যে। সে তো তা হলে হবে না এখানে। হবে হবে। ধন্বন্তরীও এমন অষুধ জানতেন না। ডলুনি।

ডলুনিতত্ত্বের বিস্তৃত তাত্ত্বিক ও প্রয়োগপদ্ধতি সংবলিত থিসিস এর উদ্ভাবক কিংবা উদ্ভাবকেরা প্রয়োগবিশারদের কিংবা সুফলভাগীরা করবেন। আপাতত এর প্রয়োগে রীতিমত মুগ্ধ হয়ে আমি দু'লাইন এর সম্বন্ধে বলে এই আবোল-তাবোল শেষ করবো।

১. হিন্দুদেরকে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায়ই আ□মণ করতে হবে। করবে জামাত বিএনপি মাস্তানেরাই। কিন্তু তারা সংখ্যায় নগণ্য সেখানে। আ□মণের সুফল দেখে যেন সাধারণ মুসলমানেরা বাধাতো দেবেই না, আ□মণে যোগ দেবে সকলেই।

২. মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় এ ঘটনা ঘটলে হিন্দু প্রতিবেশীকে রক্ষা করতে মুসলমানদের এগিয়ে আসবার সম্ভাবনা খুবই বেশি। এই আ□মণকে রাজনৈতিক চেহারা দিতে হবে কিছু নৌকা মার্কা মুসলমানকে মেরে ফেলে।

৩. হিন্দুদের মারা চলবে না পারতপক্ষে, তা হলে সহজেই তা দাঙ্গার চেহারা নিতে পারে। মূর্তি ভাঙবে, মন্দির দখল করবে, জমিজমা বাড়িঘর বাগান ও পুকুর অবশ্যই দখল করা যাবে। কিন্তু এইগুলিতে সবাইকে ভাগ দেওয়া যাবে না। যে টোপটায় প্রতিবেশী সকলেই এগিয়ে যাবে সে হল মোক্ষম। হিন্দু কিশোরী যুবতী, প্রয়োজনে যৌবনোত্তীর্ণ প্রৌঢ়া-ধর্ষণ করা যাবে, এক যোগে। জানতাম রাজনৈতিক ব্যাপারে ধর্ষণকে হাতিয়ার করেছিল খ্রিস্টান মিলোশেভিচ। বসনীয় মুসলিম তরুণীদেরকে হাতে হাতে কার্ড ধরিয়ে দিয়েছিল। সেখানে লেখা ছিল কবে কোথায় হাজিরা দিতে হবে প্রতি সপ্তাহে ধর্ষিতা হবার জন্যে। এই ছিল আমার কাছে মানুষের প্রতি মানুষের অমানবিকতার পরাকাষ্ঠা। এতদিন। পরশুই কাগজে পড়লাম ধর্ষিতা মা আকুল আবেদন করছেন ‘আমার মেয়েটা ছোট, তোমরা, দুই তিন জনের বেশি একসাথে ওকে ধরো না। পালা করে যাও।’

৪. থানায় থানায় যোগ্য লোক দেওয়া থাকবে, মামলা নেবে না এসব হিন্দুরা বেশি বলাবলি প্রতিবাদ এই জাতীয় কিছু করলে তাদের থামাবে তারা। কেউ খোঁজ খবর নিতে এলে তারাও হবে তালিকাভুক্ত।

অপারেশন ডলুনি সফল হয়েছে। তবু আরো চলবে। এরি মধ্যে হিন্দুরা মুখ বন্ধ করেছে, হিন্দু দালালেরা পৃথক নির্বাচনের কথা ছুড়ে দিয়েছে আকাশে। এবং সারাদেশের প্রায় সর্বত্র হিন্দুরা বলছে, ভোটে যাব না, ভোটের অধিকার থেকে আমাদের বাঁচান, আমরা শুধু বাঁচতে চাই, এদেশে থাকতে চাই।

এবং হিন্দুরা মরার সুযোগ না পেলেও সরার সুযোগ করে নেবেই— এ বিষয়ে খুব দ্বিমত নেই। বিএনপি জামাত খালেদা সাকা চৌ'র স্বপ্ন বুঝি তাতে সফল হবে। একাত্তরে উত্থিত বাংলাদেশের হবে তাতে অপমৃত্যু। তাতে কার কী এসে যায়? এই তো এরা সকলে চাইছেন। ক্ষতি হবে এদেশটার, নাম তার যাই হোক। ক্ষতি হবে মানুষের-সংস্কৃতির।

দায়িত্বশীলতা বলে মানবজীবনের এক অবশ্য অনুষঙ্গ আছে। এই উদ্ধত ক্ষমতামদমত্ত দায়িত্ব জ্ঞানহীন কুচ□ী মানুষগুলো কতদূর যাবে? হিটলার কতদূর গেছিলেন? তালিবান?

বিধ্বস্ত মানবতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৩

9

পাহাড়ের কথা ঃ ভূষণছড়ার ট্র্যাজেডি

এস এইচ মং মারমা

অনাবিল আনন্দ আর অপরূপ স্নিগ্ধতার পরশে গড়ে ওঠা সুন্দর সাজানো সংসারটি হঠাৎ একটি ঝড়েই এলোমেলো হয়ে গেলো। নিমিষেই ধ্বংস হয়ে গেল পাহাড়ের সবুজের কোলে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা বরুণ কুমার চাকমার পরিপাটি সংসারটি। কী না ছিল তার। পার্থিব সম্পদ ছাড়াও ছিল সুন্দর একটা কোমল মন। যে মন জুড়ে থাকতো কলে-ালিত ঝরনা, বিস্তীর্ণ উন্মুক্ত প্রান্তর, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বহুদূর বিস্তৃত অতুলনীয় সৌন্দর্যের সবুজ প্রকৃতি, আর সব কিছুকে ছেয়ে সমান্তরাল আঁকাবাঁকা একটি নয়নাভিরাম স্রোতস্বিনী নদী। মমতাময়ী স্ত্রী, ফুটফুটে দুই বাচ্চা-এক ছেলে এক মেয়ে নিয়ে অতিশয় সুখী ছিল সে।

কিন্তু সে সুখ তার বেশিদিন সইলো না। নষ্ট সময়ের নোংরা রাজনীতি এসে তাকে খুবলে খেলো। অকালেই প্রতিহিংসার কবলে পড়ে ঝরে পড়ল আদিবাসী দম্পতি বরুণ কুমার আর স্ত্রী সুবর্ণ চাকমার ছোট্ট সুখী পরিবারটি। অথচ পাহাড়ি বাঙালি এমন কেউ অবশিষ্ট ছিল না- তার সহায়তা চেয়ে পায়নি কিংবা কারোর দুঃখ-কষ্টে তার মন কেঁদে ওঠেনি। তাই তো অনায়াসে পাহাড়ি বাঙালি ছেয়ে সুদূরবর্তী অঞ্চল থেকে আসা পাহাড়ে পুনর্বাসিত সেটেলার বাঙালিদের সঙ্গে গভীর সখ্য গড়ে ওঠে তার।

আজ থেকে বছর কয়েক আগে কোনো অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে বরুণের সঙ্গে সেটেলার শহীদুল, এমদাদ, ইব্রাহিম ও আলী আহমেদের। এমন স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিক সম্পর্ক, যে কারোর বিপদে-আপদে, দুঃখ-কষ্টে, যে কোনো দুর্দিনে প্রচণ্ড সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসতো একে, অপরে। অকৃপণ সান্নিধ্যে এসে। হয়তো মাঝে মাঝে এমন মানসিকতার জন্য অনেক খেসারত দিতেও হয়েছে তাকে। তবে সবচেয়ে চরম এবং অন্তিম যে খেসারত দিতে হয়েছে তার থেকে উত্তরণের বিকল্প কোনো পথ আর ছিল না। মাত্র ৩০টি বসন্ত পেরুনোর আগেই নিভে গেলো একটি তরুণ দম্পতির প্রাণ প্রদীপ। রয়ে গেলো ফ্যাল ফ্যাল নির্বাক চেয়ে থাকা দুটি অবোধ শিশু। কিন্তু এমন তো হওয়ার কথা ছিল না; কথা ছিল আর ১০টি শিশুর মতো নিষ্পাপ শিশু দু'টি বেড়ে উঠবে। হেসেখেলে গহীন পাহাড়ের কোলে নিশ্চিন্তে বেড়ে উঠবে। কী অপরাধ ছিল এ অবোধ শিশু দু'টির। কেন এমনটি হলো? এর জন্য দায়ী কারা?

ঘটনার অন্তরালে লুকিয়ে আছে অনেক অনেক গভীরে প্রোথিত বেদনাবিধুর যন্ত্রণার নির্মম কাহিনী। যে কাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতা সুদূর রাজ অন্দরমহল থেকে আরম্ভ করে দুর্গম পাহাড়ের পাথুরে মাটি পর্যন্ত বিস্তৃত।

মনে পড়ে আজ থেকে ২০টি বছর আগে রাঙ্গামাটির বরকল থানার ভূষণছড়ার নিরিবিলি গ্রামগুলোতে কী অমানবিক ও বীভৎস ঘটনাগুলো ঘটেছিল।' ৮৪-র সেই রক্তবন্যায় নদীর দুকূল বেয়ে গড়ে ওঠা ছোট ছোট পাহাড়ি গ্রামগুলো পুরো নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। পুরো প্রজন্ম নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। সেদিন তাদের ডাকে কেউ সাড়া দেননি, তাদের চিৎকারে কেউ এগিয়ে আসেননি। মানবতা কেঁদে ওঠেনি, বিবেক নাড়া দেয়নি কারোর। না কোনো প্রগতিশীল সাংবাদিক, না কোনো সহৃদয়বান লেখক এবং না কোনো উদার মানবাধিকার কর্মী। আর রাষ্ট্র ছিল পুরো নিশ্চুপ, নির্বিকার। '৮৪ সালের গণহত্যার সেই রক্তবন্যায় বরুণ কুমারের পিতা দীপেন্দ্র চাকমাও ভেসে গিয়েছিল আর কোনো দিন ফিরে আসেননি।

আবারো ভূষণছড়ার ধন্ধছড়া গ্রামে এমনিই একটি করুণ ব্যথাতুর ঘটনা ঘটে গেছে গত ৩ আগস্ট। ঘটনাটি নেহায়েত ছোট্ট মনে হলেও এ নিয়ে পঙ্কিল রাজনীতির অপপ্রয়োগের যথেষ্ট

সম্ভাবনা আছে। ঘটনাকারীদের রয়েছে দীর্ঘদিনের রক্তে রঞ্জিত কালো নগ্ন থাবা, রাষ্ট্রের অকুণ্ঠ সমর্থন। তাই অতিশয় সাবধানতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে সামাল দেয়া অতি প্রয়োজন। নতুবা সামান্য ঘটনাটি বৃহৎ আকার ধারণ করতে পারে।

ঘটনাটি ছিল এরকম। দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের সুবাদে বছরখানেক আগে বন্ধু আলী আহমেদের দুর্দিনে তাকে ইঞ্জিনচালিত একটি পুরোনো বোট চালাতে দিয়েছিল বরুণ। সময়ের আবর্তে নিজের অবস্থা যখন গভীর সংকটাপন্ন তখন নিতান্ত বাধ্য হয়ে বোটটি ফেরত চায় সে। বোটের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে মালামাল স্থানান্তরের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কাজে নিজেকে জড়াতে শ্বশুরবাড়ি থেকে ৮০ হাজার টাকা আনে বরুণ। তাই নিজের দুঃখ-দুর্দশার কথা, শ্বশুরবাড়ি থেকে টাকা আনার কথা সবিস্তার জানিয়ে অনতিবিলম্বে বোটটি ফেরত দিতে অনুরোধ করে বরুণ। এদিকে বোটটি ফেরত চাইতে গিয়ে বরুণের সঙ্গে শহীদুলের মনোমালিন্য হয় এবং মনোমালিন্য শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড ঝগড়ায় রূপ নয়। অবশেষে ২ দিন পরে বোটটি ফেরত দিতে সম্মত হয় আলী আহমেদ।

অন্যদিকে বোট ফেরত দিয়ে স্বয়ং বেকার হয়ে যাওয়া আর নগদ ৮০ হাজার টাকার লোভে পড়ে হয়তোবা মাথায় খুন চেপে বসে আলী আহমেদের। তারপর কোনো এক জ্যোৎস্না রাতের গভীর অন্ধকারে ঘুমন্ত বরুণের ওপর তার বাড়িতে দা, কিরিচ, বল-ম নিয়ে এলোপাতাড়ি আ□মণ করে। বরুণের চিৎকার, চেচামেচি শুনে স্ত্রী সুবর্ণ চাকমার ঘুম ভেঙে যায় এবং হুড়মুড় করে ছুটে এসে আ□মণকারীদের নিচে ফেলে। ফলস্বরূপ তাকে জীবন দিতে হয় আ□মণকারীদের দা'র কোপের আঘাতে। আ□মণকারী পরিশেষে দু'জনকে কুপিয়ে মেরে মাচানে রেখে বিস্তীর্ণ জমির ছোট আল বেয়ে তাড়াহুড়া করে এমদাদ, শহীদুল, ইব্রাহিম ও আলী আহমেদসহ ক'জন পালিয়ে যায়। তবে পালানোর সময় হৈ-হুলে-াড়ে পড়ে যাওয়া পরিস্থিতি অবহিত হতে আসা বরুণের বড়ো ভাই অরুণ চাকমা ও তার স্ত্রী তাদের শনাক্ত করে ফেলে। পরক্ষণেই বরুণের বাড়িতে এসে রক্তাক্ত দেহ দেখেই তারা সম্পূর্ণ হতভম্ব ও হতবাক হয়ে পড়ে। চারিদিকে দায়ের কোপে রক্তাক্ত পড়ে থাকা বরুণ ও তার স্ত্রীর মাচানে গড়াগড়ি দেখে বিস্মিত ও থতমত খেয়ে যায় অরুণ ও তার স্ত্রী। বরুণ সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন থাকলেও রক্তক্ষরণরত মুমূর্ষু অবস্থায় মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে করুণের স্ত্রী সুবর্ণ চাকমা উলি-খিত চারজনের নাম জানিয়ে যায়। রক্তক্ষরণরত মারাত্মক অবস্থা দেখে তাদের স্থানীয় বিডিআর ক্যাম্পে নিলেও তাদের অসহযোগিতা ও অপারগতায় বিনা চিকিৎসায় মারা যায় বরুণ ও তার স্ত্রী।

আরো বড়ো নৃশংসতা অপেক্ষা করে যখন তাদের দুই অবোধ শিশুর একমাত্র ১১ মাসের শিশু কল্প চাকমা পর্যন্ত তাদের দায়ের কোপ থেকে রেহাই পায় না। তার ডান পায়ের হাঁটুতে মারাত্মক জখম হয়, যার চিকিৎসা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের সার্জারি বিভাগে সম্পন্ন হয়েছে। অপরজন ২ বছরের শিশুকন্যা উত্তরা চাকমা জবুথবু হয়ে মশারি আর কাপড়ের ভেতর সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছে। এমন মর্মান্তিক ও নৃশংসতার কথা ভাবলে গা শিউরে ওঠে।

তবে এর জন্য দায়ী অদূরদর্শী কালো রাজনীতি; যার ছোবলে পড়ে হাজার হাজার পাহ-াড়ি বাঙালিকে অকাতরে প্রাণ দিতে হয়েছে। কী অপরাধ ছিল এদের? যারা যুগ-যুগান্তর ধরে পাহাড়ে ছিল কিংবা যারা নদীভাঙা এলাকা থেকে, ভাসমান বস্তি থেকে, যাযাবর ভিক্ষাবৃত্তি থেকে পাহাড়ে পুনর্বাসিত হয়ে বসবাস করে আসছে। এদের তো অসহায় শিকার মাত্র। এর জন্য দায়ী অবিচক্ষণ, অদূরদর্শী এবং অনভিজ্ঞ নেতৃত্ব। যারা রাজনীতিকে ডিফিকাল্ট করার পাশাপাশি পাহাড়ের নিরিবিলি শান্তির জীবনকেই ডিফিকাল্ট করে তুলেছেন। এদের জন্যই গত দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে হাজার হাজার নিরীহ পাহাড়ি বাঙালিকে নির্বিচারে প্রাণ দিতে হয়েছে।

তাই তো বরকল থানার কলাবুনিয়া এলাকার বাজার কমিটির সভাপতি এক সেটেলার বাঙালি বলে ওঠেন, 'আমরা পাহাড়ে জমিজমা চাই না, জায়গা বাসস্থান চাই না, সমতলের মধ্যে যেন ভিক্ষা না করে দু'মুঠো খেয়ে বেঁচে থাকতে পারি সেরূপ ব্যবস্থা চাই।' কতটুকু ব্যথিত হলে একজন মানুষের মুখ থেকে এমন কথা বেরিয়ে আসে। এর তো কোনো অপরাধ নেই। এরা শুধু রাজনীতির হাতিয়ার মাত্র।

যারা পাহাড়কে উত্তপ্ত রেখে পরিস্থিতি ঘোলাটে করার নিরন্তর যোগানদাতা কিংবা যারা প্রতিনিয়ত ইন্ধন যুগিয়ে একটা গুমোট অবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে পাহাড়ে স্থায়ী সেনা ছাউনির যৌক্তিকতা প্রমাণে সদাসচেষ্ট তারাই নাটের গুরু। তাই তো শান্তি চুক্তির ছয়টি বর্ষ অতি□ান্ত হলেও পাহাড়ের বুকে বারবার অনাকাঙ্ক্ষিত এরূপ অনেক ঘটনা ঘটে চলেছে এবং হয়তো ভবিষ্যতেও আরো ঘটতে থাকবে।

অসহায়ভাবে মরতে হবে অনেক আরো বরুণ ও সুবর্ণ চাকমাকে। গহীন পাহাড়ে আমরা কি মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারি না? যার যার অবস্থান থেকে আমরা তো এগিয়ে আসতে পারি, তাদের জন্য- হোক না আদিবাসী পাহাড়ি, তারা তো এদেশেরই সন্তান, নিশ্চিহ্ন প্রায়। এর জন্য আরো কতো যুগ অপেক্ষা করতে হবে?

এস এইচ মং মারমা : আদিবাসী লেখক

বিধ্বস্ত মানবতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৩

ভোট, গণতন্ত্র ও মানবতা বিপর্যয়ের মুখে

মমতাজ উদ্দীন পাটোয়ারী

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্বাচন-উত্তর দেশের পরিবেশ-পরিস্থিতি আমাদের দেশের রাজনীতি, সমাজ ও জীবনবোধকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছে। যারা দেশকে নিয়ে ভাবেন তারা চারিদেকের পরিস্থিতি দেখে এতোখানি অসহায় ও বিধ্বস্ত বোধ করছেন— যা নিকট অতীতে খুব একটা চোখে পড়েনি। নির্বাচন মানেই তো জয়-পরাজয়ের বিষয়। এক পক্ষ জয়লাভ করবে, অন্যপক্ষ পরাজিত হবে— এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশেও গত ১০ বছরে তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে এক পক্ষ জয়ী হয়েছিলো, অন্যপক্ষ হতে পারেনি। পরাজিত পক্ষ সাময়িক পরাজয়কে মেনে নিতে পারেনি।

তারপরও সংসদে সরকারি ও বিরোধী দল অবস্থান নিয়েছে। আমাদের বিশ্বাস ছিলো এমনটি ঘটবে এবারো। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এবার বিজয়ী পক্ষ নির্বাচনে তাদের বিজয়কে যুদ্ধজয়ের বিষয়ের মতো করে ফেলেছে। তাদের আচরণ, কর্মকাণ্ড এমন পর্যায়ে চলে গেছে— যা নিয়ে ভাবতেই মানুষ দেশে ভোট, গণতন্ত্র, রাজনীতি ও মানবতা সম্পর্কে দারুণ হতাশ হয়ে পড়েন।

গণতন্ত্র উত্তরণের পথই হলো নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের রায় নেওয়া। খুব সততার সঙ্গে বললে বলতে হয় দেশে অনেক স্থানেই ভোটারগণ নির্বিঘ্নে, স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারেননি— সন্ত্রাসীরা রাতের বেলায় গ্রামে, মহল-ায় গিয়ে ভোটারদের হুমকি-ধামকি দিয়ে আসে। পছন্দের দলে বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ভোট পড়বে না জানা থাকলে তাদের ভোটদানকে বাধাগ্রস্ত করার সকল অপকৌশলই প্রয়োগ করা হয়। প্রশাসনকে নানাভাবে ব্যবহার করা, প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টকে বুথ থেকে তাড়িয়ে দেয়া, কিনে নেয়া, জাল ভোট দেয়া ইত্যাদি সবইতো এ

দেশে নির্বাচনে ঘটছে অবাধে। এই নির্বাচনেও অনেক আসনে, বহু কেন্দ্রে ঘটেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। দেখা যাচ্ছে দল বা প্রার্থী যেকোনো (অবৈধ) উপায়ে হলেও নির্বাচনে জিততে বদ্ধপরিকর থাকে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সুষ্ঠু অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন, ভোটারের ভোট তথা রায় কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নয়, আংশিক সত্য হতে পারে। আমরা জনগণের স্বাধীন বিবেচনা, রায় ও জনমতকে কোনো প্রকার প্রভাব বা বল প্রয়োগ না করে দেখার পরিস্থিতি এবারের নির্বাচনেও অনেক স্থানে তৈরি করতে পারিনি। এদিক থেকে আমাদের নির্বাচনকে একশব্দে 'অবাধ' বলে দেয়ার মতো নৈতিক শক্তি কারোরই নেই। যতোই দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষক দল 'নির্বাচন সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও অবাধ হয়েছে বলে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন না কেন। এটি মূলত বাহ্যিক দৃশ্য। কিন্তু নির্বাচন প্র□িয়ার ভিতরগত সত্যগুলোকে গ্রহণ করলে বিশ্বাস করতেই হবে যে, নির্বাচনে ব্যাপকসংখ্যক মানুষের রায় বা ভোট অনুপস্থিত থাকে, জাল ভোট কারো কারো জয়ের বা পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নির্বাচনে শক্তি প্রয়োগকারী দল, গোষ্ঠী বা সংস্থা ভোটারদের কিছু অংশকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করেও ফলাফলে হেরফের ঘটায়। এসব □মাগত বেড়েই চলছে। কালো টাকার খেলাও একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে নির্ভেজাল ভোট প্রদান, জনরায় দেখার সৌভাগ্য আমাদের হ্রাস পেতে বসেছে। এটি এবারের নির্বাচনে নগ্নরূপ লাভ করছে। কথা হচ্ছে, এভাবে বলতে থাকলে আগামী নির্বাচন বা পরবর্তী সময়ে সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন বাংলাদেশে কতোখানি সম্ভব তা নিয়ে এখনই গভীরভাবে সংশয় দেখা দিয়েছে। তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার মহৎ উদ্দেশ্যও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হতে যাচ্ছে— সে আশঙ্কাই এক কথায় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এতো গেলো নির্বাচনের এক দিক। অন্য দিকটিও আমাদের মন, চিন্তাকে দারুণ পীড়া দিচ্ছে। নির্বাচনে যেকোনো ব্যক্তি তার পছন্দের দল বা ব্যক্তিকে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেবেন। এতে কোন জোরজবরদস্তি গণতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সে জন্যই পর্দায় ঢাকা স্থানে ভোটারের ভোট দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। দলীয় কিছুসংখ্যক কর্মী, নেতা, সমর্থক ছাড়া কেউ বাহ্যিকভাবে বলতে পারবেন না যে, কার ভোট কোন প্রতীক বা দলের বাক্সে পড়বে। জানা গেলেও এ নিয়ে কারো সন্দেহ করা, প্রশ্ন করা অনৈতিক বলেই ভাবতে হবে। 'যার ভোট তার' এ নিয়ে মন্তব্য করা, প্রশ্ন করা গর্হিত অপরাধ বলেই আমি মনে করি। কিন্তু আমাদের দেশে আগ থেকেই পত্র পত্রিকায় 'ভোট ব্যাংক' সম্পর্কীয় খবরের কথা ছাপা হয়। কোনো কোনো দলও মনে করে থাকে যে, বিশেষ কোনো সম্প্রদায় বিশেষ কোনো দলের 'ভোট ব্যাংক'। আসলে কোনো সম্প্রদায় যদি কোনো দলকে এভাবে তাদের জন্য নিরাপদ মনে করে তাহলে তাতে দোষের কিছু নেই। হয়তো সেই দলের রাজনীতিতে সেই সম্প্রদায়ের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের কিছু সুযোগ রয়েছে। আমার কথা হচ্ছে, যারা ওই সম্প্রদায়ের কোনো বিশেষ দলের 'ভোট ব্যাংক' হিসেবে ভাবেন তারা কেন নিজ নিজ দলে ওই সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার, নিরাপত্তা বিধানের বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না? গণতন্ত্রে সকল মানুষেরই সমান অধিকার স্বীকৃত। গণতন্ত্র নিজেই অসাম্প্রদায়িক। কিন্তু কোনো দল যদি রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেয় তাহলে সংখ্যালঘু, আদিবাসীসহ বিভিন্ন ছোট-মাঝারি জনগোষ্ঠী কিভাবে সেই দলকে নিরঙ্কুশভাবে সমর্থন দেবে? ভারতে এক সময় মুসলমানগণ কংগ্রেস এবং বামফ্রন্টকে বিশেষভাবে সমর্থন দিয়েছে, রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বিজেপি ভারতের অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বদলে ফেলার ক্ষেত্রে বড় ধরনের চেষ্টা করেনি। ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিজেপির প্রতি আস্থা ফিরে আসতে শুরু করেছে। সম্প্রতি অনেক রাজ্যেই মুসলমানদের উলে-খযোগ্য একটি অংশ বিজেপিকেও ভোট দিচ্ছে। এটি আস্থা সৃষ্টির ব্যাপার। বাংলাদেশের বিএনপি দেশের সংখ্যালঘুদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টির কোনো কাজ না করে অতীতে তাদের

আওয়ামী লীগের 'ভোট ব্যাংক' বলে চিহ্নিত করেছে। এবার অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে দেশব্যাপী ক্যাডার ও সন্ত্রাসী বাহিনীকে অত্যাচার করতে সুযোগ করে দিয়েছে। **১৯৯০ এবং ১৯৯২** সালে বাবরি মসজিদকে কেন্দ্র করে একতরফাভাবে দেশের সংখ্যালঘুদের ওপর সন্ত্রাসীরা চড়াও হয়েছিল। তাতে গোটা দেশ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলো। আবার এবার নির্বাচন-উত্তর অসংখ্য সংখ্যালঘু পরিবার নির্যাতন, পাশবিকতা, নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছে। আমি একজন মানুষ এবং মুসলমান হিসেবে ভাবতেই পারি না নারী ধর্ষণসহ অমানবিক বিভিন্ন নির্যাতনকে এই সমাজ কেন এক কণ্ঠে ধিক্কার জানাচ্ছে না। পত্রপত্রিকায় লাঞ্ছিত সংখ্যালঘু পরিবারের যেসব সদস্যের লাঞ্জনার ছবি ছাপা হয়েছে তারা আমারই দেশের মানুষ ও নাগরিক। আমার যদি কোনো দলকে ভোট দেয়ার অধিকার থাকে, কেন একজন সংখ্যালঘু নাগরিকের তা থাকবে না। কেন সে তার ভোটের জন্য এভাবে আ□ান্ত হবে, সম্ভ্রম হারাবে, নির্যাতিত হবে— এ প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত কোনো উত্তর আমার জানা নেই। এবারের ভোট শেষ পর্যন্ত কেড়ে নিলো অসংখ্য মানুষের সুখ, শান্তি, নীড়, সম্ভ্রম, নিরাপত্তা, নাগরিক অধিকারসহ সব কিছুই। তাহলে ভোট কেন, গণতন্ত্র কেন? বলে দিলেই হয়, এ দেশের সংখ্যালঘুদের ভোটের কোনো প্রয়োজন নেই। সে কথাও বলা হচ্ছে না। আবার নৌকায়ও ভোট দেয়া যাবে না। ভোট দিলে খবর আছে, সবই যাবে এই যদি নীতি হয়, মনের অব্যক্ত কথা হয় তাহলে এ দেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন তা বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

এখন বলা হচ্ছে, সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষিত পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা চালু করার কথা ভাবা হচ্ছে। এ ধরনের চিন্তা-ভাবনাই প্রমাণ করে, সংখ্যালঘুদের দেশের অন্য নাগরিকদের মতো সমান মর্যাদা এবং অধিকার স্বীকার করা হচ্ছে না; এরা আলাদা কিছু এটিই স্বীকার করা হচ্ছে। আসলে সংরক্ষিত বা পৃথকভাবে সংখ্যালঘুদের জন্য নির্বাচনী ব্যবস্থা চালু করলেও এ ধরনের বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, নির্যাতন ও হয়রানি শেষ হবে বলে আমি মনে করি না। কেননা সেখানেও দলীয় প্রার্থী নির্বাচনের বিষয়টি আসবে। সে ক্ষেত্রেও ভোট কোনো না কোনো দলের পক্ষে তো দিতে হবে। বিএনপির সংখ্যালঘু প্রার্থী হেরে গেলে সংখ্যালঘুরা আরো চিহ্নিত হয়ে পড়বেন দলীয় নেতাকর্মী ও সমর্থকদের কাছে। কোনো এক বা একাধিক জনগোষ্ঠীকে এ ধরনের পরিস্থিতিতে ঠেলে দিয়ে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখা সুস্থ কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এবার নির্বাচন-উত্তর লক্ষ্য করা গেছে, শুধু সংখ্যালঘুরাই হামলা বা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তা নয়। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সমাজের ভোটারদের একটি অংশও কোথাও কোথাও বিএনপি কর্মী-সমর্থকদের দ্বারা আ□ান্ত হয়েছেন; বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগার হিসেবে তিরস্কৃত এবং কোণঠাসা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে— এটি স্বৈর মানসিকতার প্রকাশ। গ্রামাঞ্চলে বিভিন্নস্থানে এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা ঘটছে, ঘটে চলছে। বিএনপি হয়তো ধারণা করতে পারে যে, এভাবে আওয়ামী লীগকে দুর্বল করে দেয়া যেতে পারে, ভেঙ্গে দেয়া যেতে পারে। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের জ্ঞান যাদের আছে তারা স্বীকার করবেন, কোনো দলকে, তার রাজনীতিকে নিশ্চিহ্ন করার পাশবিক কোনো উপায় নেই, রাজনৈতিকভাবেই তা করতে হয়। মানুষ যখন কোনো দলের কাছ থেকে যথাযথ আচরণ পাবে, অন্য দলের চেয়ে যোগ্য নেতৃত্ব এবং প্রশংসনীয় কাজ পাবে তখন স্বেচ্ছায় সেই দলে যোগদান করবে, ভিড় করবে। গণতন্ত্রে সেটিই হচ্ছে স্বীকৃত পন্থা।

কিন্তু বাংলাদেশে যা কিছু ঘটছে রাজনীতিতে, ভোট ও গণতন্ত্রের নামে তাতে আর যাই হোক যুক্তি, আদর্শ, সততা ও মানবতার লালন, চর্চা খুঁজে পাইনা। বরং মনে হচ্ছে এই দেশ, এই সমাজ, এর রাজনীতির ধারক-বাহকগণ মানুষকে অবজ্ঞা, অবহেলা, নির্যাতন ও অপমান করে শুধু ক্ষমতা ও কর্তৃত্বই প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই পথ প্রকৃত গণতন্ত্রের নয়, ফ্যাসিবাদেরই।

ইতিহাস প্রমাণ করেছে, শেষ পর্যন্ত ফ্যাসিবাদ টিকে থাকতে পারেনি, মানবতারই জয় হয়েছে। বাংলাদেশেও আমরা আশা করবো বিএনপি এবং তার জোট সরকার গণতন্ত্রের সুস্থ পথে চলবে, জনগণকে আস্থা ও বিশ্বাসে নিয়ে রাজনীতি করবে, তা হলেই গণতন্ত্রের জয় হবে— জনগণের কল্যাণ হবে।

বিধ্বস্ত মানবতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৩

সাম্প্রদায়িকতা

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

বাংলাদেশে এক সময় ভয়ানক কিছু রোগের আধিপত্য ছিল-বসন্ত অথবা পোলিও যেমন, অথবা যক্ষা। এর কিছু নির্মূল হয়েছে, কিছু নির্মূলের পথে। সরকারি পরিসংখ্যান থেকে জেনেছি, যক্ষা বা ক্ষয়রোগের প্রকোপ এবং ব্যাপ্তি কমেছে। দিন যত যাবে, এ ধরনের ভয়ানক আরো অনেক রোগ থেকে হয়তো আমরা মুক্তি পাব। কিন্তু কিছু রোগ থেকেই যাবে এগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধটা চলবে বটে, কিন্তু জয়ী হওয়া কঠিন হবে। ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব এরকম আশ্বাসবাণী আমরা শুনে এসেছি গত ত্রিশ বছর ধরে। কিন্তু ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে আসেনি। বরঞ্চ মশার বংশ এবং শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। নতুন নতুন মশা নিত্যনতুন রোগ নিয়ে এসেছে। এখন পরিস্কার পানিতে জন্ম নেয়া, দিনের আলোয় উড়ে বেড়ানো মশার কামড়ে ডেঙ্গু জ্বর হয়ে মারা যাচ্ছে মানুষ। অর্থাৎ এক সময় যে শত্রু রাতের আঁধারে আ□মণ করত, এখন সে করছে দিনের বেলায়। বেপরোয়া হয়ে উঠেছে এই শত্রু। একে ধ্বংস করা সহজ নয়।

এই সব ভয়ংকর রোগের তালিকায় আছে আরেকটি অনিরাময়যোগ্য রোগ, যার নাম সাম্প্রদায়িকতা। ১৯৪৬-১৯৪৭, ১৯৬৪, ১৯৭১-এরকম কিছু প্রবল প্রকোপের বছরে এর আ□মণে হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে, ঘরবাড়ি পুড়েছে, নারীরা সম্ভ্রম হারিয়েছে এবং যারা বেঁচে গেছে তাদের অনেকে দেশান্তরী হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সফল সমাপ্তির পর স্বাধীন বাংলাদেশে এই রোগের আর পুনরাবির্ভাব সম্ভব নয় এরকম একটা আশাবাদ জন্মেছিল আমাদের মনে। এই রোগের জন্য যে সহায়ক পরিবেশ থাকার কথা, তা স্বাধীনতার পর মুহূর্তে বাংলাদেশে ছিল না। বস্তুত বাংলাদেশের সংবিধান এ-রোগ নির্মূলের জন্য চমৎকার কিছু ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিল। সভ্য সমাজের জন্য, সুস্থ্য মানবতার জন্য যে সবল শরীর প্রয়োজন, সেখানে সাম্প্রদায়িকতা-রোগের জীবাণু থাকলে চলবে না। ধারণা করা গিয়েছিল জীবাণু যদি থেকেও থাকে, তাহলে তার বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় অনুকূল জলবায়ু অনুপস্থিত ছিল স্বাধীন বাংলাদেশে।

সেটি যে ভুল ধারণা ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৭৫-এর আগস্টের পট পরিবর্তনের পর। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের বেশির ভাগ সদস্যের নির্মম হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে যে অমানবিকতার সূত্রপাত হল রাষ্ট্রীয় এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে, তার প্রভাবে অসাম্প্রদায়িক এবং উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যক্ত হল। বাংলাদেশের সংবিধান হারাল তার অসাম্প্রদায়িক চরিত্র; সংকীর্ণ দৃষ্টি ও ভেদবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হল; একাত্তরের পরাজিত পক্ষ এবং সামরিক ও ছদ্মবেশী সামরিক শাসন ও এক দলীয় স্বৈরশাসন রাষ্ট্রের অসাম্প্রদায়িক প্রতিটি পরিচিতিকে পাল্টে ধর্মভিত্তিক এবং সাম্প্রদায়মুখী পরিচিতিগুলোকে সামনে নিয়ে আসল। এভাবে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের অসাম্প্রদায়িক চরিত্রটি প্রশ্নবিদ্ধ হল।

বাংলাদেশের মানুষ মৌলিকভাবে কখনো সাম্প্রদায়িক নয়। কারণ এদেশের হিন্দু ও মুসলমান যুগের পর যুগ পাশাপাশি থেকেছে, একে অপরের জীবনে প্রবিষ্ট হয়েছে, সুখ দুঃখে একে অপরের অংশীদার হয়েছে। কিন্তু কিছু ধর্মব্যবসায়ী এবং ধর্ম নিয়ে রাজনীতিতে লিপ্ত মানুষ এই ঐতিহ্যের বিপরীতে দাঁড়িয়েছে। কোনো কোনো সময় এই রাজনীতিবিদ ও ধর্মব্যবসায়ীরা মানুষের মনে বিভ্রম ও সম্প্রদায়গুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে সফল হয়েছে, কিন্তু বেশিরভাগ সময় মানুষ তাদের মতলব বুঝতে পেরে প্রতিরোধ করেছে। এজন্য বাংলাদেশে একাত্তরের পর ব্যাপক আকারে কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। যেমন হয়েছে ভারতে। ভারতে প্রায় প্রতি বছরই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় এবং সেগুলিতে সংখ্যালঘু-প্রধানত মুসলমান-জনগোষ্ঠী নির্যাতনের শিকার হয়, তাদের হত্যা করা হয়। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর শিখ দেহরক্ষীর হাতে নিহত হলে সারা দেশে হিন্দু শিখ দাঙ্গা হয়। যাতে দু'হাজার শিখকে কুপিয়ে, পুড়িয়ে, গুলি করে মারা হয়। বাংলাদেশে এরকম পরিস্থিতি কখনো সৃষ্টি হয়নি। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে বাবরী মসজিদ ভাঙার ঘটনায় ভারতে যে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়, তার প্রভাবে বাংলাদেশেও দাঙ্গা হয়। (যার পেছনে একটি পত্রিকার উস্কানি অনেকটা দায়ী ছিল)। কিন্তু এটি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা সম্ভব হয়। কারণ তৎকালীন বিএনপি সরকার এ ব্যাপারে সজাগ ছিল যে, হিন্দুদের জান মালের কোনো ক্ষতি যেন না হয়। গ্রামের মুসলমান তার প্রতিবেশী হিন্দুকে আ□মণ করার কোনো কারণ খুঁজে পায়নি। বরং দাঙ্গাকারীদের প্রতিরোধ করেছে। হিন্দুদের মধ্যেও আস্থার অভাব ঘটেনি, তারা দেশান্তরী হয়নি। বরং এ কথা ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছে যে, সংক্ষিপ্ত দাঙ্গাটি ছিল একটি প্রতি□য়া, □িয়া নয়।

আমাদের স্মৃতিতে ওই দাঙ্গাটি ছিল অস্বস্তির একটি শেষ ঘটনা। এর পর ছোটখাটো ঘটনা যে কিছু ঘটেনি তা নয়। কিন্তু সেগুলো যতখানি সাম্প্রদায়িক তার থেকে বেশি অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক। মন্দির থেকে কষ্টি পাথরের মূর্তি চুরি করা আর দশটা চুরির মতই ঘটনা বরং বেশি লোভনীয়, যেহেতু একটি কষ্টি পাথরের মূর্তির দাম লক্ষ লক্ষ টাকা। মন্দিরের জমি দখলও একটি লাভজনক কাজ, যেমন স্কুলের জমি দখল করা। যদি সরকার উদ্যোগী হয়, পুলিশ উদ্যোগী হয়, তাহলে কষ্টি পাথরের বিগ্রহ এবং স্কুলের জমি উদ্ধার কঠিন কাজ নয়। সরকার যদি সেটা করে এবং অপরাধীরা শাস্তি পায়, তাহলে ব্যাপারটা সেখানেই চুকে যায়। এ ধরনের অপরাধও কমে। কিন্তু সরকার যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকে, তাহলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অসহায়বোধ বাড়ে, আস্থা কমে। অপরাধীরা আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। কোনো সরকারেরই উচিৎ হবে না এসব ব্যাপারে অবহেলা দেখানো। কিন্তু যদি দেখায়, তাহলে বুঝতে হবে কারণ আছে। সে সরকার অদক্ষ-সকল ক্ষেত্রেই ব্যর্থতা রয়েছে ওই সরকারের, মন্দিরের জমি উদ্ধারের বেলায় যেমন, স্কুলের জমি উদ্ধারের বেলায়ও তেমন; অথবা সরকার কোনো রাজনৈতিক বিবেচনায় ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত থাকছে। আর যদি তাই হয়, অর্থাৎ সরকার রাজনৈতিক কারণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর চালানো নির্যাতন প্রতিরোধ করে না, অথবা সে ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা ও তাদের শাস্তি দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে না। তাহলে পরিস্থিতির দ্রুতই অবনতি হয় এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রকোপ দেখা দেয়।

যেমন ঘটেছে ২০০১ খ্রিস্টাব্দে, বিশেষ করে ১ অক্টোবরে নির্বাচনের পর।

এবারে এক বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহে এক নির্মম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশে। এবং যে তিনটি কারণে এদেশে সাম্প্রদায়িকতার সূত্রপাত হত, তার সবগুলো কার্যকর হয়েছে। বলাবাহুল্য, তিনটি কারণের একটি যেখানে সংখ্যালঘু, বিশেষতঃ হিন্দু, সমাজের জন্য দু:সংবাদ নিয়ে এসেছে অতীতে, সেখানে তিনটি কারণের সন্নিবেশ কি রকম নির্মম হতে পারে সেটা শুধু ভুক্তভোগীরাই জেনেছেন।

গত কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশে উগ্রবাদীরা ধর্মকে নানা ধরনের পার্থিব কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করে এসেছে। উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে এদেশের বহু মুসলমান হিরোর আসনে বসিয়েছে। সেসময় থেকে বস্তুতঃ এক শ্রেণীর উগ্রবাদী ইসলামকে একটা জঙ্গী রূপে এদেশে হাজির করতে চেয়েছে। এক সময় এরকম একটা স্ে-াগান আমরা প্রচুর শুনেছি, 'আমরা হব তালিবান, বাংলা হবে আফগান।' তালিবানরা যে ইসলামের প্রয়োগ ঘটাত তাদের দেশে, সেটি ছিল তাদের মনগড়া ইসলাম। সেখানে মেয়েদের শিক্ষার অথবা কাজ করার অধিকার ছিল না। ভিন্ন ধর্মীদের কোনো অধিকার স্বীকৃত ছিল না এবং খেলাধুলা, কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার অথবা রাস্তায় জোরে হেসে আনন্দ প্রকাশও নিষিদ্ধ ছিল। বাংলাদেশে এই তালিবানী ইসলাম যারা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে, তারা এদেশের মানুষের ও সমাজের অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের বিরুদ্ধে জেহাদে নামবে, তা বলাই বাহুল্য। এবং ভিন্নধর্মীদের কোনো সুযোগ সুবিধা ও অধিকার দিতেও যে তারা নারাজ থাকবে, তাও এক প্রকার নিশ্চিন্ত। (অবশ্য এই উগ্রবাদীদের প্রকৃত ইসলামপ্রীতি কতটা, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, যখন দেখা যায় আফগানিস্তানে সাম্প্রদায়িক মার্কিন হামলার প্রতিবাদে দায়সারা গোছের স্ে-াগান দিয়ে মিছিল র‍্যালি করে, তালেবান ভাইদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেও তারা আফগাস্তিানে যুদ্ধ করতে না গিয়ে বহাল তবিয়তে বাংলাদেশেই বসে থাকল। ওসামা বিন লাদেন যখন গুহা থেকে গুহায় ফিরছেন এবং মার্কিন বোমারু বিমানগুলি বিরতিহীন বোমাবর্ষণ করে চলছে তার সম্ভাব্য সকল আশ্রয়স্থলে, তখন বাংলার তালিবানরা রাস্তায় একটা বড় মিছিল করেও তাদের □োধ প্রকাশ করছে না। বিষয়টা আমাকে অবাক করেছে।) আমার আশংকা, বাংলাদেশে পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে উগ্রবাদীরা যে অনেক তরুণকে বিভ্রান্ত করেছে গত নির্বাচনোত্তর সাম্প্রদায়িক সংঘাত তার একটি ফলিত রূপ।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তিন দশক জুড়ে চলতে থাকা নানা প্রচারণা। সেক্যুলারিজম বা অসাম্প্রদায়িকতা মানে ধর্মহীনতা এরকম একটি প্রচারণা সমাজের অনেক শিক্ষিত মানুষও চালিয়েছেন। সেক্যুলারিজম হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থাৎ কোনো ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোনো পক্ষপাতিত্ব না দেখানো। নিজ নিজ ধর্মের অনুসারীরা নিজেদের ধর্ম পালন করবেন, কেউ তাতে বাধা দিতে পারবে না; কিন্তু নিজ ধর্মকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে পারবে না। এ বিষয়টা অকারণে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। ফলে সাম্প্রদায়িক একটা পরিবেশ ধীরে ধীরে বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে। উগ্রপন্থী ইসলামি রাজনীতিবিদরা নিজেদের স্বার্থেই কাজটা করেছেন। এক্ষেত্রে ইসলামের দোহাই দেয়াটা স্বার্থের প্রয়োজনেই।

এই অবস্থায় রাজনৈতিক কারণ থেকে সৃষ্ট হানাহানি শীঘ্রই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপ নিতে পারে। বাস্তবে তাই ঘটেছে। বাংলাদেশের হিন্দুরা আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক এরকম একটি ধারণা থেকে নির্বাচনের আগে থেকেই (তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিন্দুদের উপর শুরু হওয়া আ□মণ ঠেকাতে পারলে নির্বাচনের পর পরিস্থিতি এতটা খারাপ হত না) তাদের ওপর নির্যাতন শুরু হয়। যদি হিন্দুরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ভোট কেন্দ্রে না যায়, তাহলে নির্বাচনে আওয়ামী প্রার্থী হারতে পারেন এই ছিল একটা হিসাব। নির্বাচনের পর পরাজিত আওয়ামী নেতারা অনেকেই পালিয়ে গেলেন, আর তারা পাঁচ বছর যে নির্যাতন করে গেছেন বিএনপির মানুষদের ওপর, তার বদলা নেয়ার একটা সুযোগ এল। রাগটা গিয়ে পড়ল আওয়ামী ভোট ব্যাংক অর্থাৎ হিন্দুদের ওপর। বিএনপির দায়িত্বশীল নেতারাও এটি থামাবার চেষ্টা করেননি। সরকার তো এই দোহাই দিয়ে বসে থাকল যে, যা হচ্ছে তা স্বাভাবিক, নির্বাচনোত্তর ঘটনা। রাজনৈতিক কারণটা যুক্ত হয়ে অবস্থাটা সংকটাপন্ন করে তুলল। এবং এর সঙ্গে অর্থনৈতিক কারণটাও যুক্ত হল। হিন্দুদের সম্পত্তি লুট, বাড়িঘর, দোকান পাট দখল চলতে লাগল এবং এসবের সঙ্গে যে আদিম অশুভ

গলা জড়াজড়ি করে চলে, তারও দেখা মিলল। নারীরা নির্যাতিত হল। ভিটেমাটি ছেড়ে অনেকে পালাল, দেশান্তরী হল।

যদি সরকার শক্ত হাতে শুরুতেই পরিস্থিতি মোকাবেলা করত, তাহলে অবস্থাটা এত করুণ হত না। কিন্তু সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার সেই বিখ্যাত কিছুটা সত্য, কিছুটা মিথ্যা, বাকিটা অতিরঞ্জন ধরনের উক্তি করে পুরো বিষয়টাকেই প্রায় অস্বীকার করে বসলেন। তার সঙ্গে যোগ দিলেন বিএনপির কর্তাব্যক্তিরা। তারা এখনও বলে যাচ্ছেন, সরকারকে বিপাকে ফেলার জন্য আওয়ামী লীগাররা এসব করছে।

এসব উক্তি এবং সরকারের নির্লিপ্ততা সন্ত্রাসীদের অভয় দিয়েছে। তারা এখনও হিন্দুদের ওপর আ□মণ করছে। এই আ□মণে হিন্দুরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত, যদি না দেশের মানুষ অসাম্প্রদায়িক না হত। সন্ত্রাসীদের বাদ দিলে সাধারণ মানুষ কেউ এই আ□মণে যুক্ত হয়নি। তারা নীরবেই প্রতিবাদ করেছে। সন্ত্রাসীদের সমর্থন না করাটাও এদেশে এখন একটা প্রতিবাদ।

এ কারণে এত কষ্টকর একটা অভিজ্ঞতার পরও আমি আশাবাদী। যেখানে সরকার নিস্পৃহ এবং সন্ত্রাসীরা পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ সমর্থন পাচ্ছে অনেক মহল থেকে সেখানেও ব্যাপকহারে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ঘটাতে তারা পারেনি, কারণ জনগণ থেকে কোনো সাড়া তারা পায়নি। সাধারণ মানুষই রক্ষা করছে সাধারণ মানুষকে। এটাই মস্ত এক ভরসা।

সাম্প্রদায়িকতাকে নিন্দা করলে, এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে মানবতার পক্ষেই তা যায় এই ছিল আমার ধারণা। কিন্তু শাহরিয়ার কবিরের বিষয়টি আমাকে ভাবিয়েছে। যাদের আ□মণে বিপর্যস্ত হয়ে হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে পালালো, তাদের কিছু হল না। কিন্তু ওইসব হিন্দুর সাক্ষাৎকার নিয়ে শাহরিয়ার হয়ে গেলেন রাষ্ট্রদ্রোহী। নিজের দেশের নাগরিককে মেরে দেশ ছাড়া করাটা দেশের জন্য লজ্জাকর নয়, তাদের পক্ষে কাজ করাটা দেশের ভাবমূর্তির জন্য ক্ষতিকর এই হচ্ছে বর্তমানের বাস্তবতা।

সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে লেখাটা কি তাহলে দেশদ্রোহিতা? নাকি সংবিধানে উলে-খ করা সকল নাগরিকের অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করে যাওয়া? কোনটা?

বিধ্বস্ত মানবতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৩

মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ

সোহরাব হাসান

বাংলাদেশে কোন কিছুই যখন রাজনীতি ও বিতর্কের উর্ধ্বে নয় তখন সদ্য সমাপ্ত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ শীর্ষক জাতীয় কনভেনশন নিয়েও বিতর্ক সৃষ্টি অস্বাভাবিক কিছু নয়। গণতান্ত্রিক সমাজে সকলের অবাধ বাক-স্বাধীনতা আছে। সে কারণে জনগণের একাংশ কনভেনশনটির প্রতি সমর্থন জানালে বাকিরা তার বিরোধিতা করতেই পারেন। সে অধিকার তাদের আছে। এই কনভেনশনটি সুশীল সমাজ আয়োজন করলেও এর মধ্যে কেউ কেউ আওয়ামী গন্ধ খুঁজতে পারেন। সুশীল সমাজের যে প্রতিনিধিরা কনভেনশনটি আয়োজন করেছেন, বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়েছেন তাদের অতীত ও বর্তমান নিয়েও চুলচেরা বিশে-ষণ করা যেতে পারে। প্রতিপক্ষ কারো কারো বিরুদ্ধে গুরুতর সুবিধাবাদিতারও অভিযোগ আনতে পারেন। সে নিয়েও আমার বলার কিছু নেই। এমনকি কনভেনশনস্থলে আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ কর্মীদের উটকো উৎপাতে কেউ কেউ বিরক্ত হয়েছেন সে কথাও অকপটে স্বীকার করি। সুশীল সমাজ আহুত জাতীয় কনভেনশনে একটি রাজনৈতিক দলের প্রধানকে দিয়ে উদ্বোধন করানোর বিষয়টিও কারো চোখে বেমানান মনে হতে পারে। অথবা বিরুদ্ধবাদীরা এও বলতে পারেন, বিদেশীদের ডেকে এনে দেশের উলঙ্গ চিত্র দেখানোটা মোটেই সমীচীন হয়নি। এসব সমালোচনা ও বিতর্ককে স্বীকার করে নিয়েও সরাসরি যে প্রশ্নটি করতে চাই তাহলো, যে কারণে কনভেনশন ডাকা হয়েছে, সেটি সত্য কিনা? অর্থাৎ মানবতার বিরুদ্ধে সত্যি সত্যি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কিনা?

১ অক্টোবরের নির্বাচনের আগে ও পরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ নির্বিচারে অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হয়েছে কিনা? বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা প্রতিহিংসার ঘটনা ঘটিয়েছে কিনা? তাদের একটি বড় অংশ এখনও জীবন বাঁচাতে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কিনা?

এসব যদি সত্য হয়ে থাকে-যা সরকারিদলের নেতারাও মাঝে মধ্যে স্বীকার করেছেন, তাহলে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' শীর্ষক কনভেনশন ডাকার মধ্যে অন্যায় কিছু ছিল না। যেহেতু দেশে সাম্প্রতিককালে বড় ধরনের রাজনৈতিক সহিংসতা ও সংখ্যালঘু নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে সেহেতু জনগণের কাছে তা তুলে ধরা, প্রতিকার চাওয়া ও অপরাধীদের বিচার দাবি করার মধ্যে ষড়যন্ত্র খুঁজলে আত্মতৃপ্তি পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু সত্যকে আড়াল করা যাবে না।

দেশে কি ধরনের নির্মম ও নৃশংস ঘটনা ঘটেছে তার কিছু খতিয়ান দেশী-বিদেশী পত্র পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট তার সাক্ষ্য দেবে। সংবাদপত্রের হিসাব অনুযায়ী ২০০১ সালের ১৬ জানুয়ারি থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক হত্যার শিকার হয়েছে ২শ' ৮৮ জন। এ সময় প্রতিপক্ষের হামলায় গুরুতর আহত ১ হাজার ৯শ' ৮২ জন। ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৩৮ জন নিহত হয়েছেন; হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে ৮শ' ৬ জনকে। ধর্ষিত হয়েছেন ২শ' ৮৪ জন হিন্দু ধর্মাবলম্বী নারী ও শিশু। অপহৃত হয়েছেন ৪৬ জন। শারীরিক নির্যাতনের শিকার ২ হাজার ২শ' জন পুরুষ ও ১ হাজার ৮শ ৯৬ জন মহিলা সংখ্যালঘু। অবশ্যই এ চিত্র খণ্ডিত। সকল অত্যাচার-নির্যাতনের ঘটনা পত্রিকায় আসে না। সকল অত্যাচারিত ব্যক্তিও থানায় গিয়ে মামলা করে না। ফলে বহু ঘটনাই অজানা থেকে যায়। তাছাড়া ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর থেকে বিভিন্ন জনপদে ক্ষমতাশ্রয়ী মস্তানরা যে সাধারণ মানুষের ওপর জিজিয়া কর আরোপ করছে তার হিসাবও পত্রিকায় পাওয়া যাবে না। কেননা পত্রিকায় কারো চাঁদা প্রদানের খবর বের হলে জানে মেরে ফেলার ঘটনাও ঘটেছে।

সংবাদপত্রের একজন নগণ্য কর্মী হিসিবে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০১ জাতীয় কনভেনশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো অনেকের সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম। সে কনভেনশনের উদ্যোক্তাদের বক্তৃতা আমাকে আকৃষ্ট করেনি। এর বেশিরভাগই ছিল গতানুগতিক; কিন্তু স্বাগতিক বক্তা ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের বক্তৃতার পর নির্যাতিত মানুষের যে চিত্র বাস্তবে ও ভিডিওতে দেখানো হয় তার পর কারো পক্ষে অশ্রু সংবরণ করা সম্ভব নয়। কেউ ◻্যাচে ভর করে এসেছেন চলৎশক্তিহীন অবস্থায়, কাউকে স্ট্রেচারে করেও নিয়ে আসা হয়। অনেকে হাতের আঙুল হারিয়ে, কেউ পায়ের একাংশ বিসর্জন দিয়ে এখানে এসেছিল ঢাকার ভদ্র সুধীজনদের কাছে, তাদের ওপর যে নির্মম-নৃশংস অত্যাচার হয়েছে তার প্রতিকার চাইতে। গফরগাঁওয়ের এক যুবলীগ কর্মী দেখালো কিভাবে তার হাতের দশটি আঙুল মাঝখান থেকে কেটে নেয়া হয়েছে। নগরকান্দার মোহাম্মদ হায়দার দেখালো কিভাবে তার চোখ দু'টি তুলে নেয়া হয়েছে, নড়াইলের রহিমা দেখালো কিভাবে তাদের দুই বোনের গায়ে অ্যাসিড মেরে ঝলসে দেয়া হয়েছে। তারা এ নৃশংসতার বিচার চায়; কিন্তু চট্টগ্রামের শিশুপুত্র মোস্তফা, সিরাজগঞ্জের পূর্ণিমা কিংবা ভোলার শেফালী রানী কিসের বিচার চাইবে? মোস্তফার চোখের সামনে তার বাবাকে কুপিয়ে টুকরো টুকরো করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। সিরাজগঞ্জের নবম শ্রেণীর ছাত্রী পূর্ণিমাকেও মস্তানরা ঘরে থেকে ধরে নিয়ে ধর্ষণ করেছে। ভোলার শেফালি রানী, মধ্যবয়সী পঙ্গু মহিলা। নির্বাচনের পর দুর্বৃত্তরা তাদের বাড়িতে আ◻মণ চালালে অন্যরা দৌড়ে পালিয়ে যায়; কিন্তু পঙ্গু বলে শেফালি রানী পালাতে পারেনি। ফলে দুর্বৃত্তরা তার উপরও চড়াও হয়। তাদের কাছে হাতজোড় করে শেফালি ইজ্জত ভিক্ষা চেয়েছিল। দুর্বৃত্তরা তাকে রেহাই দেয়নি। ভোলায় কেবল শেফালি নয়, ৯ বছরের রীতাসহ অনেকেই ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এই মানুষরূপী পশুরা অন্তঃসত্তা মহিলা, ষাট বছরের বৃদ্ধা কাউকেই রেহাই দেয়নি। ভোলায় গিয়ে লালমোহন থানার লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রাম ঘুরে দেখলাম : দুর্বৃত্তরা যাকে সামনে পেয়েছে তাকেই ধর্ষণ করেছে। ঘরবাড়ি লুট করেছে। এই পাষণ্ডরা একই সঙ্গে মা ও মেয়েকে, শাশুড়ি ও পুত্রবধূকে ধর্ষণ করেছে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ধর্ষিতা এক মহিলা ঘটনার পর থেকে নির্বাক হয়ে গেছে। তার মুখ থেকে একটি কথাও কেউ বের করতে পারেনি।

এরকম ঘটনা শুধু ভোলায় ঘটেনি- বরিশাল, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, খুলনা, সাতক্ষীরা, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, চট্টগ্রাম, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, কুমিল-া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কোথায় না ঘটেছে ধর্ষণের ঘটনা? এমন একটি জনপদও পাওয়া যাবে না যেখানে সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার হয়নি। যেখানে তাদের ঘরবাড়ি, মন্দির প্রতিমা ভাঙেনি। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর হামলা হয়নি ? সর্বত্র হয়েছে।

নির্বাচনের তাণ্ডবতা কেবল রাজনৈতিক সহিংসতার মধ্যে সীমিত থাকলেও তার একটি খোঁড়া যুক্তি খুঁজে পাওয়া যেত। ক্ষমতায় থাকতে আওয়ামী লীগ অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়েছে বলে এখন বিএনপি কর্মীরা তার প্রতিশোধ নিচ্ছে। বাস্তবতা হলো রাজনীতির বাইরে এ সহিংসতা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে নিরীহ সাধারণ মানুষের মধ্যে। যারা গরিব, নিজের ভিটেমাটিও নেই, অন্যের বাড়িতে আশ্রিত, যারা দু'বেলা অন্ন জোটাতে পারে না, তাদের আবার রাজনীতি কি? এসব মূঢ় ম্-ান মুখই সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের, যুবলীগের সন্তানরা নির্বাচনের পরদিনই পালিয়েছে। ফলে প্রতিশোধের খড়গটা এসে পড়েছে প্রতিবেশী দরিদ্র নারী-পুরুষের ওপর। বিএনপি মহাসচিব বলেছেন, এসব ঘটনা ঘটেছে তাদের ক্ষমতায় আসার আগে। র্অথাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে। প্রশ্ন হলো ঘটনাটি ঘটালো কারা? ভোলায় কয়েকজন নির্যাতিত নারী-পুরুষ জানালেন, নির্বাচনের পরের দিন অর্থাৎ ২ অক্টোবর সকালে যখন স্পষ্ট হলো আওয়ামী লীগ হেরেছে, জয়ী হবে ৪ দলীয় জোট, তখনই

বেপরোয়া আ□মণটা শুরু হয় এবং তা বিরামহীন ৪৮ ঘণ্টা চলতে থাকে। এভাবে দুর্বৃত্তদের হাতে নির্যাতিত হয় গফরগাঁওয়ের জ্যোৎস্না রানী মনিবাইন, আগৈলঝাড়ার সাবিত্রী, মধু, শেফালি রানী, রীতা রানী সহ অসংখ্য নারী, চিতলমারীর হাসিনা, মধু রানী দাস, চম্পা, জয়পুরহাটের সুজাতা, রেনুকা অধিকারী, রাউজানের প্রভাত দাস, মীরসরাইয়ের স্বস্তি, কুটন দাস, চন্দনাইশের অগণিত নারী। আর বেশিরভাগ পুরুষই হয় নির্যাতিত না হয় ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত। এখনও অনেকে ঘরে ফিরতে পারেনি।

আমার জন্ম যে জেলায় সেই ঝালকাটিতে ১৯৬৪ সালের পর কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানিরা যখন নির্বিচারে হিন্দু ও আওয়ামী লীগার নিধন করছিল তখনও প্রতিবেশী মুসলমানরা তাদের বাঁচাতে এগিয়ে এসেছিল। অনেকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিত। এমনকি শান্তি কমিটির সদস্যদের বাড়িতেও প্রতিবেশী হিন্দুরা আশ্রয় পেয়েছেন। আশ্রয় দিতে না পারলে নিরাপদে সীমান্তের ওপারে পার করে দিয়ে তাদের ঘরবাড়ি দেখাশুনা করেছেন; কিন্তু এবার কি ঘটলো? এবার পাকিস্তানিরা নয়, প্রতিবেশী মুসলমানরাই প্রতিবেশী হিন্দুদের বাড়িঘর লুট করেছে, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। একটি গ্রামে একটি বাড়িতে আগুন দেয়ার অর্থ হলো ওই গ্রামের সবাইকে বুঝিয়ে দেয়া যে, এদেশে থাকা যাবে না। থাকলেও নৌকায় ভোট দেয়া যাবে না। একই দেশে জন্মগ্রহণ করে একই আলো হাওয়ায় মানুষ হয়ে একই স্কুল-কলেজে পড়ে হিন্দু-মুসলমান দু'টি ভিন্ন প্রজাতিতে ভাগ করা হয়ে গেল। একজন হলো অত্যাচারী, অন্যজন অত্যাচারিত। এ কোন গণতন্ত্র আমাদের মনুষ্যত্বকে হরণ করে নিলো? এ কোন রাজনীতি মানুষ থেকে আমাদের পশুতে পরিণত করলো? পশুরও ধর্ম আছে। আ□ান্ত না হলে সে কখনো কাউকে আ□মণ করে না; কিন্তু এই মনুষ্যরূপী পশুরা অসহায় নারী ও শিশুদের ওপর প্রতিহিংসা চালিয়ে শক্তিমত্তা দেখিয়েছে, উল-াস করেছে।

পরদিন একটি পত্রিকা শিরোনাম করেছিল ঃ নির্যাতিত বাংলাদেশের খণ্ডচিত্র। আসলেই এটি খণ্ডচিত্র। কয়েকজন নির্যাতিতের কথায় ও বোবা কান্নায় সেদিন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের পরিবেশ ভারি হয়েছিল। 'জ্বলছে বাংলাদেশ' নামে ১৫ মিনিটের ভিডিও চিত্রে নির্যাতিত নারী-পুরুষের চেহারা দেখে, মঞ্চে তাদের যন্ত্রণা ও আহাজারি প্রত্যক্ষ করে প্রশ্ন জেগেছে আমরা কোথায় আছি, এই বর্বরতা মধ্যযুগকেও হার মানিয়েছে। ১৯৭৩ সালে মা মারা যাওয়ার পর কেঁদেছিলাম। আর সেদিন প্রকাশ্যে চোখ থেকে পানি নেমে এলো। নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলতে ইচ্ছে হল, এ আমার দেশ নয়। এ কতিপয় দুর্বৃত্তের দেশ। আমি তাদের কাছে অসহায় জিম্মি অথবা তাদের অপকর্মের সহযোগী! না হলে কেন আমরা এ বর্বরতা থামাতে পারলাম না? কেবল আমার নয় আমার পাশে যিনি বসা ছিলেন, তার পাশের চেয়ারে যিনি ছিলেন তাদের সবার চোখ ভিজে আসছিল।

আমার নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়েছিল। অপরাধী মনে হয়েছিল চেয়ারে আসীন সকল অভ্যাগতকেও। একদল দুর্বৃত্ত যারা সংখ্যায় বড় জোর কয়েক হাজার হবে তারাই দেশ জুড়ে এরকম একটি মধ্যযুগীয় বর্বরতা সংঘটিত করল আর আমরা চোখ বুঝে নীরবে সহ্য করলাম। আমাদের মোলায়েম প্রতিবাদের ভাষা দুর্বৃত্তের উন্মত্ততা থামাতে পারেনি। নির্যাতিতদের অভয় দিতে পারেনি। এ কোন সভ্য দেশে আমরা বাস করছি? যেখানে সরকার আছে, প্রশাসন আছে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আছে, তথাকথিত সিভিল সমাজ আছে; কিন্তু এই অসহায় ও নির্যাতিত মানুষকে ন্যূনতম অভয় দিতে কেউ এগিয়ে আসেনি। এই অক্ষমতা, এই লজ্জা কোথায় লুকাবো?

ক্ষমতাসীনদল বিএনপি নেতারা একটি কথা বলার চেষ্টা করেন, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ কনভেনশন আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অংশ এবং বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট

করাই তাদের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিষয়টি পরোক্ষভাবে স্বীকার করে তারা বলেন, নির্বাচনের অব্যবহিত পর বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটেছে। তখন বিএনপি জোট ক্ষমতায় ছিল না ক্ষমতায় ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার। বিএনপি নেতাদের ভাষায় এই যে কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে তার প্রতিকারে জোট সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছে? তত্ত্বাবধায়ক সরকারই-বা সেই দশ দিনে কি করেছে? সুষ্ঠু ও অবাধ' নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তারা ভোটকেন্দ্রে একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারলেন না। নির্বাচনে প্রশাসন বা সেনাবাহিনীর ভূমিকা কি ছিল সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার স্থান এটি নয়। দেশের কয়েকটি স্থানে ঘুরে যেসব রিপোর্ট ও তথ্য পেয়েছি তাতে রাষ্ট্রের এই দুটি উপাদানের প্রতি আমার পূর্বতন ধারণার সামান্যও পরিবর্তন হয়নি। যারা সেনাবাহিনী বা প্রশাসনের কাছে একশ' ভাগ নিরপেক্ষ ভূমিকা আশা করেন তারা বোকার স্বর্গে বাস করেন। সিভিল প্রশাসন ও সেনাবাহিনী ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। যে দল ক্ষমতায় আসবে তাদের পক্ষে এবং কখনো কখনো তাদের হয়ে কাজ করতে ভালবাসে। দেশের এই আমলাতন্ত্র এবং সেনাবাহিনীই এরশাদ আমলের নির্বাচনকে জায়েজ করে দিয়েছিল। ১৯৯৬-এ যে আমলারা বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহ' ঘোষণা করেছিলেন, ২০০১ সালে তারাই আওয়ামী লীগকে 'সাইজ' করে দিতে সচেষ্ট ছিলেন। যখন যে ভূমিকায়। অতএব আপত্তিটি সেখানে নয়। আপত্তি হলো নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতা ও দুর্বৃত্তায়ন প্রসারিত হলো কিভাবে? এই দানবশক্তিকে কি আগেভাগেই রোখা উচিত ছিল না? আওয়ামী লীগ বিএনপি রাজনীতি করে। জামাতে ইসলামী ঐক্যজোট রাজনীতি করে।

এগারো দলের নেতারাও মাঝে মধ্যে রাজনীতির ঝাণ্ডা উঁচিয়ে ধরেন। এদের কেউ ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য, কেউ ক্ষমতার ছায়ায় বসার জন্য রাজনীতি করেন। কিন্তু এই রাজনীতির বাইরে যে কোটি কোটি মানুষ আছে- যাদের কাজ হলো ৫ বছর পর একটি ভোট দিয়ে আসা, তারা কেন সহিংসতার শিকার হলেন, কেন তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া হলো, নারীদের লাঞ্ছিত করা হলো? রাষ্ট্র ও প্রশাসনের কর্তব্য ছিল এই বিপুলসংখ্যক নিরীহ মানুষের পাশে দাঁড়ানো। তারা দাঁড়ায়নি। রাজনৈতিক দলের কর্তব্য ছিল তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়ানো। তারাও ব্যর্থ হয়েছে। সিভিল সোসাইটির কর্তব্য ছিল পশুশক্তির বিরুদ্ধে বিবেককে জাগ্রত করা। তারাও রাষ্ট্র এবং মস্তানদের রক্তচক্ষুকে ভয় পেয়েছে। তবে এক্ষেত্রে বলব সংবাদপত্র সাহসী ভূমিকা নিয়েছে। কনভেনশন অঙ্গনে যে আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল তাতে বিভিন্ন পত্রিকার কাটিং ছিল। এই কাটিংগুলো প্রমাণ করে সাংবাদিকরা দুর্বৃত্তদের রাজনীতি উপেক্ষা করে কিভাবে কাজ করেছেন, কিভাবে নির্যাতিত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন; বিশেষ করে মফস্বলে কর্মরত সাংবাদিকরা। বরিশালের এক সাংবাদিক আমাকে বেদনার সঙ্গে বললেন, আওয়ামী লীগ আমলে বিএনপি'র ওপর নির্যাতনের রিপোর্ট করায় যে বিএনপি নেতারা বাহবা দিতেন আজ আওয়ামী লীগের কর্মীদের ওপর নির্যাতনের রিপোর্ট করায় হুমকি দিচ্ছেন। তখন হুমকি দিতেন আওয়ামী লীগাররা, এখন দিচ্ছেন বিএনপিওয়ালারা। এ হলো আমাদের রাজনৈতিক কালচার।

বিএনপি নেতারা আরেকটি কথা বলেছেন, আওয়ামী লীগের ৫ বছর শাসনামলের অত্যাচার-নির্যাতন ঢাকার জন্যই এ কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছে। এ কথার অর্থ দাঁড়ায় যেহেতু আওয়ামী লীগ আমলে অত্যাচার-নির্যাতন হয়েছে অতএব বিএনপি আমলেও অত্যাচার-নির্যাতন হবে এবং তার বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না। এরকম অদ্ভুত লজিক তারাই দেন যারা ক্ষমতার মোহে মত্ত, যারা সত্যকে আড়াল করতে চান।

সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়ে বিএনপি জামাত জোটের মধ্যে শুরু থেকে একটি বেপরোয়া ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটি যেমন সাইফুর রহমানের কথায় তেমনি পাতি নেতাদের

হুমকি-ধমকিতেও টের পাওয়া যাবে। আওয়ামী লীগ শাসনামলের দুঃশাসন সম্পর্কে আগামী ১৫ ও ১৬ মার্চ অনুরূপ কনভেনশন করার ঘোষণা দিয়েছেন ৪ দলীয় জোট নেতারা। তাদের এই কনভেনশনের উদ্দেশ্য যদি হয় প্রকৃতপক্ষে নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়ানো তাতে কারো আপত্তির কিছু থাকবে না। মানবতার বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি বা দলই অপরাধ সংঘটিত করুক না কেন তাকে চিহ্নিত করা সকলের দায়িত্ব। তবে এখানে একটি কথা থেকে যায়, বিএনপি এখন ক্ষমতায়। অতএব, কনভেনশন ডেকে অপরাধীদের বিচার দাবি করার প্রয়োজন কি? তার চেয়ে রাষ্ট্র ও প্রশাসন দিয়ে প্রকৃত অপরাধীদের বিচারে সোপর্দ করাই তাদের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত। এ মুহূর্তে তার চেয়েও জরুরি হলো নিজ দলের দুর্বৃত্তদের ঠেকানো। দ্বিতীয়ত, আওয়ামী লীগ এখন ক্ষমতার বাইরে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে ক্ষমতাকে কেন্দ্র করেই দুর্বৃত্তরা লালিত-পালিত হয়। সারাদেশে যারা সংখ্যালঘুদের ঠেঙিয়েছে তারাই যাতে কনভেশনের সিপাহশালার না হয়। ৪ দলীয় নেতারা কনভেনশন করার সময় এ বিষয়টিতে খেয়াল রাখবেন আশা করি।

'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' কনভেনশনটি সফল বা ব্যর্থ হয়েছে তা বোঝা যায় বিএনপির তীব্র প্রতিক্রিয়ায়। বিএনপি বলেছে, আওয়ামী দুঃশাসনের চিত্র মুছে ফেলতেই এ কনভেনশন আয়োজন করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের ৫ বছরের দুঃশাসন যদি জোট সরকারের ৪ মাসের দুঃশাসন থেকে অনেক বেশি হয়ে থাকে তাহলে বিএনপি নেতারা এত ভয় পেয়ে গেলেন কেন? কেন তারা ভারত পাকিস্তান মালদ্বীপের অতিথিদের ভিসা দিতে অস্বীকৃতি জানালেন? কেন পাকিস্তানের মানবাধিকার কর্মী আসমা জাহাঙ্গীরের ভিসা নিয়ে টালবাহানা করা হলো? কেন অজিত কাউরের মতো সেবিকাকে ভিসা দেয়া হলো না। বাংলাদেশের ভাবমূর্তি যদি নষ্ট হয়ে থাকে তাহলে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভিসা না দেয়ার জন্য হয়েছে; মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ কনভেনশন আয়োজনের জন্য নয়।

গণতন্ত্র হলো নিজের অধিকার সংরক্ষণ এবং অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা। রাজনৈতিক নেতারা বিরোধীদলে থাকলে নিজের অধিকারের জন্য বুলন্দ আওয়াজ তোলেন, রাজপথ গরম করেন আর ক্ষমতায় গেলেই অন্যের কণ্ঠ স্তব্ধ করতে, অধিকার হরণ করতে উঠে-পড়ে লেগে যান। নিজ নিজ সীমার মধ্যে থেকে সবাই কাজ করলে মানবাধিকার নিয়ে জাতীয় কনভেনশন ডাকতে হয় না, সেই কনভেনশনে আমন্ত্রিত অতিথিদের ভিসাও বাতিল করতে হয় না। বিএনপি জোট এতদিন আওয়ামী লীগের যেসব খারাপ কাজ নিয়ে রাজপথ গরম করত এখন তারাই সেই কাজের মহড়া দিচ্ছে। ধিক এই গণতন্ত্র। ধিক এই রাজনীতি!

বিধ্বস্ত মানবতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৩

কোথায় হারালো আমার একাত্তরের সেই দাম্ভিক উচ্চারণ?

আবেদ খান

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি আকাশবাণী কলকাতায় একটি সাপ্তাহিক কথিকা গ্রন্থনা করতাম এবং পড়তাম স্বনামে। কথিকাটির নাম 'জবাব দাও'। সপ্তাহে একবার আমার সেক্টর থেকে কলকাতায় এসে আবার সেক্টরে ফিরে যাওয়া কিঞ্চিৎ আশ্রয়ের জন্যে এখন সেটা ভাবা যায় না কিন্তু তখন তা ছিল প্রবল উন্মাদনার। বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল অনুষ্ঠানটি। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের 'চরমপত্র' এবং আকশবাণীর প্রণবেশ সেন গ্রন্থিত ও দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পঠিত 'সংবাদ পরিক্রমা' শ্রোতাদের অভিভূত করত তখন। এর পরই ছিল 'জবাব দাও' অনুষ্ঠানটি। সেই অনুষ্ঠানের অধ্যক্ষ প্রযোজক ছিলেন শ্রী সরল গুহ। সরল গুহকে একদিন, সেই একাত্তরের রক্তঝরা দিনে, দম্ভ করে বলেছিলাম, আমরা চৌষট্টিতে আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িকতাকে কবর দিয়েছি কিন্তু আপনারা পারেন নি।

আজ একথা যখন মনে হয় তখন গ্লানি মনকে আচ্ছন্ন করে। মনে হয়, আমি সত্য বলিনি। না বুঝে ভেতরে সন্ধান করার আগেই আবেগাপ্লুত হয়ে উচ্চারণ করেছিলাম ফাঁকা শব্দগুলো। বাংলাদেশে এখন যেসব ঘটছে কিংবা যেসব ঘটেছে আগেও স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে তাতে লজ্জায় অধোবদন হওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই আমার। আমার এই দেশ কি সত্যিই আজ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে সে সাম্প্রদায়িক নয়? একাত্তরে যখন পাকিস্তানী সামরিক জান্তা বাংলাদেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তখন তাদের লক্ষ্য ছিল এদেশ থেকে হিন্দুদের তাড়িয়ে দেওয়া। তারা বিশ্বাস করত যে, পাকিস্তান ভেঙেছে ভারত তাদের স্বার্থে। ভারতের স্বার্থ রক্ষা করছে এখানকার হিন্দুরা। এই ধারণা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল পাকিস্তান জন্মের পর থেকেই। পাকিস্তান মুসলমানদের জন্যে এবং হিন্দুদের জন্যে ভারত। অতএব পাকিস্তানে যত হিন্দু নাগরিক আছে তারা কিছুতেই পাকিস্তানকে গ্রহণ করতে পারে না। পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে যখন অসাম্প্রদায়িক এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটল তখন শঙ্কিত হল পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী। তারা বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষকে সম্পর্কিত করল স্থানীয় হিন্দুদের সঙ্গে তথা ভারতীয় স্বার্থের সঙ্গে। ফলে সুস্পষ্টভাবে তারা বিভাজন রেখাটি টেনে দিল। বাঙালির ভাষা সংস্কৃতি সামাজিক আচার অনুষ্ঠান এবং রাজনীতির বিরোধিতা করার জন্যে তারা ব্যবহার করল ইসলাম ধর্মকে।

ধর্মের অপব্যাখ্যা করে একদিকে যেমন তারা ধর্মপ্রাণ নিরীহ মুসলমান জনগোষ্ঠীর মনকে বিদিষ্ট করার চেষ্টা করল অন্যদিকে তেমনি একটির পর একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অবতারণা করে এখানকার সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মনোবল বিধ্বস্ত করতে থাকল। পঁয়ষট্টি সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর হিন্দুদের সম্পত্তিকে শত্রু-সম্পত্তিতে পরিণত করার ব্যবস্থা করে তারা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিল যে, এদেশে হিন্দুদের কোন অধিকার নেই এবং থাকতে পারে না। ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ যখন আওয়ামী লীগের রাজনীতির আদর্শের সঙ্গে যুক্ত হল তখন পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর কাছে আওয়ামী লীগ প্রধান রাজনৈতিক শত্রুতে পরিণত হল। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তখন পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ালো এই দেশকে আওয়ামী লীগ শূন্য এবং হিন্দু শূন্য করে ফেলা।

এই বিষয়টিকে অনেক বিস্তৃতভাবে দেখা যেতে পারে। তবে সেদিকে না গিয়ে বলা যায় যেহেতু বিশাল জনগোষ্ঠী অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং বাংলাদেশ

স্বাধীন হল তখন পরাজিত পক্ষের একমাত্র কাজ হয়ে পড়ল ধর্মের অজুহাত সৃষ্টি করে আওয়ামী লীগকে ভারতের সেবাদাস হিসেবে চিত্রিত করা এবং তৃণমূল পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ অধিকতর সম্প্রসারিত করে সংখ্যালঘুদের ভীতসন্ত্রস্ত ও পলায়নপর গোষ্ঠী হিসেবে তুলে ধরা। বাংলাদেশে পঁচাত্তর হত্যাযজ্ঞের সংক্ষিপ্ত পটভূমি এটাই। এরপর থেকেই শুরু হয়েছে সুবিস্ত তভাবে সাম্প্রদায়িকতার সম্প্রসারণ। আমি এখানে অবশ্য একথা বলব না যে, সে সময় থেকেই গোটা দেশ সাম্প্রদায়িক দেশে পরিণত হয়েছে। মূলত ঃ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী সে সময় ধর্মের আচ্ছাদনে তৃণমূল পর্যায়ে সাম্প্রদায়িকতা চর্চা করার উর্বর ভূমি পেয়েছে রাজনৈতিক কারণে এবং সে ক্ষেত্রে ভারত বিরোধিতা একটা ধারালো লাঙ্গল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পেরেছে। এরশাদ আমলে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীতে যখন রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম অন্তর্ভুক্ত হল তখন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ধর্মনিরপেক্ষতার অর্জনটি লুট হয়ে গেল। এটা হওয়ার ফলে আমরা দেখতে পেলাম বাংলাদেশ অতি দ্রুত ধর্মীয় মৌলবাদীদের খপ্পড়ে চলে যাচ্ছে এবং নীরবে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বিস্তার লাভ করতে শুরু করেছে সমাজের সাধারণ স্তরেও। কেবলমাত্র ধর্মীয় বা রাষ্ট্রীয় আদর্শগত কারণই নয় সম্পত্তিগত এবং বৈষয়িক লোভও এক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর এবং বেদনা দায়ক বিষয়টি এই যে কেবলমাত্র ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শগত প্রতিপক্ষরাই নয়, মুক্তিযুদ্ধের মূল পতাকাবাহীদেরও একাংশ এই উগ্র লালসার দ্বারা তাড়িত হয়ে সংখ্যালঘুদের অসহায়ত্বকে শত গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এই লোভ এবং জৈবিক লালসা সামাজিকভাবে এমন এক স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে যা বাঙালি জাতির অসাম্প্রদায়িক অস্তিত্বকে বিশাল এক জিজ্ঞাসার মধ্যে নিয়ে ফেলেছে। আমরা যদি এরশাদ আমলের শেষদিকের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভারতের বাবরি মসজিদ কেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এবং এর পরবর্তীকালে ধারাবাহিকভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অসহায় দেশত্যাগের বিষয়টি লক্ষ্য করি তা' হলে দেখব কীভাবে এবং কত গভীরে প্রবেশ করেছে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের শিকড়টি। হিন্দু পরিবার তা' সে পরিবার যত মুক্তমনা এবং অসাম্প্রদায়িকই হন না কেন গ্রামের গরীব মুসলমান পরিবারের কোন গৃহপরিচারক বা গৃহ পরিচারিকাও সে বাড়িতে কাজ করতে রাজি হয় না বা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। গ্রামে কোন হিন্দু গৃহস্থ ঘরে যুবতী নারী অথবা কিশোরী থাকলে সেই পরিবারকে প্রতিনিয়ত শঙ্কার মধ্যে কাটাতে হয়। এই পরিস্থিতি কি কোন অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের পরিচয়? দুই হাজার এক সালের পনেরই জুলাই-এর পর থেকে সংখ্যালঘুরা যে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পতিত হল পহেলা অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনের পর সেই নিরাপত্তাহীনতাই পরিণত হল বীভৎস সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবে। এরপরও কি আমরা দাবী করব আমরা সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে নষ্ট হয়ে যাচ্ছি না?

আজ এই একত্রিশ বছর পর যদি কখনও কোথাও আকাশবাণীর সেই সরল গুহর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এবং তিনি তাঁর ভারী চশমার কাঁচের পেছনের চোখ তুলে আমার দিকে পিস্পলক তাকান এবং কোন কুশল সংবাদও জিজ্ঞাসা না করেন তা'হলে তখন আমি কী করব, কী বলব? আমার একাত্তরের সেই স্পর্ধা, সেই দাম্ভিক উচ্চারণ যা আমি সঞ্চয় করতে পেরেছিলাম গোটা পাকিস্তানী আমল জুড়ে সেগুলো আমার সাধের মুক্তিযুদ্ধাত বাংলাদেশে আর কেন খুঁজে পাচ্ছি না, কেন পাচ্ছি না?

বিধ্বস্ত মানবতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৩

রাষ্ট্রদ্রোহিতা, কালো তালিকা ও সংখ্যালঘু সম্মেলন

মমতাজ লতিফ

কারা রাষ্ট্রদ্রোহী তা নিয়ে সরকারি ও বিরোধীদলের অবস্থান হওয়া উচিত এক ও অভিন্ন। কিন্তু সম্প্রতি দেশের জন্যে যে সুধী ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ ইতিবাচক ভূমিকা দেশকে শত্রুমুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, যেসব বিদেশী সংবাদদাতা, সংবাদ সংস্থা সাি্রয় সহযোগিতা করেছে, তাদের প্রতি বর্তমান সরকারের বিমাতাসুলভ আচরণ, ক্ষেত্রবিশেষে তাদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেফতার করা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তারক্ষীদের দিয়ে হয়রানি করানো, এমনকি সংখ্যালঘু ও বিরোধীদলের নির্যাতিত হওয়ার সত্য ঘটনাকে প্রকাশ করাকে দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্টের চেষ্টা নামে রাষ্ট্রদ্রোহিতার ছাপ দেয়ার প্রচেষ্টা, যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা দেশ কালো তালিকাভুক্ত হওয়াকে বিরোধী নেত্রী ও মানবাধিকার কর্মীর দেশে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাবলির প্রকাশকে দায়ী করা, যৌথ অপারেশনের সময়ে সংঘটিত শক্তিশালী বোমা হামলাকে তদন্তের পূর্বেই বিরোধী নেতাদের অপঘাতমূলক কাজ বলে মন্তব্য করা ও গ্রেফতার করা ইত্যাদিকে এ শব্দের মূল অর্থ, এর সর্বজনবিদিত ধারণাকে বিপরীতার্থক অর্থের দিকে গায়ের জোরে ঠেলে দেয়ার পেছনে কে বা কারা কি অভিসন্ধি নিয়ে এমন কালাপাহাড়ি কাজ করছে, তা ভাববার বিষয়।

বিপরীতে, যাদের কাজকর্ম সুস্পষ্টভাবে রাষ্ট্রদ্রোহী, যারা রাষ্ট্রের মূল চার নীতি, সংবিধানের প্রধান ভিতকে উপেক্ষা করে, অগ্রাহ্য করে নানামুখী মানবাধিকার বিরোধী অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের কাজকর্ম সম্বন্ধে চোখ বন্ধ করে রাখা, ক্ষেত্রবিশেষে এসব অপতৎপরতা উসকে দেয়ার কাজকে সরকারের একটি নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যেন একটি দল পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হচ্ছে-এমন অনেকেই মনে করছেন। তাদের প্রশ্ন হচ্ছে— যারা একজন দেশপ্রেমিককে, একজন বরেণ্য, দেশের জন্মলগ্নে সাি্রয়ভাবে কাজ করেছেন, তাদেরকে মুরতাদ ঘোষণা করে, তারা কি প্রকারান্তরে দেশের শত্রু নয়? যে বা যারা দেশপ্রেমিকদের দেশের শত্রু বা তাদের গোষ্ঠীর আদর্শের শত্রু ভাবে, অন্য কথায় তারাই কি এদেশের শত্রু হিসেবে নিজেদের শনাক্ত করছে না? তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কেন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না বা তাদের কাজকে বিচারের আওতায় আনা হয় না?

সম্প্রতি ফেব্রুয়ারির কবিতা উৎসবে বঙ্গবন্ধুর নাম কবিতায় থাকার কারণে সরকারি ছাত্রদলের যে সন্ত্রাসীরা একজন কবিকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও পেশিশক্তির বলে অসম্মান করেছে, তাদেরকে কে বা কারা কি উদ্দেশ্যে লেলিয়ে দিয়েছে, তা আজ জানা না গেলেও আজ বাংলাদেশের জন্মদাতার নাম মোছা উৎসবের নেতা-নায়কদের পরিচয় কি দেশদ্রোহী নয়?

এই সেদিন বরিশালে মুক্তিযুদ্ধের ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর তাদের প্রদর্শনী বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে যার প্রবল বাধাতে, সে ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর ওই মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধিতা কি অন্য কথায় দেশদ্রোহিতার সমার্থক নয়? যারা এভাবে দেশের ও জাতির প্রধান গৌরব মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে কোন এক রূপে বিরোধিতা করছে তারা বাংলাদেশের জন্মের বিরোধী অর্থাৎ তারা বাংলাদেশের স্বাধীন সত্তার শত্রু। জনগণের, বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ করে যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনেছে, তাদের প্রশ্ন-এরা রাষ্ট্রদ্রোহী নাকি মানবাধিকার কর্মী শাহরিয়ার কবির আর মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ লেখক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন রাষ্ট্রদ্রোহী? বাংলা একাডেমীর বইবেলায়ও এ দলটির আগ্রাসনও ওই এক সুতোয় বাধা নয় কি?

যারা এখনও '৭১-এর গণহত্যা ও গণধর্ষণকারী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নজিরবিহীন অন্যায়ের পরও পাকিস্তানি পতাকা, পাকিস্তানি কুচ্রী ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতির প্রেমে বিভোর

থাকেন, তারা কেন এ দেশে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে গণ্য হবে না- তারও জবাব একদিন সরকারকে দিতে হবে।

সম্প্রতি আমেরিকায় বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয় সম্পর্কে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো সে সম্পর্কে প্রবাসী বাংলাদেশীদের যাদের সিংহভাগ মুসলমান, তাদের বিভক্তি, বিতর্ক এবং সর্বোপরি তাদের বিশ্বাস-'যখন আমরা কারো তালিকাভুক্তি শিথিলের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছি, তখন এরকম সংখ্যালঘু নির্যাতনের ওপর সম্মেলন এ প্রচেষ্টার গুরুত্বকে হ্রাস করবে' অর্থাৎ এদের মতে, এটি অনুষ্ঠিত হওয়া ঠিক হচ্ছে না। এদের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন ঃ

১। সংখ্যালঘুদের এ সম্মেলনের দিন তারিখ নিশ্চয় বহু আগেই নির্ধারিত ছিল, কিন্তু এর মধ্যে যে ২০০১ থেকে এ দেশটিতে সংখ্যালঘু, বিরোধী রাজনীতিকের ওপর কি ধরনের নির্যাতন হয়েছে ও হচ্ছে তার প্রতিবাদে আপনারা কি কোন স[illegible]য় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন? সরকারকে এসব কার্যকলাপ বন্ধের উদ্যোগ নিতে সুপরামর্শ দিয়েছেন?

২। নাকি আপনারা মনে করেন, নির্যাতন হলে হবে, কিন্তু তা বড় করে ফলাও করে সম্মেলন করার দরকার কি? এতে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়।

৩। নাকি আপনারা অধিকাংশ মুসলমানদের মতো মনে করেন, বাংলাদেশে সবধর্মের মানুষ মহানন্দে বসবাস করছে, অতএব এসব 'অতিরঞ্জিত'? এখানে বলে রাখা ভাল, একজন হিন্দু, বৌদ্ধ বা খ্রিস্টান ছাড়া সংখ্যালঘুরা এখানে সুখে আছে, তা বলার অধিকারী কোন মুসলমান নয়। কিন্তু একজন সংখ্যালঘু নির্যাতিত হচ্ছে কি-না তা যেকোন ধর্মের বিবেকবান ব্যক্তি বলার এবং নির্যাতনের প্রতিবাদ করার অধিকারী।। এই হিসেবে শাহরিয়ার কবির এই অসম্ভব কষ্টকর, দুঃসাধ্য কাজটিই করেছেন।

-আপনারা এতদিনে নিশ্চয় বুঝেছেন যে, শেখ হাসিনার বক্তব্য বা সংখ্যালঘু নির্যাতনের ওপর সম্মেলন, এসব বিষয়ে লেখালেখির জন্য কালো তালিকাভুক্তি হয়নি, এটি যুক্তরাষ্ট্রের জাস্টিস বিভাগের দ্বারা প্রস্তাবিত, যা নিশ্চয় অনেক দিনের তথ্য-প্রমাণের ওপর গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন যখন বলেছিলেন যে, লাদেনের গোষ্ঠীর দ্বিতীয় নেতা বাংলাদেশে আছে, অথবা ক্লিনটনকে এদেশে আল-কায়দার উপস্থিতি আছে বলে ভ্রমণ করা থেকে বিরত থাকার জন্য যখন বহু বাংলাদেশী শত শত চিঠি, ই-মেইল করেছিল তখন প্রবাসী বাংলাদেশীরা শঙ্কিত হয়েছিলেন কি? এর কোন প্রমাণ অবশ্য পাওয়া যায়নি। তবে ওই ধরনের ই-মেইল রচয়িতার কেউ কেউ এখন সরকারে ঘাপটি মেরে আছে কি-না তাও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

-যাই হোক, প্রবাসী বাঙালি আমেরিকাবাসীদের উপলব্ধি করতে হবে- কালো তালিকাভুক্তি একটা ভিন্ন বিষয়, যা প্রবাসী হিন্দু-মুসলমান সব বাঙালির জীবিকা এবং সেহেতু দেশে বাসরত তাদের ওপর নির্ভরশীল আত্মীয়দের জীবন ধারণকে প্রভাবিত করবে। তাদের এখন কাজ হবে-১, খুবই আন্তরিকভাবে, সততার সাথে কাজ করা (রেডিক্যাশ কার্ড জালিয়াতির মতো ঘটনা যেন না ঘটে) ২. বাঙালি প্রতিনিধিরা বাংলাদেশ ককাস গ্রুপের কাছে তাদের আয়-জীবিকা ঠিক রাখার জন্য সাহায্য চাওয়া ৩. ককাস গ্রুপ ও জাস্টিস বিভাগকে জানানো যে, দেশে যাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা না ঘটে, সংখ্যালঘু বিরোধী রাজনীতিকদের অধিকার সুরক্ষিত হয় এবং উগ্র, সন্ত্রাসবাদীরা যেন বাংলাদেশে আশ্রয় না পায় তার জন্য দেশের সরকারের ওপর তারা চাপ প্রয়োগ করে যাবে। অন্যদিকে প্রবাসে বাঙালিরা যাতে আর্থিক শঠতাপূর্ণ কাজকর্ম না করে সেদিকে তাদের পক্ষ থেকে দৃষ্টি রাখা হবে।

এই কটি কাজ করলে কালো তালিকাভুক্তির প্রভাব সহনীয় হবে বলা বাহুল্য, এমনকি এসব প্রতিশ্রুতি এবং এসবের কার্যকর ফলোআপ এই কালো তালিকাভুক্তি থেকে অদূর ভবিষ্যতে রেহাইও দিতে পারে।

অন্যদিকে সংখ্যালঘু বিষয়ক সম্মেলন পুরোপুরি ভিন্ন বিষয় যা পূর্ণাঙ্গ মানবাধিকারের একটি অংশ মাত্র। এর সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় হলো নারী নির্যাতন, শিশু নির্যাতন, নিঃস্ব মানুষের মানবাধিকার এবং ক্ষুদ্র উপজাতিদের ওপর নির্যাতন। যা উলি-খিত হলো, স্বীকার করতেই হবে- এরা সমাজে নির্যাতনের পাত্রপাত্রী এবং সংখ্যালঘুরাও নানাভাবে সব রাষ্ট্রে সমাজে নির্যাতনের শিকার। স্মৃতি বিভ্রম না হলে এই কিছুদিন আগেও যুগোস্-াভিয়া দেশটি ভাঙার সময় কিভাবে ওখানে মুসলমান সার্ব-[illegible]য়েশীয়রা নির্যাতিত হয়েছে তা নিশ্চয় ভোলেন নি! আমেরিকায় কালোরা কিভাবে দাস হিসেবে গরু-ছাগলের মতো বন্দি হয়ে এসেছিল তা তো নিশ্চয় জানেন। তারাও সংখ্যালঘু এবং জাতপাতের নির্যাতনের শিকার, আব্রাহাম লিঙ্কন এবং মার্টিন লুথার কিং এদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে বরেণ্য হয়েছেন। ভারতের যেসব কড়া, কঠোর প্রতিবাদ, রহস্য উন্মোচনকারী রচনা বের হয়েছে তার অর্ধেকও বাংলাদেশে বের হয়নি। এর জন্য ওদের দেশে ওসব লেখক-সাংবাদিককে দেশদ্রোহী বা দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্টকারী হিসেবে কেউ সনাক্ত করছে না, কেউ যদি করে তবে তাকে উন্মাদ ছাড়া তারা আর কিছু বলত না।

আসলে বাঙালিদের কতগুলো বিষয় চর্চা করতে হবে- যেমন বউ ঠেঙালে এটা বলা যাবে না ওরা কি দেখে ফেলল?' বউ ঠেঙালে বলবেন, 'হাঁ, অমুক কারণে আমি বউকে ঠেঙিয়েছি।' অন্যে না দেখলেও সত্য হচ্ছে, বউকে ঠেঙিয়েছেন, তাই না? মুসলমান হলে বলতে পারবেন না হিন্দুরা বাংলাদেশে খুব সুখে আছে, তবে তাদের, সংখ্যালঘুদের দুঃখটা বোঝার জন্য তথ্য সংগ্রহ করে পাঠ করলে উপকৃত হবেন, সত্যের কাছাকাছি পৌঁছাবেন। কি কি কাজে দেশের, জাতির ভাবমূর্তি বাড়ে আর কি কি কাজ করলে তা ক্ষুণ্ন হয় এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা তৈরি করবেন। একটা উদাহরণ-মুক্তিযুদ্ধ আমাদের ভাবমূর্তি বাড়ায় নাকি বঙ্গবন্ধুর নাম কবিতায় থাকার জন্য কবিকে মারধর করলে, মুক্তিযুদ্ধের প্রদর্শনী বন্ধ করলে দেশের ভাবমূর্তি বাড়ে? '৭১-এর খুনিরা দেশের ভাবমূর্তি বাড়ায় নাকি শাহরিয়ার কবিরদের মতো মানবাধিকার কর্মীদের কাজ দেশের ভাবমূর্তি বাড়ায়? প্রবাসে থাকলেও এসব বিষয়েও আপনাদের স্বচ্ছ ধারণা ও সেই অনুযায়ী কার্যকলাপ, আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি আপনাদের উজ্জ্বল করবে।

বর্তমান যুগে অনেকেরই ধারণা, দেশে দেশে যেসব রাষ্ট্র-সরকার দ্বারা সংঘটিত অপরাধ হচ্ছে তা আন্তর্জাতিকভাবে মোকাবিলা করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রেসিডেন্ট বুশ, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী শ্যারন যে ধরনের অপরাধ করছে, করতে যাচ্ছে, আমেরিকার প্রচ্ছন্ন যোগসাজসে লাতিন আমেরিকা, এশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে যেসব বড় আকারের অপরাধ সংঘটিত হয়েছে যেমন, পানামার নরিয়েগাকে তুলে নিয়ে যাওয়া, এগুলো কোন একক দেশের পক্ষে মোকাবিলা করা অসম্ভব। সে কারণে যুগোস্-াভিয়ার খুনি প্রেসিডেন্ট আজ বিচারের মুখোমুখি! সুতরাং আজ সব দেশের সুধী, মানবতার পক্ষের প্রগতিশীল রাজনীতিক, লেখক-কবি-সাহিত্যিক-বিজ্ঞানী, পেশাজীবী, শ্রমিক-কৃষক-শিক্ষক-ছাত্র নির্বিশেষে সবাইকে সব ধরনের মানবতাবিরোধী অপরাধের ও এসব অপরাধের হোতা অপরাধীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। গড়ে তুলতে হবে শান্তির জন্য আন্দোলন, মানুষের-নারীর, বেকারের, শিশুর, শ্রমিকের, কৃষকের, সংখ্যালঘুর, উপজাতি মানুষের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। যে নারীর শত্রু, সংখ্যালঘু ও উপজাতীয় মানুষেরও সে শত্রু, সর্বোপরি এরা মুক্তবুদ্ধির মানুষের প্রধান শত্রু এবং মুক্তিযোদ্ধা ও দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রথম শত্রু। দেশে দেশে এদের চরিত্র এক ও অভিন্ন।

সুতরাং নিজে ভাল থাকতে চাইলে, নিজ পরিজনসহ শান্তিতে বসবাস করতে চাইলে এসব শত্রুকে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করুন।

সংবাদ, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ কী?

আবদুল গাফফার চৌধুরী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক নাম প্রকাশ না করার শর্তে আমাকে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের নিগ্রহ সম্পর্কে আপনি সম্প্রতি বেশ কটি লেখা লিখেছেন। তাতে অনেক শক্ত কথা আছে, সত্য কথাও আছে। কিন্তু যা নেই তা হলো সমাধানের পন্থা। আপনি এই সমস্যার সমাধান সম্পর্কে দু-একটি কলাম লিখবেন কি? আমি এই অধ্যাপক বন্ধুকে একটি সহজ উত্তর দিতে পারতাম। উত্তরটি দিতে পারতাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি উক্তি ধার করে। শরৎচন্দ্রকে একবার বলা হয়েছিল 'আপনার উপন্যাসে বাঙালি হিন্দু সমাজের অনেক বড় বড় সামাজিক সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু আপনি কোনো সমাধানের পথ বাতলাননি। আপনার লেখায় এই অসম্পূর্ণতা কেন?' শরৎচন্দ্র জবাব দিয়েছিলেন, 'আমি একজন লেখক। কোনো সমাজ সংস্কারক নই। সমাজের সমস্যা তুলে ধরাই আমার কাজ। তার সমাধানের পথ বাতলাবেন সমাজ সংস্কারকেরা।'

আমিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপক বন্ধুকে শরৎচন্দ্রের কথা ধার করে বলতে পারতাম, আমি একজন সামান্য সাংবাদিক এবং কলামিস্ট। খবর থেকে খবর ভাষ্য তৈরি করাই আমার কাজ। সেই ভাষ্যে আমার দৃষ্টিতে দেখা সমস্যাটাই উঠে আসবে। সমাধান বাতলানোর দায়িত্ব এবং যোগ্যতা কোনোটাই আমার নেই। এই দায়িত্ব রাজনৈতিক নেতা ও সমাজের জ্ঞানীগুণীজনের। এই জবাবটা অধ্যাপক বন্ধুকে আমি দিতে চাই না। কারণ, দেশের রাজনৈতিক বা সামাজিক সমস্যার সমাধান নির্দেশ করার যোগ্যতা আমার না থাকলেও এ সম্পর্কে আলোচনা করার অধিকার নিশ্চয়ই আমি রাখি।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কলকাতার 'আনন্দবাজার পত্রিকা, আমাকে বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্কের ভবিষ্যতের ওপর একটি নিবন্ধ লেখার অনুরোধ জানিয়েছিল। তখন এই দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে রীতিমতো ইউফোরিয়া চলছে। অনেকটা চু এন লাইয়ের ভারত সফরের সময়ে চীনা-হিন্দি ভাই ভাই' স্লোগানের হিড়িক দেখা দেওয়ার মতো। সেই হিড়িক বেশিদিন টেকেনি। আমি আনন্দবাজারের নিবন্ধে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলাম। এক, ভারত কত শীঘ্র বাংলাদেশ থেকে তার সৈন্য প্রত্যাহার করবে। লিখেছিলাম, 'এই সেনা প্রত্যাহার যত বিলম্বিত হবে, ততই বাংলাদেশে ভারতবিরোধী মনোভাব বাড়তে থাকবে। দুই, দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক কত দ্রুত উন্নত করা যাবে এবং ভারতে বাংলাদেশের রপ্তানি ঘাটতি প্রোগ্রেসিভলি কমিয়ে আনা যাবে এবং বিনিময় ও কমপি-মেন্টারি ট্রেড পলিসি জোরদার করা যাবে। তিন, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো দুই দেশেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর পূর্ণ নাগরিক অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা। বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের বস্তি ত্যাগ ও দেশ ত্যাগ করার কারণগুলো দূর করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তা না হলে বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের সাধারণ মানুষের মনে যে প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়েছে তা নষ্ট হবে এবং ভারতের সাম্প্রদায়িক দলগুলো তা থেকে সুবিধা লোটার সুযোগ পাবে। আখেরে তা দু'দেশের মৈত্রী সম্পর্কে ফাটল ধরাবে।

পাকিস্তানি কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু ফিরে আসার আড়াই মাসের মধ্যে ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করায় তার একটা ইতিবাচক প্রভাব দু'দেশের সম্পর্কের ওপর পড়েছিল। বঙ্গবন্ধু সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে কামরুজ্জামান সাহেব (আমি তার পত্রিকা দৈনিক জনপদের সম্পাদক ছিলাম) আমাকে সে সময় বলেছিলেন ভারতের সঙ্গে

বাংলাদেশের মৈত্রী সম্পর্কটা স্থায়ী হবে। এই লক্ষ্যে ইন্দিরা সরকার দুটি বড় পদক্ষেপ নিয়েছেন। এক. বঙ্গবন্ধুর অনুরোধ অনুযায়ী বাংলাদেশে মাড়োয়ারিদের অবৈধ তৎপরতা বন্ধ করার জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণে রাজি হয়েছেন। দুই. ১৯৬৪-৬৫ সালের আগে যেসব হিন্দু বাংলাদেশ ত্যাগ করে ভারতে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে, তাদের আবার বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে আসার জন্য সুযোগ না দেওয়া। মুজিব সরকার আগেই দিলি-কে জানিয়ে দিয়েছিল যে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় ১ কোটি শরণার্থীর মধ্যে যেসব হিন্দু শরণার্থী হানাদারদের অত্যাচারে দেশত্যাগ করে ভারতে গিয়েছিল, বাংলাদেশ তাদের গ্রহণ করবে। কিন্তু ১৯৬৫ সালের আগে যারা দেশত্যাগ করেছে, তাদের গ্রহণ করবে না। বাংলাদেশ সরকারের এ কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে '৭১ সালের হিন্দু শরণার্থীদের সঙ্গে মিশে ১৯৬৫ সালের আগের দেশত্যাগী হিন্দুরাও বাংলাদেশে ফিরে এসে তাদের জায়গা-জমির ওপর দাবি না জানায়।

কামরুজ্জামান সাহেবের (যাকে আমরা অনেকেই ডাকতাম হেনা ভাই) সঙ্গে আলাপের পর 'দৈনিক জনপদের' তৃতীয় মত কলামে লিখেছিলাম, 'কেবল অসাধু মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী এবং পঁয়ষট্টি-পূর্ববর্তী দেশত্যাগী হিন্দুদের বাংলাদেশে পুনরাগমণ বন্ধ করলেই বাংলাদেশে দীর্ঘকালের সাম্প্রদায়িকতার এবং বাংলাদেশ-ভারত সুসম্পর্ক টিকিয়ে রাখার সমস্যা দুটির সমাধান করা যাবে এই চিন্তাধারা সঠিক নয়। হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের সঙ্গে বাংলাদেশ ও ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক অনেকাংশে জড়িত। ধর্মের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হওয়ায় তখন থেকেই ভারতে ও পাকিস্তানে (পরে বাংলাদেশে তার ধর্মনিরপেক্ষতাভিত্তিক অভ্যুদয় সত্ত্বেও) দ্বৈত নাগরিকত্ববোধের ভয়ানক সমস্যাটি দেখা দেয়।

ভারতে মুসলমানদের সম্পর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় সন্দেহ করতে থাকে যে তারা ভারতীয় নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও মনে মনে পাকিস্তানের প্রতি অনুগত এবং পাকিস্তানের (পরে বাংলাদেশেরও) সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অঘোষিত অভিযোগ ছিল হিন্দু সম্প্রদায় মনে মনে ভারতের প্রতি অনুগত। সেই সঙ্গে সেই পাকিস্তানি জমানাতেই হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ ওঠে ভারতে বাংলাদেশ থেকে ক্যাপিটাল ট্রান্সফারের। অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অর্জিত অর্থ গোপনে কলকাতায় স্থানান্তর করেন। পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষার জন্য তারা পরিবারের দু-একজন সদস্যকে পূর্ব পাকিস্তানে রেখে পশ্চিমবঙ্গে অথবা ত্রিপুরায় চলে যান। পরে সুযোগমতো সেই সম্পত্তি প্রতিবেশী মুসলমানদের কাছে বি করে সেই টাকা-পয়সাও ভারতে পাচার করেন।

এই অভিযোগটি একেবারে অমূলক নয়। আবার সর্বাংশে সত্যও নয়। পাকিস্তানি জামানায় আইয়ুব আমলে পুলিশের সাবেক আইজি জাকির হোসেন যখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর, তখন তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের এক অর্থনৈতিক সম্মেলনে বলেই ফেলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে যে ক্যাপিটাল ফর্মেশন (পুঁজি গঠন) হতে পারছে না তার কারণ এখান থেকে কলকাতা এবং করাচি দুদিকেই পুঁজি পাচার হচ্ছে। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, কলকাতায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যে পুঁজি পাচার করেন তার তুলনায় করাচিতে পুঁজি পাচার অত্যন্ত ব্যাপক ও সংঘবদ্ধ। শুধু পুঁজি নয়, কাঠ, চা, পাট, রেশম ইত্যাদি সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে দেদার পাচার হচ্ছে। কাশ্মীর যুদ্ধের তহবিল সংগ্রহের নামে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পন্ন পরিবারের সোনাদানা পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেছে। প্রদেশের অর্থ সংগ্রহের একটি মাত্র সূত্র বিয় করও (sales tax) এখন কেন্দ্রীয় সরকারের কব্জায়।'

সেই পাকিস্তানি জমানাতেই খবর ফাঁস হয়ে গিয়েছিল যে, ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ হওয়ার সময় পূর্ব পাকিস্তানে স্টেট ব্যাংকের শাখা ও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক থেকে যত সোনা ও অর্থ নিরাপত্তার অজুহাতে পশ্চিম পাকিস্তানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তার

সিংহভাগই আর ফিরে আসেনি। ১৯৭১ সালে আরো ব্যাপকভাবে এই পাচারকার্য চলেছে। মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র হাতে নেওয়ার সময় মুষ্টিমেয় কয়েকটি জেলার ট্রেজারি লুট করে কেবল কাগজের টাকা বস্তা ভরে নিয়ে গেছে। কিন্তু সোনাদানায় হাত দেওয়ার সুযোগ পায়নি। তা অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতেই স্থানান্তর করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও দেশটি থেকে বিদেশে অর্থ ও পুঁজি পাচার তো কমেইনি; বরং বেড়েছে। শেখ মুজিব দেশের ব্যাংক, বীমা, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি রাষ্ট্রায়ত্ত (nationalised) করেছেন এবং সব রকম বড় ব্যবসাতেও হাত দেবেন এই ভয়ে, পাকিস্তান আমলের মুষ্টিমেয় বাঙালি পুঁজিপতি ও বড় ব্যবসায়ী বিদেশে তাদের অর্থ সরিয়ে ফেলেন এবং তাদের ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র ও বিদেশে নিয়ে যান। শিল্পপতি জহিরুল ইসলাম তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 'নাভানা'র প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করেন লন্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রিটে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা এবং তার সরকারকে উৎখাতের পর শুরু হয় বাংলাদেশে লুটেরা নব্যধনীদের অবাধ লুটপাট এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশে টাকা পাচার।

কলকাতায় এ সময় একশ্রেণীর সংখ্যালঘু হিন্দু অর্থ পাচার করেনি তা নয়। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের একশ্রেণীর রাতারাতি গজিয়ে ওঠা তথাকথিত শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী যে পরিমাণ লুটের অর্থ বিদেশী ব্যাংকে সরিয়েছেন, তার তুলনায় কলকাতায় অর্থ পাচারের পরিমাণ ছিল খুঁদকুড়ো। হিন্দু সম্প্রদায়ের সকলেই ইচ্ছা করে ভারতে তাদের অর্থ-সম্পদ সরায়নি। মুজিব হত্যার পর সামরিক শাসকরা যতই দেশের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান ছেঁড়াখোড়া করতে থাকেন, হিন্দু সম্প্রদায় তাদের নাগরিক সমানাধিকার ও নিরাপত্তা হারাতে থাকে, ততই তাদের মধ্যে আবার দেশত্যাগের প্রবণতা দেখা দেয় এবং দেশের ভিটেমাটি ব্যবসা বিক্রি করে যে অর্থ তারা সংগ্রহ করতে পারেন, সেটাই তাদের দেশত্যাগের সম্বল হয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে তারা তাদের বিষয়-সম্পত্তির যে ন্যায্য দাম পেতেন (বা এখনো পান) তা নয়। দেশে যখন যে দল ক্ষমতায় ছিল, তাদের সমর্থকদের অনেকে ক্ষমতার জোরে বহু ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের ভয় দেখিয়ে তাদের ভিটেমাটি, ব্যবসা, জমি-জিরাত (এমনকি দেবোত্তর সম্পত্তি) দখল করেছে এবং তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করেছে।

১৯৫০ সালে আমি নিজেই দেখেছি, কীভাবে বরিশালে ভয়াবহ সংখ্যালঘু নির্যাতনের পর ভীতসন্ত্রস্ত ও বেঁচে থাকা সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে পানির দামে, অনেক সময় বিনা দামে তাদের বাড়িঘর দখল করে নেওয়া হচ্ছে এবং তারা নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি অনুযায়ী বরিশালে পাঠানো অসংখ্য স্টিমারে চড়ে দলে দলে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। বরিশালের এক হিন্দু জমিদার বাড়ি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কিছু লোক দখল করার পর ওই জমিদারের পরিবারের হাতে দেশ ছেড়ে যাওয়ার স্টিমার ও ট্রেন ভাড়ামাত্র গুঁজে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৬৪ সালে ঢাকায় দাঙ্গার সময় 'সংবাদ'-এর তৎকালীন সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরীর অনুরোধে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির স্বেচ্ছাসেবকরা ওয়ারিতে গিয়ে দুর্বৃত্তদের দ্বারা পরিবেষ্টিত জনপ্রিয় চিকিৎসাবিদ ডা. নন্দীকে উদ্ধার করে সংবাদ সম্পাদকের বাসায় নিয়ে যান। এই স্বেচ্ছাসেবক দলে কলামিষ্ট বন্ধু ফয়েজ আহমদসহ আমিও ছিলাম। ডা. নন্দী দেশত্যাগে রাজি ছিলেন না। বারবার বলছিলেন, 'আমি দেশভাগ, এমনকি ১৯৫০ সালের সংখ্যালঘু নিধনের পরেও দেশত্যাগ করিনি। এখন কেন করব? আমার রোগীদের শতকরা ৯০ ভাগই তো হচ্ছে বাঙালি মুসলমান, তাদের ছেড়ে আমি কোথায় যাব? তারাই আমাকে গুণ্ডাদের হাত থেকে রক্ষা করবে।'

কিন্তু তখনকার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি এবং ডা. নন্দী সম্পর্কে মোনায়েম সরকারের মনোভাব লক্ষ্য করে জহুর হোসেন চৌধুরীসহ তার মুসলমান বন্ধুরাই তাকে আপাতত পশ্চিমবঙ্গে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি চলে যেতে না যেতেই ঢাকায় গভর্নর মোনায়েম

খানের পেটোয়া লোকেরা প্রচারপত্র বিলি করতে শুরু করে। তাতে বলা হয়, ডা. নন্দী এবং তার রাজনীতিক ভাই ভবেশ নন্দী 'ভারতের গুপ্তচর'।

আমাকে ঢাকার এক অর্থনীতিবিদ বলেছেন, (তিনি এখনো ঢাকায় আছেন। কেবল তার অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে নামটা প্রকাশ করছি না) বাংলাদেশের হিন্দুদের বিরুদ্ধে যে বলা হয়, তারা দেশপ্রেমিক নয়, সুযোগ পেলেই তারা আগে পূর্ব পাকিস্তান, এখন বাংলাদেশ থেকেও ভারতে টাকা পাচার করছে- এই অপপ্রচার সর্বাংশে সত্য নয়। হিন্দুদের একটা উচ্চবিত্ত সুবিধাবাদী অংশের কথা বাদ দিলে সাধারণ হিন্দুরা দেশপ্রেমিক। ১৯৪৭ সালের বাংলা ভাগের পরও তারা দলে দলে দেশত্যাগ করেনি। ১৯৫০ সালের ভয়াবহ নির্যাতন ও নিধনকাণ্ডের পরেই ব্যাপকহারে তাদের দেশত্যাগ শুরু হয়। তাদের বিষয়-সম্পত্তি যতটা লুট হয়েছে, বেদখল হয়েছে, ততটা তারা বিক্রিবাট্টা করতে পারেনি। পূর্ব পাকিস্তানে এবং পরে স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের নাগরিক অধিকার ও নিরাপত্তা দিন দিন যত বেশি সঙ্কুচিত হয়েছে, ততই তারা নিজেদের ভবিষ্যত নিরাপত্তার স্বার্থে ভারতে তাদের বিকল্প বাসস্থান ও জীবিকার ব্যবস্থা করার জন্য টাকা পাঠিয়েছে এবং পরে নিজেরা সুযোগমতো বাকি সম্পত্তি বা ব্যবসা-বাণিজ্য বিক্রি করে সেখানে চলে গেছে। এটা যদি তাদের মধ্যে দেশপ্রেমের অভাবের প্রমাণ হয়, তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের যারা নিজের দেশে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা এবং সর্বপ্রকার স্বার্থ সুবিধাসহ বাস করা সত্ত্বেও ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে দু'হাতে দেশের সম্পদ লুট করে, ব্যাংকের টাকা নিয়ে ঋণখেলাপী হয়ে সেই অর্থ বিলাস-ব্যাসনের জন্য বিদেশী ব্যাংকে দিনের পর দিন পাচার করেছে, দেশ সম্পর্কে তাদের মনোভাবকে কী বলা হবে?'

অর্থনীতিবিদ বন্ধু আমাকে আরো বলেছেন, তিনি হিসাব কষে আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর একশ্রেণীর মুসলমান ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি, রাজনীতিবিদ এবং সিভিল মিলিটারি হাই র‍্যাঙ্কিং অফিসার বিদেশে যত টাকা পাচার করেছেন, তার তুলনায় হিন্দুদের ভারতের টাকা পাঠানোর পরিমাণ সিকি ভাগও নয়। আমি তার সঙ্গে সহমত পোষণ করি। কয়েক বছর আগে ব্যাংক অব ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স ইন্টারন্যাশনাল (বিসিসিআই) ব্রিটিশ ও মার্কিন ব্যাংক কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে কোলাপস করার পর তাতে অর্থ আমানতকারী রাঘব বোয়ালদের যে নামের তালিকা ফাঁস হয়ে গিয়েছিল, তাতে বাংলাদেশের একগাদা সিভিল ও মিলিটারি ব্যুরোক্রাটের নামে গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ মধ্যপ্রাচ্যের শেখদের আমানতের কিছু মাত্র কম দেখা যায়নি।

বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, এমনকি পাহাড়িয়া সম্প্রদায়গুলোর মন থেকে ভারতের প্রতি নির্ভরতা অথবা ভারতের প্রতি মনে মনে আনুগত্য পোষণের বিতর্কিত অভিযোগটি দূর করার একটা প্রবল সুযোগ ও সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর। তখন বরং অনেক আগের বাস্তুত্যাগী হিন্দুদের মধ্যেও দেশে ফিরে আসার একটা ব্যাপার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলাদেশ সরকারকেই তখন সতর্ক হতে হয়েছিল যে, ১৯৬৫ সালের আগের দেশত্যাগী হিন্দু যেন ফিরে না আসে। কিন্তু এই প্রবণতাটি সম্পূর্ণ বদলে যায় ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর। ক্ষমতা দখলের পর জেনারেল জিয়াউর রহমান তার ক্ষমতার স্বার্থে ও ব্যক্তিগত ইচ্ছায় কলমের এক খোঁচায় সংবিধানের সেক্যুলার চরিত্র ধ্বংস করে এবং দেশে সাম্প্রদায়িক ও স্বাধীনতাবিরোধী দলগুলোকে মাথাছাড়া দিয়ে উঠাতে গিয়ে গোটা দেশ ও জাতির যে সর্বনাশ করে গেছেন, তার জের আমরা এখনো টেনে চলছি। তার আমল থেকেই হিন্দুরা আবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে। সংবিধানের চরিত্র বদলের সঙ্গে সঙ্গে তাদের নাগরিকত্বের মর্যাদা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে নেমে যায়। তাদের ওপর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নির্যাতন শুরু হয় এবং এবার নীরব দেশত্যাগ দেখা দেয়।

হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানদের সম্মিলিত দাবি সত্ত্বেও অর্পিত সম্পত্তি আইন (পাকিস্তান আমলের শত্রু সম্পত্তি আইন) যে বাংলাদেশের কোনো সরকারই বিলোপ করতে চাননি, এমন কি হাসি-না সরকারও গড়িমসির ভাব দেখিয়েছেন, তার কারণটি অত্যন্ত স্পষ্ট। সেই পাকিস্তান আমল থেকে হিন্দুদের সহায়-সম্পত্তি যারা দখল করেছেন, তাদের মধ্যে আওয়ামী লীগারদের সংখ্যাও কম নয়। বিশেষ করে '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় ১ কোটি হিন্দুর দেশত্যাগের সুযোগ হানাদার বাহিনীর আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে যারা তাদের অনেকের সম্পত্তি জবরদখল করেছিল, তাদের অধিকাংশই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভোল পাল্টে আওয়ামী লীগার হয়ে যায়। (আওয়ামী লীগ ক্ষমতাচ্যুত হলে তাদের বড় অংশই বিএনপিতে আশ্রয় নেয়)। ক্ষমতার এবং ভোটের রাজনীতির স্বার্থেই দুই দুটি আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে অর্পিত সম্পত্তি আইন সহসা বা সরাসরি নাকচ করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য খুঁটিনাটিগত কিছু প্রতিবন্ধকতা তো ছিলই। আন্তরিকতা থাকলে সেগুলো কাটিয়ে ওঠা যে কোনো সরকারের পক্ষে বহু আগেই সম্ভব হতো। আওয়ামী লীগ না হয় বহুকাল ক্ষমতার বাইরে ছিল। কিন্তু বিএনপি বা এরশাদের জাতীয় পার্টির সরকারের পক্ষে এই অবৈধ ও অমানবিক আইনটি বাতিল করা সম্ভব হয়নি কেন? কারণ একটাই, বাতিল করলে দুই দলেরই ওপরের ও নিচের নেতাদের অনেকের স্বার্থহানি ঘটত। আমার কাছে এমন রিপোর্টও আছে, এই অর্পিত সম্পত্তি আইন বিলোপের প্রচণ্ড বিরোধিতা ছিল সিভিল এবং মিলিটারি ব্যুরো□সির মধ্যেও। এই আইন বাতিলের দ্বারা তাদের অনেকেই 'পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা' হারানোর ভয় করেছেন।

আমি বুঝতে পারি না, বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা কী কারণে বা কিসের আশায় মাটি কামড়ে দেশে পড়ে থাকতে চাইবেন বা দেশপ্রেমের প্রমাণ বারবার তাদের দিতে হবে? যে দেশটির স্বাধীনতা অর্জনে তাদের স্বার্থত্যাগ, নির্যাতন ভোগ ও সংগ্রাম সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়; সেই স্বাধীন দেশে তারা দ্বিতীয় (আসলে তৃতীয় শ্রেণীর) নাগরিক। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো নামে অসাম্প্রদায়িক। কার্যত একটিতেও সংখ্যালঘুদের যথাযোগ্য প্রতিনিধিত্ব ও প্রভাব নেই। দেশ স্বাধীন হওয়ার ৩০ বছরের মধ্যেও রাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারপতি, সেনাপ্রধান পদে একজন সংখ্যালঘুও নির্বাচিত বা মনোনীত হননি এবং বর্তমান ব্যবস্থা চালু থাকলে আগামী ৫০ বছরেও হওয়ার সম্ভাবনা নেই। দেশত্যাগ করে বি□মপুরের জ্যোতিবসু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। ঢাকার জয়ন্ত চৌধুরী ভারতের প্রধান সেনাপতি হয়েছেন। আর দেশের মাটি আঁকড়ে থেকে রাজনৈতিক নেতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সমাজহিতৈষী দাতা রায়বাহাদুর রণদা প্রসাদ সাহা, ব্যবসায়ী নতুন সিংহ নিজ ঘরে শুয়ে নৃশংসভাবে কচুকাটা হয়েছেন।

সরকারি বা সামরিক উচ্চপদে দূরে থাক, প্রশাসন বিচার বিভাগ থেকে শিক্ষা ও অন্যান্য বিভাগ পর্যন্ত কোথাও সংখ্যালঘুদের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব কিছুমাত্র আছে কি? এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটিমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে হাসিনা সরকারের আমলে একজন মাত্র হিন্দু শিক্ষাবিদকে ভাইস চ্যান্সেলর পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। বিএনপি-জামায়াত সরকার ক্ষমতায় বসার সঙ্গে সঙ্গে তার কপালে 'আওয়ামীপন্থী' ছাপ মেরে বিতাড়ন করা হয়েছে। রাজনীতির ক্ষেত্রেও সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব, প্রভাব ও কণ্ঠশক্তি কোথায়? দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের একটিতেও সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আগামী ৩০ বছরেও কোনো সংখ্যালঘুর পক্ষে সম্ভব হবে কি? ব্যবসা বাণিজ্যে, চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে তাদের অবস্থার কথা আর না তোলাই ভালো।

শিক্ষিত, সচ্ছল, পেশাজীবী এবং উচ্চবিত্ত হিন্দু পরিবারের জন্যও বাংলাদেশে আজ ন্যূনতম ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নিরাপত্তা কোথায়? আমার ছোট ভাইয়ের মতো একজন হিন্দু উকিল, একটি জেলা শহরে প্র্যাকটিস করতেন। দেশে এত পটপরিবর্তন, এমন কি মুক্তিযুদ্ধের

সময়ও তিনি দেশত্যাগ করেননি। আমার সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ হলেই লিখতেন, আপনি তো স্বাধীন দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। আমি পালাব না। আমার সেই অনুজপ্রতিম বন্ধু ২০০১ সালের অক্টোবর নির্বাচনের পর দেশ ছেড়েছেন। কানাডার পথে তিনি দুদিন লন্ডনে ছিলেন তখন তার ২২ বছরের একমাত্র মেয়েকে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। আমি ঠাট্টা করে বলতে যাচ্ছিলাম, তুমিও শেষপর্যন্ত দেশ ছাড়লে? তিনি আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে মেয়ের দিকে আঙ্গুল তুলে বলেছেন, 'দাদা' ওর জন্য দেশ ছেড়েছি। আমার চোখের সামনে ওর কিছু ঘটলে আমি কি বাঁচতাম?' বলতে বলতে তিনি কেঁদে ফেলেছেন। ভদ্রলোক বললেন, 'তারই পাশের বাড়ির একটি মেয়ে-তার মেয়েরই বয়সী গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। বন্ধুর অবস্থা দেখার পর তার মেয়ে এক মাস কিছু খায়নি। কেবল কেঁদেছে। এই অবস্থা তো ওর হতে পারত।' ওদের সান্ত্বনা দিতে পারিনি। মেয়েটিকে বুকে টেনে নিয়েছি। সে কেঁদে বুক ভাসিয়েছে। এই মেয়ে আর আমার মেয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

বাংলাদেশে হিন্দু তথা সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরই ভবিষ্যৎ কী? এই প্রশ্নটিকে এড়িয়ে না গিয়ে, 'দেশে পূর্ণ সাম্প্রদায়িক শান্তি বিরাজ করছে'। এই ধরনের আপ্তবাক্য উচ্চারণ না করে দেশের ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই খোলাখুলি বিষয়টি আলোচনা করা উচিত। যদি সম্ভব হয়, পক্ষকাল পরে আমার এই কলামেই এ সম্পর্কে আরো কিছু আলোচনার ইচ্ছা রইল।

প্রথম আলো ৭ মার্চ ২০০৩

তাদের রামে মেরেছে রাবণেও মারছে

এবিএম মূসা

প্রতিবেদনটির শুরু এভাবে। 'হঠাৎ করেই আমাদের পার্টি অফিসে দেখা হয়েছিল দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস নামের এক যুবকের সঙ্গে। তার বাড়ি নাটোর জেলার লালপুর উপজেলায়। তিনি তার গ্রামের বাড়িতে ফিরে যেতে পারেননি। কারণ লালপুরের জার্জিস বাহিনীর অত্যাচারে অনেকের মতো তিনিও ঘরছাড়া।' প্রতিবেদনটি ভোরের কাগজে হায়দার আকবর খান রনো লিখেছিলেন দুই বছর আগে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। আমিও আজকে একইভাবে লেখা শুরু করতে পারতাম, 'হঠাৎ করে এক যুবক আমার বসার ঘরে হাজির। হাতে তার এক গাদা পত্রিকার কাটিং। যুবকটির নাম দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস। তার আর্তি, আমাদের কথা লিখুন, আমাদের বাঁচান! সেই লেখায় থাকবে আওয়ামী লীগ আমালে আমরা ঘরছাড়া হয়েছি, বিএনপি আমলে দেশছাড়া। আমি ঘর ছেড়েছি, দেশ ছাড়া না। আমার মতো কয়েকশ' লালপুরবাসী বাংলাদেশেই যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেশ ছেড়ে ভারতে যায়নি, যাবে না, যেতে চায় না।"

দীনেশের কাটিংয়ের বান্ডিলগুলি হাতে পেয়ে অবাক হলাম। কে লেখেনি, কোথায় ছাপা হয়নি লালপুরের কাহিনী! নির্মল সেন লিখেছেন জনকণ্ঠে ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০১-'প্রধানমন্ত্রী, নাটোরের লালপুর থানার কিছু ঘটনা।' নির্মল সেনের কাহিনীর মূল বক্তব্যে রয়েছে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের কাহিনী। সেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ আওয়ামী লীগ সরকারের কাছে প্রতিকার চেয়ে পায়নি। নির্মল সেন লিখেছেন, 'কোন কিছু না হওয়ার জন্য মানুষ ধরে নিয়েছে এ নির্যাতনের প্রতিকার হবে না। কারণ এ ঘটনার পেছনে আছেন একজন আওয়ামী লীগ নেতা-আতাউর রহমান জার্সিস। পিতা মৃত মুনতাজউদ্দিন, গ্রাম

আহম্মদপুর, থানা লালপুর। কোন সরকারই এ কাহিনীকে ঠেকাতে পারেনি, এখনও পারছে না।' পত্রিকার কাটিংগুলি, সব লেখা ও প্রতিবেদন পড়ে মনে হয়েছে, আসলে আওয়ামী লীগ বা বিএনপি কেউ সংখ্যালঘু নির্যাতন ঠেকায়নি, ঠেকাতে চায় না। আওয়ামী লীগ এই নির্যাতনকে পুঁজি করে রাজনীতি করেছে এবং করছে। বিএনপি সেই ধারাবাহিকতায় ফায়দা লুটছে। অন্তত দীনেশের কথায় মনে হয়েছে আওয়ামী লীগের নামে যারা রাজনীতি করেছে, তারা চেয়েছে হিন্দুদের জায়গা-সম্পত্তি। বিএনপি ভেবেছে মন্দ কি, এর ফলে আওয়ামী লীগের ভোট কমছে। সুতরাং আওয়ামী লীগের রাম আশ্রয় দেয়ার বদলে নিরাশ্রয় করেছে, বিএনপির রাবণ সেসব নিরাশ্রয়ীকে খেদিয়ে সীমান্ত পার করেছে। কয়েকশ' পরিবার লালপুর ছেড়ে চলে গেছে। দীনেশ আমাকে একটি লিস্টি দিয়েছে এসব দেশত্যাগীর। কিন্তু সবাই দেশ ছাড়েনি, দীনেশের মতো নিজ দেশে পরবাসী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আরও কয়েকশ'।

বিএনপি'র বর্তমান সাংসদ ফজলুর রহমান পটল ১৯৯৯ সালের ১৬ জুলাই মাতৃভূমিকে বলেছেন, 'জার্জিসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়ায় সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। তিনি বলেছেন, আমি এ ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অব.) রফিকের সঙ্গে কথা বলেছি কিন্তু লাভ হয়নি।' লাভ হওয়ার কথা নয়। দলীয় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলে রফিক চাকরি হারিয়েছেন। পটল জার্জিস বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। ফজলুর রহমান পটল এখন মন্ত্রী, তার দল বিএনপি এখন ক্ষমতায়। তারপরও কিন্তু লালপুরের হিন্দুরা ভিটেমাটিতে ফিরে যেতে পারেনি। কেন পারেনি বলতে পারেন ফজুলর রহমান পটল, কিন্তু বলবেন না। আওয়ামী আমলে যাই বলুন এখন ভাবছেন আওয়ামী ভোটাররা না এলেই ভাল। নাটোরের লালপুরে প্রমাণিত হয়েছে বিশেষ সরকারের আমলে বিশেষ উদ্দেশ্যে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার হয়েছে অথবা হয় এমন ধারণাটি মিথ্যা। আমি শুধু অবাক হয়ে ভাবছি, তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার কেন লালপুরের সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নিতে নিস্পৃহ ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে আমার মনে পড়ল জার্জিস শুধু নয়, ফেনীতে ও নারায়ণগঞ্জে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার হয়েছে। নারায়ণগঞ্জে স্থানীয় প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতার মন্দির দখল নিয়ে আমি নিজেই প্রতিবেদন ছেপেছিলাম। ফেনীতে সংখ্যালঘুদের জমি-জিরাত কোন জমানায় কারা দখল করেছিল তা পুরনো পত্রিকার ফাইল ঘাঁটলে জানা যাবে।

পত্রিকার কাটিংয়ের পাতাগুলি একের পর এক উল্টিয়েছি আর ভাবছি, তখন এসব চোখে পড়েনি কেন? প্রথম আলোতে রয়েছে ২০০১ সালের ১৬ অক্টোবরের খবর, 'লালপুরে আ'লীগ নেতা জার্জিস গণধোলাইয়ের শিকার।' রিপোর্টে বলা হয়েছে- 'লালপুর উপজেলার গোপালপুর, দুয়ারিয়া, দুড়দুড়িয়া, আড়বার ও ওয়ালিয়া থেকে অনেক সংখ্যালঘু জার্জিস বাহিনীর নির্মম অত্যাচারে জার্জিসের কাছে পানির দরে ভিটেমাটি বিি করে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।' সংখ্যালঘুরা যাদের কাছে আশ্রয় কামনা করে সেই আওয়ামী লীগের জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট আবুল কালাম দাবি করেছেন, স্থানীয় বিএনপি কর্মীরা জার্জিসকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় মারধর করেছে।' স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতার বক্তব্যে বোঝা গেল কেন তাদের শাসনামলে লালপুরের সংখ্যালঘুদের প্রতিকার হয়নি।

দৈনিক আজকের কাগজে কামাল লোহানী লিখেছিলেন লালপুর ঘটনাবলীর বিবরণ, প্রথম আলোতে রাশেদ খান মেনন, আরও লিখেছিলেন আহমদ ছফা, অজয় রায়। ডেইলি স্টারের তারিক আলী লিখেছেন, 'লালপুর থানার দশটি পরিবারের সঙ্গে দেখা হল। তারা পাঁচ বছর ধরে ঘরছাড়া। তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে।' কে করেছে উচ্ছেদ, কারা ১৫০০ পরিবারকে দেশছাড়া করেছে। তারিক আলী লিখেছেন, আওয়ামী নেতা জার্জিসকে এজন্য

দোষারোপ করে টিএনও রিপোর্ট করায় তাকে বদলি করা হয়। উলে-খ্য. রিপোর্টটি ১৯৯৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর ছাপা হয়েছে। এক বছর আগে লেখা শিরোনোম 'ডেটলাইন নাটোর, গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে লালপুরের সংখ্যালঘুরা।'

কুমারী সবিতা বিশ্বাসের অপহরণের ঘটনাটি পত্রপত্রিকায় এসেছে, কিন্তু কোন তদন্ত হয়নি। লালপুরের এই মেয়েটি অত্যাচারিত হওয়ার ভয়ে এখনও পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সেই কাহিনী ছাপা হয়েছে আটানব্বইতে দৈনিক জনকণ্ঠে। ভোরের কাগজ ৩ অক্টোবর, ১৯৯৬ তারিখে লিখেছে 'লালপুরে সন্ত্রাসী যুবলীগ নেতাকে গ্রেফতারের পর থানা থেকে ছাড়িয়ে আনলেন আ'লীগ নেতারা।' পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে লালপুরের ওপর এত প্রতিবেদন, মন্ত ব্য উপসম্পাদকীয় লেখার পর যখন কিছুই হয়নি তখন নতুন করে কী লিখব? তবুও দীনেশের আর্জি- সবাই লিখেছে, দেরীতে হলেও আপনি কিছু লিখুন। আমি নিজে কিছুই লিখলাম না, অতীতের লেখাগুলির হদিস দিলাম। উপসংহারেও আমি নিজে কিছুই লিখব না, দৈনিক সংবাদের বিজ্ঞ কলামিস্ট অনিরুদ্ধের লেখা দিয়ে শেষ করব। তার আগে জানতে চাইব, লালপুরের হিন্দুদের রিট মামলাটির কী হল? সেখানকার হিন্দুরা অতিষ্ঠ হয়ে সরকারি প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কাছে কোন প্রতিবিধান না পেয়ে গত বছর ২২ জানুয়ারি একটি রিট মামলা করেছিলেন। যুগান্তরের ২৩ জানুয়ারি সংখ্যার রিপোর্ট- 'হাইকোর্ট সংখ্যালঘু নিপীড়নের প্রতিকার চেয়ে দুটি মামলার পৃথক আদেশে ঘটনা তদন্ত করে রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন।' একটি বর্তমান বিএনপি সরকারের সময়ে, অন্যটি আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। সেই মামলার ফয়সালা আজও হয়নি। এক বছর ধরে ঝুলে আছে। আর হলেইবা কী? বর্তমান সরকার হাইকোর্টের বিভিন্ন নির্দেশের প্রতি যে মনোভাব দেখিয়েছে, তাতে হাইকোর্ট কী বলবে আর বলবে না তা নিয়ে আগ্রহ না থাকাই ভাল।

সংখ্যালঘু নিপীড়ন বর্তমান বিএনপি আমলে দেশ-বিদেশে যথেষ্ট হৈচৈ তুলেছে। সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার নিয়ে আমরা লেখালেখিও করেছি। কিন্তু এ যে অতীতের ধারাবাহিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী একটি দলের ক্ষমতায় থাকাকালীন ব্যর্থতা—তাও আলোচিত হতে হবে। বাস্তবতা হচ্ছে, এই দেশে সংখ্যালঘুদের নিয়ে সবাই রাজনীতি করছে। কেমন সেই রাজনীতি? লালপুর নিয়ে দৈনিক সংবাদের কলামিস্ট শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক সন্তোষ গুপ্ত ওরফে অনিরুদ্ধের কলামটির কথা বলেছিলাম। আগস্ট ২৮, ১৯৯৮ তারিখের লেখাটি থেকে উদ্ধৃতি দিলাম- 'এই তো সেদিন চট্টগ্রামে সোনার দোকানে ডাকাতির অভিযোগে এক লোক যে আগে ছিল যুব কমান্ডের আহ্বায়ক ও স্বাধীনতাবিরোধী, তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর সে আওয়ামী লীগে যোগ দেয়। অপরজন মোটর গ্যারেজের মিস্ত্রি থেকে ছাত্রলীগের ছত্রছায়ায় সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িত হয়। যারা তাকে উৎসাহভরে ছাত্রলীগে নিয়েছে তারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে মৌখিকভাবে বিশ্বাসী, আন্তরিকভাবে নয়। এই দুর্বলতার জন্যই বারবার ১৫ আগস্ট ও ৭ নবেম্বর দেখা দেয়।'

অনিরুদ্ধ বলেছেন দুর্বলতা, আমি বলব নীতিভ্রষ্ট সুবিধাবাদী নেতৃত্বের কারণেই আওয়ামী লীগ ক্ষমতা পেয়েও রাখতে পারেনি। বিএনপি আমলের ভোলা আর সাতক্ষীরা, আওয়ামী আমলের লালপুরেরই ধারবাহিকতা। আজকের সংখ্যালঘুদের যারা ফিরে দাঁড়াতে বলছেন, তারা কি বলতে পারবেন একই সঙ্গে রাম আর রাবণকে প্রতিহত করা সম্ভব হবে? তাই বিএনপিকে সংখ্যালঘু নিপীড়নের অভিযোগে অভিযুক্ত করার আগে আওয়ামী লীগকে তার দলের আদর্শ-বিরোধী সন্ত্রাসীদের বিতাড়িত করতে হবে। তা না করলে বর্তমান সরকারের সংখ্যালঘু নিপীড়ন নিয়ে অভিযোগ করার কোন নৈতিক অধিকার আওয়ামী লীগের নেই বলে মনে করতে হবে। দলের সন্ত্রাসীদের, যাদের কারণে বিগত নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়, তাদের

বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ কোন ব্যবস্থা আজো নেয়নি। অথচ কামাল হোসেন আর ড. সেলিম, কাদের সিদ্দিকীদের দলে রাখতে পারে না।

বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ রাবণ এবং রাম উভয়কেই বলতে হবে, লালপুরের হিন্দুরা এখন কোথায় যাবে? তাদের নিয়ে তো চ্যানেল ফোর টিভি সিরিজ তৈরি করেনি, দেশে-বিদেশে তাদের দুরবস্থা নিয়ে সেমিনার হয়নি, বিদেশী পত্রিকায় সমালোচনা হয়নি- তাই বলে কি তাদের দুর্দিনের অবসান হবে না? আর কতকাল দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস পত্রিকার কাটিং বগলে করে প্রতিকারের আশায় এ দুয়ার থেকে সে দুয়ারে ঘুরে বেড়াবে? সচেতন নাগরিক সমাজ অথবা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সকল মহল কি একবার লালপুর যেতে পারেন না, ঘরছাড়া মানুষগুলোকে আশ্বস্ত করে ভিটেমাটিতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন না?

যুগান্তর, ৯ মার্চ ২০০৩

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের কর্তব্য
হাসান ফেরদৌস

আবদুল গাফফার চৌধুরী হঠাৎ যেন বাংলাদেশে পারসনা ননগ্রাটা হয়ে পড়েছেন। সহকারী সম্পাদক ও কোনো কোনো সুপরিচিত বামপন্থী বুদ্ধিজীবী তো রয়েছেন-ই, গতকালের ছেলে-ছোকড়া কলাম লেখিয়েরাও যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন তাকে হেনস্থা করতে। গাফফার ভাইয়ের হাঁটুর সমান বয়সী এক কলাম লেখক দেখলাম তাকে বেকুব বলে সম্বোধন করেছেন। কলাম লেখকের বোধ-বুদ্ধিহীনতায় বিস্মিত হইনি, জানি সাম্প্রতিক বাংলাদেশের শিষ্টাচারবর্জিত রাজনৈতিক সংস্কৃতিতেই তার লালন। বিস্মিত হয়েছি সে সাপ্তাহিকের সম্পাদকের অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্তে। তিনি দেশ-বিদেশ ঘুরে নাগরিক শিষ্টাচার শিখেছেন বলেই জানতাম। কী জানি, ঘুটেঘরে এখন সম্ভবত সবকিছুতেই গোবরের গন্ধ!

গাফফার চৌধুরীকে নিয়ে চায়ের কাপে যে ঝড় উঠেছে, তার উৎস নিউইয়র্ক হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের একটি অনুষ্ঠানে তার ভাষণ। সে অনুষ্ঠানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। অল্প কিছু সংখ্যক বিদেশী বাদ দিলে সেখানে উপস্থিত বাকি প্রায় সবাই সংখ্যালঘু বাঙালি। মুসলমান বাঙালি সেখানে অনামন্ত্রিত। আমেরিকান সংবাদমাধ্যমকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও বাংলাদেশী বা নিউইয়র্কের বাংলা পত্রপত্রিকাকে সেখানে ডাকা হয়নি। কেন জিজ্ঞেস করাতে উদ্যোক্তাদের একজন আমাকে জানালেন, এদের কারোর প্রতি তাদের কোনো আস্থা নেই। 'আমরা আপনাদের চোখে দেশদ্রোহী, আমাদের কথা শোনার বদলে আমাদের সমালোচনা করাতেই আপনাদের আসল আগ্রহ। আপনাদের ডেকে আমাদের কী লাভ?'

অনুষ্ঠানের পুরো সময়জুড়ে তার এই মন্তব্যটি আমাকে ভাবিয়ে রাখে।

হাতেগোনা কয়েকজন বিদেশীকে ছেড়ে দিলে সে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা, শ্রোতা ও বক্তা প্রত্যেকেই বাঙালি। তারা কথা বলেন বাংলায়। অনেকে চমৎকার ইংরেজি বললেও বাংলা বলার সময় নির্দ্বিধায় গ্রাম্যতা জড়িয়ে ফেলেন। তাদের জন্মভূমি বাংলাদেশ, তাদের ভাবনায় বাংলাদেশ, এমনকি নিঃশ্বাসেও বাংলাদেশ। অধিকাংশের নিকট আত্মীয়স্বজন এখনো বাংলাদেশে। দেশের কথা বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়েন বা নির্লজ্জের মতো কেঁদে ফেলেন— এমন লোকের সংখ্যাও কম নয়।

জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক অথচ দেশের সংখ্যাগুরু মানুষদের সঙ্গে তারা কার্যত সম্পর্কহীন। তার চেয়েও বড় কথা, দেশের সংখ্যাগুরু মানুষও এদের সমস্যার প্রতি আশ্চর্য রকম নির্বিকার। এদের সমস্যা, অভিযোগ বা দাবির প্রশ্নে কোনো আলাপ-আলোচনা এমনকি মতবিনিময় পর্যন্ত নেই। সাম্প্রদায়িকতা, বিশেষত সাম্প্রদায়িক বৈষম্য যে বাংলাদেশে একটি সমস্যা, এ কথা দেশের সরকারের মতো দেশের অধিকাংশ মানুষও মানতে নারাজ। পত্রপত্রিকায় দাঙ্গার প্রতিবেদন ছাপা হলে তারা সেসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। কেউ কেউ বিরোধী রাজনীতিকদের কাজ বলে সেসবের গুরুত্ব খাটো করে দেখেছেন। কাজ যাদেরই হোক □মাগত নিপীড়নে সংখ্যালঘুদের পিঠ যে দেয়ালে এসে ঠেকেছে, এ কথা মানতে কেউই রাজি নয়। উচ্চ শিক্ষিত, আপাত প্রগতিশীল এমন অনেককে আমি জানি, যারা দেশে সাম্প্রদায়িকতা আছে তা মানতে রাজি কিন্তু তা নিয়ে বিদেশে কথা হোক, তাতে তাদের আপত্তি। এতে দেশের 'ইমেজ' ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে তাদের বিশ্বাস।

দু-চারজন সুপরিচিত বুদ্ধিজীবী বা রাজনৈতিক কর্মী বাদ দিলে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক ও সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়ন আছে বলে যারা দাবি করেন, তারা সবাই সংখ্যালঘু। অন্যদিকে কোনো নিপীড়ন নেই বলে যারা সে দাবিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেন, তারা সবাই সংখ্যাগুরু। সংখ্যালঘুরা নিজেদের মধ্যে বসে হ্যাঁ হ্যাঁ বলছেন, সংখ্যাগুরুরা বলছেন না, না। এদের একে অপরের মধ্যে কোনো বাক্যালাপ নেই কোনো আলাপ-আলোচনা নেই। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরুর মধ্যে সম্পর্কহীনতা-তাদের মধ্যে 'ডিসকানেক্ট'- নিশ্ছিদ্র, নিরঙ্কুশ।

আমেরিকায় বর্ণবাদ নিয়ে কথা উঠলে বক্তব্য পেশের জন্য ডাক পড়ে কৃষ্ণকায় নাগরিক অধিকার নেতা-কর্মীর। অস্ট্রেলিয়ায় আদিবাসীদের অধিকারহরণের প্রশ্ন উঠলে তা নিয়ে বিবৃতি দেন অ্যাবোরিজিন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা। যুক্তরাজ্য বা জার্মানিতে বর্ণবৈষম্য নিয়ে প্রশ্ন উঠলে অভিমত জানতে চাওয়া হয় ক্যারিবীয়, দক্ষিণ এশীয় বা আফ্রিকানদের কাছ থেকে। একমাত্র বাংলাদেশেই সংখ্যালঘুদের অধিকারের প্রশ্নে মতামত দেন সংখ্যাগুরুরা। সংখ্যালঘুরা কোনো বক্তব্য দিলে তা মিথ্যা বা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র বলে তাকে উড়িয়ে দেওয়া হয়।

সংখ্যালঘুর সঙ্গে দেশের সংখ্যাগুরু এই 'ডিসকানেক্ট' শুধু যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বেলায়, তা নয়। জাতিগত সংখ্যালঘুদের বেলাতেও তা পুরোপুরি বিদ্যমান। সংখ্যাগুরু বাঙালিরা চাকমা, গারো, হাজং ইত্যাদি জাতিগত সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের ব্যাপারে যেমন উদাসীন, তেমনি এ ব্যাপারে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার প্রশ্নেও সম্পূর্ণ অনাগ্রহী। তাদের সঙ্গে কোনোরকম সামাজিক-সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান নেই, ব্যক্তিগত পর্যায়ে বন্ধুত্ব নেই। চাকমা বা গারোরা কী চায় তা বিন্দুমাত্র বিবেচনায় না রেখে তাদের সবাইকে দুম করে বাঙালি বানিয়ে দিলাম আমরা। তাদের পাহাড়ি আবাস এলাকা দখল করে নিলাম, তাদের ভাষার অধিকার অগ্রাহ্য করলাম, অর্থনৈতিকভাবে তাদের পঙ্গু করে রাখলাম। নিজের দেশে পরবাসী এসব উপজাতিরা যখন তাদের অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য অস্ত্র তুলে নিল, তখন তার জবাবে পুরোমাত্রায় সামরিক অবরোধ বসিয়ে রাখলাম। আলাপ-আলোচনা নয়, যুদ্ধই ভালো বলে বিবেচিত হলো দেশের সরকারের কাছে। সংখ্যাগুরু বাঙালি তাতে আপত্তির কিছুই দেখল না।

মনে পড়ছে আশির দশকের মাঝামাঝি ঢাকায় জার্মান লেখক গুন্টার গ্রাস এসেছিলেন। বাংলা একাডেমিতে এক আলোচনা সভায় তিনি দেশের সেরা বুদ্ধিজীবীদের প্রশ্ন করেছিলেন, আপনারা কি জানেন আপনাদের দেশের ভেতরে জাতি হত্যা চলছে, একাধিক উপজাতিকে নিপীড়নের শিকার হতে হচ্ছে, কিন্তু আপনারা কেউ তার কোনো প্রতিবাদ করছেন না কেন? সে প্রশ্নের তেমন কোন সদুত্তর শুনেছিলাম বলে মনে পড়ছে না। একদিকে সংখ্যাগুরুর প্রতিবাদহীনতা অন্য দিকে উপজাতি প্রশ্নটি রাজনৈতিকভাবে বিবেচনায় না এনে তাকে সম্পূর্ণ

অগ্রাহ্য করার ফল দাঁড়ালো এই যে, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য উপজাতিদের হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হলো। প্রায় পঁচিশ বছর পরেও তাদের সে বিদ্রোহ শেষ হয়নি। উপজাতি প্রশ্নে বাংলাদেশে যে রক্তক্ষরণ, তাতে কেবল দেশটিই দুর্বল হয়নি, তার মানবিকতাও ক্ষুণ্ন হয়েছে। একটি দেশ যখন তার নাগরিক মানবিকতা হারায়, তখন তার সম্মিলিত চেতনাও স্তিমিত হয়, তাতে নোনা ধরে।

আমার ভয়, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রশ্নেও আমরা সেই একই রক্তক্ষরণের পথ বেছে নিচ্ছি। সংখ্যাগুরুর সঙ্গে সংখ্যালঘুর রাজনৈতিক 'ডিসকানেক্ট'-এর ফল সর্বত্রই অভিন্ন সহিংস চূড়ান্ত বাদ। চেচনিয়া থেকে কাশ্মীর, আসাম থেকে কুর্দিস্তান- সবখানেই সেই একই ছবি। তাদের অবিবেচনা, অবহেলা ও স্পষ্ট আগ্রাসনের ফলে সংখ্যালঘু যাতে সহিংসতার পথে পা না বাড়ায়, সে ব্যাপারে মূল দায়িত্ব সংখ্যাগুরুর; সংখ্যালঘুর নয়। যারা অধিকারভোগী, কেবল তারাই সে অধিকার ভাগাভাগির ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে পারে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু বিভাজন যে এখনো রক্তাক্ত হানাহানিতে পর্যবসিত হয়নি তার একটি প্রধান কারণ, সংখ্যালঘুরা সেখানে দুর্বলতম জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত। মাথায় লাঠির ঘা পড়লে পাল্টা লাঠির ঘা যে তারা দেবে, সে শক্তিই তাদের নেই। কিন্তু এখন দেশের বাইরে চলে আসা সংখ্যালঘুরা □মশ সংগঠিত হচ্ছে, দেশের বাইরে বসেও সংখ্যাগুরুকে পাল্টা লাঠির ঘা কী করে দেওয়া যায় সে বুদ্ধি তারা পেয়েছে।

নিউইয়র্কে ঐক্য পরিষদের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তার কথা থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট বাংলাদেশের মুসলমানদের কাছ থেকে ভালো কিছু তারা আর প্রত্যাশা করেন না। আওয়ামী লীগ বা বিএনপি কেউই তাদের অভিযোগ কানে নেবে না, প্রতিকারের আইনি উদ্যোগ নেবে না বা শুকনো কথা ছাড়া কার্জকর কিছুই করবে না। এই অবস্থায় যা কিছু করার তা তাদের নিজেদেরই করতে হবে। সব বক্তা ঘুরেফিরে সে কথাই বললেন। আমার ভয়, এই 'একটা কিছু করার চেষ্টা'র ফলে তাদের উদ্দেশ্য-আদর্শ বাস্তবায়িত হোক বা না হোক, বাংলাদেশের তাতে বিস্তর ক্ষতি হতে পারে। অভিবাসী সংখ্যালঘুরা দেশের সংখ্যালঘুদের মতো নিঃস্ব নয়। তারা শিক্ষিত, দেশের বাইরে রাজনৈতিক নেটওয়ার্ক কীভাবে গড়তে হয় তা তারা জানে; আন্তর্জাতিক ফোরামে লবি কীভাবে করতে হয় তাও তাদের জানা। মার্কিন কংগ্রেসম্যানকে দিয়ে তীব্র সমালোচনাপূর্ণ চিঠি তারা লেখাতে পারে। বিদেশী সাংবাদিক ডেকে চমৎকার সেমিনারের আয়োজনও তাদের ক্ষমতার মধ্যে। আমাদের 'ইমেজ'-এর ভালো কিছু যদি এখনো অবশিষ্ট থেকে থাকে তার বারোটা বাজানো তাদের ক্ষমতার বাইরে নয়। ১১ সেপ্টেম্বর-পরবর্তী আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আবহের কথাটা মাথায় থাকলে এই বিপদের মাত্রাটা ভালোভাবে বোঝা যাবে।

বাংলাদেশের রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীদের এই ক্ষতিকর সম্ভাবনার প্রতি আরো সচেতন হওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়। দেশের ভেতরে সংখ্যালঘুদের জেলে পুরলে বা কলাম লেখিয়ে দিয়ে তাদের কষে গাল দিলে এই সচেতনতা প্রকাশিত হবে না। বরং সমস্যা আছে-সে কথার স্বীকৃতি এবং তার সম্ভাব্য সমাধান খোঁজার চেষ্টার ভেতর দিয়েই তার প্রকাশ সম্ভব। এ কথা সরকারকে বুঝতে হবে, সাংবাদিককে বুঝতে হবে, রাজনৈতিক কর্মীকে বুঝতে হবে। 'নেই নেই' বলে চেঁচালে বিভেদের যে দেয়াল তৈরি হয়েছে, তা কেবল আরো কঠোর হবে, তা ভাঙা দুঃসাধ্য হবে। তাতে কোনো কোনো রাজনীতিকের লাভ হলেও বাংলাদেশের কোনো লাভ হবে না, এ ব্যাপারে কোনে সন্দেহ নেই।

কাজ আরো একটি করতে হবে। দেশের ভেতরে এবং বাইরে সংখ্যালঘুরা যে সার্বিক বিচ্ছিন্নতায় ভুগছে, তা ঘুচাতে হবে। এই কাজটাই দরকার সবচেয়ে বেশি এবং সবার আগে।

'তোমরা আমাদের লোক, আমাদের ভাই-বন্ধু'-এই প্রত্যয় তাদের মনে জাগাতে হবে। বর্তমানে নিরঙ্কুশ সংযোগহীনতা ঠেকাতে হবে। এই কাজটি যে একদম হচ্ছে না, তা নয়। গত বছর নির্বাচন-উত্তর যে সাম্প্রদায়িক হানাহানি ছড়িয়ে পড়ে, তার বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন ছেপে দেশের তথ্য মাধ্যম সে কাজটিই করেছে। কোনো কোনো লেখক-বুদ্ধিজীবীও সহানুভূতি ও সমর্থনের হাত প্রসারিত করেছেন। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী তাদেরই একজন। তার কথায়, তার শক্তিশালী বক্তব্যে সংখ্যালঘুদের মনে যে আস্থা জেগেছে, তার প্রমাণ নিউইয়র্কের অনুষ্ঠানে সংখ্যাগুরুদের ভেতর থেকে একমাত্র তিনিই ছিলেন আমন্ত্রিত বক্তা। কী এমন কথা গাফ্‌ফার চৌধুরী বলেছিলেন যে, দেশের ভেতরে বাম-ডান সব এভাবে প্রতিবাদ করে উঠল?

সংখ্যালঘুদের উদ্দেশ্যে গাফ্‌ফার ভাইয়ের বক্তব্য ছিল তিনটি। প্রথমত, দেশের ভেতরে সংখ্যালঘুরা বৈষম্যের শিকার। কিন্তু সে বৈষম্য নিরসনে ভারতের বিজেপির দিকে হাত বাড়াবেন না। দেশের ভেতরে থেকেই এই সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র চলছে। সে ষড়যন্ত্রে হাত মেলাবেন না।

তৃতীয়ত, দেশের ভেতরে সংখ্যালঘুরা অধিকারহীন। তাদের অধিকার রক্ষায় দেশে ফিরে যান। সংগ্রাম করে তাদের অধিকার রক্ষা করুন।

গাফ্‌ফার ভাইয়ের কথায় আবেগ ছিল কিন্তু তাতে যুক্তিও ছিল। সংখ্যালঘুদের যে সমস্যা, তার সমাধানে প্রথম পদক্ষেপ হলো সে সমস্যার স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতির ভেতর দিয়ে রাজনৈতিক মতবিনিময়ের প্রাথমিক ক্ষেত্র যেমন তৈরি হবে, তেমনি সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ভেতর সম্প্রীতির একটি অভিন্ন ক্ষেত্র-'কমন বেস'-তৈরি হবে। এখন বিভেদের যে দেয়াল রয়েছে, তার জায়গায় সম্প্রীতির সাঁকো তৈরি সম্ভব হবে।

নিউইয়র্কে ঐক্য পরিষদের অনুষ্ঠানে সেই সাঁকো তৈরির প্রথম ইটটি বসিয়ে গেলেন গাফ্‌ফার ভাই। এখন এই সামান্য উদ্বোধন থেকে পুরোদস্তুর একটি ব্যবহারযোগ্য সাঁকো নির্মাণের দায়িত্ব আমাদের সবার।

প্রথম আলো, ১৪ মার্চ ২০০৩

বাগেরহাটের চপেটাঘাত

মমতাজ লতিফ

বাগেরহাটে সম্মানিত একটি হিন্দু পরিবারের ওপর যে লোমহর্ষক নির্যাতন সংঘটিত হয়েছে তা বাংলাদেশের ভাবমূর্তির মুখে অসংখ্য চপেটাঘাতের মধ্যে নতুন সংযোজন। এ ধরনের অপরাধ এই মাপের পরিবারের বিরুদ্ধে ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের প্রশ্রয় ছাড়া ঘটা অসম্ভব, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। যে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দৈনিক সহিংসতায় মানুষ খুন হচ্ছে এবং সরকারের মন্ত্রীরা পক্ষপাতিত্ব ও জবরদখলের প্রতিযোগিতায় নেমেছেন, সরকার এসব বিষয়ে যে সীমাহীন নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তা প্রদর্শন করছে, তাতে এই পরিবেশে হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু, আদিবাসীরা কীভাবে বসবাস করবে, তা যেকোন সংবেদনশীল মানুষকে না ভাবিয়ে পারে না। অক্টোবর নির্বাচন থেকে এই সময় পর্যন্ত সংখ্যালঘু নির্যাতন, খুন, ধর্ষণ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে এটি আবারও বেড়েছে, তবে বন্ধ হয়নি কখনও পুরোপুরি, এ নির্যাতন বন্ধ করার আন্তর্জাতিক চাপ সত্ত্বেও। অবশ্য কালো তালিকাভুক্তি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সমালোচনার পর বাগেরহাটে ত্বরিত পুলিশি তৎপরতা দেখা গেল, যদিও ঘটনা ঘটার পর যা করা হচ্ছে ঘটনা ঘটার আগে ঘটনাটি প্রতিহত করার কোন উদ্যোগ না থাকা, এর পাশাপাশি আরও সংখ্যালঘু পরিবার আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা কেন ঘটছে এ প্রশ্ন না করে উপায় নেই। কারণ সবাই জানে নির্বাচনের সময় ও পরে জেলে থাকা কত হাজার সন্ত্রাসী মুক্তি পেয়ে কোন্ কোন্ এলাকায় কি ধরনের অপরাধ কাজে নির্দেশিত হয়ে অপরাধ করে চলেছে, তাদের গতিবিধি, নাম-পরিচয়, লক্ষ্যবস্তু/ব্যক্তি সবকিছু সম্পর্কে পুলিশ অবহিত। পুলিশকে জানতে হয়, সরকার এদের ধরতে, বিচার করতে চায় কিনা। একমাত্র এই একটি নির্দেশ থাকলে আজ বিরামহীনভাবে সংখ্যালঘু বা বিরোধী রাজনীতিক নির্যাতন বন্ধ হয়ে যেত, এ কথা অন্তত যেকোন শিক্ষিত ব্যক্তি বোঝেন। চার জাতীয় নেতার জেলখানায় খুন হওয়ার সময়ে যেমন খন্দকার মোশতাক জেলারকে বলেছিলেন'ওরা (খুনিরা) যা করতে চায়, তা করতে দিন', সে রকম নেপথ্য নির্দেশ থাকলে এ নির্যাতন বন্ধ হওয়ার নয়।

সরকার চাইলে পুলিশ নির্দেশ মানে তা দেখা যাচ্ছে সাতক্ষীরায় জামায়াতুল মুজাহিদীন নামের সহিংস গোষ্ঠীর সদস্যদের বোমা, অস্ত্র, তথ্য পুস্তিকা, ক্যাসেট ইত্যাদিসহ গ্রেফতার করা। অথচ দিনাজপুর বোমা বিস্ফোরণের কোন রহস্য উদঘাটনে তেমন তৎপরতা দেখা যায়নি। আর ময়মনসিংহ বোমা হামলা নিয়ে বিরোধী রাজনীতিক, সাংবাদিকদের জড়ানোর ঘটনাকে জাতি কীভাবে মূল্যায়ন করে তা বলাবাহুল্য। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর ইনডেমনিটির আশ্রয় খোঁজা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার বেআইনি উপায়কে নির্দেশ করে কি? হুকুমদাতা সরকার যখন ইনডেমনিটি খোঁজে, তখন যারা হাতে-কলমে খুনি তারা যা করার কথা তাই করছে—এতে বাংলাদেশের কালো তালিকাভুক্তি থেকে নাম কাটানো ত্বরিত হবে না ধীরগতির হবে—তার উত্তর যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাঙালিরা ভেবে দেখতে এবং সরকারকে ভাবনাগুলো জানাতে পারেন।

২০০১-এর রামশীল থেকে বাগেরহাট, পূর্ণিমা, শেফালী থেকে তপনের স্ত্রী, জা ও আত্মীয়া, এর মধ্যে আছে আরও অসংখ্য খুন ও ধর্ষণ। এই অপতৎপরতার স্পষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে হিন্দুহীন করা। কেননা এদেশের উগ্র দলগুলো, যারা নিজেদের '৭১-এ পাকিস্তানি হানাদারদের সঙ্গে একাত্মবোধ করে মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধ ও হিন্দু এবং প্রগতিশীল ব্যক্তি ও দলের সরাসরি নিধনে নিযুক্ত হয়েছিল এবং যারা বর্তমানে আত্মস্বীকৃত তালেবান সমর্থক বলে

গৌরব প্রকাশ করেছিল এবং যারা হরকাতুল জেহাদ জামায়াতুল মুজাহিদীন, আল-হিকমা ইত্যাদি নামে উগ্রসহিংস পন্থায় শাসন প্রতিষ্ঠার তৎপরতায় লিপ্ত এদের সবাই একটি বিষয়ে একমত যে, এদেশের বাঙালি মুসলমান এখনও খাঁটি মুসলমান হয়নি এবং এ পথের প্রধান বাধা এ দেশের বাঙালি (এদের মতে হিন্দুয়ানি, যা পাকিস্তানিরাও মনে করত) উৎসব-অনুষ্ঠান, আচার-আচরণ, মেয়েদের রাজপথে-অফিসে মুক্ত চলাচল এবং প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিকর্মীরা, অসাম্প্রদায়িকতাকে লালনকারী রাজনৈতিক দলগুলোকে শনাক্ত করেছে। নতুবা শামসুর রাহমান বা আবেদ খান বা মুনতাসীর মামুন, শাহরিয়ার কবির যাদের অবস্থান সন্ত্রাস-সহিংসতা থেকে বহু দূরে, তাদেরকে আক্রমণ করার কি কারণ থাকবে? এছাড়া এদেশের লোকসংস্কৃতি, আউল-বাউল-সহজিয়াদের গান-সাহিত্যকেও এরা সন্দেহের চোখে দেখে, কেননা এ সাহিত্য-সঙ্গীতে মানবিক, প্রেমিক ঈশ্বর আল-হ্ এক হয়ে অবস্থান করছে এবং এতে হিন্দু-মুসলমান, সব ধর্মের মানুষ এক হয়েছে। এই ধর্মনিরপেক্ষ লোকজ সংস্কৃতিকে তালেবান স্টাইলের ধ্যান ধারণার প্রসারের পক্ষে প্রতিকূল উপাদান হিসেবে এরা শনাক্ত করে এবং বাঙালির এই অসাম্প্রদায়িক মানবিক, ধর্মনিরপেক্ষ ঋতু ও প্রকৃতিভিত্তিক উৎসব-অনুষ্ঠানগুলোর অধিকাংশের জন্মসূত্র হিন্দুধর্ম। এদের জমি, সম্পদ, লুট, দখল বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে চলেছে। এখন স্বল্পসংখ্যক হিন্দুকে দেশত্যাগ করানো এবং বাংলাদেশকে হিন্দুহীন 'মডারেট মুসলিম রাষ্ট্র' নামাঙ্কিত করা, এর সঙ্গে আনুষঙ্গিক অন্যান্য পদক্ষেপ, এমনকি শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনা থাকা অসম্ভব কিছু নয়। '৭১-এর আল-বদর, আল-শামসদের জন্মদাতারাই যে বর্তমানের জামায়াতুল মুজাহিদীন, হরকাতুল জেহাদ, আল হিকমা ইত্যাদির জন্ম দিয়েছে, তা পূর্বের খুনিদের সঙ্গে বর্তমানের এসব খুনিদলের লক্ষ্য ও পন্থায় বিশেষ কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। অর্থাৎ বাংলাদেশের জন্মের শত্রুরা নানা বেশে এখনও এই রাষ্ট্রের মূলনীতি, মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা-ধর্মনিরপেক্ষতা, সব ধর্মের সমানাধিকার, নারীর অধিকারের বিরুদ্ধতা করে চলেছে।

হিন্দুহীন বাংলাদেশ কেমন হবেএ অবস্থা আসলে অন্যান্য সংখ্যালঘু এবং মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যালঘু প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিসেবীদের স্বার্থে নানাভাবে আঘাত করবে। একটি উদাহরণে এর প্রভাব সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হতে পারে। ছেলেবেলায় আমরা নিজেদের হিন্দু-মুসলমান কিনা জানতাম না, একটু বড় হয়ে জেনেছি, যদিও এতে কোন পার্থক্য থাকে তা বুঝিনি, একসঙ্গে পড়েছি, খেলেছি, নাচ-গান করেছি এবং এক থালায় খেয়েছিও। অথচ এখনকার মুসলমান শিশুরা শিশু বয়সে সালাম, টুপি মাথায় দেয়া, আজানের সময় বালিকারা মাথায় কাপড় দেয়া এসব শেখে। একটু বড় হতেই 'হিন্দু' বলে অন্য শিশুদের ঘৃণা করতে শেখে। এগুলো বাবা, মা'ই শেখাচ্ছে অবশ্যই। কিন্তু আরও বড় হলে ইউরোপ, আমেরিকার সাদা খ্রিস্টানদের দ্বারা ঘৃণিত হয়েও তাদের ঘৃণা করে না। বরং তাদের মনোরঞ্জন করতে পারলে ধন্য হয়। এদের বেড়ে ওঠার মধ্যে এসব অসংলগ্নতা এদের এক ধরনের সাম্প্রদায়িক করে তোলে, যাদের মধ্যে ভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষের জন্য উদারতার স্থান সঙ্কুচিত হয়ে আসে। নিরক্ষর গ্রামীণ ধার্মিক মানুষের মধ্যে যে উদার সহজিয়া ধর্মের লোকজ ধারণাগুলো তাদেরকে হিন্দু বা যেকোন ভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করতে প্রেরণা যোগাত, তাও আজ গ্রামে-গঞ্জে-শহুরে কট্টর ধার্মিক খুনি-সন্ত্রাসী-টাউটদের হাতে সমাজ কর্তৃত্ব চলে যাওয়াতে তারও অবক্ষয় চলছে। আগে সমাজ তার সদস্যদের যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বেড়াজাল দিয়ে সুরক্ষা দিত, আজ যে নিরাপত্তা প্রহরীরা সস্থানে নেই। যেমন, দশ বছর আগেও দাঙ্গার প্রধান প্রতিরোধকারী হিসেবে দ্রুত দাঁড়িয়ে যেত কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়ন, অন্যান্য বামদল এবং আওয়ামী লীগ কর্মীরা। বতমানে যে সংখ্যালঘু নির্যাতন চলছে তাতে

গ্যাস, তেল, বন্দর রক্ষাকারীদের মতও বামদের কোন জোরাল প্রতিরোধ দেখতে পাই না। সংখ্যালঘুরা নতুন শত্রুর মোকাবেলাই শুধু করছে না, একই সঙ্গে তারা পরীক্ষিত বন্ধুদেরও হারাচ্ছে। এরকম রুদ্ধশ্বাস কট্টর পরিবেশে অন্য সংখ্যালঘুরা এবং যা বলছিলাম প্রগতিশীল মুসলমান মুক্তবুদ্ধির চর্চাকারী বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিকর্মীর ফুল ফোটানো দূরে থাক, বৈচিত্র্যময় শিল্প নির্মাণের পথ যেমন রুদ্ধ হবে, তেমনি এদের অস্তিত্ব রক্ষাই কঠিন হয়ে উঠবে। উদাহরণ তালেবানি আফগানিস্তান যেখানে বাঙালি তালেবান যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে।

সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষা কখনওই সম্ভব নয় যদি না সংখ্যাগুরু তাদের সুরক্ষা দিতে এগিয়ে আসে। তাছাড়া নখ-দন্ত বের করে তেড়ে আসা খুনি-ধর্ষকদের বাধা দিতে পারে একমাত্র সংখ্যাগুরু মানুষরা যারা উদার, অসাম্প্রদায়িক আদর্শে বিশ্বাসী এবং এই বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। শত্রু যেখানে সরকার দ্বারা আশ্রিত হয়, তখন অন্যদের একমাত্র শক্তি ঐক্য। এসব আ্রান্ত স্থানে বামদলগুলো সমন্বয়কের দায়িত্ব নিয়ে আওয়ামী লীগ, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সংস্থা মিলে জেলা-থানা ভিত্তিক একটি ঐক্যবদ্ধ সংখ্যালঘু সুরক্ষা কমিটি গঠন করে প্রতিরোধ ও প্রতিকার কাজ গ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। একটি এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করে সামাজিকভাবে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করা এবং প্রতিরোধের কলাকৌশল সম্বন্ধে অবহিত করা, প্রয়োজনে সরকারের ভেতরের মুক্তমনা মন্ত্রী-এমপিদের সহযোগিতা দাবি করা ইত্যাদি কাজ দেরিতে হলেও শুরু করা দরকার। সন্ত্রাসীরা অন্তত এই মনস্তাত্ত্বিক চাপটুকু অনুভব করুক যে, সংখ্যালঘুরা সহায়হীন নয়, সবাই তাদের পাশে রয়েছে। সরকারকেও বোঝানো দরকার বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের বন্ধু রয়েছে। প্রবাসীরা আন্তর্জাতিকভাবে এ ধরনের ধর্ম বা জাতিগত নির্যাতনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রস্তাব তুলতে পারে। শুধু অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন কেন, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিচারেরও বিশ্বায়ন হবে না কেন? সব দেশের, বাংলাদেশ ও ভারতসহ বিভিন্ন দেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়টি আন্তর্জাতিকভাবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

সংবাদ, ১৬ মার্চ ২০০৩

জ্ঞানজ্যোতি ভিক্ষু হত্যা ঃ বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে

বিপ-ব বড়ুয়া

মানবতাবাদী বৌদ্ধভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি হত্যাকাণ্ড বৌদ্ধ ইতিহাসে একটি নির্মম-নৃশংসতম হত্যাযজ্ঞ। এরকম একজন নিঃস্বার্থ, নির্লোভ, পরোপকারী, ধ্যানী, বিনয়শীল অনাথপিতাকে ধারাল ছোরা দিয়ে গলা কেটে হত্যা করার ইতিহাস সৃষ্টিকারী ঘটনার জন্ম হয়েছিল আমাদের প্রাণের বাংলাদেশ। ২০০২ সালের ২১ এপ্রিল রাত ১২ টায় চট্টগ্রামের রাউজানস্থ হিংগলা গ্রামে তারই প্রতিষ্ঠিত ওঁয়ারা পুঞঞা অনাথাশ্রমে এই হত্যাকাণ্ডের আজ ২১ এপ্রিল ২০০৩ এক বছর পূর্ণ হলো। জ্ঞানজ্যোতি ভিক্ষুর হত্যাকাণ্ডের স্মরণীয় দিন। ৩৬৫ দিনের এক বছর সাধারণ জনগণের কাছে আশ্চর্য মনে হলেও সরকার এবং পুলিশ প্রশাসনের কাছে এটি কোন সময়ই নয়। দীর্ঘ এক বছর পরও কোন অদৃশ্য হাতের কারণে এই মামলাটি এখনও ফাইলবন্দি হয়ে রয়েছে বোধগম্য নয়। অথচ সরকারের ১শ'টি চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলার মধ্যে এটি অন্যতম। এখন জনগণের কাছে একটিই প্রশ্ন- সেসময় এটিকে চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলা হিসেবে গ্রহণ করে কি সরকার সান্ত্বনা দিয়েছিল? এই হত্যা মামলার অন্যতম আসামি এলাইচ মাহমুদ মাত্র ৪শ' টাকার বিনিময়ে এবং অপর কয়েকজনের সহযোগিতায় হত্যা করার কথা আদালতে দেয়া এক জবানবন্দিতে শিকার করেছিল। ২২ ডিসেম্বর এলাইচ মাহমুদকে গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে মামলা সহজে নিষ্পত্তি করার কথা খোদ পুলিশ প্রশাসনও বলেছিল। জনগণও একটি নাটকীয় ধূম্রজাল থেকে বের হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। আজ পর্যন্ত সে আশায় গুড়েবালি হয়ে গেছে। হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বের অনেক দেশে হত্যাকারীদের বিচার ও শাস্তির দাবিতে আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়েছিল সর্বস্তরের বিবেকবান মানুষ। টানা দু'মাস এই বাংলার মাটিতে আন্দোলনে মুখর ছিল প্রতিটি বৌদ্ধ অধ্যুষিত জনপদ, গ্রাম ও শহর। তারা আশা করেছিল, মাস না হয় দু'মাস ততোধিক তিন মাসের মাথায় এই চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলার কোন একটি সুরাহা হবে। গ্রেফতারকৃত এলাইচ মাহমুদ অনেকের নাম প্রকাশ করার পরও, মামলাটির এখন পর্যন্ত কিছুতেই কিছু হলো না। মামলার অগ্রগতি কি হলো- জনগণ আজ জানতে চায়। এ সম্পর্কে জানতে ঘটনার ৩/৪ মাসের মধ্যে জ্ঞানজ্যোতি ভিক্ষু হত্যার বিচার জাতীয় অন্দোলন কমিটি সিআইডি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কয়েকবার যোগাযোগ করেছিল। প্রতিবারই তদন্তকারী কর্মকর্তা সময়ের অজুহাত তুলে, চাকরি এবং ধর্মের দোহাই দিয়ে আন্দোলন কমিটির কর্মকর্তাদের ধৈর্য ধরার কথা বলেছিলেন। যখনই আন্দোলন কমিটি তার সঙ্গে দেখা করত তিনি বারবারই একটি কথা বলতেন, আগামী মাসের মধ্যে আশা করি চার্জশিট দিতে পারব। এভাবে বলতে বলতে আজ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা এক বছরে পা রাখল। আজকে ওই তদন্তকারী কর্মকর্তা, সরকার, পুলিশ প্রশাসনের উদ্দেশে বলতে চাই- এই মামলার কার্যসম্পন্ন করতে আর কতদিন সময় দিলে আপনারা খুশি হবেন?

ঘটনার পরদিন থেকে রাউজান থানা পুলিশ হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে অনেক চেষ্টা করেছে। আপামর জনগণ দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তা প্রতিহত করে। এই হত্যাকাণ্ডের দায়ভার আপনারা কোনভাবে এড়াতে পারেন না। শান্তির অন্বেষণে যে বৌদ্ধভিক্ষুরা নিজেদের উৎসর্গ করে দেন, সেরকম একজন ভিক্ষুকে হত্যার দায় কিভাবে এড়াবেন জোট সরকার মহাশয়? হয়তো ক্ষমতার প্রভাবে আপনারা হাঁকডাক ছাড়তে পারেন; কিন্তু বাকি হত্যাকারীদের গ্রেফতারপূর্বক শাস্তির ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত আপনারা মুক্তি পেতে পারেন না। এটা কি মানবাধিকার লংঘন নয়? একটি স্বাধীন দেশে একজন শান্তিকামী

মানবতাবাদী বৌদ্ধভিক্ষুকে হত্যার ঘটনা মানবাধিকার লংঘনের আর কোন সংজ্ঞা থাকতে পারে কি জোট সরকার মহাশয়? কোথায় সেই আপনাদের সোনার টুকরো ছেলেরা। শান্তির ব্যবস্থা করে দেখিয়ে দিন না, আপনারা যে, আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল একথা। হত্যাকারীদের গ্রেফতার করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন আপনারা। ব্যর্থ হয়েছে আপনাদের গৌরবোজ্জ্বল পুলিশ প্রশাসন। বৌদ্ধভিক্ষুরা জন্মদাতা পিতা-মাতা তথা সংসারের সব মায়া-মমতা ছিন্ন করে বেরিয়ে আসে কারও একার শান্তির জন্য নয়, মানবজাতি এবং সর্বপ্রাণীর জন্য। যখন একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু লাল চীবর পরিধান করে তখন একজন গৃহী পুরুষও তাদেরকে ছুঁতে পারে না আর সেখানে নারীর ধরা-ছোঁয়া তো অনেক দূরের কথা। আমাদের গৌরবোজ্জ্বল পুলিশ প্রশাসন একজন পঞ্চাশোর্ধ্ব বৌদ্ধভিক্ষুর হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে নারী কেলেঙ্কারি হিসেবে সাফাই গাইতে কিঞ্চিৎ পরিমাণও কুণ্ঠাবোধ করল না।

যাচ্ছেতাই মিথ্যাচার করেছে পুলিশ প্রশাসন। পুলিশের মিথ্যাচার বন্ধ ও হত্যাকারীদের গ্রেফতার এবং বিচারের দাবিতে বৌদ্ধ সম্প্রদায় তথা দেশের সুশীল সমাজ প্রতিবাদ বিক্ষোভ-আন্দোলন-সংগ্রামে রাস্তায় নেমে আসে। দীর্ঘ দু'মাস দিনের পর দিন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আন্দোলন চলে। তীব্র আন্দোলনের মুখে শেষ পর্যন্ত মামলার তদন্তভার পুলিশ প্রশাসন থেকে স্থানান্তর করে মামলাটি সিআইডির ওপর ন্যস্ত করতে বাধ্য হয়। অবশেষে অল্প কয়েকদিন তদন্তের পর সিআইডির পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের এক প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়, জ্ঞানজ্যোতি ভিক্ষু হত্যার ঘটনা নারী সং□ান্ত নয়। চাঁদা সং□ান্ত ঘটনায়ই জ্ঞানজোতি ভিক্ষুকে হত্যা করা হয়েছে। সিআইডির এ ঘোষণায় আন্দোলনকারীদের মনে আলো জ্বেলে উঠল। পরবর্তীতে আবার দেখা গেল সিআইডির ধীরে চলো নীতির অনুসরণ।

হত্যাকাণ্ড ঘটনার ১৪ দিনের মাথায় জোট সরকারের দু'জন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ারভাইস মার্শাল আলতাফ হোসেন চৌধুরী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুর মোর্শেদ খান ঘটনাস্থল হিংগলা পরিদর্শন শেষে সেদিন শোকার্ত জনতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতে আসল খুনিদের বের করে ফাঁসিতে ঝোলানোর ব্যবস্থা করা হবে। প্রয়োজনে রাউজান থানার কার্য□ম নিহত ভিক্ষুর আশ্রমে স্থানান্তর করে নিয়ে আসা হবে। খুনিদের পক্ষে যারা তদবির করবে তাদেরকেও গ্রেফতার করা হবে। মন্ত্রীদের জ্বালাময়ী বক্তব্যে সেদিন পুনরায় শোকার্ত জনতার মনে কিছুটা আশার সঞ্চার করেছিল। আজ এক বছর পরে বলতে চাই-কোথায় আপনাদের সেই হাঁকডাকের বাস্তবায়ন। সেদিনের সব কথা নিষ্ফল রোদনে পরিণত হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশে যতটি ঘটনা ঘটেছে উপরোক্ত কথাগুলো কয়েক হাজার বার বলতে শুনেছি। এ দেশের জনগণ এই মুখরোচক কথাগুলোর ওপর থেকে পুরোদমে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। দেশে প্রতিদিন কোথাও না কোথাও হত্যাকাণ্ডের খবর দেখতে পাই। আর প্রতিটি ঘটনাতেই মন্ত্রী মহোদয়গণের সেই পুরনো রেকর্ডগুলো বেজে ওঠে। জোট সরকারের উদ্দেশে বলতে চাই-আপনারা এই রেকর্ডগুলো সরাসরি আর মুখে না বলে ক্যাসেটে রেকডিং করে যেখানে ঘটনার সূত্রপাত সেখানে এই ক্যাসেটটি চালিয়ে দিন। তাহলে জনগণের সঙ্গে তীব্র মুখোমুখিও হতে হবে না।

জ্ঞানজ্যোতি হত্যা আন্দোলন শুধুমাত্র বৌদ্ধ সমাজের ছিল না, সমগ্র দেশের বিবেকবান মানুষের একটি প্রাণের আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল। রাজপথ থেকে জাতীয় সংসদ পর্যন্ত টানা দু'মাসব্যাপী আন্দোলনমুখর ছিল এই বাংলার বুক। আন্দোলনে দেশের বিভিন্ন শহরে বসবাসরত জনগণ যেমন মাঠে নেমেছিল তেমনি গ্রামগঞ্জের বৌদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চলের মানুষরাও ঘরে বসে থাকেনি। যখন যেখানে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে শত শত হাজার হাজার বৌদ্ধ নর-নারী তথা সুশীল সমাজের উপস্থিতি আন্দোলনকে দ্রুত বেগবান

করেছিল। আন্দোলনের যৌক্তিক দাবিতে বাংলাদেশের আন্দোলকারীদের সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত নেতৃবৃন্দও একাত্মতা প্রকাশ আন্দোলনকে করেছে গতিময়। জাপান, কোরিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, সুইজারল্যান্ড, ভারত, মায়ানমার (বার্মা), ফ্রান্স, আবুধাবি, আমেরিকা, লন্ডন, কানাডা, শ্রীলংকাসহ বিভিন্ন দেশে শান্তিপ্রিয় জনগণ আন্দোলন করেছিল সুশৃঙ্খলভাবে। দেশের বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন, রাজনৈতিক সংগঠন, লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, মানবাধিকারকর্মী ও সংস্কৃতিকর্মীরা আন্দোলনে সর্বাত্মক অংশগ্রহণ করে প্রেরণা যুগিয়েছিল, যা দেশে ইতোপূর্বে আর কোন সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এতটুকু আন্দোলনের রূপ ধারণ করতে দেখিনি। এ সময় চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুমিল-া, সিলেট, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কক্সবাজার ছাড়াও জেলার প্রতিটি থানায় গণঅনশন, গণমিছিল, ভূখা মিছিল, পদযাত্রা, দফায় দফায় বিক্ষোভ সমাবেশ; চট্টগ্রামের লালদিঘির ময়দানে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বৌদ্ধদের প্রথম মহাসমাবেশ, স্পিকার, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ সরকারের অন্যান্য মন্ত্রীকে স্মারকলিপি প্রদানসহ এমন কোন প্রতিবাদী আয়োজন ছিল না, তখন হয়নি। তারপরও বলি-এতকিছুর পরও ঘুম ভাঙল না কুম্ভকর্ণ দলের।

অনাথ আশ্রম রক্ষায় এ পর্যন্ত সরকার জরুরি কোন পদক্ষেপও নেয়নি। শতাধিক অনাথ শিশু কি অবস্থায় দিনযাপন করছে তার কোন খোঁজ-খবরও নিতে দেখিনি। দিন গড়িয়ে মাস গড়াল, পার হলো বছর, চার্জশিটের আলামত এখন পর্যন্ত আড়ালে থেকে গেল। বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে। একথাই আবার প্রমাণিত হলো।

সংবাদ, ২১ এপ্রিল ২০০৩

জুম্ম জনগণ যাবে কোথায়?

এস. এস চাকমা

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তানের সৃষ্টি হয় ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট। এরপর র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের ভাগে পড়ে ১৭ আগস্টে। তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যা ছিল ২,৭৫,০০০ এবং মোট জনসংখ্যার ৯৭% ছিল উপজাতীয়। বাকিরা ছিল মুসলমান, হিন্দু এবং বড়ুয়া। উলে-খ্য, ব্রিটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রাম দখল করে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক জেলা করে এর শাসনের জন্য একজন সুপারিনটেনডেন্ট নিয়োগ করে। পরে তারা এই পদবি পরিবর্তন করে ডেপুটি কমিশনার করে। এরপর ১৯০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে শাসন করার জন্য তারা একটি ম্যানুয়েল তৈরি করে, যার নাম হয় Chittagong Hill Tract অথবা Chittagong Hill Tracts Regulation, ১৯০০। এই ম্যানুয়েলের কয়েকটি ধারা খুবই প্রণিধানযোগ্য। যেমন ঃ

(১) পার্বত্য চট্টগ্রামে ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক দেয়া পাস অথবা অনুমতিপত্র ছাড়া অন্য জেলার অ-উপজাতি জনগণের কেউ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করতে পারত না এবং সেই পাস কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দেয়া হতো। তবে এর মেয়াদ ডেপুটি কমিশনার ইচ্ছা করলে বাড়াতে পারতেন।

(২) অ-উপজাতি জনগণকে পার্বত্য চট্টগ্রামে কোথাও কৃষি জমি বন্দোবস্ত দেয়া যেত না। তারা কেবল হাট-বাজারগুলোতে ব্যবসার জন্য বাজার ফান্ড এলাকার মধ্যে অস্থায়ীভাবে বাজার

প-ট বন্দোবস্ত নিতে পারত।

(৩) ডেপুটি কমিশনার যেকোন অ-উপজাতিকে উপজাতি জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছে বলে তার কাছে প্রতীয়মান হলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে বহিষ্কার করতে পারতেন।

(৪) পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য আলাদা পুলিশ বাহিনী ছিল এবং সেই পুলিশ বাহিনী কেবল উপজাতি জনগণের লোক দ্বারা গঠিত হতো। ডেপুটি কমিশনার ছিলেন সেই পুলিশ বাহিনীর প্রধান। অর্থাৎ একাধারে তিনি ছিলেন জেলা প্রশাসক এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীরও প্রধান। জেলার অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা এবং কর্মচারী ছিলেন তার নিয়ন্ত্রণে।

(৫) কোন পরিবারকে ২৫ একরের অধিক কৃষি জমি বন্দোবস্ত দেয়া যেত না। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রাম আয়তনে বড় হলেও সেখানে কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল অত্যন্ত সীমিত। সারা জেলাটি উঁচু-নিচু ছোট-বড় পাহাড়, টিলা, নদ-নদী, ছড়া ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ।

(৬) ডেপুটি কমিশনারকে প্রতি ৬ মাস অন্তর জেলার ৩ জন সার্কেল চিফ অথবা তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে জেলার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে হতো।

(৭) জেলার উপজাতি অধিবাসীরা জেলার যে কোন জায়গায় জমি বন্দোবস্ত না নিয়ে বসতি স্থাপন করতে পারত এবং সেসঙ্গে যেকোন জায়গায় ঘরবাড়ি তৈরি অথবা জুম চাষ করতে পারত। তারা ফলের বাগান এবং এসবের মালিকানাও দাবি করতে পারত।

পাকিস্তান হওয়ার কিছুকাল পরে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েল বাতিল অথবা সংশোধন না করে কয়েক হাজার বাঙালি পরিবার পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসে এবং তাদের নানিয়াচর, লংদু এবং লামা থানায় পুনর্বাসন করে। কিছুসংখ্যক পরিবারকে রাঙ্গামাটি শহরের উপকন্ঠে পুনর্বাসন করা হয় এবং জায়গাটির নামকরণ করা হয় কাশেম বাজার।

১৯৪৮ সালেই পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম পুলিশ বাহিনীকে বিলুপ্ত করে দেয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের অন্য জেলায় বদলি করে দেয় এবং সেই সঙ্গে অন্য জেলা থেকে অ-উপজাতি পুলিশ পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসে। সেই সঙ্গে প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একজন পুলিশ সুপারও নিয়োগ দেয়া হয়।

এরপর সরকার চন্দ্রঘোনাতে এশিয়ার বৃহত্তম কাগজকল নির্মাণ করে, যেখানে প্রায় অন্য জেলার ৬ হাজার লোকের চাকরি হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের খুব কম লোকই পেপার মিলে চাকরি পায় এবং তারা পায় প্রধানত ডেপুটি কমিশনার মেজর এল, এইচ নিবলেটের চেষ্টার ফলে। এরপর নির্মাণ শুরু হয় কাপ্তাই বাঁধ, যেটিকে উপজাতিরা বলে থাকে লক্ষ লোকের মরণফাঁদ। কারণ কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ১ লাখ লোকের যারা তখন ছিল জেলার মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ, তাদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি হতে উৎখাত হয়ে যায়। বাঁধ নির্মাণের ফলে ৫৪ হাজার একর কৃষি জমি অর্থাৎ জেলার মোট কৃষি জমির ৪০% হ্রদের পানিতে ডুবে যায়। অথচ বাঁধ নির্মাণের সময় বলা হয়েছিল মাত্র ৩২ হাজার একর কৃষি জমি ডুবে যাবে এবং বাঁধের উজানে যে জলাধার সৃষ্টি হবে তার আয়তন হবে ২শ' ১৩ হতে ২শ' ৫০ বর্গমাইল। কিন্তু বাঁধ নির্মাণের কাজ শেষ হলে ৩শ' ৫০ বর্গমাইল এলাকা ডুবে যায়, কিন্তু বর্ষাকালে সেটার আয়তন হয় ৪শ' বর্গমাইল। তাছাড়া সরকারি কর্মকর্তারা যেসব জায়গা ডুবে যাবে না বলেছিলেন, পরবর্তীকালে সেসব এলাকার অনেক জায়গা ডুবে যায়। ফলে অনেকেই দু'বার উদ্বাস্তু হয়, কিন্তু ক্ষতিপূরণ পায় মাত্র ১ বার। উলে-খ্য, প্রতি পরিবারকে তার ঘরবাড়ির জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় ৫শ' টাকা করে গড়ে। অন্যান্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় নিম্নলিখিত হারে ঃ

(১) প্রথম শ্রেণী জমি প্রতি একর ৬শ' টাকা।
(২) দ্বিতীয় শ্রেণী জমি প্রতি একর ৪শ' টাকা।
(৩) তৃতীয় শ্রেণী জমি প্রতি একর ২শ' টাকা।
(৪) প্রতি ফলবান বৃক্ষ ১০ টাকা।
(৫) প্রতি অফলবান বৃক্ষ ৫ টাকা।
(৬) প্রতি কলাগাছ ২৫ পয়সা।
(৭) প্রতি আনারস গাছ ৬ পয়সা।

যদিও ১৯৬১ সালে বাঁধ নির্মাণের কাজ শেষ হয় এবং লোকগুলো উদ্বাস্তু হয়ে যায়। ১৯৬৪ সালে যখন আমি রাঙ্গামাটিতে বদলি হই, তখনও অনেকেই ক্ষতিপূরণ পায়নি।

১৯৮০ সালে Far Eastern Economic Review-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, কর্ণফুলী প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের জন্য ৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছিল; কিন্তু মাত্র ২.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করা হয়েছিল। কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্ত দের এভাবে বঞ্চনার বিরুদ্ধে জনসংহতি সমিতির প্রয়াত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (তখন চট্টগ্রাম কলেজে বি. এ. ক্লাশের ছাত্র) একটি প্রচারপত্র তৈরি করে চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটিসহ আরও অনেক জায়গায় বিলি করেন। তখন তাকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে কয়েক বছর আটক রাখা হয়।

১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে কাপ্তাই প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন কর্মকর্তা এবং পদাধিকারবলে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং এরপর ডেপুটি কমিশনার মুহম্মদ সিদ্দিকুর রহমানের অনুরোধে তার বাসায় তার সঙ্গে দেখা করতে যাই। তিনি তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে থাকাকালে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতীয়দের পুনর্বাসনের চেষ্টা করছিলেন তার বর্ণনা দেন। তিনি এও বলেন যে, ডেপুটি কমিশনার হিসেবে তিনি যখন পুনর্বাসন খাতে বারবার আরও অর্থ বরাদ্দের জন্য সরকারের কাছে পত্র লেখেন, তখন এক গোপনীয় পত্রে তাকে জানানো হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা গাছের লতাপাতা খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। তাদের জন্য বেশি সাহায্যের প্রয়োজন নেই। সিদ্দিকুর রহমান পরবর্তীকালে মন্ত্রিপরিষদ সচিব হয়েছিলেন।

১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মদতে ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রামসহ আরও অনেক জায়গায় দাঙ্গা বাঁধে। সেই রেস পার্বত্য চট্টগ্রামেও দেখা দেয়। তবে সেখানে কোন লোকক্ষয় হয়নি; কিন্তু বহু-উপজাতিকে হেনস্থা এবং বহু উপজাতি মেয়ের শ-ীলতাহানি করা হয়। এমনিতেই পুনর্বাসনের সুবিধা পায়নি, আবার জুলুম-অত্যাচার। ফলে হাজার হাজার উপজাতি ভারতে চলে যেতে শুরু করে। ভারত সরকার এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত এবং বৌদ্ধ নির্যাতনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘে অভিযোগ করে। তখন শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমাভো বন্দরনায়েকেও পাকিস্তান সরকারের কাছে বৌদ্ধ নির্যাতনের বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ জানান। তখন পাকিস্তান সরকারের টনক নড়ে। গভর্নর মোনায়েম খান বারবার রাঙ্গামাটি, এমনকি সবচেয়ে উপদ্রুত এলাকা মারিশ্যায় যান এবং লোকজনকে ভারতে না যাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন এবং তাদের পুনর্বাসনের আশ্বাস দেন। তখন উপজাতিদের ভারতে চলে যাওয়া বন্ধ হয়। তবুও ৪০ হাজারের অধিক উপজাতি ভারতে চলে যায়।

উলে-খ্য, ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান সরকার Forestall Forestry And Engineering International নামে একটি কানাডিয়ান কোম্পানিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমাজের ওপর কাপ্তাই বাঁধের প্রভাব, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিতে কি কি চাষ করলে লাভজনক হবে ইত্যাদি বিষয়ে জরিপ চালানোর জন্য নিয়োগ করে। এই জরিপ কাজ ২ বছর চালানো হয় এবং এরপর

কোম্পানিটি ৯ খণ্ডে একটি বিরাট প্রতিবেদন পেশ করে। উলি-খিত প্রতিবেদনে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিকে মোট ৪ ভাগে ভাগ করা হয় এবং কি পরিমাণ ভূমিতে কি কি ফসল উৎপাদন লাভজনক হবে তা নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয় ঃ

(১) চাষাবাদযোগ্য জমি- ৭৭ হাজার একর মোট জমি ২%।

(২) ফলের বাগান করার উপযোগী-৬ লাখ ৭০ হাজার একর মোট জমির ২১%।

(৩) কেবল বন করার জন্য উপযোগী-১৬ লাখ একর মোট জমির ৫১%

(৪) সংরক্ষিত বন- ৮ লাখ একর মোট জমির ২৬%

কাজেই দেখা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আয়তনে বড় হলেও সেখানে চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ খুবই সীমিত। আরও উলে-খ্য, ওই প্রতিবেদনে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি চা-চাষের জন্য উপযোগী সেরকমও কিছু বলা হয়নি।

১৯৬৯ সালের ২৪ জুলাই হোসেন তৌফিক ইমাম পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক হিসেবে যোগদান করেন। এর কিছুকাল পরে তিনি রাংখাং সংরক্ষিত বন হতে কর্ণফুলী বাঁধ প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত কয়েক হাজার উদ্বাস্তু পরিবার, যারা পুনর্বাসনের সুবিধা না পেয়ে সংরক্ষিত বনে প্রবেশ করেছিল, তাদের সেখান থেকে পুলিশ ও ইপিআরের সাহায্যে উৎখাতের উদ্যোগ নেন। এতে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে নবনির্বাচিত এম, এন, এ রাজা ত্রিদিব রায়ের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব ও বিরোধ বাধে। ইতোমধ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় সংসদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করলে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। যেহেতু তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ অথবা অন্য কোন পার্টির তেমন কোন অস্তিত্ব ছিল না- জেলা প্রশাসক হোসেন তৌফিক ইমামের নেতৃত্বেই জেলা অসহযোগ আন্দোলন শুরু এবং তার অফিসেই আন্দোলনের জন্য Control Room প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন রাঙ্গামাটিতে এবং এর আশপাশে বাঙালিদের সংখ্যা তেমন উলে-খযোগ্য ছিল না। কিন্তু যখন বঙ্গবন্ধুর ডাকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় এবং ছাত্র-যুবকদের রাইফেল ট্রেনিং দেয়া শুরু, তখন জেলা প্রশাসকের ইঙ্গিতে আসল রাইফেলগুলো দেয়া হয় বাঙালি ছাত্র-যুবকদের এবং উপজাতি ছাত্র-যুবকদের দেয়া হয় কাঠের তৈরি ডামি রাইফেল। এভাবে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম হতেই ডেপুটি কমিশনার হোসেন তৌফিক ইমাম পাহাড়ি বাঙালিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি এবং পাহাড়িদের মনে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। বর্তমানে দৈনিক 'সংবাদ'-এর রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি মুক্তিযোদ্ধা সুনীল দে'কে জিজ্ঞেস করলে আরও বিশদভাবে জানা যাবে। কারণ সুনীল দে তখন রাঙ্গামাটিতে ছিলেন এবং তিনিও ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তবুও মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন সীমান্ত চৌকি হতে ইপিআর বাহিনী এবং জেনারেল জিয়া (তখন মেজর জিয়া) ও তার বাহিনী নিয়ে রাঙ্গামাটি পৌঁছলে তাদের এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আসা অন্যদের রাঙ্গামাটি শহরের এবং আশপাশের পাহাড়ি জনগণই খাদ্য এবং অন্যান্য রসদ দিয়ে সাহায্য করেছিল। এমনকি সুদূর লংগদু হতে তখন কৃষি কর্মকর্তা এবং রাজা ত্রিদিব রায়ের ভায়রা ভাই সমর বিজয় চাকমার একটি বিরাট ইঞ্জিন বোট দিয়ে ৬/৭শ' খাসি, ১ হাজারেরও অধিক মুরগি এবং কয়েক হাজার ডিম মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এনেছিলেন। লংদু এলাকার উপজাতিরা এসব মুক্তিযোদ্ধার জন্য সংগ্রহ করে দিয়েছিল এবং সমর বিজয় চাকমা ওইসব রাঙ্গামাটিতে নিয়ে এসেছিলেন। রাঙ্গামাটি এলাকার বালুখালী ইউনিয়ন এবং অন্যান্য ইউনিয়নের লোকও প্রচুর রসদ সরবরাহ করেছিল।

আওয়ামী লীগ আমলের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুখ্য সচিব ড. সৈয়দ আবদুস সামাদ তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ছিলেন। আমার কথায় সন্দেহ হলে যে কেউ এখনও তাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন সাধারণ উপজাতিগণ মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে কি

রকম সহযোগিতা করেছিল। অবশ্য স্থানীয় বাঙালি বারেক মাতবর, ইউসুফ আলী, মোহসীন এবং আরও কিছু বাঙালিও রসদ এবং বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন।

পরবর্তীতে জেনারেল জিয়া যখন রাঙ্গামাটি হয়ে মহালছড়ি এবং খাগড়াছড়ি হয়ে রামগড় যান তখনও পথে উপজাতীয়রাই তাকে এবং তার দলবলকে খাদ্য রসদ সরবরাহ করেছিল। সেজন্য পরবর্তীকালে যখন খান সেনারা মহালছড়ি দখল করে নেয় তারা ৩ জন উপজাতি স্থানীয় নেতা সভ্য মহাজন, গৌরাঙ্গ দেওয়ান এবং চিত্তরঞ্জন কারবারীকে ধরে নিয়ে হত্যা করে। তাদের লাশও পাওয়া যায়নি। জেনারেল জিয়া কমলছড়ি গ্রামের কাছে যখন চেঙ্গী নদী পার হচ্ছিলেন তখন নদীতে প্রায় হাঁটু পানি ছিল। সেজন্য কমলছড়ি গ্রামের মৃগাঙ্ক চাকমা জেনারেল জিয়াকে তার পিঠে করে নদী পার করে দিয়েছিলেন, যাতে তার জুতা এবং প্যান্ট পানিতে ভিজে নষ্ট না হয়। আরও উলে-খ্য, পঞ্চমের দশকের মাঝামাঝি সময়ে পূর্ব পাকিস্তান ফুটবল দলের ক্যাপ্টেন চিং হলা মং চৌধুরী ওরফে ম্যারি এবং প্রভুধন চৌধুরী জেনারেল জিয়া এবং তার দলবলকে চন্দ্রঘোনা হতে রাঙামাটি, এরপর মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি এবং এরপর রামগড় নিয়ে যান। রামগড়ের ফেনী নদীর অন্য পাড়ে ত্রিপুরা রাজ্য। আরও উলে-খ্য, চিং হলা মং চৌধুরীর বাড়ি হলো চন্দ্রঘোনাতে এবং প্রভুধন চৌধুরীর বাড়ি হলো রাঙামাটিতে। প্রভুধন চৌধুরী তখন চন্দ্রঘোনা পেপার মিলে চাকরি করতেন।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে ত্রিদিব রায়ের কাকা কে কে রায় আওয়ামী লীগের টিকেটে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার কাছে হেরেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তিনি ভারতে ত্রিপুরা রাজ্যে চলে যান। তার মতো আরও কয়েকশ' পাহাড়ি যুবক ও ছাত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে গিয়েছিল। প্রথমদিকে যারা ভারতে যায় তারা সবাই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু কে, কে রায় আগরতলা যাওয়ার কিছুদিন পরে তাকে ডেপুটি কমিশনার হোসেন তৌফিক ইমামের প্ররোচনায় আটক করা হয়। এরপর হতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সন্দেহের চোখে দেখা হয়। আর কাউকেও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়নি। ফলে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পেরে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে ফেরত আসে এবং পরবর্তীতে তাদের অনেকেই রাজা ত্রিদিব রায় এবং ডা. মালেক মন্ত্রিসভার সদস্য অংথুয়ে প্রু চৌধুরীর প্ররোচনায় সিভিল আর্মড ফোর্সেস ও রাজাকার বাহিনীতে যোগদান করে। উলে-খ্য, খান সেনারা চট্টগ্রাম শহর দখল করার কয়েকদিন পর ডেপুটি কমিশনার হোসেন তৌফিক ইমাম তার পরিবার এবং দলবলসহ মহালছড়ি এবং আরও পরে রামগড়, তারপর ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে চলে যান। ডেপুটি কমিশনারের রাঙামাটি ত্যাগের কয়েকদিন পর রাজা ত্রিবিদ রায় চট্টগ্রাম চলে যান এবং একদল খান সেনাকে সঙ্গে নিয়ে রাঙামাটিতে ফেরত আসেন। তখন হতে ত্রিদিব রায় পাকিস্তানের ঘোরতর সমর্থক হন।

পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীতে ২০/২২ জন উপজাতি ছিল। তারা সবাই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে রমণী বনুন চাকমা রামগড় সেক্টরে পাকবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। সিপাহি হেমরঞ্জন চাকমা বগুড়া সেক্টরে নিখোঁজ হন। তার লাশও পাওয়া যায়নি। সিপাহি ম্যান অ্যামি মারমাও বগুড়াতে নিহত হন। রাইফেলম্যান উখ্য জিং মারমা যুদ্ধে অসম সাহসিকতা দেখানোর জন্য যুদ্ধের পর বীরবি□ম খেতাবে ভূষিত হন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ বাহিনীতে কর্মরত দু'জন মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা বিমলেশ্বর দেওয়ান এবং ত্রিপুরা কান্ত চাকমা যথা□মে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কুমিল-া জেলার পুলিশ সুপার নিযুক্ত হন। তাছাড়া ২০/২২ জন উপজাতি সিভিল অফিসার/কর্মচারী ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে বরেণ ত্রিপুরা, কৃপামুখ চাকমা, আনন্দ বাঁশী চাকমা অন্যতম। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা BCS ক্যাডার এবং অন্যান্য চাকরিও

পেয়েছিলেন। তবে অনেকেই পরবর্তীতে শান্তি বাহিনীতে যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩ জন সার্কেল চিফের অন্যতম বোমাং চিফ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন। কিন্তু মং সার্কেলের চিফ মং প্রুসাইন যখন প্রতিদিন হাজার হাজার শরণার্থী চট্টগ্রাম জেলা হতে মানিকছড়িতে তার রাজবাড়ি হয়ে ভারতে পালিয়ে যাচ্ছিল, তিনি তাদের সবাইকে আতিথ্য সেবা দিয়েছিলেন। খানসেনারা রামগড় শহর দখল করার প্রাক্কালে কেবল তিনি ভারতে চলে যান। ভারতে গিয়ে তিনি বসে থাকেননি। তিনি একজন কর্নেলের ব্যাজ পরিধান করে আখাউড়া সেক্টরে যুদ্ধ করেন। সেজন্য পাকসেনারা রামগড় দখল করার পর মানিকছড়ি এসে তার রাজপ্রাসাদ, বৌদ্ধমন্দির এবং গ্রামের সকল বাড়িঘর ধ্বংস করে দেয়। তবে রাজপ্রাসাদ ধ্বংস করার আগে তারা সেটা লুট করে। ১৯৭৬ সালে মং রানী নীহার বালা আমাকে বলেছিলেন, তারা ভারতে চলে যাওয়ার সময় কেবল নগদ টাকা এবং স্বর্ণগুলো নিতে পেরেছিলেন। কয়েক মণ ওজনের প্রাচীন রূপার মুদ্রা, রূপার তৈজসপত্র এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য নিতে পারেননি। ওসবের মূল্য তখনকার দিনে কয়েক কোটি টাকা হবে বলেছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মং রাজা মং প্রু সাইন বাংলাদেশ সরকারের উপজাতি বিষয়ক উপদেষ্টা হয়েছিলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা যারা পাকিস্তান আমলে পাকিস্তানবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে নানা অন্যায়-আচরণের শিকার হয়েছিল, এবার তারা পাকিস্তানের সমর্থক এবং বাংলাদেশ বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে নানা নির্যাতনের শিকার হয়। এমন কি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব হতেই তাদের ওপর নির্যাতন শুরু হয়।

১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। এর পরদিন ৪ ডিসেম্বর পাকবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বউত্তরের সীমান্ত চৌকি পানছড়ি থেকে প্রত্যাহার করা হয়। ৫ ডিসেম্বর ত্রিপুরা রাজ্য থেকে একদল মুক্তিযোদ্ধা পানছড়িতে প্রবেশ করে। একদল উপজাতি তাদের অভ্যর্থনা জানাতে গেলে তারা তাদের হত্যা করে। এরপর তারা পানছড়ি এলাকার উপজাতি গ্রামগুলোর ওপর আ□মণ চালায় এবং উপজাতিদের হত্যা করা শুরু করে। তারা পানচড়ি এলাকার নারী-পুরুষ শিশুসহ মোট ৩২ জন উপজাতিকে হত্যা করে এবং ২ শতাধিক বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয় এবং বহু মেয়ের ওপর অত্যাচার চালায়। এরপর তারা খাগড়াছড়ির দিকে অগ্রসর হয় এবং রাস্তার দু'ধারে আরও কমপক্ষে ১৭৬টি বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয় এবং ১৪ ডিসেম্বর নারী-শিশুসহ আরও ২২ জন উপজাতিকে হত্যা করে। কেবল আমার গ্রামের আমার আত্মীয় সুবিমল চাকমা এবং তার কলেজ পড়ুয়া ছেলেসহ ১০ জন নিহত হয়। আমার পরিবারের কেউ নিহত হয়নি, কারণ সন্ত্রাসীদের আগমনের খবর পেয়ে তাদের আসার আগেই তারা পালিয়ে যায়। তবে বাড়িটিকে জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

এরপর ১৬ ডিসেম্বর অর্থাৎ স্বাধীনতা দিবসের দিন খাগড়াছড়ি শহরের কাছেই বাঙ্গালকাটি গ্রামের ৯ জন উপজাতিকে সন্ত্রাসীরা হত্যা করে। তাছাড়া আরও বহু বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এবং লুটপাট করা হয়। খাগড়াছড়ি শহরে তারা খাগড়াছড়ি স্কুলের শিক্ষক অনন্ত বিহারী খীসা এবং সরকারি কর্মকর্তাসহ আরও অনেককে আটক করে এবং নির্যাতন করে।

রাঙ্গামাটি অথবা আশপাশে কোন লোকক্ষয় হয়নি। তবে সেখানে কয়েকজন উপজাতি এবং সরকারি কর্মকর্তা অর্ধেন্দু বিকাশ চাকমাকে আটক করা হয়। রাঙ্গামাটিতে নির্যাতন কম হওয়ার অন্যতম কারণ হলো ইতোমধ্যে উপজাতি পুলিশ সুপার বিমলেশ্বর দেওয়ান সেখানে যোগদান করেছেন। পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই রাজা ত্রিদিব রায় পাকিস্তানে চলে গেছিলেন। আর ভারতীয় বাহিনী রাঙ্গামাটিতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে চাকমা রাজপরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা হেফাজতে নিয়ে নেয়। এরপর তাদের নয়াদিলি-তে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

ভারতীয় বাহিনীতে তিব্বতি সৈন্য থাকা এবং তাদের স্থানীয় বৌদ্ধ মন্দিরে যাতায়াত ও দুষ্কৃতকারীদের কিছুটা নিরুৎসাহ করেছিল। ফলে রাঙ্গামাটিতে তেমন বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেনি, যেমন ঘটেছিল খাগড়াছড়ি এলাকায়।

আগেই বলা হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের সময় বোমাং রাজপরিবার কোন পক্ষেই ছিল না; কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাজ পরিবারের ওপর মহাদুর্যোগ নেমে আসে। রাজার আপন ভাইপো এবং প্রয়াত রাজার প্রু এম.এস প্রুর মাথা ন্যাড়া করে দিয়ে গলায় জুতারমালা পরিয়ে তাকে সারা বান্দরবান শহর ঘোরানো হয়। ১৯৭২ সালের ৯ জানুয়ারি বান্দরবার শহরে অনুষ্ঠিত এক বড় জনসভায় পার্শ্ববর্তী সাতকানিয়া কলেজের এক ছাত্রনেতা বোমাং রাজা এবং মারমা সম্প্রদায়কে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে বক্তব্য দেয় এবং ঘোষণা দেয় 'বাঁচতে যদি চাও বাঙালি হও, অন্যথায় বার্মায় চলে যাও।' তাছাড়া মারমা সম্প্রদায়ের আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে অপমান করা হয়। ফলে সারা বান্দরবান মহকুমায় মহাআতঙ্ক সৃষ্টি হয় এবং প্রায় ২০ মারমা বার্মায় চলে যায়। পরবর্তীতে পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হলে তাদের কিছু অংশ ফেরত আসে, বাকিরা সেখানে থেকে যায়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকার রাজাকার বাহিনী, সিভিল আর্মড ফোর্সেসের সদস্য, আলবদর ইত্যাদি পাকিস্তানপন্থীদের খোঁজার নামে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ ও বিডিআর বাহিনী নিয়োগ করে। কারণ সন্দেহ করা হয়, পাকিস্তানপন্থী এসব লোক পার্বত্য চট্টগ্রামের গভীর অরণ্যে লুকিয়ে আছে; কিন্তু তাঁদের খুঁজতে গিয়ে পুলিশ ও বিডিআর বাহিনী নানা সন্ত্রাসী কাজে জড়িয়ে পড়ে। তারা সেখানে উপজাতি মেয়েদের ধর্ষণ, বাড়িঘর লুটপাট, জোর করে অর্থ আদায়, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, উপজাতিদের মারধর এবং নানাভাবে হয়রানি কাজে জড়িয়ে পড়ে। কেবলমাত্র ১৯৭২ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ৭০টির বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে। এসবের অনেক ঘটনা তখনকার সাপ্তাহিক লাল পতাকা পত্রিকার ৩০ জুন, ১৮ আগস্ট, ২২ সেপ্টেম্বর এবং ২৭ অক্টোবর সংখ্যায় বের হয়। এমতাবস্থায় উপজাতি রাজাকার সিভিল আর্মড ফোর্সের এবং প্রাক্তন উপজাতি ইপিআর এবং সদস্যরা সংগঠিত হতে থাকে এবং তারা দুষ্কৃতকারী বিডিআর, পুলিশ এবং সন্ত্রাসী বাঙালিদের বাধা দিতে থাকে এবং সুযোগ পেলে তাদের ওপর হামলা চালায়। ফলে আগের মতো আর বিডিআর এবং পুলিশ বাহিনী বিচ্ছিন্নভাবে উপজাতি গ্রামে যেতে ভয় পেতে থাকে। ফলে তাদের সন্ত্রাসী কাজকর্মও কমতে থাকে এবং পরবর্তীকালে অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসে। অবশ্য ইতোমধ্যে এ. এম. আবদুল কাদের জেলা প্রশাসক হিসেবে যোগদান করায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে সাহায্য করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ. এম. আবদুল কাদেরের মতো মানবতাবাদী জেলা প্রশাসক পার্বত্যবাসীরা আর দেখেনি। মানবেন্দ্র লারমা এবং তার ভাই জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নামে একটি আঞ্চলিক দল গঠন করলে উপজাতি রাজাকার, সিএএফ এবং অন্যরা শান্তি বাহিনী নামে জনসংহতি সমিতির সদস্য হয়।

বঙ্গবন্ধু মানবেন্দ্র লারমার ৪ দফা দাবি গ্রহণ না করলেও তিনি উপজাতিদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং সেজন্য পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু বাকশাল গঠন করলে, মানবেন্দ্র লারমা বাকশালে যোগদান করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু সপরিবারে কিছু বিপথগামী সৈনিকের হাতে নিহত হলে পরিস্থিতি আবার অন্যদিকে মোড় নেয়। মানবেন্দ্র লারমা আত্মগোপন করেন। এরপর নতুন সরকার মানবতাবাদী জেলা প্রশাসক আবদুল কাদেরকে রাঙ্গামাটি হতে প্রত্যাহার করে নেয়। জেলায় থানার সংখ্যা বাড়ায় এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য নানা স্থাপনা গড়ে তোলা হয়; তাদের সংখ্যাও অনেক বাড়ানো হয়। ফলে তখন হতে মাঝে মধ্যে শান্তি বাহিনী

ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হতে থাকে। ফলে ১৯৭৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং প্রত্যেক পরিবারকে পাহাড়ি জমি ৫ একর, মিশ্র জমি ৪ একর এবং কৃষি জমি ২.৫ একর দেয়ার ঘোষণা দেয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট ৮০ হাজার পরিবারকে নেয়া হয় এবং প্রত্যেক পরিবারকে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জমি দেয়া হলে মোট জমির পরিমাণ দাঁড়ায় নিম্নরূপঃ

(১) পাহাড়ি জমি ৫ একরx৮০.০০ পরিবার = ৪০০০০০ একর।

(২) মিশ্র জমি ৪ একরx৮০.০০ পরিবার = ৩২০০০০ একর।

(৩) কৃষি জমি ২.৫ একরx৮০.০০ পরিবার = ২০০০০০ একর।

যেহেতু পাকিস্তান আমলে সরকার কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্তদের সবাইকে জমির অভাবে পুনর্বাসন করতে পারেনি এবং প্রধানত পুনর্বাসনের সুযোগ না পেয়ে ১৯৬৪ সালে ৪০০০০ উপজাতি ভারতে চলে যায়। কাজেই প্রশ্ন উঠে এখন ৮০ হাজার বাঙালি পরিবার অর্থাৎ ৪ লাখ বাঙালিকে পুনর্বাসনের জন্য জমি পেল কোথায়। সরকারি খাস জমি তো পাওয়া যায়নি, কারণ খাস জমি না থাকলে পাবে কোথায়? তাই যা করা হলো, সেটা হলো পাহাড়িদের বন্দোবস্তকৃত এবং দখলিকৃত জমি আবার নতুন করে জরিপ করা হলো যদি কোনো উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া গেল। কিন্তু এসব জমি তো পাহাড়িদের দখলে এবং এসব জমিতে ফসল, বাগান অথবা বসতবাড়ি রয়েছে। এরকম অনেক জমি আবার গ্রামের শ্মশান ভূমি। এখন এসব জমি সরকার নতুনভাবে নতুন বসতকারী বাঙালিদের নামে বন্দোবস্ত দেয়া কিছু অতি উৎসাহী সরকারি কর্মকর্তা কিছু পাহাড়ির বন্দোবস্তকৃত জমি খাস জমি যে দেখিয়ে নতুন বসতকারীদের নামে বন্দোবস্ত দিয়ে দেয়।

প্রথমদিকে যখন বাঙালি শরণার্থীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে আনা হয়, তখন কিন্তু শান্তি বাহিনী বাধা দেয়নি অথবা নতুন বসতকারীদের ওপর আ□মণও চালায়নি। যখন শরণার্থীরা স্থিত হয় পাহাড়িদের জায়গা-জমি জোর করে দখল করা শুরু করে জমির ফসল অথবা বাগানের ফল জোর করে নিতে থাকে অথবা জোর করে চাষাবাদ শুরু করে, তখন জনসংহতি সমিতির নেতাদের হুশ হয়, তখন শান্তি বাহিনী নতুন বসতিকারীদের ওপর আ□মণ শুরু করে দেয়। সেই আ□মণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ভগবানের আশীর্বাদ হিসেবে পেয়ে যায়। তারা শরণার্থীদের রক্ষার নামে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে শরণার্থীদের সহযোগিতায় উপজাতিদের ওপর তাদের গ্রামের পর গ্রামের ওপর আ□মণ চালাতে থাকে। এতে শত শত উপজাতি নিহত, আহত এবং শত শত মেয়ে ধর্ষিত হয়। তাছাড়া গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়া হয়। আর শত শত উপজাতি বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। এবং হাজার হাজার উপজাতি ভারতে পালিয়ে যায়। ফলে উপজাতিরা তাদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি হতে একেবারে উৎখাত হয়ে যায়। অনেকেই দেশের ভেতরে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে এবং অনেকে ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় পায়।

ভিয়েতনামের মাইলাই গ্রামে যে গণহত্যা ঘটে, সেটা তো বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে মাইলাইয়ের চেয়ে অধিক লোমহর্ষক অনেক ঘটনা ঘটেছে। যেমন ১৯৮০ সালের ২৫ মার্চ এবং এর পরবর্তী ক'দিন রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালী ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রাম। ওই ঘটনায় ৩শ' জন উপজাতি নিহত এবং আরও অনেকেই আহত হয়। ২০টি উপজাতি গ্রাম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়া হয়, ৯টি বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস করা হয়, ৩০ জন মেয়েকে অপহরণ করে ধর্ষণ করা হয়। এবার আরও একটি বড় ধরনের গণহত্যা ঘটে ১৯৮১ সালের ২৬, ২৭ এবং ২৮ জুনে বর্তমান মাটিরাঙ্গা থানার গোমতি, বেলছড়ি এবং আরও কয়েকটি উপজাতি গ্রামে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী শরণার্থী বাঙালিদের সহযোগিতায়

উপজাতি গ্রামসমূহের ওপর আ□মণ চালায়। ফলে আনুমানিক ৩শ' জন উপজাতি নিহত ২শ' ৯ জন আহত এবং ৫ হাজার ৭টি বাড়িঘর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ২০ হাজারের অধিক উপজাতি ভারতে আশ্রয় নিয়ে প্রাণ রক্ষা করে। পরে ভারত সরকার তাদের দেশে পাঠিয়ে দেয়। তবে সবচেয়ে বেশি গণহত্যা ঘটে জেনারেল এরশাদের রাজত্বকালে। তার আমলে ১৯৮৪ সালের ৩১শে মে থেকে ৭ জুন ভূষণছড়া এবং ছোট হরিণা এলাকায় ১৯৮৬ সালের ১ মে তারিখে পানছড়ি, মাটিরাঙ্গা ১৮ মে তারিখে রামবাবু তেবা, ১৬ ডিসেম্বর চংড়াছড়ি এবং মেরুং মৌজায় এবং ১৯৮৮ সালের ৮-১০ আগস্ট তারিখে হিরাচর, সারবোতুলি-খাগড়াছড়ি এবং পাবলাখালি গ্রামে। এরপর ১৯৮৯ সালের ৪ মে তারিখে লংগদুতে। এসব ঘটনায় শত শত নরী-পুরুষ-শিশু নিহত এবং আহত হয় এবং হাজার হাজার উপজাতি ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। জেনারেল এরশাদ তো পাহাড়িদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন এবং সেটা কোন রাখঢাক না করে তার মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে তার উপজাতিমন্ত্রী বিনয় দেওয়ানের উপস্থিতিতে বলেছিলেন যে, প্রয়োজনে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের একেবারে উৎখাত করা হবে। জেনারেল এরশাদের পররাষ্ট্র সচিব এবং পরবর্তীকালে অন্তবর্তীকালীন সরকারের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা ফকরুদ্দিন আহমদ তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ Critical Times, memories of a South Asian Diplomat'-এ বলেছেন যে, জেনারেল এরশাদ উপজাতিদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র করেছিলেন এবং সেজন্য তার এবং তার সহযোগিদের প্রকাশ্য বিচার দাবি করেছিলেন।

বিএনপি আমলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে দু'বার বড় ধরনের গণহত্যা ঘটে। একবার ১৯৯২ সালের ১০ এপ্রিল লোগাং গুচ্ছগ্রামে, অন্যবার ১৯৯৩ সালের ১৭ নবেম্বর নানিয়ারচর বাজারে।

শান্তিবাহিনীও সুযোগ পেলেই বাঙালি শরণার্থী এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ওপর আ□মণ চালাতে থাকে। এভাবে আ□মণ প্রতি-আ□মণে এবং শত শত বিচ্ছিন্ন ঘটনায় আনুমাণিক ২০ হাজার উপজাতি নিহত এবং নিখোঁজ হয় এবং কয়েক হাজার বাঙালি এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যও নিহত এবং নিখোঁজ হয়। এসব ঘটনা সংবাদপত্রেও তেমন প্রকাশ পায়নি। কারণ দেশে কোন উপজাতি সাংবাদিক নেই, নেই তাদের কোন পত্রপত্রিকা অথবা লেখক। তাছাড়া কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকায় অনেক সাংবাদিক ইচ্ছামতো লিখতে পারেননি।

এ দেশের কিছু সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ভিন্ন ধর্মের, ভিন্ন চেহারার, ভিন্ন সংস্কৃতির এবং সরল সহজ উপজাতিদের একেবারে উৎখাত করে তাদের জায়গা জমি দখল করতে চায় এবং সেটাই পরিষ্কার ভাষায় ১৯৭৯ সালের ২৬ মে ব্রিগেডিয়ার হান্নান (পরবর্তীতে ১৯৯১ সালের খালেদা জিয়ার মন্ত্রিসভার একজন সদস্য) এবং কর্নেল আবদুস সালাম (পরবর্তীতে চট্টগ্রামে ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওস) পানছড়িতে এক প্রকাশ্য জনসভায় বলেছিলেন, We want the land and not the people। প্রায় একই কথা বলেছিলেন ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়া মন্ত্রীসভার সদস্য কর্নেল (অব.) অলি আহমদ। ১৯৯৪ সালের ২৮ অক্টোবরে রেডিও বিবিসির সংবাদদাতার এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন বাংলাদেশে সংখ্যালঘু অত্যাচার নির্যাতনের শিকার এ কথাটি সত্য নয়। অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভাঙার পর বাংলাদেশের মন্দির ভাঙার ঘটনা ভারতের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পাহাড়িদের সেনাবাহিনী কোন অত্যাচার চালাচ্ছে না। এ ধরনের প্রচারণা যারা করছে, তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধাচারণ করছে। তারা (ব্রিটিশ কমন্স সভার যে সকল সদস্য বিষয়টি সে দেশের পার্লামেন্ট উত্থাপন করেছেন তাদের উদ্দেশ্য করে) যদি কোন গোষ্ঠীকে খুব বেশি মহব্বত করেন, তাদের দেশে অনেক জায়গা আছে

সেখানে তারা তাদের নিয়ে যেতে পারেন। এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

এভাবে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রযন্ত্র যদি সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং সুশীল সমাজও নীরব থাকে তাহলে উপজাতিরা এদেশে বাস করবে কেমন করে? ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতা সন্তু লারমার একটি শান্তিচুক্তি হয়। চুক্তির পরে ভারত থেকে ৬৫ হাজারেরও অধিক উপজাতি দেশে ফেরত আসে। কিন্তু তাদের মধ্যে এখনও ৩ হাজার ৩৫টি পরিবার তাদের ভিটেমাটিতে ফেরত যেতে পারেনি, তারা তাদের জায়গা-জমিও ফেরত পায়নি। তাছাড়া দেশে অভ্যন্তরীণ ৫০ হাজারেরও অধিক উদ্বাস্তু তাদের ভিটেমাটিতে ফেরত যেতে পারেনি। কারণ তাদের জায়গা-জমিও শরণার্থী বাঙালিরা দখল করে রেখেছে। কারণ শান্তিচুক্তির সব ধারা বাস্তবায়ন করা হয়নি।

২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিএনপি জেতার, ফলে আবার নতুন নতুন উপদ্রব দেখা দিয়েছে। বিএনপি সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে বেসরকারিভাবে আরও বাঙালির পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিয়েছে। সেজন্য বগুড়া থেকে খাগড়াছড়ি পর্যন্ত নতুন বিআরটিসি বাস সার্ভিস চালু করেছে। তাদের অনেকেই নতুনভাবে পাহাড়িদের জমি দখল করা শুরু করেছে। বাণিজ্যমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুনভাবে চা বাগান করার উদ্যোগ নেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। অথচ ব্রিটিশ আমলেই ইংরেজরা পার্বত্য চট্টগ্রামে চা বাগান করে সুফল পায়নি। তারা দার্জিলিং এবং আসামে চা বাগান করে লাভবান হয়েছিল। ১৯৬৪ সালে যে কানাডিয়ান কোম্পানিটি পার্বত্য চট্টগ্রামের মাটি পরীক্ষা এবং জরিপ করেছিল সে কোম্পানিও পার্বত্য চট্টগ্রামে চা বাগান করার সুপারিশ করেনি। তাছাড়া বর্তমানে দেশে যে ১৬৫টি চা বাগান রয়েছে সেসব বাগানের ৫৮% জমি খালি পড়ে আছে। সেসব খালি জায়গায় চা চাষ করার কোন উদ্যোগ নেই। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের সুধী সমাজের সকলেই আশঙ্কা করেছেন যে চা বাগান করার নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে আরও বাঙালি নেয়ার মতলবেই মন্ত্রী মহোদয় পার্বত্য চট্টগ্রামে চা চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। অর্থাৎ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে উপজাতিদের আরও উৎখাত করতে চায়। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা এখন গভীর আতঙ্কের মধ্যে আছে, তারা ভাবছে এখন তারা যাবে কোথায়?

উলে-খ্য, ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা ছিল মোট জনসংখ্যার ৭৭.৫%। গত ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে উপজাতি অ-উপজাতির আনুপাতিক হার হয় প্রায় সমান সমান। ২০০১ সালের আদমশুমারির সরকারি ফলাফল এখনও জানা যায়নি। তবে অনুমাণ করা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন উপজাতিরা সংখ্যালঘু। আরও উলে-খ্য, ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় ভারতে চাকমাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪ হাজার হতে ১৫ হাজার। এখন সেখানে চাকমাদের সংখ্যা ৩ লাখ এবং বাংলাদেশে চাকমাদের সংখ্যা ২৬০৫৭৭। বর্তমান ভারতের চাকমারা প্রায় সবাই ১৯৪৭ সালের পর বর্তমান বাংলাদেশ থেকে চলে গেছে। কিন্তু বর্তমানে চাকমা তথা উপজাতিদের পক্ষে ভারতে যাওয়া মোটেই সম্ভব নয়। নিজের মাতৃভূমিতে তাদের স্থান না হলে অন্য কোন দেশইবা কেন তাদের গ্রহণ করবে?

সংবাদ, ২১ ও ২২ এপ্রিল ২০০৩

বেগম খালেদা জিয়ার সম্প্রীতির বাণী এবং বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও আদিবাসী সম্প্রদায়

শাহরিয়ার কবির

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক ও যুদ্ধাপরাধী অধ্যুষিত চারদলীয় জোট সরকারের নেত্রী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, ‘বিএনপি কখনও রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করে না কিংবা জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে ধর্মকে কাজে লাগায় না। ..... যারা ধর্মের ভিত্তিতে বা অন্য কোন ইস্যুতে জাতিকে বিভক্ত করতে চায় তাদের চ□ান্ত নস্যাৎ করতে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।’ (জনকণ্ঠ, ৬ মে ২০০৩)

মিথ্যাচারের জন্য গিনিয বুকে নাম লেখানো কিংবা অন্য কোথাও যদি শিরোপা লাভের ব্যবস্থা থাকতো তাহলে বেগম খালেদা জিয়া এবং তাঁর জোট সরকারের নেতারা সেই দুর্লভ কৃতিত্ব অর্জন করতেন। তাঁর প্রথম বাক্যের ইতিহাসস্বীকৃত সংশোধিত পাঠ হবে ‘বিএনপিই প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করেছে এবং জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য ধর্মকে কাজে লাগিয়েছে।’

১৯৪৭ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ধর্মীয় দ্বিজাতিতত্ত্ব অনুযায়ী ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের উদ্ভব ঘটেছিল। ’৪৭ থেকে ’৭১-এ বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত পাকিস্তানের শাসকরা ধর্মের নামেই শাসন করেছে এবং এদেশের জনগণের যে কোন আন্দোলন ও সংগ্রামকে ইসলাম ও পাকিস্তানবিরোধী বলে চরম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দমন করেছে। ’৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা এবং তাদের এ দেশীয় দোসর জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগ ও নেজামী ইসলামী পাকিস্তান ও ইসলাম রক্ষার দোহাই দিয়ে তিরিশ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করেছে। গণিমতের মাল আখ্যা দিয়ে চার লক্ষেরও বেশি নারী ধর্ষণকে তারা ধর্মের নামে জায়েজ করতে চেয়েছে।

বাংলাদেশের মানুষ ধর্মের নামে শোষণ-পীড়ন-বিভেদ চায়নি বলেই পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছিল। এ কারণেই নতুন প্রজাতন্ত্রের নতুন সংবিধানে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান নীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছিল এবং ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। যে কোন সভ্য দেশ ধর্ম-বর্ণ-জাতি-বিত্ত নির্বিশেষে মানুষের সমান অধিকার ও মর্যাদায় বিশ্বাস করে, বাংলাদেশের সংবিধানে সেই বোধেরই প্রতিফলন ঘটেছিল। রাষ্ট্রীয় নীতির ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার সরল অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্র ও সরকার কখনও ধর্মের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে না, বিশেষ কোন ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব কিংবা বিশেষ বিশেষ ধর্মের প্রতি বৈরি আচরণ প্রদর্শন করবে না। ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের অন্তর্গত, রাষ্ট্র এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবে।

ধর্মনিরপেক্ষতায় এই বোধই ছিল ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মূল প্রেরণা, যে কারণে ধর্ম ও জাতিসত্তা নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল মানুষ একজোট হয়ে ইসলামের ধ্বজাধারী পাকিস্তানি সামরিক জান্তা এবং তাদের এ দেশীয় সহযোগীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং বাংলাদেশের মাটিতে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে তাদের পরাজিত করেছিল। এই বোধ ছাড়া পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করা যেত না।

১৯৭৫ সালে স্বাধীন বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সহযোগীদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল বাংলাদেশকে আবার পাকিস্তান বানাবার জন্য। কারণ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে পাকিস্তান এবং তাদের এ দেশীয়

সেবাদাসরা কখনও '৭১-এর পরাজয়ের গ-ানি ভুলতে পারেনি। স্বাধীন বাংলাদেশ হচ্ছে পাকিস্তানের পরাজয়ের প্রতীক, ধর্মের নামে বিভেদ-শোষণ-পীড়ন-হত্যার রাজনীতির পরাজয়ের স্মারক। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসেই '৭১ এর সংবিধানের মুখবন্ধে 'বিসমিল-াহ ---' সংযোজন করে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' এবং ধর্মভিত্তিক দল করার উপর সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা বাতিল করে দিলেন। জেনারেল জিয়া একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়েও এ কাজ করেছিলেন পাকিস্তানকে তুষ্ট করার জন্য, বাংলাদেশে তাদের পরাজয়ের বেদনা ও ক্ষতের উপর মলম লাগাবার জন্য এবং বাংলাদেশকে পাকিস্তানের আদর্শে গড়ে তোলার জন্য। এ কারণেই জেনারেল জিয়া পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগী যুদ্ধাপরাধীদের দল নিষিদ্ধ ঘোষিত জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগ প্রভৃতি মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক দলকে রাজনীতি করার সুযোগ দিয়েছিলেন এবং পাকিস্তানি সামরিক জান্তার দালাল ও যুদ্ধাপরাধীদের নিজের মন্ত্রিসভায় সাদরে স্থান দিয়েছিলেন।

সংবিধানে 'বিসমিল-াহ .....' সংযোজনের অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়কে এটা চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেয়া যে এই সংবিধান তাদের নয়। কারণ কোন হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান কিংবা চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, বোম, গারো, সাঁওতালদের পক্ষে 'বিসমিল-াহ...' উচ্চারণের অর্থই হচ্ছে ধর্মচ্যুত হওয়া। ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান হত্যা করতে গিয়ে জেনারেল জিয়া এতে আরও সংযোজন করেছিলেন রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি হবে 'সর্বশক্তিমান আল-াহের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস।' একজন অমুসলিম কী কারণে মুসলমানের আল-াহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখবেন? জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে শত শত বছর ধরে এদেশে থেকে কি তারা পাপ করেছেন?

জেনারেল জিয়ার সুযোগ্য উত্তরসূরি জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় এসে সংবিধানের উপর আরেক দফা বলাৎকার করেছিলেন। ইসলামকে তিনি রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। জেনারেল এরশাদকৃত সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী হচ্ছে জেনারেল জিয়াকৃত পঞ্চম সংশোধনীর যৌক্তিক পরিণতি। এভাবেই বাংলাদেশের জেনারেলরা সভ্যতার বোধ হত্যা করে বাংলাদেশকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন মধ্যযুগীয় বর্বরতার দিকে। এখন আমরা খালেদা-নিজামীর জমানায় এর চূড়ান্ত পরিণতি দেখার দিন গুনছি, যারা '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ করেছি, যাদের আস্থা ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের প্রতি। সাংবিধানিকভাবে ধর্মের ভিত্তিতে জাতিকে এভাবে বিভক্ত করার পরও বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যদি বলেন, বিএনপি কখনও ধর্মের ভিত্তিতে জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেনি এর চেয়ে নিলর্জ্জ মিথ্যাচার আর কিছু হতে পারে না।

১৯৯৬ সালে বিএনপি ক্ষমতা হারিয়ে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক জামাতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোটের সঙ্গে জোট বেঁধেছে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য। জামাতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট বাংলাদেশকে তালেবানি আফগানিস্তান ও মৌলবাদী পাকিস্তান বানাবার ঘোষণা দিয়েছে প্রকাশ্য জনসভায়। জাতীয় সংসদে জামাত নেতা মতিউর রহমান নিজামী '৯৩ সালেই 'ব-াশফেমী আইন' প্রণয়নের বিল জমা দিয়েছেন। ইসলামী ঐক্যজোট নেতা আমিনী বলেছেন বাংলাদেশ চলবে ফতোয়ার আইন দ্বারা। হাইকোর্টের যে দুজন সম্মানিত বিচারপতি ফতোয়াকে অবৈধ ঘোষণা করে রায় প্রদান করেছিলেন আমিনীরা তাঁদের মুরতাদ ঘোষণা করেছেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে খালেদা জিয়ার উপস্থিতিতে জামাত নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর নির্বাচনী জনসভায় শে-াগান দেয়া হয়েছে'এবারের নির্বাচন হিন্দু আর মুসলমানের লড়াই', 'এবারের নির্বাচন ধুতি আর টুপির লড়াই'। এ ধরনের শে-াগান দেয়ার কারণ হচ্ছে খালেদা জিয়ার জোটের প্রার্থী সাঈদীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন আওয়ামী লীগের এডভোকেট সুধাংশু শেখর হালদার।

নির্বাচনের সময় এ ধরনের উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রচারণা চালানো হয়েছিল জনগণকে বিভক্ত করারই উদ্দেশ্যে, যাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রার্থীর বিরুদ্ধে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের প্রার্থী জয়ী হয়। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য সংখ্যালঘুদের উপর বিভিন্ন ধরনের হামলা এবং ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে যাতে তারা নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে না যায়। নির্বাচনের পর আবার তাদের উপর হামলা হয়েছে কেন তারা আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে কিংবা কেন তারা তাদের বিষয় সম্পত্তি, ব্যবসা বাণিজ্য সব ফেলে রেখে চিরদিনের মত দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে না। এই হামলা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

ক্ষমতায় আসার জন্য খালেদা জিয়া নতুন করে নিজামী-আমিনীদের সঙ্গে জোট বেঁধেছেন। গত ২০ মাস ধরে তাঁরা ক্ষমতায় আছেন। খালেদা জিয়া কি কসম খেয়ে বলতে পারবেন তাঁদের জোটের জমানায় এমন একটি মাস আছে যে মাসে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর হামলা, নির্যাতন, ধর্ষণ, হত্যা কিংবা দেশত্যাগের ঘটনা ঘটেনি? বিএনপি জামাতের উচ্ছিষ্টভোগী কলাম লিখিয়েরা অবশ্য সব সময় নেত্রীর প্রতিধ্বনি করে লিখেই চলেছেন 'বাংলাদেশে চমৎকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রয়েছে', 'সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর কোন নির্যাতন হয়নি, এখনও হচ্ছে না।' নির্যাতন-ধর্ষণ-হত্যার ঘটনা যদি নাই ঘটবে প্রধানমন্ত্রী কেন গত মাসে বাগেরহাটের দুই ধর্ষিতা গৃহবধুকে তাঁর কার্যালয়ে ডেকে এনে দু লাখ টাকা দিলেন? প্রধানমন্ত্রী যেদিন (৮ এপ্রিল) সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত তপন ভট্টাচার্যের স্ত্রী ও ভ্রাতৃবধুকে দু লাখ টাকার চেক দিয়েছেন তার ১১ দিন আগে আমরা তাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তপন ভট্টাচার্যের হত্যাকাণ্ড এবং ঠাকুরবাড়িতে তিন গৃহবধুকে ধর্ষণের অভিযোগে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তারা সবাই বিএনপির লোক। ১৩ জনের নাম বলা হয়েছে, তাদের ভেতর গ্রেফতার করা হয়েছে ৭ জনকে। বাকিরা পুলিশের নাকের ডগায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং যথারীতি, ঠাকুরবাড়ির লোকজনদের ভয়ভীতি প্রদর্শন অব্যাহত রেখেছে।

বাগেরহাটের নির্যাতিত ভট্টাচার্য পরিবার প্রধানমন্ত্রীর অনুকম্পা লাভ করেছে পাঁচটি কারণে ১) নিহত তপন ভট্টাচার্যের ভাই স্বপন ভট্টাচার্য পুলিশ বাহিনীর সদস্য, যার স্ত্রীও ধর্ষিতা হয়েছেন, ২) বিরোধীদলের নেতা সহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গ নির্যাতিতদের দেখতে গিয়েছেন, ৩) যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তারা স্থানীয় বিএনপির সদস্য, ৪) মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে বাদীরা যাতে বেশি বাড়াবাড়ি না করে কেঁচো খুঁড়তে যাতে সাপ না বেরোয় এবং ৫) ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশে মানবাধিকার লংঘন এবং সরকারের নির্লিপ্ততা ও অস্বীকৃতির ফলে যেভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে তাদের ক্ষোভ প্রশমনের জন্য এ ধরনের একটি নাটকের আয়োজন করা প্রধানমন্ত্রীর জন্য জরুরি হয়ে উঠেছিল। আরও কারণ হচ্ছে কদিন পরেই ইউরোপীয় দাতাদের প্যারিস কনসোর্টিয়ামের বৈঠক, কথা উঠলে যাতে বলা যায় আমরা তো ব্যবস্থা নিচ্ছি, ক্ষতিপূরণও দিচ্ছি!

বেগম খালেদা জিয়া যদি আন্তরিকভাবেই ধর্ষিতা নারীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হতেন সবার আগে সিরাজগঞ্জের কিশোরী পূর্ণিমাকে তিনি ডেকে পাঠাতেন তাঁর কার্যালয়ে, যে মেয়েটি ধর্ষণের বিচার চাওয়ার জন্য সংস্কার-লজ্জা-ভয় উপেক্ষা করে রাজধানী ঢাকায় ছুটে এসেছিল, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের ১১ দিন পর। পূর্ণিমাকে প্রধানমন্ত্রী ডাকেননি। গত ২০ মাসে সারা দেশে হাজার হাজার পূর্ণিমা ধর্ষিতা হয়েছে, কাউকেই প্রধানমন্ত্রী ডাকেননি বরং তিনি এবং তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সব সময় বলেছেন কোথাও কিছু ঘটেনি, খবরের কাগজ আর আওয়ামী লীগওয়ালারা মিথ্যে কথা লিখছে। কখনও উপহাস করে বলেছেন, আওয়ামী লীগ এসব করছে। অথচ নির্বাচনে যে সব পত্রিকা চার দলীয় জোটের বিজয় দেখতে চেয়েছিল, যারা আওয়ামী লীগের কট্টর সমালোচক, তারাও সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করে

নিশ্চুপ থাকতে পারেনি, দেরিতে হলেও তারা সাম্প্রদায়িক বর্বরতার শত শত ঘটনা পত্রিকায় ছেপেছে।

বাংলাদেশের খবরের কাগজকে প্রধানমন্ত্রী মিথ্যে খবর পরিবেশনের জন্য অভিযুক্ত করে বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিতে পারেন, বিদ্যুতের লাইন কেটে দিতে পারেন, প্রতিবাদী সাংবাদিক ও কলাম লেখকদের গ্রেফতার করে রিমান্ডের নামে দিনের পর দিন নির্মম নির্যাতন চালাতে পারেন, কারাগারে তাদের পশুর জীবন যাপন করতে বাধ্য করতে পারেন, কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট, অ্যামনেস্টি ইন্টান্যাশনাল ও হিউম্যানিস্ট ইন্টারন্যাশনাল সহ বিপুল সংখ্যক আন্তর্জাতিক সংস্থা সম্পর্কেও কি তিনি বলবেন সবাই শেখ হাসিনার কথা মতো জোট সরকার ও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের কল্পিত কাহিনী প্রচার করছে, অকারণে কিংবা বিশেষ কারণে উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে? খালেদা জিয়া উটপাখির মতো বালিতে মাথা গুঁজে ভাবতে পারেন ঝড় আসছে না, কারণ তিনি দেখতে পাচ্ছেন না, ভাবতে পারেন দেশের সবাই তাঁর মতো উটপাখি, বলতে পারেন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কেও বাংলাদেশের ব্যাপারে উটপাখি হওয়া উচিৎ, কিন্তু বালির ভেতর মাথা গুঁজে উটপাখি কখনও ঝড় থামাতে পারেনি, বরং ঝড় প্রবল হলে নিজেই খড়কুটোর মতো উড়ে গেছে।

খালেদা জিয়া যখন সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে প্রেম ও সম্প্রীতির বাণী বিতরণ করেন তখন দু পাশে বিভীষণরূপী গৌতম, গয়েশ্বরদের রাখেন। সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের কথা খালেদা জিয়া যত অস্বীকার করেন, তাঁর নন্দী-ভৃঙ্গিরা শতগুণ বেশি করেন। গৌতম চক্রবর্তী সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদীদের জোট সরকারের হাফ মন্ত্রী হয়ে মুসলিম মৌলবাদের প্রেমে এমনই মজেছেন যে, যুদ্ধাপরাধী মওলানা মান্নানের উগ্র মৌলবাদী দৈনিক 'ইনকিলাব'-এ কলাম লিখে সেক্যুলার লেখক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যে নিয়মিত বিষোদগার করছেন।

সরকারের শীর্ষে এক ধরনের অমানবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে। বহু জায়গায় এখন হিন্দুদের লেলিয়ে দেয়া হচ্ছে হিন্দুদের বিরুদ্ধে। প্রত্যন্ত অঞ্চলেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে সরকারী দলের সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা করার জন্য সেই সম্প্রদায়ের কিছু লোকের সাহায্য নিচ্ছে। গত ৯ মে চট্টগ্রামের বাঁশখালিতে ঘরে পেট্রল ঢেলে জুনুবালা দেবী (৬০), আরতিবালা দেবী (৪০) ও চম্পাবালার (১৪) জীবন্ত পুড়িয়ে মারার সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে পত্রিকায় এ ধরনের ঘটনার উলে-খ করেছে। (দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ মে ২০০৩)

বাগেরহাটের বিনয়কৃষ্ণ সিংহের একমাত্র মেয়ে কিশোরী বিভারাণী সিংহকে অপহরণ করে দিনের পর দিন নৃশংস নির্যাতনের ঘটনায় যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের, প্রকৃত অপরাধী যারা সরকারী দলের সদস্য তাদের গ্রেফতার করা হয়নি। (জনকণ্ঠ, ৩ মে ২০০৩)

বাগেরহাটের ধর্ষিতা অনিমা, শিউলি ও অনিতারাণীদের প্রধানমন্ত্রী দু লাখ টাকা দিয়েছেন, যার অন্তর্নিহিত কারণের একটি হচ্ছে দলীয় সন্ত্রাসীদের আড়াল করা। একইভাবে বিভারাণীকে ডেকে যদি ধর্ষণের মূল্য হিসেবে প্রধানমন্ত্রী তার হাতে এক লাখ টাকার চেক ধরিয়ে দেন তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। অনিমাদের টাকা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী এটা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন সংখ্যালঘু নারী ধর্ষণের ঘটনার সঙ্গে যদি সরকারী দলের সন্ত্রাসীরা যুক্ত থাকে এখন থেকে তার জন্য এক লাখ টাকা দেয়া হবে। এ নিয়ম এখন থেকে চালু হয়েছে এবং এটা এখন পর্যন্ত শুধু সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হচ্ছে, কারণ মুসলিম নারী ধর্ষণের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীকে কখনও বিচলিত হয়ে এক লাখ টাকা দিতে দেখিনি, কারণ তাদের মতে এসব নিছক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, এ রকম ঘটনা আওয়ামী লীগ আমলেও ঘটেছে।

প্রধানমন্ত্রী যখন অনিমাদের ডেকে এনে টাকা দেন, যখন তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভীষণদের উদ্দেশে বলছেন, 'বিএনপি কখনও রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করে না,' এবং 'বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজ করছে', 'এ দেশে কোন সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু নেই' তখন দেশের বিভিন্ন এলাকায় গত আট দিনে পাঁচটি সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা পত্রিকায় এসেছে। শুধু হিন্দু নয়, আদিবাসীরাও আক্রান্ত হচ্ছে। ফরিদপুরে আদিবাসী পল-ীতে নারকীয় তাণ্ডব (ভোরের কাগজ, ১০ মে ২০০৩), ঢাকার গাবতলীতে বিএনপির সাংসদ এস এ খালেক কর্তৃক জবরদস্তি করে ঋষিপাড়ায় সংখ্যালঘুদের জমি দখল (প্রথম আলো, ৯ মে ২০০৩), মিরসরাইয়ে সংখ্যালঘুদের ১০ দোকান ভাঙচুর ও লুটপাট (প্রথম আলো, ১১ মে ২০০৩), বাঁশখালীতে ঘরে আগুন লাগিয়ে মা ও মেয়ে সহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৩ জন দরিদ্র নারীকে পুড়িয়ে মারা (জনকণ্ঠ ১০ মে, ২০০৩)-র সংবাদ আমরা ঢাকায় বসেই জানতে পেরেছি। এসব খবর সরকার সমর্থক হিসেবে পরিচিত পত্রিকাতেও বেরুচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী যদি দলের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন, তাঁর জোটের শরিকরা যদি উগ্র মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপ্রসূত বক্তৃতা-বিবৃতি-হুমকি বন্ধ না করে ক্ষতিপূরণ দিতে দিতে (যদি অনিমাদের ক্ষেত্রে সূচিত নিয়ম প্যারিস কনসোর্টিয়ামের বৈঠকের পরও চালু থাকে) রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সঞ্চয় অচিরেই শূন্যে গিয়ে পৌঁছবে।

প্রধানমন্ত্রী ও জোট সরকারের 'সংখ্যালঘু প্রীতি'র দুটি জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তি এবং 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আইন' আক্ষরিক অর্থে হিমাগারে প্রেরণ।

১৯৯১ এবং ১৯৯৬ সালের নির্বাচনী-প্রচারণায় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিএনপির সমালোচনার অন্যতম বিষয় ছিল ক্ষমতায় গেলে আওয়ামী লীগ অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল করবে এবং এর ফলে বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে যাওয়া লক্ষ লক্ষ হিন্দু পরিবার বাংলাদেশে ফিরে এসে তাদের পরিত্যাক্ত সম্পত্তি দখল করবে। এ নিয়ে বিএনপি লিফলেট পোস্টার ছেপে এমনই মাতম করেছিল যে, আত্মরক্ষার জন্য আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ঘোষণা থেকে এ বিষয়টি বাদ রেখেছিল। অত্যন্ত অমানবিক, সংবিধানবিরোধী এই কালাকানুন বাতিল করার জন্য শুধু সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় নয়, বাংলাদেশের সিভিল সমাজও আন্দোলন করেছে, যে কারণে ক্ষমতা ছাড়ার তিন মাস আগে আওয়ামী লীগ আইনটি বাতিল করেছে। এই আইন বাতিলের পর ভারতে চলে যাওয়া একজন হিন্দুও বাংলাদেশে ফিরে এসে তার ফেলে যাওয়া সম্পত্তি দাবি করেছে এমনটি শোনা যায়নি। বরং পত্রিকায় এখন খবর বেরুচ্ছে 'অর্পিত সম্পত্তি আইন' বাতিলের ঘোষণা জোট সরকার মানছে না, সরকারীভাবে নতুন করে হিন্দুদের সম্পত্তি দখলের ঘটনা ঘটছে। (জনকণ্ঠ, ১০ মে ২০০৩)

বিএনপি একই ধরনের প্রচারণা চালিয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের সংক্ষুব্ধ আদিবাসীদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ নেয়ার সময়। শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করতে গিয়ে খালেদা জিয়া বলেছিলেন, এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম, যা বাংলাদেশের এক দশমাংশ এলাকা ভারতের হয়ে যাবে। '৯৭ সালে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, শান্তি বাহিনীর বিদ্রোহী সদস্যরা অস্ত্র সমর্পণ করেছে, সামরিক বাহিনীর নির্যাতনে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি আদিবাসী স্বদেশে ফিরে এসেছে এবং বিএনপিওয়ালারা গত পাঁচ বছর ধরে বিনা ভিসায় পার্বত্য চট্টগ্রামে যাচ্ছে। গত ৯ মে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী সম্প্রদায়ের নেতা সন্তু লারমা সরকার কর্তৃক শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন না করার অভিযোগ এনে ঢাকায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন 'বাংলাদেশের আদিবাসীদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে, তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নেই। আদিবাসীদের জীবন, ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভূমি, সংস্কৃতি, সম্পদ এখন অন্যেরা

নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশের আদিবাসীরা এখন সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি। তাদের অস্তিত্ব এখন হুমকির সম্মুখীন। সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মাধ্যমে 'পপুলেশন ট্রান্সফার' করে সমতলের আদিবাসী এলাকাসমূহ অনেক আগেই মুসলিমীকরণ হয়ে গেছে। উত্তরবঙ্গ, গারো পাহাড় এলাকা, মধুপুরের গড়, খাসিয়া পাহাড় এলাকায় আজ নিশ্চিহ্নপ্রায় সংখ্যালঘু। পার্বত্য চট্টগ্রামেও এ প্রক্রিয়া ভয়াবহভাবে অব্যাহত রয়েছে। সেখানে জুম্ম (পাহাড়ি) জনগণ নিজভূমে দ্রুত সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছে। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের ৫ বছর পরও চুক্তির অনেক মূল বিষয় বাস্তবায়িত হয়নি।' (ভোরের কাগজ, ১০ মে ২০০৩)

পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তি এবং অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আইন অগ্রাহ্য করে সারা দেশে সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন অব্যাহত রেখে খালেদা জিয়ার মুখে সম্প্রীতির বাণী ভুক্তভোগীদের কাছে নিরোর বাশি বাজানোর মতোই মনে হবে। প্যারিস কনসোর্টিয়ামের বৈঠকে দাতারা যদি প্রশ্ন করেন শান্তিচুক্তি ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আইন কেন বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না, সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন কেন অব্যাহত রয়েছে সরকার কী জবাব দেবে? দু'মাস আগে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্যরা বাংলাদেশে এসে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলো প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরা উটপাখি নন, ঘাসও খান না।

বাংলাদেশে মানবাধিকারের নিষ্ঠুর অবমাননা, বাংলাদেশের সংবিধান এবং সর্বজনীন মানবাধিকার সনদের চরম লংঘনের জন্য খালেদা জিয়া ও তাঁর জোট সরকারের সদস্যদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। সেটা বাংলাদেশের আদালতেও হতে পারে, রোম কিংবা হেগ-এর আন্তর্জাতিক আদালতেও হতে পারে। কারণ সংখ্যালঘুর নিরাপত্তা, সম-অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এখন অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় অধিকতর সোচ্চার।

জনকণ্ঠ, ১১ *মে* ২০০৩

অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?

ওয়াহিদুল হক

মৃদুলকান্তি রক্ষিত। এই হতভাগা পিতার কথা কে না জানে? যারাই সজলকে একবার মাত্র দেখেছে তারা তার নৃশংস হত্যার কথা জানার পর না কেঁদে পারেনি। মৃদুল বাবু তাঁর বাবা। সজলকে ঠিক সেই বয়সে যেতে হলো যখন সে পিতার ও বংশের সব উত্তরাধিকার ও তার নিজের ব্যক্তিগত বিদ্যা ও মনুষ্যত্বের অর্জনকে মেলাবার অভিযান আরম্ভ করতে যাচ্ছিল। প্রস্তুতি শেষের আবেগে থরথর-দৌড়ের ঘোড়ার যেমনটা হয় ছুটবার আগে।

মৃদুল রক্ষিত সমাজের মাথা, বিশেষ করে চট্টগ্রামের হিন্দুদের। আইন ব্যবসায়ে তাঁর কৃতিত্ব ও সততা এবং ফলস্বরূপ আনুপাতিক আয় তাঁকে ওই জায়গায় বসিয়েছিল, তাঁর দিক থেকে কোন পলিটিকিং নয়। টাঙ্গাইলের অকাল প্রয়াত যুবক ব্যবহারজীবী কামাক্ষা সেনের মত। সংখ্যালঘু ধর্মসম্প্রদায়েরই সমাজ থাকে। টিকে থাকবার জন্যে তা প্রয়োজন হয়। এক ধরনের সমষ্টিবদ্ধতা, সর্বাত্মক প্রতিকূলতাকে মোকাবেলা করবার জন্যে। বাংলাদেশে সংখ্যাগুরু ধর্মসম্প্রদায়ের কোন সমাজ নেই, কারণ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-আদিবাসীর মত তার সমস্যা টিকে থাকা নয়। তার সমস্যা তার সংখ্যাগুরুত্বের কল্পিত এবং মিথ্যা বোধ যেন তাকে যথেচ্ছাচারী, 'টিরান্ট', করে না বসে, বিশেষত দলে-বলে। মুসলমানের সমাজ ছিল যখন সে নিগ্রহের শিকার ছিল, সামাজিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে। সেই প্রাক-পাকিস্তান ব্রিটিশ হলেও (কোয়ান্টিটিতে, কোয়ালিটিতে নয়), সর্বভারতীয়তার মাপে ছিল নগণ্য সংখ্যালঘু। তখনকার অগ্রসর হিন্দু, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত অগ্রসর শিক্ষিত হিন্দুরাও, একটা সমাজের কথা বলত, যা নগরে প্রকটভাবে উপস্থিত না থাকলেও, গ্রাম্য বাস্তবতার মূল এবং কঠিন স্তর অতি-রক্ষণশীল নিয়ন্ত্রক ছিল। এক দিকে মুসলমানের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, আরেক দিকে ব্রাহ্মণরা সনাতন পন্থায় ধস নামাচ্ছে এবং নব্য ইংরেজিনির্ভর শিক্ষা হিন্দু অচলায়তনের প্রাচীরগুলো সমানে ভাঙছে এই তিনমুখী আক্রমণ রুখতে ভাবা হয়েছিল সামাজিক প্রতিরোধই প্রকৃষ্ট উপায়। এই সামাজিক প্রতিরোধ হিন্দু ধর্মাবলম্বী বাঙালির কোনকালে কোন উপকার করেছে বলে দেখা যায় না, বরং এই সম্প্রদায়ের আশ্চর্য সব জাতীয় অর্জনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে সব সময়ে। সমাজ নামের অনুদার দৈত্যকে অস্বীকার করেই মানুষ এগিয়েছে। এই সমাজ কখনোই ইংরেজি সোসাইটি শব্দের সমার্থক নয়। বরং ফ্রিম্যাসনদের মত কট্টর নির্যাতক গোষ্ঠী এই স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব অবলোপকারী এই দানব।

দিন বদলেছে। বৈষম্য বঞ্চনার এখন প্রধানতম হাতিয়ার সাম্প্রদায়িকতা। মুসলমান যখন সামাজিক অন্যায় অত্যাচার করতে উদ্যত হয় তখন সে সংখ্যাগুরুত্বের দোহাই দিয়ে তা করে। হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ কি আদিবাসী তখন কোনই ব্যক্তি নয় তার কাছে। সে কেবলই সংখ্যালঘু। মাথা নিচু করে চলবে, জায়গা-জমি ছাড়বে, বাসভূমি ছাড়বে, ব্যবসায়ে চাকরিতে বৈষম্যের শিকার হবে, সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরে যদি মেয়েটা সুন্দর হয়ে উঠতে থাকে তবে কোন সচ্ছল আত্মীয়ের বাড়িতে, শহরে, তাকে কাজের মেয়ে করে পাঠিয়ে দেবে, সংখ্যাগুরুর উঠতি বয়সের ছেলেদের 'মদন ক্ষিপ্ত' (প্রয়াত বড় বড় মানুষ জহুর হোসেন চৌধুরীর ভাষায়) হলে তারা হিন্দুর মেয়ে ধরবে, তাতে বাধা দেয়া চলবে না। তবেই না তারা সংখ্যালঘু। সংখ্যালঘুরা সংখ্যালঘুর মত সবকিছু মানিয়ে চলবে এবং থাকবে অনন্ত আতঙ্কের মধ্যে এটাই ছোটবড় ধনী-গরিব শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব ধরনের বাঙালি মুসলমানদের দ্বারা প্রত্যাশিত। এক একটা দাঙ্গা যায়, নির্বাচন যায়, শ'য়ে শ'য়ে বাজার হিন্দু ব্যবসায়ী শূন্য হতে থাকে, হাজার হাজার, কখনো লক্ষ

লক্ষ মানুষ অপর দেশে হিযরত করতে থাকে। বিধর্মীকে নির্যাতনের বেলায়ই মুসলমানদের মধ্যকার দীনের হতে দীন হঠাৎ খালিদ, মুসা, তারিক হয়ে যায় সব সংখ্যালঘু তার পায়ের তলারও যোগ্য নয়।

এটা কোন রাষ্ট্রের ছবি হতে পারে না। এটা অবশ্যই হাবিয়া দোযখের চাইতেও জঘন্য কিছু নরকের চিত্র। এবং এটা আমাদের সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে বাঙালিত্ব আছে, যে বাঙালি জাতিসত্তা আছে, তার চূড়ান্ত গ-ানিকর পরাজয়। অথচ পাকিস্তান আমলের প্রথম দিনগুলিতে, প্রায় সবটাই জুড়ে হিন্দু বলে পরিচিত সকল পূর্ববঙ্গীয় মানুষ, তাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে যুক্ত নির্বাচন, জমিদারি উচ্ছেদ প্রভৃতি অনেক অগ্রসর কাজে নেতৃত্ব দিয়ে তা সম্ভব করেছে। পুরো সময়টা ধরেই যে কোন হুজুগে পাকিস্তানি প্রশাসন কমিউনিস্ট ও হিন্দুদেরকে পাইকারি হারে জেলে ঠুকত। কমিউনিস্টদের সকলে জানে, তারা দিন বদলাতে চায়, কিন্তু হিন্দু শুধু হিন্দু হবার কারণেই জেলে যেতে-আসতে জীবন কাটাত। কিন্তু একদিনের জন্যে সে বলেনি বা ভাবেনি এর ভেতরের সাম্প্রদায়িকতাটুকু। সে জেনেছে এবং বলেছে এদ্বারা বাঙালি নিগৃহীত হচ্ছে, হিন্দু নয়। চূড়ান্ত আত্মদান করলেন তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে। প্রথমে অনুপ্রবেশকারীর ধুয়া তুলে, পরে পাক (পবিত্র) সমাজকে অপবিত্র করবার না-পাক মানবেতর জীব হিসেবে নৃশংস হত্যার শিকার হয়ে হিন্দু বাঙালি (পাকিস্তানি কাগজপত্র, আদেশ নির্দেশ ফরমান দেখুন, পাঠক, গণহত্যা সিদ্ধকরণে পড়ুন তাদের নেতাদের আস্ফালনমূলক ভাষণ)। অন্তত ত্রিশ লাখ জবাই হওয়া বাঙালির মধ্যে কম হলেও বিশ লাখ হিন্দু। যেখানে জনসংখ্যার অনুপাতে তারা প্রতি দশজন নাগরিকে বড়জোর একজন। তখনও, তখন থেকে এখনো, কোন হিন্দু বলেনি তারা নিতান্তই হিন্দু বলে জবাই হয়েছে। আমরা মুক্তিযুদ্ধের নায়ক ও সমর্থকেরা একযোগে বলেছি গণহত্যা হয়েছে বাঙালির ওপর, এবং আমাদের হিন্দু ভাইরাও তাই ভেবেছেন এবং বলেছেন। হিন্দু-মুসলমান কোন কথা নয়, ওরা বাঙালি মেরেছে। অথচ পাকিস্তানি শাসক-জেনারেল সকল জওয়ানের মিশন ছিল কেবলি হিন্দু মারাএবং যেহেতু বাঙালি মুসলমান, তাদের চোখে হিন্দুরই নামান্তর, মুসলমান বিশেষ করে আওয়ামী লীগপন্থী কিছু মুসলমান গণহত্যার প্রক্রিয়ায় মারা গেলে তারা আফসোস করেনি, ইসলামি বিধানমতে তাদের দাফনের ব্যবস্থা করেনি। তাদের ধারণা ছিল তারা হিন্দুই মেরেছে, এমন হিন্দু যার নাম আরবী এবং যে কলেমা বলতে পারে। এমন কি যার খৎনা হয়েছে।

বাঙালির হাজার বছরের পুরনো জাতীয়তায় চলি-শের দশকে যে ফাটল ধরেছিল তা মেরামত করে এক অখণ্ড বাঙালি জাতিসত্তা বিনির্মাণে আজকের নতুন করে সংখ্যালঘু বনে যাওয়া মানুষগুলো এইভাবে আত্মদান করেছে, সাম্প্রদায়িক স্বার্থবোধকে মাথা চাড়া দিতে দেয়নি। এখনকার তথাকথিত ধর্মসাম্প্রদায়িক সংখ্যাগুরুদের মধ্যে সবাই এমন কিছু পাষণ্ড ছিল না। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় তারা নেতৃত্ব দিয়েছে এবং ভুগেছে, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তা এই পদচতুষ্টয়ের ওপরে বাংলাদেশের সংবিধানকে স্থাপন করেছে। প্রতিটি স্তম্ভ এককভাবেই সাম্প্রদায়িকতা হননকারী, জাতীয়তা ও প্রকৃত স্বাধীনতা, ব্যক্তিক স্বাধীনতা নির্মাণকারী। তথাকথিত সংখ্যাগুরুর মধ্য থেকেই ভাষা আন্দোলন দাঁড়িয়েছিল, তারই উত্তরাধিকারসূত্রে তারা করেছে রবীন্দ্রনাথের পুনর্বাসন, পহেলা বৈশাখের জাতীয় উৎসব।

সে সকলি আজ পরাজিত, বাংলাদেশই পরাজিত। যখন হিন্দুকে আবার নিজেকে কেবলি হিন্দু বলে ভাবতে হচ্ছে (একতাল যা কেবল পাকিস্তানবাদী মুসলমানই ভেবেছে) এবং সমাজের দোহাই দিয়ে একতাবদ্ধ হতে হচ্ছে। এতকালের সব অর্জন বিসর্জন দিতে হচ্ছে, নিছক আত্মরক্ষার জন্যে। হিন্দু বলে মার খেতে হচ্ছে বলে সে হিন্দু হিসেবেই সে মারকে ফেরাতে প্ররোচিত ও বাধ্য হচ্ছে। তাছাড়া তার বাঁচবার, এদেশে নাগরিক হিসেবে বাঁচবার কোনই উপায়

নেই। মুসলমানদের মধ্য থেকে যারা বাঙালিত্বকে প্রধান জেনে দেশ স্বাধীন করেছে, সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সংবিধান করেছে, শিক্ষা সংস্কৃতিতে প্রকৃত জাতীয়তার চর্চা ব্যাপক ও গভীর করেছে, সেই মুসলমান আজ অসাম্প্রদায়িক হিন্দুকে রক্ষা করতে পারছে না, কোন কাজেই তার লাগছে না। খুন হচ্ছে, ভিটেমাটি ছাড়া হচ্ছে, জেলে হচ্ছে তাদের বাস সেই মুসলমান নিজেরাই তলিয়ে যাচ্ছে সেই অনুদার ধর্মধ্বজাধারীদের (ইসলাম ধর্ম উদার, তার নিশানবরদারেরা এখানে ফ্যাসিস্টদের গুরু ঠাকুর) নিরন্তর নির্যাতনে। তখন কী করা যাবে, সেই ভাবনা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় মৃদুলকান্তির মত মানুষদের পক্ষে।

চট্টগ্রামে পেশা, ব্যবসায়, শিক্ষা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে 'অবাঞ্ছিত' উপস্থিতি আছে হিন্দু এবং বৌদ্ধদের। জোট সরকারের আমলের আরম্ভ থেকেই একটা প্যাটার্ন অনিবার্যভাবে ধরা পড়ছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শীর্ষ ব্যক্তিদের নৃশংস হত্যা দিয়ে বিদায় করবার। অধ্যক্ষ গোপাল মুহুরি হত্যা, বৌদ্ধ ভিক্ষু হত্যা, হিন্দু পুরোহিত হত্যা তার কিছু নমুনা মাত্র। কী যে আতঙ্কে আছে বিশেষ করে চট্টগ্রামের হিন্দুবৌদ্ধ। অর্থাৎ বিধর্মী। এবং পাহাড়েরও বিধর্মীরা!

কিছু মানুষ নিজের থেকে ভাবলেন চট্টগ্রাম যাওয়া দরকার, এই আতঙ্কের ছায়াটি অপসারণের জন্য। এবং তাঁরা ভাবলেন আমরা শুধু গেলে আমাদের কথা শুনবে কে? সবাই ভাবলেন এই কাজটিতে কামাল হোসেনের (সরি, ইবরাহিম খার যেমন ছিল প্রিন্সিপাল, তেমনি এই কামালের আছে ডক্টর) সংযুক্তি খুব কার্যকর হবে। তাঁরা গেলেন তাঁর কাছে। তাঁরা বলতে কামালের রাজনৈতিক সহযোগী মানিক পঙ্কজ কাসেমরাও ছিল। কামাল সদয় সম্মতি দিলেন। যথাকালে চট্টগ্রামে একটা উপযুক্ত-মত প্রতিনিধিত্বশীল সভা বসল মৃদুলকান্তিরই বাড়িতে। কোন বিএনপি নেতা প্রথম দিকেই বললেন যে চট্টগ্রামে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ আদৌ নেই এবং তারা পরম সম্প্রীতিতে বাস করছে। সজলকান্তির মৃত্যু সাধারণ অপরাধমূলক ঘটনা। সাম্প্রদায়িকতার স্পর্শগন্ধ বিরহিত। এই রকম একটা আজগুবি দাবি যা কেবল আলতাফ হোসেন খলিফার পক্ষেই সম্ভব, সম্ভব খালেদা জিয়ার পক্ষেও, সেখানে মৃদুলকান্তির বাড়িতে খুবই অশোভন হয়েছিল, অনুচিত তো বটেই। সাম্প্রদায়িকতা ও পাকিস্তানি হারামজাদকিপনার প্রশ্নে বাংলাদেশের সবচাইতে নিরাপোষ মানুষটি সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তারেক আলী তাঁর নাম। তিনি প্রতিবাদ করলেন যথাযোগ্যভাবে। বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতিকে বর্তমানে চাপা দিয়ে আছে সংখ্যাগুরুর সর্ববিধ অত্যাচার, মাত্রাছাড়া 'টিরানি'। চট্টগ্রাম তার ব্যতিক্রম নয়, তার অপকৃষ্ট উদাহরণ মাত্র। এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করলেন স্বয়ং ড. কামাল হোসেন। এ আপনি কি বলছেন, বললেন তিনি, যারা মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে, তারা কি সবাই মরে গেছে? সাম্প্রদায়িকতাও যেমন আছে বাংলাদেশে, অসাম্প্রদায়িক মানুষই সংখ্যায় বেশী বলে দেশটা মরে যাচ্ছে না। সংখ্যাগুরুর মধ্যে অসাম্প্রদায়িক মানুষ বিশেষ করে সংখ্যায় বেশি।

উত্তরে তারেক বলেন, সংখ্যালঘু হবার খেসারত দিতে গিয়ে সদ্যই এক উজ্জ্বল তরুণকে প্রাণ দিতে হয়েছে যে বাড়িতে, তার এই ঘরে মিল মহব্বতের প্রহসন খেলা হচ্ছে হৃদয়হীনভাবে। প্রতিবাদে আমি এই সভা ত্যাগ করলাম। বেরিয়ে গেলেন তারেক আলী। ঘটনাটি আমার শোনা। যারা উপস্থিত ছিলেন তারাও সকলে একই বিবরণ দিতে পারবেন না তার প্রসিডিংসের। সেই পুরনো ক্লাসিক আকিরা কুরোসাওয়ার অমর 'রশোমন' ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়। এই বিবরণ নির্ভরযোগ্যতার সঙ্কটটি নাটকের পাত্রেরা ক্ষমা করবেন যদি নেহাৎ ভুল কিছু লিখে থাকি।

এই ঘটনাটি আমার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যে যে কামাল এবং তারেক দু'জনেই তথাকথিত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোক। কামাল পঁচাত্তর পরবর্তীকালে অত্যন্ত আপোষপন্থী

অরাজনৈতিক একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। কিছু প্রাক্তন কমিউনিস্ট তাঁকে শিখণ্ডী হিসাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। ডক্টর সাহেবও জানেন না তা হতে পারে না। কিন্তু তিনি এক নিধিরাম সর্দার যাঁর অন্তত এই ঢাল-তলোয়ারগুলি আছে। যে-প্রশ্নে আওয়ামী লীগের মত বিরাট দেশজোড়া শক্তি সংখ্যাগুরুর সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে কোন স্পষ্ট অবস্থান নিতে পারে না, সেখানে ডক্টর কামাল কী করতে পারেন, কী বলতে পারেন? তারেক যথেষ্ট পরিমাণে আত্মোন্নতিমূলক রাজনীতিতে প্রবিষ্ট নন বলে ঐ রকম আহাম্মকের মতো স্পষ্টভাষণ করতে পারেন, ওয়াক-আউট করবার মত আচরণ করতে পারেন। কামাল কি সত্য কোথায় জানেন না? তিনি এবং আওয়ামী লীগেরও কিছু মানুষ অন্ধ সেজে প্রলয় বন্ধ করতে চাইছেন। তারা কি দেশের বন্ধু?

আমি বারে বারেই সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু শব্দগুলিকে ধর্মসাম্প্রদায়িক বলে কোয়ালিফাই করেছি। বস্তুত বাংলাদেশে সংখ্যাগুরু হচ্ছে গরিব, সংখ্যালঘু সচ্ছল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং মিজারেবল মিনোরিটি হচ্ছে ঢাকায় যারা গাড়িবাড়ি, সংসদ, মন্ত্রিত্ব, উচ্চাসনাত্ব, হাওয়া ভবনের হাওয়া গায়ে মেখে দুনিয়া দাবড়িয়ে বেড়ায়। এটা অনেক বেশি বাস্তব এবং কার্যকর বিভাজন, স্বার্থ এদের অনেক বেশি; হিন্দু-মুসলমান স্বার্থের চাইতে অনেক বেশি বিপরীতমুখী এবং সংঘাতমুখী।

গণতন্ত্রে কোন ধরনের লঘুগুরু নেই, সংসদের বাইরে। কেবল সংসদ কক্ষাভ্যন্তরেই তর্কের বেলা যে পক্ষে বেশিরভাগ যায় তারা গুরু, কম পক্ষের লোকেরা লঘু। সংসদের বাইরে যেকোন সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনায়, কার্যক্রমে, বিচারে যে সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু খোঁজে, সে দেশটার বারোটা বাজায়। তার মত দেশদ্রোহী দুনিয়া ছেনেও পাওয়া যাবে না।

ভোরের কাগজ, ১৫ মে ২০০৩

ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের বিভাজন এবং সংখ্যালঘু নির্যাতন

ডা. এস এ মালেক

সংখ্যালঘু নির্যাতিত হচ্ছেন না এমন দেশ খুব কম আছে। গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রশ্নে যে দেশ পিছিয়ে সেখানেই সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন চলছে। সবচেয়ে বেশি নির্যাতন চালানো হচ্ছে ওইসব দেশে যেখানে ধর্মভিত্তিক প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি বিদ্যমান। উপমহাদেশের রাজনীতিতে ঔপনিবেশিক শক্তি কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিল যাতে করে এখানে ধর্মভিত্তিক দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় এবং সম্প্রদায় ভিত্তিক স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। মূলত হিন্দুরা ভারতের ও মুসলমানরা পাকিস্তানের নাগরিক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যায়। তবে ওই প্রক্রিয়ায় বিভাজন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। কেন না দেশ বিভাগের পর ভারতে কয়েক কোটি মুসলমান ও পাকিস্তানে কয়েক কোটি হিন্দু অধিবাসী থেকে যেতে বাধ্য হন। সেই '৪৭ থেকে দেশ বিভাগের সময় যেভাবে হিন্দুরা ভারতের দিকে ও মুসলমানরা পাকিস্তানের দিকে ধাবিত হন তা দেখে অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী মনুষ্যত্ব নির্ভর কিছু লোক চরমভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে তখনকার হিন্দু মুসলমানদের দাঙ্গা দেখে তাদের মর্মাহত হতে হয়।

সেই থেকে বিবাদ বিসংবাদ লেগেই আছে, ভারতে কিছু ঘটলে পাকিস্তানে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আর পাকিস্তানে কিছু ঘটলে তার প্রতিক্রিয়া হয় ভারতে। সাধারণ নিরীহ মানুষ মারা যায়। রাজনৈতিক কারণে সংখ্যালঘুদের ওপর স্থানীয়ভাবে নির্যাতন চালানো হয়। সম্প্রতি গুজরাটে যেমনটি ঘটে গেল। বাবরী মসজিদকে কেন্দ্র করে ভারত, বাংলাদেশ এমনকি উপমহাদেশে যা ঘটেছে তা দেখে মনে হয় যে ইংরেজরা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু এমন ব্যবস্থা করে রেখে গেছে যে শান্তিতে যেন কেউ আর বসবাস করতে না পারে। ধর্মীয় বিদ্বেষ ও সহিংসতা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে এমনভাবে বিভক্ত করে ফেলেছে যে বৃহত্তর জাতীয়তাবাদী চেতনার কথা আর কেউ চিন্তাও করতে পারছে না। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের বিভাজন যে বাঞ্ছনীয় নয় তা প্রমাণিত হয়েছে বাংলাদেশ জন্মের মাধ্যমে। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানরা কখনও পাকিস্তানি হতে পারেনি। তাদের গোলাম করে রাখবার ষড়যন্ত্র ছিন্ন করেই স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বাঙালির আবাসভূমি হিসেবে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এবং সে বাঙালি বলতে মূলত সকল সম্প্রদায়ের মানুষকেই বোঝায়। কিন্তু তাও টেকেনি। সামরিক আইন জারি হয়েছে। যিনি দেশকে স্বাধীন করলেন তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, যে, দল দেশ স্বাধীন করল তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ক্ষমতাসীন হয়ে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বর্জন করেছে। রাষ্ট্রের জন্যে ধর্ম নির্ধারণ করে দিয়ে একটা বিশেষ সমম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। অন্যান্য সম্প্রদায়কে অপেক্ষাকৃত দুর্বল অবস্থানে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। মৌলবাদী শক্তিকে মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। মোট কথা যে কারণে পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ স্বাধীন করা হয়েছে তা প্রায় ভেস্তে গেছে।

তাই এখনকার বাংলাদেশে আবার শুরু হয়েছে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন, বিতাড়ন, ধর্ষণ, হত্যা এবং জবরদখল। ২০০১ সালের নির্বাচনের পর রাষ্ট্রীয় শক্তির সমর্থনে ক্ষমতাসীন দল ও তাদের মৌলবাদী সহযোগীরা নৌকায় ভোট দেওয়ার কারণে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ওপর যে অত্যাচার, নির্যাতন করেছে তা ছিল নজিরবিহীন বর্বরতা। হিন্দু মেয়ে আওয়ামী লীগ করে বলে তাকে উলঙ্গ করে ছবি তুলে তা প্রদর্শন করা হয়েছে। এটা জঘন্য বর্বর মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। ভোলায় একটা বিশেষ জায়গায় আটকে রেখে কয়েকশত

মহিলাকে গ্যাং রেপ করা হয়েছে কয়েকদিন ধরে। জোর করে ধর্ষণ তারপর হত্যা, জোর পূর্বক ধর্মান্তরিত করে বিবাহ, বাড়ি লুট, নির্দয়ভাবে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে প্রহার, শিশুদের হত্যা, বস্তি লুট, ক্ষেত্রে ফসল লুট, পুকুরের মাছ লুট, গরু বাছুর লুট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লুট করে সর্বস্বান্ত করা হয়েছে। কয়েক জায়গায় সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে করে তারা এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। সেই '৪৭ থেকে শুরু হয়েছে, এখনও চলছে। লাখ লাখ মানুষ চলে গেছে কয়েক যুগ ধরে। উপায় না পেয়ে দেশ ছেড়েছে, ঘর ছেড়েছে, আত্মীয়-স্বজন ফেলে চলে গেছে শুধু জীবনটা নিয়ে। শিক্ষক গেছেন, ডাক্তার গেছেন, উকিল গেছেন, শিল্পী, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, সকলেই পাড়ি দিয়েছেন। '৭১-এ ভেবেছিলেন কেউ কেউ ফিরে ফিরে আসবেন, এসেছিলেনও। থাকতে পারেননি পৈত্রিক ভিটায়, চলে যেতে হয়েছে।

অনেকে হয়তো বলবেন শুধু এখানে হয়েছে, ওখানে হয়নি। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সংবিধানে থাকলেও ভারত কি পেরেছে তার সাড়ে পাঁচ দশকের গণতান্ত্রিক দেশে ওই আদর্শ বাস্তবায়ন করতে। পারেনি এবং না পারবার কারণেই সেখানে সাম্প্রদায়িক সংঘাত বারে বারে ঘটেই চলেছে।

তবে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যা সম্ভব হতে পারতো তা হয়নি। উপমহাদেশে একটি মাত্র এলাকায় একটা আদর্শ গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। সে সম্ভাবনা এখন লুপ্ত, ক্ষীণ। যারা দেশ স্বাধীন করলেন এবং যে কারণে দেশ স্বাধীন করেছেন তারা বত্রিশ বছরের স্বাধীন বাংলাদেশে মাত্র সাড়ে আট বছর ক্ষমতায়, তাও প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবেলা করতেই তাদের সময় কেটেছে একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা তখন বেশ কিছুটা নিশ্চিত ছিল।

১৯৭৫ সালের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর যারা ক্ষমতাসীন হলেন তারা বাংলাদেশকে এক ধর্মরাষ্ট্র বানাবার উদ্যোগ নিলেন। সংবিধানে ধর্মীয় ইস্যু প্রতিষ্ঠা হলো। পরবর্তীকালে রাষ্ট্র ধর্ম সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করে সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিকভাবে দুর্বল করা হলো। সব চাইতে জঘন্য যে কাজটি করা হলো, তা হচ্ছে একটা সাম্প্রদায়িক শক্তিকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করার সুযোগ করে দিয়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পাকিস্তানি ভাবধারার সৃষ্টি করা হলো। সাম্প্রদায়িক সংঘাত অনিবার্য হলো। ইসলাম ধর্মকে শক্তিশালী করা ওই পদক্ষেপের লক্ষ্য ছিল না। কারণ ধর্মীয় চেতনাকে পুঁজি করে রাজনৈতিকভাবে ব্যবসা করাই ছিল ওই ধরনের সাংবিধানিক পরিবর্তনের লক্ষ্য।

সংখ্যালঘুদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ধর্মীয় কারণে জনগণের ভেতর বিভেদ সৃষ্টি তার দল ও সরকারের লক্ষ্য নয়- এ উক্তি করেছেন অথচ সংবিধানকে ধর্মীয়করণের মাধ্যমে জেনারেল জিয়াই প্রথম বাংলাদেশের জনগণকে সাম্প্রদায়িকভাবে বিভক্ত করে গেছেন। জেনারেল এরশাদ সাংবিধানিকভাবেই জেনারেল জিয়ার লক্ষ্য পূরণ করেছেন মাত্র। এই দু'জন সামরিক শাসকের আমলেই বাংলাদেশে সেক্যুলার ডেমোক্রেটিক ফোর্স সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। সাংবিধানিকভাবে তাদের দুর্বল অবস্থানে ঠেলে দেওয়া এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করায় সংখ্যালঘুদের চরম অবস্থার শিকার হতে হয়েছে।

ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তান হতে পূর্ব পাকিস্তান ও তার জনগণকে সেক্যুলার ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্র বাংলাদেশে রূপান্তর ঘটাতে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের অবদান কম নয়। তাদেরই সমর্থনে সেক্যুলার ডেমোক্রেটিক ফোর্স ক্রমাগত শক্তিশালী হয়েছে। প্রধামন্ত্রী যে উক্তি করেছেন তার সঙ্গে তার প্রয়াত স্বামী কর্তৃক প্রবর্তিত নীতি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ধর্মীয় কারণে যদি বাংলাদেশের

মানুষ বিভক্ত হয়ে থাকে সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, জেনারেল জিয়াই তার জন্যে দায়ী।

একাত্তরের পরাজিত শক্তি ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়ে '৭১ এর পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে সংবিধানে ধর্মভিত্তিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠরা এমনিতেই একটা সুবিধাজনক অবস্থানে আছে, তাদের আরও সুবিধাজনক অবস্থানে স্থান করেছে। এটা সামাজিক স্থিতিশীলতার অনুকূল কোনো ব্যাপার নয়। প্রায় ১৪ কোটি মানুষের দেশের শতকরা ৯০ জনই মুসলমান। স্বাভাবিকভাবেই তাই মুসলিম কৃষ্টির প্রভাব অন্যান্য ধর্মীয় কৃষ্টির চাইতে বাংলাদেশের সমাজে সবচেয়ে বেশি। রাষ্ট্র সকল সম্প্রদায়ের তাই একটা বিশেষ সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের জন্যে ধর্ম নির্ধারণ করে দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগের ব্যবস্থা করে দেওয়া কখনও সমীচীন বলে বিবেচিত হতে পারে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার ইসলাম অবশ্যই সামাজিকভাবে প্রাধান্য পাবে এবং তা সেই '৭১ সাল থেকেই পেয়ে আসছে। নতুন করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্যে এটা করবার প্রয়োজন ছিল না। যে কারণে এটা করা হলো তার পেছনে ধর্মীয় চেতনা কাজ করেছে বলে মনে হয় না। ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের প্রয়োজনেই এটা করা হয়েছে। এটা হচ্ছে এমন এক রাজনীতির ধারাবাহিকতা যা পাকিস্তান আমল থেকে প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী গোষ্ঠী অনুসরণ করে আসছে।

যারা এক সময় ঘোষণা দিয়েছিলেন যে পাকিস্তান না থাকলে ইসলাম থাকবে না। তারা তো দেখলেন যে ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তান আমল থেকে চলে আসা জুয়া, ঘোড়দৌড় ও অন্যান্য নফরমানি কাজকর্ম সেক্যুলার শাসনব্যবস্থায় বিশ্বাসী শেখ মুজিব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই নিষেধ করে প্রকৃত অর্থে ইসলামিক সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষা করেন। অথচ ইসলামিক রিপাবলিকান রাষ্ট্রের কর্তারা এটা করবার সাহসই করেননি।

সংখ্যালঘুদের যদি ভারতবর্ষের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ থেকে থাকে তা বিকল্প নিরাপত্তাবোধের কারণেই। এপারে যদি বসবাস না করার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহলে তাদের একটা বিকল্প জায়গা আছে বলেই তারা নিরাপদ বোধ করে। বাংলাদেশে যদি সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ করে যথাযোগ্য নিরাপত্তা দেওয়া যেত তাহলে তারা কখনও সীমানা অতিক্রম করতেন না।

ধর্ম ও সম্প্রদায়গত বিচ্ছিন্নতার কারণে মানবতা ভূলুণ্ঠিত হতে পারে না। বার বার এটা এই উপমহাদেশের হয়েছে, এখনও হচ্ছে। তাহলে ভারতের পাঁচ দশকের গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক নেতৃত্বে সে দেশের জন্যে কী পরিবর্তন সাধন করছে। এখনও সে দেশে কিছু হিন্দু ভারতে বিশ্বাসী উচ্চ পর্যায়ের নেতা আছেন যারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় উল-সিত হন বলেই মনে হয়। তার প্রতিবাদ যে হয় না তাও নয়। ভারতের বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিসেবী, গুণীজনেরা মর্মাহত হন, প্রতিবাদ জানান, প্রতিরোধ করেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এটা শুভ লক্ষণ। বড় ধরনের কোনও ঘটনা না ঘটলেও পাকিস্তান আমলে ও আজকের বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা ওই ধরনের ঘটনার বিপরীতে একেবারে শান্তিমার্গে বসবাস করছেন এরূপ দাবি কেউ করতে পারেন না। এদেশেরও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী শক্তির চাপের মুখে উগ্র প্রতিক্রিয়াশীলরা যা করতে চায় তা করতে না পারলেও হিন্দু মহিলার উলঙ্গ ছবি তুলে তা প্রদর্শন করে তাদের বিকৃত মন মানসিকতাকে প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করে না।

যদি কেউ মনে করে থাকে যে বাংলাদেশ থেকে দেড় কোটি হিন্দু ও কয়েক লাখ খ্রিস্টান বা বৌদ্ধ সীমানার বাইরে বিতাড়িত করতে পারলে তারা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে তাহলে তারাও যে অসুস্থ বা অবাস্তব চিন্তায় মগ্ন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তারা কখনও

মানবতাবাদী সুস্থ শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলতে ইচ্ছুক নয়।

দুর্বল সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন চলানোর মধ্যে কোনও বাহাদুরি নেই। বরং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মধ্যে গর্ব ও আনন্দ দুই-ই আছে।

আজকের কাগজ, ২২ মে ২০০৩

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিজাত প্রশ্নপত্র

প্রেমরঞ্জন দেব

গত ২৯ মে ২০০৩ অনুষ্ঠিত ঢাকা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় ইংরেজি প্রথম পত্রের প্রশ্নে ঈদ-উল-ফিতর সম্পর্কে আবশ্যিক প্যারাগ্রাফ লিখতে দেয়ায় সারা দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভে সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্ন আবশ্যিক হওয়ায় এবং এটির জন্য ১৪ নম্বর বরাদ্দ থাকায় হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের পরীক্ষার্থীরা ঠিকমতো জবাব লিখতে পারেনি। পাঠকদের সুবিধার্থে এ বছরের ইংরেজি প্রথম পত্রের ১৪ নম্বরের আবশ্যিক প্রশ্নটি পুরো তুলে ধরছি Write a pragraph of about 100 words based on the following questions. Your answer to the questions should give as much details as possible (marks-14) এর পর ৬টি প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। প্রথম প্রশ্ন : How did you celebrate Eid-ul-Fitr this year? দ্বিতীয় প্রশ্ন : What did you find your mother and sister doing in the morning of the Eid day? তৃতীয় প্রশ্ন : What did you do in the morning? চতুর্থ প্রশ্ন : What did you find when you went to Eidgah? ৫ম প্রশ্ন : What kind of feast was arranged at your residence for this occasion? ষষ্ঠ প্রশ্ন : How did you spend the afternoon?

ইংরেজি প্রথম পত্রের এই পরীক্ষার পর থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকসহ অনেকেই এ ব্যাপারে বিভিন্নভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করে চলেছেন। তারা বলেছেন, ঈদ-উল-ফিতর সম্পর্কে সাধারণ ধারণা থাকলেও ইংরেজিতে ১৪ নম্বরের প্যারাগ্রাফ লেখার মতো স্বচ্ছ ধারণা ভিন্নধর্মাবলম্বীর থাকার কথা নয়। অনেক অভিভাবক বলেছেন, তাদের সন্তানরা এ প্যারাগ্রাফটি লিখতেই পারেনি। কারণ তারা ঈদ-উল-ফিতর সম্পর্কে জানলেও কীভাবে এই উৎসব উদযাপন করতে হয়, ঈদের দিন সকালে মা ও বোন কি করে, এসব দেখেনি। তাছাড়া ঈদগাহে গিয়ে কি দেখে, কি করতে হয় এটাও তার জানার কথা নয়। আবার অনেক ছাত্র-ছাত্রী আমাদের কাছে বলেছে ঈদের দিন সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত একজন মুসলিম ছাত্রছাত্রী কি কি করে তা একজন হিন্দু বা বৌদ্ধ বা খ্রিস্টান ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। দুর্গাপূজা, বুদ্ধপূর্ণিমা বা শুভ বড়দিন সম্পর্কে মুসলমান ছাত্রছাত্রীরা ধারণা রাখলেও নিশ্চয়ই এসব উৎসবের আচার অনুষ্ঠান বা বিস্তারিত রীতি প্রথম তাদের জানার কথা নয়।

ঢাকা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা একটি পাবলিক পরীক্ষা। এটা কোনো মাদ্রাসা কিংবা অন্য ধর্মীয় পরীক্ষা নয়। এক বিশেষ ধর্মীয় উৎসবের দিবসটির সঙ্গে যারা সরাসরি সম্পৃক্ত নয়, তাদের বাধ্যতামূলক ও জবাবদিহিমূলক প্রশ্ন করে বোর্ড কর্তৃপক্ষ এক চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের মনে হয়, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ধর্মীয় সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষতির পাশাপাশি আমাদের জাতীয় ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

শিক্ষাকে সাম্প্রদায়িকীকরণে ঘৃণ্যনীতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে পাবলিক পরীক্ষায় এ

ধরনের প্রশ্নপত্র করা হয়েছে। অবশ্য ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর শাহ মুহাম্মদ ফরহাদ বলেন, সব বড়ো ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পর্কে সব ধর্মের ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণা থাকে বা আছে। এটা কেবল সমালোচনার জন্য সমালোচনা বলে তিনি উলে-খ করে বলেন, এতে কোনো পরীক্ষার্থীর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা নয় (দৈনিক জনকণ্ঠ-৩০.৫)। এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো দুর্গাপূজা, ঈদ, বড়দিন ও বুদ্ধপূর্ণিমা বাংলাদেশের জাতীয় উৎসব। এসব উৎসব সম্পর্কে সব নাগরিকেরই ধারণা থাকা প্রয়োজন।

১৪ নম্বরের উপযোগী বাধ্যতামূলক কোনো প্রশ্ন উত্তর লিখতে হলে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরীক্ষার্থীরাও উৎসবের দিকটি হয়তো লিখতে পারবে। কিন্তু ধর্মীয় দিকটি মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের মতো করে লেখা সম্ভব নয়। আর এতে করে স্বাভাবিকভাবেই নম্বরের বড়ো রকমের তারতম্য হবে। এছাড়া ঐ প্রশ্নে এ বছর কীভাবে পরীক্ষার্থী ঈদ পালন করে, তার মা ও বোনেরা ঈদের দিন সকালে কি করেন, ঈদগাহে গিয়ে পরীক্ষার্থী কি দেখতে পায় ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, যা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আদিবাসী সম্পদায়ের পক্ষে জবাব দেয়া সম্ভব নয়।

'ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের এ কোন ধরনের মানসিকতা'? এই শিরোনামে গত ১৬ জুন ২০০৩ দৈনিক জনকণ্ঠে লিখিত এক নিবন্ধে দৌলত আরা মান্নান বলেছেন 'আগামী কোনো এক বছরে শুভ বড়দিন, বিজয়া দশমী কিংবা বুদ্ধপূর্ণিমার দিনটি পরীক্ষার্থীরা কীভাবে উদযাপন করেছে তার একটি বিবরণ সংবলিত আবশ্যিক প্রশ্ন ধর্ম নির্বিশেষে সকল পরীক্ষার্থীর জন্য প্রশ্নপত্রে রাখা হবে কি? এতোটুকু ধর্মীয় উদারতা তাদের কাছে প্রত্যাশা করা যায় কি? এ দেশটি পরম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বলে অহরহ উচ্চারিত হয়ে আসছে সরকারি উচ্চ পর্যায় থেকে। আর বড়দিন, বিজয়াদশমী ও বুদ্ধপূর্ণিমা এগুলো তো বড়ো বড়ো জাতীয় উৎসব, তাই নয় কি? তাই এগুলো সম্পর্কেই বা সব ধর্মের ছেলেমেয়েরা লিখতে পারবে না কেন? সাম্প্রদায়িকতার দিক ছাড়াও দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের নিরিখেও এ ধরনের ব্যক্তিসম্পৃক্ততা সংবলিত আবশ্যিক একটি প্রশ্ন একটি পাবলিক পরীক্ষা প্রদানের যৌক্তিকতা নিঃসন্দেহে প্রশ্নসাপেক্ষ'। ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সাহেব দৌলত আরা মান্নানের প্রস্তাব বাস্তবায়নে যথাসময়ে এগিয়ে আসবেন বলে আমার ধারণা।

ঢাকা বোর্ডের এই ধরনের পদক্ষেপ দেশে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় বিভেদের এক নজির। শিক্ষা ক্ষেত্রে এই মানসিকতা সর্বজনীনতা ও স্বচ্ছ পরিবেশের জন্য ভয়ানক ক্ষতিকর। এটা সর্বজনীন মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার, গণতান্ত্রিক চেতনা, সহনশীলতা ও সমমর্যাদার পরিপন্থী। বর্তমানে দেশের সকল প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, শিক্ষক সমাজের লিখিত দাবি হলো শিক্ষা ব্যবস্থার বিদ্যমান বৈষম্য ও নৈরাজ্য দূর করে ছাত্র-ছাত্রীদের সৎ, দেশপ্রেমিক, উন্নত এবং দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে উন্নত জ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর, দেশমুখী এবং অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। অথচ ঢাকা, বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরেজি প্রথম পত্রের ১৪ নম্বরের একটি আবশ্যিক প্রশ্নের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক রূপ দেয়া হয়েছে। জাতীয় মর্যাদা ও ভাবমূর্তি রক্ষার স্বার্থে আমরা এ ব্যাপারে সরকারের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করি।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সাম্প্রদায়িক ও জবরদস্তিমূলক আচরণে আমরা হতবাক। কিন্তু এদেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে দাবিদার সংগঠনসমূহ ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো, যারা অসাম্প্রদায়িক চেতনা লালন করে তারা কোথায়? তাদের নীরবতা আমাদের বিস্মিত করেছে। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিজাত প্রশ্ন রচনাকারী কর্তৃপক্ষের প্রতি তাদের কোনো

ক্ষোভ কিংবা প্রতিবাদ উচ্চারিত হলো না। তারা এটাকে কি অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন? নাকি সাম্প্রদায়িক শক্তিকে খুশি রেখে ভোটের পাল-া ভারী করতে চান! তাদের কার্যকলাপ দেখে মনে হচ্ছে জাতির বিবেক ও সৃষ্টিকর্তার নিকট আবেদন জানানো ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি মা ও মাতৃভূমি স্বর্গ থেকেও শ্রেষ্ঠ। বাংলাদেশ আমার মাতৃভূমি। তাই মাতৃভূমির মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে আমরা 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার' এই অসম্প্রদায়িক চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করবোই।

ভোরের কাগজ, ২৫ জুন ২০০৩

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশে উত্তরবঙ্গের আদিবাসীরা কেমন আছে?

এসএস চাকমা

আর্যদের এমনকি দ্রাবিড়দের আগমণের পূর্বেও ভারতবর্ষে মনুষ্য বসতি ছিল। সেই যুগের প্রথম ভাগকে বলা হতো পুরনো প্রস্তর যুগ এবং দ্বিতীয় ভাগকে বলা হতো নতুন প্রস্তর যুগ। কারণ তখন লৌহ, তামা আবিষ্কার না হওয়ার ফলে পাথরই ছিল মানুষের প্রধান অস্ত্র যা দিয়ে সে নিজেকে রক্ষা করতো এবং শিকার করে আহার সংগ্রহ করতো। তখন আগুনও আবিষ্কার হয়নি, তাই তারা কাঁচা মাংস ভক্ষণ করতো। সেই প্রস্তর যুগের বংশধররা হলো বর্তমান কোল, ভীল, মুণ্ডা, সাঁওতাল ইত্যাদি; যারা এখনো ভারতবর্ষে এবং বাংলাদেশে আদিবাসী নামেই বেশি পরিচিত।

কারণ, তারাই হলো ভারত উপমহাদেশের আদি বাসিন্দা, তবে নৃতাত্ত্বিক দিক দিয়ে তারা অস্ট্রো এশিয়াটিক অথবা অস্ট্রোলয়েড গ্রুপের একটি অংশ। মন, খেমার, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের, ভারতবর্ষের, মলাক্কা দ্বীপে, অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা একই গ্রুপের। তাদের অপর একটি অংশ বর্তমান ইন্দোনেশিয়া, মেলানেশিয়া, পোলিনেশিয়ার আদি বাসিন্দা। তাদের সকলকে বলা হয় অস্ট্রিক ভাষী। স্যার রিজলির মতে, সাঁওতালরাও সুদূর অতীতে বর্তমান অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রাচীন ভারতবর্ষে এসেছিল।

আদিবাসীরা বাংলাদেশের ভূমিপুত্র হলেও তাদের অনেককেই ব্রিটিশ আমলে এদেশে রেললাইন নির্মাণের কাজে আনা হয়েছিল বর্তমান ভারতবর্ষের বিহার অঞ্চল থেকে। কারণ তারা খুবই কর্মঠ।

১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে বাংলাদেশে সাঁওতালদের সংখ্যা ২ লাখ ২ হাজার ৭৪৪, মুণ্ডাদের সংখ্যা ২ হাজার ১১২, মাহাতোদের সংখ্যা ৩ হাজার ৫৩৪, ওরাওদের সংখ্যা ১১ হাজার ২৯৬, বুনাদের সংখ্যা ১৩ হাজার ৯১৪। লেখক এবং গবেষক আবদুস সাত্তার রচিত In the sylvan shadows থেকে জানা যায় যে, ১৮৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে তখন সাঁওতালদের সংখ্যা ছিল ৭ হাজার ৪২৭ এবং ওরাওদের সংখ্যা ৩ হাজার ৬৩৯। বর্তমানে সাঁওতালরা প্রধানত দিনাজপুর এবং ওরাওরা রাজশাহী অঞ্চলে বাস করে। তবে ভারত বিভাগের সময় প্রচুর সাঁওতাল রাজশাহী অঞ্চলেও বসবাস করতো। পাকিস্তান হওয়ার পর ইলা মিত্রের নেতৃত্বে তেভাগা আন্দোলনের কারণে অত্যাচারিত হয়ে তারা ভারতে চলে যায়। মাহমুদ শাহ কোরেশী সম্পাদিত Tribal Culture in Bangladesh (পৃষ্ঠা-৯) থেকে জানা যায় যে,

রাজশাহী অঞ্চলে ৩০ হাজার ৮২৪, বগুড়া অঞ্চলে ১৬ হাজার ৫২৯, দিনাজপুর অঞ্চলে ১১ হাজার ৯৯৯ এবং রংপুর অঞ্চলে ৬ হাজার ৩০১ জন আদিবাসী ১৯৮১ সালে বাস করতো। তিনি সেই সংখ্যাকে সরকারি হিসাব বলে উলে-খ করেছেন, আদমশুমারির হিসাবে নয়।

বর্তমানে বাংলাদেশে সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ জেলার উপজাতিসমূহসহ মোট ৫৪টি আদিবাসী সত্তা বাস করে। এবং ১৯৯১ সারের আদমশুমারি অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ২৪ লাখ ১১ হাজার ৯৫৭। অবশ্য আদমশুমারিতে মাত্র ২৯টি আদিবাসী উপজাতি সত্তার নাম রয়েছে। তবে বাংলাদেশ সরকার দেশে কোনো আদিবাসী আছে বলে স্বীকার করতে চায় না এবং সেজন্য সরকারিভাবে আদিবাসী দিবসও পালন করা হয় না। আদিবাসীরা সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এখানে আমার লেখার প্রধান বিষয় উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের নিয়ে।

উলে-খ্য, যে কোনো দেশে সংখ্যালঘু হলেই কিন্তু দুর্বল অথবা অসহায় হয় না। মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমলে ইহুদি সম্প্রদায়ভুক্ত ডিসরেইলি যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। বর্তমান ভারতে পার্সিরা সংখ্যায় ৭৫ হাজারের মতো। কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষায়, ব্যবসা-বণিজ্যে, শিল্পকলায়, সম্প্রদায় হিসেবে তারা সবচেয়ে উন্নত। ব্রিটিশ-ভারতে তারা রাজনীতিতেও এক সময় খুবই প্রতিপত্তিশালী ছিলো। এখনো আইন ব্যবসায় তারা সদর্পে বিচরণ করছেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের সেনাবাহিনী প্রধান ছিলেন পার্সি সম্প্রদায়ভুক্ত জেনারেল মানেকশ। যুদ্ধের পর তাকে ফিল্ড মার্শাল খেতাবে সম্মানিত করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর স্বামী ফিরোজ গান্ধীও পার্সি সম্প্রদায়ভুক্ত। ভারতের ইহুদিরা যদিও সংখ্যায় খুবই অল্প, তারাও সমৃদ্ধশালী। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের পূর্বাঞ্চল কমান্ডের চিফ অফ স্টাফ মেজর জেনারেল জেকবও ইহুদি সম্প্রদায়ভুক্ত। এখন তিনি ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গভর্নর। কিন্তু সম্প্রদায় হিসেবে তারা খুবই সমৃদ্ধশালী এবং রাজনীতিতেও ক্ষমতাবান। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস এবং সিনেট সভায় তাদের কয়েকজন প্রতিনিধি রয়েছেন।

ভারতে আদিবাসী, উপজাতিরাও কিন্তু খুব দুর্বল নয়। ভারত সরকার উত্তর-পূর্ব ভারতে উপজাতিদের জন্য কয়েকটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সম্প্রতি আদিবাসী সাঁওতাল এবং অন্যদের জন্য ঝাড়খণ্ড নামে একটি আলাদা রাজ্য করা হয়েছে।

আমি আসল বিষয় থেকে দূরে সরে এসেছি। আমাদের দেশের উপজাতি এবং আদিবাসী-রা কেবল সংখ্যায় অল্প নয় শিক্ষা-দীক্ষায়, ব্যবসা-বাণিজ্যেও অত্যন্ত পিছিয়ে রয়েছে। সংখ্যায় তো তারা না বেড়ে কমেই যাচ্ছে। সরকারের কেবল অবহেলা নয়, সরকারের বিরূপ মনোভাবের কারণেও তারা এদেশ থেকে □মান্বয়ে বিলীন হতে চলেছে। তারা কেবল হতদরিদ্র নয়, তারা সংখ্যগুরুদের নিত্যদিনই নির্যাতনের শিকার। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা ছিল জেলার মোট সংখ্যার ৮৭.৫%, এখন সেখানে তারা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের ওপর প্রথম দুর্যোগ নেমে আসে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পরপরই। এবং সেটা ঘটে কম্যুনিস্ট নেত্রী ইলা মিত্রের কারণে। ইলা মিত্র ভারত বিভাগের পূর্ব থেকে উত্তরবঙ্গে তেভাগা আন্দোলনের নামে কম্যুনিস্ট আন্দোলন গড়তে চেষ্টা করছিলেন এবং সেটা করছিলেন অশিক্ষিত, অসহায় এবং সংখ্যালঘুদের মধ্যে সংখ্যালঘু সাঁওতালদের নিয়ে। পাকিস্তান হওয়ার পর সেই আন্দোলন রাজশাহীর নাচোল এলাকায় জোরদার করতে গিয়ে সাঁওতালরা পাকিস্তান সরকারের রোষানলে পড়ে। সরকার সেই আন্দোলনকে আল-াহর অবিশ্বাসী কম্যুনিস্টরা নবগঠিত মুসলমান রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে মনে করে

আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়। বিশেষ করে কয়েকজন পুলিশ আন্দোলনকারীদের হাতে নিহত হলে সরকার সাঁওতালদের ওপর এমন অত্যাচার শুরু করে দেয় যে, তারা হাজারে হাজারে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়। ইলা মিত্রের কিছু ভুল সিদ্ধান্তের কারণে হাজার হাজার সাঁওতাল দেশ ত্যাগ করলে যারা পাকিস্তানে রইলো তারা দুর্বল হয়ে গেলো। সেই সুযোগটি নেয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের কিছু মতলববাজ দুষ্কৃতিকারী যারা প্রশাসনের ছত্রছায়ায় নানা কৌশলে সাঁওতাল, ওরাও, মুণ্ডা এবং অন্য আদিবাসীদের জায়গাজমি দখল নিতে শুরু করে। এবং সেই সঙ্গে তাদের মেয়েদের ধর্ষণ, অপহরণ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সেটা মহামারী আকার ধারণ করে।

উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের ওপর পাকিস্তান আমল থেকে অত্যাচারের কাহিনী লেখলে সেটা একটা মহাভারত হয়ে যাবে। সে চেষ্টা না করে আমি কেবল ইদানীংকালের কয়েকটি পত্রিকায় যে খবর বেরিয়েছে সেগুলোই এখানে সন্নিবেশ করার চেষ্টা করছি।

২০০২ সালের ২ আগস্ট 'দিনাজপুরে বসবাসকারী আদিবাসীরা দিন দিন ভূমিহীনে পরিণত হচ্ছে' শিরোনামে দৈনিক সংবাদে একটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরে বলা হয় যে, দিনাজপুর অঞ্চলের আদিবাসীরা এক সময় জোতদার ছিল। জীবন কাটছিল তাদের খুবই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে। পূজা-পার্বণসহ নানা ধরনের উৎসব আনন্দে কাটতো আদিবাসীদের জীবন। কিন্তু দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে নিরীহ সরল আদিবাসীদের সঙ্গে প্রতারণা করে তাদের জমিজমা একের পর এক আত্মসাৎ করতে মেতে ওঠে সমাজের একশ্রেণীর প্রতারক। এরা প্রশাসনের অসাধু লোকজনের যোগসাজশে আদিবাসীদের বিভিন্নভাবে হয়রানি ও প্রতারণা করে আসছে।

খবরে আরো বলা হয় যে, সম্প্রতি একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান দিনাজপুর জেলার ৪টি উপজেলায় জরিপ চালিয়ে এক হতাশাব্যাঞ্জক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে। ৪টি উপজেলায় ৪ হাজার ৬৫৩টি আদিবাসী পরিবারে লোকসংখ্যা ২০ হাজার ৭০০। ৭৫.৬৯ একর জমির ওপর তাদের নিজস্ব মালিকানায় বসতবাড়ি ছিল। এর মধ্যে তাদের নিজস্ব মালিকানায় জমির পরিমাণ ৩৩.৬৪ একর এবং সরকারি খাসজমির পরিমাণ ২৯.১০ একর। পরিবার প্রতি গড় বসতবাড়ির জমির পরিমাণ দেড় শতকেরও কম। এর মধ্যে দাদন ব্যবসায়ীদের কাছে বন্ধক রয়েছে ২.৩ একর। আদিবাসীরা প্রভাবশালী চ৾ের কাছে চড়া সুদে সামান্য অর্থের বিনিময়ে জমি বন্ধক রাখে। তাতে শর্ত এতোই কঠিন থাকে যে, আদিবাসীরা কখনই বন্ধকী জমি ফেরত নিতে পারে না। বন্ধকী জমির ঋণের পরিমাণ এতো কম যে, যা অবিশ্বাস্য। 'শোষণ পীড়নে জর্জরিত আদিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করতে হবে' শিরোনামে ২০০২ সালের ১৬ নবেম্বর দৈনিক সংবাদে আরো একটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরে বলা হয় যে, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সহযোগিতায় জাতীয় আদিবাসী পরিষদ জয়পুরহাট ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ মিলনায়তনে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ কর্মশালায় আদিবাসী ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধে বলা হয় যে, আদিবাসীদের জায়গা-জমি, সম্পদ একশ্রেণীর ক্ষমতালোভী শক্তিমান দল জোরপূর্বক দখল এবং রাষ্ট্রযন্ত্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দখলদারদের শুধু সহায়তাই নয়, নিজেই নিপীড়কের ভূমিকা পালন করছে। সাংবিধানিক আইনগত স্বীকৃতি প্রদানের মধ্য দিয়েই দারিদ্র্যবিমোচন ও উন্নয়ন সম্ভব বলে তিনি মন্তব্য করেন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থান যেমন ঠাকুরগাঁও, বীরগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর প্রভৃতি এলাকা থেকে আদিবাসী নেতা ও নেত্রীরা কর্মশালায় শামিল হন এবং সবাই বলেন যে, আদিবাসীরা এদেশের সন্তান, কৃষি উৎপাদন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা অবিরাম শ্রমে-ঘামে কাজ করে চলেছে। মুক্তিযোদ্ধারা জীবন দিয়েছে। তবুও তারা এখন নানা উৎপীড়নের শিকার। তাদের জীবন এখন নানা হুমকির সম্মুখীন, তাদের সম্পত্তি লুট হয়ে

যাচ্ছে। বক্তারা আদিবাসীদের জন্য নাগরিক অধিকার ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি দাবি করেন এবং ঐক্যবদ্ধভাবে ১০ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আদিবাসীদের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

২০০২ সালের ১৪ আগস্ট 'জোর করে সাদা স্ট্যাম্পে সই আদায়, পাঁচবিবিতে আদিবাসী বৃদ্ধকে হত্যার পর পুত্রকেও প্রাণনাশের হুমকি' শিরোনামে দৈনিক সংবাদে আরো একটি খবর প্রকাশিত হয়।

জয়পুরহাট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত খবরটি নিম্নরূপ ঃ

'পাঁচবিবির বৃদ্ধ আদিবাসী কৃষক হরেন্দ্রনাথ মালো (হরেন) প্রতিপক্ষের হাতে নিহত হওয়ার পর এখন হত্যা মামলার বাদি হরেনের পুত্র ললিত মালোও আসামিদের প্রাণনাশের হুমকিতে শঙ্কিত। আসামির নাম বা মামলা প্রত্যাহার করা না হলে পুত্রের পরিণতিও পিতার মতো হবে বলে তাকে শাসানো হয়েছে। অসহায় ললিত মালো সাংবাদিকদের জানান, তার আইনজীবীর সামনেই আসামি আমিনুল বিহারি (পাঁচবিবি উপজেলার আটাপুর ইউনিয়নের মেম্বার অবাঙালি এই হুমকি দেয়। হত্যার হুমকি দিয়ে দুটি স্ট্যাম্প পেপারে (প্রতিটি ৫০ টাকা মূল্যের) তার সই আদায় করে নেয়।'

উলে-খ্য, ২১ জুলাই ২০০২ চাঁদপুর গ্রামের আদিবাসী মামলার সাক্ষ্য-জেরা শেষে জয়পুরহাট আদালত থেকে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বাড়ি ফেরার পথে সন্ধ্যার দিকে বাজিতপুর গ্রামের বটচড়ায় (আটাপুর ইউনিয়ন, পাঁচবিবি উপজেলা) প্রতিপক্ষের লোকজন লাঠিসোঁটা নিয়ে হরেনদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। টার্গেট হরেন মালোকে তারা অহরণ করে। অন্যরা প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়। পরে গ্রামবাসী খুঁজতে এসে হরেনকে পায়নি। পরদিন ললিত মালো তার পিতার অপহরণ ঘটনা জানিয়ে পাঁচবিবি থানায় মামলা করতে চাইলেও মামলা নেওয়া হয়নি। ঘটনার তিনদিন পর বাজিতপুর গ্রামের বটচড়া মাঠের গভীর নলকূপ সংলগ্ন জমি থেকে নিহত হরেনের লাশ উদ্ধার করে কৃষকরা। লাশটি মাটি চাপা অবস্থায় ছিল। প্রথমে টালবাহানা করা হলেও পাঁচবিবি থানা পরে হত্যা মামলা নেয়। হরেনের পুত্র ললিত মালো বাদী হয়ে ৮ জনকে আসামি করে মামলা করে। উলি-খিত আমিনুল মেম্বার ওই মামলার অন্যতম আসামি।

সাদা স্ট্যাম্পে (৫০ টাকার) জোর করে তারিখবিহীন সই আদায় ও আমিনুল মেম্বার কর্তৃক হত্যার হুমকির ঘটনায় মামলার বাদী আদিবাসী যুবক ললিত মালো পাঁচবিবি থানায় জিডি করে। এ সম্পর্কে সে সাংবাদিকদের জানায়, গত ২৬ জুলাই ২০০২ সকাল ৯ টায় হরেন মালোর জমিজমা বিষয়ে অন্য একটি মামলায় তাদের নিয়োজিত আইনজীবীর মুহুরি সুভাষ হঠাৎ জয়পুরহাট থেকে চাঁদপুরে আসে। মুহুরি সুভাষ জানায়, মামলার বিষয়ে আলোচনার জন্য তাদের আইনজীবী ললিত মালোকে তার চেম্বারে (জয়পুরহাট জেলা শহরে) যেতে বলেছে। সরল বিশ্বাসে ললিত জয়পুরহাটে তার আইনজীবীর চেম্বারে গিয়ে তার পিতার হত্যার আসামি আমিনুল মেম্বারকে ২/৩ জন সঙ্গীসহ দেখতে পান।

আমিনুল মেম্বার তাকে পাশের একটি ঘরে নিয়ে যায় এবং ৫০ টাকা মূল্যের সাদা ২টি স্ট্যাম্পে সই দিতে বলে। প্রথমে রাজি না হওয়ায় আমিনুল মেম্বার তাকেও পিতা হরেনের মতো হত্যা করা হবে বলে জানায়। ললিতের আইনজীবীও সাদা স্ট্যাম্পে সই করার জন্য এবং এ বিষয়ে বেশি বাড়াবাড়ি না করার জন্য পরামর্শ দেয়। শুধু তাই নয়, এতে তার (আইনজীবীর) কাছে রক্ষিত সাড়ে ১৪ বিঘা জমির কাগজপত্র (দলিল) ও মামলার সুবিধা হবে বলে মন্তব্য করে। নিরুপায় ললিত বাধ্য হয়ে ওই দুটি সাদা স্ট্যাম্পে (সইকৃত) বাতিল ও এ বিষয়ে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছে। উলে-খ্য, সই করার সময় তার ফটোও তোলা

হয়।

গত ২০ নবেম্বর ২০০২ 'পুলিশ আসামি ধরছে না, কালিয়াকৈরে আদিবাসীদের ওপর সন্ত্রাসীদের হুমকি অব্যাহত' শিরোনামে দৈনিক সংবাদে আরো একটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরটি পাঠিয়েছেন শ্রীপুর (গাজীপুর) থেকে (সংবাদ-এর) নিজস্ব সংবাদদাতা। খবরে বলা হয়, শ্রীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা কালিয়াকৈরের সিরাজপুর গ্রামে আদিবাসীদের ওপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় মামলা হওয়ার পরে ক্ষুব্ধ সন্ত্রাসীচ□ পুনরায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। সন্ত্রাসীরা তাদের নিজ নিজ এলাকায় প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করলেও পুলিশ নীরব ভূমিকা পালন করছে বলে আদিবাসীরা অভিযোগ করছেন। ফলে কালিয়াকৈরের সিরাজপুর ও শ্রীপুরের ভেড়ামতলী গ্রামের আদিবাসীরা চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছে।'

গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০২ 'জাতীয় আদিবাসী পরিষদ রাজশাহী জেলা প্রশাসকের কাছে ৫ দফা দাবিতে স্মারকলিপি' শিরোনামে ভিন্ন একটি খবর দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত হয়। খবরে বলা হয়, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ রাজশাহী জেলা কমিটির উদ্যোগে আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা (আউস) বিভিন্ন দুর্নীতি ও প্রতারণাসহ ৫ দফা দাবিতে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

আদিবাসী পরিষদের স্মারকলিপিতে অভিযোগ করা হয়, রাজশাহীর গোদাগাড়ি উপজেলার আদিবাসী অধ্যুষিত ইউনিয়নে উন্নয়নের নামে সংস্থার মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে এবং সংস্থায় সদস্যভুক্তি করে আদিবাসীদের প্রতারণা করে আসছে।

স্মারকলিপিতে উলে-খ করা পাঁচ দফা দাবি হলো পদত্যাগকারী কর্মীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার জাতীয় আদিবাসী পরিষদ নেতা গণেশ মাঝিসহ অন্যদের মুক্তিদান, আউসের দুর্নীতিবাজ পরিচালকের শাস্তি, আউসের কার্যকরী কমিটি বাতিল করে সংস্থার কার্য□ম বন্ধ ও আমানতকারীদের সঞ্চয়ের লাখ লাখ টাকা ফেরত প্রদান করা।

গত ২০০২ সালের ২ অক্টোবর দৈনিক সংবাদে 'গুরুদাসপুরের আদিবাসী পল-ীতে হামলা, ভাঙচুর, গ্রেফতার ২' শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরে বলা হয়, 'নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার চাপিলা ইউনিয়নের ধানুড়া গ্রামে আদিবাসী পল-ীতে গভীর রাতে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা আদিবাসীদের বাড়িঘর ভাঙচুর এবং ৩ জন তরুণীকে পারিবারিকভাবে লাঞ্ছিত করে। হামলার প্রতিবাদ করলে নিরঞ্জন ও শুকদেব নামে দুই যুবককে সন্ত্রাসীরা বাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়ে মারধর করে। ঘটনার প্রতিবাদে শতাধিক আদিবাসী গুরুদাসপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অফিস ঘেরাও করলে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সাহেব আলী ও হাতেম আলী দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পক্ষে শিবলাল পাহান ২০-২৫ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করে। পরে গ্রেপ্তারকৃতদের কোর্টে চালান দেওয়া হয়।'

এ রকমভাবে দেশের বিভিন্নস্থানে আদিবাসীদের ওপর নির্যাতন চলছে যা এই স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে কোনোভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয়। এ ব্যাপারে প্রগতিশীল মহলকে এখনই ভাবতে হবে।

ভোরের কাগজ, ১৯ জুলাই ২০০৩

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন সরকার ও গণমাধ্যমের ভূমিকা

শাহরিয়ার কবির

২০০১ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় যে নজিরবিহীন সাম্প্রদায়িক নির্যাতন শুরু হয়েছে একুশ মাস অতি□ান্ত হওয়ার পরও তা বন্ধ হয়নি। এই সুপরিকল্পিত নির্যাতনের লক্ষ্য হচ্ছে ক) বাংলাদেশের দুর্বল ও অসহায় সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অর্থ ও সম্পদ আত্মসাৎ এবং খ) এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যাতে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় বুঝতে পারে বাংলাদেশে থাকতে হলে তাদের বিএনপি ও জামাতে ইসলামী ছাড়া অন্য কোন দল করা চলবে না এবং নির্বাচনের সময় ভোটকেন্দ্রে যাওয়াও চলবে না।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং তার নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের শীর্ষ নেতারা বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করতে চান না। তারা হরহামেশা বলেন, বাংলাদেশে কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নেই। বিএনপি যখনই ক্ষমতায় এসেছে তখনই তারা বাংলাদেশে অমুসলিমশূন্যকরণ কর্মসূচী নিষ্ঠার সঙ্গে বাস্তবায়ন করেছে। প্রথম দফায় জেনারেল জিয়ার শাসনামলে (১৯৭৬-১৯৮০) আমরা লক্ষ্য করেছি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সংখ্যালঘু এথনিক সম্প্রদায় বিতাড়ন প্র□িয়া। দ্বিতীয়বার খালেদা জিয়ার প্রথম শাসন-ামলে (১৯৯১-১৯৯৬) আমরা দেখেছি ভারতে বাবরী মসজিদ ভাঙার অজুহাতে বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন, যার ফলশ্রুতি হিসেবে কয়েক লক্ষ হিন্দু জনগোষ্ঠীর অভিপ্রয়াণ। এর পাশাপাশি সংখ্যালঘু এথনিক সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনও অব্যাহত ছিল। তৃতীয়বার, অর্থাৎ বর্তমানে (২০০১) খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের জমানায় সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের উপর সুপরিকল্পিতভাবে নির্যাতন চালানো হচ্ছে, যাতে তারা চিরদিনের জন্য বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যায়।

জোট সরকার বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে হিন্দু সম্প্রদায়কে গত একুশ মাসের ধারাবাহিক নির্যাতনের মাধ্যমে এটা বুঝিয়ে দিতে পেরেছে যে, বাংলাদেশে থাকতে হলে তাদের যাবতীয় লাঞ্ছনা, বৈষম্য ও নিপীড়ন মেনে নিয়ে সংবিধান প্রদত্ত সকল মৌলিক অধিকারবঞ্চিত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের জীবন গ্রহণ করতে হবে। এই জীবন ও পরিবেশ তাদের পছন্দ না হলে তাদের সামনে দুটো পথ খোলা আছে (১) সংখ্যালঘুর ধর্ম ত্যাগ করে সংখ্যাগুরুর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা এবং ২) ঘরবাড়ি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও জমিজমা ফেলে দেশান্তরী হওয়া।

গত একুশ মাস ধরে সংবাদপত্রের মাধ্যমে কিংবা কখনও উপদ্রুত এলাকায় গিয়ে নির্যাতিতদের সঙ্গে কথা বলে বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করার এই চ□ান্তটি আমরা বুঝতে পেরেছি। নির্যাতিতরা যখন তৃতীয় পথের সন্ধান জানতে চান তখন তাদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য আমরা যদিও বলি নির্যাতনের বিরুদ্ধে সবাইকে একজোট হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে, বাস্তব সত্য হচ্ছে রুখে দাঁড়াবার মতো মানসিক শক্তি এই দুর্বল, অসহায়, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নেই। অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলোও সংঘবদ্ধভাবে এবার নির্যাতিত সংখ্যালঘুর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়নি, যেমনটি দেখেছিলাম '৬৪ সালে, কিংবা সীমিতভাবে হলেও '৯২ সালে।

বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করার কর্মসূচী জোট সরকার একদিকে গোপন করতে চেয়েছে, অপরদিকে চায়নি। ২০০১ সালের অক্টোবর থেকে সংবাদপত্রে যখন সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা প্রাত্যহিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে তখন থেকে সরকার বলছে বাংলাদেশে কোথাও কোন

সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেনি, সংবাদপত্রে মিথ্যা খবর প্রকাশিত হচ্ছে কিংবা কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে যদি কিছু ঘটে থাকে সেসব আওয়ামী লীগ করেছে জোট সরকারের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার জন্য। সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা অস্বীকার করে জোট সরকার একদিকে তা আড়াল করতে চেয়েছে, অপরদিকে নির্যাতকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে এবং তাদের প্রশ্রয় দিয়ে সরকার এটাও বুঝিয়ে দিয়েছে যে তারা চায় এই নির্যাতন অব্যাহত থাকুক।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের কারণে বাংলাদেশে চলমান সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের সংবাদ দেশ বিদেশের মানুষের কাছে গোপন থাকেনি। সরকার এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়। সরকার গণমাধ্যমের পরোয়া করে না, তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে মার্কিন সরকারের সন্তুষ্টি। যদিও আমেরিকার সংবাদপত্র এমনকি স্টেট ডিপার্টমেন্টের বার্ষিক প্রতিবেদনেও বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের কথা বলা হয়েছে কিন্তু ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোট সরকারের প্রেসনোটের ভাষায় সব সময় বলছেন বাংলাদেশে চমৎকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রয়েছে। মার্কিন সরকারের আরেক পুতুল বৃটিশ সরকার বাংলাদেশের নাম সাদা তালিকায় স্থান দিয়েছে। খালেদা-নিজামীর জোট সরকার চরম মূল্যে অর্জন করেছে ইঙ্গ-মার্কিন সরকারের সন্তুষ্টি। প্রথমত. ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন হামলা এবং যুদ্ধাপরাধের নিন্দা না করে, দ্বিতীয়ত. মার্কিনী বাহিনীর ভাড়া খাটার জন্য ইরাকে বাংলাদেশের সৈন্য পাঠানোর বিষয়টি বিবেচনায় রেখে, তৃতীয়ত. রোমে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের এখতিয়ার না মেনে, চতুর্থত. মার্কিন তেল কোম্পানি ইউনিকলকে গ্যাস ও তেল বি□র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং পঞ্চমত. বাংলাদেশে মার্কিন সৈন্যদের অবাধ চলাচলের বিষয় বিবেচনা করে।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত কিংবা পররাষ্ট্রমন্ত্রী খালেদা-নিজামীর জোট সরকারকে যতই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সার্টিফিকেট দিক না কেন সেখানকার গণমাধ্যম বলছে ভিন্ন কথা। 'নিউইয়র্ক টাইমস', 'ওয়াশিংটন পোস্ট', 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' ও 'দি নেশন' সহ বিভিন্ন মার্কিন দৈনিক ও সাময়িকীতে বাংলাদেশে মৌলবাদের উত্থান, সাম্প্রদায়িক নির্যাতন এবং মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতির কথা লেখা হয়েছে। ইউরোপের বিভিন্ন পত্রিকায় হয়েছে, বিবিসিতে হয়েছে, ভারতের সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে হয়েছে। পাকিস্তান সহ দক্ষিণ এশিয়ার অপরাপর দেশের পত্রিকাতেও হয়েছে। সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের সংবাদ গোপন করার জন্য সরকার কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেও সফল হয়নি।

সম্প্রতি ইউরোপ সফরকালে জানতে পেরেছি জোট সরকার বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর একটি প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ করে দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে বিদেশে প্রদর্শন করছে। এই ছবিতে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার কিছু মানুষের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। ঢাকায় বিভিন্ন দৈনিকে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের যে সব সংবাদ বহুল আলোচিত ছিল সেই সব নির্যাতিতরা ক্যামেরার সামনে বলেছে তাদের উপর কোন নির্যাতন হয়নি, পত্রিকায় যা বেরিয়েছে তা সত্য নয়। কিছু বিদেশী সাংবাদিকরা এই ছবি সম্পর্কে আমার মন্তব্য জানতে চেয়েছিলেন। তাদের বলেছি নির্যাতিতদের কীভাবে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে ক্যামেরার সামনে মিথ্যা বলতে বাধ্য করা হয়েছে। কারণ এ বিষয়ে এক বছর আগেই আমি লিখেছিলাম। এরপর 'ডেইলি স্টার'-এও এ নিয়ে লেখা হয়েছে। 'ভোরের কাগজ'-এ ছাপা হয়েছে নির্যাতিতদের কাছ থেকে প্রশাসন কীভাবে বণ্ড লিখিয়ে নিয়েছে তাদের উপর কোন নির্যাতন হয়নি! নির্যাতন বন্ধের ব্যবস্থা না করে, নির্যাতকদের শাস্তি না দিয়ে, নির্যাতিতদের পাশে না দাঁড়িয়ে উল্টো তাদের যখন বলতে বাধ্য করা হয় তাদের উপর কোন নির্যাতন হয়নি, এর চেয়ে বর্বরতা আর কিছু হতে পারে না। এই বর্বরতা প্রদর্শনের মাধ্যমে সরকার বুঝিয়ে দিয়েছে যে তারা সাম্প্রদায়িক নির্যাতন অব্যাহত রাখার নীতির প্রতি অবিচল রয়েছে। তারা মুখে

যেমন বলছে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু বলে কিছু নেই, কার্যত তারা সেটা বাস্তবে প্রমাণ না করে ক্ষান্ত হবে না। 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নেই' এই বাক্যটি উচ্চারণের সময় সরকারি দলের নীতি নির্ধারক এবং তাদের উচ্ছিষ্টভোগী কলাম লিখিয়েরা একটি শব্দ উচ্চারণ করেন না। তাঁরা আসলে বলতে চান'বাংলাদেশে সংখ্যালঘুর স্থান নেই।'

পৃথিবীর কোথাও কি এমন দেশ আছে যেখানে ধর্মীয় বা এথনিক সংখ্যালঘু নেই? ভারতসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু। যে সব দেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেই সব দেশের সরকার যদি সংখ্যালঘু নির্যাতনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জোট সরকারের মতো বর্বরতা প্রদর্শন করে তাহলে কী প্রতিবাদের কোন উপায় থাকবে যখন আমরা নিজেদের দেশে সংখ্যালঘুর সমঅধিকার ও সমমর্যাদার বিষয়টি উপেক্ষা করি? ভারতের গুজরাটে সেখানকার হিন্দু মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক মোদী সরকার এত বড় মুসলিমনিধন যজ্ঞ পরিচালনা করার সাহস পেতো না যদি না ২০০১ সালের অক্টোবর থেকে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের বিবরণ পত্রিকায় বেরুতো কিংবা নির্যাতনের শিকার হাজার হাজার মানুষ ভারতে গিয়ে আশ্রয় না নিতো। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের পার্থক্য হচ্ছে সেখানে কেন্দ্রের জোট সরকার গুজরাটের ঘটনা ধামাচাপা দিতে চায়নি, বিরোধী দলের উপরও এর দায় চাপিয়ে দেয়নি, যা বাংলাদেশের জোট সরকার করেছে। ভারতের সব রাজ্যেই মুসলমান আছে, কিন্তু গুজরাটের ঘটনা গুজরাটেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলাদেশে গুজরাটের মতো গণহত্যা হয়নি কিন্তু দৈহিক নির্যাতন, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের ঘটনা গত একুশ মাস ধরে চলছে গোটা দেশজুড়ে, যার পরিণতি হচ্ছে লক্ষাধিক মানুষের দেশত্যাগ। যে মানুষ সহায়-সম্পদ-সম্ভ্রম হারিয়ে পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে রাতের অন্ধকারে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে তার বেদনা জীবনভর তাদের বয়ে বেড়াতে হবে। এই বেদনা প্রিয়জনের মৃত্যুর চেয়ে কম নয়।

২০০১ সালের অক্টোবরের পর প্রথম কয়েক মাস সংবাদপত্রে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের সংবাদ যেভাবে ছাপা হয়েছে তার প্রধান কৃতিত্ব হচ্ছে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত সাংবাদিকদের, যাদের উপেক্ষা করা হয় 'মফস্বল সাংবাদিক' হিসেবে। এই সাংবাদিকরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে সরকারি দল ও প্রশাসনের হুমকি অগ্রাহ্য করে যেভাবে নির্যাতনের সংবাদ সংগ্রহ করেছেন তাতে দেশের প্রতিটি বিবেকবান মানুষ তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন। কিন্তু সরকারি দল ও প্রশাসনের প্রতিহিংসা ও নির্যাতনের হাত থেকে জেলা ও থানা পর্যায়ে কর্মরত সাংবাদিকরা যেমন রেহাই পাননি, সংবাদপত্রও রেহাই পায়নি। সাংবাদিকদের উপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছে, মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে, কিংবা হত্যার হুমকি দিয়ে এলাকাছাড়া করা হয়েছে। একইভাবে যে সব পত্রিকা সরকারের নীতি অগ্রাহ্য করে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের সংবাদ ছেপেছে তাদের সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে এসব পত্রিকা □য় ও পাঠ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং প্রকাশক ও সম্পাদকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের মামলা দায়ের করা হচ্ছে। এর ফলে গত কয়েক মাস ধরে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা পত্রিকায় কম ছাপা হচ্ছে। কিন্তু যে সব মানবাধিকার সংগঠন মাঠপর্যায়ে কাজ করে, যাঁরা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘোরেন, তাদের বক্তব্য অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক নির্যাতন এতটুকু কমেনি বরং তার মাত্রা আরও বেড়েছে। গত বছর মার্চে খবরের কাগজে পাবনার চাটমোহরে খ্রিষ্টান পল-ীতে হামলার খবর পড়ে উপদ্রুত এলাকা দেখতে গিয়েছিলাম, নির্যাতিতদের সাক্ষাৎকারও নিয়েছিলাম। এরপর চাটমোহরের একই গ্রামে আরও তিনবার হামলা হয়েছে যার সংবাদ পত্রিকায় ছাপা হয়নি, জেনেছি ফাদার টীম ও রোজালিন কস্টার মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিবেদন থেকে।

সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা যা ঘটে তা পত্রিকায় পুরোপুরি কখনও আসে না। সব

ঘটনাও পত্রিকায় আসে না প্রথমত. বেশির ভাগ ঘটনা ঘটে প্রত্যন্ত অঞ্চলে, খবর না পেলে সাংবাদিকদের পক্ষে যেখানে যাওয়া হয় না, দ্বিতীয়ত. হামলাকারীদের হুমকির কারণে, অধিকতর নির্যাতনের আশঙ্কায় আ⎕ান্তরা থানায় যেতে বা সাংবাদিকদের জানাতে চান না। সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার ভুক্তভোগীরা জানেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে থানা অভিযোগ গ্রহণ করে না, কখনও অভিযোগ নথিবদ্ধ করলেও মূল আসামিদের গ্রেফতার করা হয় না। থানার কোন সৎ অফিসার যদি বা অভিযোগকারী বর্ণিত কোন আসামিকে গ্রেফতার করেন সরকারি দলের স্থানীয় নেতা কিংবা 'উপরের নির্দেশে' তাকে ছেড়ে দিতে হয়, মামলা সাজাতে হয় দুর্বল ধারায় যাতে আসামিরা অনায়াসে রেহাই পায়। প্রতিকার হবে না জেনে নির্যাতিতরা অভিযোগ জানবার আগ্রহ হারিয়ে নিজেদের সমর্পণ করেছে নিয়তির হাতে। যারা দেশে থাকবে বলে স্থির করেছে তারা ধরেই নিয়েছে এই সব প্রাত্যহিক নির্যাতন, গঞ্জনা, অপমান, বৈষম্য ও বঞ্চনা মেনে নিয়েই সংখ্যালঘুদের বাংলাদেশে থাকতে হবে। থানায় কিংবা পত্রিকায় জানিয়ে কোন লাভ নেই।

এবারের সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ভয়াবহতার কারণে যে যে সব পত্রিকা নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের পরিবর্তে খালেদা-নিজামীর চারদলীয় জোট সরকারের বিজয় দেখতে চেয়েছে এবং এই লক্ষ্যে জনমত প্রভাবিত করেছে, সেই সব পত্রিকা প্রথম দিকে উপেক্ষা করলেও শেষপর্যন্ত পারেনি। বিশেষভাবে ২০০১ সালের ২২ নবেম্বর আমাকে গ্রেফতারের পর সেই সব পত্রিকা ঢাকা থেকে প্রতিবেদক পাঠিয়ে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের সরেজমিন প্রতিবেদন ছেপেছে। ব্যতি⎕ম ছিল বিএনপির মুখপত্র 'দিনকাল', 'জামাতে ইসলামী'র মুখপত্র 'সংগ্রাম' এবং তাবৎ সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী অপশক্তির মুখপত্র 'ইনকিলাব'। এই তিনটি পত্রিকার ভেতর বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের খবর অস্বীকার করে সবচেয়ে বেশি লিখেছে 'ইনকিলাব', যে পত্রিকা '৯০ সালের অক্টোবরে ভারতে বাবরী মসজিদ ভাঙার মিথ্যা খবর ছেপে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক দুষ্কৃতকারীদের লেলিয়ে দিয়েছিল হিন্দুদের ঘরবাড়ি-মন্দির ধ্বংস এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান লুট করতে।

সম্প্রতি বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জে সংখ্যালঘু নির্যাতনের সংবাদ ঢাকার বিভিন্ন দৈনিকে বেরিয়েছে। গত ১০ জুলাই ২০০৩ তারিখে 'জনকণ্ঠ' বাগেরহাট থেকে পাঠানো বাবুল সরদারের একটি প্রতিবেদন ছেপেছে। 'মোরেলগঞ্জে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বীভৎস কাহিনীচাঁদাবাজি শ-ীলতাহানি নিত্যঘটনা' শিরোনামে এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে

'বাগেরহাটের অন্যতম অপরাধপ্রবণ উপজেলা মোরেলগঞ্জে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের আরেক বীভৎস কাহিনী জানা গেছে। সেখানে চিংড়াখালী ইউনিয়নের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বিভিন্ন গ্রামে একাধিক মামলার আসামি চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা রামরাজত্ব কায়েম করেছে। চাঁদাবাজি, লুটপাট, ডাকাতি, চুরি, নারীর শ-ীলতাহানি, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় এখানে নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সন্ত্রাসীরা এতই শক্তিশালী যে, তাদের বিরুদ্ধে ডিসি, এসপি, এমপি কাউকেই জানিয়ে কোন ফল পাওয়া যায়নি। উল্টা নালিশের কথা জানতে পেয়ে সন্ত্রাসীরা আরও দ্বিগুণ তাণ্ডব শুরু করে। গত একমাসে সেখানে কমপক্ষে ৫টি হিন্দু পরিবার অতিষ্ঠ হয়ে দেশান্তরী হয়েছে। সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ধরে নিয়ে যাওয়ার পর এখনও পর্যন্ত খোঁজ মেলেনি বৃদ্ধ ললিত মণ্ডল ও তাঁর স্ত্রীর। বুধবার বাগেরহাট প্রেসক্লাবে আহূত এক সংবাদ সম্মেলনে ওই এলাকার একাধিক গ্রামের উপস্থিত নির্যাতিত, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষরা এ অভিযোগ জানান।

'গোপালপুর, চরগোপালপুর, সিংজোড়, মহিষচরণী গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষরা এদিন সংবাদ

সম্মেলনে নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে অনেকেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তাঁদের ভাষায়, "থানা পুলিশ থেকে সংশি-ষ্ট সকলের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি। কিন্তু প্রতিকার পাইনি, বরং অত্যাচার আরও বেড়েছে। এ সময় সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তারা বলেন, শেষ আর্জি জানাতে নিরুপায় হয়ে আমরা আপনাদের কাছে হাজির হয়েছি। আপনারা আমাদের বাঁচান। নতুবা বাপ-দাদার ভিটামাটি ফেলে দেশত্যাগ করা বা মরা ছাড়া আমাদের কোন পথ নেই।"

'সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন উত্তম কুমার মণ্ডল। এ সময় এলাকার বিভি-ন্ন স্কুলের শিক্ষক, কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবীসহ নানা শ্রেণী ও পেশার প্রায় ২৫/৩০ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। লিখিত বক্তব্য এবং প্রশ্নোত্তরে জানা যায়, বিগত সংসদ নির্বাচনোত্তর ওই এলাকায় একাধিক মামলার আসামি চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনে মেতে ওঠে। বিশেষত গত ইউপি নির্বাচনে এ ইউনিয়নে জামায়াত নেতা মাওলানা আবুল কাশেম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবার পর সন্ত্রাসীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

'নির্বাচনে তারা এই জামায়াত নেতার পক্ষে 'মাসলম্যান' হিসাবে অংশগ্রহণ করে। মান্নান, দিদার, কালাম হাওলাদার, কামরুজ্জামান (লিন্টু), শাহীন শিকদার, সোবাহান দিদার, ছালাম শিকদার, আলম শিকদার, হান্নান শিকদার, রাসেল হাওলাদার, বাবুল হাওলাদার এবং হারুন শিকদারসহ কয়েকজনের বাহিনী এই নির্যাতন-নিপীড়ন শুরু করেছে। একাধিক মামলার দাগী আসামি ও অস্ত্রধারী এই বাহিনী এলাকায় 'মান্নান বাহিনী' বলে পরিচিত। এই বাহিনীর নেপথ্য নায়ক কৃষক লীগের স্থানীয় কথিত নেতা লিন্টু বক্স। তবে এদের সবার মূল হোতা উক্ত ইউপি চেয়ারম্যান জামায়াত নেতা বলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষরা মনে করেন। তারা জানান, এই 'মান্নান বাহিনী' শাসক জোটের পরিচয় দিয়ে প্রকাশ্যে তাণ্ডব শুরু করলেও এরা স্থানীয় ইউনিয়ন বিএনপি সভাপতি শিক্ষক সোবাহান হাওলাদারের নিয়ন্ত্রণহীন; তার কথা তারা মানে না।

'নির্যাতিতরা উলে-খ করেন, অস্ত্রধারী ওই বাহিনী এলাকার উত্তম কুমার মণ্ডলের নিকট ৩০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। এই টাকা দিতে অপারগতা জানালে গত ১২ এপ্রিল রাতে তারা উত্তমের বাড়ি চড়াও হয়ে বেদম মারপিট, নারীদের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালিয়ে সর্বস্ব লুটে নেয়। এর আগে গত ২৩ সেপ্টেম্বর এই বাড়িতে চড়াও হয়ে অনুরূপ ডাকাতি ও নির্যাতন করে। উত্তমের ভাষায়, 'ওরা আমার পরিবারের ওপর যে অত্যাচার চালিয়েছে তা প্রকাশ্যে বলা যায় না।' দীর্ঘদিন নানা নির্যাতনের পর গত ১২ এপ্রিল রাতে বৃদ্ধ ললিত মণ্ডল ও তার স্ত্রীকে ধরে নিয়ে বাস্তুভিটা, জায়গাজমি তারা লিখে নেয়। ধরে নেয়ার সময় এলাকাবাসী তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন করতে দেখে। আজও তারা নিখোঁজ। পার্শ্ববর্তী সিংজোড় গ্রামের স্বপন হাওলাদারের নিকট ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। এটা দিতে সে অপারগ হলে এক রাতে তাকে ধরে নিয়ে যায় এবং অমানুষিক নির্যাতন করে একাধিক স্ট্যাম্পে ও ডেমিতে স্বাক্ষর আদায় করে। রাজেন্দ্রনাথ ও নলিনীকান্তকে মারপিট করে তাদের জমি দখল করে তাতে কলার চাষ করছে। স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সন্তোষ রায়কে গত ৩ মে সকালে স্কুলে যাবার পথে সন্ত্রাসীরা ধরে তাৎক্ষণিক চাঁদা দাবি করে। তাকে হত্যার চেষ্টা চালায়। তখন তার চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে তিনি ওই যাত্রা প্রাণে রক্ষা পান। তবে তারা যাবার সময় হুমকি দিয়ে নাকি বলে, 'হিন্দুরা এ দেশে চাও কি? ৩ দিনের মধ্যে এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাবি। নচেৎ জীবনে রক্ষা পাবি না।' এলাকার নিরঞ্জন রায়ের গোয়ালঘর থেকে বাচ্চাসহ দুধের গাভী এবং অপর একটি বলদ গরু নিয়ে পার্শ্ববর্তী মাঠে জবাই করে চামড়া খুলে নেয়। পরীক্ষীত রায়কে এই সন্ত্রাসীরা গত ২৯ মার্চ বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে চাঁদা দাবি করে। ব্যর্থ হলে তার জমি লিখে নেয়। বনমালী মণ্ডল ২০ হাজার টাকা চাঁদা দিতে না পেরে প্রাণনাশের হুমকির মুখে

বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। রতিকান্ত মৃধার দিন-দুপুরে মাছ লুট, উত্তমের বাড়ি ডাকাতি, শ-ীলতাহানি, ভূষণ মণ্ডলের বাড়ি ডাকাতি ও সর্বস্ব লুটের মতো নানা অত্যাচার এখানে অহরহ ঘটছে। সেখানে সাধারণ গ্রামবাসী এখন দিন-দুপুরে চলাচল করতে, হাট-বাজারে যেতে ভয় পায়। দাগী সব আসামি নিয়ে গঠিত এই বাহিনীর অত্যাচারে গত একমাসে এলাকা থেকে স্বপন হাওলাদার, মানিক হাওলাদার, রঞ্জিত মিস্ত্রি, মনোরঞ্জন মিস্ত্রি ও অমল বাছাড় সপরিবারে দেশান্ত রী হয়েছেন বলে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাবাসী জানান। সংবাদ সম্মেলনে স্থানীয় এমপি, ডিসি ও এসপিকে এসব অভিযোগ জানিয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করে দেয়া লিখিত আবেদনপত্রের ফটোকপিও দেখানো হয়।

'এ বিষয়ে আলাপকালে জেলা বিএনপি নেতা সদর আসনের সংসদ সদস্য এমএএইচ সেলিম জনকণ্ঠকে জানান, হিন্দু কেন, যে কোন মানুষের ওপর অত্যাচার নির্যাতনসহ সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে প্রশাসন ও পুলিশকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি মোরেলগঞ্জের চিংড়াখালী ইউনিয়নের এই নির্যাতনের বিষয়টি কঠোরভাবে দমনের জন্য এদিনই এসপিকে বলেছেন বলে জানান।'

এই একটি খবর থেকেই গত একুশ মাসের ধারাবাহিক সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের প্যাটার্ন বোঝা যাবে। কিন্তু একই দিনে (১০ জুলাই, ২০০৩) 'ইনকিলাব' লিখেছে ঠিক এর বিপরীত সংবাদ। শুধু তাই নয়, এর ভেতর তারা আবিষ্কার করেছে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র! জেলা সংবাদদাতার বরাত দিয়ে 'বাগেরহাটে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ভূয়া ইস্যু সৃষ্টির অপতৎপরতা' শিরোনামে 'ইনকিলাব' লিখেছে

বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জের পল-ীতে সংখ্যালঘু নির্যাতনের নামে এক সংবাদ সম্মেলনে বানোয়াট ঘটনায় বাগেরহাটে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ বলছে, মোরেলগঞ্জের চিংড়াখালী ইউনিয়নের গোপালপুর ও চর গোপালপুর গ্রামে সংখ্যালঘু নির্যাতনের কোন ঘটনার সংবাদ তারা জানে না। এমন কি কোন ব্যক্তি থানায় এই নির্যাতনের কোন অভিযোগই করেনি। গত বুধবার বাগেরহাট প্রেসক্লাবে ঐ গ্রামের উত্তম কুমার মালি নামের এক ব্যক্তি সংবাদ সম্মেলনে সংখ্যালঘু নির্যাতনের কথা তুলে ধরেন। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, এলাকার কতিপয় ব্যক্তির ইন্ধনে নতুন একটি ইস্যু তৈরির জন্য দাদারা খরচা দিয়ে এই সংবাদ সম্মেলন করে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ভূয়া কাহিনী বর্ণনা করে। উত্তম কুমার মালি স্বাক্ষরিত এই সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, উলে-খিত দু'টি গ্রামে চাঁদাবাজি, ডাকাতি, চুরি, শ-ীলতাহানি ও অপহরণের মত জঘন্য আইন-শৃঙ্খলা পরিপন্থী ঘটনায় সংখ্যালঘুরা অতিষ্ঠ, তারা থানায় অভিযোগ দিলে পুলিশ এসব অভিযোগ গ্রহণ করেন না। এমন কি স্থানীয় এমপি, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারকে বিষয়টি কুরিয়ারের মাধ্যমে ও সরাসরি জানানোর পরও কোন প্রতিকার মেলেনি। তবে পুলিশের ভাষ্য তথাকথিত সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ তাদের হাতে আসেনি। সূত্র জানায়, সংখ্যালঘু নির্যাতনের নামে একটি ইস্যু তৈরির জন্য কুরিয়ারের রসিদ দেখিয়ে তাদের অভিযোগ প্রেরণের বক্তব্য তুলে ধরার নেপথ্যে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। কারণ সরাসরি কিংবা লিখিতভাবে কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির হয়ে অভিযোগ না দিয়ে কুরিয়ারে অভিযোগ প্রেরণের বিষয়টি এ সংবাদ সম্মেলনকে আরো রহস্যময় করে তুলেছে।'

গত বছর ভারতের গুজরাটে সংখ্যালঘু মুসলিম নিধনের সময় সেখানকার হিন্দু মৌলবাদীদের পত্রিকা যেমন এর পেছনে পাকিস্তান ও 'আইএসআই'-এর হাত আবিষ্কার করেছিল, 'ইনকিলাব' ঠিক একইভাবে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের কথা কেউ লিখলে তাকে ভারত ও 'র'-এর এজেন্ট বানিয়ে দেয়। ভারতের হিন্দু মৌলবাদী এবং বাংলাদেশের

মুসলিম মৌলবাদীদের স্বার্থ যে অভিন্ন 'ইনকিলাব' পত্রিকাটি নিয়মিত পড়লে এই সত্যটি সকলের কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে।

বাগেরহাটে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা 'ইনকিলাব' সরাসরি অস্বীকার করলেও জনকণ্ঠের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বিএনপির স্থানীয় সাংসদ 'নির্যাতনের বিষয়টি কঠোরভাবে দমনের জন্য' এসপিকে বলেছেন। অন্তত এ ক্ষেত্রে স্থানীয় বিএনপি নেতা সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা অস্বীকার করেননি।

খালেদা-নিজামীদের জোট সরকার এবং তাদের প্রধান মুখপত্র 'ইনকিলাব' সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা অস্বীকার করে এবং নির্যাতনকারীদের প্রশ্রয় দিয়ে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' সংঘটনের কাঠগড়ায়। এর জন্য শুধু সরকারকে নয়, বাংলাদেশের জনগণকেও জবাবদিহি করতে হবে। কয়েকমাস আগে সামরিক অভিযানের সময় সেনা হেফাজতে যাদের হত্যা করা হয়েছে তাদের দায়মুক্তির জন্য ইনডেমনিটি জারি করে জোট সরকার হত্যাকারীদের বিচারের পথ বন্ধ করে দিয়েছে। যদিও সরকার বার বার বলেছে সেনা হেফাজতে কেউ নিহত হয়নি, যে ৫৮ জনের মৃত্যু হয়েছে তার কারণ 'হার্ট অ্যাটাক।' এই ৫৮ জন হতভাগ্য ব্যক্তি যদি হার্ট অ্যাটাকেই মারা যাবে তার জন্য ইনডেমনিটি কেন জারি করা হবে এ প্রশ্ন অনেকেই করেছেন। আমাদের আশঙ্কা সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের জন্য যারা দায়ী তাদের গ্রেফতার ও বিচার নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলে সরকার আরেকটি ইনডেমনিটি জারি করে বলতে পারে যারা স্বজন হারিয়েছে কিংবা ধর্ষিত ও লুণ্ঠিত হয়েছে তারা আদালতে যেতে পারবে না।

যারা জেলহত্যা ও কাস্টডিতে হত্যাকে বৈধতা প্রদান করে পৃথিবীতে এমন কোন আইন নেই তাদের রক্ষা করতে পারে। 'এথনিক ক্লিনজিং' যুদ্ধাপরাধের মতোই নৃশংস অপরাধ। গত একুশ মাস ধরে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের যে চিত্র আমরা পাই তা 'এথনিক ক্লিনজিং' ছাড়া আর কিছু নয়। একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী, মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তি অধ্যুষিত জোট সরকার হত্যা ও নির্যাতনের দায় থেকে কখনও অব্যাহতি পাবে না। আজ হোক কিংবা কাল হোক, বাংলাদেশে হোক কিংবা ইউরোপে হোক যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য খালেদা-নিজামীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতেই হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২১ *জুলাই* ২০০৩

সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটের ধর্ষিত রাধারাণী, অঞ্জনা ও রেখারাণীরা কি কোনদিন ন্যায় বিচার পাবে না?

শাহরিয়ার কবির

বাগেরহাটের প্রত্যন্ত অঞ্চল চিংড়াখালী ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামের অঞ্জনা মণ্ডল ও তরুণী গৃহবধু রেখারাণী মণ্ডলকে জামাতে ইসলামীর স্থানীয় সন্ত্রাসীরা গণধর্ষণ করেছে গত ৮ মে ২০০৩ তারিখে। সাতক্ষীরার কালীগঞ্জের বিশ্বনাথপুর গ্রামের তিন গৃহবধু রাধারাণী, বনলতা ও আদুরীর উপর পাশবিক নির্যাতন করেছে জামাতে ইসলামীর স্থানীয় সন্ত্রাসীরা গত ৫ জুলাই ২০০৩ তারিখে। তরুণী গৃহবধু রাধারাণীকে ধর্ষণ করেই নরপশুরা ক্ষান্ত হয়নি, একজন ধর্ষণের পর তার মুখে ও শরীরে প্রশ্রাব করে পাশবিক উল-াস প্রদর্শন করেছে। জামাতের সন্ত্রাসীরা রেখারাণী, অঞ্জনা, রাধারাণী, আদুরী ও বনলতাদের বাড়ির নগদ অর্থসহ যাবতীয় সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে। কালীগঞ্জের রাধারাণীদের বসতবাড়ি ও কালী মন্দির ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে তাদের পাঁচ বিঘা জমির উপর গোলপোস্ট বসিয়ে ফুটবল খেলার মাঠ বানিয়েছে। রাধারাণী, আদুরী ও বনলতার উপর এমন নৃশংস নির্যাতন চালানো হয়েছে যে ঘটনার ষোলদিন পরও তাদের আমরা চলৎশক্তিহীন অবস্থায় হাসপাতালে দেখতে পাই।

গত ২০ জুলাই স্থানীয় সাংবাদিক ও সমাজকর্মীদের অনুরোধে বাগেরহাট ও কালীগঞ্জে সাম্প্রদায়িক জিঘাংসার সাম্প্রতিক শিকার নির্যাতিত মানুষদের দেখার জন্য দক্ষিণের এইসব জনপদে গিয়েছিলাম। বাগেরহাটের উত্তম কুমার মণ্ডল তার স্ত্রী রেখারাণী ও ছোটবোন অঞ্জনাকে খুলনার একটি হাসপাতালে এনেছিলেন দেখাবার জন্য। আমরা সেখানে তাদের জবানবন্দি রেকর্ড করি। এর আগে উত্তম মণ্ডল তাদের এলাকার সংখ্যালঘু পরিবারের নির্যাতিত সদস্যদের সঙ্গে এনে গত ৯ জুলাই বাগেরহাট প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে নির্যাতনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন।

উত্তম মণ্ডলরা তাদের লিখিত বক্তব্যে বলেছেন 'আমরা আজ যারা এই সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছি তারা মোড়েলগঞ্জ উপজেলার চিংড়াখালী ইউনিয়নের গোপালপুর ও চরগোপালপুর এলাকাবাসী। এই অঞ্চলটি ধর্মীয় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা। বাগেরহাট হতে এলাকাটির যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ থাকায় সন্ত্রাসীদের স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হয়েছে এ এলাকাটি।

'চাঁদাবাজি, ডাকাতি, চুরি, শ-ীলতাহানি, অপহরণ, লুটপাট, মুক্তিপণ দাবির ঘটনা এলাকায় অহরহ ঘটছে। এ এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী মোঃ কামরুজ্জামান (লিন্টু) বক্সের নেতৃত্বে সন্ত্রাসী মান্নান দিদার, কালাম হাওলাদার, শাহীন শিকদার, সোবহান দিদার, ছালাম শিকদার, হাচেন হাওলাদার, রাসেল হাওলাদার, বাবুল হাওলাদার, হারুন শিকদারের সমন্বয়ে সন্ত্রাসীদল গড়ে উঠেছে। এছাড়াও এরা পার্শ্ববর্তী ইস্রাফিল ও দেলোয়ারের দল ভাটাটিয়া সন্ত্রাসী হিসাবে এনে আমাদের অত্র এলাকায় অমানুষিক নির্যাতন ও অত্যাচার করে থাকে। এই সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে এলাকাবাসী সবাই চরম অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দিতে গেলে তা গ্রহণ করা হয় না।

'ইতোমধ্যে সন্ত্রাসীরা উত্তম কুমার মণ্ডলের কাছে ত্রিশ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। উহা দিতে অস্বীকার করলে তারা তার বাড়িতে ডাকাতিসহ উত্তম কুমারকে বেদম ভাবে মারধর করে এবং মহিলাদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালায় ও ঘরের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যায়। ৮ মাসের ব্যবধানে উক্ত সন্ত্রাসীরা পুনরায় উত্তম কুমার মণ্ডলের বাড়িতে ডাকাতি করে মহিলাদের নির্যাতন

ও মারধর করে সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যায়। পরিবারটি এখন পথে বসেছে। চাঁদার দাবিতে ললিত কুমার মণ্ডল ও তার স্ত্রীকে উক্ত সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে তার কাছ থেকে ঘর বাড়ি জমি লিখিয়ে নিয়ে বাড়ি ঘর দখল করে। এরপর থেকে ললিত কুমার ও তার স্ত্রীর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। পার্শ্ববর্তী সিংজোড় গ্রামের স্বপন কুমার হালদারের নিকট এক লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করে। সে উহা দিতে অস্বীকার করলে তাকে গভীর রাতে হত্যার উদ্দেশ্যে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে স্ট্যাম্প ও ডেমিতে জোর পূর্বক সহি করে নেয়। ব্রজেন্দ্রনাথ ও নলিনী রায় এদের জমি জোর পূর্বক উক্ত সন্ত্রাসীরা মাটি কেটে কলার চাষ করায় তাদের বাধা দেওয়ায় হত্যা এবং অপহরণের হুমকি দেয়। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক সন্তোষ কুমার রায় (বাবুল) স্কুলে যাবার পথে তাকে হত্যা করার চেষ্টা চালায়, তাকে হত্যা করতে না পেরে এদেশে হিন্দুদের কোন অস্তিত্ব নেই বলে দম্ভোক্তি করে। নিরঞ্জন রায়ের ১০/১২ দিনের বাচ্চা দেওয়া দুধের গাভী ও একটি বলদ গরু পার্শ্ববর্তী মঠে জবাই করে চামড়া খুলে নেয়। এছাড়া পরীক্ষিত রায়, বনমালী মণ্ডল, রতিকান্ত মৃধা, নিরঞ্জন মণ্ডল, বিভূতি মণ্ডলসহ অনেকের কাছে চাঁদা দাবি করে ও কারো পুকুরের মাছ, কারো বাড়িতে ডাকাতি সহ অন্যায় অত্যাচার করে যাচ্ছে।.......'

উত্তমদের সংবাদ সম্মেলনের খবর পরদিন স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশিত হয়েছে। যদিও দৈনিক 'ইনকিলাব' তাদের চরিত্র অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক নির্যাতন সম্পর্কে খালেদা-নিজামীর জোট সরকারের অবস্থান সমর্থন করতে গিয়ে লিখেছে উত্তম কুমার মণ্ডলরা সংবাদ সম্মেলনে যা বলেছেন তা মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এ বিষয়ে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন কিছুই জানে না। উত্তম কুমার ভারতের 'দাদাদের' টাকা খেয়ে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য নির্যাতনের মিথ্যা খবর রটাচ্ছে।

যে পুলিশ প্রশাসনের বরাত দিয়ে 'ইনকিলাব' বাগেরহাটের সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের সংবাদকে মিথ্যা বলেছে সেই পুলিশের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এর তিনদিন পর উপদ্রুত এলাকায় গিয়ে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের বিবরণ শুনেছেন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গোপালপুরের সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে। তার এই সফরের সংবাদও ১৪ জুলাই ঢাকার দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে।

গত ২০ জুলাই উত্তম মণ্ডল ও তার পরিবারের সদস্যরা আমাদের কাছে নির্যাতনের বিবরণ দিয়েছেন। গণধর্ষণের কথা বলতে গিয়ে উত্তমের স্ত্রী রেখারাণী ও বোন অঞ্জনা বারবার কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। তারা হামলাকারীদের চেনেন। বলেছেন এরা সবাই জামাতে ইসলামীর সঙ্গে জড়িত। থানায় অভিযোগ জানাবার পর তারা সাধারণভাবে মারধর ও ডাকাতির অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছে, ধর্ষণের অভিযোগ থানা নথিবদ্ধ করেনি।

বাগেরহাটের আরেক হতভাগ্য হিন্দু নারী সবিতা রাণী। জুন মাসে ইউরোপ সফরের সময় ইন্টারনেটে দেখেছিলাম সবিতা রাণীকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। উত্তম মণ্ডলের কাছে জানতে চেয়েছিলাম সবিতা রাণীর ঘটনা তিনি জানে কি না, জানলে তার হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কি না।

উত্তম মণ্ডল সবিতা রাণীদের চেনেন। ঘটনার পর খোঁজখবর নেয়ার জন্য তাদের বাড়িতেও গিয়েছেন। বললেন, সবিতা রাণীর স্বামী এমনই দরিদ্র যে মাতৃহারা ছয় মাসের শিশু সন্তানটিকে এখন কীভাবে লালনপালন করবে সেই দুশ্চিন্তায় সে অস্থির। তার মামলার তদবির কে করবে? সবিতা রাণী ধর্ষণ ও হত্যার জন্য এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। খবরের কাগজে কোন ফলোআপও দেখিনি। সবিতা রাণীদের খবর এভাবেই হারিয়ে যায়।

একই ঘটনা ঘটেছে সাতক্ষীরার রাধারাণীদের ক্ষেত্রে। আমরা ২১ জুলাই প্রথমে

সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ থানার বিশ্বনাথপুর গ্রামে যাই। যেখানে এই গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ ধীরেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথদের বসতবাড়ি, রান্নাঘর, গোয়ালঘর, মন্দির যেখানে ছিল সে জায়গা এখন শূন্য প্রান্তর। কালীমন্দির ভাঙা ইটের স্তুপ ছাড়া বোঝার উপায় নেই যে কদিন আগেও এখানে পাঁচটি পরিবার বাস করত। ঘটনার তিন দিন পর ঢাকার শীর্ষস্থানীয় কয়েকটি দৈনিকে ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। ৮ জুলাই (২০০৩) জনকণ্ঠের সাতক্ষীরা প্রতিনিধি মিজানুর রহমান কালীগঞ্জ ঘুরে এসে 'সাতক্ষীরায় সন্ত্রাসীদের মধ্যরাতের তাণ্ডব' শিরোনামে এক প্রতিবেদনে লিখেছেন

'কালিগঞ্জের সন্ত্রাসীরা মধ্যরাতে ঘর থেকে ধরে সেঁজে কাঁটাবন দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যায় গৃহবধূ রাধারাণী সরকারকে। বেড়িবাঁধে নিয়ে চলে শ-ীলতাহানি ও নির্যাতন। 'ধর্মের বাবা' ডাকার কারণে একজন তার মুখে প্রস্রাব করে দেয়। অন্য দু'জন করে শরীর নিয়ে উল-াস। শনিবার মধ্যরাতে কালীগঞ্জের বিশ্বনাথপুর গ্রামে সন্ত্রাসীদের হামলা ও নির্যাতনের শিকার রাধ-ারানী এখন মানসিক ভারসাম্য হারাতে বসেছে। সন্ত্রাসী হামলায় হাত ভেঙ্গেছে গৃহবধূ বনলতার। দায়ের কোপে তার দু' পা এখন অচল। সর্বাঙ্গে এখন নির্যাতনের চিহ্ন। ৪০ উর্ধ্বে বয়সী আদুরীর হাতে, মাথায়, পিঠে ও নিতম্বে আঘাত নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নির্যাতনে তার ছেলে বাসুদেব এখন আহত। এই মর্মান্তিক ও বর্বর ঘটনা ঘটে গত শনিবার মধ্যরাতে ৪টি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর। সোমবার সাতক্ষীরা থেকে ৪৪ কিলোমিটার দূরের ঐ জনপদে গিয়ে দেখা যায়, সন্ত্রাসীদের লুটপাটের চিহ্ন। রবীন্দ্রনাথের ঘর পানিতে ভাসছে। পারিবারিক কালী মন্দিরটির ইট খুলে নেয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে যাওয়া কালিগঞ্জ সার্কেলের এএসপি শামসুল হুদা জনকণ্ঠকে বলেন, নির্যাতন, ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা সত্য। স্থানীয় জামায়াত কর্মী সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল গফুরের ইন্ধনে এই বর্বর ঘটনা ঘটেছে বলে তিনি সাংবাদিকদের জানান। তবে এই ঘটনায় মামলা হলেও কেউ গ্রেফতার হয়নি। অভিযোগ, মামলা রেকর্ড হয়েছে দুর্বল ধারায়।'

'যুগান্তর', 'সংবাদ' ও 'ভোরের কাগজ'-এর প্রতিবেদনও প্রায় একই ধরনের। ৮ জুলাই 'যুগান্তর'-এর প্রকাশিত প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'সাতক্ষীরায় সংখ্যালঘুর বাড়ি ও মন্দির ভাঙচুর ঃ দুই গৃহবধুর উপর পাশবিক নির্যাতন।' 'ভোরের কাগজ'-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল'৫ হিন্দু পরিবার উচ্ছেদ, মন্দির ভাঙচুর ঃ কালীগঞ্জের তারালি এখনও থমথমে, কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।' 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনের শিরোনাম হচ্ছে 'সাতক্ষীরার কালীগঞ্জে এবার বাড়িঘর ও পূজামণ্ডপ দখল করে খেলার মাঠ বানিয়েছে জোট সন্ত্রাসীরা'। প্রতিটি প্রতিবেদনে একটি কথা বলা হয়েছে পুলিশ ধর্ষণের অভিযোগ গ্রহণ করেনি, মূল আসামীদের গ্রেফতার করা হয়নি, মামলার ধারাগুলো খুবই দুর্বল।

বিশ্বনাথপুরে আমরা কথা বলেছি আ□ান্ত ধীরেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথসহ অন্যান্য গ্রামবাসীর সঙ্গে। তারালি ইউনিয়নের নির্বাচিত ইউপি সদস্য ডলি ইসলামের সঙ্গেও আমরা কথা বলেছি। ঘটনার সময় স্থানীয় এই জনপ্রতিনিধি উত্তরবঙ্গে ছিলেন। ঘটনার সংবাদ পেয়ে তিনি এলাকায় এসে নির্যাতিতদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি রাধারাণীর শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন দেখেছেন। তিনি বলেছেন রাধারাণীকে যে নৃশংসভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে এ বিষয়ে কারও কোন সন্দেহ থাকা উচিৎ নয়। ডলি ইসলাম বিএনপির থানা পর্যায়ের নেত্রী, জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের কালীগঞ্জ থানার সম্পাদিকা। তিনি জানিয়েছেন জামাতে ইসলামীর সন্ত্রাসীরা এ ঘটনা ঘটিয়েছে। স্থানীয় সাংসদ যদিও বিএনপির তিনি জামাতের সঙ্গেই ওঠাবসা করেন। যে কারণে এখন পর্যন্ত তিনি ঘটনাস্থলে আসেননি।

আমরা কালীগঞ্জের থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রাধারাণী, বনলতা ও আদুরীর সঙ্গে কথা বলেছি।

ঘটনার ষোলদিন পরও রাধারাণীর পক্ষে বিছানায় শোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসা অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। যখন আমরা ঘটনা সম্পর্কে জানতে চেয়েছি তরুণী গৃহবধু রাধারাণী কান্নায় ভেঙে পড়েছেন, অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারেননি। শেষে কান্না চেপে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। নরপশুরা তার মুখে প্রশ্রাব করেছে এ কথা বলতে গিয়ে রাধারাণী ক্ষোভে, অপমানে, বেদনায় প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন।

প্রথমে থানার পুলিশ রাধারাণীকে তার শাঁখা স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করিয়েছে ধর্ষণের কথা তিনি যেন কাউকে না বলেন, বললে তার স্বামীর বিপদ হবে। হাসপাতালে আনার পর ডাক্তার তাকে দেখে বলেছেন এমন নির্যাতন পশু ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। অথচ সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রের ডাক্তার রাধারাণী ধর্ষিত জেনেও পরীক্ষার জন্য তাকে সিভিল সার্জনের কাছে পাঠাননি। উল্টো রাধারাণীকে ভয় দেখিয়ে বলেছেন, ধর্ষণের ডাক্তারি পরীক্ষা নাকি ধর্ষণের চেয়ে বেশি যন্ত্রণাদায়ক। ডাক্তারের এই আচরণের কথা ডলি ইসলামও বলেছেন। রাধারাণীকে আমি বলেছিলাম, পুলিশ যখন ধর্ষণের অভিযোগ গ্রহণ করেনি আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে তো বলতে পারতেন। তাকে আমি পূর্ণিমাদের কথা বলেছিলাম পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তারা কীভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে জবানবন্দি দিয়েছে। রাধারাণী বলেছেন, 'আমি গ্রামের মেয়ে, লেখাপড়া জানি না। জীবনে কোনদিন পুলিশের সঙ্গে কথা বলিনি। পুলিশ আর ডাক্তার মানা করায় আমি ভয় পেয়েছিলাম। আমার সঙ্গে হাসপাতালে অনেক লোক কথা বলেছে। তাদের ভেতর কোন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন কিনা আমি জানি না।'

আমি রাধারাণীর কাছে জানতে চেয়েছি তাকে যে ধর্ষণ করা হয়েছে এ কথা তিনি আদালতে সবার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন কি না। রাধারাণী কোন রকম ইতস্তত না করেই বলেছেন, পারবেন। তারপর কাঁদতে কাঁদতে বলেছেন, 'আপনারা এর বিচার করেন, নাহয় আমাকে মেরে ফেলেন। আমার এ মুখ কীভাবে আমি সমাজে দেখাব? কীভাবে মানুষের সামনে গিয়ে দাঁড়াব?'

রাধারাণী যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন তার দুই জা আদুরী ও বনলতা সামনের আর পাশের বিছানায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। বনলতাকে হামলাকারীরা দা দিয়ে হাতে কুপিয়েছে। রাধারাণী আর আদুরীকে কিল, ঘুষি ও লাঠি দিয়ে মারার সময় ওরা বলেছে, 'শালা মালাউন, হয় জমি ছেড়ে ভারতে যা, নয় মর।'

প্রহারের এক পর্যায়ে রাধারাণী পালাতে চাইলে আজিবর, সোহরাব ও নূরুজ্জামান তাকে জাপটে ধরে টেনে হেঁচড়ে অল্প দূরে খেঁজুর বাগানে নিয়ে যায়। প্রথমে আজিবর এবং পরে সোহরাব ও নূরুজ্জামান একসঙ্গে তাকে ধর্ষণ করে। রাধারাণীর সারা গায়ে তখনও নরপশুদের কামড়ানো, খামচানো আর মারের দাগ মিলিয়ে যায়নি। মাথায় যেখানে লাঠির বাড়ি পড়েছে সে জায়গা তখনও ফুলেছিল। রাধারাণী ওদের পায়ে ধরে ধর্মের বাবা ডেকেও রেহাই পাননি। ধর্ষণের পর নরপশুরা ওর মুখে আর সারা গায়ে প্রশ্রাব করে চলে গেছে। এরপর রাধারাণীর ভাসুর দেবররা গ্রামবাসীর সহায়তায় দুই জা সহ রাধারানীকে কালীগঞ্জের সরকারি হাসপাতালে এনে ভর্তি করায়। রাধারাণীর রক্তক্ষরণ বন্ধ হতে বার দিন লেগেছে।

রাধারাণী বলেছেন হাসপাতালে ওদের তেমন কোন চিকিৎসা হয়নি। ষোলদিন পরও তার ব্যথা দূর হয়নি। ওষুধ বাইরে থেকে কিনে খেতে হয়। সুস্থ না হওয়া সত্ত্বেও ডাক্তার বলেছেন তাদের হাসপাতাল ছেড়ে চলে যেতে হবে। কারণ মারামারির রোগী নাকি সাত দিনের বেশি হাসপাতালে রাখার নিয়ম নেই।

হাসপাতালে শয্যাশায়ী বনলতা আর অদুরীও একই ধরনের বিবরণ দিয়েছেন। ওরা ছিল

দেড়শ থেকে দুশ। প্রায় সবার কাছে ছিল অস্ত্র। আদুরীকে মন্দিরে নিয়ে নৃশংসভাবে পিটিয়েছে। আদুরীর সামনে মন্দিরের কালী প্রতিমা ভেঙে পাশের ডোবায় ফেলে দিয়েছে। আদুরীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তারা এখন সরকারের কাছে কী চান। আদুরী আমার হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলেছেন, 'বাবা, আমরা বড় অসহায়, আমাদের বাঁচান। আমাদের বাঁচার মত বাঁচতে দেন। আমরা হিন্দু বলে কেউ আমাদের দাম দেয় না। ওরা আমাদের জোর করে ভারতে পাঠিয়ে দিতে চায়। আপনাদের পায়ে পড়ি আমাদের বাঁচান। ওরা আমাদের ঘরের সব কিছু লুট করে নিয়ে গেছে। আমাদের ঘরবাড়ি সব ভেঙে তুলে নিয়ে গেছে। এখন আমাদের কিছুই নেই। তবু আমরা আমাদের দেশে থাকতে চাই। আমরা আর কিছু চাই না, শুধু মানুষের মতো বাঁচতে চাই। আর ন্যায্য বিচার চাই। আমরা যাতে এ দেশে থাকতে পারি তার ব্যবস্থা করেন।'

বাগেরহাটের রেখারাণী, অঞ্জনা, সবিতারাণী আর সাতক্ষীরার রাধারাণী, আদুরী আর বনলতা বাংলাদেশে চলমান সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের সাম্প্রতিক শিকার। সরকারের কাছে তাদের এবং তাদের পরিবারের চাওয়া খুবই সামান্য। তারা কেউ ভারতে যেতে চায় না, তারা নিজেদের মাতৃভূমিতে থাকতে চায়, থাকার জন্য নিরাপত্তা চায় এবং যে নৃশংস নির্যাতন তাদের উপর করা হয়েছে তার বিচার চায়। শুধু নির্যাতিতরা নয়, গোপালপুর আর বিশ্বনাথপুরের হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল মানুষ এই নির্যাতনের জন্য যারা দায়ী তাদের বিচার চায়। উত্তম মণ্ডলের সঙ্গে অভিযোগ জানাবার জন্য মোরেলগঞ্জ থেকে বাগেরহাটের প্রেসক্লাব পর্যন্ত যারা এসেছিল তাদের ভেতর এলাকার মুসলমান প্রতিবেশীরাও ছিল। কালীগঞ্জের বিএনপি নেত্রী নির্বাচিত ইউপি সদস্য ডলি ইসলামও স্পষ্টভাবে বলেছেন তিনি রাধারাণী ধর্ষণের এবং তাঁর এলাকার সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের বিচার চান। রাধারাণীকে যে ধর্ষণ করা হয়েছে এ কথা তিনি প্রয়োজন হলে আদালতে গিয়েও বলবেন।

এ লেখাটি যখন লিখছি তখন পত্রিকায় দেখলাম আমাদের অর্থমন্ত্রী আবারও সাফাই গেয়েছেন বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্পর্কে। গত ২৩ জুলাই নিউইয়র্কে জোট সমর্থক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনাকালে অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান তাঁর নেত্রীর চিরাচরিত ভাষায় বলেছেন, 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘু বলে আলাদা কিছু নেই।' জোট সরকারের শীর্ষ নেতাদের এ ধরনের উক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যাখ্যা তারা যেভাবেই করুন না কেন বাস্তব সত্যের কোন হেরফের হবে না। সত্য হচ্ছে, জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে পরিকল্পিত ও ধারাবাহিকভাবে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন চলছে। সত্য হচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে চিরতরে নির্মূল করে জোট সরকার অচিরেই এটা প্রমাণ করে ছাড়বে যে, 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘু বলে আলাদা কিছু নেই।' এই আলোচনায় সরকার সংখ্যালঘুদের জন্য কী কী করছে তারও ফিরিস্তি দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেছেন 'বর্তমান সরকারের আমলে সব নাগরিক সমান ধর্মীয় অধিকার ভোগ করছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য আমরা কল্যাণমূলক কর্মসূচী হাতে নিয়েছি। সিলেটে তিন লাখ টাকা ব্যয়ে হিন্দুদের জন্য শ্মশানঘাট করা হয়েছে। সিলেটে অবস্থিত বাংলাদেশের একমাত্র সংস্কৃত কলেজের আমরা উন্নয়ন করেছি। বর্তমান সরকার দেশের সকল নাগরিকের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর।' (ইনকিলাব, ২৫ জুলাই ২০০৩)

সাইফুর রহমানদের সরকার একদিকে হিন্দুদের মারবার ব্যবস্থা করছে আরেক দিকে শ্মশান বানাবার জন্য টাকা দিচ্ছে। এ ধরনের নিষ্ঠুর রসিকতা খালেদা-নিজামীদের জোট সরকারের পক্ষেই সম্ভব। সাইফুর রহমান যখন শ্মশানের জন্য অর্থবরাদ্দের কথা বলছেন তখন তার বিপরীত ঘটনাটি ঘটছে সাতক্ষীরার শ্যামনগরে। সেখানকার শতাব্দীপ্রাচীন মহাশ্মশানটির উপর রাস্তা ও বাণিজ্যিক ইমারত নির্মাণের উদ্যোগের প্রতিবাদে ২১ জুলাই (২০০৩)

শ্যামনগরের হিন্দু সম্প্রদায় মিছিল করে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকপত্র প্রদান করেছেন। সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের সংবাদ জোট সরকারের নীতিনির্ধারক এবং তাদের তল্পিবাহক কলাম লিখিয়ে ও খবরের কাগজ যতই অস্বীকার করার চেষ্টা করুক না কেন বাস্তবে তা কিছুতেই গোপন করা যাচ্ছে না।

নির্যাতনের অনেক খবর পত্রিকায় যদিও ছাপা হচ্ছে না কিন্তু যতটুকু হচ্ছে তা থেকে এবং আমাদের মাঠপর্যায়ের পর্যবেক্ষণ থেকে যে সত্য বেরিয়ে আসে তা হল ১) ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোটের প্রধান শরিকরা সাম্প্রদায়িক নির্যাতন অব্যাহত রাখার নীতিতে অবিচল রয়েছে, ২) পুলিশ ও প্রশাসন নির্যাতনকারীদের রক্ষার জন্য তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগ যথাযথভাবে গ্রহণ করছে না এবং হত্যা ও ধর্ষণের মত নৃশংস অপরাধে যারা অভিযুক্ত তাদের গ্রেফতার করছে না, ৩) নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়াবার মত কোন সমন্বিত উদ্যোগ মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী রাজনৈতিক দল কিংবা সিভিল সমাজের পক্ষে এখনও গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি, ৪) সংখ্যালঘুদের অভিপ্রয়াণ অব্যাহত রয়েছে এবং ৫) সংখ্যালঘুদের পক্ষে আদালতে ন্যায়বিচার লাভের সুযোগ শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে।

এই সত্য সমগ্র জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক, বেদনাদায়ক ও অপমানজনক। সরকারের দুষ্কর্মের জন্য দেশ ও জনগণ দায়ী না হলেও যতদিন এ ধরনের নির্যাতন অব্যাহত থাকবে তার দায় আমরা কেউ এড়াতে পারি না। আমেরিকা ইরাকে যে গণহত্যা করেছে তার প্রতিবাদে চারদলীয় জোট ছাড়া ডান বাম নির্বিশেষে সব রাজনৈতিক দল রাস্তায় নেমে এসেছে, দিনের পর দিন হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভ করেছে। আমেরিকার নিকৃষ্টতম তাবেদার খালেদা-নিজামীদের সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী অধ্যুষিত জোট সরকার যে বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করার জন্য যে ধরনের 'এথনিক ক্লিনজিং' পরিচালনা করছে তার প্রতিবাদে রাজনৈতিক দলগুলো একজোট হয়ে একুশ মাসে একটি মিছিলও করেনি। এ লজ্জা আমাদের সকলের।

কালীগঞ্জ থেকে আমরা সাতক্ষীরা সদর থানার চিংড়ি ইউনিয়নের গাভা গ্রামে যাই। হিন্দুপ্রধান এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জামাতে ইসলামীর স্থানীয় নেতা হাবীবুর রহমানের সন্ত্রাসী বাহিনী গত কয়েক মাসে প্রায় একশ হিন্দু পরিবারকে তাদের জমি ও মাছের ঘের থেকে উৎখাত করে সেখানে তার দলের লোকজনদের বসিয়েছে বলে খবর বেরিয়েছে সাতক্ষীরার স্থানীয় পত্রিকা ও ঢাকার জাতীয় দৈনিকসমূহে। সর্বশেষ হামলা হয়েছে গত ২৪ জুন ২০০৩ তারিখে।

প্রবল বৃষ্টির কারণে আমরা গাভা গ্রামে প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান আবুল খায়েরের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমাদের আসার খবর শুনে বৃষ্টি, কাদা অগ্রাহ্য করে জমি ও জীবিকা থেকে উৎখাত হওয়া হিন্দু মৎসজীবী পরিবারের শতাধিক সদস্য ছুটে এসেছিল তাদের অভিযোগ জানাবার জন্য যারা সরকারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নিয়েই মরিচ্চাপ নদীর চরের খাস জমিতে ঘরবাড়ি বানিয়ে বছরের পর বছর ধরে রয়েছে। তাদের সঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যরাও ছিলেন। জামাতী চেয়ারম্যানের সন্ত্রাসী বাহিনীর নির্যাতনের কথা বলতে গিয়ে অধিকাংশই কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। মহিলাদের ভেতর কয়েকজন বিধবাও ছিলেন যারা গোটা পরিবারের একমাত্র উপর্জানক্ষম ব্যক্তি। তাদের অবস্থা সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত। এই বর্ষায় তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, কাজে যেতে দেয়া হয় না, যাদের ছোট ছোট মাছের ঘের ছিল সেখানকার সব মাছ লুট হয়ে গেছে, দিন কাটছে অর্ধাহারে আর অনাহারে। থানায় অভিযোগ জানিয়ে কোন লাভ হয়নি। গত মার্চ (২০০৩) থেকে জুন পর্যন্ত তাদের উপর তিনবার হামলা হয়েছে। হুমকি দেয়া হয়েছে ভিটেমাটি দেশ ছেড়ে চলে না গেলে তাদের আস্ত রাখা হবে না।

এই গ্রামের সুভদ্রা সরকার, নিমাইচন্দ্র, অমলা মণ্ডল, সতীশ সরকার, তরুলতা, রাধারাণী

ও আরতিসহ সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ২৬ জনের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। তারা জামাতে ইসলামীর স্থানীয় ক্যাডার শের আলী, রহিম, আবেদুল, করিম ও সাইফুল-াহ সহ ২৫/৩০ জনের নাম বলেছেন। স্থানীয় মুসলমান ইউপি সদস্যরাও একই কথা বলেছেন। নির্বাচিত ইউপি সদস্যরা চেয়ারম্যানের কাছে প্রতিবাদ করেও কোন ফল পাননি। তাদের বক্তব্য যেহেতু ফিংড়ি ইউনিয়ন হিন্দুপ্রধান অঞ্চল এবং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জামাতীসেই কারণে জামাতীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এলাকায় কোন হিন্দু রাখবে না।

আমরা যখন গাভা থেকে সাতক্ষীরা ফিরে যাব তখন বয়স্ক মহিলারা পর্যন্ত কাঁদতে কাঁদতে পায়ের ওপর পড়ে মাথা ঠুকেছেন, বলেছেন, 'আমরা আমাদের দেশ ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না। ছেলেমেয়ে নিয়ে না খেয়ে মরতে বসেছি। আপনারা আমাদের বাঁচান।' তাদের হৃদয়বিদারক কান্না ও আহাজারিতে যে কোন পাষাণও হৃদয়ের মানুষেরও চোখ শুকনো থাকার কথা নয়, কিন্তু জামাতী নরপশুরা এমনই নির্দয় যে কোন মাত্রায় নির্যাতন, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত করতে তাদের বুক এতটুকু কাঁপে না। এতিম ও ধর্ষিতার ফরিয়াদে আল-াহার আরশ পর্যন্ত কাঁপে, কিন্তু জামাতীরা তার কোন পরোয়া করে না।

আমরা যখন খুলনা ও সাতক্ষীরার সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের শিকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নির্যাতিত সদস্যদের জবানবন্দি রেকর্ড করছি তখন এই এলাকায় চলছিল পুলিশ, বিডিআর ও সামরিক বাহিনীর যৌথ অভিযান যার একমাত্র লক্ষ্য সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার। মোবাইল টেলিফোন নেটওয়ার্ক ও জলযান বন্ধ রেখে, কোন কোন এলাকায় বেলা তিনটার পর থেকে সান্ধ্য আইন জারি করে, বহু ঢাকঢোল পিটিয়ে হেলিকপ্টারে করে গোটা আকাশ চষে বেড়িয়েও মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও কালীগঞ্জের একজন সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীকেও গ্রেফতার করা যায়নি বা করা হয়নি, বিশেষ করে যে নামগুলো গত কয়েক মাস ধরে বার বার জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশিত হয়েছে। বরং অভিযান চলাকালেও যে তারা হামলা করেছে এবং হুমকি দিয়েছে সে অভিযোগ আমাদের জানিয়েছেন এলাকার ভুক্তভোগীরা। যেদিন বিকেলে আমরা কালীগঞ্জ হাসপাতালে রাধারাণীদের দেখতে গিয়েছিলাম সেদিনও সকালে জামাতী চেয়ারম্যানের বাহিনী এসে তাদের শাসিয়ে গেছে তারা যেন হাসপাতাল ছেড়ে চলে যায়। সাতক্ষীরা থেকে ঢাকা ফেরার দুদিন পর নির্যাতিত বনলতার স্কুল শিক্ষক পুত্র বিধানচন্দ্র সরকার আমাকে টেলিফোন করে জানিয়েছেন আমরা তাদের গ্রাম থেকে ঘুরে আসার পর গফুর চেয়ারম্যানের (প্রাক্তন) লোকজনরা নতুনভাবে তাদের হুমকি দিচ্ছে। নিষ্ফল জেনেও আমি তাকে বলেছি থানায় জানাতে, থানা অভিযোগ গ্রহণ না করলে স্থানীয় সাংবাদিকদের জানাতে। বিধানচন্দ্র তারপরও বললেন, 'আপনি আবার একবার আসুন'।

সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় বিপর্যস্ত গোটা বাংলাদেশ। একটি এলাকায় একাধিকবার যাওয়া আমাদের সামর্থ্যের বাইরে। তারপরও আমরা যাচ্ছি। সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের তাবৎ ঘটনা অস্বীকার করে বেগম খালেদা জিয়া কোন বিবেচনায় তিন মাস আগে বাগেরহাটের কোমরপুর গ্রামের ঠাকুরবাড়ির দুই ধর্ষিত গৃহবধুকে দু'লাখ টাকা দিয়েছেন আমি জানি না। তিনি যদি সাতক্ষীরায় তাঁর দলের স্থানীয় নেত্রী ডলি ইসলামদের কথাও শুনতেন তাহলেও সেখানকার সংখ্যালঘুরা উপর্যুপরি নির্যাতনের শিকার হত না।

খালেদা-নিজামীদের চার দলীয় জোট সরকার যতদিন ক্ষমতায় থাকবে রেখারাণী, অঞ্জনা ও রাধারাণীদের কান্না ও হাহাকার বন্ধ হবে বলে মনে হয় না।

জনকণ্ঠ, ২৭ জুলাই, ২০০৩

মহালছড়ি ট্র্যাজেডি
দীপায়ন খীসা

২৬ আগস্ট ২০০৩ খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়িতে ঘটে গেল এক ভয়াবহ তাণ্ডবলীলা, পার্বত্য অঞ্চলের ইতিহাসে সংঘটিত হলো আরেক কালো অধ্যায়, ভূলুণ্ঠিত হলো মানবতা। ইতিহাসের পেছনে আবারও চোখ ফেরাতে হচ্ছে নানিয়ারচর, লোগাং, লংগদু, কলমপতি গণহত্যাগুলো আবার ভাসছে মানসপটে, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, সেনাবাহিনীর তাণ্ডব, ঘরছাড়া মানুষ, শরণার্থীর দল, সেই ভয়ার্ত দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে বারবার। ইতিহাসের বর্বর অধ্যায়গুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটল মহালছড়িতে। সভ্যতার চাকাকে পশ্চাৎমুখী করা হলো আবার, অনেকেই ভুলে যেতে বসেছিল সেই বিভীষিকাময় দিনগুলোর কথা। নতুন করে সাজাতে শুরু করেছিল তাদের জীবন। একটা চরম সত্য আবারও পাহাড়ী জনগোষ্ঠীকে জানিয়ে দেয়া হলো 'সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলো তো তোমাদের মূল জীবন, জীবন তো তোমাদের জন্য নয়, তোমাদের জন্য হচ্ছে জ্বালাও-পোড়াও, ধ্বংসযজ্ঞ, হত্যা, লুণ্ঠন।' ২৬ আগস্ট মহালছড়ি উপজেলা সদরসহ পার্শ্ববর্তী ৩/৪ কি.মি. এলাকা জুড়ে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ করেছে মনুষ্যরূপী পশুদের উন্মাদনা। চোখের সামনেই ভস্মীভূত হয়ে গেল দীর্ঘদিনের গড়ে তোলা ঘরবাড়ি। ঘটনার ভয়াবহতা এতই তীব্র যে দূর থেকে বোঝা কঠিন, এমনকি পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদগুলোর চেয়েও অনেকগুণ হৃদয়বিদারক। ৭টি গ্রামের ২ শতাধিক ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে বৌদ্ধ বিহার, বৌদ্ধমূর্তি ভাঙচুর করা হয়েছে। খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ২ জন কলেজ ছাত্রীর। খুন হয়েছেন মহালছড়ির সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান, এলাকার অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব বিনোদ বিহারী খীসা, হাজার হাজার মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দিন কাটাচ্ছে খোলা আকাশের নিচে। নিজ ভিটামাটিতে ফিরে আসার সাহস পাচ্ছে না, সহায়-সম্বলহীন, সবকিছু হারানো এই মানুষদের জীবন সত্যিই কি তাদের? তাদের মনে তাই উদয় হতে পারে 'জীবন এখনও আমাদের নয়।' কি ঘটেছিল?

২৭ আগস্ট পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হলো, মহালছড়িতে পাহাড়ি-বাঙালি সংঘর্ষ, কয়েকটি গ্রাম ভস্মীভূত, ১ জন নিহত, আহত কয়েকজন। পত্রিকার তথ্য অনুসারে জানা যায়, ২৫ তারিখ রূপন মহাজন নামে এক ব্যবসায়ীকে সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে। তার জের ধরে সেখানকার বাঙালিরা ২৬ আগস্ট সড়ক অবরোধের ডাক দেয়। অবরোধ চলাকালে পাহাড়ি অধ্যুষিত এলাকায় বাঙালিরা পিকেটিং করতে এলে তাদের ওপর কে বা কারা গুলি ছোঁড়ে, এতে বাঙালি জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং পাহাড়ী বসতিগুলোর ওপর চড়াও হয়। একের পর এক গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়।

পত্রিকার ভাষায় উত্তেজিত কিংবা বিক্ষুব্ধ জনতা যে মহৎ কর্মগুলো (?) সুসম্পন্ন করেছে তারপর কি তাদের উত্তেজিত অথবা বিক্ষুব্ধ বলা যায়। কেন তারা উত্তেজিত কিংবা বিক্ষুব্ধ হলেন? রূপন মহাজনকে অপহরণ করা হয়েছে। যদি সেই ব্যক্তি অপহরণই হয়ে থাকেন তাহলে তাকে উদ্ধার করার জন্য জনতাকে এভাবে মাঠে নামতে হবে কেন? সেখানে কি প্রশাসন ব্যবস্থা নেই? রূপন মহাজন অপহৃত হয়েছেন সন্ত্রাসীদের দ্বারা। পাহাড়ি জনগণের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগের সঙ্গে অপহরণের কি বা যোগসূত্র? পাহাড়ী জনগণের গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েই কি উত্তেজিত জনতা ক্ষান্ত হলেন? নারী অপহরণ, লুটপাট, মানুষ খুন করার পরই কি জনতার বিক্ষোভ প্রশমিত হলো? কাজেই পত্রিকায় যাদের উত্তেজিত জনতা বলা হয়েছে তারা সে সংজ্ঞায় পড়েন না। তাদের পরিচয় দুর্বৃত্ত, দাঙ্গাবাজ, পাহাড়ী জাতি বিদ্বেষী, মানবতা ও এই

সভ্যতার কলঙ্ক। কি করেছিল সেদিন প্রশাসন?

মহালছড়িতে ২৬ আগস্ট প্রশাসন কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়েছিল? তারা কি নিরোর বাঁশি বাজাচ্ছিল? একের পর এক গ্রাম পোড়ানো হলো অথচ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, প্রশাসনিক কর্মকর্তারা কিছুই করলেন না? নাকি তারাও স্থানীয় বাঙালিদের মতো উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিল? দুর্বৃত্তরা, দাঙ্গাবাজরা না হয় ২/১টি ঘরে প্রশাসনের অগোচরে অগ্নিসংযোগ করতে পারে, লুটপাট করতে পারে। কিন্তু গ্রামের পর গ্রাম জ্বারিয়ে দেয়া হলো, প্রশাসন কোন পদক্ষেপ নিতে পারল না? তা কীভাবে মেনে নেয়া যায়? তাহলে পাহাড়ীরা ধরে নেবে এই প্রশাসন শুধু বাঙালিদের নিরাপত্তা দেয়, প্রশাসন পাহাড়ী জনগণের নিরাপত্তা বিধান করার জন্য তৈরি হয়নি। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কি পাহাড়ী জনগণের জন্য দোষের কাজ হবে?

আবারও বিতর্কিত ভূমিকায় সেনাবাহিনী

মহালছড়ি ঘটনার সঙ্গে সেনাবাহিনীর ভূমিকা রয়েই গেল। প্রত্যক্ষদর্শীদের তথ্য থেকে জানা গেছে, সেনাবাহিনীর পেছনেই অগ্নিসংযোগকারী দুর্বৃত্তরা পাহাড়ি গ্রামগুলোতে প্রবেশ করেছে। সেনাবাহিনী রূপন মহাজনের খোঁজে পাহাড়ি গ্রামগুলোতে অভিযানে ব্যস্ত, আর তাদের ছত্রছায়ায় থেকে দুর্বৃত্তরা অগ্নিসংযোগ করেছে। এ এক মনিকাঞ্চন যোগ্য, সেনাবাহিনী সন্ত্রাসী খোঁজ করবে আর দাঙ্গাবাজরা তাদের কুকর্ম সম্পন্ন করবে। মূলত পাহাড়ি গ্রামগুলোতে সেনাবাহিনীর উপস্থিতির কারণে পাহাড়ীরা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহস পাননি। ঘটনার পরপরই সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিরা মহালছড়িতে উড়ে গেলেন। বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর চিফ অফ জেনারেল স্টাফ, চট্টগ্রামের জিওসি, খাগড়াছড়ির ব্রিগেডিয়ার মহালছড়ি পরিদর্শনে গেলেন ২৭ আগস্ট, তারপর সেনাবাহিনীর জনসংযোগ দপ্তর পত্রিকায় বিবৃতি দিল মহালছড়ি পরিস্থিতি শান্ত। সেনা কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবার পিছু ২ হাজার টাকা, রান্না করা ও শুকনো খাবার পরিবেশন করেছে। পাহাড়ী গ্রামগুলোতে অস্থায়ী সেনা ছাউনি বসানো হয়েছে। সেনাবাহিনীর এ অতি বেশি উৎসাহী তৎপরতা, পাহাড়ী জনগণের প্রতি অতি দরদি মনোভাব তাদের ব্যর্থতাকে আড়াল করারই ব্যর্থ প্রয়াস নয় কি?

নির্লিপ্ত সরকারের উচ্চ মহল

সাধারণ বড় কোন বিপর্যয়ের পর যা দেখা যায়। মহালছড়িতে তার ব্যতি□ম দেখা গেল। ছুটে গেলেন না কোন মন্ত্রী কিংবা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কোন কর্মকর্তা। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেন না পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মণি স্বপন দেওয়ান। সরকারের এই নির্লিপ্ততা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। তাহলে কি দেশে কোন সরকার নেই? যদি থাকে তাদের দায়-দায়িত্ব কি? পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর দুর্দিনে সরকারের এই নির্লিপ্ত আচরণ তাদের দমনমুখী নীতিরই বহিঃপ্রকাশ।

পাহাড়ী রাজাদের কাণ্ড

৩০ আগস্ট পার্বত্য অঞ্চলের মং সার্কেল, চাকমা সার্কেল ও বোমাং সার্কেলের চিফরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। প্রধানমন্ত্রীর দর্শন পেয়ে তারা বিগলিত হয়েছেন। বিটিভিতে দেখা গেছে, রাজাদের বাণিজ্যিক হাসি হাসি বদন। ৩১ আগস্ট দৈনিক 'সংবাদ' থেকে জানা গেল, 'উপজাতি প্রধানগণ প্রধানমন্ত্রীকে পার্বত্য অঞ্চলে সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। উপজাতি প্রধান হেডম্যানদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি সং□ান্ত এক প্রস্তাবের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংশি-ষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক

যাচাই-বাছাইয়ের পর এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।' কি অদ্ভুত রাজকীয় আচরণ? কি বিচিত্র দাবি (!) দখল মহালছড়িতে হাজার হাজার পাহাড়ী জনগণ চরম আতঙ্ক ও দুর্ভোগের মধ্যে সহায়-সম্বলহীনভাবে দিন কাটাচ্ছে তখন রাজাদের এ কোন ধরনের দায়িত্বের পরিচয়? প্রধানমন্ত্রীর দরবারে ছুটে না এসে তাদের দায়িত্ব ছিল মহালছড়িতে ছুটে যাওয়া। সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দাবি জানালেন; কিন্তু মহালছড়ি ঘটনার প্রতিবাদ করলেন না। নিন্দা জানালেন না রাজাদের এই সুবিধাবাদী আচরণ পাহাড়ি জনতার সঙ্গে তাদের প্রতারণার এক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

অধিক মৌন নাগরিক সমাজ, রাজনীতিবিদরা

সরকার নির্লিপ্ত, তার চেয়ে অধিক মৌন দেশের নাগরিক সমাজ। যারা সৃজনশীল চিন্তা করেন। যাদের বিবেক জাতিকে জাগ্রত করে, পথ দেখায়, সেই নাগরিক সমাজ, প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদদের মৌনতা পাহাড়ি জনগণকে ভাবিয়ে তোলে। এই নাগরিক সমাজ, বুদ্ধিজীবীরা তো শামসুন্নাহার হলে পুলিশি তাণ্ডবে ফেটে পড়েন, নিন্দার ঝড় তোলেন, আন্দোলনকারীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। কিন্তু মহালছড়িতে এত বড় ট্র্যাজেডির পরও কেন তাদের এই মৌনতা। প্রধান বিরোধীদলের কোন ঊর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দও মহালছড়ি ঘটনার নিন্দা জানালেন না। প্রগতিশীল রাজনীতিবিদরাও নিশ্চুপ। এ বড় বিচিত্র অভিজ্ঞতা?

সংবাদ, ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩

'সিংহবাড়ী'র আন্দোলন ও অর্পিত সম্পত্তি আইন

রাশেদ খান মেনন

সিলেটে 'সিংহবাড়ী' নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে আন্দোলন চলছে। 'অর্পিত সম্পত্তি আইন প্রতিরোধ, সিলেট'-এর নেতৃত্বে এই আন্দোলন চলছে। এতে যুক্ত আছেন সিলেটের নির্বাচিত মেয়রসহ গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন, শিক্ষক-ছাত্র, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, সিলেটের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। তারা সভা-সমাবেশ করেছেন, করেছেন মহাসমাবেশ। এখন বিষয়টি জাতীয় পর্যায়ে উত্থাপনের জন্য আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ঢাকায় আসছেন জাতীয় রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার জন্য। ওই আলোচনার পর আন্দোলন ধর্মঘট-হরতালের পর্যায়ে চলে যেতে পারে। 'সিংহবাড়ী' ইস্যু নিয়ে সিলেটের মানুষ ও জেলা প্রশাসন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেছে। ওই 'সিংহবাড়ী' ইস্যুকে কেন্দ্র করে সিলেটের জেলা প্রশাসক ইতোমধ্যে খলনায়কে পরিণত হয়েছেন। তিনি কেবল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-উপাচার্যকেই হুমকি-ধামকি দিয়ে শান্ত হননি এমনকি প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদার সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত মেয়রকেও চোখ রাঙিয়েছেন। অবশ্য তার এই ব্যবহারের পেছনে মদদ রয়েছে ক্ষমতাসীন চার দল।

এসব অভিযোগ সিংহবাড়ী ইস্যুতে আন্দোলনকারীদের। তারা বলছেন, জেলা প্রশাসক কেবল এ ক্ষেত্রে আইনেরই ব্যত্যয় ঘটাননি, 'সিংহবাড়ী'র দখল নেয়ার জন্য মরিয়া ভূমিগ্রাসীদের পক্ষ নিয়ে প্রকাশ্যে দুর্নীতির এক চরম নজির সৃষ্টি করেছেন।

সিলেটবাসীকে আলোড়নকারী এই 'সিংহবাড়ী' বিষয়টি আসলে কী? সাধারণভাবে দেখতে

গেলে বিষয়টি সিলেটের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ওই 'সিংহবাড়ী'র লিজ বাতিল ও সেখানে ভোগদখলরত পরিবারদের উচ্ছেদ করার একটা অপচেষ্টা নিয়ে জেলার প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিরোধের ঘটনা বলে প্রতীয়মান হয়। এ ধরনের বিরোধ এ দেশের প্রশাসন ও সমাজে এত হরহামেশা ঘটে যে, তা নিয়ে সংশি-ষ্ট পক্ষও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীলরা ছাড়া অন্য কেউ বিশেষ বিচলিত হন না। কিন্তু সিলেটের সিংহবাড়ী নিয়ে রীতিমতো একটা আন্দোলন গড়ে উঠে এবং তাতে সিলেট শহরের এবং এখন বৃহত্তর সিলেটের সব সচেতন মানুষ আগ্রহী ও অনেকেই তার অংশীদার। সুতরাং 'সিংহবাড়ী'র ঘটনাকে একটি 'অর্পিত সম্পত্তির লিজ বাতিল ও উচ্ছেদ নোটিশ নিয়ে সাধারণ একটি বিরোধ বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। এর পেছনের বিশেষ কারণটি তাই দেখা দরকার।

আর এই বিশেষ কারণ হলো প্রথমত, 'সিংহবাড়ী' নিয়ে সিলেট জেলা প্রশাসন যে অন্যায় আচরণ করেছে তা সিলেটবাসীর ঐতিহ্য ও গর্বে আঘাত দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, এ ঘটনা আইন করে বাতিলকৃত অর্পিত সম্পত্তি আইন দেশে আবার নতুন করে যে অনাচার শুরু করেছে জনগণ তা আর গ্রহণ করতে রাজি নয়। এ কারণেই 'সিংহবাড়ী' নিয়ে আন্দোলনের সংস্থাটির নাম দেয়া হয়েছে, 'অর্পিত সম্পত্তি প্রতিরোধ আন্দোলন, সিলেট' হিসেবে। অর্থাৎ এটা কেবল সিলেটবাসীর কোনো বিশেষ ও একক আন্দোলন নয়, অর্পিত সম্পত্তি নিয়ে সারা দেশে যে আন্দোলন রয়েছে তারই অংশ।

প্রথম 'সিংহবাড়ী' প্রসঙ্গে আসা যাক। ২০০ বছর আগে ওই বাড়ির পত্তন করেছিলেন জনৈক গোবিন্দ নারায়ণ সিং। বসতবাটি হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠা করলেও 'সিংহবাড়ী' তাদের নিছক বসতবাটি থাকেনি। সিলেটের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে তার অস্তিত্ব মিশে গেছে। সিলেটে এসে এ বাড়িতেই অতিথি হয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলাদেশের জাতীয় কবি নজরুলও সিলেটে এসে এ বাড়িতে উঠেছিলেন। অন্য কোনো দেশ হলে কেবল এই ঐতিহাসিক কারণেই 'সিংহবাড়ী' সুরক্ষার ব্যবস্থা হতো। আর কিছু না হোক, সেখানে এই ইতিহাস বিকৃত করে নিদেনপক্ষে ফলক (Plaque) টাঙানো হতো। কিন্তু আমাদের আরো অনেক ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক নিদর্শনের মতো 'সিংহবাড়ী' সে ধরনের কোনো উদ্যোগের বাইরেই রয়ে গেছে। বরং অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে 'সিংহবাড়ী' দখল করে স্বার্থবাদীদের সম্পত্তির ক্ষুধা কীভাবে মেটানো যায় তার চেষ্টা হয়েছে বারবার।

বাংলাদেশের আরো অনেক সংখ্যালঘু পরিবারের মতো 'সিংহবাড়ী'র উত্তরাধিকারীদের অনেকেই আর এ দেশে থাকেননি বা থাকতে পারেননি। ফলে শত্রু সম্পত্তির নাম বদলে অর্পিত সম্পত্তি নামে যে বৈষম্যমূলক আইন বাংলাদেশ আমলেও বহাল তবিয়তে সংখ্যালঘু সম্পত্তি নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, সে আইনেই ওই 'সিংহবাড়ী'র দুই-তৃতীয়াংশ অর্পিত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। ওই আইন অনুসারে সরকার তার লিজদানের ব্যবস্থা করেছে। এখানে 'সি-ংহবাড়ী'র উত্তরাধিকারীদের সৌভাগ্য যে ওই অর্পিত সম্পত্তি আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার একটা ঘোষণা দেন যে, 'কোনো এজমালি সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তিতে পরিণত হলে তার বন্দোবস্ত বা লিজ ওই সম্পত্তির অংশীদাররা পাবে।' সে ভিত্তিতেই 'সি-ংহবাড়ী'র এ দেশের থেকে যাওয়া অংশীদাররা গত ২২ বছর যাবৎ ওই সম্পত্তির অর্পিত অংশের ভোগদখল করে আসছেন এবং সেটা নিয়মিত সরকারি খাজনা পরিশোধের বিনিময়ে। কিন্তু ওই ঐতিহ্যবাহী সম্পত্তির ওপর অর্পিত সম্পত্তির যে সিল পড়ে গেছে, তাতে ওই 'সিংহবাড়ী' নিয়ে নানা চান্তের অবসান হয়নি। তথ্য মতে, প্রথমে 'সিংহবাড়ীকে বন্দোবস্ত নিয়ে মাদ্রাসা বানানোর চেষ্টা হয়। এতে সুবিধা ছিল এই যে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড থাকায় কেউ কিছু বলতে সাহসী হবে না। কিন্তু ভূমি বোর্ড প্রশাসন পর্যন্ত দেন-দরবার করায় ওই 'সিংহবাড়ী'

'আজিজিয়া মহিলা মাদ্রাসা' হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

সেটা ছিল ১৯৮২ সালের কথা। এরপর ১৯৯৫ সালে 'সিংহবাড়ী'র অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত অংশের মৃত মালিকদের জীবিত দেখিয়ে জাল আমমোক্তার নামায় সমস্ত সম্পত্তিও গ্রাস করে নেয়ার চেষ্টা হয় আরেক দফা। সেখান থেকে রক্ষা পেতে জাতীয় সংবাদপত্রসমূহের সাহায্য নিতে হয় এবং রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ করতে হয় ঘটনায়।

এবার সরকারপক্ষ নিজেই মাঠে নেমেছে। গত সরকারের আমলে অর্পিত সম্পত্তি আইনের জায়গায় অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন চালু হয় ২০০১ সালে। ওই আইনে স্থির হয় যে, এযাবৎ সরকার কর্তৃক অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত সকল সম্পত্তি গেজেটভুক্ত করে প্রকাশ করা হবে। যদি কেউ সেই সম্পত্তি নিজের বলে দাবি করেন তবে এতদসম্পর্কিত ট্রাইব্যুনালে আবেদন করে তার রায় পেলে সে সম্পত্তি অবমুক্ত করতে পারবেন। গেজেটভুক্ত অন্যান্য সম্পত্তি আর লিজ না দিয়ে সরকার তা বিক্রি করবে। ওই আইনে নতুন কোনো সম্পত্তি আর অর্পিত সম্পত্তি হবে না বলে বিধান করা হয়। কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেই অর্পিত সম্পত্তিসমূহকে গেজেটভুক্ত করার বিধান স্থগিত করলে অর্পিত সম্পত্তি নিয়ে আরেক দফা নতুন খেলার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং 'সিংহবাড়ী'র ক্ষেত্রে ২২ বছর ধরে লিজ ভোগকারী ওই বাড়ির বৈধ অংশীদারদের খাজনা দেয়ার বারবার আবেদনে কোনো উত্তর না দিয়ে জেলা প্রশাসন ওই সম্পত্তি জনৈক মাসুদ চকে লিজ দিয়ে দেয়। বিষয়টি সংগোপন রাখার জন্য ওই লিজ বাতিলের কোনো নোটিশও ভোগদখলকারী লিজগ্রহীতাদের দেয়া হয়নি। বরং তাদের সাত দিনের মধ্যে ওই বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয় জেলা প্রশাসন।

'সিংহবাড়ী'র বৈধ অংশীদার উত্তরাধিকারীরা স্বাভাবিকভাবেই তাদের পৈতৃক ভিটা থেকে উচ্ছেদ হতে রাজি হননি। অর্পিত সম্পত্তি আইন বলেই তারাই লিজ পাওয়ার একমাত্র বৈধ অধিকারী। সুতরাং তারা সিলেটবাসীর বিবেকের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন। আর সেই বিবেকের সাড়া দিয়ে সিলেটবাসীও এগিয়ে এসেছেন 'সিংহবাড়ী' রক্ষা করতে। তবে এখানে দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ অর্পিত সম্পত্তি আইনের নতুন অপপ্রয়োগের বিষয়টি সিলেটবাসীকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে, এ কারণেই 'সিংহবাড়ী' আন্দোলন পরিচালনাকারীরা 'অর্পিত সম্পত্তি প্রতিরোধ আন্দোলন, সিলেট' বলে অভিহিত করেছেন।

আসলে অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিলের দাবিতে আন্দোলন দীর্ঘদিনের। বলা চলে, বাংলাদেশের শুরু থেকেই। বাংলাদেশের প্রথম আওয়ামী লীগ সরকার পাকিস্তান আমলের শত্রু সম্পত্তি আইনটি 'অর্পিত সম্পত্তি আইন' নামে বহাল রাখে এবং গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই আওয়ামী লীগ শাসনের সুফলভোগীরা সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি নিজেদের করে নেয়ার খেলায় মেতে উঠেছিল। আর সে কারণেই ওই আইনের পরিবর্তন করা হয়নি। পরবর্তী সময় অর্পিত সম্পত্তি নতুন নামের ওই আইন এ দেশের সংখ্যালঘুদের জন্য রীতিমতো মরণফাঁদ হয়ে ওঠে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ আবুল বারাকাত তার সম্পাদিত An enquiry into causes and consequence of deprivation of Hindu minorities in Bangladesh through the vested poverty Act. বইতে দেখিয়েছেন যে, বাংলাদেশের হিন্দু পরিবারের প্রায় ১০ লাখ (৯ লাখ ২৫ হাজার ৫০ পরিবার), যা সমগ্র হিন্দু জনগোষ্ঠীর ৪০ ভাগ এই শত্রু বা অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৭ লাখ ৪৮ হাজার ৮৫০টি পরিবারকে জমি থেকে, ২ লাখ ৫১ হাজার ৮৫টি পরিবারকে বসতবাটি থেকে, ৪৮ হাজার ৪৫৫টি পরিবারকে তাদের বাগানের জমি থেকে, ৭৯ হাজার ২৯০ জনকে পুকুর থেকে, ৪ হাজার ৪০৫ জনকে তাদের বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় সম্পত্তি এবং ১ লাখ ১৪ হাজার ৫৩০ জনকে অন্যান্য ধরনের জমি থেকে উচ্ছেদ হতে হয়েছে। ড. বারাকাত আরো হিসাব করে

দেখিয়েছেন, শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে সংখ্যালঘু সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ হওয়া এসব জমির মূল্য যোগ করলে দাঁড়ায় ৯ লাখ ৪৪ হাজার ৬৪০ মিলিয়ন টাকা, যা দেশের জাতীয় গড় উৎপাদনের ৫৫ ভাগ এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ টাকার পাঁচগুণ সমান।

তবে অর্পিত সম্পত্তি আইনের বদৌলতে দেশের সংখ্যালঘুরা জমি-বসতবাড়ি থেকেই উচ্ছেদ হয়নি, এ জন্য তাদের রাজনৈতিক-সামাজিক হয়রানি, হামলা, মামলা-মোকদ্দমার সম্মুখীন হতে হয়েছে বারবার। অনেকেই দেশ ছাড়া হয়েছেন। ড. বারাকাতের বইয়ে সংখ্যালঘুদের আউট-মাইগ্রেশনের জেলাওয়ারি চিত্র দেখানো হয়েছে। আদমশুমারিতে দেশের বিভিন্ন জেলার সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

অর্পিত সম্পত্তির কালাকানুনের প্রয়োগ এ দেশের সংখ্যালঘুদের ভিটেমাটি ছাড়া, দেশ ছাড়ার পাশাপাশি মানসিক জগতেও বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। নিজ দেশে পরবাসী এই জীবন যেকোনো সংখ্যালঘুর জন্য বিপর্যয়কর। এ দেশে হিন্দু, খ্রিস্টান, আদিবাসী সংখ্যালঘুদের জন্য সে বিপর্যয়ই ঘটেছে। আর এই বিচ্ছিন্নতাবোধের পরিণাম সবার জানা। অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেমন সাম্প্রদায়িকতা, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছে, তার বিপরীতেও সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ভিত্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছে।

অর্পিত সম্পত্তি আইনে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এই বৈষম্যমূলক ও নিপীড়ক আচরণের এই প্রেক্ষিতে ওই আইন বাতিলের দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ের সরকার ওই আইনের অপপ্রয়োগ রোধে এখানে-ওখানে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু তাতে সমস্যা সমাধানে ইতরবিশেষ কিছু হয়নি। এযাবৎ সব সরকারই অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিলের প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে তা কার্যকর করতে উদ্যোগী হয়নি। শেষ পর্যন্ত বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলে তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ওই আইন বাতিলের একটা উদ্যোগ নেয়া হয়। সংসদের স্থায়ী কমিটিতে বিরোধী বিএনপি ও জাতীয় পার্টির সদস্যরা এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করলেও এতদসম্পর্কিত আইন আলোর মুখ দেখতে প্রায় পাঁচ বছর লেগে যায়। আওয়ামী শাসনের শেষ ভাগে এসে অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল করে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন নামে ২০০১ সালের একটি আইন জাতীয় সংসদে পাস হয়। এ আইনের বিভিন্ন ধারা নিয়েও প্রশ্ন আছে এবং সেসব সংশোধনেরও দাবি উঠেছে। কিন্তু ওই আইন পুরোপুরি কার্যকর হওয়ার আগেই সরকার পরিবর্তন ঘটলে আইনে বর্ণিত অর্পিত সম্পত্তি গেজেটভুক্তির আদেশ স্থগিত করায় সম্পূর্ণ আইনটিই অকার্যকর হয়ে পড়েছে। এখন আবার জেলা প্রশাসকরা অর্পিত সম্পত্তির ভাগ্য নির্ধারণ করছেন। সেই একই দুর্নীতি-দখলদারী সংখ্যালঘু ভূমি-সম্পত্তি গ্রাসের খেলা শুরু হয়েছে। 'সিংহবাড়ী'র ক্ষেত্রে সিলেট জেলা প্রশাসন যে ভূমিকা নিয়েছে সেটা অর্পিত সম্পর্কিত আইন বর্তমানে যে পরিণতি নিয়েছে তারই ফলশ্রুতি।

এ ঘটনা অর্পিত সম্পত্তি আইন সম্পর্কিত জোট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ করে। কিন্তু এ সরকারও তাদের পূর্বাপর দেয়া বিভিন্ন প্রতিশ্রুতিতে অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিলসহ এর অপপ্রয়োগ রোধের কথা বলেছে। বিগত জাতীয় সংসদে ওই আইন বাতিল ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের বিষয়ে তাদের দলের পক্ষ থেকে দলীয় সাংসদ তার ঐকমত্যের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। তা হলে ওই মরা আইন নিয়ে আর টানাটানি কেন। এ ধরনের আইন সিলেটের জেলা প্রশাসকের মতো ব্যক্তির হাতে পড়লে তার পরিণতিতে কী রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে সিলেটের এই আন্দোলন তার প্রমাণ। সে জন্য সরকারের উচিত ছিল দ্রুত এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসা। কিন্তু সেটা হয়নি।

অতীতে বহু কথা হয়েছে। আমি নিজে সংসদে যেমন কথা বলেছি, কলামেও লিখেছি। অন্যারাও লিখেছেন। আন্দোলন হয়েছে। সংসদেও আইন পাস হয়েছে। সুতরাং ওই আইন নিয়ে সকল হয়রানি-জুলুমের এখনই অবসান হওয়া দরকার। দরকার নতুন আইনটি কার্যকর করা। ওই আইন প্রয়োগের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আইনটিকে আরো উন্নত করার জন্য সংশোধনীর প্রয়োজন দেখা দিলে তাও করতে হবে।

আর সিলেটের 'সিংহবাড়ী' নিয়ে যা ঘটাছে তা কেবল অন্যায়, অমানবিক ও বেআইনিই নয়, রীতিমতো আমলাতান্ত্রিক ঔদ্ধত্য। আইন ও প্রশাসনিক ক্ষমতার এ ধরনের অপপ্রয়োগ বন্ধ করতে হবে। 'সিংহবাড়ী' রক্ষায় আন্দোলনকারীরা যে দাবি তুলে ধরেছেন তার যৌক্তিকতা সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং দেরি না করে তাদের কথা শোনাই বরং বাঞ্ছনীয়।

প্রথম আলো, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৩

বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা আর কতদিন আগুনে পুড়ে মরবে

শাহরিয়ার কবির

আঠার নবেম্বর মধ্যরাতে চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে ১১ জন মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। সাধনপুর গ্রামের তেজেন্দ্র শীলের পরিবারের মাত্র একজন সদস্য এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড থেকে প্রাণে বাঁচতে পেরেছে, বাকিরা সবাই পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে। নিহতদের তালিকায় নারীপুরুষ নির্বিশেষে ৭০ বছরের বৃদ্ধ থেকে ৪ দিনের শিশুও রয়েছে।

বাঁশখালীর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে পুলিশের ডিআইজি মন্তব্য করেছেন, 'আমার চাকরি জীবনে এমন হৃদয়বিদারক ঘটনা আর দেখিনি।' তারপরই তিনি বলেছেন, 'ডাকাতি করতে না পারায় ১১ জন অসহায় মানুষকে আগুন দিয়ে এভাবে হত্যা করা একটি জঘন্য ঘটনা।' চট্টগ্রামের এসপিও বলেছেন, 'ডাকাত দল ডাকাতি করতে ব্যর্থ হয়ে ক্ষোভের আক্রোশে আগুন দিয়ে তাদের জীঘাংসা মিটিয়েছে।' (জনকণ্ঠ, ২০ নবেম্বর ২০০৩)

পুলিশের ডিআইজি ও এসপি ঘটনার কোন তদন্ত না করে ঢালাওভাবে বলেছেন, ডাকাতির কথা। কারণ ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) আলতাফ হোসেন চৌধুরী স্বয়ং বলেছেন, 'এটা ডাকাতদের কাজ।' একই ভাষায় সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের মুখপত্র 'ইনকিলাব'ও লিখেছে, 'ডাকাতরা লুটপাটে ব্যর্থ হয়ে নবজাতক শিশুসহ একই পরিবারের ১১জন নারী পুরুষকে হত্যা করেছে।' অথচ একই দিনে 'প্রথম আলো' লিখেছে, 'এটি ডাকাতি নাকি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড তা এখনো স্পষ্ট নয়।' শীল বাড়ির নির্মল শীল সাংবাদিকদের বলেছেন, 'ডাকাতরা আগে অনেক মানুষকে গুলি করে খুন করেছে। কিন্তু পুড়িয়ে মারতে শুনিনি। আর আমাদের ঘরে এমন কিছু ছিল না যে ডাকাতরা তা লুটে নেবে। তার সন্দেহ এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। সাধনপুরের স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আহসানউল-হ চৌধুরীর ধারণাও একই রকম। তিনি বলেন, ডাকাতি করতে এসে পুড়িয়ে মারার ঘটনা কখনো ঘটেনি। এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড কি না সেটা তদন্ত করে বের করতে হবে।' (প্রথম আলো, ২০ নবেম্বর ২০০৩)

মন্ত্রী, প্রশাসন ও 'ইনকিলাব' ঘটনার কোন তদন্ত ছাড়াই বলে দিয়েছেন এটা নিছক ডাকাতির ঘটনা। তদন্ত শুরু হওয়ার আগেই যদি খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পুলিশের বড় কর্তারা বলেন, 'এটা ডাকাতদের কাজ', তাহলে তদন্ত করার কোন প্রয়োজন থাকে না, ডাকাতদের

(যদি আদৌ নাগাল পাওয়া যায়) ধরে জেলে পুরে দিলেই মামলা শেষ! নিহতরা হিন্দু বলেই সম্ভবত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেননি, 'আল-াহর মাল আল-াহ নিয়ে গেছেন!'

বাঁশখালীর শীল পরিবারের এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডকে নিছক ডাকাতির ঘটনা বলার অর্থ প্রকৃত সত্য আড়াল করার অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। স্থানীয় অধিবাসী ও শীল পরিবারের পক্ষ থেকে সন্দেহ করা হচ্ছে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড এবং এর যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। এই ঘটনার ছয় মাস আগে গত ৮ মে (২০০৩) বাঁশখালীর অপর এক গ্রামে নাথপাড়ার আরতিবালা, তার মা জুনুবালা ও আরতির মেয়ে চম্পাকে একইভাবে গভীর রাতে ঘরে আগুন ধরিয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। দরিদ্র আরতির জমিটুকু আত্মসাৎ করাই ছিল এই হত্যাকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য, কারণ আসামী জাহাঙ্গীর ঘটনার পাঁচ দিন আগেও আরতিকে হুমকি দিয়েছিল জমি লিখে দেয়ার জন্য। বিএনপির স্থানীয় সন্ত্রাসী জাহাঙ্গীরকে আরতি জমি লিখে দেয়নি বলে তাকে তার মা ও মেয়েসহ আগুনে পুড়ে মরতে হয়েছে।

আরতিদের পুড়িয়ে মারার আট দিন পর (১৬ মে, ২০০৩) একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির এক প্রতিনিধিদল চট্টগ্রামের আইনজীবী, সাংবাদিক ও মানবাধিকার নেতৃবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে উপদ্রুত এলাকায় গিয়েছিলেন। আরতির প্রতিবেশীরা আমাদের বলেছিলেন আসল অপরাধী জাহাঙ্গীরকে গ্রেফতার না করে পুলিশ গ্রেফতার করেছে আরতির প্রতিবেশী টংকুনাথকে, যে নাকি গিয়েছিল আরতিদের বাড়ির আগুন নেভাতে। আমরা বাঁশখালী থানায় গিয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বলেছিলাম, 'প্রকৃত আসামীকে গ্রেফতার করা না হলে দুর্বৃত্তরা প্রশ্রয় পাবে এবং এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।' আরতির হত্যাকারীদের পুলিশ আজও গ্রেফতার করেনি।

প্রশাসন ও পুলিশ প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করার জন্য তখন বলেছে আরতির চরিত্র ভাল ছিল না, তার হিন্দু প্রতিবেশীরা তাকে হত্যা করেছে। ১০ মে (২০০৩) 'ইনকিলাব' পুলিশের বরাত দিয়ে লিখেছিল 'পুলিশ জানায়, বিধবা আরতিবালার সাথে অপর একটি হিন্দু পরিবারের বিরোধ চলছিলো দীর্ঘদিন থেকে। উভয় পরিবারের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমাও রয়েছে। অপরদিকে, ঐ পাড়ার অধিবাসীরা আরতির পরিবারকে কয়েক বছর আগে একঘরে করে। এলাকাবাসী জানায়, আরতির বাড়ীতে নিয়মিত অপরিচিত লোকজন আসত। সেখানে অনৈতিক কর্মকাণ্ড চলতো বলেও লোকজন অভিযোগ করেছে। পুলিশ ধারণা করছে, গোটা পরিবারকে পুড়িয়ে মারার পেছনে এলাকাবাসীর ক্ষোভ এবং আরতির যারা শত্রু তাদের হাত রয়েছে।'

গত মে মাসে আরতিবালাদের যখন হত্যা করা হয় তখন আমরা বলেছিলাম খালেদা-নিজামীর জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে সারা দেশে সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের উপর যে নির্যাতন চালাচ্ছে আরতিবালাদের হত্যাকাণ্ড তারই ধারাবাহিকতার অন্ত র্গত। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে তোতাপাখির মত বলছে বাংলাদেশে সাম্প্রদয়িক সম্প্রতির জোয়ার বইছে, সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা কোথাও ঘটেনি, খবরের কাগজে এ নিয়ে যা লেখা হচ্ছে সবই 'বানোয়াট' 'উদ্দেশ্য প্রণোদিত', 'বিরোধী দলের সাজানো নাটক' ইত্যাদি। আরতিবালাদের হত্যার সাম্প্রদায়িক চরিত্র আড়াল করার জন্য পুলিশ ও তাদের মুখপত্র 'ইনকিলাব' আরতির চরিত্র হনন করে যে কদর্যতার পরিচয় দিয়েছিল তেজেন্দ্রলাল শীলের পরিবারের ১১ জন সদস্যকে পুড়িয়ে মারার ঘটনাকে তড়িঘড়ি করে নিছক ডাকাতি বলে আখ্যা দিয়ে সরকার একই মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে।

আরতিবালাদের পুড়িয়ে মারার জন্য যারা দায়ী তাদের গ্রেফতার না করার ফলে এর তিন মাস পর চট্টগ্রামের পটিয়ায় আরও একটি সংখ্যালঘু পরিবারের তিন জনকে পুড়িয়ে মারা

হয়েছে। আমি পটিয়ায় যেতে পারিনি, যতদূর জানি পটিয়ার আসামীদেরও গ্রেফতার করা হয়নি। শুধু বাঁশখালী আর পটিয়া কেন বাংলাদেশে গত পঁচিশ মাসে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের যতগুলো ঘটনা ঘটেছে কোথাও কি প্রকৃত আসামীদের গ্রেফতার করা হয়েছে? প্রতিটি ঘটনা সরকার প্রথমে অস্বীকার করতে চেয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের কারণে ঘটনা অস্বীকার করতে না পেরে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছে। কারণ সাম্প্রদায়িক নির্যাতন চালাবার পাশাপাশি সরকার বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জোয়ার বইয়ে দেয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে!

আরতিবালাদের বাড়িতে যেভাবে আগুন দেয়া হয়েছে তেজেন্দ্র শীলের বাড়িতে একইভাবে আগুন দেয়া হয়েছে। নির্মূল কমিটির চট্টগ্রামের নেতৃবৃন্দ ২০ নবেম্বর ভোরে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে তাঁরা সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যরা তাঁদের কাছে জানতে চেয়েছেন, 'আর কতদিন আমাদের এভাবে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হবে?'

আমরা আশা করেছিলাম দেশে বিদেশে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তীব্র হলে সরকারের টনক নড়বে, নির্যাতন বন্ধ করবে। আমাদের প্রত্যাশা এখনও পূরণ হয়নি, বরং নির্যাতনের ক্ষেত্র দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে। হিন্দু নির্যাতনের পাশাপাশি শুরু হয়েছে কাদিয়ানি নির্যাতন। খৃস্টান নির্যাতনও শুরু হয়েছিল, ইউরোপীয় ইউনিয়ন কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করায় সরকারকে সে ক্ষেত্রে কিছুটা সংযত হতে হয়েছে। কিন্তু নির্যাতিত হিন্দু বা কাদিয়ানিদের পক্ষে সেভাবে দাঁড়াবার মত কোন দেশ বা সংগঠন নেই। দেশের ভেতরে আমরা যারা সাধ্যমত প্রতিবাদ করার চেষ্টা করি সরকার তাদের দেশদ্রোহী বানিয়ে বসে আছে। বাংলাদেশের অবস্থা এখন এমনটি দাঁড়িয়েছে যে সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন চলতেই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশ একটি মনোলিথিক ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত না হয় এবং বাংলাদেশের মানুষদের এটা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে হবে। যারা প্রতিবাদ করবে তাদের দেশের 'ভাবমূর্তি বিনষ্টকারী' 'রাষ্ট্রদ্রোহী' আখ্যা দিয়ে গ্রেফতার করা হবে।

বাঁশখালীর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিপন্ন মানুষ আমাদের যে প্রশ্ন করেছেন এ প্রশ্নের জবাব বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের কর্ণধারদের দিতে হবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর রাষ্ট্রীয় নির্যাতন আর কতদিন আমাদের দেখতে হবে? আওয়ামী লীগ সহ সেক্যুলার গণতন্ত্রে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলো নিস্ফল বিবৃতি প্রদান পরিহার করে বিপন্ন জনগোষ্ঠীকে বাঁচাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য আর কত বিলম্ব করবে?

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২১ নবেম্বর ২০০৩

ঝিনাইদহে ডা. এস. কে. মুখার্জি হত্যা
কে. জি. মুস্তাফা

দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে, এই কথাটা প্রায়শই শোনা যায়। কেন সে অঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা যাচ্ছে না, সে প্রশ্নের জওয়াব পাওয়া যায় না। ধরে নেয়া হয়, সে অঞ্চল অপেক্ষাকৃত বেশি দুর্গম, কাজেই আইনের হাত সেখানে সময়মতো পৌঁছতে পারে না। এই কারণটা এতই দুর্বল যে, যুক্তির ধোপে তা টেকে না। কেননা, দুর্গম যতই হোক, ওই অঞ্চলটা অগম্য নয়। আইনের হাত প্রসারিত করার আধুনিক ব্যবস্থাদির কাছে আমাদের দেশের সকল এলাকাই সুগম্য। এমন জায়গা নেই যেখানে প্রয়োজনে উপস্থিত হওয়া যায় না।

অবশ্য সমস্যা আছে। বলা যেতে পারে, আধুনিক ব্যবস্থাদি অর্জন ও ব্যবহার প্রচণ্ড ব্যয়সাপেক্ষ, কাজেই ওসব কথা বলে মনে মনে সান্ত্বনা লাভ করা সম্ভব, কিন্তু বাস্তবে তা দূর অস্ত। যে দেশে পুলিশের অস্ত্র থেকে গুলি বের হতে অহেতুক সময় লাগে, অনেক সময় বেরই হয় না, সে দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যে কত অসহায়, তা চিন্তা করাও যায় না। যশোর-খুলনা বেল্টের সংবাদে লক্ষ্য করা যাবে, সে অঞ্চলে যত সন্ত্রাসী ধরা পড়ে তাদের চেয়ে অস্ত্র ফেলে দিয়ে পালানো পুলিশের সংখ্যা বেশি। সন্ত্রাসীরা অভিযান চালায় অস্ত্র সংগ্রহের জন্য, আর পুলিশ অভিযানে নামে সন্ত্রাসী ধরার জন্য। ফলে, পুলিশের অভিযান ব্যর্থ হলেও সন্ত্রাসীদের অভিযানে 'সাফল্য' অর্জিত হয় পূর্ণ মাত্রায়।

পুলিশ ও সন্ত্রাসীর সাফল্যের হার তুলনা করলে সহজেই চোখে পড়ে পুলিশ যেখানে ব্যর্থ, সন্ত্রাসী সেখানে সফল। যে কারণে সন্ত্রাস আজও নির্মূল করা যাচ্ছে না দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে। রাজনৈতিক দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, সন্ত্রাসী বা চরমপন্থী যা-ই বলুন না কেন, তারা কিন্তু বিগত কয়েক দশকে বিলীন হয়ে যায়নি। তাদের রং বদল হয়েছে। নামও পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু আসল সত্তাটি রয়েছে অক্ষুণ্ন। অনেকে আবার ভারত ও নেপালের মাওবাদী বলে পরিচিত বামপন্থীদের আদলে তাদের দলীয় নামকে বিশেষায়িত করেছে 'জনযুদ্ধ' শব্দটি যোগ করে। এ দলগুলোর অভ্যন্তরীণ সংঘাতের শেষ নেই, যেমন শেষ নেই তাদের নতুন নতুন নামে পরিচিত হওয়ার অক্লান্ত প্রচেষ্টারও। প্রকৃত প্রস্তাবে, এরা কে কি, তা জানার কোন প্রচেষ্টা হয়েছে বলেও আমার জানা নেই।

এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম তার উদ্দেশ্য ছিল ঝিনাইদহ শহরে প্রবীণ এমবিবিএস ডাক্তার সুধীর কুমার মুখার্জির (৬৮) হত্যাকাণ্ড। গত ১৮ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, দ্বিপ্রহর আড়াই ঘটিকায় বেল টিপে ডা. মুখার্জির বাসায় প্রবেশ করে একদল সন্ত্রাসী। বাসায় কাজের মেয়েটি বাদে অন্য কেউ ছিল না। তাই ডোরবেলের আওয়াজ শুনে ডা. মুখার্জি নিজেই দরজা খুলতে যান এবং সাক্ষাত যমদূতদের দেখতে পান উন্মুক্ত দরজায়। ঘাতকরা ডাক্তার মুখার্জিকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। কাজের মেয়ে আন্না কর্মকারের চিৎকারে আশপাশের বাড়ির লোকজন উপস্থিত হন ঘটনাস্থলে। একই শহরে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার জনসভা চলছিল ওই সময়। জনসভা শেষে শেখ হাসিনা নিহত ডা. মুখার্জিকে দেখতে যান সদর হাসপাতালে। আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি ও হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাবেক সভাপতি ডা. এস. কে. মুখার্জির হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে জনসাধারণ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। হত্যার মোটিভ সম্পর্কে পুলিশ মনে করে, চাঁদা প্রদানে আপত্তি করায় হয়ত ডা. মুখার্জিকে হত্যা করা হয়েছে।

ডা. মুখার্জির হত্যাকাণ্ডের বোধগম্য কারণ হচ্ছে, তিনি সংখ্যালঘু এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন ডাক্তার কেন এ দেশে বাস করবেন এ প্রশ্ন অনেক সন্ত্রাসীর মনে কাঁটার মতো বিঁধে রয়েছে। শেখ হাসিনার জনসভা উপলক্ষে বাসাবাড়িতে লোকজন কম থাকবে, এ বিবেচনাও নিশ্চয়ই করেছিল সন্ত্রাসীরা। তাদের হিসাব মিলে গেছে, বাসায় লোকজন ছিল না বললেই চলে। রোগী ভেবে হত্যাকারীদের জন্য দরজা খুলে দিয়ে হন্তারকদের মুখে পড়েন ডা. সুধীর মুখার্জি। ঘাতক দল ডা. মুখার্জির প্রাণ নিতেই এসেছিল, অন্যদিকে তারা নজর দেয়নি। নজর দেয়নি ধনসম্পদ লুণ্ঠনের দিকেও।

সম্প্রতি এ দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তারা মূলত শিক্ষিত সংখ্যালঘু। তাদের একজনকে হত্যা করতে পারলে আর পাঁচজন দেশ ছেড়ে পালাবে, এই হিসাব সন্ত্রাসীদের রয়েছে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। চট্টগ্রামে অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরীর হত্যাকাণ্ড এ প্রসঙ্গে উলে-খযোগ্য। দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ক্ষেত্রে যে বিষয়টির প্রতি যথেষ্ট নজর দিয়েছে তাদের নেতৃবর্গ তা হচ্ছে শিক্ষিত সংখ্যালঘু, বিশেষ করে শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করতে হবে, যাতে তারা দেশ ত্যাগের হিড়িক ফেলে দিতে পারে। এ বিষয়ে ডা. সুধীর মুখার্জির হত্যাকাণ্ড ফলাও করে প্রচার করা হবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, যার দ্বারা সংখ্যালঘুর মনে বাংলাদেশে বাস করা সম্পর্কে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ পর্যন্ত এক পর্যায় অতিবাহিত হয়েছে যখন দেশের সংখ্যালঘুরা ব্যাপক হারে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরবর্তী পর্যায় এসেছে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর, শত্রু সম্পত্তি, আরও পরে অর্পিত সম্পত্তি নামে যে সব সংখ্যালঘু নির্যাতনের পথ নির্মাণ করা হয় সে পর্যায়। এসব নির্যাতনের পরও দেশে কিছুসংখ্যক সংখ্যালঘু, এমনকি শিক্ষিত সংখ্যালঘু মাটি কামড়ে পড়ে ছিলেন। তাদের শিকড় উৎপাটনের জন্য যে সব বিশেষ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে তার একটি হচ্ছে ঝিনাইদহ মডেল, ডা. এস. কে. মুখার্জি হত্যাকাণ্ড। উদ্দেশ্য বা মোটিভের দিক থেকে চট্টগ্রামের অধ্যক্ষ মুহুরী হত্যাকাণ্ড এবং ঝিনাইদহের ডা. এস. কে. মুখার্জি হত্যাকাণ্ড প্রায় সমমানের, উভয় হত্যাকাণ্ড শিক্ষিত সংখ্যালঘুদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টির পন্থা।

সম্প্রতি বিজেপি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, বজরং ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ প্রভৃতি উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী মমতা ব্যানার্জির ন্যায় ক্ষমতালোভী নেতৃত্বের প্রশ্রয়ে পশ্চিম বাংলায় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের চেতনাকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করার প্রয়াস পাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট (সিপিএম, সিপিআই, আরএসপি, ফরোয়ার্ড ব-ক প্রভৃতি দলের জোট) সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্মনিরপেক্ষ চেতনাকে অক্ষুণ্ন রাখার অঙ্গীকার পালন করে চলেছে। তাদের এই মহতী প্রচেষ্টা বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের চেতনাকে অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়াসকে শক্তি যোগাবে। বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী শক্তিসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত। তারা এ দেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় চেতনা, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রতিরক্ষা নীতির প্রতি সমর্থন ইত্যাদি আদর্শ থেকে অনেকখানি বিচ্যুত। চারদলীয় জোটের একমাত্র বিএনপি দাবি করতে পারে তারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী শক্তি, অপর তিনটি দল ঘোরতরভাবে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী চিন্তা-চেতনায় মগ্ন। তাদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামী এখনও মুক্তিযোদ্ধা হত্যাকারী দল হিসেবে সুপরিচিত। সেদিক থেকে বিচার করলে বলতে হবে, বর্তমান বিএনপি জোট সরকারের মধ্যে শুদ্ধি অভিযান অপরিহার্য। জামায়াত ও অন্যান্য মৌলবাদী দল, যারা বিএনপিকে ঘিরে রেখেছে, তাদের উপলব্ধি করার সময় এসেছে যে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে লালন করতে হলে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তা করা যায় না। (সংক্ষেপিত)

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৩

কার ইচ্ছা পূরণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামকে অশান্ত করে তোলা হচ্ছে?

শাহ এএমএস কিবরিয়া

পার্বত্য চট্টগ্রাম আবার অশান্ত হয়ে উঠেছে। একজন কলাম লেখক বর্তমান পরিস্থিতিকে অগ্নিগর্ভ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অগ্নিগর্ভ কি-না তা ভবিষ্যতই বলবে, তবে হানাহানি ও রক্তপাতের পটভূমি নিশ্চয়ই তৈরি হয়েছে। মহালছড়ির সাম্প্রতিক ঘটনাবলী তারই পূর্বাভাস। দীর্ঘ দুই দশকের বেশি সময় যাবত সংঘাত ও রক্তপাতের প্রেক্ষিতে এ ধরনের আশঙ্কা অতি স্বাভাবিক। প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়ার বাসনা কি তাহলে পূর্ণ হতে যাচ্ছে? তিনি শান্তিচুক্তি বাতিল করতে চেয়েছিলেন। তিনি ও তাঁর দল শান্তিচুক্তি চাননি। বস্তুত জামায়াতে ইসলামীসহ ডানপন্থী সকল দলই শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করেছিল। এই চুক্তি বাতিল করার দাবিতে বেগম জিয়া সদলবলে ঢাকা থেকে রাঙ্গামাটি পর্যন্ত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে বসে লংমার্চ করেছিলেন। তাঁর উত্তেজিত কণ্ঠের ভীতিকর ঘোষণা দেশবাসী নিশ্চয়ই ভুলে যায়নি। তিনি বলেছিলেন, আওয়ামী লীগ সরকার নাকি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ফেনী পর্যন্ত পুরো এলাকা ভারতের হাতে তুলে দিয়েছে। অবশ্য তাঁর এ ধরনের উদ্ভট উক্তি কেউ গুরুত্বসহকারে নেয়নি। এ ধরনের কথা ছিল তাঁর চিরাচরিত ভারতবিদ্বেষী প্রচারণার অংশ। শান্তিচুক্তি সম্পর্কে জনগণের মনে ভীতির সঞ্চার করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালি অধিবাসীদের মনে নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করে শান্তির পরিবেশ বিনষ্ট করাই ছিল তার আসল লক্ষ্য। তাঁর কল্পনাপ্রসূত আজগুবি কথাবার্তায় শান্তিচুক্তির প্রতি দেশবাসীর সমর্থন কমেনি; বরং প্রতিটি শান্তিপ্রিয় মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামে রক্তপাত ও হানাহানি বন্ধ করে শান্তি পুনর্প্রতিষ্ঠা করা ছিল শেখ হাসিনা সরকারের এক স্মরণীয় সাফল্য। এই চুক্তি সম্পাদনের জন্য কোন দেশী বা বিদেশি ব্যক্তি বা সরকারকে মধ্যস্থতা করতে হয়নি। পাহাড়ীদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে একটা সমঝোতা ও মতৈক্যে পৌঁছা সম্ভব হয়েছিল। পাহাড়ীদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি, তাদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত বেদনা ও বঞ্চনার প্রতি উদার মনোভাব এবং বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানে পদত্ত মৌলিক অধিকারের অঙ্গীকারের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিয়েই চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছিল। ওই অঞ্চলে বসবাসরত বাঙালিদের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। কোন চুক্তি যা আপসের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়, তা কখনও সবার কাছে একেবারে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কোন কোন প্রশ্নে সব পক্ষের মনেই কিছু কিছু ক্ষোভ বা অসন্তোষ থাকতে পারে কিন্তু এসব কিছু ছাড়িয়ে লক্ষ্য করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, অস্ত্রধারী বিদ্রোহী চাকমারা বিপুলসংখ্যক দেশে ফিরে এসে অস্ত্রসমর্পণ করেছিল। এটা ছিল অবশ্যই একটা বিরল ঘটনা। ১৯৯৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ মার্চের মধ্যে চার দফায় ৬৫ হাজার উদ্বাস্তু অস্ত্র সমর্পণ করে পুনর্বাসিত হয়েছিল। চেচনিয়াতে একটি রক্তাক্ত সংগ্রাম শুরু হয়েছে। কুর্দীরা দীর্ঘদিন যাবত ইরান, ইরাক, তুরস্ক ও সিরিয়ার সঙ্গে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের অধিকার এখনও অর্জন করতে পারেনি। এসব সংগ্রামে রক্তপাত বন্ধ হয়নি।

সংখ্যালঘু বা উপজাতীয় সম্প্রদায় যখন স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসনের জন্য অস্ত্র হাতে নেয়, তখন দু'পক্ষের রক্তপাত, তিক্ততা ও বিদ্বেষ শুধু বাড়তেই থাকে এবং এসব বিদ্রোহের আগুন সহজে নেবে না। শ্রীলঙ্কায় তামিলদের সংগ্রাম ও ফিলিপিন্সে মিন্ডানাওর মোরো মুসলিম

আন্দোলনের সুদীর্ঘ রক্তাক্ত ইতিহাস অনেকেই জানেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তি তাই বিশ্বের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিল। ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার ছিল এ সাফল্যের এক বিরাট স্বীকৃতি। ক্ষমতা গ্রহণের পর বছর না ঘুরতেই শেখ হাসিনা এ জটিল সমস্যাকে সমাধান করতে পেরে তার দূরদৃষ্টি, উদার সহনশীলতা ও দেশপ্রেমের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছিলেন। নেগোসিয়েশনে আলাপ-আলোচনায় তাঁর দক্ষতাও প্রমাণিত হয়েছিল।

বিএনপি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী ও বাঙালিদের মধ্যে সৌহার্দ্য চায়নি বলে তখন মনে হয়েছিল। এখনও সেই সন্দেহ দূর হয়নি। শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে তাদের তথাকথিত ১৮ দফা দাবি ছিল এ চুক্তি বানচাল করার কৌশল। বাংলাদেশের এক ইঞ্চি জমিও ভারতের দখলে যায়নি, বরং যেসব এলাকায় বাংলাদেশের কার্যকর দখল ছিল না, তা আবার আমাদের দখলে ফিরে আসে। চুক্তির কোন কোন অংশ সংবিধানের পরিপন্থী বলে যেসব অভিযোগ তোলা হয়েছিল, তাও টেকেনি। আইনগত কোন বাধাই চুক্তি বাস্তবায়নের পথে দাঁড়ায়নি। জনসংহতির নেতা সন্তু লারমা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন এবং তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও তিনি প্রায়ই বিভিন্ন প্রশ্নে তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তাঁর নেতৃত্ব জনসংহতি সমিতির সবাই পুরোপুরি মেনে নেয়নি। একটি অংশ ইউপিডিএফ নামে একটি পৃথক আঞ্চলিক দল গঠন করে শান্তিচুক্তির বিরোধিতা শুরু করে। এদের জনসমর্থন ও প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিরোধ করার জন্যই হয়ত সন্তু লারমা আপসকামীর ভূমিকায় থাকতে চাইতেন না।

শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে বিএনপি-জামায়াত ও অন্য ডানপন্থী দলগুলো সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করেছিল। পাহাড়ে বসবাসকারী বাঙালিদের মনেও ছিল তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে অনিশ্চয়তার আশঙ্কা। সর্বোপরি ইউপিডিএফের সশস্ত্র বিরোধিতার মুখেই চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হয়েছিল। কিন্তু এতসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দেশবাসীকে (এবং বিদেশিদেরও) অবাক করে দিয়ে শান্তিচুক্তি পুরো পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে এনেছিল। বহু পাহাড়ীর মনে অবিশ্বাস ও অনাস্থা এত গভীরভাবে দানা বেঁধেছিল যে, তারা সরকারকে বিশ্বাস করে অস্ত্র সমর্পণ করে আত্মসমর্পণ করতে চায়নি। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তারা দেখেছিল যে, শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকার ছিল সর্বাংশে আন্তরিক এবং চুক্তি বাস্তবায়নে তাঁর দৃঢ় অঙ্গীকারে সন্দেহ করার কোন কারণ ছিল না। বাঙালিদের সন্দেহ ছিল আরও বেশি, কারণ তাদের মধ্যে অনেকেই সরকার ও সামরিক বাহিনীর সহায়তায় বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছিলেন। তবে তাঁরাও যখন নিরাপত্তার পরিবেশ দেখতে পেলেন, তখন চুক্তিকে স্বাগত জানালেন। তাঁরা জানতেন, পাহাড়ীদের সশস্ত্র প্রতিরোধের মুখে শুধু সেনা সাহায্য নিয়ে শান্তি ও স্বস্তিতে জীবনযাপন করা সম্ভব হবে না। জনগণের অবাধে চলাচলের পথে কোন বাধা রইল না। যে কারও পার্বত্য চট্টগ্রামে যেতে কোন বাধা রইল না। বিদেশিরা আগে ওই এলাকায় একেবারেই যেতে পারতেন না; কিন্তু চুক্তির পর এসব বিধিনিষেধ উঠে গেল। পাহাড়ী উপজাতীয় সম্প্রদায়ের ভূমি বেদখল ছিল তাদের প্রধান অভিযোগ। যেসব ঘটনা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। লুটপাট, ধর্ষণ ইত্যাদি ঘটনাও অতিদ্রুত হ্রাস পেল।

শান্তি প্রতিষ্ঠার পর পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এটাই ছিল সবার মনের আশা। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়কমন্ত্রী ও দুই সংসদ সদস্য এ বিষয়ে আন্তরিকভাবে চেষ্টাও করেছেন। অর্থমন্ত্রী হিসেবে আমার সঙ্গে তাঁর কয়েক দফা আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উৎসাহ ও আগ্রহের কথা আমি জানতাম। বস্তুত যতটুকু উন্নয়ন হয়েছে, তা শেখ হাসিনার সমর্থন ও নির্দেশেই হয়েছে। আমি রাঙ্গামাটি সফরে গিয়ে সকল শ্রেণীর স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতি সন্তু

লারমার সঙ্গেও আলোচনা করেছি। অবশ্য তাঁর মনে নানা প্রশ্ন ছিল এবং কোন কোন প্রশ্নে তাঁর সন্দেহের বিষয়টি আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। কিন্তু প্রথম দফা আলোচনার পর তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, উন্নয়ন সম্পর্কে আমি আন্তরিকভাবেই সচেষ্ট ছিলাম এবং তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে আমার কোন দ্বিধা ছিল না। রাঙ্গামাটি থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে হ্রদের পাড়ে জনসভায় গিয়ে ভাষণ দিয়েছি, নিরাপত্তা সম্পর্কে কারও মনে কোন উদ্বেগ লক্ষ্য করিনি। ঢাকায় ফিরে এসেও আমি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে উন্নয়নের কর্মকাণ্ডে সমন্বয় করা ও গতিসঞ্চার করার চেষ্টা করেছি। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও আন্তঃমন্ত্রণালয় রেষারেষির কারণে অগ্রগতি যতটা দ্রুত হওয়া উচিত ছিল, হয়ত হয়নি; কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। তবে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সম্পর্কের টানাপোড়েনের ফলে পরবর্তী সময়ে, বিশেষত ১ অক্টোবরের নির্বাচনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর পার্বত্য অঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। বেগম জিয়া শান্তিচুক্তি বাতিল করার জন্য সর্বাত্মক আন্দোলন করেছিলেন; কিন্তু গদিতে বসে ভিন্নপথ অবলম্বন করলেন। চুক্তি বাতিল না করেও কার্যত তিনি চুক্তিকে □মান্বয়ে অকার্যকর করার সব পদক্ষেপ নিয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিজের হাতে রেখে তিনি তাদের দলীয় সাংসদ মণি স্বপন দেওয়ানকে উপমন্ত্রী নিযুক্ত করেছেন। মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড যে সুষ্ঠুভাবে চলছে না; বরং স্থবিরতা বিরাজ করছে, তা আর গোপন নেই। ২৯ সেপ্টেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় কমিটিতে উপমন্ত্রী বার বার পদত্যাগের হুমকি দিয়ে তাঁর ক্ষোভ ও হতাশার কথা ব্যক্ত করলেন। শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে বর্তমান সরকারের গড়িমসি, চুক্তি পর্যালোচনা কমিটি গঠন, শরণার্থী পুনর্বাসন বিষয়ে সরকারের ইতিবাচক সাড়া না দেয়া এবং উন্নয়নে বিলম্বের কারণেই তিনি ক্ষুব্ধ এবং ওই কমিটির বৈঠকে দু'দুবার মন্ত্রিসভা থেকে অব্যাহতি চাওয়ার কথা বলেছেন। অবশ্য মণি স্বপন দেওয়ান কীভাবে আশা করেছিলেন যে, বেগম জিয়া এ চুক্তি বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হবেন, তা অনেকের কাছেই বোধগম্য নয়। যিনি চুক্তির প্রধান বিরোধিতাকারী হিসেবে দেশে বিদেশে পরিচিত ছিলেন, তিনিই আবার চুক্তি বাস্তবায়নকারীর দায়িত্ব কীভাবে পালন করবেন, তা বুঝতে গবেষণা করার দরকার হয় না।

খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়িতে বিগত ২৪ থেকে ২৬ আগস্ট যে ভয়াবহ সংঘর্ষ ঘটেছে, তা থেকে দেশবাসী পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছে। ৯টি গ্রামের আদিবাসীর ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে; কিন্তু ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অপহৃত রূপম মহাজনকে উদ্ধার করা, আহতদের চিকিৎসা করা এবং গ্রামবাসীকে জরুরিভাবে খাদ্য সরবরাহ করার জন্য যে উদ্যোগ ও তৎপরতা দরকার ছিল, তা সরকারের পক্ষ থেকে দেখা যায়নি। এমনকি সরকার যে সংসদীয় কমিটির সদস্যদের সরেজমিনে তদন্ত করার নামে পাঠিয়েছিল, তাঁরাও আসল ঘটনাস্থলে না গিয়ে খাগড়াছড়ি থেকেই ফিরে এসেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তাঁরা সবাই সরকারি দলের সদস্য এবং ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতীয়রা এঁদের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগের সংসদীয় প্রতিনিধি দল মহালছড়িতে গিয়ে আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছে। এসব ঘটনা বর্তমান সরকার ও চারদলীয় জোটের আসল মনোভাব সম্পর্কে একটা নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করেছে এবং বর্তমানে যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তার পিছনে কারা উস্কানি দিচ্ছে, তা সবাই জেনে যাচ্ছে। মুখে যে যা-ই বলুক না কেন, বেগম জিয়া শান্তিচুক্তিকে ছলে-বলে-কৌশলে বাতিল করার জন্যই এসব অপচেষ্টাকে দমন করার কোন উদ্যোগই নিচ্ছেন না।

উপমন্ত্রী মণি স্বপন দেওয়ান সংসদীয় কমিটির কাছে অভিযোগ করেন যে, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এলজিআরডি মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে পার্বত্য বিষয়ক একটি কমিটি গঠন করেছেন; কিন্তু তিনি মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হয়েও এ কমিটির কাজ কী, তা জানেন না। এ কমিটিকে কী নামে ডাকা হবে, তা তিনি জানেন না। তিনি অভিযোগ করেন, এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কোন আলোচনা করা হয়নি বা তাঁর মতামতও নেয়া হয়নি। 'তাঁকে না জানিয়েই পার্বত্য চট্টগ্রামে একের পর এক তৎপরতা চালানো হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে তাঁকে অব্যাহতি দিলেই ভাল হয়।'একজন উপমন্ত্রীর পক্ষে এ ধরনের প্রকাশ্য ক্ষোভ প্রকাশ সরকারের ভেতরের শৃঙ্খলা যে ভেঙ্গে পড়েছে তারই প্রমাণ।

শান্তিচুক্তি বাতিল না করেও কার্যত এর বিভিন্ন ধারা অকার্যকর করা বা বাতিল করার লক্ষ্যে নাকি মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সম্ভবত মণি স্বপন দেওয়ান সংসদীয় কমিটিতে ওই কমিটির কথাই উলে-খ করেছেন। কিন্তু জনসংহতি সমিতি এ কমিটির প্রশ্ন শুধু আপত্তিই করেনি, সমিতির সভাপতি সন্তু লারমা ওই কমিটি নাকি মানেন না। জনগণকে না জানিয়ে গোপনে শান্তিচুক্তির ওপর যে আঘাত করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ নেই। উপমন্ত্রী তাঁর ক্ষোভ ও হতাশা হয়ত এ কারণেই গোপন রাখতে পারেননি।

শরণার্থী পুনর্বাসনের টাস্কফোর্স পুনর্গঠন এখনও করা হয়নি। ২০০১ সালের নির্বাচনের আগে দীপংকর তালুকদার টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যানের পদ থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন। তারপর থেকে টাস্কফোর্স তেমন কোন কাজই করছে না। উপমন্ত্রী ও বিএনপি সংসদ সদস্য আবদুল ওদুদ ভূঁইয়ার মধ্যে মতভেদের কারণে টাস্কফোর্সের জন্য কমিটি গঠনের প্রশ্নে কোন অগ্রগতি হয়নি। এ ব্যাপারে স্থানীয় বিএনপি নেতৃত্ব স্পষ্টতই দ্বিধাবিভক্ত। এ বিভক্তি যে আগামী দিনের জন্য অশনি সঙ্কেত, তা না বোঝার কারণ নেই। উপজাতীয় ও পাহাড়ীদের স্বার্থ সমন্বয় করে চলার নীতি আজ কার্যত পরিত্যক্ত হয়েছে। মহালছড়িতে শান্তি পুনর্স্থাপন ও ক্ষতিগ্রস্তদের দ্রুত পুনর্বাসন করা হলে হয়ত উপজাতীয়দের মনে আস্থা অনেকাংশে ফিরে আসত। তাদের ঘারবাড়ি নির্মাণ, ধ্বংসপ্রাপ্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্নির্মাণ, মামলার দ্রুত তদন্ত ও বিচার ইত্যাদি কোন পদক্ষেপই আন্তরিকভাবে নেয়া হয়েছে বলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা মনে করে না। অনেকের মতে, মহালছড়ির ঘটনাই শেষ পর্যন্ত দেশলাইয়ের কাঠির মতো পুরো পার্বত্য অঞ্চলে বিদ্রোহ ও প্রতিরোধের আগুন ছড়িয়ে দেবে। উপমন্ত্রীর সাবধান বাণী সংশি-ষ্ট ব্যক্তিদের সতর্ক করেছে বলে মনে হয় না। কারণ পাহাড়ী ও বাঙালিদের বিভাজন যেন আরও গভীর হচ্ছে।

শান্তিচুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের জন্য একটি বিরাট মাইলফলক হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। এ মাইলফলক যাঁরা কৌশলে তুলে ফেলতে চাচ্ছেন, তাঁরা দেশে আবার রক্তপাত ও সংঘর্ষের পটভূমি রচনা করছেন। ধৈর্যের সঙ্গে চুক্তির প্রতিটি ধারা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হলে বাংলাদেশ বিশ্বে একটা বিরল সাফল্য অর্জনের গৌরব লাভ করতে পারে। কারণ এ ধরনের পরিস্থিতি যে অত্যন্ত জটিল ও সমাধান সময়সাপেক্ষ, তা সবাই জানেন। এক্ষেত্রে পাহাড়ের আদি অধিবাসীদের স্বার্থ ও তাদের ধর্মীয়, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা রক্ষা করা এবং বাঙালি অধিবাসীদের ন্যায়সঙ্গত নাগরিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত রাখাএই লক্ষ্যকে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য ধৈর্য, সহনশীলতা, উদারতা ও দক্ষতা প্রয়োজন। তার কোন লক্ষণই দেশবাসী দেখতে পাচ্ছে না। বরং বিভিন্ন উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে যদি আবার ব্যাপক রক্তপাত ও সংঘাত শুরু হয়, তাহলে বর্তমান বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারকেই তার দায়-দায়িত্ব বহন

করতে হবে। স্থানীয় বাঙালিদের স্বার্থ সংরক্ষণের নামে যা করা হচ্ছে, তা শেষ পর্যন্ত তাদের নিরাপত্তা ও সুখ-শান্তির ওপর আঘাত হানবে। সমঝোতা ও সহনশীলতার কোন বিকল্প এখানে নেই। শান্তিচুক্তিকে আন্তরিকভাবে বাস্তবায়ন করাই অশান্ত চট্টগ্রামে শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনার একমাত্র উপায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ অক্টোবর ২০০৩

আদিবাসী নারীর নিরাপত্তা

পাভেল পার্থ

যদিও বাংলাদেশে আদিবাসীদের বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য ও ইতিবাচক কোন তথ্য-উপাত্ত রাষ্ট্রের কাছে নেই, তারপরও ২০ লাখেরও বেশি আদিবাসী এই জনপদে নিরন্তর নিপীড়নের ভেতর নিজস্ব জাতিগত মেজাজ জিইয়ে রেখে টিকে থাকার লড়াই করে যাচ্ছেন। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতা কল্পনা চাকমাকে রাঙামাটির বাঘাইছড়ি থেকে কজইছড়ি আর্মি ক্যাম্পের কমান্ডার লে. ফেরদৌস ও তার সেনা সহযোগিরা অপহরণ করে। এ পর্যন্ত কোন হদিস পাওয়া যায়নি কল্পনার। কল্পনার কথা ভাবতে ভাবতে কল্পনার মা বাধুনী চাকমাও মারা গেছেন। টাঙ্গাইলের মধুপুরের বিপন্ন শালবন এলাকার মাগনতি নগরের গিদিতা রেমাকে বাঙালি মফিজ গংরা ২০ মার্চ ২০০১-এ খুন করে। গিদিতাকে খুন করার কারণ ছিল তাদের জমি দখল ও গিদিতার বোনকে অপহরণ। গিদিতা এসবের প্রতিবাদ করেছিল। সম্প্রতি মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়ার নার্সারি খাসিয়া পুঞ্জি (সোনাছড়ি পুঞ্জি) দখল করেছে বাঙালি দখলদার আবদুল খালেক ও তার সহযোগিরা। তারা সিভা সাংমাসহ ৩ জন খাসিয়াকে অপহরণ করেছে। এসব কোন ঘটনারই কোন তদন্ত ও যোগ্য বিচার হয়নি। এই তিনটি ঘটনাকে উলে-খ করার কারণ হচ্ছে এই তিনটি জায়গা বাংলাদেশের ৩টি ভিন্ন জেলায়। এখানের প্রতিটি জায়গাতেই ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তার বাস। ঘটনা তিনটিও ৩টি আলাদা সময়ের। এসব ঘটনা আদিবাসী এলাকাগুলোতে নিরন্তর ঘটে আসছে। আর আদিবাসী নারীরা কেবলি বাঙালি সন্ত্রাসী দ্বারা অপহৃত আর নিখোঁজ হচ্ছেন। আদিবাসী নারীর নিরাপত্তা দিতেও রাষ্ট্র বারবারই ব্যর্থ হয়েছে। রাষ্ট্রের আইন, রীতিনীতি কখনোই আদিবাসী নারীর নিরাপদ, নিজস্ব জাতিগত সাংস্কৃতিক স্বাধীন জীবন চায় না। যেখানে রাষ্ট্রে আদিবাসীদের কোন সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই সেখানে আদিবাসী নারীর নিরাপত্তার বিষয়টি কি আলাদা করে দেখার কোন বিষয়? বিষয় এজন্যই যে কেবল রাষ্ট্র নয়, নিজের সমাজেও আদিবাসী নারীরা কমবেশি অবহেলিত। আর এখানটাতেই আদিবাসী নারীর সর্বাধিক প্রান্তিক অবস্থান। এই প্রান্তিক অবস্থানে আদিবাসী নারী তার জাতিগত ও লিঙ্গীয় অবস্থানে দাঁড়িয়ে যে প্রতিরোধী দলিল হাজির করে বারবার তা কেবলি রাষ্ট্র-বাঙালি-লিঙ্গীয় মতাদর্শিক দাপটের জোরে আড়াল হয়ে যায়। মানুষের স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠা ও বেঁচে থাকা কোন জোর-জবরদস্তির বিষয় নয়। আর যাবতীয় জোর-জবরদস্তির ভেতর দিয়েই আদিবাসী নারীকে লড়াই করে চলতে হয়। আদিবাসী নারীকেও আমি একতরফাভাবে একপাক্ষিক জাতিগত-অর্থনৈতিক ও শ্রেণীগত অভিধায় ফেলছি না। সকল দাপুটে ভাগ বিভাজনগুলো মাথায় নিয়েই একথা তো বলা যায়, আদিবাসী নারীকে তার সমাজ ও রাষ্ট্রে লিঙ্গীয় ও জাতিগতভাবে কোন স্বতঃস্ফূর্ত নীতিনির্ধারণ ও মতামতে অংশ নিতে নিরুৎসাহিত করা হয়। কারণ এর ভেতর দিয়েই আদিবাসী নারীর নিজস্ব প্রতিরোধী স্বর আরও ি◻য়াশীল এবং

নিজের স্বাধীন অস্তিত্ব স্পষ্ট হয়; কিন্তু এই লিঙ্গ দাপুটে রাষ্ট্র আদিবাসী নারীর সেই অস্তিত্বকে নিখোঁজ করে বারবার।

আদিবাসী নারীর নিরাপত্তা কি কেবলি 'শারীরিক'?

'শারীরিক' বলতে যৌন নিপীড়ন আর ধর্ষণের মতো বিষয়গুলোর কথা বলতে চাইছি। আদিবাসী নারীরা বাঙালি, বহিরাগত কর্তৃক সবচেয়ে বেশি শারীরিকভাবে নিপীড়িত হন। আদিবাসী এলাকাগুলোতে বাঙালিরা ঘুরতে যাওয়ার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে আদিবাসী নারীদের কোন না কোনভাবে যৌন হয়রানি করা। ২০০২ সালের অক্টোবরে নাটোর জেলার গুরুদাসপুরের ধানুড়া গ্রামের আদিবাসীদের গ্রাম তছনছ করে বাঙালিরা, যৌন নিপীড়িত হয় ৩ জন আদিবাসী নারী। মান্দি নারী স্মৃতি রিছিল লেবিনা হাউই'দের ওপর নৃশংস বাঙালি ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাগুলো আমরা কমবেশি জানি।

আদিবাসী যে এলাকাগুলো বনবিভাগের আশপাশে, বন এলাকায়। সেখানে তো আদিবাসী নারীদের নিত্য বনরক্ষীদের দ্বারা নানাভাবে হয়রানি হতে হয়। বনরক্ষীদের এসব নিপীড়নের প্রতিবাদ করতে গেলে খুন হতে হয়। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার সাঁতারিয়া গ্রামের অধীর দফোকে বনরক্ষীরা এ কারণেই গুলি করে মেরেছিল। ক্ষয়িষ্ণু মাতৃসূত্রীয় সমাজের মান্দি নারী-রা একসঙ্গে নিজেদের করা ও সংরক্ষিত জুম-প্রতিবেশ এলাকায় থা. মান্দি (এক ধরনের আলু) খুঁজতে যায়। এমনি এক থা. মান্দি তোলার দিনে এক মান্দি নারী মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বনের কিছুটা নির্জনে চলে আসে। বাঙালি বনরক্ষীরা তাকে আটকায় এবং অশ-ীল প্রস্তাব দেয়। সেই মান্দি নারী তার প্রতিবাদ করলে বনরক্ষীরা তাকে জাপটে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। সকল মান্দি নারীরা তখন তাকে উদ্ধার করে। অধীর দফো তখন পাশের আনারস বাগানে ছিলেন। বিপন্ন নারীদের চিৎকারে অধীর দফো ওই জায়গায় পৌঁছান। মান্দি নারীরা সরে গেলে বনরক্ষীরা গুলি করে হত্যা করে অধীর দফোকে।

মৌলভীবাজারের মাধবপুঞ্জির খাসিয়া বন্ধুরা অনেক আক্ষেপ করলেন, ঘুরতে আসা বহিরাগত বাঙালি পুরুষ দর্শনার্থীদের কাণ্ড-কারখানার প্রতি। খাসিয়াদের নিজস্ব প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনায় সংরক্ষিত মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত একটি 'পর্যটন ও পিকনিক এলাকা'। আর যে জায়গাগুলোই এসব তথাকথিত 'পর্যটন আর পিকনিক' হয়েছে, সেসব জায়গাতেই আদিবাসী নারীরা সবচেয়ে বেশি শঙ্কা আর বিপন্নতায় দিন কাটান। মাধবকুণ্ড আর জাফলংয়ে যারাই ঘুরতে যান, তারাই খাসিয়া নারীদের ছড়ায়্রান করা দেখতে বসে যান। খাসিয়া নারীদের্রানের ছবি তুলতে বাঙালি পুরুষদের সে কি অপরিসীম তৎপরতা। মাধবপুঞ্জির খাসিয়ারা উপরে চলার রাস্তায় দীর্ঘ বাঁশের বেড়া দিয়েছিলেন। মাধবকুণ্ড ঘুরতে যাওয়া বাঙালি পুরুষদের ভিড় লেগে যেত নেই বেড়ার ভেতর দিয়ে উঁকি দিয়ে খাসিয়া নারীদের দেখার জন্য। বান্দরবানের ম্রো নারীর 'উন্মুক্ত শরীরের' ছবি তুলতে পারাকে অনেক বাঙালি পুরুষ দারুণ কঠিন কাজ (!) মনে করেন। এমনকি 'পার্বত্য চুক্তি'র সময় অনেক দৈনিক পত্রিকায় বলা নেই, কওয়া নেই 'এক চাকমা মা তার বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছেন'- এমন ছবি ছাপা হয়েছে। ওই পত্রিকাগুলো কোন বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলিম নারীর বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর ছবি ছাপানোর কথা চিন্তাও করতে পারে না হয়ত-বা। সে যাক, সে ভিন্ন বাহাস। আদিবাসী নারীরা তাদের নিজস্ব সমাজে কমবেশি শারীরিকভাবে নিরাপদ হলেও রাষ্ট্র ও বাঙালি মরদের নানামুখী তৎপরতায় তারা নিরবচ্ছিন্ন নিরপত্তাহীন দিন কাটান। আর আদিবাসী নারীর নিরাপত্তা কেবলি 'শারীরিক নিরাপত্তার' বিষয় নয়। এটি কোন একপাক্ষিক বিষয়ও নয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের যাবতীয় নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ডগুলোই আদিবাসী নারীকে নিরাপদ নিজস্ব জীবন থেকে উৎখাত করে

তাকে নিরাপত্তাহীন করে।

আদিবাসী নারীর নিজস্ব জ্ঞানের নিরাপত্তা ....

নারীর নিজস্ব জ্ঞান-অভিজ্ঞতাকে সকল সমাজেই নিরুদ্দেশ করে ফেলা হয়। প্রতিবেশ-ঘনিষ্ঠ জ্ঞানের অনন্য নজিরখানার জিহ্বা কেটে ফেলা হয়েছিল কেবলমাত্র তার প্রায়োগিক জ্ঞানকাণ্ডের জন্যই। প্রতিটি জাতিসত্তার ভেতরই নিজস্ব জীবনযাপনে নারীর রয়েছে বহুমাত্রিক জ্ঞান-অভিজ্ঞতা। শস্য রোপণ, জুম-কৃষি, বীজ সংরক্ষণ, রান্না, কাপড় বোনা, তৈজপত্র তৈরি, সন্তান লালনপালন থেকে শুরু করে প্রতিবেশ-পরিবেশ সংরক্ষণের নানা মেজাজের সজ্ঞান। সমাজের লিঙ্গীয় দাপট নারীর এই জ্ঞানকে একতরফাভাবে চুরি করে যাচ্ছেতাইভাবে। আদিবাসী নারীর যুগান্তরে গড়ে ওঠা শ্রম ও ঘামের গোষ্ঠীবদ্ধ জ্ঞান হয়ে উঠে কোন বহুজাতিক কোম্পানির বাজার দখলের কৌশল। নারীর এই জ্ঞান-অভিজ্ঞতা একতরফাভাবে চুরি হয়ে যাওয়া থেকেই নারী আরও অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে।

আদিবাসী নারী ঃ খাদ্য ও চিকিৎসা নিরাপত্তা .....

জুম কিংবা কৃষি, নারীই সকল শস্য-ফসল-খাদ্যের প্রধান যোগানদার, সংগ্রহকারী এবং হদিসকারী। নারীর নিরবচ্ছিন্ন নানা আত্মত্যাগের ভেতর দিয়েই সমাজে কোন কিছু 'খাদ্য' হয়ে ওঠে। আবার আদিবাসী নারীরা তাদের চারপাশ থেকে সংগ্রহ করেন প্রতিবেশ-ঘনিষ্ঠ খাদ্য। তার প্রতিবেশের সুস্থিত ভারসাম্য বজায় রেখেই। হবিগঞ্জের কালেঙ্গাতে ত্রিপুরী কামিতে দেখেছি চিত্রপুরী নারীরা কোন উদ্বৃত্ত খাদ্য প্রকৃতি থেকে এমনিতে সংগ্রহ করেন না, প্রকৃতিজাত (যা চাষ ও জুম করা হয় না) খাদ্য উপকরণ বিি্রও করা হয় না; কিন্তু রাষ্ট্রীয় নানা উদ্যোগ, যা বন ও পরিবেশ উন্নয়ন বলে খ্যাত তা আদিবাসী নারীর নিজস্ব খাদ্য নিরাপত্তাকে বারবার বিপন্ন করে। এমনিতেই বাঙালি দাপটের কারণে নানা আদিবাসী রান্না যেমন- নাপ্পি, ওয়াকখারি, দো জাবা, চু ইত্যাদি রাষ্ট্রীয়ভাবে বহু প্রচলিত খাদ্য হয়ে ওঠে না তার উপর আদিবাসী নারীর নিজস্ব খাদ্য উৎসের সকল নিশ্চয়তা বন্ধ করে দেয় রাষ্ট্র। ১৮৭৩ সালে বাংলাদেশে সেগুন প্রজাতি মনোকালচারের ভেতর দিয়ে কৃত্তিম বনায়ন শুরু হয়। বর্তমানে পুরো বাংলাদেশ ভরে ওঠেছে কৃত্তিম বনায়নের বিদেশি সব গাছে। তাও বন বিভাগের জন্য রেহাই পাচ্ছে না। আর প্রাকৃতিক বনের সর্বাধিক নিশ্চিহ্নকরণ ও বিদেশি গাছের বনায়নে আদিবাসী নারী তার খাদ্য উপকরণ সংগ্রহ সবচেয়ে বেশি ব্যর্থ হচ্ছে। এটি কেবলমাত্র খাদ্য অনিশ্চয়তাই নয়, নারীর অস্তি ত্বের প্রতি প্রবল আঘাত। এ প্রসঙ্গে বিপন্ন মধুপুর শালবনের গাছাবাড়ির মসলা মারাক জানালেন, একটা সময় প্রাকৃতিক বনসাল ফাং-এ (শালবনে) আমরা সবাই মিলে যেতাম। কতো কিছু পাওয়া যেত। স্টেংখান্তি, আদুরাক, চেরংকি, মেন্দা, স্টেথং, চম্মরু/গাঠি, আলত, খুমকা, আফফলকা, আমফেং, সাজালিক, দাপদিকি/দিগ্নি, থা. জা. দামরং, বলনাছিল, বলনাকগেল.... এরকম অনেক সামবিজাক (শাক-সবজি); কিন্তু শালবন কেটে একাশিয়া আর ম্যাঞ্জিয়াম লাগানোতে এখন আর আগের কোন কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না।

কেবল খাদ্য উপকরণ নয়, আদিবাসী নারীরা তাদের নিজস্ব চিকিৎসা কাজে ব্যবহৃত ওষুধি উদ্ভিদগুলোও আর তাদের চারপাশে খুঁজে পান না। এ প্রসঙ্গে সিলেটের খাদিমনগরের লালং (পাত্র) কবিরাজ নারী দই পাত্র ও মৌলভীবাজারের কালেঞ্জী খাসিয়াপুঞ্জির নারী কবিরাজ নাসিফ পথমি জানালেন একই সমস্যার কথা। বহিরাগত বাঙালিরা এসে পাহাড়ি দামি ওষুধের গাছ তুলে নিয়ে বিি্র করে। তারা বাধা দিলেও কেউ শোনে না। আর এ বিষয়ে বন বিভাগও নিশ্চুপ থাকে, সহযোগিতা করে। চারপাশের প্রতিবেশ পরিবেশ বিপন্ন হয়ে যাওয়া, প্রাকৃতিক বন কমে

যাওয়া নারীর নিজস্ব অস্তিত্বের ওপরই সর্বনাশা আঘাত। আদিবাসী নারীরা প্রাকৃতিক বন থেকেই জ্বালানি সংগ্রহ করেন, প্রাকৃতিক বন বিপন্ন হওয়ায় আদিবাসী নারীকে সে সমস্যায়ও পড়তে হয়। যাবতীয় জায়গা থেকেই আদিবাসী নারীকে বিপন্ন হতে হয় এই রাষ্ট্রে, হতে হয় নিরাপত্তাহীন।

জাগো আদিবাসী নারী, জাগো আদিবাসী বহ্নিশিখা....

সারা দুনিয়ার ৩০ কোটি আদিবাসীদের ভেতর নারীর অবস্থান সবেচেয় প্রান্তিক ও বিপন্ন। বাংলাদেশও তার বাইরে নয়। প্রতিটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব জাতিগত জীবনে নানা কাজেই সুস্থি লিঙ্গীয় সমতা থাকলেও কেবলমাত্র মান্দি ও খাসিয়া এই দু'টি মাতৃসূত্রীয় সমাজ বাদে আর প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীই পিতৃতান্ত্রিক। আর পিতৃতান্ত্রিক সব সমাজের মতো আদিবাসী সমাজেও নারীরা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণ ও মতামতের অংশীদারিত্বে নিজস্ব ভূমিকা নিয়ে উপস্থিত হতে পারে না। এমনকি গরিষ্ঠভাগ আদিবাসী নারীরই নেই সম্পত্তির উত্তরাধিকার। মাতৃসূত্রীয় মান্দি ও খাসিয়া সমাজে পরিবারের ছোট মেয়েরা সম্পত্তির প্রধান উত্তরাধিকার হয়। ম্রাইনমা (মারমা) ও রাখাইন সমাজে নারীরা সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায়; কিন্তু তার বাইরে প্রায় সমাজেই নারীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার অনিশ্চিত। জুম, কৃষি, বস্ত্রবয়ন, বাজার, ঘরে-বাইরে যাবতীয় কাজ করার পরও নারীর পূর্ণ মর্যাদা ও স্বীকৃতি কখনোই পাওয়া হয় না। হাজং বিদ্রোহ, হাতিখেদা আন্দোলন, তেভাগা, নুপীলান, চা-শ্রমিক আন্দোলন, ভানুবিল আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নানকার আন্দোলন, পাহাড়ে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনসহ সকল প্রতিরোধ-প্রতিবাদে নারীর সি্রয় অংশগ্রহণ থাকা সত্ত্বেও আদিবাসী নারীরা প্রচলিত লিঙ্গীয় দাপটের ইতিহাসে বারবার আড়াল হয়ে যায়। নারীর নিজস্ব শ্রম-ঘাম-মেধার যোগ্য স্বীকৃতি ও নিরাপদ জীবনের নিশ্চয়তা দিতে এই ব্যবস্থা, আইন, নীতি ও রাষ্ট্র বারবার ব্যর্থ হয়। জাতিসংঘ ঘোষিত 'আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক' প্রায় শেষ হতে চলল। এখনও বাংলাদেশে ৯ই আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস রাষ্ট্রীয়ভাবে পালিত হয় না। জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় 'আদিবাসী তারুণ্য (Indigenous Youths)। বাংলাদেশে, 'বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম' এবারে বাংলাদেশের আদিবাসী দিবসের জন্য মূল শে-াগান রেখেছে 'আদিবাসী নারীর নিরাপত্তা চাই'; কিন্তু যে রাষ্ট্র, যে উন্নয়ন কাঠামো আদিবাসীদের জাতিগত স্বীকৃতি দিতে নারাজ তার কাছে নারীর নিরাপত্তার বিষয়টি প্রবলভাবে হয়ত বা অযৌক্তিক (!)। তাই জেগে উঠতে হবে সকল আদিবাসী জনগণকে, ঐক্যবদ্ধ হতে হবে সকল আদিবাসী নারীকে। নারীর সকল নিরাপত্তা ও নিজস্ব স্বাধীন অধিকারের দাবিতে নিজস্ব জাতিগত সংস্কৃতি অক্ষুণ্ন রেখে, নিজস্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় গড়তে হবে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের প্রতিরোধী পাটাতন। আর ডাক দিতে হবে আরেক সকালের। যে সকালে একজন কেউ নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াবে তার জুম-জঙ্গলে, তার পাহাড়ে-সমতলে, কেউ আগুন লাগিয়ে দেবে না তার ঘরে, কেউ দখল করবে না তার বসত, কেউ ধর্ষণ করবে না তাকে ...... আমরা সকলে মিলে এখন থেকেই যাত্রা শুরু করি যেন সেই সকালের দিকে।

সংবাদ ২৩ নবেম্বর ২০০৩

চারপাশে এ কিসের আলামত?

মনজুরুল হক

সারা ভারত আর একটি রবীন্দ্রনাথ জন্ম দিতে পারেনি। আর একটি রামমোহন খুঁজে পায়নি। লালন, কানাই, নিমাই, শাহজালাল, খানজাহান আলী সবই এই বাংলার। সুফি সাধকের চারণভূমি এই বাংলা। খাল-বিল, নদী-নালা আর বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতে দখিনা বাতাসের ঢেউ খেলানো বাংলা। সহজিয়া স্বভাবের আটপৌরে জীবনযাপনের বাংলা। মিঠে কথা মিহি সুরের বাংলা। আঁচল ভরে ক্ষুধার্ত পথিককে অন্ন দান করা এই বাংলা। ক্লান্ত পথিকের মাথার ওপর বটবৃক্ষের সুশীতল শ্যামল বাংলা। এ নিয়ে বাঙালির গর্বের শেষ নেই। জাত-বিজাতে, সম্প্রদায় সম্প্রদায়তে সম্মিলন নিয়ে অহংকারের শেষ নেই বাঙালির; কিন্তু এসব এখন অতীত। ইতিহাসের অংশ। বাঙালি এখন আর মিঠে কথা-মিহি সুরের বাউল নয়। মনুষ্য সভ্যতাকে তাক লাগিয়ে দেয়া বির্ভৎস বর্বরতার ঘটনা। বাঙালি এখন অনায়াসেই মধ্যযুগের বর্বর হুন অথবা হার্মাদের ভূমিকায়। অনেকদিন ধরেই এই জনপদের মানুষ দাসযুগের বর্বরতায় পুষ্ট হয়ে এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ অমানবিক বর্বর জনগোষ্ঠী। জগতের কোথাও যা ঘটে না তাই যেন ঘটানোর গুরুদায়িত্ব এই জনপদের মানুষদের কাঁধে। ২০ নবেম্বরের জাতীয় সংবাদপত্রগুলো এক ভয়াবহ বর্বরতার দলিল হয়ে গেল। সভ্য বলে পরিচিত মানুষ দেখল সংবাদপত্রের এ মাথা থেকে ও মাথা অব্দি লাল কালিতে ব্যানার হেডিং- "বাঁশখালিতে ১১ জনকে পুড়িয়ে হত্যা"! ঘটনার শিকার এক হিন্দু পরিবার। ৭০ বছরের বৃদ্ধ থেকে ৪ বছরের শিশুও রেহাই পায়নি। এটা নতুন নয়। এমন লোমহর্ষক হত্যাযজ্ঞ হরহামেশাই এদেশে খবর হচ্ছে। ছয় বছরের শিশু ধর্ষণ, ৭০ বছরের বৃদ্ধা ধর্ষণ, কিশোরীকে গণধর্ষণ, বোবা-কালা মেয়েকে ধর্ষণ করতে করতে মেরে ফেলা পুলিশের নিরাপত্তায় ধর্ষিতা হয়ে মৃত্যু এখন আর চমকে দেয়া ঘটনা নয়। প্রতিদিনকার স্বাভাবিক চিত্র। মানুষেরও এসব দেখে-শুনে সয়ে গেছে যেন। কেউই খুব একটা আলোড়িত হচ্ছেন না। চট্টগ্রামের বাঁশখালিতে অমন একটি হত্যাকাণ্ড ঘটার পর যা যা হওয়া দরকার সবই হয়েছে। সুধী সমাজ নিন্দা জানিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী নিন্দা জানিয়েছেন। জামাত-বিএনপি জোট সরকারের পুলিশ, মন্ত্রী বরাবরের মত 'সন্ত্রাসী ডাকাতদের আস্তানা গুঁড়িয়ে দিতে বলেছেন। পরদিন খবর বেরিয়েছে সন্ত্রাসীরা স্টিল আলমারি ভাঙেনি, কোন লুটপাটও করেনি। অর্থাৎ পুরো পরিকল্পনাটা স্রেফ হত্যাকাণ্ড। ঠাণ্ডা মাথায় পেট্রোল ঢেলে, গান পাউডার ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে ১১ জন মানুষকে পুড়িয়ে মারা। আমরা অক্ষমেরা এরপর যেটা পারি তা হলো ঃ ইনিয়ে-বিনিয়ে রিপোর্ট লিখতে পারি, আবেগ-টাবেগ মেখে কলাম লিখতে পারি। আর সারা শরীরের সমস্ত ঘৃণা একত্র করে ধিক্কার জানাতে পারি; কিন্তু যারা সরকারে আছে, যাদের দায়িত্ব প্রজাগণের জানমালের নিরাপত্তা দেয়া তারা কী করেছেন? কী করছেন? কী করবেন?

যথারীতি আলতাফ চৌধুরী মুখস্থ বুলি বলে গেছেন। আরও বলবেন। কেননা এমন মুখস্থ শব্দাবলি তাকে মাঝেমধ্যেই বলতে হয়েছে, হচ্ছে, হবে। অনেকটা রেগুলেশন ওয়ার্ক। তিনি এবং তার দলের অনেক মুখপাত্র ওই তস্করদের প্রথমেই বলেছেন, "সন্ত্রাসীডাকাত"। অর্থাৎ ডাকাত প্রমাণ করতে পারলেই রাজনৈতিক-সাম্প্রদায়িক ঝঞ্ঝাট এড়ানো গেল। ডাকাতরা ডাকাতি করার সময় মানুষ খুন করতেই পারে। আর ডাকাতি ব্যাপারটা যুগ যুগ ধরে ঘটে আসছে। আরো ঘটবে। এরপর বললেন, ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। ব্যবস্থা নেয়া হবে। অপরাধীকে শাস্তি পেতেই হবে। ভারী মজার শব্দ এই 'ব্যবস্থা'। কি ব্যবস্থা তা যেহেতু বলা হচ্ছে না, তাই

ব্যবস্থা নেয়া মানে প্রতিকার ধরে নিতে হবে বলে শেখানো হচ্ছে। ব্যবস্থাটা কবে নেয়া হবে, কতদূর নেয়া হবে, আদৌ নেয়া হবে কীনা সে প্রশ্ন করা যাবে না। নিজেদেরকে রাজা-উজির-নাজির জ্ঞান করা কর্পোরেট ডেমো▯্যাসির সূর্যসন্তান যারা আমাদের মত দেশে গদিনশীল হন তাদের কাছে ব্যবস্থা তিনটি কালরূপ আছে। এরা বিগত সরকারের সকল কর্মকাণ্ডকে অন্যায়, লুটপাট, চাওয়া-পাওয়া, প্রত্যাশা-প্রাপ্তির জবাবে বলেন "ব্যবস্থা" নেয়া হচ্ছে এবং তাদের রাজত্বের দুর্নীতি, অন্যায়-অবিচার, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, অপশাসন, কুশাসনের অভিযোগ তুললে বলেন, "ব্যবস্থা" নেয়া হবে। ব্যাস, খেল খতম। কী ব্যবস্থা, কিসের ব্যবস্থা, কী রূপ ব্যবস্থা প্রশ্ন করার অধিকার নেই। উত্তর দেবারও দায়বদ্ধতা নেই।

১১ জন সংখ্যালঘু মানুষকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার পর সরকারের দায়িত্বশীলরা বলছেন, পারিবারিক বিরোধ, ব্যক্তিগত সংঘাত। তার মানে পরিবার এবং ব্যক্তির বিরোধে আদপে সরকারের কিছুই করার নেই। এর আগেও জোট সরকারের অনেক মন্ত্রী, বিশেষ করে অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান প্রতিদিন গড়ে ১০/১৫ জন মানুষ খুন হওয়া সম্পর্কে বলেছিলেন আধুনিক মেগাসিটিতে ওরকম ১০/১৫ জন মানুষ খুন হতেই পারে। অর্থাৎ ওই খুনের কারণে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে মনে করা যাবে না। বাঁশখালির হত্যাযজ্ঞের পর যথারীতি ওখানে পুলিশ ক্যাম্প হয়েছে। সন্ত্রাসীদের খোঁজা হচ্ছে, যেমনটি মুহুরি হত্যাকাণ্ডের পর করা হয়েছিল। এরপর বলা হচ্ছে ওখানে এখন শান্তি অবস্থা বিরাজ করছে। কোন অপ্রীতিকর কিছু আর ঘটেনি! এরপর বলা হবে একটি দল এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে রাজনীতিতে নেমেছে।

তারা ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চায়। তারও পর বলা হবে জোট সরকারের আমলে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অন্য যেকোন সময়ের চেয়ে ভাল। অবশ্যি ও নিয়ে আমাদের কোন অভিযোগ নেই আমরা জানি, আমরা ভাবতে বাধ্য হব এত কিছুর পরও দেশে চমৎকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজ করছে। হিন্দু-মুসলমান এক থালায় বসে ভাত খাচ্ছে। আমরা এমনটি ভাবতে ব্যর্থ হলে আমাদেরকে একটি বিশেষ দলের দালাল বলা হবে। সেটাও আমাদের অভিযোগ নয়। জোট সরকারের গৃহমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী তো দূরের কথা, তাদের তাবত মন্ত্রীদের পক্ষেও এ ধরনের নির্বিকার হত্যা, নির্মম লুণ্ঠন নিশ্চিন্ত ডাকাতি, নিরুদ্বেগ ভিটে-মাটি দখল বন্ধ করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সামান্যতম উন্নতির। তাদের ক্ষমতা নেই হু হু করে বাড়তে থাকা দ্রব্যমূল্যকে থামানো। সম্ভব নায় আদিখ্যেতা দেখিয়ে উস্কে দেয়া দলীয় ক্যাডারদের নিরস্ত্র করা। তাদের পক্ষে খুব বেশি হলে সম্ভব বিনা ট্যাক্সে বেশুমার বাণী দেয়া আর দেশের তাবত জনগণকে গাধা-গরু মনে করে নির্বিচার অসত্য বলে যেহেতু জনগণ নিশ্চুপ, সুতরাং তা জনগণ সত্যি বলেই মেনে নিয়েছে।

দেশের এমন পরিস্থিতি নিয়ে সরকারের কাছে আমাদের সামান্যতমও কোন দাবি নেই। দাবি ছিল নিজেদের কাছে। সেখানেও আমরা ব্যর্থ হয়েছি চরমভাবে। দু'টি ফুটবল দলের খেলায় রুদ্ধ হয়ে আমরা সারা ঢাকা শহর তোলপাড় করি। শত শত গাড়ি ভাঙ্গি। একজন পুলিশ মরলে লাইন দিয়ে মাতম করি। কে কোথায় মসজিদ ভাঙতে চেয়েছে বলে বুকের রক্ত ঢেলে দিতে চাই। সাদ্দামের মত এক স্বৈরশাসকের জন্য মুনাজাত করি, শহীদ হতে চাই। অথচ এতবড় একটা লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের পর কেউ টু শব্দটি করল না। কোন মিছিল বেরুল না, গাড়ি পুড়ল না, কেউ শোক পালন করল না! কেউ লক্ষ টাকার ইফতার মচ্ছব বন্ধ করল না, কোন একটি সাইরেন করুণ সুরে বাজল না। দেশোদ্ধারের ঘুম হারাম করা বড়ো বড়ো দল, মেহনতি মানুষের মুক্তির চিন্তায় মাথার চুল তুলে ফেলা বামদল, ইহকালেই বেহেস্তের মেওয়া খাওয়ানোর লালসা দেখানো ইসলামি দল কেউ টু শব্দটি করল না। এদের সবাইকে লজ্জা (যদি

ওটা অবশিষ্ট থেকে থাকে) দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র বিক্ষোভ করেছে, শোক করেছে। হঠাৎ তারা দেখিয়ে দিয়েছে তারা বাদে বাকি সবাই মৃত মানুষ। চলতে ফিরতে পারা মৃতমানুষ।

এই যে আলামতটি। মানুষের বদলে যাওয়া, মানুষের রোবট হয়ে যাওয়া, বিকারহীন যন্ত্র হয়ে যাওয়া, ভয়ঙ্কর স্বার্থপর হয়ে যাওয়া, হিংস্র বর্বর হয়ে যাওয়া এ সবই শাসকশ্রেণীর বিজয়। তারা এইটিই চেয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। আমেরিকা-ইউরোপ মাদক দিয়েছে, কসমোপলিটন ভোগবাদের ফেরিঅলারা শোবিজের নেশা দিয়েছে, ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরুনো শাসকরা ক্যাশ কারেন্সি হাতে তুলে দিয়েছে, অস্ত্র তুলে দিয়েছে, রাজনীতিবিদরা গডফাদার হয়ে গডসান বানাতে পেরেছে, ভোগের সামগ্রী হাতে পাবার জন্য বিবেককে বিি করতে শিখিয়েছে। আর এতেই তারা সফল। এমন বিশাল এক জনগোষ্ঠীর এই দেশে কোন কিছুতেই কারো কিছু আসে যায় না। ভয়ঙ্করভাবে নির্লিপ্ত থাকতে পারে টগবগ তরুণ। বেহায়া নিলর্জ্জের মত মড়ার পাশে বসে অন্ন গিলতে পারে বিবেকবান মানুষ। রোমে নিরো বাঁশি বাঁজিয়েছিল একা। এখানে এই দেশে নির্লিপ্ত নিদ্বেগ বাঁশি বাজাচ্ছে এক বিশাল জনগোষ্ঠী নিষ্কন্টক লুটপাটের শাসন চালাবার জন্য আলাতমটি মোটেই ভাল ঠেকছে না। শাসক বা শাসিত উভয়ের জন্যই অশুভ সংকেত জানিয়ে যাচ্ছে।

সংবাদ, ২৫ নবেম্বর ২০০৩

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু

বদরুদ্দীন উমর

বাংলাদেশে সব রকমের সংখ্যালঘুর ওপর নির্যাতন এখন ব্যাপকভাবে হচ্ছে এবং এর নিষ্ঠুরতাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই নিষ্ঠুর নির্যাতনের মুখে জাতিগত, ধর্মীয়, ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জীবন দুর্বিষহ ও বিপন্ন। এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সব গণতান্ত্রিক শক্তির এক গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি কর্তব্য।

এই কর্তব্য সঠিক ও যথাযথভাবে পালন করার জন্য যে পরিস্থিতিতে সংখ্যালঘুদের ওপর এই নির্যাতন হচ্ছে তার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই গত কয়েকদিনের কতগুলো ঘটনার দিকে তাকানো দরকার।

১৮-১৯ নবেম্বরের মধ্যরাতে চট্টগ্রাম শহর থেকে ৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণে ও বাঁশখালী থানা থেকে ১২ কিলোমিটার উত্তরে হিন্দুপ্রধান গ্রাম দক্ষিণ সাধনপুরের শীলপাড়ায় তেজেন্দ্র লাল শীলের বাড়িতে আগুন দিয়ে তাকেসহ তার পরিবারের ১১ জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। ২০/৩০ জন সশস্ত্র দুর্বৃত্ত মাটির কোঠার বাড়িটির ওপর হামলা করলে পরিবারের সবাই দোতলায় আশ্রয় নেন। মই দিয়ে উপরে উঠে মই সরিয়ে নিয়ে তারা উপরের দরজা বন্ধ করেন এবং দুর্বৃত্তদের হুমকিপূর্ণ ডাকাডাকিতে সাড়া না দিয়ে উপরের ঘরেই থাকেন। এলাকায় দুর্বৃত্তদের নানা প্রকার উৎপাত ও হুমকির মুখোমুখি হয়ে তারা নিরাপদ আশ্রয় তৈরির জন্য বাড়ি দোতলা করেন। এভাবে নিরপত্তা নিশ্চিত করার সময় তারা বাড়িতে আগুন দেয়ার কথা নিশ্চয়ই চিন্তা করেননি।

তেজেন্দ্র শীল সপরিবারে দোতলায় উঠে যাওয়ার পর তাদের হাতে পাওয়ার কোন সম্ভাবনা না দেখে দুর্বৃত্তরা তার বাড়িতে গান পাউডার, পেট্রোল বা অন্য কোন দাহ্য পদার্থ

ছড়িয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। একটি শিশু ও ৭ মহিলাসহ ১১জন জীবন্ত দগ্ধ হন এবং তাদের শরীর পুড়ে কয়লা হয়ে যায়। অগ্নিকাণ্ডের এক পর্যায়ে তেজেন্দ্র শীলের এক ছেলে বিমল শীল বাঁশের ছাদ ভেঙে নিচে পড়ে যান এবং পার্শ্ববর্তী ধান ক্ষেতে লুকিয়ে থাকেন। পরে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় পাড়া-প্রতিবেশীরা উদ্ধার করেন।

পরিবারটি ধন-সম্পদের মালিক না হলেও তাদের কিছু জমিজমা অছে এবং এই জমি দখল করার জন্য স্থানীয় প্রভাবশালী কোন কোন লোক দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করে আসছিল। তেজেন্দ্র শীল কোনোভাবেই নিজেদের জমি হস্তান্তর করতে রাজি না হওয়ায় জোর করে তাকে দিয়ে কিছু কাগজপত্র সই করিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যেই তার বাড়ি ঘেরাও করে হামলা করা হয়। সরকারি মহল থেকে এ ঘটনাকে নিছক ডাকাতি বলে প্রচার করলেও এর সঙ্গে ডাকাতির কোন সম্পর্ক নেই। প্রথমত, ডাকাতি করে হস্তগত করার মতো কোন সম্পদ সে বাড়িতে ছিল না। দ্বিতীয়ত, ডাকাতি করতে না পারার ফলে দাহ্য পদার্থ দিয়ে বাড়িতে আগুন দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে মারা নিছক কোন ডাকাতের কাজ হতে পারে না। এর সঙ্গে সম্পত্তি দখল অর্থাৎ জমি দখলের সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

বাঁশখালীর এ ঘটনার একদিন পর ২০ নবেম্বর রাতে পাবনা জেলার আতাইকুলা উপজেলার লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের প্রত্যন্ত সোনাবাজার বিলে হামলা চালিয়ে ঘুমন্ত ৫ ব্যক্তিকে গুলি ও জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। উত্তরপাড়ার গ্রামের অধিবাসী এই নিহত ব্যক্তিরা হলেন— লোকমান শেখ, আবদুল মালেক, জাভেদ শেখের ছেলে নান্টু, আনসার আলী এবং টিপু। এরা পাঁচজনই সোনাবাজার বিলে একটি ছোট বাঁওড় ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। এদের বয়স ১৯ থেকে ২৪ বছর। এরা কোন ভূ-সম্পত্তির মালিক নন।

সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী (যুগান্তর ২১.১১.০৩) নিহতদের আত্মীয়-স্বজনরা জানান, তারা বিলে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত। কোন সম্পত্তির বিষয়কে কেন্দ্র করে এদের ওপর আমণ হয়নি। কোন এক সূত্রের বক্তব্য অনুযায়ী. এরা নিহত হয়েছে চরমপন্থী নামে পরিচিত এক ধরনের কথিত রাজনৈতিক গ্রুপের দুই অংশের দ্বন্দ্বের কারণে। অন্য সূত্রমতে, এরা নিহত হয়েছে এই কথিত চরমপন্থী ও স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতার দ্বন্দ্ব ও শক্রতার কারণে। ধরা যেতে পারে, এ ঘটনা ঘটেছে রাজনৈতিক পরিচয়ের ছদ্মাবরণে এক ধরনের লুটপাটকারী ও সন্ত্রাসীদের দ্বারা।

২০ নবেম্বর ঝালকাঠিতে যুবলীগের এক নেতা ও তার ভাইয়ের পরিবারের নয়জনকে পুড়িয়ে মারার জন্য তাদের ঘরে আগুন দেয়া হয়। সদর উপজেলার শেখেরহাট পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র থেকে ১০০ গজ দূরে রাজপাশায় এ ঘটনা ঘটে। যুবলীগ নেতা স্বপন খান ও তার ভাই রিয়াজুর রহমান খানের পাশাপাশি ঘর। রাত ১২টার দিকে দুর্বৃত্তরা ঘরের দরজার বাইরে তালা ঝুলিয়ে চারদিকে কেরোসিন দিয়ে ভেজানো চট বিছিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনে স্বপন খান, তার শিশুপুত্র মা, বোন ও বোনের ছেলে অগ্নিদগ্ধ হন। তার স্ত্রীও আহত হন। আগুনে দুটি টিনের ঘর মালপত্রসহ সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়েছে।

ঘটনার পর দুর্বৃত্তরা বাড়ির আঙিনায় একটি কাপড়ের ব্যানার টাঙিয়ে গেছে যাতে ভুল বানানে লেখা ছিলঃ 'সন্ত্রাসী দমন অভিযান/সন্ত্রাসীকে আশ্রয় দিলে এরকম হবে। সমালোচনা না করে ভাল থাকবেন/পুলিশ ভাইগণ, কাউকে মিথ্যায় জড়াবেন না, আমরা বিদেশী। সবাই সুখে থাকুন। আল-হ হাফেজ/বিশ্ব সন্ত্রাস দমন কমিটি।' (যুগান্তর ২২.১১.০৩)।

ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ বলেন, 'স্বপন খান ও বাদল খানরা সন্ত্রাসী। এলাকাবাসী তাদের কাছে জিম্মি। আগুন লাগানোর ঘটনাটি অমানবিক হলেও গ্রামবাসী খুশি হয়েছে। এ ঘটনা এলাকার কেউ ঘটায়নি। বাইরের লোক করেছে।' ঘটনা ঘটার পরপরই

একজন পুলিশ অফিসারের পক্ষে এ ধরনের কথাবার্তা বিস্ময়কর এবং বিপজ্জনকভাবে দায়িত্বহীন। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে পুলিশের এই আচরণ প্রায় স্বাভাবিক আচরণে পরিণত হয়েছে। দুষ্কৃতকারীরা এলাকার লোক নয়- এ কথা বলে পুলিশের নিশ্চিত থাকা এবং নিজেদের টাঙানো ব্যানারে নিজেদের বিদেশী বলে উলে-খ করা থেকে এটাই মনে হয়, দুষ্কৃতকারীরা এলাকারই লোক, তারা স্থানীয়। পুরো ঘটনাটি স্থানীয় দুই রাজনৈতিক গ্রুপের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কারণেই ঘটে থাকবে। এখানে মূল লক্ষণীয় বিষয় হল, অপরাধ বা ক্রাইমের ধরন। ২১ নবেম্বর শুক্রবার, ২৭ রমজান ঢাকার নাখালপাড়ায় একটি কাদিয়ানী মসজিদ ও সেখানে অবস্থিত কাদিয়ানীদের ওপর হাজার হাজার লোক এক হামলা চালায়। খতমে নবুয়ত আন্দোলন সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে কিছু দিন থেকে একদল মোল-া কাদিয়ানী মসজিদটি দখল করার চেষ্টা করে আসছিল। খতমে নবুয়তের প্রধান দাবি হল, কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা। এই কমিটির নেতা তেজগাঁও শিল্প এলাকার রহিম মেটাল জামে মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে ২০ নবেম্বর বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে হাজারখানেক লোক কাদিয়ানী মসজিটিকে ঘেরাও করে। সেখানে নামাজ পড়ার নাম করে ঢুকে মসজিদটি দখল করাই ছিল এই ঘেরাওয়ের উদ্দেশ্য। পুলিশ বাধা দেয়ায় তখন সেটা সম্ভব হয়নি। পরদিন শুক্রবার জুমার নামাজের পর কয়েক হাজার লোক উপরোক্ত খতিবের নেতৃত্বে নাখালপাড়া কাদিয়ানী মসজিদটির দিকে অগ্রসর হলে পুলিশ তাদের বাধা দেয় এবং সেই বাধার মুখে মিছিলকারীরা পুলিশের ওপর ইট-পাটকেল ছোঁড়ে। পুলিশও তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে। এ খবর পেয়ে তেজগাঁও শিল্প এলাকার ১০টি মসজিদ থেকে আরও হাজার হাজার লোক এসে অন্যদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং কাদিয়ানী মসজিদে ঢোকার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। এর ফলে পুলিশ ও মোল-াদের মধ্যে মারামারি আরও বিস্তৃত হয়। সমগ্র এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ লোকেরা মহাখালী বাসস্ট্যান্ড পুলিশ ফাঁড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। তবে পুলিশের বাধার মুখে শেষপর্যন্ত বিকেলের দিকে আক্রমণকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়। তার আগে খতিবের নেতৃত্বে 'খতমে নবুয়ত কমিটির' পক্ষ থেকে এক কর্মসূচি ঘোষণা করে বলা হয়, ৫ ডিসেম্বর জুমার নামাজের পর একটি প্রতিবাদ মিছিল করে তারা কাদিয়ানী মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য অর্থাৎ সেটি দখল করার জন্য মসজিদ ঘেরাও করবে।

কাদিয়ানীদের ওপর এ ধরনের আক্রমণ নতুন নয়। জামায়াতে ইসলামী কর্তৃক কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার ক্রিমিনাল তৎপরতার ইতিহাস নতুন নয়। ১৯৫৩ সালে জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নেতা মওদুদীর নেতৃত্বে পাকিস্তানের লাহোরে এক ভয়ংকর দাঙ্গায় হাজার হাজার কাদিয়ানী নিহত হন। এই কাদিয়ানী দাঙ্গা সংক্রান্ত এক মামলায় পাকিস্তানের সুপ্রিমকোর্ট মওদুদীর ফাঁসির আদেশ দেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে জামায়াতের তৎপরতা চলতে থাকে। এর ফলে পাকিস্তানে এখন কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাদের ওপর নানাভাবে নির্যাতন চলছে।

বাংলাদেশেও জামায়াতে ইসলামী কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে ওই একই রকম তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। মাত্র কয়েক বছর আগে ১৯৯২ সালে ঢাকার বকশীবাজারে কাদিয়ানীদের প্রধান জামাতখানা আক্রমণ করা হয়। ১৯৯৯ সালে খুলনায় একটি কাদিয়ানী মসজিদে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কয়েকজন কাদিয়ানীকে হত্যা করা হয়। সম্প্রতি যশোরের একটি কাদিয়ানী মসজিদের ইমামকে এই ধর্মান্ধ লোকেরা হত্যা করেছে। কুষ্টিয়াতেও কাদিয়ানীরা একইভাবে একই ধরনের লোকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন।

জামায়াতে ইসলামী সরকারি ক্ষমতায় আসার আগে যেভাবে খোলাখুলি কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে নানা তৎপরতায় লিপ্ত থাকত, এখন সেটা আর সম্ভব হয় না। তাদের রাজনৈতিক

স্বার্থেই এটা তারা এখন প্রকাশ্যে করে না। তবে অন্য সংগঠন খাড়া করে সেগুলোর মাধ্যমে তাদের এই তৎপরতা তারা আগের মতোই বজায় রেখেছে। এর সঙ্গে সরকারি আশ্রয়-প্রশ্রয়েরও সম্পর্ক আছে। বাধ্য হয়ে কাদিয়ানী মসজিদ দখল করা বন্ধের জন্য তারা পুলিশ নামিয়েছে। কিন্তু অন্য কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। ঘটনার পর এক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হওয়া দরকার ছিল রহিম মেটাল জামে মসজিদের খতিব ও তার প্রধান সাঙ্গপাঙ্গদের গ্রেফতার করা। সে সঙ্গে অন্য আইনগত পদক্ষেপও গ্রহণ করা। কিন্তু এসবের কিছুই হয়নি। কাজেই ৫ ডিসেম্বর খতিবের নেতৃত্বে আর এক দফা কাদিয়ানীবিরোধী তৎপরতার পথ খোলা রাখা হয়েছে।

২৪ নবেম্বর সোমবার রাত দেড়টায় চট্টগ্রামের হাটহাজারীর উত্তর গুমানমর্দন কুতুব বাড়িতে একদল দুষ্কৃতকারী একটি টিনশেড ঘরে আগুন লাগিয়ে একই পরিবারের ১০ জনকে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা করে। এ সময় আক্রান্ত ঘরের গৃহকর্তা নতুন টিনশেড ঘরটির পরিবর্তে পুরনো ঘরটিতে যাওয়ার ফলে তারা প্রাণে বেঁচে যান কিন্তু টিনশেড ঘরসহ পার্শ্ববর্তী অন্য একজনের ঘর সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়। গৃহকর্তা শফিউল আমল চৌধুরী ও তার প্রতিবেশী জাকির হোসেন সপরিবারে রক্ষা পেলেও কয়েক লাখ টাকার মালামাল ও গবাদিপশু এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে ধ্বংস হয়।

ঈদের ছুটির পর ২৯ নবেম্বর প্রকাশিত সংবাদপত্র রিপোর্ট (যুগান্তর) থেকে দেখা যায়, ঈদের ছুটির সময় সারাদেশে নানা প্রকার সহিংসতার ঘটনায় ৪১ জন খুন হয়েছেন।

১৯ থেকে ২৪ নবেম্বর পর্যন্ত মাত্র কয়েক দিনের কয়েকটি ঘটনাই এখানে উলে-খ করা হলো। এর আগে ও পরে এ ধরনের ঘটনা প্রত্যেক দিনই একের পর ঘটছে। এসব ঘটনা সব ধরনের সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগুরু অর্থাৎ বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

সারাদেশে বিরাজমান এই পরিস্থিতিতে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন যে বৃদ্ধি পাবে এবং বেপরোয়া হবে এটাই স্বাভাবিক। কারণ, সংখ্যাগুরুরা নির্যাতিত এবং আক্রান্ত হলেও সমাজের অপেক্ষাকৃত দুর্বল অংশ হিসেবে সংখ্যালঘুরা আরও বেশি করে এই নির্যাতনের শিকার হন। এ দিকটির প্রতি খেয়াল রেখে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের বিষয়টি সামগ্রিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার-বিশে-ষণ করতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। কারণ, সামগ্রিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যাটিকে না দেখলে বোঝাই যাবে না বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন কেন আজ এ পর্যায় এসে দাঁড়িয়েছে।

আসলে ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে। প্রথমে উর্দুভাষী অবাঙালিদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালানো হয়েছে। তাদের বিপুল সংখ্যককে হত্যা এবং তাদের প্রায় সবার ধন-সম্পদ, বাড়িঘর লুটপাট ও দখল করা হয়েছে। এই সঙ্গে শত্রু সম্পত্তি আইন রদ না করে তার নাম পরিবর্তন করে 'অর্পিত সম্পত্তি আইন' রেখে তার আওতায় ব্যাপকভাবে হিন্দু সম্পত্তি দখল করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ নামধারী আওয়ামী বাকশালী সরকার আমলেই এই লুণ্ঠন ও দখল হয়েছে ব্যাপকভাবে। বস্তুতপক্ষে তখন থেকেই সাধারণভাবে সারাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে লুটপাট দখল ও নির্যাতনের এক মহোৎসব যা এখনও পর্যন্ত জারি আছে। শুধু তাই নয়, এটা আরও ব্যাপক ও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এই পরিস্থিতিতে যেখানে দেশের সংখ্যাগুরু জনগণের জীবন, সম্মান ও সম্পত্তির কোন নিরাপত্তা নেই সেখানে সংখ্যালঘুর জীবন, সম্মান ও সম্পত্তি নিরাপদ থাকবে এটা এক অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই বাংলাদেশে সংখ্যালঘুর ওপর নির্যাতন শুধু জারি আছে তাই নয়, ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে সংখ্যাগুরুর ওপর নির্যাতন।

সারাদেশে ১৯৭১ সালের পর থেকে যে দুর্বৃত্ত শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে এবং যারা এক ধারাবাহিক

অগ্রগতির মাধ্যমে এখন ক্ষমতার শীর্ষস্থানগুলো দখল করেছে তারা সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণের ওপর শোষণ-নির্যাতন বেপরোয়াভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। কাজেই এক্ষেত্রে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু এক অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্রে সম্পর্কিত। একের সমস্যা অন্যের সমস্যা থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে দেখার কোন সুযোগ নেই। তবে যেহেতু এই নির্যাতন সংখ্যালঘুর ওপর অনেক ক্ষেত্রেই বেশি হয়, সে জন্য এর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন আছে।

দেশের সংখ্যাগুরু বলতে যে সাধারণ মানুষকে বোঝায়, তারা সংখ্যালঘুর ওপর কোন নির্যাতন করছেন না। কোন সময়ই করেন না। তবে মতলববাজ জনশত্রুরা অনেক সময়ই বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে গণবিরোধী কাজে প্ররোচিত ও লিপ্ত করে থাকে। তারা নিজেদের ভাড়া করা লোক লাগিয়ে সরাসরি অনেক আ□মণ ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটিয়ে থাকে যেমন তারা এটা ঘটিয়েছে চট্টগ্রামের বাঁশখালীর সাধনপুর গ্রামে।

একটি দেশের শাসক শ্রেণী যদি এসব □িমিনাল কাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়, যদি তারা সত্যি সত্যি এর বিরুদ্ধে পদেক্ষপ নিয়ে নির্যাতনকারী শক্তিকে নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর থাকে, তাহলে এ ধরনের ঘটনা ঘটা সম্ভব হয় না। কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থা এদিক দিয়ে এমন যে ক্ষমতাসীন শ্রেণী ও ক্ষমতাসীন সরকারের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে সারাদেশে দুষ্কৃতকারীরা নানা অপরাধপূর্ণ তৎপরতা সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু নির্বিশেষে জনগণের বিভিন্ন অংশের বিরুদ্ধে অব্যাহত রেখেছে। উপরে মাত্র কয়েকদিনের সব ঘটনা না হলেও যেসব ঘটনার উলে-খ করা হল, তার থেকেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার কথা।

এই পরিস্থিতিতে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে সোচ্চার থাকা ও প্রতিবাদ করার প্রয়োজন অনস্বীকার্য হলেও এর বিরুদ্ধে কোন কার্যকর ও ফলপ্রসূ প্রতিরোধ গড়ার জন্য প্রয়োজন সংখ্যালঘুর সমস্যা সংখ্যাগুরুর সমস্যা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু ব্যাপক ও মিলিত গণতান্ত্রিক সংগ্রাম গড়ে তোলা। সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু নির্বিশেষে এই গণতান্ত্রিক সংগ্রামই এদেশের জনগণের শোষণ-নির্যাতন থেকে মুক্তির একমাত্র পথ। এছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

যুগান্তর, ৩ ডিসেম্বর ২০০৩

বিএনপি-জামাতের রাজনীতি

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

বিএনপি-জামাতের রাজনীতি সংখ্যালঘু সমাজ, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি প্রবল বৈরী অবস্থান গ্রহণ করেছে। এই রাজনীতি মুসলিম ঐতিহ্য ও মনোলিথিক ইসলামের সঙ্গে নেগোশিয়েট করে একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই পর্যায়টির প্রস্তাবনা হচ্ছে : বাংলাদেশের মতো আধা-শিল্পোন্নত সমাজে যেখানে মুসলিম ঐতিহ্য ও মনোলিথিক ইসলাম □িয়াশীল, যেখানে কোনো সমাজ-বিপ-ব ঘটেনি, সেখানে এসব জীবন্ত থেকে রক্ষণশীল, কর্তৃত্ববাদী ও জাতীয়-জঙ্গি ইসলামিক চাপ তৈরি করা। এই চাপ স্পষ্ট রাজনীতির কলাকৌশলে, ধর্মবিচারে, ধর্মব্যবহারে। এই চাপ হচ্ছে ফ্যাসিস্ট প্রবণতা।

বাঁশখালীর ১৩ জন হিন্দু সাধারণ মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করা, কুষ্টিয়ায় আহমদীয়া ইমাম হত্যা করা, তেজগাঁওয়ে আহমদীয়া মসজিদ দখল প্রচেষ্টা প্রমাণ করেছে বিএনপি-জামাত রাজনীতির স্বরূপ এবং অন্যপক্ষে প্রমাণ করেছে সেক্যুলার রাজনীতি উদ্ভূত সেক্যুলার সমাজের প্রয়োজন। বাংলাদেশের সংকট থেকে তৈরি হয়েছে অদ্ভুত ও বিপজ্জনক পরিস্থিতি, যেখান থেকে উত্থিত হয়েছে বিএনপি-জামাত-ইসলামী ঐক্য জোটের রাজনীতি, যে-রাজনীতি প্রান্তিক অবস্থান থেকে ধীরে ধীরে অর্জন করেছে সামাজিক সর্মথন এবং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক কল্পনার ওপর বিস্তার করেছে এক ধরনের আধিপত্য। একটি পরিবৃদ্ধিশীল বাজার অর্থনীতি বিশ্বায়নের সময়ে একটি জঙ্গি জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ খুঁজছে। যে মতাদর্শ বিভাজিত ও প্রতিযোগী স্বার্থের মধ্যে সিমেন্টের মতো কাজ করবে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদের অবসন্নতার পর, একটি দক্ষিণপন্থী, আধা-ফ্যাসিস্ট, যুক্তিহীন, বাজার-বান্ধব মতাদর্শ একটি জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ হিসেবে কাজ করছে। এই সময়কার বাংলাদেশে শুধু সাম্প্রদায়িকতা বনাম সেক্যুলারিজমের লড়াই হচ্ছে তা নয়, এই লড়াই বিকল্প সমাজ নির্মাণ এবং যেকোনো ধরনের ফ্যাসিজমের (বিএনপি/জামাত/ইসলামী ঐক্যজোট) মধ্যে। এই লড়াইয়ে সেক্যুলারিজম অবশ্যই একটি প্রয়োজনীয় ভিত্তি কিন্তু যথেষ্ট ভিত্তি নয়। ফ্যাসিস্টিক সাম্প্রদায়িকতা পরাজিত করা সম্ভব যদি আমরা বৈপ-বিক ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় কম্যুনিটি নির্মাণ করতে সমর্থ হই।

বিএনপি-জামাত-ইসলামিক ঐক্যজোটের ফ্যাসিস্টিক জাতীয়তাবাদ একদিকে বাংলাদেশ থেকে হিন্দুত্ব উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছে অন্যদিকে সুন্নী ইসলামের মধ্যে □িয়াশীল শিয়া ও আহমদীয়া উপধারাকে মুসলিম সমাজ থেকে বহিষ্কার করার চেষ্টা করছে। এই কাজ, এই প্রবণতা হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধানের ওপর বিএনপি-জামাত-ইসলামী ঐক্যজোটের ফ্যাসিস্ট আ□মণ। প্রতিটি দেশ তার নিজের মতো ফ্যাসিজম অর্জন করে। ফ্যাসিজমের ঐতিহাসিক ধরন কোনো একটি দেশের ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মজ চরিত্র থেকে উদ্ভূত হয় এবং ঐ দেশের সবরকম অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়।

বিএনপি ও জামাত এবং ইসলামী ঐক্যজোট পৃথক পৃথকভাবে এবং একসঙ্গে মুসলমানত্বের যে উদ্দেশ্য তৈরি করেছে, সে উদ্দেশ্য প্রধানত এসব রাজনৈতিক দলের কাজ, সাংগঠনিক নীতি, মতাদর্শিক প্রণয়ন ও প্রোগ্রামের ফ্যাসিস্টস্বরূপ স্পষ্ট করে তুলেছে। বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগের পতনের পর থেকেই পরিকল্পিতভাবে মুসলমানত্বের শক্তিগুলো নাটকীয়ভাবে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। এই শক্তিগুলো উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনকালে, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে বিলীয়মান হচ্ছিল। তাদের অবস্থান ছিল রাজনৈতিক পলিটিক্স প্রান্তে। একই সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, সেক্যুলার সিভিলিটির রাজনীতি পূর্বে তৈরি

না হলে সাংবিধানিক গণতন্ত্র ও সমতার আদর্শ ধরে রাখা সম্ভব নয়।

১৩ জন হিন্দুকে পুড়িয়ে মারা, কুষ্টিয়ায় আহমদীয়া ইমাম হত্যা ও তেজগাঁওয়ে আহমদীয়া মসজিদ দখলের প্রচেষ্টা, খুলনায় থেকে থেকে শিয়া বিরোধী দাঙ্গার মতো ঘটনা মূলত ফ্যাসিস্ট চরিত্রসুলভ। এসব ঘটনার স্বরূপ, মবিলাইজেশনের পদ্ধতি, বিএনপি, জামাত ও ইসলামিক ঐক্যজোটের ক্যাডার বাহিনীর কাঠামো এবং নির্দিষ্ট মতাদর্শিক ধরন বিশে-ষণ করা জরুরি। এসবের মধ্য দিয়ে বিএনপি, জামাত ও ইসলামিক ঐক্যজোট সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিজম প্র্যাকটিস করে ও সংখ্যালঘুবিরোধী উগ্রতা প্রচার করে।

সাধারণত এ ধরনের ঘটনা ঘটার পর খালেদা জিয়ার জোট সরকার দুর্বৃত্তদের শাস্তি দেয়ার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে না, সাক্ষীপ্রমাণ ও ফটোগ্রাফিক নমুনা থাকা সত্ত্বেও। দুর্বৃত্তদের তাদের সাঙাতদের ও তাদের নেতাদের আইডেনটিটি জানা সত্ত্বেও জোট সরকার চুপ করে থাকে, তার প্রধান কারণ এই সরকার দুর্বৃত্তদের সরকার। সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদিতা এসব রাজনৈতিক দল বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকে, আইনানুগতা ও আইন বহির্ভূততা একই সঙ্গে ব্যবহার করে থাকে। একই সঙ্গে নির্মাণ করে মিথিক ইতিহাস (বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে), এই মিথিক ইতিহাস নির্মাণ বিএনপি, জামাত ও ইসলামী ঐক্যজোটকে বাস্তব ইতিহাসের ঊর্ধ্বে নিয়ে যাওয়ার দরুন এভাবে তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের ফ্যাসিস্ট শক্তি।

এসব কারণে বিএনপি, জামাত ও ইসলামী ঐক্যজোট শুধু সাম্প্রদায়িকতার প্রতিভূ নয়, তার শিকার সংখ্যালঘু সমাজ, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়। বিএনপি, জামাত ও ইসলামী ঐক্যজোটের মূল লক্ষ্য শুধু হিন্দুদের পদানত করা নয়, রাষ্ট্রক্ষমতা করতলগত করে রাখা, বাংলাদেশকে রাজনৈতিক, মতাদর্শিক, ঐতিহাসিকভাবে পুনর্নির্মাণ করা। বাংলাদেশের পুনর্নির্মাণ প্রজেক্টের লক্ষ্য : অতীত ও বর্তমানের একটা বড়ো অংশ প্রত্যাখ্যান করা (বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা)। এই প্র�য়ায় ইতিহাস নির্মাণের অর্থ আমাদের সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী এবং কমিউনিস্ট ইতিহাস প্রত্যাখ্যান করা, ঐতিহ্যের নামে নারীদের পুনরায় গৃহবন্দী ও নজরদারি করা, আমাদের বুদ্ধিবাদী ও সাংস্কৃতিক উৎপাদনের উজ্জ্বলবাদিতা নিয়ন্ত্রণ করা, বিএনপি-জামাত-ইসলামী ঐক্যজোট বিরোধীদের ও সংখ্যালঘুদের একটি কর্তৃত্ববাদী স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রের মধ্যে পদানত করা। বিএনপি, জামাত ও ইসলামী ঐক্যজোট নির্মিত রাষ্ট্রীয় সাম্প্রদায়িকতা (ইহুদী বর্ণবাদের নামান্তর) হচ্ছে বাংলাদেশের রক্তক্ষরণ, বারবার, ঘুরে ঘুরে।

ভোরের কাগজ, ৫ ডিসেম্বর ২০০৩

খাসিয়াদের দিনযাপন

বাঁধন আরেং

স্থানীয়ভাবে বনের গাছপালা আদিবাসী খাসিয়াদের শত জনমের সাধারণ মূর্ত প্রতীক। খাসিয়া শিশুদের জন্ম হয় গাছের ছায়ায়, বেড়ে ওঠে সেখানেই। মৃত্যুর পর কবর হয় ছায়াময় বনবিথীকায়। তাদের জীবনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড (অন্তত বাংলাদেশে) বনের গাছপালাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। বনবাসী খাসিয়াদের জীবন সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করে পাহাড়ি মাটি ও বৃক্ষের নির্যাস থেকে।

দেশের পূর্বাঞ্চলের জেলা মৌলভীবাজারের পূর্বদিকের উপজেলা কুলাউড়ার দুর্গম পাহাড় ও বনাঞ্চলসহ সিলেট ও সুনামগঞ্জের প্রত্যন্ত এলাকায় ১২ হাজারেরও বেশি খাসিয়া বাস করে। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা ঘেঁষা গভীর অরণ্যের আদি বাসিন্দা খাঁসিয়ারা মংগোলীয় পরিবারভুক্ত, গারোদের মতো মাতৃতান্ত্রিক সমাজের মানুষ। তাদের নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং জীবনধারার একটি স্বাতন্ত্র্য ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য বিকাশ লাভ করেছে। ভিটামাটির প্রতিটি কণা, আবহাওয়া, বৃক্ষ এবং সবকিছুর সঙ্গেই তাদের আত্মার বন্ধন সুদৃঢ়। পাহাড়ের ওপর গড়ে ওঠা পরিবারগুলো নিয়ে এক একটি পুঞ্জি গঠিত হয়। পাড়া বা গ্রামকে স্থানীয়ভাবে পুঞ্জি বলে। পুঞ্জির প্রধানকে মন্ত্রী বলে। তিনি শান্তি-শৃঙ্খলাসহ প্রজাদের সঙ্গে খোলামেলা আলাপচারিতায় তাদের ক্ষোভ ও বেদনা নিয়ে অনিশ্চিত দিন যাপনের কারণগুলো প্রকাশ পায়। সহজ-সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত খাসিয়াদের অবস্থা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। পাহাড়ের ওপরে সবকিছুই সাজানো গুছানো, মনে হয় ওরা সুখেই আছে। কিন্তু কাছাকাছি থেকে কথা বললে উপলব্ধি করা যায় কত উদ্বেগ ও অস্থিরতায় তারা দিন কাটায়। ২০০২ সালের ২৬ জুলাই একজন স্থানীয় বন কর্মকর্তার নেতৃত্বে কুলাউড়া এলাকার ফুলতলা পুঞ্জি ধ্বংস করে কিভাবে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করেছিল সেদিনের ঘটনা স্মরণ করে এলাকার খাসিয়ারা এখনও আতংক বোধ করে। ৪/৫শ' জনের স্থানীয় অ-আদিবাসী সশস্ত্র দল মারধর ও একজনকে গুলি করে হত্যা করে পুঞ্জিতে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল, বাড়িঘর জ্বালিয়ে গাছপালা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল। আত্মরক্ষার জন্য তীর ছুঁড়ে প্রতিপক্ষের দু'একজনকে আহত করলেও আদিবাসীরা প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এর পরের ঘটনাগুলো মর্মস্পর্শী।

সমতলের ক্ষমতা ও রাজনৈতিক চ�জালের শিকার হওয়ার কথা বলছিলেন অনেক পুঞ্জিবাসী। তাদের মতে ন্যায্যতার পক্ষে কেউ কাজ করে না। থানা বা জনপ্রতিনিধি সবাই সমান, কেউ প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ন্যায়-অন্যায় বিচার করে না। জুমের গাছ চুরি করা, মহিলাদের উত্ত্যক্ত করা, পানলতা কেটে ফেলা এসব নিত্যদিনের ঘটনা। প্রতিদিনই ক্ষতির শিকার হয় কিন্তু এসবের কোন প্রতিকার নেই। বনে যারা বাস করে এসব ক্ষতি যেন তাদের প্রাপ্য। তাদের এক একটি দিন ধৈর্যশক্তি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পার হয়। ১৯৯৯ সালের শেষ দিকে চৈলতাছাড়া পুঞ্জির মন্ত্রী গ্রেগরি নকরেকের বাড়িঘর ধ্বংস করে ভিটা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। দুষ্কৃতকারীরা দেড় বছরের শিশুসহ পরিবারের ৪ মহিলাকে ধরে নিয়ে আটকে রেখেছিল। প্রাণের ভয়ে গ্রেগরি নকরেক কোথায় পালিয়েছেন তার হদিস মেলেনি। পাল্টাপাল্টি মামলা হয়েছিল তারও আর কেউ খোঁজ নেয় না। আদিবাসীদের ধরে নিয়ে গিয়ে আটক রাখা এখানকার স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হচ্ছে। ৩ জুলাই ২০০৩ নার্সারি পুঞ্জির আলেক্স ঘাগ্রা নামের একজনকেও জুমের পান চুরির মিথ্যা অভিযোগ করে ধরে নিয়ে গিয়ে কয়েকদিন আটক রেখেছিল। এ নিয়ে পুঞ্জিবাসীদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়েছিল। এক পর্যায়ে উত্তেজনা সৃষ্টি

হয়, ছেড়ে দেয়ার পর পরিস্থিতি শান্ত হয়।

খাসিয়ারা পুঞ্জি থেকে উচ্ছেদ হলে তাদের আর অন্য কোথাও যাওয়ার উপায় থাকবে না। কেননা তাদের জীবিকার একমাত্র উপায় পান চাষ। পান চাষের জন্য প্রয়োজন গাছপালা। ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে বড় গাছ পালন করা হয়। তাতে প্রতিটি গাছের গোড়ায় পান চারা লাগানো হয়। গাছের কাণ্ড বেয়ে বেড়ে ওঠে পানলতা। ছড়াতে থাকে পাতা আর লতা। লতা যত ছড়ায় পানপাতা তত বাড়ে। পানপাতা বাড়া মানেই ভাল ফলন। ভাল ফলন মানেই টাকা আসবে। টাকা আসা মানেই স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন। কিন্তু পান চাষ কঠিন পরিশ্রমের কাজ। পাহাড়ে ওঠানামা করে, ঘুরে ঘুরে প্রতিটি পানলতার যত্ন নেয়াসহ গাছের ডাল ছেঁটে দেয়া, পান পাতা সংগ্রহ করা, কোন পানলতা ভাইরাস আ্রান্ত হয়েছে কিনা দেখাশোনা করা; পাতা গুছানো কাজগুলো নারী-পুরুষ সমানভাবেই করে থাকে। তবে বিি্র জন্য বাজারে যেতে হয় না। পাইকারি েতারা এসে নিয়ে যায়।

খাসিয়াদের উদ্বেগের মূল কারণ পাহাড়ি জমি ও পান ব্যবসা। তারা যে জমিতে বসে এবং পান চাষ করে এসবই এক সময় ছিল জমিদারদের। জমিদারি প্রথা বিলোপের পর খাস হিসেবে বর্তমানে সরকারের জমি। জমিদারদের আমলে পত্তনি নিয়ে তারা পান চাষ করত। তারও আগে থেকেই পুরুষানু্মে খাসিয়ারা পান চাষ করে আসছে। সেই সূত্র ধরেই এখনও তারা বাপ-দাদাদের পেশা ধরে রেখে পান চাষ করেই জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। খাসিয়াদের মধ্যে ধান চাষী নেই বললেই চলে। অন্য কোন পেশার সঙ্গেও তাদের তেমন সম্পর্ক নেই। সরকারি বা বেসরকারি চাকরিতেও দেখা যায় না। ব্যবসার কথা বললে পান ব্যবসাকেই বলতে হবে। পান চাষ একটি শিল্পও বটে। কাজেই খাসিয়াদের বনভূমি কেড়ে নেয়া মানে মানবাধিকারের চরম লংঘন। বর্তমানে Associvation for Participation in Development সংক্ষেপে APS নামে ইটালিভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা খাসিয়াদের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে সংস্থাটি স্থানীয় খাসিয়াদেরই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় আদিবাসীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বন রক্ষা ও বনের উন্নয়নের জন্য তাদের প্রচেষ্টা বাঁচামরা সম্পর্কযুক্ত। তাদের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও সামাজিকতা সব কিছুই পান চাষ তথা বন ও বনভূমি থেকে উদগত। পান চাষী কৃষকরা সহযোগিতা লাভ করলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে। কর্মসংস্থানের একটি ক্ষেত্রও প্রসারিত হবে। যুগ যুগ ধরে এলাকায় বসবাসের কারণে ভূমির উপর তাদের স্বাভাবিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে অধিকার তারা ভোগ করতে পারে না। স্থানীয়ভাবে নানা জটিলতা সৃষ্টি করে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল আদিবাসীদের অধিকার হরণ করে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখে।

অন্যদিকে নির্বাচনে জয় বা পরাজয় হলে স্থানীয় নেতা ও জনপ্রতিনিধিদের আসল রূপ প্রকাশ পায়। গণতন্ত্রের আড়ালে লুকায়িত দেশের জাতীয় রাজনীতির স্বরূপ গ্রামাঞ্চলের সাধারণ জনগণের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে বিশেষ করে আদিবাসীদের ক্ষেত্রে বিষয়টি সুস্পষ্ট। সরকার চাইলে আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা সমাধান দিতে পারে কিন্তু রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন। জমির মালিকানা আদিবাসীদের হাতে তুলে দিলে সরকারের রাজস্ব বাড়বে। এলাকার জনগণ বিশেষ করে ভূমিজ সন্তান আদিবাসীরা রাজস্ব দিয়ে ভূমির মালিকানা স্থায়ী করার পক্ষেই মত প্রকাশ করছে। তারা চায় সরকার যেন যথাযথ আইনগত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জমির স্বত্ব প্রকৃত এবং বর্তমান ভোগ দখলির কাছেই ফিরিয়ে দেয়। অপ্রিয় হলেও সত্য যে ভূমি সমস্যার মতো আদিবাসীদের মৌলিক কোন বিষয় নিয়ে কাজ করে কোন সরকারই স্বাধীনতার ৩ দশক পরও সার্বজনীন গণতান্ত্রিক মানসিকতার প্রকাশ ঘটাতে পারেনি। রাজনৈতিক

ছত্রছায়ায় থেকে একশ্রেণীর মুখোশধারী অপরাধী চ এলাকার আদিবাসীদের ওপর হয়রানি ও অত্যাচার করে যাচ্ছে। উদাসীনতা ও আন্তরিকতাহীন আচরণের কারণে আদিবাসীরা স্থানীয় প্রশাসনের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের সহায়ক শক্তি ভাবতে পারে না। আদিবাসীদের সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য চারপাশের চাপে কোণঠাসা হচ্ছে। বাংলায় ভাববিনিময় করা গ্রামাঞ্চলের অনেক খাসিয়ার জন্য এখনও সমস্যা হয়ে আছে। এ সমস্যার কারণে বাইরের কারও সঙ্গে খোলামেলাভাবে যোগাযোগ হয় না। বুকের ব্যথা যেন বুকেই থেকে যায়। ছেলেমেয়ে নিয়ে নিভৃতে বসবাস করতে চাইলেও তাদের উৎকণ্ঠার দিন শেষ হয় না। পুঞ্জির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা পড়ালেখা করে থাকে। কিন্তু প্রাথমিক স্কুল শেষে কোথায় যাবে এমন প্রশ্ন থেকেই যায়। তবে অভিভাবকরাও চেষ্টা করে যাচ্ছে। তারা উপলব্ধি করছে পান চাষ করে শুধু টাকা রোজগার করলে বাঁচা যাবে না। ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে হবে। তা না হলে ভবিষ্যৎ আরও খারাপ হবে। লক্ষণীয় যে খ্রিস্ট বিশ্বাসী খাসিয়ারা প্রতি রোববার নিজ ভাষায় ধর্মীয় উপাসনা করে থাকে। কাঠ ও বাঁশের তৈরি পরিচ্ছন্ন, পরিকল্পিত এবং আকর্ষণীয় খাসিয়াদের বাড়িঘর যেন তাদের অন্তর গৃহের নকশাই ফুটিয়ে তোলে। সচ্ছল পরিবারগুলোর ইটের তৈরি ঘরও রয়েছে। তাদের ঘরে জেনারেটরের বাতি জ্বলে, পানি সরবরাহ হয়। সেসব পরিবারের আসবাবপত্রসহ সবকিছুই আধুনিক। খাবার ঘর, শোবার ঘর, বসার ঘর, অতিথি ঘর, ধোয়ামোছার নির্ধারিত স্থান, পরিপাটি্ানঘর ও পায়খানা সব মিলিয়ে গহীন বলে পাহাড়ের চূড়ায় অন্য একটি সংস্কৃতির সুন্দর জীবন ফুটে ওঠে। অন্তত দু'-একটি বাড়ির সামনে পাথরের বড় কন্টেইনারে গ-াসসহ খাবার পানি রেখে দিতে দেখা গেছে যাতে তৃষ্ণার্তরা পান করতে পারেন।

কোন পুঞ্জিতেই স্বাস্থ্যসেবার কোন সুবিধা নেই। যে কোন ওষুধের প্রয়োজনে পাহাড় থেকে নেমে যেতে হয় কয়েক মাইল দূরে। মহিলাদের সমস্যার শেষ নেই। ১৯৯৮ সালে প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর নেত্রকোনার কলমাকান্দা এলাকা থেকে আসা আনন্দ চিসিম এলাকায় স্বাস্থ্য সেবার কাজ করে যাচ্ছেন। একদিন জুমে কাজ করতে গিয়ে মারাত্মকভাবে কেটে আহত এক ব্যক্তির চিকিৎসা করছিলেন আনন্দ চিসিম। তার মতে বাইরের কোন সাধারণ চিকিৎসককে আনলেও ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা ভিজিট দিতে হয়।

পুঞ্জিগুলোতে পানীয় জলের সমস্যা প্রকট। কোথাও কোন চাপকল দেখা যায়নি। পাহাড় থেকে নেমে যেতে হয় অনেক নিচে। উপরে পানি তুলে আনা মহিলাদের জন্য খুবই কষ্টকর। শুকনা মৌসুমে এ সমস্যা হয় আরও বেশি। পাহাড়ি ঝরনাগুলো শুকিয়ে যায় তখন খুঁজতে হয় নতুন পানির উৎস। পুঞ্জিগুলোতে দ্রব্যমূল্যও আকাশছোঁয়া। ডিমের হালি ২০ (কুড়ি) টাকা, বড় মোরগ (১ কেজির কম) ২০০-২২০ টাকা, মাছের কেজি সর্বনি ৮০ টাকা। বাড়িতে বসেই সবকিছু পাওয়া যায়। গৃহিণীরা অপেক্ষায় থাকেন দোকানিরা কখন আসবে। শাক-সবজিসহ সবকিছুই কিনতে হয়। দিন আনে দিন খায় অবস্থার মানুষদের কষ্টের শেষ নেই। পান চাষ একটি অনিশ্চিত কৃষিকাজ। যারা বেশি জমিতে বেশি বিনিয়োগ করে চাষ করে তাদের খুব বেশি সমস্যা হয় না। কিন্তু যারা স্বল্প জমিতে স্বল্প পুঁজি নিয়ে চাষ করে তাদের অনিশ্চয়তার মধ্যেই থাকতে হয়। পানলতা যদি ভাইরাস আ্রান্ত হয় তাহলে অবস্থা আরও খারাপ হয়। অনেকেই ঋণগ্রস্ত হয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

ইদানীং এলাকার আদিবাসীদের জন্য মরণফাঁদ হয়ে আছে ইকোপার্ক। ২০০১ সালের ১৫ এপ্রিল তৎকালীন সরকারের বন ও পরিবেশমন্ত্রী মরইছড়া ও মাধবকুণ্ড এলাকায় প্রায় ১৫০০ একর বনভূমির ওপর ইকোপার্ক প্রকল্প বাস্তবায়নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। শত শত খাসিয়া পরিবারের পান জমি প্রকল্পের আওতায় পড়ে যাওয়ায় জমি হারানোর ভয়ে তারা মরণপণ সংগ্রাম

চালিয়ে যাচ্ছে যাতে ইকোপার্ক না হয়। জমি হারালে খাসিয়াদের পরিবার-পরিজন নিয়ে কোথাও যাওয়ার জায়গা থাকবে না। বিনোদনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য আদিবাসীদের জায়গাজমি দখল করে নিলে মানবাধিকারের চরম লংঘন হবে।

যুগান্তর, ১৪ ডিসেম্বর ২০০৩

সাম্প্রদায়িকতা : আরেক রূপে

রাশেদ খান মেনন

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিণতি ঘটেছিল একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়। বস্তুত পাকিস্তান আমলের দীর্ঘ সময়কালে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম মুখ্য বিষয় ছিল। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাদের শাসনকে টিকিয়ে রাখতে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার অস্ত্রকেই বারবার ব্যবহার করেছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিভক্তি সৃষ্টি করার জন্য সাম্প্রদায়িক সহিংসতাকে পর্যন্ত উস্কে দিয়েছে। একাত্তরেও বাঙালি নিধন অভিযানে তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্যবস্তু করেছিল। অবশ্যই এটা অচিরেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আওয়ামী লীগ বা সংখ্যালঘু নয় সমস্ত বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করতে, তাদের চিরতরে পদানত রাখতেই তারা নির্বিচার গণহত্যা করেছে, সামরিক অভিযান চালিয়েছেন। বাংলাদেশের লড়াই সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানের মূলভিত্তি দ্বিজাতিতত্ত্বকে আবার প্রমাণ করেছিল। ঐ মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট বাংলাদেশ যে ঐ অসাম্প্রদায়িক ভিত্তির ওপর দাঁড়াবে, তার ভিত্তিতে দেশ পরিচালনা করবে, সেটাই স্বাভাবিক ছিল। বাংলাদেশে পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধের এ আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ঘটেছে সংবিধানে। বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির অন্যতম বলে ঘোষণা করা হয়। ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। একই সঙ্গে সকল ধর্মমত অনুসরণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়।

কিন্তু অসাম্প্রদায়িকতার যে ভিতের ওপর বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা তা বেশিদিন টেকেনি। বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা যা কার্যত পাকিস্তানের পুরোনো রাষ্ট্রব্যবস্থারই পুনঃস্থাপন, তার মধ্যে অপরিবর্তিত আর্থসামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার যে বীজ লুকিয়ে ছিল তা দ্রুতই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা-উত্তর শাসকদলের দুর্নীতি, অনাচার জনমনে যে হতাশা সৃষ্টি করেছিল তা তাদের □মেই অদৃষ্টবাদী করে তুলেছিল। এই হতাশারই সুযোগ গ্রহণ করেছে মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি। যাত্রা শুরুতেই বাংলাদেশকে পাকিস্তানি অতীতে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য তারা একের পর এক চ□ান্তে লিপ্ত হয়েছে। সে সময়ের ক্ষমতাসীনরাও একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় তাদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য নিজেরাও ঐ ধরনের চ□ান্তের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এক্ষেত্রে একটা উদাহরণই যথেষ্ট হতে পারে। বাংলাদেশ-উত্তরকালে সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি একমুখীন বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল, দেশের বুদ্ধিজীবীদের একাংশের তীব্র বিরোধিতার কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। বরং বাজেটে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ করার জন্য সরকারকে বাধ্য করা হয়েছে। এই বুদ্ধিজীবীরা সমাজে এখনো নমস্য ব্যক্তি বলেই পরিচিত কেবল নন, তাদের মুক্তবুদ্ধির প্রতীক বলেও উলে-খ করা হয়। কিন্তু তাদের হাতেই সাধারণ শিক্ষার পাশে মাদ্রাসা শিক্ষার ব্রিটিশ শাসনের কূটকৌশলটি আরো সুদৃঢ় হয়েছে।

পঁচাত্তরের পটপরিবর্তনের পর যখন সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বিলুপ্ত হয়েছে, ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দেয়া হয়েছে, তখন সামরিক শাসকরা এই মাদ্রাসাকেই তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অন্যতম বাহন হিসেবে বেছে নিয়েছিল। ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকেই তারা ফিরিয়ে আনেনি কেবল, তাকে রাজনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি প্রদানে সহায়তা করেছে।

সে যাই হোক, যেটা বাস্তব তা হলো বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের অল্প পরেই এ দেশের অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিটি নড়বড়ে হয়ে পড়ে। আর পরবর্তী সময় সংবিধানের রঙ পাল্টেছে। রাষ্ট্র ও সমাজে ঐ সাম্প্রদায়িকতা দৃঢ়ভিত্তি নিয়েছে এবং এখন ঐ সাম্প্রদায়িক শক্তি সরাসরি রাষ্ট্রক্ষমতার শরিক। এর ফলে রাষ্ট্র ও সমাজের ঐ সাম্প্রদায়িকতা আরো দৃঢ় ভিত্তি লাভ করেছে। বস্তুত সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কার্যত পাকিস্তানি অতীতে ফিরে গেছে।

বাংলাদেশে এই সাম্প্রদায়িকতা জনগণের মন ও মানসে, রাষ্ট্রীয় নীতিতে, সমাজে বিস্তৃত হলেও তা সেভাবে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার রূপ পরিগ্রহ করেনি। এটা ঠিক যে, দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইনের কারণে তাদের জমি-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সেসব বেদখল হয়েছে, চাকরি ক্ষেত্রে বৈষম্য তাদের পিছিয়ে রেখেছে, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাসকারী সংখ্যালঘুরা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত সহিংসতার সম্মুখীন সেভাবে হয়নি। ভারতের বাবরি মসজিদের ঘটনার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক সহিংস ঘটনা সৃষ্টির চেষ্টা হলেও সেটা অনেকখানি সীমিত ছিল ঐ ঘটনা ও দেশের সংখ্যালঘুদের মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করলেও উপমহাদেশের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তারা আশা করেছিল যে, বাবরি মসজিদের ঘটনার প্রতি□য়া হিসেবে সেটা ঘটলেও তা কোনো স্থায়ী কিছু হবে না।

কিন্তু ২০০১ সালের নির্বাচনের পর ঐ সাম্প্রদায়িক সহিংসতা যে রূপ ও ব্যক্তি নিয়ে বিস্ত ার লাভ করে তাতে ঐ বিশ্বাসে দৃঢ় থাকা কিছুতেই সম্ভব হয়নি। বরং সংখ্যালঘুরা এটাই সঙ্গতভাবে মনে করতে যাবেন যে, নিজভূমি থেকে তাদের পরিকল্পিতভাবে উচ্ছেদ করাই এ সাম্প্রদায়িক সহিংসতার লক্ষ্য। জোট সরকারের আমলে শিক্ষার পাঠ্যসূচীর সাম্প্রদায়িকীকরণ এমনকি পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ধর্মীয়করণ ঐ ধারাটাকে আরো দৃঢ়মূল করেছে। সরকারি চাকরি না পাওয়া, পদোন্নতিতে বৈষম্য এভাবেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ বিচ্ছিন্নতাবোধকে আরো দৃঢ় করেছে।

এ গেলো ভিন্নধর্মাবলম্বী সংখ্যালঘুদের সঙ্গে অপরাধ। এটা পাকিস্তানি আমলের অতীত নীতিরই পুনরাবৃত্তি। কিন্তু ধর্মীয় সংখ্যাগুরু জনগণের মধ্যে ধর্মমত অনুসারে ফারাক সৃষ্টি করা, বিভেদ-বৈষম্য, সংঘাত সৃষ্টি করার যে প্রচেষ্টার লক্ষণীয়ভাবে ব্যপ্তি ঘটেছে তা বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজকে আরো দুর্বল করে ফেলবে। বাংলাদেশের নড়বড়ে ভিতকে ধ্বংস করে দেবে।

এ ধরনের ঘটনার আমরা প্রকাশ দেখি দেশের সংখ্যালঘু মুসলমানদের মধ্যে, বিভিন্ন তরিকার মধ্যে বিভেদ ও সংঘাতের ঘটনায়। বিগত শাসনামলে দেওয়ানবাগী পীরের অনুসারীদের সঙ্গে চরমোনাইয়ের পীরের অনুসারীদের সংঘর্ষের ঘটনা কী রূপ নিয়েছিল সেটা আমরা দেখেছি। বিভিন্ন তরিকার অনুসারীদের মধ্যেও এ ধরনের বিবাদ-বিসংবাদের ঘটনা আমরা মাঝে মাঝে দেখি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে আহমদীয়া মুসলিম জামাত অনুসারীদের 'অমুসলিম' ঘোষণা করার দাবিতে তাদের মসজিদ ও বাড়িঘরে আ□মণ পরিচালনা নিঃসন্দেহে বড়ো ধরনের উদ্বেগের কারণ। কারণ এটা কেবল সামাজিক শৃঙ্খলা নষ্ট করবে। কারো ধর্মমত নির্ধারণের দায়িত্ব যদি এভাবে কিছু মোল-া অথবা তাদের মতানুসারে রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেয়া হয় সেটা কেবল মানবাধিকার লঙ্ঘনই হবে না, দেশের সংবিধানে ব্যক্তির ধর্মমত অনুসরণের স্বাধীনতারও চরম লঙ্ঘন করা হবে। এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ তখন সংবিধানের অন্যান্য

ক্ষেত্রেও পরিবর্তন, যেমন ব-াসফেমি আইন পাস করা অথবা তালেবানি আমলের মেয়েদের শিক্ষা-কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করার মতো ভয়ানক ঘটনা ঘটাবে।

এখানে আহমদীয়া জামাত সম্পর্কে দু-একটা কথা বলা প্রয়োজন। অবশ্য আহমদীয়া জামাত তাদের বিভিন্ন প্রচারপত্র, প্রকাশনা, সংবাদপত্রে লেখার মধ্য দিয়ে তাদের ধর্মমতকে পরিষ্কার করেছে। এই ধর্মমত তাদের নিশ্চিতভাবে ইসলাম থেকে খারিজ করে না। আহমদীয়ারা সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, তারা পবিত্র কলেমা লা ইলাহা ইল-াল-াহু মুহাম্মাদুর রাসুল-াহ'তে পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাসী। এছাড়া নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত তারা যথারীতি পালন করে। তা সত্ত্বেও তাদের অমুসলিম ঘোষণা করার দাবি কেন? তা হলেও মুসলমান সম্পর্কে কুরআন-হাদিসের সংজ্ঞা বদলাতে হয়। আর এই সংজ্ঞা নিশ্চয়ই কোনো মোল-া পাল্টাতে পারে না। কারণ তারা যদি কুরআন-হাদিস বিশেষজ্ঞ বলেও দাবি করেন তার পরও ঐ কুরআন সে ধরনের অধিকার তাদের দেয়নি। ইসলাম ধর্মই বলেছে, ধর্ম বিষয় বিচারের অধিকার একমাত্র স্রষ্টার। আর যদি এসব মোল-াদের হাতে কারো ধর্মমতের বিচার করতে দেয়া হয়, তাহলে ইসলামে যেসব ভাগ-বিভাগ রয়েছে তারা তখন পছন্দ অনুযায়ী আজ একে, কাল অন্যকে 'অমুসলিম' বা 'ধর্মাদ্রোহী' হিসেবে ঘোষণা করবে।

অবশ্য এই মোল-ারা সরকারকেই এই আহমদীয়া জামাতের অনুসারীদের অমুসলিম ঘোষণা করতে বলেছে। কোনো সরকার সেটা পারে কি-না, অথবা সরকারের সেটা দায়িত্ব কিনা এটি বলা নিষ্প্রয়োজন। কোনো সরকারি ঘোষণা কারো ধর্মমত পরিবর্তন করতে পারে না। আর যদি সেটা করে তবে তার পরিণতি কি হতে পারে পাকিস্তান তার প্রমাণ। পাকিস্তানের জিয়াউল হকের সামরিক সরকার কাদিয়ানিদের 'অমুসলিম' ঘোষণা করেছিল। সুন্নিদের কাছে শিয়া, শিয়াদের কাছে সুন্নি অমুসলিম কেবল নয়, ঘোরতর শত্রুতেই পরিণত হয়েছে। পাকিস্তানের কোনো মসজিদই আর নামাজিদের জন্য নিরাপদ নয়। শিয়া-সুন্নী বা অন্য বিভেদকে কেন্দ্র করে পরস্পরের মসজিদ আ□মণের ঘটনা ঘটছে। মসজিদে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে। আর সব মিলিয়ে পাকিস্তানের পরিচিতি হয়েছে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসেবে। পাকিস্তানের এই সন্ত্রাসবাদের অজুহাত ধরে সে দেশে মার্কিন সেনাবাহিনীর আগমন ঘটেছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে একটা দেশের স্বাধীনতা নামে থাকলেও কাজে থাকে না। বাংলাদেশে সে ধরনের ঘটনা ঘটলে সে ধরনের পরিণতিই ঘটবে এ দেশের ভাগ্যেও।

মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। বস্তুত বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা সর্বপ্রকার রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এই সাম্প্রদায়িকতা এখন আর কেবল সংখ্যালঘুদেরই স্পর্শ করছে না, দেশের সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীও তার বিষ নিঃশ্বাস থেকে মুক্ত নয়। বরং এই বিষ বাংলাদেশের সমাজকে চরমভাবে পিছিয়ে দিয়েছে। এই অবস্থায় বাংলাদেশের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে ফিরে যেতে হবে। যে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের জন্মকে সম্ভব করেছে তার উপরই দাঁড়াতে হবে। দেশের মানুষকে তার ভিত্তিতে সংগঠিত করতে হবে। সেই লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দ্রুত পুনর্গঠন করাই এখন জরুরি কাজ।

ভোরের কাগজ, ২১ ডিসেম্বর ২০০৩

সাম্প্রদায়িক নির্যাতন, অনটন ও বঞ্চনার শিকার উত্তরের জনপদ

শাহরিয়ার কবির

নাম না বললে হেমবালা বেওয়াকে দেখে বোঝার উপায় নেই তিনি নারী না পুরুষ। বয়স ষাট, সত্তর কিংবা আশিও হতে পারে। গত ১৪ ডিসেম্বর (২০০৩) ঠাকুরগাঁও শহর থেকে ১৫/১৬ কিলোমিটার দূরে চিলারং তেলিপাড়া গ্রামে ভাঙাচোরা খড়ের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বলছিলেন তাদের নিত্যদিনের অভাব অনটন আর জোট সরকারের আমলে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের কথা।

তাঁর পরনে ছিল ছেঁড়া রঙচটা লুঙ্গি, গায়ে খয়েরি রঙের ছেলেদের সুয়েটার, তার ওপর সবুজ সুতির চাদর। গায়ের রঙ কালো, খড়িওঠা কোঁচকানো চামড়া, মাথার চুল সব সাদা, ছোট করে ছাঁটা। আমাদের সঙ্গে দিনাজপুরের আঞ্চলিক ভাষায় তিনি কথা বলছিলেন। তার পুত্রবধু চার সন্তানের জননী রাধারাণীকে কীভাবে ধর্ষণ করে দু' চোখ উপড়ে নিয়েছে তার বিবরণ খুবই সাদামাটা ভাষায় দিলেন হেমবালা।

১১ সেপ্টেম্বর (২০০৩) বিকেলে রাধারাণী আখক্ষেতে গিয়েছিলেন জ্বালানির জন্য কিছু শুকনো পাতা সংগ্রহ করতে। বিএনপির স্থানীয় সন্ত্রাসী রফিকুল আর তার দুই সঙ্গী রাধারাণীকে জাপটে ধরে তার মুখ আর গলা চেপে টেনে নিয়ে যায় আখক্ষেতের ভেতরে। পালা করে তাকে ধর্ষণ করা হয়। তারপর ধারালো দা দিয়ে তার চোখ দুটো উপড়ে সংজ্ঞাহীন রাধারাণীকে ফেলে তারা চলে যায়।

স্বামী ও প্রতিবেশীরা ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ক্ষেতের ভেতর থেকে তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে দেখে পাশে পড়ে আছে রাধারাণীর উপড়ানো দুই চোখ। এই পৈশাচিক নির্যাতনের বিবরণ ঢাকার বিভিন্ন দৈনিকে তখন ছাপা হয়েছিল। ঠাকুরগাঁওর 'হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদ' নির্যাতকদের বিচার দাবি করে পোস্টার ছেপেছে অন্ধ রাধারাণীর ছবিসহ। মিছিল করে তারা জেলা প্রশাসনকে স্মারকলিপি দিয়েছে। পুলিশ তিনজনের ভেতর দু'জন আসামিকে গ্রেফতারও করেছিল কিন্তু একজন জামিনে ছাড়া পেয়ে গেছে। সে আর বিএনপির স্থানীয় চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফার লোকজন রাধারাণী আর তার প্রতিবেশীদের হুমকি দিচ্ছে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য। ঐক্য পরিষদের জেলা সম্পাদক এডভোকেট ইন্দ্রনাথ রায় জানিয়েছেন, জোট সরকারের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে গত দুই বছরে তাদের এলাকার কয়েক হাজার হিন্দু পরিবার ভারতে চলে গেছে। ঠাকুরগাঁও থেকে সীমান্ত বেশি দূরে নয়।

আমরা দিনমজুর রাধারাণীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনি এখন কী চান। অন্ধ রাধারাণী কোন কথা বলেন না। তার প্রতিবেশী তিলেশ্বরী আমাদের বললেন, ওরা এখনও আমাদের হুমকি দেয়। দিনের বেলায় আমরা মেয়েরা ওদের ভয়ে একা বাইরে যাই না। গরু ছাগল চরাতে গেলে চার পাঁচজন একসঙ্গে বেরোই। সঙ্গে দা আর কাস্তে নিয়ে যাই। এরপর তিলেশ্বরী তীক্ষ্ণ গলায় রাধারাণীকে বললেন, যারা তোর এই অবস্থা করেছে তুই সে কথা বাবুদের বলতে পারিস না? তুই এর বিচার চাস, ওদের শাস্তি চাস এসব কথা কেন বলছিস না?

রাধারাণী প্রথমে বিড়বিড় করে বললেন, আমি বিচার চাই। তারপর একটু থেমে মুখ তুলে তাকালেন। শঙ্কা ও বিষাদের প্রস্তরীভূত অবয়ব। চুলে তেল নেই, কপালে অস্পষ্ট সিঁদুরের দাগ। কোটরের ওপর চোখের পাতা সেঁটে রয়েছে, কোণার দিকটা ভেজা। আর্তকণ্ঠে বললেন, আমি চোখে দেখি না, কাজ করতে পারি না। আমি বাঁচব কী ভাবে?

রাধারাণীর শাশুড়ি হেমবালা বললেন, তার ছেলে আর রাধারাণী দু'জনই দিনমজুরের কাজ

করে। কাজ থাকলে ওরা পনের/কুড়ি টাকা মজুরি পায়। ওদের দু'জনের আয়ে সাতজন মানুষ এতদিন কোন রকমে ধুঁকে ধুঁকে বেঁচেছিল। তিন মাস ধরে রাধারাণী কাজে যেতে পারে না। আর কোনও দিন পারবেও না। একা ছেলের আয়ে সাতজন মানুষ সারাদিনে এক বেলা এক সের চালের ভাত খায়। কোন দিন লবণ জোটে, কোনদিন তাও জোটে না। কাজ না পেলে ভাতও জোটে না, শাকপাতা সেদ্ধ করে খেতে হয়। এসব কথা বলতে গিয়ে বার বার হেমবালার গলা বুজে আসে, বার বার চোখ মোছেন, তবু কান্না থামে না।

হেমবালার ছেলে মলিন সেদিন ঘরে ছিল না। মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে গ্রাম থেকে ধান কিনে নিয়ে শহরের বাজারে বিক্রি করবে। তিনশ টাকায় এক মণ ধান বিক্রি করলে ওর কুড়ি টাকা থাকবে।

উত্তরবঙ্গে এখন কৃষকের গোলায় নতুন ধান উঠেছে। ঢাকা থেকে সড়কপথে ঠাকুরগাঁও আসার সময় দেখেছি কৃষকের উঠোনে, ধানকলের সামনে, এমনকি হাইওয়ের উপর নতুন ধান মেলে দেয়া হয়েছে শুকোনোর জন্য। কৃষকের গোলায় ধান উঠলেও ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের অভাব যে দূর হয়নি রাধারাণীদের অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়। চোখ উপড়ে নেয়া ধর্ষক নরপশুদের বিচারের চেয়ে রাধারাণীর কাছে জরুরি হচ্ছে আগামী দিনে ওরা বাঁচবে কীভাবে? একা দিনমজুর স্বামীর রোজগারে সাতজন মানুষকে এক বেলা আধপেটা খেয়ে থাকতে হবে এবং সেটাও নির্ভর করছে মলিনের কাজ পাওয়ার উপর।

আমরা ঠাকুরগাঁও গিয়েছিলাম শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র জনসমাবেশে যোগ দেয়ার জন্য। রাধারাণীর কথা আমরা জানতাম না। সকালে আদালত প্রাঙ্গণে সমাবেশ শেষ হওয়ার পর ঐক্য পরিষদের ইন্দ্রনাথ রায় বললেন রাধারাণীর কথা। মামলার কোন অগ্রগতি নেই। আসামিদের ধরা হচ্ছে না। এলাকার পর এলাকা হিন্দুশূন্য হয়ে যাচ্ছে। তাঁর কাছে রাধারাণীদের মানবেতর জীবন যাপনের কথা শুনে দুপুরের পর ওদের দেখতে গিয়েছিলাম শহরের অনতিদূরে চিলারঙ তেলিপাড়া গ্রামে।

হিন্দুপ্রধান এই গ্রামের মানুষের অভিযোগের অন্ত নেই। সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের বিভিন্ন অভিব্যক্তির কথা বলছিলেন তারা। ঘনশ্যামের কাছে ৫০ হাজার টাকা চেয়েছে সন্ত্রাসীরা। হুমকি দিয়েছে টাকা না পেলে ঘনশ্যামের দুই তরুণী কন্যাকে তুলে নিয়ে যাবে। গ্রামের বৈষ্ণবী কাননবালার স্বামী মারা গেছে। মৃত স্বামীকে তার নিজের জমিতে কবর দিতে বাধা দেয়া হয়েছে। গ্রামের মানুষদের বলা হচ্ছেপ্রাণে বাঁচতে চাইলে দেশ ছেড়ে চলে যেতে।

হেমবালা বেওয়া যখন কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'মরণ ছাড়া আর উপায় নাই' তখন এই সহায়সম্বলহীন, নির্যাতিত, দুস্থ এই পরিবারটির জন্য গভীর বেদনাবোধের পাশাপাশি বুকের ভেতর ক্ষোভ আর ক্রোধ জমতে থাকে। যুদ্ধাপরাধী, মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক অপশক্তি অধ্যুষিত জোট সরকার ক্ষমতায় এসে বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে আফগানিস্তান আর পাকিস্তানের মতো ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে হলে এ কাজ খালেদা-নিজামীদের করতে হবে। কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলের এই সব নির্যাতিত অসহায়, বিপন্ন মানুষদের বাঁচবার কি কোন কর্মসূচী বিরোধী দলগুলো একজোট হয়ে নিতে পারে না?

হেমবালাদের ঘরের চেহারা এত জরাজীর্ণ যে এক ঝলক ঝড়ো বাতাসে যে কোন সময়ে তা উড়ে যাবে। চালের বেশির ভাগ জায়গায় খড় নেই, বাঁশের খুটিও নড়বড়ে, ঘুণেধরা। মনে হল হাজার তিরিশেক টাকা দিতে পারলে এই পরিবারটিকে বাঁচানো যায়। আমাদের কাছে অত টাকা ছিল না। তিন হাজার টাকা হেমবালার হাতে গুঁজে দিয়ে বলতে গেলে পালিয়ে এসেছি। গ্রামের অনেক বাড়ির অবস্থাই হেমবালাদের মতো, শুধু ধর্ষণ করে চোখ উপড়ে ফেলা হয়নি পার্থক্য এতটুকুই।

তেলিপাড়া থেকে শহরে ফিরে দেখি এক বৃদ্ধ সাঁওতাল অপেক্ষা করছেন দেখা করার জন্য। ঠাকুরগাঁও জেলা বারের একমাত্র সাঁওতাল সদস্য এডভোকেট মারিও টুডু গিয়েছিলেন রাণীশংকৈল-এ। তাঁর সঙ্গে এসেছেন ষাট বছরের কামালাং মুর্মু। তার ছেলে ফিলিমন মুর্মুর স্ত্রী বিউটি ওরফে তালামাইকে গত ১৯ সেপ্টেম্বর (২০০৩) স্থানীয় সন্ত্রাসীরা ধর্ষণ করে দা দিয়ে গলা কেটে হত্যা করেছে। তিন মাস হতে চলল, তিন জন আসামির ভেতর পুলিশ মাত্র একজনকে গ্রেফতার করেছে। তবে এখন নাকি তাকেও ছেড়ে দেয়ার আয়োজন চলছে। স্থানীয় দারোগা মামলার বাদী কামালাংকে বলেছেন গ্রেফতারকৃত আসামি তালেব এ ব্যাপারে কিছুই বলছে না। ফলে ওকে আর আটকে রাখা যাবে না। যারা ওর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেছে এখন তাদেরই গ্রেফতার করা হবে।

বৃদ্ধ তামালাং মুর্মু বাংলা বলতে পারেন না। সাঁওতাল ভাষায় তিনি কথা বলছিলেন, বাংলায় অনুবাদ করে দিচ্ছিলেন, এডভোকেট মারিও টুডু। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমাদের কাছে তিনি কী চান। তামালাং কোন আর্থিক সহযোগিতা চাননি। তিনি চান আমরা যেন খবরের কাগজে তাদের বিপদ আর অসহায়ত্বের কথা লিখি। সন্ত্রাসীরা সবাই সরকারি দলের। তারা হুমকি দিচ্ছে মামলা তুলে না নিলে তাদের এদেশে রাখা হবে না। ঘটনার মাত্র তিন মাস আগে কামালাং সপরিবারে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

তামালাং আরও বললেন, তিনি লেখাপড়া জানেন না। এজাহার লিখেছেন থানার দারোগা, তাকে বলেছেন সই দিতে। পরে শুনেছেন তার অভিযোগপত্রে তালামাইকে ধর্ষণের উলে-খ নেই, শুধু হত্যার কথা বলা হয়েছে। রাধারাণীর ক্ষেত্রেও সরকারি ডাক্তার ধর্ষণের কথা লেখেননি, লিখেছেন 'বলপূর্বক যৌনমিলন'। ধর্ষক ও নির্যাতকদের বাঁচাবার জন্য এবং বিচারপ্রার্থী নির্যাতিতদের উপর আরও নির্যাতন চালাবার কত রকমের পদ্ধতি যে মফস্বলের থানার কর্মকর্তারা জানেন সেখানে না গেলে বোঝা যাবে না।

দুই

এবার বিজয় দিবস পালন করেছি উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত এলাকায়। দুটো কারণে উত্তরবঙ্গকে বেছে নিয়েছিলাম। প্রথমত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই প্রথম বিজয় দিবসে আমি কারাগারের বাইরে ছিলাম। ২০০১ আর ২০০২ সাল কেটেছে ঢাকা আর চট্টগ্রামের কারাগারে। যদিও জোট সরকারের মুখপত্র দৈনিক 'ইনকিলাব' আর 'দিনকাল' গত এক মাস ধরে ক্রমাগত আমার সম্পর্কে এমন সব ভয়ঙ্কর মিথ্যা ও প্রতিহিংসামূলক খবর ও উপসম্পাদকীয় ছেপেছে মনে হয়েছে এ বছর বিজয় দিবসেও বুঝি কারাবন্দি থাকতে হবে। যখন দেখলাম দিনকিলাবওয়ালাদের প্ররোচনামূলক এত কিছু লেখার পরও আমাকে গ্রেফতার করা হয়নি তখন ঠিক করেছি রাজধানী থেকে বহু দূরে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সেই সব মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে বিজয় দিবস উদযাপন করব যাদের জীবনে বিজয় আজও তেমন কোন অর্থ বহন করে না।

উত্তরবঙ্গে যাওয়ার দ্বিতীয় কারণ ছিল সেখানকার দুর্ভিক্ষাবস্থা। এক মাস আগে বিভিন্ন দৈনিকে মঙ্গাকবলিত উত্তরবঙ্গের দরিদ্র মানুষের আহাজারির খবর পড়ে আমাদের নির্মূল কমিটি সহসভাপতি শহীদজায়া শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী কাজী মুকুলকে বলেছিলেন, উত্তরবঙ্গে আমাদের পাঠাগার কিংবা নির্মূল কমিটির মাধ্যমে দুস্থ মানুষদের জন্য তিনি কিছু সাহায্য পাঠাতে চান। তিনি দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন গৃহিনীর জন্য দশ হাজার টাকার অনুদান যথেষ্ট বড় অঙ্কের হলেও উত্তরবঙ্গের মঙ্গাকবলিত অঞ্চলে এই টাকা সমুদ্রে এক ফোঁটা পানির মতো। শ্যামলী ভাবীর টাকাটা পাওয়ার পর আমরা কেন্দ্রের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করলাম। এই দশ হাজারের সঙ্গে যদি আমরা কিছু যোগ করি

তাহলে সবাইকে না হোক কিছু দুস্থ মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারকে আমরা সাহায্য করতে পারব।

উত্তরবঙ্গে 'ভোরের কাগজ'-এর সাংবাদিক পরিমল মজুমদার কুড়িগ্রামের উলিপুরে আমাদের 'মুক্তিযুদ্ধের শহীদ স্মৃতি পাঠাগার'-এর সঙ্গে যুক্ত। তিনি সেখানকার এক বধ্যভূমিতে একদিনে সাড়ে সাতশ মানুষ হত্যার বিবরণ সংগ্রহ করেছেন। সেই সব শহীদ পরিবারের কয়েকজন কোন সরকারের কাছ থেকে আজ পর্যন্ত কোন আর্থিক সহযোগিতা পাননি। সহায় সম্বলহীন এই সব শহীদ পরিবারের সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধের সময় পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্যকে হারিয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ মানবেতর জীবন যাপন করছেন। পরিমল এ ধরনের তিরিশটি পরিবারের তালিকা আমাদের পাঠিয়েছিলেন যাদের ভেতর কয়েকজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাও আছেন। ওদের কেউ ভিক্ষে করেন, কেউ ঝাড়ুদারের কাজ করেন, কেউ রিকশা চালান। পরিমলের পাঠানো তালিকা পেয়ে আমরা ঠিক করেছি বিজয় দিবসে আমরা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের এই সব মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারকে সংবর্ধনা জানাব এবং কিছুটা আর্থিক সাহায্য প্রদান করব।

উত্তরবঙ্গের অভাবের কথা মোনাজাতউদ্দিন আর আনিসুল হকদের মতো সাংবাদিকদের লেখা পড়ে এতকাল জেনেছি, নিজের চোখে দেখা হয়নি। মঙ্গার কথা আলাদা, বাংলাদেশে একজন দিনমজুর সারাদিন কাজ করে ১৫/২০ টাকা মজুরি আর কপাল ভাল থাকলে একবেলা ভাত পান উত্তরবঙ্গ না গেলে এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন হতো। ক্ষেতের ধান গোলায় উঠলেও ভূমিহীন ক্ষেতমজুর একদিন কাজ না পেলে উপোস থাকে এমন কথা বিশ্বাস করাও কষ্টকর।

লালমনিরহাট থেকে ১৬ ডিসেম্বর সকাল দশটা নাগাদ উলিপুরে গিয়ে পৌঁছেছি। পাঠাগারের সামনে বড় একটা খোলা জায়গা, সেখানেই সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে। আমরা গিয়ে দেখি মঞ্চের এক পাশে চেয়ারে কিছু বয়স্ক মানুষ, মলিন চেহারা আর বেশভূষা দেখে মনে হল এরাই হচ্ছেন সেই সব প্রান্তিক মানুষ যাদের কারণে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে ১৯৭১-এ। মুক্তিযুদ্ধের ২০ বছর পর কিছু শহীদ পরিবারের ত্যাগ ও বিপর্যয়ের কথা সংকলন করে 'একাত্তরের অবিরাম রক্তক্ষরণ' নামে একটা বই বের করেছিলাম। ভূমিকায় লিখেছিলাম, মুক্তিযোদ্ধাদের দেশ স্বাধীন করার যুদ্ধ নয় মাসের ভেতর শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু অধিকাংশ শহীদ পরিবারের জীবনযুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। স্বজন হারানোর বেদনার পাশাপাশি পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষটির অভাবে গোটা পরিবার কীভাবে বিপর্যস্ত হয় তার জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে রাজধানী ঢাকাসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ শহীদ পরিবার।

উলিপুরে আমাদের পাঠাগারের নেতৃবৃন্দ বললেন, জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর আমরা শহরের ভেতরের শহীদ মিনার এবং শহরের বাইরে '৭১-এর বধ্যভূমিতে গিয়ে ফুল দেব। মাইকে আয়োজকরা ঘোষণা করলেন আমরা মিছিল করে পূর্ব বাজারের বধ্যভূমিতে যাব।

রাজধানী ঢাকাসহ মফস্বলের সর্বত্র দেখেছি মিছিলের পুরোভাগে সব সময় থাকেন নেতারা। আমরা স্থানীয় নেতাদের বললাম, মিছিলের সামনে মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের জায়গা দেয়ার জন্য। তাঁরা আমাদের কথা রাখলেন। উলিপুরের মুক্তিযোদ্ধা আর শহীদ পরিবারের সদস্যদের নেতৃত্বে আমরা মিছিল করে গেলাম পূর্ব বাজারে।

বধ্যভূমির পাশে একটা পুকুর, '৭১-এর নয় মাসে যে পুকুরে প্রতিদিন মানুষের লাশ ভাসতে দেখা গেছে। কোন কোন দিন ১৫/২০ জনকেও হত্যা করা হয়েছে এই বধ্যভূমিতে। পুকুরের তীরে একটা শহীদ মিনার। আমরা শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করলাম। আমাদের পাঠাগারের সভাপতি আবদুল মজিদ হাড়ি সংক্ষেপে বধ্যভূমির পরিচয় দিয়ে বললেন, আমরা

মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের মুসলমান-হিন্দু নির্বিশেষে স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করব।

আমার চারপাশে ছিলেন শহীদ পরিবারের সদস্যরা কাচুয়ানি বেওয়া, হাসরভান বেওয়া, বাঁশালী বেওয়া, সুরভান বেওয়া, সখিনা বেওয়া, ফজিলা বেওয়া, খোদেজা বেওয়া, বাতাসী বেওয়া আর জুলাফ বেওয়ারা। নীরবতার কয়েক সেকেন্ড না যেতেই একজন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন, তারপর আরেকজন, এবং আরেকজন। এরপর তাদের সম্মিলিত কান্নার শব্দে নীরবতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। কয়েকজন কাঁদতে কাঁদতে শহীদ মিনারে মাথা ঠুকলেন। কয়েকজন কান্নায় ভেঙে পড়লেন আমার পায়ের উপর। তাদের কান্না আমাদের কাঁদাল। আমাদের সঙ্গে স্থানীয় যে সব সাংবাদিক ছিলেন তাঁরাও অশ্রুসংবরণ করতে পারেননি। ফেরার সময় একজন বললেন, এত বছর পর আমরা ঢাকা থেকে তাদের দেখতে গিয়েছি, এ কারণেই দীর্ঘ দিনের জমে থাকা কান্না বাঁধ মানেনি।

মঞ্চে তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়েও তারা কাঁদলেন। বাতাসী বেওয়া এত কাঁদছিলেন যে পরিমল তাঁকে ধরে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর কান্নাজড়ানো দুর্বোধ্য কথাগুলো আমাদের শোনালেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যখন বাতাসীদের বাড়িতে গুলি চালাতে থাকে তখন তার ছেলে বক্তার আলী একজন সৈন্যকে জাপটে ধরে তার রাইফেল ছিনিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু সে নিজে অস্ত্র চালাতে জানতো না। পাকিস্তানি সৈন্যরা তাকে কাবু করে অস্ত্র নিয়ে নেয়। তারা মায়ের সামনে ছেলেকে কীভাবে হত্যা করেছে তার বিবরণ দিয়েছেন পরিমল। একবারে গুলি করে নয়, হানাদার পশুরা প্রথমে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে বক্তার আলীর চোখ উপড়ে নেয়, তারপর তাকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে অনেক সময় নিয়ে হত্যা করে।

জুলাফ বেওয়ার স্বামীর সঙ্গে তার শ্বশুর ও দুই দেবরকেও হত্যা করেছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। তাঁর স্বামী বারু উদ্দিনকে প্রথমে বেয়নেট চার্জ করেছে, তারপর গুলি করে হত্যা করে লাশ ফেলে রেখে চলে যায়। সেদিন তাদের বাড়ির অন্য শরিকদের নিয়ে মোট ষাটজনকে ওরা হত্যা করেছিল। কাঁদতে কাঁদতে জুলাফ বেওয়া বললেন, বত্রিশ বছর চলে গেছে, আমাদের কেউ দেখে নাই, কেউ খোঁজ নেয় নাই। আমরা দারুণ কষ্টে বেঁচে আছি। খাবার নাই, চিকিৎসা নাই, ঘরে ঘরে অনাহার আর অভাব। মান ইজ্জতের কারণে ভিক্ষা করতে পারি না। এভাবেই শোক আর কষ্টের আগুনে পুড়ে আমরা মারা যাচ্ছি।

মঞ্চে আমার একপাশে ছিলেন অনুষ্ঠানের সভাপতি আবদুল মজিদ, আরেক পাশে নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল। যখন কিছু বলার জন্য মুকুলের ডাক এল মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কিছুই বলতে পারলেন না। শুধু বললেন, আমরা এসেছি আপনাদের সংগ্রামের কথা আর কষ্টের কথা জানার জন্য, আপনাদের শ্রদ্ধা জানাবার জন্য। যা বলার আমাদের সভাপতি বলবেন।

'৭১-এর নির্যাতনের কথা শুনতে গিয়ে আমার চোখের সামনে ভাসছিল ঠাকুরগাঁওয়ের রাধারাণী আর তালামাই সহ গত ছাব্বিশ মাসে জোট সরকারের সন্ত্রাসীদের নির্যাতনের শিকার সেই সব পরিবারের কথা, স্বাধীন বাংলাদেশে যা কোন�মেই প্রত্যাশিত ছিল না। বাঁশখালী আর মহালছড়ির ধ্বংসযজ্ঞের বিবরণ ও ছবি পত্রিকায় দেখে '৭১-এর কথাই মনে হয়েছে। হত্যার লক্ষ্য ও পদ্ধতি অবিকল এক। '৭১-এ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী প্রথমে বেছে নিয়েছিল আওয়ামী লীগ, হিন্দু ও বুদ্ধিজীবীদের। তারপর মুক্তিযোদ্ধাসহ গোটা বাঙালি জাতি। '৭১-এর তিরিশ বছর পর ২০০১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দালাল ও ঘাতকদের দল জামাতে ইসলামী ক্ষমতার অংশীদার হয়ে একই পদ্ধতিতে নির্যাতন চালাচ্ছে। তাদেরও লক্ষ্য সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়, আওয়ামী লীগ, বুদ্ধিজীবী এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বাঙালি। '৭১-এ উলিপুরে যেভাবে বাতাসী বেওয়ার ছেলে বক্তার আলীর চোখ উপড়ে তাকে হত্যা করেছিল

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী, ২০০৩ সালে একই ভাবে ঠাকুরগাঁওয়ের হেমবালা বেওয়ার ছেলের বউ রাধারাণীর চোখ উপড়ে ফেলেছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর প্রেতাত্মারা। এটা ঠিক যে হত্যা ও ধর্ষণের সংখ্যা '৭১-এ অনেক বেশি ছিল কিন্তু নির্যাতনের লক্ষ্য ও পদ্ধতির কোন পরিবর্তন হয়নি। '৭১-এ পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য জেনারেল ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা হত্যা ও ধর্ষণসহ যাবতীয় ধ্বংসযজ্ঞের পথ বেছে নিয়েছিল। তিরিশ বছর পর তাদের একই রাজনীতি ও আদর্শে বিশ্বাসীরা ক্ষমতায় এসে ধাপে ধাপে সেদিকেই যাচ্ছে, '৭১-এর পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য।

উলিপুরের সংবর্ধনা সভায় আমরা দুস্থ মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রত্যেককে নগদ দু' হাজার টাকা, একটি কম্বল ও একটি গায়ের চাদর দিয়েছিলাম। পরিবার প্রতি দু' হাজার টাকা নিতান্তই অপ্রতুল। সভায় আমার বক্তব্যে আমি রাজনৈতিক দল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন, বিত্তবান ব্যক্তি ও প্রবাসী বাঙালিদের আহ্বান জানিয়েছি, প্রত্যেকে যদি একটি পরিবারের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নেন এই সব মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবার অনাহারে মৃত্যু কিংবা উঞ্ছবৃত্তির অপমান থেকে বাঁচতে পারেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় উলিপুর ছিল ৬নং সেক্টরের অধীন, যে সেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন শহীদ কর্ণেল আবু তাহের। তাঁর অনুজ ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল বীরপ্রতীকও একই সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন। উলিপুরে আমরা মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারদের সংবর্ধনা জানাব একথা জানতে পেরে কম্বলগুলো বেলাল উপহার দিয়েছেন।

দেশের এমন কোন এলাকা নেই যেখানে স্বজনহারা, নির্যাতিত মানুষের কান্নার শব্দ শোনা যাবে না। এই কান্না হতে পারে '৭১-এর কিংবা ২০০১ ও তার পরবর্তী সময়ের। '৭১-এ যেভাবে আমরা সবাই একজোট হয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলাম, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগীদের নির্যাতনের বিরুদ্ধেও একইভাবে দাঁড়াতে হবে। একজোট হতে হবে শুধু বিপন্ন মানুষকে বাঁচাবার জন্য নয়। মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার হিংস্র থাবা থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশকে বাঁচাতে হলে সেক্যুলার গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের বিকল্প কোন পথ নেই।

জনকণ্ঠ, ২৩ ডিসেম্বর ২০০৩

উপজাতিদের অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি চাই

মনজুরে মওলা

আদিবাসী ও উপজাতিদের মধ্যে পার্থক্য কী এবং কতটুকু, আমার তা ঠিক জানা নেই। একটি ভূখণ্ডে যুগ যুগ ধরে যেসব মানুষ তাদের নিজস্ব জীবন যাপন প্রণালী ও সে প্রণালী থেকে উদ্ভূত বিশ্বাস ও সংস্কৃতি নিয়ে বেঁচে থাকে তাদেরই হয়তো ওই ভূখণ্ডের আদিবাসী বলা যায়। কিন্তু একদিন ওই ভূখণ্ড সম্পূর্ণভাবে বহিরাগতদের অধিকারে চলে যেতে পারে। বহিরাগতরা ওই ভূখণ্ডে পরম্পরায় বাস করে সেটিকে তাদের নিজেদের করে নিতে পারে আ□ান্ত ও নির্যাতিত হয়ে মূল অধিবাসীর সম্পূর্ণ হারিয়ে যেতে পারে কিংবা ওই ভূখণ্ডের কোনও কোনও জায়গায় সংখ্যালঘু হয়ে, বহিরাগতদের জীবনধারা ও জীবনের মূল্যবোধ মেনে না নিয়ে ও নিজস্ব জীবনধারা ও সংস্কৃতি যতো দূর সম্ভব অব্যাহত রেখে বেঁচে থাকতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এমনি কিছু মানুষ এখনও বেঁচে আছেন। এরা আদিবাসী এই দিক থেকে দেখলে আদিবাসীরা এমন এক জনগোষ্ঠী যারা একসময় একটি ভূখণ্ডের পুরোটুকুর অধিকারী ছিলেন।

কিন্তু এখন সে ভূখণ্ড তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে, এখন সেখানে তারা নৃতাত্ত্বিকভাবে সংখ্যালঘু।

উপজাতিরা? কিছু কিছু মানুষ তাদের নিজস্ব জীবনধারা ও নিজস্ব সংস্কৃতি সমুন্নত রেখে কোনও কোনও এলাকায় দীর্ঘদিন বসবাস করে আসতে পারেন। ওই সব জায়গা বহিরাগতদের দ্বারা অধিকৃত নাও হতে পারে কিংবা অধিকৃত হলেও বহিরাগতরা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস নাও করতে পারে। কিন্তু একদিন ওইসব জায়গা ইতিহাসের ধারায় একটি তুলনামূলকভাবে বড়ো ও স্বাধীন ভূখণ্ডের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে, এমন এক ভূখণ্ডের যার অধিকাংশ মানুষ ওই সব জায়গার মানুষের থেকে নৃতাত্ত্বিকভাবে এবং জীবনাচরণ ও সংস্কৃতির দিক থেকে ভিন্ন। স্বাধীন ভূখণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন জাতির প্রশ্নটিও এসে পড়ে। ওই বড়ো জনগোষ্ঠী যদি একটি বিশেষ জাতি বলে পরিচিত হয় তাহলে নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক কারণে, ছোট ছোট জনগোষ্ঠীগুলো তো আর সে-জাতির অন্তর্গত হতে পারে না সেগুলো তখন মূল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে উপজাতি হয়ে যায় এখানে বহিরাগতদের বসতি গড়ার প্রশ্ন নেই বলে বড়ো ও ছোট দুই জনগোষ্ঠীই আদিবাসী সেই অর্থে নয়, এই অর্থে ও এ কারণে যে নিজ নিজ জায়গায় তারা দীর্ঘদিন ধরে নিজ-নিজ মতো করে বসবাস করে আসছে, তারা কেউই বাইরের কেউ নয়, নিজ রাষ্ট্রে দু'জনগোষ্ঠীর অধিকারই সমান করে তাহলে উভয় জনগোষ্ঠীর গণতান্ত্রিক অধিকারও সমান এবং সমান বলেই গণ্য হওয়া উচিৎ। বাংলাদেশে তেমনটি হয় কি? সম্প্রতি এরকম দু'জন উপজাতি নাগরিক প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। খবরের কাগজে এদের আদিবাসী বলা হয়েছে। (আজকের কাগজ, ০৬-০১-২০০৪) আমি আদিবাসী নয়, 'উপজাতি' বলার পক্ষপাতি। ঘটনাটি ঘটেছে রাজধানী ঢাকার একটু দূরে এক জেলার বনাঞ্চলে। সেখানে একটি ইকোপার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে এবং সে উদ্দেশ্যে সে ইকোপার্কের সীমানা ঘিরে দেয়াল তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় উপজাতি নাগরিকেরা এর প্রতিবাদ করে শান্তিপূর্ণ মিছিল করার সময় গুলি চালানো হয়। বনরক্ষীরা বলেছে, তারা শুনেছে পুলিশের গুলিতে একজন নিহত হয়েছে। পুলিশ বলেছে, তারা শুনেছে বনরক্ষীদের গুলিতে একজন হয়েছে। পুলিশ কিংবা বনরক্ষী কেউই বলছে না যে, তাদের গুলিতে কেউ নিহত হয়েছে। এ হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ হয়েছে। সাত ঘন্টা মহাসড়কে গাড়ি চলেনি। জেলা প্রশাসক বলেছেন, উপজাতিরা যা চান, তা-ই হবে। এরপর মহাসড়কের অবরোধ তুলে নেওয়া হলেও উপজাতিরা জেলা প্রশাসকের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেননি—ইকোপার্ক নির্মাণ বন্ধ করা বিষয়ে তারা আনুষ্ঠানিক সরকারি ঘোষণা চান। তারা বিক্ষোভ-কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশ বা বনরক্ষী গুলি করবে কেন? বিরোধী দল যদি মিছিল বা সমাবেশ করে পুলিশ মাঝে-মধ্যে তাদের ওপর পেটায়, মিছিল বা সমাবেশ যতোই শান্তিপূর্ণ হোক না কেন, তাতে পুলিশের কিছু এসে যায় না। এর একটি ব্যাখ্যা আছে। পুলিশ এমনটি করে সরকারের নির্দেশে। সরকার তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন বা নিদেনপক্ষে হয়রানি করতে চায়। এটি নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য নয়, তবু এমনটি হয়। কিন্তু উপজাতিদের প্রতিবাদ তো কোনও রাজনৈতিক প্রতিবাদ ছিল না, কোনও রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এ প্রতিবাদ আয়োজন করেনি। আর যতো দূর জানা যায়, মিছিলটি নিরস্ত্র ছিল। শান্তিপূর্ণ ছিল। তাহলে গুলি কেন? আর পুলিশ বা বনরক্ষী যে-ই গুলি করে থাকুক না কেন, গুলি করার দায়িত্ব সে সংস্থা স্বীকার করবে না কেন? কিছু রাজনৈতিক দল এ ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছে। এমনি তদন্ত অবশ্যই হওয়া উচিত। যদি বিচার বিভাগীয় তদন্ত হয়,এও নিশ্চিত করা উচিত যে লোকে যেন মনে না করে যে তা কেবল লোক দেখানো। কেউ যদি মনে করেন যে, ইকোপার্ক গড়ে তোলা সঙ্গত হবে

না, কিংবা কোনও বিশেষ জনগোষ্ঠীর স্বার্থ-বিরোধী বা তার জন্য ক্ষতিকারক হবে, তাহলে সেকথা বলার, প্রতিবাদ করার অধিকার তার নিশ্চয়ই আছে। কেউ যদি প্রতিবাদ করেন, সরকারের উচিত, দমন-নীতি চালিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া নয়, প্রতিবাদের কারণগুলো বিবেচনা করা, সেগুলো যুক্তিসঙ্গত কিনা ভেবে দেখা এবং যুক্তিসঙ্গত হলে তা প্রতিকারের ব্যবস্থা করা। আরও ভয় আছে, ইকোপার্ক গড়ে তোলা হলে উপজাতি নাগরিকদের অন্য কোনও পরিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে উপজাতি নাগরিকদের যদি কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতি নাগরিকরা যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাবেন তো যথাসময়ে তার মানে দ্রুত পাবেন তো? কাপ্তাই বাঁধ তৈরির সময় বিশাল এলাকা পানিতে ডুবে গিয়েছিল, বহু উপজাতি নাগরিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। তাদের কেউ কেউ কোন ক্ষতিপূরণ পাননি, কেউ কেউ পেয়েছিলেন কিন্তু তা ছিল যৎসামান্য, যারা পেয়েছিলেন তারা অনেক দেরিতে, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে পেয়েছিলেন। একথা আমি শুনেছি এক সরকারি কর্মকর্তার কাছ থেকে। যিনি সে সময় সেখানে কর্মরত ছিলেন পরে অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ শিক্ষাগত উপাধি অর্জন করেছিলেন, বছর তিনেক আগে সরকারের সর্বোচ্চ শিক্ষাগত উপাধি অর্জন করেছিলেন। বছর তিনেক আগে সরকারের সর্বোচ্চ দু'জন সচিবের একজন ছিলেন, এখন অবসর জীবন-যাপন করছেন। কোনও তথাকথিত উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ার ফলে যদি কোনও ব্যক্তি বাড়িঘর বা জমিজমা হারান, তিনি উপজাতি নাগরিকই হোন বা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর লোকই হোন, হারানো সম্পত্তির জন্য তাকে কেবল টাকা-পয়সা দেওয়াই যথেষ্ট নয়, তাকে পুনর্বাসিত করা প্রয়োজন, এমনভাবে করা প্রয়োজন যাতে তার জীবনধারা ও সংস্কৃতি অব্যাহত থাকে এবং তাকে কোনও বৈরী পরিবেশে অন্তীয় মানুষের মধ্যে বাস করতে না হয়। এমনি আশা করা কি দূরাশা?

মূল সমস্যাটি, আমার মনে হয়, অন্য জায়গায়। তা এই যে, আমাদের সংবিধানে উপজাতিদের কোনও পৃথক স্বীকৃতি নেই। এই স্বীকৃতি যদি থাকতো তাহলে উপজাতীয়তা সং□ান্ত আজকের বহু জটিল সমস্যা হয়তো উদ্ভূতই হতো না। উদাহরণত সংবিধানের ২৩ অনুচ্ছেদে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলা আছে যে, 'রাষ্ট্র' জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। উপজাতিদের ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলা তো বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলা থেকে ভিন্ন। সেগুলো 'পরিপোষণ ও উন্নয়নের কথা সংবিধানে বলা হবে না কেন? হ্যাঁ, উপজাতিদের সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য সরকার কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। কিন্তু কেবল তা-ই যথেষ্ট নয়। চাই উপজাতিদের সংস্কৃতির পৃথক জীবনধারার ও সে-সংস্কৃতি ও জীবনধারা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তাদের সব অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি।

আজকের কাগজ, ১৪ জানুয়ারি ২০০৪

মধুপুর বনের আদিবাসীদের শেষ আশ্রয় কোথায়

বাঁধন আরেং

মধুপুর বন ঐতিহ্যগতভাবে গারো, কোচ আদিবাসীদের আবাসস্থল। ৪৫ একরের এই বনভূমি মধুপুর গড় নামেও পরিচিত। গারোরা এই এলাকাকে 'আবিমা' (মাতৃভূমি) বলে। বৈচিত্রময় প্রাণসম্পদের আধার ছিল মধুপুরের গভীর অরণ্য। কিংবদন্তি কাহিনী রয়েছে ঐতিহ্যবাহী এই বনকে ঘিরে। ঝরাপাতার বনভূমিতে সূর্যের আলো মাটিতে পৌঁছত না ঘন

সবুজ পাতার কারণে। গভীর বন ও হাজারো প্রাণের বিচরণ আজ আর নেই। বাঘ, ভাল-ুক, হরিণ, হাতি, বনমহিষ, ময়ূর, ময়না, টিয়া ইত্যাদিসহ ২৫০ প্রজাতির পশুপাখি একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে আরও অনেক আগেই। এলাকার আদি মানুষ ও বনরক্ষী গারোদের অস্তিত্বও আজ হুমকির মুখে। এরা হারিয়ে গেলে মধুপুর বনের শেষ সাক্ষীও থাকবে না।

মুঘল যুগের আগে গৌড় সুলতান আমলে মধুপুর বনে গারোদের প্রথম বসতি স্থাপনের উলে-খ পাওয়া যায়। কাল□মে তারা বনের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল বলেও জানা যায়। ব্রিটিশ আমলে জমিদারদের কাছ থেকে জমি পত্তনি নিয়ে জুম চাষ করে ধান, তুলা ছাড়াও নানা রকম ফসল ফলত। নাটোরের রাজাকে খাজনা দিয়ে নিঝঞ্ঝাটে বনভূমি ভোগ করার কাগজপত্র পাওয়া যায়। তাদের সুখ বেশিদিন থাকেনি। পাক ভারত বিভাগের পর অন্য সংস্কৃতির লোকজন বনের আশপাশে বসবাস শুরু করে। তখন থেকেই আদিবাসীদের বিড়ম্বনা শুরু হয়। জমিদারী প্রথা বিলোপের পর বনভূমি সরকারি খাস জমি হিসেবে বন বিভাগ কর্তৃত্ব শুরু করে। তাদের স্বাভাবিক অধিকার সংকুচিত হলে আদিবাসীরা প্রথম থেকেই বন বিভাগের কর্তৃত্ব মেনে নিতে পারেনি। ১৯৬২ সালে পাকিস্তান সরকার মধুপুর গড়ের বন এলাকাকে জাতীয় উদ্যানে ঘোষণা দিয়ে ২০ হাজার একর জমি দখল করে দেয়াল নির্মাণের পরিকল্পনার শিকার হয়েছিল ১৯টি আদিবাসী গ্রাম। অনেক ঘরবাড়ি ভেঙে-জ্বালিয়ে আতংক সৃষ্টি করে জমি দখলের চেষ্টা করলেও আন্দোলনের চাপে সরকার কর্মসূচি থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। পরবর্তীতে উচ্চ আদালতের নিষেধাজ্ঞায় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন স্থগিত হয়ে যায়। কিন্তু আদিবাসীদের মধ্যে উচ্ছেদ আতংক থেকেই যায়। তাদের ওপর চলতে থাকে হত্যা নির্যাতন, মিথ্যা বন মামলা ও নানারকম হয়রানি। নারী ও শিশু নির্যাতন বৃদ্ধি পেতে থাকে। কত নারী-পুরুষ বন বিভাগের কর্মচারীদের হাতে নিহত ও নিগৃহীত হয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যান যেমন জানা নেই তেমনি গুরুত্ব দেয়াও হয়নি। এলাকার আদিবাসী পরিবারের পুরুষ সদস্যরা একাধিক মিথ্যা বন মামলার শিকার। দিনের পর দিন মামলার খরচপাতি চালাতে গিয়ে তারা নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। জমি বি□ি বা সংসারের মূল্যবান সম্পদ বন্ধক রেখে মামলা থেকে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করে ছেলেমেয়ে মানুষ করার সুযোগ তারা পায় না। স্থানীয় বন বিভাগের সীমাহীন দুর্নীতির কারণে পরিবারের সমাজে অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা বেড়েই চলেছে। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অসংখ্য ঘটনা। ৩-৫ হাজার মিথ্যা মামলার বোঝা নিয়ে জীবনযাপন করে হতদরিদ্র আদিবাসীসহ কর্মচারীদের লোকজন। ভোটার লিস্ট দেখে আদিবাসীদের বিরুদ্ধে বন কর্মচারীদের মামলা দায়ের করার অভিযোগও রয়েছে। বনভূমি উচ্ছেদ করার সুদূরপ্রসারী দুরভিসন্ধি নিয়েই বন বিভাগ মামলায় ঝুলিয়ে তাদের হয়রানি ও নিঃস্ব করে বলে স্থানীয় আদিবাসীরা মনে করে।

আন্তর্জাতিক বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর ভূমিকাও মধুপুর বন ও বনের মানুষদের অস্তিত্ব অনিশ্চিত করে তুলছে। ১৯৮৬ সালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ১৫ হাজার একর জমিতে রাবার চাষের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। গারো আদিবাসীরা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে থাকে। এই সংগ্রামে তারা সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা সফল হয়েছিল। কিন্তু ভোগ করতে হয়েছিল চরম অত্যাচার আর নির্যাতন। ১৯৮৮-৮৯ সালে থানা বনায়ন ও নার্সারি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সামাজিক বনায়নের অধীনে জ্বালানি কাঠ উৎপাদনের লক্ষ্যে উডলট বাগান কর্মসূচি শুরু করে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) ঋণ সহায়তায় ৭ বছর মেয়াদী অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রতি বছর নবায়নযোগ্য চুক্তিতে প্রতিজন অংশীদারকে ৩ একর জমিতে ৩৬শ'র মতো বিদেশী প্রজাতির ইউকেলিপটাস, আকাশিয়া ও মিঞ্জিয়াম চারাগাছ লাগানোর কথা বলা হয়। বাগান দেখাশোনা করে চারাগাছ বড় করে তোলার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল অংশীদারের।

মেয়াদ শেষে বাগানের গাছ বিি করে লভ্যাংশের ৪০ ভাগ অংশীদারদের বাকি ৬০ ভাগ সরকারি তহবিলে জমা হওয়ার কথা। উডলট বাগান করার আগে ঐতিহ্যবাহী প্রাকৃতিক বন কেটে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল। স্থানীয় আদিবাসী জনগণ ও বিশেষজ্ঞরা পরিবেশ নষ্ট হওয়ার কথা বলে প্রকল্পটি বাতিলের আহ্বান জানিয়েছিলেন, কিন্তু গুরুত্ব দেয়া হয়নি। বাগানের গাছ নিলামে বিির সময় হলে অংশীদাররা তাগাদা দিলেও বন বিভাগ নানা অজুহাতে বিির ব্যবস্থা করেনি। এক সময় বাগানের গাছ শেষ হয়ে যায়। অংশীদাররা লাভবান হওয়ার পরিবর্তে জেল, মামলা, সামাজিক অস্থিরতা ও আর্থিক ক্ষতির শিকার হয়। অপর দিকে এলাকার প্রাকৃতিক বনও ধ্বংস হয়ে যায়।

২০০৩ সালে বছর জুড়েই মধুপুর বনে ছিল উত্তেজনা। বছরের শেষ দিকে ২৫ ডিসেম্বর ঘরে ঘরে কালো পতাকা উড়িয়ে এলাকার গারোরা বড়দিন উৎসব পালন করে। ন্যাশনাল পার্কের সঙ্গে ইকোপার্ক গড়ে তুলে বন রক্ষার নামে প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণের অব্যাহত প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, মিছিল, মিটিং ও আন্দোলনের এক পর্যায়ে ৩ জানুয়ারি ২০০৪ শান্তিপূর্ণ একটি প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশ ও বন কর্মচারীরা বিনা উস্কানিতে গুলি করে পীরেন স্-নকে হত্যা, শিশু ও নারীসহ আরও ২০ জনেরও বেশি লোককে আহত করে। ১৯৬২ সাল থেকে ৪১ বছরে মধুপুর বনে গারোদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই এবারের মতো এর আগে কোনদিনই প্রচার মাধ্যমগুলোতে ব্যাপকভাবে প্রচার হয়নি। কত সংগ্রামী নারী-পুরুষ সেসব ঘটনা জানতে পারেনি। ৬১ হাজার ফুট দৈর্ঘ্য ৭ ফুট উঁচু ইটের দেয়ালের ওপর আরও ৩ ফুট তারকাঁটার দেয়াল নির্মাণসহ ইকোপার্ক গড়ে তোলার জন্য প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। ইকোপার্কের জন্য ২০ হাজার একর জমির মধ্যে ৩০ একরের মতো আদিবাসীদের চাষের জমি ছাড়াও ঐতিহ্যবাহী দখলি জমি হাতছাড়া হয়ে যাবে। দেয়াল নির্মাণ হলে আদিবাসীদের ভিটেমাটি সংকোচন, চলাচলের রাস্তা বন্ধ, দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবনযাপনে বিঘ্নসহ উচ্ছেদের আশংকা রয়েছে। ৭টি জায়গায় গেট থাকবে আর প্রত্যেকটিতে টোল প্রদান করতে হবে। উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করতে নিজেদের বাড়ির আঙিনা পার হতেই টোল দেয়া শুরু করতে হবে। বাড়িভিটার আশপাশের গাছ-গাছালিকে ঘিরে জীবন-জীবিকার যে অবলম্বন রয়েছে তা চোখের সামনেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অনেক প্রতিশ্রুতি, অনেক ভাল কথা বলা হয় কিন্তু পরবর্তীতে সেসবের কোন গুরুত্বই থাকে না। এমনি অভিজ্ঞতা থেকেই মরণপণ প্রতিবাদ করে যাচ্ছে। নিগৃহীত লোকজন। দেয়াল নির্মাণের বিরোধিতা করার কারণে আদিবাসীদের বিরুদ্ধে সরকারি কাজে বাধাদানের অভিযোগ তুলে স্থানীয় বন বিভাগ মামলা দায়ের করেছে। কথিত মামলায় ৯ আসামির মধ্যে ১০-১২ বছরের ৪ শিশু-কিশোরও রয়েছে। বন ও পরিবেশ মন্ত্রীকে লিখিতভাবে আদিবাসীদের আপত্তির বিষয় জানানো হয়েছে, তার সঙ্গে নেতৃবৃন্দ দেখা করে আলোচনা করেছেন। মন্ত্রী এলাকায় গিয়ে কিছু লোকের সঙ্গে কথাও বলেছেন। তিনি মামলা তুলে নেয়াসহ অন্যান্য সব দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এর বিপরীতে আদিবাসীদের মূল দাবি ইকোপার্ক প্রকল্প বাতিল ও দেয়াল নির্মাণ বন্ধের পরিবর্তে অব্যাহতভাবে চলতেই থাকে। বছরের মাঝামাঝি দিকে আন্দোলনের মুখে তাড়াহুড়া করে মধু-পুর বন রক্ষা সংান্ত একটি কমিটি গঠন করে সেখানে আদিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য রাখার ঘোষণা দিয়ে আন্দোলনের নাটকীয় মোড় ঘোরানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। এর আগে কখনই এ ধরনের কমিটি গঠন বা আদিবাসীদের সংশি-ষ্টতা প্রয়োজন বোধ করেনি। কথিত কমিটি আদিবাসীদের প্রত্যাখ্যান করে কারণ তারা জানে একবার দেয়াল নির্মাণ হয়ে গেলে তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বন্দিশালায় জন্মগ্রহণ করবে, তাদের জীবন কাটবে চিড়িয়াখানার প্রাণীর মতো।

প্রধানমন্ত্রীকেও ফ্যাক্সে আদিবাসীদের উদ্বেগ জানানো হয়েছে। বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতি ও

মানবাধিকার কর্মী, রাজনীতিবিদ অনেকেই আদিবাসীদের ন্যায়সংগত দাবি অনুধাবন করে সংহতি প্রকাশ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের নেতৃবৃন্দ এলাকা পরিদর্শন করে দাবি মেনে নিয়ে আদিবাসী বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুসরণ করে মধুপুরের আদিবাসীদের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বন এলাকায় ৬৫টির বেশি আদিবাসী গ্রামের মধ্যে বর্তমানে ৩৫/৪০টির মতো অবশিষ্ট রয়েছে। যেসব গ্রামের আদিবাসীদের নিরাপত্তা প্রয়োজন।

আদিবাসীদের জীবন দর্শন, ভালবাসা, দেশ ও সমাজ চেতনা বনের ফুল, ফল বাতাসে দুলে ওঠা গাছের পাতা আর পাখির গানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। তাদের জন্ম-মৃত্যু-বেড়ে ওঠা সবকিছু বনেই হয়। তাই বনের প্রতি তাদের দরদ বেশি হওয়া খুবই স্বাভাবিক, চাওয়া-পাওয়াও বেশি। কারণ তারা জানে উদার প্রকৃতির বুকে তাদের জন্য ভালবাসা অনেক বেশি। তারা চাইলেই পায়, সে কারণেই পাওয়ার উৎস তারা নষ্ট করতে চায় না। বনভূমির প্রতিটি কণা তাদের অনুভূতিকে স্পর্শ করে। তাদের হৃদয় জুড়ে শাল-গর্জনের সৃষ্টি হাওয়া। তারা হারাতে চায় না সুখ। তাদের রেখে যাওয়া সুস্বাদু আম-কাঁঠালের স্বাদ তাদের কাছে অনেক বেশি। কিন্তু মধুপুর বনের আদিবাসীদের শেষ আশ্রয় তাদের পূর্বপুরুষদের ভিটেমাটিতে হবে কি?

যুগান্তর, ৩০ জানুয়ারি ২০০৪

মধুপুর বনে আদিবাসীদের বাঁচতে দিন, ইকোপার্ক বাতিল করুন

সঞ্জীব দ্রং

মধুপুর বনে ইকোপার্ক বা জীববৈচিত্র সংরক্ষণের নামে যে ন্যাশনাল পার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প সরকার জোর করে বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে এবং তা করতে গিয়ে আদিবাসীদের হত্যা করেছে, আদিবাসীদের র‍্যালিতে গুলি করেছে, এ প্রকল্প আসলে ইকোপার্ক প্রকল্প নয়। এটি হবে স্রেফ একটি বিনোদন পার্ক প্রকল্প এবং এ প্রকল্প গায়ের জোরে বাস্তবায়নের পরে জীববৈচিত্র সংরক্ষণ দূরের কথা, যেটুকু বন ছিল মধুপুর গড়ে, তাও উজাড় হয়ে যাবে। বন উজাড় হলে বন বৃক্ষশূন্য হলে সরকার বা বনবিভাগের কিছু আসে যায় না। বনবিভাগ তো রয়েছেই বন ধ্বংসের জন্য, গাছ চুরি করে লাভবান হওয়ার জন্য। এটি প্রমাণিত আমাদের দেশে। এজন্য গবেষণার দরকার নেই। বনে গেলেই এটা বোঝা যায় বনবিভাগ কী করে গাছ নিয়ে, বনসম্পদ নিয়ে। বনবিভাগের কর্মকর্তাদের সম্পদের হিসাব ঠিকমতো নিলেই বেরুবে বন থেকে মুনাফা করে কারা। আর আমাদের আদিবাসী মানুষ এবং দরিদ্র সাধারণ বাঙালি এ বনবিভাগের অত্যাচারে মিথ্যা মামলার বোঝা টানতে টানতে নিঃস্ব-রিক্ত-সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। মধুপুরে চলছত্র হাইস্কুল মাঠে এক বৃদ্ধ বাঙালি জনসভায় বলেছেন, এই বনবিভাগের অত্যাচারে আমরা শেষ হয়ে গেলাম।

মধুপুর ন্যাশনাল পার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প প্রস্তাবনায় বলা আছে এবং ২৬ জানুয়ারি ঢাকার সংবাদ সম্মেলনে বনমন্ত্রী নিজেই বলেছেন, এ প্রকল্পের আওতায় বেষ্টনী নির্মাণ হবে ৬১ হাজার রানিং ফুট, কালভার্ট দুটি, পিকনিক স্পট ১০টি, কটেজ তিনটি, পাখির অভয়ারণ্যের জন্য জলাধারসহ লেক নয়টি, টাওয়ার দুটি, রেস্ট হাউস ছয়টি, পানির ট্যাঙ্ক দুটি, রাস্তা ছয়টি, জঙ্গলকর্মীদের জন্য ব্যারাক নির্মাণ হবে ছয়টি। আমার প্রশ্ন হলো, বনের মধ্যে এসব নির্মাণ কি ইকোপার্কের সংজ্ঞায় পড়ে? প্রকল্পে আরো বলা আছে, জীবজন্তু ও পশুপাখি □য় করা হবে ৪০ লাখ টাকা দিয়ে, পশুপাখির জন্য খাদ্য □য় করা হবে ৪১ লাখ টাকা দিয়ে, বন্য পশুপাখির রোগবালাই নিরাময়ের জন্য ওষুধ কেনা হবে ১০ লাখ টাকা দিয়ে ঘাস, লিগুম, কলাগাছ লাগানো হবে ৩০ হেক্টর জমিতে (অথচ বনের প্রাকৃতিক গজারি গাছ নির্বিচারে ধ্বংস করেছে বনবিভাগ নিজেই উডলট বাগানের নামে)। এখন মধুপুরের ঐতিহ্যবাহী শালবন বিরাণ ও বিবর্ণ। বনের শত শত একর জমি বনবিভাগ কলাবাগানের জন্য লিজ দিয়েছে ক্ষমতাবানদের। আরেকটি বিষয় খুব লক্ষণীয়, প্রকল্প প্রস্তাবনায় বলা আছে, পাখির অভয়ারণ্যের জন্য জলাধার নির্মাণ করা হবে। যে বনে বিমান বাহিনীর ফায়ারিং রেঞ্জ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে, বিকট শব্দে যেখানে বনভূমি মুহুর্মুহু প্রকম্পিত হয়, সেখানে পাখির অভয়ারণ্য নির্মাণ আজগুবি ভাবনা ছাড়া কিছুই নয়। এখনো মধুপুর বনে গেলে সারাদিনে যে কয়টি দেশী পাশি দেখা যাবে, তা গোনা যাবে। মধুপুর বনকে এ রকমই ধ্বংসের প্রান্তে নিয়ে গেছে আমাদের বনবিভাগ ও তার 'জঙ্গল অফিসার'রা। মহাশ্বেতা দেবী এদের জঙ্গল অফিসারই বলেছেন তার উপন্যাসে। আমরা আদিবাসীরা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলতে পারি, এ ১০ কোটি টাকার প্রকল্প কোনো□মেই মধুপুরের বন ও জীববৈচিত্র রক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারবে না,কিন্তু অর্থব্যয় হবে, অর্থের ভাগ ক্ষমতাসীনরা পাবে আর চূড়ান্তভাবে বন ধ্বংস হবে, বনের আদিবাসী মানুষের জীবন বিপন্ন হবে।

টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসক কওছার জহুরাকে জড়িয়ে ধরে মধুপুর বনের এক আদিবাসী নারী কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, আমাদের আপনি বাঁচান। মহিলা জেলা প্রশাসক সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন

তাদের। কাছেই তেলকীর রাস্তায় নিহত পীরেন্‌্‌ালের মৃতদেহ কফিনে রাখা হয়েছিল। টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ সড়কে তখন হাজার হাজার আদিবাসী নারী-পুরুষ-শিশু বসে প্রতিবাদ জানাচ্ছে পীরেন হত্যার। ঢাকা থেকে ড. কামাল হোসেনসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ যোগ দিয়েছেন আদিবাসীদের সমাবেশে। ৫ জানুয়ারি সকাল থেকে দু'পাশে গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। বহু গাড়ি আটকা পড়েছে। জেলা প্রশাসক অবরোধ সরাতে করজোড়ে আদিবাসীদের অনুরোধ করেছেন। আদিবাসীরা তার অনুরোধ শুনেছেন। তারপরই দু'জন আদিবাসী মহিলা রাস্তা থেকে উঠে এসে জেলা প্রশাসককে জড়িয়ে ধরে কথাগুলো বলেছেন। মনে পড়ে গিয়েছিল ব্রিটিশ সময়ের কথা। মহাশ্বেতা দেবী তার চোট্টি মুন্ডা ও তার তীর উপন্যাসে এক আদিবাসীকে দিয়ে বলেছিলেন ব্রিটিশ ছোট লাটের এক অ্মীয়কে, 'তুই যদি ভালো গোরমেন, তবে আমাদের এত কষ্ট কেন?' ভালো গোরমেন কবে আসবে আদিবাসীদের জন্য আমাদের দেশে? এই জেলা প্রশাসক পরে তার কথা রাখেননি। ১৭ জানুয়ারি আদিবাসী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে আবার হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা হয়েছে।

কী ছিল পীরেন্‌্‌ালের অপরাধ? পীরেন মধুপুরের বনে, নিজের জন্মভূমি গ্রামে মিছিলে গিয়েছিলেন? শান্তিপূর্ণ মিছিলে? ওরা ইকোপার্ক চাননি নিজেদের ঐতিহ্যগত জমিতে যেখানে হাজার বছর ধরে গারোদের পূর্বপুরুষেরা বিচরণ করেছেন স্বাধীনভাবে। সরকার বলছে, জায়গাগুলো বনবিভাগের। সরকার আদিবাসীদের ভূমি মালিকানার সংস্কৃতিই জানে না। আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমি মালিকানার সংস্কৃতি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত জাতিসংঘের অনেক সনদে স্বীকৃত। আইএলও কনভেনশন ১০৭ বাংলাদেশ সরকার অনুসমর্থনও করেছে। আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমির কাগজ বা দলিল থাকুক বা না থাকুক, সে ভূমি তাদের। এটাই আদিবাসীদের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি। তাই বিশ্বের আদিবাসীরা প্রশ্ন করে তোমরা কী করে কেনাবেচা করবে আকাশ, সমুদ্র, পাহাড়? এসব কি তোমরা সৃষ্টি করেছ? সৃষ্টিকর্তার সম্পদ মানুষ কীভাবে কেনাবেচা করে? এই তো সংস্কৃতি আদিবাসীদের যাকে আমরা ধ্বংস করছি নির্দয়ভাবে ও মূর্খভাবে।

৩ জানুয়ারি ২০০৪ পীরেন্‌্‌াল এবং আরো সহস্র আদিবাসী মিছিলে গিয়েছিলেন বনের মধ্যে তাদের গ্রামে। দুপুরবেলা তাদের মিছিলের ওপর নির্বিচারে পুলিশ ও বনরক্ষী গুলিবর্ষণ করে। জালাবাদে গ্রামে ঘটনাস্থলে নিহত হন আদিবাসী যুবক পীরেন্‌্‌াল। পিঠে রাইফেলের গুলিতে মা্মক আহত দশম শ্রেণীর ছাত্র উৎপল নকরেক এখন পঙ্গু। ডাক্তাররা আমাদের বলেছেন, গুলি পিঠের অনেকগুলো নার্ভ ছিঁড়ে বিদ্ধ হয়েছে, উৎপলের কোমরের নিচের দিক চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেছে, ও কোনদিন হাঁটতে পারবে না। ও বেঁচে রইবে এটুকু আশা আমরা করতে পারি? উৎপল সুস্থ হয়ে উঠুক। ১২ বছরের শিশু রবীন সাংমা মায়ের সঙ্গে ওরাও মিছিলে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। যারা গুলিবিদ্ধ হয়েছে তাদের বিরুদ্ধেই মিথ্যা মামলা দিয়েছে সরকার। আদিবাসী নারী রীতা নকরেক, রহিলা সিমসাংরা চিকিৎসাও নিতে পারেননি ঠিকমতো।

ইকোপার্ক মানে কী? দেয়াল নির্মাণ করে বন রক্ষা করা যায় এ কথা দেশের কেউ বিশ্বাস করবে না। কারণ বন ধ্বংস করে, গাছ বেঁচে, মুনাফা করে, বনের সম্পদ লুণ্ঠন করে সরকারের ক্ষমতাবান লোকেরাই সব সময়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও মধুপুরের বন মোটামুটি গভীর ছিল, বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী ছিল বনে, কমপক্ষে ৪০০ প্রজাতির বৃক্ষ ছিল এখানে। সেগুলো আজ কোথায় গেল? আদিবাসী মানুষ সম্পদ ভোগ তো দূরের কথা, বহু গ্রাম তারা হারিয়েছে বনের মধ্যে। তারা আজ বিপন্ন। এখন একটু অধিকারের কথা বললেও ওদের গুলি করে হত্যা করা হয়, শত শত মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়।

এভাবে চললে আদিবাসীরা এ দেশে বাঁচতে পারবে না। মধুপুরের আদিবাসীরা আজ

কোথায় যাবে, কার কাছে যাবে? আমি দেশের সুশীল সমাজের কাছে, এনজিওদের কাছে, মানবাধিকার সংগঠনসমূহ ও ব্যক্তিদের কাছে, সংস্কৃতিকর্মীদের কাছে, সাংবাদিকদের কাছে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে, দেশের বিবেকবান ও সহৃদয় মানুষের কাছে আকুল আবেদন জানাই, আপনারা মধুপুর বন আদিবাসী, পরিবেশ বাঁচাতে এগিয়ে আসুন। লেখকেরা লিখুন, প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করুন। আদিবাসীদের বাঁচতে দিন। আপনারা মধুপুরের বনে গয়রা, সাধুপাড়া, জয়নাগাছা, কাকারাগুনি, সাতারিয়া, বেদুরিয়া প্রভৃতি গ্রামে আসুন। আদিবাসী মানুষের বাঁচার সংগ্রামে সংহতি প্রকাশ করুন। ওখানে নিহত পীরেন স্নালের বিধবা স্ত্রী সীতা নকরেক, তার তিন মাসের কন্যা রাত্রি নকরেক, তিন বছরের পুত্র উৎস নকরেক নির্বাক হয়ে গেছে, মা সাইরোনী নকরেক স্তব্ধ চেয়ে আছে। ইকোপার্কের জন্য জীবন দিলেন বনের সন্তান পীরেন স্নাল, আমরা আর হারাতে চাই না।

প্রথম আলো, ৭ মার্চ ২০০৪

আদিবাসীদের ভালোবাসেন এমন বিশাল হৃদয়ের মানুষ খুঁজি

সঞ্জীব দ্রং

গত বছর এ আদিবাসী দিবসে প্রথম আলোতেই আমি লিখেছিলাম, আজ আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস। বিশ্বের দেশে দেশে আদিবাসীদের স্বপ্ন দেখার দিন, নতুন করে মানুষের মতো করে বাঁচার স্বপ্ন, নিজেদের স্বতন্ত্র নিয়ে, সংস্কৃতি নিয়ে, মূল্যবোধ ও চেতনা নিয়ে বাঁচার স্বপ্ন। আমি স্বপ্ন দেখি গারো পাহাড়ে মেননেং নদী তীরে একদিন গারো শিশু প্রথম স্কুলে গিয়ে ভোরবেলা তার সুন্দর সুন্দর গল্প করবেন, গারোদের কত সুন্দর সুন্দর গল্প আছে তা শিশুটিকে শোনাবেন, গারো গান গাইবে শিশুরা সমবেত কণ্ঠে, শিশুটি বাড়ি ফিরে তার বাবা-মাকে এ কথা বলবে, শুনে ওরা অবাক হয়ে যাবেন তাদের সময় তো এ রকম ছিল না। আমি স্বপ্ন দেখি আদিবাসীরা এখন থেকে রাষ্ট্রে ছোট ছোট অধিকার ভোগ করতে পারবেন তাদের ভিন্নতার কারণে অপমানিত হতে হবে না কোথাও, আদিবাসীদের ভূমি জোর করে কেউ কেড়ে নেবে না, আদিবাসী মেয়ের দুঃখ থাকবে না, পাহাড়ে জুম ক্ষেতে পাহাড়ি তরুণী নির্ভয়ে কাজ সেরে ফিরতে পারবে, দিঘীনালায় যে সেটেলার চাকমা মহিলারা জমি দখল করে রেখেছিল এতদিন, সে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে জমিগুলো দেবে আর ক্ষমা চাইবে। মায়াবতী পাহাড়ি জননী হাসি-মুখে তাকে ক্ষমা করে দেবেন। সমাজের সর্বত্র আদিবাসীদের প্রতি মানবিক ভালোবাসা জেগে উঠবে, আদিবাসীদের বেদনা সবাইকে আহত করবে, ওদের দুঃখে সমভাবে দুঃখী হবে বাংলাদেশ।

এর কোনটাই ঘটেনি আমাদের জীবনে গত এক বছরে। বরং মধুপুরে ইকোপার্ক নামে পিকনিক স্পট প্রকল্পের বিরোধিতা করতে গিয়ে পুলিশ ও বনরক্ষীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন গারো যুবক পীরেন স্নাল। তার স্ত্রী সীতা নকরেক এখন শুধু কাঁদেন তিন বছরের শিশুপুত্র উৎসব ও ছয় বছর বয়সী কন্যা রাত্রি নকরেককে নিয়ে জয়নাগাছা গ্রামে। ঘটনার পরপর সীতা নকরেক স্বামী হত্যার প্রতিবাদ জানাতে ঢাকায় এসিছিলেন। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সন্তানসহ দাঁড়িয়ে কোনো কথা বলতে পারেননি। ভাষাহীন মুখে তিনি স্বামী হত্যার বিচার চেয়েছিলেন গত

জানুয়ারি মাসে। সাত মাস হয়ে গেল পিরেন হত্যার বিচার তো দূরের কথা, গারোদের নামে উল্টা ১৫টি মিথ্যা মামলা ঠুকে দিয়েছে বন বিভাগ। এখনো তিনজন গারো নেতা টাঙ্গাইল জেলহাজতে আছেন বিনা অপরাধে।

এ বছর আদিবাসী দিবসের মূল সুর আমরা ঠিক করেছি আমাদের ভূমি আমাদের জীবন। কেননা আদিবাসীদের জীবনে মূল অবলম্বন হলো ভূমি। অথচ যুগ যুগ ধরে আদিবাসীরা তাদের ভূমি হারিয়েছে। প্রভাবশালী ভূমিগ্রাসী চক্র ক্রমাগতভাবে ওদের জমিজমা কেড়ে নিয়েছে জোর করে। জাল দলিল দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে, আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে সর্বস্বান্ত করেছে আদিবাসীদের। আর দেশের সরকার, যাদের আদিবাসীদের অধিকার রক্ষা করার কথা, তারা সবসময় শক্তিমানদের সহায়তা করেছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। আদিবাসীরা হয়তো কখনো আইনের আশ্রয় নিয়েছে, মামলা করেছে, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে মামলা চালাতে গিয়ে আরো নিঃস্ব হয়েছে। বছরের পর বছর দরিদ্র আদিবাসী মামলা করে জমি ফেরত পেয়েছে এ রকম নজির তো বলতে গেলে নেই। মহাশ্বেতা দেবী তার চোট্টি মুন্ডা ও তার তীর উপন্যাসে এক মুন্ডা পহানের মাধ্যমে বলেছিলেন, 'তুই যদি ভালো গোরমেন, তবে আমাদের এত কষ্ট কেন?' বিহারে বড়লাটের ভাই ইংল্যান্ড থেকে বেড়াতে এসেছিলেন এবং মুন্ডাদের গ্রাম ঘুরছিলেন! এই বিদেশী খুব সুন্দর আচরণ করেছিলেন মুণ্ডাদের সঙ্গে। তাতেই পহান তাকে কথাগুলো বলেন। ব্রিটিশ আমলে বলা একজন মুণ্ডার সে কথাগুলো আজও সমানভাবে প্রযোজ্য।

প্রতিদিন জমি হারাচ্ছে আদিবাসীরা আর অসহায়ভাবে দেখছে যে তাদের পাশে দাঁড়ানোর কেউ নেই। শুধু ভূমিলোভী চক্র নয়, কখনো স্বয়ং সরকার আদিবাসীদের উচ্ছেদ করছে স্বয়ং সরকার আদিবাসীদের উচ্ছেদ করছে বিভিন্ন প্রকল্পের নামে। এমনকি বন বিভাগ সামাজিক বনায়নের নামে চুক্তি করেও আদিবাসীদের সঙ্গে প্রতারণা করছে। চুক্তিতে বলা ছিল, আদিবাসী-রা গাছ সংরক্ষণ ও যত্ন করবে এবং বড় হলে গাছ বিক্রির ৬৫ শতাংশ টাকা তারা পাবে এবং বাকিটা বন বিভাগ পাবে। কিন্তু ১০-১৫ বছর কষ্ট করে গাছ পালনের পর বন বিভাগ আদিবাসীদের এ প্রাপ্য অংশ দিচ্ছে না। মধুপুরের অনেক আদিবাসী প্রতারিত হয়েছে। দিনাজপুরের সাঁওতালরা কিছুদিন আগে বিশাল সমাবেশ করেছে বন বিভাগের প্রতারণার বিরুদ্ধে।

আমি বেশ কিছুদিন আগে কুলাউড়ায় ফুলতলা খাসিয়া পুঞ্জিতে গিয়েছিলাম। এখানে এলাকার ভূমিগ্রাসী চক্রের সঙ্গে বন বিভাগের লোকজন মিলে ফুলতলা খাসিয়া পুঞ্জিটি তছনছ করে দিয়েছিল, লুট করে নিয়েছিল খাসিয়াদের সহায় সম্পদ। গ্রামে ঢোকার আগে বন বিভাগের গার্ডরা নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিল খাসিয়াদের ওপর। গুলিবিদ্ধ হয়ে ফুলতলা খাসিয়া পুঞ্জির হেডম্যানের ছেলে এখনো একচোখ অন্ধ। তার গুলি এখনো রয়ে গেছে। তার মায়ের বাঁ হাতে গুলি লেগেছিল, তার মাংস ছিঁড়ে গেছে। এ রকম অনেকেই এখনো শরীরে গুলির স্প্রিন্টার বয়ে নিয়ে বেঁচে আছেন। এত বড় আক্রমণের পরও খাসিয়ারা থানায় মামলা করতে পারেনি, বরং বন বিভাগ উল্টো খাসিয়াদের ওপর মিথ্যা মামলা দায়ের করে। হেডম্যানের মা যার বয়স একশ' বছরের অধিক, তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায় এবং হাজতে ভরে দেয়। তার ভাইকেও পুলিশ ধরে নিয়ে যায় সঙ্গে একজন তরুণীকেও ধরে নিয়ে যায়। ওরা পালাতে পারেনি ওদের বৃদ্ধ মাকে রেখে, তাই ধরা পড়ে সন্ত্রাসীদের হাতে, আক্রমণকারীদের হাতে। এ আক্রমণের পরও ওরা আবার গড়ে তোলে ওদের গ্রাম। ওদের চারজন স্বজন বিনা দোষে জেলে থাকে দেড় মাস। জেল থেকে ফিরে মিথ্যা মামলা কাঁধে নিয়ে দু'জন মারা যায়। ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বন বিভাগ, খাসিয়ারা গাছ চুরি করছিল। খাসিয়াদের গ্রামে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে, প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে, ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে লুণ্ঠন করার পর আদিবাসীদের নামেই মামলা হয়

গাছ চুরির এবং এ মামলা যথারীতি গ্রহণ করে পুলিশ। এখনো আতঙ্কে আছে ফুলতলা খাসিয়ারা। কারণ ওদের জায়গা স্থানীয় চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে যারা দখল করতে চায়, তারা ক্ষমতাসীনদের ছত্রছায়ায় থাকে। থানা পুলিশ তাই জেনেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে না।

এ রকম ভাবেই বেঁচে আছে আদিবাসীরা বা তারা বেঁচে নেই আসলে কোনরকম টিকে আছে। যে ভূমিকে তারা মনে করত তাদের অস্তিত্বের চিহ্ন, এখানে প্রাণেরা জেগে থাকে, তাতে তাদের অধিকার আছে, ভূমিই তাদের জীবন, বাঁচার শেষ অবলম্বন, সেই ভূমির অধিকার সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। যে বনকে তারা মনে করত তাদের এবং পরম মমতায় বনের মধ্যে জীবনকে সাজাত, সেই বনের ওপর তাদের অধিকার অস্বীকার করা হচ্ছে। আইএলও কনভেনশন ১০৭ অনুস্বাক্ষর করার পরও কোনো সরকার আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমির অধিকারকে স্বীকার করে ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

তবে একটি ভালো খবরও আছে, কোথাও কোথাও রুখে দাঁড়াচ্ছেন আদিবাসীরা। এখন আদিবাসীদের এ নিজস্ব সংগ্রামকে শক্তিশালী করা দরকার। নিজ বাসভূমে পরবাসীর দুঃখ ঘুচাতে হলে ভূমি রক্ষার কাজই সবার আগে করা দরকার। যে ভূমিতে সাঁওতাল বাস করেন উত্তরবঙ্গে, সে জমির কাগজ বা দলিলপত্র থাকুক বা না থাকুক, সে জমি ওই সাঁওতালের। সরকারের খাতায় সে জমি 'খাস' হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে, কিন্তু আদিবাসী সংস্কৃতিতে সে জমি ওই আদিবাসীরই। তাদের কাছ থেকে সরকার বা অন্যরা যদি সে জমি জোরপূর্বক কেড়ে নিতে চায়, সেটা হবে আন্তর্জাতিক সনদের লঙ্ঘন, যা মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে চিহ্নিত হবে। খাসিয়াদের জন্যও একই কথা প্রযোজ্য।

আদিবাসীদের এখন এই স্পিরিটের ওপর কাজ করতে হবে। কাগজপত্র থাকুক বা না থাকুক আদিবাসী অধ্যুষিত জমি, সম্পদ, বন, গাছপালা এসবের মালিক আদিবাসীরাই। খাসিয়া এলাকায় ইকোপার্ক আন্দোলন করে আমরা একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। সিরাজগঞ্জের তারাশ থানার মাধাইনগরেও আদিবাসীরা জেগে উঠেছেন, উচ্ছেদ হওয়ার উপ□ম হওয়ার পরও তারা সরকারি প্রকল্প ঠেকিয়ে দিয়েছেন। আমি আশাবাদী, মধুপুরেও আদিবাসীরাই জয়ী হবেন তাদের সংগ্রামে, অরণ্যের বুকে অর্থহীন দেয়াল নির্মাণ বন্ধ হবে, বন্দিদশা থেকে আদিবাসীরা মুক্ত হবেন। আদিবাসীরা নিজেরা যে জেগে উঠছেন, এ কাজকেই এখন সবার সহযোগিতা করা দরকার, এসবই আশার কথা। কিন্তু আদিবাসীরা এককভাবে এ কঠিন কাজে জয়ী হতে পারে না।

তাই প্রগতিশীল মুক্ত-সংস্কৃতিমনা বাঙালিদের আদিবাসীদের পাশে থাকা দরকার। আদিবাসীদের একটু অধিকার দিলে এ রাষ্ট্রের কী এমন ক্ষতি হয়? বরং আদিবাসীদের ভাষা সংস্কৃতি, গান, ইতিহাস,গল্প সাহিত্য নানাভাবে আমাদের এ গরিব দেশকে সমৃদ্ধ করতে পারে। কিন্তু এসবের জন্য দরকার বাঙালিদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক বিশাল হৃদয়ের কিছু মানুষ, যারা আদিবাসীদের ভালোবেসে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারেন।

চৌদ্দ কোটি মানুষের দেশে এ রকম কতজন আছেন? তারা কোথায় আছেন?

প্রথম আলো, ৯ আগস্ট ২০০৪

আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতি বদলে যাচ্ছে

সৌরভ সিকদার

বাংলাদেশের জনগণনা ১৯৯১-এর রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে আদিবাসী মোট জনসংখ্যা ১২ লাখ। যদিও বাস্তবে এই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ। বাংলাদেশে বাংলা ভাষাভাষী বাঙালিরা প্রধান জনগোষ্ঠী বা জাতি হলেও আর্য আগমনের আগে এ অঞ্চলের আদি বাসিন্দা মূলত এই আদিবাসীরাই। নানা জাতির মিশ্রণে শংকর বাঙালি জাতির উদ্ভবের অনেক আগ থেকেই সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসী এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছে ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিকভাবে এ সত্য আজ প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে বাংলাদেশে এদের সংখ্যা ৪৫টি বলে বাংলাদেশ আদিবাসী ফেরাম মনে করে। সভ্যতার আলোর স্পর্শবঞ্চিত এই আদিবাসীরা এখন নিজভূমে পরবাসী। তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি নানাভাবে পরিবর্তিত হতে হতে আজ তা হুমকির সম্মুখীন। বাংলাদেশের আর্থ-সমাজ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এ কথা বললে অতিরিক্ত বা অত্যুক্তি হবে না যে 'আদিবাসী সংস্কৃতি আজ বিপন্নপ্রায়।' এ বক্তব্যের সপক্ষে জোরালো যুক্তি এই যে, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম প্রধান যে দু'টি বিষয় নিয়ে তাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করছে তার প্রথমটি ভূমি অধিকার (Struggle for land rights) এবং দ্বিতীটি নিজস্ব সংস্কৃতির সংরক্ষণ (Struggle to preserve culture)। এছাড়াও মাতৃভাষা রক্ষা ও মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের অধিকারের দাবিতে তাঁরা সোচ্চার।

আমাদের দেশে আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল মূলত ঔপনিবেশিক আমলে (Colonial period)। তবে তখন এই পরিবর্তন সীমিত ছিল মূলত ধর্মান্তর (মিশনারিদের মাধ্যমে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ) এবং আদিবাসী ভাষায় কিছু কিছু বহিরাগত শব্দ অনুপ্রবেশের মাধ্যমে। যেমন ফাদার, গির্জা, চার্চ, খ্রিস্ট প্রভৃতি খ্রিস্টধর্মকেন্দ্রিক শব্দ। ঔপনিবেশিক আমলে আদিবাসীদের সমাজ কাঠামো এবং তাদের সংস্কৃতিতে পরিবর্তন না হওয়ার কারণ হিসেবে উলে-খ করা যায় স্থবির অর্থনীতি, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রজা-প্রভু সম্পর্ক এবং দুর্গম পাহাড়-অরণ্যে আদিবাসীদের আবাসস্থল থাকায় সেই সঙ্গে যান্ত্রিক সুবিধাদি এবং বিশ্বায়নের স্পর্শের বাইরে থাকা। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের আদিবাসীদের সমাজ-সংস্কৃতি এবং ভাষার ক্ষেত্রে প্রধান পরিবর্তন শুরু হয় উপনিবেশ-উত্তরকালে। বিশ্বে আদিবাসীসহ বিভি-ন্ন জাতি-গোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মূলত শিল্পায়ন (Industrialization) এবং আধুনিকায়নের জন্যই এ ধরনের পরিবর্তন ঘটে থাকে। বাংলাদেশের আদিবাসীদের ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো প্রধান কারণ হয়ে দেখা দেয়নি। যদিও আধুনিকায়নের বিষয়টি এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের প্রধানত দক্ষিণ-পূর্ব (Ctg) এবং পূর্ব-উত্তর (Sylhet) সীমান্তজুড়ে আছে আদিবাসীরা। এদের অধিকাংশই দুর্গম পাহাড়-প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করে। আর উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে (North Bangle) বাস করে সাঁওতাল এবং অন্য কয়েকটি আদিবাসী জাতি। এরা মূলত সমতলভূমির বাসিন্দা এবং কৃষিই প্রধান জীবিকা। অঞ্চল ও অবস্থানভেদে উপনিবেশ-উত্তর সময়ে এদের পরিবর্তনের ধারাও ভিন্ন। বাংলাদেশের আদিবাসীরা বাঙালিদের মতোই হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে এবং তা পালন করে আসছে। এখানে বলে নেয়া ভাল যে, বাংলাদেশের সংখ্যাধিক্য জনগোষ্ঠীর ধর্ম ইসলাম হলেও আদিবাসীদের মধ্যে এই ধর্ম গ্রহণের কোন তথ্য আমরা পাই না। অধিকাংশ উপজাতি বৌদ্ধ, হিন্দু এবং খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী হলেও এদের প্রায় প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজস্ব নামধাম, আচার-নীতি, উৎসব, সংস্কার, চিকিৎসা পদ্ধতি (এখন লুপ্তপ্রায়), ভাষা ও সংস্কৃতি যা তারা শতাব্দীর পর

শতাব্দী ধরে বংশপরম্পরায় বহন করে চলেছে। তাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে জড়িত এই সংস্কৃতিই মূলত অন্যদের থেকে তাদের পৃথক করে তুলেছে। যে কোন জাতি বা জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের দু'টি প্রধান Phenomenon হচ্ছে ১. স্থানচ্যুতি ২. অন্য জাতি কর্তৃক অধীন হওয়া। বাংলাদেশের আদিবাসীদের ক্ষেত্রে এ দু'টি প্রপঞ্চ বা Phenomenon তো আছেই সেই সঙ্গে মানুষ তথা রাষ্ট্র সৃষ্ট অসংখ্য কারণও সক্রিয়। বিশ্বায়ন ও আকাশ সংস্কৃতির ফলে যেমন এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের, এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির সাংস্কৃতিক সংঘাত ঘটছে, তেমনি ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলে ভারতবর্ষ যখন ভারত ও পাকিস্তান দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে নতুন দু'টি রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে তখন কোন রাষ্ট্রই তাদের আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য ব্যবস্থা নেয়নি। পাকিস্তান আমলে আদিবাসীদের মানবিক-সাংস্কৃতিক অধিকার বলে কিছু ছিল না। তারা ছিল সত্যিকার অর্থে দেশের অবহেলিত মানুষ। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরও তারা স্বীকৃতি পায়নি। এর প্রমাণ ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে (১৯৭৮ সালে সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে এই ধর্মনিরপেক্ষতাও লুপ্ত হয়) গ্রহণ করা হলেও পরবর্তী সময়ের কোন শাসকই যথার্থ গণতান্ত্রিক এবং প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদের পরিচয় দিতে পারেনি। ফলে গণতন্ত্রের পরিবর্তে স্বৈরতন্ত্র, উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদ এমনকি অনেক সময় সাম্প্রদায়িক চরিত্রেরও বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। রাজব্যবস্থা এবং শাসকদের এই চরিত্রের কারণে এ দেশে গণতন্ত্র যেমন সত্যিকারভাবে বিকশিত হয়নি তেমনি আদিবাসী জনগোষ্ঠী তাদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি বিকাশের পরিবর্তে সংখ্যাধিক্য জনগণের বাঙালি সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বদলে ফেলছে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিকে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৬ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে 'বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন।' অর্থাৎ এ দেশের সব আদিবাসীর পরিচয় হবে বাঙালি। বাংলাদেশের জনগণ বা নাগরিক হলেও তারা যে বাঙালি নন এ সত্যকে তো অস্বীকার করার উপায় নেই। কাজেই রাষ্ট্রই যখন তাদের বাঙালি পরিচয়ে সংবিধানে গ্রহণ করে নেয় তখন তো অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত পশ্চাৎপদ এসব ক্ষুদ্র জাতিসত্তার পক্ষে নিজস্ব জাতি পরিচয়, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থায় নাগরিকদের জন্য যেসব অনিবার্য অধিকার বা সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয় তা বাস্তবায়ন বা ভোগ করতে গণতন্ত্র নিঃসন্দেহে অনিবার্য। যে কোন দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ছাড়া আদিবাসী বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলোর অধিকার সংরক্ষণ করার কথা ভাবাই যায় না। দেশে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু থাকলে ক্ষুদ্র বৃহৎ নির্বিশেষে সব জনগোষ্ঠীর অধিকার ভোগ করার নিশ্চয়তা সবচেয়ে বেশি থাকে। আর এর ফলে অবিকৃতরূপে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয় আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতিকে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক কারণে গণতন্ত্রের চর্চা না হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আদিবাসীরাও। Post-Colonial আমলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি আদিবাসীদের মধ্যে সম্প্রসারণ ঘটলেও তাদের সংস্কৃতিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবচেয়ে বেশি।

আদিবাসীদের ভাষা-সংস্কৃতির পরিবর্তনের কারণ :

১. সংবিধানে তাদের জাতিসত্তার স্বীকৃতি না থাকা।
২. আদিবাসী এলাকায় বহিরাগত মুসলিম পরিবারের সরকারি উদ্যোগে পুনর্বাসন (১৯৪৮)।
৩. পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী আমলের কিছু কিছু এলাকা রিজার্ভ-ফরেস্ট ঘোষণা করায় ঐতিহ্যবাহী জুমচাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
৪. ১৯৬১ সালে কর্ণফুলী নদীতে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করলে এ অঞ্চলের ৫৪ হাজার একর চাষযোগ্য সমভূমি কৃত্রিম হ্রদের জলে নিমগ্ন হয়। ফলে গৃহ ও জীবিকাহারা হয় ৭৭ হাজার আদিবাসী।
৫. সিলেট জেলার মৌলভীবাজারের খাসিয়া এলাকায় এবং টাঙ্গাইলের মধুপুরে গারোদের উচ্ছেদ করে ইকো-পার্ক নির্মাণের চেষ্টা।
৬. আদিবাসী এবং বাঙালি পরস্পর বাণিজ্য ও যোগাযোগ সূত্রে মেলামেশার কারণে আদিবাসীদের ওপর বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে।
৭. আদিবাসীদের মধ্যে অগ্রসর একটি অংশ শিক্ষিত হওয়া, বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ এবং নাগরিক সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে নিজস্ব ভাষা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
৮. আদিবাসী সংস্কৃতি প্রচার, সংরক্ষণ ও গবেষণার ক্ষেত্রে সরকারি যথাযথ পদক্ষেপ না থাকায়।
৯. আদিবাসী ভাষায় রচিত লোকসাহিত্য ছড়া-কবিতা, গল্প-আখ্যান-উপকথা প্রভৃতি চর্চা ও প্রচারের সুযোগ না থাকা।
১০. আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় কোন নীতি ও যথাযথ পরিকল্পনা না থাকলে বিগত ৫০ বছরে (১৯৪৭ সালের পর) বাংলাদেশের আদিবাসী জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তাদের জায়গা-জমি বৃদ্ধি তো পায়ইনি বরং সংকুচিত হয়েছে। ফলে জীবন ও জীবিকার তাগিদে তারা নিজ নিজ অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র গমন করেছে অথবা পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। আর এ কারণে তাদের মিশতে হয়েছে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল-উন্নত বাঙালিদের সঙ্গে। সঙ্গত কারণেই তাদের সংস্কৃতি-ভাষা প্রভাবিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সাঁওতাল আদিবাসীদের ভাষা-সংস্কৃতির পরিবর্তনের কথা বলা যেতে পারে যাদের ভাষা ও সংস্কৃতি আজ আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কারণে বাংলাভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত এবং পরিবর্তনমুখী।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মধ্যে প্রধান বা সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে চাকমা। বাংলাদেশে এদের সংখ্যা প্রায় ৩ লাখ। উপনিবেশ উত্তরকালে এদের ভাষা ও সংস্কৃতিই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে বাংলাদেশের সমাজ-নৃবিজ্ঞানীদের অভিমত। চাকমাদের জীবন ও জীবিকার প্রদান উৎস ছিল 'জুম' চাষ (Shifting cultivation)। পাহাড় সংলগ্ন সমতল ভূমি বা পাহাড়ের ধাপে ধাপে ছোট ছোট সমভূমি তৈরি করে সেখানে যে ফসল ফলানোর প্রক্রিয়া তা-ই জুমচাষ। চাকমাদের এই ঐতিহ্যবাহী জুমচাষ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ১৯৬১ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের কারণে। সে সময় এলাকার কৃষি জমির ৪০ শতাংশ অর্থাৎ ৫৪ হাজার একর জমি পানিতে ডুবে যায়। ফলে জুমচাষে নিয়োজিত চাকমাদের ৫০% বাধ্য হয়ে জীবিকার তাগিদে ফলফলারি ও অন্যান্য শাকসবজি চাষের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। জুমচাষ এ অঞ্চলের চাকমা ও অন্য আদিবাসীদের শুধু অর্থনৈতিক ভিতই রচনা করেনি, যুগ যুগ ধরে এই সহজ জীবন ব্যবস্থা তাদের দান করেছে আনন্দ। চাকমাদের পালাগানে (ভরন্দি আদাম) জুম নিয়ে অনেক আবেগবহুল বর্ণনা রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুমচাষ তাই এখানকার অধিবাসীদের সমাজ-সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ। জুমচাষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বর্তমানে জুমকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান, উৎসব এমনকি সাহিত্যচর্চাও সীমিত হয়ে পড়েছে। যেমনT.H. Lewin তার Wild Races of South-Eastern India (1870) গ্রন্থে জুম চাষকেন্দ্রিক একটা উৎসব বা ওদের ভাষায় 'মাগিরি' এবং একটি অনুষ্ঠান 'সাধুং'-এর নাম উলে-খ করেছেন। বর্তমানে এ দু'টি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডই লুপ্ত। এছাড়া জুম অর্থনীতির ওপর ভিত্তি করে এখানকার সামাজিক

সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, যা ছিল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা'। এই ব্যবস্থায় সময়ের ভিত্তিতে কাজ করে প্রতিটি গ্রামই ছিল অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার ও সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস (রাজ্য-প্রজা) ভেঙে গেলে পরিবর্তনটা অনিবার্য হয়ে যায়। উপজাতিদের অনেকের মধ্যেই যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশায় বিধিনিষেধ ছিল। বর্তমানে গ্রাম বা গোত্রকেন্দ্রিক সমাজ এবং সংস্কারে পরিবর্তন ঘটায় অবাধ মেলামেশার সুযোগ তৈরি হয়েছে চাকমা সমাজে। যে কোন সমাজে বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক বিষয়, বিশেষ করে এর অনুষ্ঠানসমূহ। চাকমাসহ অনেক আদিবাসীই ঐতিহ্যবাহী বিবাহের রূপ বদলে গেছে। আগে বিবাহে 'চুমুলাঙ' নামের একটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন না করলে বিবাহ বৈধ হতো না, বর্তমানে এ অনুষ্ঠান লুপ্তপ্রায়। এবার চাকমাদের ভাষার প্রসঙ্গটি পৃথকভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের একটি ভাষা হচ্ছে চাকমা। বাংলার সঙ্গে এর সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও একটি পৃথক ভাষার মর্যাদা লাভ করার সব যোগ্যতাই রয়েছে। তবে ভৌগোলিক ও অবস্থানগত কারণে Sino-tibeten পরিবারের ভাষার যথেষ্ট প্রভাব এ ভাষায় পাওয়া যায়। জাতিগতভাবে চাকমারা অন্যান্য আদিবাসীর তুলনায় অগ্রসর হওয়ায় এবং বাঙালি ও বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সান্নিধ্যে আসায় বর্তমানে এদের নিজস্ব ভাষা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। চাকমা ভাষার নিজস্ব লিপি 'Ojhapata' এখন আর চাকমারা ব্যবহার করে না বরং বাংলালিপিই ক্রমে গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে। তাছাড়া মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ না থাকায় ঘরে চাকমা ভাষা ব্যবহার করলেও ব্যবহারিক প্রয়োজনে বাইরে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে হচ্ছে। ফলে নিজের ভাষার চেয়ে অন্য ভাষা বেশি চর্চার কারণে বিকৃত হচ্ছে নিজের ভাষা। এ বিষয়ে Sadananda Chakma Suhrid এক নিবন্ধে লিখেছেন 'বাংলা ভাষার প্রভাব ও আধিপত্যের কারণে চাকমা ভাষা আজ হুমকির সম্মুখীন। বাঙালি ও বাংলা ভাষার সংস্পর্শে এসে বদলে যাচ্ছে চাকমা শব্দভাণ্ডার।' অন্যান্য আদিবাসীর ভাষার অবস্থাও প্রায় এক। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজবংশী আদিবাসীদের ভাষা Bodo ভাষাগোষ্ঠীর একটি শাখা হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে তারা তাদের আদিভাষা হারিয়ে বাংলা ভাষায় কথা বলে যে বাংলায় Bodo ভাষাজাত শব্দাবলীর প্রভাব আছে বলে ভাষা বিজ্ঞানীরা উলে-খ করেছেন।

কলোনি-উত্তরকালে বাংলাদেশের আদিবাসীরা যখন নাগরিক ভোটাধিকার লাভ করে এবং রাষ্ট্রীয় শাসনের কার্যকর অন্তর্ভুক্তি ঘটে তখন তাদের ছোট গোত্র বা সমাজে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী বিচার-ব্যবস্থা লুপ্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ একজন আদিবাসী অপরাধ করলে আগে যেমন স্থানীয় বা গোত্র পর্যায়ে বিচার করা হতো এখন তা পরিবর্তিত হয়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে করা হয়। এছাড়াও ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের বেশ কিছু আদিবাসীর ছিল নিজস্ব ভেষজ চিকিৎসা পদ্ধতি। তারা তাদের পাহাড়-অরণ্যে প্রাপ্ত উদ্ভিদ-গুল্ম দিয়েই চিকিৎসা করে আসছিল দীর্ঘদিন। কিন্তু সভ্যতার সম্প্রসারণ এবং নাগরিক জীবনে চিকিৎসার সুযোগ তৈরি হওয়ায় ক্রমে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি অধিকার করে নেয় আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতির এক ঐতিহ্যবাহী উপাদান ভেষজ চিকিৎসার স্থান। একইভাবে তাদের খাদ্যাভ্যাসে তেমন পরিবর্তন না ঘটলেও পোশাক এবং সংগীতের ধারায় পরিবর্তন ঘটেছে। মেয়েদের মধ্যে পোশাকের ঐতিহ্য কিছুটা থাকলেও ছেলেরা নিজেদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ছেড়ে নাগরিক সংস্কৃতির আধুনিক পোশাক পরছে। চাকমা এলাকা ঘুরলেই এ তথ্য প্রমাণিত হয়। নাগরিক সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকায় সংগীতচর্চা হ্রাস পেয়েছে। যে কোন সমাজে প্রকৃতি এবং সভ্যতার স্বাভাবিক নিয়মেই কিছু পরিবর্তন ঘটে থাকে। বাংলাদেশের আদিবাসীদের ক্ষেত্রেও এরূপ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে, যা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু রাষ্ট্রসৃষ্ট সংকটের কারণে যে বাংলাদেশের আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে তা সহজভাবে মেনে নেয়া যায় না। যেখানে রাষ্ট্রের উচিত এসব ক্ষুদ্র জাতিসত্তার (Ethnic Community) ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা করা অথচ এখানে তার বিপরীতটা ঘটছে। সাম্প্রতিককালে এশিয়ার দু'টি রাষ্ট্র ফিলিপাইন এবং নেপালে আদিবাসীদের রক্ষার জন্য আইন-তৈরি করা হয়েছে যা তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকারসহ এগুলোকে অবিকৃত থাকতে সহায়তা করবে। বাংলাদেশের প্রায় ২০ লাখ আদিবাসীর ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন তৈরি এবং তা বাস্তবায়ন সম্ভবত এ মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি কাজ। আর এ বিষয়ে সরকারকেই উদ্যোগী হতে হবে সবার আগে।

যুগান্তর, ১২ আগস্ট ২০০৪

পাহাড়ের কথা ঃ আর কতোকাল চলবে পঙ্কিল রাজনীতি?

এস এইচ মং মারমা

গহিন পাহাড়ের আকাশ ছেয়ে ইথারে যখন কবিতার মতো দুটো পঙক্তিমালা ভেসে এলো-
'আমি বড়ো অসহায়
আমার করার কিছুই নেই'

তখন শীতের আড়মোড়া ভেঙে পত্রিকার পাতায় আরো মনোযোগী হয়ে উঠি। মনে পড়ে আজ থেকে কয়েক বছর আগে কোনো এক রৌদ্রোজ্জ্বল অলস দুপুরে সবাই যখন যার যার কাজে ব্যতিব্যস্ত, তখন দক্ষিণা বাতাস হু হু করে প্রচণ্ড বেগে বয়ে চলেছে কোমল গ্রামখানি জুড়ে। ঠিক এ সময়ে কলেজ থেকে ফিরছি একাকী।

হঠাৎ দেখি রাস্তার উত্তর পাশে জনাকয়েক লোকের ভিড়। গ্রামের অনতিদূরে পাহাড়ি এলাকার পাথর টানার গুটিকয়েক মালবাহী গাড়ি। তারই নিকটবর্তী ছোট্ট একটি ঘরের অভ্যন্তরের মেঝেতে উঁকি দিচ্ছে জড়ো হওয়া লোকগুলো। পরক্ষণে দেখি আগুন, সিগারেটের টুকরো থেকে পেট্রলে আগুন লেগে দাউ দাউ করে জ্বলছে। আগুন নেভানোর চেষ্টা, বালি আর পানি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি।

কিন্তু সকল প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করে বাতাসে আগুন উড়ছে। প্রথমে একটি দোকানের ছনের চালে-নরম বাতাসের সঙ্গে হিংস্র অনলের গড়াগড়ি। তারপর একটির পর একটি বাড়ি বেয়ে পুরো গ্রামখানি নিমিষেই আগুনে পুড়ে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত। যেন খোলা আকাশের নিচে পুরো গ্রামখানি লণ্ডভণ্ড এক হিরোশিমা।

আকস্মিকতায় হতভম্ব আমি বড়োজোর ১০ বছরের ঐকান্তিক সাধনার সনদপত্র সমেত বাক্সটি কোনোমতে নিরাপদে স্থানান্তরের মুহূর্তটুকু পেয়েছি। অবশেষে পুরো গ্রামটি পোড়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবন থেকে স্বপ্নটি উড়ে গেলো চিরতরে।

এই আমি বিগত বছরগুলোতে সীমাহীন চেষ্টা করেও দগ্ধ বাড়িটি আগের মতো করে সাজাতে পারিনি। বরং বাবার নিরবচ্ছিন্ন নিরিবিলি সাধনায় ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা বাড়িটির অবয়বখানি এখনো যেন খাপছাড়া, কপর্দকশূন্য এবং নির্জীবতার ছোঁয়ার বিধ্বস্ত তার এক নীরব সাক্ষী।

সেদিন প্রখর রৌদ্রে দাউদাউ করা অপ্রতিরোধ্য আগুনে পাশের বাড়ির মহিলাটির প্রসব বেদনার চিৎকার যেন আকাশ বাতাস ভারী করে তুলেছিল। তবে মুহূর্তের পর সব কেমন যেন নিস্তব্ধতার নিশ্চুপ সাগরে ডুবে যায়। এতো বিপুল আগুনের লেলিহান শিখাও যেন দমাতে পারেনি তাকে- পরিশেষে ফুটফুটে ছোট্ট এক মানব শিশুর জন্ম।

কী বেদনাময় ছিল মুহূর্তগুলো- চিৎকার, কান্নাকাটি, ব্যথা-বেদনা ও ভয়ের সংমিশ্রণে এদিক ওদিক ছোটাছুটি। শিশুর জন্ম দেবে নাকি নিজের জীবনের অস্তিত্ব নিয়ে পালাবে নিরাপদ কোনো স্থানে। সত্যিই আকস্মিক এমন এক প্রকৃতির বীভৎসতায় আমরা সবাই ছিলাম কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও ভীতসন্ত্রস্ত।

সেদিন আমরা প্রকৃতির কাছে হেরে গিয়েছিলাম। কিন্তু কদিন আগে খাগড়াছড়ির মহালছড়িতে যে ঘটনাটা ঘটে গেলো তা ছিল নেহায়েত কিছু লোকের অমানবিক এক হৃদয়হীন নৃশংস কাণ্ড।

তবে গভীর মানবতাপূর্ণ পরিবেশে বড়ো হয়ে ওঠা একজন তরুণ ক্যাপ্টেন সেদিন তার উপরিস্থ একজন মেজরের কাছে মিনতি করছেন, স্যার বর্তমানে যা ঘটছে, ঘটে চলেছে, যেভাবেই হোক একে থামানো প্রয়োজন। নতুবা গ্রাম থেকে গ্রামে, ঘর থেকে ঘরে পুরো এলাকা ভস্মীভূত হয়ে যাবে হয়তো বা আমাদের অতিশয় নির্লিপ্ততায়।

বেচারা ক্যাপ্টেন অনুমান করতে পারেননি, যার কাছে উদ্ভূত পরিস্থিতির সমাধানের প্রত্যাশা- তিনি হয়তো লৌহ-ইস্পাতে গড়া পাহাড়ে টিকে থাকার সংস্কৃতির একজন বার্তাবাহক মাত্র। যার প্রতীক্ষা ছিল তারও উপরিস্থ একজনের নির্দেশের। অগত্যা প্রচণ্ড একটা হোঁচট খেলো তরুণ ক্যাপ্টেনের কোমল মন। পাহাড়ের সংস্কৃতিতে অনভিজ্ঞ ক্যাপ্টেনের নিষ্পাপ হৃদয়ে যে একটা লুকানো সুন্দর মন, তা হয়তো তাকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছে, উজ্জীবিত করেছে মানবতার পক্ষে স্বকীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে। কিন্তু হয়তো পারেননি চারপাশের বিশৃঙ্খল পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিকতায় সপ্রতিভ হতে। তবে তার মনোবল, তার সন্দেহভরা মন এবং তার হৃদয়ানুভূতি কালে কালে হয়তো আরো তীক্ষ্ণ হবে আগামীর সুন্দর কোনো প্রত্যাশার উদ্ভাবনে।

তাই হয়তো মানবতার জন্য এখনো মানুষ কেঁদে ওঠে, নিস্তব্ধতার খোলস ভেঙে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ার দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করে। হয়তোবা এটাই তাদের শৈশবের বেড়ে ওঠা প্রকৃতিজাত স্বভাব এবং এ জন্যই পৃথিবীটা এখনো বেঁচে আছে কিছু সুন্দর মানুষের ভিড়ে।

অথচ নির্লিপ্ততা কিংবা নিরপেক্ষতার অভাববোধ যে কী মারাত্মক ও ভয়ানক পরিণতি বয়ে আনে মানবতা নিষ্পেষণে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মহালছড়ির বিভীষিকাময় অত্যাচারের সাক্ষী নিঃস্ব ও নিঃশেষ হয়ে যাওয়া ৩০০ পরিবার।

তাই মানবতা, বিবেক এবং সর্বোপরি সভ্যতাকে আলোকিত করার পরিবর্তে ঝাঁকে ঝাঁকে পিঁপড়ের মতো দল বেঁধে গহীন পাহাড়ে গিয়ে একের পর এক গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করার, ভস্মিভূত করার অমানবিতা সভ্যতাকে আদিম সমাজে ফিরে যাওয়ার হাতছানি দেয়। অসহায়, নিরীহ, নির্দোষ লোকেরা হয়তো আজো জানে না, কী ছিল তাদের অপরাধ?

এরা তো আমাদেরই সন্তান, এদেশের দুর্গম পাহাড়ের সবুজ প্রকৃতির ক্রোড়ে বেড়ে ওঠা সহজ-সরল নিতান্ত নিরীহজন। তাই তো আগুন নিয়ে খেলা করার আগেই কি আমরা আমাদের বিবেক, সভ্যতা ও সর্বোপরি শিক্ষার কাছে মাথা নুইয়ে দিতে পারতাম না? কেন আমরা এমন মানবতা বোধগুলোকে উপেক্ষা করতে পারলাম? আমরা যা করেছি, তা ছিল অত্যন্ত মর্মস্পর্শী, হৃদয়বিদারক নির্মম কিছু অমানবিক কাজ। কোনো সভ্য মানুষ এ নৃশংসতার হীন প্রয়াসে সায় দিতে পারে না।

তারপর এক সময় নিশ্চিহ্ন এবং সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়ার শেষে শুরু হলো পাল্টাপাল্টি কথোপকথন, এক যন্ত্রণাময় অধ্যায়ের। যে অধ্যায় একে অপরকে ডিঙিয়ে ব্যর্থতার দায় থেকে উৎরে যাওয়ার নিরন্তর এক প্রচেষ্টা। কিংবা এ ব্যর্থতার ধুলোমাখা শরীরের সম্পূর্ণ মলিনতা মুছে পরস্পরের নিষ্কলঙ্কে উত্তীর্ণ হওয়ার আপ্রাণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

এমনি এক অনির্ধারিত বৈঠকে জেলার প্রধান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সুচিন্তিত ও দূরদর্শী কথামালার অসতর্ক মুহূর্তে সহসা দোষারোপ করে বসলেন জেলার একমাত্র নির্বাচিত রাজনীতিককে- যারই করুণ পরিণতি ভোগ করছে আজকের দুর্ভাগা ৩০০ পরিবার। সাপের গর্তে হাতের ছোঁয়া লাগালে পরিণাম যে ভয়াবহ, হয়তো বা তিনি তার সঠিক অনুমান করতে পারেননি।

রাজনীতি যে সব সময় ধরাছোঁয়ার বাইরে তার যথার্থতা নিরূপণে ব্যর্থ ছিলেন তিনি। অচিরেই এর খেসারত দিতে হয়েছে চরমভাবে। যদিও রাজনীতিক ও সিভিল প্রশাসনের ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠা অন্য প্রশাসনের এতোটুকু আঁচড়ও লাগেনি।

তাই রাজধানীর বুকে ফিরে যেতে যেতে বাধ্য হওয়ার আগেই কবিতার দুটো পঙক্তি বেজে ছিল দুঃসময়ে চারদিকে সহযোগিতা না পাওয়া অসহায় একজন জেলার প্রধান অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের গভীর দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে।

অথচ এ ব্যর্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতার বলি অনাকাঙ্ক্ষিত চিরদুঃখী অতিশয় নিরীহ ৩০০ পরিবার। যাদের সেদিনের বেঁচে থাকার প্রচণ্ড লড়াইয়ের দুঃসহ স্মৃতিগুলো আজো কাঁদায়, কষ্ট দেয় এবং তাড়া করে ফিরে প্রতিনিয়ত। কী হবে সুদূরপ্রসারী রাজনীতির নিষ্করুণ যাঁতাকলে আটকেপড়া অসহায় নিঃসঙ্গ পরিবারগুলোর? এর জন্য দায়ী কি শুধু একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর? না ব্যর্থ রাজনীতিক, না প্ররোচক অন্য প্রশাসন? এভাবে আর কতোকাল চলবে সংকীর্ণ পথে পাহাড়ের এ পঙ্কিল রাজনীতি? আরো কতো সহস্র বছর?

ভোরের কাগজ, ১৪ আগস্ট ২০০৪

আদিবাসীদের ভূমি রক্ষার প্রশ্নে প্রচলিত ভূমি আইন প্রসঙ্গে

ফজলে হোসেন বাদশা

বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসীদের মতো অনাদৃত, অবহেলিত, শোষিত ও উপেক্ষিত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কোনো বঞ্চিত মানুষের তুলনা সম্ভব কিনা আমার জানা নেই।

ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের গভীর অসন্তোষ এবং তার বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের জানা। যা ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামের ইতিহাস হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে। কিন্তু ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আদিবাসীদের ওপর জুলুম তেভাগা সংগ্রামের শেষ পর্বে চরমে পৌঁছে। যার ধারাবাহিকতা চলতে থাকে সমগ্র পাকিস্তান আমলেই। সমস্ত নির্যাতনেরই লক্ষ্য ছিল, ভূমি দখল, আদিবাসীদের গ্রাম উচ্ছেদসহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নির্যাতন। যার ফলে কেবলমাত্র দেশের উত্তরাঞ্চল থেকে লাখ লাখ আদিবাসী দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। রাতারাতি আদিবাসীদের জমি দখল ও গ্রাম দখল পাকিস্তানি আমলের এক স্বাভাবিক ঘটনাবলিতে পরিণত হয়েছিল।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসীদের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ৩০ বছর পার হয়ে গেছে। স্বাধীন বাংলাদেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন প্রসঙ্গ অনাবশ্যক বিষয়ে পরিণত হলো। বাঙালি অহমিকার কানাগলি দিয়ে এক নির্মম সাম্প্রদায়িক নিগ্রহ চলতে থাকলো আদিবাসীদের উপর। তার কোনো প্রামাণ্য দলিলও তৈরি সম্ভব হয়নি দেশের আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষিত জনসমাজের আন্তরিক উদ্যোগের অভাবে। তাই প্রথমেই আদিবাসী জনগোষ্ঠী ভূমি অধিকার রক্ষার প্রশ্নে কি ধরনের সংকটের মুখোমুখি তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রয়োজন।

সমস্ত পাপকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য জেনেভা সম্মেলনে বলা হয়েছিল বাংলাদেশে আদিবাসী নেই। কিন্তু **১৯৯৩** সালে যখন জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষ হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তখন থেকেই আদিবাসী বিষয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিভঙ্গি কার্যত উলঙ্গ হয়ে পড়ে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় যখন জাতিসংঘ ঘোষিত দিবস পালনে স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ শুরু হয় তখন সরকার ও রাষ্ট্রের দিক থেকে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর গণতান্ত্রিক অধিকারের বিষয়টি প্রবলভাবেই দেশের মানুষের সম্মুখে এসে পড়ে। ফলে অধিকার বঞ্চিত আদিবাসীদের পক্ষে □মাগত ব্যাপক এক জনসমর্থন ঘটনা প্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যাপকতা অর্জন করতে শুরু করে।

১৯৯৩ সালে আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষ পালনের মধ্যদিয়ে আদিবাসী জনসমাজ যেন হঠাৎ করেই লড়াকু জনগোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের পুনঃআবিষ্কার করে। দেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ও জাতিসত্তার সংগ্রামের অগ্রগতি উত্তরবঙ্গে সমতলের আদিবাসীদের নিজেদের ঐক্যবদ্ধ এবং প্রতিবাদী হতে সহায়তা করে। সমগ্র নব্বইয়ের দশক জুড়েই বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আদিবাসীদের নতুন এক সংগ্রামের ধারা জন্ম লাভ করে। সমগ্র আন্দোলনের অভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যা মূলত ভূমির উপর আদিবাসীদের অধিকারের প্রশ্ন থেকেই উত্থিত হয়। প্রতিটি জেলা ও থানা পর্যায়ে দেখা যায় আদিবাসীরা তাদের গ্রাস ও কৃষি জমির উপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এক ব্যাপক আন্দোলন শুরু করেন। যা □মাগতভাবে উত্তরবঙ্গের ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী ও পাবনা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। উলি-খিত এলাকার আন্দোলনে ভূমি সং□ান্ত যেসব

সমস্যাবলী প্রশাসনের কাছে উপস্থাপন করা হয় তা নিম্নরূপ-

১. ভূমি জবর-দখল।
২. ভীতি সৃষ্টির মাধ্যমে আদিবাসীদের সম্পত্তি হস্তগতসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতারণা।
৩. ভূমি জাল-জালিয়াতি।
৪. খাস জমি ও পরিত্যক্ত ভূমি থেকে বিভিন্ন পন্থায় আদিবাসীদের উচ্ছেদ।
৫. সম্পত্তি উদ্ধারে প্রশাসনের অসহযোগিতা।

আদিবাসীদের বসত অথবা কৃষিজমি জবরদখলের ঘটনা একেবারেই সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আলোকে তা সহজেই অনুমান করা সম্ভব। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ সাধারণত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের দ্বারাই প্রভাবিত হয়। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দ্বারা দরিদ্র আদিবাসীদের সম্পত্তি বেদখল হলেও প্রশাসন ও আইনের সহায়তা থেকে তারা বঞ্চিত। আদিবাসীদের অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থানের কারণেই প্রশাসনকে প্রভাবিত করা সম্ভব হয় না। বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রতা ও ব্যয়বহুল হওয়ায় আদিবাসীরা নিজেদের জমি উদ্ধারে সাধারণত সফল হতে পারে না। আদিবাসীদের জমি সং□ান্ত কাগজপত্র এমনকি আদালতে সাক্ষ্য প্রদান সব ক্ষেত্রেই তাদের প্রতিমুহূর্তে প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। নির্যাতন ও নিপীড়নের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তগত হওয়ার ঘটনা ব্যাপক। আদিবাসী নারী ধর্ষণ, নারী অপহরণ, হত্যা গ্রাম পুড়িয়ে দেয়ার মতো ঘটনার দৃষ্টান্ত অনেক। আদিবাসীদের গ্রামছাড়া করতে কতো ভয়াবহ নৃশংসতার আশ্রয় নেয়া হয়ে থাকে তার উদাহরণ আলফ্রেড সরেনের মৃত্যু ও ভীমপুর গ্রামের ধ্বংসযজ্ঞ। এ ধরনের ঘটনাবলিতে আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ভূমি গ্রাসীদের সঙ্গে সংশি-ষ্ট। তার প্রমাণ ভীমপুর নওগাঁর ঘটনা। আদিবাসী গ্রামগুলোকে ভেতর থেকে ভাঙন সৃষ্টির মাধ্যমে আদিবাসীদের উচ্ছেদ ও সম্পত্তি দখলের এক নীরব প্র□িয়া চলে। আদিবাসী ও বাঙালিদের মিশ্র গ্রাম চূড়ান্তভাবে আদিবাসীদের উচ্ছেদকেই ত্বরান্বিত করে। ফলে আদিবাসীদের গ্রামগুলোকে ঐক্যবদ্ধ ও অটুট রাখার সমস্যাও খুবই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা দরকার।

আদিবাসীদের জমি জালিয়াতি সমগ্র উত্তরাঞ্চলে এক ব্যাপক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। কোনো প্রকারে আদিবাসীদের সম্পত্তির ভূয়া কাগজ সৃষ্টির মাধ্যমে জবরদস্তিমূলকভাবে সম্পত্তি দখল এটা এক ধরনের নির্যাতন হিসেবে দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে। যেসব আদিবাসীদের সম্পত্তি খাস খতিয়ানভুক্ত করা হয়েছে অথবা পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত সেসব সম্পত্তি থেকেও আদিবাসীদের উচ্ছেদের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহার ও ক্ষমতাসীন দলের স্বার্থকে বড়ো করে দেখা হয়। যেমন মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পত্তি বরাদ্দের নামে দীর্ঘদিন থেকে বসবাসরত আদিবাসীদের ভূমি থেকে উচ্ছেদের উদাহরণও অনেক। সমস্যার প্রতিটি ক্ষেত্রেই আদিবাসীদের প্রতি অবিচার ও দুর্ভোগ প্রশাসন বিবেচনা করে না। প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রশাসন পরিচালিত হয় ক্ষমতাসীন সরকারের আদিবাসী বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি ও দলীয় স্বার্থের ভিত্তিতে। ফলে ভূমি প্রশাসন এবং আইন প্রয়োগকারী প্রশাসন আদিবাসীদের প্রতি মানবিক আচরণ এবং সমস্যা সমাধানে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে না। যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আদিবাসীদের ব্যাপক আন্দোলন ও সামাজিক চাপে প্রশাসন আদিবাসীদের ন্যায়সঙ্গত দাবি স্বীকার করতে বাধ্য হন।

আদিবাসীদের ভূমি রক্ষা সংক্রান্ত প্রচলিত আইন

আদিবাসীদের বিষয় সম্পত্তি সমস্যা ও সংকট দীর্ঘদিন থেকেই। এ কারণে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে **১৯১৮** সালে আদিবাসীদের সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে যে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়

তা প্রায় একই রূপে সন্নিবেশিত হয়েছে স্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড টেন্যান্সি অ্যাক্টের ৯৭ নং ধারায়।

এই আইনের আওতায় নিুলিখিত আদিবাসী সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্ত- সাঁওতাল, বানিয়া, ভূইয়া, ভূমিজী, ডালু, গারো, গন্দ হাদি, হাজং, হো, খারিয়া, কোচ (ঢাকা বিভাগ), কোবা, মগ, (বরিশাল) মাল, সুরিয়া পাহাড়িয়া, সেচ, মুন্ডা, মুন্ডাই, ওরাও এবং তুরী।

৯৭ নং ধারায় বিধানসমূহ কার্যকর করার বিষয়সমূহ কয়েকটি উপধারায় বিশে-ষণ করা হয়েছে। তার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে :

ক. কোনো আদিবাসী তার রায়ত বা জোত কোনো আদিবাসী নয় এমন ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করতে আগ্রহী হয় তবে তাকে রাজস্ব অফিসারের বিবেচনা সাপেক্ষে হস্তান্ত র কার্যকর করতে হবে।

খ. আদিবাসীদের নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এই ৯৭ ধারা কার্যকর হবে না।

গ. কোনো আদিবাসী ধর্মান্তর অথবা তার ধর্মীয় পরিচয় দ্বারা এই ধারার প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হবে না।

ঘ. সরকার ইচ্ছা করলে কোনো প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই ধারার বিধানসমূহ কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে অথবা এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বা বাতিল করতে পারেন।

স্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড টেন্যান্সি অ্যাক্টের ৯৭ ধারা প্রসঙ্গে

১৮৮৫ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সপ্তম অধ্যায়-এর পর সংযোজিত নতুন অধ্যায়টি হলো সপ্তম 'ক' অধ্যায়। এই অধ্যায়েই আদিবাসীদের সম্পত্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। আমাদের দেশের স্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড টেন্যান্সি অ্যাক্ট ১৯৫০ সালের ৯৭ ধারায় সপ্তম 'ক' অধ্যায়টি অক্ষুণ্ন রাখা হয়। এমনকি অধ্যায়ের শিরোনাম Restricition on alienation of land by Aboriginals একই রাখা হয়। কিন্তু বাস্তব তথ্য প্রমাণে দেখা যাচ্ছে ১৯৪৭ সালের পরবর্তী সময়ে উত্তরবঙ্গে ভূমিহীন আদিবাসীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২০% যা বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮৫% এরও বেশি। ফলে ৯৭ ধারা বহার থাকলেও আদিবাসীদের ভূমি হারানোর প্রক্রিয়া কখনোই থেমে থাকেনি। আদিবাসীদের ভূমি অধিকার প্রশ্নে বিভিন্নমুখী সমস্যা সমাধানে উলি-খিত ৯৭ ধারা যে পর্যাপ্ত নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিগত ১০ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে এ কথা বলা সহজ যে, সুষ্ঠু ভূমি সংক্রান্ত আইনের অপর্যাপ্ততাই আদিবাসীদের ভূমি হারানোর একমাত্র কারণ নয় বরং আদিবাসীদের সামাজিক নিরাপত্তা যা তাদের মৌলিক অধিকারের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।

আদিবাসীদের ভূমি রক্ষার প্রশ্নে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন।

ক. বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসীদের প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় নীতি অপরিহার্য। কারণ আদিবাসীদের স্বীকৃতি প্রশ্নে রাষ্ট্র সরকারের দোদুল্যমান নীতি আদিবাসীদের আরো অনিশ্চিত অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দরকার সাংবিধানিকভাবেই বিভিন্ন জাতিসত্তার আদিবাসীদের স্বীকৃতি।

খ. আদিবাসীদের গ্রাম ও তাদের কৃষিজমি যা এখনো পর্যন্ত ভোগ দখলে রয়েছে এবং বিগত ৫০ বছরে অবৈধভাবে আদিবাসীদের হারানো জমির পরিমাণ সুনির্দিষ্টকরণের জন্য ভূমি কমিশন গঠন প্রয়োজন। যে কমিশন আদিবাসীদের ভূমি পুনরুদ্ধারসহ আদিবাসীর জন্য বিশেষ ভূমি আইন প্রণয়নের জন্য সুপারিশ করবে।

গ. আদিবাসীদের ভূমি গ্রাসের জন্য শুধু দেওয়ানি সমস্যার প্রতিকারই নয় ফৌজদারি সমস্যার প্রতিকারও যে অপরিহার্য তা বাস্তবতার আলোকে উপলব্ধি করা যায়। যদি দেশে সন্ত্রাস অথবা চাঁদাবাজি রোধে অথবা নারী-শিশু নির্যাতন প্রশ্নে বিশেষ আইন প্রণয়ন করা যায়, তবে দেশের সবচেয়ে বঞ্চিত ক্ষুদ্র জাতিসমূহের মৌলিক অধিকার রক্ষায় বিশেষ ধরনের ফৌজদারি ধারা বা আইন সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকতে পারে না। আজ এ কথা বিতর্কের বিষয় নয়, আদিবাসীদের উপর যেসব নিপীড়ন চলে তার লক্ষ্যও হচ্ছে আদিবাসীদের বিষয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করা। অতএব আদিবাসীদের সামাজিক নিরাপত্তা ছাড়া তাদের ভূমির অধিকার রক্ষা সম্ভব নয়।

ঘ. আদিবাসীদের স্বার্থ সংশি-ষ্ট সব বিষয় তত্ত্বাবধানের জন্য যেমন পৃথক মন্ত্রণালয় প্রয়োজন, একইভাবে প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে আদিবাসীদের সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংরক্ষণে প্রয়োজন আইনগত ক্ষমতাসহ প্রশাসনিক দপ্তরের।

আদিবাসী নেতা শহীদ আলফ্রেড সরেনসহ অসংখ্য আদিবাসীকে জীবন দিতে হয়েছে ভূমির প্রশ্নে। শহীদ আলফ্রেড সরেনের রক্তের দাগ মুছে ফেলতে সেই আদিবাসী গ্রাম ভীমপুরকে আদিবাসীহীন করতে প্রতিক্রিয়াশীলরা এখনো তৎপর। খুনিরা গ্রেপ্তার হয়নি, বিচার হয়নি খুন ও সন্ত্রাসের। গ্রামাঞ্চলে সন্ত্রাস ও উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তির দাপট এখন আদিবাসীদের জন্য ভয়াবহ বিপদ হিসেবে উপস্থিত। প্রতিদিনই ঘটছে আদিবাসীদের ভূমি দখলের অসংখ্য ঘটনা। তাই আদিবাসীদের ভূমি অধিকার প্রশ্নে এখনই প্রয়োজন সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের উদ্যোগ দেশের সব আদিবাসী সেই শপথ নিতেই আজ এগিয়ে আসছেন।

ভোরের কাগজ, ২২ আগস্ট ২০০৪

কেন এ দেশে জন্মেছিলাম!

মুনতাসীর মামুন

হ্যাঁ, আমরা জয়ী হয়েছিলাম। আর পাশ্চাত্যে আমাদের জন্য জনমত সৃষ্টি করেছিলেন, হ্যারিসন, বেজ, রবিশংকর প্রমুখ শিল্পী। সে তো ত্রিশ বছর আগের কথা। এখনকার মতো বিশ্বায়নও হয়নি, প্রযুক্তিও এতো উন্নতি হয়নি তখন। আগে আমাদের মতো দেশে একনায়করা অনেক কিছু করে পার পেয়ে যেতেন। কারণ, এতবড় বিশ্বে কে রাখে কার খবর! এখন কোথায়ও কিছু ঘটলে, মুহূর্তের মধ্যে চাউর হয়ে যাচ্ছে তা সারা বিশ্বে। তাই দেখা যাবে, বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে বা যেখানে স্বৈরশাসকরা শাসন করছে সেখানে স্যাটেলাইট, ইন্টারনেট ও অন্যান্য প্রযুক্তিতে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়।

মিষ্টি হেসে দুষ্টু ছেলের মতো অনায়াসে নির্বিকার মুখে মওদুদ আহমদ যে প্রতিনিয়ত অসত্য বলে যাচ্ছেন, না মিছিমিছি বাবর যে শত্রু খুঁজে বেড়ান, বা ব্যারিস্টার না, হুদা যে প্রধানমন্ত্রীর মত অমান্য করে নিজের স্ত্রী সংস্থাকে ১০ কোটি টাকার সম্পত্তি দেন (না. ব্যক্তিস্বার্থে নয়, 'মানবাধিকার' প্রতিষ্ঠার জন্য), খালেদা জিয়া যে পিন আটকে যাওয়া রেকর্ডের মতো বারবার বলেন, এ দেশে কিছু হচ্ছে না, সব অপপ্রচার-এগুলো কি কেউ বিশ্বাস করে? যেহেতু তারা ক্ষমতায় আছেন তাই তাদের মনে হয় সবাই তাদের কথা বিশ্বাস করছে। বিশ্ববাসীও। প্রযুক্তির কথাটা বোধ হয় তারা ভুলেই যান।

গানের সঙ্গে প্রযুক্তি এবং তার সঙ্গে খালেদা জিয়ার কী সম্পর্ক, ভেবে অবাক হতে পারেন পাঠক। আছে। না হলে এ প্রসঙ্গ কেন আনবো? তিন দশক পর আবার বিদেশে বাংলাদেশ নিয়ে গান লেখা হচ্ছে। ১৯৭১ সালের গান আমাদের উজ্জ্বল করেছিল। ২০০৪-এর গান আমাদের মাথা নিচু করে দিয়েছে। এখনকার গানও হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতনের বিরুদ্ধে। তবে নায়ক পাকিরা নয়, বাঙালিরা, থুড়ি বাংলাদেশীরা।

আমাদের বন্ধু শাহরিয়ার কবির আমাকে একটি গানের সিডি উপহার দিয়েছেন। গায়ক নামী কেউ নয়, শান্তবাদী এক গায়ক লোরকান অটওয়ে। নিউইয়র্কে থাকেন। সিডিতে ২৯টি গান আছে। খোদ যুক্তরাষ্ট্রে এবং বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে যেসব অন্যায় সংঘটিত হচ্ছে সে বিষয়ে গানগুলো লেখা হয়েছে। লোরকান নিজেই লিখেছেন।

১৯৭১ সালে যখন বাংলাদেশে গণহত্যা চলছে তখন যুক্তরাষ্ট্র সরকার গণহত্যার পক্ষে ছিল। আর মানুষ ছিল গণহত্যার বিপক্ষে। তারা গান বেঁধেছে, মিছিল করেছে, বাঙালিদের জন্য টাকা তুলেছে। ইরাকে গণহত্যাও যুক্তরাষ্ট্র চালাচ্ছে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। যুক্তরাষ্ট্র সরকার সবসময় গণহত্যাকারী, স্বৈরাচারী, ফ্যাসিবাদী শাসকদের সমর্থন করে। কিন্তু ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ মিছিলটি যুক্তরাষ্ট্রেই হয়েছে। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর পক্ষে বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে আমেরিকায়ই বিক্ষোভ হয়েছে প্রথম। তবে শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, পৃথিবীর সব দেশে বিশেষ করে ইউরোপে শান্তিবাদী মানুষের সংখ্যা বেশি। নিজেদের সরকারের মানবতাবিরোধী কার্য□মে তারাই আগে মাঠে নামে।

বর্তমানে মৌলবাদী সরকারকে ক্ষমতায় বসাতে সাহায্য করেছে বুশ ও বে-য়ার প্রশাসন। যে কারণে গত তিন বছর যে অমানুষিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে এ দেশে সে বিষয়ে তারা নিশ্চুপ। বে-য়ারের রাষ্ট্রদূত গ্রেনেড হামলায় আহত হলেও বে-য়ার চুপ করে থাকেন। আমরা তো অনেক আগে থেকেই চুপ করে আছি। আজ বুশ পাওয়েল বা রামসফিল্ড কোথাও গেলে পে-ন থেকে প্রায় নামতে পারেন না মানুষজনের প্রতিবাদে। যারা প্রতিবাদ জানাচ্ছে তারা শ্বেতাঙ্গ ও

খ্রিস্টান। কিন্তু এখানে তারা দূরে থাকুক, তাদের সেকশন অফিসার এলেও মন্ত্রীরা, মিডিয়া ব্যস্ত হয়ে পড়ে। খতিব, আমিনীর মতো মুসলমানরা হঠাৎ উদাস হয়ে যায়। আজ আমরা কোথায়! অথচ ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু ধমক দিয়েছিলেন নিক্সনকে।

ক্ষমতায় আসার পর মৌলবাদী জোট সরকার বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য ও আওয়ামী লীগকে □তদাস করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সেটি এখনো অক্ষুণ্ণ। আমাদের কিছু লোক এর প্রতিবাদ করেছে। তার ফলস্বরূপ নিগৃহীত হয়েছে, হচ্ছে। বিদেশে সিভিল সমাজ যা করেছে, এ দেশের সিভিল সমাজ তা করেনি। করার কথাও বোধহয় ভাবেনি।

লোরকানের সিডির শিরোনাম- 'সংস অব দি টাইমস দ্যাট ট্রাই দি সোল- দ্য সংস অব এ কোয়াকার বালাড সিগার।' সিডির সঙ্গে গানের সংকলনের একটি কপিও দেওয়া হয়েছে। এই সংকলনে বাংলাদেশের ওপর দু'টি গান আছে। একটি গান বাংলাদেশের এক কিশোরীকে নিয়ে শিরোনাম 'হু উইল ম্যারি মি'। অন্যটিতে উলে-খ আছে বাংলাদেশের, নাম- 'সং অব দি থার্ড ওয়ার্ল্ড'।

'হু উইল ম্যারি মি'-২৮ লাইনের গান। মুদ্রিত গানটির পাশে ছাপা হয়েছে ধর্ষিত এক কিশোরীর ছবি। বালিকার ডাগর চোখ, নিষ্পাপ মুখ দেখে আপনি মুগ্ধ হবেন। এই কিশোরীটি ২০০১ সালে সংবাদ শিরোনাম হয়েছিল। তার নাম আপনারা সবাই জানেন। যারা তাকে ধর্ষণ করেছিল তারা বাংলাদেশী জাতির কাছে বীরের সম্মান পেয়েছিল। যারা মামলা করেছিল তাদের নিগৃহীত করা হয়েছিল। চিন্তা করে দেখুন- সামান্য, শক্তিহীনা এক হিন্দু বালিকাকে গণধর্ষণ করে বাংলাদেশীরা আজ বীরের সম্মান লাভ করে। আর ১৯৭১ সালে বাঙালিরা সশস্ত্র ধর্ষক লুটেরা খুনি পাক হানাদার ও তাদের সহযোগীদের হত্যা করে বীরের সম্মান পেতো।

লোরকানের দীর্ঘ গানের বিষয়বস্তু- একটি হিন্দু বালিকা ধর্ষিত হয়েছে। অথচ একদিন এই ধর্মীয় উন্মাদনার বিরুদ্ধে এই দেশটি রক্ত দিয়ে জয়লাভ করেছিল। গানের প্রথম চারটি চরণ-

'I'm a Bangladeshi Hindu girl, I cannot say my name I cannot show my face to you, Im forced to fee is shame.

I cannot find the words to tell, what they did to me when the gangs come to my village and robbod my dignity.

শেষ লাইনটি হচ্ছে-

'why is it not the rapist, who is forced to hide his face'

ছবিটির নিচে ক্যাপশনটি আরো ভয়াবহ- 'বর্তমান বাংলাদেশে, সংখ্যালঘু সব বয়সী মহিলাকে গণধর্ষণ করা হয় যাতে তারা দেশ ছেড়ে চলে যায়। যুক্তরাষ্ট্রই সেই সরকারকে সমর্থন করছে, যে সরকার এ ভয়াবহতা প্রশ্রয় দিচ্ছে। সন্ত্রাসের একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে ধর্ষণ যার কারণে বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং পাহাড়িদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে।

এ ক্যাপশনের যে অনেকটা সত্য তা কি অস্বীকার করবেন?

দ্বিতীয় গানটির উপজীব্য তৃতীয় বিশ্ব। যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে তৃতীয় বিশ্বকে দমন করে লাভবান হচ্ছে তাও বলা হয়েছে। এ গানটির চারটি চরণ

'My sister was murdered, for the wrongs of the past in the Chittagong Hills, on the streets of Belfast in Rahmalah, or Gujrat, in corners far sway While our poverty feeds gluttony in the USA'

এখানে যে ছবিটি মুদ্রিত হয়েছে তা ধর্ষিত এক হিন্দু বালিকার, বাংলাদেশের।

এ সিডি আমার মাথা নিচু করে দিয়েছে। আমার দেশের অবর্ণনীয় অত্যাচার নিয়ে বিদেশী গায়ক গান বাঁধছে। সেই গানে তার নিজের সরকারের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। আর আমার দেশে? আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না- এক হিন্দু বালিকাকে ধর্ষণ করতে

এসেছে জোটীয়রা। তার মা হাতজোড় করে বলছেন, বাবারা আপনারা একজন একজন করে আসুন, আমার মেয়েটা ছোট। আমি আবার এ বালিকা দু'টির ছবি দেখছি, আমার চোখ অশ্রুসিক্ত, আমি কিছুই করতে পারিনি, দেখে মাথা নিচুকরে থাকি, বিদেশও, লজ্জায়। এ খবরটি যখন বের হয় আমার দেশের ক'জন মানুষ প্রতিবাদ করেছিল? আজ পর্যন্ত কত মেয়ে ধর্ষিত হলো, আত্মহত্যা করলো, কী হলো? আমরা তো নিজেদের ধার্মিক মুসলমান বলে জাহির করতে ভালোবাসি। আজানের সময় মাইক চললে বিরক্ত হই, রোজায় দোকান খোলা রাখলে ক্রুদ্ধ হই, নামাজ পড়তে পড়তে কপালে দাগ করে ফেলি, গুণগুণ করে সুরা আওড়াই- বলেন তো আল-াহর বান্দারা ঐ যে সংবাদগুলো বেরিয়ে ছিল আপনাদের কী একটু দুঃখ হয়েছিল? না হয়নি। কারণ আপনার মনে হয়েছে সে তো হিন্দু মেয়ে, সে তো আমার মেয়ে নয়। কেউ কি প্রতিবাদ করেছিলেন? কেউ কি সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসেছিলো? কোনো গায়ক কি গান বেঁধেছিলেন? মুসলমানের ধর্ম এই তা জানা ছিল না। অন্তত মুসলমানদের ইতিহাস বা ধর্মগ্রন্থে এসব করতে হবে এবং করে মুসলমানিত্বের বড়াই করতে হবে বলে কখনো পড়িনি। আসলে মানবসন্তান হলে হয়তো অন্যরকম অনুভূতি হতো? টেলিভিশনে দেখেননি, মানুষ পুড়িয়ে মারছে, জনতা উল-াসে দেখছে, দূরে পুলিশ দাঁড়িয়ে। মওদুদ আহমদ নিভাঁজ স্যুট পরে বলছেন, গণগ্রেপ্তার হয় না, বেগম জিয়া চমৎকার শিফন আর সানগ-াস পরে বলছেন, বাংলাদেশের ইমেজ নষ্ট করা হচ্ছে। তারা আধুনিক বিশ্ব ও প্রযুক্তির কথা বেমালুম ভুলে যান।

কী হচ্ছে আজ বাংলাদেশে? বিরোধী দল সমাবেশ ডাকলে গণগ্রেপ্তার হয়। হাইকোর্টের আদেশ কেউ মানতে চায় না। ভিখিরির সংখ্যা, নিরন্নের সংখ্যা বাড়ছে। মাঝে মাঝে তাদের কাঙালি ভোজন করিয়ে ছাড়ছে। আমরা তৃপ্তি পাই, কালো টাকা সাদা করার নিয়ত ব্যবস্থা হচ্ছে। এক কোটি টাকার গাড়ি এলে সহসা বিক্রি হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ আধপেটা খেয়ে থাকে। জুলুম, নির্যাতন তো নিত্যদিনের ব্যাপার। মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয় মুক্তিযুদ্ধের দলিল বিকৃত করার জন্য, আর মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভের সামনে নির্মিত হয় গণশৌচাগার। সেসব গুড়িয়ে দেওয়া দূরে থাকুক, প্রতিবাদে কেউ সোচ্চার হয় না। এক নিস্তব্ধতার সংস্কৃতি ঢেকে দিয়েছে বাংলাদেশকে। এ যে কত ভয়াবহ, অমানবিক এবং রুচি বিকৃতি তা কি আমাদের কারো মনে হয়? হয় না। আমাদের কাছে নিভাঁজ স্যুট, শিফন শাড়ি, দামী সানগ-াস অনেক মহার্ঘ। মুসলমান হলে হতে হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। বিরোধী দলের হলে ভৃত্য। খুনখারাবির বিচার? বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয় না আর সাধারণ খুন, ধর্ষণের?

কারা ভাবমূর্তি নষ্ট করছে, লোরকানরা? যদি বালিকারা গণধর্ষিত না হতো, যদি বিচার হতো তাহলে কী এসব লেখা হতো না গাওয়া হতো? এই স্যুট, শিফন, সানগ-াস, নির্বিকার মানুষ আমাদের দেশের যে ভাবমূর্তিটি তুলে ধরছে তা হলো অমানবিক একটি দেশের এবং এ দেশের মানুষ এতো অমানবিক যে, তারা যে অমানবিক সেটাও তারা বোঝেন না। এসব গান বাজবে এখন বিদেশে, গাওয়া হবে শান্তিকামী মানুষের কনসার্টে। '৭১-এ যে গান শুনতে শুনতে চোখে পানি জমতো, কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতাম মাথা উঁচু করে, মুখে থাকতো হাসি। আজ এসব গান শুনতে শুনতে মাথাটা নিচু করে থাকি অথচ মাত্র ত্রিশ বছর!

আমাদের জেনারেশনের অনেকেই দেশত্যাগ করছে। অনেকে এখন মালয়েশিয়ার জেলে যেতেও রাজি, টাকা খরচ করে। কিন্তু রাজি নয় অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে দেশটাকে মানবিক করতে। আমরা অনেকে যাইনি দেশ ছেড়ে, দেশ গড়বো বলে, দেশ ছেড়ে যাওয়ার সময়ও চলে গেছে। কিন্তু আমাদের অনেকের মনে হয়, অনেকের না হলেও নিজের মনে হয়, কেন এ দেশে জন্মেছিলাম!

ভোরের কাগজ ২.১০.২০০৪

সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে রাজনীতি

কামাল লোহানী

এদেশের জনগণ বর্তমান ক্ষমতান্ধ বিএনপি-জামাত দোস্ত সরকারের দুঃশাসন, দুর্নীতিও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। আমরা দেশের প্রায় সকল নাগরিকই ক্ষুব্ধ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে এবং অগ্নিমূল্য প্রতিরোধে সরকারি ব্যর্থতায়। ওদের দলীয় কসম খাওয়া কর্মী-সমর্থক ছাড়া আর সবাই আমরা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মর্মান্তিক অবনতিতে উদ্বিগ্ন। ক্ষমতার অপব্যবহার ছাড়াও রাজনীতিকে কলুষিত করা এবং সাধারণ সরল মানুষের ধর্মপ্রাণ মনকে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে, অপব্যাখ্যা দিয়ে বিপথগামী ও বিপন্ন করার বিরুদ্ধে।... আমরা এই ক্ষমতাজোটের শুরুর কথা ভুলিনি।

২০০১ সালের অক্টোবরে নির্বাচনে বিজয়ী জামাত ও বিএনপির নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের হিন্দুবিদ্বেষীই নয় কেবল, সংখ্যালঘু নির্যাতন, নিপীড়ন ও উচ্ছেদ-বিতাড়ন এবং হত্যা-ধর্ষণের নির্মম কাহিনীর কথা আজও লোমহর্ষক অধ্যায় হিসেবে মনে করি এবং শিহরিত হই, সন্ত্রস্ত হয়ে থাকি। আমরা তো জানি ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিসর্জন দিয়ে এরাই সংবিধানকে ক্রমশ ক্ষতবিক্ষত করেছে। এর মধ্যে এবারে শারদীয় পূজা উৎসব অপ্রত্যাশিতভাবে কেন এমন শান্তিপ্রিয় পরিবেশে পালিত হয়ে গেল তা কিন্তু বুঝতে আমাদের বাকি নেই। তাই বলে কি, যেহেতু জোট সরকারকে চাই না, সে কারণেই কেবল বাস্তবকে অস্বীকার করবো? না।

আমরা জনগণ যারা সচেতন, রাজনীতি বিশ্বাসী, তারা কিন্তু নির্দ্বিধায় বলতে পারি এবারে শারদ উৎসব মোটামুটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই পালিত হয়েছে।... অবশ্য ক্ষমতাসীন বিএনপি হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান পরিষদের পাল্টা একটি সংগঠন হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ফ্রন্ট' নামে গঠন করেছে, কিন্তু সার্বজনীন দুর্গোৎসব উদযাপন কমিটি কিংবা মহানগর দুর্গা পূজা উদযাপন কমিটির জায়গা দখল করতে পারেনি। এরাই দুর্গা পূজার সকল আয়োজন করে থাকে এবং এবারও করেছে। হয়তো পরের নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারলে একেও দলীয়করণ করার তাবৎ কৌশল কাজে লাগাবে।

কিন্তু নির্বিঘ্নে জামাত আমলে পূজা পালনের সংবাদে সকলেরই ধারণা সামনে নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক হিন্দু তথা সংখ্যালঘু ভোট তারা এবারে হারাতে চায় না। এ পরামর্শ জামাতই বোধ হয় তাদের দিয়েছে।

তবু স্থানীয় একটি নির্ভরযোগ্য দৈনিকের কলকাতা প্রতিনিধি প্রবীণ সাংবাদিক ও টিভি উপস্থাপক অমিত বসু খবর পাঠিয়েছেন, বাংলাদেশে শারদ উৎসবে হিন্দু নির্যাতনের অভিযোগে বিজেপি কলকাতার বঙ্গবন্ধু সরণীতে বাংলাদেশের ডেপুটি কমিশনের সামনে বিক্ষোভের ঝড় বইয়ে দিয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে ডেপুটি হাই কমিশনে স্মারকলিপি দিয়েছে। আর প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে আসামির কাঠগাড়ায় দাঁড় করিয়েছে।

গত ৩০ অক্টোবর শনিবার প্রতিবাদ সমাবেশের নেতৃত্ব দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথাগত রায়। বক্তারা তাদের বক্তৃতায় বাংলাদেশের শারদ উৎসবে হিন্দুরা নিগৃহীত হয়েছে এবং তাদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে। ট্রাকে বোঝাই কর্মীবাহিনী নিয়ে এসেছিল এবং ট্রাকে দাঁড়িয়েই ওরা বক্তৃতার আগুন ঝরিয়েছে।

বক্তৃতায় তারা আক্রমণ করেছে বাংলাদেশকে ও পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে। তারা বলেছে, বামফ্রন্ট সরকার সব দেখে শুনে চুপচাপ বসে আছে। আর তাই নাকি প্রতিবাদের দায়িত্ব বিজেপির ওপরই পড়েছে। বিজেপির নেতারা কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

ওপর ক্ষেপে গেছেন এবং বলেছেন, তিনি এত বেশি বাংলাদেশে যাওয়া-আসা করেন, এটা উচিত নয়। আর তাই ঘনিষ্ঠতার জন্য তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে ভুলে গেছেন।

তথাগত বাবুরা তো লালকৃষ্ণ আদভানিরই সাগরেদ, এর চেয়ে ভাল চিন্তা করা কি দেখা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গের মতোন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রাজ্যে ওরাই সংকীর্ণ জাতপাতের কুৎসিত রাজনীতি চালু করার কোশেস করছে।

বামফ্রন্ট সরকারের সুদৃঢ় আদর্শিক রাজনৈতিক ভিত আছে বলে ওই রাজ্যে দাঁত গলাতে পারছে না, তাই বাংলাদেশের ভেতর নাক গলাতে চাইছে। ভূত দেখছে কলকাতায় বসে। অবশ্যই তথাগত রায় বা তার দলের কাজই এই। অন্যথা হবে কী করে? মমতা বন্দোপাধ্যায়ের তৃণমূলের সঙ্গে হাতে ধরে ওঠার চেষ্টা করে এবার নিজের পায়ে বুঝি দাঁড়াতে চাইছে এবং বুঝতে পারছে বন্ধু তৃণমূলের সর্বাঙ্গে কেবল ক্ষত। সবাই কংগ্রেসে চলে যাচ্ছে। কবে হয়তো মমতাই কংগ্রেসের ঘরে গিয়ে উঠবেন অন্ধভক্তদের জলে ভাসিয়ে। ভেতরে ভেতরে সে স্রোতও বইছে। তাই স্বজন হারিয়ে বিজেপি এখন থেকে নিজেদের রাস্তা তৈরির জন্য আদভানির নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িকতা এবং বাংলাদেশ বিরোধিতার সুযোগ নেওয়ার জন্য বোধহয় অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়েছে।

কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো যে, তথাগত বাবু! আর তাছাড়া বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভেতরে কী হচ্ছে, তাতে রাজ্য সরকার কী করবে? ওরাতো আর 'চিলে কান নিয়ে গেল' শুনে চিলের পেছনে দৌড়াবার পাত্র নয়! তথাগত বাবু নিজের ঘর দেখুন, অন্যের দিকে নিজে তাকাবেন না, তেমনি আর কাউকে অযথা তাকাতে বলবেন না, রাজনৈতিক ফায়দা লোটার কৌশলে। মনে রাখবেন, উস্কানিবিহীন বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। মুক্তিযুদ্ধে ওটাও আমরা অর্জন করেছি। আপনাদেরই কাউন্টার পার্টি জামাতে ইসলামী তাদের স্বজনদের নিয়ে 'ইস্টদেবতা'কে এখন থেকেই স্মরণ করতে শুরু করেছে যেমন, তেমনি বোধহয় আপনারও কূল বাঁচাবার কসরত করছেন। কিন্তু মনে রাখবেন, ভারতবাসী যেমন তেমনি বাংলা ভাষাভাষী মানুষও সাম্প্রদায়িক শক্তিতে চিহ্নিত করতে পেরেছে।

আত্মতৃপ্তি ও ভোট-কৌশল

'শত শত চূহা মারকে বিলি- চলি হজকো'। এ কথাটা শুনে আসছি ছোটবেলা থেকে। জানি না, হয়তো বাক্যটি উর্দুজবানে তারও আগে থেকেই প্রচলিত। এর বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায়; 'শত শত ইঁদুর মেরে বেড়াল হজ করতে চলেছে।' টেলিভিশনে এমন তকরিরই করছিলেন আমাদের উজিরে আজম বেগম খালেদা জিয়া। তিনি বলছিলেন, 'আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, বাংলাদেশে কেউ সংখ্যালঘু নন। সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। সকলের ভাগ্য এদেশের সঙ্গে এদেশের মাটির সঙ্গে জড়িত।' প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তখন হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ তার সামনে বসেছিলেন। শারদীয়, উৎসব উপলক্ষ্যে ওরা গিয়েছিলেন দেশের নির্বাহী প্রধানের সন্দর্শনে। সেই সভাতেই এমন অমৃতবচন শুনে হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ হয়তো প্রীত হয়েছেন। কিন্তু পাড়ার এক ঠোঁটকাটা বয়সী মুসলিম ভদ্রলোক চকিতে মন্তব্য ছুঁড়ে দিলেনঃ 'এ কী কথা শুনি আজি মন্থরা'র মুখে রঘুরাজ।'... আজ এই আধুনিকতার বিস্ময়ের যুগে রঘুরাজও নেই, মন্থরাও নেই। তবুও অভিজ্ঞতা-সজ্ঞাত এইসব বাক্য আজও প্রয়োগ করছেন মানুষ। তবে আমাদের 'উজিরে আজম' ম্যাডাম তো আর রাজনীতির বাইরে কোনও কথা বলেন না।

তাই তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের ওই নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এমন খোশ বাতচিত তো করবেনই। তার শাসন মেয়াদের তিন বছরতো কেটেই গেলো, এবার দু'বছর বাকি। এখন থেকে তো

নির্বাচনী কলাকৌশল চালু করতেই হবে। যত যাই হয়ে থাকুক না ২০০১ সালের অক্টোবরে জামাত-বিএনপি জোটের বিজয়ের পর, এখন মন থেকে সব মুছে ফেলে খালেস দিলে গুফতোগু করতে চালাকির চাল তো নেবেনই। এখন থেকে তোষামোদ করতে না পারলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে সাম্প্রদায়িক হিংসায়, তা তো আর ভোট পাওয়ার পক্ষে 'কারেকশন' করা যাবে না। তাই একে আমি আত্মোপলব্ধি বলবো না, সংসদীয় অথবা ভোটের রাজনীতির কৌশল বলেই মনে করি। তাই শুরুতেই বলেছি, 'শত শত চুহা মারকে বিলি- চলি হজ'কো।'

এই মিঠা মিঠা বাতচিতের পর টেলিভিশনের মাইকের সামনে ভব্যতার খাতিরেই হোক আর সংশয় তাড়িত হয়েই হোক মুক্তিযুদ্ধের এক সেক্টর কমান্ডার এবং বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান পরিষদের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সিআর দত্ত বেশ আহলাদিত চিত্তেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনে আনন্দিত প্রতি[illegible]য়া ব্যক্ত করেছেন। তবে হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতারকৃত শৈবাল সাহা পার্থকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে কোনও কথা বলেননি। তারা কেবল নিরাপত্তার নিশ্চয়তা চাইতে আর সন্দর্শনে আনন্দ বিতরনের জন্যেই গিয়েছিলেন।

সার্বজনীন দুর্গাপূজা শেষ হয়েছে। লক্ষ্মীপূজাও শেষ। তেমন কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। দেশময় শারদীয় উৎসবে মত্ত মানুষ আনন্দময়ীর আগমনে মেতে উঠেছিলেন সত্যিই। মনের কোনে আশংকা থাকলেও বাধাহীন উৎসব সকলকেই উচ্ছ্বসিত করে তুলেছিল। দেবীর বোধন, অর্চনা ও বিসর্জন এসবই নির্বিঘ্নে ঘটেছে বলেই মনে হচ্ছে। ঈষৎ সন্দেহ রাখলাম এই জন্য যে, তাহলে আমরা সবাই নির্বিঘ্নে করতে পারি। কিন্তু হয়তো নানা কারণে করতে চাই না।... সামনের ২০০৬ সালে তো নির্বাচন। মাত্র বছর পেরিয়েই।

সুতরাং এখন থেকে সংযত হওয়া উচিত। এই রাজনীতির কৌশল না খাটালে ২০০১ সালে অক্টোবরের পরে নির্যাতিত সংখ্যালঘু ভোটারদের মনোকষ্ট দূর করে ওদের আস্থাভাজন না হতে পারলে, সমূহ বিপদের সম্মুখীন হতে যে হবে, ক্ষমতাসীন দুঃশাসন সেই কথাই মনে রেখে এক্ষুণি ইস্টদেবতা অর্থাৎ ভোটারদের স্মরণ করার পথ খুঁজছেন।... তবু সাইফুর রহমান সাহেবের আকাঙ্ক্ষাপূরণ করে বলতে চাই, 'ভালই করেছে সরকার।'

কিন্তু ওপরে ওপরে যতোই ভাল্‌ভালাই দেখাক না কেন, মনের ভেতর একেবারে মূলে যে বিদ্বেষ জমে আছে, তাকে দূর না করে কৌশল আটলেই 'পুণ্যিলাভ' হবে না। তার জন্য খালেস দিল চাই। মনে কোনও মলিনতা রাখা যাবেন।... মানুষ আপনাদের চেয়ে সচেতন, তাই ভালকে ভাল বলে মেনে নিতে পারো কিন্তু 'ভাল'র পেছনে যদি কোনও কপটতা থাকে এবং তাকে যদি ধরে ফেলতে পারে তাহলে তা কিন্তু খুবই খতরনাক হয়। মানুষ যখন এই শঠতা উপলব্ধি করে এক হয়, তখন কিন্তু যতো শক্তিমানই হোন না কেন, তার কাছেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবেন।

আজকের কাগজ, ২১ নবেম্বর ২০০৪

বাংলাদেশের আদিবাসীদের বঞ্চনার তালিকা

এ জেড এম আবদুল আলী

অজস্র 'না' এবং বঞ্চনা নিয়ে কাটছে আমাদের পাহাড়ি জনপদের মানুষগুলোর সারাটা জীবন। তারই একটি তালিকা এমন হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তুলে ধরেছিলেন সেদিন সেলিনা হোসেন যে, উপস্থিত শ্রোতারা হতবাক হয়ে গিয়েছিল। খানিকটা দুঃখে, খানিকটা লজ্জায় ভালো করে কথাও বলতে পারেনি শ্রোতাদের অনেকে। বহুদিন আগে পড়া একটি ইংরেজি নাটকের শিরোনাম মনে পড়ে গিয়েছিল আমার। সে নামটি ছিল 'শক অব রিকগনিশন'। মঞ্চে, পাদপ্রদীপের আলোয় হঠাৎ করে একটি মধ্যবয়স্ক অতি সাধারণ পুরুষকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখে উপস্থিত দর্শকরা চমকে হতবিহ্বল হয়ে ওঠে, যেন হঠাৎ করে নিজেকে চিনতে পারে তারা। সে এক হতচকিত আত্মআবিষ্কারের অভিজ্ঞতা। সেদিন সেলিনা হোসেনের বক্তৃতাটি শুনে অনেকেরই সেরকমটাই মনে হয়েছিল। কই, এই বাংলাদেশকে তো আমরা চিনিনি, জানার চেষ্টা করিনি। বাংলাদেশের নাগরিক বলে এ কাদের তুলে ধরলেন আমাদের সামনে সেলিনা হোসেন?

উপলক্ষটি ছিল 'অজিত গুহ স্মারক নবম বক্তৃতা'। বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতের এই উজ্জ্বল নক্ষত্রটি বিদায় নিয়েছেন আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে, ১২ নবেম্বর ১৯৬৯ সালে। বহুদিন পরে আজ থেকে নয়-দশ বছর আগে, তাঁর গুটিকয় ছাত্র এবং গুণমুগ্ধ পরিচিত ব্যক্তি মিলে একদিন ব্যবস্থা করেছিল অজিত বাবুর স্মরণে প্রতি বছর তাঁর মৃত্যুদিবসে একটি স্মারক বক্তৃতার। গত ২৫ নবেম্বর (নানা অসুবিধেয় ১২ তারিখে পালন করা যায়নি) প্রায় প্রতিবারের মতো এবারেও এই বক্তৃতার আয়োজন করেছিল 'অজিত গুহ স্মৃতি পরিষদ'। নবমবারের মতো এবারও এ দেশের একজন খ্যাতিমানকে আহ্বান করা হয়েছিল একটি বক্তৃতা দেয়ার জন্য। সে উপলক্ষেই ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন দিয়েছিলেন তাঁর লিখিত বক্তৃতা, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষগুলোর ওপর। ১৬ পাতার এই বক্তৃতাটির নাম তিনি দিয়েছিলেন 'পাহাড়ি জনপদে জীবনের অন্বেষা'।

'কথা ছিল বাংলাদেশের ভাগে যে আকাশটুকু পড়েছে তার অধিকার সব মানুষের সমান থাকবে। থাকেনি।'

'কথা ছিল দেশের প্রধান জাতিসত্তার মানুষের পাশাপাশি ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর সাংবিধানিক স্বীকৃতি থাকবে। থাকেনি।'

'কথা ছিল পূর্ণ মানুষের মর্যাদায় তাদের ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ থাকবে। থাকেনি।'

এমনি দশটি আশ্বাস ভঙ্গের বাক্য দিয়ে শুরু হয়েছে সেলিনা হোসেনের বক্তৃতাটি। যেমন তথ্যসমৃদ্ধ ও উচ্চমানের গবেষণাসমৃদ্ধ তাঁর বক্তব্যটি, তেমনি আবেগঘন ভাষায় লিখিত হয়েছে এর প্রতিটি লাইন। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষগুলোর জীবনের এমন কোনো দিক নেই, এমন কোনো সমস্যা নেই যা তুলে ধরা হয়নি এই স্মারক বক্তৃতায়।

সেলিনা হোসেন প্রথমেই একটি আক্ষেপের কথা দিয়ে শুরু করেছেন। গণতন্ত্র, অধিকার এবং নাগরিক সমাজ, এগুলো একটি আরেকটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই তিনটির কোনোটির সঙ্গেই বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষগুলোর সম্পর্ক আজ এই তেত্রিশ বছরেও কি গড়ে ওঠেনি। পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পর্কে তাদের এক নেতা রূপায়ণ দেওয়ান বলেছেন এক মর্মান্তিক কথা, 'আমরা শুধু আওয়ামী লীগকে বিশ্বাস করি নাই, সমগ্র বাঙালি জাতিকে বিশ্বাস করে আমরা চুক্তি করেছি।' কিন্তু বাঙালি জাতি কি আজ

পর্যন্ত সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করেছে? তিক্ত বেদনায় উচ্চারিত হয়েছে সেলিনা হোসেনের কণ্ঠ থেকে, 'সমাজ বহু সত্তার মিলনকেন্দ্র। এই বহু সত্তার মধ্যে নানা মত ও পথ রয়েছে।... সমষ্টির বহুমাত্রার সর্বোচ্চ প্রতিফলন যেখানে তাই গণতন্ত্র।' ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষগুলো যে দেশের গণতন্ত্রের পূর্ণ অংশীদার নয় সে দেশের সেই গণতন্ত্র একটি মিথ্যা। পরিষ্কার বলে দিয়েছেন সেলিনা হোসেন।

গবেষক-লেখক বদরুদ্দীন উমর থেকে আরম্ভ করে কবি পাবলো নেরুদা অনেকের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন এই বক্তৃতায় তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে। প্রমাণ করেছেন যে, প্রত্যেকের 'জাতিগত অস্তিত্ব ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেঁচে থাকার পূর্ণ অধিকার যে গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত, তা এসব জীবনের ক্ষেত্রে লজ্ঘিত হয়েছে।' তারা আসলে যাপন করছে এক ধরনের বেড়াজাল দেয়া শৃঙ্খলিত জীবন। অনেকটা আফ্রিকার ন্যাচারাল সাফারি পার্কগুলোতে বেঁচে থাকা পশুর মতো, আপাত-স্বাধীন হলেও, এক অদৃশ্য বেড়াজালের মধ্যে। জাতিসংঘ ১৯৯৩ সালকে 'বিশ্ব আদিবাসী বর্ষ' ঘোষণা দিলেও বাংলাদেশ সরকার সেই ঘোষণা মানেনি। বলেছে, এ দেশে কোনো আদিবাসী নেই। যারা আছে তারা উপজাতি। ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তিতে 'উপজাতি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'উপজাতি' কথাটিও আমাদের সংবিধানে নেই। অবশ্য আদিবাসীরা এই কথাটিও আজ মানতে রাজি নয়। তারা 'উপজাতি' নয় তারা 'জাতি'। 'উপজাতি' শব্দটি ব্যবহার করে তাদের পরিপূর্ণ 'জাতি' হয়ে উঠতে বাধা দেয়া তারা মানবে কেন? প্রশ্ন তুলেছে তারা।

এই ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো রাষ্ট্রকর্তৃক এতই অবহেলিত যে তাদের সংখ্যাটি পর্যন্ত আজও সঠিকভাবে নিরূপণ হয়নি। ১৯৯১-এর আদমশুমারিতে বাংলাদেশে ২৯টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এসব বিষয় নিয়ে যারা গবেষণা করছেন তাদের কারো কারো মতে বাংলাদেশে চলি-শ থেকে পঞ্চাশটি আদিবাসী জনগোষ্ঠী আছে। দেশে পঁয়তালি-শটি আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে। ১৯৮১ সালের আদমশুমারিতে যে সব আদিবাসী গোষ্ঠীর নাম উলে-খ করা হয়েছে, ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে তাদের মধ্যে এক আধটি বাদ পড়েছে। কিন্তু কী কারণে বাদ হলো তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। যাদের সংখ্যাই সঠিকভাবে নিরূপণ হয়নি, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা কী করে করবে সরকার? তাদের সমস্যাবলিই বা জানবে কী করে? নাগরিকসমাজ এবং সরকার এ বিষয়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে বলে দাবি করেছেন সেলিনা হোসেন।

যে দেশটির কারণে একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আজ জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা দিয়েছে, সেই দেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মাতৃভাষা কোনো রকম মর্যাদা পায়নি। 'দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মূল স্রোত বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করছে বলে তাদের নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।' সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর অনেকে বাংলা শিখছে, কিন্তু সাঁওতালি শিখছে না। এক গবেষকের মতে নব্বই শতাংশ চাকমা জনগণ চাকমা বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিত নয়। আর এক গবেষকের মতে 'চাকমা, মারমা ও রাখাইনদের মধ্যে '৭০-এর দশক পর্যন্ত নিজস্ব ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালু ছিল।

...এই শিক্ষাব্যবস্থা বন্ধ হওয়ার প্র[illegible]য়া শুরু হয়েছিল '৮০-এর দশকের শুরুতে এবং '৯০-এর দশক শুরু হওয়ার আগেই তা সম্পন্ন হয়।' (বর্তমান আলোচক ২০০১ সালে এ বিষয়ে একটি লেখায় লিখেছিল, পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় ছয় হাজারের মতো ভাষা আছে। এগুলোর মধ্যে মাত্র ৪ শতাংশ ভাষা, মানে মাত্র শ' তিনেক ভাষা দিয়েই পৃথিবীর ৯৬ শতাংশ মানুষ তাদের মনের ভাব প্রকাশ করে। বাকি সাড়ে পাঁচ হাজার ভাষার মধ্যে অনেকগুলো, বিশেষ করে যে সব ভাষাতে কথা বলার লোক এক লাখের কম, সেগুলোর মধ্যে বেশ কিছু

এখন, যাকে বলে বিপন্ন ভাষা, তা-ই হয়ে দাঁড়িয়েছে। কী হারে এই তিন হাজার ভাষা অবলুপ্তির আশঙ্কা তার একটা মোটামুটি হিসাবও করা হয়েছে। সেই হিসাবে একশ বছরে তিন হাজার ভাষার বিলুপ্তি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হয়েছে। অর্থাৎ সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করে সেগুলোকে বাঁচিয়ে না রাখলে প্রতি দুই সপ্তাহে অবলুপ্ত হয়ে যাবে একটি করে ভাষা। অবশ্য, পৃথিবীর অনেক গণতান্ত্রিক দেশ এখন এসব ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করছে)। কীভাবে এই ভাষাগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে, কীভাবে সেই ভাষায় শিক্ষা দেয়া সম্ভব হবে সেলিনা হোসেন সে সম্পর্কে অনেক বাস্তবসম্মত পরামর্শ দিয়েছেন তাঁর লেখায়। বলেছেন সেই সব পদক্ষেপ সরকার এবং নাগরিক সমাজকে নিতে হবে।

প্রাসঙ্গিকভাবেই উঠে এসেছে আমাদের সংবিধানের কথা যেখানে লেখা আছে, 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা'। আক্ষরিক অর্থে এই ঘোষণা মেনে নিলে সমূহবিপদ ঘটবে এই ছোট ছোট অন্য ভাষাগুলোর। তাই সেলিনা মনে করেন, মাতৃভাষা সমুন্নত করার অর্থ শুধু বাংলাভাষা সমুন্নত করাই নয়, প্রত্যেক নাগরিকের মাতৃভাষা সমুন্নত করা। যদিও সংখ্যায় কম, তবু বাংলাদেশের এমন নাগরিক আছে, যাদের মাতৃভাষা বাংলা নয়। একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনা ব্যাহত হবে যদি এই নাগরিকদের মাতৃভাষার অধিকার একই সঙ্গে সমুন্নত না করা হয়। সেই ভাষাগুলো হারিয়ে যাওয়া 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে'র জন্মদাতা দেশটির জন্য বড় লজ্জার কথা হবে।

লজ্জায় পড়ে যেতে হয় এই পাহাড়িদের সংস্কৃতির ওপর আমাদের মানে সমতলবাসী বাঙালিদের, সংস্কৃতির আগ্রাসন বিবেচনা করলেও। সবটাই হয়তো ইচ্ছেয় নয়। তবু প্রভাব আর আগ্রাসনের মধ্যে খুব সূক্ষ্ম তফাৎই থাকে অনেক সময়। বহুদিন পরে বিদেশ থেকে চাকমা ছেলের বাংলায় লেখা চিঠি পড়ে মা খুশি হতে পারে না, বেদনায় ভরে যায় মায়ের মন। ভাবেন, ছেলেটা এতদিনে পর হয়ে গেল। পাহাড়িদের জমি দখল করে অন্যেরা যখন তাদের সমতলীয় পদ্ধতিতে চাষ করে তখন পাহাড়িদের জুমচাষই শুধু আগ্রাসনের মুখে পড়ে না, পাহাড়িদের সংস্কৃতির অস্তিত্ব একটি সংকটের মুখে পড়ে। পাহাড়িদের ভাষা, পোশাক, সঙ্গীত-নৃত্যের মতো তাদের চাষ পদ্ধতিও তাদের জীবনচর্চার, তাদের সংস্কৃতির অংশ। সমতলবাসী বাঙালিদের আক্রমণ ঠেকাতে মারমা মেয়েরা ওড়নাকে সংযোজন করে তাদের পোশাকে। কে জানে মারমা নারীর নিজেদের পোশাক একদিন বাঙালি নারীর পোশাকের নিচে চাপা পড়ে যাবে কি না? আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সেলিনা হোসেন এবং এসব নিয়ে কাজ করছেন যারা সেই সব সামাজিক নৃবিজ্ঞানী।

কোনো কোনো গোষ্ঠী দরিদ্র পাহাড়িদের ধর্মান্তরিত করছে বলেও দাবি করেছেন সেলিনা হোসেন। এরপর আর সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কী বাকি থাকে? এই ভাগ্যাহত মানুষগুলো, যারা সমতলবাসীদের আক্রমণে, সেনা অভিযানের ভয়ে এক জায়গা থেকে উঠিয়ে আরেক জায়গায় চলে যাচ্ছে, আজকাল নতুন একটি শব্দ ব্যবহার হচ্ছে তাদের দুরবস্থা প্রকাশ করার জন্য। তাদের 'অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু' বলা হচ্ছে। এ একটি নেতিবাচক অনুষঙ্গ। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে উদাহরণ দিয়েছেন সেলিনা হোসেন লঞ্চে যেতে যেতে দেখেছেন জনশূন্য ছোট ছোট গ্রাম, যেখানে গ্রামগুলোর নামও লেখা নেই কোথাও। লেখা আছে আর্মি আউটপোস্টের নম্বর। অনেক লঞ্চ থেকে আজকাল আর সেসব গ্রামের নাম ঘোষণা করা হয় না যাত্রীদের জন্য। হাঁক দেয়া হয় আউটপোস্ট নম্বর নয়, সাত কিংবা ছয় বলে। পাহাড়িদের সংস্কৃতি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে এই সব বিচিত্র নাম। খোদ ঢাকা নগরীতেই যেমন হারিয়ে গিয়েছে 'মহাকালী' পরিচয়টি 'মহাখালী' নামক অর্থহীন নামের আড়ালে। 'রূপান্তর চলমান প্রক্রিয়ার ধর্ম', লিখেছেন সেলিনা। কিন্তু 'আদিবাসীদের জীবনে সংস্কৃতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইতিবাচক অর্থে রূপান্তরিত হয়নি। আঘাত

এসেছে তাদের বিপর্যস্ত করতে। আঘাত এসেছে বিলুপ্তির পথে ঠেলে দিতে।'

১৯৯৭ সালে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যে চট্টগ্রামের এই সব ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জীবনে এক নতুন সূর্য উদয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু অনেক হতাশার অন্ধকারে এক ঝিলিক আলোর মতো দেখা দিয়ে তা আবার মিলিয়ে গিয়েছে। বরং বলা যেতে পারে, অন্ধকার আরো গাঢ় হয়ে এসেছে। সেদিন সদিচ্ছা ছিল, কিন্তু অভাব ছিল সক্রিয় প্রচেষ্টার। আজ সদিচ্ছা এবং সক্রিয় প্রচেষ্টা কোনোটাই দেখা যাচ্ছে না। এখন তাই সেখানে পাহাড়ি এবং পাহাড়িতে, পাহাড়িতে বাঙালিতে এবং পাহাড়ি ও সেনাবাহিনীতে সংঘাতের বীজ বপন হয়েছে। ২০০৩ সালের আগস্ট মাসে মহালছড়ির ট্র্যাজেডিই তার নমুনা। রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তহীনতায় এবং কিছু কিছু ভুল ও অন্যান্য সিদ্ধান্তের ফলে আজ সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে চুক্তি বাস্তবায়নের বদলে চুক্তিবিরোধী অনেক ইস্যু তৈরি হয়েছে। এগুলো যত শিগগির সম্ভব দূর করা হোক। আমাদের নাগরিক ও সুশীল সমাজের শুভ বুদ্ধির উদয় হোক এই আবেদন করে সেলিনা হোসেন শেষ করেছেন তাঁর বক্তব্য।

অনুষ্ঠানের শেষে সভাপতি হিসেবে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের বক্তৃতাটি ছিল, এক হিসেবে, সেলিনা হোসেন যেসব সমস্যা তুলে ধরেছেন সেগুলো কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, কেন সেগুলোর সমাধান করা যাচ্ছে না, সেসব সম্পর্কে সেলিনা হোসেনের বক্তৃতার একটি পরিপূরক ভাষণ। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান আমাদের সংবিধান রচনার সময় এর বাংলা অনুবাদ সমন্বয় করার সুবাদে সংবিধান রচয়িতাদের বেশ কাছে ছিলেন। তিনি স্বীকার করলেন, ভুল অনেক হয়ে গেছে। তবে এ কথাও বললেন যে, ভুল যদি স্বীকার করা যায় তাহলে সেটিই হয় সেই ভুল সংশোধনের প্রথম পদক্ষেপ। তিনি আরো বললেন কয়েকটি বাস্তব অসুবিধার কথা। বিশেষ করে ছোট ভাষাগুলো যে বিপদের মুখে আছে সেগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করতে যে সমস্যাগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলোর কথা তবে সদিচ্ছা এবং সৎ সাহসের সঙ্গে এই সমস্যাগুলো মোকাবেলা না করলে যে মঙ্গল হবে না, শান্তি ফিরবে না, সে কথা সবাইকে স্বীকার করতে হবে।

যত দ্রুত সম্ভব এই পদক্ষেপ আমাদের নিতেই হবে। সেলিনা হোসেনের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করার কোনো উপায় নেই।

প্রথম আলো, ১০ জানুয়ারি ২০০৫

শহীদ পীরেনের আত্মত্যাগ মানবাধিকারের পক্ষে

বাঁধন আরেং

জানুয়ারি (২০০৫) শহীদ পীরেন স্নালের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়ে গেল। গত বছর এই দিনে (২০০৪ সালে) আদিবাসী অধ্যুষিত ঐতিহ্যবাহী মধুপুর বন এলাকায় মানবতাবিরোধী আদিবাসীদের অস্তিত্বের হুমকিস্বরূপ ইকোপার্ক ও প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণের প্রতিবাদ-সংগ্রামে সহস্র নারী-পুরুষের শান্তিপূর্ণ একটি মিছিলে সামনের সারিতে থাকা পীরেন স্নাল বিনা উস্কানিতে পুলিশ ও বন রক্ষীদের গুলিতে ঘটনাস্থলে নিহত হন। তারই সহসংগ্রামী উৎপল নকরেকসহ একই ঘটনায় আহত হয় ৩৫ জনেরও বেশি। গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত উৎপল দীর্ঘ প্রায় এক বছর চিকিৎসার পর প্রাণে বেঁচে গেলেও বরণ করতে হয়েছে চিরপঙ্গুত্ব, হুইল চেয়ারে বসেই তাকে সারাজীবন কাটাতে হবে। অল্প বয়সেই পীরেনের স্ত্রী বিধবা হয়ে ১ ও ৪ বছর বয়সের শিশুসন্তানদের নিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একখণ্ড জমির নিশ্চয়তা, অস্তিত্ব রক্ষা ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়ে পীরেন তার অবোধ দু'সন্তানকে

পিতৃহারা করে রেখে গেছেন। বুলেটের আঘাতে নিজের চলৎশক্তি হারিয়ে উৎপল দিশেহারা নিজ জাতিকে সামনে এগিয়ে চলার শক্তি যুগিয়েছে। দুই পরিবারের অপূরণীয় ক্ষতির বিনিময়ে মধুপুর বন এলাকার গারো আদিবাসীরা লাভ করেছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অপ্রতিরুদ্ধ সংগ্রামী চেতনা, জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে আত্মত্যাগের অপার মহিমা উপলব্ধি করার দুর্লভ সুযোগ। যাদের ক্ষতি হয়েছে, কোন কিছু দিয়ে তাদের পুষিয়ে দেয়া যাবে না, তবে প্রাপ্য মর্যাদা দিতেই হবে।

বছরজুড়ে ২০০৩ সালে মধুপুর গড় এলাকার আদিবাসীদের প্রতিবাদ-আন্দোলন, মিছিল, সভা, সেমিনার, পত্র-পত্রিকা এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ব্যাপকভাবে প্রচার করে। এলাকার আদিবাসী নেতারা বন ও পরিবেশ মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের আপত্তির কারণ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে ইকোপার্ক ও পার্কের চারপাশে প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ প্রকল্প বাতিলের আহ্বান জানিয়েছিলেন। বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীকেও ফ্যাক্সযোগে অবহিত করা হয়েছিল। সঙ্গে দু'একজন মন্ত্রীসহ বন ও পরিবেশ মন্ত্রী এলাকা পরিদর্শন করে কিছু লোকজনের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। বনমন্ত্রী আদিবাসীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বন মামলা প্রত্যাহারসহ সব দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাস দেয়ার পর আরও বেশি হয়রানি মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে আদিবাসীদের মধ্যে সন্দেহ দেখা দেয়।

সাংবাদিকসহ মানবাধিকার ও সাংস্কৃতিক কর্মী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এলাকায় সরেজমিন গিয়ে আদিবাসীদের ন্যায়সঙ্গত দাবি অনুধাবন করে সরকারের প্রতি প্রকল্প বাতিলের আহ্বান জানিয়েছিলেন। আদিবাসী ফোরাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার জনসংহতি সমিতির অবিসংবাদিত নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় সন্তু লারমাসহ রাজনৈতিক-সামাজিক নেতৃবৃন্দ ও সিভিল সোসাইটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আদিবাসীদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন।

এক পর্যায়ে মধুপুর বন সংরক্ষণ সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করে কমিটিতে আদিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য রাখার প্রস্তাব করে আন্দোলনের মোড় ঘোরাতে চেষ্টা করলে আদিবাসীরা প্রত্যাখ্যান করে। বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের আহ্বান ও জনমত উপেক্ষা করে বন বিভাগ বেপরোয়া হয়ে ইকোপার্ক এবং দেয়াল নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করলে আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে ওঠে। বছরের শেষান্তে এলাকার খ্রিস্টান আদিবাসীরা ঘরে ঘরে কালো পতাকা টানিয়ে ২০০৩ সালের বড়দিন উৎসব পালন করে। ব্রিটিশ আমলের পর ১৯৬২ সাল থেকে দীর্ঘ ৪১ বছরে বন বিভাগের নির্যাতন ও হয়রানির জমাট বাঁধা ক্ষোভ আদিবাসী পল্লীগুলোতে আগ্নেয়গিরির মতো বিস্ফোরিত হয়। ২০০৪ সালের প্রথম দু'দিনে আন্দোলন অপ্রতিরোধ্য হলে ৩ জানুয়ারি শান্তিপূর্ণ একটি প্রতিবাদ মিছিলের ওপর গুলি করলে প্রিয়জনদের রক্তস্রোত মধুপুর বন আদিবাসীদের আরও আপন হয়ে ওঠে। তাদের প্রিয় জন্মভূমি আবিমাতে তাদেরই বিরুদ্ধে মিথ্যা বন মামলা, হত্যা নারী ও শিশু নির্যাতন, ভূমি দখল করে উচ্ছেদের পাঁয়তারা করা হয়। এই মানবতাবিরোধী তৎপরতারই শিকার হন পীরেন স্নাল। যুগ-যুগের অন্যায়-শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রক্তের মূল্য কত, আদিবাসীরা তা গভীরভাবে উপলব্ধি করছে। এক ফোঁটা রক্তের স্রোত তাদের নিয়ে যাবে সামনের হাজার বছরের কাছে। শহীদ পীরেনের আত্মত্যাগের স্মৃতি অবহেলিত গারো সমাজে চিরঅম্লান একটি শহীদ মিনার হয়ে থাকবে।

ঐতিহ্যবাহী সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক কাঠামো দুর্বল করে পূর্বপুরুষদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে মানবাধিকার হরণের প্রকাশ্য কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৬২ সাল থেকে। ২০ হাজার একর জমি দখলে নিয়ে জাতীয় উদ্যান করার উদ্যোগ গ্রহণ করলে উদ্যান সীমানার ১৯টি গ্রাম ছাড়াও প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে গড় এলাকার মানুষরা। ১৯৮৬-৮৭ সালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) আর্থিক সহায়তায় প্রাথমিকভাবে ১৫ হাজার একর

জমিতে রাবার বাগান করার প্রতিবাদে আবার জুলুম-অত্যাচারের শিকার হতে হয় মধুপুর বনের আদিবাসীদের। ১৯৮৯ সালে সামাজিক বনায়নের আওতায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) ঋণ সহায়তায় শুরু হওয়া জ্বালানি কাঠ উৎপাদনের লক্ষ্যে উডলট বাগান প্রকল্প চলাকালে মানবাধিকার হরণের মাত্রা আশংকাজনকভাবে বেড়ে যায়। সে সময় বনরক্ষীদের গুলিতে অন্তত দু'জন মারা যায় (বিহেন নকরেক ও অধীর দফো) এবং জেল-জুলুমের শিকার হয় অগণিত গারোসহ এলাকার হাজার হাজার সাধারণ মানুষ। নিজেদের দুর্নীতি ও বনসম্পদ লুটপাটের সঙ্গে জড়িত থাকার ঘটনা আড়াল করার জন্য বন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বনের আদিবাসী সাধারণ গরিব মানুষদের ওপর দোষ চাপিয়ে মিথ্যা মামলায় ঝুলিয়ে হয়রানি করার বিষয়টি এখন সর্বজনবিদিত। 'বন বিভাগের দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিত করা হচ্ছে, বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৭২৯, সাময়িক বরখাস্ত ১৫ জন' শিরোনামের ৬ জানুয়ারি, ২০০৫ দৈনিক যুগান্তরের প্রতিবেদনে সারাদেশে বন বিভাগের দুর্নীতির ভয়াবহতা অনুধাবন করা যায়। এক্ষেত্রে দেরিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের টনক নড়েছে এবং নিজেদের মধ্যে মন্ত্রীর ভাষায় 'শুদ্ধি অভিযান' শুরু করেছে। ২০০৩-০৪ সালে ঢাকার রাজপথে ইকোপার্ক, দেয়াল নির্মাণ ও বন বিভাগের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে সাংস্কৃতিক কর্মীসহ শিক্ষাবিদ, ছাত্র ও মানবতাবাদী অনেক অ-আদিবাসী সংগঠন আদিবাসীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। এভাবে পীরেনের আত্মত্যাগে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যের মঞ্চও গড়ে উঠেছিল। উৎপলের পঙ্গুত্ববরণ হাজারো তরুণ যুবাদের মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে সাহস যুগিয়েছে। সম্মান এবং শ্রদ্ধায় অক্ষয় শক্তির উৎস হয়ে থাকবে জাতি ও সমাজের কল্যাণে আত্মোৎসর্গের গৌরবময় স্মৃতি। বুলেটের সামনে দাঁড়িয়ে মানবতা ও সমাজের ক্রান্তিলগ্নে মাথা নত না করে সামনে এগিয়ে চলার পথ দেখিয়ে যারা দুর্বার শক্তি দান করেছে, তারা মানবতাবাদীদের আদর্শ হয়ে থাকবে।

ভাষা, ধর্ম, বর্ণ ও সংস্কৃতি নির্বিশেষে সব নাগরিকের নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও মতামত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু নির্বিচারে গুলি করে পীরেন হত্যা ও অনেককে আহত করার সুবিচার লাভের ক্ষেত্রে আদিবাসীরা সন্দেহ প্রকাশ করছে। পীরেন স্নাল পুলিশ বা বনরক্ষীদের গুলিতে নিহত হননি মর্মে সরকারি তদন্তের প্রতিবেদন নিহতের পরিবার ও আদিবাসী নেতারা প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলন ও আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। একই সঙ্গে মধুপুর বন এলাকাসহ দেশের পাহাড় ও বনাঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন না করারও সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন, পাহাড় ও বন গারো আদিবাসীদের জীবন-জীবিকা এবং সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। সে কারণেই অর্থপূর্ণ আলোচনা এবং বন ও পাহাড় বিষয়ক নীতি প্রণয়নে তাদের অংশীদার করার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবা উচিত। এ জায়গায় অবহেলা করা হলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চরম অবহেলা এবং অবমাননারই শামিল বলে আদিবাসীরা মনে করেন। অবহেলা ও অবজ্ঞাচ্ছলে কৌশল অবলম্বন হীনতা ও অযোগ্যতারই নামান্তর। ক্ষমতাহীনতার সুযোগে যা খুশি তা করা মানবাধিকার লংঘন বলেই তারা মনে করেন। স্থানীয় প্রশাসনের যুগ-যুগের অবহেলা আদিবাসীদের ওপর জুলুমে মদদ যুগিয়েছে। ক্ষমতা চর্চাকারীদের অন্য সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে অজ্ঞতা, জানতে চেষ্টাহীনতা এবং সম্মান না করা থেকেই রক্তঝরা পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সার্বজনীন মানসিকতার চর্চা না থাকা, কার্যক্রমে অন্য সংস্কৃতির মানুষদের গুরুত্ব না দেয়ার কারণেই এ দেশে রাজনীতির দৈন্যদশা। এক্ষেত্রে শহীদ পীরেনের আত্মোৎসর্গ অবহেলিত আদিবাসী সমাজ তা সার্বজনীন মানবাধিকারের পক্ষেই থাকবে।

যুগান্তর, ১৬ জানুয়ারি ২০০৫ রোববার

জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুর সম্পত্তি বেদখল এবং উচ্ছেদ প্রসঙ্গে

মিথুশিলাক মুরমু

বিগত কয়েক মাস আগে মন্ত্রিসভার নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠকে জমিজমা ও বাড়িঘর জবরদখলকারী হিসেবে ১০ ধরনের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা হয়েছিল: রাজনৈতিক দল, দলের অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকটাত্মীয়, সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসী দল, নির্মাণ সংস্থা, বেসরকারি হাউজিং সোসাইটি ও সমবায় সমিতি, সমাজের টাউট শ্রেণী, বন্যদস্যু, লাঠিয়াল, জোতদার, চিংড়ি ঘের মালিক, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং মোটর গ্যারেজ, রিকশা গ্যারেজ ও বস্তির মালিক। বিশেষ করে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুর ক্ষেত্রে দেখা যায় রাজনৈতিক দল ও দলের অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের দ্বারাই সবচেয়ে বেশি জমিজমা ও বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করে দখল করা হয়ে থাকে। বেসরকারি হিসাব অনুযায়ী দেশে প্রায় ৩৩ হাজার একর খাসজমি বেদখল হয়ে গেছে। অন্যদিকে বন বিভাগের কমপক্ষে ১ লাখ ৮৬ হাজার একর ভূমি দখলদারদের কব্জায় চলে গেছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে, সড়ক ও জনপথ বিভাগের এবং রাষ্ট্রখাতের বিভিন্ন মিল-কারখানার অব্যবহৃত ভূসম্পত্তিও অনেক ক্ষেত্রে দখল করে নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন সময় সরকারের কাছে অভিযোগ করা হলেও সরকার বারবার অস্বীকার করে আসছিল; কিন্তু বিগত কয়েক দিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস এ বিষয়ে বলেছেন: "মানবাধিকার রিপোর্ট এবং বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া চিঠিতে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ও আহমদিয়া সম্প্রদায়ের জমিজমা দখলের যেসব অভিযোগ পাওয়া গেছে, যুক্তরাষ্ট্র সেসব অভিযোগ খতিয়ে দেখবে।' তিনি আরও বলেন, তার কাছে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের রিপোর্ট এবং বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত বেশকিছু চিঠি বা খবর আছে। আমরা জেনেছি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ কোথাও কোথাও অসন্তুষ্ট। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ও আহমদিয়া সম্প্রদায়ের জমিজমা দখলের অভিযোগও পাওয়া গেছে। আমরা এই বিষয়গুলো খতিয়ে দেখতে চাই।

এরপর সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কিছুটা হলেও নড়েচড়ে উঠেছেন। 'আদিবাসী দিবস' ২০০৩-এ প্রকাশিত স্মরণিকায় এক বাণীতে বিরোধীদলীয় নেত্রী বলেন, 'আদিবাসীরা আজ নানাভাবে নিপীড়িত হচ্ছেন। তাদের ভূমি কেড়ে নেয়া হচ্ছে জোরপূর্বক, উন্নয়নের নামে তাদের জীবন ও জীবিকা ধ্বংস করা হচ্ছে, তাদের সংস্কৃতি আজ বিপন্ন: এভাবে সভ্যতা এগুতে পারে না।' নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কমিটির নির্বাহী সদস্য অজয় রায়ও এক সাক্ষাৎকারে বলেন, সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি গ্রাস, অত্যাচার-নির্যাতন, দেশ থেকে বিতাড়ন, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার উদ্যোগ ও সাম্প্রতিককালে পাকিস্তানের মডেলে 'ধর্ম অবমাননা' (ব-াসফেমি ল') আইন প্রয়োগের পাঁয়তারা ইত্যাদি রাজনৈতিক লক্ষ্য হাসিলের জন্যই পরিচালিত। সাম্প্রদায়িক শক্তিটি □মশ এ দেশটিকে তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত একটি একাশ্মীয় ও একধাতব (মেনোলিথিক অ্যান্ড মেনোমেটালিক) ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে রত: 'আহমদিয়া' নামে পরিচিত একটি সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নামে ঘোষণার ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি তার সাম্প্রতিক উদাহরণ।' ২০০১ সালে বন বিভাগ মৌলভীবাজার খ্রিস্টান প্রধান খাসিয়াদের অধিকারে থাকা ভূমির ওপর একটি ইকো-পার্ক নির্মাণ শুরু করে। যদিও আদিবাসী খাসিয়ারা বংশানু□মে এই ভূমিতে বাস করে আসছে তবু সরকার তাদের মালিকানার স্বীকৃতি দেয়নি। সরকার নিজেই এই ভূমির মালিকানা দাবি করে বলেছে, খাসিয়ারা এসব জমি অবৈধভাবে দখল করে আছে (২০০৩ সালের বার্ষিক মানবাধিকার

রিপোর্ট)। কেস স্টাডি-১ রাজশাহীর দুর্গাপুরে বিএনপির সন্ত্রাসীরা দফায় দফায় হামলা চালিয়ে দুটি আদিবাসী পরিবারের বাড়িঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। উপজেলা সদরের দুর্গাপুর ডিগ্রি কলেজ সংলগ্ন সিংগা এলাকায় দফায় দফায় হামলার পর গভীর রাতে তারা আবার হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। ঘটনাস্থল থেকে মাত্র কয়েকশ' গজ দূরে দুর্গাপুর থানা পুলিশ ওই আদিবাসী পরিবারের সহায়-সম্পদ রক্ষায় এগিয়ে আসেনি। বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত দু'টি আদিবাসী পরিবারের ৮ নারী-পুরুষ খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছে। এলাকার লোকজন জানান, বিএনপির ওই সন্ত্রাসীরা হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট চালিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, তারা আদিবাসী গৃহবধূ চিন্তামনি ও তার পুত্র পরিমলের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। নির্যাতন ও বাড়িঘর ভেঙে দেয়ার পর সন্ত্রাসীরা যাওয়ার সময় হুমকি দিয়ে বলেছে, 'থানা পুলিশ, পৌর চেয়ারম্যান ও এমপিকে ম্যানেজ করে তোদের বাড়িঘর ভেঙে ফেলা হলো। কাজেই তাদের কাছে (থানা-পুলিশ, পৌর চেয়ারম্যান ও এমপি) গেলে বাড়িতে পেট্রোল ঢেলে সবাইকে পুড়িয়ে মারা হবে।' এসব হুমকিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা ভয়ে থানা-পুলিশের কাছে কোন অভিযোগ করার সাহস পায়নি। বর্তমানে তারা চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। আদিবাসী গৃহবধূ চিন্তামনি ও তার পুত্র পরিমল জানায়, সিংগা গ্রামে হাজী সিরাজের কাছ থেকে ১২ বছর আগে ৬ শতক জমি কিনে আদিবাসী নরেন রায় ও শ্রীমতি তারা রাণীর পরিবার বসবাস করে আসছে। চিন্তামনির স্বামী নরেন রায় রাজশাহী শহরে থাকেন। ঘটনার পর ২৬ জুন সকাল ৯টায় সিংগা গ্রামেরই বিএনপি সমর্থক রেজাউল, আলমগীর, মাসুদ, সেলিম, মামুন, হাবিব, আরিফসহ ১০/১৫ সন্ত্রাসী এসে একটি ঘর ভেঙে দেয়। ২৮ জুন গভীর রাতে (আনুমানিক ২টা) ২০/২৫ সন্ত্রাসী এসে চিন্তামনিকে মারধর করে তার গলায় হাঁসুয়া চেপে ধরে। একপর্যায়ে একটি ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শিকল আটকিয়ে দিয়ে পরিমলকে লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকে। এরপর দু'টি ঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। যাওয়ার সময় থানা পুলিশ কিংবা সাংবাদিকদের কাছে ঘটনা না জানানোর জন্য শাসিয়ে যায়। এলাকাবাসী ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেন, "বিএনপি নেতা জামাল হোসেন ও সুবোল আদিবাসী পরিবার দু'টিকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে প্রায় ১০ লাখ টাকা মূল্যের মাত্র ৬ শতক জমি দখলের জন্য পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে দিয়ে বাড়িঘর গুড়িয়ে দিয়েছে।'

কেস স্ট্যাডি-২। বান্দরবানে আওয়ামী লীগের দুই প্রভাবশালী নেতার নেতৃত্বে ক্যাচিংপাড়ায় মারমা আদিবাসীদের জমি দখল করে বহিরাগত অভিবাসন শুরু হয়েছে। পাড়ার পশ্চিম পাশে ১৯ পরিবারের প্রায় ৪০ একর জমি দখল করে গত (১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর) দু'দিনে দেড় শতাধিক অভিবাসী পরিবারকে ঘরবাড়ি তৈরি করে দেয়া হয়েছে। পাড়ার পশ্চিম পাশে ক্যচিং কার্বারির ধানিজমি ঘেঁসে পাহাড়ের জঙ্গল পরিস্কার করে টিনের চালাঘর নির্মাণ করা হয়েছে। সেখানে মামুন, মো.ফরিদ, লাল বিবি, আমেনা বেগমসহ অনেকে জানান, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কাজী মুজিবর রহমান ও পৌর কমিশনার, জেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি আবদুল মাজেদের নেতৃত্বে প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় নির্মিত ১৫০টি বাড়িঘরে ১৭০টি পরিবার এসেছে। এর মধ্যে দ্বিতীয় দফায় এসেছে ১৬০টি পরিবার। গত ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর এসব ঘরবাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে বলে তারা জানান। ঘর নির্মাণ করেছিলেন মামুন। তিনি জানান, জমি দখল করার জন্য রাতের মধ্যেই বাঁশ, গাছ ও টিনসহ বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে এসে ঘর নির্মাণের জন্য তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। বাঁশ, গাছ ও টিন কে দিয়েছে জানতে চাইলে তিনি প্রথমে জানান, তারা নিজেরা কিনেছেন। পরে আবার বলেছেন, এসব কে দিয়েছে তিনি জানেন না। ২০০৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি বোমাং রাজপুণ্যাহ চলাকালে পাড়ার লোকজন যখন সবাই উৎসবে ছিলেন তখন আওয়ামী লীগ নেতা মুজিব-মাজেদ লাঠিয়াল বাহিনী নিয়ে প্রথম দফা চারটি ঘর নির্মাণ করে সাতটি পরিবার সেখানে রেখে আসেন। বিষয়টি

জানাজানি হলে জনসংহতি সমিতি, আঞ্চলিক পরিষদ ও আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতারা বাধা দেন। একই সঙ্গে বিএনপিও 'জিয়ানগর' সাইনবোর্ড লাগিয়ে সেখানে জমি দখলের উদ্যোগ নিলে মুজিব-মাজেদ তাদের দখল পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে বাধ্য হন।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্যুরো অফ ডেমো□সি হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড লেবার প্রকাশিত 'ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম রিপোর্ট ২০০৪'-এ বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ধর্মীয় প্রভাবিত সহিংসতা বেড়েই চলেছে। এখানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বিভিন্ন অপরাধের শিকার হয়ে থাকে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সাহায্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী প্রায়ই ধীরগতির। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ সাধারণত অকার্যকর। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু আদিবাসীদের ক্ষেত্রে এই ভূমিগ্রাস ও উচ্ছেদের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আদিবাসীরা অশিক্ষিত, অবহেলিত ও আইন-আদালত কম বোঝার কারণে রাজনৈতিক নেতানেত্রীরা কিংবা তাদের আত্মীয়-স্বজনরা এই জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট হয়। সরকারের মন্ত্রী পর্যায়ের কমিটিকে এখন উদ্যোগ নিতে হবে যারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও জাতিগত সংখ্যালঘু আদিবাসীদের ভূমি গ্রাস ও উচ্ছেদের জন্য তাণ্ডব চালাচ্ছে, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান এবং নিজের ভিটেমাটিতে ডাল-ভাত খেয়ে সুখ ও শান্তিতে বসবাস করার বিধান করতে।

সংবাদ, ১৩ মার্চ ২০০৫

আদিবাসী ভাষা-সংস্কৃতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি ও সরকার

মতিউর রহমান

পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী জুম্ম জনগণ, তাদের জীবন-সংগ্রাম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সব সময় আমাদের জন্য বড় আগ্রহের বিষয়। তারপরও সরাসরি অভিজ্ঞতা কম। রাঙামাটি শেষ গিয়েছিলাম ১৯৯৮ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য শান্তিচুক্তির প্রথম বর্ষ উপলক্ষে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির আমন্ত্রণে। মনে পড়ে, রাঙামাটি স্টেডিয়ামে বিশাল জনসভায় অংশ নিয়েছিলাম।

তখনই জনসংহতির নেতা-কর্মীদের মধ্যে হতাশার সুর শোনা গিয়েছিল। আওয়ামী লীগ সরকার শান্তিচুক্তি করেছে। কর্ণফুলী নদীতে অনেক পানি গড়িয়েছে। বিএনপি বিরোধীদলে থাকা অবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তির তীব্র বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু সরকারে গিয়ে চুক্তি নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তারাও কিছু করেনি। সাত বছরেরও বেশি হয়েছে আওয়ামী লীগ-বিএনপি কেউ কোনো উদ্যোগ নেয়নি শান্তিচুক্তি কার্যকর করতে। এখন হতাশা আরো বেড়েছে। উদ্বেগ আর ক্ষোভ বেড়ে চলেছে।

এ রকম অবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামের তরুণ সংস্কৃতিসেবীদের সংগঠন জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল (জাক) আমাদের কাছে আসে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের তাদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার ওপর একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করার আগ্রহ দেখায়। আমাদের সহযোগিতা করতে বলে। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে রাজি হই।

রাঙামাটিতে জাকের রজতজয়ন্তী ও অষ্টম পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা শুরু হয় গত ২৪ ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠক। শিক্ষাবিদ ড. আনিসুজ্জামান, অর্থনীতিবিদ ড. স্বপন আদনান, নাট্য ব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ, চট্টগ্রাম থেকে প্রথম আলোর আবাসিক সম্পাদক আবুল মোমেন আমরা অংশ নিই।

২৪ ফেব্রুয়ারি আমরা যখন রাঙামাটি পৌঁছাই তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে প্রায়। সেদিন সন্ধ্যাতেই জাকের সভাপতি ঝিমিত ঝিমিত চাকমার সভাপতিত্বে নাচ-গান আর একতার বন্ধন রচনার মধ্যদিয়ে উপজাতীয় সাংস্কৃতি মেলা শুরু হয়। মঙ্গল প্রদীত জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি ড. আনিসুজ্জামান।

ওইদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে অতিথিদের মেলা পরিদর্শনের পর আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী জুমঘরের আদলে তৈরি ইজোরে (ম্যাচান) বসে শুরু হয় আলোচনা সভা। আদিবাসী সংস্কৃতিকে যেকোনোভাবে বাঁচিয়ে রাখার যথাযথ ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আবেদন জানান সব বক্তা ড. আনিসুজ্জামান, চাকমা রাজা দেবাশীষ রায়, স্বপন আদনান, প্রশান্ত ত্রিপুরা, আবুল মোমেন, মামুনুর রশীদ, জাকের সাধারণ সম্পাদক শিশির চাকমাসহ আমরা। আমরা সবাই বলি পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়িত হোক, আদিবাসীদের কৃষি সংস্কৃতি বিকশিত হোক। জাকের সংস্কৃতিচর্চার মাধ্যমে আদিবাসীদের একত্র করার প্রচেষ্টার প্রতি আমরা পূর্ণ সমর্থন জানাই।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর দুটি গ্রন্থ 'জাক-এর ২৫ বর্ষ পূর্তি সংকলন ২০০৫' ও 'সুহৃদ চাকমা স্মারক গ্রন্থে'র মোড়ক উন্মোচন করা হয়। দুটিই জাকের প্রকাশনা। চাকমা সাহিত্যে সুহৃদ চাকমা একটি পরিচিত নাম। তিনি একাধারে কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, গবেষক ও সমালোচক ছিলেন। তার সাহিত্যচর্চার বয়সও খুব বেশি ছিল না। জাকের প্রতিষ্ঠালগ্নে সাধারণ সম্পাদক সুহৃদ চাকমা মাত্র ৩০ বছর বয়সে ১৯৮৮ সালের ৮ আগস্ট অজ্ঞাত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। এক অস্থির, সংঘাতময় পরিস্থিতির শিকার হন সুহৃদ চাকমা। তার স্ত্রী অর্চনা তালুকদারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হলো।

মেলার দ্বিতীয় দিন ২৫ ফেব্রুয়ারি শু□বার সকাল ১০টায় রাঙামাটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে গোলটেবিল বৈঠক হয়। জাকের অনুরোধে প্রথম আলো এ গোলটেবিলের আয়োজনে সহযোগিতা করে। বিষয় ছিল 'প্রাথমিক স্তরে আদিবাসী ভাষায় শিক্ষা কার্য□ম চালু'। গোলটেবিল আলোচনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান সন্তু লারমা বলেন, মাতৃভাষা চালু করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতার দিকটা প্রধান। পার্বত্য শান্তিচুক্তিতে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষা চালুর অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গত সাত বছরেও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়ের কথাগুলো ছিল খুব তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করলে অন্যান্য ভাষায় শিক্ষা গ্রহণও সহজ হয়। নিজের ভাষায় শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের মানসিক বিকাশও দ্রুত হয়। বিদ্যালয়ের দরজার বাইরে যদি নিজেদের ভাষা-সংস্কৃতিকে রেখে যেতে হয় সে ক্ষেত্রে আদিবাসী শিশুরা অন্য শিশুদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে।

আলোচনায় ড. আনিসুজ্জামান বলেন, প্রাথমিকস্তরে আদিবাসী ভাষা প্রচলনের সময় নির্ধারণ করা দরকার। কত সময়ে কোন শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হবে তা ঠিক করে এগিয়ে যাওয়া দরকার।

আসলে সেদিনের গোলটেবিল আলোচনা ভাষা-সংস্কৃতি নিয়ে হয়ে উঠেছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের তাদের দুঃখ-বেদনা, উৎসাহ-আগ্রহ প্রকাশের আরতির একটি সুযোগ। উলে-খ্য, পার্বত্য চট্টগ্রামের ১১ জাতিসত্তার মধ্যে আটটির প্রতিনিধি উপস্থিতি ছিলেন বৈঠকে। তাদের নিজস্ব ভাষা রক্ষা ও চর্চায় তাদের নানা উদ্যোগের কথা তারা বলেন। ড. স্বপন আদনান, মামুনুর রশীদ, আবুল মোমেন এবং প্রশান্ত ত্রিপুরার আলোচনা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা মনে করি সন্তু লারমা দেবাশীষ রায়ের কথাগুলো ছিল যথেষ্ট যৌক্তিক। মাতৃভাষায়

শিক্ষালাভ শিশুদের অধিকার। এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে আদিবাসীদের ভাষাকে টিকিয়ে রাখা এবং প্রাথমিক স্তরে আদিবাসী ভাষায় শিক্ষা কার্য□ম চালু করা অনেকটাই সম্ভব। আমরা বিশ্বাস করি, সব পক্ষকে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়ে অন্তত কিছু একটা করা যায়। তার জন্য সবার আগে দরকার সরকারের সদিচ্ছা।

আমরা রাঙামাটি আসব জেনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি প্রথম আলোর সম্পাদকের সঙ্গে রাঙামাটির নাগরিক সমাজের সঙ্গে পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন ও সামগ্রিক পরিস্থিতির ওপর এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছিল। প্রথম দিন আদিবাসী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সভা শেষ করে ২৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় রাঙামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সম্মেলন কক্ষে মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় সঞ্চালক ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মহা-সভাপতি রূপায়ন দেওয়ান। মতবিনিময় সভায় স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন কর্মীরা অংশ নেন। আলোচনায় পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ায় সৃষ্ট সমস্যা ও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। এবং এ চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার অভাবটি বারবার আলোচনায় আসে।

রূপায়ন দেওয়ান আলোচনার শুরুতে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় মানুষ খুবই হতাশ। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ গোষ্ঠী সৃষ্টি করা হচ্ছে শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করার জন্য। উত্তরবঙ্গের মঙ্গা আর পার্বত্য চট্টগ্রামের 'রাহদ'-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকা মঙ্গাকবলিত।

সুধাবিন্দু খীসা বলেন, শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে জোট সরকারের কোনো সদিচ্ছা নেই। সরকার কার্যত চুক্তিবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

রাজা দেবাশীষ রায় বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে যে দ্বন্দ্ব চলছে, যে সমস্যা চলছে সেটা তো অভ্যন্তরীণ সমস্যা। তেমন বড় কিছু নয়। সেজন্য তো নিরাপত্তা বাহিনীর প্রয়োজন নেই। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোনো সমস্যা থেকে থাকলে সেটা পুলিশের ব্যাপার। সেটা সেনাবাহিনীর বিষয় নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তিতে সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহারের কথা ছিল। পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পুলিশ নিয়োগের বিধান ছিল। সে সব তো হয়নি।

ইউসুফ আলম বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের কাগজে-কলমে উন্নয়ন হচ্ছে। সার্বিকভাবে উন্নয়ন হচ্ছে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থা করুণ। ভূমি কমিশন গঠন করা হয়নি।

নির্মলেন্দু ত্রিপুরা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সারা বাংলাদেশের দশ ভাগের এক ভাগ। আমাদের কোনো পূর্ণ মন্ত্রী নেই। একজন রাষ্ট্রদূতও নেই। সর্বত্র আমরা কোণঠাসা।

টুকু তালুকদার বলেন, শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ায় নারী নির্যাতন অব্যাহত আছে। বাঘাইছড়িতে ফাতেমাকে যৌতুকের জন্য স্বামী মেরে ফেলেছে। পাহাড়িদের মধ্যে ধর্ষণ বা ধর্ষণ করে মেরে ফেলার নজির নেই।

সুনীল কান্তি দে বলেন, সারা দেশে এএমএস চালু হলেও পার্বত্য অঞ্চলকে বাদ দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক নেতারা বক্তৃতা-বিবৃতি দেন, কিন্তু তারা কেউ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান চান না।

সুকুমার দেওয়ান বলেন, ইতিমধ্যে পুনর্বাসিত বাঙালিরা সমঅধিকারের দাবি তুলেছে। পরে তাদের তিন-চতুর্থাংশ এবং এক শ ভাগ অধিকারের দাবিতে এসে যাবে। তখন আমাদের কিছুই থাকবে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের এটাই সময়।

অ্যাডভোকেট সুস্মিতা চাকমা অভিযোগ করে বলেন, মোবাইল নেটওয়ার্কের মধ্যেও নেই

তিন পার্বত্য জেলা। আসছে বিটিটিবি মোবাইল ফোন থেকেও কি বঞ্চিত থাকবে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবানবাসী? প্রযুক্তির এই আধুনিক ব্যবস্থা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী কেন বঞ্চিত হবে? আমাদের অঞ্চলের এই বিশেষ ব্যবস্থা কেন?

মতবিনিময় বৈঠকের আলোচনার মধ্য দিয়ে যে মূল বিষয়টি বের হয়ে এসেছে তা হলো কোনো কিছুই সম্ভব হচ্ছে না সরকারের সদিচ্ছার অভাবে। পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে বিগত আওয়ামী লীগ ও বর্তমান চারদলীয় জোট সরকার সদিচ্ছার অভাব প্রদর্শন করেছে। চুক্তি সম্পাদনের পর দীর্ঘ তিন বছর আট মাস সময় পেলেও আওয়ামী লীগ সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

অপরদিকে বিএনপি নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম প্রথম চুক্তির ব্যাপারে কিছুটা ইতিবাচক কথা বললেও □মাগত চুক্তি লঙ্ঘন ও চুক্তি বাস্তবায়নের প্র□িয়াকে পদদলিত করার নীতি গ্রহণ করেছে। চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে একজন যোগ্য উপজাতীয় ব্যক্তিকে নিয়োগ না করে চুক্তিবিরোধী ও সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত একজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত না হওয়ার ফলে চুক্তি বাস্তবায়নের প্র□িয়া এখন সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। সব মিলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি এখন আবার গভীর সংকটের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বেশ কিছু সময় পর পার্বত্য রাঙামাটি গিয়ে এবং ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি দুদিনে তিনটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে, বিভিন্ন শ্রেণীর উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলে, আলোচনা ও ভাববিনিময় করে এসবই আমাদের মনে হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরের এক বছর পর ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে সেখানে গিয়ে পাহাড়িদের মধ্যে হতাশা দেখেছিলাম। এবার সেখানে গিয়ে □মবর্ধমান ক্ষোভ দেখতে পেলাম।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং জুম্ম জনগণসহ ওই এলাকার স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য বিশেষ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। মানুষ আশা করেছিল এই চুক্তির মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। এবং এর ফলে ওই এলাকায় সত্যিকারের উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হবে, জুম্ম জনগণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে। পাহাড়িরা আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ পাবে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বলতে গেলে এসব কিছুই হয়নি। দীর্ঘ সাত বছরেরও বেশি সময় হয়ে গেলেও চুক্তি বাস্তবায়নের প্র□িয়াটি বন্ধ রয়েছে। 'অপারেশন উত্তরণ' নামে সেনাবাহিনী তল-াশি অভিযান, ধরপাকড়, শারীরিক নির্যাতন প্রভৃতি মানবতাবিরোধী কার্যকলাপ চলছে। অন্যদিকে হত্যা-ধর্ষণের মতো অপরাধও হচ্ছে। পুনর্বাসিত বাঙালিদের দিয়ে জুম্ম গ্রামে হামলা, ভূমি বেদখল, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি চলছে। সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ইউপিডিএফ নামে একটি চুক্তিবিরোধী সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে নানাভাবে মদদ দেওয়ার অভিযোগ শোনা যায়। এই গোষ্ঠীটি প্রায় প্রতিদিন নানা ধরনের সন্ত্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। জনসংহতি সমিতির নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের ধরপাকড়, নির্যাতন, মিথ্যা মামলায় হয়রানি, দলীয় কার্যালয়ে হামলা-ভাঙচুরও চলছে। গড়ে তোলা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলন, বাঙালি গণপরিষদ, নাগরিক ফোরাম, বাঙালি সমন্বয় পরিষদ, বাঙালি ছাত্র পরিষদের মতো ভুঁইফোড় সংগঠন। তারা চুক্তিবিরোধী বিভিন্ন তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। এসব সংগঠন, ইউপিডিএফ এবং বাঙালি পুনর্বাসিতরা, এরা সবাই চাপে ফেলতে চাইছে জনসংহতি সমিতিকে।

আমরা লক্ষ্য করছি, বর্তমান সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে আন্তরিকতার পরিচয় তো দিচ্ছেই না, বরং গ্রহণ করেছে চুক্তির শর্তবিরোধী বিভিন্ন পদক্ষেপ। এ প্রসঙ্গে উলে-খ করা যেতে পারে;

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে একজন জুম্মকে পূর্ণ মন্ত্রী নিয়োগ না করে প্রধানমন্ত্রীর হাতে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব রাখা হয়েছে।

সেনা, ভিডিপি ও আনসার বাহিনীর অস্থায়ী সব ক্যাম্প প্রত্যাহার করার কথা চুক্তিতে থাকলেও মাত্র ৩১টি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। সেটাও আওয়ামী লীগ আমলে। চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য প্রশাসনের ওপর সেনা কর্তৃত্ব থাকার কথা নয়। কিন্তু তা অব্যাহত রয়েছে অপারেশন উত্তরণ (ইতিপূর্বে অপারেশন দাবানল) বলবৎ রাখার মাধ্যমে। বিভিন্ন স্থানে চৌকি বসিয়ে সেনাবাহিনীর তল-াশি, হয়রানির শিকার হয় সাধারণ নিরপরাধ উপজাতীয়রা। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য গঠিত ভূমি কমিশনকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে। আদিবাসী ও স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার কোনো উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করেনি।

বর্তমানে সেখানে উন্নয়ন বলতে গেলে কিছু নেই। তবে কাগজে-কলমে উন্নয়ন প্রকল্প ভেঙে পড়েছে। বেড়েছে বেকারত্ব। কুটির শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু উদ্যোগের অভাবে কিছুই হয়নি। পার্বত্য নারীদের এগিয়ে নেওয়ার কোনো উদ্যোগ নেই।

বর্তমানে এ পরিস্থিতিতে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে বা জুম্ম জনগণকে নিয়ে কী করতে চায় এটা পরিষ্কার হতে হবে প্রথমে। বর্তমান বিরাজিত সংকট থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব যদি সরকার তা প্রকৃতই চায়। চুক্তির সব বিষয় বাস্তবায়ন একটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, সন্দেহ নেই। তবে সাত বছরেও চুক্তি বাস্তবায়নে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়া, বরং চুক্তিবিরোধী কার্যক্রমকে উসকে দেওয়া কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। 'অপারেশন উত্তরণ' প্রত্যাহার করা খুবই জরুরি, যাতে সাধারণ মানুষ স্বস্তি পেতে পারে এবং সরকারের ওপর আস্থা স্থাপন করতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও উন্নয়ন বোর্ডের দায়িত্ব একজন যোগ্য উপজাতির হাতে দেওয়া জরুরি। এসব পদক্ষেপ নিয়ে সরকারকে প্রথমে আস্থা অর্জনের উদ্যোগ নিতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য দেশের সব গণতান্ত্রিক শক্তি, সংগঠন, সুধী সমাজকে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। তাদের সক্রিয় ভূমিকা ছাড়া সংকট সমাধান সম্ভব নয়। যে চুক্তির মাধ্যমে দুই দশকের অধিক রক্তক্ষয়ী সংঘাত বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে সেই চুক্তি লঙ্ঘনের মধ্য দিয়ে বিগত দিনের মতো নতুন দ্বন্দ্ব-সংঘাত কাম্য হতে পারে না।

প্রথম আলো, ১৪ মার্চ ২০০৫

বিপন্ন সংখ্যালঘু বিপন্ন মানবতা

এস এস চাকমা

বর্তমান চারদলীয় জোট সরকার একটি নতুন তথ্য দেশবাসীর কাছে বলা শুরু করেছে যে, বাংলাদেশে কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নেই। যারা আছে, তারা সবাই বাংলাদেশী এবং তারা সবাই এ দেশের নাগরিক, তাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। আসলে কি তাই? এ দেশে যদি সংখ্যালঘু না থাকে, তাহলে প্রায় প্রতিদিন কাদের ওপর অত্যাচার হয়, কাদের জমি বেদখল হয়, কাদের স্ত্রী-কন্যা নির্যাতনের শিকার হয় এবং কেন প্রায় প্রতিদিন খবরের কাগজগুলোতে সংখ্যালঘু নির্যাতনের খবর ছাপা হয়! খবরের কাগজগুলো কি মিথ্যা খবর পরিবেশন করে? আর ক্ষতিগ্রস্তদের কেন সংখ্যালঘু বলা হয়?

গত ৮ ডিসেম্বর ২০০৪ দৈনিক সংবাদে 'ধামরাইয়ে সংখ্যালঘু নির্যাতন, ঐক্য পরিষদের চাপে গ্রেপ্তার-১' শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরে বলা হয় যে, গত ২ নবেম্বর ধামরাইয়ে গোপালপুর গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের শ্মশানঘাট, কালীমন্দির, বাড়িঘর ও পুকুরসহ জমিজমা দখল করার চেষ্টা করে স্থানীয় সন্ত্রাসী বাদেশ আলী ফকির, আদম আলী ফকির, আব্দুর রশিদ ও ইব্রাহিম গং। বাধাগ্রস্ত হয়ে সন্ত্রাসীরা ৬০টি সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যদের নির্বিচারভাবে মারপিট করে এবং সেই সঙ্গে লুটপাট চালায়। বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে ধামরাই থানার পুলিশকে জানানো হয়, কিন্তু পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি এবং কাউকে আটকও করেনি। পরবর্তী সময়ে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ সরজমিন তদন্তে পুলিশকে চাপ দিলে ধামরাই পুলিশ সন্ত্রাসী জিয়া ইব্রাহিমকে আটক করে।

গত ১৩ ডিসেম্বর ২০০৪ দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় 'সাভারে এক পরিবারের ওপর হামলা, বাড়ি দখলের পাঁয়তারা' শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরে বলা হয় যে, সাভারের ধয়ারপুর ইউনিয়নে বেরন গ্রামে সত্তর ঊর্ধ্ব রাখাল চন্দ্র দাস পৈতৃক বাড়িতে আজন্ম বসবাস করে আসছেন। কিছুদিন আগে বাড়িটির ওপর চোখ পড়ে স্থানীয় এক প্রভাবশালী ব্যক্তির। সে একাধিক মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে বাড়ি থেকে উচ্ছেদের নানা চেষ্টা চালায়। সর্বশেষ গত শনিবার রাত ৮টার দিকে একদল সন্ত্রাসী রাখালের বাড়িতে ঢোকে। তারা পরিবারের লোকজনকে মারধর করে স্বর্ণালঙ্কারসহ নগদ অর্থ ডাকাতি করে। সন্ত্রাসীরা যাওয়ার সময় হুমকি দেয়, ১ মাসের মধ্যে বাড়ি না ছাড়লে পরিণতি খারাপ হবে। খবর পেয়ে সাভার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং ঘটনার সত্যতা পেয়ে থানায় একটি মামলা গ্রহণ করে।

গত ১৯ অক্টোবর ২০০৪ দৈনিক ভোরের কাগজে 'বিভিন্নস্থানে মন্দির ও প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় উদ্বেগ' শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরে বলা হয় যে, প্রায় ৩০ বছর পর শারদীয় দুর্গাপূজা রমজান মাসে পড়ায় এবং দেশব্যাপী প্রতিমা ও মন্দির ভাঙচুরের ঘটনা ঘটায় শারদীয় দুর্গোৎসব নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায় খুবই উদ্বিগ্ন। গত ১৮ অক্টোবর ২০০৪ রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে পূজা উদযাপন পরিষদ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় যে, দেশের বিভিন্নস্থানে ২০টির মতো প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সরকার তখন পর্যন্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। সংবাদ সম্মেলনে আরো বলা হয় যে, সরকার মণ্ডপ রক্ষার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়োগ করেছে ঠিকই, কিন্তু পুলিশ দিয়ে পূজা করানো যায় না। এর জন্য প্রয়োজন সব ধর্মের মানুষের সহমর্মিতা এবং সম্প্রীতি।

গত ২০ অক্টোবর ২০০৪ দৈনিক ভোরের কাগজে 'ঠাকুরগাঁওয়ে পূজামণ্ডপ বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি' শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরে বলা হয় যে, শহরের হলপাড়া ও কালীবাড়ির ২টি পূজামণ্ডপে ঢোল বাজালে বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে। ঠাকুরগাঁও পোস্ট অফিসের মাধ্যমে ঐ দুটি মণ্ডপের পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বরাবার এই হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

২০ নবেম্বর ২০০৪ দৈনিক ভোরের কাগজে 'ধামরাইয়ে ৮০টি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলায় জড়িত কাউকে পুলিশ ধরেনি' শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরে বলা হয় যে, ৪ নবেম্বর ধামরাই উপজেলার নান্নার ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামের পুকুরে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে ৮০টি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় জড়িত কাউকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি, যদিও অভিযোগ সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঐ সন্ত্রাসী হামলায় ১৪ জন আহত হয় এবং ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে।

৯ ডিসেম্বর ২০০৪ দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় 'বান্দরবানে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সেনা নির্যাতনের অভিযোগ' একটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরে বলা হয় যে, বান্দরবান সদর ও রোয়াংছড়ি উপজেলার বিভিন্নস্থানে সেনাবাহিনীর অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে নিরীহ পাহাড়িদের

আটক ও নির্যাতনের অভিযোগ করেছে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ। অভিযোগে বলা হয়েছে যে, ওই দুই উপজেলায় ২২ নবেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৯ জনকে সেনাবাহিনী আটক ও নির্যাতন চালিয়ে অস্ত্র বের করে দেওয়ার কথা বলেছে।

২ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ দৈনিক সংবাদে 'বাগেরহাটে অপহৃত সংখ্যালঘু কিশোরী দুদিন পর উদ্ধার' শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরে বলা হয় যে, বাগেরহাট সদরের রাখালগাছী রসুলপুর গ্রামে শুক্রবার সন্ধ্যায় পার্শ্ববর্তী ভাটপাড়া গ্রামের ফজলউদ্দিনের ছেলে মমতাজ ৪/৫ জন সহযোগী নিয়ে ঐ কিশোরীকে (১৫) অপহরণ করে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এসআই নন্দন মমতাজের বাবা ফজলউদ্দিনকে আটক করেন। তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী পুলিশ উৎফুল গ্রামের সফদার শেখের বাড়ি থেকে কিশোরীকে উদ্ধার করে। এ ঘটনায় অপহৃতার ভাই মমতাজসহ ৫ জনকে আসামি করে মামলা করেছে।

গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ 'রূপগঞ্জে হিন্দু পরিবারের জমি দখল করেছে আওয়ামী লীগ নেতা' শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরে বলা হয় যে, কাঞ্চন পৌর এলাকার ৬নং ওয়ার্ডের ১৬৯নং মৌজায় ৩৩ শতাংশ জমির মালিক ছিলেন নদীমাল। পরে নদীমাল তার একমাত্র মেয়ে কামিনী দাসী ও তার স্বামী রজনী মণ্ডলের কাছে ৮০ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেন। রজনী মণ্ডল মৃত্যুর আগে তার অংশ থেকে তার স্ত্রী-পুত্রের নামে জমি লিখে দিয়ে যান। পিতার মৃত্যুর পর ফালু মণ্ডল সাড়ে ১৬ শতাংশ জমি ভোগদখল করেন। এদিকে প্রভাবশালী প্রতিবেশী আবদুর রউফ '৯৬ সালে ফালু মণ্ডলকে কৌশলে ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে নিজ বাসায় ৯ দিন আটক রেখে জমি লিখে দেওয়ার জন্য নানাভাবে নির্যাতন চালায়। এ সময় ভয়ে ফালু মণ্ডল জমি লিখে দিতে রাজি হন। আবদুর রউফ ১০ শতাংশ জমির দাম ৭ লাখ টাকা নির্ধারণ করে ৪ লাখ টাকা নরসিংদীর একটি ব্যাংকে ফালুর নামে জমা দেয়। বাকি ৩ লাখ টাকা না দিয়েই জমি রেজিস্ট্রি করে দেওয়ার জন্য আবদুর রউফ স্থানীয় সাবরেজিস্ট্রার অফিসে ফালুকে নিয়ে যায়। সাবরেজিস্ট্রার ফালু মণ্ডলকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে সঠিক উত্তর না পেয়ে দলিল ফেলে দেন। ১৯৯৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর জমির সাবকবলা দলিল হয়।

আওয়ামী লীগ আমলে আব্দুর রউফ জমি দখলের পাঁয়তারা চালায়। ২০০০ সালের ১৮ আগস্ট সে ফালুর ঘরবাড়িতে হামলা চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং ৬ লাখ টাকার মালামাল ও গাছপালা লুট করে। এ ব্যাপারে থানায় গেলেও পুলিশ কেস নেয়নি। হিন্দু পরিবারটি ৪ বার আদালতের ডিক্রি পেলেও আব্দুর রউফ জোর করে জমি দখল করেছে।

গত ২১ নবেম্বর ২০০৪ দৈনিক সংবাদে 'চকরিয়া মন্দিরে হামলা, ৪ মূর্তি ভাঙচুর ঃ আহত ১২' শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। খবরে প্রকাশ, কক্সবাজার জেলার চকরিয়া পৌর এলাকায় নাথপাড়া ব্রিটিশ কালীবাড়িতে গত শুক্রবার রাতে কয়েকজন পূজারী যখন প্রার্থনা ও পূজা করছিল, তখন একদল দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে ৪টি বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি ভেঙে ফেলে এবং একটি স্বর্ণের চেইন লুট করে। এ সময় তাদের বাধা দিতে গিয়ে স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের ২ জনসহ মোট ১২ জন আহত হয়। আহত অপর ১০ জন নাথ সম্প্রদায়ের। এ ব্যাপারে সোন-ারামনাথ ২৬ জনের বিরুদ্ধে চকরিয়া থানায় অভিযোগ করেছেন। পরবর্তী সময়ে পুলিশ একজন দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করলেও পরে তাকে ছেড়ে দিয়েছে। ফলে দুর্বৃত্তরা এখন সংখ্যালঘুদের হুমকি দিচ্ছে এবং তারা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে।

গত ২৩ নবেম্বর ২০০৪ দৈনিক সংবাদে 'কেরানীগঞ্জে সংখ্যালঘু পরিবারে সন্ত্রাসীদের হামলা, লুট ঃ আহত ৫' শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরে বলা হয় যে, কোরানীগঞ্জে সরকারদলীয় সন্ত্রাসী গনি এবং তার বাহিনী ব্যবসায়ী স্বপন মণ্ডলের কাছে চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না পেয়ে তারা নগদ ৩০ হাজার টাকা, ১০ ভরি স্বর্ণ ও আসবাবপত্রসহ মূল্যবান জিনিসপত্র

নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীদের বাধা দিতে গিয়ে সিন্ধু (২০), সুজিত (২৫), রণজিত (২৩), রীনা (২০), বীনা (১৭) ছুরিকাঘাতে আহত হয়।

এই হলো সংখ্যালঘুদের ওপর কয়দিনের এবং কয়েকটি পত্রিকার নির্যাতনের চিত্র। সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর নিয়মেই পরিণত হয়েছে। কারণ সন্ত্রাসীরা সরকারের মনের খবর ভালোভাবেই জানে এবং আরো জানে যে, সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার হলে তাদের জমি দখল, নারীদের নির্যাতন করলে এবং অন্যান্য সম্পত্তি দখল করলে কেউ তাদের বিচার করে শাস্তি দিতে পারবে না, তাদের বিচারও হবে না। সেজন্যই তারা সংখ্যালঘুদের ওপর অপরাধমূলক কাজ করে থাকে। আর আমাদের দেশের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, এসব দেখেও নীরব থাকাতেই পছন্দ করে বরং সুশীল সমাজের অনেকেই সুযোগ পেলেই দেশে-বিদেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান এই বলে যে, বাংলাদেশ একটি উদার মুসলিম দেশ। এ দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে পরম শান্তিতে বসবাস করছে।

ভোরের কাগজ, ১৯ এপ্রিল ২০০৫

বিশ্বের আদিবাসীদের বক্তব্য ও আমাদের অভিজ্ঞতা

মঙ্গল কুমার চাকমা

গত ১৬ থেকে ২৭ মে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দফতরে জাতিসংঘের আদিবাসীবিষয়ক স্থায়ী ফোরামের চতুর্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে সরকারি, আদিবাসী সংগঠন ও জনগোষ্ঠী, এনজিও, একাডেমিয়া, জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা ও দাতা সংস্থাসমূহের ১ হাজার ২০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এ অধিবেশনে আদিবাসী ফোরামের চেয়ারপারসন হিসেবে ফিলিপাইনের ইগোরোত আদিবাসী নেত্রী ভিক্টোরিয়া টাউলি-কর্পোজ নির্বাচিত হন।

এবারের অধিবেশনে মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী'। মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের অধীনে ১ নম্বর লক্ষ্য চরম দারিদ্র ও ক্ষুধা দূরীকরণ এবং ২ নম্বর লক্ষ্য সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ওপর আলোচনা হয়। এ ছাড়া আদিবাসীদের মানবাধিকার পরিস্থিতি, আদিবাসী সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও পৃথকীকরণ, আদিবাসী শিশু, যুব ও নারী এবং ফোরামের ভবিষ্যৎ কর্ম ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়।

আদিবাসী প্রতিনিধিরা বলেন সরকার, উন্নয়ন সংস্থা ও দাতাগোষ্ঠীসমূহ উন্নয়নকে শুধু উন্নয়ন প্রেক্ষাপট থেকে বিবেচনা করে। অধিকারভিত্তিক ধারণা থেকে উন্নয়ন কার্যক্রমকে দেখা হয় না। এরূপ উন্নয়ন ধারণা আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে প্রান্তিকীকরণ করে। ভূমি থেকে তাদের চিরতরে উচ্ছেদ করে। তাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে। জাতীয় অস্তিত্ব ও আবাসভূমির অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে। তাই আদিবাসীরা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যকে অধিকারভিত্তিক আঙ্গিকে প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের আহ্বান জানান। তারা বলেন, দারিদ্র বিমোচন অর্থহীন হবে যদি ভূমি, ভূখণ্ড এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর আদিবাসীদের অধিকারের কথা বলা না হয়। আদিবাসী-রা অভিযোগ করেন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য প্রণয়নের ক্ষেত্রে, এমনকি জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রেও আদিবাসীদের সম্পৃক্ত করা হয়নি।

আদিবাসীরা বলেন, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা আদিবাসীদের মূল স্রোতধারায় অঙ্গীভূত করে এবং আদিবাসীদের পরিচয় সংস্কৃতি ও প্রথাগত জ্ঞান ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে। আদিবাসীদের

শিক্ষার ক্ষেত্রে বহুভাষী ও আন্তঃসাংস্কৃতিক শিক্ষা ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হওয়া দরকার, যাতে আদিবাসী শিশু অধিকারকে ত্বরান্বিত করে। ওই বাস্তবতার আলোকে আদিবাসীরা তাদের শিশুদের জন্য পৃথক পাঠ্য□ম ও শিক্ষানীতি প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আদিবাসীরা বলেন, তারা অব্যাহতভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার। আদিবাসীদের পূর্বাবহিতকরণ সম্মতি ব্যতীত আদিবাসী ভূখণ্ডে তেল-গ্যাসসহ খনিজ সম্পদ আহরণ, জলবিদ্যুৎ বাঁধ নির্মাণ, পার্ক ও সংরক্ষিত অঞ্চল ঘোষণা, সামরিকীকরণ, বহিরাগত বসতি স্থাপন ইত্যাদি আদিবাসী স্বার্থবিরোধী কার্য□ম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর ফলে তাদের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা চরমভাবে ক্ষুন্ন হচ্ছে এবং চিরাচরিত ভূমি থেকে তারা চিরতরে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে। এশিয়ার আদিবাসীরা বলেন, এশিয়ার অধিকাংশ দেশের আদিবাসীঅধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ ব্যাপক সামরিকীকরণ করা হয়েছে এবং নৃশংস সেনা শাসন জারি রয়েছে। এর ফলে এশিয়ার আদিবাসীরা চরম নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। তাদের জীবনে চরম দুর্ভোগ ও দুর্দশা নেমে এসেছে। আদিবাসী নারীরা চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিনাতিপাত করতে বাধ্য হচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে তারা বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে 'অপারেশন উত্তরণ', মিয়ানমারের 'ব-াক এরিয়া', ঘোষণা ও দেখা মাত্র গুলি, জাপানের "মার্কিন সামরিক ঘাটি" ইন্দোনেশিয়ার 'ডুরারত সিপিল অ্যাণ্ড ডুরারত মিলিটার' এবং থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন ও নেপালে ব্যাপক সেনা অভিযান ইত্যাদি উদাহরণ তুলে ধরেন। এবারের অধিবেশনে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী কর্তৃক আদিবাসীদের ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘনেরও গুরুতর অভিযোগ ওঠে। এ জন্য শান্তিরক্ষী বাহিনী নিয়োগকালে স্ক্রিনিংসহ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে আদিবাসী সং□ান্ত নীতিমালা প্রণয়নের দাবি জানানো হয়।

আদিবাসীরা তাদের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা উন্নয়নের জন্য মানবাধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ বাস্তবায়ন এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন ট্রিটিবডিসমূহে আদিবাসীদের সম্পৃক্তকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। আদিবাসীদের অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে আদিবাসী অধিকারবিষয়ক ঘোষণাপত্রের কোনো বিকল্প নেই বলে তারা উলে-খ করেন। আগামী দু বছরের মধ্যে আদিবাসী অধিকারবিষয়ক খসড়া ঘোষণাপত্র অনুমোদনের জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

এবারের অধিবেশনে মানবাধিকার সং□ান্ত আলোচনায় মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার লুইস আরবোর, আদিবাসীবিষয়ক স্পেশাল র‍্যাপিটিয়র স্টাভেন হ্যাগেন এবং আদিবাসীবিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের চেয়ারপাসরন আলফন্সো মার্টিনেজ ভাষণ দেন। এ ছাড়া জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা, দাতাসংস্থা ও সরকারি প্রতিনিধিরা তাদের আদিবাসী সং□ান্ত গৃহীত কার্য□ম তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে আদিবাসী প্রতিনিধিরা স্থায়ী ফোরামের সুপারিশ বাস্তবায়ন সং□ান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিলের ওপর কর্মকৌশল (মেকানিজম) গড়ে তোলার জন্য জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা ও সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। প্রসঙ্গত, জাতিসংঘের অনেক বিশেষায়িত সংস্থাও সরকারের অসংবেদনশীল পলিসির সঙ্গে খাপ খাইয়ে আদিবাসী অঞ্চলে কাজ করে থাকে বলে আদিবাসীরা উলে-খ করেন।

উলে-খ্য, আদিবাসীবিষয়ক স্থায়ী ফোরাম জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের একটি সম্পূরক বডি। জাতিসংঘ কাঠামোর মধ্যে এটি আদিবাসীবিষয়ক সর্বোচ্চ ফোরাম। ২০০২ সালের মে মাসে প্রথম অধিবেশনের মাধ্যমে এ ফোরামের যাত্রা শুরু হয়। আটজন আদিবাসী বিশেষজ্ঞ এবং আটজন সরকারি প্রতিনিধি নিয়ে এ ফোরাম গঠিত। এ ফোরামের

অধিবেশনে সরকারি, আদিবাসী সংগঠন ও জনগোষ্ঠী, এনজিও, একাডেমিয়া, জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা ও দাতাসংস্থাসমূহের প্রতিনিধিরা পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ এবং বক্তব্য রাখতে পারেন।

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশ থেকেও এবারের অধিবেশনে কয়েকজন আদিবাসী প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করি। আমরা অধিবেশনে এদেশের আদিবাসীদের ওপর দমন-পীড়নের পরিস্থিতি তুলে ধরি এবং বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের আদিবাসীদের অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মানবাধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ বাস্তবায়ন, ভূমি-ভূখণ্ড-প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর আদিবাসীদের চিরায়ত অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান, আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা, আদিবাসী অঞ্চল থেকে সামরিক শাসন ও বসতিকারী বহিরাগতদের প্রত্যাহার, সরকার এবং আদিবাসীদের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিসমূহ বাস্তবায়ন, তেল-গ্যাসসহ খনিজ সম্পদ আহরণ, বাঁধ নির্মাণ, ইকো-পার্ক স্থাপনের নামে আদিবাসীদের ভূমি জবরদখল ও তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ প্র□িয়া বন্ধের আহ্বান জানাই।

আমাদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অধিবেশনে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি বলেন, বাংলাদেশে কোনো আদিবাসী নেই। তবে কিছু উপজাতি আছে। তারা দেশের পূর্বদিক থেকে কয়েক শতাব্দী আগে এদেশে আগমন করেছেন। সংবিধানে জাতিগত সংখ্যালঘুসহ সব নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা, সভা-সমিতি গঠনের স্বাধীনতা, কর্ম ও চলাফেরার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সমাজের অনগ্রসর অংশ হিসেবে গণ্য করে 'উপজাতি'দের বিশেষ সুবিধা প্রদানের জন্য সংবিধানে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। তারই আলোকে 'উপজাতি'দের প্রদেয় সুযোগ-সুবিধার ফিরিস্তি তিনি তুলে ধরেন। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তির দেশ। বাংলাদেশে আদিবাসী নিপীড়নের অভিযোগ সর্বৈব ভিত্তিহীন। এটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার বলে তিনি উলে-খ করেন। তিনি আরো বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে বলা হয়, বাংলাদেশের অনেক আইনে (যেমন ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গ ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন এবং ১৯৯৫ সালের ১২ নবেম্বর আইন) আমাদের 'আদিবাসী' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ ছাড়া ২০০০ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ২০০৩ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত শুভেচ্ছা বাণীতে আমাদের 'আদিবাসী' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গে বলা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদি অধিবাসী। প্রাক-ব্রিটিশ যুগে এ অঞ্চল ছিল একটি স্বাধীন সামন্ত রাজ্য। ব্রিটিশ শাসনামলে এবং এমনকি পাকিস্তান শাসনামলের প্রথমার্ধেও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল 'শাসনবহির্ভূত অঞ্চল' হিসেবে স্বতন্ত্র শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা ভোগ করত। অনুরূপভাবে সিলেটের গারো অধ্যুষিত অঞ্চলও একসময় 'আংশিক শাসনবহির্ভূত অঞ্চল' হিসেবে শাসিত হতো।

আদিবাসী নিপীড়নের অভিযোগ তদন্তের জন্য জাতিসংঘের আদিবাসীবিষয়ক স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ারকে এদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানাতে প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। অন্যথায় আদিবাসী সংগঠনের পক্ষ থেকে স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ারকে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে ঘোষণা করা হয়। প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে আরো বলা হয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অবদান নিঃসন্দেহে গর্বের বিষয়। কিন্তু পক্ষান্তরে দেশের ভেতর পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জনগণের

শান্তি ও মানবাধিকার হরণ করা কোনো মেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। উলে-খ্য, আমাদের বক্তব্য প্রদানের আগে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ করেন। তিনি নিজেকে দেখতে আদিবাসীর মতো বলেও মতপ্রকাশ করেন। এমনকি তারই উদ্যোগে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনপ্রধানের সঙ্গেও আমরা সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হই। আমরা এসব অত্যন্ত সাদরে গ্রহণ করি এ স্পিরিটের ভিত্তিতে যে, সংঘাত নিরসনের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ একটি উপযুক্ত ফোরাম।

কিন্তু আমাদের বক্তব্য দেওয়ার পর তিনি আমাদের ওপর অনেকটা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন এবং মিথ্যা বক্তব্য নিয়ে অহেতুক দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করছি মর্মে অভিযোগ এনে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি এতই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, এরপর তিনি আর আমাদের সঙ্গে কোনো কথাও বলেননি এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক যে, একদিকে বাক-স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধানের কথা বলা হয়, অন্যদিকে বাক-স্বাধিনতা প্রয়োগ করতে গিয়ে দেশের সুনাম নষ্টকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এটাই হচ্ছে দুমুখো নীতি। শুধু তাই নয়, আদিবাসীদের বহিরাগত বলতেও তিনি নূন্যতম কূটনৈতিক সৌজন্যের ধার ধারেননি। এটা উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী এবং উগ্র সাম্প্রদায়িক মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। তার এ অসৌজন্যমূলক বক্তব্যে বিভিন্ন দেশের আদিবাসী প্রতিনিধিসহ জাতিসংঘের অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেন। তাই উগ্র জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িক আচরণ ও কার্য মের মধ্য দিয়ে সরকারি প্রতিনিধিরাই দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে বলে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

প্রথম আলো, ১৭ জুন ২০০৫

২০০১ সালের নির্বাচনের পর সংখ্যালঘু নির্যাতন মামলার ঐতিহাসিক রায় এবং ...

সরদার ঝন্টু

১ অক্টোবর জামাত-বিএনপি জোট নির্বাচনে জেতার রাত থেকে দেশব্যাপী ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর যে নির্যাতন, ধর্ষণ ও লুটপাট করেছিল তার একটি ঘটনার মামলার রায় ঘোসণা করা হয়েছে ২০ জুন। রায়ে ৫ ধর্ষককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ঘটনার দুর্ধর্ষ দুই আসামি মোতাহার ও হারুন পলাতক রয়েছে। এজন্য রায় শুনে আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন ঘটনার শিকার দুই নারী। আরও শঙ্কিত সংসদ নির্বাচনও ফের এলো বলে।

আদালতে রায় হওয়া এ ঘটনাটি ভোলার লালমোহন উপজেলার লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়নের প্রত্যন্ত অঞ্চল ফাতেমাবাদ গ্রামের। এখানে বাস করে সংখ্যালঘু ৩০টি পরিবার। ১ অক্টোবর গভীর রাত থেকেই পরিবারগুলোর ওপর শুরু হয় পৈশাচিক নির্যাতন। স্থানীয় এক সাংবাদিকের ভাষায় যা আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগকেও হার মানায়। ওই সময় ৪ মাসের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ ও তার পঞ্চাশোর্ধ বয়সের শাশুড়িকে পালা মে ধর্ষণ করেছিল জোট সরকারের বিজয়ে অতি উল-সিত সন্ত্রাসীরা। নালিশ করে কোন ফল হবে না বলে সম্ভ্রম হারিয়েও মুখ বুজে তারা সহ্য করেছিল। থানা পুলিশে কেন জানায়নি এর উত্তরে ওই পরিবারগুলো জানায়, ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে বাবরি মসজিদ ইস্যুকে কেন্দ্র করে সবক'টি সংখ্যালঘু পরিবারের ঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। ওই ঘটনা থানা পুলিশে জানিয়েও তারা কোন ফল পায়নি বলে সম্ভ্রম হারিয়েও গরিব-অসহায় মানুষগুলো চুপ করেছিল। শুধু এই সময় বরিশালের জনকণ্ঠের প্রতিনিধি শওকত মিলটন নিজের দায়বদ্ধতা থেকে সিরিজ রিপোর্ট প্রকাশ করাতে অমানবিক নির্যাতনের বর্ণনা শুনে ফাতেমাবাদ গ্রামে ছুটে এসেছিলেন ড. কামাল হোসেন, ড. অজয় রায় ও গণফোরাম নেতা পঙ্কজ ভট্টাচার্য। পুলিশ মামলা নিতে বাধ্য হয়। আসামিদের হুমকির মুখে জীবন রক্ষার্থে মামলার বাদি গৃহবধূকে তার স্বামীসহ ভারতে গিয়ে পালিয়ে থাকতে হয়। এক বছর পর গৃহবধূকে ভারত থেকে আনিয়ে সাক্ষী দেয়াতে হয়। ৪ বছর পর মামলার রায় ঘোষণা হয়। রায় ঘোষণার পর বর্তমানে ধর্ষকের স্বজনরা পরিবারগুলোকে হুমকি দিচ্ছে সময় এলে প্রতিশোধ নেবে।

সময়টা কখন? হিসাব কষলে কী দাঁড়ায়, ফের নির্বাচনে জেতার পরমুহূর্ত থেকেই কী? হতে পারে, জোটের সন্ত্রাসীদের কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই। জামাত-বিএনপি জোট সংখ্যালঘুদের ওপর ধর্ষণ, নির্যাতন ও লুণ্ঠন করেছে হিসাব কষেই। কারণ যেখানে ৩৫ থেকে ৪০ ভাগ ভোটার ধর্মীয় সংখ্যালঘু সেখানেই আওয়ামী লীগের প্রার্থীর বিজয় নিশ্চিত হয়। এ ভোট যেন আওয়ামী লীগ একচেটিয়াভাবে না পায় এজন্যই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে ধর্ষণ, নির্যাতন এমনকি তাদের দেশছাড়াও করা হয়েছে। এও দেখা গেছে, '৯৬ সালের নির্বাচনে বিজয়ের পর আওয়ামী লীগের লোকরা সংখ্যালঘুদের গনিমতের মাল মনে করেই ব্যবহার করেছে। বরিশালের গৌরনদীতে এমনও ঘটনা ঘটেছে, দিনের পর দিন আটকে রেখে আওয়ামী লীগের কর্মীরা সংখ্যালঘু পরিবারের কন্যাদের ধর্ষণ করেছে। ক্ষোভে-রোষে সংখ্যালঘুরা মান গেছে এখন জান যাবে যায় যাক, এ কথা মনে করে বিএনপি প্রার্থীকে ভোট দিয়েছে; কিন্তু কী হবে, সে-াগান ওই একটাই সংখ্যালঘুরা ভোট নৌকাতেই দেয়এ অজুহাতে বিএনপি প্রার্থীকে ভোট দিয়েও নির্যাতন থেকে রেহাই পায়নি গৌরনদী আগৈলঝাড়ার সংখ্যালঘুরা।

অভিনব পন্থায় ভোট চায় বর্তমান সরকারের আইন প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর। তার এক সমর্থক জানাল, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা কাঁঠালিয়া উপজেলার আওড়াবুনিয়াতে নির্বাচনী জনসভায় সংখ্যালঘু নারীদের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, কপালে সিঁদুর দেয়া এবং লাল পাড়ের শাড়ি পরা এ মহিলাদের আপনারা চেনেন? ওরা এসেছে আমাকে দেখাতে, আসলে ভোট দেবে নৌকায়। আমি চাই, আপনারা ভোট কেন্দ্রে যাবেন না তাহলেই আপনাদের ভোট আমি পেয়ে যাব। ভোট প্রদান নাগরিক অধিকার। তিনি আইনজ্ঞ, ব্যারিস্টার এবং বর্তমানে জোট সরকারের আইন প্রতিমন্ত্রী। তাহলে বিষয়টি গিয়ে কী দাঁড়ায়? জোট সরকারের আরেকজন সাংসদ আছে নূরুল ইসলাম মনি। এলাকার লোকজন বলে, রওশন এরশাদকে মা ডেকে হেরোইনের ব্যবসা করে কোটি কোটি টাকা কামিয়েছেন। নির্বাচনের সময় মনি সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনে অশিক্ষিত মৌলবাদীদের উৎসাহিত করে। নির্বাচনে জেতার তাগিদে পতিতা ভাড়ায় এনে কপালে সিঁদুর পরিয়ে হিন্দু নারীদের ভোট আগাম দিয়ে ফেলে। নির্বাচনে জেতার পর ওই এলাকার নেতৃস্থানীয় সংখ্যালঘুদের হামলা-মামলা দিয়ে হয়রানি করে। এমন হলে সংখ্যালঘুরা কোথায় যাবে? সহজ উত্তর পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে যাবে। আর হচ্ছেও তো তাই; কিন্তু জোট সরকার নিজের মুখ রক্ষার্থে মানবাধিকারের প্রশ্নে জোর গলায় প্রতিবাদ জানায়, সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন হয় না, তারা দেশত্যাগ করে না, এটা সম্প্রীতির দেশ আরও কত কী! তাই যদি হবে তাহলে একটিই প্রশ্ন লর্ড হার্ডিঞ্জের ধর্ষিত দুই নারী রায় প্রকাশের পর কেন ঘটনার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা প্রকাশ করেন। আর কেনই-বা সন্ত্রাসী নরপিশাচরা হুমকি দেয় সময় আসুক, সময়টা কী আরেক ১ অক্টোবরের?

সংবাদ, ৬ জুলাই ২০০৫

সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্পর্কে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের সরজমিন প্রতিবেদন ও পর্যবেক্ষণ

অক্টোবর ২০০১ - আগস্ট ২০০৫

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সরজমিন তদন্ত

এক
ডেটলাইন ঃ ফেণী
হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নেমে এসেছে অবর্ণনীয় তাণ্ডব

এবারের জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পুরো ফেনীতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর নেমে এসেছে অবর্ণনীয় তাণ্ডব। ফেনী সদর, দাগনভূঁইয়া থানার কয়েকটি গ্রামের মানুষ প্রাণ ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই ফেনীতে হত্যা করা হয়েছে ভূবন চন্দ্র দাস ও অর্জুন দত্ত বৈষ্ণবকে। গ্রামছাড়া হয়েছে অসংখ্য নারী-পুরুষ।

ফেনীর দাগনভূঁইয়া থানার মহেশপুর গ্রামের সব হিন্দু পরিবারের মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হয়েছে ফেনী সদর থানার দক্ষিণ ছনুয়ার হরেন্দ্র কুমার সাহার বাড়ি। ১৪ অক্টোবর ২০০১ রোববার সরেজমিন সাম্প্রদায়িক নির্যাতন প্রত্যক্ষ করার জন্য একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাংবাদিক শাহ-রিয়ার কবিরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ফেনীতে যান। এই প্রতিবেদকও সঙ্গী হয়েছিলেন ওই প্রতিনিধি দলের। ফেনীর সদর থানার তুলাবাড়িয়া গ্রামে যখন প্রতিনিধি দলটি পৌঁছায় তখন সেখানে আশ্রয় নেয়া শঙ্কিত সংখ্যালঘু পরিবারের আহাজারিতে বাতাস ভারি হয়ে উঠে। সবচেয়ে বেশি অসহায় পরিস্থিতিতে পড়েছে নারীরা। তারা সম্ভ্রম হারানোর ভয়ে পালিয়ে এসেছে তাদের গ্রাম-ভিটেমাটি ছেড়ে। সেকান্দারপুর, নলদিয়া, লেমুয়া, মহেশপুর, দক্ষিণধনিয়া, চাঁদপুর প্রভৃতি গ্রাম থেকে অসংখ্য নারী এসে আশ্রয় নিয়েছে ফেনী শহরের কাছাকাছি তুলাবাড়িয়া গ্রামে। কিশোরী, তরুণী, নববধূ থেকে শুরু করে বৃদ্ধা পর্যন্ত সন্ত্রাসীদের নির্যাতনের ভয়ে পালিয়ে এসেছে এখানে। সবাই ভয় আর শঙ্কায় তাদের নাম প্রকাশ করতে বারণ করলেন এই প্রতিবেদককে। প্রায় সবারই এক অভিযোগ, ভোটের দিন ওদের ভোট কেন্দ্রে যেতে দেয়া হয়নি। সন্ত্রাসীরা বলেছে, ভোট কেন্দ্রে গেলে গলা কেটে নেয়া হবে। সন্ত্রাসীরা দল বেঁধে পাহারা বসিয়েছিল গ্রামের হিন্দু পরিবারগুলোর বাড়ির চারদিকে। নির্বাচনের আগে থেকেই তাদের হুমকি দিয়েছে যেন ভোট কেন্দ্রে না যায়। আর নির্বাচনের পর থেকে শুরু হয়েছে অন্য নির্যাতন। বিএনপি আর জামায়াতে ইসলামীর সন্ত্রাসীরা হিন্দুদের ঘরে ঘরে গিয়ে বলছে, তোমাদের ঘরে বন্দুক আছে। বন্দুক বের করে দাও। নইলে তোমাদের কেটে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হবে। সন্ত্রাসীদের ভয়ে হিন্দু পরিবারগুলোর পুরুষরা অনেক আগেই পালিয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ে। সন্ত্রাসীরা বলছে, পুরুষদের বের করে এনে তাদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য। না দিতে পারলে তারা মোটা অংকের চাঁদা চাইছে। এই চাঁদার পরিমাণ একলাখ থেকে তিন লাখ টাকা। সন্ত্রাসীরা বলছে, টাকা না দিতে পারলে ঘরের বউ-ঝিকে অত্যাচার করা হবে। সম্ভ্রম হারানোর ভয়ে বাড়ির নারীরাও শেষপর্যন্ত পালিয়ে এসেছে এই তুলাবাড়িয়া গ্রামে।

১৩ অক্টোবর ফেনী সদর থানার তুলাবাড়িয়া গ্রামে আশ্রয় নেয়া শঙ্কিত অসহায় হিন্দুদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। নির্যাতনের ভয়ে গ্রাম, বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে এসে এখানে আ□মণের শিকার হয়েছে তারা। সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত হয়েছে স্বপন চন্দ্র দাস ও মাখন চন্দ্র দাস। তাদের ফেনী সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্ত্রাসী মোশারফ, রফিক ও আনোয়ারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

'ভোট কেন্দ্রে গেলে লাশ পড়বে'

মরণী বালা দাস, বাণী রাণী দাস, শিখা, ফুল কুমারী দাস, কানন বালা দাস, হিরা রাণী দাস, শিপ্রা রাণী দাস, বীভা রাণী আচার্য, মণিকা রাণী দাস, সন্ধ্যা রাণী দাস, সবিতা রানী দাস, ও বীনতা রানী দাস ওদের সবার একই জিজ্ঞাসা, কি অপরাধ তাদের? কেন তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে আজ উদ্বাস্ত অসহায় জীবন কাটাতে হচ্ছে? ওরা শঙ্কিত চিত্তে প্রশ্ন করেছে এই বাংলাদেশ কি আমাদের দেশ নয়? এদেশের জন্য কি আমরা রক্ত ঝরাইনি? এদের মতো একই প্রশ্ন সাম্প্রদায়িক আ□মণে বিপন্ন ফেনীর সর্বস্তরের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের। একেকজন মানুষ একেকটি পরিবারের সকরুণ কাহিনী ধারণ করা আছে ভিডিও ক্যামেরায়। তাদের কথা-বার্তায় প্রকাশ পায় এক করুণ জীবনের আর্তি। দাগন ভূঁইয়া থানার সেকান্দরপুর গ্রামের মরণী বালা দাস সন্ত্রাসীদের ভয়ে জান নিয়ে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে ফেনী সদর থানার তুলাবাড়িয়া গ্রামের এক আত্মীয়ের বাড়িতে। তিনি বললেন, গ্রামে জ্বালা-যন্ত্রণায় থাকতে পারি নাই। আমাদের কাছে এসে টাকা পয়সা চায়। পুরুষদের মারধর করে। বলে টাকা না দিলে মহিলাদের অত্যাচার করবে। বলে, 'ইজ্জত নিবো'। আমরা ওদের ভয়ে ঘর থেকে বের হতে পারি নাই। বনে জঙ্গলে লুকিয়ে ছিলাম কয়দিন। তারপর একদিন পালিয়ে এসেছি এখানে।

একই গ্রামের বাণী রাণী দাস বললেন, আমাদের পুরুষ সন্ত্রাসীদের ভয়ে বাড়ি আসতে পারে না। সন্ত্রাসীরা দল বেঁধে আসে। বলে টাকা দে, স্বামী ছেলেদের বের করে দে, না দিলে গুলি করবো। সন্ত্রাসী আমার বুকে বন্দুক ধরেছে। একই গ্রাম থেকে পালিয়ে আসা শিখা বললেন, আমার বাড়ির সব কিছু লুট করে নিয়ে গেছে ওরা। সাতজন এসেছিল। আমরা ওদের চিনতে পারিনি। ডাকাতি করে সবতো নিয়েই গেছে। যাওয়ার সময় বলেছে ১০ হাজার টাকা দিতে হবে এবং পুরুষদের ওদের হাতে তুলে দিতে হবে। পুরুষদের নাকি ওরা টুকরো টুকরো করে কাটবে। এই কথা শুনে আমরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছি।

একই গ্রাম থেকে পালিয়ে আসা আশ্রয়প্রার্থী বৃদ্ধা ফুল কুমারী দাস বললেন, আমাদের ভোট কেন্দ্রে যেতে দেয়া হয়নি। ভোটের আগেই প্রতিদিন বাড়িতে এসে ওরা ধমক দিয়ে বলতো, 'ভোট কেন্দ্রে গেলে লাশ পড়বো।' নির্বাচনের এক মাস আগ থেকে ওই হুমকি, ধমক শুরু হয়। নির্বাচনের পরে জীবনের ভয়ে বাড়ি ছেড়েছি আমরা। তিনি বললেন, আমি বুড়া মানুষ। জানের ভয় কার না আছে। সব ঘটনা থানায় জানিয়েছি। কিন্তু লাভ হয় নাই। সন্ত্রাসীদের সঙ্গে থানার খুব খাতির। জীবনের প্রায় তিনকাল খুইয়ে আসা এই বৃদ্ধ কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, আমাদের কি অপরাধ? কেন ওরা আমাদের ঘরবাড়ি ছাড়া করলো? সেকান্দারপুর গ্রামের কানন বালা দাস বললেন, আমাদের গ্রামে নয় ঘর হিন্দু ছিল। সবাই পালিয়ে গেছে। তিনি বললেন, আমাদের স্বামী বাজারে শুঁটকি মাছ বি□ করে। ওদের ভয়ে সে এখন বাজারে যেতে পারে না। রাস্তায় দেখা হলে বলে নৌকায় ভোট দিয়েছ, প্রাণে বাঁচবা না। টাকা না দিলে কাউকে বাঁচতে দেবো না। তিনি বললেন, সেকান্দারপুর গ্রামে এবার কেউ পূজা করবে না। আমরা জানতে চেয়েছিলাম, কবে বাড়ি ফিরবেন উত্তরে তিনি বললেন, গ্রামে এখন অশান্তি। শান্তি ফিরে এলেই আমরা ঘরে ফিরবো।

৯ম শ্রেণীর ছাত্রী হিরা রাণী দাস বললো, ভোটের এক দেড় মাস আগের ঘটনা। সন্ত্রাসীরা আমাদের ঘরে ঢুকে বললো, ৫০০০ টাকা দে, নইলে মান সম্মান নষ্ট করা হবে। ওরা আমার মা-বাবা সবাইকে লাইনে দাঁড় করিয়ে মাথায় বন্দুক ধরে। তারপর আমার মা ও ভাবীকে আঘাত করে। হিরা বললো, আমার বাবা সামান্য কৃষিকাজ করে। ওরা প্রায়ই টাকা চায়। এত টাকা আমরা কোথায় পাবো? তাই সবাই পালিয়ে এসেছি। আমরা এখন খবর পাই ওরা নাকি আমাদের বাড়িতে আসে দল বেঁধে। বলে বাড়ি ছাইড়া কয়দিন থাকবা ডেডাইয়া 'গো (হিন্দুদের) একটা একটা কইরা কুবামু।' সে বললো, আমাদের বাড়ির কাউকে ভোট দিতে দেয়নি সন্ত্রাসীরা। আমরা দুই মাস ধরে গ্রাম ছাড়া।

সেনবাগ থানার নলদিয়া গ্রামের শিপ্রা রাণী দাস বলেন, ভোটের পরে সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে ঘরে থাকতে পারি নাই। ওরা বলেছে, 'ডেডারা (হিন্দুদের প্রতি বিদ্রুপাত্মক শব্দ) আওয়ামী লীগ করে। ওদের বাড়িতে থাকতে দেয়া হবে না। বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হবে। ওরা আমাদের বাড়িতে বোমা ফাটিয়েছে। ফেনী সদর থানার লেসুয়া গ্রামের প্রীতি রাণী দাস বললেন, দু'মাসের বাচ্চা নিয়ে পালিয়ে এসেছি। ১১ জন সন্ত্রাসী এর মধ্যে একজনের নাম ফেরদৌস, একদিন রাতে আমাদের দরজা জানালা ভেঙে ফেলতে চেয়েছিলো। আমাদের গ্রামের ২৭টি হিন্দু পরিবারের প্রায় ৩শ' মানুষের কেউ এখন বাড়িতে নেই। ভোটের দুই মাসে আগ থেকেই আমাদের বাড়িতে প্রহারা বসায় মাস্তানরা। শহিদুল-হ নামে এক সন্ত্রাসী পিস্তল ঠেকিয়েছে একদিন। বলেছে, কেউ ভোট দিতে গেলে মেরে ফেলবো। ওরা ১১ লাখ টাকা চেয়েছে। আমার শ্বশুর ১ লাখ টাকা দিয়েছে মীমাংসার জন্য। কিন্তু আরো চাচ্ছে।

দাগন ভূঁইয়া থানার মহেশপুর গ্রামের সন্ধ্যা রাণী দাস বললেন, পাঁচ হাজার টাকা না দিতে পারায় ওরা আমার স্বামীকে মেরেছে। তিনি বলেন, মহেশপুর গ্রামের সব হিন্দুরা পালিয়েছে ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। তিনি বলেন, আমাদের গ্রামে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের খবর শুনে সাংবাদিক গিয়েছিলো। আমরা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছি এ জন্য সন্ত্রাসীরা বলেছে তোদের আর রক্ষা নাই। এ জন্য আমরা পালিয়ে এসেছি।

ফেনী সদর থানার দক্ষিণ ধনিয়া গ্রামের বীনতা রাণী দাস বললেন, ওরা আমাদের ভোট দিতে দেয়নি। বলেছে, ভোট দিলে তোদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হবে।

এমনি অসংখ্য ভয়ার্ত মুখ এসে আশ্রয় নিয়েছে ফেনীর সদর থানার তুলাবাড়িয়া গ্রামে। সহায় সম্বলহীন অসহায় নারী আর তাদের সঙ্গে অবুঝ শিশুরা বাড়ির পুরুষরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে হাতে প্রাণ নিয়ে। এই বিপন্ন মানুষগুলো জানে না তাদের কি অপরাধ। কবে তারা ফিরতে পারবে নিজ ভিটায় সেটা এখন অনিশ্চিত। সামনেই শারদীয় দুর্গোৎসব। এবারের পূজা তারা করতে পারবে কিনা সেটাও তারা জানে না।

পুড়ে ছাই হয়েছে হরেন্দ্র সাহার বাড়ি, পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে পলাশ কান্তি লধ'কে

নির্বাচনের ৩ দিন পর ৪ অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাতে সন্ত্রাসীরা পুড়িয়ে দিয়েছে হরেন্দ্র সাহার বাড়ি। ফেনী সদর থানার দক্ষিণ ছনুয়া গ্রামের ওই বাড়িটি হরেন্দ্র কুমার সাহার হলেও তার মৃত্যুর পর বাড়ির মালিক এখন তার চার ছেলে। বড় ছেলে হরিপদ সাহা এই প্রতিবেদককে বলেন, আমাদের চার ভাইয়ের ওই বাড়িটি পুড়িয়ে দিয়েছে। তিনি বলেন, আমরা ওই বাড়িতে কেউ থাকি না বিধায় ওই আগুনের হাত থেকে প্রাণে রক্ষা পেয়েছি। আমরা ভাইরা সবাই ফেনীতে থাকি। তিনি বলেন, কি কারণে আমাদের বাড়িতে লুটপাট হল এবং পুড়িয়ে দেয়া হল তা আমরা জানি না। ১৪ অক্টোবর ২০০১ রোববার ওই পোড়া বাড়িটি সরেজমিনে দেখার জন্য আমরা দক্ষিণ ছনুয়া গ্রামে যাই। ফেনী শহর থেকে চট্টগ্রাম সড়ক ধরে অনেকটা এগিয়ে তারপর

কাঁচা রাস্তা। মাটির পথ ভেঙে আরো অনেকটা হাঁটলে ওই গ্রাম। গ্রামের মধ্যে একটি ঐতিহ্যবাহী বাড়ি এটি। ওঠানে পা দিতেই টের পাওয়া যায় ৪ অক্টোবর সংঘটিত ধ্বংসযজ্ঞ। উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি চৌচালা টিনের ঘরটি পুড়ে গেছে। মাটির দেয়ালে লেগে আছে আগুনের লেলিহান শিখার ছোবল। আগুনে পুড়েছে ঘরের পুরো কাঠামো। আগুন দেয়ার আগে লুট করা হয়েছে ঘরের সব জিনিসপত্র। মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত আগুনে পুড়েছে ওই বাড়িটি। গ্রামের বাসিন্দা, আশপাশের বাড়ির মানুষ বর্ণনা দিলেন সে রাতের ভয়াবহ আগুনের কথা। তবে তারা নাম বললেন না কেউই।

রাতভর আগুনের তাণ্ডব পুড়িয়েছে কচি একটা কাঁঠাল গাছ, একটি আম গাছ আর ঘরের পশ্চিমে হেলান দেয়া নারকেল গাছটিও জ্বলেপুড়ে অঙ্গার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হরিপদ সাহা বললেন, লুটপাট ও বাড়িতে আগুন দেয়ার ফলে তাদের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে তা ৩ লাখ টাকা আর মানসিক যে ক্ষতি এ জীবনে পূরণের নয়। তিনি বললেন, আমরা এদেশ, এ মাটির সন্তান— অথচ আমরা আমাদের পবিত্র বাপদাদার ভিটাকে রক্ষা করতে পারছি না। কে দেবে আমাদের জানমালের নিরাপত্তা?

ওদিকে নির্বাচনের পরে দাগনভূঁইয়া থানার হিরাপুর গ্রামের তরুণ পলাশকান্তি লধকে হত্যা করার জন্য আ□মণ করে সন্ত্রাসীরা। তার অপরাধ তিনি আওয়ামী লীগের সমর্থক। ভোট দিয়েছেন নৌকায়।

১১ অক্টোবর ২০০১ বৃহস্পতিবার বিকেল চারটায় পলাশকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গ্রামের মোল-ার দোকানের সামনে বেদম প্রহার করা হয়। প্রহারে তার হাত-পা ভেঙে যায়। সন্ত্রাসীদের উদ্দেশ্য ছিল পলাশকে মেরে ফেলা। গ্রামের লোকজন এগিয়ে এসে তাকে প্রাণে রক্ষা করে। গ্রামবাসী পলাশকে উদ্ধার করে দাগনভূঁইয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরেছে পলাশ। তবে পঙ্গু শরীরে সে এখনো নিরাপদ নয়। তাকে হুমকি দেয়া হচ্ছে তার হাত কেটে নেয়া হবে বলে। সন্ত্রাসীদের ভয়ে পলাশের পক্ষে কেউ থানায় মামলা পর্যন্ত করেনি।

একটি সূত্র জানায়, পলাশকান্তি লধকে যারা পঙ্গু করেছে তারা সবাই বিএনপির সন্ত্রাসী। জিয়াউদ্দিন পিতা আব্দুল কাদের, শাহ আলম ও শাহ জালাল পিতা মোহাম্মদ এছাক, মামুন পিতা সামছুল হক— এই চার সন্ত্রাসী পলাশকে হত্যার উদ্দেশ্যে আ□মণ করে বলে জানা গেছে। এদের সবার বাড়ি দাগনভূঁইয়া থানার দক্ষিণ লালপুর গ্রামে।

নির্বাচনের পর ফেনীর সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নেমে এসেছে এক অবর্ণনীয় তাণ্ডব। ইতিমধ্যে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে ভুবন চন্দ্র দাস ও অর্জুন চন্দ্র বৈষ্ণবকে। ঘরবাড়ি ছাড়া করা হয়েছে অসংখ্য পরিবারকে। আতংকিত অসহায় মানুষ খুঁজে ফিরছে এতটুকু নিরাপদ আশ্রয়।

পূজা হবে না এবার

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। আর এ উৎসবটিই এবার করতে পারছে না ফেনী জেলার নির্যাতিত ভিটেমাটি ছাড়া হিন্দুরা। নির্বাচনের আগে এবং পরে সন্ত্রাসীদের ভয়ে তারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। পূজার আর বাকি মাত্র তিনদিন ঘরবাড়ি ছেড়ে আসা এসব সংখ্যালঘুর পরিবার কবে গ্রামে ফিরতে পারবেন তাও অনিশ্চিত। ফেনী জেলার সদর থানা, দাগনভূঁইয়া আর সোনাগাজী থানার যেসব নির্যাতিত হিন্দু এসে আশ্রয় নিয়েছিল ফেনী শহরের কাছে তুলাবাড়িয়া গ্রামে সেখানেও সন্ত্রাসীরা হামলা করেছে গত ১৫ অক্টোবর। ১৪ অক্টোবর ২০০২ রোববার তুলাবাড়িয়া গ্রামে আশ্রয় নেয়া অসংখ্য পরিবারের প্রায় ২০টি

পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা হয় ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রতিনিধিদের। তারা সবাই জানান, এবার তারা পূজা করবেন না। গ্রামে যেতে না পারলে পূজা করবেন কীভাবে। তারা জানান, প্রাণের ভয়ে ফেলে আসা তাদের গ্রামের ঘরবাড়িতে এখনো সন্ত্রাসীরা পাহারা দিচ্ছে। গ্রামের কোথাও একটি প্রতিমা তৈরি করতে পারেনি তারা। ফলে পূজা তাদের জীবন থেকে হারিয়ে যাবে। সোনাগাজী থানার হাজীপুর গ্রামের স্বপন কুমার দত্ত (৪০) নির্বাচনের দিন রাতে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছেন সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে। তিনি সেই যে পালিয়ে এসেছেন আর বাড়িতে ফিরতে পারেননি। বাড়িতে বৃদ্ধ মা, স্ত্রী, দুই কিশোরী মেয়ে ও এক ছেলে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। সন্ত্রাসীরা বাড়িতে ঢুকে হুমকি দিচ্ছে স্বপন কুমারকে তাদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য। স্বপন কুমারের দোষ ছিল তিনি নৌকার সমর্থক। স্বপন কুমার দত্ত কান্না জড়ানো কণ্ঠে বললেন, আমরা এবার পূজা করব না। তিনি বলেন, এই বাংলাদেশে এমন পরিস্থিতি আর কখনো হয়নি। নিজের ঘরে ফিরতে পারছি না। জানি না আমার ছেলেমেয়েদের ভাগ্যে কি আছে। তিনি বলেন, তাদের গ্রামের সবগুলো হিন্দু পরিবারেরই এমন দুর্যোগ নেমে এসেছে এবার। কেউ পূজা করতে পারবে না। দাগনভূঁইয়া থানার মহেশপুর গ্রামের সব হিন্দু পরিবারের লোকজন গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে একটু নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। ওই থানার পাশের গ্রাম হিরা-পুরের এক বৃদ্ধ বললেন, এই দুই গ্রামে আর একটিও প্রতিমা তৈরি হবে না। শোনা যাবে না তাদের শব্দ। ফেনী সদর থানার দক্ষিণ ছনুয়া গ্রামের হরেন্দ্র কুমার সাহার বাড়িটি পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। পাশের বাড়ির বৃদ্ধা শিবরানী সাহা বললেন, আমার ভাসুর পুত্রের বাড়িতে আগুন দিয়ে পাশের আরেক বাড়িতে লুট করলো। আমরা এই গ্রামে আর থাকতে পারি না। তিনি বললেন, তার এই দীর্ঘ জীবনে এবারই প্রথম পূজা করতে পারছেন না। গ্রামে কোথাও পূজা হবে না এবার। পুরো ফেনীতে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ওপর নেমে এসেছে এক নারকীয় তাণ্ডব। বাড়িঘর ছেড়েও রেহাই পাচ্ছে না নিরীহ হিন্দুরা। সন্ত্রাসীরা বলছে, ড্যাডা (হিন্দু)রা পালাইয়া থাকবে কয়দিন? টাকা না দিলে ওদের ঘরবাড়ি সব দখল করে নেয়া হবে।

দুই
ডেটলাইন ঃ পিরোজপুর
জামাত নেতা সাঈদীর এলাকায় বহুমাত্রিক নির্যাতন

২০০১ সালের ১ অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচন যে কী পরিমাণ বিপর্যয় ডেকে এনেছে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনদের ওপর, তা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এখনও সারাদেশে এই অমানবিক নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিশেষ করে সারাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর নির্যাতনের তথ্য সংগ্রহের জন্য দেশের যে অঞ্চলে গিয়েছি মানুষের করুণ আর্তি দেখেছি সর্বত্র। খবরের কাগজে পিরোজপুরে ডাঃ দেবলাল ডাকুয়ার উপর নৃশংস নির্যাতনের বিবরণ পড়ে আমরা গিয়েছিলাম কুখ্যাত রাজাকার মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর নির্বাচনী এলাকায়। পিরোজপুর, নাজিরপুর আর ইন্দরকানী নিয়ে পিরোজপুর জেলার এই আসন থেকে এবারের নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন সাঈদী। নির্বাচনের আগে এবং পরে বিএনপি ও জামাতের সন্ত্রাসীরা ওখানে যে তাণ্ডব চালিয়েছে তারই কিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় পত্র-পত্রিকায়। আজীবন মিথ্যাবাদী সাঈদী ওসব প্রতিবেদনের প্রতিবাদ জানিয়ে সাংবাদিকদের আহ্বানও জানিয়েছিলেন পিরোজপুর ঘুরে আসার সময়। সরেজমিন আমরা পিরোজপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে এসে এই জামাত নেতা সাঈদীর মিথ্যার বেসাতির প্রমাণ পেয়েছি।

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির উদ্যোগে গত ৬ নবেম্বর ২০০১ একটি টিম যাত্রা করে পিরোজপুরের উদ্দেশ্যে। এবারের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের চিত্র নিয়ে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করবে নির্মূল কমিটি। তার তথ্য সংগ্রহের জন্যই এই যাত্রা। ৭ নবেম্বর সকালে ওই জেলার নাজিরপুর থানার মাটিভাঙ্গা ইউনিয়নের মধ্যবানিয়ারী গ্রামে আমরা যখন পৌঁছি তখন চারদিক থেকে ছুটে এসে জড়ো হতে থাকে আতঙ্কিত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন। তারা এবার দুর্গাপূজা করতে পারেনি। সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে করেছে 'ঘটপূজা'। এসব করেও রেহাই পায়নি ওই গ্রামের নিরীহ হিন্দুরা। গত ১৪ অক্টোবর ওই গ্রামের সবকটি মন্দিরের প্রতিমা ভেঙে দিয়েছে জামাত ও বিএনপি'র সন্ত্রাসীরা। ওই দিন দল বেঁধে সন্ত্রাসীরা আ□মণ করেছে। লুটপাট করেছে গ্রামের দোকান পাটে। সন্ত্রাসীরা আহত করেছে অজয় কুমার, হরিদাসী, খোকন চন্দ্র মিস্ত্রি, অমি মিস্ত্রি, দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস, ননী রায়সহ আরও অনেককে।

ওই গ্রামের সত্তর উর্ধ্ব বৃদ্ধ অনীল কুমার হাওলাদার বললেন, আমার জীবনে আমি এমন হামলা দেখিনি। এই গ্রামে এমনকি সাত গ্রামে হিন্দু মুসলমানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাটিয়েছে যুগের পর যুগ। এবারই প্রথম এমন হল। আমাদের প্রতিমা ভেঙে দেয়া হল। এমন কেন হল? এই বলে বৃদ্ধ কাঁদছিলেন থর থর করে। তখন মাঠ ভর্তি মানুষ। পুরো গ্রামের নারী-পুরুষ এসে জড়ো হয়েছে মাঠে— মন্দিরের কাছে যেখানে তাদের প্রতিমাগুলো ভেঙে ফেলেছে সন্ত্রাসীরা। নির্যাতিত নারী-পুরুষ একে একে তাদের ওপর নির্যাতনের কাহিনী বর্ণনা করলেন।

ঢাকা-পিরোজপুর মহাসড়ক থেকে দীঘিরজান পুল ছাড়ালেই রাস্তাটি বাঁক নেয়। একটু এগুলেই দীঘিরজান বাজার। এই বাজার পর্যন্ত মটর গাড়ির সীমানা। এরপর তিন কিলোমিটার মাটির পথ হয় হেঁটে নয়তো ভ্যানে করে পাড়ি দিতে হয়। ভ্যানে যেতে যেতে মনে হচ্ছিল সবুজ বৃক্ষে মোড়ানো এ এক অন্য দিগন্ত। রাস্তার একদিকে ছোট একটি লম্বা জলাধার। স্থানীয় ভাষায় যার নাম 'জোলা'। ছোট শাখা খালও বলা যেতে পারে। ওই 'জোলায়' ঠেলা জাল দিয়ে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা মাছ ধরছে। মাছ বলতে কই-এর বাচ্চা, পুঁটি, টাকি আর মলা। রাস্তার অন্যদিকে দিগন্ত বিস্তৃত ধানের ক্ষেত। সবুজ আর হলুদ মিশেলে ধান ক্ষেতগুলো মাঝে মধ্যেই বাতাসের দুলুনিতে নেচে উঠছে। দু'একটি ক্ষেতের ধান কাটা হয়েছে। কাটা ফসলের ক্ষেত ন্যাড়া মাথার মত ছড়িয়ে আছে জলে পা ডুবিয়ে। সেই জন্য মাছের সন্ধানে বসে আছে সাদা বক। সবুজের মাঝে বকদের এই ধ্যানমগ্ন দৃশ্য দূর থেকে চোখে পড়ে। রাস্তার পাড় ঘেঁষেই শিশু, মেহগনি আর রেইনট্রির সারি। দু'এক জায়গায় ধান গাছের শরীর ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ পুরো পাতার হোগলা গাছ। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বড় বড় দীঘি। পুরো রাস্তাটা গাছের ছায়ায় ঢাকা। এমন একটি নিটোল, শান্ত রাস্তা ভাঙতে ভাঙতে আমার কেবল মনে হতে থাকে এই অনাবিল প্রকৃতির শান্ত নীড়ে মানুষ কী করে সাম্প্রদায়িক হতে পারে, কী করে সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীরা এখানে হামলা করে তারই প্রতিবেশীর ওপর।

সকালে এমন একটি শীতল ছবি মনে এঁকে যখন আমরা গ্রামের সেই বটতলায় পৌঁছাই তখন অন্য এক দৃশ্য। মাঠের এক কোণে একটি বটবৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে ছায়া বিস্তার করে। সামনে অনেকটা ফাঁকা, এক প্রান্তে দু'টি মন্দির অন্য প্রান্তে একটি। দুর্গা, কালী আর মা শীতলার মন্দির। গ্রামের সাধারণ মানুষ বললেন, বহু প্রাচীন এ মন্দির। এই প্রাচীন

মন্দিরগুলোর ভেতরের সবকটি প্রতিমাকেই ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। মন্দিরের ভেতর এখনও পড়ে আছে ক্ষত-বিক্ষত প্রতিমাগুলো। মধ্য বানিয়ারী গ্রামের নির্যাতিত অসহায় মানুষ যখন তাদের সেই বিভীষিকার কাহিনী আমাদের কাছে বর্ণনা করছিল তখন সেখানে এসে উপস্থিত জামাতে ইসলামীর স্থানীয় নেতা আবদুর রাজ্জাক। তিনি প্রথমে আমাদের কাছে পরিচয় দেন তিনি জামাতের মাটিভাঙ্গা ইউনিয়নের নেতা। কিন্তু ক্যামেরা অন করলে তিনি তার কথা ঘুরিয়ে বলেন তিনি জামাতের সমর্থক। অবশ্য এক পর্যায়ে তিনি স্বীকার করেছেন ওই ইউনিয়নের পাশের গ্রাম চালতাবাড়িতে জামাতের দায়িত্বে আছেন তিনি।

ওই জামাত নেতা গত নির্বাচনে সাঈদীর হয়ে কাজ করেছেন। তিনি এই গ্রাম এবং পুরো মাটিভাঙ্গা ইউনিয়নের সব খবর রাখেন। কে আওয়ামী লীগ করে, কারা নৌকায় ভোট দেয় সব তার মুখস্থ। আমরা যখন নির্যাতিত মানুষের সঙ্গে কথা বলি এই জামাত নেতা সুকৌশলে একটি টেপরেকর্ডার নিয়ে বসে যান সবার মাঝখানে। সবার বক্তব্য তিনি রেকর্ড করেন। তিনি ওখানে এসে এমনভাবে অবস্থান নেন যেন নির্যাতিতরা নির্ভয়ে তাদের কথা বলতে না পারে। আমরা ওই জামাত নেতারও একটি সাক্ষাতকার ধারণ করি— যেখানে তিনি বলেন, এই গ্রামে কোন সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস হয়নি। একটি দল ষড়যন্ত্র করে এসব করেছে। অথচ গ্রামের সবাই বলেছে এরই নেতৃত্বে গ্রামে সব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে।

গ্রামের এক তরুণ মনিরুজ্জামানকে জামাত ও বিএনপি'র সন্ত্রাসীরা ১৪ অক্টোবর অপহরণ করে নিয়ে যায়। ২২ অক্টোবর পর্যন্ত তাকে খুলনায় একটি ঘরে আটকে রেখে অবর্ণনীয় নির্যাতন চালানো হয়। মনির এখন পঙ্গু প্রায়। মনিরের অপরাধ তাদের পূর্ব পুরুষ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত পরিবারটি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এবারের নির্বাচনে নৌকার পক্ষে কাজ করার জন্য মনিরের বাবার কাছে সন্ত্রাসীরা পঞ্চাশ হাজার টাকা দাবি করে। সময় মত ওই টাকা না দিতে পারায় ১৪ অক্টোবর গ্রামের মধ্যেই মনিরকে বেদম প্রহার করা হয়। গ্রামের অন্যরা মনিরকে বাঁচাতে গেলে তাদের ওপরও আ□মণ করা হয়। গ্রামের দোকানপাট লুটপাট করা হয়— ভাঙ্গা হয় মন্দির। তারপর মনিরকে অপহরণ করা হয়। মনির আমাদের কাছে হামলাকারীদের নাম ধরে ধরে বলে, কারা ছিল ঐ দিন তাণ্ডবের সময়। হাবিবুর, লুৎফর, শমসের, মুজাহেদ বেলায়েত। এরা সবাই নির্বাচনে জামাতের সমর্থন করেছে বলে মনির জানায়।

ডা. দেবলাল ডাকুয়াকে ওরা জোর করে মুসলমান বানাতে চেয়েছিল

মধ্য বানিয়ারী গ্রামে সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটে মধ্যবয়সী একজন ডাক্তার দেব লাল ডাকুয়ার ওপর। নির্বাচনের ১০ দিন পর ১১ অক্টোবর সন্ধ্যায় তার ওপর চালানো হয় বর্বরতর নির্যাতন। সেই রাতের ঘটনার পর ডা. ডাকুয়া লজ্জায় অপমান আর ভয়ে ঘর থেকে বের হতে পারছেন না। স্বাভাবিক জীবন যাপনও করতে পারছেন না তিনি। অথচ কী গোছানো সংসার ছিল তার। স্ত্রী, এক ছেলে প্রতাপ ডাকুয়া— যে সম্প্রতি পুলিশে চাকরি নিয়েছে। মেয়ে মলিনার বিয়ে হয়ে গেছে। ডাক্তার ডাকুয়ার এ জীবনে আর বেশিকিছু চাওয়ার ছিল না। পরমযত্নে তিনি সেবা করছেন আর্তের। নিজ গ্রাম আর অন্য গ্রাম যেখান থেকেই ডাক আসতো তিনি ছুটে গেছেন। পুরো জীবন তিনি উৎসর্গ করেছিলেন মানব সেবায়। অথচ এবারের নির্বাচনে সব কেমন উলটপালট হয়ে গেল।

ঘটনার দিন সন্ধ্যায় তিনি দক্ষিণ বানিয়ারীতে রোগী দেখতে গিয়েছিলেন। দক্ষিণ বানিয়ারী বাজারে বিএনপি ও জামাতের একদল সন্ত্রাসী তাকে দাঁড় করিয়ে নির্যাতন শুরু করে। সন্ত্রাসীরা তাকে বলে শালা মালাউন, নৌকায় ভোট দিয়েছে, এবার মজা বোঝ। তারা এই বলে বে-ড নিয়ে

আসে। একজন ডা. ডাকুয়ার লুঙ্গি তুলে ধরতে উদ্ধত হয়। একজন বলে শালারে মুসলমান বানাবো। সন্ত্রাসীদের ওইসব আচরণে ভীষণ ভয় পেয়ে আর্তচিৎকার করতে থাকেন ডাক্তার ডাকুয়া। তার চিৎকারে বাজারের সব মানুষ ছুটে আসে। ডা. ডাকুয়া তার প্রাণ রক্ষার জন্য মুরুব্বিদের কাছে আবেদন করেন। মুরুব্বিরা বলে ওরা যা করছে তার বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই তাদের। বে-ডধারী সন্ত্রাসীরা ডাঃ ডাকুয়াকে জোর করে মুসলমান বানাবে। ভয়ে, শঙ্কায় এক পর্যায়ে প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন ডা. ডাকুয়া। গলা শুকিয়ে কাঠ। তিনি একটু পানি চাইলে তার মুখের সামনে তুলে ধরা হয় প্রস্রাবের বাটি। বলা হয়— শুয়রের বাচ্চা মালাউন পেশাব খা। প্রাণপণ চিৎকার করে প্রস্রাব খাওয়ার হাত থেকে রেহাই পান ডাক্তার ডাকুয়া। তিনি প্রাণ ভিক্ষা চান। সন্ত্রাসীরা তাকে প্রাণ ভিক্ষা দেয়। তবে শর্ত থাকে সাতদিনের মধ্যে ৫০,০০০ টাকা দিতে হবে। না দিতে পারলে তাকে হত্যা করা হবে বলে জানায় তারা। সাদা কাগজে সইও নেয়া হয়।

ওই দিনের ঘটনার পর হত বিহবল আর আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে গেছেন তিনি। এখন মানুষের উপস্থিতি দেখলেই আঁতকে উঠেন তিনি। এমন বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে সন্ত্রাসীরা তাকে এবং তার স্ত্রীকে প্রতিদিন হুমকি দিচ্ছে এই ঘটনা কাউকে জানালে তাদেরকে জানে মেরে ফেলা হবে।

ওই দিনের ঘটনা স্মরণ করতে গিয়ে বারবার কান্নায় ভেঙে পড়েছেন ডাক্তার ডাকুয়া। তিনি আমাদের কাছে জানতে চান তিনি এখন কি করবেন? এ লজ্জা তিনি রাখবেন কোথায়? তিনি বলেন, আমরা কি এ মাটির সন্তান নই? আমরা কি এদেশে থাকতে পারবো না? আর কত অপমান সইতে হবে আমাদের? আমরা কি এদেশ ছেড়ে চলে যাব?

ডাক্তার ডাকুয়া তার ওপর নির্যাতনের ঘটনা জানিয়ে মাটিভাঙা পুলিশ ফাঁড়িতে— নাজিরপুর থানায় মামলাও করেছেন। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। উল্টো সন্ত্রাসীরা প্রতিদিনই তার বাড়িতে এসে মৃত্যুর হুমকি দিচ্ছে। তার স্ত্রীকে গালি দিচ্ছে অশালীন ভাষায়। ডাক্তার ডাকুয়া বলেন, ওইদিন যারা আমার ওপর এমন অমানবিক নির্যাতন করেছে তারা বিএনপি ও জামাতের সমর্থক-কর্মী। লেয়াকত, হাবিবুর, মুজাহিদ, মজিদ ফকিরসহ আরও অনেকে ছিল ওইদিন। তিনি বললেন, তিনি সবাইকে চিনেছেন। নির্বাচনের পরে এরা দল বেঁধে এই গ্রামে ঘুরেছে বলে তিনি জানান। ওরা গ্রামে গ্রামে সন্ত্রাস করেছে, মন্দির ভেঙেছে, মনিরুজ্জামানকে অপহরণ করেছে।

এ অঞ্চলে এমন হামলা আর নির্যাতনের কারণ কী হতে পারে এ প্রশ্ন আমরা করেছিলাম মাটিভাঙা ডিগ্রি কলেজের অধ্যাপক রেজাউল করিমকে। তার বাড়ি পূর্ব বানিয়ারি গ্রামে। তিনি বললেন, এই নির্বাচনী এলাকায় চার দলীয় ঐক্যজোট প্রার্থী ছিলেন মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী। তিনি জামাত নেতা। অন্যদিকে নৌকার প্রার্থী ছিলেন সুধাংশু শেখর হালদার। সাঈদী তার নির্বাচনী প্রচারণায় বলেছে, 'এবারের নির্বাচন হিন্দু মুসলমানের লড়াই। হিন্দুকে ভোট দিলে সবাই কাফের হয়ে যাবে'। সাঈদী নির্বাচনে জিতেছেন। স্বভাবতই এখন হিন্দুদের ওপর নির্যাতন হচ্ছে।

তিনি বলেন, আমাদের এই ইউনিয়নে দীর্ঘকাল ধরে হিন্দু মুসলমান একত্রে বসবাস করেছে। ঐতিহ্যগতভাবেই একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল এ অঞ্চলে। এবারই সেটা নষ্ট করা হল। ১৯৭১ সালেও হিন্দুদের ওপর এমন নির্যাতন হয়নি। কোন প্রতিমা ভাঙা হয়নি। এই গ্রামে হিন্দু পরিবারের সংখ্যাই বেশি। এখানে এতই শান্তি আর সম্প্রীতি ছিল যে— এ অঞ্চল থেকে দেশত্যাগের সংখ্যা নেই বললেই চলে। অথচ ২০০১ সালের নির্বাচনের পর হিন্দুরা ভীষণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তারা দেশ ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছে প্রাণের ভয়ে।

আমরা বাঁচবো, এদেশ আমাদের

৭ নবেম্বর পড়ন্ত দুপুরে মধ্য বানিয়ারী গ্রামের একটি উঠানে বসে যখন আমরা ডা. ডাকুয়ার সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলাম পাশেই একটি কুকুর বার বার আর্তনাদ করে উঠছিল। মানুষের বেদনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল কুকুরটি। এই বেদনার মেঘ ঘেরা গ্রামটিতে একটি দৃশ্য আমাদের আলোর পথ দেখায়। যে উঠানে আমরা বসেছিলাম তার ওপর ঘরের বারান্দা। মাটিতে ঘেরা বারান্দার এক কোণায় একটি চকি পাতা। চকির ওপর পাতা হোগলার একটি পাটি। সবুজ হোগলার পাতা রোদে শুকিয়ে হলুদ বর্ণ হয়েছে। সেই হলুদ পত্রের ওপর নীল কালি দিয়ে কচি হাতে কে যেন লিখে রেখেছে, আমরা বাঁচবো, এদেশ আমাদের'।

তিন

ডেটলাইন ঃ সিরাজগঞ্জ
গণধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী পূর্ণিমা

২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনের ৭ দিন পরে বিএনপির ২৫/৩০ জন সন্ত্রাসী পালা করে ধর্ষণ করেছে সিরাজগঞ্জ জেলার উল-াপাড়া থানার পূর্ব দেলুয়া গ্রামের দশম শ্রেণীর ছাত্রী পূর্ণিমা রাণী শীলকে। ধর্ষণের জন্য অপহরণকালে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে মেয়েকে রক্ষা করতে গিয়ে তাদের বেদম প্রহারে প্রায় পঙ্গু হয়েছেন পূর্ণিমার মা বাসনা রাণী দাস। সন্ত্রাসীরা পিটিয়ে পঙ্গু করেছে বাসনার প্রৌঢ় স্বামী অনীল কুমার শীলকে। পিতার বাড়ি বেড়াতে আসা বিবাহিত মেয়ে গীতা রাণীও তাদের নির্যাতন থেকে রেহাই পায়নি।

৮ অক্টোবর ২০০১ রাতে অসহায় অনিল কুমার শীলদের গোটা পরিবারের ওপর নেমে এসেছিল এক নারকীয় নির্যাতন। সে নির্যাতনের কথাই ২০ অক্টোবর ঢাকার একটি হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বর্ণনা করলেন অনিল কুমার শীলের পরিবার। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অনিল কুমার শীল, তার স্ত্রী বাসনা রাণী শীল এবং সেই ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার কিশোরী পূর্ণিমা। সংবাদ সম্মেলনে পূর্ণিমা আর তার মার কান্না ছাড়া বলার কিছুই ছিল না। সাংবাদিকদের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়ে পূর্ণিমার মা বললেন, আমার সব গেছে। কি অপরাধ করেছি আমরা। আমার এই মেয়ের কি হবে? তিনি বললেন, তিনবার আত্মহত্যা করতে গেছে পূর্ণিমা। রাতে ঘুমাতে পারে না সে। পূর্ণিমা অঝোরধারায় কাঁদতে কাঁদতে সাংবাদিকদের বললেন, আমি নিরাপত্তা চাই, আমাকে আপনারা নিরাপত্তা দিন। আমার যারা সর্বনাশ করেছে আমি তাদের বিচার চাই। আমার মতো যেন এমন শিকার কোন মেয়ে না হয় আপনারা তাই দেখবেন।

এর আগের দিন লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবিরের নেতৃত্বে নির্মূল কমিটির একটি প্রতিনিধি দল সিরাজগঞ্জের উল-াপাড়ায় গিয়েছিলেন নির্যাতিত এই পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে। ৮ তারিখ রাতে এই পাশবিক ঘটনার পরে ৯ তারিখে পুরো সকাল পর্যন্ত গ্রামের ভেতরেই পুরো

পরিবারটিকে অবরুদ্ধ করে রাখে সন্ত্রাসীরা। ৯ তারিখ আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে পুরো পরিবার সর্বস্ব হারিয়ে এক কাপড়ে পালিয়ে আশ্রয় নেয় উল-াপাড়া সদরে এক আত্মীয়ের বাসায়। পরিবারের নির্যাতিতদের সঙ্গে যখন কথা বলা হয়, রেকর্ড করা হয় তাদের জবানবন্দি, তখন তাদের চোখে-মুখে ছিল বেদনার প্রগাঢ় কালিমা। নিঃস্ব-অসহায় একটি পরিবারের সবাই কেমন বিমূঢ় হয়ে গেছে। বাসনা রাণী কাপড় সরিয়ে তার আ□ান্ত হাতটি দেখালেন। অনিল কুমার দেখালেন তার ভাঙ্গা পায়ের ক্ষত। পরিবারের মেজ মেয়ে, সিঁথিতে ভরাট সিঁদুর। তিনি বললেন, কিভাবে তাকে প্রহার করে রক্তাক্ত করা হয়েছে।

তারা ওই রাতের যে বর্ণনা দেন তা সংক্ষেপে এমন ঃ নির্বাচনের ৭ দিন পর গত ৮ অক্টোবর ২৫/৩০ জনের একটি সন্ত্রাসীদল রাতের অন্ধকারে অনিল কুমার শীলের পরিবারের ওপর হামলা করে তাকে মারাত্মকভাবে আহত করে। তার ছোট মেয়ে পূর্ণিমা রাণী শীলকে সন্ত্রাসীরা অপহরণ করতে গেলে বাধা দিতে গিয়ে নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন অনিল কুমারের স্ত্রী বাসনা রাণী শীল। পিতার বাড়িতে আশ্রয় নেয়া মেজ মেয়ে গীতা রাণীকেও সন্ত্রাসীরা বেদম প্রহার করেছে। ওই রাতে পাশবিক অত্যাচারের শিকার হয় অনিল কুমার শীলের ছোট মেয়ে দশম শ্রেণীর ছাত্রী ১৫ বছর বয়সের পূর্ণিমা রাণী শীল। পরিবারের সবাইকে পিটিয়ে অজ্ঞান করে পূর্ণিমাকে তুলে নিয়ে যায় তারা। তারপর ২৫/৩০ জন নরপশু পালা করে তাকে ধর্ষণ করে। প্রায় দুঘন্টা পর পূর্ণিমাকে উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনার কথা কারো কাছে যেন না বলতে পারে সে জন্য পরের দিন ৯ অক্টোবর সকাল পর্যন্ত ওই পরিবারটিকে তাদের বাড়ির ভেতরেই অবরুদ্ধ করে রাখে সন্ত্রাসীরা। সন্ত্রাসী এবং তাদের অভিভাবকরা অনিল কুমারের ওপর নানাবিধ চাপ দিতে থাকে ঘটনাটি মিটিয়ে ফেলার জন্য। কিন্তু এরই মধ্যে ঘটনা জানাজানি হয়ে যায়। স্থানীয় সাংবাদিক ও আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সাংসদ মির্জা লতিফ উদ্যোগী হয়ে আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করান। স্থানীয় উল-াপাড়া থানার পুলিশ বাধ্য হয় একটি মামলা গ্রহণ করতে। কিন্তু থানা ধর্ষণের মামলা না নিয়ে একটি সাধারণ সন্ত্রাসী মামলা নেয়। এরপর একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সিরাজগঞ্জ জেলা শাখার আহ্বায়ক সাংবাদিক আমিনুল ইসলাম উদ্যোগী হয়ে পূর্ণিমাকে সিরাজগঞ্জ শহরে এনে সিভিল সার্জন অফিসে মেডিক্যাল চেকআপ করান। ডাক্তারী পরীক্ষায় ধর্ষণের যাবতীয় চিহ্ন পাওয়া গেছে। আমিনুল ইসলামের সহযোগিতায় ১৪ অক্টোবর পূর্ণিমা বাদী হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেছে। ১৬৪ ধারায় ম্যাজিস্ট্রেট পূর্ণিমার জবানবন্দি রেকর্ড করেছেন এবং অভিযুক্ত ১৫ জনকে গ্রেফতারের নির্দেশ নিয়েছেন। ২৫/৩০ জনের ভেতর ১৫ জনের নাম পূর্ণিমা ম্যাজিস্ট্রেটকে বলতে পেরেছে। এ পর্যন্ত আবদুর রউফ নামে একজন আসামিকে পুলিশ গ্রেফতার করতে পেরেছে।

এদিকে মামলা করার পর অসহায় এই পরিবারটির ওপর অবর্ণনীয় দুর্যোগ নেমে এসেছে। সর্বস্ব হারিয়ে তারা একবস্ত্রে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে সন্ত্রাসীদের হুমকির কারণে। দুবেলা-দুমুঠো অন্নের সংস্থান নেই, সন্ত্রাসীদের আ□মণে প্রায় পঙ্গু অনিল কুমার তার পুরো পরিবার নিয়ে এখন আশ্রয় নিয়েছেন উল-াপাড়া সদরে এক আত্মীয়ের বাসায়। এখানেও নিরাপদ নয় তার পরিবার। থানা থেকে পুলিশ আসে, স্থানীয় বিএনপির এমপি এম আকবর আলী লোক পাঠান যেন মামলাটি মীমাংসা করে ফেলা হয়। হুমকি দেয়া হচ্ছে মামলা প্রত্যাহার না করা হলে পরিণিতি খুব খারাপ হবে। সন্ত্রাসীরা দফায় দফায় লোক পাঠাচ্ছে যেন এ নিয়ে কেউ বাড়াবাড়ি না করে। পূর্ণিমা রাণী তার জবানবন্দিতে বলেছে তার নির্যাতনকারীদের কয়েকজনকে সে চিনেছে। এরা সবাই বিএনপির কর্মী। ২০ অক্টোবর নির্যাতিত পূর্ণিমা রাণী শীলসহ অন্যান্যকে সংবাদ

সম্মেলনে হাজির করা হয় ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য। সংবাদ সম্মেলনে এই অসহায় পরিবারটির পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান জানানো হয়। নির্মূল কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় পূর্ণিমার ভরণপোষণ ও পড়াশোনার ব্যয় নির্বাহের। পূর্ণিমার হাতে অগ্রিম ১০,০০০ টাকা তুলে দেন নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় নেত্রী শহীদ জায়া শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী। ফারিয়া লারা ফাউন্ডেশনের পক্ষে শিল্পী এমদাদ হোসেন দেন ১০,০০০ টাকা। ইঞ্জিনিয়ার সাধন দাস পূর্ণিমার হাতে ৫,০০০ টাকা তুলে দিয়ে বলেন, তুমি আমার মা। এবার আমি দুর্গা মায়ের পূজা করবো না। আমি তোমার পূজা করবো।

চার

ঘোষপাড়া আর বালে-াপাড়ার আতংকিত সংখ্যালঘুরা বললেন এমন সন্ত্রাস কখনও দেখিনি

লাহিড়ীমোহনপুর থানার আগমোহনপুর গ্রামের ঘোষপাড়ার সাগর রানী ঘোষ বললেন, আমরা এখানে কীভাবে থাকবো? সন্ত্রাসীরা আমাদের যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। নিয়ে যাচ্ছে বউদের। আমরা এতো অত্যাচার কীভাবে সইবো? তিনি বললেন, ৫ বছর শান্তিতে ছিলাম, এখনতো টিকে থাকাই দায়। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বললেন, মারলে একেবারে মেরে ফেলেন— তাও ভালো। এ অপমান সহ্য হয় না। আমার এক মেয়ে আইএ পরীক্ষা দেবে, একজন দেবে ম্যাট্রিক। কী করে ওদের পড়াবো? স্কুল কলেজে পাঠাতে পারি না সন্ত্রাসীদের ভয়ে।

সিরাজগঞ্জ সদর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরত্বের গ্রাম আগমোহনপুর বালে-াপাড়াসহ অন্যান্য হিন্দু প্রধান গ্রাগুলোতে নেমে এসেছে এক অবর্ণনীয় পরিস্থিতি। চারদিকে বর্ষার পানিবন্দি গ্রাম বালে-াপাড়া আর আগমোহনপুরের কোন হিন্দু এবার পূজা করবে না। তারা পূজা করতে পারবে না। সাম্প্রদায়িক নির্যাতন আর সন্ত্রাসের পাশাপাশি ওই গ্রামগুলোতে শুরু হয়েছে সবকিছু লুটপাট করে নেয়ার সর্বগ্রাসী কাণ্ড। ১৮ অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাতে ট্রলারে করে এসে সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে সব লুটে নিয়ে গেছে আগমোহনপুর গ্রামের ঘোষপাড়ার। ওই পাড়ার ঠাকুর চিত্ত রঞ্জন ঘোষ নির্মূল কমিটির প্রতিনিধিদের বলেন, রাতে দরজা ভেঙে সাতআটজন করে ঢুকে। তারা সীমার চোখ বেঁধে ফেলে। বলে টিভি দে, টাকা দে। আমরা এই পাড়ার সব ঘর মিলে পূজা করি। সেই পূজার ১৫ হাজার টাকা তারা লুট করে নিয়ে গেছে। ঘটনার পরের দিন ১৯ অক্টোবর অপরাহ্নে আমাদের ট্রলার যখন ঘোষপাড়ার ঘাটে নোঙর করে তখন পুরো পাড়ার আতঙ্কিত মানুষ এসে ভিড় করে আমাদের সামনে প্রতিমুহূর্তে তারা শঙ্কা করছে নতুন নতুন বিপদের। ঘোষপাড়ার এক প্রান্তে পড়ে আছে অর্ধনির্মিত প্রতিমা। গায়ে রঙের আঁচড় দেয়া হয়নি। ঘোষপাড়ার নারী পুরুষ একে একে বললেন, এবার তারা পূজা করবেন না। ওই পাড়ার জয়ন্তী রাণী দাস বললেন, সন্ত্রাসীরা আমার ঘরে ঢুকে আমার বুকে ছুরি ধরে বলে যা আছে সব দিয়ে দে। তিনি বললেন, যারা এসেছিল সবার মুখ ঢাকা। তারা যাবার সময় হুমকি দিয়ে বলেছে, এই ঘটনা কাউকে না জানাতে। চিত্ত রঞ্জন ঘোষের স্ত্রী সন্ধ্যারাণী ঘোষ বললেন, ওরা

আমার বুকের কাছে পিস্তল ধরলো। আমার কানের দুটি পাশা ছিনিয়ে নিল। ওদের সবার মুখ বাঁধা ছিল, খালি চোখ দুটো খোলা।

ঘোষপাড়ার ওই রাতে সন্ত্রাসীরা নগদ ৫০ হাজার টাকা ও ৮ ভরি স্বর্ণালংকার নিয়ে গেছে। আরো নিয়েছে ঘরের মূল্যবান সব সামগ্রী। নগদ টাকার মধ্যে ঘোষপাড়ার সমিতির টাকা ছিল ৪০ হাজার।

স্কুল শিক্ষিকা রত্নারাণী চ□বর্তী বললেন, পূজার সব টাকা নিয়ে গেছে ওরা, আমরা কিভাবে পূজা করবো? সরকার বলছে, পূজা করতে কিন্তু আমরা মা বোনেরা মণ্ডপে দাঁড়াবো কিভাবে? ও পাড়ার বৌঝিদের পরার কাপড় পর্যন্ত নিয়ে গেছে। তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, এতো বয়স হলো, আমরা এমন সন্ত্রাস দেখি নাই।

তিনি বলেন, মেয়েরা বের হতে পারছে না। তারা প্রাইভেট পড়া বাদ দিয়েছে। তিনি বললেন, '৭১-এর মতো ঘটনা ঘটছে। প্রতিদিন অন্তত একটি করে মামলা দেয়া হচ্ছে হিন্দুদের নামে। আর চাঁদা চাওয়া হচ্ছে হিন্দুদের ঘরে ঘরে। বৃদ্ধ বিধবা গীতা রাণী ঘোষ বলেন, পূজার সব কিছু নিয়ে গেছে ওরা। এখন আর আমি পূজাই করবো না।

নিঃস্ব জীতেন্দ্র নাথ ঘোষ করুণ আর্তি প্রকাশ করলেন এভাবে মা বোনের ইজ্জত যদি না থাকে আমরা পূজা করবো কীভাবে। এখন আমাদের জীবন নিয়ে টানাটানি পূজার মণ্ডপ সাজাবো কি করে। তারা বলেছে, শালা মালাউনরা নৌকায় ভোট দিয়েছ, এখন দৌড়াও।

বিধবা বৃদ্ধ নীহার রাণী ঘোষ বলেন, ওরা আমাদের এদেশে থাকতে দিতে চায় না। ওরা চায় আমরা সব কিছু ছেড়ে চলে যাই। আমাদের ছেলে মেয়েরা হাট-বাজারে যেতে পারে না। ওরা অত্যাচার করে। তিনি করুণ কণ্ঠে এই প্রতিবেদককে প্রশ্ন করেন, এতো অত্যাচার করলে কীভাবে এদেশে থাকবো। ওরা দল বেঁধে এলো। আমি বললাম, আমাগো এদেশে থাকতে দিবা না? না দিলে একেবারে মেরে ফেলো, আমরা শান্তি পাই।

সিরাজগঞ্জের একজন সাংবাদিক, একজন ব্যবসায়ী নির্মূল কমিটির নেতৃবৃন্দকে জানান, বস্তুত পুরো সিরাজগঞ্জ জেলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর চালানো হচ্ছে নীরব সন্ত্রাস। ব্যবসায়ীদের কাছে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করা হচ্ছে। তাদের হুমকি দেয়া হচ্ছে সাড়ম্বরে পূজা করার জন্য। বলা হচ্ছে, পূজার আলোকসজ্জা না করলে তোদের দেশছাড়া করা হবে। সিরাজগঞ্জ শহরের প্রত্যন্ত গ্রামের হিন্দু পরিবারগুলোকে অবরুদ্ধ করে সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে বলে ওই সাংবাদিক জানান।

পাঁচ

ডেটলাইন ঃ বাগেরহাট

ঠাকুরবাড়ির স্বামীহারা ধর্ষিতারা চায় নরপশুদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি

সরস্বতী ভট্টাচার্যের কান্না থামছে না। ডুকরে ডুকরে, বিলাপ করে কেঁদে উঠছেন আশি পেরুনো এই বৃদ্ধা। কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, 'ওরা কোপাইয়া কোপাইয়া আমার তপনকে

মারিছে। আমি এগো এখন কি কইরে বাঁচাবো?' বুক চাপড়ে তিনি বলতে থাকেন— 'আমি শান্তি চাই, আমার ছেলে হত্যার বিচার চাই। আর যেন কোন মায়ের এমন না হয়।'

বাগেরহাটের কোমরপুর গ্রামের ঠাকুরবাড়ির সেই নারকীয় ঘটনা ঘটে ৮ মার্চ ২০০৩ শনিবার মধ্যরাতে। আমরা যখন ২৯ মার্চ (২০০৩) শনিবার সকালে ওই বাড়িতে যাই তখনো শোকের ছায়া আচ্ছন্ন করে রেখেছে পুরো বাড়িটি। সেই রাতে নির্যাতিত ওই বাড়ির দুই বউ হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে এলেও এখনো উঠে বসতে পারছেন না বিছানা থেকে। নিহত তপন ভট্টাচার্যের ধর্ষিতা স্ত্রী কথাই বলতে পারছেন না। সব হারিয়ে আজ নির্বাক তিনি। অতিকষ্টে দু'একটা কথা বলেন।

লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবিরের নেতৃত্বে ২৯ মার্চ ২০০৩ একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির একটি প্রতিনিধি দল ওই দিন কোমরপুর ঠাকুর বাড়িতে যান। প্রতিনিধি দলের সদস্য শহীদজায়া শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী যখন নিহত তপন ভট্টাচার্যের বাকরুদ্ধ স্ত্রী অনিমাকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছিলেন যে, তিনিও তার মত বয়সে ১৯৭১ সালে বিধবা হয়েছিলেন— তখন অসহায়ের মত অনিমা তার মুখের দিকে চেয়ে আর্তকণ্ঠে বলেছিলেন, 'আপনার তো ছেলেমেয়ে আছে, আমার তো মা বলারও কেই নেই। মা নেই, বাবা নেই, স্বামীকেও ওরা মেরে ফেললো।'

তিন বছর হয় তপনের সঙ্গে বিয়ে হয় অনিমার। গত বছর একটি মৃত কন্যা সন্তান হয়েছিল তাদের। এবারও একটি মৃত সন্তান জন্ম দেন তিনি। সিজারিয়ান সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে অনেকটা কাটাছেঁড়া করেছে ডাক্তার। যমে আর মানুষে টানাটানির পর ৯ দিন হাসপাতালে থেকে শু▯বার ঘটনার আগের দিন অনিমা ফিরেছেন বাড়িতে। আর পরের দিন রাতেই ঘটল এই নারকীয় ঘটনা। চোখের সামনে স্বামীকে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তার ওপর চালানো হয়েছে পাশবিক নির্যাতন।

গায়ে শক্তি নেই— এখনো ধরে ধরে বিছানা থেকে উঠাতে হয় অনিমাকে। প্রায় উন্মাদ অনিমা মাঝে মধ্যেই কেমন অস্থির হয়ে যান। তারপর থেমে থেমে আস্তে আস্তে বলেন, 'আমার তো ওঠার শক্তি ছিল না। ওরা কোপায়ে কোপায়ে আমার স্বামীকে মারল। স্বামী হারানোর যে কী জ্বালা যার না গেছে সে বুঝবে না। কোপায়ে কোপায়ে যদি অর্ধেক মেরেও রেখে যেত তাও তো তাকে নাড়াচাড়া করে দেখতে পারতাম। ওরা আমার ওপর অত্যাচার করল। আমি এখন যাব কোথায়— কি করে, কেমন করে বাঁচব? অনিমা বললেন, ওরা আমার শাড়ি ছিড়ে আমার দেবর স্বপনকে বেঁধেছে। আমাকে অসভ্য সব গালিগালাজ করেছে।

অনিমা আকুতি জানালেন তার জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিতে যা নিয়ে তিনি সারাজীবন বাঁচতে পারেন। আর তার জীবনের এই সর্বনাশের জন্য দোষীদের এই শাস্তি চাইলেন— 'ওদের কোপায়ে কোপায়ে তার ভেতর লবণ দিয়ে নদীতে ফালায়ে দিন।'

সেই রাতে আরেক নির্যাতিত নারী শিউলি ভট্টাচার্য। নিহত তপনের ছোট ভাই স্বপনের স্ত্রী। শিউলির সঙ্গে নির্যাতনের শিকার হয়েছে তার মা— যিনি জামাই বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। সেই রাতের ঘটনার পর লজ্জায়, অপমানে আর আতঙ্কে যেন মরে গেছেন শিউলি। ১৪ দিন হাসপাতালে থাকার পর বাড়িতে এসেও শয্যাশায়ী। তার কোলের কাছে শুয়ে আছে সাড়ে ৪ বছরের ছেলে। শিউলি বার বার কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন— 'আমাদের তো সবই গেছে ওদের বিচার চাই, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'

শিউলি বললেন, ওরা ১০/১২ জন ঘরে ঢুকেছিল। কেন এমন অত্যাচার করল— এ প্রশ্নের জবাবে শিউলি বলল, ওরা ইলেকশনের কথা বলেছে। শিউলি বললেন, আমি ভোটার হইনি।

এই বাড়ির বড় বউ শিখা ভট্টাচার্য— নিরঞ্জন ভট্টাচার্যের স্ত্রী। তিনি কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, ওরা আমার স্বামীকে মারতে এসেছিল। যে কোন সময় ওরা আমার স্বামীকে মেরে ফেলতে পারে। তিনি বলেন, '২০০১ সালের নির্বাচনের পর আমরা সাত মাস পালিয়ে ছিলাম ওদের অত্যাচারে। বিএনপির স্থানীয় চেয়ারম্যান শেখ নূর মোহাম্মদকে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে সাতমাস পর বাড়িতে গিয়েছি আমরা। মাস তিনেক আগে রাতে ঘরের বাইরে বের হলে মুখোশপরা ৩/৪ যুবক হঠাৎ আমার মুখে গামছা চেপে ধরে। এ সময় আমি চিৎকার দিলে ওই দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। ওরা আমাদের বাঁচতে দেবে না। বাড়িতে পুলিশ প্রহরা আছে তারপরও ওরা লাইট মারে। কাঁদতে কাঁদতে শিখা বলেন, কে ওদেরকে টাকা দিল আমার স্বামীর মাথা নেয়ার জন্য তাকে ধরার চেষ্টা করেন আপনারা।' ওই রাতের ঘটনার পর নূর মোহাম্মদের ভাগনের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে লুটের মালামাল। কিন্তু তাকে গ্রেফতার করেনি পুলিশ রহস্যজনক কারণে। ওই রাতে মৃত্যুর হাত থেকে কোনভাবে বেঁচে গেছেন স্বপন ভট্টাচার্য। পুলিশ কনস্টেবল স্বপনকেও মেরে ফেলত ওরা। স্বপনের বৃদ্ধা মায়ের আজাহারিতে তাকে প্রাণে মারেনি।

স্বপন সেই ভয়াল রাতের কথা আমাদের কাছে বর্ণনা করার সময় বলছিলেন, আমার এই জীবনে এমন অত্যাচার কখনো দেখিনি। আমরা সংখ্যালঘু বলেই ওরা এই নির্যাতন করল। ওরা আমার ভাইকে মেরেছে। মারতে এসেছিল বড় ভাইকে। তিনি সে রাতে বাড়িতে ছিলেন না। কিন্তু ওরা তাকে রেহাই দেবে না। এখন না হয় পুলিশ পাহারা আছে। কিন্তু এটা ক'দিন। পুলিশ পাহারা থাকার পরও রাতে ওরা বাড়িতে লাইট মারে। আশপাশে ওরা ঘোরে।

স্বপন বললেন, আমার চোখের সামনে ওরা আমার ভাইকে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করল। ঠাকুর ঘরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করল নারীদের ওপর। ওরা আমার ভাইঝিকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেতে চাইছিল। সে সময় ওরা বলছিল তোর বাপরে মার্ডার করতে আইছিলাম— তারে পেলাম না, তোরে নিয়ে যাব। আমার বৃদ্ধা মা কান্নাকাটি করে ওদের হাতে পায়ে ধরে মেয়েটাকে রক্ষা করেছে।

স্বপন বললেন, ওইদিন আনিস এসেছিল, দাড়িওয়ালা ইদ্রিস ছিল, আরো অনেকেই ছিল। আনিস আর ইদ্রিস তো সব স্বীকার করেছেন। তবে মূল আসামি এখনো গ্রেফতার হয়নি। স্বপন কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমরা যেন থাকতে পারি— সংখ্যালঘুদের ওপর যেন এই ধরনের নির্যাতন আর না হয় তার ব্যবস্থা করে দেন।

বাগেরহাট সদর উপজেলার যাত্রাপুর ইউনিয়নের কোমরপুর গ্রামের ঠাকুর বাড়িটি এখন শোকে মোড়ানো এক ধ্বংসপুরী যেন। খুলনা শহর থেকে রূপসা নদী পেরিয়ে খুলনা-বাগেরহাট বা রূপসা বাগেরহাট নতুন সড়ক। সেই সড়কে চলতে চলতে নোয়াপাড়া থেকে মোড় নিতে হয় বামে। তারপর রূপসা-বাগেরহাট মৃত রেল সড়কের গা ঘেঁষে ঘেঁষে যেতে হয় কোমরপুর। খুলনা থেকে ৪৬ কিলোমিটার। গ্রামের মাঝ দিয়েই বয়ে গেছে সরু মসৃণ পিচঢালা পথ। সেই পিচঢালা রাস্তা থেকে সরু লাগোয়া রাস্তা গিয়ে মিশেছে ঠাকুরবাড়ির উঠানে। বাড়ির পথে উঁচু একটি গাছে টাঙানো কালো কাপড় শোকের চিহ্ন হয়ে বাতাসে দোল খাচ্ছে বার বার।

শোকে মোড়ানো এই ঠাকুর বাড়িতে ২০ মার্চ গিয়েছিলেন জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা। তিনি সেখানে খুন হওয়া তপনের মা এবং ভাই স্বপন ও নিরঞ্জন ভট্টাচার্যকে সান্ত্বনা দেন। এরপর তিনি সেখানকার প্রাইমারি স্কুল মাঠে এক প্রতিবাদ সভায় বলেন, একাত্তরে যেভাবে বাংলার মা-বোনদের ওপর পাকহানাদাররা অত্যাচার, নির্যাতন চালিয়েছে, খালেদা-নিজামীর অনুসারীরাও ঠিক একই কায়দায় মা-বোনদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালাচ্ছে। ওইদিন ঢাকা ফেরার পথে শেখ হাসিনা খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই বাড়িতে নির্যাতিত দুই নারীকে দেখতে যান।

ঘটনার পর থেকে সময়ে অসময়ে প্রতিদিনই অসংখ্য মানুষ ভিড় করছে ওই বাড়িতে। পুলিশ পাহারাও রয়েছে কিন্তু আতঙ্ক কাটেনি সংখ্যালঘু ওই গ্রামের মানুষদের।

সর্বশেষ পরিস্থিতি

নির্মূল কমিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলার সময় স্বপন ভট্টাচার্য বলেছেন, তাদের নিরাপত্তাহীনতার কথা। সে সঙ্গে উলে-খ করেছেন নির্যাতিতদের চিকিৎসা ব্যয় মেটানোর মত টাকাও এখন তাদের হাতে নেই। চিকিৎসা ব্যয়, ওষুধ আর পথ্য যোগাতে পারছে না তারা। নির্মূল কমিটির পক্ষ থেকে শাহরিয়ার কবির দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারটিকে তাৎক্ষণিকভাবে ৫ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য দেন। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির পক্ষ থেকে এদের চিকিৎসা ও আইনি সহায়তা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। কোমরপুর থেকে ফিরে ওই দিন ২৯ মার্চ দুপুরে খুলনা প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে শাহরিয়ার কবির বলেন, নৃশংসতম হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাটের ঘটনায় জড়িতদের রক্ষা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যেখানে ঘটনার সঙ্গে জড়িত কয়েক নরপশু ধরা পড়েছে, তারা পুলিশ ও আদালতের কাছে তাদের পাশবিক আচরণের কথা স্বীকার করেছে সেখানে অপরাধী শনাক্ত করতে টিআই প্যারেডের ধুয়া তোলা হয়েছে। টিআই প্যারেড সম্পন্ন হয়েছে ১ এপ্রিল মঙ্গলবার। ওই নজিরবিহীন পৈশাচিক ঘটনার সঙ্গে সরাসরি জড়িত ৩ আসামীর শনাক্ত মহড়া অনুষ্ঠিত হয় বাগেরহাট কারাগারে। ম্যাজিস্ট্রেট হোসেন আলীর উপস্থিতিতে নিহত তপন ভট্টাচার্যের স্ত্রী ও শাশুড়িসহ স্বপন ভট্টাচার্য আসামীদের শনাক্ত করেন। এ সময় জেলে বন্দী ও কয়েদিদের মধ্যে ৩৩ জনকে একত্রে তাদের সামনে হাজির করা হয়। এর মধ্যে স্বপনের স্ত্রী যুবদল ক্যাডার ইদ্রিস শেখকে, নিহত তপনের স্ত্রী আনিস হাওলাদারকে এবং তাঁর শাশুড়ি কালু সরদারকে তাদের ধর্ষক হিসেবে শনাক্ত করেন।

২০০১ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাগেরহাট জেলায় ব্যাপক হারে যে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন শুরু হয় তা সরকার গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেনি কখনো। উল্টো তারা এটা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেছে। সম্প্রতি প্রথম আলো পত্রিকায় ওই জেলার পরিস্থিতি নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদন ছাপা হয়। ৩০ মার্চ প্রকাশিত প্রতিবেদনে উলে-খ করা হয়েছে, '২০০১ সালের অক্টোবর থেকে ২০০২ এর আগস্ট পর্যন্ত শুধু পুলিশের হিসাবেই বাগেরহাট জেলায় নারী নির্যাতনের ২০১টি ঘটনা ঘটেছে।

নারী নেত্রী, সাংস্কৃতিক কর্মী, আইনজীবী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, পুলিশ প্রশাসন, সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রতি রাতেই জেলার কোথাও কোথাও নারীরা নির্যাতিত হচ্ছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব নির্যাতনের সঙ্গে সরকার দল বিএনপি'র নেতা-কর্মীরা জড়িত বলে তারা অভিযোগ করেছেন।

ঘটনার পেছনের ঘটনা

বাগেরহাটের এই গ্রামটি হিন্দু অধ্যুষিত। প্রাচীনকাল থেকে হিন্দু মুসলমান বসবাস করে এসেছে পরম শান্তিতে। যুগের পর যুগ কোন সাম্প্রদায়িক, অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি এখানে। কিন্তু ২০০১ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জোট সন্ত্রাসীরা বাগেরহাটের অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানেও সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব শুরু করে। কোমরপুরের ঠাকুরবাড়ির বড় ছেলে নিরঞ্জন ভট্টাচার্যকে সবাই মান্য করে। পুরো গ্রামের আপদে-বিপদে তিনি এগিয়ে যান। তিনি আওয়ামী লীগের সঙ্গেও সম্পৃক্ত। ঠাকুর বাড়ির পাশের বাড়ি সুনীল কুমার ব্যানার্জীর বিধবা স্ত্রী কমলা ব্যানার্জীর বাড়ি এবং বাড়ির চারপাশে বিস্তর সম্পত্তি। কমলা ব্যানার্জীর কিশোর পুত্র গোপালকে হত্যা করা হয় '৯৬ সালে। একমাত্র সন্তান হারিয়ে কমলার গোটা জগৎ অন্ধকার হয়ে গেছে। তিনি জানালেন দু মুঠো অন্নের জন্য তাঁকে এখন অপরের বাড়িতে হাত পাততে হয়। শাহরিয়ার

কবির তাঁকে ৩ হাজার টাকা দিয়েছেন।

গোপালের মা কমলা নিরঞ্জনের পিসি। গোপাল হত্যা মামলার এক নম্বর আসামী হচ্ছে— হারুণ মেম্বার। নিরঞ্জন এই মামলার প্রধান সাক্ষী। সেই থেকে হারুন মেম্বারের রাগ নিরঞ্জনের ওপর। ওই রাতের ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া হারুণ মেম্বার নূর মোহাম্মদ চেয়ারম্যানের ডানহাত বলে জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা।

ছয়
ডেটলাইন ঃ চাটমোহর
'ওরা আমাদের এ দেশে থাকতে দেবে না'

৬৫ বছরের বৃদ্ধা আমোদিনী বৈদ্য বিলাপ করে কাঁদছিলেন। তার চোখের পানি নেমে আসছিল বাঁধভাঙা নদীর মত। তিনি শোকের কান্না কাঁদছেন আর বর্ণনা করছেন কীভাবে তাদের ওপর হামলা করা হয়েছে। তিনি চোখের ধারা আঁচলে মুছতে মুছতে বললেন, 'ওরা আমাদের এদেশে থাকতে দেবে না। তার এই কান্না সেদিন পাবনা জেলার চাটমোহর থানার ফৈলজানা গ্রামের সকলের বিবেককে আহত করেছে। আমোদিনী বৈদ্য যখন তাদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা বলছিলেন তখন উঠানে দাঁড়ানো অন্যান্য নারীরা চোখের পানি সংবরণ করতে পারেননি। গত ১ অক্টোবরের নির্বাচন এদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর ভয়ঙ্কর এক বিপর্যয় ডেকে এনেছে যা আজ পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলছে। প্রতিদিনই দেশের কোথাও না কোথাও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে।

৩ মার্চ ২০০২ একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির একটি প্রতিনিধিদল পাবনার চাটমোহরের ফৈলজানা গ্রামে যান নির্যাতিত এই খ্রিস্টান পরিবারটির পরিস্থিতি সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার জন্য। নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি লেখক, সাংবাদিক শাহরিয়ার কবিরের নেতৃত্বে এই প্রতিনিধি দলটি যখন ওই গ্রামে পৌঁছে তখন দুপুর গড়িয়েছে। চাটমোহর পাবনা জেলার প্রান্ত থানা। এরপরেই নাটোর জেলা। এবার চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন যে কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তারই একটি জ্বলন্ত উদাহরণ চাটমোহরের ফৈলজানা নামক খ্রিস্টান অধ্যুষিত এই প্রত্যন্ত গ্রামটি।

পাবনা সদর থেকে চাটমোহর থানা সদর পর্যন্ত পৌঁছাতে ঝক্কির আর শেষ থাকে না রাস্তার ভাঙ্গাদশার জন্য। চাটমোহর থেকে ফৈলজানা গ্রাম টানা ১৮ কিলোমিটার। তার অর্ধেক রাস্তা সরু পিছ ঢালাপথ আর অর্ধেক মেঠো। এই গ্রামের সুবল মণ্ডলের বাড়িতে হামলা করে আহত করেছে তাকে, তার স্ত্রী পরিমণ্ডল আর ৭৫ বছরের বৃদ্ধ সুবল মণ্ডলের শ্বশুর পৌল বৈদ্যকে।

সুবল মণ্ডলের বাড়িতে এটাই প্রথম হামলা। তার আগে তারই আত্মীয় তার ভায়রা সুশান্তের বাড়িতে হামলা করা হয়েছে ৪ দফায়। সুশান্তের বাড়িতে সর্বশেষ হামলা করা হয়েছে ২৬ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার রাতে। ফৈলজানা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা শাহজাহান আলী ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের হামলার শিকার হন সুশান্ত ও তার মা সহ বেশ

কয়েকজন। পরের দিন সকালে ২৭ তারিখ বুধবার শাজাহান চেয়ারম্যান দলবল নিয়ে আক্রমণ করে সুবল মণ্ডলের বাড়িতে। বাড়ির তিনটি ঘরের যাবতীয় আসবাব-মূল্যবান জিনিসপত্র সব তছনছ করে ফেলে। মারাত্মকভাবে আহত করে তার বৃদ্ধ শ্বশুর ও স্ত্রীকে। সেই দিনের আঘাত নিয়ে সুবল মণ্ডল ও তার শ্বশুর এখন ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই বৃদ্ধের দুটি হাতই ভেঙে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। ডাক্তাররা জানিয়েছেন হাতের ফোলা কমলে দু'হাতেরই অপারেশন করা হবে।

নির্মূল কমিটির প্রতিনিধির সঙ্গে এই প্রতিবেদক যখন ফৈলজানা গ্রামের খ্রিস্টান পল্লীতে পৌঁছেন তখন সেখানে ঢাকার প্রায় সবগুলো দৈনিকের স্থানীয় প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। সন্ত্রাসীরা সুবল মণ্ডলের ঘরের কোন কিছুই আস্ত রাখেনি। মাটি থেকে শুরু করে সিলিং ফ্যান, টেলিভিশন, সিরামিকের তৈজসপত্র, আচারের বৈয়াম সব ভেঙে তছনছ করেছে। তাদের আক্রোশ থেকে মাদার তেরেসা আর যীশুর ছবিও রেহাই পায়নি। তিনটি ঘরে সেদিন পর্যন্ত ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল সব ধ্বংসযজ্ঞের চিহ্ন। সন্ত্রাসীরা গোয়ালঘরে গিয়ে নিরীহ গরুগুলোকেও আঘাত করে এবং তাদের বাঁধন খুলে দেয়। সুবল মণ্ডলকে শারীরিক এবং আর্থিকভাবে পঙ্গু করে দেয়ার সব রকম আয়োজনই তারা সেদিন করেছিল।

সেদিনের সে ভয়াবহ ঘটনার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে সুবল মণ্ডলের স্ত্রী পরি মণ্ডল আমাদের জানান, 'মঙ্গলবার রাতে আমার বোনের জামাই সুশান্ত'র বাড়িতে সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। এটা জানার জন্য আমার স্বামী বুধবার সকালে ওখানে যায়। সে বাড়ি থেকে ফেরার পথে ছয়-সাতজনের একটি সন্ত্রাসী দল রাস্তায় আমার স্বামীর ওপর হামলা করে। আমি শুনতে পাই যে তার হাত ভেঙে দিয়েছে। এই খবর পেয়ে আমি ঘর থেকে বের হই রাস্তায় যাওয়ার উদ্দেশে। ঠিক এ সময়ে ৪০/৪৫ জনের একটি দল আমার বাড়িতে এসে হামলা করে।' পরি মণ্ডল বলেন, কী নারকীয় তাণ্ডব তারা চালায়। তারা যখন একে একে ঘরের সব জিনিসপত্র ভাঙচুর করে লুটে নেয় মুখে বলতে থাকে 'শালা সুবল— তুমি আওয়ামী লীগ কর। তোমার আওয়ামী লীগ বাইর করতাছি।'

পরি মণ্ডল বলেন, সকাল সাড়ে নটার সময় ওই সন্ত্রাসী দলটি একে একে সব তছনছ করে, তাদের দু'জন আমার ঘরে ঢুকে পড়ে। আর ভাঙচুর করতে থাকে। আমি এই ঘটনায় প্রায় হতবাক হয়ে যাই। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ওদের বলি, 'ভাই তোমরা এগুলো করছো কেন— তোমাদের কি মা বোন নেই।' উত্তরে ওরা আমাকে একটি অশ্লীল বকা দেয়— বলে, 'তুই ঘর থেকে বের হয়ে যা নইলে তোকে শেষ করে দেবো।' ওদের ভয়ে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। ওরা কয়েকজন করে ভাগ হয়ে একেক ঘরে হামলা চালায়। কয়েকজন বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। আমিও বাইরে দাঁড়িয়ে প্রভুর নাম স্মরণ করতে থাকি। এমন সময় ঘটনার কথা জানতে পেরে আমার বাবা এদিকে ছুটে আসতে থাকে। সন্ত্রাসীরা আমার বৃদ্ধ বাবাকে রাস্তার মধ্যে ফেলেই বেদম মারধর করে। আমি বাবাকে বাঁচাতে গেলে আমাকেও মারধর করে। আমার পিঠে মারাত্মক যখম। ওরা আমার বাবার হাতদুটো ভেঙে দিয়েছে।

এইটুকু বলে পরি মণ্ডল কান্নায় ভেঙে পড়েন। বিলাপ করতে করতে তিনি বলেন, ওরা আমাকে মেরেছে, আমাদের সবকিছু ধ্বংস করেছে তাতে কোন কষ্ট নেই। কষ্ট শুধু আমার বৃদ্ধ বাবাকে ওরা পঙ্গু করে দিল। ঈশ্বর ওদের বিচার করবেন।

পরি মণ্ডল জানালেন, তার বাবাকে যারা পঙ্গু করেছে— তাদের সবাইকে তিনি চেনেন। তারা আশপাশের গ্রামেরই। পাশের গ্রাম উত্তর সাইপাই এর আমজাদ পরি মণ্ডলের গলার চেইন ছিনিয়ে নেয় এবং সে-ই প্রথম তার বাবা পৌল বৈদ্যকে আঘাত করে এবং পরে অন্যরা বেদম প্রহার শুরু করে।

পরি মণ্ডল এই ঘটনার কারণ হিসেবে জানালেন, তার স্বামী সুবল মণ্ডল স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা। তিনি স্বভাবতই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জন্য কাজ করেছেন, এটাই বিএনপি'র সন্ত্রাসী স্থানীয় চেয়ারম্যান শাহজাহান আলীর আক্রোশের কারণ। গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের আগে শাহজাহান সুবল মণ্ডলের বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রী পরি মণ্ডলকে বলেছে তাকে একটি ভোট দেয়ার জন্য। পরি মণ্ডল তাকে বিনীতভাবে বলেছেন, আপনি বিএনপি করেন— আমরা আজন্ম আওয়ামী লীগের সমর্থক। আমরা আপনাকে কি করে ভোট দেব? ২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগেও শাহজাহান আলী পরি মণ্ডলের কাছে একই কায়দায় ভোট চেয়েছে। আর ১ অক্টোবরের নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন একাত্তরের ঘাতক পরাজিত সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী সরকারের জোট ক্ষমতায় আসার পর সারাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর যে অত্যাচার নেমে আসে চাটমোহরের ফৈলজানা গ্রামসহ আশপাশের গ্রামগুলোতেও সে রকম আক্রমণ হয়েছে। খ্রিস্টান ও হিন্দুদের বাড়ি ঘরে ভাঙচুর, মূর্তি বিনষ্ট করার পাশাপাশি তাদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের চাঁদাও দাবি করা হয়েছে।

ফৈলজানার এই ঘটনায় পরি মণ্ডল বললেন, ওই দিন বিএনপি'র সন্ত্রাসীরা নগদ ৫০ হাজার টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে। আর ক্ষতিগ্রস্ত করেছে প্রায় ৫ লাখ টাকার মালামাল।

সেদিনের সে ভয়াবহ দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে পরি মণ্ডলের মা আমোদিনী বৈদ্য কিছুতেই কান্না থামাতে পারছিলেন না। বার বার ডুকরে কেঁদে উঠছিলেন তিনি। শুধু প্রভুর কাছে জানতে চাইছিলেন কি দোষ তারা করেছেন— কেন এমন অত্যাচার নেমে এলো তাদের জীবনে? তিনি বললেন, আমার মেয়ের জামাই নিজে না খেয়ে এলাকার সব মানুষের উপকার করে। সবার ভালর জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিতেও পিছপা হয় না, আর তাকেই এমনভাবে কেন মারলো সন্ত্রাসীরা। প্রভু তুমি তাদের দেখো। এই বৃদ্ধা যখন ঘটনার বর্ণনা করছিলেন তখন তার কান্নার শব্দে বাতাস ভারি হয়ে উঠছিল। তার হাহাকারে আকাশ যেন কেঁপে উঠছিল।

পরি মণ্ডল জানালেন, তাদের জীবনে এমন ভয়াবহ ঘটনা আর কখনও ঘটেনি। এই ঘটনার পর গ্রামের হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলমান সবাই তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা তার স্বামী এবং বাবাকে ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। এ ঘটনায় চাটমোহর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে প্রধান আসামি শাহজাহান চেয়ারম্যান এলাকায় বুক চিতিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পুলিশ তাকে গ্রেফতার করছে না। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা সাখাওয়াত সাখো বললেন, প্রশাসন তার সঠিক দায়িত্ব পালন করলে চাটমোহরে এমন ঘটনা ঘটতো না। চাটমোহর থানার ওসি নুরুল আলম বলেন, আমরা চেষ্টা করছি কিন্তু তাকে ধরতে পারছি না। তবে এজাহারভুক্ত কিছু আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

চাটমোহরের সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার শিকার বৃদ্ধ পৌল বৈদ্য দু'হাতে ব্যান্ডেজ নিয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালের বেডে। ৯ মার্চ ২০০২ শনিবার বিকেলে নির্মূল কমিটির প্রতিনিধি দল যখন তার সঙ্গে দেখা করতে যান তখন তাকে ঘিরে ছিলো তার ছোট মেয়ে, এক ছেলে, ছোট নাতি এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন। যন্ত্রনায়কাতর বৃদ্ধ একটুও কথা বলতে পারছিলেন না। কেবল অসহায় চোখ দুটো তুলে তাকাচ্ছিলেন এদিকে ওদিকে। একটু একটু করে আলো কমে আসছে হাসপাতালের ওই কক্ষটিতে। একটু পরেই দিনের সবটুকু আলো হারিয়ে যাবে। বিষন্ন আলোয় ঘেরা এই সময়ে পৌল বৈদ্য শূন্যে দু'চোখ মেলে ধরলেন। হয়তো একবার ভেবে নিলেন তার শৈশব তার কৈশোর যৌবন এবং তার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে। তারপর প্রশ্ন করলেন কেন এমন হলো?

পৌল বৈদ্যের ছেলে বাবুল বৈদ্য বললেন, বাবার হাত প্রচণ্ড ফোলা। দুটো হাতই ভেঙে

গেছে। ডাক্তাররা বলেছেন, ফোলা কমলে অপারেশন করা হবে। তবে তাদের শঙ্কা বৃদ্ধ বয়সের এই হাড় আর ভালো হবে কি-না। বাবুল কান্না জড়ানো কণ্ঠে বললেন বুড়ো বয়সে বাবাকে পঙ্গু জীবন বয়ে বেড়াতে হবে— এ দৃশ্য আমাদের দেখতে হবে— সন্তান হয়ে এর চেয়ে কষ্টের আর কি হতে পারে? বাবুলের কাছ থেকেই জানা গেলো সেদিনের ঘটনায় আহত সুবল মণ্ডলের একটি হাত ভেঙে গেছে। তিনিও পঙ্গু হাসপাতালে এসেছিলেন চিকিৎসার জন্য। তার হাতে প-াস্টার করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তিনি ডাক্তারদের অবজারভেশনে রয়েছেন। তার হাতের পরিণতি কি হয় তা এখনি বলা যাচ্ছে না।

সাত

ডেটলাইন ঃ সাভার

সুচন্দার হাহাকার ঃ কার কাছে বিচার চাইব?

'ওই দিন বিকেল বেলা আমি বাইরে শুকাতে দেয়া কাপড় ঘরে আনছিলাম। আমার স্বামী সুশান্ত ঘরেই ছিল। সে আমার দু'বাচ্চা নিয়ে খেলা করছিল। এমন সময় পশ্চিম দিক থেকে সেন্টু ও শওকত আলী বোমা ফাটিয়ে আমাদের বাড়িতে ঢোকে। সেন্টুর হাতে একটা রামদা ছিল। সে বলে ওই সুশান্ত কই? আমি ওদের কথার ধরন দেখে ভীষণ ভয় পাই। আমি আমার স্বামীর জীবন রক্ষার জন্য বলি সে বাড়িতে নেই। একথা শুনে শওকত আমাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে। ওর এই হঠাৎ আ□মণে আমার কোলের বাচ্চা মাটিতে পড়ে যায়। মাটিতে পড়ে ও ভীষণ চিৎকার দিতে থাকে। আমিও বড় করে চিৎকার দেই। চিৎকার শুনে আমার ভাসুর আনন্দ গোমেজ ছুটে আসে এবং ওদের হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। আমার ভাসুরকে ওরা বেদম প্রহার করে। আমার চিৎকার শুনে আমার স্বামীও ঘর থেকে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে আসে। সে লাঠি তুলতে সেন্টু রাম দা দিয়ে লাঠি ফিরিয়ে দেয়। এ পর্যায়ে আমি ওদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে দৌড়ে ঘরে ঢুকি। আমার গায়ের কাপড় সব ছিঁড়ে ফেলেছে ওরা। আমি আমার বাচ্চাগুলোকে নিয়ে ঘরে ঢুকি। বাচ্চাগুলো ভয়ে থর থর করে কাঁপছিল। এরপর ওরা আমার ভাসুর আর স্বামীকে তাড়া করে রামদা দিয়ে। ওরা প্রাণ ভয়ে ঘরে এসে আশ্রয় নেয়। আমি প্রাণ রক্ষার জন্য ঘরের খিলি- আটকে দেই। তারপর শুরু হয় ওদের আরও অত্যাচার। ওরা ঘরের দরজায় জোরে জোরে লাথি দিতে থাকে। রামদা দিয়ে টিনের চালে কোপায়। কারেন্টের মিটার ভেঙে ফেলে। আমরা তখন ঘরের ভেতরে বসে ঈশ্বরের নাম স্বরণ করছিলাম। এরপর ওরা পিছনের জানালার শিক ভেঙে ফেলে। আর অকথ্য গালাগালি করে। বলতে থাকে— আমাকে বের করে দেয়ার জন্য। নইলে আমার স্বামী ও ভাসুরকে মেরে ফেলবে বলে হুমকি দেয়। ওই ঘটনায় বাচ্চাগুলো অনেক ভয় পায়। সে রাতে ভয়ে আতঙ্কে ওরা আর ভাত খেতে পারেনি। ওরা এটা কেন করল— আমি কার কাছে বিচার চাইবো?'

এ বুক ফাটা আর্তি এক অসহায় গৃহবধূর। সাভারের কমলাপুর গ্রামের খ্রিস্টান পল-ীর এই আতঙ্কিত গৃহবধূ সুচন্দা গোমেজ যখন ৬ মার্চ (২০০৩) বুধবার বিকেলে তার বাড়িতে ঘটে যাওয়া নারকীয় তাণ্ডব বর্ণনা করছিলেন তখন তার দু'চোখ দিয়ে টপ টপ করে ঝরে পড়ছিল

অশ্রুবিন্দু। তিনি কষ্টের সেই জলধারা আঁচলে মোছার ব্যর্থ চেষ্টা করছিলেন বার বার। বস্তুত সাভারের নিভৃত পল-ীর এই খ্রিস্টান অধ্যুষিত অঞ্চলটির প্রতিটি ঘরের চিত্রই এমন। কয়েকজন চিহ্নিত সন্ত্রাসীর দাপটে সাভারের কমলাপুর গ্রামের খ্রিস্টান পল-ীর সাড়ে তিনশ' পরিবারের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। যখন তখন এসে হামলা, বৌ-ঝিদের অপমান আর চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটছে প্রতিদিন। জীবনের ভয়ে নিরীহ খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষরা মুখ খুলছে না। থানাও সব জেনে মূক ও বধিরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

ওই দিনের ঘটনা সম্পর্কে সুচন্দার পিতা সুনীল চৌকিদার বললেন, আমরা নিরীহ খ্রিস্টান সম্প্রদায় সবার সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিতে বাস করি— এটা ওদের পছন্দ নয়। আমাদের মেয়েদের ওপর ওদের বেশি লোভ। আর চাঁদাবাজির ঘটনা তো ঘটছেই। এই গ্রামে কেউ একটি নতুন ঘর করলে ওদের চাঁদা দিতে হয়। না দিলে সব কাজ বন্ধ। ওরা-মানে সেন্টু আর শওকত বাহিনী দল বেঁধে বাজারে আড্ডা দেয়। বোমা আর গুলি ফাটিয়ে উৎসব করে। প্রতি ঘরে ঘরে ওদের লোক গিয়ে চাঁদা চায়। চাঁদা না দিতে পারলে বৌ-ঝিদের অপমান করে। এ পল-ীতে সাড়ে তিনশ' খ্রিস্টান পরিবার আছি আমরা। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু লোক এখানে এসে জমি কিনে বাড়ি করে বসবাস শুরু করেছে। তাদের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক। সন্ত্রাসী সব ঘটনা ঘটায় পাশের গ্রাম ভবানীপুরের তেজুমিয়ার পুত্র শওকত আলী ও কালু মিয়ার পুত্র সেন্টু। তারা তাদের দলবল নিয়ে এই গ্রামে এসে সন্ত্রাস করে। ওদের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ গ্রামবাসী স্থানীয় বিরুনিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলাউদ্দিনের কাছে যায়। চেয়ারম্যান প্রায় প্রতিদিনই একটা করে বিচার করেন। বিচারে ওরা মাপ চেয়ে আবার পরের দিনই আ□মণ করে। এই ১০ দিন আগে প্রায় ৫০/৬০টা বিশাল বিশাল রামদা নিয়ে একজনকে ধাওয়া করে। আমরা দোকানের শাটার ফেলে তাকে রক্ষা করি। তাকে পেলে ওরা মেরেই ফেলতো। গেল ঈদের সময় আমাদের পাশের বাড়িতে কিছু মেয়ে নিয়ে একটি পরিবার বেড়াতে এসেছিল। ওরা এসে সেই মেয়েদের চাইলো। না পেয়ে তাদের বহনকারী মাই□োবাসটি ভেঙে দিয়ে যায়। সুনীল চৌকিদার বললেন, ওদের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতন থেকে শুরু করে অনেকগুলো মামলা আছে। কিন্তু পুলিশ কিছু করছে না। কেননা— ওরা এবারের নির্বাচনে বিএনপিকে ভোট দিয়েছে। বিএনপি'র জন্য কাজ করে।

এলাকার এই নির্যাতনের ঘটনা স্থানীয় মেম্বার জুলহাস ও আকবরকেও জানানো হয়েছে। তারাও অসহায়। চেয়ারম্যান বলেছেন, আমি আর কিছু করতে পারবো না তোমরা থানায় গিয়ে মামলা কর। সুনীল চৌকিদার বললেন, ওই দিন সন্ধ্যায় থানায় গেলাম মামলা করতে। দারোগা মামলা নিতে চায় না। আমার কথা শুনেই না। পরে ওসি সাহেব বলে দেয়াতে মামলা নিয়েছে। মামলা হয়েছে বুধবার রাতে।

এই প্রতিবেদকের সঙ্গে সুনীল চৌকিদারের কথা হয় শনিবার দুপুরে। তখন পর্যন্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়নি। ওই দিনের ঘটনায় পুরো কমলাপুর গ্রামের মানুষ আতঙ্কের মধ্যে প্রহর গুনছিল। যে কোন সময় আবার ওরা দলবেঁধে আ□মণ করতে পারে বলে গ্রামের অনেকেই জানালেন। সুনীল চৌকিদার আরও জানান, ওরা বিকেলে বাজারে গিয়ে আমাকে পেছন থেকে লাথি মারে আর বলে তোর মেয়েকে পাইনি— তোকে মেরে ফেলবো। সুচন্দা গোমেজের স্বামী সুশান্ত এই প্রতিবেদককে বলেন, আমরা বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে মানসম্মান নিয়ে কীভাবে থাকবো। ওই দিন যদি আমি বাড়িতে না থাকতাম আমার ও আমার স্ত্রীর জীবনে এক সর্বনাশ নেমে আসতো। ওই দিন আশপাশের যারাই আমাদের আর্তচিৎকার শুনে এগিয়ে এসেছে তাদেরই ওরা আঘাত করেছে। এখন আমরা আতঙ্কে প্রহর কাটাচ্ছি। যে কোন সময় আবার বিপদ নেমে আসতে পারে। এই অবস্থায় আমরা কোথায় যাব? কি করবো, সরকার কি

আমাদের কোন দায়িত্ব নেবে না। আমরা কি এদেশের মানুষ না। ওই দিন সুচন্দার চিৎকার শুনে ছুটে এসেছিলেন পাশের বাড়ির ৬৬ বছরের বৃদ্ধ সাহাদত আলী। সন্ত্রাসী সেন্টু আর শওকত তার পা প্রায় ভেঙে দিয়েছে লাঠি দিয়ে আঘাত করে।

অসহায় সুচন্দাকে রক্ষার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন মসজিদের ইমাম মাওলানা মিনহাজ। তাকেও তারা বেদম প্রহার করেছে। বৃদ্ধ সাহাদত আলী বললেন, ওরা আমাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। আমরা হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান সবাই মিলে শান্তিতে বসবাস করতে চাই। ওরা তা করতে দেয় না। ওরা মুরগির ফার্ম থেকে মুরগি—গৃহস্তের ছাগল ধরে নিয়ে যায়। ওই দিন বাড়ির গাছগুলো পর্যন্ত ওরা কেটে ফেলেছে।

ওই পল-ীর আরেক দরিদ্র খ্রিস্টান সুশান্ত। তার আদি বাড়ি কালিগঞ্জ। তিনি বললেন বাইরের কোন মানুষই এখানে এসে নিরাপদে থাকতে পারে না।

ফজলুর রহমান

আট
ডেটলাইন ঃ বগুড়া
সাংবাদিক দীপঙ্কর চক্রবর্তী হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য

বগুড়ার একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির অন্যতম সংগঠক, বিশিষ্ট প্রবীণ সাংবাদিক দৈনিক দুর্জয় বাংলা'র নির্বাহী সম্পাদক দীপঙ্কর চক্রবর্তী (৫৫)-কে ২০০৪ সালের ২ অক্টোবর রাত ১২ টার দিকে ধারালো অস্ত্রের কোপে দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে হত্যা করা হয়। বগুড়া শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে শেরপুর উপজেলা শহরে তাঁর বাড়ির সামনে এ ঘটনা ঘটানো হয়। ঘাতকরা মটর সাইকেলে করে সামনের দিক থেকে এসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং পিছন থেকে তাঁর ওপর আঘাত হানে। দীপঙ্কর চক্রবর্তী পেশাগত দায়িত্ব পালন শেষে প্রতিদিনের মতো এদিনও বগুড়া থেকে বাড়ি ফিরছিলেন।

'তাঁকে হত্যার পেছনে কি কারণ রয়েছে' সে প্রসঙ্গ টানতে গিয়ে পরবর্তীকালে বগুড়ার সংবাদপত্রসহ জাতীয় সংবাদপত্রগুলোতে বেশকিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে উলে-খ করা হয়েছিল যে, শেরপুরের ভবানীপুরে অবস্থিত প্রাচীন ভবানী মন্দিরের বেহাত হয়ে যাওয়া জায়গা-জমি উদ্ধারের তৎপরতা চালাতে গিয়েই দীপঙ্কর চক্রবর্তী প্রভাবশালী দখলবাজদের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এ কারণেই তিনি নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন।

সংবাদপত্রের প্রতিবেদনগুলোতে ভবানী মন্দিরের বিপুল জায়গা-জমি প্রভাবশালীদের দ্বারা দখল হয়ে যাওয়ার কথা উলে-খ করা হলেও, 'এই প্রভাবশালী কারা' সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাবে কিছু বলা হয়নি। এ বিষয়ে আমরা অনুসন্ধান চালিয়ে নিশ্চিত হয়েছি যে, এই দখলদার প্রভাবশালীরা প্রায় সবাই বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামীর লোক। এরাই দীর্ঘদিন ধরে মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি জবর দখলের মাধ্যমে ভোগ-দখল করে আসছে। সাংবাদিক দীপঙ্কর চক্রবর্তী এদের বিরুদ্ধেই লড়ছিলেন এবং মন্দিরের সম্পত্তি উদ্ধারে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

ভবানী মন্দির

পুরো নাম "মা ভবানী মন্দির"। উপমহাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ৫১টি পীঠস্থানের মধ্যে অন্যতম এটি। কালিকাপুরাণের ভাষ্য অনুযায়ী, দক্ষযজ্ঞে দেবী সতী স্বামীর নিন্দা সহ্য করতে না পেরে দেহ ত্যাগ করেন। তখন সতীর প্রাণহীন দেহ কাঁধে নিয়ে দেবাদিদেব মহাদেব প্রলয়নৃত্য শুরু করেন। সেই মহাপ্রলয়নৃত্য থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রক্ষার জন্য স্বয়ম্ভু বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর প্রাণহীন দেহ ৫১টি খণ্ডে বিভক্ত করেন। সেইসব দেহখণ্ড বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় পতিত হলে ৫১টি পীঠস্থানের জন্ম হয়। কালিকাপুরান বলছে, ভবানীপুরে দেবীর বামপাজরাস্থি, মতান্তরে দক্ষিণ চক্ষু পতিত হয়েছিল। সেই থেকে এই পীঠস্থানে দেবীর নাম অর্পণা বা ভবানী। প্রাচীন এই মহাতীর্থক্ষেত্রের অবকাঠামো নাটোরের রানী ভবানী অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মাণ করেছিলেন।

মন্দিরটি হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে অন্যতম তীর্থস্থান হওয়ায় এখানে শুধু বাংলাদেশের বিভি-ন্ন অঞ্চল থেকেই নয় ভারত, নেপাল, ভুটান, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা থেকেও অগণিত হিন্দু তীর্থ যাত্রী আসেন। ফলে ভবানী মন্দির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে আসছে।

নাটোরের রানী ভবানী স্টেট থেকে দেয়া দেবোত্তর ১২ বিঘা জমির উপর এই মন্দিরের অবকাঠামো স্থাপিত। প্রাচীর বেষ্টিত মন্দির চত্তরের ভিতরে রয়েছে দক্ষিণমুখি মূল মন্দির, বামে ভৈরব শিবমন্দির, আরও তিনটি শিব মন্দির, ৮০ ফুট দৈর্ঘের ভোগ পাঠশালা, ৩২ ফুট প্রস্থ নাটমন্দির, দু'টি অতিথিশালা, বাসুদেব মন্দির, গোপাল মন্দির, নরনারায়ণ সেবাঙ্গন (শ্যাম প্রসাদ সেবা অঙ্গন), শাখারী পুকুর, ২টি্ান ঘাট, বেষ্টনী প্রাচীরের বাইরে তিনটি শিবমন্দির এবং একটি পঞ্চমুণ্ড আসন।

ব্রিটিশ আমলের সি এস রেকর্ড অনুযায়ী, নাটোরের রানী ভবানী ছোট তরফ এস্টেট এবং অন্যান্য জমিদারদের পক্ষ থেকে এই মন্দিরের অনুকূলে প্রচুর ভূ-সম্পত্তি দান করা হয়। যার পরিমান প্রায় ৫৮৩ একর। এরপর ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান আমলে জমিদারী প্রথা বাতিল হলে ১৯৫৮ সালে এই মন্দিরের নামে ১৮৬ একর সম্পত্তি বরাদ্দ করা হয়। এই সম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্ব দেয়া হয় রাজশাহী বিভাগীয় রাজস্ব কর্মকর্তার উপর। কিন্তু এই কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতায় বা অন্যকোন কারণে মন্দিরের বরাদ্দকৃত দেবোত্তর ভূ-সম্পত্তি, পুকুর, জলমহাল ইত্যাদি সব কিছুই খাস খতিয়ানে রেকর্ডভুক্ত করা হয়। এতে করে এই জমি বেদখল হওয়া শুরু হয়। বেদখল হতে হতে শেষ পর্যন্ত সবই প্রায় দখলবাজদের কবলে চলে যায়। এমন কি ১৭ একর জমির উপর মন্দিরের চৌহদ্দি নির্মিত হলেও দখলবাজদের কবলে পড়ে বর্তমানে মন্দিরের সীমানা প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে মাত্র ১ একর ২৯ শতক জমির উপর।

জমি উদ্ধার তৎপরতা

মন্দিরের সম্পত্তি খাস খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে পরবর্তীকালে সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে মৌখিকভাবে বলা হয়, 'ভুলবশতঃ এটা হয়ে গেছে। এখন তাদের পক্ষে আর কিছু করার নেই।' এই অবস্থায় মন্দিরের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং মন্দিরের অবশিষ্ট সম্পত্তি রক্ষার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৮৮ সালে সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে "ভবানীপুর মন্দির সংস্কার উন্নয়ন ও পরিচালনা কমিটি" নামে একটি কমিটি করা হয়। এই কমিটি মন্দির সংস্কারের জন্য জনগণের দানকৃত অর্থ সংগ্রহ করতে থাকে।

এদিকে মন্দিরের সম্পত্তি খাস হয়ে যাওয়ার পর থেকে স্থানীয় প্রভাবশালীরা সেগুলো প্রশাসনের সহায়তায় দখল করে নিতে থাকে এবং এজন্য তারা প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও তৈরী করে ফেলে। এভাবে বিপুল সম্পত্তির প্রায় সবটাই দখলবাজদের কবলে চলে যায়।

মন্দির পরিচালনা কমিটি বিগত আওয়ামী লীগ সরকার আমলে এই বিপুল সম্পত্তি

দখলবাজদের কবল থেকে উদ্ধার করতে সরকার ঘোষিত খাস খতিয়ানের বিপরীতে আইনগত পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়। ২০০২ সালে জমি উদ্ধার আন্দোলনও জোরদার হয়ে ওঠে। এইসব পদক্ষেপের মূল শক্তি হয়ে দাঁড়ান সাংবাদিক দীপঙ্কর চ□বর্তী। তাঁর নেতৃত্ব এবং জনমত গঠনে নেয়া বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যদিয়ে সর্বমোট ১৯টি মামলা দায়ের করা হয়। দীপঙ্কর চ□বর্তীর জীবদ্দশাতেই এইসব মামলায় ৩টিতে রায় পাওয়া যায়। আদালত থেকে ৫০ বিঘারও বেশি জমি ফিরে পাবার ব্যাপারে মন্দিরের পক্ষে রায় হয়। এতে করে ভোগদখলকারীরা বেকায়দায় পড়ে যায় এবং আন্দোলনকারীদের প্রতি ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে। তদন্ত থেকে জানা গেছে, আদালতের রায় সত্ত্বেও দখলবাজরা তাতে তোয়াক্কা না করে নিজেদের ক্ষমতার প্রভাবে অটল থাকে এবং দখল করা সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়া থেকে বিরত থাকে। তখন জমি উদ্ধারের জন্য মন্দির পরিচালনা কমিটির নেতৃবৃন্দ নতুন আন্দোলন শুরু করেন। এ ক্ষেত্রে সাংবাদিক দীপঙ্কর চ□বর্তী মুখ্য ভূমিকা পালন করেন এবং আন্দোলন সফল করার জন্য সর্বস্তরে জনমত গঠন করতে থাকেন। এর ফলে দখলবাজরা বড় রকমের চাপের মুখে পড়ে বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

তদন্তকালে জানা গেছে, দখলবাজদের মধ্যে ভবানীপুর শাখা বিএনপি'র সহ-সভাপতি হায়দার আলী, স্থানীয় বিএনপি নেতা এডভোকেট আবুল কালাম আজাদ, ভবানীপুর ইউপি চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা গোলাম মোস্তফা প্রমুখের দখলে রয়েছে পুকুর, জলাশয়সহ প্রায় অর্ধ শতাধিক একর জমি। এরকম আরও শতাধিক একর জমি বা সম্পত্তি দখলে রয়েছে এদেরই লোকজনের হাতে। যারা শুধু বিএনপি দলীয় নয়, প্রভাবশালী জামায়াত নেতা এবং তাদের অনুসারী লোকজন। এদের প্রতি বিএনপি ও জামায়াতসহ জোট সরকারের শীর্ষ নেতাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগসহ আনুসাঙ্গিক আর্শিবাদ রয়েছে।

দায়েরকৃত মামলাগুলোর রায় একের পর এক মন্দিরের পক্ষে যাওয়ায় এবং এর পাশাপাশি আন্দোলনকারীদের তৎপরতার কারণে সামাজিক চাপ বাড়তে থাকায় দখলবাজরা বেশ শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। তারা রাজনৈতিক প্রভাব খাটাতে গিয়েও জনমত এবং আইনগত চাপের কাছে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। সাংবাদিক দীপঙ্কর চ□বর্তীর কারণে তারা মোটা অঙ্কের অর্থের প্রলোভন দেখিয়েও আন্দোলনকারীদের নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছিল। এমনকি তারা মন্দির পরিচালনা কমিটির বিপরীতে কয়েকজন হিন্দুকে প্রভাবিত করে নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় পাল্টা একটি কমিটি গঠন করিয়েও আন্দোলন ব্যর্থ করার অপপ্রয়াস চালিয়েছিল। কিন্তু সে কমিটি কার্যত কিছুই করতে না পেরে এক পর্যায়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল।

তদন্তকালে আরও জানা যায়, সাংবাদিক দীপঙ্কর চ□বর্তীকে মন্দিরের সম্পত্তি উদ্ধার তৎপরতা থেকে নিবৃত্ত করতে দখলকারীদের তরফ থেকে বিভিন্নভাবে চাপ দেয়া হয়েছে। 'সর্বহারা' দিয়ে হত্যা করানোর হুমকি দেয়া হয়েছে। মোটা অংকের আর্থিক প্রলোভন দেখানো হয়েছে। কিন্তু নির্ভীক, সৎ এবং আপোসহীন দীপঙ্কর চ□বর্তী কোন কিছুতেই বশীভূত হননি। বরং এসব প্রলোভনের বিপরীতে তিনি সভা-সমাবেশ, মিছিল, সংবাদ সম্মেলন, সংবাদপত্রে লেখালেখি করতে থাকেন। এতে করে প্রভাশালী দখলবাজদের সব অপতৎপরতাই ব্যর্থ হয়ে যায়। ওয়াকেবহালদের অনেকেই মনে করেন, এই অবস্থায় চরম পরিণতির টার্গেটে পরিণত হন সাংবাদিক দীপঙ্কর চ□বর্তী। কেননা প্রভাবশালী দখলবাজদের জন্য এই বিষয়টিই পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে, দীপঙ্করকে সরিয়ে দিতে পারলেই কেবল সব রকম আন্দোলন বা মন্দিরের সম্পত্তি উদ্ধারের তৎপরতা বন্ধ করা যাবে। বিশেষ করে তাঁর মতো একজন জনপ্রিয় সাংবাদিককে সরাতে পারলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এমনিতেই বশ মানতে বাধ্য হবে। তখন তাদের পাশে দাঁড়ানোরও আর কেউ থাকবে না।

দীপঙ্করের সামাজিক পরিচিতি

দীপঙ্কর চ□বর্তী শুধুমাত্র দৈনিক দুর্জয়বাংলা সংবাদপত্রের নির্বাহী সম্পাদকই ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট কলামিস্ট, বগুড়া প্রেসক্লাব ও বগুড়া সাংবাদিক ইউনিয়নের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, শেরপুর প্রেসক্লাব ও রিপোর্টার্স ইউনিটিরও প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সহ-সভাপতি, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি বগুড়ার অন্যতম উপদেষ্টা, ভবানীপুর মা ভবানী মন্দির উন্নয়ন কমিটির সহ-সম্পাদক, শেরপুর পুজা উদযাপন পরিষদের সাবেক সভাপতি, শেরপুর বিজ্ঞান ও কারিগরী মহিলা কলেজের পরিচালনা পরিষদের সদস্য। এছাড়াও তিনি বহু সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং মানবসেবামূলক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সামাজিকভাবে তিনি এতটাই প্রভাবশালী ও সম্মানীয় ছিলেন যে, সরাসরি তাঁর সামনে প্রশাসন বা ক্ষমতাসীন মহলের কারও দাঁড়াবার মতো সৎ সাহস ছিল না।

দীপঙ্কর চ□বর্তী আজীবন সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বগুড়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলাদেশ সংবাদপত্রের মাধ্যমে সাংবাদিকতা পেশা শুরু করেন। তিনি দৈনিক উত্তরাঞ্চল, দৈনিক চাঁদনী বাজার, দৈনিক করতোয়ায় গুরুত্বপূর্ণ পদে পেশাগত দায়িত্ব পালন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র সন্তান, মা, চার বোন ও এক ভাইসহ আত্মীয়-স্বজন এবং অসখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া

দীপঙ্কর চ□বর্তী হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বগুড়াসহ সারা দেশে তীব্র প্রতি□য়ার সৃষ্টি হয়। হত্যার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বগুড়া ও শেরপুর পরিণত হয় বিক্ষোভের শহরে। সাংবাদিক সমাজ, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মহল ছাড়াও সর্বস্তরের মানুষ হত্যার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসেন। বন্ধ হয়ে যায় স্কুল-কলেজ। হাজারো বিক্ষুব্ধ মানুষ মিছিল-স্লোগানে রাজপথ কাঁপিয়ে তোলেন, বন্ধ করে দেন রাজপথ। এক কথায় বগুড়া-শেরপুর হয়ে ওঠে বিক্ষুব্ধ জনপদ।

বগুড়ার সাংবাদিক সমাজ হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে পরদিন ৭২ ঘণ্টার সময় দিয়ে প্রশাসনের প্রতি আলটিমেটাম ঘোষণা করেন এবং মাসব্যাপী শোক কর্মসূচী ছাড়াও সপ্তাহব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। ৩ অক্টোবর শেরপুরের সাংবাদিকরা ঢাকা-বগুড়া মহাসড়ক অবরোধ করেন। তারা শেরপুর বাসস্ট্যান্ডে প্রতিবাদ সমাবেশ করেন, যাতে সকল রাজনৈতিক-সামাজিক- সাংস্কৃকিত-পেশাজীবী সমাজের নেতৃবৃন্দ অংশ নিয়ে ঘাতকদের অনতিবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। ৪ অক্টোবর বগুড়ায় সর্বস্তরের সাংবাদিক মুখে কালো কাপড় বেঁধে, শৃঙ্ক্ষলিত কলম হাতে মিছিল করেন এবং শেরপুরে একঘন্টার প্রতীক অনশন কর্মসূচী পালন করা হয়। আলটিমেটামের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও দীপঙ্করের ঘাতকরা গ্রেফতার না হওয়ায় এবং প্রশাসন হত্যাকারীদের চিহ্নিত করতে না পারায় ৬ অক্টোবর বগুড়া প্রেসক্লাবে বগুড়া সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিইউজে), বগুড়া প্রেসক্লাব, সাংবাদিক ইউনিয়ন বগুড়া (জেইউবি), উত্তরাঞ্চল ফেডারেল সাংবাদিক পরিষদের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ইকবাল সোবহান চৌধুরীসহ অন্যান্য নেতাদের উপস্থিতিতে প্রতিবাদ সমাবেশ করা হয় এবং সেইসঙ্গে সাংবাদিক সমাজের পক্ষ থেকে নতুন কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। এ কর্মসূচীগুলোর মধ্যে ছিল ৮ অক্টোবর বগুড়ায় মানববন্ধন, ৯ অক্টোবর বিক্ষোভ মিছিল, ১১ অক্টোবর প্রতীক অনশন এবং ১২ অক্টোবর উত্তরাঞ্চলীয় সাংবাদিক মহাসমাবেশ। এদিকে দীপঙ্কর চ□বর্তী হত্যার প্রতিবাদে এবং ঘাতকদের চিহ্নিত ও গ্রেফতারের দাবিতে ২৫ অক্টোবর একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির

উদ্যোগে বগুড়ায় বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়। এতে নির্মূল কমিটির অন্যতম উপদেষ্টা বিচারপতি কে এম সোবহান, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, সহ সভাপতি ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুলসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৩ অক্টোবর নিহত দীপঙ্কর চ□বর্তীর শেষকৃত্যানুষ্ঠান হয়। এতে সর্বস্তরের মানুষ অংশ নেন। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল এই হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে শেরপুর ছুটে যান এবং দীপঙ্করের শেষকৃত্যানুষ্ঠানে যোগদান করেন। তিনি দীপঙ্করের শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের সঙ্গে মিলিত হন। এ সময় বগুড়া শাখা একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নেতৃবৃন্দও তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

দীপঙ্কর চ□বর্তী হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে এবং ঘাতকদের চিহ্নিত করে তাদের গ্রেফতার দাবি করে তাৎক্ষণিক ভাবে জাতীয় নেতৃবৃন্দ বিবৃতি প্রদান করেন। বিরোধীদলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এক বিবৃতিতে দীপঙ্কর চ□বর্তী হত্যাকাণ্ডে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এ হত্যাকাণ্ড আবারও প্রমাণ করলো খালেদা-নিজামীর শাসনামলে মানুষের জানমালের সামান্যতম নিরাপত্তা নেই। সরকার ও সরকারের মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী লুটেরাদের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংবাদ পরিবেশনের কারণেই দীপঙ্কর চ□বর্তীর মতো অজাতশত্রু প্রতিভাবান সাংবাদিককে জীবন দিতে হলো। তিনি হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবি করেন এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি তাঁর সমবেদনা জানান। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি বগুড়া শাখার অন্যতম সংগঠক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক দীপঙ্কর চ□বর্তীর পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় উপদেষ্টামণ্ডলী ও নেতৃবৃন্দ। ৪ অক্টোবর ২০০৪ একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির ও সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, দীপঙ্কর চ□বর্তী সব সময়ই মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা এবং '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সোচ্চার ছিলেন। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বাস্তবায়নে তাঁর উদ্যোগ ও চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন সৎ, নীতিবান, নিবেদিতপ্রাণ সাংবাদিক এবং সমাজকর্মী। তাঁর মত একজন নম্র-ভদ্র এবং বিনয়ী স্বভাবের মানুষের কোন ব্যক্তিগত শত্রু থাকতে পারে বলে আমরা মনে করি না। অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল আদর্শের শত্রুরাই ছিল তার প্রতিপক্ষ। মৌলবাদী ঘাতকরা এ বছর খুলনায় নির্মূল কমিটির অন্যতম সংগঠক বিশিষ্ট সাংবাদিক মাণিক সাহাকে বোমা মেরে নির্মমভাবে হত্যা করেছে, সাংবাদিক হুমায়ুন কবীর বালুকে হত্যা করেছে অথচ প্রকৃত হত্যাকারীদের জামায়াত-বিএনপি'র মৌলবাদী জোট সরকার আজ অবধি গ্রেফতার করেনি। আমরা মনে করি সারা দেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সাংবাদিক পেশাজীবী ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের পরিকল্পিতভাবে হত্যার ধারাবাহিকতায় বগুড়ায় সাংবাদিক দীপঙ্কর চ□বর্তীকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ও আমাদের সহযোদ্ধা দীপঙ্কর চ□বর্তীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দার পাশাপাশি অবিলম্বে ঘাতকদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জোর দাবি জানাচ্ছি। একই সঙ্গে আমরা দীপঙ্কর চ□বর্তীর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং নির্মূল কমিটির বগুড়া শাখার ক্ষুব্ধ শোকাহত সহযোদ্ধাবৃন্দের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছি।'

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সভাপতি ইকবাল সোবহান চৌধুরী ও মহাসচিব মনজুরুল আহসান বুলবুলসহ দেশের সকল সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ

এক বিবৃতিতে বলেন, দীপঙ্কর চ□বর্তীর নির্মম হত্যাকাণ্ড আবারও প্রমাণ করেছে দেশে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কতটা অবনতি হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে সরকার একজন সৎ, নির্লোভ পেশাদার সাংবাদিকের নিরাপত্তা বিধানেও ব্যর্থ। সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে দীপঙ্কর চ□বর্তীর ঘাতকদের আটক করে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান। নেতৃবৃন্দ তাঁর পরিবারের শোকসন্তপ্ত সদস্যদের সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। বিবৃতিতে অন্যান্যের মধ্যে সই করেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আলতাফ মাহমুদ ও সাধারণ সম্পাদক শাহ আলমগীর, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মোস্তাক আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক শহীদ উল আলম, খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি এস.এম জাহিদ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাহেব আলী, বগুড়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি এ.এইচ.এম আখতারুজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান মনা, রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মুস্তাফিজুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক জামিনুর রহমান, যশোর সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি সাজেদ রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মইনুল হক, দিনাজপুর সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি স্বরূপ কুমার বকশী ও সাধারণ সম্পাদক শাহীন হোসেন এবং ময়মনসি-ংহ সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কাজী ইয়াসিন ও সাধারণ সম্পাদক আতাউল করিম।

হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে রাজনৈতিক ও সাংবাদিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে আরও যাঁরা বিবৃতি দেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু, ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান খান, বিকল্প ধারা বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান সাবেক রাষ্ট্রপতি হোসেইন মুহাম্মদ এরশাদ, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের (রব) সভাপতি নূর আলম জিকু ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল মালেক, জাতীয় পার্টির (মঞ্জু) চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ও মহাসচিব শেখ শহীদুল ইসলাম, জাতীয় গণফ্রন্টের সমন্বয়ক টিপু বিশ্বাস, বাসদ আহ্বায়ক আফম মাহবুবুল হক, গণতান্ত্রিক মজদুর পার্টির আহ্বায়ক এডভোকেট আব্দুস সালাম, বিপ-বী ঐক্য ফ্রন্টের মোশরেফা মিশু, মানবাধিকার সংস্থা অধিকার, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক এডভোকেট সুলতানা কামাল, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি বাহাউদ্দিন নাছিম ও সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ দেবনাথ, কৃষক লীগ সভাপতি ড. মির্জা জলিল ও সাধারণ সম্পাদক মো. মোতাহার হোসেন মোল-া, বঙ্গবন্ধু লেখক পরিষদ সভাপতি আয়াত আলী পাটওয়ারী ও সাধারণ সম্পাদক শেখ আবদুল হক, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক জোট কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভাপতি মোমতাজ উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক আবুল খায়ের সাজ্জাদ, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সভাপতি লিয়াকত সিকদার ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবুসহ আরও অনেকে।

দীপঙ্করের বাড়িতে নির্মূল কমিটির নেতৃবৃন্দ ঃ ৩০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান

২৫ অক্টোবর ২০০৪ দুপুরে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নেতৃবৃন্দ নিহত সাংবাদিক দীপঙ্কর চ□বর্তীর শেরপুরস্থ বাসভবনে যান এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দেন। এ সময় নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির নিহত দীপঙ্কর চ□বর্তীর পরিবারের সাহাযার্থে তাঁর স্ত্রী অঞ্জনা চ□বর্তীর হাতে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির পক্ষ থেকে নগদ ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা প্রদান করেন। তিনি দীপঙ্করের পরিবারকে বৈরী সময়ের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে ধৈর্যধারণের আহ্বান জানান। দীপঙ্করের পরিবারকে সান্ত্বনা জানাতে লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির ছাড়াও বিচারপতি কে এম সোবহান, ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল,

নির্মূল কমিটি বগুড়ার উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি প্রবীণ সাংবাদিক মুহাম্মদ আব্দুল মতীন, আহ্বায়ক সাংবাদিক মাহমুদুর রহমান মনা, রাজশাহী শাখা নির্মূল কমিটির সভাপতি আবুল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ কামরুজ্জামানসহ শেরপুরের সাংবাদিক ও নির্মূল কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে দীপঙ্কর চ□বর্তীর বাড়িতে গেলে এক হৃদয়বিদারক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। তাঁর স্ত্রী অঞ্জনা চ□বর্তী কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তিনি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছিলেন, 'আমি আর পারি না, আর সহ্য হয়না, আমি কি নিয়ে বাঁচবো, কেন বাঁচবো, কার জন্য বাঁচবো? কেমন করে বাঁচবো, কোন সান্তনায় বেঁচে থাকবো?'

ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীকে জড়িয়ে ধরে অঞ্জনা চ□বর্তী বার বার বলছিলেন, 'কি অপরাধ ছিল তাঁর? কেন তাঁকে হত্যা করা হলো? কারা তাঁকে হত্যা করলো? তাঁর তো কোন শত্রু ছিল না। শত্রুই যদি থাকবে তাহলে এতো মানুষ কেন ছুটে আসবে তাঁর কাছে? দিন রাত যে লোকটি মানুষের কাজে ব্যস্ত থাকতো, শুধু উপকার করতো, নিজের জন্য কিছুই করতো না তাঁকে কেন হত্যা করা হবে? সে তো কারো ক্ষতি করেনি, অনিষ্ট করেনি, তাহলে কেন তাঁকে শেষ করে দেয়া হলো? 'আমি এখন কি নিয়ে বাঁচবো, কার জন্য বাঁচবো, কেনো বাঁচবো? কেমন করে বেঁচে থাকবো? এই লোকটি তো আমাদের বেঁচে থাকবার জন্য কিছুই রেখে যায়নি, পরের ভবিষ্যত নিয়ে ভেবেছে, করেছে। কিন্তু নিজের ভবিষ্যতের জন্য, পরিবারের জন্য কিছুই ভাবেনি, করেনি, কিছু রেখে যায়নি।'

অঞ্জনা চ□বর্তীকে সান্তনা দিতে এসে সকলেই নির্বাক হয়ে পড়েন। সবার চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে অশ্রু। নিশ্চুপ নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকে গোটা বাড়ি জুড়ে। তার মাঝে শোনা যায় শুধু অঞ্জনার চিৎকার, আহাজারি।

অঞ্জনা চ□বর্তী বিলাপ করতে থাকেন, 'একজন মানুষকে হত্যা করা হলো, অথচ কোন হত্যাকারী ধরা পড়লো না, জানা গেলো না কারা হত্যা করলো, কেন হত্যা করা হলো? এটা কোন কথা হতে পারে?' 'ষড়যন্ত্র করে এ হত্যা করা হয়েছে। এক দিনের চিন্তায় এভাবে হত্যা করা সম্ভব না। অনেক দিনের পরিকল্পনায় এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে? কাদের স্বার্থে আঘাত লেগেছিল? কারা এমন মানুষটাকে শেষ করলো? তা কি জানতে পারবো না? বিচার পাবো না এটা কি কথা হয়? তাহলে কোন সান্তনায় বেঁচে থাকবো?'

এইসব প্রশ্নের মাঝে দীর্ঘক্ষণ নীরব থেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য চেষ্টা করেন কাছে বসে থাকা সকলেই। লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির সান্তনা দিয়ে বলেন, 'আমরা আপনার পাশে আছি, আপনার বিপদের দিনে এখানে উপস্থিত সবাই আপনার পাশে আছে ধৈর্য ধরুন।'

শাহরিয়ার কবির সহ একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নেতৃবৃন্দ এসময় শোক সন্ত প্ত পরিবারের সকলের খোঁজ খবর নেন। দীপঙ্করের দুই পুত্র সন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে কথা বলেন, তাদেরকে সবাই মিলে সাহায্য করে দীপঙ্করের মতো সৎ, আদর্শবান, দেশপ্রেমিক মানুষ হিসেবে বড় করার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন। অঞ্জনা চ□বর্তীও দুই সন্তানের জন্য আশীর্বাদ কামনা করেন।

দীপঙ্কর হত্যা মামলার অবস্থা

সারা দেশের মানুষ যখন সাংবাদিক দীপঙ্কর চ□বর্তী হত্যাকারীদের চিহ্নিত করে তাদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে আসছিলেন দায়িত্বশীল মহল তখন এ দাবি পূরণে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। দীপঙ্কর হত্যা মামলার তদন্ত কাজের ফলাফলও একবারে নেতিবাচক। দীপঙ্কর চ□বর্তীর বড় পুত্র পার্থ সারর্থী চ□বর্তী বাদী হয়ে ২০০৪ সালের ৩ অক্টোবর শেরপুর

থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেছিলেন। এই মামলায় পুলিশ সন্দেহজনকভাবে ৪ জনকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তারা সবাই জানিয়ে মুক্ত হয়ে গেছে।

হত্যার ঘটনা তদন্তে পুলিশ প্রাথমিকভাবে জানিয়েছিল, ভবানী মন্দিরের সম্পত্তি উদ্ধার আন্দোলনের কারণেই দীপঙ্কর চ□বর্তী ভাড়াটিয়া খুনীদের দ্বারা খুন হয়েছেন বলে তাদের ধারণা। এদিকে আমাদের তদন্তথেকে জানা যায়, পুলিশ খুনের মোটিভ সম্পর্কে আঁচ করতে পারলেও সে অনুযায়ী তদন্ত পরিচালনা করেনি বা হত্যা রহস্য উদঘাটনে অগ্রসর হয়নি। প্রভাবশালী মহলের চাপের কারণে পুলিশ সত্য উদঘাটনে বিরত থাকে এবং শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্যই তারা ৪ জনকে সন্দেহজনকভাবে গ্রেফতার করে। এরপর দীর্ঘ এক বছর পেরিয়ে গেলেও পুলিশ এখন পর্যন্ত হত্যার কারণ বা ঘাতক কে বা কারা তা উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি। মামলাটি এখন সি আই ডি'র উপর ন্যস্ত রয়েছে। তাদের তদন্তেরও কোন ফলাফল পাওয়া যায়নি। এদিকে গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৫ শেরপুরের সাংবাদিক নিমাই ঘোষকে শেরপুর থানার ওসি নূরুল ইসলাম জানিয়েছেন, সাংবাদিক দীপঙ্কর চ□বর্তী হত্যার মামলাটি সি আই ডি'র উপর ন্যস্ত থাকলেও পুলিশ ঘটনার ব্যাপারে এখনও তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। ওসি বলেন, 'দীপঙ্কর চ□বর্তী একজন সৎ ও নির্ভীক সাংবাদিক ছিলেন। সৎ মানুষের হত্যাকাণ্ডের কিনারা বের করা খুব কঠিন কাজ। তবে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

শেষ কথা

আমাদের অনুসন্ধানে নিশ্চিত হওয়া গেছে, সাংবাদিক দীপঙ্কর চ□বর্তী যাদের টার্গেটে পরিণত হয়েছিলেন তারা শুধু স্থানীয়ভাবেই ক্ষমতাধর ছিল না, তাদের সঙ্গে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের উচ্চ পর্যায়ের যোগসাজস ছিল। সে কারণে হত্যাকাণ্ডের দায় থেকে দখলবাজরা নিজেদের আড়াল করতে উচ্চ পর্যায় থেকে সব রকম সহযোগিতা পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রভাশালী মহল এবং তাদের রাজনৈতিক শক্তি নানান নাটকীয় ভূমিকারও আশ্রয় নিয়েছে। অনুসন্ধানে দেখা যায়, দীপঙ্কর চ□বর্তী হত্যাকাণ্ডের পর প্রতিবাদী জনতার কাতারে বিএনপি-জামায়াত এবং মন্দিরের সম্পত্তি দখলকারীরাও সামিল হয়ে গেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিক্ষুব্ধ মানুষের চাইতে এদের তরফ থেকে বেশী বিক্ষুব্ধ হবার ভান করা হয়েছে। যেমন বিএনপি-জামাতের পক্ষ থেকে দীপঙ্কর হত্যার প্রতিবাদে ধুমধাম করে বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়েছে, দীপঙ্করের শেষকৃত্যানুষ্ঠানের সময় আগবাড়িয়ে সব রকম সহযোগিতা করা হয়েছে, দীপঙ্করের শোকাহত পরিবারের জন্য আর্থিক সহায়তার হাত বাড়ানো হয়েছে। এমন কি হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গোৎসবের আয়োজনেও অতিউৎসাহী ভূমিকা রাখা হয়েছে। মোটা অংকের আর্থিক সহায়তাও দেয়া হয়েছে এজন্য। হত্যাকাণ্ডের পর বিএনপি-জামাতের নেতারা অন্যান্যদের মতো বিবৃতি দিয়েছেন, মিছিল করেছেন, প্রধানমন্ত্রীপুত্র তারেক রহমানসহ অন্যান্য নেতারা দীপঙ্করের শোক সন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন। এমন কি দীপঙ্করের পরিবারকে প্রয়োজনে সবরকম খরচ দেয়ার আশ্বাস দিয়ে পুত্রদের চাকরীর ব্যবস্থা করে দেয়ার কথাও বলা হয়েছে। পরে অবশ্য এক পুত্রকে মাস্টার রোলে ছোট-খাটো একটি চাকরীর ব্যবস্থা করেও দেয়া হয়। এইসব কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি এই মহল থেকে হত্যা ঘটনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য নানা প্রচারণাও চালানো হয়। প্রচারণায় বলা হয়, মন্দিরের অভ্যন্তরীণ বিরোধের জের ধরে দীপঙ্কর খুন হয়েছেন। এ প্রচারকে প্রতিষ্ঠিত করতে পুলিশ দখলবাজদের দ্বারা প্রভাবিত নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা পাল্টা মন্দির কমিটির একজন বিনয়ভূষণ ঠাকুর ওরফে ষষ্ঠিকে গ্রেফতার করে।

অনুসন্ধানে আরোও জানা যায়, প্রভাবশালী রাজনৈতিক মহলের এইসব তৎপরতার মূল

উদ্দেশ্য ছিল বিক্ষুব্ধ মানুষকে বিভ্রান্ত করা, হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণিত করা এবং একই সঙ্গে হত্যার রহস্য উদ্ঘাটনে বিক্ষুব্ধ মানুষের যে আন্দোলন চলছিল তাকে লক্ষ্যচ্যুত করা। আরও লক্ষ্য ছিল, মন্দিরের জবরদখল হওয়া সম্পত্তি উদ্ধারের আন্দোলন স্তব্ধ করে দেয়া, যাতে করে দখলবাজরা সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে যায়। তদন্তে দেখা যায়, রাষ্ট্রীয়, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে এরা ক্ষমতাধর হওয়ায় নাটকীয় তৎপরতাগুলো বেশ সফল হয়েছে। বিশেষ করে পরবর্তীকালে এভাবে দীপঙ্কর হত্যার মোটিভকেই ধামাচাপা দেয়া সম্ভব হয়েছে। এখনও এই হত্যা ঘটনার মূল রহস্য উদ্ঘাটন করা হয়নি, হত্যাকারীদের চিহ্নিত করা হয়নি বা তাদের কোন রকম রাজনৈতিক পরিচয়ও প্রকাশ করা হচ্ছেনা। সেইসঙ্গে দেখা যাচ্ছে, হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে যে গণআন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাও এখন নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে এবং মন্দিরের জমি উদ্ধার আন্দোলনেও কোন তৎপরতা নেই। এতে করে দখলবাজরা বহাল তবিয়তে বর্তমানে নিশ্চিন্ত অবস্থায় রয়ে গেছে। তাদেরকে আদালতের রায় অনুযায়ী দখলকৃত জমিও ফেরত দিতে হচ্ছে না, এ নিয়ে কেউ কথা বলতেও আসছে না। কার্যত এভাবেই সাংবাদিক দীপঙ্কর চ□বর্তীকে হত্যার মধ্যদিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে পদদলিত করে, তাদের ভীতির মধ্যে ফেলে দিয়ে জোট সরকারের লোকেরা স্বার্থ হাসিল করে চলেছে। অপর দিকে সংখ্যালঘুরা সব জেনে বা বুঝেও নিরাপত্তার কারণে নিশ্চুপ হয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন।

আবুল হোসেন খোকন

নয়

ডেটলাইন ঃ বাঁশখালী

‘সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের আগুনে পুড়ছে বাঁশখালী’

বাঁশখালী, বিপর্যস্ত মানবতার এক ভয়ংকর চিত্র। প্রতিদিন মানবতা ভূলুণ্ঠিত হয় এখানে। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে □মশঃ বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠেছে দক্ষিণ চট্টগ্রামের নদী সমুদ্র আর পাহাড়ঘেরা এই সবুজ শ্যামল প্রান্তরটি। ক্ষমতাসীন জোট সরকারের আমলে ২০০৩ সালের নবেম্বরে এই বাঁশখালী আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলোর শিরোনামে চলে আসে। রাতের অন্ধকারে মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে হার মানিয়ে গান পাউডার ছিটিয়ে বাহির থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে জীবন্ত পুঁড়িয়ে মারা হয় ১১ জনকে। ৪ দিনের শিশু থেকে ৭০ বছরের বৃদ্ধ, নারী পুরুষ নির্বিশেষে। স্তম্ভিত হতবাক হয়ে পড়ে এদেশের মানুষ। এ কী করে সম্ভব? কিন্তু তাই হয়েছে বাঁশখালীর দক্ষিণ সাধনপুর শীলপাড়াতে। হ্যাঁ এরা ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বলেই আজো সেই ঘটনার প্রকৃত আসামীদের গ্রেপ্তার করা হয় না, উপজেলা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক কালীপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আমিনুর রহমান চৌধুরী এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের গডফাদার হলেও তাকে অদৃশ্য কারণে (!) প্রশ্রয় দিচ্ছে প্রশাসন, সব মিলিয়ে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসে পুড়ছে বাঁশখালী।

শুধু ২০০৩ সালের ১৮ নবেম্বর নয় এর আগেও আরো দুটি হিন্দু পরিবারের ঘরে রাতের অন্ধকারে আগুন দিয়ে এভাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। ২০০১ সালের ১ অক্টোবর সংসদ

নির্বাচনের পর থেকে বাঁশখালীতে বসবাসরত হিন্দু পরিবারগুলোর উপর নেমে আসে পাশবিক অকথ্য নির্যাতন, নিপীড়ন। প্রায় প্রতিরাতেই ডাকাতির নামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর হামলা চালানো হয়। ধর্ষিত হয় ৬২ বছরের পৌঢ়া থেকে ১৪ বছরের কিশোরি পর্যন্ত। এলাকাবাসীর অভিযোগ, এভাবে ডাকাতির নামে নির্যাতন, ধর্ষণ করে ঘরবাড়ি ছাড়া করে সহায় সম্পত্তি দখল করার জন্যই একধরনের নীলনকশা চলছে বাঁশখালীতে। এলাকার জনপ্রতিনিধি বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরী ‘মুখে শেখফরিদ, বগলে ইট’ নিয়ে □ড়নকের ভূমিকা পালন করছেন।

সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস ধর্ষণ, নিপীড়ন ও হুমকির মুখে বাঁশখালী থেকে অনেক হিন্দু পরিবার ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। কেউ চট্টগ্রাম শহরে কেউ কক্সবাজার রাঙ্গামাটি আবার কেউ দেশান্তরিত হয়ে ভারতেও চলে গেছেন। কিন্তু এর কোন সঠিক পরিসংখ্যান নেই কারো কাছে। যাদের পরিবারের সদস্যরা ভারতে চলে গেছেন নিতান্ত বাধ্য হয়ে তারাও কোনকিছু বলতে রাজী নয়। কারণ এতে করে উল্টো এসব পরিবারের উপর প্রশাসনিক হয়রানী নেমে আসে। বাংলাদেশের প্রশাসনিক অবস্থাও এমন যে, দেশ ছেড়ে অন্যকোন দেশে যতদিন খুশী থাকতে পারবে, তাতে কোন সমস্যা নেই, কিন্তু ভারতে না। ভারত যেন এক শত্রুদেশ। তাই বাংলাদেশ থেকে যারাই প্রাণভয়ে ভারতে চলে গেছেন তারা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা কখনোই স্বীকার করেন না এ বিষয়টি অযথা হয়রানীর শিকার হতে হবে এই ভয়ে। সারা বাংলাদেশের যে চিত্র দক্ষিণ চট্টগ্রামের বাঁশখালীও তার ব্যতি□ম নয় এ ব্যাপারে।

তবে ব্যতি□ম অবশ্যই আছে। তাহলো ডাকাতির নামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ঘরবাড়ি, জায়গা সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য পরিকল্পিতভাবে ধর্ষণ, নির্যাতন হয়রানী করা হচ্ছে। আরো যে বিষয়টি এখানে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে তাহলো রাতের আঁধারে ঘরে আগুন দিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা। এভাবে প্রতিবেশী অন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতংকের সৃষ্টি করা। যাতে তারা মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে ঘরবাড়ি জায়গা সম্পত্তি বি□ি করে অথবা তা না করেই পালিয়ে যায়। গত প্রায় ৪ বছরে বিভিন্ন সময়ে বাঁশখালীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে নানা মত ও সম্প্রদায়ের লোকজনের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, এরই মধ্যে কমপক্ষে ১০০টি পরিবার বাঁশখালীতে তাদের পৈত্রিক ভিটামাটি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

অল্প কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা দিলেই পুরো চিত্রটি দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ২০০১ এর জুলাই মাস থেকে ২০০৩ এর নবেম্বর মাস পর্যন্ত ২৭ মাসে ৪টি হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরে আগুন দেয়া হয়েছে। এতে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছে ১৮জন। সবচেয়ে আতংকের বিষয় হলো ঐ নবপোড়া ভিটেতে আজ পর্যন্ত কেউ আর ঘর বানিয়ে থাকার চিন্তাও করেনি। পোড়া ভিটাগুলো তেমনই পড়ে আছে। রাজনীতিবিদ, সমাজ, প্রশাসন মন্ত্রী এমপি কারোরই কোন মাথা ব্যাথা নেই এ ব্যাপারে। এমনকি এসব ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা কিভাবে কোথায় আছেন তার খোঁজ খবরও কেউ করেন না। মামলাগুলোও ঝুলে আছে। আসামী গ্রেপ্তার নেই। চার্জশীট দেয়া হয়না। আর সাধনপুরের শীলপাড়ার ১১জনকে পুড়িয়ে মারার ঘটনাকে তো তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) আলতাফ হোসেন থেকে শুরু করে জোট সরকারের সব মন্ত্রী এমপি ও প্রশাসন একযোগে ‘স্রেফ ডাকাতি’ বলে আখ্যায়িত করে পার পেতে চেয়েছেন। সুতরাং তদন্তও তেমনি হচ্ছে।

শীলপাড়ার পোড়াভিটায় এখন গোয়ালঘর আর পাটের চাষ হচ্ছে

২০০৩ সালের ১৮ নবেম্বর রাতে সাধনপুরের শীলপাড়ায় তেজেন্দ্র শীলের দোতলা মাটির ঘরের বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে চারিদিকে গানপাউডার ছিটিয়ে আগুন লাগিয়ে জীবন্ত

পুড়িয়ে মারা হয় ১১ জনকে। স্তম্ভিত বাঁশখালীবাসী সহ সারা দেশের বিবেকবান মানুষ। কিন্তু টনক নড়েনি জোট সরকারের। তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী, পুলিশের আই,জি, এসপি ও বন পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী ছুটে গেলেন সেদিনই বাঁশখালীতে। বললেন, ডাকাতি করতে এসে তা করতে ব্যর্থ হয়েই আগুন দিয়েছে ডাকাতরা। তিনি সন্ত্রাসীদের আস্তানা গুঁড়িয়ে দেয়ার এবং প্রয়োজনে গুলি করারও (ফাঁকা গুলি!) নির্দেশ দিলেন পুলিশ প্রশাসনকে। কিন্তু তার কিছুই হয়নি আজ পর্যন্ত।

সেদিন সাম্প্রদায়িকতার আগুনে পুড়ে যারা মারা গেছে তারা হলো, তেজেন্দ্র লাল শীল, বকুল শীল, অনিল শীল, স্মৃতি শীল, সোনিয়া শীল, বাবুটি শীল, রুমী শীল, প্রসাদী শীল, এ্যানী শীল, দেবেন্দ্র শীল ও ৪ দিনের শিশু কার্তিক শীল। যে রাতে আগুনে পুড়িয়ে মারা হলো এদেরকে তার আগেরদিনই ঐ ৪ দিনের নবজাতকের নাম কার্তিকশীল রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছিল পারিবারিক অনুষ্ঠান করে। তা আর করতে পারেনি ঐ শীল পরিবার।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের মর্মান্তিক এই ঘটনার পর অন্ততঃ ৫/৭ বার গিয়েছি ঐ শীলবাড়িতে। সর্বশেষ গত ৩১ আগস্ট। পোড়া ভিটেতে ঘরের কোন চিহ্ন নেই। একটি গোয়াল ঘর, কিছুটা অংশে পাটক্ষেত-আর কিছু অংশে ঘাস জঙ্গল হয়ে উঠেছে। তবে একটি পোড়া স্টীলের আলমারি এখনও পড়ে আছে ঐ ভিটেতে। নিহত তেজেন্দ্র শীলের ভাই শচীন্দ্র শীলের নির্মাণাধীন পাকা বাড়ির কয়েকটি কক্ষ এখন পুলিশের দখলে। পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে সেখানে। ১০ সদস্যের একটি টীম আসলে শুধু খেয়ে পড়ে ঘুমিয়ে সময় কাটায়। এছাড়া আর কোন কাজ নেই তাদের। কিন্তু তাদের থাকার ঘরের বিদ্যুৎবিল ও রান্না করার লাকড়ি যোগান দিতে হয় শীল পরিবারকেই। শচীন্দ্রশীল, তার স্ত্রী পুষ্পশীল ও পুত্রবধু দিন কাটান ঐ অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পের পিছনের ২টি কক্ষে। অথচ ঘরটি তার নিজের টাকায় তৈরি। সরকার স্থানীয় লোকজনের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করার ঘোষণা দিয়েই খালাস। সরকারের দায়-দায়িত্ব যেন এখানেই শেষ। পুলিশ সদস্যরা কোথায় থাকবে তার কোন ব্যবস্থা করেনি। শুধু তাই নয়, শীলবাড়িটির থেকে ৫০ গজ দুরে বনিকপাড়ার লোকজন ৫ গণ্ডা জায়গা দান করেছেন পুলিশ ক্যাম্প করার জন্য। ইট, বালু, রড, সিমেন্ট, টিন মিস্ত্রী খরচ সবই স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় নিজেরা চাঁদা তুলে যোগান দিচ্ছেন।

৩ মেয়েকে হারিয়েছেন সেদিন পুষ্পরানী শীল। বাবুটি শীল, প্রসাদী শীল ও এ্যানী শীল। বর্তমান অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করতেই ডুকরে কেঁদে উঠলেন। বললেন, আমার মেয়েদেরকে, ভাসুর, ভাসুরের ছেলেমেয়েদের যারা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে তাদের কী মা-বাবা, ছেলে মেয়ে নেই? কোন বিচার তো পেলাম না আজো। পুলিশ ক্যাম্প বসেছে তার ঘরে। অসুবিধা হলেও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন তারা। বললেন, পুলিশ আছে বলে এখন হয়তো আছি। নাহলে তো থাকতে পারতাম না। একমাত্র ছেলে সঞ্জীত দুবাইতে থাকে। তার পাঠানো টাকাতেই সংসার চলে।

একই বাড়ির শ্যামল শীল জানালেন, আগস্ট মাসে মন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরী ১৩ জনের নামে রিলিফের টিন বরাদ্দ দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের ১৩ জনকে দিয়ে মৌখিক অঙ্গীকার করিয়ে নিয়েছে যে এসব টিন তারা তাদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে পারবে না। সব টিন পুলিশ ফাঁড়ির জন্য দিতে হবে। শ্যামল বললেন, আমাদের দিতে তো কোন অসুবিধা নেই।, আমরা দিয়ে দিয়েছি সব। কিন্তু পুলিশ ক্যাম্প বসানোর জন্য সরকারিভাবে কোন বরাদ্দ নেই কেন? আমাদের রিলিফের টিন বরাদ্দ দিয়ে তা পুলিশ ক্যাম্পে লাগানো হচ্ছে, এ কেমন নিয়ম। আমাদের তো রিলিফের টিনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমরা আমাদের সবার স্বার্থে, নিরাপত্তার স্বার্থে পুলিশ ফাড়িটি করতে চাই। তাই কোন কিছু বলতে পারছিনা। ইতিমধ্যে ক্যাম্পের নির্মাণ

কাজের জন্য প্রায় আড়াই লাখ টাকা খরচ হয়ে গেছে। আরও প্রায় ২লাখ টাকা লাগবে। কিন্তু টাকা যোগাড় হচ্ছে না। তবে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় নিজেদের প্রয়োজনেই, নিরাপত্তার জন্য পুলিশ ক্যাম্পটি স্থাপন করতে চান। কিন্তু সরকার থেকে এজন্য কোন ধরনের আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়নি আজ পর্যন্ত। নিহত তেজেন্দ্র শীলের জীবিত ৩ ছেলের মধ্যে দুইজন বিমল শীল ও নির্মল শীল চট্টগ্রামে থাকেন। কিন্তু কেউই আর বাড়িতে থাকেন না। অপর এক ভাই সুনীল শীল মধ্যপ্রাচ্যের ওমানে থাকেন।

গত আগস্ট মাসের শেষ দিকে চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস রোধ ও নির্যাতনের প্রতিবাদে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্যপরিষদ চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে এক মানববন্ধনের আয়োজন করেছিল। তাতে বিমল শীল ও নির্মলও এসেছিলেন। দুজনেই ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, পত্রিকায় তো দেখলাম আমাদের ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আমিনুর রহমান চৌধুরী (বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরী চাচাতো ভাই) তার অনুগত সন্ত্রাসীদের দিয়ে আমাদের ঘরে আগুন দিয়ে মা-বাবা ভাইবোন সবাইকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে। আমরাতো দেখিনি কারা আগুন দিয়েছে। কিন্তু গত ৩ আগস্ট বন্দোরহাট থেকে ইউনুস নামে যে সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেতো র‍্যাব ও সাংবাদিকদের কাছে আমিন চেয়ারম্যানের নামই বলেছে।

অথচ আমিন চেয়ারম্যানকে তো পুলিশ বা র‍্যাব প্রেপ্তার করেনি। শুনেছি সে সাতকানিয়া সার্কেলের এএসপি ক্লারেন্স গোমেজের গাড়িতে করে ঘুরে বেড়ায়। এই যদি হয় অবস্থা তাহলে আমরা কবে আর এই নির্মম হত্যকাণ্ডের বিচার পাবো?

সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ঐ শীল পরিবারকে ৪ লাখ টাকা দেয়া হয়েছিল কিন্তু তারা প্রাণভয়ে আর নিজেদের ভিটেতে ঘর নির্মাণ করার সাহস পাননি। এই ৪ লাখ টাকার ১লাখ দেয়া হয়েছে শচীন্দ্র শীলকে যার ৩ মেয়ে সেদিন রাতে তার ভাই তেজেন্দ্র শীলের ঘরে ছিল। ঐ ৩ মেয়েও আগুনে পুড়ে মারা গেছে। মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা সাতকানিয়া সার্কেলের এএসপি ক্লারেন্স গোমেজের মোবাইলে তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চেয়ে ফোন করা হলে তিনি উল্টো রাগান্বিত স্বরে বলেন, আপনাদের সাংবাদিকদের কোন কথা বলবো না আমি, আপনারা উল্টো-পাল্টা কথা লেখেন এ ব্যাপারে। আমিনুর রহমান চৌধুরী (কালীপুর ইউপি চেয়ারম্যান) কে তার গাড়িতে করে ঘোরার বিষয়টি পত্রিকাতে লেখাতেই ক্ষেপে গেছেন তদন্ত কারি কর্মকর্তা ক্লারেন্স গোমেজ।

উল্টোপাল্টা কথা হয়ে যায় আমাদের পুলিশ কর্মকর্তাদের কাছে। অথচ ইতিমধ্যে এই মামলায় গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে ২ জন আসামী আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দীতে আমিন চেয়ারম্যানের জড়িত থাকার বিষয়টি বলেছে। সর্বশেষ গত ৩ আগস্ট ২০০৫ ইং তারিখে বহদ্দারহাট এলাকা থেকে র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া মোঃ ইউনুস সব গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়। এই ১১ হত্যার পিছনে গডফাদার হিসেবে আমিন চেয়ারম্যানের নাম গ্রেফতারকৃত ইউনুস বলেছে। এই ইউনুস ও আকবর নামে অপর এক সন্ত্রাসীকে আমিন চেয়ারম্যান চট্টগ্রাম শহরে পাঠিয়েছিল মোজাহের নামে এক বাস ড্রাইভারকে খুন করার জন্য। ধরা পড়ে যায় ইউনুস স্থানীয় জনতার হাতে। তারপর র‍্যাব এসে তাকে আটক করে নিয়ে যায়।

র‍্যাব-৭ (চট্টগ্রাম আঞ্চলিক জোন) কার্যালয়ে র‍্যাব কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ইউনুস জানিয়েছে, গত ২০০৩ সালের ১৮ নবেম্বর রাতে ঐ ঘটনার এক সপ্তাহ আগে আমিন চেয়ারম্যানের অফিসে বসে এই আগুন লাগিয়ে হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা হয়। ১৮ নবেম্বর রাতে আমিন চেয়ারম্যান প্রায় ৩ কেজি পরিমান গান পাউডার তুলে দেয় ঐ সন্ত্রাসী গ্রুপটির হাতে তেজেন্দ্র শীলের ঘরে আগুন দেয়ার জন্য। সে অনুযায়ী সন্ত্রাসী গ্রুপ গডফাদার আমিন চেয়ারম্যানের নির্দেশমত গানপাউডার ছিটিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারে সবাইকে। শুধুমাত্র ঘরে

থাকা বিমল শীল মাটির দোতলা ঘর থেকে লাফ দিয়ে বাইরে বের হয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল। ইউনুস জানিয়েছে, শীল পরিবারের জায়গা জমি দীর্ঘদিন ধরে দখল করতে চেয়েছিল আমিন চেয়ারম্যান। তা না পেরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারে ঐ রাতে।

ইউনুসকে চাঁন্দগাও থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার ভাষ্য অনুযায়ী মূল পরিকল্পনাকারী আমিন চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ বা র‍্যাব। উল্টো পুলিশ তাকে দিয়ে নানা ধরনের বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা শিখিয়ে ঘটনা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে চাইছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরী পুলিশ প্রশাসনের উপর তার অবৈধ প্রভাব খাটিয়েছেন বলে জানাগেছে। আমিন চেয়ারম্যানের সব অপকর্মের মদদাতা মন্ত্রী নিজেই এমন অভিযোগ বাঁশখালীর জনসাধারণের।

পূর্ব চাম্বলের নাথপাড়ায় আরতি'র ভিটেতে এখন জঙ্গল

বাঁশখালীর সাধনপুরে ১১ জনকে পুড়িয়ে মারার ঘটনার মাত্র সাড়ে ৭ মাস আগে এই উপজেলার পূর্ব চাম্বলের নাথপাড়ায় বিধবা আরতি বালা নাথের ঘরে কেরোসিন জাতীয় দাহ্য পদার্থ ঢেলে একই কায়দায় পুড়িয়ে মারা হয় ৩ প্রজন্মের নারীকে। ২০০৩ সালের ৮ মে রাতে বিধবা আরতি নাথের ঘরে আগুন দেয় পার্শ্ববর্তী সন্ত্রাসী জাহাঙ্গীর ও অন্য কয়েকজন সন্ত্রাসী। জীবন্তপুড়ে মারা যায় আরতি'র বৃদ্ধা মা ঝুনুবালা নাথ (৭০), মেয়ে চম্পাময়ী নাথ (১৪) ও আরতি বালা নাথ (৪০)।

সে রাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের এই হত দরিদ্র পরিবারের মাটির ঘরটিতে আগুন লাগানোর পর আরতি'র ছেলে সঞ্জীত নাথ ও দূরসম্পর্কের ভাই দুলাল কর্মকার কোন□মে বের হয়ে আসতে পারলেও ঐ তিনজন বের হতে পারেনি। তারা জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায় ঘরের ভেতরেই। ঘটনার পর বাঁশখালী থানা পুলিশের তৎকালীন ওসি বেলালউদ্দিন তরফদার মূল ঘটনাকে পাশ কাটানোর জন্য আরতির চরিত্রে কলংক লেপনের অপচেষ্টা করেন। তার বক্তব্য ছিল আরতি নাথের চরিত্র ভালছিল না, তাকে বারণ করেও কোন লাভ হয়নি, তাই হয়তো প্রতিবেশিরা ক্ষুব্ধ হয়ে তার ঘরে আগুন দিয়েছে ইত্যাদি। কিন্তু পত্রপত্রিকায় এনিয়ে লেখালেখি হওয়াতে, মহিলা পরিষদ ও মানবাধিকার সংগঠক লেখক শাহরিয়ার কবিরের নেতৃত্বে একটি মানবাধিকার টীম ঘটনাস্থলে গিয়ে এ ব্যাপারে সুষ্ঠ তদন্তের দাবি জানান এবং জাহাঙ্গীর সহ অন্য আসামীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান। এরপরে প্রশাসন কিছুটা নড়েচড়ে বসে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, ২০০৩ সালের ৮ মে ৩ জনকে পুড়িয়ে মারার পর কিন্তু গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এ ব্যাপারে কোন খোজ-খবর নেয়নি। কিন্তু গত ১৬ মে'২০০৩ ইং তারিখে শাহরিয়ার কবিরের নেতৃত্বে মানবাধিকার সংগঠকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করার পর চট্টগ্রামের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তৎপর হয়ে ওঠে। তবে তারা নিহত আরতি নাথ সহ ৩ জনকে পুড়িয়ে মারার পেছনে কারা রয়েছে তা জানার চাইতে বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে শাহরিয়ার কবির ও মানবাধিকার সংগঠকরা বাঁশখালী গিয়ে কি করেছেন তা জানার জন্য।

ঐ ঘটনার পর এ প্রতিবেদক অন্তত ৩ বার গেছেন ঘটনাস্থলে। সর্বশেষ গত ৩১ আগস্ট ২০০৫ইং তারিখে নাথপাড়ার হতভাগ্য আরতি বালা নাথের বাড়িতে। চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দুরে অজ পাড়া গাঁ নাথপাড়ায় আরতির ঘর ছিল। রাস্তায় মাটি ভরাটের কাজ ও পাটি বানিয়ে বি□ করে বিধবা আরতি সংসার চালাতো অনেক কষ্টে। কিন্তু তা আর সহ্য হয়নি এ সমাজের লোলুপ পুরুষদের। চোখ পড়ে তার উপর। বিভিন্ন হুমকি ধমকি আসে। অর্থের প্রলোভন দেখানো হয়। কোন কিছুতেই যখন রাজী হয়নি দৃঢ়চেতা আরতি নাথ তখন তার ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা হলো। তার উপর তার ভিটেমাটি দখল করার একটি চ□ান্ত

করেছিল জাহাঙ্গীর ও তার কয়েকজন সহযোগী সন্ত্রাসী।

মামলা করেছিল আরতির ছেলে সঞ্জিত নাথ। মামলার চার্জশীটও হয়েছে। বাঁশখালী ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মামলা চলছে। মামলার হাজিরা দিতে চট্টগ্রাম শহর থেকে বাঁশখালীতে কোর্টে হাজিরা দিতে হয় সঞ্জিত নাথকে। সঞ্জিত আর সুকুমার এই দুই ভাই বেঁচে আছে শুধু। গত ৩১ আগস্ট নাথপাড়ায় গিয়ে দেখাগেলো পোড়ামাটির ঘরটিতে তখন জঙ্গলে ভরে গেছে। পরিত্যাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে সেই ২০০৩ সালের মে মাস থেকে। কিন্তু এই ঘটনার অন্যতম হোতা জাহাঙ্গীরকে আজ পর্যন্ত গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ। সে স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত। ২০০৩ সালের ৮মে আরতির ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারার কয়েকদিন আগেও সে আরতির বাড়িতে এসে খুন করার ও আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারার হুমকি দিয়েছিল।

নিহত আরতিদের পার্শ্ববর্তী বাতাসী দেব নাথের (৫৮) সাথে কথা হয় এ প্রতিবেদকের। তিনি জানান, ওরা যে ঘর ঠিক করবে তার জন্য তো টাকা পয়সা দরকার। তা কই পাবে ওরা। দুই ভাই পেটের তাগিদে চট্টগ্রাম শহরে দুটি সেলুনে চাকরি করে কোনভাবে জীবন চালায়, মামলার হাজিরা দিতে বাঁশখালী গেলে তখন দুইভাই বাতাসী দেব নাথের ঘরেই থাকে বলে জানান তিনি। তার ছেলে টুনটু দেব নাথকেও পুলিশ সেই রাতে ঘর পোড়ার পর গ্রেপ্তার করেছিল। তবে সে কোনভাবে জড়িত না থাকায় ৩/৪ মাস পরে জেল থেকে জামিনে বের হয়ে আসে। মামলার প্রকৃত আসামীদের আদৌ কোন সাজা হবে কিনা তা নিয়ে সন্দিহান নাথপাড়ার অনেকে।

গত ৩১ আগস্ট নাথপাড়ায় গিয়ে জানা গেলো গত ৩ মাস আগে আরতিদের বাড়ির পাশে হরিপদ নাথের ঘরেও কে বা কারা আগুন দিয়েছিল। হরিপদ নাথের স্ত্রী মীনাময়ী দেবী জানান, রাত আনুমানিক ৮ টার দিকে কেরোসিন ছুড়ে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল তাদের ঘরে। কেরোসিনের একটি ছোট পাত্র পাওয়া গিয়েছিল ঘরের বাইরে। থানায় এ ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করতে গেলে থানা পুলিশ টাকা দাবি করাতে তারা টাকা দিতে না পারায় তা আর হয়নি। এভাবেই বাঁশখালীতে হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হচ্ছে।

পালেগ্রামের খোকন দাস স্ত্রী পুত্র কন্যা হারিয়ে এখন পাগল প্রায়

বাঁশখালীর পালেগ্রামের দত্তপাড়ার খোকনদাস (৫৯) ২০০১ সালের জুলাই মাসে চাকরি করতেন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে। কিন্তু ২০ জুলাই রাতে তার যে এতবড় সর্বনাশ হয়ে যাবে তা জানতেন না তিনি। বাড়িতে বেড়া আর টিনের ঘরে ঘুমন্ত স্ত্রী পুত্র কন্যারা। কিন্তু গভীর রাতে কেবা কারা সেই ঘরে আগুন দিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে তার স্ত্রী আলো রানী দাস (৪০), মেয়ে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী গোলাপ চাঁপা দাস (১৩) ছেলে দীপক দাস (১১) ও প্রদীপ দাস (৭) কে। আরও দুই ছেলে পুলক দাস ও অলক দাস সেদিন বাড়িতে না থাকায় রক্ষা পেয়েছে।

কারা তার ঘরে আগুন দিয়ে তার স্ত্রী-পুত্র কন্যাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে তার কোন কিছুই অনুমান করতে পারেননি হতভাগ্য খোকন দাশ। ২১ জুলাই ২০০১ সালে সকাল বেলা তার ছেলে অলকদাস তার পিতার কর্মস্থলে গিয়ে জানায় এই দুঃসংবাদটি। তারপরই ছুটে আসেন তিনি গ্রামে। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে তখন শুধু প্রিয়তম স্ত্রী পুত্র কন্যার পোড়া লাশ দেখতে পান। এ ব্যাপারে থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে মাত্র। ফলে এ ব্যাপারে আর কোন অগ্রগতি হয়নি বলে জানা গেছে।

সে সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে নিহতদের অন্ত্যোষ্টি□য়া সম্পন্ন করার জন্য সরকারের কাছ থেকে খয়রাতি সাহায্য হিসেবে মাত্র ৫ হাজার টাকা পেয়েছিলেন। এপর আর

কেউ কোন খোঁজ খবর নেয়নি এই পরিবারটির ।

২০০৫ সালের ৩১ আগস্ট বিকেলে যখন হতভাগ্য খোকন দাসের বাড়িতে যাই তখন তার পোড়া ভিটেতে নতুন করে আর কোন ঘর দেখা যায়নি । টাকার অভাবে ঘর তুলতে পারেননি । সেই ভিটাতেই নিহত ৪ জনের শ্মশান বেদী করা হয়েছে । খোকন দাস থাকেন তার ভাইয়ের ঘরে একা । বাদাম বিক্রি করে জীবন নির্বাহ করেন এখন । ছোট ভাই ননীদাসের স্ত্রীই তাকে রান্না করে দেয় । কিন্তু তিনি আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারেননি । গত ৪ বছর ধরে শুধু স্ত্রীপুত্র কন্যাদের স্মৃতি হাতড়ে বেড়িয়েছেন ।

সেদিন তার কাছে ঘটনা জানতে চাইলে বার বার ছোট বাচ্চার মত হাউমাউ করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন তিনি । দৌড়ে ঘরের ভিতর থেকে অতিযত্নে স্মৃতি আগলে রাখা স্ত্রী পুত্র কন্যার জীবিত ও মৃত অবস্থার ছবি বের করে নিয়ে আসেন । ছবিগুলো বুকে আকড়ে ধরে ডুকরে কেঁদে ওঠেন । বললেন, এত বছর কেউ তো আসেননি আমার খোঁজ-খবর নিতে । কি হবে আর আমার এই করুণ কাহিনী লিখে? আমার স্ত্রী ছেলে মেয়েকে তো আর ফিরে পাবো না । কয়েকটি ছবি চাইলাম তার কাছে তার স্ত্রী পুত্রদের । বললেন, সব নিয়ে যেতে পারেন আপনারা, আমি তো এতবছর আগলে রাখলাম এদের ছবি । এখনো মনে হয় আমার দীপক, প্রতী, গোলাপচাঁপা আমাকে বাবা বলে ডাকে । কিন্তু ওদেরকে তো আর ফিরে পাবো না আমি ।

শুধু এই তিনটি পরিবারকেই আগুন দিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়নি । গত ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চাম্বল এলাকায় বিজলী দাস নামে এক বিধবা মহিলাকে তার ঘরেই একই কায়দায় পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল । কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি কোনভাবে ঘর থেকে বের হয়ে প্রাণটি বাঁচিয়েছেন । সে ঘটনারও কোন সুরাহা হয়নি আজ পর্যন্ত । চট্টগ্রামের বিশিষ্ট মানবাধিকার সংগঠক এডভোকেট রানাদাসগুপ্ত এসব ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছেন, এভাবে হিন্দু সম্প্রদায়কে ঘরবাড়ি ভিটেমাটি ছাড়া করে তা গ্রাস করার জন্যই অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে আগুনে পুড়িয়ে সংখ্যালঘুদের হত্যা করা হচ্ছে ।

ডাকাতির নামে ধর্ষণ করা হচ্ছে ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিবারের প্রৌঢ়া থেকে কিশোরী পর্যন্ত

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২০০১ সালে বাঁশখালী থেকে জয়লাভ করেন ৪ দলীয় জোট প্রার্থী বিএনপি প্রার্থী জাফরুল ইসলাম চৌধুরী । তিনি বর্তমানে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী । কিন্তু তার নির্বাচনী এলাকাতেই ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর এত নির্যাতন নিপীড়নের ব্যাপারে তিনি বরাবরই নীরব থেকেছেন । বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন, নারী সংগঠন ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ যখন এই সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন, সোচ্চার হয়েছেন তখনই তিনি সোচ্চার হয়েছেন । তবে সেই প্রতিবাদ বা সোচ্চার হওয়াটা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে । তার দাবি বাঁশখালীতে কোন সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস হয়নি । যা ঘটেছে তা শুধু ডাকাতি ও বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনামাত্র ।

অথচ বাঁশখালীর বিভিন্ন এলাকা যেমন, কানীপুর, পালেগ্রাম, পুইছড়ি, কাথারিয়া, চাম্বল, ফোকদণ্ডী, জনদী সহ বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সময়ে সরেজমিনে গিয়ে যে চিত্র পাওয়া গেছে তা বিএনপি দলীয় বাঁশখালীর জনপ্রতিনিধি বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরীর বক্তব্যের অন্তসারশূন্যতাই প্রমাণ করে । ২০০২ সালের এপ্রিল মে মাসেই বাঁশখালীতে বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকাতে ডাকাতির নামে নির্বিচারে কমপক্ষে ৫ শতাধিক ঘরে নির্যাতন, নিপীড়ন চালিয়েছে সন্ত্রাসীরা । টাকা পয়সা, স্বর্ণালংকার ইত্যাদি কেড়ে নেয়ায় চেয়ে পৌঢ়া মহিলা থেকে শুরু করে ঘরের বধূ ও কিশোরীদের ধর্ষণ ও নির্যাতনই মুখ্য ছিল ডাকাতির নামে সংঘটিত এসব ঘটনায় । অনেক ক্ষেত্রেই মামলা করার সাহস পাননি গৃহকর্তা বা

ভুক্তভোগীরা । মামলা করলে একদিকে পুলিশের হয়রানি, সন্ত্রাসীদের হুমকি, অপরদিকে ঘরের মা-বোনদের সম্ভ্রম নিয়ে আবারো টানাটানি হবে এ ভয়ে অনেকে তা করতে রাজী হননি । আবার অনেকে থানায় মামলা করতে গেলেও পুলিশ মামলা নেয়নি । গত জুন ২০০৫ সালেও বাঁশখালী থানা সদরের কাছে ব্র্যাক নামে একটি এনজিও সংস্থার এক মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী (হিন্দু সম্প্রদায়ের) ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ।

তিনি প্রথমে থানায় মামলা করতে গেলে থানা মামলা নেয়নি । পরে স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনারদের সুপারিশে ও ৮০০ টাকা উৎকোচ দিয়ে থানায় মামলা দায়ের করতে হয়েছে সেই মহিলাকে ।

২০০২ সালে এপ্রিল মে মাসে সংঘটিত ডাকাতির নামে নির্বিচারে নারী নির্যাতনের ঘটনার পর অনেক ঘরেই ৫০ বছরের নীচে কোন মহিলা আর ঘরে থাকেনি । এমনকি পালেগ্রামে ঐতিহ্যবাহী আদিত্য আশ্রমেও হামলা চালিয়ে ছিল সন্ত্রাসীরা । অতিসম্প্রতি আবার গিয়েছিলাম সেই আদিত্য আশ্রমে । আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা প্রদীপানন্দ ব্রহ্মচারী অভিযোগ করলেন, ২০০২ সালে তার মন্দিরে ও আশ্রমে যে সন্ত্রাসীরা হানা দিয়েছিল তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বা কোন বিচার হয়েছে বলে আজ পর্যন্ত শুনিনি । সেই সময় আশ্রমের শিষ্য ও আশ্রমের মহিলা আশ্রিতারা সন্ত্রাসীদের হাতে নির্যাতিত ও ধর্ষিতদের কেউই আর ভয়ে লজ্জায় এ প্রতিবেদকের সামনে আসতে চাননি । ছবি পর্যন্ত তুলতে দিতে নারাজ তারা । একটি মামলাও হয়েছিল তখন (নং-৯ (৫)২০০২) । কিন্তু তার কোন সুরাহা হয়েছে কিনা জানেন না প্রদীপানন্দ ব্রহ্মচারী ।

পালেগ্রামের উষাচক্রবর্তী তখন জানিয়েছিলেন, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ও পাঞ্জাবিরা এ ধরনের নির্যাতন করেনি । তিনি ২০০২ সালেই তার দুই এইচএসসি পরীক্ষার্থীনী মেয়ের সম্ভ্রম বাঁচানোর জন্য অন্য আত্মীয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । বিজয়গোপাল হোড়ের স্ত্রী ছিলেন তখন ৬২ বছরের পৌঢ়া । তাকেই রেহাই দেয়নি সন্ত্রাসীরা । ধর্ষণের শিকার হতে হয়েছিল তাকেও । এ অবস্থার মধ্যে ২০০২ সালের মে মাসে কয়েকদিনের জন্য পালেগ্রাম হরিমন্দিরের কাছে একটি অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছিল । কিন্তু তাও পরবর্তীতে আবার তুলে নেয়া হয় । এসব ঘটনা নিয়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ চট্টগ্রাম জেলা শাখা ও কেন্দ্রীয় কমিটি আলাদা আলাদা সাংবাদিক সম্মেলনও করেছিলেন দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে । তারা নির্যাতিত নিপীড়িত ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তাবিধানেরও দাবি জানিয়েছিলেন । অথচ স্থানীয় মন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরী এসব ব্যাপারে কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেননি । উল্টো তিনি মানবাধিকার সংগঠনের প্রতি দোষারোপ করে বলেছেন তারা তার ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য এসব অভিযোগ করছেন ।

কিন্তু ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িতে ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বারবার হানা দিয়ে ডাকাতির নামে লুটপাট, ধর্ষণ, এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে বাঁশখালীর হিন্দুরা । প্রায় শতাধিক পরিবারের ঘরে এখন কেউ থাকে না । কারো ঘরে ২/১ জন সদস্য শুধু ঘর পাহারা দিয়ে রয়েছেন । বাকীরা ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন অন্যত্র । কেউ বাঁশখালীর বাইরে, আবার কেউ দেশ ছেড়েই চলে গেছেন ।

গত ৩১ আগস্ট ২০০৫ ইং পূর্ব চাম্বলের মনোরঞ্জন ধরের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল তার ঘরের দরজা তালাবদ্ধ । প্রায় ৩ বছর আগে তার বাড়িতে একদিন সন্ধ্যায় সন্ত্রাসীরা ঢুকে ৭০ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ ২লাখ টাকা নিয়ে যায় । ছুরিকাঘাত করে তার স্ত্রী মীনা ধর ও ছেলে নারায়ণ ধরকে । এরপরে চাম্বল বাজারে তাদের স্বর্ণের দোকানেও হানাদেয় । বাধ্য হয়ে মনোরঞ্জন ধর সপরিবারে এখন নিজের ভিটেমাটি ছাড়া ।

মনোরঞ্জন ধরের পাকা ঘরের পাশেই তার ছোট ভাইয়ের ঘর । ছোট ভাইয়ের স্ত্রী দীপালী

ধর জানান, ঘরে ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে বার বার সন্ত্রাসী হামলার পর তারা উপজেলা সদরে কোথাও আছেন বলে শুনেছেন। কিন্তু সত্যিকার অর্থে কোথায় আছেন তা আর জানাতে পারেননি। পূর্ব চাম্বলের অনেক হিন্দু পরিবারই এখন আর নিজেদের বাড়িতে থাকেন না।

কালীপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ সাধনপুর এলাকার অশীতিপর বৃদ্ধ অনন্তমোহন শীল জানান, শীলপাড়ারই নেপাল শীল, ভট্টশীল, ফনিন্দ্র শীল, মাখন শীল বাড়ি ছেড়ে চলেগেছেন। পার্শ্ববর্তী বণিক পাড়ার অনিল ধর, সোনাধর, মৃদুল ধর, কালীপদ ধর, ননী ধর, মিলন ধর, অমর চাঁদ ধর বাঁশখালী ছেড়ে এখন কক্সবাজার ও রাঙ্গামাটিতে আছেন বলে জেনেছেন। অপরদিকে ধীরেন ধর ও সুনীল ধর ভারতে চলে গেছেন বলে জানেন তিনি। শীলপাড়ার প্রায় ৪৫ ঘরের মধ্যে অনেকেই ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন।

তবে বাঁশখালীর বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোকজনের সাথে আলাপ করে জানাগেছে, হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক পরিবারের লোকজন তাদের সোমত্ত মেয়েদেরকে গ্রামের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন অন্তত নির্যাতন, ধর্ষণের হাত থেকে বাঁচার জন্য। অনেক হিন্দু পরিবারের কোন কোন সদস্যকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। সেখানেই তারা একটি ঠিকানা ও আয় রোজগারের পথ বের করতে পারলে পরিবারের বাকী সদস্যরাও পরবর্তীতে জায়গা জমি বিক্রি করে চলে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করছেন। তবে অধিকাংশই ভারতে চলে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করছেন। কিন্তু কেউই এ ব্যাপারে মুখ খুলতে নারাজ। তাদের বক্তব্য হলো, ভারত ছাড়া অন্য কোন দেশে যদি আমাদের পরিবারের সদস্যরা যায় এতে কোন সমস্যা নেই, কিন্তু যদি জানতে পারে যে ভারতে গেছে তাহলেই সমস্যা। তাই আমরা এ ব্যাপারে কিছুই বলতে পারবো না।

মূলতঃ বাঁশখালীর প্রতিটি হিন্দু পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একধরনের আতংক বিরাজ করছে। পালেগ্রামের উত্তম, তপন, রূপন সহ আরো কয়েকজন গত **৩১** আগস্ট ২০০৫ ইং এ প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, তারা এখনো রাতের বেলা পাহারা দিয়ে থাকেন সন্ত্রাসীদের ভয়ে।

কারা এবং কাদের ইন্ধনে বাঁশখালীতে সন্ত্রাস চালানো হয়েছে তার সবকিছুই জানেন বাঁশখালীর হিন্দু সম্প্রদায়। কিন্তু কেউই ভয়ে মুখ খুলতে চাননা। শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের বাসিন্দারা নয় মুসলিমরাও নারাজ কিছু বলতে। কারণ সন্ত্রাসী আর তাদের গডফাদাররা এতই শক্তিশালী যে, কোনভাবে তথ্য প্রদানকারিদের নাম প্রকাশ হলেই নানা ধরনের হামলা নির্যাতন আর মিথ্যা মামলার শিকার হতে হবে তাদেরকে।

অজানা আতঙ্ক আর হতাশা ফুটে ওঠে সাধনপুরের শীলপাড়ার নির্মল শীল ও বিমল শীলের কথায়। গ্রেপ্তারকৃত আসামী আমিন চেয়ারম্যানের লালিতপালিত সন্ত্রাসী মোঃ ইউনুসের স্বীকারোক্তিতে **১১** হত্যার ব্যাপারে আমিন চেয়ারম্যানের প্রত্যক্ষ ইন্ধন ও মদদ থাকার বিষয়টি প্রকাশ পেলেও পুলিশ আজ পর্যন্ত তাকে গ্রেপ্তার করেনি। ভয়ে ঐ পরিবারের সদস্যরা আর গ্রামের বাড়িতে ঘর পর্যন্ত তৈরি করেননি। কিন্তু মুখ ফুটে সেই নির্মম সত্য কথাটি পর্যন্ত বলতে পারছেন না তারা। এভাবেই দেশের অন্যান্য স্থানের মত বাঁশখালীতে জোট সরকারের নেতাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ভিটেমাটি ছাড়া করার এক অমানবিক অশুভ চক্রান্ত চলছে।

সমরেশ বৈদ্য

দশ

ডেটলাইন ঃ বাগেরহাট

রামপালের নির্যাতিত সেই ছবিরাণী ভালো নেই

রামপালের সেই ছবিরাণী ভালো নেই। ২০০২ সালের **২১** আগস্ট স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মী-সমর্থকরা তাঁকে অমানবিক নির্যাতন করার পরেও রেহাই দেয়নি। পদে পদে তাঁকে হেনস্থা করা হচ্ছে। তাঁকে নির্যাতন করা সংক্রান্ত মামলাটির সাক্ষ্য পর্ব এগিয়ে আসায় হেনস্থার মাত্রা বেড়ে গেছে। নারী পাচারকারী, নারীদের নিয়ে অনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকাসহ তাঁর নামে নানা অভিযোগ তুলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বিভিন্ন বাহিনীর কাছে অভিযোগ দাখিল করা হচ্ছে। আর ব্যক্তিগতভাবে হুমকি-ধামকি, অপহরণ চেষ্টাতো আছেই। একদিকে সন্ত্রাসীদের নিরন্তর চাপ, অন্যদিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিতদের জিজ্ঞাসাবাদ-এই দুই চাপে পড়ে অসুস্থ পঙ্গুত্ববরণকারী ছবিরাণীর স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যহত হচ্ছে। এই দম আটকানো পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে তিনি আগস্ট মাসে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

প্রতিহিংসামূলক ঘটনায় আমাদের সমাজে নারী নির্যাতনের ঘটনা একটি নিয়মিত বিষয়। ২০০১ এর অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বাগেরহাটের রামপালে এমনি একটি নারকীয় ঘটনা ঘটে। তাঁকে শুধুমাত্র আক্ষরিক অর্থে ধর্ষণ করা হয়নি, উলঙ্গ করে বর্বরভাবে পিটানো হয়, মাথার চুল ছেটে দেয়া হয়, ওই অবস্থায় ছবি তুলে রাখা হয়। শরীরের এমন কোন জায়গা বাকি ছিলো না যেখানে আঘাত করা হয়নি। শরীরের স্পর্শকাতর প্রতিটি অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করা হয়। বিশেষ করে গোপনাঙ্গ, হিপজয়েন্ট, দুই পায়ের আঘাত ছিল গুরুতর। আক্রমণ-নির্যাতনকারীরা আবার মেয়েটিকে 'খারাপ' সাজিয়ে থানা পুলিশের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতির কারণে সেই মুহূর্তে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই অমানবিক খবরটি জানাজানি হয়। দেশজুড়ে ছিঃ ছিঃ রব ওঠে। বিস্ময়কর হচ্ছে, এই ঘটনাটি ঘটেছিল স্থানীয় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের অফিসে।

ঘটনার শিকার ছবি রাণী। তিনি গ্রামের এক গরীব পরিবারের সন্তান। জীবিকার তাগিদে পিতৃহীন পরিবারে অন্য কোন পুরুষ সদস্য না থাকায় তিনিই অর্থোপার্জনের দায়িত্ব নেন। না হলে তিনি তার বোন এবং মায়ের প্রতি দায়িত্বও পালন করতে পারতেন না। একারণে চিংড়ি উৎপাদনে খ্যাত রামপালে ছবিরাণী নিজেই চিংড়ি চাষ ও উৎপাদনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। উৎপাদিত পণ্য বিপণনের সুবিধার্থে তিনি এর বিপণন ব্যবসায়ও যুক্ত হন। কিন্তু তিনি তো একজন নারী। এই সমাজ নারীকে স্বাধীন, অর্থোপার্জনকারী, স্বাবলম্বী হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত নয়। সমাজে দুর্বলতর অংশ হিসাবে নারীকে পদে পদে হেনস্তার শিকার হতে হয়। নারীর সাহসী কোন উদ্যোগকে নীচুতার সঙ্গে, রুচিহীনতার সঙ্গে দেখা হয়। অবশ্য পণ্য বিপণনের চলমান সাংস্কৃতিক আবহ নারীকে পণ্য হিসাবে দেখাতে-দেখতে অভ্যস্ত। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। ধনশালী অনেক নারী শহরাঞ্চলে নানা উদ্যোগ-কর্মকাণ্ড করে চলেছে। কিন্তু গ্রামীণ বিরুদ্ধ পরিবেশে নারী, তাও আবার ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন নারীর পথচলা খুবই দুরূহ। চারিদিকে হায়েনার লাল জিহ্বা লকলক করে। সময় এবং সুযোগ পেলেই হামলে

পড়ে। ছবিরাণীর ক্ষেত্রেও এই ঘটনা ঘটে।

রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকে তার বিপদের মাত্রা বাড়তে থাকে। চারিদিকে তখন চিংড়ি ঘের দখলের উৎসব চলছে। তার ঘেরটি দখল হবে না কেন? তিনি একে নারী, তার ওপর ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য, আবার আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। যেখানে আওয়ামী লীগের বড় বড় নেতাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা, সেখানে নামকাওয়াস্তে এক নেতার সামর্থই বা-কি! একদিন ঠিকই তার চিংড়ি ঘেরটি দখল করে নেয়া হলো। বলা হলো চিংড়ি ঘেরটি তাদের। এর সপক্ষে তাদের কাগজ-পত্র আছে। এই নিয়ে স্থানীয়ভাবে সালিশ বৈঠক হলো। দখলকারী দোষী সাব্যস্ত হলো। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তারও করে। কিন্তু যথারীতি সে ছাড়া পেয়ে যায়। একজন নারী, সেতো অবলা। তার এতো দুঃসাহস। শুরু হলো দেখে নেয়ার পালা। চিংড়ি ঘের আবার দখল করে নেয়া হলো। বাড়ীর জমিও দখল করে নেয়ার চেষ্টা চলে। উপায়হীন ছবি রাণী আদালতের শরণাপন্ন হলেন। কিন্তু তার পক্ষে কে লড়বে! তাকেই উপজেলা থেকে জেলা সদর বাগেরহাট পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। এমনি একদিন ২০০২ সালের ২১ আগস্ট ছবিরাণী বাগেরহাট থেকে বাড়ী ফিরছিলেন। রামপাল বাসস্টান্ডে বাস থেকে নামার পরপরই স্থানীয় ক্ষুব্ধ বিএনপি নেতা-কর্মীরা তার ওপর হামলে পড়ে।

আঘাতে আঘাতে ছবিরাণী যখন মৃতপ্রায়, তখন তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। শুরু হয় মানসিক পীড়ন। নির্যাতনকারীরা সঙ্গাহীন ছবিকে নষ্টা মেয়ে আখ্যা দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়ার চেষ্টা করে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে এ খবর জানাজানি হবার পর দেশব্যাপী নিন্দার ঝড় ওঠে। চাপের মুখে পুলিশ প্রশাসন ছবিরাণীর জবানীতে এই ঘটনার মামলা গ্রহণ করে আসামী করা হয় স্থানীয় বিএনপি নেতা মজনু রহমান, আবুল বাশার কাজী, তায়েব নূর, কামাল ইজারাদার, জামাল শিকারী, বজলুর রহমান, কাজী হুমায়ুন কবির হিমু, এমদাদুল হক, এমএ মান্নান, আলতাফ, মোস্তাফিজুর রহমান, কামাল শিকারী, আব্দুল ওহাব, মেঝে শিকদার, ইলি ফারায়েজী ও জিন্নাত। তবে প্রথম থেকেই বিষয়টি উপেক্ষা করার প্রবণতা ছিল। যেহেতু ঘটনার সঙ্গে সরকারি দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে, তাই ঘটনাটি নিয়ে নানা টালবাহানা চলে। অবশ্য, প্রবল জনমতের চাপে দুই মাসের মাথায় ২৩ অক্টোবর রামপাল থানা পুলিশ এই মামলার চার্জশীট দেয়। এতে আবুল বাশার কাজীসহ ১৫ জনকে অভিযুক্ত করা হয়। এরা প্রত্যেকেই বিএনপির নেতা-কর্মী-সমর্থক।

অমানবিক এই নির্যাতনে গোটা দেশে ধিক্কার ওঠে। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের সহায়তায় তাঁকে খুলনা ও ঢাকায় চিকিৎসা করানো হয়। তাঁর শরীরে একাধিক অস্ত্রোপচার করা হয়। এক বছরেরও বেশী সময় ধরে তাঁকে নানা জায়গায় চিকিৎসা নিতে হয়। খুলনা ও ঢাকার বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে তিনি চিকিৎসা নিয়েছেন। বিভিন্ন সহৃদয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাঁর চিকিৎসার খরচ যুগিয়েছে। তিনি বহুদিন পর্যন্ত আ□মণকারীদের ভয়ে-আতঙ্কে তাঁর গ্রামের বাড়ীতে ফিরতে পারেননি। সরকার দলীয় নেতা-কর্মীদের নামে মামলার চার্জশীট দেয়ায় মামলা প্রত্যাহার করার জন্যে তাঁর ওপর অব্যাহত চাপ প্রয়োগ হতে থাকে। আ□ান্ত হওয়ার প্রায় দুই বছরের মাথায় তিনি বাড়ীতে যান।

এখনও তিনি স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারেন না। কিন্তু আসামী হওয়া সরকারি দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের রোষানল থেকে তিনি মুক্তি পাননি। সরকারি দলের সঙ্গে যুক্ত থেকে চার্জশীটভুক্ত আসামী হওয়া কি কম কষ্টের কথা। মামলা প্রত্যাহার করে নিতে নানাভাবে ভয়ভীতি, হুমকিধমকি দিতে থাকে। শুধুমাত্র ছবিকে নয়, তাঁর বিধবা মা, ছোট ভাই, এমনকি নিকটাত্মীয়দের ওপর হুমকিধমকি চলতে থাকে। একাধিকবার শারীরিক আ□মণেরও চেষ্টা চালানো হয়। ছবিরাণী এসব ঘটনা জানিয়ে রামপাল থানায় একাধিক জিডি দাখিল করেছেন।

ভীতি-শঙ্কার মুখে তিনি বর্তমানে তাঁর ওড়াবুনিয়া গ্রামের বাড়ি ছেড়ে রামপাল সদরে এসে বসবাস করছেন। কিন্তু দুর্বৃত্তরা তাঁর পিছু ছাড়েনি। পঙ্গপালের মত তাকে অনুসরণ করছে। মামলাটির সাক্ষ্য পর্ব শুরু হওয়ার দিন এগিয়ে আসায় আসামীরা আরও বেপরোয়া হয়ে পড়েছে। তারা একদিকে সাক্ষীদের ভয়ভীতি দেখিয়ে সাক্ষ্য না দেয়ার জন্যে হুমকিধমকি অব্যাহত রেখেছে। অন্যদিকে, ছবির নামে নানাধরনের কুৎসা রটনা শুরু করেছে। বলা হচ্ছে, সেই পুরনো কথা; ছবি খারাপ মেয়ে। তিনি নারী পাচারকারী। নারীদের দিয়ে তিনি নানা অনৈতিক কাজ করান। চরমপন্থী, অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের সঙ্গে তার যোগাযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগ পুলিশের বিভিন্ন অফিস ছাড়াও র‌্যাবের কাছে করা হয়েছে। উপরন্তু, ২০০৫ সালের ১ আগস্ট তাকে অপহরণের চেষ্টা করা হয়। এসব ঘটনায় নির্যাতিত অসহায় ছবিরাণী চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তিনি তাঁর জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বরাবর আবেদন করেছেন। ছবিরাণীর মামলাটি হাইকোর্টের নির্দেশে খুলনার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালে বিচার চলছে। অক্টোবরে এই মামলার সাক্ষ্য শুরু হবে।

গৌরাঙ্গ নন্দী

প্রিপ ট্রাষ্টের প্রতিবেদন (সংক্ষেপিত)

ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা সর্বত্র আতঙ্কগ্রস্ত (সেপ্টেম্বর - নবেম্বর, ২০০১)

ভূমিকা

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের বিষয়টি জাতীয় সংবাদপত্র এবং ইলেক্ট্রনিক সংবাদ মাধ্যমের প্রধান সংবাদ হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা অতীতেও বহুবার সহিংসতার মুখে পড়েছে কিন্তু এবারে তার ব্যাপকতা এবং স্থায়িত্ব অতীতের সকল মাত্রাকে অতি□ম করে যায়। ভুক্তভোগী অনেকে বলেছেন, বাংলাদেশে অতীতে আর কখনো তাঁরা এরূপ নির্মমতার শিকার হন নি।

নির্বাচনোত্তর সময়ে এনজিও এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হয়ে দাঁড়ায় সন্ত্রাসী এবং মৌলবাদীদের আ□মণের শিকার। দোকান ও বাড়িঘরে আ□মণ ও হামলা, লুটপাট, হত্যা, ধর্ষণ, লাঠিপেটা এবং চাঁদাবাজির শিকার হয় প্রধানত ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা। গোটা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে একটি নিরাপত্তাহীনতা। মানুষ বাড়ির বাইরে বেরোচ্ছে না, এমনকি আ□মণের ভয়ে শিশু-কিশোরেরা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেছে।

বলা হচ্ছে যে, সন্ত্রাসীদের সমর্থনে এক শ্রেণীর অপরাধী এসব অমানবিক কর্মকাণ্ড চালিয়েছে। দুর্বৃত্তরা সংখ্যালঘুদের দু'ভাবে হয়রানি করেছে ঃ দৈহিক এবং মানসিক। মানসিক হয়রানির মধ্যে রয়েছে মন্দিরে হামলা, লুটপাট, হিন্দু গ্রামগুলোতে গুলিবর্ষণ, চাঁদাবাজি, নানা ধরনের ভীতি প্রদর্শন, ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার ও দেশত্যাগের হুমকি ...। দৈহিক হয়রানির মধ্যে রয়েছে নারীদের সম্ভ্রমহানি ও ধর্ষণ, বাড়ি থেকে বলপূর্বক উৎখাত, লাঠিপেটা, শারিরিক নির্যাতন, ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংস সাধন, জমিদখল ইত্যাদি। কোনো কোনো এলাকায় সংখ্যালঘুরা আ□মণের লক্ষ্যবস্তু হয় নির্বাচনের আগে থেকেই এবং এ-পরিস্থিতি এখনও পর্যন্ত অপরিবর্তিত রয়েছে অধিকতর তীব্রতায়।

বাংলাদেশে প্রায় সকল জেলাই এই সকল সহিংস ঘটনা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত, তবে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বরিশাল এবং খুলনা বিভাগের জেলাসমূহ।

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে ধর্ষণ, বলপূর্বক উচ্ছেদ, যৌন হয়রানি এবং শারীরিক নির্যাতনের ঘটনার সংখ্যা/পৌনপুনিকতার ভিত্তিতে।

তথ্যের উৎস

এখানে তথ্য সংকলিত হয়েছে ছ'টি দৈনিক সংবাদপত্র— জনকণ্ঠ, সংবাদ, ভোরের কাগজ, ডেইলি স্টার, প্রথম আলো এবং আজকের কাগজ থেকে। বর্তমান প্রতিবেদনটি হচ্ছে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতনের সম্পর্কে এ সকল দৈনিকে ২রা অক্টোবর থেকে ৩০শে অক্টোবর

প্রকাশিত সংবাদের সারসংক্ষেপ।

মূল তথ্য

সহিংসতার মাত্রার কারণে ধর্মীয় সংখ্যালঘুগণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁদের অনেকে বিক্ষিপ্ত আ□মণে এবং সংঘর্ষে আহত। তাদের ঘরবাড়ি এবং মন্দিরগুলো আ□ান্ত ও তছনছ হয়েছে। দুর্বৃত্তরা তাদের পুকুরের মাছ নিয়ে গেছে, লুট করেছে খামার থেকে হাস-মুরগী এবং হালের বলদ, অনেক পরিবার পালিয়ে গেছে এবং লুকিয়ে রয়েছে। অন্যান্য হয়রানি ছাড়াও তাদেরকে নানা রকম হুমকি দেয়া হয়েছে। দুর্বৃত্তরা প্রথমে তাক করে পুরুষদের ওপর এবং পরবর্তীতে নির্বিচারে উৎপীড়ন চালায় নারীদের ওপর।

এনজিওদের ওপর হয়রানি

বাংলাদেশের ছ'টি প্রধান দৈনিক সংবাদপত্র— বাংলাদেশ অবজার্ভার, ভোরের কাগজ, ডেইলি স্টার, জনকণ্ঠ, প্রথম আলো অনুযায়ী, ১লা অক্টোবরের জাতীয় নির্বাচনের পর থেকে এনজিওগুলোর ওপর দমন-নিপীড়ন চলছে। স্থানীয় নেতা, সন্ত্রাসী এবং পরিচিত সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের তরফ থেকে।

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো হচ্ছে ঃ বরিশালের আগৈলঝাড়া এবং গৌরনদী থানা, কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া থানা, রাজশাহীর বাগমারার হাটগঞ্জপাড়া, নাটোর, পাবনা, জয়পুরহাট সদর থানার সবুজনগর গ্রাম এবং সাতক্ষীরা জেলা। সূত্র থেকে জানা গেছে, বরিশালে ব্র্যাকের এক কর্মীকে কুপিয়ে মারা হয় (দৈনিক অবজার্ভার, ১.১০.০১), প্রশিকার দুই কর্মচারী ছুরিকাহত হন, উত্তরণের কর্মীদের পুড়িয়ে মারার হুমকি দেয়া হয় এবং সাতক্ষীরা জেলার ৪০টি এনজিও একই রকম হুমকির মুখে পড়েন।

বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার একটি স্থানীয় এনজিও'র সহায়সম্পদ লুট করা হয়। (১১-১০-০১ তারিখে) কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া থানার স্থানীয় প্রশিকা এবং ব্র্যাক অফিস জ্বালিয়ে দেয়া হয়। রাজশাহীর বাগমারা থানার হাটগঞ্জপাড়া গ্রামের ব্র্যাক অফিসের কর্মীদের, নাটোরের কারবালা গ্রাম উন্নয়ন কেন্দ্র, পাবনার দুলাই জনকল্যাণ সংস্থার নারী কর্মীদের বলপূর্বক তাড়িয়ে দেয়া হয়। পাবনার ঐ স্থানীয় এনজিও'র নির্বাহী পরিচালক এবং তিনজন কর্মচারী শটগান, বিস্ফোরক দ্রব্যাদি এবং দেশীয় অস্ত্রের আঘাতে আহত হন।

ধর্ষণ

বিপন্ন এবং হুমকিগ্রস্ত মেয়েদেরকে তাদের অভিভাবকরা শহরের আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ভোলা জেলার লালমোহন থানার লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়নে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে এবং নারীরা গণধর্ষণের শিকার হয়। কন্যা এবং স্ত্রীর সম্ভ্রমহানির ঘটনা অভিভাবকরা প্রকাশ করতে না চাওয়ায় ধর্ষণের অধিকাংশ ঘটনা প্রকাশিত হয়নি। নারীর শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছে ভোলা, পটুয়াখালী, বাগেরহাট, বরিশালের আগৈলঝাড়া, গৌরনদী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এবং সিরাজগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থানে।

পরিবেশিত তথ্য থেকে দেখা যায় সর্বাধিক সংখ্যক ধর্ষণ ঘটেছে ভোলা এবং পটুয়াখালীতে। বৃহৎ অঙ্কের চাঁদার টাকা দিতে অস্বীকার করায় বরিশালে মেয়েদেরকে অপহরণ ও ধর্ষণ করা হয়।

এনজিও প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের নিয়ে গঠিত একটি দল লালমোহনের লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়ন সফর করেন এবং জানতে পারেন যে দুর্বৃত্তরা সেখানে প্রায়

১০০ জন নারীকে ধর্ষণ করেছে। নির্যাতিতের মধ্যে অধিকাংশই বহিরাগতদের উপস্থিতিতে স্ত্রী-কন্যার ধর্ষণ সম্পর্কে মুখ খুলতে নারাজ— প্রথমত লোকলজ্জায়, দ্বিতীয়ত তথ্য প্রকাশ হলে পুনরায় দুর্বৃত্তদের হাতে নির্যাতনের সম্ভাবনা।

অমানবিকতার বিচারে লালমোহন উপজেলার অবস্থা ছিল সবচেয়ে খারাপ। একটি সাধারণ শে-াগান ছিল 'একটা দুইটা মালু (হিন্দু) ধর, রাত ভইরা ভোগ কর'।

হুমকি এবং ধ্বংস

কর্মী এবং সন্ত্রাসীরা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্যে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। নির্বাচনী প্রচারের একেবারে শুরুতেই তারা সংখ্যালঘুদের হুমকি দিতে থাকে। বিজয়ের পর তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের দৈহিকভাবে আ□মণ করতে থাকে। এরই সাথে নির্বিচারে চাঁদা আদায় এবং সম্পত্তি দখল চলতে থাকে। তারা তাদেরকে নিরন্তর হুমকি দিতে থাকে, রাতের ঘুমও বন্ধ হয়ে যায়। হুমকি প্রদান এবং চাঁদার দাবি না মেটানো হলে শুরু হয় দৈহিক হামলা ও পাশবিক নিপীড়ন।

হামলাকারীরা ঘরবাড়ি ধ্বংস, সম্পত্তি লুটপাট এবং লোকজনকে এলাকা ত্যাগে বাধ্য করেছে। তারা মুদির দোকানে আগুন লাগিয়ে দেয়, হিন্দু ব্যবসায়ীদের ব্যবসাকেন্দ্রগুলো ধ্বংস করে। সংখ্যালঘুদের বহু ঘরবাড়ি এবং ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হয়, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়।

বাস্তুত্যাগ ও দেশান্তর

অনেক মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়। সিরাজগঞ্জে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের চার শত ব্যক্তি ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। সন্ত্রাসীরা তাদের দেশত্যাগ করতে বলে। নিরাপত্তার জন্য শত শত বাংলাদেশী হিন্দু পরিবার সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে যায়। অনেকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়, কারণ হামলাকারীরা তাদের সবকিছু লুট করে এবং বাড়িঘর ছেড়ে যাওয়ার জন্য বলপ্রয়োগও করে। নতুনভাবে বাঁচার জন্য এভাবেই তারা অন্যত্র চলে যায়। প্রথমে বাড়ি ত্যাগ করে বিভিন্ন জেলা পরিবারের পুরুষ সদস্যরা এবং তারপর যুবতী নারী সদস্যরা। কোনো কোনো ঘটনায় পুরুষ সদস্যকে বাইরে টেনে এনে মেরে ফেলাও হয়। এভাবে নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেলে গোটা পরিবারটিই পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ থেকে বেশ কিছু সংখ্যক লোকের গৃহত্যাগের চিত্র পাওয়া যায়— যা সমগ্র চিত্রের খণ্ডিত অংশ মাত্র।

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত

একটি গোটা ধর্মীয় সম্প্রদায়কে ভীতিগ্রস্ত করে তোলার সর্বাধিক সা□িয় পথ হল তাদের ধর্মীয় আরাধ্য দেবদেবীর মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করা। সন্ত্রাসী ও মৌলবাদীরা বহু মন্দির এবং মূর্তি ধ্বংস বা অপবিত্র করে।

উপসংহার

এটি অত্যন্ত দুঃখজনক যে স্থানীয় সরকার এবং পল-ী উন্নয়ন মন্ত্রী সংবাদপত্রের একাংশে প্রকাশিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের ওপর নির্যাতন ও হয়রানির প্রতিবেদনগুলোকে বিএনপি সরকারের সুনাম নষ্ট করার উদ্দেশ্যে একটি মহলের চ□ান্ত বলে বর্ণনা করেছেন।

আমাদের মনে রাখা উচিত যে, কোন গণতান্ত্রিক সমাজে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান থাকা

উচিত নয়। সাম্প্রতিক ঘটনাবলি কি মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণায় বিবৃত নীতিমালার প্রত্যক্ষ পরিপন্থী ও লঙ্ঘন নয়?

বলপূর্বক উচ্ছেদের ঘটনাগুলো সম্পর্কে কিছু তথ্য

অকুস্থান	সংখ্যা (জন/পরিবার)
বগুড়া	৭০ টি পরিবার
নওগাঁ	২০০ জন মানুষ
পাবনা	৪০০ জন মানুষ
রাজশাহী	৬০০ জন মানুষ
কুড়িগ্রাম	৩০০ জন মানুষ
পিরোজপুর	১৫ জন মানুষ
বরিশাল	৪৪০ জন মানুষ
ময়মনসিংহ	৩০০ জন মানুষ
সিরাজগঞ্জ	৩০০ জন মানুষ
মাগুরা	৭টি পরিবার
চট্টগ্রাম	৩০০টি পরিবার

(গণতদন্ত কমিশনের সৌজন্যে)

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া ও প্রতিরোধ কার্যক্রম

নির্বাচনোত্তর সাম্প্রদায়িক সহিংসতার শিকার বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় ও নারীদের উপর যে অমানবিক নির্যাতন চালানো হয় তার সঠিক চিত্র তুলে ধরার জন্য বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ একটি পর্যবেক্ষণ কার্য□ম চালায়। মহিলা পরিষদের এ কার্য□ম শুধুমাত্র নির্লিপ্ত পর্যবেক্ষণ ছিল না। এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়িয়ে এ সামাজিক দুর্যোগ প্রতিহত করার সম্ভাব্য নানা কার্য□ম।

নির্যাতনের খবর নানা মাধ্যমে প্রচারিত হবার পর মহিলা পরিষদ এর সঠিক চিত্র ও প্রকৃত তথ্যসমূহ উদ্ঘাটনের জন্য দুটি দলকে কতিপয় দুর্গত এলাকায় প্রেরণ করে। ১৮, ১৯ ও ২০শে অক্টোবর (২০০১) তারিখে অনুষ্ঠিত হয় ঘটনাস্থল পরিদর্শনের কাজ। দল দুটি গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট ও পরে ১৯শে নবেম্বর ভোলায় কতগুলো দুর্গত গ্রাম পরিদর্শন করে এবং পর্যবেক্ষণ কার্য□ম চালায়। মহিলা পরিষদ নেতৃবৃন্দ প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে তাঁদের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। এতে তাঁরা সংখ্যালঘু নারী নির্যাতনের বহু করুণ চিত্র তুলে ধরেন এবং এ ঘৃণ্য ধারা প্রতিহত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। এর আগে ৯ই অক্টোবর তারিখে প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠান করে নির্যাতনের প্রতিবাদ জানানো হয়। এ ছাড়া মহিলা পরিষদ নির্যাতিতাদের পুনর্বাসনে সহায়তা প্রদানেও সাধ্যমত ভূমিকা রাখে।

পর্যবেক্ষণকারী দলে অংশগ্রহণ করেছিলেন ডা. মালেকা বানু, রেখা চৌধুরী, এডভোকেট মাসুদা রেহানা বেগম, রেখা দাশ পুরকায়স্থ, মনিরুজ্জামান বিপ-ব ও ডা. ফরিদা। সরজমিনে পর্যবেক্ষণের পর তাঁরা পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করেছেন। এর সারসংক্ষেপ এখানে সংযোজিত হল।

সরেজমিন পর্যবেক্ষণ -১

রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ

৯ই অক্টোবর বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিনিধি দল রামশীলে পৌঁছান। সেখানে তাঁরা বহুসংখ্যক নারী ও কিশোরীর সন্ধান পান যাঁরা শারীরিক ও যৌন নির্যাতন এবং ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। তাঁরা সেখানে অনুরূপ ১০ জনের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেন। এঁদের বয়স ছিল ১৩ থেকে ৪৫ এবং অনেকেই বিবাহিতা। এর মধ্যে ৬ জনকেই সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে নিয়ে ৩ থেকে ৭ দিন আটক রেখে উপর্যুপরি গণধর্ষণ করেছে। এর মধ্যে ১৩ বছরের শিল্পী, ৯ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ষোড়শী গৃহবধূ সাবিত্রী এবং ইউপি সদস্য ৪৪ বছরের শেফালীরানী রয়েছেন। এঁরা পার্শ্ববর্তী বরিশাল জেলা থেকে এসে রামশীলে আশ্রয় নিয়েছেন। পরে প্রতিনিধি দল অনুরূপ আরো ৫ জন নারীর সঙ্গে কথা বলেছেন। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে,

নির্বাচনের ১ সপ্তাহ আগে থেকে বরিশাল জেলার বিভিন্ন এলাকার ৪-৫শ হিন্দু মেয়ে রামশীলে এসে আশ্রয় নেয়। নির্বাচনের ১ দিন পর আরও শতশত নির্যাতিত পরিবার এসে রামশীলে আশ্রয় নেয়। কারণ এই এলাকাটি দুর্গম ও বিপুল সংখ্যায় হিন্দুপ্রধান এলাকা।

নির্যাতনের ধরন

অত্যাচারের সবচেয়ে কুৎসিত রূপটি বের হয়ে এসেছে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের ব্যাপকতার মাধ্যমে। '৭১-এর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নৃশংসতাকেও হার মানিয়েছে এমন চিত্রও পাওয়া গেছে। হিন্দুদের সম্পদ লুটপাট করা হয়েছে, ভীতি প্রদর্শন করে চাঁদা আদায় করা হয়েছে, নির্বিচারে মারপিট করা হয়েছে এবং তাদের আয়ের ক্ষেত্র বিনষ্ট করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণকারীদের মতে এ নির্যাতন পূর্বপরিকল্পিত এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসামূলক।

সরেজমিন পর্যবেক্ষণ-২

বাগেরহাট

পর্যবেক্ষণ দলটি দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০শে অক্টোবর বাগেরহাট জেলার মোল-ারহাট ও ফকিরহাটে নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় বিপর্যস্ত বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করেন। সেখানে তাঁরা পাগলাবাজার, বড়গাওলা, মেজগাওলা, বারইগাথি, পোদ্দারবাড়ি, মাদারতুলি ও সুড়িগাথির ১৫ জন নির্যাতিতা নারী ও কিশোরীর সঙ্গে কথা বলেন। এখানকার ঘটনাবলিও রামশীলের দেখা ঘটনাবলির প্রায় অনুরূপ। এখানে মা-মেয়েকে একই সঙ্গে ধর্ষণের কুৎসিত নির্যাতনের কথা শোনা গেছে। ধর্ষিতাদের নিজের মুখ থেকেই তাঁরা এসব কথা শোনেন। এখানে তাঁরা কয়েকজন চিহ্নিত শীর্ষসন্ত্রাসীর নামধাম সহ, যেমন— কালাফকির, ঝুলু, কামরুল ফকির ও তাদের ১৮/২০ জন সঙ্গীর অকথ্য নির্যাতনের বিবরণ জানতে পারেন। রামশীলের সঙ্গে এখানকার যে পার্থক্যটি পর্যবেক্ষণকারীদের নজরে পড়েছে তা হল রামশীলের নির্যাতিতরা ছিল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় আশ্রিত। আর এখানে নির্যাতিতরা প্রতিমুহূর্তে আরও নির্যাতনের হুমকির মুখে। বেশ কয়েক জায়গায় নারী অপহরণ ও নির্যাতনের খবর পেয়ে তাঁরা যেসব এলাকায় গিয়ে দেখেছেন, সংখ্যালঘু পরিবারগুলো এলাকা থেকে পালিয়ে গেছে। নির্বাচনের ১ সপ্তাহ আগে থেকেই এ এলাকাতেও সংখ্যালঘুদের প্রতি ভয়ভীতি প্রদর্শন ও নির্যাতন শুরু হয়েছিল। অনেক সাবধানতা অবলম্বন করেও অনেকে তাঁদের নারী ও কিশোরীদের সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারেন নি।

সামগ্রিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পর্যবেক্ষণ

- নির্বাচনোত্তর দেশব্যাপী সংখ্যালঘু নারীরা রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের দ্বারা গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন।
- এই ভয়াবহ পরিস্থিতি প্রতিরোধ করতে প্রশাসন নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়ায় নি। ভয়ভীতি দূর করে অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা দেয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করে নি। এমনকি প্রশাসন বিষয়টির বাস্তবতাও স্বীকার করতে চায় নি।
- সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে নির্যাতনের ঘটনাগুলোকে 'সাজানো নাটক, অতিরঞ্জিত ও গুজব' বলে প্রচার করায় সন্ত্রাসীরা অপরাধকর্মে উৎসাহিত হয়েছে।
- কোনও রাজনৈতিক দল নির্যাতিতদের পাশে এসে কার্যকরভাবে দাঁড়ায় নি।
- নারী নির্যাতনের এই পাশবিক তাণ্ডবতা আমাদের পবিত্র সংবিধানের ২৬ ও ২৭ ধারার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ঘটিয়েছে। এতে ১৯৯৩ সালের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ভিয়েনা মানবাধিকার ঘোষণাও লঙ্ঘিত হয়েছে।

সরেজমিন পর্যবেক্ষণ-৩

লালমোহন থানা, ভোলা

১৯শে নবেম্বর সকালে পর্যবেক্ষণকারী দলটি ভোলায় পৌঁছায়। সেখান থেকে তাঁরা যান লালমোহন উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়নে। গ্রামের মানুষ প্রথমে মুখ খুলতে চায় নি এতটাই ছিল তারা সন্ত্রস্ত। পরে আশ্বস্ত হয়ে তারা কথা বলে। সেখানকার নির্যাতনের বিবরণ আরও বেদনাদায়ক ও লজ্জাজনক। ৪০ বছর বয়সী একজন পঙ্গু নারীও সেখানে ধর্ষণের হাত থেকে রেহাই পায় নি। তিনি ধর্ষিতা হয়ে ৩ দিন অজ্ঞান ছিলেন। হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা হয়েছে কিন্তু প্রেসক্রিপসনে ধর্ষণের কথা উলে-খ করা হয় নি। চর অন্নদাপ্রসাদে ধর্ষিতা হয়েছেন ১৯ বছরের এক গৃহবধূ। তাঁর কোল থেকে ৬ মাসের শিশু সন্তানকে ধানক্ষেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করেছে দুর্বৃত্তরা। পর্যবেক্ষণকারী দলটি গিয়েছিল অন্নদাপ্রসাদ গ্রামের ভেণ্ডারবাড়ি নামক একটি নিভৃত বাড়িতে- যে জায়গাটিকে নিরাপদ ভেবে সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন শত শত অসহায় নারী। কিন্তু সেখানে তাঁরা রক্ষা পান নি। প্রাণভয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়া মেয়েদের চুল ধরে টেনে তুলে দুর্বৃত্তরা ধর্ষণ করেছে। এভাবে আশ্রয়গ্রহণকারী অধিকাংশ নারীই বর্বরদের হাতে লাঞ্ছনার শিকার হন। অন্নদাপ্রসাদ গ্রামে অন্তত ৮ জন ধর্ষিতা নারীর জবানবন্দি তাঁরা শুনেছেন। ২রা অক্টোবর সেখানে সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলার লোমহর্ষক বর্ণনা পর্যবেক্ষণকারীরা ভুক্তভোগীদের মুখ থেকে শুনেছেন এবং দেড় মাস পরেও সেই হামলা নির্যাতনের চিহ্ন দেখেছেন। অত্যাচারের সেই দুঃস্বপ্নের ছাপ তারা তখনও দেখেছেন অসহায় সংখ্যালঘুদের চোখে মুখে। নারী নির্যাতন ছাড়াও বিভিন্ন রকম অত্যাচার সেখানে সংঘটিত হয়েছে। নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়েছেন ১০৮ বছর বয়সী এক বৃদ্ধ। লোহার রড দিয়ে নির্মমভাবে তাঁকে পেটানো হয়েছে এবং তাঁর সবকিছু লুট করা হয়েছে। ফাতেমাবাদ গ্রামের সম্পন্ন এক গৃহস্ত বিপুল অর্থের বিনিময়ে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে নিজ পরিবারকে রক্ষা করার চেষ্টা করে চলেছেন। কিন্তু তাঁর প্রতিবেশীরা রক্ষা পায় নি। তাঁর পাশের বাড়ির এক তরুণী পুত্রবধূ ও তাঁর শাশুড়ি একসঙ্গে ধর্ষিতা হয়েছেন। ফেরার পথে পাগলা বাজারে ধর্ষিতা ৮ বছরের শিশুকন্যার মায়ের সঙ্গে দেখা হয় পর্যবেক্ষণকারীদের। অসহায় মাকে তাঁরা কোন সান্ত্বনা দিতে পারেন নি, বিচার পাওয়ার আশ্বাস দিতে পারেন নি। এসব ঘটনায় বিক্ষুব্ধ পর্যবেক্ষকরা তাঁদের অনুভূতির কথা এভাবে প্রকাশ করেছেন প্রতিবেদনে— "আমাদের গৌরবোজ্জল স্বাধীনতা লাভের ৩০ বছর পর এই ধরনের বর্বরোচিত ঘটনার বিবরণ শুনে লজ্জায় আমাদের মাথা নুয়ে পড়ে। আমরা এসব ঘটনার প্রতিকার চাই, প্রতিরোধ চাই। সভ্য দুনিয়ায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে এ কলঙ্ক আমাদের মুছতেই হবে।"

লালমোহন পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত মূল তথ্য ঃ

১. নির্বাচনের পরদিন ২রা অক্টোবর সকাল থেকে লুটপাট, মারধর ও ধর্ষণ শুরু হয়েছে। পরিদর্শিত কয়েকটি গ্রামে দেখা গেছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনও বাড়িই বাদ যায় নি কোনো না কোন ধরনের আক্রমণ থেকে।

২. নিত্যপ্রয়োজনীয় খাবার থেকে শুরু করে গরু-ছাগল পর্যন্ত সব ধরনের অস্থাবর সম্পত্তি লুট করা হয়েছে। যা নেয়া যায় না এমন জিসি ভাঙচুর বা ধ্বংস করা হয়েছে। ফলের গাছ কাটা হয়েছে।

৩. পরিদর্শিত এলাকাটিতেই শতাধিক নারী ধর্ষিত হয়েছেন বলে বস্তুনিষ্ঠ অনুমান করা হয়। যদিও মাত্র ৮ জন ধর্ষিতার জবানবন্দি পাওয়া গেছে, অন্যরা হয় এলাকা ছেড়ে গেছেন, না হয় সামাজিক কারণে গোপন করার চেষ্টা করেছেন।

৪. ধর্ষণ ছাড়াও নানা ধরনের সম্ভ্রমহানি, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে সব সংখ্যালঘু পরিবার।

৫. নির্যাতনকারীদের অনেকেই স্থানীয় বাসিন্দা এবং তারা নির্যাতিতদের সামনেই ঘোরাফেরা করছে। তারা এলাকায় তেমন কিছু হয় নি বলে প্রচার করছে এবং নিরাপত্তা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে উপহাসের মত। ফলে এলাকায় চরম নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ বিরাজ করছে।

৬. ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের আচরণ থেকে মনে হয়েছে এসব কাজে তাদের নীরব সম্মতি থাকতে পারে।

৭. কোনও রাজনৈতিক দল তখন পর্যন্ত উপদ্রুত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসে নি।

৮. নির্যাতিত ও সম্পদহারা মানুষের বেশির ভাগই দরিদ্র। এদের পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ ও সাহায্য দরকার।

৯. সরকার ও প্রশাসনের দিক থেকে বাস্তব সত্য চেপে যাওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে। এর ফলে নিরাপত্তাহীনতা বেড়েছে, অপরাধ উৎসাহিত হয়েছে এবং প্রতিরোধ বা প্রতিকার প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে।

১০. আবার যে কোন সময় যে কোনো ধরনের আক্রমণের আশঙ্কায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আছে সে এলাকার হিন্দুরা। অনেকে সহায়সম্বল ফেলে দেশ ছাড়ছে অথবা ছাড়ার কথা ভাবছে।

১১. পর্যবেক্ষণকারী দলটি ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতাদের কাছ থেকে কিছুটা হুমকির মুখোমুখি হয়েছেন তাদের তথ্যানুসন্ধান কাজের জন্য। এসব তথ্য প্রকাশিত হওয়ার ফলে হিন্দুদের আরও ক্ষতি হবে বলে ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতারা মন্তব্য করেছেন।

পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে মহিলা পরিষদের উত্থাপিত সুপারিশ ঃ

১. নির্যাতিত নারীদের বিচার পাওয়ার জন্য আইনী পদক্ষেপ নিতে সরকারকে বাধ্য করা। ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা।

২. ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য সরকারকে বাধ্য করা।

৩. নির্যাতিত মেয়েদের স্বাভাবিক করে তুলতে সামাজিক উদ্যোগ নেয়া।

৪. সংবিধানে প্রদত্ত সম-অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সামাজিক ও আইনগত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন/সংস্থাসমূহের মানবাধিকার লঙ্ঘনের এই ঘটনার বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্যসমৃদ্ধ রিপোর্ট প্রণয়ন করা।

(গণতদন্ত কমিশনের সৌজন্যে)

নাগরিক অধিকার কমিটির প্রতিবেদন
ভোলা জেলায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন-১

বিগত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভোলা জেলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর ব্যাপক নির্যাতন চালানো হয়েছে। রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে সমগ্র দেশের হিন্দুদের উপর এই নির্যাতনের পরিকল্পনা ফল দাঁড়িয়েছে ঃ

১. দেশে লক্ষ লক্ষ সন্ত্রাসী তৈরি হয়েছে।
২. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর "চেইন অফ কমান্ড" ভেঙে পড়েছে এবং চরিত্র নষ্ট হয়েছে।
৩. দেশে কোটি কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে।
৪. সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আইনের প্রতি এবং সার্বিকভাবে রাষ্ট্রব্যবস্থাটির উপরই আস্থা হারাতে বসেছে।
৫. বহুধর্মীয় সহ-অবস্থানের পরিবেশ ধ্বংস হয়েছে।
৬. অসংখ্য কোমলমতি ছাত্র/ছাত্রীর একটি শিক্ষাবর্ষ নষ্ট হয়েছে।

১৯৯২ সালে যে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক নির্যাতন হয়েছিল তা বিভিন্ন অজুহাতে তদানীন্তন বিএনপি সরকার অস্বীকার করার ফলে এবং অপরাধীদের যথাযথ বিচার না করাতে এবার সহিংসতার মাত্রা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভোলা জেলা

ভোলা জেলায় ৪টি সংসদীয় আসন, এবং এর সব ক'টিতেই এবারের নির্বাচনে বিএনপি'র প্রার্থীরা জয়ী হন। জেলার সাতটি উপজেলাতেই পরিকল্পিতভাবে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক নির্যাতন চালানো হয়েছে। হাজার হাজার সংখ্যালঘু নির্যাতিত হলেও কোন প্রকার প্রশাসনিক বা রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা তারা পায়নি। স্থানীয় প্রতিবেশীদের সহানুভূতি-সহযোগিতাও সন্ত্রাসীদের দাপটে ও চাপে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। সমগ্র জেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের সংক্ষিপ্ত চিত্রটি নিম্নরূপ ঃ

নিহতের সংখ্যা	ঃ ৬ (রাজনৈতিক কর্মী ছাড়া),
আহতের সংখ্যা	ঃ ১৫০০
ধর্ষণের শিকার	ঃ ৬০০
বাড়িঘর লুট	ঃ ১০০০টি
ঘরবাড়ি/মন্দির পোড়ানোর ঘটনা	ঃ ৩০টি,
গরু অপহরণ	ঃ ৮০টি
ছাগল অপহরণ	ঃ ১০০টি
ক্ষেত থেকে ফসল কেটে নেওয়ার পরিমাণ	ঃ ৫০ একর জমির ফসল
জবরদস্তি চাঁদা আদায়ের পরিমাণ	ঃ ২ কোটি টাকার মত

বলা বাহুল্য এটি খণ্ডচিত্র মাত্র- নাগরিক অধিকার কমিটির স্বেচ্ছাসেবীদের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ জরিপের ভিত্তিতে তৈরি।

১.১ ভোলা সদর ঃ

শহর এবং শহরের উপকণ্ঠে নির্যাতনের বৈশিষ্ট ছিল একই রকম এবং সুস্পষ্ট। পরিকল্পনা ও বিশেষ নির্দেশ মাফিক হিন্দু নির্যাতন এবং হিন্দু খেদাও অভিযান চালানো হয়। নির্বাচনের আগে যদিও সৌজন্যমূলকভাবে সব দলের নির্বাচনী তহবিলে সংখ্যালঘুরা চাঁদা দান করেছে, কিন্তু নির্বাচনের পরে হয়েছে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় এবং ভোলায় এমন কোন সংখ্যালঘু বাড়ি নেই যেখান থেকে চাঁদা নেওয়া হয়নি।

ডাক্তার, ঔষধের দোকানের মালিক, শিক্ষক, ছোট ব্যবসায়ী ইত্যাদি পেশার মানুষ থেকে শুরু করে শ্রমিক, রিকশাচালক, কৃষকও অত্যাচারের শিকার হয়েছে। বাড়ি লুট, বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া, মহিলাদের ধর্ষণ, পুরুষ/মহিলা নির্বিশেষে নির্মমভাবে পেটানো, গাছপালা কেটে নেওয়া, ঘরে তোলা ফসল লুট, ক্ষেতের ফসল কেটে নেওয়া সহ নানা রকম ও নানা মাত্রার অত্যাচারের ফলে বেশ কিছু সংখ্যাক লোক ভারতে পালিয়ে গেছে। এই জেলা থেকে **১৯৯২** সালের ঘটনার পরে হাজার হাজার মানুষ ভারতে আশ্রয় নেয় এবং বেশির ভাগই আর ফিরে আসেনি। এবারও, রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত শতকরা ৫০ ভাগ মানুষ এক আশ্রয় থেকে আর এক আশ্রয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কতিপয় সংখ্যালঘু সংবাদপত্র কর্মীর বাড়িতে রিপোর্ট পাঠানোর অপরাধে বোমা হামলা হয়েছে।

১.২ বোরহানউদ্দিন উপজেলা ঃ

এই উপজেলার শহরাঞ্চলে তেমন সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি না হলেও গ্রামগুলিতে ব্যাপকহারে হয়েছে। জনৈক সংখ্যালঘুর পিতা তাঁর সামনে মেয়েকে ধর্ষিত হতে দেখে জ্ঞান হারান এবং দু'দিন পরে মারা যান। অনেকেই শহরে আশ্রয় নিতে না পেরে ভারতে চলে গেছেন।

১.৩ দৌলতখান উপজেলা ঃ

এই উপজেলার অবস্থা ভোলা সদরের মতই করুণ। বিভিন্ন স্থান থেকে হিন্দু মহিলা এবং কিশোরীদের মাই□াবাসে তুলে নেওয়া হয় এবং কিছুদিন পরে ফেরত দিয়ে যায়; উলঙ্গ অবস্থায় রাস্তায় ফেলে রেখে যাওয়ার ঘটনাও ঘটে। এই উপজেলায় সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। জোর করে ধর্মান্তরিত করার ঘটনাও এখানে ঘটেছে। বেশ কিছু সন্ত্রাসীকে থানায় আটক করা হলেও কিছুদিন পরে দলীয় চাপে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

১.৪. তজুমদ্দিন উপজেলা ঃ

১৯৯২ সালের সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শীর্ষে ছিল এই উপজেলা, তবে এবার এই থানা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। মারপিট, চাঁদাবাজি, সম্পদ লুট ইত্যাদি ঘটেছে। উলে-খ্য যে, এই উপজেলায় ধর্ষণের একটি ঘটনার কথাই নিশ্চিতভাবে জানা গেছে, অন্যান্যরা নির্যাতিত হলেও লোকলজ্জার ভয়ে ও সামাজিক কারণে প্রকাশ্যে স্বীকার করতে নারাজ।

১.৫ লালমোহন উপজেলা ঃ

ভোলা জেলায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই উপজেলা। এখানে ব্যাপক হারে নির্যাতনই শুধু হয়নি সংখ্যালঘুদের বলতে বাধ্য করা হয়েছে যে তাদের উপর কোন অত্যাচার হয় নি। জনসমক্ষে লাঞ্ছিত করা, সম্পদ লুট, অগ্নিসংযোগ, গণহারে ধর্ষণ, ৮-৯ বছরের শিশু থেকে শুরু করে ষাটোর্ধ মহিলা, এমনকি একজন পঙ্গু মহিলাকেও গণধর্ষণ করা হয়। অন্নদাপ্রসাদ গ্রামের

ভেন্ডারবাড়ি নামে পরিচিত একটি বড় বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া কমপক্ষে ৫০ জন মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়। অন্নদাপ্রসাদে নির্যাতিত জনগণ একটি সভা করে একটি কমিটি গঠন করে, সেখানে বেশ কিছু সংখ্যক নির্যাতিত মহিলা ও শিশুর নাম তালিকাভুক্ত করা হয়। কিন্তু প্রশাসনের চাপে সেই সভায় উপস্থিত কেউ কেউ কিছু হয় নি বলে পরে বিবৃতি দিয়েছেন।

১.৬ চরফ্যাশন উপজেলা ঃ

এই উপজেলায় রিপোর্ট লেখা সময় পর্যন্ত অবাধে চাঁদাবাজি, লুট, ধর্ষণ, লাঞ্ছনা ইত্যাদি অব্যাহত ভাবে চলছিল। একজন সাইকেল মিস্ত্রিকে পিটিয়ে মারা হয়েছে এবং ধর্ষণের কারণে একজন মহিলা আত্মহত্যা করেছেন। নির্বাচনের সময় ঢাকা থেকে আনা ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের বিনোদনের জন্য সংখ্যালঘুদের হাঁস-মুরগী-ছাগল ইত্যাদি জোর করে নিয়ে যাওয়া হত।*

ভোলা জেলায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন-২ অন্নদাপ্রসাদ-ফাতেমাবাদ গ্রামে কী ঘটেছে

"নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটির" পক্ষে একটি ৫ সদস্য দল ২৭ থেকে ২৯ শে ডিসেম্বর (২০০১) তিনদিন ব্যাপী ভোলা সফর করেন। দলের এই রিপোর্টটি শুধুমাত্র লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়নের দু'টি গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ভোটের আগে বেশ কিছুদিন ধরে অন্নদাপ্রসাদ গ্রামের মোটামুটি ২২০০ সংখ্যালঘু ভোটারদের ভোট না দেবার জন্য হুমকি দেওয়া হয়। এ সত্ত্বেও কিছু কিছু ভোটার সকালে ভোট কেন্দ্রে যেতে চাইলে তাদের ঢুকতে দেওয়া হয় নি, পথেই বাধা দেয়া হয়। ভোটের পরের দিন থেকে এদের উপর শুরু হয় অমানবিক নিষ্ঠুরতা যা আন্তর্জাতিকভাবে প্রচারিত হয়েছে।

গুণমনি বাজারের কাছে অবস্থিত ক্ষেতমজুর গজেন্দ্রর মেয়ে ৮/৯ বছরের এক শিশু কন্যা মমতাকে ৪/৫ জন দুর্বৃত্ত ধর্ষণ করে এবং এখন তাকে নিরাপত্তার কারণে অজ্ঞাত স্থানে সরিয়ে রাখা হয়েছে। মমতার পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল নগেন্দ্র দাসের 'ভেণ্ডারবাড়ি'তে- যেখানে আরো শতাধিক বিভিন্ন বয়সের মহিলারাও আশ্রয় নিয়েছিল। ঘটনার দিন রাত্রে শতাধিক সন্ত্রাসী ভেণ্ডারবাড়িতে চড়াও হয় এবং দফায় দফায় সারা রাত ধরে লুণ্ঠন, ঘর ভাঙচুর, দৈহিক নির্যাতন এবং মহিলাদের ধর্ষণ করে। মমতাকে ৪/৫ জন সন্ত্রাসী পার্শ্ববর্তী ক্ষেতে নিয়ে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। পরের দিন ওরা বাড়ি ফিরে দেখে তাদের চালাঘর ভেঙে দেয়া হয়েছে, ঘরে রাখা তাবৎ সম্পত্তি ও ধান-চাল লুট হয়ে গেছে। থানা হেলথ কমপে-ক্সের ডাক্তাররা তাকে ১২ দিন হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা দেয় এবং পুলিশকে কেস নিতে বাধ্য করে।

এর পরে দলটি অবনীদাশের বাড়িতে পার্শ্ববর্তী ফাতেমাবাদ গ্রাম থেকে আশ্রয় নেওয়া লোকজনদের সাথে কথা বলেন। তারা জানান যে ফাতেমাবাদে এখন একজন হিন্দুও চাঁদাবাজির ভয়ে ফিরে যেতে পারছেনা। জেসমিন (৩৫) তাঁর স্বামী সুভাসের সঙ্গে গঙ্গাচরনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। ২রা অক্টোবরের রাতে প্রায় ১৮/২০ জন সন্ত্রাসী ঐ বাড়িতে চড়াও

* নিরাপত্তার কারণে জরিপকর্মীদের নাম প্রকাশ করা হল না।

হয়। জেসমিন পাশের ধানী জমিতে লুকিয়ে থাকে। তারা তাঁর ১৪ বছরের সুন্দরী মেয়েটিকে না পেয়ে তাঁকে চাপাতি দিয়ে জখম করে ও পাশে 'হলদি ক্ষেতে' নিয়ে ধর্ষণ করে। সে হেলথ কমপে-ক্সে ৯দিন চিকিৎসাধীন ছিল।

গঙ্গাচরনের বাড়িতে বনেদীয়ানার ছাপ রয়েছে। জ্যেষ্ঠদের মধ্যে আছেন ব্রজরাজ কুমার বাবু। তিনি জানালেন যে ১৯৯২ সালের নির্যাতনের পর এই বাড়ির ২২ জন সদস্য ভারতে চলে গিয়েছে, আর ফিরে আসেনি। নতুন বসতি স্থাপনকারীরা কিভাবে সংখ্যালঘুদের অবজ্ঞা করে, বক্রোক্তি করে এবং ভারতে চলে যেতে বলে এসব কথা বলতে বলতে তিনি কেঁদে ফেলেন। এই ১০৮ বছরের বৃদ্ধকে সন্ত্রাসীরা অমানবিক দৈহিক অত্যাচার করে, তিনি তাঁর হাত-পায়ে রডের আঘাতের চিহ্ন দেখান।

এর পরে দলটি উৎফুল- বাবু, মনোরঞ্জন বাবু এবং চিত্ত বাবু এদের সকলের কাছে থেকে জানতে পারেন কেমন করে তাঁরা তাঁদের ভিটে মাটি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে সরে গিয়েছিলেন এবং নিজেদের চোখের সামনে কয়েক পুরুষ ধরে গড়ে ওঠা সম্পত্তি লুট হতে দেখেছেন। দলের মহিলা সদস্য লক্ষ্মী দাসের (৪০) কাছে তাঁর এবং ১৬ বছর বয়সী অন্তঃসত্তা পুত্রবধূ সুস্মিতার ধর্ষণের বিবরণ শোনেন। ছায়ারানী নামে এক মহিলা রাতে ধর্ষিত হবার পর যখন তাঁর বিধ্বস্ত ঘরে সকাল বেলা ফিরে আসেন তখন আর এক দল পাষণ্ড তাকে তাড়া করে। তিনি পুকুরে ঝাঁপিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলে গুণ্ডারা তাঁর কোলের ছেলেকে পুকুরে ছুঁড়ে ফেলবার হুমকি দেয়। ছায়ারানী তখন উঠে এসে নিজেকে গুণ্ডাদের হাতে সঁপে দেন। আর একজন মহিলা অনুরাধার কথা থেকে জানা যায় তিনি চেলাকাঠ দিয়ে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন, কিন্তু আক্রমণকারীদের কাছে শেষ পর্যন্ত তাঁকে এবং তাঁর পুত্রবধূ তৃষ্ণাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

গ্রামের বর্ষীয়ান একজন মানুষ দলের সদস্যদের প্রশ্ন রাখেন— গ্রামের গণ্যমান্যদের (ব্রজরাজ, নগেন্দ্র, গণেশ, পবন ডাক্তার) সঙ্গেই যখন কুকুর বিড়ালের মত আচরণ করা হয়, তখন সাধারণ মানুষ যে কি অবস্থায় আছে তা অনুমেয়। পরিদর্শক দলটি জানতে পারে যে বেশ ক'টি পরিবার পশ্চিমবঙ্গে চলে গেছে এবং ফসল তুলতে পারলে আরো অনেক পরিবার হয়তো চলে যাবে।

গ্রামের লোকজনদের কাছে পরিদর্শক দল জানতে পারেন যে গণেশবাবুর স্ত্রী, কন্যা এবং শ্যালকের স্ত্রী নির্বাচনের কয়েকদিন আগে ধর্ষিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের বাড়িঘর লুট করা হয়েছে। তিনি এখন এক আত্মীয়ের আশ্রয়ে চরফ্যাশনে অবস্থান করছেন। পবন ডাক্তার নামক এলাকার একজন সম্মানীয় ব্যক্তির স্ত্রী, মাতা এবং ভাইয়ের স্ত্রীর সম্মান লুট করা হয়েছে। কিন্তু তিনি সমাজে লজ্জায় সে কথা প্রকাশ করছেন না। আরো জানা গেছে যে, হিরু দাসের পরিবারের মহিলারা এবং আওয়ামী লীগ কর্মী বনমালী দাসের শ্যালিকা পারুলবালাও একইভাবে ধর্ষিত হয়েছেন, তবে তাঁরা লোকলজ্জার ভয়ে স্বীকার করছেন না। বিজয় দাস (৭৪) নামে জনৈক বর্ষীয়ান গ্রামবাসী দলের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন যে, এই অত্যাচারের পর দেশত্যাগ ছাড়া তাদের আর কী উপায় আছে? এই সমাজে তাঁদের পক্ষে আর স্ত্রী-কন্যা ধর্ষণের লজ্জা নিয়ে বাস করা সম্ভব নয়।

২রা অক্টোবরের পর থেকে বেশ কিছু স্কুলের ছাত্র/ছাত্রী স্কুলে যেতে সাহস পাচ্ছে না। যেখানে নির্বাচনের পূর্বে কানি প্রতি জমির দাম ছিল ৮০,০০০ টাকা সেখানে এখন গণহারে জমি বিক্রির হিড়িকে দাম নেমে গেছে ২০-৩০ হাজার টাকায়। সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত কিছু যুবকের সঙ্গেও দলের সদস্যরা কথা বলেছে। তারা বলেছে যে তেমন কোন সন্ত্রাস হয়নি। এলাকায় এখন শান্তি বিরাজ করছে, পোলাপানেরা দুই একটা মালাউনের ঘরে ইট পাটকেল মেরেছিল মাত্র।

গ্রামবাসীদের সাথে আলাপ করে জানা যায় যে, ৩৫ ঘর সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দালালদের মাধ্যমে দেশত্যাগের ব্যবস্থা করে ফেলেছে। গোলাপী নামে এক ধর্ষিতা মহিলার সঙ্গে কথা বলায় তিনি ধর্ষণের কথা স্বীকার করেছেন।গ্রামের বর্ষীয়ান ব্যক্তিরা পরিদর্শক নেতৃবৃন্দের কাছে দাবি করেছেন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য। পর্যবেক্ষণ দলের সদস্যরা লালমোহন থানায় পুলিশের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এবং জেলার ডিসির সঙ্গে দেখা করে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও সংখ্যালঘুদের মধ্যে যেন আস্থা ফিরে আসে সেজন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেছেন।

পরিশিষ্ট ঃ

ভোলা ছেড়ে আসার পর খবর এসেছে যে, সন্ত্রাসীরা আবার গ্রামে হুমকি দিয়েছে যে আর কখনও কারো কাছে যদি তারা অভিযোগ করে তবে তাদের নিরাপত্তা কেউ দিতে পারবেনা। সন্ত্রাসীরা দু'জন বেদে মেয়ের শ-ীলতাহানি করে এবং সালিশের মাধ্যমে একটি সমঝোতায় উপনীত হয়।

* নিরাপত্তার কারণে প্রতিবেদনে উলি-খিত ব্যক্তিদের ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিশিষ্ট সমাজ-নেতা, সাংবাদিক, ফটো-সাংবাদিক, সমাজকর্মী, আইনজীবী, ও কতিপয় মানবাধিকার কর্মী নিয়ে গঠিত পর্যবেক্ষক দলটি ভোলা সদর উপজিলার চর কুমারিয়া ইউনিয়ন ও পার্শ্ববর্তী এলাকাও পরিদর্শন করেন। -প্রতিবেদক

এছাড়া নাগরিক অধিকার কমিটির পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তি ও মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয়ে একটি দল গাজিপুরের কালিয়াকৈর থানার ২-৩টি গ্রাম ঘুরে দেখেন এবং গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলেন। হিন্দু অধিবাসীরা যে অস্বস্তির মধ্যে আছেন ও তাঁরা যে সুখে নেই এটা স্পষ্ট। অনেকেই বলেছেন ভোটার তালিকা থেকে তাঁদের নাম কেটে দিতে। দেশত্যাগের ইচ্ছাও অনেকে প্রকাশ করেছেন। চাপাইর গ্রামের অধিকাংশ হিন্দু পরিবারই পালিয়ে যায়। তৎসত্ত্বেও বেশ কিছু নির্যাতন ও লুটপাট হয়েছে। সীমারপার গ্রামেরও একই অবস্থা, অনেকেই পালিয়ে গিয়েছিল। এখনও আতঙ্কের রেশ কাটেনি। বেশ কিছু মারপিট ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। কালিয়াকৈর সদরের উপকণ্ঠে পালপাড়ার প্রবীণ অধিবাসী নিতাই চন্দ্র পাল জানান যে, তাঁরা ঐতিহ্যিকভাবেই বরাবর তাঁদের জমিদারদের ভোট দেন এবং এবারও তাঁরা ধানের শীষে ভোট দিয়েছিলেন। এমনকি নির্বাচনের আগে তাঁদের ধুতি পরিয়ে ধানের শীষের পক্ষে মিছিলও করিয়েছিলেন। কিন্তু পরাজয়ের পর বিএনপি কর্মীরা বিশ্বাস করে নি, আর তাই তাদের ওপর নেমে আসে নির্যাতন ও লুটপাট। নির্বাচনের আগে যুবতী মেয়েদের আগেই সরিয়ে রাখা হয়েছিল। আর নির্বাচনের পর অনেকেই ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল, বিশেষ করে যুবকরা। সন্ত্রাসীদের হাতে মুক্তিযোদ্ধা নাসিরউদ্দিন আহমদও রেহাই পায়নি। নাগরিক অধিকারের পক্ষ থেকে একদল বুদ্ধিজীবী ৫-১২-০১ তারিখে চট্টগ্রাম পরিদর্শন করেন। সেখানে তাঁরা 'সচেতন নাগরিক সমাজে'র সাথে মতবিনিময় করেন এবং সেখানে উপস্থিত কয়েকজন নির্যাতিত ব্যক্তির সাথে কথা বলেন। আর একটি দল ২৯-৩০ শে (২০০১) নবেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া পরিদর্শন করেন এবং সেখানে হিন্দু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে কথাবার্তা বলে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হন।

(সংক্ষেপিত ঃ গণতদন্ত কমিশনের সৌজন্যে)

ডেটলাইন ঃ পটুয়াখালী
'হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনরিটিয'-এর সরজমিন প্রতিবেদন
সন্ত্রাসীরা পূজা করতে দেয়নি

২০০১-এর জুলাই থেকে যাত্রা শুরুর পর এ যাবৎকাল বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত নির্যাতনের ঘটনাবলীর সূত্রধরে তদন্ত প্রতিবেদন তৈরী করেছে হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনরিটিয (এইচআরসিবিএম) নির্যাতিতের পাশে দাঁড়িয়েছে, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য দিয়েছে, প্রয়োজনে আইনগত পরামর্শ ও সহায়তা দিয়েছে, গণ-ধর্ষিতাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে। বেশ কিছু ধর্ষিতা পুনর্বাসিত হয়েছে নেত্রকোণা জেলাধীন সুসং- দুর্গাপুরের সীমান্তবর্তী 'মানবকল্যাণকামী অনাথালয়ে' ও চট্টগ্রামের শহরতলীর 'প্রবর্তক সংঘে'।

এই যাবৎ এইচআরসিবিএম মর্মান্তিক কিছু নির্যাতনের তদন্ত প্রতিবেদন যেমন চট্টগ্রামে অধ্যক্ষ মুহুরী হত্যা, বৌদ্ধভিক্ষু হত্যা, বাঁশখালীতে সপরিবারে ১১ জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনা, সিরাজগঞ্জের পূর্ণিমার হৃদয় বিদারক কাহিনী, বাগেরহাটের কোমরপুরের গণধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড, মানিকগঞ্জের আরোরা গ্রামের পুরোহিত কন্যা শিল্পী রানীর গণধর্ষণ সহ দেড়শোরও বেশী অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করেছে। এর মধ্যে রয়েছে দেশ জুড়ে হত্যা, শারীরিক নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, গণধর্ষণ, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে আ[illegible]মণ, মন্দির,-শ্মশান জবর দখল, প্রতিমা ভাঙচুর, জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করণ, দেশত্যাগে বাধ্যকরণ প্রভৃতি। এগুলো নীচের web address এ পাওয়া যাবে ঃ www.hrcbm.org, www.hrcbmdfw.org, www.hrtribune.com

বাস্তবতা অনুধাবনের প্রয়োজনে নিকট অতীতের ২/১টি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত রূপ এখানে তুলে ধরা হলো

১. দশমিনার ১৪ সংখ্যালঘু পরিবারের করুণ কাহিনী

বিগত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ দৈনিক আজকের কাগজ-এ "সন্ত্রাসী সিদ্দিক বাহিনীর হাতে জিম্মি দশমিনার আলিপুরা গ্রামের ১৪ সংখ্যালঘু পরিবার" ও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ দৈনিক সংবাদে "দশমিনার ১৪টি সংখ্যালঘু পরিবারকে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি" শিরোনামে খবর প্রকাশিত হয়। ঘটনার তদন্তে ১৯.২.২০০৫ তারিখে এইচআরসিবিএম এর ৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল দশমিনার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করে। পরের দিন পটুয়াখালী পৌঁছেই প্রতিনিধি দল জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের সাথে কথা বলে রওনা করে বাউফল-কালাইয়া হয়ে দশমিনার উদ্দেশ্যে। দশমিনা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল বিধায় পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। সন্ধ্যায় দশমিনার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সাথে আলোচনা শেষে দশমিনার প্রতিনিধিদল রাত্রিযাপন

করে। পরদিন সকালে তারা পশ্চিম আলিপুরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এবং তদন্ত কাজ সম্পন্ন করে।

প্রাপ্ততথ্য ঃ পটুয়াখালী জেলাপ্রধান দশমিনা থানার অন্তর্গত ২ নং আলীপুরা ইউনিয়নের পশ্চিম আলীপুরা একটি নিভৃত গ্রাম। এই গ্রামেই ২০-২৫ ঘর সংখ্যালঘু পরিবার দীর্ঘকাল ধরে বাস করে আসছে। এটি কাপালী পাড়া নামেই পরিচিত। একই গ্রামের বাসিন্দা আর রহিম হাওলাদের পুত্র আবুবকর সিদ্দিক (সিদ্দিক হাওলাদার) পেশায় একজন শিক্ষক হলেও মূলত সে সুদ ব্যবসায়ী। উচ্চহারে সে শিক্ষকদের বেতনের চেক, এলাকার গরীব জনগণের সোনার গহনা, গৃহস্থালী জিনিসপত্র, হালের বলদ ইত্যাদি বন্ধক সহ টাকা লগ্নির ব্যবসা করে অল্প দিনের মধ্যেই প্রচুর অর্থ সম্পত্তির মালিক হয়ে যায়। উপরন্তু ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক হবার কারণে তাদের আশ্রয় প্রশ্রয়ে সে তার একটি বাহিনী গড়ে তুলতে সমর্থ হয়।

সিদ্দিক তার সৃষ্ট বাহিনীর সহায়তায় বিগত ৩/১/২০০৫ তারিখে সকাল ১০টার দিকে কাপালী পাড়ার সখী চরণ কাপালীর বাড়ী রামদা, লেজা, সুড়কী ও লাঠিসোটা নিয়ে আ্রমণ করে। তাদের বসতবাড়ি, দুর্গা মন্দির, মনসা মন্দির ও শ্মশানের জমি দখল করে নেয়। বাধা দিতে এলে সবাইকে ভারতে পাঠিয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়। প্রাণনাশ ও জান উজ্জতের ভয়ে সবাই ছেলে-মেয়েদের নিয়ে দৌড়ে ঘরে ওঠে। জানা যায়, একই প্র্রিয়ায় সে ভূবন চন্দ্র কাপালীর বাড়ী, সীতানাথ চন্দ্র কাপালীর বাড়ী ও গিরীশ চন্দ্র কাপালীর বাড়ীতেও আ্রমণ চালায়। এভাবে সন্ত্রাসী বাহিনী এলাকার সখী চরণ হালদারের ২ একর ১৯ শতাংশ, মনোরঞ্জন সরকারের ২ একর ৯ শতাংশ, যুগল চন্দ্র সরকারের ২ একর ৫২ শতাংশ সহ ১৪টি পরিবারের ১২ একর চাষাবাদের ও বসতবাড়ীর জমি দখল করে নেয়।

জানা গেছে, দরিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী এসব পরিবারের লোকজন কৃষিকাজ ও শ্রম বি্রি করে এযাবৎ বাপ দাদার ভিটে মাটিতে মাথা গুঁজে কোনভাবে টিকে ছিলো। বর্তমানে সিদ্দিকের ৩ ভাই সেলিম, শফিক ও রফিকসহ গ্রামের বখাটে ছেলেমেয়ে নিয়ে গঠিত বাহিনীর অত্যাচারে তাদের জীবন এখন বিপন্ন। বিভিন্ন কারণে গ্রামের সংখ্যালঘু পরিবারগুলোকে তারা মারধোর করেছে, তাদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ভয় দেখিয়েছে। দেশত্যাগে বাধ্য করার কথা বলেছে। সভ্য জনপদ থেকে বিচ্ছিন্ন এ গ্রামের সংখ্যালঘু পরিবারগুলো এখন সিদ্দিক বাহিনীর হাতে জিম্মি হয়ে চরম নিরাপত্তাহীনতা ও উচ্ছেদ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। সাংবাদিকদের কিছু জানালে তাদের হত্যার হুমকিও দেয়া হয়েছে।

ঘটনার পরপরই ৬/২/২০০৫ তারিখে দশমিনা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবরে এ ঘটনার প্রতিকার চেয়ে পশ্চিম আলীপুরা সংখ্যালঘু সমাজের পক্ষে বাসুদেব কর্মকার, ধীরেন্দ্র চন্দ্র সরকার, অনিল চন্দ্র হালদার, নারায়ণ চন্দ্র হালদার প্রমুখ আবেদন করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দশমিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এ ব্যাপারে জরুরী ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেন এবং তিনি এস, আই নুরুল আমিনকে তদন্ত পূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার দায়িত্ব প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, তদন্তশেষে তদন্ত কর্মকর্তা সন্ত্রাসীদের পক্ষেই রিপোর্ট প্রদান করেন।

এ ব্যাপারে আবুবকর সিদ্দিককে প্রশ্ন করা হলে সে জানায়, অভিযোগকারী অনিল চন্দ্র হালদারের কাকাতো ভাই নিতাই চন্দ্র হালদার (পিতা ঃ নিরঞ্জন হালদার) ও ব্রজেন হালদারের (পিতা ঃ রাজেন্দ্র চন্দ্র হালদার) কাছ থেকে তাদের অংশ মোতাবেক সব সম্পত্তি সে কিনে নিয়েছে। অভিযোগে প্রকাশ, উক্ত নিতাই ও ব্রজেন বর্তমানে এদেশে নেই। তাদের দেশ ছেড়ে যাবার ব্যাপারে সিদ্দিকের অদৃশ্য হাত রয়েছে। তারা চলে যাবার পরে কিভাবে দলিল সম্পাদিত হলো এটাই সবার প্রশ্ন। ভূয়া দলিলের বদৌলতে সে এখন পরিবারগুলোর স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তিই ভোগ করতে উদ্যত।

মানবাধিকার প্রতিনিধিদল প্রশাসনের সহায়তায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে এলাকার চেয়ারম্যান, স্থানীয় শাসকদলের নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবৃন্দ সেখানে আসেন। তথ্যানুসন্ধান শেষ হলে, এক পর্যায়ে সবার সামনে দাঁড়িয়ে গ্রামের এক সজ্জন বয়োবৃদ্ধ মানবাধিকার দলের কাছে জোড়হাতে অনুরোধ জানান, তারা যেন বিষয়টি উচ্চ পর্যায়ে তথা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে না ধরেন। এতে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হবে। তিনি ১৫ দিনের সময় চান যাতে তারা বিরাজমান সমস্যার সমাধান করতে পারেন। এতে উপস্থিত সবাই সম্মতি জ্ঞাপন করলে মানবাধিকার দলও ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

সর্বশেষ ঃ ১৫ দিন পর যোগাযোগ করা হলে এইচআরসিবিএম এর ঢাকা অফিসে খবর আসে সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর সম্পত্তি (সিদ্দিক বাহিনী কর্তৃক দখলকৃত) তাদের কাছে ফিরিয়ে দেবার যে সব শর্ত পালনের জন্য সালিশীর মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হলেছিলো, সিদ্দিক বাহিনীর পক্ষাবলম্বনকারী ও মদদদাতা স্থানীয় প্রভাবশালী সরকারদলীয় কিছু সমর্থক তা মানতে রাজী হয়নি পরবর্তীকালে। এমতাবস্থায় সংখ্যালঘু পরিবারগুলোকে আদালতের আশ্রয় নিতে বলা হয় এইচআরসিবিএম এর পক্ষ থেকে। বর্তমানে বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন। এখন কেমন আছে দশমিনার প্রত্যন্ত এলাকার নিভৃত পল-ীর উপেক্ষিত সংখ্যালঘু পরিবারগুলো? এইচআরসিবিএম প্রতিনিধিদল পটুয়াখালী ত্যাগের পূর্বে জেলা প্রশাসককে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে এসেছিলো নির্যাতিত মানুষগুলোর দিকে একটু মানবিক দৃষ্টি ফেরাতে। তারা জানিয়েছিলেন, ১৫ দিনের মধ্যে একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান হয়তো হয়ে যাবে এবং তিনি যেন উপদ্রুত পশ্চিম আলিপুরার কাপালী পাড়ায় সংখ্যালঘুদের জন্যে একটি মন্দির নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। যাতে সংখ্যালঘু পরিবারগুলো তাদের ধর্মীয় কৃষ্টি পালন করতে পারে। এই বছর ওখানে পূজো হয়নি সন্ত্রাসী হামলার জন্যে। মা আনন্দময়ী আসবেন। শারদীয় উৎসব আনন্দে মুখরিত হবে। কিন্তু দশমিনার ঐ অধিকার বঞ্চিত মানুষগুলোর জীবনে কি আর বইবে আনন্দধারা? এখনও গভীর রাতে বসতভিটার চারদিকে সন্ত্রাসী বাহিনীর সশস্ত্র মহড়া! কষ্ট-ক্লিষ্টে টেনে নেয়া অনিশ্চিত জীবনের ভার আর কতকাল বইবে তারা?

দুই
ডেটলাইন লালমনিরহাট
সংখ্যালঘু কিশোরীকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ

জাতীয় দৈনিকে খবরটি প্রকাশিত হবার পরপরই এইচআরসিবিএম-এর ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি অনুসন্ধানী দল তথ্য সংগ্রহে বেরিয়ে পড়ে ঘটনাস্থল লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী থানার বড় কমলাবাড়ীর উদ্দেশ্যে। ১৯/৮/০৫ তারিখ রাতে যাত্রা করে তারা পরদিন সকালে পৌছান লালমনিরহাটে। সকাল নটায় যথারীতি জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়ে এসে আলোচনা হয় প্রথমে জেলা প্রশাসক ও পরে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এর সাথে। পুলিশ সুপারের অনুপস্থিতিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের কাছে প্রয়োজনীয় সহায়তা চাওয়া হয়। সেদিন দেশব্যাপী বোমাহামলার প্রতিবাদে সারাদেশে হরতাল আহবান করায় বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি হলেও তিনি শেষতক থানা পর্যন্ত প্রতিনিধিদলকে পৌছানোর ব্যবস্থা করেন।

থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সাথে প্রয়োজনীয় কাজ শেষে সদস্যবৃন্দ প্রশাসনের সহায়তায় ঘটনাস্থলে পৌছান এবং তদন্ত কাজ সম্পন্ন করেন।

প্রাপ্ততথ্য ঃ লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী থানার বড় কমলাবাড়ী গ্রামের নাবালিকা শোভারানী রায়   বয়স **১১** বছর ৮ মাস। সে পার্শ্ববর্তী গ্রামের হাজীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীর ছাত্রী। ঐ উচ্চ বিদ্যালয়ের নৈশ প্রহরী ছোট কমলাবাড়ী নিবাসী বকুল মিয়া (পিতা- আজম উদ্দিন) প্রধান শিক্ষক উপবৃত্তির টাকা দেবেন জানিয়ে একদিন শোভাকে নিয়ে তার সাদাকালো পাসপোর্ট সাইজের ছবিতে ও কতগুলো ফাঁকা স্ট্যাম্পে সই করিয়ে নেয়। খাদিজা নামের একটি ছাত্রী না আসায় তাকে খাদিজা বেগমেরও সই দিতে বলে। মেয়েটি প্রথমে সই দিতে না চাইলে তাকে দিয়ে জোরপূর্বক সই করিয়ে নেয়। সরল বিশ্বাসে নিরীহ মেয়েটি ৫টি সই করা ছবি বকুলের হাতে দেয় এবং বকুল মিয়া উক্ত ছবি ও স্ট্যাম্প নিয়ে চলে যায়।

পরবর্তীতে সে গোপনে নাবালিকা শোভার পূর্বের দেয়া ছবি ও ফাঁকা স্ট্যাম্পের স্বাক্ষরের সাহায্যে বিগত ৭/৪/২০০৫ তারিখে ৪৪৫/০৫ নং এফিডেভিটে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরের এবং ৪৪৮/০৫ নং এফিডেভিটে জনৈক তৈয়ব আলীর (পিতা-সুরুজ আলী) সাথে বিয়ের কাগজ-পত্র তৈরি করে। তৈয়ব আলীর বাড়ী ছোট কমলাবাড়ী, সে বকুল মিয়ার চায়ের দোকানে কাজ করে।

বিগত ১৮/৭/০৫ তারিখ সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ জনৈক আয়নাল হক (পিতা-মৃত হযরত আলী) মোহিনী চন্দ্র রায় (পিতামৃত- চিন্তাবর্মন), দ্বিজেন্দ্রনাথ বর্মন (পিতা-সুশীলচন্দ্র বর্মন), রানাকাণ্ড বর্মন (পিতা- ভাটোরা বর্মন) ও মনির উদ্দিন (পিতা- কেনা শেখ) প্রমুখের উপস্থিতিতে শোভার বাবা দানেশ চন্দ্র রায় ওরফে বাচ্চা বর্মন (পিতা- চিন্তা বর্মন) এর হাতে তার ধর্মান্তর ও বিয়ের এফিডেভিটের কাগজ পত্রের ফটোকপি তুলে দেয়। সে জানায়, হাজীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের নৈশপ্রহরী বকুল মিয়ার চায়ের দোকানের কাজের ছেলে তৈয়ব আলীর সাথে শোভ-ারানী ওরফে খাদিজা বেগমের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। সে শোভাকে তাদের হাতে তুলে দেয়ার দাবী করে। অন্যথায় তাকে জোরপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যাবার হুমকি দেয়।

এমতাবস্থায় প্রতারণার শিকার শোভার বাবা দানেশচন্দ্র রায় বিষয়টির আপোষ মিমাংসার জন্যে স্থানীয় গণ্যমান্যদের দ্বারস্থ হন। কিন্তু এফিডেভিটগুলো বাতিল করে নাবালিকা মেয়েটির উপর দাবী প্রত্যাহারের কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় তিনি আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হন এবং আদিতমারী থানায় বিগত ২৬/৭/০৫ তারিখে এজাহার প্রদান করেন (আদিতমারী থানা, সাধারণ ডায়েরী নং ৮৪৪)

এইচআরসিবিএম প্রতিনিধি দল আদিতমারী থানা থেকে প্রথমেই হাজীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে নৈশ প্রহরী বকুল মিয়ার খোঁজ করে। তাকে না পাওয়া গেলে প্রধান শিক্ষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। বেশভূষায় প্রধান শিক্ষক একজন ধার্মিক বলে প্রতীয়মান হলেও আসলে তিনি যে একজন ভণ্ড, শঠ তা তার কার্যকলাপেই প্রমাণিত হলো। তিনি তার নৈশ প্রহরীর অহেতুক সাফাই সাইলেন এবং তার অপরাধ বেমালুম চেপে গেলেন। ভাবখানা এমন যেন কিছুই হয়নি। পরে জানা গেছে, তিনি থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সাথে যোগ-সাজশে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন   অফিসারকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন যাতে এই দুর্বৃত্তের চাকুরী হারাতে না হয়।

শোভার বাড়ীতে যখন অনুসন্ধানীদল পৌঁছলো তখন দুপুর অতি ান্ত। বাড়ীর সর্বত্র দারিদ্রের ছাপ স্পষ্ট। শোভাকে পাওয়া গেলনা। তাকে নিয়ে রাখা হয়েছে নিরাপদ স্থানে এক নিকট আত্মীয়ের বাড়ীতে। সেখানে নিয়ে গেলেন তার মা। ছল্ ছল চোখে সাক্ষাৎকারে সে জানালো, সে কোন নোটারী পাবলিকের কাছে যায়নি। তৈয়ব নামের সে কাউকে চেনেনা। সে শুধু নৈশ প্রহরী বকুল মিয়াকেই চেনে   তার চায়ের দোকানেও সে কোনদিন যায়নি। সে কোন সময় খাদিজা নাম ধারণ করেনি। সে নাবালিকা এবং প্রতারণার শিকার। সে বর্তমানে বাবা-

মার কাছেই আছে, অতীতেও ছিলো   কোন সময়ের জন্য পরের ঘরে যায়নি।

শোভার মা ও আত্মীয় স্বজনের সাথে কথা বলে জানা গেল, এহেন ঘটনার অবতারণায় হিন্দু সম্প্রদায়ের জন-মনে গভীর ক্ষোভ ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। মেয়েটি এবং পরিবারের সদস্যবৃন্দ সার্বক্ষণিক জীবনের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। মেয়েটির চোখে বিষাদের ছায়া। জীবনের কোন কিছু বুঝতে না বুঝতেই বিষণ্নতা তাকে আশ্রয় করলো   এ অনাকাঙ্খিত ঘটনার জন্য কাকে দায়ী করবে সে   নিজেকে, সমাজকে না ভাগ্যকে?

বর্তমানে বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন। এসব ঘটনার সরেজমিন তদন্তে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যার পর নাই নির্যাতনের মধ্যে কালাতিপাত করছে। এ থেকে পরিত্রাণের কোন পথ তাদের জানা নেই। এই দিশাহীনতার মধ্যে কেউ দিচ্ছেনা কোন পথের সন্ধান। তাদের দীর্ঘদিনের ভোগকরা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ভূ-সম্পত্তি বেদখল হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, উপাসনালয় মঠ শ্মশান পর্যন্ত জবরদখল করে নিচ্ছে ভূমিদস্যুরা, সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে, তাদের মেয়েরা বাইরে বেরুতে পারছেনা   তাদের হতে হচ্ছে গণধর্ষণের শিকার। স্বামীর সামনে স্ত্রী, বাবার সামনে মেয়ের, কোথাও বা শাশুড়ী-পুত্রবধূ, কোথাও বা মা-মেয়ে একত্রে গণধর্ষণের শিকার হবার ঘটনা কোন নতুন কিছু নয়। বিভিন্ন স্তরে একমাত্র সংখ্যালঘু হবার অপরাধে চাকুরী থেকে অব্যাহতি দেয়া হচ্ছে তাদের, অনেক ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা হারাচ্ছেন তারা, নতুনদের চাকুরীর অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে অত্যন্ত নগ্নভাবে, তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও আ ান্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। উচ্চতর শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার অভিজ্ঞতাও তাদের দীর্ঘকালের। এর সাথে জোর করে মেয়েদের ধর্মান্তরিত করার বিষয়টিতো আছেই; এখন নতুন করে যুক্ত হচ্ছে ছেলেদের ধর্মান্তরিত করার নবনব প্রচেষ্টা ও প্রলোভন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এদেশের সংখ্যালঘুদের সামনে বর্তমানে দু'টো পথ খোলা আছে   হয় তাদের এদেশে ধর্মান্তরিত হয়ে বাঁচতে হবে অথবা পূর্বসূরীদের মতো নীরবে দেশত্যাগ করতে হবে। এর আর কোন বিকল্প নেই। এখনই সময় এই মর্মান্তিক বিপন্নতার প্রতিরোধ ও প্রতিকারের পথের সন্ধান   অন্যথায় জাতিসত্ত্বা বিলোপের এ সুদূরপ্রসারী চ ান্ত কারো জন্য কল্যাণ বয়ে আনবেনা।

অশোক তরু

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রতিবেদন (সংক্ষিপ্তসার)

নির্বাচনোত্তর কালে সংখ্যালঘু নির্যাতনের উপর আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আ.স.ক) প্রতিবেদনটি তথ্যসমৃদ্ধ। ভোলা, সাতক্ষীরা, গৌরনদী উপজেলা, যশোর, বাগেরহাট, চট্টগ্রাম, বরিশাল এবং নাটোর জেলার নির্যাতনের বিবরণ এই রিপোর্টে স্থান পেয়েছে। রিপোর্টে বেশ কয়েক স্থানেই উলে-খ করা হয়েছে যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি সাধারণত একান্ত বাধ্য না হলে (যেমন ঢাকা থেকে আগত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের চাপ বা পত্রিকায় ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হওয়া) মামলা নিতে অস্বীকার করেছে এবং মামলা নিলেও আইনের ফাঁক-ফোঁকর রেখে মামলা রেকর্ড করেছে। এ ছাড়া তদন্তকারীরা এলাকায় উপস্থিত থাকাকালে সর্বক্ষণ একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের কর্মী/নেতৃবর্গ তাদের অনুসরণ করেছে এবং দুই-এক জায়গায় তাঁদের বাধা দিতে চেষ্টা করেছে। এ কারণে আ▯ান্ত ব্যক্তিরা অনেক জায়গায় মুখ খুলে কিছু বলতে পারেন নি।

দেশত্যাগ সম্পর্কে আ▯ান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে উলে-খযোগ্য সংখ্যক দেশে আর থাকবেন না বলে মনস্থির করে ফেলেছেন, তবে বেশির ভাগ মানুষই সরকার নিরাপত্তা এবং শান্তিতে থাকার ব্যবস্থা করলে দেশে থাকার পক্ষপাতী। বেশ কিছু জায়গায় বিভিন্ন সংঘবদ্ধ গ্রুপ কর্তৃক পালা করে লুটপাট, চাঁদাবাজি এবং ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

ভোলা জেলার রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, নির্বাচনের আগে থেকেই উত্তেজনা বিরাজ করছিল এবং ৪ দলীয় জোটের বিজয় নিশ্চিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই নির্যাতন শুরু হয়। পর্যবেক্ষক দল লালমোহন থানার অন্তর্ভুক্ত লর্ডহার্ডিঞ্জ ইউনিয়নের অন্নদাপ্রসাদ ও ফাতেমাবাদ গ্রাম থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। অন্নদাপ্রসাদ গ্রামের 'ভেণ্ডারবাড়ি' নামক মহল-াটিতে সব চাইতে লোমহর্ষক ঘটনা ঘটে। এখানে শত শত মানুষ নির্যাতনের শিকার হন। এক পঙ্গু মহিলা তাঁর মেয়ের (১৩/১৪) ইজ্জত বাঁচাতে গিয়ে নিজে ধর্ষিত হন। পুলিশ দেড় মাস পরে একান্ত বাধ্য হয়ে ধর্ষণের মামলা নিয়েছে। ৮-৯ বছরের একটি কিশোরী ধর্ষিত হয়। ফাতেমাবাদ গ্রামের শ্বাশুড়ি ও তার অন্তঃসত্ত্বা পুত্রবধূ ধর্ষিত হয়েছেন। সংবাদপত্রে তার ধর্ষণের খবর বের হওয়ার পরই মামলা নেওয়া হয়। উলে-খ্য যে, অন্নদাপ্রসাদ ও ফাতেমাবাদ গ্রামের ৬টি মামলার মধ্যে একমাত্র কিশোরী মেয়েটির ধর্ষণের মামলাটি চার্জশীটের স্তরে আছে। তদন্তকারীরা এই এলাকায় ২০টির অধিক ধর্ষণের কথা উলে-খ করেছেন কিন্তু মামলা হয়েছে মাত্র তিনটি। অন্নদাপ্রসাদের যে ঘটনাগুলি ব্যাপক প্রচার পেয়েছে অথচ মামলা হয়নি তার মধ্যে আছে ধর্ষণের ঘটনা ১২টি, স্বর্বস্ব লুটপাটের ঘটনা ৮টি।

প্রতিবেদকদের মতে বিজয়ী দলের প্রার্থী কর্মী এবং বিরোধী দলের কোন ব্যক্তি বা সামাজিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা নির্যাতন প্রতিরোধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসেন নি। এ প্রসঙ্গে ঐ এলাকার একজন মুসলিম হেডমাস্টার, যার বাড়ি লুটপাট ও ধর্ষণের প্রধান স্থান 'ভেণ্ডারবাড়ির' ১ কিলোমিটারের মধ্যে, জানান যে যদিও এসব তিনি ঘৃণা করেন তবুও সেদিন

রাত্রে প্রতিরোধ করার উদ্যোগ নেন নি।

স্বরূপকাঠির রিপোর্টে জানা যায় যে, অক্টোবরের ৩ তারিখে ইদুলকাঠি বাজারে প্রথম ধাক্কায় কিছু সংখ্যালঘুর দোকান ভাঙচুর হওয়ার পর পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর দ্রুত পদক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। সংখ্যালঘু ছাড়াও এই থানায় কিছু সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের উপরেও হামলা, চাঁদাবাজি হয়েছে। তবে সংখ্যালঘুদের বেলায় চাঁদা আকাশচুম্বী হারে ধার্য করা হয়। চাঁদা ধার্য করার একটি চিরকুটও তদন্তকারীদের দেখান হয়। এই জেলায় ভীতি প্রদর্শন, লুটপাট, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের ব্যাপক ঘটনা ঘটেছে।

বাগেরহাট হচ্ছে দেশের ভীষণভাবে আ▯ান্ত হওয়া একটি জেলা। সংখ্যালঘুদের অনেক মাছের ঘের লুট হয়েছে এবং মালিকরা সর্বস্বান্ত রয়েছেন। প্রতিবেদকদের সঙ্গে এই রকম একজন ক্ষতিগ্রস্ত মালিকের দেখা হয় যিনি ঘেরের জন্য ব্র্যাক থেকে লোন নিয়েছিলেন এবং এখন তাকে লোন পরিশোধের জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। একই ভদ্রলোক তার স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে আহত ভাতিজি সহ ৮ জনকে ভারতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। প্রতিবেদক পূর্বসায়রা নামক একটি গ্রামের চিত্র তুলে ধরেছেন। এই গ্রামে নির্যাতন এবং চাঁদাবাজির কারণে গা ঢাকা দিয়েছেন ১৫ জন, দেশত্যাগ করেছেন ৩৪ জন, গণধর্ষণের শিকার হয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন ২ জন এবং দেশ ত্যাগ করেছেন ২ জন। উলে-খ্য বাগেরহাটের কিছু গ্রামে নির্বাচনের ৩ সপ্তাহ আগে থেকেই বসতবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া, চাঁদাবাজি ইত্যাদি শুরু হয়ে যায়। অন্য একটি ঘেরপ্রধান গ্রামে সংখ্যালঘুদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ করেন▯ এমন একজন মুসলিম মালিকের ঘেরও লুট হয়েছে। বাগেরহাটের বারুইপাড়া গ্রামের শিল্পী দেবনাথ উপর্যুপরি ধর্ষিত হয়েছেন এবং ২/৩ জন ধর্ষণকারীকে তিনি চিহ্নিত করেন। তিনি ঘটনার দেড় মাস পরে নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলা দায়ের করেছেন। এর আগে অজ্ঞাত কারণে থানার ও.সি ধর্ষণের বদলে ডাকাতি এবং লুটপাটের মামলা দায়ের করেছিলেন।

নাটোর জেলার লালপুর থানার সীমান্তলগ্ন গ্রামগুলিতে গত ১০-১৫ বছর ধরে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের কারণে দু'হাজারের বেশি সংখ্যালঘু দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। এমন একজন দেশত্যাগীর বৈমাত্রেয় ভাই, যিনি এখনও এদেশে রয়েছেন▯ নির্বাচনের পরপরই তার উপর চাঁদা ধার্য করা হয় এই অজুহাতে যে, তার দেশত্যাগী ভাই জনৈক চাঁদাবাজের (স্থানীয় বি.এন.পি কর্মী) কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিল। থানার আর একটি গ্রামেও (কৃষ্ণরামপুর) প্রতিবেদক আসবাবপত্র লুণ্ঠন, বাক্স ভেঙে টাকা নিয়ে যাওয়া, মারধর, গরু ছাগল লুণ্ঠন ইত্যাদি ঘটে বলে প্রতিবেদনে উলে-খ করেছেন।

চট্টগ্রাম জেলার মিরেরসরাই থানার মিঠানালা গ্রামের দাসপাড়ায় প্রায় ৫০টি হিন্দু পরিবার প্রধানত মুড়ি ভেজে ও বি▯ি করে দিনযাপন করে। নির্বাচনের পর দিন (২রা অক্টোবর, ২০০১) থেকেই পাড়ার হাঁস-মুরগি চুরি হচ্ছিল। ৫ই অক্টোবর (২০০১) রাতে ৫/৬ জনের একটি দলকে এরা তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হলেও রাত ১টার দিকে ১৫/২০ জন লোক পাড়ায় হামলা চালায়। বিভিন্ন বাড়ির সদস্যদের প্রচণ্ড মারধোর করে টাকা-পয়সা আসবাবপত্র লুট এবং ভাঙচুর করে। পাড়ার সুনীল দাস (সাধু) সৎ, শ্রদ্ধেয় ও জনপ্রিয় ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর বাড়ি আ▯ান্ত হলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা প্রাণভয়ে পালিয়ে গেলেও তিনি বাড়ি ছেড়ে যান নি। তিনি মন্দিরের দরজা খুলে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে লাঠি এবং ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয় এর ফলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। উলে-খ্য হামলাকারীরা প্রতিটি বাড়িতে গিয়েই ১০ তারিখের মধ্যে ধর্মান্তরিত না হলে পাড়া ছাড়তে হবে বলে হুমকি দেয়। আ▯মণকারীদেরকে চিনলেও কেউ শনাক্ত করতে সাহস করে নি, তবে পুলিশ নিজস্ব সূত্রের খবরের ভিত্তিতে ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে বলে জানায়।

বরিশাল জেলার গৌরনদী এবং আগৈলঝাড়া থানার অধীনে সংখ্যালঘু গ্রামগুলিতে ব্যাপক লুটপাট, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি ইত্যাদি হয়েছে। থানার বিভিন্ন এলাকাতে সংখ্যালঘু ছাড়াও বেশ কিছু মুসলিম বাড়িতে হামলা, চাঁদাবাজি ঘটার উলে-খ দেখা যায়। হামলাকারীদেরকে স্থানীয় বি.এন.পি'র নেতা কর্মী হিসাবে শনাক্ত করা হলেও তাদের নাম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কেউ উচ্চারণ করতে সাহস করেনি এবং পুলিশও মামলা নেয়নি। সংখ্যালঘুর মধ্যে শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিবর্গকে দৈহিকভাবে লাঞ্ছনা করে জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়। এই থানার বেশিরভাগ মানুষই গোপালগঞ্জের রামশীল এবং নারকেলবাড়িতে আশ্রয় নেয়, কিছু মানুষ ভারতে চলে যায়। জেলাপ্রশাসকের কাছে লেখা একটি আবেদনপত্রে দেখা যায় স্থানীয় জনসাধারণ ৪ জন মহিলাকে ধর্ষণ, ১৫/২০ জন মহিলাকে ধর্ষণের হুমকি, ১৩টি চাঁদাবাজির ঘটনা, ২২টি চাঁদা ধার্য করার ঘটনা, ৮টি দোকান লুটের ঘটনা, ১১টি বসতবাড়ি লুট ও ভাঙচুর, ২টি পায়ের রগ কেটে দেওয়ার ঘটনা জেলা প্রশাসককে অবহিত করা হয়েছে। এই আবেদনপত্রে একজন মুসলিম মহিলাকে ধর্ষণের কথাও উলি-খিত হয়েছে।

গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া থানা ভুক্ত রামশীলের রিপোর্টে দেখা যায় গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া থানাধীন ২৩/২৪টি গ্রামের ৮-১০ হাজার মানুষ এই এলাকায় আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে যে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে অন্যান্য আতঙ্কিত পরিবারও এখানে আশ্রয় নিয়েছে। পুলিশ ও প্রশাসনের নীরবতা সন্ত্রাসীদের উৎসাহিত করেছে যার ফলে আশ্রয়গ্রহণকারীরা ঘরে ফিরে যেতে সাহস পাচ্ছে না।

সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগরে এক সংখ্যালঘু চেয়ারম্যানের সাংবাদিক সম্মেলনের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাস্থলে অনুসন্ধান করে 'আসকের' এক প্রতিবেদক জানিয়েছেন যে, মুন্সীগঞ্জ ইউনিয়নে দুই একটি ঘটনা ছাড়া তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি। প্রতিবেদক জানতে পেরেছেন যে, স্থানীয় সকল দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সম্মিলিত ভাবে জনসাধারণের কাছে সম্প্রীতির আহ্বান জানিয়ে নির্বাচনোত্তর উত্তেজনার প্রশমন ঘটানোর উদ্যোগ নিয়েছেন।

যশোরের কেশবপুরের রিপোর্টে দেখা যায় একজন স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকরা এখানকার সকল সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিয়েছে বলে প্রকাশ। উলে-খ্য যে, এক স্থানে একদল আওয়ামী লীগ সমর্থক নিরাপত্তার জন্য পুলিশ ক্যাম্পে যাওয়ার পথে এদের মধ্যে বেছে বেছে সংখ্যালঘুদের মারধর করা হয়। তবে থানার অন্য স্থানে আওয়ামী লীগের মুসলিম সমর্থকদের বাড়িঘরও ভাঙচুর করা হয়। প্রতিবেদকরা আরও জানতে পেরেছেন যে, জেলার মনিরামপুর থানার সংখ্যালঘু পরিবারদের উপর নির্যাতন হয়েছে।

(গণতদন্ত কমিশনের সৌজন্যে)

ডেটলাইন ঠাকুরগাঁও
ধর্ষণের পর রাধারাণীর চোখ উপড়ে ফেলা হয়

ঠাকুরগাঁও জেলা শহর থেকে ৬ কিঃ মিঃ উত্তর পার্শ্বে ১৯০০ হিন্দু ভোটার অধ্যুষিত চিলারং গ্রাম। দীর্ঘদিন ধরে বিএনপি ও স্বাধীনতাবিরোধী সন্ত্রাসীরা চিলারং গ্রামের হিন্দুদের উপর নিরব নির্যাতন চালাতে থাকায় অনেক হিন্দু পরিবার ভিটামাটি ত্যাগ করে ভারতে চলে যাওয়া শুরু করলে আমরা জেলা ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে নির্যাতনের নির্দিষ্ট ঘটনা ও দেশত্যাগীদের তালিকা উলে-খ করে ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসকের কাছে গত ১৬/০২/২০০৩ ইং তারিখে স্মারক লিপি প্রদান করি। কিন্তু বিএনপি জামাত জোটের প্রভাবশালী নেতাদের নির্দেশে জেলা প্রশাসন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় জোটের সন্ত্রাসীরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ ত্বরান্বিত এবং দেশত্যাগী সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি গ্রাস করার উদ্দেশ্যে চিলারং গ্রামের ভূমিহীন ও হতদরিদ্র মলিন চন্দ্র সাহার স্ত্রী চার সন্তানের জননী রাধারানী সাহা নৃশংস নির্যাতনের শিকার হয়েছে। গত ১১/০৯/২০০৩ তারিখ দুপুরের পরে রান্নার জন্য তার বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বের আখক্ষেত থেকে আখের শুকনাপাতা সংগ্রহ করতে গেলে চিলারং গ্রামের বিএনপি এর সা য়কর্মী ও ঠাকুরগাঁও বিএনপি এর শীর্ষস্থানীয় নেতার বিশেষ আশির্বাদপুষ্ট রফিকুল ইসলাম ও তার দুজন সহযোগী রাধারানীকে আখক্ষেতের মধ্যে পালা মে ধর্ষণ করে। রাধারানী রফিকুল ইসলামকে চিনতে পেরেছিল। এর ফলে সন্ত্রাসীরা রাধারানীকে হত্যার উদ্দেশ্যে তার গলা চেপে ধরে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করার চেষ্টা করে তার দুই চোখ উপড়ে নেয়। সেই রাতে রাধারানীকে ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে তাকে হাসপাতালের বারান্দায় ফেলে রাখে এবং তাকে হাসপাতাল থেকে তাকে কোন ঔষধ দেয়া হয়নি। পরে বাকীতে ঔষধ নিয়ে রাধারানীর চিকিৎসা করা হয়।

রাধারানীর স্বামী গত ১২/০৯/২০০৩ তারিখে ঠাকুরগাঁও থানায় বিএনপি'র সন্ত্রাসী ও সা য়কর্মী আসামী রফিকুল ইসলাম সহ অজ্ঞাত নামা অপর দু'জন সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের ৯(৩)/৪(২)(ক) ধারার অভিযোগে লিখিত এজাহার দায়ের করেন (যার ঠাকুরগাঁও থানার মামলা নং '৬, তারিখ ১১/০৯/২০০৩ ও জিআর মামলা নং ৪০২/০৩ ৩১৮/২০০৩)

এই ঘটনায় এলাকার হিন্দুদের মধ্যে ত্রাস, শঙ্কা ও উত্তেজনা দেখা দিলে পুলিশ ১২/০৯/২০০৩ তারিখে এজাহার নামীয় সন্ত্রাসী রফিকুল ইসলাম ও তার সহযোগী ইউসুফ আলীকে গ্রেফতার করলে ঘটনার অপর আসামী নাজিরুল ইসলাম ১২/০৯/২০০৩ তারিখে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকে এবং ইতিমধ্যে আই, ও এস, আই দীন মোহাম্মদ তড়িঘড়ি করে ১৪/০৯/২০০৩ তারিখে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আসামী ইউসুফ আলীর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারামতে লিপিবদ্ধ করেন। আসামী ইউসুফ আলী ঘটনার সাথে তার ও আসামী রফিকুল ইসলামের সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার

করে জবানবন্দি দেয়। ইতিমধ্যে ১৩/০৯/২০০৩ ইং তারিখে রাধারানীর ডাক্তারী পরীক্ষা হলেও প্রভাবশালী মহলের নির্দেশে ডাক্তারী পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে রাধারানীর স্বামীকে জানানো হয়নি। আমি ব্যক্তিগতভাবে আর.এম.ও ডাঃ মোঃ রিয়াজুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করে রাধারানীর ডাক্তারী পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে জানতে চাইলে আর,এম,ও সাহেব জানান যে, রাধারানীর চোখ দুটো উঠানো হয়েছে, কিন্তু তাকে কেউ ধর্ষণ করে নাই। এই অবস্থায় নির্যাতিতা রাধারানীর ছবি সহ পোস্টার বের করে নির্যাতিতা ও ধর্ষিতা রাধারানীর সুচিকিৎসা ও সঠিক ডাক্তারী পরীক্ষার প্রতিবেদন সহ সুষ্ঠু তদন্ত এবং তিনজন আসামীর সর্ব্বোচ্চ শাস্তির দাবীতে ঠাকুরগাঁও জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের উদ্দ্যোগে ও নেতৃত্বে প্রায় চার হাজার লোক নিয়ে মিছিল, মিটিং ও সমাবেশ করে ১৮/০৯/২০০৩ ইং তারিখে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের বরাবরে স্মারকলিপি দেয়া হয়। এস,আই, দীন মোহাম্মদ বিশেষ প্রভাবশালী মহলের নির্দেশে অপর আত্মগোপনকারী আসামী নাজিরুল ইসলামকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রাধারানীর স্বামী মলিন চন্দ্র সাহা বা আমাদেরকে অবহিত না করে গোপাল তুলশী রঞ্জন সাহা ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে রাধারানীর তথাকথিত জবানবন্দি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ২২ ধারা মতে লিপিবদ্ধ করান। জবানবন্দিতে কেবল মাত্র আসামী রফিকুল ইসলাম ও ইউসুফ আলীকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এ কথা জানতে পেরে রাধারানীর স্বামী মলিন চন্দ্র সাহা গত ২৪/০৯/২০০৩ ইং তারিখে আসামী নাজিরুল ইসলামের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ততার বিষয় ও স্থানীয় চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফার আসামীদের পক্ষালম্বনের বিষয়ে ঠাকুরগাঁও থানায় সাধারণ ডাইরী দায়ের করলে ঠাকুরগাঁও থানা তা যথারীতি গ্রহণ করে এবং সাধারণ ডাইরীর রিসিভ কপি পরে দেবেন বলে জানায়। ইতিমধ্যে তদন্তকারী কর্মকর্তা এস,আই দীন মোহাম্মদ তড়িঘড়ি করে আসামী পক্ষের আত্মীয় ও আসামী পক্ষের সমর্থক মামলার জন্য অনাবশ্যক অনেক লোককে সাক্ষীর শ্রেণীভুক্ত করে সাক্ষীর তালিকায় ৪২ জন সাক্ষীর নাম উলে-খ করে আত্মগোপনকারী আসামী নাজিরুল ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরব থেকে কেবলমাত্র রফিকুল ইসলাম ও ইউসুফ আলীর নামে অভিযোগ পত্র দাখিল করার পরে সাধারণ ডাইরীর রিসিভ কপিতে ২৪/০৯/২০০৩ তারিখ-এর উপর সাদা ফ্লুইড লাগিয়ে ০১/১০/০৩ তারিখ উলে-খ করে সাধারণ ডাইরীর রিসিভ কপি দেন। যার সাধারণ ডাইরী নং-০৭।

এরপরে মামলাটি বিচার নিস্পত্তির জন্য নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ ট্রাইবুন্যালে স্থানান্তরিত হলে এই পর্যায়ে আমরা ২৭/০৯/২০০৩ ইং তারিখের অভিযোগ পত্রের সম্মতিতে আসামী নাজিরুল ইসলামের সংশি-ষ্টতার বিষয় উলে-খ করে ভিকটিম রাধারানীর সাথে মনগড়া জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করা সহ বিধান অনুযায়ী মামলার তদন্তের ফলাফল সম্পর্কে এজাহারকারীকে অবহিত না করার কারণে নারাজী দরখাস্ত দাখিল করা হয়। নারাজী দরখাস্তের সমর্থনে এজাহারকারী মলিন চন্দ্র সাহা ও তার স্ত্রী ভিকটিম রাধারানী সাহা গত ০১/১১/২০০৩ তারিখে যথা[illegible]মে ৪১১ ও ৪১০ নং এফিডেভিট করেন। বিশেষ পি,পি জনাব আব্দুল হালিম এ্যাডভোকেট সাহেব আমাদেরকে সর্বাত্মক অসহযোগিতা করলে মামলার এজাহারকারী মলিন চন্দ্র সাহা মামলা পরিচালনার জন্য এ্যাডভোকেট ইন্দ্রনাথ রায়কে নিয়োগ দেয়ার জন্য গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রার্থনা করলে সলিসিটর শাখা বাদীর ব্যক্তিগত খরচে এ্যাডভোকেট ইন্দ্রনাথ রায়কে নিয়োগের অনুমতি প্রদান করেন।

মামলার বিচার শুরু হলে বাদী পক্ষের গুরুত্বপূর্ণ ও ঘটনার সাথে সংশি-ষ্ট মোট ১৬ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়। বাদী পক্ষের এই ১৬ জন সাক্ষীর মধ্যে এজাহারকারী মলিন চন্দ্র সাহা, ভিকটিম রাধারানী সাহা সহ মোট ১১ জন স্থানীয় সাক্ষী ছিল। অভিযোগ পত্রের সাক্ষীর

তালিকাভুক্ত অবশিষ্ট ২৬জন সাক্ষীর মধ্যে কেউ কেউ আসামীদের আত্মীয়, কেউ কেউ আসামী পক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। কোন কোন সাক্ষীকে আসামীপক্ষের আত্মীয় ও এলাকার চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফা সাক্ষী না দেওয়ার জন্য ভয়-ভীতি দেখালে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, ফলে তাদেরকে বাদ দেয়ার জন্য প্রার্থনা করা হয়। এই অবস্থায় বিজ্ঞ আদালত বাদীপক্ষের সাক্ষী সমাপ্ত করে আসামীদেরকে ফৌঃ কাঃ বিঃ ৩৪২ ধারা মতে পরীক্ষা (আসামীদের বক্তব্য শোনার পর্যায়) জন্য দিন ধার্য করেন। বাদী পক্ষের স্থানীয় **১১**জন সাক্ষী ঘটনার সাথে আসামী রফিকুল ইসলাম, ইউসুফ আলী ও নাজিরুল ইসরামের সংশি-ষ্টতার বিষয়ে পরস্পরকে সমর্থন করায় ইউসুফ আলী ও নাজিরুল ইসলামের সংশি-ষ্টতার বিষয়ে পরস্পরকে সমর্থন করায় আসামী নাজিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে (Cognitmene) নেওয়ার দরখাস্ত দেয়ার জন্য বিশেষ পিপি জনাব আব্দুল হালিমকে একাধিকবার অনুরোধ করা হলে বিশেষ পিপি দরখাস্ত দিতে অঙ্গীকার করায় এ্যাডভোকেট ইন্দ্র নাথ রায় গত ২৭/০৮/২০০৫ তারিখে নাজিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে নেয়ার জন্য বিজ্ঞ আদালতে দরখাস্ত করেন।

এমতাবস্থায় ঠাকুরগাঁও নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুন্যাল হতে মামলাটি রাজশাহী দ্রুত বিচার ট্রাইবুন্যালে পাঠানোর জন্য এস,আর, ও নং ২৩৪ আইন/২০০৫, প্রজ্ঞাপন অতিরিক্ত সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, আগস্ট/০৪, ২০০৫ প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা-১, ১৪/০৮/২০০৫ ইং তারিখে আঃ প্রঃ ২/২০০২ (আইন-১)/৫৪৭ নং স্মারকে আদেশ হয়। সরকারের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মামলাটি দ্রুত নিস্পত্তি হওয়ার পরিবর্তে মামলা নিস্পত্তি হতে বিলম্ব হওয়ার কারণ সহ অন্যান্য কারণ উলে-খ করে মামলার এজাহারকারী মলিন চন্দ্র সাহা গত ৩০/০৮/০৫ ইং তারিখে ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের বরাবরে আবেদন করেও কোন ফল পাওয়া যায় নি। মামলাটি ইতিমধ্যে রাজশাহী দ্রুত বিচার ট্রাইবুন্যালে স্থানান্তরিত হয়েছে।

রাধারানীর মামলায় স্থানীয় **১১**জন সাক্ষী পরস্পরকে সমর্থন করে যে সাক্ষ্য প্রদান করেছে আসামীদের সর্ব্বোচ্চ সাজার আদেশ ঠাকুরগাঁও হলে তাৎক্ষণিকভাবে যে প্র্িয়া সৃষ্টি হবে তাতে বিএনপি এর শীর্ষ নেতার রাজনৈতিক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কায় অসৎ উদ্দেশ্যে মামলাটি শেষ পর্যায়ে রাজশাহী দ্রুত বিচার ট্রাইবুন্যালে প্রেরণ করা হয়েছে।

মর্মান্তিক ব্যাপার হলো রাধারানীর জীবনে এমন পৈশাচিক ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে জেলা প্রশাসন, সরকারী দল বা স্থানীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রী মির্জা ফ.ই. আলমগীর কোন দিন রাধারানীকে দেখতে যাননি। কোনভাবে তাকে সাহায্য সহযোগিতা করেননি। এমনকি রাধারানীর পরিবার অর্ধাহারে অনাহারে থাকার বিষয় জানার পরেও রাধারানীর পরিবারকে ভিজিএফ কার্ড দেয়া হয়নি। অথচ সংশি-ষ্ট এলাকার অনেক পরিবারকে ভিজিএফ কার্ড, টিন সহ অন্যান্য সাহায্য দেয়া হয়েছে।

রাধারানীকে ধর্ষণ করে চোখ দুটি তুলে নেয়ার ঘটনার পরে ১৪/১২.২০০২ ইং তারিখে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব শাহরিয়ার কবির ও সাধারণ সম্পাদক জনাব কাজী মুকুল অন্যান্য নেতৃবৃন্দসহ ঠাকুরগাঁও এলে রাধারানীর ঘটনা জানতে পেরে তাঁর বাড়ীতে যান। তাঁরা রাধারানী ও তার পরিবারের বক্তব্য শোনেন এবং এরপরে তিন দফায় নগদ ৫৫,০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন।

দুই
জামাতী সন্ত্রাসী কর্তৃক মালতি পাল ধর্ষণ

ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী থানাধীন বেলতলা গ্রামের যতীন চন্দ্র পালের গর্ভবর্তী স্ত্রী মালতি পাল (২২) কে তার প্রতিবেশী জামাতে ইসলামের স্িয় কর্মী ও ঠাকুরগাঁও জেলা জামাতে ইসলামের সেেটারী ও বালিয়াডাঙ্গী সংসদীয় আসনে (২০০১) সালের নির্বাচনে জোটের প্রার্থী মৌলানা হাকিমের আর্শিবাদপুষ্ট আব্দুল মালেক, পিতা- মোঃ বিকল (২) শেরাফত আলী, পিতা- সাইফুল ইসলাম (৩) মোঃ বাবুল, পিতা- মোঃ বয়রা সকলের সাং- বেলতলা, আমজানখোর, থানা- বালিয়াডাঙ্গী, জেলা-ঠাকুরগাঁও গণ গত ০৪/০৮/২০০৪ সন্ধ্যা ৭.০০ টায় তার বাড়ীর লোকদের অনুপস্থিতির সুযোগে বাড়ীতে এসে মালতি পালকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে পাশের হলুদ ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে মারপিট ও ধর্ষণ করে। ০৪/০৮/০৪ ইং তারিখে রাতে মালতি পালকে বালিয়াডাঙ্গী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বালিয়াডাঙ্গী থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্বাস আলী খাঁ ঘটনার রাতেই আসামী পক্ষ ও ক্ষমতাসীন জোটের নেতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরদিন বালিয়াডাঙ্গী হাসপাতালে গিয়ে ভিকটিম মালতি পালকে ৫০/= টাকা হাতে দিয়ে তাকে পরনের কাপড় চোপড় পরিস্কার করে ধুয়ে স্নান করার নির্দেশ দিয়ে মালতি পালের স্বামী যতীন চন্দ্র পালকে থানায় ডেকে নিয়ে থানার এক পুলিশকে দিয়ে একখানি এজাহার লিখে স্বাক্ষর নেয়। যার বালিয়াডাঙ্গী থানার মামলা নং ০১ তারিখ ০৫/০৮/২০০৪। ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ৯(৪) (খ) (ধর্ষণের চেষ্টা) ধারা ও জি,আর, মামলা নং ৩১৭/০৪। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে যতীন চন্দ্র পাল ঠাকুরগাঁও ম্যাজিস্ট্রেট আদালত থেকে জি,আর ৩১৭/০৪ নং মামলার এজাহার বের করে পড়ে জানতে পারে যে, ওসি বালিয়াডাঙ্গী আসামীদের রক্ষা করার জন্য মনগড়া এজাহার লিখেছে। এর পরে বিস্তারিত ঘটনা উলে-খ করে যতীন চন্দ্র পাল গত ১৪/০৮/২০০৪ ইং তারিখে ঠাকুরগাঁও পুলিশ সুপার বরাবরে অভিযোগ দায়ের করে এবং নিজে বাদী হয়ে উলে-খিত আসামীদের বিরুদ্ধে ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমনের ৯(৩) ধারার অভিযোগ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুন্যালে ১৭/৮/২০০৪ তারিখে ১২৯/০৪ নং নারী ও শিশু মামলা দায়ের করে।

বিজ্ঞ আদালত ২১/০৮/০৪ইং তারিখে মামলাটি তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য জনাব আজিজুল ইসলাম ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে দায়িত্ব প্রদান করেন। ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আজিজুল ইসলাম সরেজমিনে তদন্ত করে প্রাথমিকভাবে অভিযোগের সত্যতা আছে এই মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করলে বিজ্ঞ আদালত ০২/২০০৪ তারিখে উলে-খিত তিনজন আসামীর বিরুদ্ধে ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের ৯(৩) ধারায় অপরাধ আমলে নিয়ে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারীর আদেশ দেন এবং ইতিমধ্যে পুলিশ জি,আর ৩১৭/০৪ নং মামলায় নারী ও শিশু ১৬৫/০৪ নং মামলায় সংশি-ষ্ট তিনজন আসামীর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯ (৩) ধারায় অভিযোগ পত্র দাখিল করলে বিজ্ঞ আদালত আসামীদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারীর আদেশ দেন। উলে-খিত তিনজন আসামী বর্তমানে জেল হাজতে আটক আছে। কিন্তু ওসি বালিয়াডাঙ্গী আব্বাস আলী খাঁ ধরা ছোঁয়ার বাইরে নিরাপদে আছেন।

তিন
বিএনপির সন্ত্রাসীরা ধর্ষণ করছে রাণী বেশরাকে

ঠাকুরগাঁও সদর থানার কহরপাড়া গ্রামের আদিবাসী মহল-ার যোগেশ বেশরার সদস্যে বিবাহিতা মেয়ে রানী বেশরা (২০) তার শ্বশুড়বাড়ী থেকে বাবার বাড়ীতে বেড়াতে এসে ধর্ষিত হয় বিএনপির স্থানীয় সন্ত্রাসীদের দ্বারা। ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপি নেতা ও কহরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পয়গাম আলী গডফাদারের একান্ত অনুগত ও এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী (১) আবুল হোসেন (২) মিঠুন মোহাম্মদ (৩) মজিবর রহমান (৪) সালাম (৫) আকরাম ২৪/০৮/২০০৪ তারিখ রাত ২.০০ টার সময় অস্ত্রের মুখে রানী বেশরাকে তার শয়ন ঘর থেকে অপহরণ করে পার্শ্ববর্তী ইক্ষু ফার্মের বনায়নের ভিতরে বিবস্ত্র করে পালা□মে উপর্যুপরী ধর্ষণ করে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে চলে যায়। পরদিন ২৫/০৮/২০০৪ ইং তারিখে এই ঘটনা প্রকাশ পেলে আসামীদের গডফাদার পয়গাম আলী চেয়ারম্যান আপোষ করার কথা বলে রানী বেশরার কাছ থেকে একাধিক সাদা কাগজে সই নেয়। ঐক্য পরিষদ বিষয়টি অবহিত হওয়ার পর পাঁচজন আসামীর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের অভিযোগে ঠাকুরগাঁও থানায় মামলা করে। যার ঠাকুরগাঁও থানার মামলা নং ৩১ তারিখ ২৯/০৮/২০০৪ ও জি,আর মামলা নং-৩৫০/২০০৪। মামলা দায়ের করার পরে পয়গাম আলী চেয়ারম্যান পুলিশকে চাপ দিয়ে মামলা ধামা চাপা দিয়ে রাখে এবং আসামীদের গ্রেফতার করতে দেয়নি।

চার
আদিবাসী কিশোরী তালাস হেমরমকে ধর্ষণ করেছে বিএনপির সন্ত্রাসীরা

ঠাকুরগাঁও সদর থানার বিএনপি সভাপতি ও রুহিয়া ইউনিয়নের তৎকালীন চেয়ারম্যান তৈমুর রহমান ও তার সার্বক্ষণিক সহযোগী খলিল গত ২৮/০১/২০০২ ইং তারিখ দিনগত রাত অনুমান ১২.০০ টার সময় মধুপুর ধুলের হাট (ফরিদপুর) গ্রামের আদিবাসী সুবল হেমরম বাড়ীতে গিয়ে মদপান করে নাবালিকা মেয়ে তালাস হেমরম (১৪) কে জোর করে ধর্ষণ করে। এই ঘটনার বিষয়ে সুবল হেমরম বাদী হয়ে ঠাকুরগাঁও থানায় মামলা দায়ের করে। যার ঠাকুরগাঁও থানার মামলা নং ০২, তারিখ ০৩/০২/২০০২ ও জি,আর মামলা নং ৭৪/২০০২।

এই মামলা দায়ের হওয়ার কারণে কৃষি প্রতিমন্ত্রী মির্জা ফ,ই, আলমগীরের নির্দেশে তৎকালীন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব আনোয়ারুল হককে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে স্ট্যান্ড রিলিজ করা হয়। এই মামলা দায়ের হওয়ার ২/৪ দিন পরে কৃষি প্রতিমন্ত্রী জনাব মির্জা আলমগীরের আদিবাসী নাবালিকা ধর্ষণ মামলার অন্যতম আসামী তৈমুর রহমানকে পাশে বসিয়ে পুলিশের উপস্থিতিতে রুহিয়ায় প্রকাশ্য জনসভা করেন। মামলা দায়ের হওয়ার পর তৈমুর রহমান আদিবাসী সুবল হেমরম, তার নাবালিকা মেয়ে তালাস হেমরম ও তার পরিবারকে অজ্ঞাত স্থানে গোপন করে রাখে। আমরা অনেক খুজাখুঁজি করেও সুবল হেমরমের পরিবারের সন্ধান পাইনি। এরপরে তৈমুর রহমান ঠাকুরগাঁও পৌর বিএনপি সভাপতি এ্যাডভোকেট আব্দুল হালিমের জুনিয়র এ্যাডভোকেট জাকারিয়ার মাধ্যমে এ্যাডভোকেট মোঃ সফিউজ্জামান চৌধুরী নোটারী

পাবলিকের অফিসে ০৬/০২/২০০২ ইং তারিখে সুবল হেমরম ও তার নাবালিকা মেয়ে তালাস হেমরমকে দিয়ে এজাহারের ঘটনা অস্বীকার করে এফিডেভিট করে নেয়ার পরে পুলিশ ০৮/০২/২০০২ ইং তারিখে তৈমুর রহমান ও খলিলের নামে চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেন। এরপরে তৈমুর রহমান সুবল হেমরমের পরিবারকে এলাকা ছাড়া করলে তারা অন্যত্র গিয়ে বসবাস করছে।

পাঁচ
আদিবাসী বিউটি হাজদাকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে

ঠাকুরগাঁও জেলার রানীসংকৈল থানা এলাকার সুন্দরপুর গ্রামের আদিবাসী কামলাং মুরমুর অন্তসত্বা পুত্রবধূ বিউটি হাজদাকে (২০) বাড়ী রেখে বাড়ীর লোকেরা ১৯/০৯/২০০৩ তারিখ বিকাল তিনটার সময় মাছ ধরতে যায়। এই সুযোগে আসামী (১) আবু তালেব, পিতা-খাজানউদ্দীন বাঁশবাড়ী সুন্দরপুর (২) রাশেদ খান মেনন, পিতা-আব্দুল কাদের সাং- সুন্দরপুর, কান্দু (৩) ফুলমিয়া পিতা অজ্ঞাত সাং- সুন্দরপুর থানা রানীসংকৈল জেলা ঠাকুরগাঁও বিউটি হাজদাকে পালা□মে উপর্যুপরী ধর্ষণ করে। সেই সময় বিউটি হাজদা আসামীদের নাম প্রকাশ করার হুমকি দিলে আসামীরা বিউটি হাজদার গলা কেটে দিয়ে পালিয়ে যায়। এই ঘটনার পরে বিউটি হাজদা প্রতিবেশীদের বাড়ীতে দৌড়ে গিয়ে আসামীদেরকে ইশারায় দেখিয়ে দেয়ার পর মারা যায়। এই ঘটনার বিষয়ে বিউটি হাজদার শ্বশুর বাদী হয়ে রানীশংকৈল থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯(৩) ধারায় এজাহার করে। যার রানীসংকৈল থানার মামলা নং ১১ তারিখ ১৯/০৯/২০০৩ ও নারী ও শিশু মামলা নং ৯৮/০৪। উক্ত মামলায় পুলিশ তদন্ত শেষে আসামীদের নামে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করলে বিজ্ঞ নারী ও শিশু ট্রাইবুন্যাল আসামীদের বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে কেস এবং বর্তমানে মামলাটি সাক্ষীর পর্যায়ে বিচারাধীন আছে।

ছয়
বিএনপির সন্ত্রাসীরা ধর্ষণ করেছে নাবালিকা পুতুলকে

ঠাকুরগাঁও সদর থানার ঠাকুরগাঁও জেলা শহরের পার্শ্বে উত্তর ঠাকুরগাঁও গ্রামের গোপাল চন্দ্র শর্মা ২৯/০৪/০৫ ইং তারিখ রাত অনুমান ১.০০ টার সময় প্রস্রাব করার জন্য ঘুম থেকে উঠে দেখে যে, তার ১৪ বছর বয়সের নাবালিকা মেয়ে পুতুল ঘরে নাই। এরপরে গোপাল শর্মা তার আত্মীয় স্বজন সহ খোজাখুঁজি করে ভোর ৫.০০ টার সময় তার বাড়ীর ৩০০/৪০০ গজ দূরে বাঁশ ঝাড়ে অজ্ঞান, উলঙ্গ ও রক্তাক্ত অবস্থায় পুতুলকে দেখতে পায়। বাড়ীতে এনে সেবা যত্ন করলে পুতুলের জ্ঞান ফেরে। এরপরে পুতুল জানায় যে, ঘটনার রাত অনুমান ১০.০০ টার সময় সে প্রস্রাব করার জন্য বাইরে এলে এলাকার বিএনপি কর্মী (১) আব্দুর রহমান, পিতামৃত-পাতা খলিফা (২) ফিরোজ পিতামৃত-মুনির উদ্দিন উভয়ের সাং-উত্তর ঠাকুরগাঁও, থানা ও জেলা-ঠাকুরগাঁওসহ আরো একজন অচেনা আসামী তার মুখ বেঁধে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে

পালা□মে ধর্ষণ করলে সে অজ্ঞান হয়ে যায়। এই ঘটনা জানাজানি হলে আসামীরা গোপাল শর্মার পরিবারকে অবরুদ্ধ করে রাখে। সংবাদ পেয়ে আমরা গোপাল শর্মা ও তার নাবালিকা মেয়ে পুতুলকে উদ্ধার করে আনলে গোপাল শর্মা বাদী হয়ে মামলা করে। যার ঠাকুরগাঁও থানার মামলা নং-০৫ তারিখ ০৯/০৫/২০০৫ ও নারী শিশু মামলা নং ৭৬/২০০৫। এই মামলা হওয়ার পরে আসামী পক্ষ ভয় দেখিয়ে গোপাল শর্মার কাছ থেকে আসামীরা নির্দোষ মর্মে আপোষনামা ও অঙ্গিকারনামা লিখে নেয়।

২০০১ সালে অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় নির্বাচনের পরে ঠাকুরগাঁও জেলায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর শত শত নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। যার ফলে ঠাকুরগাঁও জেলা থেকে কমপক্ষে ত্রিশ হাজার ধর্মীয় সংখ্যালঘু ভিটামাটি ত্যাগ করে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা হলো গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক একটি রাজনৈতিক দলও এই জেলায় নির্যাতিত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পাশে সাংগঠনিকভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে দাঁড়ায়নি, নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের খোঁজখবরও নেয়নি। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বরং কিছু ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হয়ে দেশত্যাগী হওয়ার সময় গোপনে সংখ্যালঘুদের জায়গা জমি নামমাত্র মূল্য দিয়ে অথবা টাকা দেয়ার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে রেজিস্ট্রি করে নিয়ে দ্রুত দেশত্যাগী হতে সাহায্য করেছে।

তাছাড়া ঠাকুরগাঁওয়ে প্রতিনিয়ত মন্দিরের জায়গা ও শশ্মান সহ ব্যক্তিগত সম্পত্তি জবর দখল হচ্ছে। এসব বিষয়ে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ করে কোন রকম প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে না।

এ্যাডভোকেট ইন্দ্র নাথ রায়
সাধারণ সম্পাদক
হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদ
ঠাকুরগাঁও জেলা কমিটি

মহালছড়ির ঘটনা ২০০৩

২০০৩ সালের ২৬ আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়িতে বসবাসকারী আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবীতে সোচ্চার আদিবাসী জুম সম্প্রদায়ের উপর বাঙালি বসতিস্থাপনকারীরা (যাদের মূলত ঃ জুম সম্প্রদায়ের আন্দোলন মোকাবেলা এবং তাদের উৎখাত করার জন্য সরকারি উদ্যোগে সমতল থেকে বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে) পৈশাচিক হামলা চালায়।

পাহাড়ীদের অভিযোগ অনুযায়ী এই বসতি স্থাপনকারী বাঙালিরা সামরিক বাহিনীর সহযোগিতায় আদিবাসী গ্রামবাসীদের উপর হামলা চালিয়ে ৩৬৭ জনের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, ২ জনকে হত্যা করে (যাদের মধ্যে আট মাসের এক শিশুও রয়েছে), লুটপাট চালায়, ১০ জন নারীকে ধর্ষণ করে এবং আরও অনেককে শারীরিকভাবে জখম করে। হামলায় ৫৪ জন আদিবাসী গুরুতরভাবে আহত হয়।

বাঙালি বসতিস্থাপনকারীরা এর আগে 'বাঙালি সমন্বয় পরিষদ'-এর ব্যানারে মহালছড়ি বাজারে সমবেত হয় এবং সেই সমাবেশে আদিবাসী জুম গ্রামের উপর হামলা চালানোর পক্ষে উগ্র সাম্প্রদায়িক বক্তব্য রাখা হয়। তারা এই সমাবেশে প্রশাসন, সামরিক বাহিনী এবং স্থানীয় পুলিশসহ তাদের সঙ্গে সংশি-ষ্ট অন্যান্য মহলকে উদ্দেশ্য করে এই হুঁশিয়ারীও দেয় যে, আদিবাসীরা উৎখাত না হওয়া পর্যন্ত তারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো এখানে সামরিক বাহিনী, পুলিশ এবং সিভিল প্রশাসনের ভূমিকা অত্যন্ত নিন্দনীয়। তাদের কারণেই আদিবাসীদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন, ধর্ষণ, হত্যার মতো ঘটনা ধারাবাহিকভাবে ঘটছে। তাছাড়া সামরিক বাহিনী (২১ ইবিআর) অনবরত জুম্ম জনসাধারণের প্রতি এই হুঁশিয়ারী দিয়ে আসছে যে, তারা যদি বাঙালি বসতিস্থাপনকারীদের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালায় তাহলে সেনাবাহিনী গুলি চালাতে বাধ্য হবে। বিশেষ করে সেনাবাহি-নী আদিবাসীদের উপর হামলা ও অগ্নিসংযোগের জন্য উৎসাহিত করবার জন্য বাঙালি বসতিস্থাপনকারীদের জন্য পেট্রোল এবং কেরোসিনও সরবরাহ করেছিল। সম্প্রতি তারা আদিবাসীদের উপর হামলা চালানোর জন্য শতাধিক বাঙালি বসতিস্থাপকারীকে শারীরিক প্রশিক্ষণও দিয়েছে।

মহালছড়ি সামরিক জোন (২১ ইবিআর)-এর মদদে বাঙালি বসতিস্থাপনকারীরা ঘটনার দিন মহালছড়ি বাজার, সিলেট পাড়া, টিএন্ডটি এবং হাসপাতাল এলাকায় সমবেত হয়। এইসব জায়গা থেকে বাঙালি বসতিস্থাপনকারীরা একযোগে পাথরতলী, বুয়াটেক, দুরপজ্জানাল কেরেঙ্গানাল, হেমন্তপাড়া, থালিপাড়া, রামেশুকারবারীপাড়া এবং চ্যাংরাছড়িমুখ এলাকার জুম আদিবাসী জনপদের উপর হামলা চালিয়ে অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ এবং লুটপাট চালায়। সেনাবাহি-নীর নাকের ডগায় এইসব পৈশাচিক ঘটনা ঘটে।

হামলার শিকার গ্রাম সমূহ ঃ

- বাবুপাড়া (২৫২ থাইলাপাড়া মৌজা। এখানে ৭৬টি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়) সমিল পাড়া (২৫২ নম্বর থাইলাপাড়া মৌজা। এখানে ৩৮টি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়)।
- রামেশশুকারবারী পাড়া (২৫২ নম্বর থাইলাপাড়া মৌজা। এখানে ৯৬টি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয় এবং ৭টি বাড়ি লুট করা হয়)।
- দুরপজ্জানাল (২৫৪ নম্বর দুরপজ্জানাল মৌজা। এখানে ৪টি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয় এবং ৪০ বাড়িতে লুট করা হয়)।
- মাধমপাহাড়তলী (২৫২ নম্বর থাইলাপাড়া মৌজা। এখানে ৩৭টি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয় এবং ১৮ বাড়িতে লুট করা হয়)।
- লেমুছড়ি (২৫০ নম্বর লেমুছড়ি মৌজা। এখানে ৭০টি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়, যার মধ্যে একটি বৌদ্ধমন্দির, দুটি দোকান, একটি ক্লাবঘর, একটি ইউনিসেফ স্কুল এবং দুটি ধান মাড়াই কলঘর ছিল। এছাড়া ২টি বৌদ্ধমূর্তি লুট করা হয় ও ২টি বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস করা হয়)।
- নুয়াপাড়া (২৫১ নম্বর চ্যাংরাছড়ি মৌজা। এখানে ১২টি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়)।
- থালিপাড়া (২৫২ নম্বর থালিপাড়া মৌজা। এখানে ১টি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়)। ঘটনাস্থলের কাছেই মহালছড়ি থানা হেডকোয়ার্টার, ২৫ কিঃ মিঃ উত্তরে খাগড়াছড়ি শহর অবস্থিত।
- এছাড়া আরও যেসব পাড়ায় হামলা ও লুটপাট হয় সেগুলো হলো বুয়াটেক, চ্যাংরাছড়িমুখ, হাসপাতাল, টিএন্ডটি এলাকা এবং হেমন্তপাড়া।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য ঃ

হামলার শিকার সোনালী চাকমা বলেন, 'প্রথমে সেনাবাহিনীর তরফ থেকে বাঙালি বসতিস্থাপনকারীদের পক্ষে নিরাপত্তামূলক গুলি বর্ষণ করে হামলায় উৎসাহ যোগানো হয় এবং তারপর তাদের হামলার জন্য লেলিয়ে দেয়া হয়।

কেরেঙ্গানাল গ্রামের নীলাচন খিশার স্ত্রী মিনতী খিশা বলেন, তার গ্রামের দিকে যখন নৌকায় করে মেয়েরা পালিয়ে আশ্রয় নেবার জন্য আসছিল তখন সেনাবাহিনীর লোকরা তাদের ঘেরাও করে বেদম প্রহার করতে থাকে। সেইসঙ্গে তারা জোর করে কবিতা চাকমা, সবিতা চাকমা, পিন্টু চাকমা, কোয়েল চাকমা এবং অন্যান্য গ্রামের আরও কয়েকজন মেয়েকে লেকের পানিতে ফেলে দেয়।

সমিলপাড়া গ্রামের ৯৩ বছর বয়স্ক জয়ন্ত চাকমা বলেন, এই হামলা কিছুই না। বসতিস্থাপনকারী বাঙালিরা অনবরত আদিবাসীদের জায়গা-জমি জবর দখল করে নিচ্ছে এবং এ ব্যাপারে সরকার তাদের সব সময় উৎসাহ যোগাচ্ছে। তার স্ত্রী কনকলতা চাকমা বলেন, 'এই হামলার ঘটনায় সামরিক বাহিনীর পুরো সহায়তা ছিল।'

প্রতুল চন্দ্র খিশার স্ত্রী নিরূপা খিশা বলেন, 'ঘটনার সময় আমি দেখেছি বাঙালি বসতিস্থাপনকারীরা আদিবাসীদের বাড়ি-ঘরে আগুন দিচ্ছে এবং সহায় সম্পদ লুটপাট করছে।'

যে সকল নারী শারীরিক ভাবে নির্যাতিত হয়েছে ঃ

১. পাথরতলী গ্রামের সোয়সদার চাকমার স্ত্রী শান্তিবালা চাকমা ওরফে মিতা (৩৮)।
২. পাথরতলী গ্রামের সোয়সদার চাকমার বোন খুকী চাকমা (১২)।
৩. পাথরতলী গ্রামের সোয়সদার চাকমার বোন বনিতা চাকমা (১৫)।
৪. পাথরতলী গ্রামের সুদত্ত চাকমার বোন অমিতি চাকমা (১৬)।

৫. পাথরতলী গ্রামের সুদত্ত চাকমার বোন গীতাঞ্জলি চাকমা (১৪)।
৬. কেরেঙ্গানাল গ্রামের কালোবরণ চাকমার বোন বীনারাণী চাকমা (২০।
৭. কেরেঙ্গানাল গ্রামের বাতা চাকমার স্ত্রী কালোসোনা চাকমা (৩৫)।
৮. কেরেঙ্গানাল গ্রামের নিবারণ চাকমার স্ত্রী মায়ালক্ষী চাকমা (২২)।
৯. কেরেঙ্গানাল গ্রামের কালাউধা চাকমার বোন চিককালা চাকমা (৩৫)।
১০. কেরেঙ্গানাল গ্রামের বিমল চাকমার স্ত্রী বাধিমিলা চাকমা (৩৫)।

২৬ আগস্টের এই বর্বর হামলার ঘটনায় চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনপদে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। সন্ত্রাসের শিকার শোকাহত এইসব মানুষকে দেখার জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি। দক্ষিণ বাংলার এই জনপদ দিনরাত যেন এভাবে এক যুদ্ধাবস্থায় বাস করছে। এই মানুষেরা শান্তিতে ঘুমাতে পারছে না। অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ এবং আহত হবার মতো নানা ঘটনা এদের জন্য নিত্য সঙ্গী।

মহালছড়ির ঘটনা প্রমাণ করে পাহাড়ী জনগণ মোটেও অনুকুল দেশে নেই। তাদের বিরুদ্ধে অপতৎপরতা বন্ধ হচ্ছে না। পার্বত্য এলাকা অনবরতভাবে বাঙালিরা দখল করে নিচ্ছে। জয়সেনপাড়া এবং পাগুজ্জছড়ি এলাকায় তাদের বসতিস্থাপন এর জলন্ত উদাহরণ। সুমনালঙ্কার মহাথেরো বলেছেন, 'আওয়ামী লীগের শাসনামলের শেষ সময়ে এই বসতিস্থাপন হয়।'

মহালছড়ির এই সন্ত্রাসী ঘটনা প্রতিহিংসার পরিবেশ তৈরী করেছে। লেমুছড়ির অবনী কুমার চাকমা (৪০) বলেন, 'বাঙালি বসতিস্থাপনকারীরা আমাদের ভূমিসহ রাস্তা-ঘাট সমস্ত কিছু দখল করে নিতে চায়। ১৯৯১ সাল থেকে তারা আমাদের ভূমি দখল করে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করে আসছে। এ ব্যাপারে আমরা জেলা আদালতে অভিযোগ করেছি। জেলা প্রশাসক এ ব্যাপারে ভূমি অধিদপ্তরকে আদিবাসীদের জন্য কিছু দিক নির্দেশনা দিয়েছিল, কিন্তু এখন পর্যন্ত দখলকৃত কোন ভূমি ফেরত পাওয়া যায়নি।'

যেখানে সামরিকবাহিনী মহালছড়ির ঘটনায় হামলাকারীদের পক্ষাবলম্বন করেছিল সেখানে স্বভাবতই ন্যায়সঙ্গত বিচার পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে এবং ঘটনাপ্রবাহও জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীরা মামলা পর্যন্ত করতে সাহস পায়নি। পার্বত্য জনপদের ক্ষেত্রে এখন এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, সেনাবাহিনী সেখানে থাকলে তারা হামলাকারীদের পক্ষেই ভূমিকা রাখবে।

বস্তুতপক্ষে সামরিক তৎপরতার মুখে পাহাড়ী জনপদ উৎখাত হচ্ছে। সেইসঙ্গে ২৬ আগস্টের ঘটনা আবারও প্রমাণ করেছে যে, পাহাড়ী জনগণ পুরো নিরাপত্তাহীন, নেতৃবৃন্দ এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলোও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নিতে পারছে না।

বিনোতাময় ধামাই
বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম-এর পাবলিক হিয়ারিং-এ মানবাধিকার নেত্রী রোজলিন কস্তার প্রতিবেদন

‘ভোলার ৯৮ শতাংশ হিন্দু নারী নির্বাচনের সময় ধর্ষিত হয়েছে।’

বাংলাদেশে ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর জোট সরকারের অত্যাচার-নিপীড়ন সম্পর্কে সারা বিশ্ব আজ কম-বেশি জানে। অতীতে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার হলেও ২০০১ সালের ১ অক্টোবর থেকে পরিকল্পিতভাবে ও সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দেশে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। এই পরিস্থিতির অংশ হিসেবে দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রক্রিয়া অবিরাম চলছে। এরই জের ধরে আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের ‘কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম’ এবং বাংলাদেশের ককাস গ্রুপের সভাপতি কংগ্রেসম্যান যোসেফ ক্রাউলী বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ওপর এক পাবলিক হিয়ারিং-এর ব্যবস্থা করেন। ৩০ এপ্রিল ২০০৪ নিউইয়র্কের সিটি ইউনিভার্সিটির স্কুল অব ল’ কুইন্স কলেজের (৬৫-২১ মেইন স্ট্রিট ফ্লাসিং, নিউইয়র্ক) অডিটরিয়ামে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের প্রতিনিধি এবং এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মুখপত্র একত্রে কমিশনের মুখোমুখি এই হিয়ারিং-এ উপস্থিত হয়। হিয়ারিং-এ কমিশনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশের কংগ্রেশনাল ককাসের সভাপতি কংগ্রেসম্যান যোসেফ ক্রাউলী, কমিশনের ভাইস চেয়ার ফেলিস ডি. গিয়ার, কমিশনের দুই কমিশনার প্রীতা বানসাল এবং পাতি চ্যাং। রাষ্ট্র ও জনপ্রতিনিধিবর্গের পক্ষে সাক্ষী ছিলেন যথাক্রমে প্রধান বিচারপতি (অব.) ও ২০০১ সালে জাতীয় নির্বাচন প্রাক্কালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান লতিফুর রহমান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিভাগের প্রফেসর ইউ.এ.বি রাজিয়া আক্তার বানু (উভয়ে রাষ্ট্র পক্ষের), এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের আন্তর্জাতিক সচিবালয়ের গবেষক আব্বাস ফয়েজ (নির্যাতিত জনগণের পক্ষে এ্যামনেস্টির প্রতিনিধি) এবং ঢাকাস্থ মানবাধিকার সংস্থা হটলাইন হিউম্যান রাইটস বাংলাদেশের কো-অর্ডিনেটর রোজলিন কস্তা ও প্রিপ ট্রাস্টের প্রধান নির্বাহী আরোমা দত্ত (বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সংখ্যালঘু নির্যাতিতদের পক্ষে সাক্ষী)।

গত ৩০ এপিল ২০০৪ স্থানীয় সময় বিকাল ৪ ঘটিকায় সাড়ে ৪শ’ দর্শক শ্রোতাদের সামনে মুক্তভাবে উপরোক্ত অডিটরিয়ামে বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও জনগণের পক্ষ নিয়ে কমিশন হিয়ারিং শুরু করেন। প্রথমে কমিশনের ভাইস চেয়ার ফেলিস ডি. গিয়ার প্রারম্ভিক বক্তব্য পেশ করেন। এরপর কংগ্রেসম্যান যোসেফ ক্রাউলিও বক্তব্য দেন। উভয়েই এই হিয়ারিং-এর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও গুরুত্ব সবার সামনে তুলে ধরেন এবং ফেলিস ডি. গিয়ার রাষ্ট্র ও জনপ্রতিনিধি সাক্ষীদের পরিচয় সবার সামনে তুলে ধরেন। অতঃপর সাক্ষীগণ পর্যায়ক্রমে তাদের লিখিত বক্তব্য সবার সামনে তুলে ধরেন।

ভাইস চেয়ার ফেলিস ডি. গিয়ার তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে এই কমিশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, সারা বিশ্বে ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি মনিটর করার লক্ষ্যে এবং কোথায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগণ ধর্মের কারণে বৈষম্যের শিকার হলে সে সব তথ্য স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও কংগ্রেসকে জানান কারণ আমেরিকার বৈদেশিক নীতির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মানবাধিকার রক্ষা। তিনি বলেন, কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করে। “কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম” স্টেট ডিপার্টমেন্ট কিংবা অন্য কোন নির্বাহীর শাখাও নয়। কমিশন মাত্র পর্যবেক্ষক ও পরামর্শক হিসেবে কাজ করে। নিজেদের কাজের অংশ হিসেবে কমিশন আগ্রহী সংশি-ষ্ট ব্যক্তি বা দল কিংবা সংস্থার সাথে আলাপ আলোচনা করে বিদেশের কোন ঘটনার তদন্ত, ঘটনা প্রকাশ এবং এ ধরনের হিয়ারিং অনুষ্ঠান করে। কমিশন গঠিত হয়েছিল ১৯৯৯ সালে এবং এর পর এ ধরনের হিয়ারিং হয়েছে ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্থানসহ অনেক দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর।

এরপর প্রতিনিধিবর্গ তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন। উক্ত অনুষ্ঠানে আমার উপস্থাপিত মৌখিক বক্তব্যটি ছিল নিম্নরূপ যা হুবহু বাংলায় অনুবাদ করা হল ঃ

যুক্তরাষ্ট্রের “কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম”-এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, সম্মানিত কংগ্রেসম্যান যোসেফ ক্রাউলী, উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়বৃন্দ, সবাইকে জানাই শুভ সন্ধ্যা। “কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম”-এর কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই এজন্য যে তাঁরা আমাকে এধরনের একটি অনুষ্ঠানে সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে আমার বক্তব্য তুলে ধরে এখানে উপস্থিত সুধীজনের সাথে আমার উদ্বেগ প্রকাশ করবার সুযোগ করে দিয়েছেন।

আমি ১৯৮৬ সাল থেকে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের জন্যই মানবাধিকারের কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু বিশেষভাবে যখনই কেউ নির্যাতনের শিকার হয়েছে তাদের জন্য কাজ করছি। যখনই হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা, বৌদ্ধ, আহমদিয়া বা আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরা নির্যাতিত হয়েছে, আক্রান্ত হয়েছে, তাদের জন্যও কাজ করেছি। পার্বত্য চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চলের আদিবাসীদের জন্যও কাজ করেছি। কিন্তু আমার এই সুদীর্ঘ কর্মজীবনে বাংলাদেশে মুসলিমদের দ্বারা খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা আক্রান্ত বা নির্যাতিত হয়েছে এমন কোন অতীত অভিজ্ঞতা আমার আগে ছিল না। আমরা সর্বদা শান্তিপূর্ণভাবে মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে শত শত বছর ধরে বাস করেছি।

একদা বাংলাদেশ ছিল সেক্যুলার, শান্তিপূর্ণ দেশ যা আজ ‘সন্ত্রাসীদের গুটিপোকা’, ‘লজ্জার দেশ’ এবং ‘সর্বোচ্চ দুর্নীতির দেশ’ হিসেবে কয়েক বছর ধরে সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে। বেশিদিন আগের কথা নয় যখন বাংলাদেশে নানা ধর্মের, নানা বিশ্বাসের ও নানা মতের লোকেরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতো। তারা নিজেদের জীবন, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে পরস্পরের সাথে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের পরিবেশে করতো।

কিন্তু আজ ২১ শতাব্দীতে পা দিয়ে, যখন সারা বিশ্ব উন্নয়ন ও শিক্ষার চেতনায় এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা বাংলাদেশের জনগণ তখন নিছক ধর্মের কারণে ঘৃণার শিকার হচ্ছি যদিও সবাই একইভাবে একাজটি করে না এবং মাত্র ক্ষুদ্র একটি দল বাংলাদেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর ধর্মের কারণে নির্যাতন ও বৈষম্য করে চলেছে। এভাবে তারা দেশের ও জনগণের মধ্যেকার শান্তি, সৌহার্দ্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে মানুষের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টির প্রয়াস চালাচ্ছে যা শত শত বছর ধরে এদেশের মানুষ লালন করেছে।

সরকারের সকল যন্ত্র দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের নিরাপত্তা, শান্তি, সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ, সম্প্রীতি এবং অধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হচ্ছে। খুব সংক্ষেপে আমি কয়েকটি

বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই যা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি এবং সংগ্রহ করে ডকুমেন্ট করেছি।

১৯৪১ সালে বাংলাদেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা ছিল মোট জনসংখ্যার ৩৩ শতাংশ, কিন্তু এখন এই সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ১৩ শতাংশে, যা আপনারা অন্যদের কাছ থেকেও শুনেছেন। এখানে স্বভাবতঃই একটি প্রশ্ন জাগে, 'কেন' সংখ্যালঘুদের জনসংখ্যার এই নিুগতি? এই পরিস্থিতি আমাদেরকে ভাবিয়ে তোলে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যা কেন এত দ্রুত কমছে? কয়েকটি ঘটনার উলে-খ করলেই বুঝতে পারা যাবে কেন বাংলাদেশে বিশেষভাবে হিন্দুদের সংখ্যা এত দ্রুত কমছে যারা ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে।

১৯৪৮, ১৯৫০, ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় এবং তখন অসংখ্য নির্যাতিত হিন্দু এদেশ ছেড়ে ভারতে চলে যায়।

১৯৯০ ও ১৯৯২ সালে ভারতের অযোধ্যায় বাবরী মসজিদকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর যে আ□মণ, নিপীড়ন, নির্যাতন চালানো হয়েছে তাতে অসংখ্য হিন্দু জীবনের নিরাপত্তার জন্য জন্মভূমি বাংলাদেশ ত্যাগ করে চিরতরে ভারতে চলে যায়।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ করে বাংলাদেশ সৃষ্টির পর আমরা একটি অসাম্প্রদায়িক সেক্যুলার রাষ্ট্র পেয়েছিলাম যার যেখানে সাংবিধানিকভাবেই ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি ছিল। কিন্তু অচিরেই সেটি তুলে দেওয়া হয়েছিল যা আমার পূর্ববর্তী সম্মানিত বক্তাগণ ইতিমধ্যেই বলেছেন। প্রথম সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদ ছিল মূল স্তম্ভগুলোর মধ্যে প্রধানতম।

১৯৭৮ সালে সেক্যুলারিজম বা ধর্মীয় স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদ সংবিধান থেকে ১২ ধারা বিলুপ্তি ঘটিয়ে এবং সংবিধানে "বিসমিল-াহের রাহমানির রাহিম" সংযোজনের মাধ্যমে ইসলামিক মূল্যবোধ সংযোজন করা হয়েছিল। এর মাধ্যমেই সংবিধানে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করা হয়েছিল এবং তখন থেকেই এদেশকে ইসলামিকরণ করা শুরু হয়েছিল।{The Second Proclamation (Fifth Amendment) Order, 1978 (Second Proclamation Order No. 1V of 1978) এর second Schedule বলে "১২। ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা।" অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত। এই প্রি□য়ার মাধ্যমে সেক্যুলারিজমকে হত্যা করে ইসলামী মৌলবাদের মূল্যবোধকে প্রতিস্থাপিত করা হল। একাজটি তৎকালীন সরকার প্রধান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান করেছিলেন যিনি ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের জনক মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার পর ক্ষমতায় আরোহন করেছিলেন।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান **১৯৮১** সালে রক্তপাতহীন ক্যুর মাধ্যমে হত্যার পর জেনারেল এইচ এম এরশাদ ক্ষমতার হাল ধরেন। তিনি তার পূর্বসূরী থেকে আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে 'ইসলাম ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে' ইসলামকে 'রাষ্ট্র ধর্ম' ঘোষণা দিলেন **১৯৮৮** সালে। এদেশের সাধারণ সহজ সরল গ্রাম্য দরিদ্র, অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও ধর্মভীরু লোকদের ধর্মের নামে ব্যবহার করে সস্তা ভোট পাবার লক্ষ্যে এরশাদ এই কাজটি করে দেশের অন্যান্য ধর্মের লোকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করলেন। এটা অবশ্য সম্পূর্ণই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। যদিও সংবিধানে ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মের লোকদের সম অধিকার প্রয়োগ, সুযোগ-সুবিধা ভোগ ও মর্যাদার পাবার সুযোগ রয়েছে কিন্তু তা শুধু কাগজেই থেকে গেল। তার প্রধান লক্ষ্য ছিল স্পর্শকাতর বিষয় ইসলাম ধর্মকে ব্যবহার করে সংখ্যাগুরু মুসলমানদের ভোট পেয়ে ক্ষমতায় থাকা।

সংবিধানের এই পরিবর্তনের পর স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এর খুব বেশী অপব্যাখ্যা দেয়। এবং প্রচার করে যে বাংলাদেশ হচ্ছে একটি ইসলামী দেশ বা শুধু মুসলমানদের দেশ।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ কখনো 'ইসলামিক দেশ' ছিল না। কিন্তু এদেশের রাজনীতিবিদরা ধর্মের নামে নিজেদের ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখতে বাংলাদেশের সাধারণ সহজ-সরল লোকদের কিনে নেয়। তাই অনেক সময় সাধারণ লোকেরাও বলে এদেশ মুসলমানের দেশ, ইসলামিক রাষ্ট্র।

সবচেয়ে খারাপ সময় শুরু হয় **১৯৯০**-এর দশকে যখন ভারতের অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভাঙার মত দুর্ভাগ্যজনক কয়েকটি ঘটনা ঘটে। এসময়ে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নানা ধরনের অমানবিক অত্যাচার শুরু করা হল, তাদের ঘরবাড়ি, মন্দির আ□মণ করে লুটপাট ও ভাংচুর করা হল যার পুনরাবৃত্তি ঘটল **১৯৯২** সালেও। আরেকটি ঘটনায় **১৯৯২** সালের **১০** এপ্রিল খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার লোগাং-এ মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে প্রায় **১২০০** মানুষকে হত্যা করা হল। তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে ভস্মিভূত করা হল।

বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও সিলেটে উন্নয়নের নামে স্থানীয় সংখ্যাগুরু জনগণ, প্রশাসন ও বনরক্ষা কর্মীরা গারো ও খাসিয়াদের নির্যাতন করে নিজ আবাসভূমি থেকে উচ্ছেদ করে তাদের জমাজমি জবরদখল করে নিল। ময়মনসিংহের গারোরাও 'অর্পিত সম্পত্তির' শিকার হয়ে অনেকে তাদের সম্পত্তি হারিয়েছে। গারো হত্যা, জোরপূর্বক গারোদের জমি দখল, অপহরণ এবং জোরপূর্বক বিয়ের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণ, গারো ও খাসিয়াদের বিরুদ্ধে অসংখ্য মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানী করা ইত্যাদি বিশেষভাবে উলে-খযোগ্য। এসবই প্রমাণ করে যে সরকারের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে সরকারী মদদে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন একটি এজেণ্ডা বাস্তবায়ন করতেই এসব ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। বনকর্মী ও পুলিশ দিয়ে বেশ কিছু আদিবাসীদের খুন করানো হয়েছে যার কোন সুরাহা হয়নি।

জমি জবরদখল করতে গিয়ে শুধুমাত্র বিগত ছয় বছরে আটজন আদিবাসীকে খুন করা হয়েছে। এদের কয়েকজন নিজেদের জমির অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে অবৈধ দখলদারদের হাতে খুন হতে হয়েছে। বাংলাদেশে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকদের ওপর নির্যাতন আগে ছিল না। তবে **১৯৯৫** সালে যখন সালমান রুশদির "সাটানিক ভার্সেস" প্রকাশিত হল তখন দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে খ্রিস্টান গ্রাম ও পরিবারে আ□মণ, অগ্নি-সংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে।

১৯৯৮ সালে ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে অবস্থিত শতবর্ষ পুরনো সেন্ট ফ্রান্সিস স্কুলে আ□মণ করে ইসলামী মৌলবাদীরা লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুর করে অপূরণীয় ক্ষতি করে। দৈব□মে অন্যত্র স্থানান্তরের ফলে সেখানে অবস্থানরত ছাত্রীরা রক্ষা পেয়েছিল কিন্তু সিস্টারগণকে (নানদের) নানা ধরনের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সরকারের পক্ষ হতে এবিষয়ে কোন সাহায্য সহযোগিতা করা হয়নি।

২০০১ সালের জুনে গোপালগঞ্জের বানিয়ারচর মিশনে রবিবার দিন প্রার্থনা চলাকালে বোমা দিয়ে **১১** জনকে হত্যা ও **২৫** জনকে আহত করা হয়েছিল। এসব ব্যাপারে সরকারের পক্ষ হতে ক্ষতিপূরণ বা অন্য কিছুই করা হয়নি। এমনকি নিরপেক্ষ কোন তদন্ত কমিশন গঠন করে এই ঘটনার তদন্তও করা হয়নি বা কোন সন্ত্রাসীকেও গ্রেফতার করা হয়নি।

ইসলামিক দু'টি মৌলবাদী রাজনৈতিক দল জামায়াত-ই-ইসলামী এবং ইসলামী ঐক্যজোটকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি **২০০১** সালের অক্টোবরে যখন জোট করে ক্ষমতায় এলো তখন থেকে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণ দারুণ সংকটের মুখোমুখি হতে শুরু করল। আমি নিজে বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত ভোলা দ্বীপে নির্যাতিত সংখ্যালঘু হিন্দুদের দেখতে গিয়েছি **২০০২** সালের জানুয়ারিতে। সেখানকার মহিলা,

পুরুষদের সাথে কথা বলেছি। যেসব মহিলাদের সাথে সাক্ষাৎ করে কথা বলেছি তাদের প্রায় ৯৮ শতাংশ মহিলাই নির্বাচনের দিন ও পরে ধর্ষিত বা গণধর্ষিত হয়েছে। জীবনের ভয়ে এবং আবারো হয়রানির ভয়ে এরা খুব সহজে কারো কাছে মুখ খুলতে চায় না।

আমি নিজে আট বছরের একটি শিশুসহ তিনটি শিশু কন্যাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি। এরা সবাই ধর্ষিত হয়েছে। আট বছরের শিশুটি ছয় যুবক দ্বারা ধর্ষিত হয়েছিল। সে নিজে বুঝতেও পারেনি তার জীবনে কি ঘটেছে। এধরনের ঘটনা এখনো অহরহ ঘটছে। আবার কিছু এলাকায় এমনও দেখা গেছে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মী সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু হিন্দু ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা যেখানে বসবাস করে সেখানে গিয়ে দাবি করেছে "হয়তো টাকা দাও নয়তো তোমার মেয়েকে দাও"। এধরনের ঘটনা দেশের প্রায় সর্বত্র যেখানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বাস করে সেখানে এখনো ঘটছে। কিন্তু পুলিশ প্রশাসন বা সরকারের কোন বিভাগে এসব ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেয় না। সংখ্যালঘু হিন্দু, খ্রিস্টান এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের অনেকে নানা ধরনের হুমকি, হয়রানির শিকার এখনো হচ্ছে, জান-মালের নিরাপত্তা পাচ্ছে না, নিজেদের বৌ-ঝিদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে, মিথ্যা মামলার শিকার হচ্ছে। উচ্ছেদের ভয়ে এরা কাউকে কিছু জানাতে চায় না।

যদিও প্রতিদিনের খবরের কাগজে আমরা যৌতুকের জন্য খুন, ধর্ষণ ও আরো অনেক মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার বিষয় জানতে পারি— তবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারীদের প্রতি যে অমানবিক ঘটনাগুলো ঘটছে তার সাথে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘটিত ঘটনার পার্থক্য হচ্ছেঃ সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হলে তাদের বলা হয় 'এদেশ থেকে চলে যাও'।

বাংলাদেশে অবস্থিত আহমদিয়া সম্প্রদায়ের একটি ক্ষুদ্র দল এদেশে বাস করে। তারাও একটি বিশেষ গোষ্ঠী ও সরকারের কিছু লোক দিয়ে হয়রানী, নির্যাতন ইত্যাদির শিকার হচ্ছে। কিন্তু স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কোন রাজনৈতিক দলকে কে এতবড় ক্ষমতা দিল দেখার জন্য যে কে কোন ধর্ম কিভাবে পালন করছে? তাদের কে ক্ষমতা দিল অন্যের ধর্মে হস্তক্ষেপ করে তাদের নিজ ধর্ম পালনে বাধা দিতে? কার কাছ থেকে একটি রাজনৈতিক দল এমন ক্ষমতা পেতে পারে অন্যের ধর্মগ্রন্থ বা প্রচার-প্রচারণা বন্ধ করে দিতে আর সরকারও কেন তাদের দাবি অনুযায়ী কাজ করবে? একটি গণতান্ত্রিক সরকারের এধরনের কাজ করা উচিৎ নয়। তবু বাংলাদেশের বর্তমান সরকার তা-ই করে চলেছে।

বাংলাদেশে যে সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়, তাদের সম অধিকার দেওয়া হয় না এবং তাদের প্রতি নানা ধরনের নির্যাতন চালানো হয় তার প্রমাণ স্বরূপ বলা হয়, সরকারের উচ্চ পর্যায়ে, নীতি নির্ধারক মহলে, পাবলিক সার্ভিস কমিশনে বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রের মত কোন স্থানে কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোককে পাওয়া যাবে না। যোগ্যতা, দক্ষতা ও উপযুক্ত শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও এসব স্থানে তাদের চাকরীতে নেওয়া হয় না। লিখিত পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেলেও মৌখিক পরীক্ষার সময় কৌশলে তাদের বাদ দেওয়া হয়। সংখ্যালঘু নির্যাতন ও বৈষম্যের ভেতর এটিও একটি যে এদেশের সংখ্যালঘুদের চাকরীর ক্ষেত্রেও প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে স্থান দেওয়া হবে না।

অসহিষ্ণুতা, ধর্ষণ, দুর্নীতি, অবৈধ জবরদখল, সংখ্যালঘু উচ্ছেদ, সাম্প্রদায়িকতা, ইত্যাদি বাংলাদেশকে ছেয়ে ফেলেছে, সরকার নির্বিকার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব ঘটনার পর দেখা যায় সন্ত্রাসীরা সরকারী ছত্রছায়ায় এসব করে। তাই এধরনের অবৈধ কাজ থেমে থাকে না। গ্রাম্য সহজ সরল অশিক্ষিত লোকেরা স্থানীয় রাজনীতিবিদ ও ধর্মীয় নেতাদের প্রভাবে অনেক সময় এসব কাজে অংশীদার হয়, বিভ্রান্তও হয় আবার প্রভাবিতও হয়।

প্রশাসন, বিচার বিভাগ, ও পাবলিক সার্ভিস কমিশন ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে। এসব

স্থান দলীয়করণ করে কলুষিত করা হয়েছে যার ফলে সত্য প্রকাশ হয় না। সাংবাদিক, লেখক, সুশীল সমাজের নাগরিকবৃন্দ, মানবাধিকার রক্ষায় নিবেদিত কর্মীগণ, যারা কণ্ঠহীনদের কণ্ঠ, তার সরকারের রোষানলে পড়ে দারুন সমস্যায় আছে। তাদের ওপর চাপ আছে যেন সত্য প্রকাশ না করে। সাংবাদিক মানিক সাহা, লেখক শাহরিয়ার কবির, শিক্ষক ও লেখক মুনতাসীর মামুন, সাংবাদিক সালিম সামাদ, প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ মানুষের জন্য, নির্যাতিতের জন্য কথা বলতে গিয়ে সরকারের হাতে আটক হয়েছেন, অকথ্য নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এবং দিনের পর দিন জেলের ভিতর কাটিয়েছেন কিংবা নিহত হয়েছেন। তাঁরা মানুষের প্রতি জোট সরকারের অমানবিক আচরণের ঘটনার তদন্ত করে রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন, নির্যাতিত লোকদের হয়ে সরকারের এহেন অপকর্মের নিন্দা জানিয়েছেন। যুক্তরাজ্যের টিভি চ্যানেল-৪ এর দুই সাংবাদিককেও বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচারের ঘটনা তদন্ত করার অপরাধে কারাবরণ করতে হয়েছে।

যারা এদেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর এ ধরনের মানবতাবিরোধী নির্যাতন চালিয়েছে বা এখনো চালাচ্ছে তাদের সংখ্যা এখনো খুবই নগণ্য এবং এসব অমানবিক কর্মকাণ্ড অস্বীকার না করে বরং সরকার আন্তরিক হলে এখনো তাদের দমন করতে পারে। বাংলাদেশ সরকার যদি সত্যিকার অর্থে দেশের মঙ্গল চায় তাহলে তাদের সুশীল সমাজের লোকদের সাথে, বে-সরকারী সংস্থাগুলোর সাথে, পেশাজীবী, দাতা দেশ ও দাতা সংস্থার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে একযোগে সার্বিক উন্নয়নে কাজ করতে হবে।

জোট সরকারের বর্তমান পরিস্থিতি ও তাদের দুর্বলতার সুযোগে বাংলাদেশে ইসলামী মৌলবাদী চ[illegible] সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছে। আমরা শান্তিপ্রিয় এবং শান্তিতে সবার সাথে মিলে মিশে বাস করতে চাই এদেশে। আমরা এদেশেরই নাগরিক, এদেশেরই জনগণ। এদেশে আমরা আর নির্যাতন, বৈষম্য ও অমর্যাদা পেতে চাই না শুধু মাত্র আমাদের ধর্মের কারণে। আমরা এদেশে বাঁচতে চাই আরো ১০ জন মুসলমানের মত সব অধিকার, মর্যাদা এবং মানবাধিকার নিয়ে এবং এদেশেরই একজন যোগ্য নাগরিক হিসেবে।

আমার মনে হয় আমি আপনাদের এধরনের আরো অসংখ্য ঘটনা শোনাতে পারবো কিন্তু সময়ের স্বল্পতা হেতু আমাকে এখানেই শেষ করতে হচ্ছে।

আমরা মনে করি আমরা যেখানে জন্মেছি সেখানেই মরবো, আমাদের মাতৃভূমিতেই শান্তি তে থাকবো অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে এবং আমাদের সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের যে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে তা ভোগ করবো।

আমি আশা করি, "কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম"-এর সহযোগিতায় যে শান্তিপূর্ণভাবে আমরা আগে বাস করেছি, সেভাবে আবারো শান্তিতে সবার সাথে মিলে বাংলাদেশেই বসবাস করতে পারবো।

সকলকে ধন্যবাদ

রোজলিন কস্তা

মানবাধিকার সমন্বয়কারী, হটলাইন হিউম্যান রাইটস বাংলাদেশ

সংখ্যালঘু নির্যাতন
নির্বাচিত আলোকচিত্র

জুলাই ২০০১-আগস্ট ২০০৫



২০ জুলাই ২০০১ আগুন দিয়ে বাঁশখালীর খোকন দাশের বাড়ি-ঘর পৈশাচিক ভাবে জ্বালিয়ে দেবার পর দগ্ধ হয়ে থাকা একটি লাশ



খোকন দাশের জ্বালিয়ে দেয়া বাড়িতে পুড়ে অঙ্গার হয়ে থাকা তাঁর সন্তানের লাশ



২০০১ সালের ২০ জুলাই বাঁশখালীর খোকন দাশ তাঁর জীবন্ত পুড়িয়ে মারা স্ত্রী ও সন্তানের ছবি হাতে দাঁড়িয়ে



সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের শিকার বাঁশখালীর খোকন দাশের আগুনে পোড়া একটি ঘরের অংশ বিশেষ



২০০১ সালের ২০ জুলাই রাতে বাঁশখালীর পালে গ্রামের দত্তপাড়ায় সাম্প্রদায়িক হামলাকারীরা খোকন দাশের বাড়িতে আগুন দিয়ে তার স্ত্রী আলোরানী দাশসহ এক মেয়ে ও দুই ছেলেকে পুড়িয়ে হত্যা করে ছবিতে নিহতদের শেষকৃত্যানুষ্ঠানের দৃশ্য



২০০১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ কেন্দ্র আয়োজিত 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অভিযাত্রা' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে শহীদজায়া শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী, সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, বিচারপতি কে এম সোবহান, অধ্যাপিকা পান্না কায়সার প্রমুখ



জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগের দিন ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০১-এ সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের লাগিয়ে দেয়া আগুনে ভস্মীভূত চট্টগ্রামের রাউজান থানার কোয়েপাড়া গ্রামের সুবোধ দাশের বাড়ি



২০০১-এ অক্টোবর নির্বাচনের দুইদিন আগে চট্টগ্রামের রাউজানের কোচাপাড়ায় সাম্প্রদায়িক পৈশাচিকতার শিকার সুবোধ দাসের বসত বাড়ি। যুদ্ধাপরাধী সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ক্যাডাররা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে এভাবেই সবকিছু ধ্বংস করে দেয়



৩০ সেপ্টেম্বর ২০০১-এ সাম্প্রদায়িক জোট সন্ত্রাসীরা চট্টগ্রামের মীরেরসরাই থানার নাহেরপুর গ্রামের মহেন্দ্র দফাদারের কালীবাড়িতে হামলা চালিয়ে কালীবিগ্রহ ভেঙে গুড়িয়ে দেয়



রামশীলে আশ্রয় নেয়া ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার অন্নদাপ্রসাদ গ্রামের পঙ্গু শেফালী রানী দাশ (বামে) এবং মধুরানী দাশ (ডানে)। ২০০১-এর ২ অক্টোবর শেফালী রানী দাশ গণধর্ষণের শিকার হয় এবং ৪ অক্টোবর চরম নির্যাতনের মুখে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসে মধুরানী দাশ



২০০১ সালের ৫ অক্টোবর সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসার শিকার চট্টগ্রামের মীরেরসরাই-এর নাহেরপুর গ্রামের দীনদয়াল আশ্রম। বিএনপি-জামাত জোটের ক্যাডাররা আগুন দিয়ে আশ্রমটি ভস্মিভূত করে দেয়



২০০১ সালের ৫ অক্টোবর ফেনীতে সাম্প্রদায়িক ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হওয়া একটি বাড়ি



কালিয়ার কার্ণিকদিয়া গ্রামের বৃদ্ধ নারায়ণ দাস ও তার স্ত্রী ২০০১ সালের ৯ অক্টোবর বিএনপি-জামাত জোটের লোকেরা হামলা চালিয়ে এদের দু'জনকেই মারপিট করে বাড়ির সমস্ত জিনিষ-পত্র লুট করে নেয়



২০০১ সালের ১৯ অক্টোবরে সিরাজগঞ্জের উল াপাড়ায় নির্যাতিত পূর্ণিমার মা বাসনা রাণী শীল নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় নেত্রী দৌলত আরা মান্নানকে তার উপর বিএনপি ক্যাডারদের শারীরিক নির্যাতনের চিহ্ন দেখান



অব্যক্ত যন্ত্রণায় সিরাজগঞ্জের উল াপাড়ার পূর্বদলুয়া গ্রামের স্কুলছাত্রী পূর্ণিমা শীল্ব ২০০১ সালের ৮ অক্টোবর বিএনপির ক্যাডাররা মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পালাক্রমে তার উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়



২০০১ সালের ৮ অক্টোবর সিরাজগঞ্জের উল াপাড়ায় সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার পূর্ণিমা শীলের সঙ্গে তার বাবা, মা ও মেজো বোন



৮ অক্টোবর ২০০১ সিরাজগঞ্জের উল াপাড়ার নির্যাতিত পূর্ণিমা শীলের বাবা অনিল শীল্ব বিএনপি ক্যাডাররা পৈশাচিক হামলা চালিয়ে তাঁকেও মারাত্মক ভাবে আহত করে্ব শেষ পর্যন্ত নির্যাতনের ধকল সইতে না পেরে গত সেপ্টেম্বর (২০০৫) মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন



নির্বাচনোত্তর সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের প্রতিবাদে পূর্ণিমা শীলকে সঙ্গে নিয়ে ২০০১ সালের ২০ অক্টোবর একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে (বাম থেকে) নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল, স্থপতি রবিউল হুসেইন, শহীদজায়া শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী, পূর্ণিমা শীল, লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, পূর্ণিমা শীলের মা বাসনা শীল ও ভাস্কর ফেরদৌসী



২০০১ সালের ২০ অক্টোবর সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার সিরাজগঞ্জের পূর্ণিমা শীলের হাতে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির পক্ষ থেকে ১০ হাজার টাকার চেক তুলে দেন সংগঠনের সহ সভাপতি শহীদজায়া শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী



২০০১ সালের ১০ অক্টোবর চট্রগ্রামের রাউজানে বিএনপি-জামাত জোট ক্যাডারদের হামলার শিকার সংখ্যালঘুদের বাড়ি-ঘর হামলাকারীরা লুটপাট চালিয়ে আগুন দিয়ে এসব বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেয়



১৬ অক্টোবর ২০০১-এ রামশীলের আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান নেয়া সংখ্যালঘু নারী-পুরুষের একাংশ



অক্টোবর নির্বাচনোত্তর সাম্প্রদায়িক দমনমূলক পরিস্থিতি মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য ২০০১-এর ৯ অক্টোবর একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির গোলটেবিল বৈঠকে (বাম থেকে) সাংবাদিক ওয়াহিদুল হক, লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, অধ্যাপিকা সানজিদা খাতুন ও অধ্যাপিকা আনোয়ারা সৈয়দ হক



১৪ অক্টোবর ২০০১ মধ্য পিরোজপুরের নাজিরপুর থানার মধ্য বানিয়ারি গ্রামের সবকটি মন্দিরের প্রতিমা মৌলবাদী জোট সন্ত্রাসীরা ভেঙে গুড়িয়ে দেয় ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি মন্দির



১১ অক্টোবর ২০০১ পিরোজপুরের নাজিরপুর থানার মধ্য বানিয়ারি গ্রামের মধ্যবয়সী ডাক্তার দেবলাল ডাকুয়ার উপর বিএনপি-জামাত জোট সন্ত্রাসীরা পাশবিক নির্যাতন চালায় ডাক্তার দেবলাল ডাকুয়াকে মুসলমানী করতে সন্ত্রাসীরা বে ড নিয়ে তেড়ে আসে



১৪ অক্টোবর ২০০১ পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলার মধ্য বানিয়ারি গ্রামের বিএনপি-জামাত জোট সন্ত্রাসীদের বর্বর নির্যাতনের শিকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কয়েকজন



১৬ অক্টোবর ২০০১ মহিলা মেম্বার রত্না ঘোষের তিল তিল করে গড়ে তোলা সংসারের কোনকিছু আর অবশিষ্ট নেই সাম্প্রদায়িক জোট সন্ত্রাসীরা ১৬ অক্টোবর রাতে এভাবে সবকিছুই ধ্বংস করেছে



২০০১ সালের ১৬ অক্টোবর রাতে পৈশাচিক জিঘাংসায় চট্টগ্রামের রাউজানের পশ্চিম গুজরায় জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাড়খার করে দেয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলা মেম্বার রত্না ঘোষের সহায়-সম্পদ '৭১-এর যুদ্ধাপরাধী ও বিএনপি নেতা সাকা চৌধুরীর ক্যাডাররা এই পৈশাচিকতা চালায়



১৬ অক্টোবর ২০০১ সাম্প্রদায়িক জোট সন্ত্রাসীদের জ্বালিয়ে দেয়া আগুনে ভস্মীভূত চট্টগ্রামের রাউজান থানার পশ্চিম গুজরা গ্রামের মহিলা ইউপি সদস্য রত্না ঘোষের বাড়ি



বগুড়ার কাহালু উপজেলার দুর্গাপুর গ্রামে ভেঙ্গে ফেলা একটি দুর্গা প্রতিমা ২০০১ সালের ১৭ অক্টোবর সাম্প্রদায়িক আক্রোশে বিএনপির ক্যাডররা এই প্রতিমা ভেঙ্গে ফেলে



অক্টোবর ২০০১ নির্বাচনের পর বিএনপি-জামাত জোট সন্ত্রাসীদের সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রামশীলে আশ্রয় কেন্দ্রে এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলতে থাকেন, আব্রু ইজ্জত রক্ত সবই দিলাম, তারপরও ওরা বলে এ দেশ আমাদের নয়



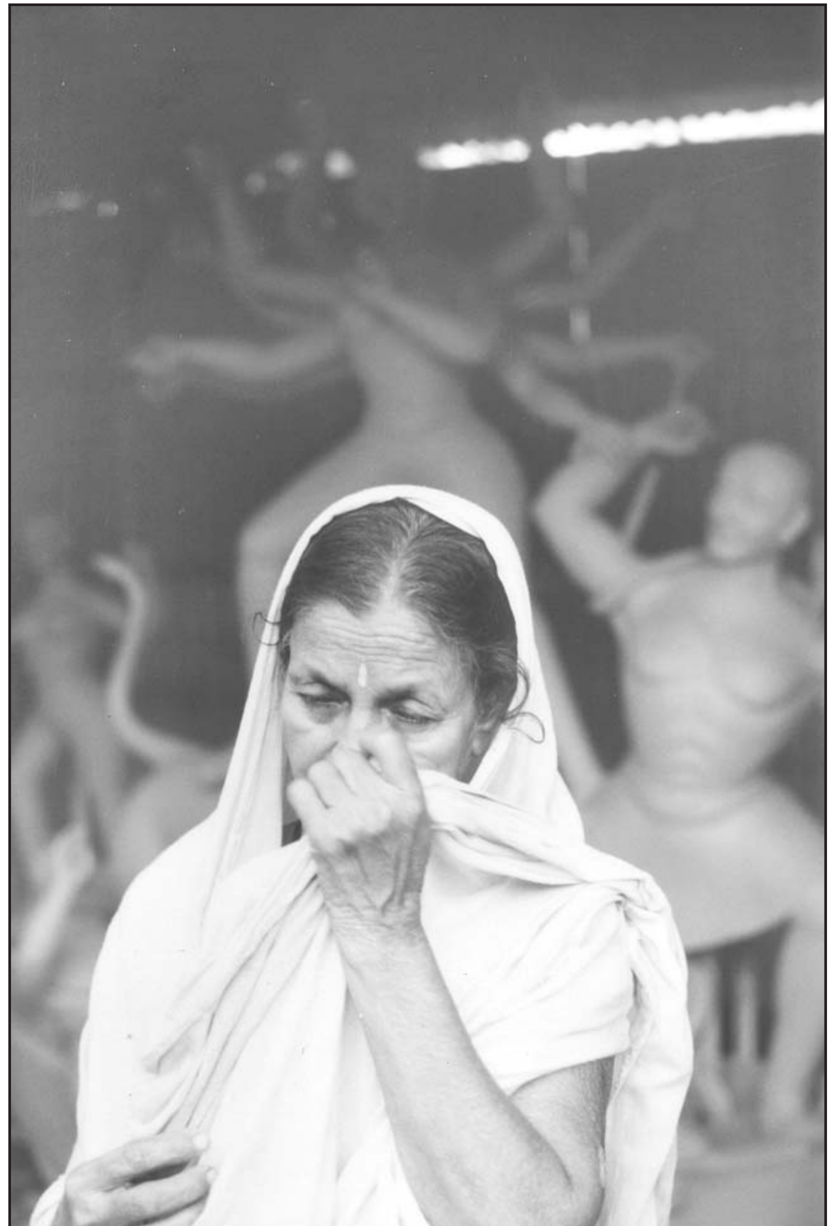
২০০১ সালের ১৯ অক্টোবর সিরাজগঞ্জের ঘোষপাড়ায় সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার কয়েকজন সংখ্যালঘু নারী-পুরুষ



১৯ অক্টোবর ২০০১-এ সিরাজগঞ্জের উল াপাড়ারঘোষপাড়ায় সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার সংখ্যালঘুদের ভিডিও সাক্ষ্য ধারণ করেন লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির



২০০১ সালের ১৯ অক্টোবর চট্রগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার রানারখিলপাড়া গ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার ভৌমিক বাড়ির দুর্গামূর্তি



২০০১ সালের ১৯ অক্টোবর সিরাজগঞ্জের উল াপাড়ারঘোষপাড়ায় মন্দিরে হামলা চালিয়ে প্রতিমা ভাঙচুর এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন চালানোর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন বিভা রানী



২০০১ সালের ১৯ অক্টোবর সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের শিকার চট্রগ্রামের আনোয়ারা থানার খিলপাড়া গ্রামের ডাঃ ব্রজেন্দ্র ভৌমিকের পূজামণ্ডপ   হামলাকারীরা মণ্ডপের প্রতিমা ভেঙ্গে-চুড়ে গুড়িয়ে দেয়



ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে ২০০১ সালের ২৩ অক্টোবর মাস্টারদা সূর্য সেনের সহযোদ্ধা বিপ বী বিনোদ বিহারী চৌধুরীর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সকাল-সন্ধ্যা অনশন কর্মসূচি



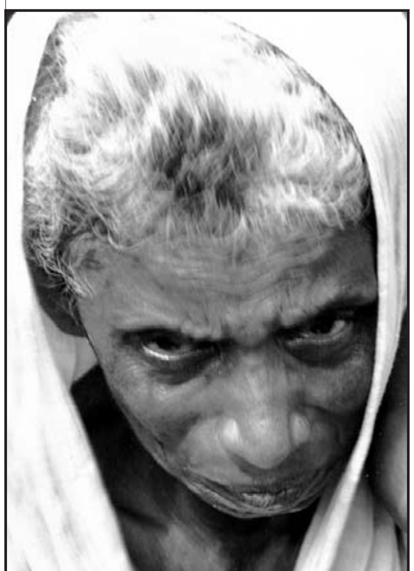
২০০১-এর নির্বাচনের আগে পরে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন নিপীড়ন বন্ধসহ দোষীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে ২৩ অক্টোবর ২০০১-এ চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের মানববন্ধনের একাংশ



১ অক্টোবর নির্বাচনের জোট সন্ত্রাসীদের নির্যাতনের শিকার একটি সংখ্যালঘু পরিবার জান মালের নিরাপত্তার আশায় বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে



২০০১ অক্টোবর নির্বাচন পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের মুখে কালিয়ার ঘোষপাড়ায় পুরুষশূন্য এক বাড়িতে আতঙ্কিত দুই বৃদ্ধা

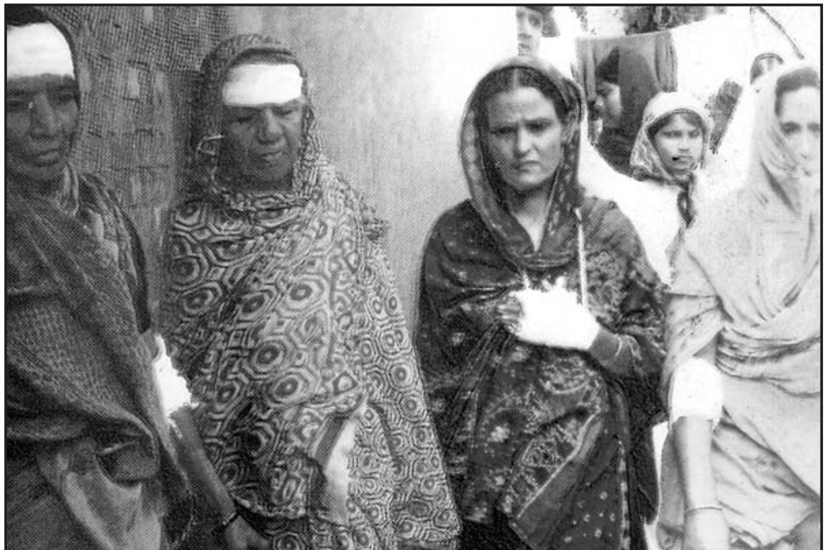




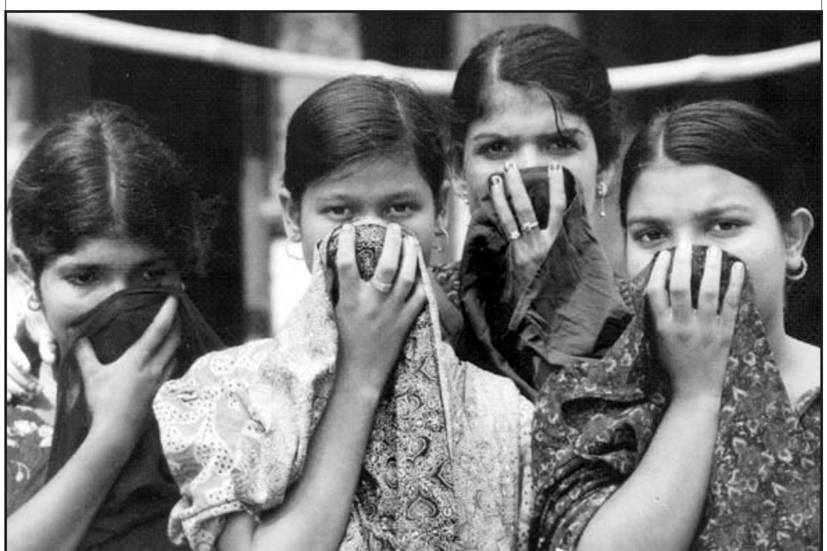
বিএনপি-জামাত জোট ক্যাডারদের পৈশাচিক নির্যাতনের শিকার দুই নারী ২০০১ সালের অক্টোবর নির্বাচনের পর নির্যাতিতরা আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় রামশীলের আশ্রয় কেন্দ্রে



২০০১ সালের অক্টোবরে বিএনপি-জামাত জোটের সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার গাংনীর মেহেরপুরে যিশুখ্রীস্টের প্রতিকৃতি



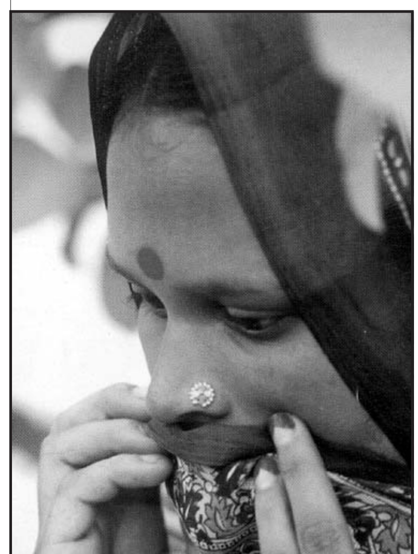
রামশীলের আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নেয়া সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার চট্টগ্রামের চন্দনাইশ গ্রামের কয়েকজন নারী। অক্টোবর নির্বাচনের পর বিএনপির ক্যাডাররা এদের বাড়ি-ঘরে হামলা চালিয়ে সর্বস্ব লুটে নেয় এবং এই নারীদের বেদম মারপিট করে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেয়

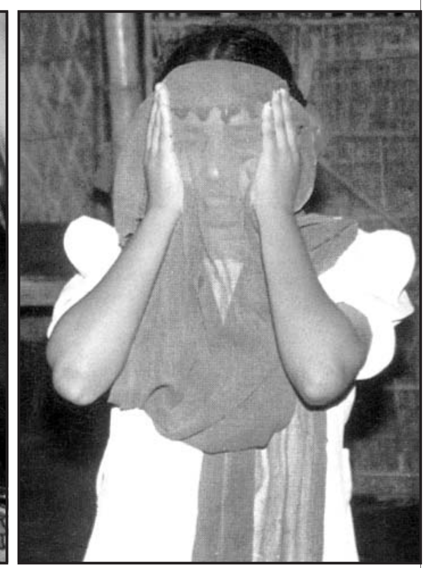


কোটালীপাড়ায় আশ্রয় নেয়া গৌরনদী-আগৈলঝাড়ার স্কুল পড়ুয়া ৪ বালিকা। ২০০১ সালের ১ অক্টোবর রাতে বিএনপি-জামাত জোটের ক্যাডাররা এদের গ্রামে হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে মেতে উঠে ব্যাপক লুটপাট, ধ্বংসযজ্ঞ ও নারী ধর্ষণে। এই ৪ বালিকাও এসময় ধর্ষিত হয়



২০০১-এর অক্টোবর নির্বাচনের পর খুলনার কালিয়ায় বিএনপি-জামাত জোট সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার ভীত-সন্ত্রস্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের কয়েকজন





২০০১ সালের অক্টোবর নির্বাচনের পর দিন গণধর্ষণের শিকার গৌরনদীর চাঁদনী গ্রামের পাঁচ মাসের অন্তঃসত্তা সাবিত্রী দাস (বামে) এবং গফরগাঁওয়ের শিশু জোৎস্না (ডানে)



২০০১ সালের অক্টোবর নির্বাচনের পর কোটালীপাড়ার রামশীলে আশ্রয় নেয়া সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার আরো ৪ নারী



১ অক্টোবর ২০০১ নির্বাচনের পর জোট সন্ত্রাসীরা ধার্যকৃত চাঁদা না পেয়ে হত দরিদ্র রিকশাচালক ক্ষুদিরামের প্রাণ কেড়ে নেয় নিহত ক্ষুদিরামের মায়ের আহাজারি



অক্টোবর নির্বাচনের পর সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের মুখে কোটালীপাড়ার রামশীলে পৈত্রিক প্রাণ হাতে করে আশ্রয় নেয়া দুই নারী বিএনপি-জামাত জোট ক্যাডারদের লুটপাটের ফলে সর্বস্ব হারিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন তারা

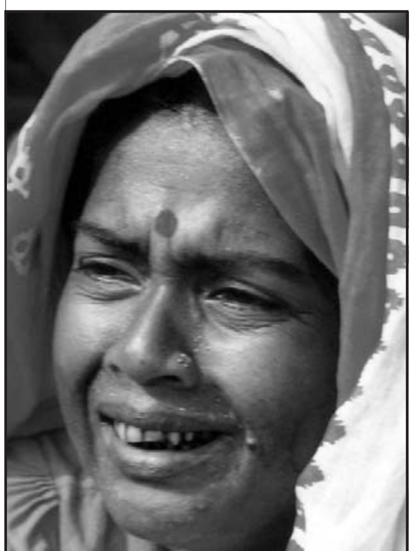




২০০১ অক্টোবর নির্বাচনের পর জোট সন্ত্রাসীদের পৈশাচিক হামলা-নির্যাতনের বর্ণনা দিচ্ছেন নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় দুই মহিলা



সাম্প্রদায়িক জোট সন্ত্রাসীদের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত নির্যাতিত ভীত শঙ্কিত সংখ্যালঘু নারীরা একটি প্রতিবাদ সভায় অজানা আতঙ্কে





অক্টোবর নির্বাচনের পর কোটালীপাড়ার রামশীলে আশ্রয় নেয়া সর্বস্বহারা আগৈলঝাড়ার এক নারী (বামে) এবং বিএনপি ক্যাডারদের কবলে ধর্ষিত ও ভিটেমাটি থেকে বিতাড়িত বরিশালের সংখ্যালঘু নারী (ডানে)



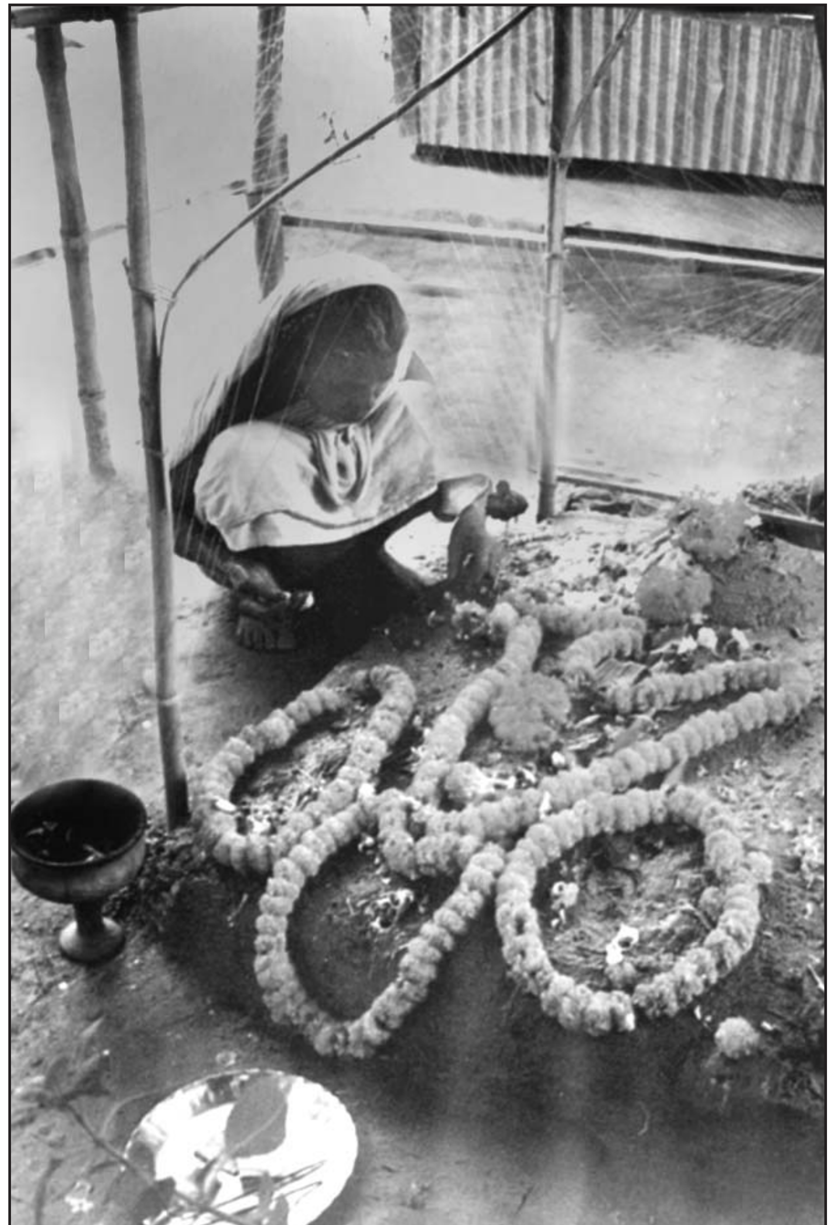
অক্টোবর নির্বাচনের পর মীরেরসরাই-এ জোট সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবের শিকার ঝোটন দাস্ব তাঁর মাথায় লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মারা হয়েছে



অক্টোবর ২০০১-এর নির্বাচনের পর সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন নিপীড়নের প্রতিবাদে প্রকৌশল বিশ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা মুখে কালো কাপড় বেঁধে মিছিল করে



কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের গাংনী গ্রামের খ্রিস্টান বাড়িতে জোট সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার এক খ্রিস্টান মহিলা   সন্ত্রাসীরা বাড়িঘর তছনছ করে যাবার সময় যিশু খ্রিস্টের ছবিটিকে কেটে চিঁড়ে দিয়ে যায়

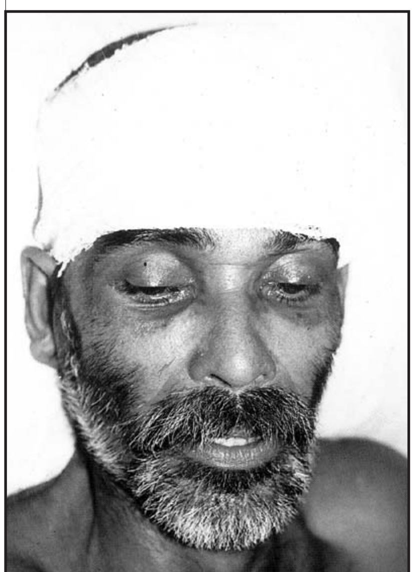


এখানেই হত্যা করে জোট সন্ত্রাসীরা তাঁর সন্তানকে   নিহত সন্তানের রক্তের ওপর পরম মমতায় নিজের কষ্টটাকে লাঘব করতে ফুল দিয়ে ঢেকে দিচ্ছেন একজন সন্তানহারা মা   অক্টোবর ২০০১ নির্বাচনের পর এমনিভাবে হাজারো মায়ের বুক খালি করে মৌলবাদী জোট সন্ত্রাসীরা





সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার ৮ বছরের রীতা রানী দাস (বামে) অক্টোবর নির্বাচনের পর চর লালমোহনের এই শিশুটি বিএনপি-জামাত সন্ত্রাসীদের কবলে পড়ে গণধর্ষণের শিকার হয় (ডানে) অক্টোবর নির্বাচনের দ্বিতীয় দিনে পঞ্চাশোর্ধ সরস্বতীও জোট সন্ত্রাসীদের ধর্ষণের শিকার হন





অক্টোবরের নির্বাচনের পর জোট সন্ত্রাসীদের চরম নির্যাতনের শিকার পীরগঞ্জের প্রাণগোপাল হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন (বায়ে) (ডানে) আরও এক নির্যাতিত সংখ্যালঘু নারী



২০০১ অক্টোবর নির্বাচনের পর রামশীলে আশ্রয় নেয়া ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য রেণুকা অধিকারী তাঁর ধর্ষণ, নির্যাতন ও সর্বস্ব হরণের কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন



বাড়িঘর, স্বামী, সন্তান সবকিছু হারিয়ে এই নারী এখন আর কিছুই ভাবতে পারছেন না অক্টোবর ২০০১ নির্বাচন তাঁর সবকিছুই কেড়ে নিয়েছে কী তাঁর ভবিষ্যত?



প্রতিবাদ সমাবেশে রামশীলে আশ্রিতা শেফালী রানী সরকার তাঁর ওপর বর্বর নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং তাঁর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জোট সন্ত্রাসীদের পরিকল্পিত হামলার চিহ্ন দেখাচ্ছেন



অক্টোবর ২০০১-এর নির্বাচনের পর কোটালীপাড়ার রামশীলে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়া নির্যাতিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিবাদের একাংশ



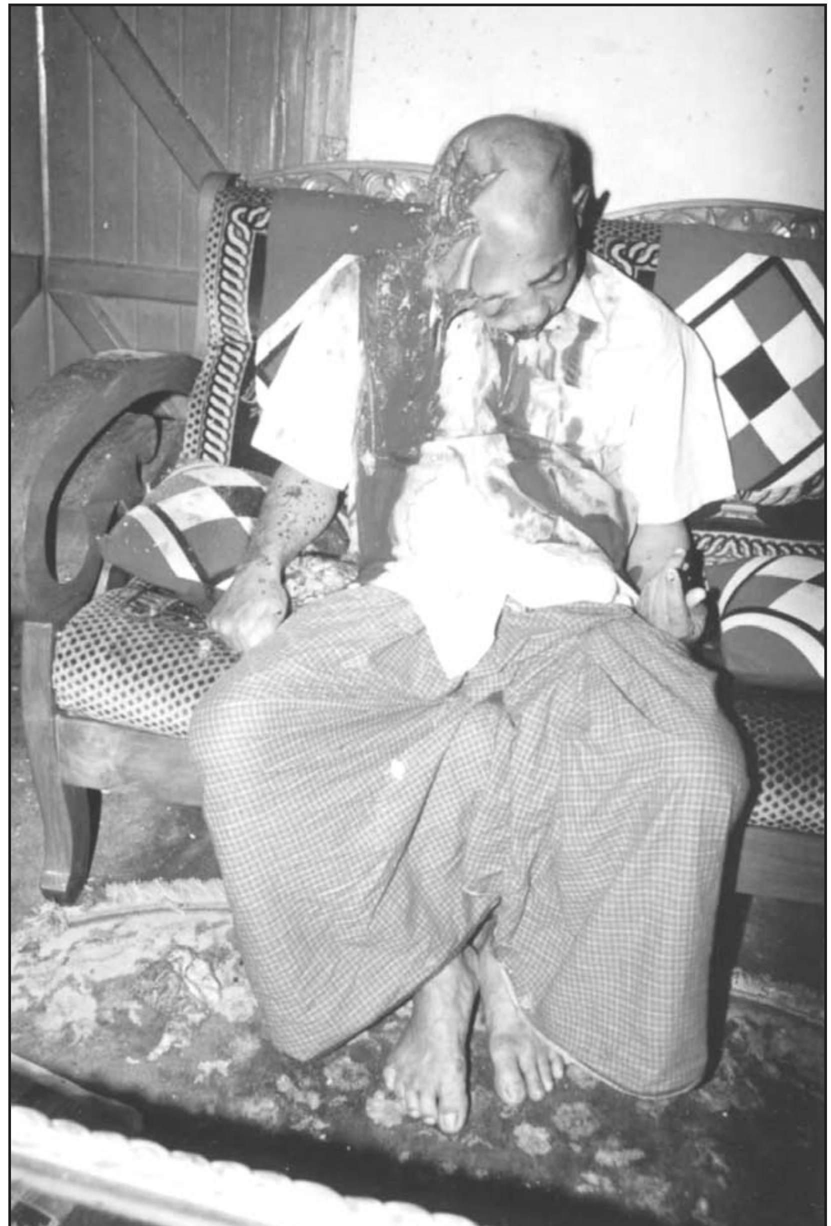
২০০১ সালের নবেম্বর মাসে চট্টগ্রামের মীরেরসরাইয়ে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের ক্যাডাদের কবলে পড়ে ধর্ষিত এক সংখ্যালঘু গৃহবধূ



২০০১-এর ১৬ নবেম্বর সকালে জামালখানে নিজ বাসভবনে জামাত শিবিরের সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মূহুরীর মৃতদেহে পুষ্পার্ঘ অর্পণ



চট্টগ্রামে হাজারো মানুষের ঢল নেমেছিল জামাত শিবিরের সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মূহুরীর প্রতি শ্রদ্ধা আর সাম্প্রদায়িক জোট সরকারের প্রতি ধিক্কার জানাতে



একজন বর্ষীয়ান অকুতোভয় শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মূহুরীকে নিজ বাসভবনে ২০০১-এর ১৬ নবেম্বর সকালে জামাত শিবির ক্যাডাররা নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করে



৫ নবেম্বর ২০০১-এ চট্টগ্রামের মীরেরসরাই থানার দাশপাড়ায় সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত এক বসতবাড়ি



৫ নবেম্বর ২০০১ সালে চট্টগ্রামের মীরেরসরাই থানার দাশপাড়া গ্রামে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত সুনীল সাধু'র মায়ের আহাজারি



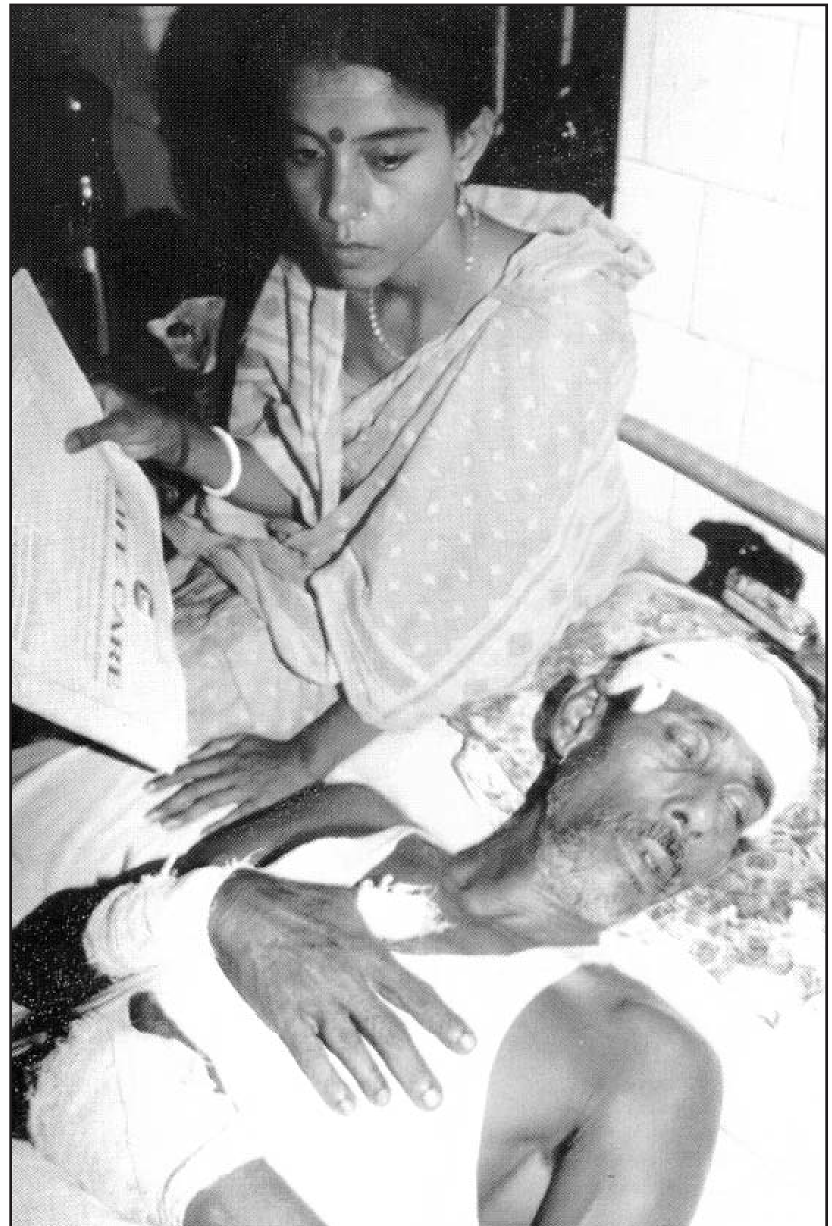
৫ নবেম্বর ২০০১ সালে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের হামলায় চট্টগ্রামের মীরেরসরাই থানার দাশপাড়ায় মন্টু দাশের জখমের চিহ্ন



২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন নিপীড়নের প্রতিবাদে ১১ নবেম্বর ২০০১-এ চট্টগ্রামে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মশাল মিছিল



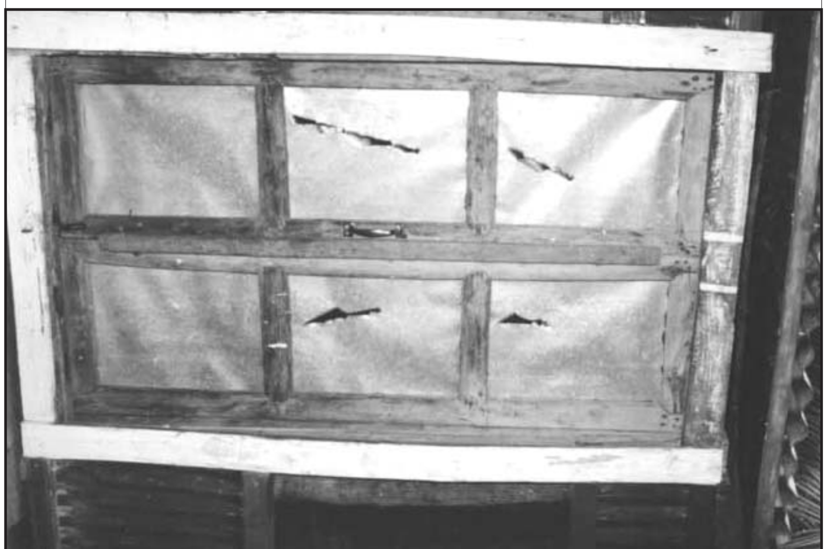
সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস, হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আহুত ১৫ নবেম্বর ২০০১-এর হরতালের সময় চট্টগ্রামে মিছিল



অক্টোবর ২০০১-এর নির্বাচনের পর জামাত-শিবির ক্যাডাররা চট্টগ্রামের মীরেরসরাই-এ নিরঞ্জন দাসের ওপর নির্মম সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে তাঁকে মারাত্মক জখম করে



২০০১-এর নবেম্বর 'মাইনরিটি ট্যাক্স' আদায়ের নামে সাম্প্রদায়িক জোট সন্ত্রাসীরা চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার সুনীল নাথের ৪০ হাজার টাকা লুট করে তাকে ছুরিকাঘাতে আহত করে



৫ নবেম্বর ২০০১ মীরেরসরাইয়ে দাশ পাড়ায় সুনীল সাধুর ঘরের জানালা দরজায় সন্ত্রাসীদের কোপের চিহ্ন



৫ নবেম্বর ২০০১ চট্টগ্রামের মীরেরসরাইয়ে দাশপাড়ায় জোট সন্ত্রাসীদের নির্যাতনের শিকার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন একজন সংখ্যালঘু



সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন ও সংখ্যালঘুদের নির্ভয়ে নিরাপদে ভোটদানের পরিবেশ সৃষ্টির দাবিতে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০১ চট্টগ্রামে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মিছিল



৫ নবেম্বর ২০০১ মীরেরসরাই-এ দাশপাড়ায় সাম্প্রদায়িক জোট সন্ত্রাসীদের হামলায় লণ্ডভণ্ড ঘরের জিনিসপত্রের মাঝে অসহায় সংখ্যালঘু পরিবারের একজন



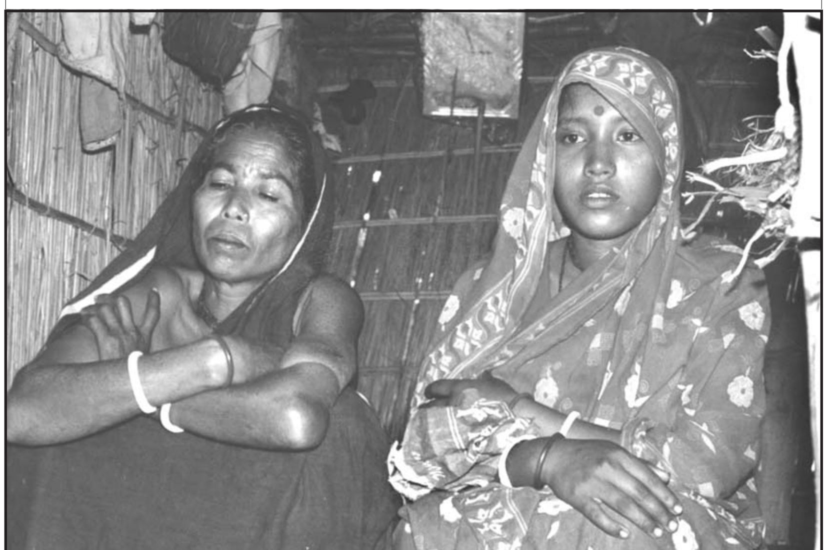
সংখ্যালঘুদের ওপর সাম্প্রদায়িক জোট সন্ত্রাসীদের নিপীড়ন নির্যাতনের প্রতিবাদে চট্টগ্রামে প্রকৌশল বিশ বিদ্যালয়ের সচেতন ছাত্র-ছাত্রীরা ক্যাম্পাসের গেটে কালো ব্যানার টানিয়ে রাখে



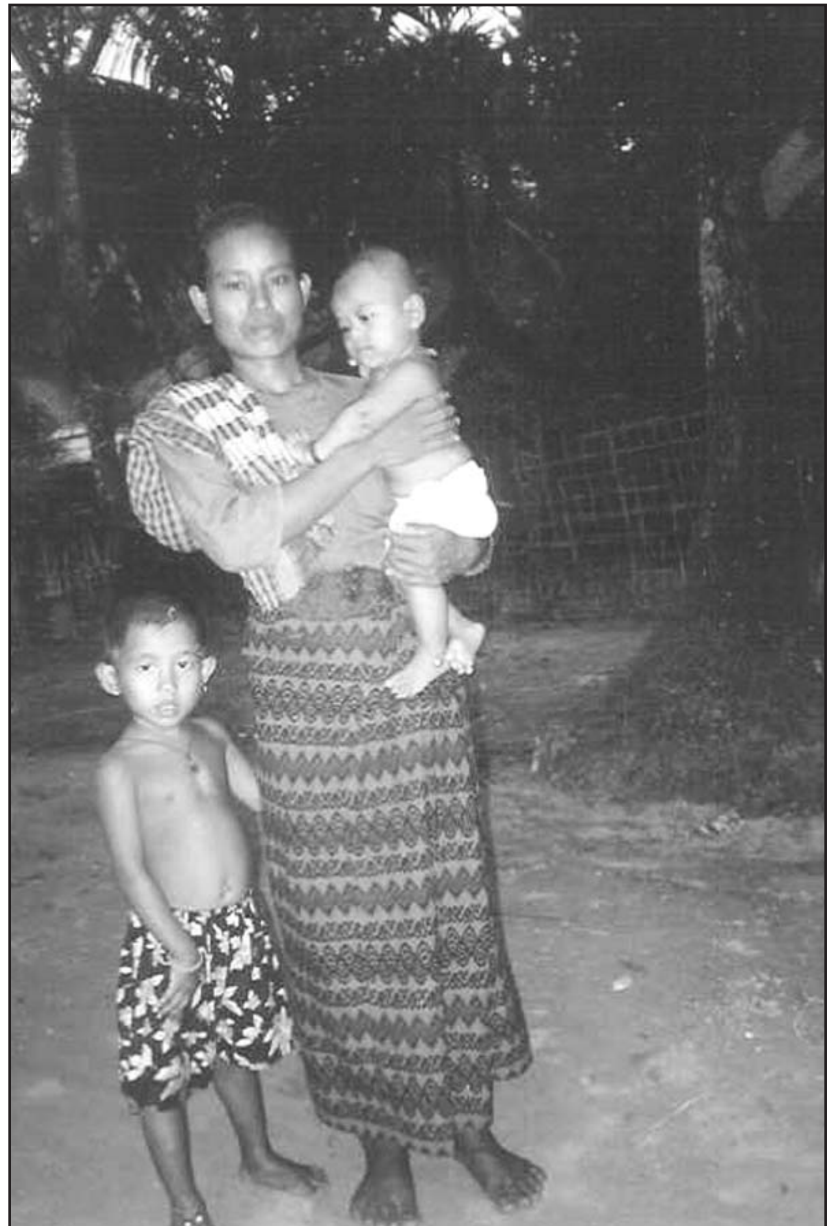
২০০১ সালের ৫ নবেম্বর মীরেরসরাই-এর দাশপাড়ায় এক সংখ্যালঘু কিশোরীর দীর্ঘদিনের জমানো শখের আসবাবপত্র ভেঙে গুড়িয়ে দেয় জোট সন্ত্রাসীরা ভাঙাচোরা আসবাবপত্রের দিকে চেয়ে আছে আতঙ্কিত কিশোরী



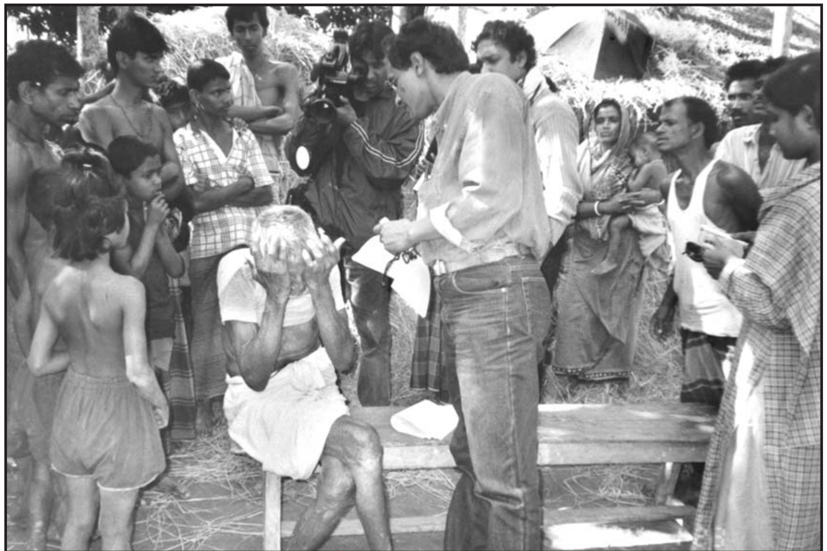
১০ অক্টোবর ২০০২-এ পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক জোট সরকারের মদদপুষ্ট সেটেলাররা আদিবাসী শিশু উসাননু মারমাকে নির্মমভাবে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে



ভোলার অন্নদাপ্রসাদ গ্রামের সুস্মিতা ও লক্ষ্মী এরা দু'জনেই অক্টোবর নির্বাচনের পর বিএনপি-জামাত কর্মীদের কবলে পড়ে গণধর্ষণের শিকার হয় ঘটনার সময় সুস্মিতা ৬ মাসের অন্তঃস্বত্তা ছিল



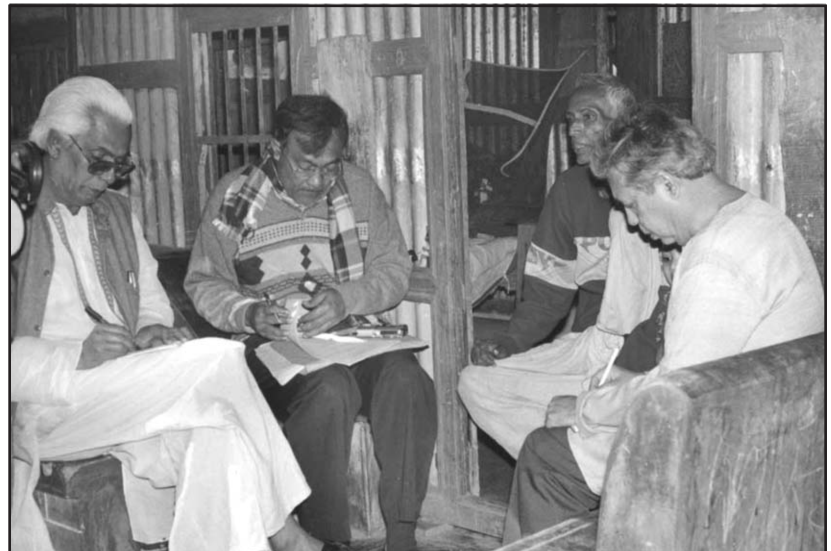
১০ অক্টোবর ২০০২-এ সাম্প্রদায়িক জোট সরকারের মদদপুষ্ট সেটেলাররা আদিবাসীদের বাড়িঘর ভেঙে গুড়িয়ে দেয় ছবিতে অসহায় এক মা তাঁর অবোধ শিশুদের নিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ির সামনে



১০০ বছর বয়সী ভোলার ব্রজকুমার বাবু, যিনি শারীরিকভাবে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার। তাঁর একটাই অপরাধ তিনি আওয়ামী লীগের ভোটার ছিলেন



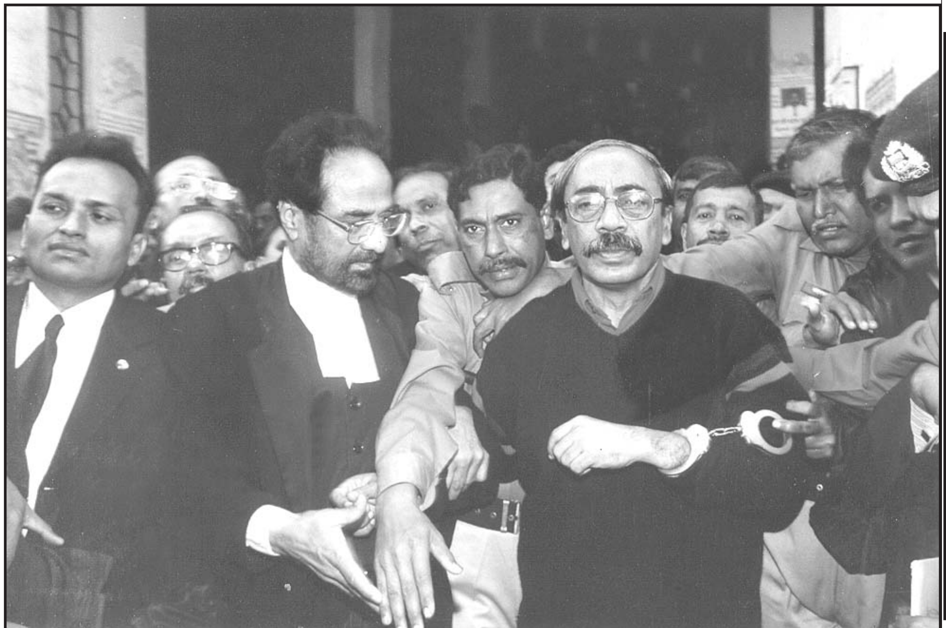
অক্টোবর নির্বাচনের পর সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার ভোলা সদর উপজেলার একটি গ্রামে সংখ্যালঘু নারীদের সাক্ষাতকার নেন নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটির সদস্যরা



নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে ভোলা সদর উপজেলার গ্রামে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার এক সংখ্যালঘু ব্যক্তির সাক্ষাতকার গ্রহণ করছেন অধ্যাপক অজয় রায় এবং মানবাধিকার নেতা পংকজ ভট্টাচার্য



ভোলায় সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা সরেজমিনে দেখে আসার পর নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটির সংবাদ সম্মেলন



৯ ডিসেম্বর ২০০১ মৌলবাদী জোট সরকারের প্রতিহিংসার শিকার নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি 'কারাবন্দি বিবেক' শাহরিয়ার কবির হাতকড়া পরিহিত অবস্থায় আদালত থেকে বেরিয়ে আসেন পাশে তাঁর আইনজীবী ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম



২৩ ডিসেম্বর ২০০১ শাহরিয়ার কবিরের মুক্তির দাবীতে মিছিলের পুরোভাগে (ডান থেকে) অভিনয়শিল্পী শমী কায়সার, নাট্যশিল্পী সারা যাকের, ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, আসাদুজ্জামান নূর, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, কবি শামসুর রাহমান, বিচারপতি কে এম সোবহান, ওয়াহিদুল হক, আবেদ খান প্রমুখ



২৩ ডিসেম্বর ২০০১ নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবিরের মুক্তির দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সচেতন নাগরিকদের মানববন্ধনে কথাশিল্পী ডাঃ আনোয়ারা সৈয়দ হক, মানবাধিকার নেত্রী হামিদা হোসেন, নারীনেত্রী শিরিন আখতার, শিক্ষাবিদ দৌলত আরা মান্নানসহ অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ



২৩ ডিসেম্বর ২০০১ শাহরিয়ার কবিরের মুক্তির দাবিতে প্রেসক্লাবের সামনে নাগরিক সমাজের মানববন্ধন কর্মসূচিতে অধ্যাপক আমিনুর রশীদ, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, এডভোকেট সুধাংশু শেখর হালদার, ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, ব্যারিস্টার শওকত আলী খান, মুনতাসীর মামুন, নাট্যব্যক্তিত্ব আসাদুজ্জামান নূর, ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, সারা যাকেরসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ



১৯ জানুয়ারি ২০০২ নির্মূল কমিটির দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জাদুঘরে আয়োজিত আলোচনা সভায় (বাম থেকে) ব্যারিস্টার শওকত আলী খান, অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, সাংবাদিক ওয়াহিদুল হক ও সাংবাদিক আবেদ খান



৬ জানুয়ারি ২০০২ সাম্প্রদায়িক জোট সন্ত্রাসীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত কক্সবাজারের বাইল্যাপাড়ার সুজন বড়ুয়া (২০) সারা শরীরে পেরেক বিদ্ধ করে, কুপিয়ে তাকে হত্যা করা হয়



৫ ফেব্রুয়ারি ২০০২ চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবিরকে দেয়া সংবর্ধনা সভা পণ্ড করতে সাম্প্রদায়িক জামাত শিবিরের ক্যাডাররা বোমা হামলা করে বোমাবাজিতে হতভাগ্য এক রিকশাচালক নির্মমভাবে নিহত হয়



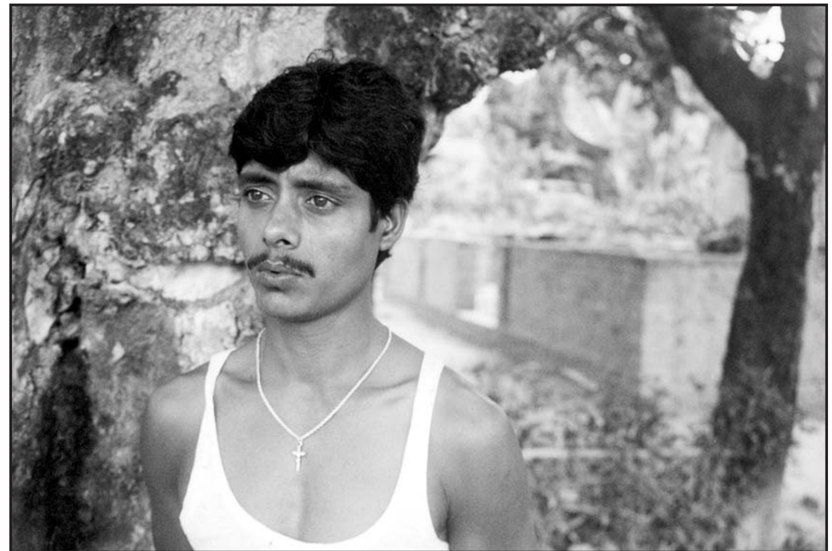
৫ ফেব্রুয়ারি ২০০২ চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবিরকে দেয়া সংবর্ধনা সভা পণ্ড করতে সাম্প্রদায়িক জামাত শিবিরের ক্যাডাররা পুলিশের উপস্থিতিতে ও প্রত্যক্ষ মদদে মুহুর্মুহু বোমাবাজির সময় ধোঁয়াচ্ছন্ন সভাস্থল



৩ মার্চ ২০০২ পঙ্গু হাসপাতালের বেডে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন ৭০ বছরের বৃদ্ধ পৌল বৈদ্য বিএনপির সন্ত্রাসী শাজাহান চেয়ারম্যান তার দুটি হাতই ভেঙ্গে দিয়েছে



৩ মার্চ ২০০২ পাবনার চাটমোহরে খ্রিস্টান পাড়ায় সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার এক মহিলা



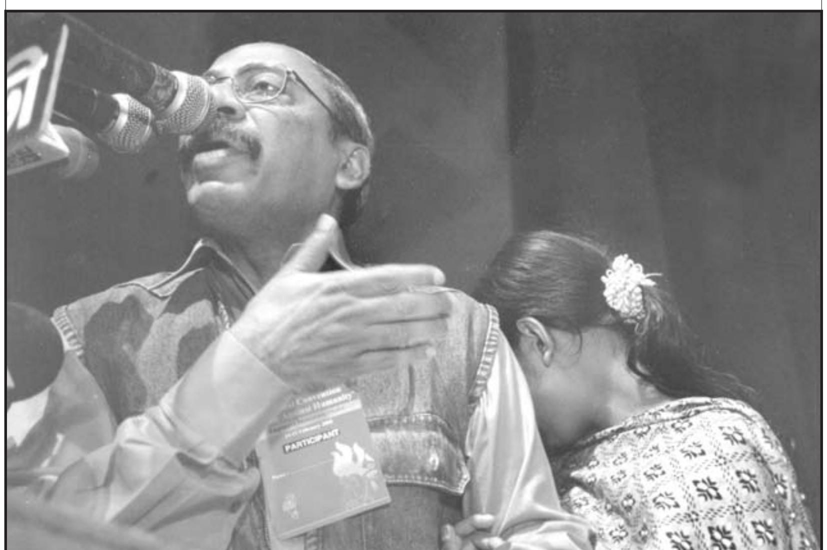
৯ মার্চ ২০০২ সাভারের কমলাপুরে সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের এক সদস্য



২ ফেব্রুয়ারি ২০০২ কারাগার থেকে মুক্ত হলে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবিরকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক নাগরিক সংবর্ধনা প্রদান করে ছবিতে শাহরিয়ার কবির সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করছেন



৩ মার্চ ২০০২ পাবনার চাটমোহরে ফৈলজানা গ্রামে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ওপর হামলার খবর পেয়ে নির্যাতিত সুবল মণ্ডলের পরিবারের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, কেন্দ্রীয় নেতা সাংবাদিক ফজলুর রহমান ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ



১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২ 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' জাতীয় কনভেনশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির। ধর্ষিতা পূর্ণিমা শীল সাংবাদিক শাহরিয়ার কবিরকে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে



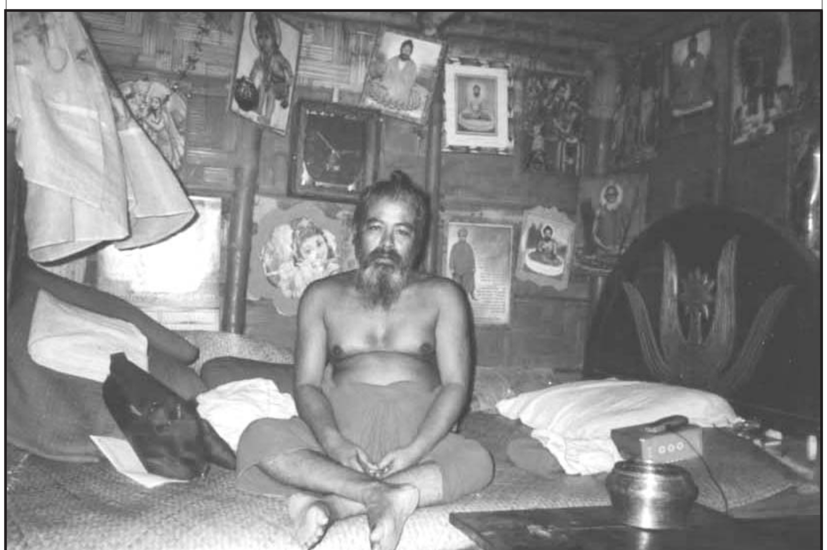
২১ এপ্রিল ২০০২ চট্টগ্রামের রাউজানে নৃশংস বর্বরতায় নিজ হাতে গড়া হিংগলা ওয়ারাপুঞঞা বৌদ্ধ অনাথালয়ে জবাই করে খুন করা হয় বৌদ্ধ ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি মহাস্থবিরকে। ইনসেটে জ্ঞানজ্যোতি মহাস্থবির



মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি শ্রী বিষ্ণুপদ রায়। ২৮ মার্চ ২০০২ সাম্প্রদায়িক জোট সন্ত্রাসীরা সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই শিক্ষকের দুটি পা ও ডান হাত নির্মমভাবে ভেঙে দেয়



২৮ এপ্রিল ২০০২ চট্টগ্রাম রাউজানে বৌদ্ধভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু নিরপেক্ষ তদন্ত ও বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল



৮ মে ২০০২-এ বাঁশখালী পালেগ্রামের আদিত্য আশ্রমে হামলা চালায় মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক জোট সন্ত্রাসীরা ধর্মপ্রাণ এই সাধু প্রদীপানন্দ ব্রহ্মচারীও রেহাই পাননি সেই সন্ত্রাসের কবল থেকে



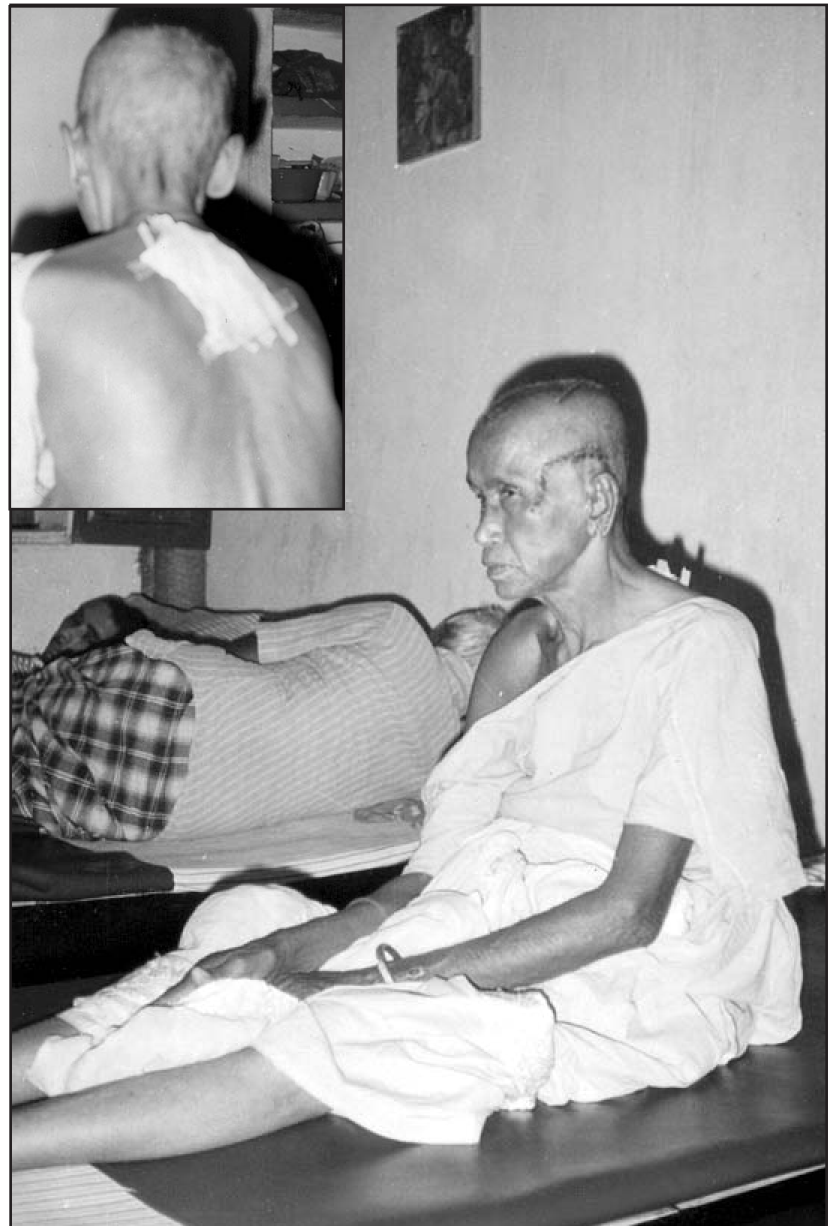
২৯ এপ্রিল ২০০২ গভীর রাতে খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ির হিন্দু পুরোহিত মদনগোপাল গোস্বামীকে ছাত্রদলের ক্যাডাররা নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করে



২১ এপ্রিল ২০০২ রাউজানে বৌদ্ধভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি মহাস্থবিরের খুনীদের ফাঁসির দাবিতে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ চট্টগ্রাম শহর থেকে রাউজান অভিমুখে পদযাত্রা করে মে মাসে



১২ জুন ২০০২ জনসংহতি সমিতির সদস্য সত্যরঞ্জন চাকমা সেনা বাহিনীর নির্যাতনে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন



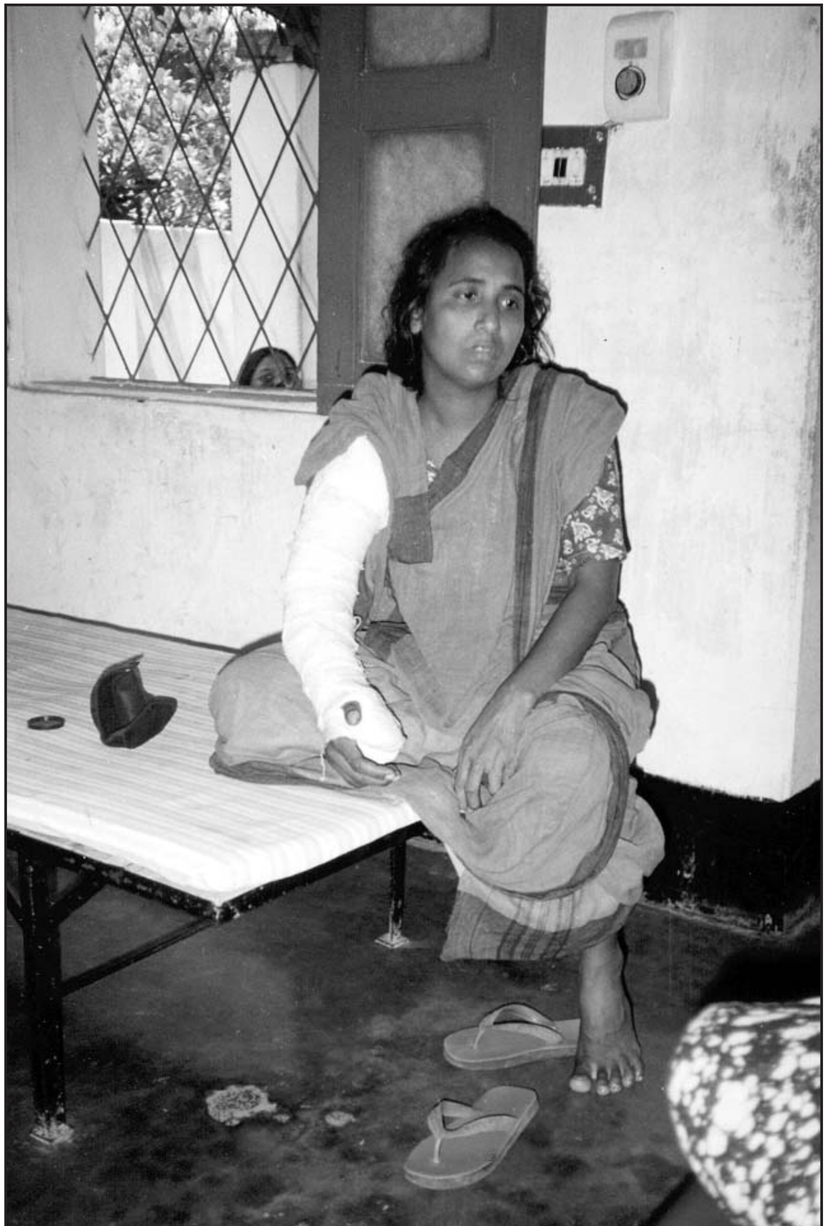
১৯ আগস্ট ২০০২ নাটোরের গৌরগোপালপুরে সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার গণেশ গোমেজের বয়োবৃদ্ধা স্ত্রী অতুনী গোমেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ইনসেটে অতুনী গোমেজের পিঠে রাম দা'র কোপের চিহ্ন



৬ জুন ২০০২-এ চট্টগ্রামে লালদীঘির মাঠে রাউজানের বৌদ্ধ ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি মহাস্থবিরের হত্যার বিচার দাবিতে আয়োজিত মহাসমাবেশ মঞ্চে উপবিষ্ট বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দ



৬ জুন ২০০২-এ চট্টগ্রামের লালদীঘির মাঠে রাউজানের বৌদ্ধ ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি মহাস্থবিরের হত্যার বিচার দাবিতে মহাসমাবেশে আগত প্রতিবাদী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের একাংশ



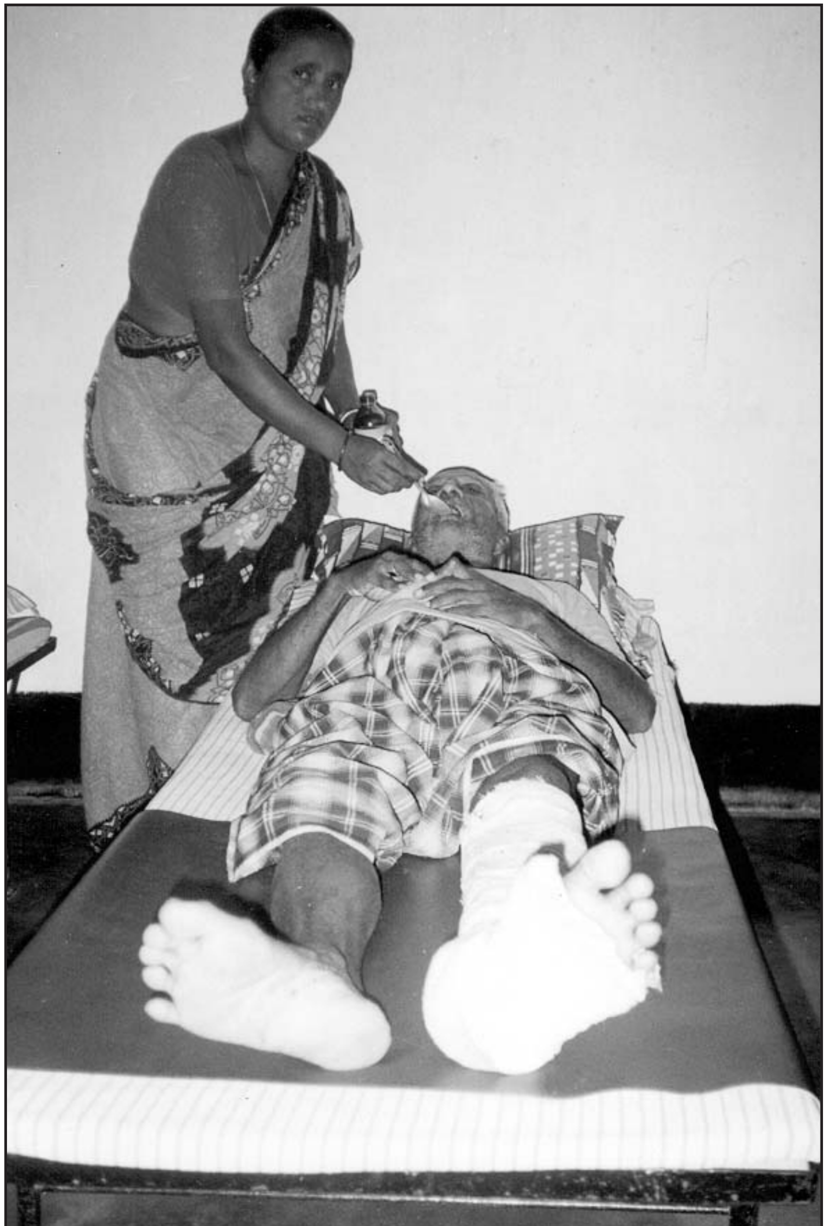
২৯ আগস্ট ২০০২ নাটোরের দীঘাদোলায় সাম্প্রদায়িক জোট সন্ত্রাসীরা মারিয়া গোমেজ (৩৫)-এর একটি হাত ভেঙে দেয়



২১ আগস্ট ২০০২ লন্ডনে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সদর দফতরে নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবিরের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের দক্ষিণ এশীয়া বিভাগের প্রধান আব্বাস ফয়েজ



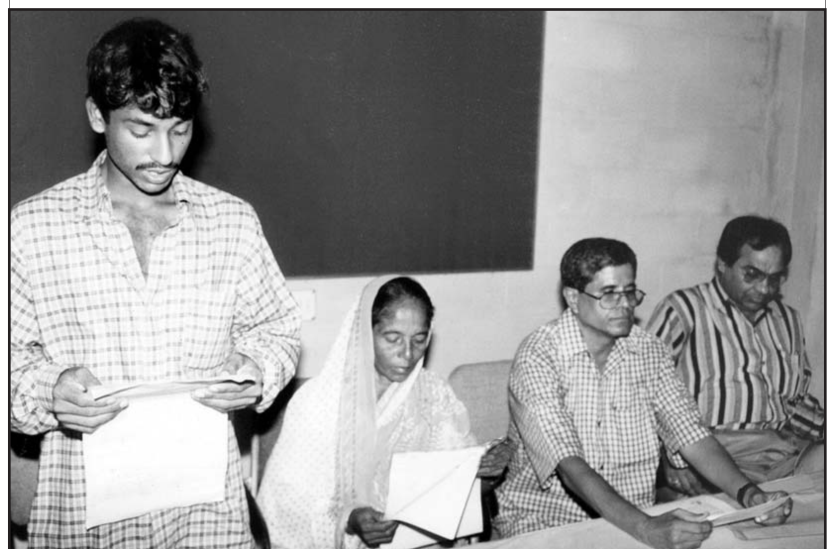
২৯ জুলাই ২০০২ চট্টগ্রামের রাউজানে ওয়ারাপুঞঞা বৌদ্ধ অনাথালয়ের শিক্ষার্থীদের হাতে থালা নিয়ে ভুখা মিছিল



অক্টোবর ২০০১-এর অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ১৯ আগস্ট ২০০২-এ নাটোরের গৌরগোপালপুরে সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের গণেশ গোমেজ



১৫ আগস্ট ২০০২ বাগেরহাটের রামপালে বিএনপি সন্ত্রাসীরা বিএনপি অফিসে ছবি রানী মণ্ডলকে হাতুড়িপেটা করে চুল কেটে দেয় এবং বিবস্ত্র করে ছবি তোলে নির্যাতিত ভীত সন্ত্রস্ত ছবি রানী হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন



নির্যাতিত ছবি রানীর পরিবার নির্যাতনকারী জোট সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবীতে সাংবাদিক সম্মেলন করে সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন তার ভাই, পাশে ছবি রানীর বৃদ্ধ মা ও অন্যান্যরা



১০ অক্টোবর ২০০২ রাশভিলা আদিবাসী গ্রামে সেটেলারদের হামলায় আহত উনুসিং মারমা



সাতক্ষীরায় ধর্ষিতা মা তারামনি এবং পুত্র বিশ জিৎ পুত্রের সামনেই মাকে ধর্ষণ করে বিএনপির ক্যাডাররা



সাতক্ষীরার কালীগঞ্জে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্বাচনোত্তর হামলা নির্যাতনের প্রতিবাদে কালীগঞ্জে পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ আয়োজিত প্রতিবাদ সভা ও সাংবাদিক সম্মেলন



১ অক্টোবর ২০০২ শহীদ মিনার শৃঙ্খলমুক্তকরণ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সন্ত্রাস নির্যাতনের প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ নাগরিক সমাজ শহীদ মিনারে এক মহাসমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহরিয়ার কবির



সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের চরম বর্বরতার শিকার সংগ্রাম কৃষ্ণ। বিএনপি সন্ত্রাসীরা তাঁর ডান পা কেটে নেয়



৭ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করা হয় নির্মূল কমিটির সহ-সভাপতি অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনকে। ৮ ডিসেম্বর তাঁকে সিএমএম কোর্টে হাজির করা হয়। ৮ জানুয়ারি দিনাজপুর জেল থেকে তিনি মুক্তি লাভ করেন



অক্টোবর ২০০১-এর নির্বাচনের পর ২০০২ সালে বাগেরহাটে সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার কয়েকজন সংখ্যালঘু



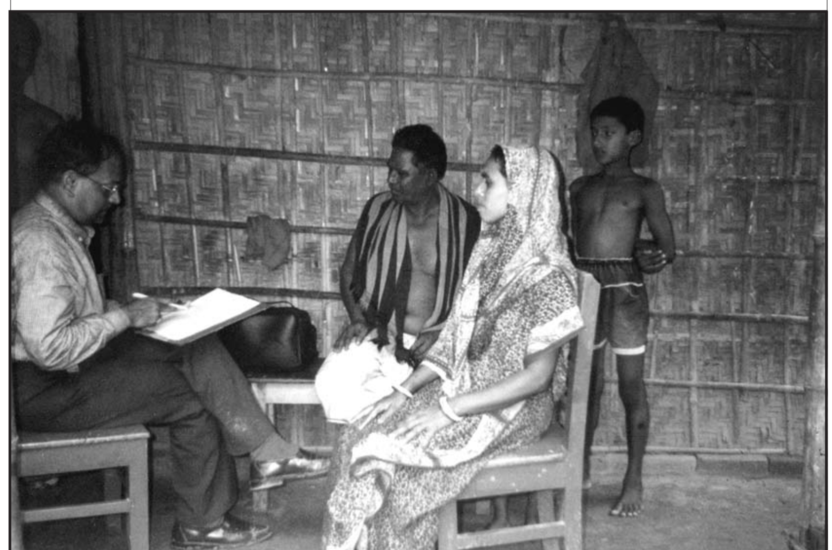
বোয়ালখালী মেরুং সাম্প্রদায়িক হামলায় জোট সন্ত্রাসীদের জ্বালিয়ে দেয়া আগুনে পুড়ে ছাই হওয়া বসতবাড়ি



বোয়ালখালী মেরুং জোট সন্ত্রাসীদের সাম্প্রদায়িক হামলায় জ্বালিয়ে দেয়া আগুনে পুড়ে ছাই হওয়া বসতবাড়ি



বোয়ালখালী মেরুং সাম্প্রদায়িক হামলায় জোট সন্ত্রাসীদের জ্বালিয়ে দেয়া আগুনে পুড়ে ছাই হওয়া বসতবাড়ি



৩০ ডিসেম্বর ২০০২ পার্বতীপুরে সাম্প্রদায়িক হামলায় আহত ননীগোপাল দাস (৬৪) এসময় ননীগোপাল দাসের স্ত্রী শান্তি রানী দাসের সাক্ষতকার নেয়া হয়



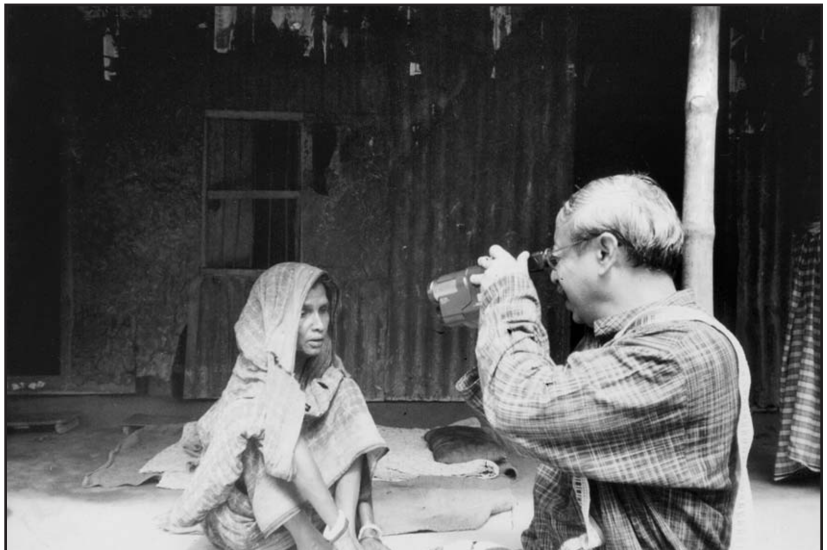
২০০৩-এর ফেব্রুয়ারি মাসে শরীয়তপুরের মসীয়ার গ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলায় নিহত ছেলের জন্য আহাজারী করছে মা সেফালী রানী ভট্টাচার্য   মানবাধিকার নেতা এডভোকেট রবীন্দ্র ঘোষ সরজমিনে তাদের দেখতে যান



১৮ ফেব্রুয়ারি মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ার ঋষিপাড়ায় নির্যাতিত পুষ্পরানীর বাড়ি



জানুয়ারি ২০০৩ বাঁশখালীতে গণধর্ষণের শিকার কয়েকজন সংখ্যালঘু কিশোরী



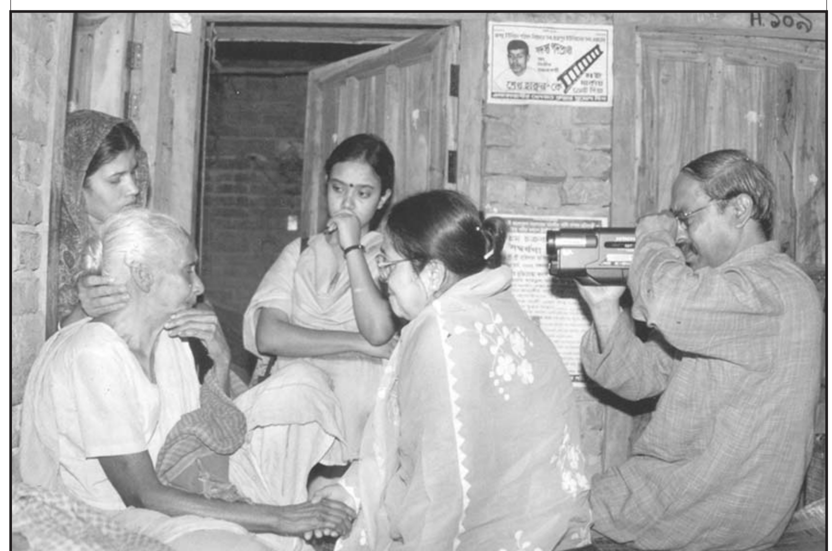
১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ার ঋষিপাড়ায় বিএনপি নেতা কুখ্যাত রাজাকার সোবহান বাহিনীর হাতে নির্যাতিতা সংখ্যালঘু নারী পুষ্পরাণীর সাক্ষাৎকার ধারণ করছেন সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির



১৯ মার্চ ২০০৩ বাগেরহাটের কোমরপুর গ্রামের ঠাকুরবাড়িতে নিহত তপন ভট্টাচার্যের ভাই বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সদস্য স্বপনের ধর্ষিতা স্ত্রী শিউলি



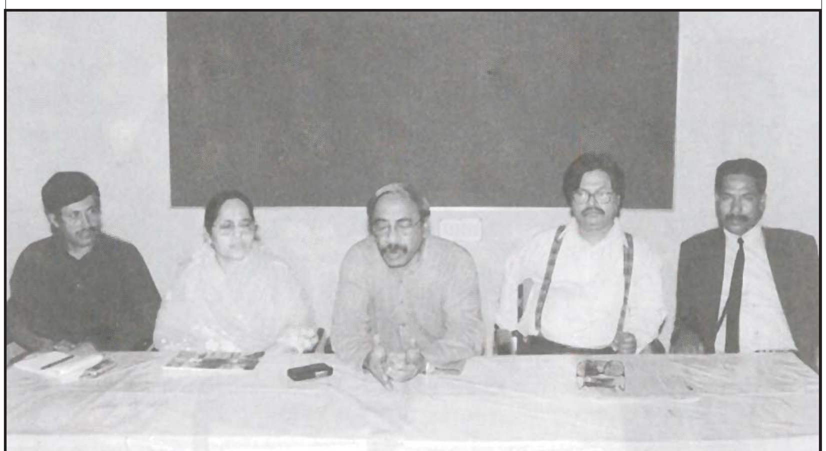
১৯ মার্চ ২০০৩ বাগেরহাটের কোমরপুর গ্রামে ঠাকুর বাড়িতে সাম্প্রদায়িক হামলায় নিহত তপন ভট্টাচার্যের ধর্ষিতা স্ত্রী অনিমা



২৯ মার্চ ২০০৩ বাগেরহাটের কোমরপুরের ঠাকুর বাড়িতে শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী জোট সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত তপন ভট্টাচার্যের বৃদ্ধ মা সরস্বতী দেবীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন ক্যামেরায় নির্যাতিতদের জবানবন্দি ধারণ করছেন নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির



২৯ মার্চ ২০০৩ বাগেরহাটের কোমরপুরে ঠাকুরবাড়িতে চারদলীয় জোটের সন্ত্রাসীরা একই পরিবারের তিন নারীকে ধর্ষণ করে এবং গৃহকর্তার মেজভাই তপন চক্রবর্তীকে হত্যা করে। নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহরিয়ার কবিরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালে নিহত তপনের পরিবারের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন



২৯ মার্চ ২০০৩ বাগেরহাটের কোমরপুরের ঠাকুরবাড়িতে জোট সন্ত্রাসীদের হত্যা ও ধর্ষণের আলামত সচক্ষে দেখে এসে খুলনা প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় বক্তৃতা করছেন সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির। মঞ্চে তাঁর সঙ্গে (বাম থেকে) কাজী মুকুল, শহীদজায়া শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী, ডাঃ বাহারুল আলম ও এডভোকেট আব্দুল লতিফ



১৯ এপ্রিল ২০০৩ ভূয়াছড়িতে বিধ্বস্ত বাড়ির সামনে একদল আদিবাসী। বিএনপি-জামাত জোট ক্যাডাররা এদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়



ভূয়াছড়িতে জ্বালিয়ে দেয়া আদিবাসী পাহাড়ীদের বাড়ি। সজীব চাকমা ধ্বংসযজ্ঞের হিসাব নিচ্ছেন



লেমুছড়িতে সেনাবাহিনীর মদদপুষ্ট সেটেলাররা সাম্প্রদায়িক আক্রোশে পুড়িয়ে দেয় ভগবান বুদ্ধের মূর্তি



১৯ এপ্রিল ২০০৩ ভূয়াছড়িতে সেটেলারদের হামলায় আহত ধীরসেন চাকমা। তিনি গুরুতরভাবে মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হন



৮ মে ২০০৩ রাতে আরতি বালা নাথ সহ তার মা ও মেয়েকে পুড়িয়ে মারার পর পোড়া ঘরের সামনে ছেলে সজল ও আরতির মেয়ে ও মেয়ের স্বামী



১৬ মে ২০০৩ চট্টগ্রামের বাঁশখালী হত্যাযজ্ঞের বর্ণনা দিচ্ছেন একজন প্রত্যক্ষদর্শী। সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছেন নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহরিয়ার কবির ও সাংবাদিক ফজলুর রহমান



২০ জুন ২০০৩ লন্ডনে হাউস অব কমন্সে হিন্দু বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের যুক্তরাজ্য শাখা বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। রমেন ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহরিয়ার কবির। সভার সভাপতি ছিলেন রমেন ব্যানার্জি। তাঁর পাশে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের তিনজন এমপি জেরেমি করবিন, জন ক্রুডাস ও গ্যারেথ টমাস



১৬ মে ২০০৩ তারিখে শাহরিয়ার কবিরের নেতৃত্বে নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় ও চট্টগ্রাম জেলার নেতৃবৃন্দ বাঁশখালী গিয়েছিলে, যেখানে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল আরতি রানী, তার মা ও মেয়েকে। তাঁরা প্রতিবেশী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে চট্টগ্রামে এসে সাংবাদিক সম্মেলন করেন



বাঁশখালীর পূর্ব চাম্বল নাথপাড়ার পুড়িয়ে দেয়া আরতি বালার পোড়া ঘরে এখন জঙ্গল উঠেছে। এ বাড়িতে এখন আর কেউ থাকেনা। গত ৩১ আগস্ট ২০০৫ তারিখে তোলা ছবি



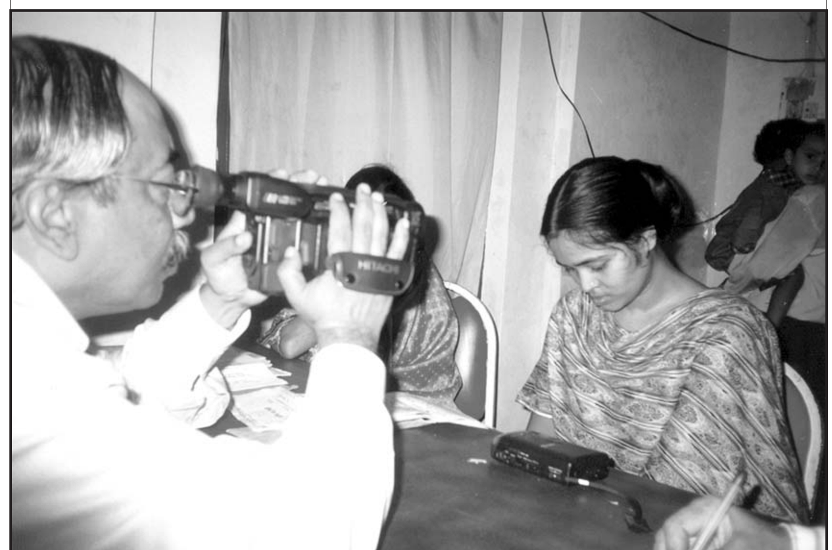
৬ জুন ২০০৩ স্টকহোমে সুইডিশ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সদর দফতরে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহরিয়ার কবির



১৯ জুন ২০০৩ লন্ডনে কমনওয়েলথ সচিবালয়ে মানবাধিকার বিভাগের প্রধান হানিফ ভ্যালির সঙ্গে নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহরিয়ার কবির ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ



২০ জুলাই ২০০৩ বাগেরহাট মোরেলগঞ্জের ধর্ষিতা আরতী রানী নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাংবাদিক শাহরিয়ার কবিরের কাছে নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন



২০ জুলাই ২০০৩ বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক জোট সন্ত্রাসীদের ধর্ষণের শিকার আরতী রানীর ননদ নির্যাতনের বর্ণনা দিচ্ছেন। তার নির্যাতনের বর্ণনা ধারণ করছেন নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির



২০ জুলাই ২০০৩ বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক জোট সন্ত্রাসীদের ধর্ষণের শিকার আরতী রানীর স্বামী উত্তম কুমার মণ্ডল নির্যাতনের বর্ণনা দিচ্ছেন। তার নির্যাতনের বর্ণনা ধারণ করছেন নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির



২১ জুলাই ২০০৩ সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বিশ নাথপুরগ্রামের সরকার বাড়ির বড় বউ আদুরী বিএনপি জামাত জোট সন্ত্রাসীদের নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি হন। হাতজোড় করে তার আকুল আর্তি ঃ 'দয়া করে আমাদের এদেশেই থাকতে দাও। আমরা এ মাটিতেই বাঁচতে চাই'



২১ জুলাই ২০০৩ কালীগঞ্জ থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন বিএনপি-জামাত জোটের সন্ত্রাসীদের দ্বারা ধর্ষিতা বিশ নাথপুরগ্রামের সরকার বাড়ির মেজ বউ বনলতা



২১ জুলাই ২০০৩ কালীগঞ্জ থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন বিএনপি-জামাত জোটের সন্ত্রাসীদের দ্বারা ধর্ষিতা বিশনাথপুর গ্রামের সরকার বাড়ির ছোট বউ রাধারানীর সাক্ষাৎকার ধারণ করেন নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, সঙ্গে নির্মূল কমিটির মহানগর শাখার নেতা অরূপ সিংহ অপু



২১ জুলাই ২০০৩ সাতক্ষীরার কালীগঞ্জে সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রত্যক্ষ করে এসে সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবে প্রেস ব্রিফিং করছেন নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির। সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল ও মুক্তিযুদ্ধের শহীদ স্মৃতি পাঠাগার খুলনার প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ বাহারুল আলম



৩ আগস্ট ২০০৩ ভূষণছড়ায় সেটেলারদের পৈশাচিক হামলায় গুরুতর আহত শিশু কম্পন চাকমা (১১ মাস)। উক্ত হামলায় তার দাদু (৮৪) নিহত হন



৭ আগস্ট ২০০৩ ধামরাইয়ে জোট সন্ত্রাসীদের ধর্ষণের শিকার ছবি রানী। পাশে তার স্বামী



৭ আগস্ট ২০০৩ ধামরাইয়ে ধর্ষিতা ছবি রানীর সাক্ষাৎকার ধারণ করছেন নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির ও কেন্দ্রীয় নেতা সাংবাদিক ফজলুর রহমান



২৬ আগস্ট ২০০৩ চট্টগ্রামের মহালছড়িতে সেনাবাহিনীর মদদে সেটেলারদের হামলার সময় পুড়িয়ে দেয়া আদিবাসীদের কয়েকটি বাড়ি



২৬ আগস্ট ২০০৩ মহালছড়িতে সেনাবাহিনীর মদদে সেটেলাররা ভেঙে গুড়িয়ে দেয় আদিবাসীদের গ্রাম ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি বাড়ি



২৬ আগস্ট ২০০৩ মহালছড়ি সাম্প্রদায়িক হামলায় সেনাবাহিনীর মদদপুষ্ট সেটেলারদের পুড়িয়ে দেয়া আদিবাসী গ্রামের বাড়ি ঘর এ বাড়ির কোন কিছুই রক্ষা পায়নি



২৬ আগস্ট ২০০৩ মহালছড়িতে সেনাবাহিনীর মদদপুষ্ট সাম্প্রদায়িক সেটেলারদের হামলার সময় পুড়িয়ে দেয়া আদিবাসী গ্রামে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি বাড়ির সামনে দাড়িয়ে আছেন একজন ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী



২৬ আগস্ট ২০০৩ মহালছড়িতে সেনাবাহিনীর মদদপুষ্ট সাম্প্রদায়িক সেটেলারদের হামলার সময় পুড়িয়ে দেয়া আদিবাসী গ্রামে ভস্মীভূত একটি বাড়ি পর্যবেক্ষণ করছে সরকারি বাহিনী



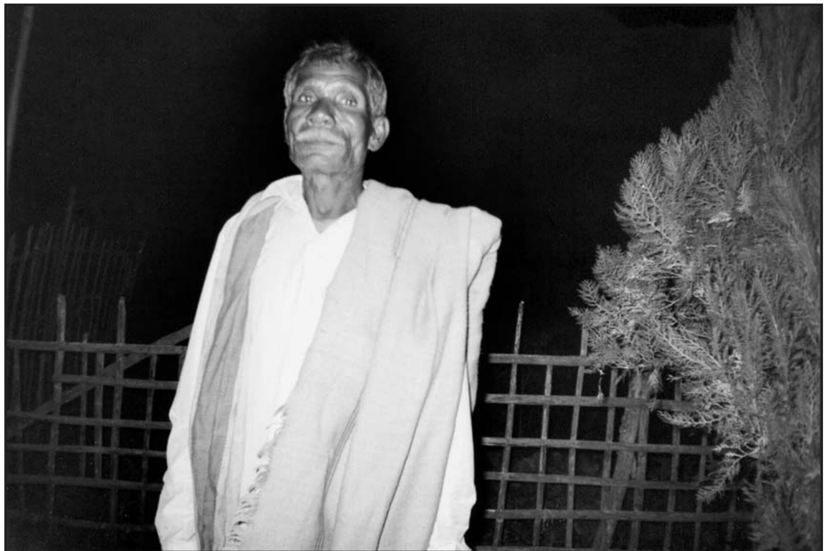
২৬ আগস্ট ২০০৩ মহালছড়িতে সাম্প্রদায়িক হামলার সময় সেনাবাহিনী ও সেটেলাররা শারীরিকভাবে নির্যাতন করে কালোসোনা চাকমাকে



৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩ মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি যৌথভাবে 'বাংলাদেশে জঙ্গী মৌলবাদের উত্থান এবং সাম্প্রদায়িক নির্যাতন' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে। বিষয়ের উপর ধারণাপত্র উত্থাপন করেন শাহরিয়ার কবির। ছবিতে (বাম থেকে) ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু, সিপিবির সভাপতি কমরেড মনজুরুল আহসান খান, নির্মূল কমিটির নেতা সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, আওয়ামী লীগ নেতা সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সভাপতি অজয় রায় ও অধ্যাপক মুশাররফ হোসেন প্রমুখ



১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩-এ কোলকাতা বিশ বিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব স্যোশাল হিস্ট্রি কর্তৃক বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন শাহরিয়ার কবির। ছবিতে অধ্যাপক অমিয় বাগচী, পিপিআই নেতা গৌতম চট্টোপাধ্যায়, সিপিআই(এম) নেত্রী কনক মুখার্জী ও কংগ্রেস নেত্রী ডঃ ফুলরেণু গুহ



৯ নবেম্বর ২০০৩ ঠাকুরগাঁওয়ে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার নিহত বিউটি সরেনের পিতা কামালাং সরেন॥ বিএনপি ক্যাডাররা বিউটি সরেনকে ধর্ষণের পর জবাই করে হত্যা করে



৯ নবেম্বর ২০০৩ ঠাকুরগাঁও-এর রাধারানীকে গণধর্ষণ করে তাঁর দুই চোখ উপড়ে ফেলে বিএনপির সন্ত্রাসীরা॥ স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ধর্ষিতা রাধা রানী



২৮ এপ্রিল ২০০৫ ঠাকুরগাঁওয়ে নির্যাতিত গৃহবধূ রাধারাণীর হাতে নিউইয়র্কের বিদ্যুৎ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ৩৫ হাজার টাকা হস্তান্তর করেন নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল, ঠাকুরগাঁও নির্মূল কমিটির আহ্বায়ক রাশেদুল ইসলাম ও এডভোকেট মোস্তাক আলম টুলু



ধর্ষিতা রাধারানী পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে নিজ বাড়ির সামনে



৯ নবেম্বর ২০০৩ ঠাকুরগাঁও-এ চিলারং তেলীপাড়া গ্রামের রাধারানীকে গণধর্ষণ করে তাঁর দুই চোখ উপড়ে তুলে ফেলে বিএনপির সন্ত্রাসীরা। ১৪ ডিসেম্বর তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির



১৮ নবেম্বর ২০০৩, 'মৌলবাদী সহিংসতার শিকার আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তব্য রাখছেন একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির। (বাম থেকে) মওলানা আব্দুল আউয়াল, অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী, বিচারপতি কে এম সোবহান, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী এবং সর্বডানে অধ্যাপক মীর মোবাশে রআলী



১৮ নবেম্বর ২০০৩, 'মৌলবাদী সহিংসতার শিকার আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তব্য রাখছেন হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি মেজর জেনারেল (অবঃ) সি আর দত্ত। তাঁর ডান দিকে এডভোকেট সুলতানা কামাল, সাংবাদিক ওয়াহিদুল হক এবং বাঁ দিকে আছেন মুক্তি সংগ্রামী বিধান কৃষ্ণ সেন, মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আয়শা খানম ও চলচ্চিত্রনির্মাতা শামীম আখতার



বাঁশখালীর সাধনপুরে তেজেনশীলের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে পরিবারের ১১ জনকে পুড়িয়ে হত্যার পর কয়লা হওয়া লাশগুলি পর্যবেক্ষণ করছে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন



১৮ নবেম্বর ২০০৩-এ মধ্যযুগীয় বর্বরতায় রাতের অন্ধকারে গান পাউডার দিয়ে বাঁশখালীর সাধনপুরে ৪ দিনের শিশু থেকে ৭০ বছরের বৃদ্ধসহ পরিবারের ১১ জনকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয় কয়লা হওয়া লাশগুলি হতভাগ্য পরিবারের ১১ সদস্যের



বাঁশখালীর সাধনপুরে ১১ জনকে নৃশংস বর্বরতায় পুড়িয়ে মারার পর ব্যথিত ক্ষুব্ধ মানুষের ঢল ২০ নবেম্বর ২০০৩ তারিখে তোলা ছবি



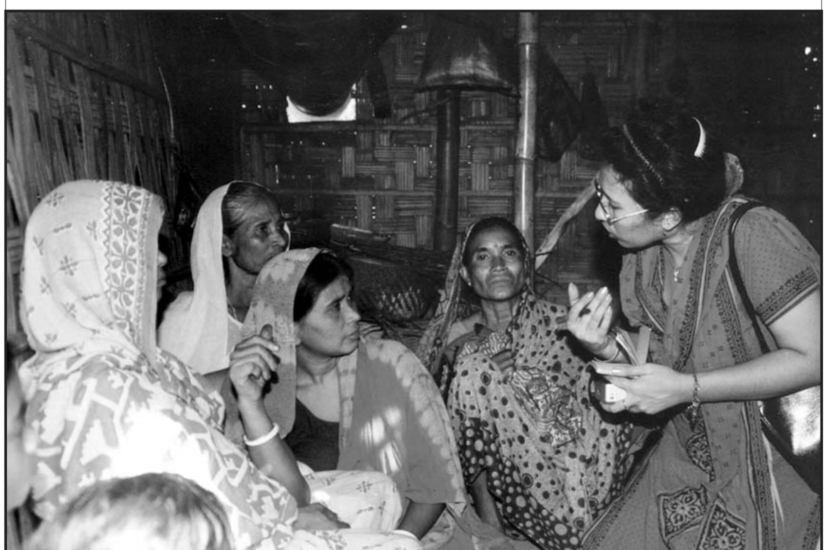
১৮ নবেম্বর ২০০৩-এ মধ্যযুগীয় বর্বরতায় রাতের অন্ধকারে গান পাউডার দিয়ে বাঁশখালীর সাধনপুরে তেজেনশীলের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে ৪ দিনের শিশু থেকে ৭০ বছরের বৃদ্ধসহ একই পরিবারের ১১ জনকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয় ছবিতে পুড়ে কয়লা হওয়া লাশের দৃশ্য



সাম্প্রদায়িক বর্বরতায় তেজেনশীলের পরিবারের ১১ সদস্যকে পুড়িয়ে মারার পর স্বজনদের আহাজারি



১৯ নবেম্বর ২০০৩ চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে ১১ জনকে পুড়িয়ে হত্যার খবর শুনে নির্মূল কমিটির চট্টগ্রাম শাখার নেতৃবৃন্দ ছুটে যান ঘটনাস্থলে। নেতৃবৃন্দ স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ শোনেন



নির্মূল কমিটির চট্টগ্রাম জেলার নেত্রী সাংবাদিক সুমি খান তেজেনশীলের প্রতিবেশীদের জবানবন্দি রেকর্ড করছেন



চট্টগ্রামের বাঁশখালীর পূর্ব চাম্বলের স্বর্ণ ব্যবসায়ী মনোরঞ্জন ধরের দোতলা ভবনের সব দরজাই বন্ধ, কেউ নেই বাড়িতে। তাঁর বাড়িতে সন্ত্রাসীরা হানা দিয়ে ৭০ ভরি স্বর্ণ নগদ ২ লাখ টাকা নিয়ে যায়। তারপর থেকে তিনি সপরিবারে গৃহ ত্যাগ করেছেন



১৮ নবেম্বর ২০০৩-এ বাঁশখালীর সাধনপুরে সাম্প্রদায়িক পৈশাচিকতায় তেজেনশীলের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে শিশুসহ পরিবারের ১১ সদস্যকে হত্যার পরদিন বাড়ির সামনে মানুষের ভীড়



জোট সন্ত্রাসীদের জ্বালিয়ে দেয়া বাঁশখালীর সাধনপুরে তেজেনশীলের সেই পোড়া ঘরের কোন অস্তিত্ব বর্তমানে নেই পোড়া ভিটেতে এখন গোয়ালঘর আর পাটক্ষেত্র জীবিত সদস্যরা প্রাণভয়ে আর ঘরে থাকতে রাজী নয় গত ৩১ আগস্ট ২০০৫-এ এই ছবি তোলা হয়



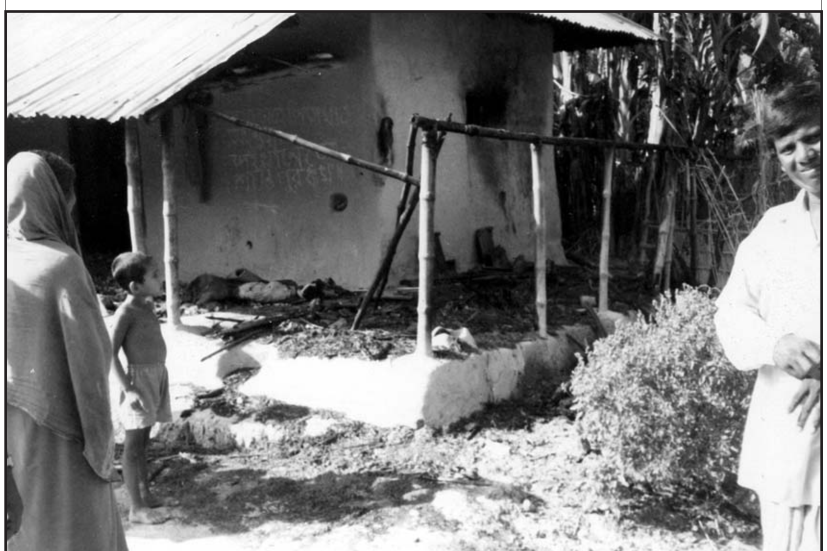
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রাজশাহীর দুর্গাপুরে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার দশরথ কবিরাজের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিচ্ছেন সাংবাদিক জাহাঙ্গীর আলম আকাশ



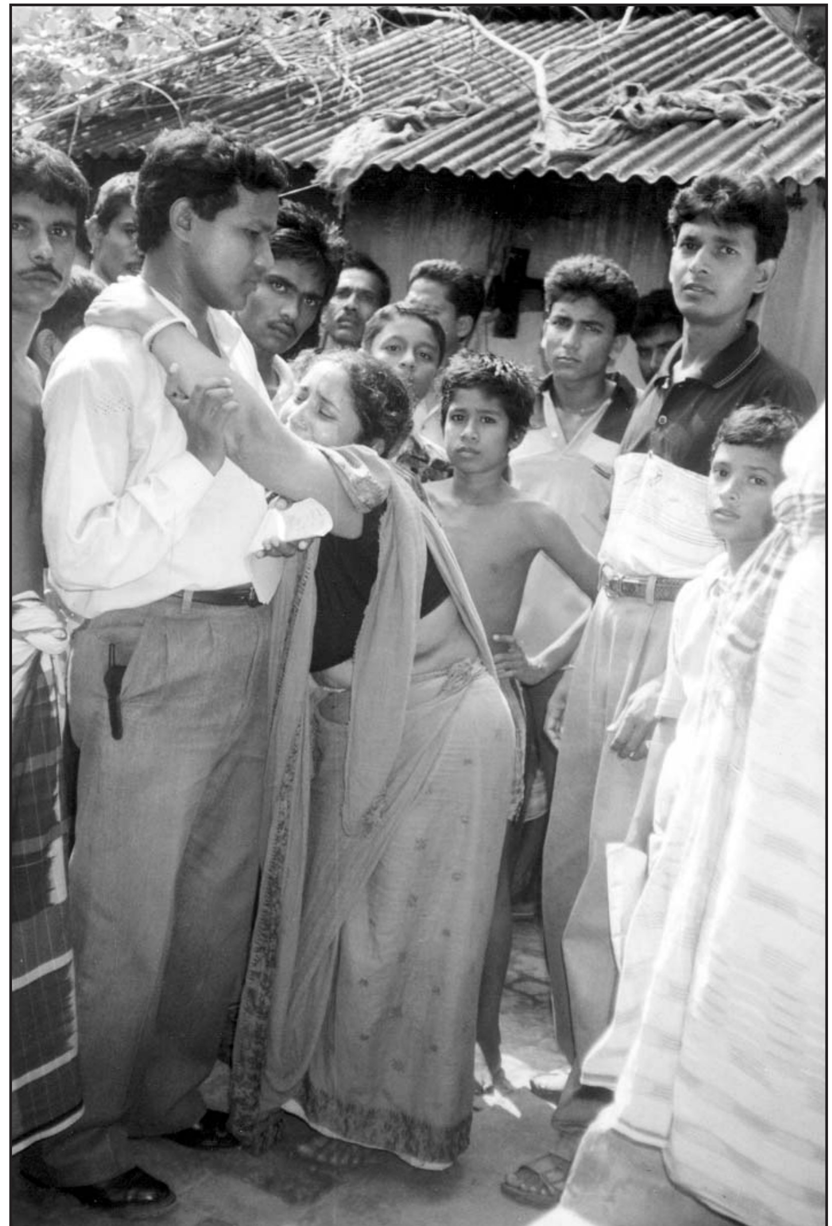
২৯ ডিসেম্বর ২০০৩ রাজশাহীর দুর্গাপুরে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার বৃদ্ধ দশরথ কবিরাজ



সাম্প্রদায়িক হামলায় আহত দশরথ কবিরাজের সাথে কথা বলছেন নির্মূল কমিটির উপদেষ্টা সাংবাদিক কামাল লোহানী, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, সহ-সভাপতি শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ



জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়া রাজশাহীর দুর্গাপুরে দশরথ কবিরাজের বসতবাড়ি



বাগমারার বজরুক কোলায় সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার মিনতি বালা সাংবাদিক জাহাঙ্গীর আলম আকাশকে সামনে পেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন



২০০৩ সালের ডিসেম্বরে পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার চরবানিয়ারিতে বিএনপি-জামাত জোট সন্ত্রাসীদের হাতে নির্যাতিত নারী-শিশুরা



ডিসেম্বর ২০০৩ পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলার চরবানিয়ারী ইউনিয়নে বিএনপি সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত এক নারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন



পুঠিয়ায় সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার কার্ত্তিক চন্দ্র দেব



আতঙ্কিত বানিয়ার মালোপাড়ার বাসিন্দারা পৌর নির্বাচনের পর বিএনপি ক্যাডাররা এদের উপর হামলা-নির্যাতন চালায়



৩ আগস্ট ২০০৪ রাঙামাটির বরকলে সেটেলারদের পৈশাচিক হামলায় গুরুতর আহত সুবর্ণা চাকমা



৩ আগস্ট ২০০৪ রাঙামাটির বরকলে সেটেলারদের পৈশাচিক হামলায় গুরুতর আহত সুবর্ণা চাকমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন



আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে মধুপুর ইকোপার্ক বাতিল করার দাবিতে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের অবস্থান ধর্মঘট



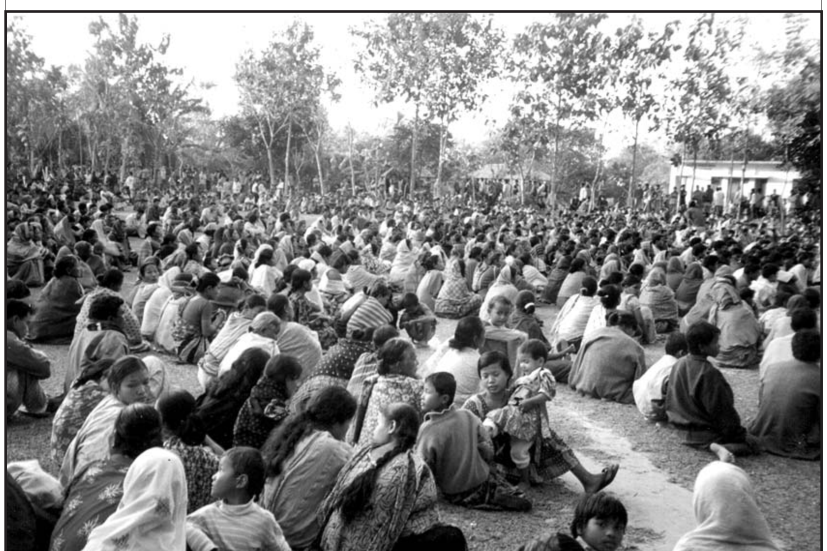
মধুপুর ইকোপার্ক বাতিলের দাবিতে আদিবাসীদের সমাবেশে অনুষ্ঠানের একাংশ



৪ জানুয়ারি ২০০৪ ইকোপার্কবিরোধী আন্দোলনে বনরক্ষীদের গুলিতে নিহত পীরেন স্নালের স্ত্রী ও সন্তান



৪ জানুয়ারি ২০০৪ ইকোপার্কবিরোধী আন্দোলনে বনরক্ষীদের গুলিতে নিহত পীরেন স্ নের লাশ সামনে নিয়ে মধুপুরের আদিবাসীদের সড়ক অবরোধ



আদিবাসী নেতা পীরেন্াল হত্যার প্রতিবাদে মধুপুরে নারী পুরুষের বিক্ষোভ সমাবেশ



শিশু কন্যাকে কোলে নিয়ে নিহত পীরেন্ালের স্ত্রী বিক্ষোভ মিছিলে



৮-১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে মধুপুরে ইকোপার্ক নির্মাণের প্রতিবাদে আয়োজিত সমাবেশ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ



পুলিশের গুলিতে নিহত আদিবাসী নেতা পীরেন্‌ স্নালের স্ত্রী   তিন মাসের শিশু কন্যাকে কোলে নিয়ে তিনি আদিবাসীদের বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত হন



মধুপুর ইকোপার্ক বাতিলের দাবীতে শহীদ মিনার পাদদেশে আদিবাসীদের প্রতীক অনশন



৬-৮ মার্চ ২০০৪ লন্ডনে আয়োজিত "বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন



২৮ জানুয়ারি ২০০৪ 'বহুমাত্রিক সংখ্যালঘু নির্যাতন এবং প্রস্তাবিত ব াশফেমী আইন' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তব্য রাখছেন ফাদার টিম্ব   পাশে শহীদজায়া শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী, অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী, লেখক সৈয়দ শামসুল হক, বিচারপতি কে এম সোবহান, লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, নারীনেত্রী হেনা দাশ, প্রমোদ মানকিন এমপি, অধ্যাপক মীর মোবাশে র আলী প্রমুখ



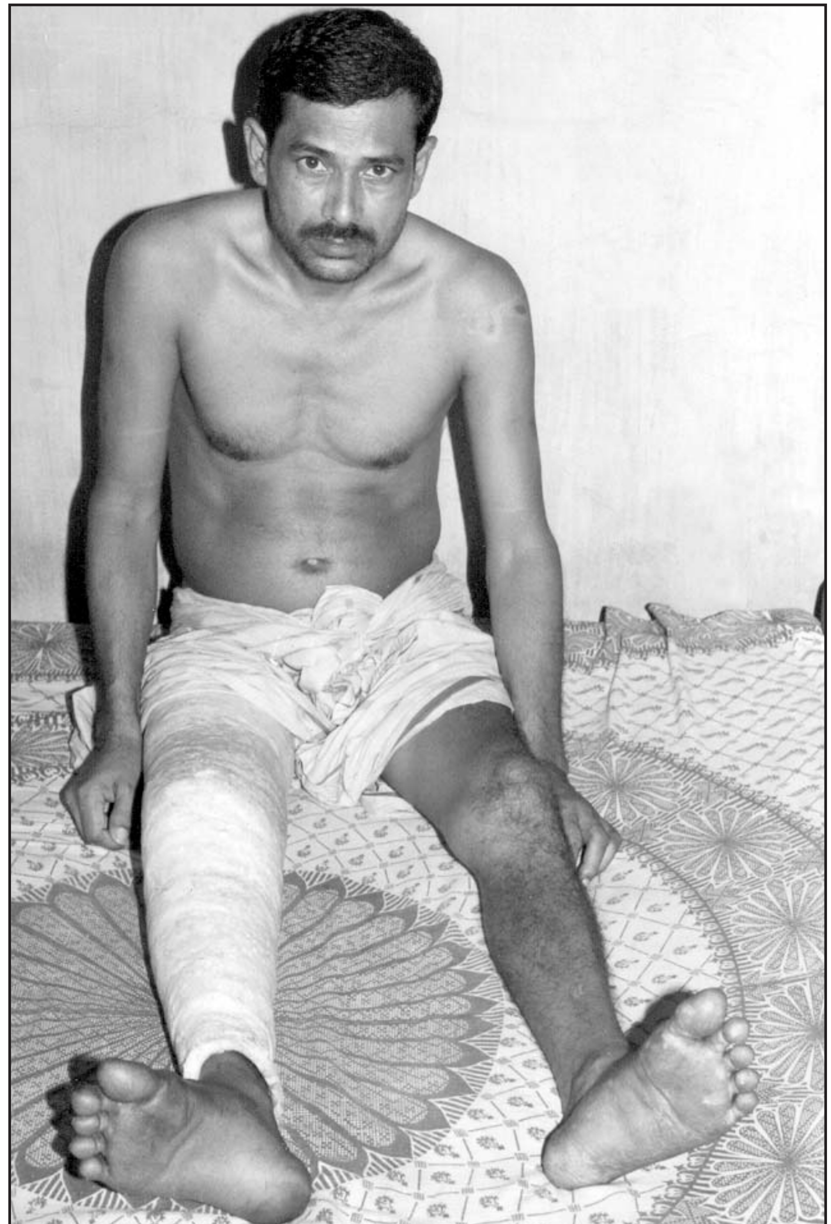
২৮ জানুয়ারি ২০০৪, 'বহুমাত্রিক সংখ্যালঘু নির্যাতন এবং প্রস্তাবিত ব াশফেমী আইন' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তব্য রাখছেন লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির   তাঁর বাম পাশে বিচারপতি কে এম সোবহান, ডানে নারীনেত্রী হেনা দাশ, প্রমোদ মানকিন এমপি, পেছনে কাজী মুকুল



২৮ জানুয়ারি ২০০৪ 'বহুমাত্রিক সংখ্যালঘু নির্যাতন এবং প্রস্তাবিত ব াশফেমী আইন' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তব্য অজয় রায় (বাম থেকে) মানবাধিকারনেত্রী রোজলিন কস্টা, মানবাধিকারনেত্রী ফস্টিনা পেরেরা, সমাজকর্মী মমতাজ লতিফ, অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক, ডাক্তার ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী প্রমুখ



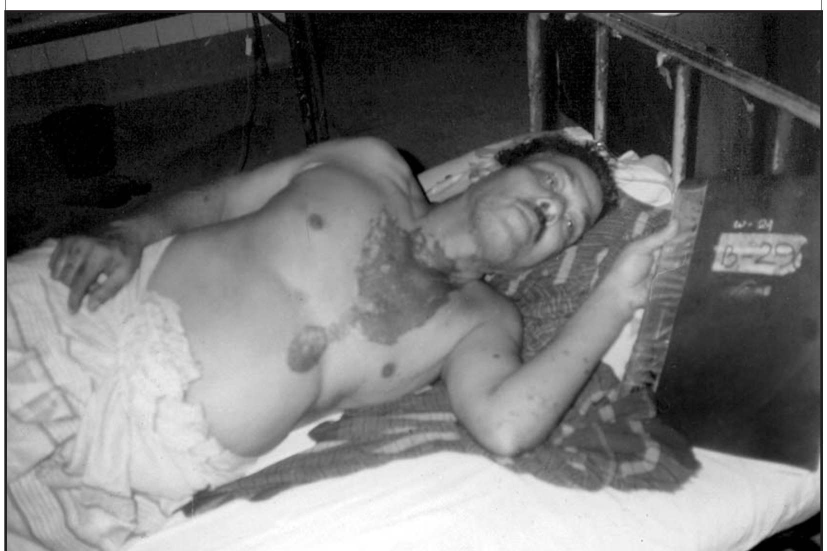
২৮ জানুয়ারি ২০০৪ 'বহুমাত্রিক সংখ্যালঘু নির্যাতন এবং প্রস্তাবিত ব্লাসফেমী আইন' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় উপস্থিত (বাম থেকে) মওলানা আহমেদ তৌফিক চৌধুরী, শহীদজায়া সালমা হক, ব্যারিস্টার সারা হোসেন, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল



মে ২০০৪ মৌলবাদী বাংলাভাই ক্যাডারদের নৃশংস হামলায় আহত নওগাঁর আত্রাই ভোপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের তিলাবদুয়ী গ্রামের দিলীপ কুমার মণ্ডল



২৫ মে ২০০৫ পার্বতীপুরে ঘরবাড়ি থেকে উৎখাত হওয়া আদিবাসীরা



৭ জুন ২০০৫ এসিডদগ্ধ বাবুল শীল



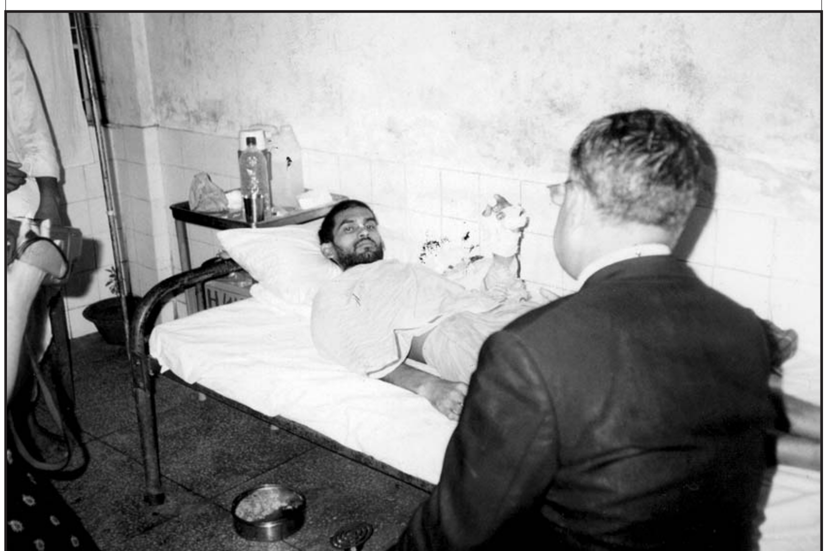
৩ জুন ২০০৫ আনোয়ারার পাটনীকোঠায় বাসন্তীমন্দিরে সন্ত্রাসীদের হামলায় ভাঙ্গা প্রতিমা   সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে পূজা মণ্ডপে কালো পতাকা টানিয়ে রাখা হয়   স্থানীয় কথিত এক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের নির্দেশে এই হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ রয়েছে



১২ জুন ২০০৫ সন্ত্রাসীদের হামলায় নিহত খুকী দাশ



চট্টগ্রামের আনোয়ারা পাটনীকোঠা বাসন্তীমন্দিরে হামলার প্রতিবাদে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ২০০৫ সালের জুনে



হবিগঞ্জে নরসিংহ জিউর আখড়ার সেবায়েত উদয়পৌর দাস্ব ২০০৪-এর ২৭ জুলাই জোট সন্ত্রাসীরা আশ্রমটি দখল করে এই সেবায়েতকে গুরুতর আহত করে



১২ জুন ২০০৫ বাঁশখালীতে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের কবলে ধর্ষণের শিকার চলিশোর্ধ মিনা রানী সরকার



২ অক্টোবর ২০০৪ বগুড়ার বিশিষ্ট সাংবাদিক দীপঙ্কর চক্রবর্তীর দেহ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন মাথা। রাতে অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে নিশংসভাবে ধারালো অস্ত্র দিয়ে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। ইনসেটে সাংবাদিক দীপঙ্কর চক্রবর্তী



নিহত সাংবাদিক দীপঙ্কর চক্রবর্তীর স্ত্রী অঞ্জনা চক্রবর্তীর আহাজারিতে ভারী হয়ে উঠেছে পরিবেশ। প্রভুভক্ত কুকুরটিও যেন শোকে কাতর



৩ অক্টোবর ২০০৪ বগুড়ার শেরপুরে নিহত সাংবাদিক ও বগুড়া শাখা একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নেতা সাংবাদিক দীপঙ্কর চক্রবর্তীর শবদেহে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল



সাংবাদিক দীপঙ্কর চক্রবর্তীর হত্যার প্রতিবাদে বগুড়াসহ উত্তরাঞ্চলের সাংবাদিকদের যৌথ মিছিল



সাংবাদিক দীপঙ্কর হত্যার বিচার দাবীতে বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ শেরপুর শাখা ভবানীপুর মন্দিরে কালো ব্যানার টানিয়ে খুনীদের ফাঁসী দাবি করে



২৫ অক্টোবর ২০০৪ বগুড়ার শেরপুরে নিহত সাংবাদিক দীপঙ্কর চক্রবর্তীর বাড়ীতে তাঁর শোকাহত স্ত্রী অঞ্জনা চক্রবর্তীর হাতে ৩০ হাজার টাকা তুলে দেন লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির। এ সময় তাঁর পাশে (ডানে) প্রবীণ সাংবাদিক মুহম্মদ আব্দুল মতীন এবং (সর্ববামে) ডাক্তর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী ও পিছনে সাংবাদিক আবুল হোসেন খোকন, মাঝে অঞ্জনা চক্রবর্তীর পিছনে তার পুত্র পার্থ ও শেরপুরের সাংবাদিক সুজিত



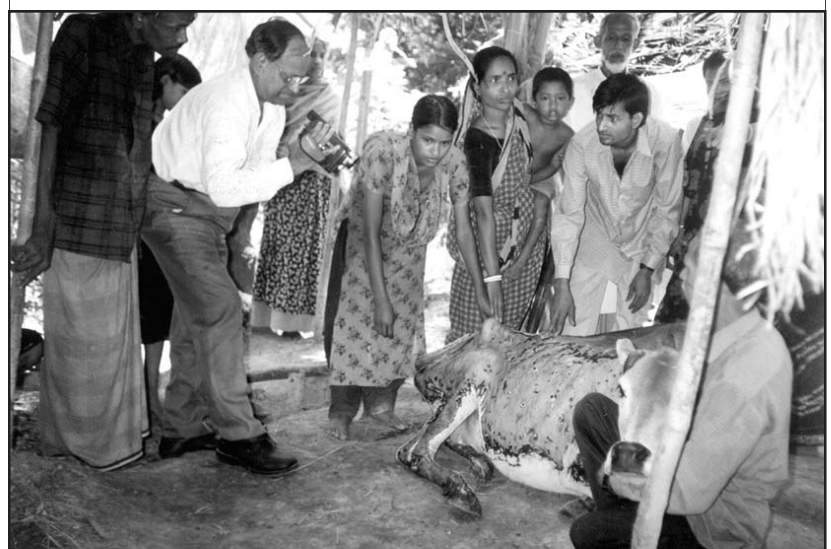
২৫ অক্টোবর ২০০৪ সাংবাদিক দীপঙ্কর চক্রবর্তীর নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি বগুড়া শাখা আয়োজিত বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখছেন নির্মূল কমিটির উপদেষ্টা বিচারপতি কে এম সোবহান মঞ্চে উপবিষ্ট ভারপ্রাপ্ত সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, বগুড়া শাখার উপদেষ্টা মুহম্মদ আবদুল মতীন, এডভোকেট শামসুল আবেদীন সোনা ও প্রবীণ সাংবাদিক যাহেদুর রহমান যাদু



২৫ অক্টোবর ২০০৪ সাংবাদিক দীপঙ্কর চক্রবর্তীর নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি বগুড়া শাখা আয়োজিত বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখছেন নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির



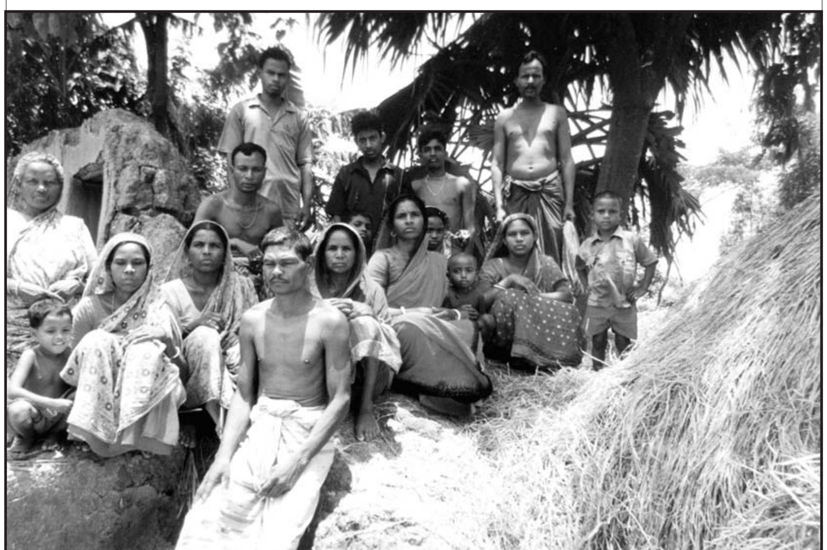
২০০৪ সালের নবেম্বরে শরীয়তপুর জেলার মসীয়ার গ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার এক সংখ্যালঘুর বাড়ি



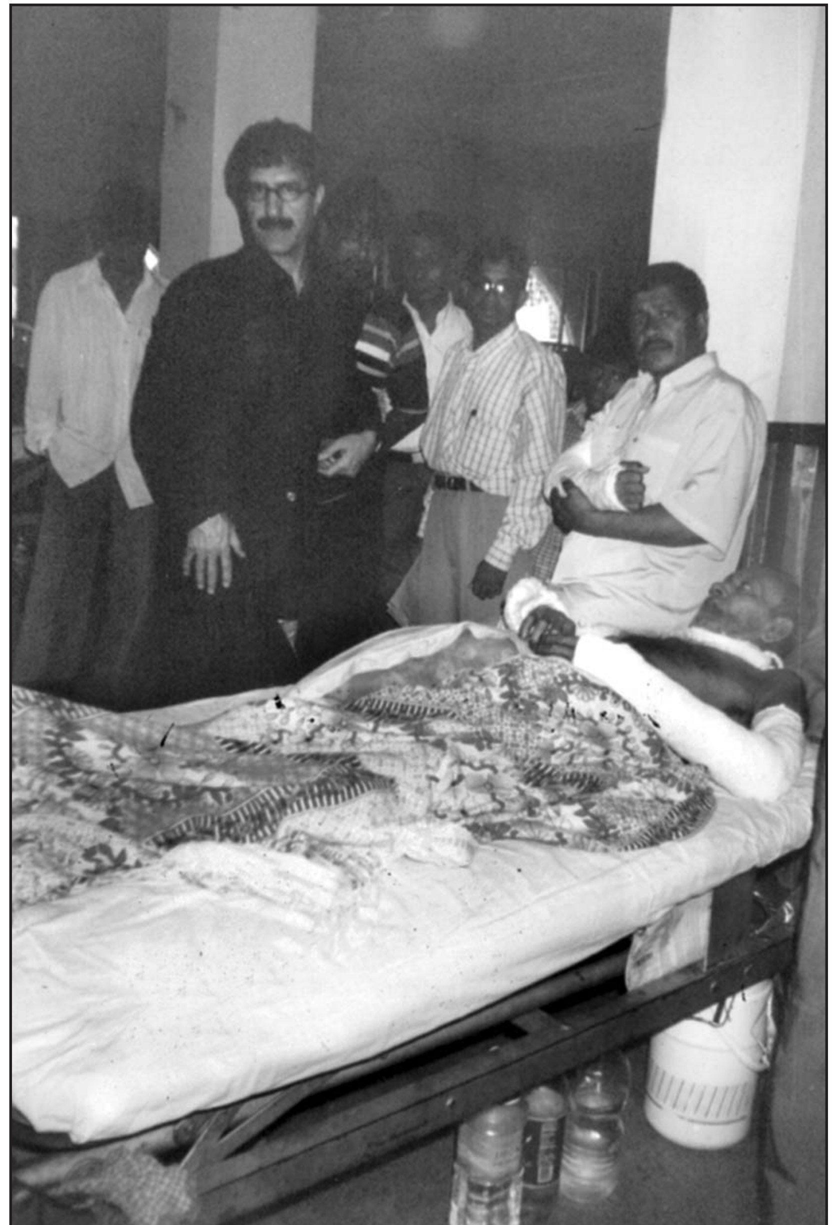
২০০৪ সালের নবেম্বরে শরিয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ থানার মসীয়ার গ্রামে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের হামলা থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গরুও রেহাই পায়নি সন্ত্রাসীরা গরুটিকে আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে ছবি ধারণ করছেন মানবাধিকার নেতা এডভোকেট রবীন্দ্র ঘোষ



২০০৪ সালের নবেম্বরে শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ থানার মসীয়ের গ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার এক সংখ্যালঘুকে দেখতে যান মানবাধিকার নেতা এডভোকেট রবীন্দ্র ঘোষ



২০০৪ এর ডিসেম্বরে আত্রাই রানীনগরে বাংলাভাই ক্যাডারদের সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার আদিবাসীরা



২০০৪ এর ডিসেম্বরে পাবনার চাটমোহরে সাম্প্রদায়িক হামলায় আহত সুবল মণ্ডলকে দেখতে যান এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের প্রধান আব্বাস ফয়েজ

সংখ্যালঘু নির্যাতন
১৬টি দৈনিকের সংবাদ শিরোনাম

১৫ জুলাই ২০০১ - ২৫ আগস্ট ২০০৫

জুলাই ২০০১

১. পটিয়ায় ১ জনকে পিটিয়ে হত্যা, *প্রথম আলো*, *১৬ জুলাই ২০০১*
২. আত্রাইয়ে পূজামণ্ডপে সন্ত্রাসী হামলা গ্রেফতার-৪, *প্রথম আলো ১৬ জুলাই ২০০১*
৩. কলাপাড়ায় আবার সন্ত্রাসী নাইস্যা বাহিনীর তৎপরতা শুরু, *সংবাদ*, *২০ জুলাই ২০০১*
৪. বাকেরগঞ্জে একই পরিবারের ৫ জনকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা, *ভোরের কাগজ*, *২২ জুলাই ২০০১*
৫. ঘরে তালা দিয়ে পেট্রল ঢেলে আগুন, বাঁশখালীতে একই পরিবারের চারজন জীবন্ত দগ্ধ, *ভোরের কাগজ*, *২২ জুলাই ২০০১*
৬. স্বরূপকাঠি ও বানারিপাড়ায় সংখ্যালঘু ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে, *প্রথম আলো*, *২২ জুলাই ২০০১*
৭. খাগড়াছড়িতে একজন খুন, *প্রথম আলো*, *২২ জুলাই ২০০১*
৮. বাঁশখালীতে রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডে মা-মেয়ে ও ২ শিশুসন্তানের মৃত্যু, *প্রথম আলো*, *২২ জুলাই ২০০১*
৯. তালায় ৫ বাড়িতে ডাকাতি, গুলিবিদ্ধ ডাকাত গ্রেফতার, *প্রথম আলো*, *২২ জুলাই ২০০১*
১০. সিলেটে বিয়ের ৪ দিন পূর্বে কনে অপহৃত, *জনকণ্ঠ*, *২৩ জুলাই ২০০১*
১১. নোয়াখালীতে অপহৃত ব্যবসায়ী উদ্ধার, দুই সন্ত্রাসী গ্রুপে সংঘর্ষ, *ভোরের কাগজ*, *২৩ জুলাই ২০০১*
১২. সাতক্ষীরায় দু'রাতে ১০ বাড়িতে ডাকাতি ॥ মালামাল ভাগাভাগি নিয়ে গোলাগুলি, *জনকণ্ঠ*, *২৩ জুলাই ২০০১*
১৩. বাকেরগঞ্জের পল্লীতে অগ্নিদগ্ধ যুবকের হাসপাতালে মৃত্যু, *ভোরের কাগজ*, *২৩ জুলাই ২০০১*
১৪. সিলেটে বিয়ের ৪ দিন পূর্বে কনে অপহৃত, *জনকণ্ঠ*, *২৩ জুলাই ২০০১*
১৫. ৩ সন্তানের জননী ধর্ষিত, *জনকণ্ঠ*, *২৪ জুলাই ২০০১*
১৬. হিন্দু কল্যাণ পরিষদের সংবাদ সম্মেলন, ভোলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন বেড়েছে, *প্রথম আলো*, *২৪ জুলাই ২০০১*
১৭. সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত ৩, জকিগঞ্জে হিন্দু পরিবারের বিয়ের কনেকে ফিল্মি স্টাইলে অপহরণ, *ভোরের কাগজ*, *২৪ জুলাই ২০০১*
১৮. রায়পুরায় সন্ত্রাসী রজু মিয়া ও তার বাহিনীর অত্যাচারে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন পরিবারসহ ১ কলেজ উপাধ্যক্ষ, *সংবাদ*, *২৬ জুলাই ২০০১*
১৯. বরিশালে অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূর মৃত্যু, *ভোরের কাগজ*, *২৬ জুলাই ২০০১*
২০. রাজৈরে দুর্বৃত্তদের এসিডে ঝলসে গেছে এক দম্পতির শরীর, *ভোরের কাগজ*, *২৬ জুলাই ২০০১*
২১. জকিগঞ্জে অপহৃত সংখ্যালঘু কনে শিউলি উদ্ধার, *ভোরের কাগজ*, *২৮ জুলাই ২০০১*
২২. কেশবপুরে সাংবাদিকের হাতের আঙুল কেটে নিয়েছে সন্ত্রাসীরা, *ভোরের কাগজ*, *২৯ জুলাই ২০০১*
২৩. কেশবপুরে সাংবাদিকদের হাত ভেঙে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা, *প্রথম আলো*, *৩০ জুলাই ২০০১*

আগস্ট ২০০১

২৪. যুবলীগ কর্মীকে পিটিয়ে হত্যা ॥ সাতক্ষীরায় থানা ঘেরাও উত্তেজনা, *জনকণ্ঠ*, *১ আগস্ট ২০০১*
২৫. ৭ দোকানে হামলা ও লুট, ফুলগাজীতে বিএনপির দুই ক্যাডারের নেতৃত্বে লুটপাট, *সংবাদ*, *২ আগস্ট ২০০১*
২৬. কলাপাড়ায় দুর্বৃত্তদের হামলা ॥ ধৃত ১ জন আহত ৮ গ্রামবাসী, *সংবাদ*, *২ আগস্ট ২০০১*
২৭. মুন্সীগঞ্জে ৩১ ঘন্টা পর অপহৃত ব্যবসায়ী উদ্ধার, *জনকণ্ঠ*, *২ আগস্ট ২০০১*
২৮. পটুয়াখালী সংবাদ প্রতিনিধির ওপর সন্ত্রাসীদের হামলা, *জনকণ্ঠ*, *২ আগস্ট ২০০১*
২৯. নাটোরের গোপালপুরে উত্তেজনা, হিন্দুদের দোকান ভাঙচুর, *প্রথম আলো*, *২ আগস্ট ২০০১*
৩০. নওগাঁয় আদিবাসী গৃহবধূকে গণধর্ষণ ॥ আসামী গ্রেফতার, *জনকণ্ঠ*, *৩ আগস্ট ২০০১*
৩১. থানা হাজতে রহস্যময় মৃত্যু, ময়নাতদন্তে আত্মহত্যার আলামত কালিগঞ্জে বিক্ষোভ অব্যাহত, *ভোরের কাগজ*, *৩ আগস্ট ২০০১*
৩২. বেগমগঞ্জের পূজামণ্ডপে বিএনপি ক্যাডারদের হামলা গুলিবিদ্ধ ৪, *ভোরের কাগজ*, *৪ আগস্ট ২০০১*
৩৩. নারায়ণগঞ্জ কারাগারে কয়েদির মৃত্যু, *ভোরের কাগজ*, *৪ আগস্ট ২০০১*
৩৪. সংখ্যালঘু এক সাংবাদিকের বাড়ি দখল করেছে সন্ত্রাসীরা প্রাণনাশ ও উৎখাতের হুমকি, *জনকণ্ঠ*, *৫ আগস্ট ২০০১*
৩৫. আজ কালিগঞ্জে সকাল সন্ধ্যা হরতাল, পুলিশ হেফাজতে বিশ্বনাথের হত্যাকারী হিসেবে ওসির অপসারণ দাবি, *প্রথম আলো*, *৫ আগস্ট ২০০১*
৩৬. বাঘায় জামাত-শিবিরের তাণ্ডব, সংখ্যালঘুরা ঘরে ফিরছেন তবে গ্রেফতার হয়নি কেউ, *প্রথম আলো*, *৫ আগস্ট ২০০১*
৩৭. সংখ্যালঘু এক সাংবাদিকের বাড়ি দখল করেছে সন্ত্রাসীরা প্রাণনাশ ও উৎখাতের হুমকি, *জনকণ্ঠ*, *৫ আগস্ট ২০০১*
৩৮. কালিগঞ্জে হাজতে মৃত্যু, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে আত্মহত্যা এলাকায় আজ হরতাল, *ভোরের কাগজ*, *৫ আগস্ট ২০০১*

৩৯. নোয়াখালীর চরে দস্যু শফি বাতান্যা ও রানা বাহিনীর সন্ত্রাস, মহিলারাও নিরাপদ নয়, *ভোরের কাগজ, ৫ আগস্ট ২০০১*
৪০. কার জেল কে খাটছে!, *সংবাদ, ৫ আগস্ট ২০০১*
৪১. বালুখালির ত্রিপুরাপাড়ায় গুলিতে যুবক নিহত, *সংবাদ, ৫ আগস্ট ২০০১*
৪২. সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়নে উদ্বেগ, *সংবাদ, ৫ আগস্ট ২০০১*
৪৩. সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মামলা করায় পটুয়াখালীর 'সংবাদ' প্রতিনিধি ও পরিবার সদস্যদের হুমকি, *সংবাদ, ৬ আগস্ট ২০০১*
৪৪. কালীগঞ্জে পুলিশি নির্যাতনে নিহত বিশ্বনাথ, ময়না তদন্ত রিপোর্ট নিয়ে অসন্তোষ, ফুঁসে উঠছে সবাই, *সংবাদ, ৬ আগস্ট ২০০১*
৪৫. জামাত-শিবির চক্রের হামলা-ভাঙচুর, রাজশাহীর বাঘায় সাংবাদিক ও সংখ্যালঘুরা আতঙ্কে, *সংবাদ, ৭ আগস্ট ২০০১*
৪৬. বাঘায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে জামায়াত শিবির ক্যাডাররা আবার বেপরোয়া, *প্রথম আলো, ৮ আগস্ট ২০০১*
৪৭. নওগাঁয় আদিবাসী গৃহবধূ ধর্ষণ ঘটনায় ১ জন গ্রেফতার, *প্রথম আলো, ৮ আগস্ট ২০০১*
৪৮. চাঁদা না দেয়ায় না'গঞ্জে ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলা ॥ ১২ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট, *জনকণ্ঠ, ৮ আগস্ট ২০০১*
৪৯. দুটি পরিবারের বসতবাড়ি দখল প্রতিবাদকারীরা হুমকির মুখে, *সংবাদ, ৮ আগস্ট ২০০১*
৫০. চাটমোহরে খ্রিস্টান পল্লীতে যুবক খুন, *প্রথম আলো, ৯ আগস্ট ২০০১*
৫১. নারায়ণগঞ্জে স্বর্ণকারের বাসায় হামলা, ২০ ভরি সোনাসহ নগদ টাকা লুট, *ভোরের কাগজ, ১০ আগস্ট ২০০১*
৫২. চাঁদাবাজদের ভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কাঠমিস্ত্রি অমূল্য, *ভোরের কাগজ, ১১ আগস্ট ২০০১*
৫৩. মন্দির ভাঙচুর ও ৫ জনকে পুড়িয়ে মারার প্রতিবাদ, *সংবাদ, ১১ আগস্ট ২০০১*
৫৪. না'গঞ্জে চাঁদা না দেয়ায় বাড়িতে হামলা, সোনা নগদ অর্থ লুট, *সংবাদ, ১১ আগস্ট ২০০১*
৫৫. ভাঙ্গায় সন্ত্রাসীদের অব্যাহত হুমকিতে নিরাপত্তাহীনতায় একটি পরিবার, *ভোরের কাগজ, ১২ আগস্ট ২০০১*
৫৬. অষ্টগ্রামে সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়ি দখল, *সংবাদ, ১২ আগস্ট ২০০১*
৫৭. সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সরেজমিন প্রতিবেদন, ভোলায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলায় ৩০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, *প্রথম আলো, ১৪ আগস্ট ২০০১*
৫৮. শ্বাসরোধ করে যুবক হত্যা, *জনকণ্ঠ, ১৮ আগস্ট ২০০১*
৫৯. ডিমলায় একজনকে হত্যা, *সংবাদ, ১৯ আগস্ট ২০০১*
৬০. মামলা করায়—, *সংবাদ, ১৯ আগস্ট ২০০১*
৬১. ভোলায় উত্তর দিঘলদী ইউনিয়নে ২ বাড়িতে দূর্বৃত্তদের তাণ্ডব, *প্রথম আলো, ২০ আগস্ট ২০০১*
৬২. বগুড়ায় বাড়ি ও নৈশকোচে ডাকাতি, ৪ যাত্রী আহত, *প্রথম আলো, ২০ আগস্ট ২০০১*
৬৩. গোপালগঞ্জে পুকুর থেকে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার, *প্রথম আলো, ২০ আগস্ট ২০০১*
৬৪. শাহজাদপুরের পল্লীতে সন্ত্রাসী হামলায় গৃহবধূ আহত, *ভোরের কাগজ, ২০ আগস্ট ২০০১*
৬৫. ব্যবসায়ীকে অপহরণ, পরে উদ্ধার, *সংবাদ, ২০ আগস্ট ২০০১*
৬৬. পলাশবাড়িতে নৈশ কোচ যাত্রীদের সর্বস্ব লুট, দুপচাঁচিয়ায় ডাকাতি, মালামাল লুট শেষে গৃহকর্তার পুত্রকে অপহরণ, *ভোরের কাগজ, ২১ আগস্ট ২০০১*
৬৭. রাঙ্গামাটিতে শহীদ পরিবার নিগৃহীত, *ভোরের কাগজ, ২১ আগস্ট ২০০১*
৬৮. পুকুর থেকে ১ ব্যক্তির লাশ উদ্ধার, *সংবাদ, ২২ আগস্ট ২০০১*
৬৯. পুরান ঢাকায় ব্যবসায়ী গুলিবিদ্ধ, *প্রথম আলো, ২২ আগস্ট ২০০১*
৭০. গোপালগঞ্জে নিখোঁজ হওয়ার ৪ দিন পর এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার, *ভোরের কাগজ, ২৩ আগস্ট ২০০১*
৭১. রাঙ্গুনিয়ার কদমতলী গ্রামে সংখ্যালঘুদের বাড়িতে চুরি-ডাকাতি আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে, *সংবাদ, ২৪ আগস্ট ২০০১*
৭২. সন্ত্রাসীদের দাপটে ৪ গ্রামের সংখ্যালঘুরা ভয়ভীতিতে কাটাচ্ছে, *সংবাদ, ২৪ আগস্ট ২০০১*
৭৩. বরিশালে নির্বাচনকে সামনে রেখে শুরু হয়েছে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস, *ভোরের কাগজ, ২৫ আগস্ট ২০০১*
৭৪. ফেনীর ভোটচিত্র ঃ সংখ্যালঘুরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে, *সংবাদ, ২৬ আগস্ট ২০০১*
৭৫. ভোলা, সিরাজগঞ্জ, সরিষাবাড়িতে সংঘর্ষে আহত ৬৫, সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা, বিডিআর মোতায়েন, *সংবাদ, ২৬ আগস্ট ২০০১*
৭৬. ফেনীতে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন চলছে, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অভিযোগ, *প্রথম আলো, ২৭ আগস্ট ২০০১*
৭৭. শেরপুর উপজেলার চণ্ডিজান গ্রাম, ধর্ষণকারী চক্র ধর্ষিতাকে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে, *প্রথম আলো, ২৭ আগস্ট ২০০১*
৭৮. ভোটকেন্দ্রে না যেতে হুমকি, যশোরে বৈধ হিন্দু ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার অপচেষ্টা, *প্রথম আলো, ২৭ আগস্ট ২০০১*
৭৯. ফেনীতে সন্ত্রাসীদের হাতে সংখ্যালঘুরা জিম্মি, *ভোরের কাগজ, ২৭ আগস্ট ২০০১*
৮০. লক্ষীপুরের গ্রামে সন্ত্রাসীদের হামলা আহত ২ জন, *সংবাদ, ২৭ আগস্ট ২০০১*
৮১. বিএনপি কর্মীদের হামলায় আহত নড়াইলের দুই যুবলীগ নেতা হাসপাতালে, *ভোরের কাগজ, ২৯ আগস্ট ২০০১*
৮২. কলেজছাত্র অমর চান দাসের সহায়-সম্পত্তি গ্রাসের লক্ষ্যে তাকে দেয়া হচ্ছে প্রাণনাশের হুমকি, *সংবাদ, ২৯ আগস্ট ২০০১*
৮৩. নির্বাচনকে সামনে রেখে রাউজানে সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের রণপ্রস্তুতি ?, *ভোরের কাগজ, ৩০ আগস্ট ২০০১*
৮৪. সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সংবাদ সম্মেলন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর প্রতিক্রিয়াশীল চক্র পরিকল্পিতভাবে নির্যাতন চালাচ্ছে, *ভোরের কাগজ, ৩০ আগস্ট ২০০১*

৮৫. বিভিন্নস্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের প্রতিকার দাবি, *সংবাদ, ৩০ আগস্ট ২০০১*

৮৬. বানারীপাড়ার সংখ্যালঘু ভোটারদের হাল, *জনকণ্ঠ, ৩০ আগস্ট ২০০১*

সেপ্টেম্বর ২০০১

৮৭. বানারীপাড়ার ৪ গ্রামের সংখ্যালঘু ভোটাররা বিচ্ছু বাহিনীর কাছে জিম্মি, *আজকের কাগজ, ১ সেপ্টেম্বর ২০০১*

৮৮. সংবাদ সম্মেলনে প্রতিকারের দাবি ॥ সিলেটের খ্রিস্টান মিশনারির ভূ-সম্পত্তি বিক্রি করে দিচ্ছে কুচক্রী মহল, *আজকের কাগজ, ১ সেপ্টেম্বর ২০০১*

৮৯. কালীমন্দিরে নির্বাচনী অফিস করতে না দেয়ায়, *সংবাদ, ১ সেপ্টেম্বর ২০০১*

৯০. হুমকির মুখে যশোরের সংখ্যালঘু ভোটার, *জনকণ্ঠ, ২ সেপ্টেম্বর ২০০১*

৯১. ঐক্য পরিষদের বিবৃতি, ঢাকা-৬ আসনের সংখ্যালঘু ভোটারদের মির্জা আব্বাস ভুয়া ভোটার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, *ভোরের কাগজ, ৩ সেপ্টেম্বর ২০০১*

৯২. ফেনীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনকারী সন্ত্রাসী গ্রেফতারের দাবি, *প্রথম আলো, ৩ সেপ্টেম্বর ২০০১*

৯৩. নওগাঁ ভূমিহীন আদিবাসীদের উচ্ছেদে সন্ত্রাসী তাণ্ডব, *জনকণ্ঠ, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০০১*

৯৪. জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের স্মারকলিপি প্রদান, ফেনীর গ্রামাঞ্চলে সংখ্যালঘুদের ওপর সন্ত্রাসীদের হামলার অভিযোগ, *প্রথম আলো, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০১*

৯৫. ফেনীতে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভা, অস্ত্র উদ্ধারের নামে মন্দিরের পবিত্রতা ক্ষুন্ন ॥ সাতবাড়িয়ার ২০টি পরিবার গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে, *সংবাদ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০১*

৯৬. রাজধানীতে ৩টি হত্যাকাণ্ড, *সংবাদ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০১*

৯৭. সংবাদ সম্মেলনে প্রতিকারের দাবি, সিলেটের খ্রিস্টান মিশনারির ভূ-সম্পত্তি বিক্রি করে দিচ্ছে কুচক্রী মহল, *আজকের কাগজ, ১ সেপ্টেম্বর ২০০১*

৯৮. গৌরনদীতে বোমায় আহত ছাত্রলীগ নেতার ডান পা কেটে ফেলা হয়েছে, *প্রথম আলো, ৭ সেপ্টেম্বর ২০০১*

৯৯. মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে বিজয়ী করার আহ্বান ॥ সাংবাদিক সম্মেলনে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, *জনকণ্ঠ, ৭ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১০০. জয়পুরহাটে আদিবাসী গ্রামে হামলার প্রতিবাদে বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠনের নিন্দা, *প্রথম আলো, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১০১. চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ রণক্ষেত্র, *প্রথম আলো, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১০২. নিখোঁজ স্কুল ছাত্রীর খোঁজ ৩ দিনেও পাওয়া যায়নি, *সংবাদ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১০৩. সন্ত্রাসী হামলায় দলীয় কর্মী নিহত হওয়ায় হরতাল পালন, সন্দীপে আ.লীগ সমর্থকদের দোকান ভাঙচুর, হিন্দুপাড়ায় হামলা, *ভোরের কাগজ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১০৪. ফুলতলায় গুলি করে ১ ব্যক্তিকে হত্যা, *ভোরের কাগজ, ১০ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১০৫. সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ হেলাল, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তায় প্রশাসনের নিরপেক্ষ হস্তক্ষেপ কামনা, *সংবাদ, ১০ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১০৬. দুর্গাদাস ভট্টাচার্যের নিয়োগ বাতিল ॥ অধ্যাপক মমিন চৌধুরী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়া উপাচার্য, *জনকণ্ঠ, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০০১*

১০৭. সরেজমিন প্রতিবেদন ঃ নির্বাচন এলেই বানারীপাড়ার ৪টি গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিএনপির সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে; তারা সহজে ভোট দিতে পারেনা। ইতোমধ্যে তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে; অনেকেই গ্রাম ছেড়েছে, *দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১০৮. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির শিকার হয়েছি, *সংবাদ, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১০৯. আদিবাসী কিশোরী ধর্ষিত, *সংবাদ, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১১০. ফেনীতে কয়েকটি বাড়িতে সন্ত্রাসীদের হামলা লুটপাট ভাঙচুর, *প্রথম আলো, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১১১. মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ব্যবসায়ীর ফোন ও টাকা নিয়ে গেছে দুস্কৃতকারীরা, *প্রথম আলো, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১১২. বানারীপাড়ায় সংখ্যালঘুদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা নিন ॥ সেমিনার, *জনকণ্ঠ, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১১৩. রাজাপুরে জমি সংক্রান্ত বিরোধে সন্ত্রাসীদের হামলায় দুই মহিলাসহ আহত ৭, *প্রথম আলো, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১১৪. প্রেস ব্রিফিংয়ে সরকারি মুখপত্র, গত দেড় মাসে ৫০৩টি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে মাত্র ১৩টি রাজনৈতিক, *প্রথম আলো, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১১৫. এমএমসির সেমিনারে আশঙ্কা, বানারীপাড়ার সখ্যালঘুরা এবারও ভোট কেন্দ্রে যেতে পারবেন না, *প্রথম আলো, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১১৬. আগৈলঝাড়া গৌরনদীতে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ, *আজকের কাগজ, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১১৭. জমি সংক্রান্ত ঘটনায় রাজাপুরে সন্ত্রাসী হামলায় আহত ৭, *আজকের কাগজ, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১১৮. সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের আমরণ অনশন শুরু, *প্রথম আলো, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১১৯. নির্বাচনী সহিংসতায় আরও একজন নিহত, আহত ৯৩ ॥ অধিকাংশই আওয়ামী লীগের, *জনকণ্ঠ, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১২০. 'মায়েম'-এর নির্বাচন প্রতিবেদন প্রকাশ, মহিলা ও সংখ্যালঘু ভোটারদের মধ্যে এখনো অনিশ্চয়তা রয়েছে, *ভোরের কাগজ, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১২১. মিডিয়া অ্যালায়েন্সের প্রাক-নির্বাচনী পর্যবেক্ষণ, মহিলা ও সংখ্যালঘুদের ভোটদানে অনিশ্চয়তা, উপহার তালিকায় মোবাইল ফোন বোরকা!, *সংবাদ, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১২২. একদিকে সর্বহারাদের অত্যাচার, অন্যদিকে জামাতের হুমকি পিরোজপুরের সংখ্যালঘুদের ভোট দিতে না পারার আশঙ্কা, *প্রথম আলো, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১২৩. নির্বাচনকে সামনে রেখে মিরসরাইয়ে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ, *প্রথম আলো১৪ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১২৪. কচুয়ায় সংখ্যালঘুদের বাড়িতে হামলা, সংঘর্ষে আহত ৪৫, *সংবাদ, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০১*

১২৫. সাতক্ষীরায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জামাতের হামলা ॥ ১৫ নাট্যকর্মী আহত, *আজকের কাগজ, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১২৬. বাগেরহাটসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে সক্রিয় চরমপন্থী সন্ত্রাসীরা, কোন কোন প্রার্থীর পক্ষে ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন করে ভোট চাইতে দেখা যাচ্ছে, *সংবাদ, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০০১*

১২৭. নির্বাচন ॥ হুমকির মুখে সংখ্যালঘুরা !, *জনকণ্ঠ, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১২৮. বরিশালে এমএমসির সেমিনার, বানারীপাড়ার সংখ্যালঘু ভোটারদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন, *ভোরের কাগজ, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১২৯. আত্রাইয়ে চারদলের মিছিলে সাম্প্রদায়িক উস্কানি ॥ বিতণ্ডা হার্ট এ্যাটাকে আওয়ামী লীগ কর্মীর মৃত্যু, *জনকণ্ঠ, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৩০. মহিলা ও সংখ্যালঘুদের ভোটদানে বাধা দিলে গ্রেফতার করুন ॥ প্রধান উপদেষ্টা, *জনকণ্ঠ, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৩১. দক্ষিণ-পশ্চিমে ধর্মব্যবসায়ীদের ব্যাপক তৎপরতা, *জনকণ্ঠ, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৩২. রাজনৈতিক সহিংসতায় কচুয়া উত্তপ্ত, পুলিশ-আ.লীগ-বিএনপি সংঘর্ষে আহত শতাধিক, *ভোরের কাগজ, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৩৩. খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ প্রার্থীর সমর্থকদের গাড়ি বহরে গুলি, নিহত ১ আহত ৩, *ভোরের কাগজ, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৩৪. বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনী সহিংসতা ॥ আহত ৫শ' ভাংচুর লুটপাট অগ্নিসংযোগ সংখ্যালঘুদের হুমকি, *জনকণ্ঠ, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৩৫. দেবিদ্বারে সন্ত্রাসীদের ছুরিকাঘাতে বাবা-মেয়ে নৃশংসভাবে খুন, *ভোরের কাগজ, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৩৬. মঠ বাড়িয়ায় ধানের শীষে ভোট না দিলে সংখ্যালঘুদের প্রাণ নাশের হুমকি দিয়েছে ডাকাতরা, *আজকের কাগজ, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৩৭. দেবিদ্বারে সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা, বাবা-মেয়েকে হত্যা, *সংবাদ, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৩৮. খুলনা-৪ আসন, সংখ্যালঘু ভোটারদের ভয় ভীতি দেখানো হচ্ছে, *সংবাদ, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৩৯. দেবিদ্বারে ডাকাতের হাতে ২ জন খুন, *প্রথম আলো, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৪০. ৫০ জন আইনজীবীর বিবৃতি, দুর্গাদাস ভট্টাচার্যের অপসারণ অবৈধ, *প্রথম আলো, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৪১. সিরাজগঞ্জে আ.লীগের অভিযোগ, সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার করছে চারদলীয় ঐক্যজোট, *প্রথম আলো, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৪২. দেবিদ্বারে ছুরিকাঘাতে বাবা-মেয়ে হত আহত ২, *জনকণ্ঠ, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৪৩. সন্ত্রাসের জনপদ ভোলা— তিনটি আসন ঝুঁকিপূর্ণ, *জনকণ্ঠ, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৪৪. ভোট কেন্দ্রে না যেতে সাঈদী সমর্থকদের হুমকি, পিরোজপুরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটাররা ভীতসন্ত্রস্ত, *সংবাদ, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৪৫. ৩০ বছর ধরে বিরত, চন্দ্রদিঘলিয়া ইউনিয়নের মহিলারা এবার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে, *ভোরের কাগজ, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৪৬. দেবিদ্বারে ছুরিকাহত বৃদ্ধার মৃত্যু, আঁখিই ছিল দুর্বৃত্তদের টার্গেট, *ভোরের কাগজ, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৪৭. রাজধানীতে ২টি হত্যাকাণ্ড, *সংবাদ ২০ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৪৮. কমিশনার ও ডিআইজির সঙ্গে যশোরের হিন্দু নেতৃবৃন্দের মতবিনিময়, *প্রথম আলো, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৪৯. মানিকগঞ্জের গ্রামে কালিমূর্তি ভাংচুর, *জনকণ্ঠ, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৫০. যশোরে সংখ্যালঘু ভোটারদের প্রতি একটি বিশেষ দলের হুমকি আতঙ্ক ॥ আটক ২, *জনকণ্ঠ, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৫১. বাগেরহাট এখন আতঙ্কের জনপদ ॥ বেড়েছে সংঘাত প্রশাসন নির্বিকার, *জনকণ্ঠ, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৫২. খুলনায় দু'টি আসনে ভোটারদের কাছে সাম্প্রদায়িক বক্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে, *জনকণ্ঠ, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৫৩. কচুয়ার গ্রামে গ্রামে বিএনপির সন্ত্রাস, *জনকণ্ঠ, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৫৪. সংখ্যালঘুদের ভোটদানে বিরত রাখতে পরিকল্পিত সন্ত্রাসের নীলনক্সা!, *জনকণ্ঠ, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৫৫. যশোরে স্বাধীনতার পক্ষের প্রার্থীদের হারানোর নীলনক্সা, *জনকণ্ঠ, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৫৬. রাঙ্গুনিয়ায় অস্ত্রের মহড়া ॥ ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ, *জনকণ্ঠ, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৫৭. রাউজানে সাকার অনুগত সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু ভোটারদের ভয় দেখাচ্ছে, *প্রথম আলো, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৫৮. রাউজান রাঙ্গুনিয়ায় সাকা বাহিনীর ত্রাস, পুলিশের ধাওয়া, ফটিকছড়িতে আ.লীগ প্রার্থীর গাড়ি বহরে সন্ত্রাসী হামলা, ৫ পুলিশসহ আহত ২৫, *ভোরের কাগজ, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৫৯. বিএনপি কর্মীদের সন্ত্রাসে কচুয়ার কয়েকটি গ্রাম জনমানবশূন্য ঃ চরম নিরাপত্তাহীনতায় সংখ্যালঘুরা, *ভোরের কাগজ, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৬০. আতঙ্কে সংখ্যালঘুরা ঃ ফেনীতে গুলি করে বাবাকে হত্যা ঃ মেয়েদের ধর্ষণের চেষ্টা, *সংবাদ, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৬১. বরিশালে মাস্তানরা সংখ্যালঘু ভোটারদের ভেতর হয়রানি ও নির্যাতনের রাজত্ব কায়েম করেছে, *বাংলাদেশ অবজারভার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০১*, নগরকান্দায় সাজেদা চৌধুরী, শিবচরে নূরে আলম চৌধুরীর গাড়িতে হামলা ॥ সংখ্যালঘুদের বাড়ি ভাংচুর, *জনকণ্ঠ, ২২ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৬২. নড়াইলের সংখ্যালঘু ও দু'টি আশ্রয়ণ প্রকল্পের ভোটারদের হুমকি দেয়া হচ্ছে, *জনকণ্ঠ, ২২ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৬৩. কুষ্টিয়ায় সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা ॥ গুলিতে হত ১, *জনকণ্ঠ, ২২ সেপ্টেম্বর ২০০১*

১৬৪. পিরোজপুরে সংখ্যালঘুদের প্রতি জামায়াতের হুমকি, *জনকণ্ঠ*, *২২ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৬৫. খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ সদস্য হত ॥ গুলিবিদ্ধ ২, *জনকণ্ঠ*, *২২ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৬৬. বাগেরহাটে সংখ্যালঘুদের বাড়িতে ফের হামলা, আগুন, *জনকণ্ঠ*, *২২ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৬৭. স্বস্তিতে ভোট দেয়া যাবে তো? *জনকণ্ঠ*, *২২ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৬৮. রংপুরের দু'টি আসনের চিত্র ঃ সংখ্যালঘুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুখোশপরা সন্ত্রাসীদের হুমকি, *সংবাদ*, *২৩ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৬৯. ভোলার তিনটি উপজেলার সংখ্যালঘুরা আতঙ্কে, *জনকণ্ঠ*, *২৩ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৭০. বাগের হাটে সংখ্যালঘু পাড়ায় অগ্নিসংযোগের ঘটনায় জেলায় আতঙ্ক, *প্রথম আলো*, *২৩ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৭১. বাগেরহাটে হিন্দুদের মধ্যে চরম আতঙ্ক অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ২৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা ।, *জনকণ্ঠ*, *২৩ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৭২. প্রধান টার্গেট সংখ্যালঘু সম্প্রদায় : বাগেরহাটে ১৫ দিনে একজন নিহত আহত শতাধিক, ২০ ক্যাম্প ভাঙচুর ।, *সংবাদ*, *২৩ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৭৩. নৌকার মিছিলে যোগ দেয়ায় বাড়িঘরে আগুন : বাগেরহাটে উৎকুল গ্রামে বিভীষিকা আতঙ্কে আছে মানুষজন, *ভোরের কাগজ*, *২৩ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৭৪. পটুয়াখালীর দুমকিতে ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন, *আজকের কাগজ*, *২৩ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৭৫. সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন ঃ প্রতিবাদ করার কেউ নেই, *সংবাদ*, *২৪ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৭৬. ভোলা ও ফেনীতে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, *জনকণ্ঠ*, *২৪ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৭৭. পাংশার গ্রামে দুর্গা ও কালীমূর্তি ভাঙচুর, *জনকণ্ঠ*, *২৪ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৭৮. সংখ্যালঘুদের ভোটদানে নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার দাবিতে মানববন্ধন , *সংবাদ*, *২৪ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৭৯. নজিরবিহীন চাপের মুখে সংখ্যালঘু ঃ বরিশালের ৩টি আসন, *প্রথম আলো*, *২৭ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৮০. সরকারি মুখপাত্রের ব্রিফিং, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, *প্রথম আলো*, *২৫ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৮১. নির্বাচনকে সামনে রেখে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনে উদ্বেগ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিবাদ সভা, *প্রথম আলো*, *২৫ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৮২. সংখ্যালঘুরা ভোট দেবে না? নির্যাতন, ভয়ভীতি সর্বত্র, *প্রথম আলো*, *২৫ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৮৩. রংপুরের দুটি আসনে মুখোশধারী সন্ত্রাসীদের তৎপরতা : সংখ্যালঘুদের ভোট কেন্দ্রে না যাওয়ার হুমকি, *সংবাদ*, *২৫ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৮৪. সংখ্যালঘু ভোটাররা চরম আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতায় : এককোটি ভোটারের ভোটাধিকার প্রয়োগ নিয়ে সংশয় : প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশেও তদন্ত হচ্ছে না, *আজকের কাগজ*, *২৬ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৮৫. হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সংবাদ সম্মেলনে নির্যাতনের অভিযোগ : ফেনীর ৯০ হাজার সংখ্যালঘু ভোটার শেষ পর্যন্ত ভোট দিতে পারবে তো? *ভোরের কাগজ*, *২৬ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৮৬. ৭ ভিআইপি প্রার্থী কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে : চট্টগ্রামের ৮টি থানার সংখ্যালঘুদের ভয়ভীতি দেখান হচ্ছে, *সংবাদ*, *২৬ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৮৭. নজিরবিহীন চাপের মুখে সংখ্যালঘু ঃ বরিশালের ৩টি আসন, *প্রথম আলো*, *২৭ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৮৮. সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, তরুণী লাঞ্ছিত, প্রতিমা ভাঙচুর : নির্বাচনী সহিংসতায় নিহত ১, আহত দেড় শতাধিক, *সংবাদ*, *২৮ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৮৯. যশোরে সংখ্যালঘুরা সন্ত্রাসী আতঙ্কে, *জনকণ্ঠ*, *২৮ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৯০. কচুয়ায় সংখ্যালঘুরা ভোট প্রদানে নিরাপত্তা চায়, *ইত্তেফাক*, *২৮ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৯১. শ্যামনগরে আতঙ্ক কাটেনি : সংখ্যালঘু পরিবারের তিন কিশোরী লাঞ্ছিত-অনেকেই এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে, *জনকণ্ঠ*, *২৮ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৯২. সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে মানববন্ধন, *প্রথম আলো*, *২৮ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৯৩. 'নির্বাচনের প্রেক্ষিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার'— অভিমত, *প্রথম আলো*, *২৮ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৯৪. নির্বাচন সামনে রেখে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বন্ধের আহ্বান । হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, *প্রথম আলো*, *২৮ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৯৫. নির্বাচন কে সামনে রেখে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বন্ধের আহ্বান ॥ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, *প্রথম আলো*, *২৭ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৯৬. প্রধান কর্মকর্তার ব্রিফিং ঃ সংখ্যালঘুদের ভোটদান নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, *প্রথম আলো*, *২৯ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৯৭. পাবনা শেরপুর সাতক্ষীরা নেত্রকোনা রাজবাড়ীতে ঃ সংখ্যালঘুদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা, *প্রথম আলো*, *২৯ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৯৮. কুষ্টিয়া বাগেরহাট পটুয়াখালী নলছিটিতে ঃ সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, প্রতিমা ভাঙচুর, *প্রথম আলো*, *৩০ সেপ্টেম্বর ২০০১*
১৯৯. বাগেরহাট ও ঝালকাঠিতে সংখ্যালঘুদের প্রতি হুমকি- কালীমন্দির ভাঙচুর আহত ৮ গ্রেপ্তার ৩, *আজকের কাগজ*, *৩০ সেপ্টেম্বর ২০০১*
২০০. শেষ মুহূর্তের চট্টগ্রাম : অস্ত্রের ঝনঝনানি শোনা যাচ্ছে দেড় হাজার ক্যাডার প্রস্তুত ১০ লাখ সংখ্যালঘু জিম্মি, *আজকের কাগজ*, *৩০ সেপ্টেম্বর ২০০১*
২০১. দেশছাড়া করার হুমকি : সংখ্যালঘুদের আতঙ্ক কাটেনি, *জনকণ্ঠ*, *৩০ সেপ্টেম্বর ২০০১*
২০২. উখিয়ায় সংখ্যালঘুরা হুমকির সম্মুখীন, *সংবাদ*, *৩০ সেপ্টেম্বর ২০০১*
২০৩. পটুয়াখালীর ৪৫টি গ্রামের সংখ্যালঘু ভোটারদের আতঙ্কগ্রস্ত করা হচ্ছে, *সংবাদ*, *৩০ সেপ্টেম্বর ২০০১*

অক্টোবর ২০০১

২০৪. ভোলায় সংখ্যালঘুদের ওপর চাপ বাড়ছে, *প্রথম আলো, ০১ অক্টোবর ২০০১*

২০৫. নলছিটি গ্রামে ৭ সংখ্যালঘুকে পিটিয়ে আহত : ইলেন ভুট্টোর ৩ সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, *সংবাদ, ০১ অক্টোবর ২০০১*

২০৬. মুন্সীগঞ্জে সংখ্যালঘুদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা : ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার হুমকি, *সংবাদ, ০১ অক্টোবর ২০০১*

২০৭. সংখ্যালঘু পরিস্থিতি : কুমিল্লায় ২জনকে হত্যা, নরসিংদিতে ৫০ বাড়িতে হামলা, *সংবাদ, ০১ অক্টোবর ২০০১*

২০৮. বিএনপির সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের হুমকি দিলেও পুলিশ নীরব-ফয়জুল হক, *প্রথম আলো, ১ অক্টোবর ২০০১*

২০৯. রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহতের সংখ্যা ১৬৩, ৩৩ জেলায় সংখ্যালঘু ভোটাররা হুমকি ও চাপের মুখে, *সংবাদ, ০১ অক্টোবর ২০০১*

২১০. রাউজানে সংখ্যালঘুদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ : ভয়ভীতি প্রদান অব্যাহত, *সংবাদ, ০১ অক্টোবর ২০০১*

২১১. সাতকানিয়ায় সংখ্যালঘুদের ভোটাধিকার হরণ করা হলো যেভাবে, *জনকণ্ঠ, ০১ অক্টোবর ২০০১*

২১২. বানারীপাড়ায় ৪ গ্রামের সংখ্যালঘু ভোটাররা বিচ্ছু বাহিনীর কাছে জিম্মি, *আজকের কাগজ, ০১ অক্টোবর ২০০১*

২১৩. সংখ্যালঘুদের ভোটদানে বাধা, *জনকণ্ঠ, ১ অক্টোবর ২০০১*

২১৪. কুমিল্লায় সংখ্যালঘুদের বাড়িতে বোমা হামলায় হত ২ ॥ আটক আ. লীগ নেতার সেনা হেফাজতে মৃত্যু, *জনকণ্ঠ, ১ অক্টোবর ২০০১*

২১৫. অধ্যাপক সনৎ কুমারের প্রাণনাশের চেষ্টা ॥ দেশব্যাপী নিন্দা ও প্রতিবাদ, *জনকণ্ঠ, ১ অক্টোবর ২০০১*

২১৬. ফেনীতে ঢিলেঢালা নিরাপত্তা ব্যবস্থা ॥ ভোটাদের মধ্যে আতঙ্ক, *জনকণ্ঠ, ১ অক্টোবর ২০০১*

২১৭. বিভিন্ন স্থানে অনিয়ম ও জাল ভোট প্রয়োগ,ব্যালট বাক্স ছিনতাই ঃ ফেনীতে ৬০ হাজার সংখ্যালঘু ভোটার ভোট দিতে পারেনি? প্রশাসনের সহায়তায় হিন্দুদের ভোটকেন্দ্রে যেতে দিতে বাধা, ফেনী-২ ও ৩ আসনে নির্বাচন স্থগিতের দাবি, *ভোরের কাগজ, ২ অক্টোবর ২০০১*

২১৮. সাম্প্রদায়িক অপশক্তি ভয়ভীতি দেখিয়ে সংখ্যালঘুদের ভোটদানে বাধা সৃষ্টি করেছে, *জনকণ্ঠ, ২ অক্টোবর, ২০০১*

২১৯. সিলেটে ১৫ টি সংখ্যালঘু পরিবারের ঘরে তালা। পরে পুলিশের সাহায্য নিয়ে মিছিল করে গিয়ে ভোটদান, *জনকণ্ঠ, ২ অক্টোবর ২০০১*

২২০. সাতকানিয়ায় সংখ্যালঘুদের ভোটাধিকার হরণ করা হলো যেভাবে, *জনকণ্ঠ, ২ অক্টোবর ২০০১*

২২১. খুলনায় জামায়াতের মিছিল থেকে মন্দিরে হামলা-প্রতিমা ভাঙচুর, *মুক্তকণ্ঠ, ৩ অক্টোবর ২০০১*

২২২. পিরোজপুরে জামাত শিবিরের তাণ্ডব, *আজকের কাগজ, ৩ অক্টোবর ২০০১*

২২৩. রাজধানীতে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, *মুক্তকণ্ঠ, ৩ অক্টোবর ২০০১*

২২৪. সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা ভোলাবাসীর আতঙ্ক কাটছে না, *প্রথম আলো, ৩ অক্টোবর ২০০১*

২২৫. সংখ্যালঘুদের ভোটদানে বাধা, *প্রথম আলো, ৩ অক্টোবর ২০০১*

২২৬. পাইকগাছায় ৩টি মন্দিরে হামলা ॥ প্রতিমা ভাংচুর, *জনকণ্ঠ, ৩ অক্টোবর ২০০১*

২২৭. সাতকানিয়ায় সংখ্যালঘুদের ভোটাধিকার করণ করা হলো যেভাবে, *প্রথম আলো, ৪ অক্টোবর ২০০১*

২২৮. নৌকায় ভোট দেওয়ার কারণে, *প্রথম আলো, ৪ অক্টোবর ২০০১*

২২৯. বান্দরবানে বীর বাহাদুর নির্বাচিত : বৌদ্ধ মন্দিরে হামলা চালিয়ে মূর্তি ভাঙচুর করেছে বিএনপি সন্ত্রাসীরা, *আজকের কাগজ, ৪ অক্টোবর ২০০১*

২৩০. মুন্সিগঞ্জ, বাগেরহাট, যশোর, সাতক্ষীরা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং গফরগাঁও থেকে প্রেরিত : নির্বাচনোত্তর সংঘর্ষ, মূল লক্ষ্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আহত ৩৭১, বিএনপি কর্মীরা মীরপুরে নারকীয় আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে, *সংবাদ, ৪ অক্টোবর ২০০১*

২৩১. বরিশালে বিএনপির তাণ্ডব : সংখ্যালঘুদের নির্যাতন হুমকি বাড়িঘরে হামলা ভাংচুর, চলছে দখল পাল্টাদখল, *জনকণ্ঠ, ৪ অক্টোবর ২০০১*

২৩২. হুমকি,নির্যাতন ও বাড়ি ঘরে হামলার অভিযোগ ঃ ভোলার ৪টি আসনের প্রায় এক লাখ সংখ্যালঘু ভোটার ভোট দিতে পারেনি, *ভোরের কাগজ, ৪ অক্টোবর ২০০১*

২৩৩. যশোরে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ॥ ৮ জন আহত, *আজকের কাগজ, ৪ অক্টোবর ২০০১*

২৩৪. নারায়ণগঞ্জে হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলা ॥ গুলিবর্ষণ, *ভোরের কাগজ, ৪ অক্টোবর ২০০১*

২৩৫. সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের বাড়ীতে হামলা, *ইত্তেফাক, ৪ অক্টোবর ২০০১*

২৩৬. কর্মীদের শান্ত রাখতে বিএনপির মাইকিং ভোলায় ॥ আওয়ামী লীগ ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, *প্রথম আলো, ৪ অক্টোবর, ২০০১*

২৩৭. কক্সবাজারে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, প্রাণ ভয়ে ঘর ছাড়া অনেকে, *প্রথম আলো, ৪ অক্টোবর, ২০০১*

২৩৮. উখিয়ায় সংখ্যালঘু পাড়ায় হামলা, *ভোরের কাগজ, ৪ অক্টোবর ২০০১*

২৩৯. নরসিংদীতে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, *আজকের কাগজ, ৪ অক্টোবর ২০০১*

২৪০. বান্দরবানে নৌকায় ভোট দেয়ায় উপজাতীয়দের ওপর হামলা, *জনকণ্ঠ, ৪ অক্টোবর ২০০১*

২৪১. রাষ্ট্রপতির কাছে জাতীয় হিন্দু পরিষদের আবেদন, *সংবাদ, ৪ অক্টোবর ২০০১*

২৪২. কর্মীদের শান্ত রাখতে বিএনপির মাইকিং ভোলায় আওয়ামী লীগ ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, *প্রথম আলো, ৪ অক্টোবর ২০০১*

২৪৩. বরিশালে বিএনপির তাণ্ডব ঃ সংখ্যালঘুদের নির্যাতন হুমকি বাড়িঘরে হামলা ভাঙচুর চলছে দখল পাল্টাদখল, *জনকণ্ঠ, ৪ অক্টোবর ২০০১*

২৪৪. সংখ্যালঘুদের ভোটদানে বাধা দেয়া হয়েছে ॥ ব্রতী'র নির্বাচন পর্যবেক্ষণের প্রাথমিক রিপোর্টে তথ্য, *মুক্তকণ্ঠ, ৪ অক্টোবর ২০০১*

২৪৫. মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলন নেতৃবৃন্দ সংসদ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছেন, *জনকণ্ঠ, ৪ অক্টোবর ২০০১*

২৪৬. মুন্সিগঞ্জ, বাগেরহাট, যশোর, সাতক্ষীরা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং গফরগাঁও থেকে প্রেরিত ঃ নির্বাচনোত্তর সংঘর্ষ, মূল লক্ষ্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আহত ৩৭১, বিএনপি কর্মীরা মীরপুরে নারকীয় আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে, *সংবাদ, ৪ অক্টোবর ২০০১*

২৪৭. বিএনপি জামায়াত সন্ত্রাসীদের হামলায় ৪ আওয়ামী লীগ কর্মী নিহত । সাবেক মন্ত্রী তোফায়েল আহম্মদ এবং সাবেক সাংসদ গোলন্দাজের বাসভবনে হামলা ও লুটপাট, *জনকণ্ঠ, ৫ অক্টোবর ২০০১*

২৪৮. সংখ্যালঘু ও অন্যদলের ওপর হামলাকারীদের গ্রেফতার করুন ॥ আইজিকে মান্নান ভুঁইয়া, *জনকণ্ঠ, ৫ অক্টোবর ২০০১*

২৪৯. সংখ্যালঘু এবং আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের ওপর নির্যাতন সন্ত্রাস অব্যাহত, *জনকণ্ঠ, ৫ অক্টোবর ২০০১*

২৫০. ব্রতীর নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ঃ প্রাথমিক প্রতিবেদন বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে না যেতে হুমকি দেয়া হয়েছে, *সংবাদ, ৫ অক্টোবর ২০০১*

২৫১. সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বেড়েই চলছে নির্বাচন-উত্তর সন্ত্রাস-নিহত ৫, শতাধিক আহত, *সংবাদ, ৫ অক্টোবর ২০০১*

২৫২. সারাদেশে নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতিতে ব্যাপক নৈরাজ্য এবং সংঘাত ও সহিংসতা, আইন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে, সরকার নিষ্ক্রিয় পুলিশ ও সেনাবাহিনী নীরব দর্শক, *সংবাদ, ০৫ অক্টোবর ২০০১*

২৫৩. খুলনার গ্রামে মূর্তি ভাঙা ও নির্মাতাকে লাঞ্ছনার অভিযোগ, *ইত্তেফাক, ০৫ অক্টোবর ২০০১*

২৫৪. ২০ জেলায় আওয়ামী লীগ ও সংখ্যালঘুদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা সংঘর্ষ : নিহত ৯, *প্রথম আলো, ০৫ অক্টোবর ২০০১*

২৫৫. বাগেরহাট জেলার গ্রামগুলো থেকে বহুসংখ্যক হিন্দু ও আওয়ামী লীগ কর্মী এলাকা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে । এ জেলায় গত দুদিনে সন্ত্রাসীদের হাতে ১০ জন আহত ও ২ জন নিহত হয়েছে, *সংবাদ, ০৫ অক্টোবর ২০০১*

২৫৬. গত কয়েক দিনে নাটোর ও নওগাঁয় ১ জন নিহত ও ১০ জন আহত হয়েছে, *সংবাদ, ০৫ অক্টোবর ২০০১*

২৫৭. না' গঞ্জ বরিশাল কুমিল্লায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বাড়িঘর ভাংচুর লুটপাট !! প্রাণভয়ে অন্যত্র আশ্রয়, *জনকণ্ঠ, ৫ অক্টোবর ২০০১*

২৫৮. রাজশাহীতে সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ওপর হামলা হুমকি ঃ অনেকে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে, *জনকণ্ঠ, ৫ অক্টোবর ২০০১*

২৫৯. সংখ্যালঘুদের ওপর এই নির্যাতন এখনই বন্ধ করুন ঃ নির্যাতন, সন্ত্রাসের প্রতিবাদ অব্যাহত, *জনকণ্ঠ, ৬ অক্টোবর ২০০১*

২৬০. সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, সন্ত্রাসের প্রতিবাদ অব্যাহত, *জনকণ্ঠ, ৬ অক্টোবর ২০০১*

২৬১. সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনায় চট্টগ্রামের বিশিষ্ট নাগরিকদের ক্ষোভ, *ভোরের কাগজ, ৬ অক্টোবর, ২০০১*

২৬২. আশুগঞ্জে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার, *ভোরের কাগজ, ৬ অক্টোবর, ২০০১*

২৬৩. ভোলায় সংখ্যালঘুরা আতঙ্কে ঃ মৌলভীবাজারে লুটপাট, সংখ্যালঘু সদস্যদের হুমকি ॥ সাতক্ষীরায় হিন্দু তরুণী ধর্ষিত, *ভোরের কাগজ, ৬ অক্টোবর ২০০১*

২৬৪. বাউফলে আটটি দুর্গা প্রতিমা ভেঙ্গেছে দুর্বৃত্তরা, *ভোরের কাগজ, ৬ অক্টোবর ২০০১*

২৬৫. সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর হামলার নিন্দা-প্রতিবাদ, *সংবাদ, ৬ অক্টোবর ২০০১*

২৬৬. গাজীপুরে সংখ্যালঘুরা আতঙ্কে, *ভোরের কাগজ, ৬ অক্টোবর, ২০০১*

২৬৭. নৌকায় ভোট দেয়ায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের শত শত মানুষ ঘরছাড়া । । প্রাণনাশের হুমকি ॥ বাড়িঘরে হামলা লুটপাট পুলিশ নির্বিকার, *জনকণ্ঠ, ৬ অক্টোবর ২০০১*

২৬৮. নির্বাচনোত্তর তাণ্ডবে আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি ঃ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা লুটপাট চলছে, *জনকণ্ঠ, ৬ অক্টোবর, ২০০১*

২৬৯. বরিশাল শহরে ছাত্রদল ক্যাডারদের তাণ্ডব, স্বরূপকাঠিতে বাড়িঘরে হামলা লুটপাট, সংখ্যালঘুরা পালিয়ে যাচ্ছে, *ভোরের কাগজ, ৬ অক্টোবর, ২০০১*

২৭০. সারাদেশে আ'লীগ নেতা কর্মী হত্যা ও সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদ, *মুক্তকণ্ঠ, ৬ অক্টোবর ২০০১*

২৭১. বিক্রমপুর কেবি ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের উপর হামলা ॥ কলেজ বন্ধ ঘোষনা, *ইত্তেফাক, ৬ অক্টোবর ২০০১*

২৭২. উজিরপুরে সংখ্যালঘুদের ওপর বিএনপির নারকীয় তাণ্ডব চলছে ॥ মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি, তরুণীরা আতঙ্কে ।, *জনকণ্ঠ, ৬ অক্টোবর, ২০০১*

২৭৩. নির্বাচনের পর রাঙ্গুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে সহিংসতা ॥ নির্বাচনের পূর্ব রাত্রে একটি বাড়িতে সন্ত্রাসীদের অগ্নিসংযোগ, *ইত্তেফাক, ৭ অক্টোবর, ২০০১*

২৭৪. নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় সিরাজগঞ্জ নাটোর কালিয়াকৈর ও ঝিনাইদহে ৪ জন নিহত, *ইত্তেফাক, ৭ অক্টোবর, ২০০১*

২৭৫. হিন্দুদের ওপর নির্যাতন বন্ধের আহ্বান, *প্রথম আলো, ৭ অক্টোবর ২০০১*

২৭৬. সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধের দাবি, *প্রথম আলো, ৭ অক্টোবর ২০০১*

২৭৭. নৌকায় ভোট দেয়ায় দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা অব্যাহত, *আজকের কাগজ, ৭ অক্টোবর, ২০০১*

২৭৮. দেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ সমর্থক ও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা অব্যাহত, *প্রথম আলো, ৭ অক্টোবর, ২০০১*

২৭৯. বিএনপি ও মৌলবাদী সমর্থকরা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে ॥ ফরিদপুরের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ওপর হামলা, বাড়িঘরে আগুন, ভাংচুর, *আজকের কাগজ, ৭ অক্টোবর, ২০০১*

২৮০. কলাপাড়া প্রেসক্লাবে আওয়ামী লীগের সংবাদ সম্মেলন ॥ বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ সমর্থক ও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা,বাড়িতে অগ্নিসংযোগ গবাদি পশু ও গাছপালা কেটে নেয়ার অভিযোগ, *আজকের কাগজ,৭ অক্টোবর, ২০০১*

২৮১. হামলা লুটপাট অগ্নিসংযোগ চলছেই ॥ কুমিল্লার গ্রামে গ্রামে সন্ত্রাস, *প্রথম আলো, ৭ অক্টোবর ২০০১*

২৮২. সহিংসতায় পাঁচ জেলায় পাঁচজন নিহত : সংখ্যালঘুরা আতঙ্কে, *যুগান্তর*, *৭ অক্টোবর ২০০১*

২৮৩. সাঈদীর এলাকা এখন বিপজ্জনক জনপদ ॥ আগুন দেয়া হচ্ছে সংখ্যালঘুর বাড়িতে, *জনকণ্ঠ*, *৭ অক্টোবর ২০০১*

২৮৪. আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন চলছেই ॥ প্রাণনাশের হুমকি ।। মানুষ আতঙ্কিত, *জনকণ্ঠ*, *৭ অক্টোবর ২০০১*

২৮৫. নির্বাচনোত্তর সংঘর্ষে আরও ৮ জন নিহত সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা অব্যাহত । সর্বত্রই পুলিশ নীরব ॥ রাজধানীর ঝোলাপট্টিতে ২শ' পরিবার উচ্ছেদ, *জনকণ্ঠ*, *৭ অক্টোবর ২০০১*

২৮৬. নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় পিরোজপুরে শতাধিক লোক আহত ॥ অনেকে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছে, *সংবাদ*, *৭ অক্টোবর ২০০১*

২৮৭. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের জন্য সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা হচ্ছে —মহিলা পরিষদ, *মুক্তকণ্ঠ*, *৮ অক্টোবর ২০০১*

২৮৮. সংখ্যালঘুদের ওপর হামলাকারীদের রুখে দাঁড়ান—সিপিবি, *মুক্তকণ্ঠ*, *৮ অক্টোবর ২০০১*

২৮৯. নির্যাতন বন্ধে কঠোর নির্দেশ, *প্রথম আলো*, *৮ অক্টোবর ২০০১*

২৯০. দিনাজপুরের গ্রামে সংখ্যালঘুদের ওপর বর্বরোচিত হামলা— শ্লীলতাহানি অনেকে প্রাণভয়ে দেশ ছেড়েছে, *জনকণ্ঠ*, *৮ অক্টোবর ২০০১*

২৯১. দেশে এবার দুর্গাপূজা হবে কি?, *জনকণ্ঠ*, *৮ অক্টোবর ২০০১*

২৯২. নারী প্রগতি সংঘ ঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিভীষিকার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, *জনকণ্ঠ*, *৮ অক্টোবর ২০০১*

২৯৩. সুপরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ঃ লুটতরাজ ও নারী নির্যাতন করা হচ্ছে ॥ বঙ্গবন্ধু পরিষদ, *জনকণ্ঠ*, *৮ অক্টোবর ২০০১*

২৯৪. আরও ৫ আওয়ামী লীগ কর্মীকে হত্যা ঃ সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা নির্যাতন চলছেই, *জনকণ্ঠ*, *৮ অক্টোবর ২০০১*

২৯৫. গাজীপুরে বিএনপি ক্যাডারের সন্ত্রাসের রাজত্ব॥ বহু সংখ্যালঘু পরিবার ঘরছাড়া—জনমনে চরম আতঙ্ক ॥ সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ, *জনকণ্ঠ*, *৮ অক্টোবর ২০০১*

২৯৬. স্বরূপকাঠিতে বিএনপির সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি আওয়ামী লীগ কর্মী -সমর্থক ও সংখ্যালঘুরা ॥ চলছে বাড়িঘর ভাংচুর লুটপাট চাঁদাবাজি ও নির্যাতন, *জনকণ্ঠ*, *৮ অক্টোবর ২০০১*

২৯৭. বান্দরবানে সংখ্যালঘুদের জবাই করার হুমকি, *জনকণ্ঠ*, *৮ অক্টোবর ২০০১*

২৯৮. নির্বাচনোত্তর জিঘাংসা ॥ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী প্রবীণ শিক্ষক সীমাহীন নির্যাতনের শিকার, *জনকণ্ঠ*, *৮ অক্টোবর ২০০১*

২৯৯. বিএনপির শুদ্ধি অভিযানে বরিশালে দুই উপজেলার সংখ্যালঘুরা এলাকা ছেড়েছে, মন্দির ভাংচুর, বাড়িতে আগুন, লুটপাট ॥ তরুণীদের অনেকেই স্কুল-কলেজে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, *জনকণ্ঠ*, *৮ অক্টোবর ২০০১*

৩০০. সরিষাবাড়িতে বিএনপির নির্বাচনোত্তর তাণ্ডব ঃ আ'লীগ নেতা-কর্মী-সমর্থক ও সংখ্যালঘুরা ভয়ে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিচ্ছে, *প্রথম আলো*, *৮ অক্টোবর ২০০১*

৩০১. বিভিন্ন স্থানে আ.লীগ সমর্থক ও সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা ভাংচুর লুটপাট অব্যাহত, *প্রথম আলো*, *৮ অক্টোবর ২০০১*

৩০২. সর্বোচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা হামলা, দখল সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ করতে কঠোর ব্যবস্থার নির্দেশ, *প্রথম আলো*, *৮ অক্টোবর ২০০১*

৩০৩. নারায়ণগঞ্জে দুটি মন্দিরে মুখোশধারীদের গুলি, *যুগান্তর*, *৮ অক্টোবর ২০০১*

৩০৪. মাগুরায় সংখ্যালঘু তিন ছাত্রীকে অপহরণের শাস্তি দাবি করেছে মহিলা পরিষদ, *যুগান্তর*, *৮ অক্টোবর ২০০১*

৩০৫. নির্বাচনোত্তর নারায়ণগঞ্জ ঃ আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বাড়িঘরে হামলা-ভাংচুর-দোকানপাট দখল ॥ অনেক সংখ্যালঘুর আত্মগোপন, *ইত্তেফাক*, *৮ অক্টোবর ২০০১*

৩০৬. সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার প্রতিবাদে সমাবেশ বিবৃতি, *যুগান্তর*, *৮ অক্টোবর ২০০১*

৩০৭. উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক ঃ সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বন্ধের নির্দেশ, *যুগান্তর*, *৮ অক্টোবর ২০০১*

৩০৮. সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা লুটপাট ও ভাঙচুর অব্যাহত, *আজকের কাগজ*, *৮ অক্টোবর ২০০১*

৩০৯. খালেদার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঃ সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধে পদক্ষেপ নিন, *সংবাদ*, *৮ অক্টোবর ২০০১*

৩১০. মিরসরাইয়ে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা, *সংবাদ*, *৮ অক্টোবর ২০০১*

৩১১. ১১ দলের সমাবেশে বক্তারা ঃ সংঘাত ও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা নিয়ন্ত্রণে ॥ তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বিকার, *প্রথম আলো*, *৮ অক্টোবর ২০০১*

৩১২. অব্যাহত সহিংসতায় সংখ্যালঘুদের ভয় ॥ বরিশালে সুযোগ সন্ধানীরা মরিয়া, *মাতৃভূমি*, *৮ অক্টোবর ২০০১*

৩১৩. বাগেরহাটের কয়েকটি গ্রামের সংখ্যালঘুরা বাড়িঘর ছাড়া ঃ সন্ত্রাসী হামলার শিকার, আশ্রয় নিয়েছে মংলার চটের হাটে, *মুক্তকণ্ঠ*, *৮ অক্টোবর ২০০১*

৩১৪. খুলনায় সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার এবং দেশত্যাগের হুমকি-পঞ্চানন বিশ্বাসের সংবাদ সম্মেলন, *মুক্তকণ্ঠ*, *৮ অক্টোবর ২০০১*

৩১৫. আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের ওপর সন্ত্রাসী তাণ্ডব— সংখ্যালঘুরা বলির পাঁঠা ঃ নির্বাচনোত্তর নজিরবিহীন লুটপাট দখল জুলুম, *জনকণ্ঠ*, *৮ অক্টোবর ২০০১*

৩১৬. নির্বাচন-উত্তর নারায়ণগঞ্জ : আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বাড়িঘরে হামলা, ভাঙচুর, দোকানপাট দখল : অনেক সংখ্যালঘুর আত্মগোপন, *ইত্তেফাক*, *০৮ অক্টোবর ২০০১*

৩১৭. আওয়ামী নেতাকর্মী ও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চলছেই প্রশাসন নির্বিকার নেতারাও এলাকা ছেড়েছেন, *জনকণ্ঠ*, *৯ অক্টোবর ২০০১*

৩১৮. সংখ্যালঘুদের ওপর হামলায় উদ্বিগ্ন ১০ নাগরিক, দুষ্কৃতকারী ও সুযোগসন্ধানীদের শনাক্ত করে ব্যবস্থা নিন, *প্রথম আলো*, *৯ অক্টোবর ২০০১*

৩১৯. তিন জেলার ১৫ হাজার আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও সংখ্যালঘু আশ্রয় নিয়েছে কোটালীপাড়ায়, *যুগান্তর*, *১০ অক্টোবর ২০০১*

৩২০. জাসদের বিবৃতি ॥ সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে প্রধান উপদেষ্টার নিস্ক্রিয়তা ক্ষমার অযোগ্য, *ভোরের কাগজ, ১০ অক্টোবর ২০০১*

৩২১. সংখ্যালঘুদের হামলার প্রতিবাদে মহিলা পরিষদের মানববন্ধন, *মুক্তকণ্ঠ, ১০ অক্টোবর ২০০১*

৩২২. অব্যাহত হামলার মুখে উত্তরের অনেক জেলা থেকে সংখ্যালঘুরা দেশত্যাগ করছেন, *প্রথম আলো, ১০ অক্টোবর ২০০১*

৩২৩. অব্যাহত হামলার মুখে উত্তরের অনেক জেলা থেকে সংখ্যালঘু দেশত্যাগ করছে, প্রথম আলো, *১০ অক্টোবর ২০০১*

৩২৪. সহিংসতা রোধ ও সংখ্যালঘুদের জীবনের নিরাপত্তা বিধান করুন - এনজিও নেতৃবৃন্দ, *মুক্তকণ্ঠ, ১০ অক্টোবর ২০০১*

৩২৫. সাভার ও ধামরাইয়ে সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের ওপর নির্যাতন অব্যাহত, *মুক্তকণ্ঠ, ১০ অক্টোবর ২০০১*

৩২৬. মহিলা পরিষদের মানব বন্ধন ঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এক চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, *মুক্তকণ্ঠ, ১০ অক্টোবর ২০০১*

৩২৭. ডেটলাইন কুমিল্লা : আতঙ্কিত জনপদে পালিয়ে বেড়াচ্ছে সংখ্যালঘু পরিবার, *আজকের কাগজ, ১০ অক্টোবর ২০০১*

৩২৮. দেশ জুড়ে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার নির্যাতন অব্যাহত, *আজকের কাগজ, ১০ অক্টোবর ২০০১*

৩২৯. অব্যাহত হামলার মুখে উত্তরের অনেক জেলা থেকে সংখ্যালঘুরা দেশত্যাগ করছেন, *প্রথম আলো, ১০ অক্টোবর ২০০১*

৩৩০. গলাচিপায় অর্ধশতাধিক সংখ্যালঘু পরিবার সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি, *প্রথম আলো, ১০ অক্টোবর ২০০১*

৩৩১. গৌরনদী-আগৈলঝাড়ার চিত্র : ধানের শীষে ভোট দিয়েও সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হচ্ছে, *যুগান্তর, ১০ অক্টোবর ২০০১*

৩৩২. সংখ্যালঘুদের জন্য চনপাড়া এখন আতঙ্কের জনপদ : বিএনপি সন্ত্রাসীদের ভয়ে ঘরছাড়া তরুণরা : মেয়েদের 'তুলে নিয়ে' যাওয়ার হুমকি, *আজকের কাগজ, ১০ অক্টোবর ২০০১*

৩৩৩. মাগুরায় আওয়ামী লীগ কর্মী ও সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ ঃ আহত ৪৫, *ডেইলি স্টার, ১০ অক্টোবর ২০০১*

৩৩৪. ইউরোপীয়ান কমিশন দলের আহ্বান— 'সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে জোরালো ব্যবস্থা নিন', *বাংলাদেশ অবজারভার, ১০ অক্টোবর ২০০১*

৩৩৫. ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির গোলটেবিল বৈঠক ॥ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও সংবিধানের অস্তিত্ব নিয়ে ঘোর সংশয় প্রকাশ, *প্রথম আলো, ১০ অক্টোবর ২০০১*

৩৩৬. পাবনার তিনটি উপজেলায় সংখ্যালঘুরা পালিয়ে যাচ্ছে। নির্যাতন ও লুণ্ঠনের অভিযোগ, *বাংলাদেশ অবজারভার, ১১ অক্টোবর ২০০১*

৩৩৭. কেশবপুরে আওয়ামী লীগ কর্মী ও হিন্দু পরিবারসহ ৫০,০০০ মানুষ অবরুদ্ধ, *অবজারভার, ১১ অক্টোবর ২০০১*

৩৩৮. প্রশাসন নীরব পরিস্থিতির উন্নতি না হলে অনেক সংখ্যালঘুর নীরবে দেশ ছেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা, *জনকণ্ঠ, ১১ অক্টোবর ২০০১*

৩৩৯. ঝিনাইদহে সংখ্যালঘুরা সন্ত্রস্ত, *মাতৃভূমি, ১১ অক্টোবর ২০০১*

৩৪০. কালিয়াকৈরে সংখ্যালঘুরা এলাকা ছাড়া, *মাতৃভূমি, ১১ অক্টোবর ২০০১*

৩৪১. সংখ্যালঘুদের বাড়ি ছাড়ার হুমকি, ডাকাতি, লুটপাট, ধর্ষণ চলছে সমান তালে, *ভোরের কাগজ, ১১ অক্টোবর ২০০১*

৩৪২. বাগেরহাটের মংলায় সংখ্যালঘুদের ওপর বিএনপি সন্ত্রাসীদের হামলায় নিহত ১ চিংড়িঘের ও বাস টার্মিনাল দখল, *আজকের কাগজ, ১১ অক্টোবর ২০০১*

৩৪৩. হিংস্র শ্বাপদের জনপদ ঃ বাগেরহাটে সংখ্যালঘুদের গ্রামগুলো জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুনে, *জনকণ্ঠ, ১১ অক্টোবর ২০০১*

৩৪৪. দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের চিত্র ঃ পরিস্থিতির উন্নতি না হলে অনেক সংখ্যালঘুর নীরবে দেশ ছেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা, *জনকণ্ঠ, ১১ অক্টোবর ২০০১*

৩৪৫. নওগাঁয় নির্বাচনোত্তর সহিংসতা চলছে, নৌকায় ভোট দেয়ায় মহিলারা লাঞ্ছিত প্রতিমা ভাংচুর। প্রশাসন নীরব, *জনকণ্ঠ, ১১ অক্টোবর ২০০১*

৩৪৬. সরেজমিনে নড়াইল ॥ বিএনপি জামায়াতের ক্যাডাররা নৌকার ভোটার খুঁজে হামলা চালাচ্ছে, আহত শতাধিক, অধিকাংশ সংখ্যালঘু, *জনকণ্ঠ, ১১ অক্টোবর ২০০১*

৩৪৭. বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের বাড়িঘরে হামলা লুট ॥ মন্দির ও প্রতিমা ভাংচুর, *জনকণ্ঠ, ১১ অক্টোবর ২০০১*

৩৪৮. সংখ্যালঘু নারী-পুরুষের কোটালীপাড়ায় আশ্রয় গ্রহণ অব্যাহত। নির্যাতনের কাহিনী শুনলেন ডিসি এসপি, *জনকণ্ঠ, ১১ অক্টোবর ২০০১*

৩৪৯. রাউজানের অনেক সংখ্যালঘু পরিবার এখনও খোলা আকাশের নিচে, *জনকণ্ঠ, ১১ অক্টোবর ২০০১*

৩৫০. রাজশাহীতে সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের ওপর হামলা ও হুমকিদান অব্যাহত, *সংবাদ, ১১ অক্টোবর ২০০১*

৩৫১. পরাজিত জোট প্রার্থীর শ্যালকের সন্ত্রাস ঃ সংখ্যালঘুরা ঘরছাড়া, *সংবাদ, ১১ অক্টোবর ২০০১*

৩৫২. নেত্রকোনায় কিশোরী উদ্ধার ৩জন গ্রেফতার, *মাতৃভূমি, ১১ অক্টোবর ২০০১*

৩৫৩. সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা লুটপাট, প্রতিমা ভাংচুর, অপহরণ ॥ ফরিদপুরের নগরকান্দা-ভাঙ্গা, বরগুনার পাথরঘাটা-আমতলী আতঙ্কের জনপদ, *প্রথম আলো, ১১ অক্টোবর ২০০১*

৩৫৪. রাষ্ট্রপতির নির্দেশ, ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিন, *প্রথম আলো, ১১ অক্টোবর ২০০১*

৩৫৫. খালেদাকে মেনন-বিমল, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা-নির্যাতন বন্ধের উদ্যোগ নিন, *প্রথম আলো, ১১ অক্টোবর ২০০১*

৩৫৬. নির্বাচনোত্তর সংঘর্ষঃ নোয়াখালীতে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, নির্যাতন, ভাংচুর, লুট, আহত ২৫, *আজকের কাগজ, ১১ অক্টোবর ২০০১*

৩৫৭. হিংস্র শ্বাপদের জনপদ ॥ রামপালের প্রসাদনগর নলবুনিয়া গ্রাম এখন বিরাণভুমি ॥ সন্ত্রাসীরা সর্বত্র চালাচ্ছে লুট ধর্ষণ নির্যাতন, *জনকণ্ঠ, ১২ অক্টোবর ২০০১*

৩৫৮. নোয়াখালিতে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ঃ নির্যাতন চাঁদাবাজি চলছেই, *জনকণ্ঠ*, ১২ *অক্টোবর* ২০০১

৩৫৯. গোপালগঞ্জ জেলার পুরোটাই যেন আশ্রয়কেন্দ্র ॥ ১৫হাজার আশ্রয় নিয়েছে, আরও আসছে ॥ সন্ত্রাসের মুখে ঘরছাড়া সংখ্যালঘুদের আতঙ্ক কাটেনি, *জনকণ্ঠ*, ১২ *অক্টোবর* ২০০১

৩৬০. গৌরনদীতে এক শিক্ষককে মারধর, *ভোরের কাগজ*, ১২ *অক্টোবর*, ২০০১

৩৬১. কাঠালিয়া পূজামণ্ডপ এলাকা ভাঙচুর, *ভোরের কাগজ*, ১২ *অক্টোবর*, ২০০১

৩৬২. চাঁদপুরে চাঁদা দিয়ে নিজ বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা, *ভোরের কাগজ*, ১২ *অক্টোবর* ২০০১

৩৬৩. কেরানীগঞ্জে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, *ভোরের কাগজ*, ১২ *অক্টোবর* ২০০১

৩৬৪. পিরোজপুরের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিবারগুলো চরম আতঙ্কে ॥ অনেকেই দেশ ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, কোণঠাসা আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরাও গা ঢাকা দিয়েছে, *ভোরের কাগজ*, ১২ *অক্টোবর* ২০০১

৩৬৫. কোটালীপাড়ায় আশ্রিতদের জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ বরিশালে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে, *ভোরের কাগজ*, ১২ *অক্টোবর* ২০০১

৩৬৬. শহীদ মিনারে সচেতন নাগরিক সমাজের সমাবেশ ॥ সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা তদন্তে বিচারবিভাগীয় কমিটি গঠনের দাবি, *ভোরের কাগজ*, ১২ *অক্টোবর* ২০০১

৩৬৭. কোটালীপাড়ায় আশ্রয় গ্রহণ, অগ্নিসংযোগ লুটপাট ধর্ষণের অভিযোগ ॥ দু'টি জেলার ১৫ হাজার সংখ্যালঘু নারী-পুরুষ ঘরছাড়া, *জনকণ্ঠ*, ১২ *অক্টোবর* ২০০১

৩৬৮. রাজশাহীতে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা অব্যাহত, *জনকণ্ঠ*, ১২ *অক্টোবর* ২০০১

৩৬৯. সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করুন।। খুলনায় ১৩ বিশিষ্ট নাগরিকের বিবৃতি, *জনকণ্ঠ*, ১২ *অক্টোবর* ২০০১

৩৭০. সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার প্রতিবাদ জানিয়েছে ফরিদপুর হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ, *জনকণ্ঠ*, ১২ *অক্টোবর* ২০০১

৩৭১. বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গর্বিত ঐতিহ্যকে ধ্বংস করতে চাইছে কোন অশুভ শক্তি, *জনকণ্ঠ*, ১২ *অক্টোবর* ২০০১

৩৭২. সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন অব্যাহত, *সংবাদ*, ১২ *অক্টোবর* ২০০১

৩৭৩. সিরাজগঞ্জে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর মহিলা পোলিং এজেন্ট ধর্ষিত, *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১২ *অক্টোবর* ২০০১

৩৭৪. সরিষাবাড়িতে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও সংখ্যালঘু পরিবার আতঙ্কিত অনেকে গ্রাম ছেড়েছে, *জনকণ্ঠ*, ১২ *অক্টোবর* ২০০১

৩৭৫. বিএনপি দুর্বৃত্তদের হামলায় সংখ্যালঘুরা পলাতক, *ডেইলি স্টার*, ১২ *অক্টোবর* ২০০১

৩৭৬. ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের কাণ্ড ঃ সিরাজগঞ্জে বাড়ীতে চড়াও হয়ে সংখ্যালঘু স্কুলছাত্রী অপহরণ করে ধর্ষণ, *প্রথম আলো*, ১২ *অক্টোবর* ২০০১

৩৭৭. বরগুনা সাতক্ষীরায় সংখ্যালঘু ও আ. লীগ সমর্থকদের ওপর হামলা, *প্রথম আলো*, ১২ *অক্টোবর* ২০০১

৩৭৮. আতঙ্কিত সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ ঃ সাতক্ষীরা সীমান্তে নারী শিশুসহ ৯৯ সংখ্যালঘু বিডিআরের হাতে আটক, *প্রথম আলো*, ১২ *অক্টোবর* ২০০১

৩৭৯. বান্দরবানে খ্রিস্টান পল্লী ছাত্রীনিবাসে ডাকাতি হামলায় আহত ১২, *প্রথম আলো*, ১২ *অক্টোবর* ২০০১

৩৮০. ঘরছাড়া সংখ্যালঘুরা বাড়ি ফিরতে সাহস পাচ্ছেন না, *জনকণ্ঠ*, ১৩ *অক্টোবর* ২০০১

৩৮১. ভৈরবে সংখ্যালঘু ও আ. লীগ সমর্থকদের ওপর হামলা হুমকি, অনেকেই বাড়ীছাড়া, *জনকণ্ঠ*, ১৩ *অক্টোবর* ২০০১

৩৮২. বরিশালের আগৈলঝাড়া থেকে শত শত সংখ্যালঘু মানুষ পালিয়ে গেছে, *ডেইলি স্টার*, ১৩ *অক্টোবর* ২০০১

৩৮৩. সিরাজগঞ্জে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বেড়েই চলেছে ॥ উল্লাপাড়ায় বিএনপি আওয়ামী লীগের সভা ॥ ১৪৪ ধারা জারি, *জনকণ্ঠ*, ১৩ *অক্টোবর* ২০০১

৩৮৪. 'হামলা নির্যাতন করা হচ্ছে না' মর্মে সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে মুচলেকা গ্রহণ, *ভোরের কাগজ*, *জনকণ্ঠ*,১৩ *অক্টোবর* ২০০১

৩৮৫. হিংস্র শ্বাপদের জনপদ ঃ বাগেরহাটের পুণ্যভূমি অপবিত্র করা হয়েছে ॥ সংখ্যালঘুদের গ্রামে চলছে ধর্ষণ লুট, *জনকণ্ঠ*, ১৩ *অক্টোবর* ২০০১

৩৮৬. পুলিশ নিষ্ক্রিয়-নির্বিকার ॥ ভোলায় নির্বাচনোত্তর সহিংসতার শিকার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই, *সংবাদ*, ১৩ *অক্টোবর* ২০০১

৩৮৭. সম্পত্তি দখল, দেশত্যাগে বাধ্য ও আওয়ামী লীগ বিমুখ করা ঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার নেপথ্যে, *জনকণ্ঠ*, ১৩ *অক্টোবর* ২০০১

৩৮৮. সন্ত্রাসীদের অস্ত্রের মহড়া, ১৬ হাজার গারো আতঙ্কে ঃ মধুপুরে আদিবাসী অঞ্চলে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস, *জনকণ্ঠ*, ১৩ *অক্টোবর* ২০০১

৩৮৯. সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের ঘটনায় উপজাতীরা শঙ্কিত, *ভোরের কাগজ*, ১৩ *অক্টোবর* ২০০১

৩৯০. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন ॥ বিভিন্ন দল ও সংগঠনের নিন্দা, *যুগান্তর*, ১৩ *অক্টোবর* ২০০১

৩৯১. সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বন্ধে কঠোর হোন ঃ নতুন সরকারকে ইসি, *ভোরের কাগজ*, ১৩ *অক্টোবর* ২০০১

৩৯২. সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বন্ধের দাবিতে আমরণ অনশন, *সংবাদ*, ১৩ *অক্টোবর* ২০০১

৩৯৩. কোটালীপাড়ায় আশ্রয় গ্রহণকারী সংখ্যালঘুরা বাড়ী ফিরিতে চায় না, *ইত্তেফাক*, ১৩ *অক্টোবর* ২০০১

৩৯৪. ডিসি-এসপিদের আশ্বাস সত্ত্বেও সংখ্যালঘুরা বাড়িঘরে ফিরতে সাহস পাচ্ছে না, *সংবাদ*, ১৩ *অক্টোবর* ২০০১

৩৯৫. সংখ্যালঘু ও আ'লীগ কর্মীদের ওপর হামলা চলছে ঃ ফেনিতে ২ জন নিহত, *সংবাদ*, ১৩ *অক্টোবর* ২০০১

৩৯৬. ১৯টি আদিবাসী পরিবারকে উচ্ছেদের হুমকি ঃ রাজশাহীতে সংখ্যালঘু আ'লীগ কর্মীকে অপহরণ করে হত্যা, *সংবাদ*, ১৩ *অক্টোবর* ২০০১

৩৯৭. সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের বিবৃতি ঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন বন্ধে রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ কামনা, *প্রথম আলো*, ১৩ *অক্টোবর* ২০০১

৩৯৮. নোয়াখালীতে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন ॥ আহত ৩০, *খবর*, ১৩ *অক্টোবর* ২০০১

৩৯৯. সারাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা অব্যাহত, *আজকের কাগজ, ১৩ অক্টোবর ২০০১*

৪০০. উদ্যোগ ব্যর্থ, রামশীলের আশ্রিতদের পুনর্বাসন করতে পারেনি প্রশাসন, *প্রথম আলো, ১৩ অক্টোবর ২০০১*

৪০১. সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা সম্পর্কে বিবিসিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কিছুটা ষড়যন্ত্রমূলক কিছুটা গুজব কিছুটা সত্যও আছে, *প্রথম আলো, ১৩ অক্টোবর ২০০১*

৪০২. সুরঞ্জিত সেন গুপ্তের বিবৃতি, রাষ্ট্রপতির প্রতি বিবেকবান ভূমিকা নেয়ার আহ্বান, *সংবাদ, ১৩ অক্টোবর ২০০১*

৪০৩. রাজনগরে নির্বানোত্তর সহিংসতা ঃ রাজাপুরে এক সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা ও লুট ঃ ১ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবী, *ইত্তেফাক, ১৩ অক্টোবর ২০০১*

৪০৪. সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ করুন, ইউরোপীয় কমিশন, *জনকণ্ঠ, ১৪ অক্টোবর ২০০১*

৪০৫. সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদ, অনশনরত শিক্ষার্থীদের কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়েছে, *প্রথম আলো, ১৪ অক্টোবর ২০০১*

৪০৬. রামশীলের আশ্রিতরা বাড়ি না ফিরে অন্যত্র চলে যাচ্ছে, *প্রথম আলো, ১৪ অক্টোবর ২০০১*

৪০৭. পশ্চিমবঙ্গে জমির দাম বেড়েছে দেড়গুণ সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে সীমান্ত পাড়ি দিচ্ছে সংখ্যালঘুরা, *ভোরের কাগজ, ১৪ অক্টোবর ২০০১*

৪০৮. হিংস্র শ্বাপদের জনপদ ঃ সংখ্যালঘু নির্যাতন-মাছের ঘেরও লুট, *জনকণ্ঠ, ১৪ অক্টোবর ২০০১*

৪০৯. নির্বাচনী সহিংসতা ॥ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সংখ্যালঘুদের পূজা হবে ম্লান নিরানন্দ পরিবেশে, *জনকণ্ঠ, ১৪ অক্টোবর ২০০১*

৪১০. আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় এখন নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের আশ্রয় শিবির ॥ প্রাণভয়ে ঢাকায় ছুটে আসছে সংখ্যালঘুরা ॥ সংখ্যালঘু তরুণীদের জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেই চলছে ॥ বিএনপি ও জামাত-শিবিরের সন্ত্রাসীদের দায়ী করছেন নির্যাতিতরা, *আজকের কাগজ, ১৪ অক্টোবর ২০০১*

৪১১. রাজবাড়ী বাজারে তিন হিন্দু ব্যবসায়ীর দোকানে দুর্ধর্ষ ডাকাতি, *খবর, ১৪ অক্টোবর ২০০১*

৪১২. সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ করুন ॥ ইউরোপীয় কমিশন, *জনকণ্ঠ, ১৪ অক্টোবর ২০০১*

৪১৩. মুক্তিযুদ্ধে নবম সেক্টর সংখ্যালঘু হত্যা ধর্ষণ ॥ সংগ্রাম পরিষদ গঠনের আহ্বান, *জনকণ্ঠ, ১৪ অক্টোবর ২০০১*

৪১৪. চট্টগ্রামের ১৪০জন আইনজীবীর বিবৃতি ॥ সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের নিন্দা মাগুরায় ৩ ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় উদ্বেগ, *সংবাদ, ১৪ অক্টোবর ২০০১*

৪১৫. আতঙ্কিত হয়ে দেশ ত্যাগ!! সাতক্ষীরা সীমান্তে নারী শিশুসহ ৯৯ সংখ্যালঘু বিডিআরের হাতে আটক, *প্রথম আলো, ১৪ অক্টোবর ২০০১*

৪১৬. হিন্দু সম্প্রদায় এবার দুর্গাপূজায় উৎসব করবে না, *মুক্তকণ্ঠ, ১৪ অক্টোবর ২০০১*

৪১৭. চট্টগ্রামে ঐক্য পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত ঃ সংখ্যালঘু বাড়িঘরে হামলা লুটপাটের ক্ষতিপূরণ আদায়ে মামলার প্রস্তুতি, *সংবাদ, ১৪ অক্টোবর ২০০১*

৪১৮. রমনায় ভোলা থেকে আসা শতাধিক সংখ্যালঘুর নির্যাতন বর্ণনা, *সংবাদ, ১৪ অক্টোবর ২০০১*

৪১৯. জয়পুরহাটে মন্দির ভাংচুর, *সংবাদ, ১৪ অক্টোবর ২০০১*

৪২০. সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন—১১দল, *সংবাদ, ১৪ অক্টোবর ২০০১*

৪২১. ভারতে আশ্রয় নিতে শুরু করেছে সংখ্যালঘুরা ॥ সাতক্ষীরা সীমান্ত থেকে ১৪৭ জন আটক, *সংবাদ, ১৪ অক্টোবর ২০০১*

৪২২. সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনায় উদ্বেগ, *সংবাদ, ১৪ অক্টোবর ২০০১*

৪২৩. বাড়িঘর লুট ॥ নারী নির্যাতন ॥ মাতৃভূমি থেকে বের করে দেয়ার পাঁয়তারা ঃ সংখ্যালঘুদের ওপর তাণ্ডব চলছেই ॥ পুলিশ নির্বিকার, *মুক্তকণ্ঠ, ১৪ অক্টোবর ২০০১*

৪২৪. সংখ্যালঘুদের ওপর হামলায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন —ঢাবি শিক্ষক সমিতি, *মুক্তকণ্ঠ, ১৪ অক্টোবর ২০০১*

৪২৫. সিরাজগঞ্জের অধিকাংশ মন্দিরে এ বছর দুর্গাপূজা হবে না, *সংবাদ, ১৪ অক্টোবর ২০০১*

৪২৬. বান্দরবানে খ্রিস্টান পল্লী ছাত্রীনিবাসে ডাকাতি—হামলায় আহত ১২, *প্রথম আলো, ১৪ অক্টোবর ২০০১*

৪২৭. মাকে দেখা হল না সাবলু চক্রবর্তীর, *প্রথম আলো, ১৪ অক্টোবর ২০০১*

৪২৮. ভাঙ্গায় সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর অকথ্য নির্যাতন, *প্রথম আলো, ১৪ অক্টোবর ২০০১*

৪২৯. রাজশাহীতে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামে দল বেঁধে লুটপাট, *প্রথম আলো, ১৪ অক্টোবর ২০০১*

৪৩০. পশ্চিমবঙ্গে জমির দাম বেড়েছে দেড়গুন ॥ সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে সীমান্ত পাড়ি দিচ্ছে সংখ্যালঘুরা, *আজকের কাগজ, ১৪ অক্টোবর ২০০১*

৪৩১. মুন্সীগঞ্জ ও মাগুরায় পাঁচ তরুণীকে ধর্ষণঃ সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, *খবর, ১৪ অক্টোবর ২০০১*

৪৩২. গোপালগঞ্জে আশ্রয় গ্রহণকারী সংখ্যালঘু পরিবারের অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাজীবন ব্যহত হওয়ার আশঙ্কা, *জনকণ্ঠ, ১৪ অক্টোবর ২০০১*

৪৩৩. নাজিরপুরে বিএনপি সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব ঃ হামলার ভয়ে বরগুনা ও যশোর শহরে সংখ্যালঘুদের আশ্রয় গ্রহণ, *প্রথম আলো, ১৫ অক্টোবর ২০০১*

৪৩৪. গৌরীপুরে সংখ্যালঘুদের বাড়ী-ঘরে বিএনপির হামলা ঃ ভৈরব, রাজশাহী ও মাগুরায় সহিংসতা, ওসিসহ ৬০ আহত, *প্রথম আলো, ১৫ অক্টোবর ২০০১*

৪৩৫. ‘চেনা মানুষগুলোই তাদের সর্বনাশ করল’, *জনকণ্ঠ, ১৫ অক্টোবর ২০০১*

৪৩৬. নগরকান্দায় এক সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা ’৭১-এর ঘটনাকেও হার মানিয়েছে, *জনকণ্ঠ, ১৫ অক্টোবর ২০০১*

৪৩৭. নড়াইলের কালিয়া ও নড়াগাতীতে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন অব্যাহত ॥ গোপালগঞ্জে আশ্রিতরা বাড়িঘরে ফিরতে পারছে না, *জনকণ্ঠ, ১৫ অক্টোবর ২০০১*

৪৩৮. ক্রমশঃ অশান্ত হয়ে উঠছে নীলফামারী ॥ পূজা উদ্‌যাপন অনিশ্চিত, *জনকণ্ঠ, ১৫ অক্টোবর ২০০১*

৪৩৯. মানবাধিকার কমিশনের উদ্বেগ, পুলিশের অসহযোগীতাতেই সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বেড়েছে, *প্রথম আলো, ১৫ অক্টোবর ২০০১*

৪৪০. রাজশাহীর বুজরুক কোলায় এখনো আতঙ্ক, সংখ্যালঘুদের আবার হামলার হুমকি দুর্গাপূজা বয়কট করবে এলাকাবাসী, *প্রথম আলো, ১৫ অক্টোবর ২০০১*

৪৪১. সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চলছেই, পিরোজপুরের গ্রামে মন্দির ভাংচুর ॥ বরিশালে মা, মেয়ে, ননদ লাঞ্ছিত, *জনকণ্ঠ, ১৫ অক্টোবর ২০০১*

৪৪২. দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মহিলাদের রাতের ঘুম হারাম ॥ নির্বাচনোত্তর ধর্ষিত ৫০ ঃ সংখ্যালঘু নারী ধর্ষণের উন্মাদনায় মেতেছে সন্ত্রাসীরা, *জনকণ্ঠ, ১৫ অক্টোবর ২০০১*

৪৪৩. নিরাপত্তার আশ্বাস দিলেও নীরব সন্ত্রাসের আশঙ্কা ঃ আগৈলঝাড়ার সংখ্যালঘুরা বাড়ি ফিরতে চায়, *জনকণ্ঠ, ১৫ অক্টোবর ২০০১*

৪৪৪. নড়াইলে নির্বাচনোত্তর সহিংসতা, *সংবাদ, ১৫ অক্টোবর ২০০১*

৪৪৫. সমাবেশ মানববন্ধন অনশন ঃ সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধের দাবিতে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি পেশ, *সংবাদ, ১৫ অক্টোবর ২০০১*

৪৪৬. মিরসরাইয়ে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও নির্যাতন অব্যাহত ॥ পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না, *সংবাদ, ১৫ অক্টোবর ২০০১*

৪৪৭. মতলব ও শাহরাস্তিতে প্রতিমা ভাঙচুর!, *প্রথম আলো, ১৫ অক্টোবর ২০০১*

৪৪৮. নাজিরপুরে বিএনপি সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব ঃ হামলার ভয়ে বরগুনা ও যশোর শহরে সংখ্যালঘুদের আশ্রয় গ্রহণ, *প্রথম আলো, ১৫ অক্টোবর ২০০১*

৪৪৯. সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার প্রতিবাদ রাবি নারায়ণগঞ্জ রাজবাড়িতে মিছিল, *প্রথম আলো, ১৫ অক্টোবর ২০০১*

৪৫০. বেগমগঞ্জে শঙ্কিত সংখ্যালঘুরা ॥ সাদামাটাভাবে পালন হবে দুর্গাপূজা, *আজকের কাগজ, ১৫ অক্টোবর ২০০১*

৪৫১. সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনায় আদালতে মামলা করবে মানবাধিকার সংস্থা, *মুক্তকণ্ঠ, ১৫ অক্টোবর ২০০১*

৪৫২. অবিলম্বে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ঃ কালো পতাকা মিছিলপূর্ব সমাবেশে সেলিম, *মুক্তকণ্ঠ, ১৫ অক্টোবর ২০০১*

৪৫৩. হুমকির মুখে আত্রাইয়ের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ঃ অনেকে এলাকা ছাড়তে শুরু করেছে, *মুক্তকণ্ঠ, ১৫ অক্টোবর ২০০১*

৪৫৪. উখিয়ায় বৌদ্ধ মন্দিরে হামলা ভাংচুর, *যুগান্তর, ১৫ অক্টোবর ২০০১*

৪৫৫. খিলগাঁওয়ে মন্দির জ্বালিয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা, *যুগান্তর, ১৫ অক্টোবর ২০০১*

৪৫৬. বরিশালে এক সংখ্যালঘু পরিবারের ৩ সদস্যার সম্ভ্রমহানি, *ইত্তেফাক, ১৫ অক্টোবর ২০০১*

৪৫৭. ঝালকাঠিতে সংখ্যালঘুদের উপর হামলা থামিতেছে না ॥ মন্দির ভাংচুর ঃ বরগুনায় আশ্রয়ের আশায় ঃ নাজিরপুরের গ্রামে মন্দির দোকান ভাঙচুর, *ইত্তেফাক, ১৫ অক্টোবর ২০০১*

৪৫৮. সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিন—সিপিবি, *সংবাদ, ১৫ অক্টোবর ২০০১*

৪৫৯. সংখ্যালঘু পরিবারে মারধরের অপরাধে বিএনপি নেতা গ্রেফতার, *ডেইলি স্টার, ১৫ অক্টোবর ২০০১*

৪৬০. পিরোজপুর ও চাঁদপুরে পূজা মণ্ডপে হামলা, *ডেইলি স্টার, ১৫ অক্টোবর ২০০১*

৪৬১. সংখ্যালঘু নির্যাতন ঃ পরিবারের তিন নারীর সম্ভ্রম হানি, *প্রথম আলো, ১৫ অক্টোবর ২০০১*

৪৬২. নরসিংদীতে পূজা মণ্ডপে হামলা, আরও কয়েক স্থানে সহিংসতা, *ইত্তেফাক, ১৬ অক্টোবর ২০০১*

৪৬৩. ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের চিত্র ঃ শতাধিক গ্রামে সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব। নিহত ২, আহত ২০০। প্রায় ১০ হাজার লোক বাড়ি ছাড়া।, *ইত্তেফাক ১৬ অক্টোবর ২০০১*

৪৬৪. সংখ্যালঘুরা বিভিন্ন সীমান্ত পথে দেশ ছাড়ছে—, *যুগান্তর, ১৬ অক্টোবর ২০০১*

৪৬৫. সংখ্যালঘু নির্যাতনের ৮০ ভাগ খবর ভিত্তিহীন ঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, শুধু বিএনপি নয়, আ, লীগও আক্রমণ করছে ঃ মান্নান ভুঁইয়া, *সংবাদ, ১৬ অক্টোবর ২০০১*

৪৬৬. সংখ্যালঘুদের উপর হামলা, হত্যা বন্ধ কর— হাসিনা, *ডেইলি স্টার, ১৬ অক্টোবর ২০০১*

৪৬৭. সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা একাত্তরের ভয়াবহতাকেও হার মানিয়েছে, *আজকের কাগজ, ১৬ অক্টোবর ২০০১*

৪৬৮. শঙ্কিত প্রান্তর ফেনী-১ হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর নেমে এসেছে অবর্ণনীয় তাণ্ডব, *মুক্তকণ্ঠ, ১৬ অক্টোবর ২০০১*

৪৬৯. চট্টগ্রামে সংখ্যালঘুদের ওপর উল্টো চাপ ॥ পূজা করতে হবে জাঁকজমকের সঙ্গে, *জনকণ্ঠ, ১৬ অক্টোবর ২০০১*

৪৭০. বাগেরহাটের সন্ত্রাসকবলিত সংখ্যালঘুদের খোঁজখবর নিলেন ১১দল নেতৃবৃন্দ, *জনকণ্ঠ, ১৬ অক্টোবর ২০০১*

৪৭১. বরিশালে সন্ত্রাসী কর্তৃক কিশোরী ধর্ষিত, *ডেইলি স্টার, ১৬ অক্টোবর, ২০০১*

৪৭২. মায়ের সামনে কলেজপড়ুয়া কন্যাকে রাতভর ধর্ষণ ঃ ভাঙ্গায় বর্বরতম নির্যাতনের শিকার হয়েছে এক সংখ্যালঘু পরিবার, *ভোরের কাগজ, ১৬ অক্টোবর ২০০১*

৪৭৩. হিংস্র শ্বাপদের জনপদ ঃ বাগেরহাটের গ্রামে গ্রামে 'এলান' দিয়ে সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়, *জনকণ্ঠ, ১৬ অক্টোবর ২০০১*

৪৭৪. সন্ত্রাসীরা ময়মনসিংহ ও পিরোজপুরে প্রতিমা ভাংচুর করেছে, *জনকণ্ঠ, ১৬ অক্টোবর ২০০১*

৪৭৫. এ পর্যন্ত সীমান্তে ১শ' ৭০ জন আটক ঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ব্যাংক থেকে সংখ্যালঘুদের টাকা তুলে নেয়ার হিড়িক ঃ অনেকে দেশ ত্যাগ করছেন, *জনকণ্ঠ, ১৬ অক্টোবর ২০০১*

৪৭৬. কক্সবাজারে সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসীদের লোলুপ দৃষ্টি এবার বৌদ্ধমন্দিরের জমির উপর— হামলা, ভিক্ষুকে প্রহার, *জনকণ্ঠ, ১৬ অক্টোবর ২০০১*

৪৭৭. দু'শতাধিক সন্ত্রাসীর একযোগে হামলা লুটপাট ঃ সংখ্যালঘুদের আতঙ্কিত জনপদ রাজশাহীর বজরুক পাড়া, *জনকণ্ঠ, ১৬ অক্টোবর ২০০১*

৪৭৮. সিরাজগঞ্জে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা নির্যাতন চাঁদাবাজি চলছেই, *জনকণ্ঠ, ১৬ অক্টোবর ২০০১*

৪৭৯. নৌকায় ভোট দেয়ার কারণে রাজনগরে নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র, *জনকণ্ঠ*, *১৬ অক্টোবর ২০০১*
৪৮০. সিলেটে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন আতঙ্কে রয়েছে, *সংবাদ*, *১৬ অক্টোবর ২০০১*
৪৮১. এই দুর্বৃত্তদের বিচার করবে কে ? রামশীলের আশ্রয়কেন্দ্রে অসংখ্য নির্যাতিত মুখ, *সংবাদ*, *১৬ অক্টোবর ২০০১*
৪৮২. ফেনীতে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা ঃ আহত ৫, গ্রেপ্তার ৩, *প্রথম আলো*, *১৬ অক্টোবর ২০০১*
৪৮৩. বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধের দাবিতে কলকাতায় বিক্ষোভ সমাবেশ, *প্রথম আলো*, *১৬ অক্টোবর ২০০১*
৪৮৪. সরেজমিন-নগরকান্দা ॥ সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা একাত্তরের ভয়াবহতাকেও হার মানিয়েছে, *আজকের কাগজ*, *১৬ অক্টোবর ২০০১*
৪৮৫. বিভিন্ন সংগঠনের বিবৃতি ঃ সংখ্যালঘু ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর হামলার নিন্দা অব্যাহত, *ভোরের কাগজ*, *১৬ অক্টোবর ২০০১*
৪৮৬. নিউইয়র্কে ঐক্য পরিষদের সমাবেশ ঃ যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী সংখ্যালঘুরা জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে অনশন করবে, *ভোরের কাগজ*, *১৬ অক্টোবর ২০০১*
৪৮৭. এক এএসআই ক্লোজ ঃ ঈশ্বরগঞ্জে মন্দিরে হামলা, ৯টি মূর্তি ভাংচুর, *ভোরের কাগজ*, *১৬ অক্টোবর ২০০১*
৪৮৮. সংখ্যালঘুদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাংচুর করায় নেত্রকোনায় বিএনপি-ছাত্রদলের ১০ নেতাকর্মী গ্রেপ্তার, *ভোরের কাগজ*, *১৬ অক্টোবর ২০০১*
৪৮৯. মন্দির পাহারায় থাকা দু'যুবকের ওপর হামলা ঃ ফেনীতে গ্রামবাসীরা ধাওয়া করে বিএনপির ৩ সন্ত্রাসীকে ধরে পুলিশে দিয়েছে, *ভোরের কাগজ*, *১৬ অক্টোবর ২০০১*
৪৯০. মুখোশধারী যুবকদের তাণ্ডব ॥ বান্দরবানে পাহাড়ি তরুণী ধর্ষিত, *ভোরের কাগজ*, *১৬ অক্টোবর ২০০১*
৪৯১. তিনজনের শ্লীলতাহানি ॥ বিএনপি ক্যাডার গ্রেফতার, *ইত্তেফাক*, *১৬ অক্টোবর ২০০১*
৪৯২. আইনজীবীদের প্রতিবাদ সমাবেশ ঃ সন্ত্রাস ও সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধে ব্যর্থ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি, *জনকণ্ঠ*, *১৬ অক্টোবর ২০০১*
৪৯৩. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সামনেই কমলারানী তার বাড়িতে হামলার বিবরণ দিল, *প্রথম আলো*, *১৬ অক্টোবর ২০০১*
৪৯৪. গৌরনদীতে সংখ্যালঘু দুই ভাইকে বেঁধে রেখে তাদের স্ত্রীদের গণধর্ষণ করেছে বিএনপি ক্যাডাররা, *সংবাদ*, *১৬ অক্টোবর ২০০১*
৪৯৫. চাটখিলে আওয়ামী লীগ নেতা অপহৃত : ঈশ্বরগঞ্জে ৯টি প্রতিমা ভাঙচুর, *সংবাদ*, *১৬ অক্টোবর ২০০১*
৪৯৬. ফেনীতে সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের প্রতিবাদে বিভিন্ন সংগঠনের কর্মসূচী, *প্রথম আলো*, *১৬ অক্টোবর ২০০১*
৪৯৭. এক ব্যক্তি গ্রেফতার ॥ বরিশালে এক পরিবারে ৩ নারীর সম্ভ্রমহানির ঘটনায় মামলা, *প্রথম আলো*, *১৬ অক্টোবর ২০০১*
৪৯৮. কালীগঞ্জে তিল্লাগ্রামে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ঃ রেহাই পায়নি অন্ধ বিবেক কুমারও, *প্রথম আলো*, *১৭ অক্টোবর ২০০১*
৪৯৯. বরগুনার ধর্ষিত সংখ্যালঘু কিশোরীকে আইনি সহায়তা দেবে সামাজিক আন্দোলন, *প্রথম আলো*, *১৭ অক্টোবর ২০০১*
৫০০. সংখ্যালঘু কিশোরীর সম্ভ্রমহানি ঃ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করলেন ভাণ্ডার বিএনপি সভাপতি, *প্রথম আলো*, *১৭ অক্টোবর ২০০১*
৫০১. বিএনপি ক্যাডারদের প্রতিহিংসার আগুনে রামশীল ও কোটালীপাড়ার সংখ্যালঘুরা গ্রাম ছাড়ছে ॥ আতঙ্ক কাটছে না, *জনকণ্ঠ*, *১৭ অক্টোবর ২০০১*
৫০২. ঝালকাঠির পূর্ব ফুল্লহার গ্রামে সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত- মামলা তুলে নেয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে সন্ত্রাসীরা, *সংবাদ*, *১৭ অক্টোবর ২০০১*
৫০৩. সংখ্যালঘু এবং উপজাতীয়রা এখনও গভীর আতঙ্কে, *সংবাদ*, *১৭ অক্টোবর ২০০১*
৫০৪. কেশবপুরে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ীঘর তছনছ, ইনডিপেনডেন্ট, *১৭ অক্টোবর ২০০১*
৫০৫. নির্যাতন ধর্ষণ মারপিটের আরও ঘটনা ॥ রাঙ্গামাটিতে আ'লীগ-বিএনপি সংঘর্ষ ঃ সংখ্যালঘুদের আতঙ্ক বাড়ছে ॥ কয়েকটি পূজামণ্ডপে তাণ্ডব, প্রতিমা ভাংচুর, প্রতিবাদে বিক্ষোভ মানববন্ধন, *জনকণ্ঠ*, *১৭ অক্টোবর ২০০১*
৫০৬. নবাবগঞ্জে তিনটি দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর, *জনকণ্ঠ*, *১৭ অক্টোবর ২০০১*
৫০৭. বিএফইউজে ও ডিইউজে'র বিবৃতি ঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা বন্ধে ব্যর্থতায় ক্ষোভ, *মুক্তকণ্ঠ*, *১৭ অক্টোবর ২০০১*
৫০৮. ঈশ্বরগঞ্জে সংখ্যালঘুরা দুর্গাপূজা নিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত, *মুক্তকণ্ঠ*, *১৭ অক্টোবর ২০০১*
৫০৯. হিংস্র শ্বাপদের জনপদ ঃ বাগেরহাটের সংখ্যালঘু গ্রামগুলোতে এবার উৎসবের আমেজ নেই পূজার প্রস্তুতিও নেই, *জনকণ্ঠ*, *১৭ অক্টোবর ২০০১*
৫১০. জামালপুর রংপুর ও নাটোরে প্রতিমা ভাংচুর, মন্দিরে হামলা, *সংবাদ*, *১৭ অক্টোবর ২০০১*
৫১১. বিভিন্ন সংগঠনের আরো বিবৃতি ঃ সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার নিন্দা, *ভোরের কাগজ*, *১৭ অক্টোবর ২০০১*
৫১২. সাম্প্রদায়িকতা রুখে দাঁড়াও— চট্টগ্রামে বিশাল মানববন্ধন, *ভোরের কাগজ*, *১৭ অক্টোবর ২০০১*
৫১৩. সংখ্যালঘুদের গরুবাছুর লুট, *জনকণ্ঠ*, *১৭ অক্টোবর ২০০১*
৫১৪. রাঙ্গামাটির আসাম বস্তির সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগিতেছে, *ইত্তেফাক*, *১৭ অক্টোবর ২০০১*
৫১৫. পাথরঘাটায় ১০টি সংখ্যালঘু পরিবারের উপর নির্যাতনের অভিযোগ, *ইত্তেফাক*, *১৭ অক্টোবর ২০০১*
৫১৬. রায়পুরায় ৪টি মূর্তি ভাংচুর ॥ সংখ্যালঘুরা শংকা ও আতংকে, *খবর*, *১৭ অক্টোবর ২০০১*
৫১৭. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থানা এলাকার সংখ্যালঘুরা বাড়ীঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে, *ডেইলি স্টার*, *১৭ অক্টোবর*, *২০০১*
৫১৮. শঙ্কিত প্রান্তর ফেনী-২ সন্ত্রাসীরা দল বেঁধে আসে, বলে 'টাকা দে, স্বামী-ছেলেদের বের করে দে, না দিলে গুলি করবো', *মুক্তকণ্ঠ*, *১৭ অক্টোবর ২০০১*

৫১৯. লক্ষীপুর উপজেলার অধিকাংশ হিন্দু মন্দিরে দুর্গাপূজা হবে না, *সংবাদ, ১৭ অক্টোবর ২০০১*

৫২০. কেশবপুরে (যশোর) সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর ভাংচুর ও তছনছ, *ইনডিপেনডেন্ট, ১৭ অক্টোবর ২০০১*

৫২১. শাসক দলের কর্মীদের নির্যাতন নিপীড়নে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আতঙ্কে রয়েছে, *ডেইলি স্টার, ১৭ অক্টোবর ২০০১*

৫২২. মাগুরার বিভিন্ন গ্রামের সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ওপর হামলা নির্যাতনের অভিযোগ, *জনকণ্ঠ, ১৭ অক্টোবর ২০০১*

৫২৩. চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের ওপর নির্যাতন বন্ধের দাবি॥ সাংস্কৃতিকর্মীদের সমাবেশ, *জনকণ্ঠ, ১৭ অক্টোবর ২০০১*

৫২৪. সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া ॥ পূজার বাজার ক্রেতা শূন্য, *জনকণ্ঠ, ১৭ অক্টোবর ২০০১*

৫২৫. মান্নান ভূঁইয়ার সাক্ষাৎ, সংখ্যালঘুদের হয়রানি বন্ধের পদক্ষেপ নিতে বলেছেন রাষ্ট্রপতি, *প্রথম আলো, ১৮ অক্টোবর ২০০১*

৫২৬. বিভিন্ন স্থানে নানা সংগঠনের মিছিল সমাবেশ, সংখ্যালঘু ও আ. লীগ সমর্থকদের ওপর হামলা-নির্যাতনের প্রতিবাদ, *প্রথম আলো, ১৮ অক্টোবর ২০০১*

৫২৭. বিভিন্ন সংগঠনের সমাবেশ- বিবৃতি, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বন্ধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দাবি, *প্রথম আলো, ১৮ অক্টোবর ২০০১*

৫২৮. নির্বাচনোত্তর সহিংসতা, উখিয়ার বৌদ্ধমন্দিরে সন্ত্রাসীদের হামলা, *আজাদী, ১৮ অক্টোবর ২০০১*

৫২৯. নড়াগাতিতে সহিংসতাঃ এলাকা জুড়ে চরম আতঙ্ক ঃ পূজা মণ্ডপের মূর্তি ভাঙচুর; সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, চাঁদা দাবি, *ভোরের কাগজ, ১৮ অক্টোবর ২০০১*

৫৩০. সংবাদ সম্মেলনে চট্টগ্রামের পূজা উদ্‌যাপন কমিটি নেতৃবৃন্দ ঃ আমাদের সকল আনন্দ ম্লান হয়ে গেছে দুর্গাপূজা অনাড়ম্বরেই পালিত হবে, *ভোরের কাগজ, ১৮ অক্টোবর ২০০১*

৫৩১. সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ কর ॥ রাষ্ট্রপতির নির্দেশ, *জনকণ্ঠ, ১৮ অক্টোবর ২০০১*

৫৩২. নির্যাতন বন্ধে সংখ্যালঘু কমিশন গঠনের দাবি, *যুগান্তর, ১৮ অক্টোবর ২০০১*

৫৩৩. ফেনীতে খুন সন্ত্রাস চাঁদাবাজি অব্যাহত ঃ হিন্দুদের ওপর চলছে অমানুষিক নির্যাতন ॥ চাঁদা না দিলে দেশ ছাড়ার হুমকি, *মুক্তকণ্ঠ, ১৮ অক্টোবর ২০০১*

৫৩৪. পাথরঘাটায় ১০ সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা নির্যাতন।। কিশোরী ধর্ষিত, *জনকণ্ঠ, ১৮ অক্টোবর ২০০১*

৫৩৫. লালমনিরহাট-কুড়িগ্রাম সীমান্ত দিয়ে অনেক সংখ্যালঘু পরিবার প্রাণের ভয়ে দেশ ছেড়ে যাচ্ছে, *জনকণ্ঠ, ১৮ অক্টোবর ২০০১*

৫৩৬. বাগেরহাটের সংখ্যালঘু গৃহবধূর প্রশ্ন—এত চাপের মধ্যে আমরা কীভাবে থাকব, আমরা শুধু শান্তি চাই, *জনকণ্ঠ, ১৮ অক্টোবর ২০০১*

৫৩৭. ১২ বিশিষ্ট ব্যক্তির বিবৃতি ঃ সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ নিন ॥ ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন দাবি, *জনকণ্ঠ, ১৮ অক্টোবর ২০০১*

৫৩৮. সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদ ঃ ঢাবি শিক্ষকদের মৌন মিছিল, *জনকণ্ঠ, ১৮ অক্টোবর ২০০১*

৫৩৯. বরিশালে দুর্গাপূজা সাড়ম্বরে উদযাপন করতে বিএনপির আপ্রাণ চেষ্টা, হিন্দু সম্প্রদায়ের অনাড়ম্বরভাবে পালনের সিদ্ধান্ত, *জনকণ্ঠ, ১৮ অক্টোবর ২০০১*

৫৪০. পূজাচলাকালীন বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচী পালনের সিদ্ধান্ত ঃ অজানা শঙ্কায় এবারের শারদীয় উৎসব অনেকাংশে ম্লান, *জনকণ্ঠ, ১৮ অক্টোবর ২০০১*

৫৪১. রাজশাহীর ৭ হাজার আদিবাসী সন্ত্রাসী হামলার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে, *জনকণ্ঠ, ১৮ অক্টোবর ২০০১*

৫৪২. বগুড়ার গ্রামে সংখ্যালঘু এক পোস্টমাস্টারকে সপরিবারে উচ্ছেদ ॥ লুটপাট ভাঙচুর, *জনকণ্ঠ, ১৮ অক্টোবর ২০০১*

৫৪৩. আশ্রিতদের আহাজারিতে রামশীলের আকাশ ভারি ! কিছু জিজ্ঞাসা করলেই মানুষ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, *জনকণ্ঠ, ১৮ অক্টোবর ২০০১*

৫৪৪. সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা-নির্যাতনের প্রতিবাদ, *প্রথম আলো, ১৮ অক্টোবর ২০০১*

৫৪৫. বকশিগঞ্জ নলডাঙ্গা রায়পুরা ঈশ্বরগঞ্জে প্রতিমা ভাংচুর, *প্রথম আলো, ১৮ অক্টোবর ২০০১*

৫৪৬. কালীগঞ্জে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ঃ 'বাবারা নাম লিখছ, ছবি নিচ্ছো আমাদের অসুবিধা হবেনা তো?, *প্রথম আলো, ১৮অক্টোবর ২০০১*

৫৪৭. ঝালকাঠিতে সংখ্যালঘুদের বাড়িতে হামলার ঘটনায় একজন গ্রেপ্তার, *প্রথম আলো, ১৮অক্টোবর ২০০১*

৫৪৮. বিভিন্নস্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা মূর্তি ভাংচুর ॥ প্রতিবাদে বিক্ষোভ-মিছিল, *প্রথম আলো, ১৮ অক্টোবর ২০০১*

৫৪৯. ঝালকাঠির রাজপুরের দেউরী পরিবারের ওপর হামলায় ১ জন গ্রেফতার, *আজকের কাগজ, ১৮ অক্টোবর ২০০১*

৫৫০. ৫ তরুণী-মহিলার সম্ভ্রমহানি, বাড়ীঘর ভাংচুর, লুটপাট ঃ প্রতিমন্ত্রীর চাচাতো ভাই পরিচয়ে ৪২টি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর মধ্যরাতে বর্বর হামলা, *খবর, ১৮অক্টোবর ২০০১*

৫৫১. সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামে ২২৫ আইনজীবীর প্রতিবাদ, *জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০১*

৫৫২. সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার প্রতিবাদ করায়-, *জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০১*

৫৫৩. সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে নগরী প্রতিবাদ মুখর ॥ মিছিল সমাবেশে ঘৃণা প্রকাশ, *জনকণ্ঠ, ১৯অক্টোবর ২০০১*

৫৫৪. রামশীলে আশ্রয়গ্রহণকারী হাজার হাজার সংখ্যালঘুর বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ॥ সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি, *জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০১*

৫৫৫. ঢাকা আইনজীবী সমিতির সভা ঃ সংখ্যালঘু নির্যাতনে জড়িতদের গ্রেফতার ও শাস্তি দাবি, *জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০১*

৫৫৬. বগুড়ায় প্রতিমা ভাংচুর, নেত্রকোনায় নাটমন্দিরে লুট, পঞ্চগড়ে এবার অনাড়ম্বর পূজার সিদ্ধান্ত, *জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০১*

৫৫৭. নোয়াখালীর সর্বত্র চলছে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, *জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০১*

৫৫৮. জামালপুরে পূজার আয়োজনে উৎসাহ নেই ॥ বাড়িঘর মন্দিরে হামলা নীরবে চলছে চাঁদাবাজি, *জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০১*

৫৫৯. নীলফামারীতে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ॥ আহত ১০, *জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০১*

৫৬০. সংখ্যালঘুর দুঃখ-দুর্দশার আরো করুন কাহিনী, *ডেইলি স্টার, ১৯ অক্টোবর ২০০১*

৫৬১. প্রতিবাদে প্রতীক অনশন, *জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০১*

৫৬২. চাঁদার দাবিতে নির্যাতন ॥ মামলা না করেও বাঁচতে পারলেন না চরফ্যাশনের ক্ষুদিরাম, *জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০১*

৫৬৩. চট্টগ্রামে পূজা হবে অনাড়ম্বর ॥ অনশন ও মানববন্ধন কর্মসূচী ঘোষণা, *জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০১*

৫৬৪. রায়পুরায় পূজামণ্ডপে মূর্তি ভাঙচুর, *জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০১*

৫৬৫. জীবন মান বাঁচাতে ঘরছাড়া সেইসব মানুষের কথা, *সংবাদ, ১৯ অক্টোবর ২০০১*

৫৬৬. ভাঙ্গায় কলেজ ছাত্রী ধর্ষণ ঃ প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে ঘটনা ভিন্ন খাতে প্রবাহের চেষ্টা, *ভোরের কাগজ, ১৯ অক্টোবর ২০০১*

৫৬৭. পাথরঘাটায় নির্যাতনের শিকার ১০ হিন্দু পরিবার, এক কিশোরী ধর্ষিত, *ভোরের কাগজ, ১৯ অক্টোবর ২০০১*

৫৬৮. সংখ্যালঘু নির্যাতনঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে কুটনীতিকদের উদ্বেগ প্রকাশ, *যুগান্তর, ১৯ অক্টোবর ২০০১*

৫৬৯. সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন: চট্টগ্রামের দুশ'পঁচিশ আইনজীবীর ক্ষোভ, *যুগান্তর, ১৯ অক্টোবর ২০০১*

৫৭০. কালিয়াকৈর উপজেলা ঃ সংখ্যালঘু পরিবারগুলো এখনো বাড়িঘরে ফিরতে পারেনি, *সংবাদ, ১৯ অক্টোবর ২০০১*

৫৭১. নির্বাচনোত্তর সহিংসতা ॥ বাগেরহাটে সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা উদ্‌যাপিত না হওয়ার আশংকা, *সংবাদ, ১৯ অক্টোবর ২০০১*

৫৭২. কালীগঞ্জে ২ সংখ্যালঘুর কাছে ৩ লাখ টাকা চাঁদা দাবি, *প্রথম আলো, ১৯ অক্টোবর ২০০১*

৫৭৩. সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ঃ ঘটনাগুলো অস্বীকার করার জন্য প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক চাপ, *প্রথম আলো, ১৯ অক্টোবর ২০০১*

৫৭৪. সরেজমিন-রাউজান-রাঙ্গুনিয়া-সন্দ্বীপ ঃ নৌকা সমর্থকদের ওপর চলছে নারকীয় নির্যাতন, *আজকের কাগজ, ১৯ অক্টোবর ২০০১*

৫৭৫. মাগুরায় সংখ্যালঘু পল্লীতে হামলার নায়ক বিএনপি নেতা মিজান গ্রেফতার, *প্রথম আলো, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৫৭৬. সংখ্যালঘু নির্যাতনকারীদের বিশেষ ব্যবস্থায় দ্রুত বিচার দাবি, *যুগান্তর, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৫৭৭. নির্বাচন-পরবর্তী সন্ত্রাস, *সংবাদ, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৫৭৮. চাটখিলে অপহরণের ৫ দিন পর শুধাংশুকে উদ্ধার, *যুগান্তর, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৫৭৯. স্বরুপকাঠিতে দোকানিকে কুপিয়ে হত্যা, *যুগান্তর, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৫৮০. দুর্গাপূজা উদযাপনে বিঘ্ন সৃষ্টির চেষ্টা: সূত্রাপুরে উত্তেজনা, *যুগান্তর, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৫৮১. সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন----১১ দল, *যুগান্তর, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৫৮২. সাকা চৌধুরীর নির্দেশ! রাউজানে হিন্দু বসতিতে অগ্নিসংযোগ ব্যবসায়ীকে হুমকি, *ভোরের কাগজ, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৫৮৩. মাধবপুরে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব ঃ মারপিট-লুটপাট, মেয়েরা অবরূদ্ধ, চাঁদা দাবি, *ভোরের কাগজ, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৫৮৪. বরিশালের গৌরনদীতে সরজমিন অনুসন্ধান ঃ যে চিত্র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যকে সমর্থন করে না, *ভোরের কাগজ, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৫৮৫. খুলনা নাটোর লালপুর ব্রাক্ষণবাড়িয়ায় চাঁদাবাজি লুটপাট মারপিট ঃ সংখ্যালঘু নির্যাতন এখনও চলছেই, *জনকণ্ঠ, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৫৮৬. সারা দেশে সংখ্যালঘু ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তির ওপর অব্যাহত নির্যাতনের প্রতিবাদ, *জনকণ্ঠ, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৫৮৭. পূজামণ্ডপে হামলা প্রতিমা ভাংচুর বন্ধ হয়নি ঃ অনাড়ম্বর দুর্গোৎসব পালনের সিদ্ধান্ত, *জনকণ্ঠ, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৫৮৮. নবীনগরে শতাধিক দুর্গামূর্তি অবিক্রীত ॥ কারিগররা বিপাকে, *জনকণ্ঠ, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৫৮৯. এবার চোরাচালানের ঘাট দখল ॥ মোটা টাকার বিনিময়ে ঃ সংখ্যালঘুদের সীমান্ত পার করে দেয়া হচ্ছে, *জনকণ্ঠ, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৫৯০. মোল্লাহাটে সংখ্যালঘুরা সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বেরুতে সাহস পাচ্ছে না ঃ সন্ত্রাসীদের নির্যাতন লুটপাট চলছে, *জনকণ্ঠ, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৫৯১. উল্লাপাড়ার গ্রামে সংখ্যালঘুদের বাড়িতে মুখোশধারীদের গণডাকাতি লুট ॥ মহিলাদের ওপর নির্যাতন, *জনকণ্ঠ, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৫৯২. কটিয়াদীতে সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা ৫ বাড়িতে হামলা চালিয়ে মালামাল লুট করেছে, *সংবাদ, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৫৯৩. বরগুনা জুড়ে দুর্গোৎসব পালন করাতে প্রশাসন যতটা উৎসাহী, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে ততটা নয়, স্থানীয় বিএনপি বলছে, সবই অতিরঞ্জিত, *সংবাদ, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৫৯৪. ফলোআপ ঃ নীলফামারীতে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা তদন্ত করে অবশেষে মামলা গ্রহণ, *প্রথম আলো, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৫৯৫. সরেজমিন ঃ পালিয়ে যাওয়ার পর বাড়ি ফিরতেও সংখ্যালঘুদের টাকা দিতে হচ্ছে, *প্রথম আলো, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৫৯৬. নাটোরের গ্রামে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট, আহত ১০, *প্রথম আলো, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৫৯৭. বুজরুককোলার সংখ্যালঘুদের নিয়ে যা হচ্ছে...., *প্রথম আলো, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৫৯৮. অনাড়ম্বর পূজা উদযাপনের সিদ্ধান্ত ঃ সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিভিন্ন স্থানে সমাবেশ, *প্রথম আলো, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৫৯৯. হিজলায় সংখ্যালঘুর বাড়ী নিশ্চিহ্ন ॥ গৃহবধূ নির্যাতিত, *ইত্তেফাক, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৬০০. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য মানববন্ধন, *ইত্তেফাক, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৬০১. নড়াইলে আওয়ামী লীগ সমর্থক ও হিন্দুদের উপর হামলা ॥ বাড়ীঘর লুটপাট ও চাঁদাবাজি, *ইত্তেফাক, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৬০২. বৃহত্তর নোয়াখালীতে দু'শ বাড়ী লুট ঃ আহত ৫০, *খবর, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৬০৩. সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা ॥ চট্টগ্রামে দুর্গা পূজার সময় প্রতিবাদী কর্মসূচী পালন হবে, *প্রথম আলো, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৬০৪. সাভারে সংখ্যালঘুরা তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, *বাংলা বাজার, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৬০৫. সংখ্যালঘুদের উপর হামলার প্রতিবাদে স্মারকলিপি পেশ আজ মহা অষ্টমী ॥ পূজা পরিষদের সকাল-সন্ধ্যা অনশন কর্মসূচী, *আজাদী, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৬০৬. এমএইএমের প্রতিবেদন, নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, *প্রথম আলো, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৬০৭. বাগের হাটে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, নির্বাচনে পরাজিতরা এখন সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু ধুয়া তুলে চক্রান্তে মেতেছে, *প্রথম আলো, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৬০৮. আদিবাসীদের ওপর হামলা বন্ধ করুন ॥ রাজশাহীতে গণসমাবেশ, *জনকণ্ঠ, ২০ অক্টোবর ২০০১*

৬০৯. সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার প্রতিবাদে সভা-সমাবেশ অব্যাহত, *প্রথম আলো, ২১ অক্টোবর ২০০১*

৬১০. উপদ্রুত এলাকা ঘুরে সচেতন নাগরিকদের অভিমত, সংখ্যালঘু নির্যাতন ঃ সরকার বাস্তবকে আড়াল করছে, *প্রথম আলো, ২১ অক্টোবর ২০০১*

৬১১. সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ॥ দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর, বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ বিক্ষোভ পূজায় উৎসবের আমেজ নেই, *প্রথম আলো, ২১ অক্টোবর ২০০১*

৬১২. ঝিনাইদহে সংখ্যালঘুদের মালিকানাধীন পাঁচটি চালকলে হামলা : চাললুট, *জনকণ্ঠ, ২১ অক্টোবর ২০০১*

৬১৩. আইনজীবীদের প্রতিবাদ সমাবেশ : সংখ্যালঘুদের ওপর সন্ত্রাস বন্ধে ব্যর্থতা ঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী, *জনকণ্ঠ, ২১ অক্টোবর ২০০১*

৬১৪. 'ভোট'-এর সংবাদ সম্মেলনে তথ্য উপস্থাপন— সারা দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের ব্যাপকতা '৭১ সালকেও হার মানিয়েছে, *ভোরের কাগজ, ২১ অক্টোবর ২০০১*

৬১৫. সরেজমিন বাগেরহাট ঃ সংখ্যালঘুরা সন্ত্রস্ত এখনো ॥ তরুণরা ঘরে ফেরেনি, তরুণীরা গৃহবন্দিঃ ছাত্র-ছাত্রীরা ভয়ে স্কুল-কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, *আজকের কাগজ, ২১ অক্টোবর ২০০১*

৬১৬. নগরকান্দায় মন্দিরে আগুন, দুর্গাপ্রতিমা ভাংচুর ৬ জন আটক, *আজকের কাগজ, ২১ অক্টোবর ২০০১*

৬১৭. সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিক্রিয়া ঃ সংখ্যালঘুদের আস্থায় ফেরানো না গেলে দেশত্যাগ অনিবার্য, *জনকণ্ঠ, ২১ অক্টোবর ২০০১*

৬১৮. রাজশাহী জেলা জুড়ে আ'লীগ নেতা-কর্মী, আদিবাসী ও সংখ্যালঘুদের ওপর চলছে নির্মম নির্যাতন, *সংবাদ, ২১ অক্টোবর ২০০১*

৬১৯. সুনামগঞ্জে বন্ধুকধারীদের গুলীতে ২ আদিবাসীসহ নিহত ৩, *প্রথম আলো, ২১ অক্টোবর ২০০১*

৬২০. মধ্যযুগীয় বর্বরতা ঃ সংখ্যালঘু নির্যাতনের চিত্র, *জনকণ্ঠ, ২১ অক্টোবর ২০০১*

৬২১. রামশীলেই নয় মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামেও শত শত সংখ্যালঘু পরিবার আশ্রয় নিয়েছে, *জনকণ্ঠ, ২১ অক্টোবর ২০০১*

৬২২. শরীয়তপুর গলাচিপা ও চলনবিল এলাকায় সংখ্যালঘু নির্যাতন অব্যাহত, *জনকণ্ঠ, ২১ অক্টোবর ২০০১*

৬২৩. পূর্ণিমার ঘটনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা, *সংবাদ, ২১ অক্টোবর ২০০১*

৬২৪. আমার মতো কেউ যেন অত্যাচারের শিকার না হয় ঃ পূর্ণিমা, *সংবাদ, ২১ অক্টোবর ২০০১*

৬২৫. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে রংপুরে মৌন মিছিল, *বাংলাদেশ অবজারভার, ২২ অক্টোবর ২০০১*

৬২৬. সশস্ত্র ৩ যুবককে পুলিশে সোপর্দ বাউফলে পূজা তোরণ এবং প্রতিমা নির্মাতার বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, *ভোরের কাগজ, ২২ অক্টোবর ২০০১*

৬২৭. মীরসরাই ও সীতাকুণ্ডে সংখ্যালঘু নির্যাতন ঃ প্রতিমা ভাংচুর, চাঁদাবাজি, লুটপাট চলছে, মহিলারা গ্রামছাড়া, পুরুষরা নির্ঘুম, *ভোরের কাগজ, ২২ অক্টোবর ২০০১*

৬২৮. ভোলার একটি গ্রামে এক রাতের সন্ত্রাসের চিত্র, *জনকণ্ঠ, ২২ অক্টোবর ২০০১*

৬২৯. ঝিনাইদহের দাসপাড়ার সংখ্যালঘুদের রাতের ঘুম হারাম ॥ গণহারে চাঁদা ধরা হচ্ছে, *জনকণ্ঠ, ২২ অক্টোবর ২০০১*

৬৩০. সংখ্যালঘু ছাত্রী লাঞ্ছনা, দায়িত্বে চরম অবহেলা উল্লাপাড়ার ওসি সাময়িক বরখাস্ত, *প্রথম আলো ২২ অক্টোবর ২০০১*

৬৩১. দোরগোড়ায় শারদীয় দুর্গোৎসব ॥ কি ভাবছেন মাগুরার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন, *সংবাদ, ২২ অক্টোবর ২০০১*

৬৩২. রাউজান ও রাঙ্গুনিয়ায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, অনেকেই পালিয়েছেন, *প্রথম আলো, ২২ অক্টোবর ২০০১*

৬৩৩. উজিরপুরের বিলাঞ্চলে সংখ্যালঘুরা বন্দীজীবন যাপন করছে ॥ গ্রাম থেকে বের হলেই হুমকি ধমকি, *জনকণ্ঠ, ২২ অক্টোবর ২০০১*

৬৩৪. পূজামণ্ডপে হামলা, *বাংলাদেশ অবজারভার, ২২ অক্টোবর ২০০১*

৬৩৫. ধর্ষিতার মার দাবী, আমরা ন্যায্য বিচার চাই, *ডেইলি স্টার, ২২ অক্টোবর ২০০১*

৬৩৬. চাটমোহর ও পলাশ বাড়িতে প্রতিমা ভাংচুর, *প্রথম আলো, ২২ অক্টোবর ২০০১*

৬৩৭. ভারতে পালিয়ে আসা হিন্দুরা নির্যাতনের কথা বললেন, *ডেইলি স্টার, ২২ অক্টোবর ২০০১*

৬৩৮. সুনামগঞ্জে আদিবাসী পল্লীতে হামলা, *প্রথম আলো, ২২ অক্টোবর ২০০১*

৬৩৯. রাউজান ও বান্দুরিয়ায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, অনেকেই পালিয়েছেন, *প্রথম আলো, ২২ অক্টোবর ২০০১*

৬৪০. সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের প্রতিবাদ, সম্মিলিত আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের মৌনমিছিল, *প্রথম আলো*, ২২ অক্টোবর ২০০১
৬৪১. উপদ্রুত এলাকা ঘুরে সচেতন নাগরিকদের অভিমত ॥ সংখ্যালঘু নির্যাতন ঃ সরকার বাস্তবকে আড়াল করছে, *প্রথম আলো*, ২২ অক্টোবর, ২০০১
৬৪২. সরেজমিন রিপোর্ট-১ ॥ ঝিনাইদহের দাসপাড়ার সংখ্যালঘুদের রাতের ঘুম হারাম ॥ গণহারে চাঁদা ধরা হচ্ছে, দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২ অক্টোবর ২০০১
৬৪৩. বরিশালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ॥ যেসব ঘটনা ঘটছে তার সত্যতা তো আছেই, তবে, *প্রথম আলো*, ২৩ অক্টোবর ২০০১
৬৪৪. নারী ও সংখ্যালঘু নির্যাতন'৭১ এর কথা মনে করিয়ে দেয়— মহিলা পরিষদ, *প্রথম আলো*, ২৩ অক্টোবর ২০০১
৬৪৫. লালপুরে ৫০টি সংখ্যালঘু পরিবার পুলিশ প্রহরায় দিন কাটায়, *প্রথম আলো*, ২৩ অক্টোবর ২০০১
৬৪৬. মোড়েলগঞ্জে সংখ্যালঘু ও আ.লীগ সমর্থকদের বাড়ীতে হামলা ও লুটপাট চাঁদাবাজি ॥ অভিযোগে ফল হচ্ছে না, *জনকণ্ঠ*, ২৩ অক্টোবর ২০০১
৬৪৭. জৈন্তাপুরে দুর্গা প্রতিমার মস্তক ছিন্ন করে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা : প্রতিবাদে ঘটপূজা, *যুগান্তর*, ২৩ অক্টোবর ২০০১
৬৪৮. মনিরামপুরের ঋষিপাড়ায় ১৬টি বাড়িতে লুটপাট : ৯ মেয়ে ধর্ষিত, *যুগান্তর*, ২৩ অক্টোবর ২০০১
৬৪৯. চাটমোহরে দুর্গাপূজার প্রতিমা ভেঙ্গেছে দুর্বৃত্তরা, *জনকণ্ঠ*, ২৩ অক্টোবর ২০০১
৬৫০. নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস ॥ চোখের সামনে বাবা মাকে মারধর করায় ঃ শিশুরাও আতঙ্কিত, *জনকণ্ঠ*, ২৩ অক্টোবর ২০০১
৬৫১. 'অন্যের দুঃখে আমরা আনন্দে গা ভাসিয়ে দিতে পারি না' ঃ উৎসবের আমেজ নেই ॥ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপ সত্ত্বেও উত্তরাঞ্চলে সাদামাটাভাবে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, *সংবাদ*, ২৩ অক্টোবর ২০০১
৬৫২. ভোলার নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের আহাজারি : প্রধানমন্ত্রীকে বলবেন, আমরা ভোট দিইনি আগামীতেও দেবোনা, শুধু এদেশে থাকতে চাই, *সংবাদ*, ২৩ অক্টোবর ২০০১
৬৫৩. হিজলায় সংখ্যালঘুর বাড়ি নিশ্চিহ্ন : গৃহবধূ নির্যাতিত, *ইত্তেফাক*, ২৩ অক্টোবর ২০০১
৬৫৪. লালপুরে ৫০টি সংখ্যালঘু পরিবার পুলিশ প্রহরায়, *প্রথম আলো*, ২৩ অক্টোবর ২০০১
৬৫৫. সরেজমিন, ক্ষুধিরামের 'স্বাভাবিক মৃত্যু' ও প্রিয় বালার ক্ষেত্রে অপরাধজনিত নরহত্যা, *প্রথম আলো* ২৩ অক্টোবর ২০০১
৬৫৬. উল্লাপাড়ায় পূর্ণিমার উপর নির্যাতনের ঘটনা অস্বীকার করিলেন এমপি, *ইত্তেফাক*, ২৩ অক্টোবর ২০০১
৬৫৭. সরেজমিন রিপোর্ট-২ ॥ **ভোলার লেজপাতা গ্রামে লুট হয়েছে সম্পদ ও ইজ্জত**, *জনকণ্ঠ*, ২৩ অক্টোবর ২০০১
৬৫৮. ভারতীয় সংবাদ সংস্থার খবর বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা ভারতে চলে যাচ্ছে, *আজকের কাগজ* ২৩ অক্টোবর ২০০১
৬৫৯. চট্টগ্রামে পূজামণ্ডপে বোমা বিস্ফোরণ, কেউ হতাহত হয়নি, *প্রথম আলো*, ২৩ অক্টোবর ২০০১
৬৬০. সন্ত্রাসী হামলার ভয়ে সংখ্যালঘু, গ্রামের গৃহবধূরা সিথিতে সিঁদুর দিচ্ছে না, *জনকণ্ঠ* ২৪ অক্টোবর ২০০১
৬৬১. কাপাসিয়ায় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ, *সংবাদ*, ২৪ অক্টোবর ২০০১
৬৬২. মনিরামপুরে সংখ্যালঘুদের ঘরে ঘরে ঢুকে লুটপাট কিশোরী ও তরুণী লাঞ্চিত, *প্রথম আলো*, ২৪ অক্টোবর ২০০১
৬৬৩. সন্ত্রাসী হামলার ভয়ে সংখ্যালঘু গ্রামের গৃহবধূরা সিঁথিতে সিঁদুর দিচ্ছে না, *জনকণ্ঠ*, ২৪ অক্টোবর ২০০১
৬৬৪. সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় সংখ্যালঘু নির্যাতন ঃ পুলিশের বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলা ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ, *প্রথম আলো*, ২৪ অক্টোবর ২০০১
৬৬৫. বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা নির্যাতন ও মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা দিল্লী সরকার কঠোর দৃষ্টিতে দেখছে— বাজপেয়ী, *ডেইলি স্টার*, ২৪ অক্টোবর ২০০১
৬৬৬. উল্লাপাড়ার ঘটনা সম্পর্কে পুলিশের বক্তব্যে প্রকৃত সত্য আড়াল করা হয়েছে ॥ নির্মূল কমিটি, *দৈনিক মুক্তকণ্ঠ*, ২৪ অক্টোবর ২০০১
৬৬৭. সংখ্যালঘুদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ॥ দুর্গাপূজা বর্জন, *সংবাদ*, ২৫ অক্টোবর ২০০১
৬৬৮. সংখ্যালঘু ও নারী নির্যাতনের নৃশংস ও লোমহর্ষক চিত্র ফুটে উঠল মহিলা পরিষদের বর্ণনায়, *জনকণ্ঠ*, ২৪ অক্টোবর ২০০১
৬৬৯. ময়মনসিংহে চাঁদা না পেয়ে দুর্গাপ্রতিমা ভাংচুর, *প্রথম আলো*, ২৫ অক্টোবর ২০০১
৬৭০. কুমারী পূজার দিন সারা দেশে গণঅনশন কর্মসূচি পালন, *প্রথম আলো*, ২৫ অক্টোবর ২০০১
৬৭১. দিল্লীতে বাংলাদেশ মিশনের সামনে সংখ্যালঘু নিগ্রহের প্রতিবাদ বিক্ষোভ, *জনকণ্ঠ*, ২৫ অক্টোবর ২০০১
৬৭২. সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার প্রতিবাদে সারা দেশে অনশন কর্মসূচি পালিত, ভোরের কাগজ, ২৬ অক্টোবর ২০০১
৬৭৩. যেখানে নির্যাতন চলছে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়নি—যেভাবে দুর্গাপূজা দেখিয়ে আনা হলো কূটনীতিকদের, *ভোরের কাগজ* ২৬ অক্টোবর ২০০১
৬৭৪. জাগো মানুষ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, *জনকণ্ঠ*, ২৬ অক্টোবর ২০০১
৬৭৫. নাটোরের কৃষ্ণরামপুরের ৪৫টি সংখ্যালঘু পরিবার বিএনপি সন্ত্রাসীদের বর্বর হামলা ও লুটপাটের শিকার 'একাত্তরেও এত যন্ত্রণা সহ্য করিনি', *সংবাদ*, ২৬ অক্টোবর ২০০১
৬৭৬. পূর্ণিমার ঘটনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা, *সংবাদ*, ২৬ অক্টোবর ২০০১
৬৭৭. সংখ্যালঘু নির্যাতন ঃ সরকার সত্য স্বীকার করছে না------অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, *জনকণ্ঠ*, ২৬ অক্টোবর ২০০১
৬৭৮. প্রতিবেদনগুলো কি মিথ্যা ছিল, *ডেইলি স্টার (ম্যাগাজিন)* ২৬ অক্টোবর ২০০১
৬৭৯. একটি সুন্দর উৎসব হামলার কারণে পণ্ড হয়ে গেল, *ডেইলি স্টার ম্যাগাজিন*, ২৬ অক্টোবর ২০০১
৬৮০. সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে চট্টগ্রামে মানববন্ধন, *প্রথম আলো*, ২৬ অক্টোবর ২০০১

৬৮১. পূজামণ্ডপ ও মন্দিরে লুটপাটের পর আগুন ॥ হিন্দু সম্পত্তি দখল, সন্ত্রাসী হামলা, *জনকণ্ঠ*, ২৬ *অক্টোবর* ২০০১

৬৮২. চরমোনাইয়ে ধর্ষিত সংখ্যালঘু কিশোরী সন্ত্রাসীদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, *জনকণ্ঠ*, ২৬ *অক্টোবর* ২০০১

৬৮৩. মোল্লাহাটে পাল্টাপাল্টি মামলায় আওয়ামী লীগ-বিএনপির নেতা কর্মীরা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, সংখ্যালঘুদের ওপরেও চলছে সমান নির্যাতন, *সংবাদ*, ২৬ *অক্টোবর* ২০০১

৬৮৪. প্রতিবাদ সমাবেশে রামশীল পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা, সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের জন্য দোষিদের শাস্তি দাবি, *প্রথম আলো*, ২৬ *অক্টোবর* ২০০১

৬৮৫. আজ বিজয়া দশমী, নবমীতে অত্যাচার নির্যাতনের প্রতিবাদে সারা দেশে মানববন্ধন-নীরবতা পালিত, *প্রথম আলো*, ২৬ *অক্টোবর* ২০০১

৬৮৬. যশোরের অভয়নগর, গিয়াস-শওকত বাহিনীর হাতে জিম্মি, *জনকণ্ঠ* ২৭ *অক্টোবর* ২০০১

৬৮৭. নওগাঁয় পূজামণ্ডপে আগুন ॥ কুলাউড়ায় প্রতিমা ভাংচুর, *জনকণ্ঠ*, ২৭ *অক্টোবর* ২০০১

৬৮৮. গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতিমণ্ডলীর সভা ঃ সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা ও নির্যাতন বৃদ্ধিতে উদ্বেগ, *সংবাদ*, ২৭ *অক্টোবর* ২০০১

৬৮৯. নাটোরে সংখ্যালঘুদের ওপর মুখোশধারীদের হামলা, *সংবাদ*, ২৭ *অক্টোবর* ২০০১

৬৯০. কমিটির সভাপতি 'হিন্দু' হওয়ায় তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে স্কুলটিতে, *সংবাদ*, ২৭ *অক্টোবর* ২০০১

৬৯১. অনাড়ম্বর দুর্গাপূজা উদযাপনের পাশাপাশি রয়েছে মূর্তি ভাংচুরের ঘটনা, *আজকের কাগজ*, ২৮ *অক্টোবর* ২০০১

৬৯২. রাজশাহীর দুর্গাপুরে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসী হামলা ॥ শতবর্ষী কবিরাজকে কুপিয়ে জখম, *জনকণ্ঠ*, ২৮ *অক্টোবর* ২০০১

৬৯৩. নরসিংদিতে কালী মন্দিরের মূর্তি ভাংচুর, *জনকণ্ঠ*, ২৮ *অক্টোবর* ২০০১

৬৯৪. সাতক্ষীরার রামনগরে সন্ত্রাসীরা বেপরোয়া ॥ সংখ্যালঘুদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যহত, যুবক-যুবতীরা ঘরছাড়া, *জনকণ্ঠ*, ২৯ *অক্টোবর* ২০০১

৬৯৫. গাজীপুরে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলায় ৮ জন আহত, *রূপালী*, ২৯ *অক্টোবর* ২০০১

৬৯৬. বাগেরহাটে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও বাড়িঘরে লুটপাট, *সংবাদ*, ২৯ *অক্টোবর* ২০০১

৬৯৭. রাজশাহী বরিশাল ঈশ্বরদীতে বিএনপি ক্যাডারদের হামলা ভাংচুর অগ্নিসংযোগ সন্ত্রাসী তাণ্ডব ॥ সংখ্যালঘুসহ আহত ১০, নাটোরে কুপিয়ে দুই ব্যবসায়ীকে জখম, *জনকণ্ঠ*, ৩০ *অক্টোবর* ২০০১

৬৯৮. সন্ত্রাসী তাণ্ডব ॥ সংখ্যালঘুসহ মাগুরায় আহত ১০, নাটোরে কুপিয়েছে দুই ব্যবসায়ীকে, *জনকণ্ঠ*, ৩০ *অক্টোবর* ২০০১

৬৯৯. মুন্সীগঞ্জে গ্রামে সন্ত্রাসীরা কুপিয়ে গুরুতর জখম করেছে এক সংখ্যালঘুকে, *জনকণ্ঠ*, ৩০ *অক্টোবর* ২০০১

৭০০. সংখালঘুদের বাপদাদার ভিটায় থাকতে হলে মাসোহারা দিতে হবে ঃ রাউজান রাঙ্গুনিয়ায় বিএনপি ক্যাডারদের ফরমান, *সংবাদ*, ৩০ *অক্টোবর* ২০০১

৭০১. গৌরীপুরে কালী মূর্তি ভাংচুর, *সংবাদ*, ৩০ *অক্টোবর* ২০০১

৭০২. পুঠিয়ায় প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় বিএনপি কর্মী গ্রেপ্তার, *প্রথম আলো*, ৩০ *অক্টোবর* ২০০১

৭০৩. দশরথ কবিরাজের মুখে বিএনপি ক্যাডারদের নির্যাতনের বর্ণনা, *সংবাদ*, ৩০ *অক্টোবর* ২০০১

৭০৪. ভারতে পালিয়ে যাওয়া হিন্দুদের বর্ণিত নির্যাতনের কাহিনী, *ডেইলি স্টার*, ৩০ *অক্টোবর* ২০০১

৭০৫. ধুনটে লক্ষ্মী প্রতিমা ভাংচুর, *প্রথম আলো*, ৩১ *অক্টোবর* ২০০১

৭০৬. বাড়িঘর ছেড়ে স্কুলে আশ্রয় ঃ খুলনা ও শেরপুরে সংখ্যালঘুদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা, লুট , *প্রথম আলো*, ৩১ *অক্টোবর* ২০০১

৭০৭. আজ প্রবারণা পূর্ণিমা ঃ সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের প্রতিবাদে বৌদ্ধরা আজ ফানুস ওড়াবে না, *ভোরের কাগজ*, ৩১ *অক্টোবর* ২০০১

৭০৮. রাজশাহীতে চাঁদাবাজি ও সংখ্যালঘু নির্যাতনে জড়িত ৭ বিএনপি ॥ নেতাকর্মী গ্রেপ্তার, *ভোরের কাগজ* ৩১ *অক্টোবর* ২০০১

৭০৯. জয়পুরহাটে বিধান সরকারের বাড়িতে সন্ত্রাসীদের অগ্নিসংযোগ, *বাংলাদেশ অবজার্ভার*, ৩১ *অক্টোবর* ২০০১

৭১০. গাজীপুরে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর নির্যাতনের অভিযোগে ঃ পৌর কমিশনারসহ গ্রেফতার ২, *যুগান্তর*, ৩১ *অক্টোবর* ২০০১

৭১১. খুলনার ডুমুরিয়া গ্রাম এখন জনশূন্য ঃ ৫শ' সংখ্যালঘু নারী-পুরুষ আশ্রয় নিয়েছে পার্শ্ববর্তী গ্রামে, *মুক্তকণ্ঠ*, ৩১ *অক্টোবর* ২০০১

৭১২. নৌকায় ভোট দেয়ার অপরাধে সন্ত্রাসী তাণ্ডবের জের ঃ রায়পুরায় ৬শ' সংখ্যালঘু পরিবার এবার দুর্গোৎসব করতে পারেনি, *মুক্তকণ্ঠ*, ৩১ *অক্টোবর* ২০০১

৭১৩. নারী নির্যাতন ঃ নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার কালো দাগ, *আজকের কাগজ*, ৩১ *অক্টোবর* ২০০১

৭১৪. নৌকার ভোটার আর সংখ্যালঘুদের জন্য কালিয়াকৈর জিম্মি জনপদ, *জনকণ্ঠ*, ৩১ *অক্টোবর* ২০০১

নবেম্বর ২০০১

৭১৫. ঘটনাস্থল মিরসরাই, বাউফল, না'গঞ্জ, কালিয়াকৈর ও সৈয়দপুরের সোনাখুলি সব সংখ্যালঘু ও আ'লীগ নেতা-কর্মীদের ওপর চলছে চরম নির্যাতন: চাঁদা দাবি, না হয় দেশ ছাড়ার হুমকি, *সংবাদ*, ১ *নবেম্বর*, ২০০১

৭১৬. বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার প্রতিবাদ : কলকাতায় বিক্ষোভ, *সংবাদ*, ১ *নবেম্বর* ২০০১

৭১৭. বিবিসি সংবাদ দাতার পর্যবেক্ষণ, *সংবাদ, ২ নবেম্বর ২০০১*

৭১৮. গলাচিপার আটখালী গ্রামের সংখ্যালঘু ও নৌকার সমর্থকরা বিএনপির আল আমিন বাহিনীর হাতে জিম্মি, *জনকণ্ঠ, ২ নবেম্বর ২০০১*

৭১৯. 'মাকে সন্তুষ্ট করতে নয়, বিএনপিকে সন্তুষ্ট করতে এই পূজা', *সংবাদ, ৩ নবেম্বর,২০০১*

৭২০. বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ না হলে ভারতীয়রা প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠতে পারে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, *জনকণ্ঠ, ৩ নবেম্বর ২০০১*

৭২১. সংখ্যালঘুরা আতঙ্কে, ঘরে ফিরতে পারছে না, *সংবাদ, ৪ নবেম্বর ২০০১*

৭২২. সরজমিন-১, গলাচিপার মাঝ গ্রামে ২ হিন্দু যুবতীকে অপহরণের চেষ্টা ॥ ভাংচুর লুট, ঘরছাড়া ১৩ নারী-পুরুষ, *জনকণ্ঠ, ৪ নবেম্বর ২০০১*

৭২৩. মাধবপুরে আতঙ্কজনক পরিবেশে দুর্গোৎসব পালনঃ প্রতিমা ভাংচুর ও পূজামণ্ডপে পাটকেল ছোঁড়া হয়েছে, *সংবাদ, ৪ নবেম্বর, ২০০১*

৭২৪. বিভিন্ন জায়গায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা অব্যাহত, *সংবাদ, ৪ নবেম্বর, ২০০১*

৭২৫. সরজমিন মুন্সিগঞ্জ, সংখ্যালঘুরা আতঙ্কে, আ. লীগ নেতা কর্মীরা ঘরে ফিরতে পারছে না, *সংবাদ, ৪ নবেম্বর ২০০১*

৭২৬. নরসিংদীতে সংখ্যালঘুদের ওপর সরকারদলীয় সন্ত্রাসীদের নির্যাতন, *জনকণ্ঠ, ৫ নবেম্বর ২০০১*

৭২৭. আইনমন্ত্রীর নিজের এলাকায় অকার্যকর তার নির্দেশ—আশ্বাস ঃ কোম্পানীগঞ্জ ঃ হামলা-নির্যাতনে সন্ত্রস্ত হিন্দুরা, আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ, *ভোরের কাগজ, ৫ নবেম্বর ২০০১*

৭২৮. নাটোর : সংখ্যালঘু নির্যাতন কমলেও ভয়ভীতি প্রদর্শন বন্ধ হয় নি, *সংবাদ, ৬ নবেম্বর ২০০১*

৭২৯. সামাজিক আন্দোলনের নেতারা কালিয়াকৈরে, নির্যাতনে হাত-পা ভাঙা হিন্দুরা এসে বিবরণ দিলেন, *প্রথম আলো, ৬ নবেম্বর ২০০১*

৭৩০. সামাজিক আন্দোলনের নেতারা কালিয়াকৈরেঃ নির্যাতনে হাত-পা ভাঙ্গা হিন্দুরা এসে বিবরণ দিলেন, *প্রথম আলো, ৬ নবেম্বর ২০০১*

৭৩১. মানিকগঞ্জে পরেশ হালদারকে হুমকি ঃ চাঁদা ২০ হাজার, নইলে মাথা, *জনকণ্ঠ, ৬ নবেম্বর, ২০০১*

৭৩২. ঘটনাস্থল নীলফামারীর ডোমার ঃ হিন্দু বিধবার কোটি টাকার সম্পদ লুটে নেয়ার পাঁয়তারা, *সংবাদ, ৬ নবেম্বর ২০০১*

৭৩৩. বাগেরহাটে রামকৃষ্ণ আশ্রমে সন্ত্রাসী হামলা গ্রেপ্তার ২ জন, *ভোরের কাগজ, ৬ নবেম্বর ২০০১*

৭৩৪. গলাচিপার হরিপদ শীলকে দিগম্বর করে বাজারে ঘোরানো হয় বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামির ছোট ভাইয়ের নির্দেশে, *জনকণ্ঠ, ৭ নবেম্বর ২০০১*

৭৩৫. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনার তদন্ত কমিশন গঠন করা হবে—নাগরিক সমাজ, *প্রথম আলো, ৭ নবেম্বর ২০০১*

৭৩৬. মিরসরাইয়ে দাসপাড়ায় মধ্যরাতে বিএনপি সন্ত্রাসীদের হামলাঃ সেবাইত খুন, আহত ৩০, *জনকণ্ঠ, ৭ নবেম্বর, ২০০১*

৭৩৭. নাগরিক সমাজের মতবিনিময় সভা ॥ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনায় তদন্ত কমিশন গঠন করা হবে, *প্রথম আলো, ৭ নবেম্বর ২০০১*

৭৩৮. সন্ত্রাসীদের ভয়ে নরসিংদীর রাজনগরে সংখ্যালঘুরা অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে, *যুগান্তর, ৮ নবেম্বর, ২০০১*

৭৩৯. গলাচিপার হরিদেবপুর : মহিউদ্দিন বাহিনীর হাত থেকে মেয়েদের সম্ভ্রম বাঁচাতে দুটি হিন্দু পরিবার এলাকাছাড়া, *জনকণ্ঠ, ৮ নবেম্বর ২০০১*

৭৪০. রাউজানের সরকারপাড়াঃ সন্ত্রাসীরা ঘোষবাড়িটি পুড়িয়ে দিলেও সাহায্য নিয়ে কেউ এগিয়ে আসেনি, *সংবাদ, ৮ নবেম্বর ২০০১*

৭৪১. ফেনীতে চাঁদার দাবিতে অপহরণ ও বাড়ি দখল চলছে, সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগের কর্মী সমর্থকরা নির্যাতনের শিকার ॥ এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক, *জনকণ্ঠ, ৮ নবেম্বর ২০০১*

৭৪২. মিরসরাইয়ে সংখ্যালঘু পাড়ায় হামলা, গ্রেফতার ১২, সাংবাদিকদের সামনে আ, লীগ-বিএনপি নেতাদের বিতণ্ডা, *প্রথম আলো, ৯ নবেম্বর ২০০১*

৭৪৩. কলাপাড়ায় এক সংখ্যালঘু বাড়িতে আগুন, ছেলেকে অপহরণ—দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকিঃ পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ছেন একজন বিএনপি নেতা, *সংবাদ, ৯ নবেম্বর ২০০১*

৭৪৪. নির্বাচনের পর ভোলা-১ ঃ অন্নদাপ্রসাদ গ্রামে এক বিভীষিকার রাত, *প্রথম আলো, ৯ নবেম্বর ২০০১*

৭৪৫. লন্ডন ও সুইজারল্যান্ডে সংখ্যালঘু নিপীড়নের প্রতিবাদ, হাউজ অব কমন্সের সামনে অনশন জাতিসংঘ মহাসচিবকে স্মারকলিপি, *ভোরের কাগজ, ৯ নবেম্বর ২০০১*

৭৪৬. সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগের কথা স্বীকার করলেন কলকাতায় নিযুক্ত বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনার, *প্রথম আলো, ১০ নবেম্বর ২০০১*

৭৪৭. নির্বাচনের পর ভোলা-২ ঃ ক্ষেতমজুর প্রাণকৃষ্ণও স্ত্রী-কন্যা নিয়ে ভারতে চলে যাবেন, *প্রথম আলো, ১০ নবেম্বর ২০০১*

৭৪৮. সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের শ্বেতপত্র প্রকাশ করবে নির্মূল কমিটি-, *সংবাদ, ১০ নবেম্বর ২০০১*

৭৪৯. সংখ্যালঘু পাড়ায় হামলা ঃ মিরসরাইয়ে আহত একজন মারা গেছে, *প্রথম আলো, ১০ নবেম্বর ২০০১*

৭৫০. নাটোরে ক্ষমতাসীনদের সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি ঃ 'বিএনপিতে যোগ দিলে সমস্যা থাকবে না।', *সংবাদ ১১ নবেম্বর ২০০১*,, পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, *সংবাদ, ১১ নবেম্বর ২০০১*

৭৫১. শেখ হাসিনাকে দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন নির্যাতিত ও মুক্তিযোদ্ধা মঙ্গল ঘরামী, *জনকণ্ঠ, ১১ নবেম্বর ২০০১*

৭৫২. ভাংচুর, লুটপাট বন্ধ হলেও এখন চলছে তাদেরকে মারধর করার ঘটনা, *সংবাদ, ১১ নবেম্বর ২০০১*

৭৫৩. দেশ ত্যাগ নয়, সন্ত্রাসীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংখ্যালঘুরাঃ রামপাল-মংলার নির্যাতিত হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ সভা, *সংবাদ, ১১ নবেম্বর ২০০১*

৭৫৪. নির্বাচনের পর ভোলা ৩ ঃ পঙ্গু শেফালী রানীর 'নাকফুল কেড়ে নেওয়ার' কাহিনী, *প্রথম আলো, ১১ নবেম্বর ২০০১*

৭৫৫. স্কুল শিক্ষকের স্বপ্নের দোকান দখল করে নিয়েছে যুবদল, *যুগান্তর, ১১ নবেম্বর ২০০১*
৭৫৬. অভয়নগরে আবারো কালীমূর্তি ভাঙচুর, *ভোরের কাগজ, ১১ নবেম্বর ২০০১*
৭৫৭. নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের ভারতে আশ্রয় নেয়ার ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তোলপাড়, *জনকণ্ঠ, ১১ নবেম্বর ২০০১*
৭৫৮. নোয়াপাড়া ও শাহজাদপুরে প্রতিমা ভাংচুর, *জনকণ্ঠ, ১১ নবেম্বর ২০০১*
৭৫৯. পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, *সংবাদ, ১১ নবেম্বর ২০০১*
৭৬০. নির্বাচনের পর ভোলা-৪ ঃ জয়ন্তীর সংগ্রামের কাহিনী, *প্রথম আলো, ১২ নবেম্বর, ২০০১*
৭৬১. রাউজানে সা. কা. বাহিনীর নির্যাতন ঃ ৭ ইউনিয়নের ৫ হাজার সংখ্যালঘু নাগরিক ঘরবাড়ি ছাড়া, *সংবাদ, ১৩ নবেম্বর ২০০১*
৭৬২. সেই লোমহর্ষক ঘটনার কথা মনে হলে ডাক্তার দেবলালের সারা মুখ এখনও আতঙ্কে কুকঁড়ে ওঠে , *জনকণ্ঠ, ১৩ নবেম্বর ২০০১*
৭৬৩. ঝিনাইদহের কয়েকটি এলাকায় ব্যাপক চাঁদাবাজির অভিযোগ, *প্রথম আলো, ১৪ নবেম্বর, ২০০১*
৭৬৪. গৌরনদী ও আগৈলঝাড়ায় চাঁদাবাজী ॥ চাঁদা না দিলেই বাড়ি ঘরে লুটপাট চলছে, *জনকণ্ঠ, ১৪ নবেম্বর ২০০১*
৭৬৫. ধর্ষিত সংখ্যালঘু মহিলার সংখ্যা হাজার ছাড়াতে পারে, *জনকণ্ঠ, ১৫ নবেম্বর ২০০১*
৭৬৬. কিশোরগঞ্জে সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলা, লুটপাট, আহত ৭, *যুগান্তর, ১৫ নবেম্বর ২০০১*
৭৬৭. কুয়াকাটার শত বছরের ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব এবার অনিশ্চিৎ ॥ মূল আয়োজক পালিয়ে বেড়াচ্ছে, *জনকণ্ঠ, ১৫ নবেম্বর ২০০১*
৭৬৮. দাশপাড়ায় সাম্প্রদায়িক নির্যাতন চালানোর কথা স্বীকার করেছে যুবদল নেতা ফিরোজ খান, *সংবাদ, ১৫ নবেম্বর ২০০১*
৭৬৯. ধোরলা গ্রামে দুধর্ষ ডাকাতি ॥ লুটপাট ব্যাপক নির্যাতন, *আজাদী, ১৫ নবেম্বর ২০০১*
৭৭০. বেতবুনিয়া ঃ শুধু আ. লীগ নেতাকর্মী নয় পাহাড়িরাও নির্যাতনের শিকার, *ভোরের কাগজ, ১৬ নবেম্বর ২০০১*
৭৭১. আলোচনা সভায় বক্তারা, চট্টগ্রামে ঐক্য পরিষদ আহূত আধাবেলা হরতাল পালিত, *সংবাদ, ১৬ নবেম্বর, ২০০১*
৭৭২. বান্দরবানের বরইছড়িতে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন অব্যাহত, *জনকণ্ঠ, ১৬ নবেম্বর ২০০১*
৭৭৩. হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে জামাত শিবির!, *সংবাদ, ১৭ নবেম্বর ২০০১*
৭৭৪. নাটোরের কালীমূর্তির স্বর্ণালঙ্কার লুট, *সংবাদ, ১৭ নবেম্বর ২০০১*
৭৭৫. ফেনীতে ৮টি সংখ্যালঘু পরিবারে লুটপাট, কালীমূর্তি ভাংচুর, *সংবাদ, ১৭ নবেম্বর ২০০১*
৭৭৬. চট্টগ্রামে নিজ বাসভবনে অধ্যক্ষ গোপাল মুহুরীকে গুলি করে হত্যা ঃ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জামায়াত- শিবির ক্যাডাররা জড়িত : পুলিশ যেভাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল, *যুগান্তর, ১৭ নবেম্বর ২০০১*
৭৭৭. নান্দাইলে সংখ্যালঘু যুবক অপহৃত : ২ দিনেও সন্ধান মেলেনি, *প্রথম আলো, ১৭ নবেম্বর ২০০১*
৭৭৮. মাগুরায় হিন্দুবাড়িতে, কুমিল্লায় লোকনাথ আশ্রমে সন্ত্রাসী হামলা, *প্রথম আলো, ১৭ নবেম্বর ২০০১*
৭৭৯. সীমান্ত অতিক্রমকালে ২২জন হিন্দু গ্রেফতার, *ডেইলি স্টার, ১৭ নবেম্বর ২০০১*
৭৮০. চিলমারীতে এক পুরোহিতকে জখম করে ৩ আঙ্গুল বিচ্ছিন্ন করেছে ছাত্রদল ক্যাডাররা, *ভোরের কাগজ, ১৭ নবেম্বর ২০০১*
৭৮১. জামায়াতে ইসলামীর প্রভাবশালীদের মদদ ঃ গোদাগাড়িতে এবার মন্দির দখল করে বানানো হচ্ছে মসজিদ, *জনকণ্ঠ, ১৭ নবেম্বর ২০০১*
৭৮২. ফেনিতে পুলিশ বিডিআর যৌথ অভিযান অব্যাহত, দাগনভূঁঞায় ডাকাতি লুটপাট, মূর্তি ভাঙচুর, *প্রথম আলো ১৭ নবেম্বর ২০০১*
৭৮৩. হত্যাকান্ডের ৩ দিন আগে অধ্যক্ষ মুহুরীকে ফোনে হুমকি দেওয়া হয়, *প্রথম আলো ১৮ নবেম্বর ২০০১*
৭৮৪. খোকসায় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন অব্যাহত, *আজকের কাগজ, ১৮ নবেম্বর ২০০১*
৭৮৫. সরজমিন ঃ হিজলা ॥ সংখ্যালঘুদের বাড়িতে ভাংচুর-লুটপাটের পর এখন শুরু হয়েছে চাঁদাবাজি, *সংবাদ, ১৮ নবেম্বর ২০০১*
৭৮৬. সংখ্যালঘু নির্যাতনের কথা জাতিসংঘ প্রতিনিধিকে জানানো হয়েছে, *সংবাদ, ১৮ নবেম্বর ২০০১*
৭৮৭. মামাবাড়ির আবদার !, *প্রথম আলো, ১৮ নবেম্বর ২০০১*
৭৮৮. নরসিংদীতে পূজা দেখতে গিয়ে নিখোঁজ ॥ পীযুষের লাশ উদ্ধার, *যুগান্তর, ১৮ নবেম্বর ২০০১*
৭৮৯. সংখ্যালঘু নির্যাতন ঃ নাটোরের চৌগ্রাম ॥ মহিলাদের ধর্ষণের ভয় দেখিয়ে ৩ লাখ টাকার সম্পদ লুটপাট, *সংবাদ, ১৯ নবেম্বর ২০০১*
৭৯০. দাগনভূঞায় চাঁদার টাকা পরিশোধ করতে না পারায় পরিবার নিয়ে পালিয়েছেন গুপিনাথ, *আজকের কাগজ, ১৯ নবেম্বর ২০০১*
৭৯১. গৌরনদীতে যুবককে মারপিট, ব্যবসায়ীর ৫০ হাজার টাকা ছিনতাই, *ভোরের কাগজ, ১৯ নবেম্বর ২০০১*
৭৯২. হিজলায় চাঁদাবাজদের ভয়ে এক সংখ্যালঘু ডাক্তার পালিয়ে বেড়াচ্ছে, *ভোরের কাগজ, ১৯ নবেম্বর ২০০১*
৭৯৩. বরিশালে খ্রিস্টানপাড়ায় ছাত্রদল ক্যাডারদের হামলা ও লুটপাট, *প্রথম আলো, ২০ নবেম্বর ২০০১*
৭৯৪. দিনাজপুরে সন্ত্রাস, দেশত্যাগ কালে সীমান্তে সংখ্যালঘু পরিবারের ১৪ জন আটক, *সংবাদ, ২০ নবেম্বর ২০০১*
৭৯৫. সাভারে সংখ্যালঘু পরিবারে সন্ত্রাসীদের হামলা, গৃহকর্তা গুরুতর আহত, *প্রথম আলো, ২১ নবেম্বর ২০০১*
৭৯৬. বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের প্রতিবাদে কলকাতায় বিক্ষোভ স্মারকলিপি, *প্রথম আলো, ২১ নবেম্বর ২০০১*

৭৯৭. বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়টি কঠোরভাবে নিয়েছি ঃ বাজপেয়ি , *সংবাদ*, *২১ নবেম্বর ২০০১*

৭৯৮. 'ন্যাড়া বাহিনী', *প্রথম আলো*, *২২ নবেম্বর ২০০১*

৭৯৯. নির্যাতনে দেশত্যাগী সংখ্যালঘুদের কলকাতায় বিক্ষোভ। বাংলাদেশ হাইকমিশন স্মারকলিপি, *জনকণ্ঠ*, *২২ নবেম্বর ২০০১*

৮০০. লাল মোহনে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন, পুলিশি তৎপরতা বৃদ্ধি, ৬টি মামলা দায়েরঃ গ্রেফতার-৭, *প্রথম আলো*, *২২ নবেম্বর ২০০১*

৮০১. মৌলভীবাজারে গ্রামে চাঁদা না পেয়ে সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের ধান কেটে নিয়েছে, *প্রথম আলো*, *২২ নবেম্বর ২০০১*

৮০২. ভিটে মাটি বিক্রি করে পালাতে গিয়েও পথে পথে নির্যাতন, অপহরণ, *প্রথম আলো*, *২২ নবেম্বর*, *২০০১*

৮০৩. সন্ত্রাসীদের কবল থেকে দম্পতিকে উদ্ধার, *নিউ নেশন*, ২৩ *নবেম্বর ২০০১*

৮০৪. জিয়ায় শাহরিয়ার কবির আটক, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২৩ *নবেম্বর ২০০১*

৮০৫. ঘটনাস্থল আগৈলঝাড়া ॥ সংখ্যালঘুদের একটি বাড়ি দখল । পুলিশ নির্বিকার, *আজকের কাগজ*, *২৪ নবেম্বর ২০০১*

৮০৬. বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার খবরে ভারতের পার্লামেন্টের উদ্বেগ প্রকাশ, *আজকের কাগজ*, *২৪ নবেম্বর ২০০১*

৮০৭. সরজমিন মানিকগঞ্জ ॥ চাঁদা দিতে না পেরে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে ভক্তদাস, *সংবাদ*, *২৪ নবেম্বর ২০০১*

৮০৮. হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের বর্ধিত সভা ঃ সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান, *প্রথম আলো*, *২৪ নবেম্বর ২০০১*

৮০৯. সন্ত্রাসী খোঁজার অজুহাতে তারা আমার বাবাকে হত্যা করেছে, *ডেইলি স্টার*, *২৪ নবেম্বর ২০০১*

৮১০. সরজমিন বাঘা উপজেলা ঃ সংখ্যালঘু পাড়ায় পাইকারী ছিনতাই ও ডাকাতি, *সংবাদ*, *২৫ নবেম্বর ২০০১*

৮১১. ৩ লাখ টাকা চাঁদা দাও অথবা উচ্ছেদ হও ঃ ৩০টি হিন্দু পরিবারকে বিএনপি ক্যাডারদের হুমকি, *ডেইলি স্টার*, *২৫ নবেম্বর ২০০১*

৮১২. রাজাপুরে সংখ্যালঘু নির্যাতন ঃ শ্রমিকদল নেতাসহ আসামী ১২ঃ দু'জন রিমান্ডে, *প্রথম আলো*, *২৫ নবেম্বর ২০০১*

৮১৩. অপমৃত্যুর ঘটনায় হত্যা মামলা ঃ হয়রানির শিকার হিন্দুপরিবার, *ভোরের কাগজ*, *২৬ নবেম্বর ২০০১*

৮১৪. পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশী শরণার্থী ঃ শরণার্থী শিবির খুলতে বলেছেন বিজেপি সভাপতি, *ভোরের কাগজ*, *২৬ নবেম্বর ২০০১*

৮১৫. মেহেন্দীগঞ্জে সংখ্যালঘু পল্লী চিকিৎসকের ওপর হামলা, এলাকায় ক্ষোভ, *ভোরের কাগজ*, *২৬ নবেম্বর ২০০১*

৮১৬. শাহরিয়ার কবিরের জামিন হয়নি, হাতকড়া পরিয়ে আদালতে আনা হয় রিমান্ড দু'সপ্তাহের জন্য স্থগিত, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, *২৬ নবেম্বর ২০০১*

৮১৭. বিবিসির প্রতিবেদন ॥ ভারতে চলে যাওয়া হিন্দুরা সন্ত্রাসীদের ভয়ে বাংলাদেশে ফিরতে চায় না, *জনকণ্ঠ*, *২৭ নবেম্বর ২০০১*

৮১৮. চাঁদা না পেয়ে বোমা হামলা, শিশু আহত, *প্রথম আলো*, *২৮ নবেম্বর ২০০১*

৮১৯. স্বরাষ্ট্র সচিব ও আইজিপিকে হাইকোর্টের নির্দেশ, সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা তদন্ত করে রিপোর্ট দিন, *প্রথম আলো*, *২৮ নবেম্বর ২০০১*

৮২০. বান্দরবানে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা, মাগুরায় প্রতিবন্ধী যুবতী ধর্ষণের শিকার, *প্রথম আলো*, *২৮ নবেম্বর ২০০১*

৮২১. চিলমারীতে ছাত্রদল ক্যাডারদের হাতে আহত পুরোহিতের অবস্থা অপরিবর্তিত, *ভোরের কাগজ*, *২৮ নবেম্বর ২০০১*

৮২২. চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে সংখ্যালঘু পরিবারে সন্ত্রাসী হামলা, লুটপাট, *ভোরের কাগজ*, *২৮ নবেম্বর ২০০১*

৮২৩. বান্দরবানে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা ঃ মাগুরায় প্রতিবন্ধী যুবতী ধর্ষণের শিকার, *প্রথম আলো*, *২৮ নবেম্বর ২০০১*

৮২৪. কালিয়াকৈরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আকুতি ॥ ভোটার তালিকা থেকে আমাদের নাম কেটে দিন, আমরা এ দেশেই থাকতে চাই ঃ স্মারকলিপি পেশ, *সংবাদ*, *২৮ নবেম্বর ২০০১*

৮২৫. রিপোর্টার্স ইউনিটিতে মোর্শেদ খান ঃ দেশের কোথাও কোথাও সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, *ভোরের কাগজ*, *২৮ নবেম্বর ২০০১*

৮২৬. যেখানে গণহারে সংখ্যালঘু মহিলাদের সম্ভ্রম লুট করা হয়েছে, সেই ভয়ংকর জনপদের নাম ভোলার লর্ড হার্ডিঞ্জ, *সংবাদ*, *২৯ নবেম্বর ২০০১*

৮২৭. সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে ১১ দল, *জনকণ্ঠ*, *২৯ নবেম্বর ২০০১*

৮২৮. *'হুজুর, আমাদের জেলে ভরুন ঃ বাংলাদেশে আর ফিরব না'*, *জনকণ্ঠ*, *২৯ নবেম্বর ২০০১*

৮২৯. সরকারকে হাইকোর্ট ঃ সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্পর্কে তদন্ত করে রিপোর্ট দেয়ার নির্দেশ, *জনকণ্ঠ*, *২৯ নবেম্বর ২০০১*

৮৩০. পাট ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৯৫ হাজার টাকা ডাকাতি, *বাংলাদেশ অবজারভার*, *৩০ নবেম্বর ২০০১*

৮৩১. সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনায় সরকার বিপাকে ॥ শাহরিয়ার কবিরকে ধরে অবস্থা লেজে গোবরে, *জনকণ্ঠ*, *৩০ নবেম্বর ২০০৫*

ডিসেম্বর ২০০১

৮৩২. বাগেরহাটে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৬ জন গণধর্ষণের শিকার, *ডেইলি স্টার*, *১ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৩৩. চট্টগ্রামে প্রকাশ্যে একে-৪৭ দিয়ে ছাত্র ও যুবলীগ নেতাকে গুলি করে পলায়ন, *ভোরের কাগজ*, *১ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৩৪. বেড়া ও সাঁথিয়ায় নির্বাচনের দুই মাস পরও আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি হয়নি ঃ এখনো হামলার শিকার হচ্ছে সংখ্যালঘুরা, *ভোরের কাগজ*, *১ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৩৫. সংখ্যালঘুরা এখনো আতঙ্কে ঃ ঝালকাঠীতে তারকব্রহ্ম নাম কীর্তন অনুষ্ঠান এবার জমছে না, *ভোরের কাগজ, ১ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৩৬. বাগেরহাটে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনায় ৭ ব্যক্তি গ্রেফতার, *ভোরের কাগজ, ১ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৩৭. তুচ্ছ ঘটনায়, *ভোরের কাগজ, ২ ডিসেম্বর ২০০৫*

৮৩৮. ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং ॥ সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ ঃ নির্দলীয় তদন্ত দাবি, *সংবাদ, ২ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৩৯. ফলোআপ ঃ জাতীয় নির্বাচনে আ' লীগ প্রার্থীর পক্ষে কাজ করাই অপরাধ ঃ চিলমারীতে পুরোহিতকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করা হয়েছে ॥ ৪০টি সংখ্যালঘু পরিবারের কাছে বিএনপি সন্ত্রাসীদের চাঁদা দাবি, *সংবাদ, ২ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৪০. ঐক্য পরিষদের সমাবেশ ঃ সরকার ঘটনা অস্বীকার করায় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বাড়ছে, *প্রথম আলো, ২ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৪১. বিএনপি সন্ত্রাসীদের হাত থেকে লোকনাথ আশ্রমের দর্শণার্থীরাও রেহাই পাচ্ছে না, *সংবাদ, ২ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৪২. শাহরিয়ার কবিরের মুক্তি ও সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধের দাবি করেছে ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি, *আজকের কাগজ, ২ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৪৩. নির্যাতনের ভয়ে দেশ ছেড়ে যাওয়ার সময় সাতক্ষীরা সীমান্তে ১১ সংখ্যালঘু আটক, *সংবাদ, ৩ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৪৪. মৌলভীবাজারের গ্রামে চাঁদা না পেয়ে সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু শিক্ষকের ধান কেটে নিয়েছে, *খবর, ৩ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৪৫. বিএনপি নেতা পরিচয় দিয়ে নরসিংদীতে হিন্দু পরিবারকে উচ্ছেদ করে বাড়ি দখল, *ভোরের কাগজ, ৩ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৪৬. কালিয়ার সংখ্যালঘুরা এখনো আতঙ্কে, *ভোরের কাগজ, ৩ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৪৭. মাদারীপুরে কালীমন্দিরে ব্যাপক ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ, *ভোরের কাগজ, ৩ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৪৮. সিলেটে সংলাপ ॥ খাসিয়া ও গারো নারীদের ভূমির মালিকানার অধিকার দিতে হবে, *ভোরের কাগজ, ৩ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৪৯. খুলনায় গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা ॥ সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধে প্রয়োজন রাজনৈতিক কমিটমেন্ট, *ভোরের কাগজ, ৪ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৫০. গৌরনদীতে অবাধে চলছে চাঁদাবাজি ॥ মৎস্যজীবীকে পিটিয়ে দেশ ছাড়ার হুমকি দিচ্ছে বিএনপি ক্যাডাররা, *ভোরের কাগজ, ৪ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৫১. কাশিয়ানীর এক সংখ্যালঘু ১৮ দিন ধরে নিখোঁজ, ২ আসামী গ্রেফতার, *প্রথম আলো, ৪ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৫২. গোপালগঞ্জে অপহৃত সংখ্যালঘু নেতাকে উদ্ধার করা যায়নি, *সংবাদ, ৪ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৫৩. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বীকার করেছেন, ৭৪টি হিন্দু পরিবার আক্রান্ত ৪২ টি মূর্তি ভাঙা হয়েছে, ধর্ষণের শিকার ৪, *সংবাদ, ৫ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৫৪. সংখ্যালঘুদের ওপর পৈশাচিক হামলার সরজমিন প্রতিবেদন, নির্যাতনের ঘটনার দশ ভাগের এক ভাগও প্রকাশিত হয়নি, *ভোরের কাগজ, ৫ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৫৫. ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক ॥ হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের বিষয়ে অর্থমন্ত্রীর কাছে জানতে চান বাজপেয়ী, *ভোরের কাগজ, ৫ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৫৬. সংখ্যালঘুদের ওপর পৈশাচিক হামলার সরজমিন প্রতিবেদন ॥ নির্যাতনের ঘটনার দশ ভাগের একভাগও প্রকাশিত হয়নি, *ভোরের কাগজ, ৫ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৫৭. ২ মাসে ৯ খুন, ৫ ডাকাতি, চুরি, ছিনতাই লেগেই আছে ॥ ঝালকাঠিতে হত্যাসহ সন্ত্রাস বেড়েছে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ হয়নি, *ভোরের কাগজ, ৫ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৫৮. বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের উদ্বেগ, বিচার দাবি, *ভোরের কাগজ, ৬ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৫৯. সাংসদের নির্দেশ উপেক্ষা করে বার বার হানা ॥ বগুড়ায় প্রাচীন মন্দিরের সম্পত্তি দখলে স্থানীয় বিএনপি মরিয়া, *ভোরের কাগজ, ৬ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৬০. সাম্প্রদায়িক হামলা অব্যাহত থাকায় পূজা উদযাপন পরিষদের উদ্বেগ, *ভোরের কাগজ, ৬ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৬১. পালং-এর এক বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি, *বাংলাদেশ অবজারভার, ৬ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৬২. ৫ জেলার প্রায় ৩০ হাজার সংখ্যালঘু ভারতে আশ্রয় নিয়েছে, *বাংলাদেশ অবজারভার, ৬ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৬৩. কারারুদ্ধ বিবেক শাহরিয়ার কবিরকে মুক্তি দিন সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ করুন ॥ এ্যামনেস্টি, *দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৬৪. নওগার সাপাহারের ফজুল্লাহপুর এখন সন্ত্রস্ত জনপদ ॥ সংখ্যালঘুদের চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ, *জনকণ্ঠ, ৬ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৬৫. রাউজানে সংখ্যালঘু নির্যাতন, জমির ধান কেটে নিয়ে গেছে বিএনপির ক্যাডার বাহিনী, দু'জন গুলিবিদ্ধ, *সংবাদ, ৭ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৬৬. নির্যাতনের মুখে ভারতে পালিয়ে যাওয়া হিন্দুদের পুশ-ইন চেষ্টা বিএসএফএর, *ভোরের কাগজ, ৭ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৬৭. সদরপুরে সংখ্যালঘু লোকজনকে মারধর, দেশ ত্যাগের হুমকি, *ভোরের কাগজ, ৭ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৬৮. শাহরিয়ার কবিরের মুক্তি দাবিতে চট্টগ্রামে মিছিল সমাবেশ ॥ সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন একাত্তরকেও হার মানিয়েছে ঃ নাগরিক অধিকার নেতৃবৃন্দ, *ভোরের কাগজ, ৭ ডিসেম্বর*

৮৬৯. সন্দ্বীপে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দেশ ত্যাগের নির্দেশ, *বাংলাদেশ অবজারভার, ৮ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৭০. মুক্তিপণের দাবীতে যুবক অপহৃত, *বাংলাদেশ অবজারভার, ৮ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৭১. চেয়ারম্যান ও পুলিশের সহযোগিতায় জামাত নেতার কাণ্ড ॥ সাতক্ষীরায় এক হিন্দু পরিবারকে ভারতে পাচার করে বিপুল সম্পত্তি জবরদখল, *ভোরের কাগজ, ৮ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৭২. যেভাবে নির্যাতিত কুলুবালাকে দিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের নাটক করেছে কথিত সন্ত্রাসীরা, *সংবাদ, ৮ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৭৩. কচুয়ায় ৬ সংখ্যালঘু যুবতীকে ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে তোলপাড় ॥ পুলিশ ধামাচাপা দিতে ব্যস্ত, *সংবাদ, ৮ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৭৪. হয় চাঁদা দাও, না হয় প্রতিরাতে একটি করে মেয়ে দাও। ৫০ খ্রিস্টান পরিবারের হুমকির মুখে বসবাস, *জনকণ্ঠ, ৮ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৭৫. স্বামীবাগ আশ্রমে প্রার্থনা সঙ্গীতকালে বোমা পড়েছে, *জনকণ্ঠ, ৯ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৭৬. গলাচিপায় অবাধে চলছে ছিনতাই রাহাজানি, *জনকণ্ঠ, ৯ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৭৭. চাঁদাবাজরা মাখন লালের মেয়ে দাবি করেছে, স্ত্রীর সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারেনি বিষ্ণু জেলে ঃ বাগেরহাটের চিতলমারীতে লাদেনের ছবিঅলা প্যাডে চলছে চাঁদাবাজি!, *জনকণ্ঠ, ৯ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৭৮. অধ্যক্ষ মুহুরী হত্যায় তদন্ত ঝিমিয়ে পড়েছে, ধরা ছোয়ার বাইরে ৬ আসামি, *ভোরের কাগজ, ৯ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৭৯. রাউজানে ছাত্রলীগ নেতাকে জবাই করে হত্যা, *ভোরের কাগজ, ৯ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৮০. বড়লেখায় এক সংখ্যালঘুর দোকান ভাঙচুর ও লুট করেছে জামাত নেতা, *ভোরের কাগজ, ৯ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৮১. শাহরিয়ার কবির গ্রেফতার ও সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে সিডনিতে প্রবাসীদের বিক্ষোভ, *দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৮২. ইটনার উন্মুক্ত জলাশয়ে লাঠিয়াল বাহিনীর দাপট অব্যাহত ঃ সংখ্যালঘু জেলে সম্প্রদায়ের ঘরে ঘরে বাতাস ভারি করা হাহাকার, *সংবাদ, ১০ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৮৩. তানোর ঃ সংখ্যালঘুদের তিনটি দোকান দখল করেছে বিএনপি নেতা, *সংবাদ, ১০ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৮৪. গৌরনদীতে সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলা ॥ আগৈলঝাড়ায় লুটপাট ঃ বাগেরহাটে অনাড়ম্বর পূজা, *ইত্তেফাক, ১১ডিসেম্বর ২০০১*

৮৮৫. রূপসায় পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ সাধারণ সম্পাদকের বাড়িতে হামলা, *বাংলাদেশ অবজারভার, ১১ডিসেম্বর ২০০১*

৮৮৬. খিস্টান সম্প্রদায়ের ওপর হামলার নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশন, *বাংলাদেশ অবজারভার, ১১ডিসেম্বর ২০০১*

৮৮৭. রায়েরবাজারের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত পুলপাড় এখনো আতঙ্কিত জনপদ ঃ নির্বাচনের আড়াই মাস পরও চাঁদাবাজি, হত্যার হুমকি, নির্যাতন চলছে, *ভোরের কাগজ, ১১ডিসেম্বর ২০০১*

৮৮৮. সন্ত্রাসী কর্তৃক খ্রিস্টান পরিবারের সদস্য অপহরণের অভিযোগ, *ডেইলি স্টার, ১১ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৮৯. লালমনিরহাটে সন্ত্রাসীদের হামলায় পাঁচ সংখ্যালঘু যুবক আহত, *জনকণ্ঠ, ১১ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৯০. সিরাজগঞ্জে ঈদকে সামনে রেখে চলছে চাঁদাবাজি ॥ সংখ্যালঘু, আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরাই মূল টার্গেট, ভোরের কাগজ, ১১ ডিসেম্বর ২০০১

৮৯১. গরু চুরি, ভোরের কাগজ, ১২ ডিসেম্বর ২০০১

৮৯২. কারমাইকেলে সংখ্যালঘু শিক্ষককে পিটিয়েছে শিবির ক্যাডার, *জনকণ্ঠ, ১২ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৯৩. সংখ্যালঘু নির্যাতন ও নারী ধর্ষণের বিরুদ্ধে খুলনায় মানববন্ধন পালিত, *জনকণ্ঠ, ১২ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৯৪. বাগেরহাটে সংখ্যালঘু ৯টি বাড়িতে ডাকাতি, *সংবাদ, ১৩ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৯৫. মাগুরার শ্রীপুরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঃ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে চলছে মুক্তিপণ আদায় ও চাঁদাবাজির ঘটনা, *সংবাদ, ১৩ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৯৬. চাঁদা না দেয়ায় রাঙ্গুনিয়ায় সোনার দোকান লুট করেছে বিএনপির সন্ত্রাসীরা ॥ রংপুরে কালী মন্দির ভাংচুর, *জনকণ্ঠ, ১৩ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৯৭. রংপুরে কালীমন্দিরে সন্ত্রাসী হামলা প্রতিমা ভাঙচুর, ভোরের কাগজ, ১৩ ডিসেম্বর ২০০১

৮৯৮. সাভারে সংখ্যালঘু পরিবারে সন্ত্রাসীদের হামলা : গৃহকর্তা গুরুতর আহত, *প্রথম আলো, ১৪ ডিসেম্বর ২০০১*

৮৯৯. নরসিংদীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৯ বাড়িতে হামলা, *বাংলাবাজার পত্রিকা, ১৪ ডিসেম্বর ২০০১*

৯০০. এবার খ্রীষ্টান পল্লীতে যুবদলের শাসনকায়েম, *সংবাদ, ১৪ ডিসেম্বর ২০০১*

৯০১. বরগুনায় সংখ্যালঘু পরিবারের উপর বিএনপি সন্ত্রাসীদের হামলা, অগ্নিসংযোগ, *প্রথম আলো, ১৪ ডিসেম্বর ২০০১*

৯০২. সামাজিক আন্দোলনের তথ্য, সম্পত্তি দখলের লোভে সংখ্যালঘুদের উপর বর্বরতা অব্যাহত রয়েছে, *প্রথম আলো, ১৪ ডিসেম্বর ২০০১*

৯০৩. আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ করায় মাগুরায় এক হিন্দু ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে জখম, *জনকণ্ঠ, ১৫ ডিসেম্বর ২০০১*

৯০৪. সরজমিন রাজশাহীর ঝালুকা গ্রাম ঃ 'ছবি তুলে কি হবে, শালা মালাউনের বাচ্চাদের এদেশে থাকতে দেয়া হবে না?', *সংবাদ, ১৫ ডিসেম্বর ২০০১*

৯০৫. বাগেরহাটে হিন্দু বাড়িতে গণডাকাতি লুটপাট, হুমকি, ভোরের কাগজ, *১৫ ডিসেম্বর ২০০১*

৯০৬. তারা ভারত যাচ্ছিল শ্যামনগরে ২৮ জন সংখ্যালঘু সদস্য গ্রেফতার প্রথম, *সংবাদ, ১৬ ডিসেম্বর ২০০১*

৯০৭. কুমিল্লার পল্লীতে ইউপি চেয়ারম্যান বাড়িসহ তিন বাড়িতে ডাকাতি চেয়ারম্যানকে হুমকি, ভোরের কাগজ, ২০ ডিসেম্বর ২০০১

৯০৮. সাতক্ষীরার মৌখালিতে হিন্দু পাড়ায় লুট, ভাঙচুর, আগুন আহত ৩০ জন, ভোরের কাগজ, ২০ ডিসেম্বর ২০০১

৯০৯. কালীগঞ্জে সংখ্যালঘু পরিবারের উপর সন্ত্রাসী হামলা, আহত- ৩০, *প্রথম আলো, ২০ ডিসেম্বর ২০০১*

৯১০. সাঁথিয়ায় শ্মশান ঘাট দখলের চেষ্টা ব্যর্থ, *সংবাদ, ২১ ডিসেম্বর ২০০১*

৯১১. মূর্তি চুরি, *ভোরের কাগজ, ২১ ডিসেম্বর ২০০১*

৯১২. রাঙ্গামাটিতে পাহাড়ি যুবক হত্যা, অপহৃত হয়েছে এক ট্রাক ড্রাইভার, *ভোরের কাগজ, ২১ ডিসেম্বর ২০০১*

৯১৩. শাহরিয়ার কবিরের আটকাদেশের মেয়াদ আরও ৯০ দিন বৃদ্ধি ॥ জামিনের আবেদন তৃতীয় বার নাকচ, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, *২১ ডিসেম্বর ২০০১*

৯১৪. ঈদের রাতে ধামরাইয়ের পল্লীতে মূর্তি চুরি, ভোরের কাগজ, ২২ ডিসেম্বর ২০০১

৯১৫. মামলা করার সাহস দেখালো না কেউ, স্থানীয়ভাবে মীমাংসার চেষ্টা চলছে, গোপালগঞ্জের গ্রামে তুচ্ছ ঘটনায় সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা, *ভোরের কাগজ*, *২২ ডিসেম্বর ২০০১*

৯১৬. গোপালগঞ্জে ৬টি সংখ্যালঘু পরিবার আতঙ্কে রয়েছে, *যুগান্তর*, ২২ *ডিসেম্বর ২০০১*

৯১৭. নড়াইলে ছাত্রদল নেতা আহত, ধর্ষণের পর গৃহবধূ হত্যা, আওয়ামী লীগ কর্মীর রগ কর্তন, *প্রথম আলো*, ২৩ *ডিসেম্বর ২০০১*

৯১৮. দেড় লাখ টাকা লুট ॥ রাজশাহীতে ডাকাতি, *বাংলাদেশ অবজারভার*, *২৪ নবেম্বর ২০০১*

৯১৯. কুয়াকাটার রাখাইনদের জমির ধান লুট করে নিচ্ছে বিএনপি সন্ত্রাসীরা ॥ পুলিশ নীরব দর্শক, *জনকণ্ঠ*, *২৪ ডিসেম্বর ২০০১*

৯২০. আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ছেলের পুলিশের চাকরি হয়নি তাই নারায়ণ ঠাকুরের গাভী লুট, *জনকণ্ঠ*, *২৪ ডিসেম্বর ২০০১*

৯২১. মাগুরায় পোস্টার টাঙ্গিয়ে সংখ্যালঘুদের প্রতি হুমকি, *জনকণ্ঠ*, *২৪ ডিসেম্বর ২০০১*

৯২২. রায়পুরায় মন্দির থেকে মুর্তি চুরি, ভোরের কাগজ, ২৪ ডিসেম্বর ২০০১

৯২৩. সংখ্যালঘু নির্যাতন : ঘটনাস্থল গোপালগঞ্জের বিজয়পাশা গ্রাম-ডা. অসিত সরকারসহ ৬টি পরিবার এখন চরম নিরাপত্তহীনতার শিকার, *প্রথম আলো*, *২৫ ডিসেম্বর ২০০১*

৯২৪. ৫ শতাদিক ধর্ষণ ঃ সরকারের চোখ এখনো বন্ধ!, *ভোরের কাগজ*, *২৫ ডিসেম্বর ২০০১*

৯২৫. চাঁদা না দিলে সংখ্যালঘু পরিবারের মেয়েকে অপহরণের হুমকি ॥ সন্ত্রাসী গ্রেফতার, *জনকণ্ঠ*, *২৫ডিসেম্বর ২০০১*

৯২৬. স্বরূপকাঠীতে সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে, *জনকণ্ঠ*, *২৫ডিসেম্বর ২০০১*

৯২৭. জনসংহতি সমিতির নেতা হত্যাকাণ্ড, অপহৃত কিশোর উদ্ধার হয়নি, চুক্তির পক্ষ-বিপক্ষ গ্রুপে সংঘর্ষ, *প্রথম আলো*, *২৬ ডিসেম্বর ২০০১*

৯২৮. বাংলাদেশের হিন্দুরা ‘আর ফিরে যাবে না’, *ডেইলি স্টার*, *২৬ ডিসেম্বর ২০০১*

৯২৯. চাটমোহরে চাঁদাবাজদের হুমকির মুখে চরম নিরাপত্তাহীনতায় এক সংখ্যালঘু শিক্ষক, ভোরের কাগজ, ২৭ ডিসেম্বর ২০০১

৯৩০. ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে কিশোরগঞ্জে হিন্দু বিধবার স্তন কর্তন, *জনকণ্ঠ*, *২৭ ডিসেম্বর ২০০১*

৯৩১. জোট সন্ত্রাসে মানুষ দিশাহারা ॥ যশোরে সংখ্যালঘু ২৭ বাড়িতে ডাকাতি, বরিশালে দুই ছাত্র ও এক যুবদল নেতা গ্রেফতার, *জনকণ্ঠ*, *২৮ ডিসেম্বর ২০০১*

৯৩২. বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের তদন্ত হওয়া উচিত ॥ অ্যামনেস্টি মহাসচিব, *জনকণ্ঠ*, *২৮ ডিসেম্বর ২০০১*

৯৩৩. হাতিয়ায় স্বামীকে পিটিয়ে জখম ॥ স্ত্রীর শ্লীলতাহানি, *ইত্তেফাক*, *২৮ ডিসেম্বর ২০০১*

৯৩৪. পুঠিয়ায় আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ॥ ক্ষমতাসীনদের নির্যাতন ছাড়াও বেড়ে গেছে চুরি ডাকাতি ধর্ষণ, *সংবাদ*, *২৯ ডিসেম্বর ২০০১*

৯৩৫. সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করুন ॥ দায়ীদের বিচার হওয়া উচিত ঃ অ্যামনেস্টি মহাসচিব, *ভোরের কাগজ*, *২৯ ডিসেম্বর ২০০১*

৯৩৬. বাড়ি বিক্রি করে অন্যত্র চলে যেতে চেয়েছিলেন ॥ চাঁদা না পেয়ে ফেনীতে বিএনপি সন্ত্রাসীরা প্রবীণকে পিটিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে, ভোরের কাগজ, *২৯ ডিসেম্বর ২০০১*

৯৩৭. কেশবপুরের পল্লীতে ২৮ বাড়ি থেকে চাঁদা আদায় করেছে দুষ্কৃতকারীরা, *ভোরের কাগজ*, *২৯ ডিসেম্বর ২০০১*

৯৩৮. ফেনিতে সন্ত্রাসীদের হাতে প্রহৃত হয়ে ১ ব্যক্তির মৃত্যু, *প্রথম আলো*, *২৯ ডিসেম্বর ২০০১*

৯৩৯. সাতকানিয়ায় মন্দিরের জায়গা দখল নিয়ে সংঘর্ষ আহত ৫, গ্রেফতার ৫, *ভোরের কাগজ*, *৩০ ডিসেম্বর ২০০১*

৯৪০. বানারীপাড়ায় গার্লস স্কুলের নামে বরাদ্দ বাড়ী দখল ॥ মন্দিরও দখলের পাঁয়তারা, *জনকণ্ঠ*, *৩০ ডিসেম্বর ২০০১*

৯৪১. সেনবাগে মন্দিরে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় শিবির ক্যাডার গ্রেফতার, *ইত্তেফাক*, *৩১ ডিসেম্বর ২০০১*

৯৪২. সিঙ্গাইরে সংখ্যালঘুর ওপর নির্যাতন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা, *ইত্তেফাক*, *৩১ ডিসেম্বর ২০০১*

৯৪৩. সোনাগাজীতে এক ব্যক্তি খুন, *ইত্তেফাক*, *৩১ ডিসেম্বর ২০০১*

জানুয়ারি ২০০২

৯৪৪. সেনবাগে কালী মন্দির ও বঙ্গবন্ধুর ছবিতে অগ্নিসংযোগ ॥ শিবির ক্যাডার গ্রেফতার, *আজকের কাগজ, ১ জানুয়ারি ২০০২*

৯৪৫. দেশব্যাপী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঃ অপ্রতিরোধ্যভাবে সংঘর্ষ, লুটপাট ও ছিনতাই চলছে, *বাংলাদেশ অবজারভার, ১ জানুয়ারি ২০০২*

৯৪৬. হিজলায় সন্ত্রাস চলছেই ॥ পুলিশ নিষ্ক্রিয়, শূন্য ভিটায় ফিরে এসেছে মালতী রাণী, *জনকণ্ঠ, ১ জানুয়ারি ২০০২*

৯৪৭. নগদ অর্থ ও সোনা লুট, *ইনডিপেনডেন্ট, ১ জানুয়ারি ২০০২*

৯৪৮. সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনায় তোলপাড়, *রূপালী, ১ জানুয়ারি ২০০২*

৯৪৯. সাতক্ষীরায় সংখ্যালঘু পরিবারের দোকান ও বাড়িতে হামলা, *জনকণ্ঠ, ৩ জানুয়ারি ২০০২*

৯৫০. বাগেরহাটে সন্ত্রাসীদের হাতে ৫ সংখ্যালঘু নারী লাঞ্ছিত উচ্ছেদের পাঁয়তারা, *জনকণ্ঠ, ৩ জানুয়ারি ২০০২*

৯৫১. প্রথম আলোকে সাক্ষাৎকারে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিব আইরিন খান ॥ সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে ঃ নির্বাচনে জনগণ ভোট দিয়েছে পরিবর্তনের জন্য, *প্রথম আলো, ৩ জানুয়ারি ২০০২*

৯৫২. আড়াইহাজার ও ফতুল্লায় ডাকাতি, আহত ১০, *খবর, ৪ জানুয়ারি ২০০২*

৯৫৩. শেরপুরে ছাত্রদল ক্যাডারদের চাঁদাদাবি ॥ বাড়িঘরে হামলা ঃ ২ ছাত্রদল কর্মী গ্রেফতার, *খবর, ৪ জানুয়ারি ২০০২*

৯৫৪. শেরপুরের ঝিনাইগাতীর খ্রিস্টান পল্লীবাসী সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি, *আজকের কাগজ, ৪ জানুয়ারি ২০০২*

৯৫৫. কলমাকান্দায় সন্ত্রাসীরা এক সংখ্যালঘুর বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে, মূর্তি ভাংচুর, *যুগান্তর, ৫ জানুয়ারি ২০০২*

৯৫৬. ক্ষিদিরপুর গ্রামে এখনো সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন চলছে, *সংবাদ, ৫ জানুয়ারি ২০০২*

৯৫৭. কেমন আছেন সংখ্যালঘুরা ঃ নির্যাতিত সংখ্যালঘুরা বাড়িঘরে ফিরে নতুন সমস্যার মুখে পড়ছেন চালচুলোর কিছুই নেই!, *জনকণ্ঠ, ৬ জানুয়ারি ২০০২*

৯৫৮. একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী-পুত্রের আর্তি, *মাতৃভূমি, ৬ জানুয়ারি ২০০২*

৯৫৯. কক্সবাজারে ছাত্রলীগ কর্মী খুন, বরিশালে আরেক ক্যাডার জখম, *প্রথম আলো, ৭ জানুয়ারি ২০০২*

৯৬০. কক্সবাজারে ছাত্রলীগ কর্মীকে অপহরণের পর নির্যাতন করে হত্যা, *জনকণ্ঠ, ৮ জানুয়ারি ২০০২*

৯৬১. রূপসায় এসিডে ঝলসে গেছে স্বামী-স্ত্রীর মুখমণ্ডল, *ভোরের কাগজ, ৮ জানুয়ারি ২০০২*

৯৬২. প্রতিবাদে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় ঃ শাঁখারি বাজারে মন্দিরে ঢুকে মূর্তি ভেঙেছে এক দুর্বৃত্ত, *সংবাদ, ৯ জানুয়ারি ২০০২*

৯৬৩. বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন ঃ ১৪ জানুয়ারি জাতিসংঘের সামনে গণঅনশন, *সংবাদ, ৯ জানুয়ারি ২০০২*

৯৬৪. লক্ষীপুরে বাড়ীতে সন্ত্রাসীদের হামলা, *ইত্তেফাক, ১০ জানুয়ারি ২০০২*

৯৬৫. গোয়ালন্দে মূর্তি ভাঙচুর করেছে দুষ্কৃতকারীরা, *প্রথম আলো, ১০ জানুয়ারি ২০০২*

৯৬৬. নবীগঞ্জে স্টুডিওতে ডাকাতি, *ইত্তেফাক, ১০ জানুয়ারি ২০০২*

৯৬৭. প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় নরসিংদীতে কিশোরী এসিডদগ্ধ, *যুগান্তর, ১১ জানুয়ারি ২০০২*

৯৬৮. নাটোরে আদিবাসী পরিবারের জমি ও মহাশ্মশান দখল, *যুগান্তর, ১১ জানুয়ারি ২০০২*

৯৬৯. নেত্রকোনার পূর্বধলায় সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব, লুটপাট ॥ আহত ৬, *আজকের কাগজ, ১১ জানুয়ারি ২০০২*

৯৭০. চৌমুহনীতে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর পুজামণ্ডপের ঘাট দখল ঃ স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম ক্ষোভ, নিন্দা ও উত্তেজনা, *আজকের কাগজ, ১১ জানুয়ারি ২০০২*

৯৭১. শনিদেবের মন্দিরে ভাংচুর ঃ কামাল আবার রিমান্ডে ॥ ২ সহযোগীকে খুঁজছে পুলিশ, *আজকের কাগজ, ১১ জানুয়ারি ২০০২*

৯৭২. যশোরে চরমপন্থী দলের পরিচয়ে সংখ্যালঘু বাড়িতে ব্যাপক ডাকাতি ॥ পুলিশ বলছে দস্যুতা, *জনকণ্ঠ, ১২ জানুয়ারি ২০০২*

৯৭৩. অ্যাসিড নিক্ষেপ ॥ দাউদকান্দিতে এক সংখ্যালঘু পরিবারের ৪ জন আহত, *সংবাদ, ১২ জানুয়ারি ২০০২*

৯৭৪. তাড়াশের মানুষ সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি, *জনকণ্ঠ, ১২ জানুয়ারি ২০০২*

৯৭৫. কাশিয়ানির সংখ্যালঘু নেতা মনোরঞ্জনের লাশ প্রায় দু'মাস পর উদ্ধার, *ভোরের কাগজ, ১৩ জানুয়ারি ২০০২*

৯৭৬. নির্যাতনের ১২ মামলারই ভবিষ্যত অনিশ্চিত ॥ চাপা দেয়া হচ্ছে প্রত্যাহারের জন্য, দরখাস্তও পড়েছে, *জনকণ্ঠ, ১৩ জানুয়ারি ২০০২*

৯৭৭. বগুড়ার শেরপুরে যুবক খুন, *সংবাদ, ১৪ জানুয়ারি ২০০২*

৯৭৮. মধুখালীতে সংখ্যালঘুদের ১০টি দোকান ভাঙচুর, *সংবাদ, ১৪ জানুয়ারি ২০০২*

৯৭৯. নরসিংদীতে বিএনপি সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব মামলা করে সংখ্যালঘুরা বেকায়দায়, *ভোরের কাগজ, ১৪ জানুয়ারি ২০০২*

৯৮০. পাইকগাছায় অপহৃত কৃষ্ণপদকে ৩ দিনেও উদ্ধার করা যায়নি, *ভোরের কাগজ, ১৪ জানুয়ারি ২০০২*

৯৮১. চিঠিতে গভীর উদ্বেগ ঃ প্রধানমন্ত্রীর কাছে হিন্দু নির্যাতনের বিষয়ে জানতে চেয়েছেন মার্কিন কংগ্রেসম্যান, *ভোরের কাগজ, ১৪ জানুয়ারি ২০০২*

৯৮২. সংখ্যালঘুদের মধ্যে এখনও নীরব আতঙ্ক, দেখার কেউ নেই, গোপনে দেশ ছাড়ছেন অনেকেই, *জনকণ্ঠ, ১৪ জানুয়ারি ২০০২*

৯৮৩. নির্যাতনের নতুন কৌশল পাল্টা মামলা দায়ের ॥ রেহাই পেতে বিএনপি নেতাদের চাঁদা প্রদান, *জনকণ্ঠ, ১৫ জানুয়ারি ২০০২*

৯৮৪. ঝিনাইগাতীতে সংখ্যালঘু আদিবাসীরা সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি ভূয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে জমিজিরেত হাতিয়ে নিচ্ছে, *সংবাদ, ১৫ জানুয়ারি ২০০২*

৯৮৫. ঝিনাইদহে হোটেল ব্যবসায়ী অধ্যাপকের কাছ থেকে টাকা আদায় ঃ ২ দারোগার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ, *ভোরের কাগজ, ১৫ জানুয়ারি ২০০২*

৯৮৬. পাংশায় প্রভাবশালীদের দখলে এক সংখ্যালঘুর বসতবাড়ি, *প্রথম আলো, ১৬ জানুয়ারি ২০০২*

৯৮৭. বাগেরহাটে নতুন আতঙ্ক ঃ ডাকাতির পর নারী নির্যাতন ঃ মোড়েলগঞ্জ ও কচুয়ায় ৯ বাড়িতে ডাকাতি ॥ মা মেয়েসহ ৪ মহিলার শ্লীলতাহানি, *জনকণ্ঠ, ১৬ জানুয়ারি ২০০২*

৯৮৮. লর্ড হার্ডিঞ্জে হিন্দু বাড়ি দখল করেছে নব্য প্রভাবশালীরা ॥ সাংবাদিকদের হাত-পা ভেঙ্গে দেয়ার হুমকি, *জনকণ্ঠ, ১৬ জানুয়ারি ২০০২*

৯৮৯. সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে নিউইয়র্কে জাতিসঙ্ঘের সামনে সমাবেশ, *ইত্তেফাক, ১৬ জানুয়ারি ২০০২*

৯৯০. চরফ্যাশনে নির্বাচনের পর ১৭ মহিলার শ্লীলতাহানি, *ইত্তেফাক, ১৬ জানুয়ারি ২০০২*

৯৯১. ধনবাড়ীতে চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি, *ইত্তেফাক, ১৬ জানুয়ারি ২০০২*

৯৯২. সফররত দুই কংগ্রেস সদস্যের কাছে স্মারকলিপি ॥ সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ, মৌলবাদী তৎপরতা নিষিদ্ধ ও শাহরিয়ার কবিরের মুক্তি দাবিতে জাতিসংঘের সামনে বিক্ষোভ অনশন, *জনকণ্ঠ, ১৬ জানুয়ারি ২০০২*

৯৯৩. ভোটকেন্দ্রে যেতে মানা! ॥ বরগুনার সংখ্যালঘু গ্রামে সন্ত্রাসীদের হানা, *প্রথম আলো, ১৭ জানুয়ারি ২০০২*

৯৯৪. রাজশাহীর দুর্গাপুরে বিএনপি সমর্থকদের নির্যাতন চলছেই, *সংবাদ, ১৭ জানুয়ারি ২০০২*

৯৯৫. অনেক ঘটনাই রয়েছে অন্তরালে ॥ উজালার মৃত্যু অনেক প্রশ্ন রেখে গেছে ॥ দুই উপজেলায় নির্যাতনের কোন উত্তর নেই, *জনকণ্ঠ, ১৭ জানুয়ারি ২০০২*

৯৯৬. সংখ্যালঘু নির্যাতন দমনে সরকার ব্যর্থ ॥ আলোচনাসভা, *জনকণ্ঠ, ১৮ জানুয়ারি ২০০২*

৯৯৭. সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনার পর বিচার না পাওয়া মানুষ এখন দিশাহারা ফায়দা লুটেছে বিভিন্ন মহল, *জনকণ্ঠ, ১৮ জানুয়ারি ২০০২*

৯৯৮. ধামরাইয়ে গৃহকর্তাসহ সকলকে বেঁধে ডাকাতি, *ভোরের কাগজ, ১৮ জানুয়ারি ২০০২*

৯৯৯. সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রসঙ্গে বক্তব্য চেয়ে আদালতের নির্দেশ মানলো না সরকার, *ভোরের কাগজ, ১৮ জানুয়ারি ২০০২*

১০০০. বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে জাতিসংঘের সামনে প্রতীক গণঅনশন, *ভোরের কাগজ, ১৮ জানুয়ারি ২০০২*

১০০১. ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজকে হত্যার হুমকি, *খবর, ১৮ জানুয়ারি ২০০২*

১০০২. ঠাকুরগাঁয়ে ন্যাপ নেতার বাড়িতে হামলা ঃ স্ত্রী ও পুত্র গুরুতর আহত, *যুগান্তর, ১৮ জানুয়ারি ২০০২*

১০০৩. কেরানীগঞ্জে সংখ্যালঘুদের বাড়ি দখল ঃ সাতটি পরিবার ঘরছাড়া, *যুগান্তর, ১৯ জানুয়ারি ২০০২*

১০০৪. সন্দ্বীপের এক সহায়হীন সংখ্যালঘু পরিবার পালিয়ে বেড়াচ্ছে ঃ যুবদল ক্যাডারের চাঁদাবাজির দৌরাত্ম্য, *সংবাদ, ১৯ জানুয়ারি ২০০২*

১০০৫. কেরানীগঞ্জে চাঁদার দাবীতে সংখ্যালঘুর বাড়িতে হামলা, *ইত্তেফাক, ১৯ জানুয়ারি ২০০২*

১০০৬. পুলিশ পাহারায় নাটোরের আড়াই শ' পরিবার, *জনকণ্ঠ, ২০ জানুয়ারি ২০০২*

১০০৭. খোদ কেরানীগঞ্জেই সংখ্যালঘু পরিবার আক্রান্ত অবরুদ্ধ!, *জনকণ্ঠ, ২১ জানুয়ারি ২০০২*

১০০৮. পাইকগাছায় সংখ্যালঘুদের তিনটি চিংড়ি ঘের দখল, *জনকণ্ঠ, ২১ জানুয়ারি ২০০২*

১০০৯. সংখ্যালঘু নির্যাতন ঃ চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় গাইবান্ধায় ১ দম্পতিকে দেশ ছাড়ার হুমকি, *সংবাদ, ২১ জানুয়ারি ২০০২*

১০১০. দাউদকান্দিতে দেবোত্তর সম্পত্তি দখলের পাঁয়তারা ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা, *সংবাদ, ২১ জানুয়ারি ২০০২*

১০১১. লক্ষ্মীপুরে চাঁদার দাবিতে সংখ্যালঘুদের বাড়িতে হামলা লুটপাট, *যুগান্তর, ২১ জানুয়ারি ২০০২*

১০১২. শাঁখারীবাজারে মূর্তি ভাঙচুরের প্রতিবাদ মিছিলে হামলা, আহত ২০, *আজকের কাগজ, ২১ জানুয়ারি ২০০২*

১০১৩. নাটোরের উদীশা গ্রামে চাঁদাবাজি অব্যাহত ঃ সংখ্যালঘুদের রক্ষা করতে পুলিশি পাহারা ॥ সর্বহারাদের হুমকিমুলক চিঠি 'তোর মৃত্যু অনিবার্য', *সংবাদ, ২১ জানুয়ারি ২০০২*

১০১৪. মুক্তি পাওয়ার পর সাক্ষাৎকারে শাহরিয়ার কবির ঃ ছবিটি শেষ করবোই, *ভোরের কাগজ, ২১ জানুয়ারি ২০০২*

১০১৫. সাবেক ও বর্তমান আমলের সংখ্যালঘু নির্যাতনের দুইরিটে আজ আদেশ, *প্রথম আলো, ২২ জানুয়ারি ২০০২*

১০১৬. রাঙামাটিতে পকেট মারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, তিন মহিলা সহ আহত-৭, *প্রথম আলো, ২২ জানুয়ারি ২০০২*

১০১৭. কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গায় গৃহবধূ ও যুবক খুন, খুলনায় আওয়ামী লীগ কর্মী ঘের মালিককে গুলি করে হত্যা, *প্রথম আলো, ২৩ জানুয়ারি ২০০২*

১০১৮. ঝালকাঠিতে সংখ্যালঘুদের ওপর বিএনপির হামলা, আহত ১০, *সংবাদ, ২৪ জানুয়ারি ২০০২*

১০১৯. মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করেছে ডাকাতদল, *দি নিউ নেশন, ২৫ জানুয়ারি ২০০২*

১০২০. ঝালকাঠিতে হিন্দুপাড়ায় হামলা ঃ ছাত্রদল নেতা গ্রেফতার, *যুগান্তর, ২৫ জানুয়ারি ২০০২*

১০২১. বেড়ায় সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা ঃ মাতা পুত্র আহত, *যুগান্তর, ২৫ জানুয়ারি ২০০২*

১০২২. বগুড়ায় কালী মূর্তি ভাংচুর ঃ উত্তেজনা, *যুগান্তর, ২৬ জানুয়ারি ২০০২*

১০২৩. ইরি ব্লক থেকে শ্যালো মেশিন ও পার্টস চুরি—৫০ বিঘা জমি সেচবঞ্চিত ঃ মোল্লাহাটে সংখ্যালঘুদের এক কোটি টাকার মাছ চুরি, *জনকণ্ঠ, ২৬ জানুয়ারি ২০০২*

১০২৪. খুলনায় সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসী হামলা, গ্রামবাসীর প্রতিরোধ ঃ নিজামীর গাড়ি আটকে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার দাবি, *ভোরের কাগজ, ২৬ জানুয়ারি ২০০২*
১০২৫. ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ ঃ ঠাকুরগাঁওয়ে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ৪ মহিলার শ্লীলতাহানি, আহত ১০, *সংবাদ, ২৭ জানুয়ারি ২০০২*
১০২৬. বগুড়ার হরিপুর মন্দিরের দরজা-জানালা ও মূর্তি ভাঙচুর, *প্রথম আলো, ২৭ জানুয়ারি ২০০২*
১০২৭. শ্রীপুরের পল্লীতে ডাকাতি, *ভোরের কাগজ, ২৭ জানুয়ারি ২০০২*
১০২৮. চৌগাছার হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামে বিএনপি সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব, পুলিশের গুলিবর্ষণ ঃ গুলিবিদ্ধ ৬ সহ আহত ৪০ জন, *ভোরের কাগজ, ২৭ জানুয়ারি ২০০২*
১০২৯. বাউফলে চাঁদা না পেয়ে হিন্দু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসীদের হামলা, আহত ৮, *প্রথম আলো, ২৮ জানুয়ারি ২০০২*
১০৩০. আমতলীতে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর নির্যাতন, *প্রথম আলো, ২৮ জানুয়ারি ২০০২*
১০৩১. বেড়ায় সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যদের মারধর লুট, *যুগান্তর, ২৮ জানুয়ারি ২০০২*
১০৩২. যশোরে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার অভিযোগে বিএনপি নেতা গ্রেফতার, *সংবাদ, ২৮ জানুয়ারি ২০০২*
১০৩৩. মৃত্যু ভয়ে ভীত নই ॥ শাহরিয়ার কবির, *ইত্তেফাক, ২৮ জানুয়ারি ২০০২*
১০৩৪. বাউফলে বিএনপি চাঁদাবাজদের হিন্দু বাড়িতে হামলা॥ মা ও দুই মেয়ের শ্লীলতাহানি, *জনকণ্ঠ, ২৯ জানুয়ারি ২০০২*
১০৩৫. নওগাঁয় সংখ্যালঘু পরিবারকে হুমকি ঃ ৫০ হাজার টাকা দিবি, না হয় দেশ ছেড়ে চলে যাবি, *ভোরের কাগজ, ২৯ জানুয়ারি ২০০২*
১০৩৬. মহেশখালীতে সংখ্যালঘু নির্যাতন চলছে, *সংবাদ, ২৯ জানুয়ারি ২০০২*
১০৩৭. ঠাকুরগাঁয়ে ৪০টি পরিবার ঘর-বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছে, *বাংলাদেশ অবজারভার, ২৯ জানুয়ারি ২০০২*
১০৩৮. সাতকানিয়ায় সংখ্যালঘু নেতার বাড়িতে হামলা-লুটপাট, *ভোরের কাগজ, ৩০ জানুয়ারি ২০০২*
১০৩৯. লক্ষ্মীপুরে কালীমন্দির ভাংচুর, *ইত্তেফাক, ৩১ জানুয়ারি ২০০২*
১০৪০. ঝালকাঠিতে সন্ত্রাসীদের লুটপাট, *খবর, ৩১ জানুয়ারি ২০০২*
১০৪১. নবাবগঞ্জে মন্দিরে হামলা ৬টি প্রতিমা ভাঙচুর, *প্রথম আলো, ৩১ জানুয়ারি ২০০২*
১০৪২. হাসপাতালে আহত প্রাণতোষকে বোমা মেরে হত্যার হুমকি, *সংবাদ, ৩১ জানুয়ারি ২০০২*

ফেব্রুয়ারি ২০০২

১০৪৩. সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে ॥ সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী জাতীয় সমাবেশ, *জনকণ্ঠ, ১ ফেব্রুয়ারি ২০০২*
১০৪৪. ভৈরবে মন্দিরের সেবায়েত প্রহৃত, *যুগান্তর, ১ ফেব্রুয়ারি ২০০২*
১০৪৫. নবাবগঞ্জে প্রতিমা ভাঙচুর, *যুগান্তর, ১ ফেব্রুয়ারি ২০০২*
১০৪৬. সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সমাবেশে বক্তারা ॥ মুক্তিযুদ্ধের সকল শক্তিকে এক মঞ্চে আনুন, *সংবাদ, ১ ফেব্রুয়ারি ২০০২*
১০৪৭. হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সমাবেশ ॥ বর্তমান সরকার ক্ষমতায় থাকলে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ হবে না, *ভোরের কাগজ, ১ ফেব্রুয়ারী ২০০২*
১০৪৮. নাটোরের এক মুক্তিযোদ্ধার পরিবার আছে চরম নিরপত্তাহীনতায়, *যুগান্তর, ২ ফেব্রুয়ারী ২০০২*
১০৪৯. মিঠাপুকুরে চাঁদাবাজির শিকার হিন্দু ব্যবসায়ীরা, 'হিন্দুস্তান' পাঠানোর হুমকি, *ভোরের কাগজ, ২ ফেব্রুয়ারি ২০০২*
১০৫০. সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৩টি সংখ্যালঘু পরিবার ঘরছাড়া, *ভোরের কাগজ, ২ ফেব্রুয়ারি ২০০২*
১০৫১. আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষিত ঃ ধামইরহাটের রিফুজিপাড়া থেকে সরকারদলীয় সন্ত্রাসীরা কেটে নিয়ে গেছে মন্দিরের বিশাল সব গাছ ॥ এলাকা ছাড়া বহু সংখ্যালঘু, *সংবাদ, ২ ফেব্রুয়ারি ২০০২*
১০৫২. জোট সরকারের ১শ' দিন ॥ রাউজান ছিল আতঙ্কের নগরী ঃ ২ খুন, ১৫টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ৮০টি বাড়িঘর ভাঙচুর, *আজকের কাগজ, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২*
১০৫৩. জমি নিয়ে বিরোধ ঃ সাতক্ষীরায় দুই সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলা ভাংচুর, *যুগান্তর, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২*
১০৫৪. খুলনায় সংখ্যালঘুর বাড়িতে ভাংচুর লুটপাট, *যুগান্তর, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২*
১০৫৫. সংখ্যালঘু পরিস্থিতি ঃ খোঁজখবর নিচ্ছে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট, *যুগান্তর, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২*
১০৫৬. পটুয়াখালীর কালিশুরী গ্রাম ঃ সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর বিএনপি সন্ত্রাসীদের হামলা ঃ আহত ৮ জন, *সংবাদ, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২*
১০৫৭. বসন্তপুর গ্রামের ৭০টি ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিবার এখন অবরুদ্ধ, *সংবাদ, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২*
১০৫৮. সংখ্যালঘু নির্যাতনের খবর প্রকাশে বাউফলের ওসি নাখোশ সাংবাদিকদের গালাগালি, হুমকি, *জনকণ্ঠ, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২*
১০৫৯. পুঠিয়ায় সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীর ওপর হামলার উদ্দেশ্য সম্পত্তি দখল, *যুগান্তর, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২*
১০৬০. সংখ্যালঘু নির্যাতন ঃ রংপুরে লুটপাট, মানিকগঞ্জে মূর্তি ভাঙচুর, বাগেরহাটে স্কুলছাত্রী ধর্ষিত, *সংবাদ, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২*
১০৬১. দৃষ্টিপাত-এর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঃ বাংলাদেশে নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের সাহায্যে নিউইয়র্কে অর্থ সংগ্রহ, *জনকণ্ঠ, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২*
১০৬২. ভোলায় হিন্দু বাড়িতে হামলা লুটপাট শ্লীলতাহানি, *প্রথম আলো, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২*
১০৬৩. সিরাজদিখানে মন্দিরের জমি দখলের চেষ্টা, মূর্তি ভাংচুর, হামলা, *জনকণ্ঠ, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০২*
১০৬৪. ডাকাত কর্তৃক মূল্যবান সামগ্রী লুট, *বাংলাদেশ অবজারভার, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০২*
১০৬৫. হোসেনপুরে সংখ্যালঘুর বাড়ি ভাংচুর ॥ শিক্ষকসহ গ্রেফতার ২, *ইত্তেফাক, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০২*

১০৬৬. সাতক্ষীরার গ্রামে মন্দির এলাকায় মসজিদ নির্মাণের চেষ্টা ॥ সংখ্যালঘু পরিবারকে হুমকি, *জনকণ্ঠ*, ৬ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৬৭. পিরোজপুর ও পটুয়াখালীতে হিন্দু পরিবারে সন্ত্রাসীদের হামলা, *প্রথম আলো*, ৬ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৬৮. বাগেরহাটে হিন্দু পরিবারের জমি দখল করে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সাইনবোর্ড, *প্রথম আলো*, ৬ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৬৯. মোড়েলগঞ্জে তিন দিনে দশ বাড়িতে ডাকাতি ॥ শ্লীলতাহানির অভিযোগ, *সংবাদ*, ৭ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৭০. সন্ত্রাসের জনপদ পদ্মপুকুর ॥ সংখ্যালঘুদের দিন কাটে চরম আতঙ্কে, *জনকণ্ঠ*, ৭ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৭১. সাম্প্রদায়িক হামলা রুখতেই হবে ॥ শাহরিয়ার কবির, *জনকণ্ঠ*, ৭ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৭২. হিন্দু পরিবারের বাড়ি দখলকে কেন্দ্র করে শরণখোলার গ্রামে উত্তেজনা, *ভোরের কাগজ*, ৮ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৭৩. সুনামগঞ্জের দিরাইয়ে এক হিন্দু বাড়িতে সশস্ত্র হামলা ॥ আহত ১০, *আজকের কাগজ*, ৯ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৭৪. কেরানীগঞ্জে যুবদল ক্যাডারদের সংখ্যালঘুর বাড়ি দখল, *সংবাদ*, ৯ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৭৫. সংখ্যালঘু এক বাড়িতে দ্বিতীয়বার ডাকাতি, *সংবাদ*, ৯ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৭৬. চুমুর নামে চাঁদা আদায় করছে ছাত্রদলের ক্যাডাররা সীতাকুণ্ডের পরেশবাবু পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, *আজকের কাগজ*, ১০ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৭৭. সিলেটে শ্রীকৃষ্ণের সোনার বাঁশি মুকুট ছাতা চুরি, *যুগান্তর*, ১০ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৭৮. বিচারপতি বিবি রায় চৌধুরীর হাজীগঞ্জের বাড়িতে মূর্তি ভাঙচুর, *যুগান্তর*, ১০ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৭৯. হামলাকারীরা প্রকাশ্যে ঘুরছে, পুলিশ ধরছে না ঃ খুলনায় আহত ব্যবসায়ী নেতা হাসপাতালেও নিরাপত্তাহীন, *সংবাদ*, ১১ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৮০. চৌগাছার মালিগাতিতে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন ঃ সন্ত্রাসীরা বহাল তবিয়তে, পুলিশ উল্টো নির্যাতিতদের বিরুদ্ধেই মামলা করেছে, *ভোরের কাগজ*, ১১ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৮১. ভোলার গ্রামে গৃহবধূ ধর্ষণ ॥ মালামাল লুট, *ইত্তেফাক*, ১১ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৮২. রামগতিতে সংখ্যালঘু পরিবারের এক সদস্য অপহৃত ॥ পরে উদ্ধার, *জনকণ্ঠ*, ১১ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৮৩. সিমি ইন্দ্রানীর পর এবার কাঞ্চন, *জনকণ্ঠ*, ১২ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৮৪. কুড়িগ্রামে কালীমূর্তি ভেঙে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা, *সংবাদ*, ১৩ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৮৫. নওগাঁয় ধর্ষিত ববিতা রানী নরপশুদের বিচার দাবি করেছে, *জনকণ্ঠ*, ১৩ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৮৬. 'পূজার জন্য অর্থ দেয়া হবে না' ঃ ই.বি. ভিসির ঘোষণা, *ডেইলি স্টার*, ১৩ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৮৭. হাতিয়ায় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন ॥ অনেকেই পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, *আজকের কাগজ*, ১৩ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৮৮. সাতক্ষীরার একটি গ্রামে ডাকাতি, *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৪ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৮৯. দেওয়ানগঞ্জে সরস্বতী প্রতিমা ভাঙচুর, *যুগান্তর*, ১৪ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৯০. সরজমিন চান্দিনা ॥ লুটপাট ভাঙচুর দাঁদাবাজি চলছে, *সংবাদ*, ১৪ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৯১. নেত্রকোণায় সংখ্যালঘুর জমি দখলের পর বাড়ি থেকে উচ্ছেদের হুমকি, *ইত্তেফাক*, ১৪ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৯২. বাউফলের একটি সংখ্যালঘু পরিবার ৪ মাস ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, *ইত্তেফাক*, ১৫ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৯৩. দেওয়ানগঞ্জে সরস্বতী প্রতিমা ভাংচুরের পর পূজা অনিশ্চিত, *ইত্তেফাক*, ১৫ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৯৪. কলাপাড়ায় দিবালোকে সংখ্যালঘু চিকিৎসককে মারধর ও ছিনতাই, *সংবাদ*, ১৫ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৯৫. জাতীয় কনভেনশনে আলোচনা ঃ সংখ্যালঘুর ওপর হামলা সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ করুন ॥ রেহমান সোবহান, *জনকণ্ঠ*, ১৫ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৯৬. মহাকালের কালো কুঠুরি থেকে একাত্তরের দুঃখিনী বাংলা কি উঠে এলো দু'হাজার দুই সালে?, *জনকণ্ঠ*, ১৫ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৯৭. সর্বস্ব হারানো মানুষের আহাজারিতে ভারি হয়ে উঠেছিল কনভেনশন মঞ্চ, *জনকণ্ঠ*, ১৫ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৯৮. ডাকাতি সংঘটিত, *ইন্ডিপেনডেন্ট*, ১৫ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১০৯৯. রাউজানে গিকার সশস্ত্র বাহিনীর ত্রাসের রাজত্ব ঃ সংখ্যালঘুরা এখনো আতঙ্কে, *ভোরের কাগজ*, ১৬ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১১০০. প্রতিরাতে বিষ প্রয়োগে মাছ লুট ॥ প্রশাসন নির্বিকার ঃ বাগেরহাটের চিংড়ি চাষীরা সর্বস্বান্ত হতে চলেছে, *জনকণ্ঠ*, ১৬ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১১০১. রাজশাহীতে কলেজছাত্রী কৃষ্ণারানীর মুখ আগুনে ঝলসে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা ঃ দেওয়ানগঞ্জে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক, *জনকণ্ঠ*, ১৬ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১১০২. কনভেনশনে উইলিয়াম স্লোন ঃ শাহরিয়ার কবির যে কাজটি করতে চেয়েছিলেন, আমি সেই কাজটিই করবো, *ভোরের কাগজ*, ১৬ *ফেব্রুয়ারী* ২০০২
১১০৩. মুক্তাগাছায় আদিবাসী যুবককে অপহরণের পর হত্যা, *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৭ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১১০৪. রাজশাহীতে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন বেড়েই চলেছে ঃ সন্ত্রাসীদের কেউই ধরা পড়ছে না, *সংবাদ*, ১৭ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১১০৫. মুক্তাগাছায় ছুরিকাঘাতে ব্যবসায়ীর মৃত্যু, *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৮ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১১০৬. ফতুল্লায় মন্দিরের সেবায়েতকে মারধর, *ইত্তেফাক*, ১৮ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১১০৭. সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধের দাবি, *সংবাদ*, ১৮ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১১০৮. সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা মিথ্যা প্রমাণে মাঠে নেমেছে সরকার, *জনকণ্ঠ*, ১৮ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২
১১০৯. দাগনভূঁঞায় নারকীয় তাণ্ডব ঃ সংখ্যালঘু দুই গৃহবধূকে ধর্ষণ ॥ সর্বস্ব হারিয়ে ৫০টি পরিবার গ্রাম ছাড়া, *জনকণ্ঠ*, ১৮ *ফেব্রুয়ারি* ২০০২

১১১০. পুকুরের মাছ, ধান-চাল, গরু ও হাঁস-মুরগি লুট ঃ মিরসরাইয়ে সন্ত্রাসীদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে একটি সংখ্যালঘু পরিবার, *প্রথম আলো, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২*

১১১১. নীলফামারীতে জামায়াত কর্মীরা এক সংখ্যালঘুর বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, *প্রথম আলো, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২*

১১১২. সন্ত্রাসী হামলায় যুবক আহত, *ইনডিপেনডেন্ট, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২*

১১১৩. আখাউড়ায় সরস্বতী প্রতিমা ভাঙচুর ॥ বরগুনায় প্রতিমা ভাঙচুর, *প্রথম আলো, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০২*

১১১৪. হাতিয়ায় সংখ্যালঘু জেলেদের ওপর সন্ত্রাসীদের নির্যাতন, *প্রথম আলো, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০২*

১১১৫. পঞ্চগড়ে দুই সন্তানসহ মা এসিডদগ্ধ, *বাংলাদেশ অবজারভার, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০২*

১১১৬. বেপারীকে গুলী করে গরু ও টাকা লুট, *ইত্তেফাক, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০২*

১১১৭. দাগনভুঁইয়ায় সংখ্যালঘুদের উপর হামলা ॥ ধর্ষণ মামলা দায়ের ॥ সন্ত্রাসী আটক, *ইত্তেফাক, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০২*

১১১৮. ফেনীর দাগনভুঁইয়া, ছাগলনাইয়া ও সোনাগাজী ঃ সংখ্যালঘুদের ওপর নানা নির্যাতন অব্যাহত, জানমাল ও ইজ্জত রক্ষার দাবিতে কর্তৃপক্ষ বরাবর ২৫টি পরিবারের স্মারকলিপি, *সংবাদ, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০২*

১১১৯. চাঁদা না দেয়ায় বগুড়ায় সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা ভাংচুর লুট, *যুগান্তর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০২*

১১২০. পাইকগাছায় দুই সংখ্যালঘু বাড়িতে সশস্ত্র ডাকাতি, *জনকণ্ঠ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০২*

১১২১. চাটমোহরে খ্রিস্টান পল্লীতে বিএনপির সন্ত্রাসীদের হামলা, ১০টি বাড়ি ভাঙচুর, লুটপাট, আহত ২৫, *প্রথম আলো, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২*

১১২২. চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে দোকানদারকে মারধর ॥ ভাংচুর, *ইত্তেফাক, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২*

১১২৩. রংপুরে মন্দিরে হামলা প্রতিমা ভাংচুর লুট, *জনকণ্ঠ, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২*

১১২৪. পঞ্চগড়ের ব্রাহ্মণপাড়ায় সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা ঃ সন্ত্রাসীরা সারা শরীর ঝলসে দিয়েছে ১ গৃহবধূর ॥ মামলা তুলে নেয়ার প্রকাশ্য হুমকি, *সংবাদ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২*

১১২৫. জানুয়ারি মাসে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ৬৩টি, *ভোরের কাগজ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২*

মার্চ ২০০২

১১২৬. নান্দাইলে সংখ্যালঘু পরিবারকে দেশ ছাড়ার হুমকি, *বাংলাবাজার পত্রিকা, ১ মার্চ ২০০২*

১১২৭. পুঠিয়া-দুর্গাপুরের ২০টি গ্রামে এখনও চলছে অত্যাচার নির্যাতন ঃ ৫ শ' সংখ্যালঘু পরিবার গ্রামছাড়া, *জনকণ্ঠ, ১ মার্চ ২০০২*

১১২৮. মাগুরায় স্কুল ছাত্রী অপহৃত, *ডেইলি স্টার, ১ মার্চ ২০০২*

১১২৯. শাহরাস্তির দুটি গ্রামে জোট সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব ঃ ঝিনাইদহে গ্রামছাড়া ৫০ সংখ্যালঘু ॥ খুলনায় সহস্রাধিক পরিবার জিম্মি, *জনকণ্ঠ, ১ মার্চ ২০০২*

১১৩০. ধর্মপাশার ইউপি সদস্যার শ্লীলতাহানির চেষ্টা, *সংবাদ, ২ মার্চ ২০০২*

১১৩১. বোয়ালমারীতে রক্ষাচণ্ডীর মূর্তি ভাঙচুর, *ভোরের কাগজ, ২ মার্চ ২০০২*

১১৩২. বরিশালে ২ গৃহবধূ ও ১ কিশোরী ধর্ষিত, জেলার সংখ্যালঘুদের মাঝে ফের আতঙ্ক, *ভোরের কাগজ, ২ মার্চ ২০০২*

১১৩৩. দাগনভূঁঞার ৩২টি সংখ্যালঘু পরিবার গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, *আজকের কাগজ, ২ মার্চ ২০০২*

১১৩৪. অপহরণের ৪ দিন পর ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার, *বাংলাবাজার পত্রিকা, ২ মার্চ ২০০২*

১১৩৫. সোনাগাজীতে ১০ সংখ্যালঘু পরিবারের সর্বস্ব লুট, *ইত্তেফাক, ২ মার্চ ২০০২*

১১৩৬. ঠাকুরগাঁয়ে ৩ সন্তানের জননী অপহরণ, *খবর, ২ মার্চ ২০০২*

১১৩৭. মঠবাড়িয়ায় অসহায় ১৮টি পরিবার সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি, *মাতৃভূমি, ৩ মার্চ ২০০২*

১১৩৮. হাতিয়ায় সহস্রাধিক সংখ্যালঘু নর-নারীর মিছিল ঃ নির্যাতনকারীকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার প্রতিবাদ, *আজকের কাগজ, ৩ মার্চ ২০০২*

১১৩৯. বোয়ালমারীতে ২টি মন্দিরে হামলা॥ ১০ পরিবার নিরাপত্তাহীন, *ইত্তেফাক, ৩ মার্চ ২০০২*

১১৪০. সুজানগরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন বন্ধ হয়নি, *ভোরের কাগজ, ৪ মার্চ ২০০২*

১১৪১. জলঢাকায় সংখ্যালঘুদের খতমের হুমকি দিচ্ছে জামায়াত, *ভোরের কাগজ, ৪ মার্চ ২০০২*

১১৪২. সেই সংখ্যালঘু কিশোরীকে ৫০ দিনেও উদ্ধার করা যায়নি, *সংবাদ, ৪ মার্চ ২০০২*

১১৪৩. চাটমোহর খ্রীস্টানপাড়ায় মানুষের ঢল ॥ সন্ত্রস্ত পরিবারে যেন প্রাণসঞ্চার, *জনকণ্ঠ, ৪ মার্চ ২০০২*

১১৪৪. ধর্ষিতার জরিমানা, *সংবাদ, ৫ মার্চ ২০০২*

১১৪৫. রাঙ্গামাটিতে এক পরিবারের ৩ জন খুন, *জনকণ্ঠ, ৫ মার্চ ২০০২*

১১৪৬. নাটোর মহাশ্মশানে হামলা, *যুগান্তর, ৫ মার্চ ২০০২*

১১৪৭. ফুলপুরে সন্ত্রাসী কর্তৃক শ্যালো মেশিন ভাঙচুর ॥ জ্যোতিষ দেবনাথের চাষাবাদ ব্যাহত, *প্রথম আলো, ৬ মার্চ ২০০২*

১১৪৮. বানারীপাড়ায় মন্দির দখলের চেষ্টা ॥ পুজো বন্ধ ॥ মিথ্যা মামলা, পুরোহিত এলাকাছাড়া, স্থানীয় সংসদ সদস্যের ঘনিষ্ঠ নেতার হুমকি, *জনকণ্ঠ, ৬ মার্চ ২০০২*

১১৪৯. বোয়ালমারীতে রক্ষাচণ্ডি মূর্তি ভাঙচুর, *সংবাদ, ৬ মার্চ ২০০২*

১১৫০. হাটহাজারীতে সমাজসেবা কর্মকর্তা বকুল রানী নৃশংসভাবে খুন এলাকায় শোকের ছায়া, *জনকণ্ঠ, ৬ মার্চ ২০০২*

১১৫১. পাংশায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা॥ মালামাল লুট, *খবর, ৬ মার্চ ২০০২*

১১৫২. চট্টগ্রামে চাঁদা না পেয়ে বিয়ের আসর পণ্ড করেছে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা ঃ মামলা করলে হত্যার হুমকি দিয়ে বিয়ের উপহারসামগ্রী নিয়ে যাওয়া হয়েছে, *ভোরের কাগজ, ৭ মার্চ ২০০২*

১১৫৩. দৌলতপুরে স্বর্ণ ব্যবসায়ীর কাছে চাঁদা দাবি হত্যার হুমকি, *প্রথম আলো, ৭ মার্চ ২০০২*
১১৫৪. হাতিয়ার জেলেপাড়ায় মোস্তফা মেম্বর বাহিনীর অকথ্য নির্যাতন ঃ প্রায় ২০ সহস্রাধিক সংখ্যালঘু জিম্মি॥ মুক্তি পেতে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা, *সংবাদ, ৭ মার্চ ২০০২*
১১৫৫. সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বন্ধ করুন ঃ পঙ্গু হাসপাতালে নির্যাতিতদের পাশে ডেনমার্ক ও জার্মান রাষ্ট্রদূত, *প্রথম আলো, ৮ মার্চ ২০০২*
১১৫৬. বগুড়ায় মুক্তিপণ না পেয়ে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রকে হত্যা, *সংবাদ, ৮ মার্চ ২০০২*
১১৫৭. চাঁদার দাবিতে বড়াইগ্রামে খ্রিস্টান পল্লীতে সন্ত্রাসীদের হামলা, আহত ৫, *প্রথম আলো, ৯ মার্চ ২০০২*
১১৫৮. নোয়াখালীতে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসী হামলা ও লুট, *সংবাদ, ৯ মার্চ ২০০২*
১১৫৯. মানিকগঞ্জে সংখ্যালঘু ডাক্তারের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, *সংবাদ, ৯ মার্চ ২০০২*
১১৬০. সিলেটে আদিবাসীর জমি আত্মসাত ॥ শেষ সম্বলটুকু নামমাত্র মূল্যে বিক্রির চাপ, *জনকণ্ঠ, ৯ মার্চ ২০০২*
১১৬১. নবাবগঞ্জের গ্রামে চাঁদার দাবিতে সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলা ও গুলি, *আজকের কাগজ, ৯ মার্চ ২০০২*
১১৬২. চাঁদাবাজি ঃ নাটোর ও নবাবগঞ্জে সংখ্যালঘুর বাড়িতে হামলা ঃ বরিশালে কুপিয়ে ২ জনকে জখম, *যুগান্তর ৯ মার্চ ২০০২*
১১৬৩. সাভারে হিন্দু ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলা ভাঙচুর, *ভোরের কাগজ, ৯ মার্চ ২০০২*
১১৬৪. বাজিতপুরের আয়নারকান্দি গ্রামে সন্ত্রাস ঃ মরদেহ জিম্মি করেও চাঁদাবাজি, ২০ হিন্দু পরিবার গ্রামছাড়া, *প্রথম আলো, ১০ মার্চ ২০০২*
১১৬৫. পূজা মণ্ডপে মানব বিষ্ঠা নিক্ষেপ ॥ যুবক গ্রেফতার, *বাংলাবাজার পত্রিকা, ১০ মার্চ ২০০২*
১১৬৬. সন্ত্রাসীরা নোয়াখালীতে মন্দিরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, *বাংলাবাজার পত্রিকা, ১০ মার্চ ২০০২*
১১৬৭. মিরসরাইয়ে জেলে সর্দার খুন, *যুগান্তর, ১১ মার্চ ২০০২*
১১৬৮. সাটুরিয়ায় প্রতিমা ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, *প্রথম আলো, ১১ মার্চ ২০০২*
১১৬৯. মাদারীপুরে সংখ্যালঘুর দোকানে হামলা, চাটখিলে ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে ফল লুট, *প্রথম আলো, ১১ মার্চ ২০০২*
১১৭০. বাজিতপুরে চাঁদাবাজ ছিনতাইকারীদের তৎপরতা ঃ পালিয়ে বেড়াচ্ছে একটি হিন্দু পরিবার, *প্রথম আলো, ১১ মার্চ ২০০২*
১১৭১. নোয়াখালীর রামদি গ্রামে মন্দিরে অগ্নিসংযোগ, *প্রথম আলো, ১১ মার্চ ২০০২*
১১৭২. পুঠিয়ায় সন্ত্রাসীদের হাতে লাঞ্ছিত আরেক সংখ্যালঘু, *সংবাদ, ১১ মার্চ ২০০২*
১১৭৩. ভীতির মধ্যে গারো সম্প্রদায়, *প্রথম আলো, ১১ মার্চ ২০০২*
১১৭৪. কুড়িগ্রামের পল্লীতে সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব ৩টি হিন্দু বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ঃ লোকজনদের মারধোর, চোখে আগুন দিয়ে অন্ধ করা হয়েছে একজনকে, *ভোরের কাগজ, ১২ মার্চ ২০০২*
১১৭৫. চাঁদাবাজি ঃ রায়পুরায় সন্ত্রাসীরা পুড়িয়ে দিয়েছে সংখ্যালঘু মাছ ব্যবসায়ীর বাড়ি, *যুগান্তর, ১৩ মার্চ ২০০২*
১১৭৬. সাতক্ষীরায় ধর্ষকদের পক্ষে বিএনপি নেতার সংবাদ সম্মেলন, *আজকের কাগজ, ১৩ মার্চ ২০০২*
১১৭৭. বরিশালে তরুণী স্কুলশিক্ষিকা ধর্ষণের শিকার, *ভোরের কাগজ, ১৩ মার্চ ২০০২*
১১৭৮. নরসিংদীর চরাঞ্চলে সন্ত্রাসীদের আগুনে সংখ্যালঘুদের ৩টি ঘর ভস্মীভূত, *প্রথম আলো, ১৩ মার্চ ২০০২*
১১৭৯. মহাদেবপুরে সংখ্যালঘুর বাড়িতে দুর্বৃত্তদের অগ্নিসংযোগ, *প্রথম আলো, ১৩ মার্চ ২০০২*
১১৮০. ঝালকাঠিতে সংখ্যালঘু পরিবারের ঘর দখলের চেষ্টা, মা-মেয়ে আহত, *ভোরের কাগজ, ১৪ মার্চ ২০০২*
১১৮১. রাজশাহীর বাঘায় সংখ্যালঘুদের বাড়িতে লুটতরাজ, *সংবাদ, ১৪ মার্চ ২০০২*
১১৮২. বৃদ্ধ দশরথ বললেন, বাড়িতে কিভাবে যাব, আমার নিরাপত্তা কোথায়?, *সংবাদ, ১৪ মার্চ ২০০২*
১১৮৩. সর্দার রেবতী মোহনকে পশুর মতো জবাই করে হত্যার পর মীরসরাইয়ের বানাতলী জেলেপাড়ার মানুষগুলো 'জীবন নিয়ে কোনরকম বেঁচে আছে', *আজকের কাগজ, ১৪ মার্চ ২০০২*
১১৮৪. গোপালগঞ্জে প্রতিমা ভাঙচুর, *যুগান্তর, ১৫ মার্চ ২০০২*
১১৮৫. জলঢাকায় সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীকে মারধর, *সংবাদ, ১৬ মার্চ ২০০২*
১১৮৬. চাঁদা না দেয়ায় ইটনায় এক ব্রাহ্মণের ওপর সন্ত্রাসীদের হামলা ঃ আতঙ্কিত পরিবার-পরিজন, *সংবাদ, ১৬ মার্চ ২০০২*
১১৮৭. নাটোরে সংখ্যালঘু এলাকায় ফের সন্ত্রাসী হামলা পিতাপুত্র গুরুতর আহত, *জনকণ্ঠ, ১৬ মার্চ ২০০২*
১১৮৮. মোল্লাহাটের সংখ্যালঘুরা চাঁদাবাজি ও দখল আতঙ্কে, *ভোরের কাগজ, ১৬ মার্চ ২০০২*
১১৮৯. নবাবপুরে মরণচাঁদে সন্ত্রাসীদের হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট গ্রেফতার ১, *আজকের কাগজ, ১৬ মার্চ ২০০২*
১১৯০. আলীকদমে পাহাড়ি কিশোরী অপহরণ এলাকায় উত্তেজনা, *প্রথম আলো, ১৭ মার্চ ২০০২*
১১৯১. ১১ দিনে নিহত ৬ ॥ সমানে চলছে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার, *সংবাদ, ১৭ মার্চ ২০০২*
১১৯২. বরিশালের আস্তাকাঠি গ্রাম ॥ সংখ্যালঘুদের ওপর সন্ত্রাসীদের নিয়মিত হামলা ॥ পুলিশ চুপচাপ ঃ শ্লীলতাহানির অভিযোগে মামলা দায়ের, *সংবাদ, ১৭ মার্চ ২০০২*
১১৯৩. নওগাঁয় সন্ত্রাসীদের হামলায় এক সংখ্যালঘু খুন, *জনকণ্ঠ, ১৭ মার্চ ২০০২*
১১৯৪. হবিগঞ্জে পৌর কমিশনারসহ ১১ হিন্দু বাড়িতে সন্ত্রাসী হামলা, মালামাল লুট, *ভোরের কাগজ, ১৮ মার্চ ২০০২*
১১৯৫. রাজনগরে নিজ বাড়িতে গাড়ি ঢুকাতে বিএনপি নেতার কাণ্ড ঃ সংখ্যালঘুর বাড়ি ও জমি দখল করে রাস্তা প্রশস্ত করার অভিযোগ, *প্রথম আলো, ১৮ মার্চ ২০০২*

১১৯৬. রংপুরে সংখ্যালঘু মুক্তিযোদ্ধা পরিবারে হামলা, লুটপাট, জখম ঃ চাঁদা না পেয়ে ছাত্রদল ক্যাডারদের কাণ্ড ॥ গৃহকর্তাকে কুপিয়ে জখম, *ভোরের কাগজ, ১৯ মার্চ ২০০২*

১১৯৭. লক্ষ্মীপুরে মন্দির দখল করে বাড়ি নির্মাণের অভিযোগ, *আজকের কাগজ, ১৯ মার্চ ২০০২*

১১৯৮. আগৈলঝাড়ায় জমি দখল, *মাতৃভূমি, ২০ মার্চ ২০০২*

১১৯৯. নবাবগঞ্জে সন্ত্রাসী হামলায় বৌদ্ধ পরিবারের পাঁচ জনকে কুপিয়ে জখম, *ভোরের কাগজ, ২০ মার্চ ২০০২*

১২০০. ভালুকা ও নবাবগঞ্জে হামলা ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ ঃ টাঙ্গাইলে হিন্দু ব্যবসায়ীর গুদামঘর দখল করে নিয়েছে বিএনপি নেতা, *প্রথম আলো, ২০ মার্চ ২০০২*

১২০১. ঘটনাস্থল বাঘার বাউসা ইউনিয়নের দিঘা গ্রাম ঃ অনিল কুমার সরকারের নামে এবার মৃত্যুর পরোয়ানা দিয়ে চিঠি ঃ সংখ্যালঘুদের মধ্যে নতুন করে ভীতি, *সংবাদ, ২১ মার্চ ২০০২*

১২০২. কুড়িগ্রামে মূর্তি ভাঙচুর, *প্রথম আলো, ২১ মার্চ ২০০২*

১২০৩. গুরুদাসপুরে হিন্দু আ. লীগ কর্মীকে পিটিয়েছে সন্ত্রাসীরা, *প্রথম আলো, ২১ মার্চ ২০০২*

১২০৪. উজিরপুরে এস.এস.সি পরীক্ষার্থীকে অপহরণ চেষ্টা, মারধর, *প্রথম আলো. ২২ মার্চ ২০০২*

১২০৫. ইটনায় সংখ্যালঘু পরিবারের উপর সন্ত্রাসী হামলা ঃ আহত ২, *আজকের কাগজ, ২৩ মার্চ ২০০২*

১২০৬. অসামাজিক কাজে বাধা দেওয়ায় দ্বিতীয় দফা হামলা ঃ বরিশাল খ্রিস্টান পল্লীতে ছাত্রদল ক্যাডারদের হামলা, গ্রেপ্তার ২, *ভোরের কাগজ, ২৩ মার্চ ২০০২*

১২০৭. নওগাঁয় সংখ্যালঘু কিশোরী ধর্ষণ যুবক খুন, *জনকণ্ঠ*, ২৩ *মার্চ ২০০২*

১২০৮. কক্সবাজারে জমি দখলের জন্য বৌদ্ধমন্দির পুড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা, *প্রথম আলো, ২৪ মার্চ ২০০২*

১২০৯. কেবল ফেব্রুয়ারি মাসে সংখ্যালঘু মানুষের ওপর ১৩১টি নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, *আজকের কাগজ, ২৫ মার্চ ২০০২*

১২১০. গলাচিপায় ফের ধর্ষণকালে অঙ্গ হারাল ইউপি মেম্বার, *জনকণ্ঠ*, ২৬ *মার্চ ২০০২*

১২১১. সাতক্ষীরার তালা উপজেলার কলাপাতা গ্রাম ঃ ২ সংখ্যালঘুর বাড়িতে ডাকাতি নিঃস্ব করে দিয়ে গেছে সবাইকে, *সংবাদ, ২৮ মার্চ ২০০২*

১২১২. বানিয়ানগরে খোদ ওয়ার্ড কমিশনার দখল করেছে হিন্দু বাড়ি, *জনকণ্ঠ, ২৮ মার্চ ২০০২*

১২১৩. ধামরাইয়ে বিএনপি নেতার ফার্মে ঃ আওয়ামী লীগ কর্মীকে পুড়িয়ে হত্যা, *জনকণ্ঠ, ২৮ মার্চ ২০০২*

১২১৪. বিয়ানীবাজারে 'শ্মশান ভূমি' আত্মসাতের অভিযোগ, *বাংলাবাজার পত্রিকা, ২৯ মার্চ ২০০২*

১২১৫. ঠাকুরগাঁওয়ে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ, *যুগান্তর, ৩০ মার্চ ২০০২*

১২১৬. বৃন্দাবন দাসের লাশ দাহ করতে দেয়া হয়নি, *ইত্তেফাক, ৩০ মার্চ ২০০২*

১২১৭. মাগুরায় পরীক্ষার হল সুপারসহ দু'জনের হাত পা ভেঙ্গে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা, *ইত্তেফাক, ৩০ মার্চ ২০০২*

১২১৮. বিএনপি সমর্থকদের নির্যাতনের শিকার ঝালকাঠীর দুই সংখ্যালঘু পরিবার, *ভোরের কাগজ, ৩১ মার্চ ২০০২ রোবার*

এপ্রিল ২০০২

১২১৯. চট্টগ্রামে ছাত্রদল ক্যাডারদের হাতে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুন, *সংবাদ, ১ এপ্রিল ২০০২*

১২২০. ডোমারে কালীমন্দির ও প্রতিমা ভাঙচুর, *সংবাদ, ১ এপ্রিল ২০০২*

১২২১. শাহজাদপুর কালীমন্দিরে বোমা হামলা, *ভোরের কাগজ, ১ এপ্রিল ২০০২*

১২২২. চাঁদা না দেয়ায় ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে জখম, *বাংলাবাজার পত্রিকা, ১ এপ্রিল ২০০২*

১২২৩. দেবীগঞ্জে সংখ্যালঘু গৃহবধূ ধর্ষিত ॥ অবশেষে ৫ দিন পর ধর্ষণ চেষ্টা মামলা, *জনকণ্ঠ, ১ এপ্রিল ২০০২*

১২২৪. সত্য পালের পরিবারকে হুমকি ঃ উদ্দেশ্য জমি দখল, *সংবাদ, ২ এপ্রিল ২০০২*

১২২৫. মাগুরায় ঐক্য পরিষদ নেতা সন্ত্রাসী হামলার শিকার, *সংবাদ, ২ এপ্রিল ২০০২*

১২২৬. চাটমোহরে ধান ক্ষেত থেকে আদিবাসী যুবকের লাশ উদ্ধার, *প্রথম আলো, ২ এপ্রিল ২০০২*

১২২৭. গৌরনদী ও আগৈলঝাড়ায় সংখ্যালঘুরা এখনো আতঙ্কে, *ভোরের কাগজ, ২ এপ্রিল ২০০২*

১২২৮. উল্লাপাড়ায় অপহৃত কলেজ ছাত্রী ১৬ দিন পরও উদ্ধার হয়নি, *বাংলাবাজার পত্রিকা, ২ এপ্রিল ২০০২*

১২২৯. ঘাটাইলে প্রতিমা ভাঙচুর, সংখ্যালঘুরা আতঙ্কে, *সংবাদ, ৩ এপ্রিল ২০০২*

১২৩০. ইটনায় বিধবাকে ধর্ষণ ॥ ধর্ষক গ্রেফতার, *সংবাদ, ৩ এপ্রিল ২০০২*

১২৩১. মৌলভীবাজারের পল্লীতে সংখ্যালঘু গৃহবধূকে ধর্ষণের পর জ্বালিয়ে দিয়েছে তার ঘর, *আজকের কাগজ, ৪ এপ্রিল ২০০২*

১২৩২. গোপালপুরে এখনো চলছে সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব ঃ ইউপি সদস্য কল্পনা রানীর পরিবার ৬ মাস ধরে বাড়ি ছাড়া ॥ কলেজছাত্রী সোমা ও স্কুলছাত্র শুভর লেখাপড়া বন্ধ, *সংবাদ, ৫ এপ্রিল ২০০২*

১২৩৩. চট্টগ্রামে ঐক্যপরিষদের সম্মেলন, পুলিশের হামলায় নাটক মঞ্চস্থ হতে পারেনি, *সংবাদ, ৫ এপ্রিল ২০০২*

১২৩৪. পালিয়ে বেড়ানো এক সংখ্যালঘু পরিবার, *সংবাদ, ৫ এপ্রিল ২০০২*

১২৩৫. গোপালগঞ্জে সংখ্যালঘুদের ঘের থেকে চিংড়ি চুরির হিড়িক, *যুগান্তর, ৬ এপ্রিল ২০০২*

১২৩৬. গোপালপুরের ইউএনও নিজেই এলাকা ছাড়তে বলেছেন কল্পনা রানীকে, *জনকণ্ঠ, ৬ এপ্রিল ২০০২*

১২৩৭. চাঁদা না পেয়ে সাতক্ষীরায় এলজিইডি প্রকৌশলীকে পিটিয়েছে ছাত্রদল সভাপতি ঃ রাস্তা মেরামতের কাজও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, *আজকের কাগজ*, ৬ *এপ্রিল* ২০০২
১২৩৮. সান্তাহারে কলেজছাত্রীকে অপহরণের পর উদ্ধার আবার অপহরণ, *প্রথম আলো*, ৬ *এপ্রিল* ২০০২
১২৩৯. ঘাটাইলে প্রাচীন কৃষ্ণমূর্তি ভাঙচুর ঃ এলাকার বর্মণ সম্প্রদায়ের মাঝে ক্ষোভ, হতাশা, *প্রথম আলো*, ৬ *এপ্রিল* ২০০২
১২৪০. মুক্তাগাছায় সংখ্যালঘুদের দোকানপাট ভাঙচুর, *প্রথম আলো*, ৬ *এপ্রিল* ২০০২
১২৪১. বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসীদের ত্রাসের রাজত্ব ঃ রাজাপুরে স্বামীর সামনেই স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছে সন্ত্রাসীরা, *ভোরের কাগজ*, ৬ *এপ্রিল* ২০০২
১২৪২. কেরানীগঞ্জ ঃ বাড়ি দখলের পর অস্ত্র মামলায় জড়ানোর হুমকি, *সংবাদ*, ৭ *এপ্রিল* ২০০২
১২৪৩. ৩টি পরিবারের ২৬ জন দেশছাড়া হয়েছে ঃ যশোরের একটি সংখ্যালঘু গ্রামে সন্ত্রাসীদের অব্যাহত নির্যাতন, *সংবাদ*, ৭ *এপ্রিল* ২০০২
১২৪৪. আড়াইহাজারে দেবোত্তর সম্পত্তি জবরদখল চেষ্টার প্রতিবাদ, *সংবাদ*, ৭ *এপ্রিল* ২০০২
১২৪৫. বাগেরহাটে বেপরোয়া ঘের দখল ঃ পার্বতীপুরে সুইপার কলোনির জমি দখল করেছে সরকারী দল সমর্থকরা, *জনকণ্ঠ*, ৭ *এপ্রিল* ২০০২
১২৪৬. রূপসায় সংখ্যালঘু পরিবারের খাবারে বিষ গৃহকর্তার মৃত্যু, ৩ জন গুরুতর অসুস্থ ॥ বাড়ির মালামাল লুট, *জনকণ্ঠ*, ৭ *এপ্রিল* ২০০২
১২৪৭. চাটখিলে রাষ্ট্রপতির আত্মীয় পরিচয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে উচ্ছেদের পরিকল্পনা, *বাংলাবাজার পত্রিকা*, ৮ *এপ্রিল* ২০০২
১২৪৮. রায়পুরায় সংখ্যালঘুদের ওপর সন্ত্রাসীদের হামলা লুটপাট, *যুগান্তর*, ৮ *এপ্রিল* ২০০২
১২৪৯. জীবিত তারেক জিয়ার নামে স্মৃতি সংঘ! সংখ্যালঘুদের কাছে চাঁদা দাবি, *সংবাদ*, ৮ *এপ্রিল* ২০০২
১২৫০. ভোলায় সংখ্যালঘু গৃহবধূকে ধর্ষণ ও কুপিয়ে মালামাল লুট ॥ সিরাজগঞ্জে অপহৃত হিন্দু কিশোরকে খাৎনা, *জনকণ্ঠ*, ৯ *এপ্রিল* ২০০২
১২৫১. নওগাঁয় আদিবাসী মহিলার শ্লীলতাহানি স্বামী আহত, *সংবাদ*, ৯ *এপ্রিল* ২০০২
১২৫২. চন্দনাইশে ৭ হিন্দু বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি দেশ ছেড়ে চলে যেতে হুমকি দেয় দুর্বৃত্তরা, *ভোরের কাগজ*, ১০ *এপ্রিল* ২০০২
১২৫৩. গৌরনদীতে গৃহবধূর ওপর বোমা হামলা, *ইত্তেফাক*, ১০ *এপ্রিল* ২০০২
১২৫৪. ঘটনাস্থল রাজশাহীর দেবীপুর গ্রাম ঃ সংখ্যালঘুর বাড়িতে ছাত্রদল ক্যাডারদের ব্যাপক তাণ্ডব, *সংবাদ*, ১১ *এপ্রিল* ২০০২
১২৫৫. মীরসরাইয়ে হিন্দু পাড়ায় হামলা আহত ৩ জন, *ভোরের কাগজ*, ১২ *এপ্রিল* ২০০২
১২৫৬. ভোলায় মেয়ের সামনে মাকে ধর্ষণ, *ভোরের কাগজ*, ১২ *এপ্রিল* ২০০২
১২৫৭. ফরিদপুরের গ্রামে সংখ্যালঘু কিশোরীকে অপহরণের চেষ্টা ঃ পথের কাঁটা সরাতে বৃদ্ধাকে তুলে নিয়ে হত্যা, গৃহবধূকে ধর্ষণ, *প্রথম আলো*, ১২ *এপ্রিল* ২০০২
১২৫৮. ২শ' বছরের পুরাতন মন্দির ভেঙ্গে জমি দখলের পাঁয়তারা, *বাংলাবাজার পত্রিকা*, ১২ *এপ্রিল* ২০০২
১২৫৯. গৌরনদীতে বিএনপির সশস্ত্র ক্যাডারদের তাণ্ডব ঃ সংখ্যালঘুদের ওপর হামলায় আহত ৮, অনেকে বাড়িছাড়া, *ভোরের কাগজ*, ১৩ *এপ্রিল* ২০০২
১২৬০. কেরানীগঞ্জে সংখ্যালঘু কিশোরী ধর্ষিত, *আজকের কাগজ*, ১৩ *এপ্রিল* ২০০২
১২৬১. জামায়াত এমপি ও ক্যাডার বাহিনীর হাতে ইউএনও লাঞ্ছিত, *মানব জমিন*, ১৪ *এপ্রিল* ২০০২
১২৬২. সাতক্ষীরায় পূজা মণ্ডপে জামাতের হামলা ॥ ৩০ নারী-পুরুষ প্রহৃত, *আজকের কাগজ*, ১৪ *এপ্রিল* ২০০২
১২৬৩. রাউজানে অস্ত্রের মুখে যুবক অপহরণ, *আজকের কাগজ*, ১৫ *এপ্রিল* ২০০২
১২৬৪. ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দুই কর্মকর্তাকে খুন করে দুর্বৃত্তরা ২৫ লাখ টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে, *ইত্তেফাক*, ১৬ *এপ্রিল* ২০০২
১২৬৫. আখাউড়ায় মূর্তি ভাঙচুর, *প্রথম আলো*, ১৬ *এপ্রিল* ২০০২
১২৬৬. গোপালগঞ্জে পুলিশ পরিচয়ে ঘরে ঢুকে স্কুল শিক্ষককে পিটিয়ে গুলি করে জখম, *প্রথম আলো*, ১৬ *এপ্রিল* ২০০২
১২৬৭. ছাগলনাইয়ায় ৪ জনকে মারধর বাগেরহাটে দুই বাড়ি লুট ঃ মঠবাড়িয়ায় ছাত্রদল ক্যাডারদের নির্যাতনে সংখ্যালঘু গৃহবধূসহ তিনজন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে, *জনকণ্ঠ*, ১৬ *এপ্রিল* ২০০২
১২৬৮. গৌরনদীর কাপালিক পাড়ায় বিএনপি সন্ত্রাসীদের হামলা, *সংবাদ*, ১৭ *এপ্রিল* ২০০২
১২৬৯. জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ ঃ মহাদেবপুরে গৃহবধূকে বিবস্ত্র ও লাঞ্ছিত করার অভিযোগ॥ পুলিশ মামলা গ্রহণ করেনি, *সংবাদ*, ১৭ *এপ্রিল* ২০০২
১২৭০. বেগমগঞ্জে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা ॥ লম্পট যুবক গ্রেফতার, *সংবাদ*, ১৭ *এপ্রিল* ২০০২
১২৭১. জলদাস পাড়ায় আবারও হামলা, *সংবাদ*, ১৮ *এপ্রিল* ২০০২
১২৭২. কেরানীগঞ্জের সংখ্যালঘু এক কলেজ ছাত্রীকে ৫ দিন আটক রেখে গণধর্ষণ, *আজকের কাগজ*, ১৮ *এপ্রিল* ২০০২
১২৭৩. ঘটনাস্থল মেহেন্দিগঞ্জের গোবিন্দপুর ইউনিয়ন, চাঁদাবাজির ভয়ে সংখ্যালঘুরা এখনও এলাকাছাড়া, *সংবাদ*, ১৮ *এপ্রিল* ২০০২
১২৭৪. জামায়াত এমপি ও ক্যাডার বাহিনীর হাতে ইউএনও লাঞ্ছিত, *মানব জমিন*, ১৮ *এপ্রিল* ২০০২
১২৭৫. জমি দখলে বাধার জের, পাথরঘাটায় বিএনপি ক্যাডাররা সংখ্যালঘু গৃহবধূকে বেদম পিটিয়েছে, *প্রথম আলো*, ১৯ *এপ্রিল* ২০০২
১২৭৬. রাঙ্গুনিয়ায় সংখ্যালঘু পাড়ায় দুর্বৃত্তদের হামলা, আহত ২৫, *সংবাদ*, ২০ *এপ্রিল* ২০০২
১২৭৭. আখাউড়ায় মূর্তি ভাঙচুর, *খবর*, ২১ *এপ্রিল* ২০০২
১২৭৮. পার্বতীপুরে সংখ্যালঘু বাড়িতে ডাকাতি, *সংবাদ*, ২১ *এপ্রিল* ২০০২
১২৭৯. কলাপাড়ায় সংখ্যালঘু শিশুকে ধর্ষণ চেষ্টা ॥ নরপশুকে হাজতে প্রেরণ, *জনকণ্ঠ*, ২১ *এপ্রিল* ২০০২
১২৮০. সাতক্ষীরায় সংখ্যালঘু গৃহবধূকে সন্তানের সামনে ধর্ষণ করেছে জামায়াতকর্মী, *জনকণ্ঠ*, ২২ *এপ্রিল* ২০০২

১২৮১. ঐক্য পরিষদের জরিপ ঃ দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর সব ধরনের নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে, *ভোরের কাগজ, ২২ এপ্রিল ২০০২*

১২৮২. পূর্বশত্রুতার জের ধরে আগুন ঃ গুরুদাসপুরে সংখ্যালঘু ৩ পরিবারের ৪টি ঘর পুড়ে ছাই, *প্রথম আলো, ২২ এপ্রিল ২০০২*

১২৮৩. কেরানীগঞ্জে সংখ্যালঘু গার্মেন্টস কর্মীকে গণধর্ষণ, *আজকের কাগজ, ২৩ এপ্রিল ২০০২*

১২৮৪. পঞ্চগড়ে এক ব্যক্তির দোকান ও বাড়ী বেদখল, *ইত্তেফাক, ২৩ এপ্রিল ২০০২*

১২৮৫. রাউজানে গভীর রাতে অনাথ আশ্রমে ঢুকে জবাই করে প্রবীণ বৌদ্ধ ভিক্ষুকে হত্যা, *ভোরের কাগজ, ২৩ এপ্রিল ২০০২*

১২৮৬. চাঁদা না পেয়ে সন্ত্রাসীদের গুলি ঃ পাবনায় স্কুলশিক্ষক আহত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন, *প্রথম আলো, ২৩ এপ্রিল ২০০২*

১২৮৭. ১০ দিনেও উদ্ধার হয়নি অপহৃত কিশোরী, *ভোরের কাগজ, ২৪ এপ্রিল ২০০২*

১২৮৮. যশোরে ইউপি মেম্বারের দণ্ড ঃ ৭৫ হাজার টাকা জরিমানা করে এক সংখ্যালঘুর সম্পত্তি লিখে নিয়েছে, *সংবাদ, ২৪ এপ্রিল ২০০২*

১২৮৯. চৌমুহনীতে বৈষ্ণব বেশে ডাকাতি ঃ গৃহকর্ত্রীকে বেঁধে স্বর্ণালংকার লুট, *যুগান্তর, ২৪ এপ্রিল ২০০২*

১২৯০. মারধরসহ মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হয়রানির অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন ঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জে সংখ্যালঘুদের বিএনপি নেতা-কর্মীদের হুমকি, *আজকের কাগজ, ২৪ এপ্রিল ২০০২*

১২৯১. নবীগঞ্জে প্রাচীন মন্দির ভেঙে জমিদার বাড়ি বেদখল, *যুগান্তর, ২৫ এপ্রিল ২০০২*

১২৯২. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান লুট ও দখলের প্রতিবাদে অনশন, *সংবাদ, ২৫ এপ্রিল ২০০২*

১২৯৩. রাউজানে সংখ্যালঘু পাড়া অবরুদ্ধ, *সংবাদ, ২৫ এপ্রিল ২০০২*

১২৯৪. পুলিশের চাহিদা মতো টাকা দিতে না পারায়, *সংবাদ, ২৫ এপ্রিল ২০০২*

১২৯৫. জমি সংক্রান্ত বিরোধ ঃ বসত ঘরে অগ্নিসংযোগ একটি পরিবারকে উচ্ছেদের প্রচেষ্টা, *ইত্তেফাক, ২৫ এপ্রিল ২০০২*

১২৯৬. কিশোরগঞ্জে চাঁদার দাবিতে এক সংখ্যালঘুকে খুন,, *জনকণ্ঠ, ২৬ এপ্রিল ২০০২*

১২৯৭. উল্লাপাড়ায় সন্ত্রাসীরা আদিবাসীদের জমির ধান কেটে নিয়ে গেছে, *সংবাদ, ২৬ এপ্রিল ২০০২*

১২৯৮. পঞ্চগড়ে এক ব্যক্তির দোকান ও বাড়ী বেদখল, *ইত্তেফাক, ২৬ এপ্রিল ২০০২*

১২৯৯. পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনের দাবি এলাকাবাসীর ঃ সন্ত্রাস চাঁদাবাজি অপহরণ ধর্ষণ ও ডাকাতি আতঙ্কে কৃষ্ণনগরবাসী, *প্রথম আলো, ২৭ এপ্রিল ২০০২*

১৩০০. নেত্রকোনায় চারদিনেও অপহৃত নাট্যশিল্পী অপর্ণার সন্ধান মেলেনি, *যুগান্তর, ২৭ এপ্রিল ২০০২*

১৩০১. ৬০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়া পেল নরেন হালদার, *সংবাদ, ২৮ এপ্রিল ২০০২*

১৩০২. হাইমচরে মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর, *আজকের কাগজ, ২৮ এপ্রিল ২০০২*

১৩০৩. বাগমারায় স্কুলছাত্রী অপহরণ, *প্রথম আলো, ২৯ এপ্রিল ২০০২*

১৩০৪. আওয়ামী লীগকে সমর্থন করার খেসারত ঃ নির্যাতনের ভয়ে পালিয়ে থেকে চাকরি খোয়ালেন প্রবীণ স্কুল শিক্ষক জগদীশ, *ভোরের কাগজ, ৩০ এপ্রিল ২০০২*

১৩০৫. ধামরাইয়ে কালীমন্দিরে হামলা-ভাঙচুর, প্রাচীন বটগাছ কর্তন, *ভোরের কাগজ, ৩০ এপ্রিল ২০০২*

১৩০৬. বরিশালে সেইন্ট পিটার্স চার্চের জমি ও পুকুর দখলের উদ্যোগ ঃ জেলা জজ আদালতের সম্পত্তি দাবি করে বর্ধিত ভবন তৈরির প্রক্রিয়া শুরু, *ভোরের কাগজ, ৩০ এপ্রিল ২০০২*

১৩০৭. নাচোলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনকে মারধর, মামলায় জড়িয়ে হয়রানি, *ভোরের কাগজ, ৩০ এপ্রিল ২০০২*

১৩০৮. বৌদ্ধ ভিক্ষু হত্যার জন্য সাকা ক্যাডারদের দায়ী করেছে আন্দোলন কমিটি, *প্রথম আলো, ৩০ এপ্রিল ২০০২*

১৩০৯. এবার পুরোহিতকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা, *জনকণ্ঠ, ৩০ এপ্রিল ২০০২*

১৩১০. মানিকগঞ্জে চাঁদাবাজদের দাপট ঃ হত্যার হুমকির মুখে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন রাধা বল্লভ, *আজকের কাগজ, ৩০ এপ্রিল ২০০২*

মে ২০০২

১৩১১. যশোরে মেয়েকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় ৭ সংখ্যালঘু নারীপুরুষকে মারধর, *জনকণ্ঠ, ১ মে ২০০২*

১৩১২. বৃহত্তর চট্টগ্রামে কেন একের পর এক বর্বর হত্যাকাণ্ড?, *ভোরের কাগজ, ১ মে ২০০২*

১৩১৩. চাঁদার দাবিতে চট্টগ্রামে ব্যবসায়ীকে নির্যাতন ঃ মামলা না করার জন্য স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর আদায়, *ভোরের কাগজ, ১ মে ২০০২*

১৩১৪. ধামরাইতে চাঁদা না দেওয়ায় এক সংখ্যালঘুর হাত-পা ভেঙে দিয়েছে ছাত্রদল ক্যাডাররা, *আজকের কাগজ, ১ মে ২০০২*

১৩১৫. অবশেষে পূর্ণিমা ধর্ষণ মামলার চার্জশিট, বিএনপির ১৭ জন আসামি, *ভোরের কাগজ, ৩ মে ২০০২*

১৩১৬. কটিয়াদীতে চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীদের হাতে ১ জন নিহত, *সংবাদ, ৩ মে ২০০২*

১৩১৭. গাইবান্ধায় সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ হয়নি ॥ ৫টি পরিবার নিরাপত্তাহীন, *সংবাদ, ৩ মে ২০০২*

১৩১৮. সরজমিন মদনগোপাল হত্যাকাণ্ড ঃ বাদিকে হুমকি, শঙ্কায় আছে ৮ হাজার সংখ্যালঘু, সংবাদ, ৩ মে ২০০২

১৩১৯. বিএনপি নেতারা জানেন কারা জড়িত ?, *সংবাদ, ৩ মে ২০০২*

১৩২০. ধামরাই শ্মশানঘাটে সন্ত্রাসী হামলা মন্দির ভাঙচুর, *প্রথম আলো, ৩ মে ২০০২*

১৩২১. কষ্টিপাথরের দুর্লভ মূর্তিসহ অন্য মালামাল লুট ঃ নবীগঞ্জে প্রাচীন মন্দির ভেঙ্গে জমি দখল করেছে বিএনপির এক নেতা, *জনকণ্ঠ, ৪ মে ২০০২*

১৩২২. পাবনায় সংখ্যালঘু এক পরিবার ধর্ষিত মেয়ে নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, *জনকণ্ঠ, ৪ মে ২০০২*

১৩২৩. জ্ঞানজ্যোতি ভিক্ষু হত্যার বিচার দাবিতে চট্টগ্রাম থেকে রাউজান পর্যন্ত মানব বন্ধন ঃ চট্টগ্রামে আরেক ভিক্ষুর ওপর সন্ত্রাসী হামলা অস্ত্র ঠেকিয়ে টাকা-পয়সা ছিনতাই, *ভোরের কাগজ, ৪ মে ২০০২*
১৩২৪. ঘটনাস্থল সাতক্ষীরার রামনগর গ্রাম ঃ স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা ও নির্যাতন ॥ অপরাধীদের পুলিশ গ্রেফতার করছে না, *সংবাদ, ৪ মে ২০০২*
১৩২৫. জামাত নেতার বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা ঃ সংখ্যালঘু পরিবারের চিংড়ি ঘের লুট, *সংবাদ, ৪ মে ২০০২*
১৩২৬. চাঁদা না দেওয়ায় ধামরাইয়ে ১জনকে পিটিয়ে জখম, *প্রথম আলো, ৪ মে ২০০২*
১৩২৭. খুলনার ফুলতলায় বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এক ব্যক্তিকে খুন, *জনকণ্ঠ, ৫ মে ২০০২*
১৩২৮. লাকসামে সংখ্যালঘুদের ১০টি ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা, *প্রথম আলো, ৫ মে ২০০২*
১৩২৯. নান্দিনায় ইউপি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে সংখ্যালঘু পরিবার উচ্ছেদ॥ দোকান ভাংচুর, *জনকণ্ঠ, ৬ মে ২০০২*
১৩৩০. খুলনায় সন্ত্রাসীরা শীতলা মন্দিরের পূজায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে ঃ টিন খুলে নিয়ে গেছে নাট মন্দিরের, *জনকণ্ঠ, ৬ মে ২০০২*
১৩৩১. মাগুরায় সংখ্যালঘু পরিবারের ৭ সদস্যকে বিষ খাইয়ে হত্যার চেষ্টা, হাসপাতালে ভর্তি, *জনকণ্ঠ, ৬ মে ২০০২*
১৩৩২. বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবন বিপন্ন ঃ বৌদ্ধ ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি হত্যার প্রতিবাদ সভায় বক্তারা, *ভোরের কাগজ, ৬ মে ২০০২*
১৩৩৩. সংবাদ সম্মেলনে মন্দির সেবাইতের অভিযোগ ঃ শাহজাদপুরে জাল দলিলের মাধ্যমে দেবোত্তর সম্মত্তি দখলের চেষ্টা, *ভোরের কাগজ, ৬ মে ২০০২*
১৩৩৪. বাঁশখালিতে সংখ্যালঘুর বাড়িতে আগুন, *আজকের কাগজ, ৮ মে ২০০২*
১৩৩৫. যশোরে চাঁদা না পেয়ে দোকান থেকে তুলে নিয়ে ব্যবসায়ীর দু পা থেঁতলে দিল সন্ত্রাসীরা, *প্রথম আলো, ৮ মে ২০০২*
১৩৩৬. খুলনায় পূজায় সন্ত্রাসীদের বিঘ্ন সৃষ্টি॥ নিরাপত্তা দাবিতে সমাবেশ, *জনকণ্ঠ, ৯ মে ২০০২*
১৩৩৭. পুঠিয়ায় আদিবাসী যুবতী ও লক্ষ্মীপুরে কাজের মেয়ে ধর্ষিত, *জনকণ্ঠ, ৯ মে ২০০২*
১৩৩৮. সাতক্ষীরায় সংখ্যালঘু গৃহবধূ ধর্ষিত, *সংবাদ, ৯ মে ২০০২*
১৩৩৯. ঠাকুরগাঁওয়ে প্রধান শিক্ষককে গলায় ছুরি ঠেকিয়ে ইস্তফাপত্র লিখে দিতে বাধ্য করা হলো ।, *সংবাদ, ৯ মে ২০০২*
১৩৪০. নাটোরের গ্রামে সংখ্যালঘুদের ১৩টি বাড়িতে গণডাকাতি, *সংবাদ, ১০ মে ২০০২*
১৩৪১. রমনা কালীমন্দির দখল করে নিয়েছে বিএনপির ক্যাডাররা ঃ 'গয়েশ্বরের নির্দেশ ছাড়া মন্দিরে কোনো পূজা সভা সমিতি হবে না', *ভোরের কাগজ, ১১ মে ২০০২*
১৩৪২. তানোরে ৬০টি আদিবাসী ও সংখ্যালঘু পরিবার সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি, *ভোরের কাগজ, ১১ মে ২০০২*
১৩৪৩. সাহস হারিও না কাজলী রানী, *সংবাদ, ১১ মে ২০০২*
১৩৪৪. বাঁশখালিতে এক রাতে ৯ বাড়িতে ডাকাতি ॥ সংখ্যালঘু গৃহবধূকে হত্যার চেষ্টা, *জনকণ্ঠ, ১২ মে ২০০২*
১৩৪৫. ডোমারে সংখ্যালঘুর বাড়ি ও দোকানে ডাকাতি ॥ ডাকাতের গুলিতে আহত ৭, *জনকণ্ঠ, ১৩ মে ২০০২*
১৩৪৬. সীতাকুণ্ডে সংখ্যালঘুদের ভোটদানে বাধা ঃ শিবিরের হামলায় আহত ৭, *যুগান্তর, ১৪ মে ২০০২*
১৩৪৭. রাউজানে আরেক বৌদ্ধ বিহারে সন্ত্রাসী হামলা, *যুগান্তর ১৪ মে ২০০২*
১৩৪৮. কোম্পানীগঞ্জে আফসার বাহিনীর তাণ্ডবে নয় জেলে পরিবার এলাকা ছাড়া, *যুগান্তর, ১৪ মে ২০০২*
১৩৪৯. সন্ত্রাসীদের উৎপাত বৃদ্ধি চন্দ্রঘোনা খ্রিস্টান পাড়ার বাসিন্দারা আতঙ্কে, *ভোরের কাগজ, ১৪ মে ২০০২*
১৩৫০. নওগাঁয় স্কুল ছাত্রী এসিড দগ্ধ, *ভোরের কাগজ, ১৪ মে ২০০২*
১৩৫১. শ্রীলতাহানির চেষ্টার প্রতিবাদ করায়..., *প্রথম আলো, ১৫ মে ২০০২*
১৩৫২. সাংবাদিক লাঞ্ছিত, শিক্ষক গ্রেপ্তার ঃ পুলিশের বাধায় খুলনায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পণ্ড, *প্রথম আলো, ১৬ মে ২০০২*
১৩৫৩. মন্দিরের জায়গা দখল ঃ উল্লাপাড়ায় আদিবাসীদের জমির ধান কেটে নিয়েছে সন্ত্রাসীরা, *জনকণ্ঠ, ১৯ মে ২০০২*
১৩৫৪. সন্ত্রাসীদের ভয়ে কেউ এগিয়ে আসেনি ॥ এখন চলছে উচ্ছেদের পাঁয়তারা ঃ কুলাউড়ায় এক সংখ্যালঘু পরিবারকে প্রাণনাশের হুমকি ॥ বাড়িতে আগুন, *জনকণ্ঠ, ১৯ মে ২০০২*
১৩৫৫. মানিকগঞ্জে প্রতিমা ভাঙচুর জেলেপাড়ায় আতঙ্ক, *প্রথম আলো, ১৯ মে ২০০২*
১৩৫৬. শ্যামপুরের জেলেপাড়ায় হামলা লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ ঃ আহত ১০, *যুগান্তর, ২০ মে ২০০২*
১৩৫৭. জমি নিয়ে বিরোধের জের ॥ মিরসরাইতে বৃদ্ধাকে জবাই করে হত্যা, *জনকণ্ঠ, ২০ মে ২০০২*
১৩৫৮. বিএনপি ক্যাডারদের তাণ্ডব ॥ মাগুরায় মেয়েকে না পেয়ে মাকে কোপ, *জনকণ্ঠ, ২০ মে ২০০২*
১৩৫৯. জোট সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে দখল ঃ টঙ্গীবাড়ী বাজারের বাসুদেব মন্দির এখন খৈলভুসির দোকান, *জনকণ্ঠ, ২০ মে ২০০২*
১৩৬০. সিলেটে ধর্ষককে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে সন্ত্রাসীরা ঃ আলফাডাঙ্গায় ধর্ষিতার আত্মহত্যা, *ভোরের কাগজ, ২১ মে ২০০২*
১৩৬১. পূর্ণিমা ও শীতাংশু ভট্টাচার্যের সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে জোট সন্ত্রাসীরা ॥ পরিবারটি কার্যত অবরুদ্ধ, *ভোরের কাগজ, ২২ মে ২০০২*
১৩৬২. টেকনাফে ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে টাকা ছিনতাই ॥ থানা মামলা নেয়নি, *সংবাদ, ২২ মে ২০০২*
১৩৬৩. টাঙ্গাইলের গ্রামে সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব ঃ ইউপি সদস্য কল্পনা রানীর পরিবার সাড়ে ৭ মাসেও নিজেদের বাড়িতে ফিরতে পারেনি, *সংবাদ, ২২ মে ২০০২*
১৩৬৪. গৌরনদী ও আগৈলঝাড়ায় ৩টি ধর্ষণ ঃ ঘটনা ধামাচাপা দিতে প্রভাবশালী মহলের নানা অপতৎপরতা, *প্রথম আলো, ২২ মে ২০০২*
১৩৬৫. আসামি ধরতে গিয়ে নওগাঁয় সেবায়েতের বাড়ি ভাঙচুর, মারধর, *প্রথম আলো, ২২ মে ২০০২*

১৩৬৬. শরীয়তপুরে কালী মন্দিরে হামলা ভাংচুর আগুন, *যুগান্তর, ২২ মে ২০০২*

১৩৬৭. পঞ্চগড়ে সন্ত্রাসী কর্তৃক সংখ্যালঘুর দোকান ভাঙচুর ও বসতভিটা থেকে উচ্ছেদের অভিযোগ, *আজকের কাগজ, ২২ মে ২০০২*

১৩৬৮. আবার ওয়ার্ড কমিশনার খুন, বিনয় সরকার বিনার শরীরে ১৭ রাউন্ড গুলি, পুরান ঢাকার ঘরে ঘরে তল্লাশি, দলীয় বিরোধ কারণ হতে পারে, *প্রথম আলো, ২৩ মে ২০০২*

১৩৬৯. হায়রে শান্তি, *প্রথম আলো, ২৩ মে ২০০২*

১৩৭০. ইংলিশ ডাকাতদল, *প্রথম আলো, ২৩ মে ২০০২*

১৩৭১. বরগুনায় মন্দিরের জমি দখল করে বিএনপি কার্যালয় নির্মাণ, *প্রথম আলো, ২৩ মে ২০০২*

১৩৭২. রাজশাহীর পবার ধর্ষিতা আদিবাসী শিশু শিউলি হেমরমের সুচিকিৎসা হচ্ছে না, *যুগান্তর, ২৫ মে ২০০২*

১৩৭৩. জোট সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব ॥ সম্পত্তি গ্রাসে সংখ্যালঘুর বাড়িতে আগুন, *জনকণ্ঠ, ২৬ মে ২০০২*

১৩৭৪. আশাশুনিতে ঘের নিয়ে হাঙ্গামা, ৩ মহিলাকে আটকে রাখা হয় ইউপি কক্ষে, *ভোরের কাগজ, ২৬ মে ২০০২*

১৩৭৫. তারাকান্দায় সন্ত্রাসীদের অস্ত্রের মুখে সাদা কাগজে সই আদায় ঃ জাল দলিল তৈরি করে সংখ্যালঘু পরিবারের জমি দখলের পাঁয়তারা, *সংবাদ ২৬ মে ২০০২*

১৩৭৬. সন্ত্রাস ও ষড়যন্ত্রের শিকার স্বামী-সন্তান ঃ পথে পথে ঘুরছেন উষারানী, *সংবাদ, ২৮ মে ২০০২*

১৩৭৭. ঘটনাস্থল মাগুরার পালপাড়া ঃ পাশবিক নির্যাতনের শিকার ২ সংখ্যালঘু তরুণীর ইজ্জতের মূল্য নির্ধারিত হয়েছে ১৯ হাজার ৫ শ' টাকা, *সংবাদ, ২৮ মে ২০০২*

১৩৭৮. নোয়াখালীতে মহাশ্মশান দখল করে নিয়েছে বিএনপি ক্যাডাররা, *যুগান্তর, ২৮ মে ২০০২*

১৩৭৯. অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বার্ষিক রিপোর্ট ॥ সংখ্যালঘু নির্যাতনকারীরা রেহাই পেয়ে গেছে, *ভোরের কাগজ, ২৯ মে ২০০২*

১৩৮০. সীমান্ত পেরোনোর সময় ৭৭ সংখ্যালঘু আটক, *সংবাদ, ২৯ মে ২০০২*

১৩৮১. শাহজাদপুরে দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে সন্ত্রাসীরা, *সংবাদ, ২৯ মে ২০০২*

১৩৮২. সিলেটে তিন সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা ॥ আহত ৩, *আজকের কাগজ, ২৯ মে ২০০২*

১৩৮৩. পাবনার বেড়ায় সম্পত্তি দখলে ব্যর্থ হয়ে সংখ্যালঘুর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, *আজকের কাগজ, ২৯ মে ২০০২*

১৩৮৪. সরেজমিন মীর্জাগঞ্জ ঃ মাধবখালী সন্তোষপুর এখন ক্যাডার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ঃ শীর্ষ নেতার স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চেয়েও রক্ষা পাননি গোবিন্দ ডাক্তার, *জনকণ্ঠ, ২৯ মে ২০০২*

১৩৮৫. কক্সবাজারে দুই সংখ্যালঘুর বাড়িতে ডাকাতি ॥ ২ লক্ষাধিক টাকার মাল লুট ॥ গুলিবিদ্ধসহ আহত ৮, *জনকণ্ঠ, ২৯ মে ২০০২*

১৩৮৬. রংপুরের পীরগঞ্জ ঃ ধর্ষণের অভিযোগে মামলা করায় আদিবাসী পরিবার ঘরছাড়া, *সংবাদ, ৩০ মে ২০০২*

১৩৮৭. কেশবপুরে হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সন্ত্রাসী হামলা, *সংবাদ, ৩০ মে ২০০২*

১৩৮৮. পীরগঞ্জে আদিবাসী কন্যা ধর্ষিত ॥ ধর্ষক গ্রেফতার, *আজকের কাগজ, ৩০ মে ২০০২*

১৩৮৯. কচুয়ায় চাঁদা না পেয়ে ছাত্রদল ক্যাডাররা হাত-পা গুঁড়িয়ে দিয়েছে মিষ্টি ব্যবসায়ীর, *ভোরের কাগজ, ৩১ মে ২০০২*

জুন ২০০২

১৩৯০. সংখ্যালঘু ও জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা ঃ মলমগঞ্জ বাজারের কালী মন্দিরের জায়গা দখল করে পাকা ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে, *আজকের কাগজ, ১ জুন ২০০২*

১৩৯১. এবার বিএনপি ক্যাডাররা দখল করে নিয়েছে শ্মশান, *সংবাদ, ২ জুন ২০০২*

১৩৯২. ঝিনাইদহে সন্ত্রাসীরা ছাত্রলীগ নেতাকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে দু'পা ভেঙে দিয়েছে, *যুগান্তর, ৩ জুন ২০০২*

১৩৯৩. রাজশাহীতে আদিবাসী শিশু খুন, *যুগান্তর, ৩ জুন ২০০২*

১৩৯৪. হিন্দু ধর্মীয় নেতা অধ্যক্ষ চারু ব্রহ্মচারী ২৮ দিন ধরে নিখোঁজ! ঃ হত্যা বা গুম করে রাখার আশঙ্কা, *ভোরের কাগজ, ৩ জুন ২০০২*

১৩৯৫. অপরাধ সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধে প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি ঃ কারণ দর্শানো নোটিশ দিয়ে সাতকানিয়ায় প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষককে হয়রানি, *ভোরের কাগজ, ৩ জুন ২০০২*

১৩৯৬. তানোরের রাতৈল গ্রামের আদিবাসীরা বিএনপি ক্যাডারদের হুমকিতে সন্ত্রস্ত, *জনকণ্ঠ, ৪ জুন ২০০২*

১৩৯৭. সাতক্ষীরায় জামাত নেতার কাণ্ড ঃ মা ও পুত্রকে বিবস্ত্র করে ৫ ঘণ্টা ধরে নির্যাতন, *ভোরের কাগজ, ৪ জুন ২০০২*

১৩৯৮. নওগাঁয় পূজামণ্ডপে আগুন ধরিয়ে দিয়ে প্রতিমা ভাঙচুর, *প্রথম আলো, ৪ জুন ২০০২*

১৩৯৯. বরিশালে যুবককে অপহরণ করে হত্যার চেষ্টা ঃ অপহরণকারীকে পুলিশে সোপর্দ, *যুগান্তর, ৪ জুন ২০০২*

১৪০০. কাঁঠালিয়ায় আওয়ামী লীগ নেতাকে গুলি করে হত্যা, *যুগান্তর, ৪ জুন ২০০২*

১৪০১. ডোমারে একটি সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়িঘর লুট, অগ্নিসংযোগ ও স্ত্রী-কন্যাদের ধর্ষণের হুমকি, *সংবাদ, ৫ জুন ২০০২*

১৪০২. সাড়ে ৩০০ জেলে পরিবারের আয়ের উৎস বন্ধ ঃ ফরিদপুরে বিএনপি নেতার নেতৃত্বে বিল দখল, জেলেরা গ্রামছাড়া, *প্রথম আলো, ৬ জুন ২০০২*

১৪০৩. লালমোহনে সংখ্যালঘু গৃহবধূ খুন ॥ গ্রেফতারকৃত দুই বিএনপি নেতাকে থানা থেকে ছিনতাই, *জনকণ্ঠ, ৬ জুন ২০০২*

১৪০৪. কুলাউড়ায় খ্রীস্টানদের বসত ভিটা দখল করতে কুচক্রীমহলের পাঁয়তারা, *জনকণ্ঠ, ৬ জুন ২০০২*

১৪০৫. শেরপুরে আদিবাসী যুবতীর শ্লীলতাহানি ॥ পাঁচ দিন পরও মামলা হয়নি, *জনকণ্ঠ*, ৬ *জুন* ২০০২
১৪০৬. 'ভিটায় ফিরতে চাই না, হাসপাতালেই যেন আমার মরণ হয়', *যুগান্তর*, ৬ *জুন* ২০০২
১৪০৭. থানচিতে সন্ত্রাসীদের হাতে সরকারি কর্মচারী খুন, *যুগান্তর*, ৭ *জুন* ২০০২
১৪০৮. উল্লাপাড়ায় স্কুলছাত্রী অপহরণের ৫ দিন পরও উদ্ধার হয়নি, *সংবাদ*, ৭ *জুন* ২০০২
১৪০৯. ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দিনদুপুরে ডাক্তার অপহরণ ঃ ছাত্রদল নেতাসহ ৩ জন গ্রেফতার, *যুগান্তর*, ৮ *জুন* ২০০২
১৪১০. ঝালকাঠিতে এক রাতে ১০টি ডাকাতি, *যুগান্তর*, ৮ *জুন* ২০০২
১৪১১. অপহরণের দু'মাস পরও উদ্ধার হয়নি স্কুল ছাত্রী শিখা রানী, আজকের কাগজ, ৮ *জুন* ২০০২
১৪১২. ৩ মাসে অপহৃত ১০, ২০ লাখ টাকা মুক্তিপণ আদায় ॥ কালীগঞ্জে অপহরণ বাড়ছে, *প্রথম আলো*, ৯ *জুন* ২০০২
১৪১৩. কুষ্টিয়ায় সংখ্যালঘু পরিবারে 'হাফপ্যান্ট' বাহিনীর লুটপাট, *সংবাদ*, ৯ *জুন* ২০০২
১৪১৪. হবিগঞ্জে সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীর দোকানে ছাত্রদল ক্যাডারের চাঁদাবাজি ॥ মালিক আহত পরে ক্যাডারকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, *জনকণ্ঠ*, ১০ *জুন* ২০০২
১৪১৫. অভয়নগরে অপহৃত প্রভাতী রানী উদ্ধার হয়নি ॥ ভাইকেও অপহরণের হুমকি, *জনকণ্ঠ*, ৯ *জুন* ২০০২
১৪১৬. রামগড়ে বিডিআরের বিরুদ্ধে ৫ উপজাতিকে পেটানোর অভিযোগ, *যুগান্তর*, ১১ *জুন* ২০০২
১৪১৭. ভারত চলে যাওয়ার নির্দেশ বানারীপাড়ায় একটি সংখ্যালঘু পরিবার সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি, *আজকের কাগজ*, ১২ *জুন* ২০০২
১৪১৮. ধামরাইয়ে মন্দিরের সম্পত্তি দখল করে ঘরবাড়ি তুলেছে সন্ত্রাসীরা, *প্রথম আলো*, ১২ *জুন* ২০০২
১৪১৯. সিরাজগঞ্জে একরাতে ৬ বাড়িতে সর্বহারাদের ডাকাতি, মারধর, *ভোরের কাগজ*, ১২ *জুন* ২০০২
১৪২০. সিলেটে কোটিপতি মা-মেয়ে খুন, *যুগান্তর*, ১৩ *জুন* ২০০২
১৪২১. সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে ঘরছাড়া কলমাকান্দার হরেকৃষ্ণ সরকারের পরিবার, *যুগান্তর*, ১৩ *জুন* ২০০২
১৪২২. মোম ব্যবসায়ীকে পিস্তল ঠেকিয়ে টাকা নিয়েছে পুলিশ!, *সংবাদ*, ১৪ *জুন* ২০০২
১৪২৩. পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ঃ সাতক্ষীরার গ্রামে ১১০ বিঘা জমি দখলের চেষ্টা, বৃদ্ধা গৃহবন্দি, *প্রথম আলো*, ১৪ *জুন* ২০০২
১৪২৪. নড়িয়ায় স্বামীকে বেঁধে রেখে স্ত্রীকে ধর্ষণের পর অপহরণ করেছে সন্ত্রাসীরা, *আজকের কাগজ*, ১৪ *জুন* ২০০২
১৪২৫. লালমোহনে নমিতা হত্যাকাণ্ড সংখ্যালঘুরা আতংকিত ঃ পুলিশ বিব্রত, *যুগান্তর*, ১৫ *জুন* ২০০২
১৪২৬. অপহরণের ৮ দিন পর চলন্ত বেবিট্যাক্সি থেকে লাফিয়ে পড়ে রক্ষা, *সংবাদ*, ১৫ *জুন* ২০০২
১৪২৭. চাঁদা না পেয়ে সংখ্যালঘু কৃষকের হাত-পা ভেঙে দিয়েছে জোট সন্ত্রাসীরা ঃ মামলা না নিয়ে থানার আপসের পরামর্শ, *ভোরের কাগজ*, ১৫ *জুন* ২০০২
১৪২৮. শাহজাদপুরে কলেজ শিক্ষকের বাড়িতে হামলা ভাংচুর লুট ঃ গ্রেফতার ৩, *যুগান্তর*, ১৬ *জুন* ২০০২
১৪২৯. মহাদেবপুরে ফের আদিবাসী উচ্ছেদের পাঁয়তারা বিএনপি ক্যাডারদের সরেনের ভাগ্যবরণের হুমকি, *জনকণ্ঠ*, ১৬ *জুন* ২০০২
১৪৩০. হুমকি, *ভোরের কাগজ*, ১৬ *জুন* ২০০২
১৪৩১. সন্তানের ইজ্জত রক্ষা করতে গিয়ে মা আহত, *ভোরের কাগজ*, ১৭ *জুন* ২০০২
১৪৩২. সন্ত্রাসীদের নির্যাতনের শিকার কলমাকান্দার এক সংখ্যালঘু পরিবার, *ভোরের কাগজ*, ১৭ *জুন* ২০০২
১৪৩৩. ভৈরবে মেয়েকে ধর্ষণ চেষ্টায় ব্যর্থ ধর্ষকরা মায়ের সম্ভ্রম লুটেছে সন্তানদের সামনে, *জনকণ্ঠ*, ১৭ *জুন* ২০০২
১৪৩৪. বহিষ্কৃত বিএনপি নেতার কাণ্ড ঃ বান্দরবানে ৪ পাহাড়ির জমি দখল করে হাউজিংয়ের রাস্তা নির্মাণ, *প্রথম আলো*, ১৭ *জুন* ২০০২
১৪৩৫. চাটমোহরে খ্রীস্টান পল্লীতে ফের চাঁদাবাজি ও প্রাণনাশের হুমকি, *জনকণ্ঠ*, ১৭ *জুন* ২০০২
১৪৩৬. নড়িয়ায় স্বামীকে বেঁধে রেখে স্ত্রীকে অপহরণ, *সংবাদ*, ১৮ *জুন* ২০০২
১৪৩৭. বরিশাল, নোয়াখালী, ভৈরব ও সাতক্ষীরায় ৫ জন ধর্ষিত, *প্রথম আলো*, ১৯ *জুন* ২০০২
১৪৩৮. গৌরনদীতে ছিনতাইয়ের টাকা উদ্ধার করে ছাত্রদল ক্যাডারদের ভাগ-বাটোয়ারা, *ভোরের কাগজ*, ২০ *জুন* ২০০২
১৪৩৯. মোহনগঞ্জে সংখ্যালঘু কলেজছাত্রী ধর্ষিত, *সংবাদ*, ২১ *জুন* ২০০২
১৪৪০. ৭ দিনেও গঙ্গা রানীকে উদ্ধার করা যায়নি মধুপুরে সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক, *সংবাদ*, ২১ *জুন* ২০০২
১৪৪১. রায়পুরায় রজু বাহিনীর অত্যাচার বেশ কিছু পরিবার বাড়িছাড়া, *প্রথম আলো*, ২১ *জুন* ২০০২
১৪৪২. তেঁতুলিয়ায় আদিবাসীদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র, *যুগান্তর*, ২১ *জুন* ২০০২
১৪৪৩. কক্সবাজারে সদ্য বিবাহিত সংখ্যালঘু যুবতী অপহৃত ॥ দিনমজুর পিতাকে পুলিশ ও সন্ত্রাসীদের হুমকি, *জনকণ্ঠ*, ২১ *জুন* ২০০২
১৪৪৪. ঝালকাঠিতে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলার পর এবার তাদের বিরুদ্ধেই মামলা, *ভোরের কাগজ*, ২২ *জুন* ২০০২
১৪৪৫. ২৭ দিনেও থানা মামলা নেয়নি ঃ নওগাঁয় এক প্রভাবশালী ব্যক্তি মন্দিরের রাস্তাসহ সংখ্যালঘুর দোকান দখল ও মালামাল লুট করেছে, *সংবাদ* ২২ *জুন* ২০০২
১৪৪৬. অভয়নগরে অপহৃত শিক্ষকের লাশ ভায়না বিল থেকে উদ্ধার, *প্রথম আলো*, ২২ *জুন* ২০০২
১৪৪৭. চাঞ্চল্যকর তথ্য ॥ বাগেরহাটে ডাকাতি ও সংখ্যালঘু নির্যাতনে বিএনপি নেতারা জড়িত ॥ আদালতে ডাকাত সর্দারের স্বীকারোক্তি, *জনকণ্ঠ*, ২২ *জুন* ২০০২

১৪৪৮. ব্যবসায়ী তপন চন্দ্র পালের সংবাদ সম্মেলন ঃ স্ত্রী-সন্তানদের নিরাপত্তা দাবি, *সংবাদ*, ২৩ *জুন* ২০০২
১৪৪৯. ঝালকাঠীতে চার সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা, *ভোরের কাগজ*, ২৩ *জুন* ২০০২
১৪৫০. চট্টগ্রামে ওষুধ ব্যবসায়ী খুন, *ভোরের কাগজ*, ২৫ *জুন* ২০০২
১৪৫১. রাঙ্গামাটিতে রেঞ্জার অপহৃত, *জনকণ্ঠ*, ২৫ *জুন* ২০০২
১৪৫২. চাঁদা না পেয়ে, *ভোরের কাগজ*, ২৬ *জুন* ২০০২
১৪৫৩. সাভারে যুবক খুন, *আজকের কাগজ*, ২৭ *জুন* ২০০২
১৪৫৪. হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জরিপ ঃ মে মাসে সংখ্যালঘুদের ওপর ৫৯টি নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, *ভোরের কাগজ*, ২৮ *জুন* ২০০২
১৪৫৫. মুন্সিগঞ্জে প্রাচীন মন্দিরের জায়গা দখল করে নিয়েছে সন্ত্রাসীরা, *সংবাদ*, ২৯ *জুন* ২০০২
১৪৫৬. প্রাণভয়ে পালিয়েছে কয়েক শ' মানুষ ঃ কক্সবাজারের জলদাসপাড়ায় সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব, চাঁদার দাবিতে ঘরে ঘরে হানা, মন্দিরে আগুন, *জনকণ্ঠ*, ৩০ *জুন* ২০০২
১৪৫৭. এক সপ্তাহের মধ্যে দেশ ত্যাগ না করলে কচুকাটা করার হুমকি ॥ হামলা ভাংচুরের পর মামলা দিয়ে হয়রানি ঃ রাজৈরে সংখ্যালঘু ৮ পরিবার দশদিন ধরে অবরুদ্ধ, *জনকণ্ঠ*, ৩০ *জুন* ২০০২

জুলাই ২০০২

১৪৫৮. মধুখালীতে সমর হত্যাকাণ্ড ॥ আসামি করার ভয় দেখিয়ে সংখ্যালঘুদের ওপর চলছে চাঁদাবাজি, *সংবাদ*, ১ *জুলাই* ২০০২
১৪৫৯. কক্সবাজারে কয়েকশ' সংখ্যালঘুর ওপর নারকীয় তাণ্ডব, দুর্গামন্দিরে আগুন, *ভোরের কাগজ*, ১ *জুলাই* ২০০২
১৪৬০. ফরিদপুরে ধর্ষণের মিথ্যা মামলায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে সংখ্যালঘু ব্যবসায়ী, *ভোরের কাগজ*, ২ *জুলাই* ২০০২
১৪৬১. কলাপাড়ায় মুক্তিযোদ্ধা কালিপদের চিংড়ি ঘেরে বিষ প্রয়োগ ঃ ২ লাখ টাকার মাছ মরে গেছে, *আজকের কাগজ*, ৩ *জুলাই* ২০০২
১৪৬২. অধ্যক্ষ মুহুরী হত্যার প্রধান হোতা মন্টু একে-৫৬ রাইফেলসহ গ্রেফতার। অভিযানকালে পালিয়েছে ছাত্রদল নেতা, *জনকণ্ঠ*, ৪ *জুলাই* ২০০২
১৪৬৩. কংগ্রেসম্যান গিলম্যান বলেন, সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধে তিনি খালেদা জিয়াকে বারবার অনুরোধ করেছেন, *জনকণ্ঠ*, ৪ *জুলাই* ২০০২
১৪৬৪. বাজিতপুরে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী আহত, *যুগান্তর*, ৫ *জুলাই* ২০০২
১৪৬৫. মিথ্যা মামলায় দু'ভাইকে গ্রেফতার ঃ মোটর সাইকেল না দেয়ায় শেরপুরে সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলা, *জনকণ্ঠ*, ৬ *জুলাই* ২০০২
১৪৬৬. নওগাঁয় সংখ্যালঘু তরুণী অপহরণ ॥ ২ সন্ত্রাসী গ্রেফতার, বাদীকে হুমকি, *জনকণ্ঠ*, ৬ *জুলাই* ২০০২
১৪৬৭. গলাচিপায় এক সংখ্যালঘু পরিবার সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি ॥ গণধর্ষণের হুমকি, *জনকণ্ঠ*, ৬ *জুলাই* ২০০২
১৪৬৮. বেগমগঞ্জে সংখ্যালঘু বিয়েবাড়িতে হামলা ও লুটপাট, আহত ৩, *সংবাদ*, ৭ *জুলাই* ২০০২
১৪৬৯. আমতলীতে সংখ্যালঘু পরিবারে সন্ত্রাসী হামলা ঃ ৭ মহিলাসহ আহত ১১, *সংবাদ*, ৭ *জুলাই* ২০০২
১৪৭০. নির্যাতিত পাঁচ হিন্দু পরিবারের ১৯ সদস্য অবৈধ পথে ভারত যাওয়ার সময় দিনাজপুরে আটক, *জনকণ্ঠ*, ৭ *জুলাই* ২০০২
১৪৭১. বাঁশখালী মন্দিরে সন্ত্রাসী হামলা ঃ আহত ৯, *যুগান্তর*, ৭ *জুলাই* ২০০২
১৪৭২. নিখোঁজ হওয়ার ৩ দিন পর রূপসায় ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার, *ভোরের কাগজ*, ৭ *জুলাই* ২০০২
১৪৭৩. বেগমগঞ্জে সংখ্যালঘু পরিবারের বিয়েবাড়িতে সন্ত্রাসীদের হামলা ঃ মালামাল লুট, মহিলাদের শ্লীলতাহানি, *ভোরের কাগজ*, ৮ *জুলাই* ২০০২
১৪৭৪. বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন বিষয়ে মার্কিন সিনেটে শুনানি হবে, *জনকণ্ঠ*, ৯ *জুলাই* ২০০২
১৪৭৫. কালিগঞ্জে ডাকাতের গুলিতে ব্যবসায়ী খুন। ভাইসহ আহত-৮। দোকান লুট, *জনকণ্ঠ*, ৯ *জুলাই* ২০০২
১৪৭৬. সংখ্যালঘুদের খামারের মাছ লুট, *সংবাদ*, ১০ *জুলাই* ২০০২
১৪৭৭. উল্লাপাড়ায় কালী মন্দির ও কালী মূর্তি ভাঙচুর, *সংবাদ*, ১০ *জুলাই* ২০০২
১৪৭৮. তিন মাস আগে অপহৃত জয়পুরহাটের দুই সংখ্যালঘু কিশোরীকে এখনও পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি, *জনকণ্ঠ*, ১০ *জুলাই* ২০০২
১৪৭৯. বিয়েবাড়িতে সবাইকে জিম্মি করে সোনাদানা ও নগদ টাকা লুট, *ভোরের কাগজ*, ১১ *জুলাই* ২০০২
১৪৮০. বোয়ালমারীতে চাঁদা না দেয়ায় সংখ্যালঘু এক কৃষকের হাত-পা ভেঙে দিয়েছে জোট সরকারের সন্ত্রাসীরা, *আজকের কাগজ*, ১১ *জুলাই* ২০০২
১৪৮১. নওগাঁর মান্দায় বিএনপি সন্ত্রাসীদের হুমকি ধামকিতে পালিয়ে বেড়াচ্ছে একটি পরিবার, *সংবাদ*, ১২ *জুলাই* ২০০২
১৪৮২. উল্লাপাড়ায় আদিবাসীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, *যুগান্তর*, ১২ *জুলাই* ২০০২
১৪৮৩. চাঁদা না দেয়ায় লালপুরে সন্ত্রাসীরা স্কুল শিক্ষককে কুপিয়ে জখম করেছে, *যুগান্তর*, ১৩ *জুলাই* ২০০২
১৪৮৪. চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় ব্যবসায়ীদের মারধর মৎস্য খামার লুট, *ভোরের কাগজ*, ১৩ *জুলাই* ২০০২
১৪৮৫. চাঁদপুরের শীর্ষস্থানীয় হিন্দু নেতাদের দেশত্যাগের হুমকি দিয়ে হরকাতুল জিহাদের চিঠি, *আজকের কাগজ*, ১৩ *জুলাই* ২০০২
১৪৮৬. বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদকৃত সংখ্যালঘু পরিবার ফরিদপুর প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে অবস্থান ধর্মঘটে ঃ বারবার ফিরেও বাড়িতে ঢুকতে পারেনি, *আজকের কাগজ*, ১৩ *জুলাই* ২০০২

১৪৮৭. পিরোজপুরে এখনো সংখ্যালঘু নির্যাতন! বহু লোকের ভারতে পলায়ন, কেউ কেউ অগোপনে ঢাকায়, *ভোরের কাগজ, ১৪ জুলাই ২০০২*

১৪৮৮. সোনাগাজীতে সন্ত্রাসী হামলা ঃ ৪টি সংখ্যালঘু পরিবার বাড়িছাড়া, আহত ৮, *প্রথম আলো, ১৪ জুলাই ২০০২*

১৪৮৯. চাঁদপুরে পৌর কমিশনারের নেতৃত্বে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি দখলের চেষ্টা, *সংবাদ, ১৫ জুলাই ২০০২*

১৪৯০. চাঁদা না দেওয়ায় সিলেটে প্রি-ক্যাডেট একাডেমির অধ্যক্ষকে পিটিয়েছে সন্ত্রাসীরা, *ভোরের কাগজ, ১৫ জুলাই ২০০২*

১৪৯১. এসিড সন্ত্রাসের শিকার দাউদকান্দির অনুকূলের পরিবার অসহায়, *প্রথম আলো, ১৭ জুলাই ২০০২*

১৪৯২. বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের উপর নিউইয়র্কে দু'শ পৃষ্ঠার বই প্রকাশ, *জনকণ্ঠ, ১৮ জুলাই ২০০২*

১৪৯৩. বৃহত্তর সিলেটে খাসিয়া সম্প্রদায় উচ্ছেদ আতংক, প্রভাবশালী ভূমিদস্যুদের হুমকি ও আগ্রাসনে দিশেহারা, *জনকণ্ঠ, ১৮ জুলাই ২০০২*

১৪৯৪. পাঁচবিবিতে আদিবাসী বৃদ্ধ কৃষককে হত্যা, *জনকণ্ঠ, ১৮ জুলাই ২০০২*

১৪৯৫. আশাশুনিতে সংখ্যালঘুর চিংড়ি ঘের বেদখল, *সংবাদ, ১৯ জুলাই ২০০২*

১৪৯৬. সরকার সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে রিট নিষ্পত্তিতে কালক্ষেপণ করছে ঃ রুলের জবাব দিতে ৮ মাসে ৬ বার সময় নিয়েছে তদন্ত রিপোর্টও দাখিল করেনি, *ভোরের কাগজ, ২০ জুলাই ২০০২*

১৪৯৭. চাঁদা না দেয়ায় ভালুকায় এক সংখ্যালঘু ব্যবসায়ী পরিবার চারমাস বাড়ি ছাড়া, *জনকণ্ঠ, ২১ জুলাই ২০০২*

১৪৯৮. জুনে সংখ্যালঘু নির্যাতন, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের রিপোর্ট প্রকাশ, *জনকণ্ঠ, ২২ জুলাই ২০০২*

১৪৯৯. পাখি শিকারে বাঁধা দেওয়ায় ঃ আদিবাসী মেয়েকে প্রহার ॥ মাকে বিবস্ত্র করেছে সন্ত্রাসীরা, *আজকের কাগজ, ২৩ জুলাই ২০০২*

১৫০০. গ্রামগুলোতে চলছে ডাকাতদের তাণ্ডব ঃ বিভীষিকার জনপদ বাঁশখালী ॥ ঘরে ঘরে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, *জনকণ্ঠ, ২৩ জুলাই ২০০২*

১৫০১. চাঁদা না দেয়ায় রায়পুরায় কাপড় ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা, *যুগান্তর, ২৩ জুলাই ২০০২*

১৫০২. গির্জায় জমি নিয়ে বিরোধ : ৭ জনকে কুপিয়ে জখম, আগৈলঝাড়ায় খ্রিস্টান পল্লীতে বিএনপি সন্ত্রাসীদের হামলা, ৪টি বাড়ি ভাংচুর, *প্রথম আলো, ২৪ জুলাই ২০০২*

১৫০৩. হালুয়াঘাটে একরাতে ২৪ সংখ্যালঘু বাড়িতে মুখোশধারীদের হামলা, কয়েক লাখ টাকার মাল লুট, *জনকণ্ঠ, ২৪ জুলাই ২০০২*

১৫০৪. হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ নেতা চিত্তরঞ্জন দাস গ্রেফতার, *জনকণ্ঠ, ২৪ জুলাই ২০০২*

১৫০৫. হাইমচরে নীরব চাঁদাবাজি, আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও সংখ্যালঘুরা আতংকে, *জনকণ্ঠ, ২৪ জুলাই ২০০২*

১৫০৬. তালায় খ্রিস্টান ও ঋষি সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন, মানব বন্ধন, ডিসিকে স্মারক লিপি, *জনকণ্ঠ, ২৪ জুলাই ২০০২*

১৫০৭. চাকরীর আশায় গ্রাম থেকে শহরে, হোটেলের ৭তলা থেকে লাফিয়ে পড়ে সম্ভ্রম বাঁচাল ঝর্ণা, *জনকণ্ঠ, ২৬ জুলাই ২০০২*

১৫০৮. জমি বন্দকের ফাঁদে উত্তরাঞ্চলের আদিবাসী সমাজ, *জনকণ্ঠ, ২৭ জুলাই ২০০২*

১৫০৯. দুই বিধবা-করুণাময়ী ও ননীবালা যাবেন কোথায় ?, *জনকণ্ঠ, ২৮ জুলাই ২০০২*

১৫১০. কুলাউড়ায় খাসিয়া পুঞ্জি ধ্বংস, একজন খুন, প্রথম আলো, ২৮ জুলাই ২০০২

১৫১১. নাঙ্গলকোটে সংখ্যালঘুর বিয়ে বাড়ীতে চাঁদা দাবী ॥ হামলায় একজন আহত, *ইত্তেফাক, ২৯ জুলাই ২০০২*

১৫১২. উল্লাপাড়ায় মন্দিরে হামলা, লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট, *সংবাদ, ৩০ জুলাই ২০০২*

১৫১৩. নওগাঁয় বিএনপি কর্মির সন্ত্রাস, আদিবাসীদের বিক্ষোভ, স্মারকলিপি, *জনকণ্ঠ, ৩১ জুলাই ২০০২*

আগস্ট ২০০২

১৫১৪. সন্ত্রাস চাঁদাবাজি, বগুড়ায় গ্রামীন ব্যাংকের ভল্ট ভাঙ্গার চেষ্টা চিতলমারিতে দুই সংখ্যালঘু সহোদর জখম, *জনকণ্ঠ, ২ আগস্ট ২০০২*

১৫১৫. কুষ্টিয়ায় ৫ লাখ টাকা চাঁদা চেয়ে দুই ডাক্তারকে উড়োচিঠি- হত্যার হুমকি, *জনকণ্ঠ, ২ আগস্ট ২০০২*

১৫১৬. সিলেটে সংখ্যালঘুর জমি দখলে হামলা॥ মুক্তিযোদ্ধা মায়ারাম গুরুতর আহত, *জনকণ্ঠ, ৩ আগস্ট ২০০২*

১৫১৭. চিতলমারীতে চিংড়ি ঘেরে বিষ প্রয়োগ॥ ৫ লাখ টাকার মাছ মরে গেছে, *জনকণ্ঠ, ৫ আগস্ট ২০০২*

১৫১৮. শালিখার ওপর সংখ্যালঘুদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা ॥ আহত ৫, *জনকণ্ঠ, ৫ আগস্ট ২০০২*

১৫১৯. দোকানের কর্মচারী খুন, *প্রথম আলো, ৬ আগস্ট ২০০২*

১৫২০. হালিশহর দাস পাড়ায় চাঁদার দাবিতে ঘরে ঢুকে মহিলাদের মারধর, দুই সন্ত্রাসীকে ধরে পিটুনি, *জনকণ্ঠ, ৭ আগস্ট, ২০০২*

১৫২১. সাতক্ষীরায় মা ছেলে দিগম্বর মামলা ঃ মোসলেমসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট আজ, *জনকণ্ঠ, ৭ আগস্ট ২০০২*

১৫২২. সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ ঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক হিন্দুর বাড়ি দখল করে নিয়েছে বিএনপি সাংসদের ভাই, *ভোরের কাগজ, ৮ আগস্ট ২০০২*

১৫২৩. আগৈলঝাড়ার খ্রিস্টানপল্লী এখনো অবরুদ্ধ ঃ বিএনপি ক্যাডারদের হামলার ঘটনায় মামলা হলেও পুলিশ নির্বিকার, বাদী-সাক্ষীকে হুমকি, *ভোরের কাগজ, ৯ আগস্ট ২০০২*

১৫২৪. নলছিটিতে এক গ্রাম্য ডাক্তারের উপর মধ্যযুগীয় নির্যাতন, *আজকের কাগজ*, *১০ আগস্ট ২০০২*
১৫২৫. সিলেটে ব্যবসায়ীর ওপর এসিড নিক্ষেপ, মুখমণ্ডল দগ্ধ, দুটি চোখ নষ্ট, *প্রথম আলো*, *১০ আগস্ট ২০০২*
১৫২৬. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির ক্যাডারদের হামলায় ৮ দিন ধরে ক্যাম্পাস ছাড়া সংখ্যালঘু এক ছাত্র, *আজকের কাগজ*, *১০ আগস্ট ২০০২*
১৫২৭. আবদার বিপত্তি, *ভোরের কাগজ*, *১১ আগস্ট ২০০২*
১৫২৮. মোড়েলগঞ্জের কালীমন্দিরে গরু জবাই, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ক্ষোভ, *ভোরের কাগজ*, *১১ আগস্ট ২০০২*
১৫২৯. পূর্ব শত্রুতার জের ॥ যশোরে ১ ব্যক্তিকে কুপিয়ে জখম, *জনকণ্ঠ*, *১১ আগস্ট ২০০২*
১৫৩০. সংখ্যালঘুদের প্রতি সন্ত্রাসীদের নির্দেশ ঃ হয় চাঁদা অথবা মেয়ে দাও নতুবা জায়গাজমি লিখে দিয়ে চলে যাও, *ভোরের কাগজ*, *১২ আগস্ট ২০০২*
১৫৩১. রায়পুরায় ব্যবসায়ী মানিক হত্যাকাণ্ড ঃ পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় আসামিরা প্রকাশ্যে ॥ চরম নিরাপত্তাহীনতায় বাদীপক্ষ, *ভোরের কাগজ*, *১২ আগস্ট ২০০২*
১৫৩২. বোয়ালমারীতে কলেজ ছাত্রীকে নির্যাতনের অভিযোগ॥ থানা মামলা নেয়নি, *সংবাদ*, *১২ আগস্ট ২০০২*
১৫৩৩. জয়পুরহাটে আদিবাসী স্কুলশিক্ষিকাকে অপহরণ করে ধর্ষণ ঃ ময়মনসিংহ জামালপুরে ২ জনের শ্লীলতাহানি, *প্রথম আলো*, *১২ আগস্ট ২০০২*
১৫৩৪. বাগেরহাটে একরাতে ২ সংখ্যালঘু বাড়িতে ডাকাতি, আতঙ্ক, *ভোরের কাগজ*, *১৩ আগস্ট ২০০২*
১৫৩৫. ফরিদগঞ্জে পৃথক দুটি ঘটনায় সংখ্যালঘু পরিবারের ১০ জন আহত, *ভোরের কাগজ*, *১৩ আগস্ট ২০০২*
১৫৩৬. দুর্নীতি দমন বিভাগে মামলা করায় হত্যার হুমকি ঃ সদরপুরে বাস্তুভিটাসহ সংখ্যালঘু পরিবারের জমিজমা দখল করেছে জালিয়াতচক্র, *ভোরের কাগজ*, *১৩ আগস্ট ২০০২*
১৫৩৭. কুমিল্লায় শত বছরের পুরনো শ্মশান দখল, *প্রথম আলো*, *১৩ আগস্ট ২০০২*
১৫৩৮. জোর করে সাদা স্ট্যাম্পে সই আদায় ঃ পাঁচবিবিতে আদিবাসী বৃদ্ধকে হত্যার পর পুত্রকেও প্রাণনাশের হুমকি, *সংবাদ*, *১৪ আগস্ট ২০০২*
১৫৩৯. আদিবাসী ৪০টি পরিবারকে উচ্ছেদের নানা প্রচেষ্টা ঃ একটি মামলার রায়কে পুঁজি করে চুনারুঘাটে খাস ভূমি বৈরাগী পুঞ্জি দখলের উদ্যোগ, *আজকের কাগজ*, *১৪ আগস্ট ২০০২*
১৫৪০. পাবনায় আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণ, *প্রথম আলো*, *১৪ আগস্ট ২০০২*
১৫৪১. প্রাণভয়ে জয়পুরহাটে আশ্রয় নিয়েছেন ডাক কর্মকর্তা, *প্রথম আলো*, *১৪ আগস্ট ২০০২*
১৫৪২. ফরিদপুরে নাটক কথা কৃষ্ণকলি নিয়ে উত্তেজনা, আজ তৌহিদী জনতার প্রতিবাদ সমাবেশ, *জনকণ্ঠ*, *১৫ আগস্ট*, *২০০২*
১৫৪৩. ৬ দিনেও উদ্ধার হয়নি চট্টগ্রামে অপহৃত যুবক, *প্রথম আলো*, *১৬ আগস্ট ২০০২*
১৫৪৪. টুঙ্গীপাড়ায় সংখ্যালঘু একটি পরিবারের বাড়িঘর লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও দখল, *সংবাদ*, *১৬ আগস্ট ২০০২*
১৫৪৫. সাতক্ষীরায় ধর্ষণ মামলার রিপোর্ট নিয়ে অভিযোগ, *যুগান্তর*, *১৭ আগস্ট ২০০২*
১৫৪৬. দারোগা ব্যবসায়ী সহ ৩ খুন, ২ সন্ত্রাসীও মরেছে পিটুনিতে, *জনকণ্ঠ*, *১৮ আগস্ট*, *২০০২*
১৫৪৭. সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্পর্কে সরকারের রিপোর্ট পেশ, ঘটনা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উল্লেখ করা হয়েছে, *জনকণ্ঠ*, *১৮ আগস্ট*, *২০০২*
১৫৪৮. আদিবাসী নেতা সরেন হত্যার দ্বিতীয় বার্ষিকী আজ, আসামীরা জামিনে বেরিয়ে বাদি সাক্ষীদের হত্যার হুমকি দিচ্ছে, *জনকণ্ঠ*, *১৮ আগস্ট*, *২০০২*
১৫৪৯. শ্রীপুরে সুইপারের ঘর কেটে পুকুরে, *সংবাদ*, *১৯ আগস্ট ২০০২*
১৫৫০. সন্ত্রাস ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে জয়পুরহাটে আদিবাসীদের বিক্ষোভ, *জনকণ্ঠ*, *১৯ আগস্ট ২০০২*
১৫৫১. বানারীপাড়ায় গৃহবধূকে কুপিয়ে জখম, *যুগান্তর*, *১৯ আগস্ট ২০০২*
১৫৫২. ফরিদপুরে কথাকৃষ্ণকলি নিয়ে সংস্কৃতিকর্মীদের গ্রেফতার, আতংক, *জনকণ্ঠ*, *২০ আগস্ট*, *২০০২*
১৫৫৩. তেজগাঁওয়ে এএসআই দিনেশ খুন হওয়ায় ফরিদপুরের ধোপাপাড়া গ্রাম শোকস্তব্ধ, *জনকণ্ঠ*, *২০ আগস্ট*, *২০০২*
১৫৫৪. মাদারগঞ্জ বৃদ্ধা সুমতিবালা নিরাপদে থাকার নিশ্চয়তা চান, ফেরত চান বাড়ি ভিটা, *জনকণ্ঠ*, *২০ আগস্ট*, *২০০২*
১৫৫৫. নড়াইলের কালিয়ায় অস্ত্রের মুখে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ, *আজকের কাগজ*, *২১ আগস্ট ২০০২*
১৫৫৬. সিলেটের গোলাপগঞ্জে প্রধান শিক্ষককে গুলি করে হত্যা ॥ আহত ২, *আজকের কাগজ*, *২২ আগস্ট ২০০২*
১৫৫৭. আগৈলঝাড়ায় স্কুলছাত্রী অপহরণের চেষ্টা ঃ স্কুল বন্ধ ঘোষণা, *যুগান্তর*, *২৩ আগস্ট ২০০২*
১৫৫৮. বিরোধ নিষ্পত্তিতে জামাত এমপির হস্তক্ষেপ ঃ সাতক্ষীরায় মারধর করে সংখ্যালঘু পরিবারকে জমিজমা থেকে উচ্ছেদ, *ভোরের কাগজ*, *২৩ আগস্ট ২০০২*
১৫৫৯. বিএনপি সন্ত্রাসীদের বর্বর নির্যাতন ঃ হাসপাতালেও সন্ত্রস্ত ছবি রানী ॥ রামপাল বিএনপি অফিসে নিয়ে আওয়ামী লীগের এই নারী কর্মীর চুল কেটে দিয়ে হাতুড়িপেটা করে বিবস্ত্র ছবি তোলা হয়, মামলা করবে কে?, *ভোরের কাগজ*, *২৪ আগস্ট ২০০২*
১৫৬০. বাগেরহাটে আওয়ামী লীগ কর্মী ও এক গৃহবধূ এসিডদগ্ধ, গ্রেপ্তার ১, *ভোরের কাগজ*, *২৪ আগস্ট ২০০২*
১৫৬১. ফটিকছড়িতে অপহৃত ব্যবসায়ীর এখনও খোঁজ মেলেনি, *আজকের কাগজ*, *২৪ আগস্ট ২০০২*
১৫৬২. খালিয়াজুরীতে এক ব্যক্তিকে জবাই, *জনকণ্ঠ*, *২৪ আগস্ট ২০০২*
১৫৬৩. নেত্রকোনায় দু'টি মন্দিরে হামলা, ভাংচুর, *জনকণ্ঠ*, *২৪ আগস্ট ২০০২*
১৫৬৪. যশোরে ছাত্রলীগ কর্মীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে রড দিয়ে পিটিয়েছে সন্ত্রাসীরা, *জনকণ্ঠ*, *২৪ আগস্ট ২০০২*
১৫৬৫. এবার বানিয়াচঙ্গে মন্দিরে সেবায়েতের গলাকাটা লাশ, *জনকণ্ঠ*, *২৪ আগস্ট ২০০২*

১৫৬৬. সৈয়দপুরে স্কুল শিক্ষিকার কাছে চাঁদা দাবি ॥ এসিড মারার হুমকি, *জনকণ্ঠ*, *২৪ আগস্ট ২০০২*

১৫৬৭. ছবিরানীকে নির্যাতনে জড়িত রামপাল বিএনপির চার সদস্য বহিস্কার ঃ গ্রেফতার-৩, শংকা কাটেনি, *জনকণ্ঠ*, *২৫ আগস্ট*, *২০০২*

১৫৬৮. ছবি রাণীর উপর নির্যাতনে শেখ হাসিনার নিন্দা, *জনকণ্ঠ*, *২৫ আগস্ট ২০০২*

১৫৬৯. জামিনে থাকা অবস্থায় অসিম কুমার উকিলকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার, *জনকণ্ঠ*, *২৫ আগস্ট ২০০২*

১৫৭০. সেবায়েত হত্যায় বানিয়াচঙ্গে চরম আতঙ্ক, আটক দুজনকে আজ কোর্টে চালান, *জনকণ্ঠ*, *২৫ আগস্ট ২০০২*

১৫৭১. ফরিদপুরে সাংবাদিক হত্যার হুমকি, গোপালগঞ্জের বিশিষ্ট নাগরিকদের নিন্দা, *জনকণ্ঠ*, *২৫ আগস্ট ২০০২*

১৫৭২. সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্পর্কে হাইকোর্টে দেয়া জোট সরকারের রিপোর্টটি জঘন্য মিথ্যাচার ॥ স্টেটসম্যান, *জনকণ্ঠ*, *২৬ আগস্ট ২০০২*

১৫৭৩. বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জে মাছ ব্যবসায়ী অপহৃত, *আজকের কাগজ*, *২৬ আগস্ট ২০০২*

১৫৭৪. শালিখায় অস্ত্রের মুখে দশম শ্রেণীর ছাত্রী তপতী মণ্ডলকে অপহরণ, *আজকের কাগজ*, *২৬ আগস্ট ২০০২*

১৫৭৫. সাতক্ষীরার কালিগঞ্জে সংখ্যালঘু নির্যাতনবিরোধী কনভেনশন ঃ ভারতে পালাতে চাই না, প্রতিরোধ করে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াতে চাই, *ভোরের কাগজ*, *২৬ আগস্ট ২০০২*

১৫৭৬. প্রধান আসামী জামিনে ও অন্য কয়েকজন পলাতক ঃ সাতক্ষীরায় দিগম্বর করে নির্যাতনের শিকার মা ও পুত্র প্রাণভয়ে দু'মাস ধরে বাড়ি ফিরতে পারছেনা, *জনকণ্ঠ*, *২৭ আগস্ট ২০০২*

১৫৭৭. ছাতকে সন্ত্রাসী হামলায় খেলাঘরের চারু ও কারুকলা সম্পাদক রন্টু আচার্য আহত, *আজকের কাগজ*, *২৭ আগস্ট ২০০২*

১৫৭৮. রাজৈরে রাধা-গোবিন্দ মন্দিরে মূর্তি ভাংচুর ॥ সংখ্যালঘুদের ক্ষোভ, আতঙ্ক, *আজকের কাগজ*, *২৮ আগস্ট ২০০২*

১৫৭৯. কুমারখালীতে শিশু অপহরণ ॥ ৪ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি ॥ এলাকাবাসী আতঙ্কে, *জনকণ্ঠ*, *২৮ আগস্ট ২০০২*

১৫৮০. চাঁদা না দেয়ায় শৈলকুপায় একই পরিবারের তিন সদস্যকে কুপিয়ে জখম, *জনকণ্ঠ*, *২৮ আগস্ট ২০০২*

১৫৮১. জামালপুরে সংখ্যালঘু এক পরিবারকে উচ্ছেদের হুমকি, *যুগান্তর*, *২৯ আগস্ট ২০০২*

১৫৮২. মেডিকেল বোর্ড প্রধানও কথা বলেননি, ছবি রাণীর শয্যাপাশে শেখ হাসিনা, চিকিৎসার ত্রুটিতে অসন্তোষ, *জনকণ্ঠ*, *৩০ আগস্ট*, *২০০২*

১৫৮৩. বাজিতপুরে স্কুলছাত্রীকে অপহরণের চেষ্টা ব্যর্থ, গ্রেপ্তার ১, *প্রথম আলো*, *৩১ আগস্ট ২০০২*

১৫৮৪. পাইকগাছায় সংখ্যালঘুর বাড়ি লুটপাট ও মন্দির ভাংচুরের অভিযোগ, *যুগান্তর*, *৩১ আগস্ট ২০০২*

১৫৮৫. কোটচাঁদপুরে মুক্তিপণের দাবিতে ১ জন অপহৃত, *সংবাদ*, *৩১ আগস্ট ২০০২*

সেপ্টেম্বর ২০০২

১৫৮৬. বাকলিয়ায় বিগত বিএনপি আমলের এক সন্ত্রাসী বাহিনীর পুনরুত্থান, *ভোরের কাগজ*, *১ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৫৮৭. চট্টগ্রামে স্বর্ণ ব্যবসায়ী অপহৃত : ৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি, *যুগান্তর*, *১ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৫৮৮. বরগুনায় সন্ত্রাসীদের হামলায় এনজিও কর্মী আহত, *প্রথম আলো*, *১ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৫৮৯. সংখ্যালঘু ব্যবসায়ী খুন ॥ কিশোরগঞ্জে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক, *সংবাদ*, *১ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৫৯০. ছবি রাণীর নির্যাতনকারীরা আমাদের দলের লোক- বাগেরহাটে বিএনপি এমপি, *জনকণ্ঠ*, *২ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৫৯১. নীরফামারীতে সন্ত্রাসীদের হাতে এক সংখ্যালঘু নিহত, *জনকণ্ঠ*, *২ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৫৯২. ১৯ বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি ॥ বরদেশ্বরী মন্দির কমিটির নেতা চিত্তরঞ্জন ও হারাধনের মুক্তি দাবি, *ভোরের কাগজ*, *২ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৫৯৩. সরকার সমর্থকদের দখলাভিযান সম্পর্কে জানে না পুলিশ ঃ উল্লাপাড়ায় মন্দিরের ৪২ বিঘা জমি দখল করে রাতারাতি বসত তৈরি, *ভোরের কাগজ*, *৩ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৫৯৪. জলঢাকায় আবারও জামাত ক্যাডারদের হামলা ॥ মামলা তুলে না নিলে জবাই করে হত্যার হুমকি, *সংবাদ*, *৩ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৫৯৫. মংলায় সাবেক ইউপি সদস্যাকে গণধর্ষণ, *আজকের কাগজ*, *৩ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৫৯৬. চবির ৫ সংখ্যালঘু শিক্ষককে দেশত্যাগের হুমকি দিয়েছে ইসলামিক সলিডারিটি ॥ ডাকযোগে চিঠি, *জনকণ্ঠ*, *৫ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৫৯৭. ঘটনাস্থল মনিরামপুর ঃ ধর্ষণ প্রচেষ্টার ঘটনায় আদালতে মামলা করে বিপাকে পড়েছেন বাদিপক্ষ, *সংবাদ*, *৫ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৫৯৮. নাটক কথা কৃষ্ণকলি ২৮ নাট্যকর্মীর মাল ক্রোকের নির্দেশ, *জনকণ্ঠ*, *৬ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৫৯৯. চবির পাঁচ সংখ্যালঘু শিক্ষককে দেশ ছাড়ার হুমকিতে বিস্ময়, গোয়েন্দা অনুসন্ধান শুরু, *জনকণ্ঠ*, *৬ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৬০০. কটিয়াদীতে এক স্কুলছাত্রীকে অপহরণ করেছে দুর্বৃত্তরা॥ অ্যাসিড নিক্ষেপ, *সংবাদ*, *৭ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৬০১. মানিকগঞ্জে সংখ্যালঘু কৃষক হত্যা, *সংবাদ*, *৮ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৬০২. প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ ঃ যশোরে নির্যাতনের প্রতিবাদে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মৌন মিছিল, *প্রথম আলো*, *৮ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৬০৩. নওগাঁয় সংখ্যালঘু গৃহবধূকে গভীর রাতে অস্ত্রের মুখে অপহরণ, *জনকণ্ঠ*, *৯ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৬০৪. বাজিতপুরে স্কুলছাত্রী অপহরণের চেষ্টা ॥ অস্ত্র উদ্ধার ॥ ১ জন আটক, *সংবাদ*, *৯ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৬০৫. কালিয়ায় ২ সংখ্যালঘুকে পিটিয়েছে সন্ত্রাসীরা, *আজকের কাগজ*, *৯ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৬০৬. তিনদিন পরও মুক্তাগাছার অপহৃত স্কুলছাত্রী সুমীর সন্ধান মেলেনি, *যুগান্তর*, *৯ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬০৭. সংজ্ঞাহীন হয়ে নীপু বড়ুয়া আবার হাসপাতালে, *ভোরের কাগজ*, *১০ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬০৮. বগুড়ায় ফাঁসি দিয়ে নৈশপ্রহরীকে হত্যা, *সংবাদ*, *১১ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬০৯. ঝালকাঠিতে অনিল পুলিশের পরিবারকে উচ্ছেদের চক্রান্ত! ৪ ছেলে এলাকাছাড়া, *জনকণ্ঠ*, *১১ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬১০. জুরাইনে আশ্রমের মনসা মূর্তি ভাংচুর, *যুগান্তর*, *১১ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬১১. লক্ষ্মীপুরে সংখ্যালঘু দু'মেয়ের ইজ্জত বাঁচাতে গিয়ে পিতা গুলিবিদ্ধ, *সংবাদ*, *১২ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬১২. নওগাঁয় গৃহবধূকে ৪ দিন আটকে রেখে ধর্ষণের অভিযোগ, মামলা দায়ের, *ভোরের কাগজ*, *১২ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬১৩. বগুড়ায় তালোড়া বাজারের হিন্দু ও মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের উড়ো চিঠি, *যুগান্তর*, *১২ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬১৪. মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করে চিঠি ॥ যশোরে ১১ সংখ্যালঘু পরিবার আতঙ্কে, *জনকণ্ঠ*, *১২ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬১৫. মোড়েলগঞ্জে চাঁদা দাবিতে সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলা ৪ ছেলেকে বেদম মারপিট, *জনকণ্ঠ*, *১২ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬১৬. মাদারীপুরে ৮ পরিবার ১০ দিন অবরুদ্ধ ঃ সন্ত্রাসীদের নেতৃত্বদানকারী এলেম বয়াতি, *প্রথম আলো*, *১২ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬১৭. আসামিরা জামিনে বেরিয়ে নির্যাতিতদের হুমকি দেয় ঃ টাঙ্গাইলে অপহরণ-ধর্ষণসহ নারী ও শিশু নির্যাতন উদ্বেগজনক গতিতে বাড়ছে, *সংবাদ*, *১৩ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬১৮. চট্টগ্রামে সন্ত্রাসীদের বাঁচাতে কমিটি, *যুগান্তর*, *১৩ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬১৯. নওগাঁয় প্রতিবন্ধী মহিলাকে ধর্ষণ, *জনকণ্ঠ*, *১৪ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬২০. শ্যামপুরে ব্যবসায়ীকে ছুরি মেরে ৩ লাখ টাকা ছিনতাই, *ভোরের কাগজ*, *১৪ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬২১. বিদ্যুৎ লাইন নিতে গিয়ে এক ব্যক্তির লাখ টাকার গাছ কেটে সাবাড়, *সংবাদ*, *১৪ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬২২. সোনাগাজীতে গণধর্ষণের শিকার সংখ্যালঘু পরিবারের ২ বোন, *আজকের কাগজ*, *১৪ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬২৩. পার্বতীপুরে সরকারী দলের লোকেরা শ্মশানের জায়গা দখল করেছে, *জনকণ্ঠ*, *১৫ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬২৪. পিতার অস্বাভাবিক মৃত্যুর কথা বলে সন্তানদের কাছে চাঁদা দাবি, না পেয়ে মারধর, *ভোরের কাগজ*, *১৬ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬২৫. মানিকগঞ্জে ৩ পরিবারের গাছপালা জমি দখলে নিচ্ছে প্রভাবশালীরা, *প্রথম আলো*, *১৬ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬২৬. গাজীপুরে সন্ত্রাসী হামলায় ছাত্রলীগ নেতা আহত, *আজকের কাগজ*, *১৭ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬২৭. নড়াইলে হাতুড়ি দিয়ে যুবকের হাত-পা গুঁড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা, *প্রথম আলো*, *১৭ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬২৮. জোট ক্যাডারদের নির্যাতনের বর্ণনা ঃ উখিয়ায় নির্যাতিত চাকমা নারী কক্সবাজার আদালতের শরণাপন্ন, *জনকণ্ঠ*, *১৮ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬২৯. চরবিষ্ণুপুর গ্রামের ঘটনা ॥ ২ জন গণধর্ষণের শিকার, *সংবাদ*, *১৮ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬৩০. নড়াইলে ঘেরমালিককে কুপিয়ে হত্যা, *প্রথম আলো*, *১৮ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬৩১. সরকারীদলীয় ক্যাডাররা এবার মাছ লুট করেছে, *আজকের কাগজ*, *১৮ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬৩২. নির্মূল কমিটির সংবাদ সম্মেলনে কবীর চৌধুরী ॥ জোট সরকার রাষ্ট্রকে পরিণত করেছে অসহায়, বিপন্ন, নির্যাতিতের বিরুদ্ধ শক্তিতে, নিষ্পেষণের হাতিয়ারে, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, *১৮ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬৩৩. চিতলমারীতে বিশ্বকর্মা প্রতিমা ভাংচুর, *জনকণ্ঠ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬৩৪. মানিকগঞ্জে জাপা নেতার দাপটে দিশাহারা ৪টি পরিবার, *জনকণ্ঠ*, *১৯ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬৩৫. তালায় বিএনপি সন্ত্রাসীরা একটি পরিবারের বাড়িঘর দখল করেছে, *সংবাদ*, *২০ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬৩৬. গৌরীপুরে ৩০টি হিন্দু পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ঃ জায়গা দখল করে নানা উৎপাত মেয়েদের স্কুল-কলেজে যাওয়া বন্ধ, *প্রথম আলো*, *২০ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬৩৭. পাবনায় সংখ্যালঘু কিশোরী অপহরণ ॥ ৬ দিনেও উদ্ধার হয়নি, *জনকণ্ঠ*, *২১ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬৩৮. কেরানীগঞ্জে পূজামণ্ডপে হামলা করে দুর্গা প্রতিমা গুঁড়িয়ে দিয়েছে উগ্রবাদীরা, *ভোরের কাগজ*, *২১ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬৩৯. পূজা উদযাপন পরিষদের প্রতিনিধি সম্মেলন ঃ সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন সরকার কিছু করছে না, *সংবাদ*, *২১ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬৪০. কুড়িগ্রামে সংখ্যালঘু পরিবারে সন্ত্রাসী হামলা ॥ মহিলাকে বিবস্ত্র করে মারধর, *জনকণ্ঠ*, *২২ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬৪১. আরো ৪ পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ঃ বিএনপি সন্ত্রাসীদের চাঁদা দিতে ব্যর্থ হয়ে সংখ্যালঘু পরিবার বাড়িছাড়া, *ভোরের কাগজ*, *২৩ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬৪২. মামলা হলেও পুলিশ হামলাকারীদের ধরছে না ॥ বোয়ালমারীতে সন্ত্রাসীদের প্রহারে আহত কৃষক বিধান ঃ চিকিৎসার অভাবে এখন পঙ্গু হওয়ার পথে, *আজকের কাগজ*, *২৩ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬৪৩. চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে মাছ ব্যবসায়ী খুন, *আজকের কাগজ*, *২৩ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬৪৪. জমি নিয়ে বিরোধের জের ॥ মতলবে গৃহবধূর জিহবা কেটে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা, *ভোরের কাগজ*, *২৪ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬৪৫. নাটোরে খ্রীস্টান পাড়ায় সন্ত্রাসীদের হামলা ২ মহিলা লাঞ্ছিত, ভাংচুর লুট, *জনকণ্ঠ*, *২৪ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৬৪৬. সন্ত্রাসীদের ভয়ে পালিয়ে শেষ রক্ষা হয়নি সন্দিপের, *যুগান্তর*, *২৪ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৬৪৭. সন্ত্রাসীদের চাঁদা দিতে না পেরে বাড়ি ছাড়তে হলো ডা. পরিমলকে, *প্রথম আলো, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৬৪৮. রূপসায় ঘুমন্ত দোকানি গুলিবিদ্ধ, *ভোরের কাগজ, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৬৪৯. ঘটনা তেরখাদার বলদ্ধর্ণা গ্রামের ঃ স্কুলপড়ুয়া এক ছাত্রীকে রামপালের ছবি রানী মণ্ডলের ন্যায় সম্ভ্রমহানিসহ পরিবারকে ভিটেমাটি ছাড়া করার হুমকি, *সংবাদ, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৬৫০. চিতলমারীতে নিখোঁজ হলো আরো একটি সংখ্যালঘু পরিবার, *ভোরের কাগজ, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৬৫১. নওগাঁয় আদিবাসী পল্লীতে সশস্ত্র হামলা, ১০ আদিবাসী পরিবার গ্রামছাড়া, *ভোরের কাগজ, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৬৫২. হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের দাবি দিবস পালিত, *যুগান্তর, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৬৫৩. মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে নির্মাণাধীন দুর্গামূর্তি ভাঙচুর, *আজকের কাগজ, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৬৫৪. শালিখায় মণ্ডপে সন্ত্রাসী হামলা ॥ দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর, *জনকণ্ঠ, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৬৫৫. কচুয়ায় আবারো গণধর্ষণের শিকার হলো সংখ্যালঘু পরিবারের গৃহবধূ, *ভোরের কাগজ, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৬৫৬. গাইবান্ধায় দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর, *আজকের কাগজ, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৬৫৭. বাগেরহাটে মন্দিরে হামলা প্রতিমা ভাঙচুর, *প্রথম আলো, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৬৫৮. নেত্রকোনায় বোমা মেরে পূজা মণ্ডপ উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছে মৌলবাদীরা, *জনকণ্ঠ, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০২*

১৬৫৯. ধামরাইয়ে সংখ্যালঘু প্রবাসীর স্ত্রীকে মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন, বাড়ি-ভিটা থেকে উচ্ছেদ, *ভোরের কাগজ, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০২*

অক্টোবর ২০০২

১৬৬০. পার্বতীপুরে মনসা দেবী মন্দিরের পুরোহিতকে উড়োচিঠি ॥ ৫০ হাজার টাকা দাবি, *জনকণ্ঠ, ১ অক্টোবর ২০০২*

১৬৬১. বিএনপি ক্যাডার ও প্রভাবশালীদের মদদ ॥ বরিশালে প্রকাশ্যে হিন্দু পরিবারকে উচ্ছেদ করে পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখল, *জনকণ্ঠ, ১ অক্টোবর ২০০২*

১৬৬২. ফেনীতে মার্কেটে সন্ত্রাসী হামলা স্বর্ণের দোকান লুট, *ভোরের কাগজ, ১ অক্টোবর ২০০২*

১৬৬৩. গুরুদাসপুরে আদিবাসী পল্লীতে হামলা ভাঙচুর, গ্রেপ্তার ২, *প্রথম আলো, ২ অক্টোবর ২০০২*

১৬৬৪. ৫ লাখ টাকা চাঁদার দাবিতে ব্যবসায়ীকে অপহরণ, মারধর, *ভোরের কাগজ, ২ অক্টোবর ২০০২*

১৬৬৫. অপহরণের ৯ দিন পরও স্কুলছাত্রী হ্যাপি উদ্ধার হয়নি, *সংবাদ, ৩ অক্টোবর ২০০২*

১৬৬৬. খুলনার রূপসায় প্রতিমা ভাঙচুর ॥ সংখ্যালঘুদের মধ্যে ক্ষোভ, *সংবাদ, ৩ অক্টোবর ২০০২*

১৬৬৭. ময়মনসিংহের ফুলপুরে প্রতিমা ভাঙচুর, *প্রথম আলো, ৩ অক্টোবর ২০০২*

১৬৬৮. রিক্সাচালকের স্ত্রীকে ধর্ষণ ও অপহরণে বাধা দেয়ায় রুষ্ট সন্ত্রাসীদের হামলা ঃ কুড়িগ্রামে দুই সংখ্যালঘু গ্রাম কার্যত অবরুদ্ধ, *জনকণ্ঠ, ৩ অক্টোবর ২০০২*

১৬৬৯. গাইবান্ধার বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা গৌতম চন্দ্র মোদকের বাড়িসহ তিন সংখ্যালঘু বাড়িতে সন্ত্রাসী হামলা, *জনকণ্ঠ, ৪ অক্টোবর ২০০২*

১৬৭০. বামনায় আওয়ামী লীগ কর্মীর লাশ উদ্ধার, *আজকের কাগজ, ৪ অক্টোবর ২০০২*

১৬৭১. মহাদেব গ্রামে এবার কি দুর্গাপূজা হবে না?, *ভোরের কাগজ, ৪ অক্টোবর ২০০২*

১৬৭২. সাতক্ষীরায় চিংড়ি ব্যবসায়ী এসিডদগ্ধ, গ্রেপ্তার ২, *প্রথম আলো, ৫ অক্টোবর ২০০২*

১৬৭৩. লোহাগড়ায় পিটিয়ে যুবক হত্যা, *যুগান্তর, ৫ অক্টোবর ২০০২*

১৬৭৪. ঠাকুরগাঁও চিনিকলের শ্রমিক খুন, *জনকণ্ঠ, ৫ অক্টোবর ২০০২*

১৬৭৫. চাঁদা দাবিতে দাগনভূঁঞায় দুর্গা প্রতিমা ও আবুপুরে মন্দির ভাংচুর, *জনকণ্ঠ, ৬ অক্টোবর ২০০২*

১৬৭৬. ফুলতলায় গুলি করে ১ ব্যক্তিকে হত্যা, *সংবাদ, ৬ অক্টোবর ২০০২*

১৬৭৭. রামপালে বোবা কিশোরী ধর্ষিত, *সংবাদ, ৬ অক্টোবর ২০০২*

১৬৭৮. ধামরাইয়ে সংখ্যালঘুর বাড়ি দখলের ঘটনা ॥ পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর তদন্ত ঃ পুলিশের ভূমিকা নিয়ে জনমনে ক্ষোভ, *ভোরের কাগজ, ৬ অক্টোবর ২০০২*

১৬৭৯. রাউজানে সন্ত্রাসী তাণ্ডবে আতঙ্কিত এলাকাবাসী ॥ সপ্তাহকাল ধরে সাংবাদিকসহ হামলার শিকার কয়েকটি পরিবার, খুন হয়েছে এক গৃহবধূ, *ভোরের কাগজ, ৭ অক্টোবর ২০০২*

১৬৮০. নেত্রকোনায় ফের দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর ॥ সাতক্ষীরায় সংখ্যালঘুর বাড়ি তছনছ, *জনকণ্ঠ, ৭ অক্টোবর ২০০২*

১৬৮১. থানচিতে ৩ আদিবাসীকে অপহরণ ঃ মুক্তিপণ না পেয়ে একজনকে হত্যা, *ভোরের কাগজ, ৭ অক্টোবর ২০০২*

১৬৮২. রাউজানে ডাকাতি, মহিলা খুন, দেড় লাখ টাকার মালামাল লুট, *আজকের কাগজ, ৭ অক্টোবর ২০০২*

১৬৮৩. দিনাজপুরের ব্যবসায়ীর পুত্রকে অপহরণ করে ঢাকায় এনে এসিডে ঝলসে নদীতে নিক্ষেপ, *প্রথম আলো, ৭ অক্টোবর ২০০২*

১৬৮৪. চকরিয়ায়র গ্রামে সাড়ে তিন শ' রাখাইন পরিবার আতঙ্কে, *জনকণ্ঠ, ৭ অক্টোবর ২০০২*

১৬৮৫. মাঠ থেকে দুই যুবতীর লাশ উদ্ধার, *ইনকিলাব, ৭ অক্টোবর ২০০২*

১৬৮৬. টুঙ্গিপাড়ায় যুবক খুন, *যুগান্তর, ৮ অক্টোবর ২০০২*

১৬৮৭. ফতুল্লা, নেত্রকোনায় দুর্গাপূজার প্রতিমা ভাঙচুর, কুলিয়ারচরে মন্দিরে আগুন, *সংবাদ, ৮ অক্টোবর ২০০২*

১৬৮৮. পিরোজপুরের দুর্গাপূজা না করার জন্য চিঠি, *সংবাদ, ৮ অক্টোবর ২০০২*

১৬৮৯. ঢাকায় একসঙ্গে ৪ জন এসিড সন্ত্রাসের শিকার!, *জনকণ্ঠ, ৮ অক্টোবর ২০০২*
১৬৯০. ঝিনাইদহের গ্রামে এক মহিলাকে রাতভর গণধর্ষণ, *যুগান্তর, ৮ অক্টোবর ২০০২*
১৬৯১. কেরানীগঞ্জে একটি সংখ্যালঘু পরিবারের জমি দখল করে ঘর তুলেছে সন্ত্রাসীরা, *জনকণ্ঠ, ৮ অক্টোবর ২০০২*
১৬৯২. সূত্রাপুরের লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির দখলমুক্ত করতে পারেনি পুলিশ, *জনকণ্ঠ, ৮ অক্টোবর ২০০২*
১৬৯৩. ঝালকাঠিতে চাঁদা দাবিতে সংখ্যালঘুর বাড়ি ভাংচুর ॥ সাবেক ইউপি সদস্য গ্রেফতার, *জনকণ্ঠ, ৮ অক্টোবর ২০০২*
১৬৯৪. আদালতের নির্দেশের পরও থানা মামলা গ্রহণ করেনি ঃ অপহরণের ৪৮ দিন পরও স্কুলছাত্রী শিপ্রাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, *সংবাদ, ৯ অক্টোবর ২০০২*
১৬৯৫. প্রতিকার মেলেনি ঃ অজানার উদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছে ক্ষুদিরাম, *সংবাদ, ৯ অক্টোবর ২০০২*
১৬৯৬. নারায়ণগঞ্জে পূজামণ্ডপে বিডিআর টহল, পাগলায় প্রতিমা ভাংচুর ঘটনায় কোর্টে নৈশপ্রহরীর জবানবন্দি, *জনকণ্ঠ, ১০ অক্টোবর ২০০২*
১৬৯৭. বস্ত্রহরণ, হুমকি এবং .... ॥ নাটোরে সংখ্যালঘু নিপীড়ন, *সংবাদ, ১১ অক্টোবর ২০০২*
১৬৯৮. পাবনায় মন্দিরে হানা দিয়ে প্রতিমা ভাঙচুর ঃ পূজা উৎসব না করার সিদ্ধান্ত, *প্রথম আলো, ১১ অক্টোবর ২০০২*
১৬৯৯. নড়াইলে প্রতিমা ভাঙচুর, *প্রথম আলো, ১২ অক্টোবর ২০০২*
১৭০০. জয়পুরহাটে আদিবাসী শিক্ষিকাকে অপহরণ করে গণধর্ষণ, *জনকণ্ঠ, ১২ অক্টোবর ২০০২*
১৭০১. টাঙ্গাইলের ধনবাড়িতে দুর্গাপ্রতিমা ভাঙচুর ও উপকরণ ছিনতাই, *সংবাদ, ১২ অক্টোবর ২০০২*
১৭০২. প্রতিমাটি সুতোয় বাঁধা ছিল!, *সংবাদ, ১২ অক্টোবর ২০০২*
১৭০৩. অবরুদ্ধ বাগেরহাট ঃ জেলা জুড়ে চলছে নীরব ধর্ষণ ॥ জড়িতরা সরকারী দলের ক্যাডার, *জনকণ্ঠ, ১২ অক্টোবর ২০০২*
১৭০৪. চাঁদা না পেয়ে লুটপাট ঃ নবাবগঞ্জে এক সংখ্যালঘু পরিবার সন্ত্রাসীদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, *ভোরের কাগজ, ১২ অক্টোবর ২০০২*
১৭০৫. বরিশালের উজিরপুরে চেয়ারম্যান লাঞ্ছিত, *আজকের কাগজ, ১৩ অক্টোবর ২০০২*
১৭০৬. ইটনায় মন্দির ভাঙচুর, *সংবাদ, ১৩ অক্টোবর ২০০২*
১৭০৭. মানিকগঞ্জে সাংসদের সামনেই ছাত্রদল কর্মীদের তাণ্ডব ঃ চাঁদা না দেয়ায় ব্যবসায়ীকে প্রহার, *সংবাদ, ১৩ অক্টোবর ২০০২*
১৭০৮. ঠাকুরগাঁওয়ে প্রতিমা ভাঙচুর, *জনকণ্ঠ, ১৩ অক্টোবর ২০০২*
১৭০৯. ছোটন বাহিনীর চাঁদাবাজি ছিনতাই নির্যাতন—চকরিয়ার সাড়ে ৩০০ রাখাইন পরিবার নিরাপত্তাহীন, তাঁতশিল্প বন্ধের উপক্রম, *প্রথম আলো, ১৪ অক্টোবর ২০০২*
১৭১০. ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রহারে গুরুতর আহত বৃদ্ধের মৃত্যু, *ভোরের কাগজ, ১৪ অক্টোবর ২০০২*
১৭১১. চট্টগ্রামে দুপুর বেলায় দুর্ধর্ষ ডাকাতি, *আজকের কাগজ, ১৫ অক্টোবর ২০০২*
১৭১২. ফতুল্লায় মহিলা শ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার, *আজকের কাগজ, ১৫ অক্টোবর ২০০২*
১৭১৩. পূজামণ্ডপ থেকে ফেরার পথে সন্ত্রাসী হামলার শিকার ঃ কলেজ ছাত্র নিহত হওয়ার ঘটনায় রাঙ্গামাটিতে বিজয়া শোভাযাত্রা বাতিল, *ভোরের কাগজ, ১৬ অক্টোবর ২০০২*
১৭১৪. রাজশাহীতে পূজামণ্ডপে বখাটেপনা, সংঘর্ষে ১০ জন আহত, *প্রথম আলো ১৬ অক্টোবর ২০০২*
১৭১৫. ফটিকছড়িতে শিবির ক্যাডার জামাল বাহিনীর হাতে এক গ্রামের সংখ্যালঘুরা জিম্মি, *জনকণ্ঠ, ১৬ অক্টোবর ২০০২*
১৭১৬. মির্জাপুরে পূজামণ্ডপ থেকে গৃহবধূকে অপহরণের চেষ্টা ॥ স্বামীকে কুপিয়ে জখম, *ইত্তেফাক, ১৭ অক্টোবর ২০০২*
১৭১৭. দিনাজপুরে অপহৃত ব্যবসায়ী ৫২ দিনেও উদ্ধার হয়নি—মামলা তুলে নিতে হুমকি, *প্রথম আলো, ১৭ অক্টোবর ২০০২*
১৭১৮. গাজীপুরে লক্ষ্মীপ্রতিমার হাত ভেঙ্গে নিয়েছে সন্ত্রাসীরা, *জনকণ্ঠ, ১৮ অক্টোবর, ২০০২*
১৭১৯. চট্টগ্রাম সংখ্যালঘুর বাড়িতে ডাকাতি ॥ নগদসহ চার লাখ টাকার মাল লুট, *জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০২*
১৭২০. রাউজানে বৌদ্ধ ভিক্ষুর অন্ত্যেষ্টির দানবাক্স ছিনতাই চেষ্টা, গোলাগুলি ॥ আহত ৫, *জনকণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০০২*
১৭২১. ভাঙ্গায় আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে হিন্দু ব্যবসায়ীর জায়গায় মার্কেট নির্মাণ, *ভোরের কাগজ, ১৯ অক্টোবর ২০০২*
১৭২২. মংলায় গৃহবধূকে ধর্ষণের পর দ্বি-খণ্ডিত করে নদীতে নিক্ষেপ ঃ লাশ উদ্ধার, ধর্ষক গ্রেফতার, *আজকের কাগজ, ২০ অক্টোবর ২০০২*
১৭২৩. গৌরনদীতে ডাকাতি ঃ ২ লাখ টাকার মালামাল লুট, *আজকের কাগজ, ২০ অক্টোবর ২০০২*
১৭২৪. পশুর নদী থেকে সংখ্যালঘু গৃহবধূর তিন খণ্ড লাশ উদ্ধার, জনকণ্ঠ, ২১ অক্টোবর ২০০২
১৭২৫. চরভদ্রাসনে কালী মন্দিরে দুর্বৃত্তদের হামলা ॥ মূর্তি ভাংচুর, *জনকণ্ঠ, ২৩ অক্টোবর ২০০২*
১৭২৬. চবিতে এবার বাংলা ও হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ৪ শিক্ষককে উড়ো চিঠি ঃ প্রাণনাশের হুমকি— দেবতাও রক্ষা করতে পারবে না ।, *জনকণ্ঠ, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০২*
১৭২৭. পাটগ্রামে মন্দিরের পুকুর দখল নিয়ে দুই দলের সংঘর্ষ, হত-১, আহত-১০, *জনকণ্ঠ, ২৪ অক্টোবর ২০০২*
১৭২৮. সুমানগঞ্জে গৃহবধূ ধর্ষণের চেষ্টা, মামলা করায় প্রাণনাশের হুমকি, *জনকণ্ঠ, ২৪ অক্টোবর ২০০২*
১৭২৯. যশোরে জমি দখলের পর সংখ্যালঘু পরিবারকে দেশ ত্যাগের জন্য চাপ, *জনকণ্ঠ, ২৪ অক্টোবর ২০০২*
১৭৩০. চাঞ্চল্যকর ছবিরাণী হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত ১৫ আসামীর নামে পৃথক দুটি চার্জশীট দাখিল, *জনকণ্ঠ, ২৪ অক্টোবর ২০০২*
১৭৩১. নির্যাতন মামলার চার্জশীট, ছবি রাণীর উদ্বেগ, *জনকণ্ঠ, ২৫ অক্টোবর ২০০২*

১৭৩২. কালিয়ায় চিংড়ি ঘের মালিক খুন, *ইত্তেফাক*, ২৬ *অক্টোবর* ২০০২
১৭৩৩. মাগুরায় এক ব্যক্তি খুন, *যুগান্তর*, ২৬ *অক্টোবর* ২০০২
১৭৩৪. পূজা বন্ধে বেনামি পত্রে হুমকি, *ভোরের কাগজ*, ২৬ *অক্টোবর* ২০০২
১৭৩৫. নগরীতে দিনের বেলা সন্ত্রাসীর গুলিতে স্কুলশিক্ষক নিহত ঃ জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের?, *প্রথম আলো*, ২৭ *অক্টোবর* ২০০২
১৭৩৬. চাঁদা না দেয়ায় ব্যবসায়ীকে মারধর, *সংবাদ*, ২৭ *অক্টোবর* ২০০২
১৭৩৭. স্বপন গোস্বামী হত্যা, চাঁদপুরে এক ব্যক্তি আটক, *জনকণ্ঠ*, ২৮ *অক্টোবর* ২০০২
১৭৩৮. আশাশুনিতে কালীমূর্তি ভাঙচুর, *প্রথম আলো*, ২৯ *অক্টোবর* ২০০২
১৭৩৯. বাগেরহাটে প্রতিমা ভাঙ্গার প্রতিবাদ করায় সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যদের বেধড়ক মারধর, *জনকণ্ঠ*, ২৯ *অক্টোবর* ২০০২
১৭৪০. মুন্সীগঞ্জে স্কুল শিক্ষিকার লাশ উদ্ধার, *ইত্তেফাক*, ৩০ *অক্টোবর* ২০০২
১৭৪১. অকৃতকার্য দুই ছাত্রের কীর্তি শিক্ষক স্বপন গোস্বামী হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার তিন, *জনকণ্ঠ*, ৩১ *অক্টোবর* ২০০২
১৭৪২. মহাদেবপুরে লাশ সৎকারে বিএনপি কর্মীদের বাধা, *জনকণ্ঠ*, ৩১ *অক্টোবর* ২০০২
১৭৪৩. পাইকগাছায় মুক্তিপণ দাবীতে দুই ধনাঢ্য ব্যক্তিকে অপহরণ, সন্ত্রাসীদের দাপট কমেনি, *জনকণ্ঠ*, ৩১ *অক্টোবর* ২০০২

নবেম্বর ২০০২

১৭৪৪. সামাজিক অবক্ষয়ের এক লোমহর্ষক চিত্র, প্রতিশোধ নিতে কিশোর স্কুল ছাত্ররা খুন করেছে শিক্ষককে, পুলিশ তাদের গডফাদার জাসদ নেতাকে খুঁজছে, *জনকণ্ঠ*, ১ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৪৫. আশাশুনিতে প্রতিমা ভাঙচুর ॥ অস্ত্রসহ সন্ত্রাসী আটক, *সংবাদ*, ২ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৪৬. কুষ্টিয়ায় সংখ্যালঘু কিশোরীকে রাতভর ধর্ষণ ॥ পরিবার নিরাপত্তাহীন, *জনকণ্ঠ*, ৩ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৪৭. কুড়িগ্রামে কালী প্রতিমা ভাঙচুর, *প্রথম আলো* ৪ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৪৮. রাজধানীতে গলা কেটে জোড়া খুন, *ভোরের কাগজ*, ৫ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৪৯. পাইকগাছা থেকে অপহৃত দুজনের সন্ধান মেলেনি পুলিশের মামলা, *জনকণ্ঠ*, ৬ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৫০. রাঙ্গুনিয়ায় পাহাড়ী বাঙালী সংঘাতের আশংকা, *নিক জনকণ্ঠ*, ৬ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৫১. ২০০ বছরের প্যাগোডা-বিধ্বস্ত, আরেকটি হুমকির মুখে, কক্সবাজারে রাখাইনদের জমি দখল করে ঘর তোলার হিড়িক, *প্রথম আলো*, ৭ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৫২. নারায়ণগঞ্জে ডিবি পুলিশের পরিচয়ে দুর্ধর্ষ ডাকাতি, ৫০ ভরি স্বর্ণালংকার লুট, *জনকণ্ঠ*, ৯ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৫৩. পূজামণ্ডপে সন্ত্রাসীদের হামলা ॥ কালীমূর্তি ভাংচুর, *জনকণ্ঠ*, ১০ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৫৪. পাইকগাছা থেকে অপহৃত আদরকে তিন মাসেও উদ্ধার করা যায়নি, *যুগান্তর*, ১২ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৫৫. পাবনায় প্রতিমা ভাংচুরের প্রতিবাদে মণ্ডপে মণ্ডপে কালো পতাকা, ঘটপূজা, *জনকণ্ঠ*, ১২ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৫৬. ফকিরহাটে চাঁদা না পেয়ে ফের দুই সংখ্যালঘুর বাড়িতে ডাকাতি ঃ গৃহকর্তা গুলিবিদ্ধ, দু'লাখ টাকার মাল লুট, এলাকায় আতঙ্ক, *জনকণ্ঠ*, ১৩ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৫৭. রাজশাহীর একটি সংখ্যালঘু পরিবারকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা, *সংবাদ*, ১৪ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৫৮. মুকসুদপুরে অ্যাসিড সন্ত্রাসের শিকার বৃদ্ধ মনি মোহন, *সংবাদ*, ১৪ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৫৯. আটকাদেশ, ফরিদপুরে আতঙ্ক, *প্রথম আলো*, ১৪ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৬০. সিলেটে আদিবাসীদের জমি দখল করে নিচ্ছে প্রভাবশালী চক্র, *জনকণ্ঠ*, ১৪ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৬১. রাঙ্গুনিয়ায় পূজা উৎসবে সন্ত্রাসী হামলা ॥ আহত ২০, *প্রথম আলো*, ১৫ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৬২. রায়গঞ্জে মন্দির থেকে ৪টি মূর্তি চুরি, *প্রথম আলো*, ১৫ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৬৩. সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ ঃ বরগুনার পৌর শ্মশান দখলের চেষ্টা সম্প্রীতি বিনষ্টের উস্কানি, *সংবাদ*, ১৬ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৬৪. কুমিল্লায় ছুরিকাঘাতে ব্যবসায়ী নিহত, *যুগান্তর*, ১৭ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৬৫. মিরসরাইয়ে সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা, *যুগান্তর*, ১৭ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৬৬. জামালপুরে মূর্তি ভাঙচুর, *প্রথম আলো*, ১৭ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৬৭. সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা ঃ সাতক্ষীরায় একটি সংখ্যালঘু শহীদ পরিবারের জমি দখলের পাঁয়তারা, *সংবাদ*, ১৯ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৬৮. সন্ত্রাসীদের চাঁদার দাবি পূরণ করতে না পারায় বরিশালে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দু'মাস ধরে বন্ধ, *সংবাদ*, ২০ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৬৯. পুলিশি বাধার মুখে মধুখালীতে রাস উৎসব পণ্ড, *সংবাদ*, ২০ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৭০. মধুখালীতে রাসযাত্রা উৎসব ভণ্ডুল করে দিয়েছে দারোগা, *জনকণ্ঠ*, ২১ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৭১. সিরাজগঞ্জে পূর্ণিমা ধর্ষণ মামলা, সম্পূরক চার্জশীটের বিরুদ্ধে নারাজি দরখাস্তের শুনানি শুরু, *জনকণ্ঠ*, ২২ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৭২. পুলিশ আসামি ধরছে না ঃ কালিয়াকৈরে আদিবাসীদের ওপর সন্ত্রাসীদের হুমকি অব্যাহত, *সংবাদ*, ২৩ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৭৩. স্কুলছাত্রী সরস্বতী আড়াই মাসেও উদ্ধার হয়নি, *জনকণ্ঠ*, ২৩ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৭৪. ফুলপুরে শিশু ধর্ষিত থানা মামলা নেয়নি, *যুগান্তর*, ২৪ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৭৫. কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে সংখ্যালঘু কিশোরী ধর্ষিত, *সংবাদ*, ২৪ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৭৬. কটিয়াদীর অপহৃত স্কুলগামী শিপ্রা রানী এক মাসেও উদ্ধার হয়নি ॥ পরিবারকে দেশ ছাড়ার হুমকি ॥ সংখ্যালঘুরা আতঙ্কে, *সংবাদ*, ২৪ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৭৭. মোহনপুরে সংখ্যালঘুদের ইজারা নেয়া বিল দখল করেছে যুবদল নেতা তিন লাখ টাকার মাছ লুট, *জনকণ্ঠ*, ২৫ *নবেম্বর* ২০০২
১৭৭৮. সিঙ্গাইরে নোটিস দিয়ে মন্দির সংস্কার বন্ধ রাখার হুমকি, *জনকণ্ঠ*, ২৫ *নবেম্বর* ২০০২

১৭৭৯. ধামরাইয়ে সন্ত্রাসীদের হামলায় এক হিন্দু পরিবারের ৬ জন আহত, *প্রথম আলো, ২৬ নবেম্বর ২০০২*
১৭৮০. বিশ্বনাথের পল্লীতে একটি সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদ চক্রান্তের অভিযোগ, *সংবাদ, ২৬ নবেম্বর ২০০২*
১৭৮১. রায়পুরার পল্লীতে সংখ্যালঘু পরিবারের ধান কেটে নেয়ার চেষ্টা ॥ গুরুতর আহত ১ ॥ ৭ দিন পর থানায় মামলা গ্রহণ, *সংবাদ, ২৭ নবেম্বর ২০০২*
১৭৮২. মির্জাগঞ্জে কিশোরের লাশ উদ্ধার, *প্রথম আলো, ২৭ নবেম্বর ২০০২*
১৭৮৩. উজিরপুরে সংখ্যালঘু বাড়িতে সন্ত্রাসী হামলা গৃহকর্তাসহ আহত ৩, *সংবাদ, ২৮ নবেম্বর ২০০২*
১৭৮৪. রাজশাহীতে বিএনপি নেতার ইট ভাঁটিতে দুই শ্রমিককে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ, আটক ৬, *জনকণ্ঠ, ২৯ নবেম্বর ২০০২*
১৭৮৫. ঘটনাস্থল কটিয়াদীর চরবেতাল গ্রাম ঃ সংখ্যালঘু জেলে পরিবারের ওপর সন্ত্রাসী হামলা ॥ উদ্দেশ্য উচ্ছেদ, *সংবাদ, ৩০ নবেম্বর ২০০২*

ডিসেম্বর ২০০২

১৭৮৬. ফকিরহাটে সংখ্যালঘুদের বাড়িতে ফের ডাকাতি আটক ৬ ॥ অস্ত্র উদ্ধার, *জনকণ্ঠ, ১ ডিসেম্বর ২০০২*
১৭৮৭. পূর্বধলায় সংখ্যালঘুর বাড়িতে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের হামলা, *সংবাদ, ২ ডিসেম্বর ২০০২*
১৭৮৮. লামায় আদিবাসী মুরুংরা সন্ত্রাসী কালু বাহিনীর হাতে জিম্মি, *জনকণ্ঠ, ৩ ডিসেম্বর ২০০২*
১৭৮৯. আমতলীতে সংখ্যালঘুদের ধান লুট ॥ গ্রেফতার ১, *আজকের কাগজ, ৪ ডিসেম্বর ২০০২*
১৭৯০. সাভারে তিন বাড়িতে ডাকাতি, *ভোরের কাগজ, ১০ ডিসেম্বর ২০০২*
১৭৯১. জলঢাকায় জামাত সমর্থক ও থানা পুলিশের কাণ্ড! জমি দখলের জন্য সংখ্যালঘুকে নির্যাতন ও মিথ্যা মামলায় জেল হাজতে প্রেরণ, *সংবাদ, ১০ ডিসেম্বর ২০০২*
১৭৯২. কুড়িগ্রাম একটি সংখ্যালঘু পরিবারের জমি আত্মসাতের চেষ্টা ॥ পরিবারে নিরাপত্তাহীনতা, *সংবাদ, ১২ ডিসেম্বর ২০০২*
১৭৯৩. সংখ্যালঘু নির্যাতন ঃ এবারে প্রচারে নেমেছে খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, *ইনকিলাব, ১২ ডিসেম্বর ২০০২*
১৭৯৪. কুমিল্লায় মন্দিরের দানবাক্স লুট, *প্রথম আলো, ১৩ ডিসেম্বর ২০০২*
১৭৯৫. বাউফলে সোনার দোকান লুট, *প্রথম আলো, ১৩ ডিসেম্বর ২০০২*
১৭৯৬. বালাগঞ্জে ৪টি মূর্তি ভাঙচুর, *সংবাদ, ১৩ ডিসেম্বর ২০০২*
১৭৯৭. বগুড়ায় নিহত যুবকের পরিচয় ও খুনের মোটিভ মিলেছে, *জনকণ্ঠ, ১৫ ডিসেম্বর ২০০২*
১৭৯৮. নবেম্বরে সংখ্যালঘু ও নারী নির্যাতন, *জনকণ্ঠ, ১৬ ডিসেম্বর ২০০২*
১৭৯৯. খুলনায় এক সংখ্যালঘু পরিবারের জমি দখল ॥ থানা মামলা নেয়নি, *জনকণ্ঠ, ১৭ ডিসেম্বর ২০০২*
১৮০০. লালমোহনে ৫টি সংখ্যালঘু পরিবারের ৯ একর জমির ধান লুট ঃ থানায় মামলা, *সংবাদ, ১৮ ডিসেম্বর ২০০২*
১৮০১. সাংবাদিক প্রবীর শিকদার ও গৌতম দাসকে গ্রেফতার না করতে হাইকোর্টের নির্দেশ, *জনকণ্ঠ, ১৯ ডিসেম্বর ২০০২*
১৮০২. মূল হোতা সরকার ক্যাডার বাহিনী ঃ বুদ্ধমূর্তি লুটে বাধা পেয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুকে জবাই, *জনকণ্ঠ, ২৩ ডিসেম্বর ২০০২*
১৮০৩. প্রতিমা বিসর্জনকালে সন্ত্রাসী হামলা মিরসরাইয়ে আহত ৮, *প্রথম আলো, ২০ ডিসেম্বর ২০০২*
১৮০৪. জমি নিয়ে বিরোধ, সরাইলে সংঘর্ষে হত-১, আহত অর্ধশত, *জনকণ্ঠ, ২৪ ডিসেম্বর ২০০২*
১৮০৫. জ্ঞানজোতির ঘাতকদের ধরতে সিআইডির অভিযান, *জনকণ্ঠ, ২৫ ডিসেম্বর ২০০২*
১৮০৬. সন্ত্রাসীদের কোপে বাগের হাট এনজিও কর্মকর্তা জখম, মোড়েলগঞ্জে চাঁদাবাজদের হাতে ২জন প্রহৃত, *জনকণ্ঠ, ২৬ ডিসেম্বর ২০০২*
১৮০৭. চাঁপাইনবাবগঞ্জে সন্ত্রাসীদের ভয়ে নাচোলের ২শ আদিবাসীর সেনা ক্যাম্পের সামনে অবস্থান গ্রহণ, *জনকণ্ঠ, ২৭ ডিসেম্বর ২০০২*
১৮০৮. নবাবগঞ্জে কালিমূর্তি ভাঙচুর, *আজকের কাগজ, ২৮ ডিসেম্বর ২০০২*
১৮০৯. দুষ্কৃতকারীদের ছুরিকাঘাতে কুমিল্লায় এসএসসি পরীক্ষার্থীসহ ৫ জন আহত, *যুগান্তর, ২৮ ডিসেম্বর ২০০২*
১৮১০. পুঠিয়ায় আবারও ধর্ষণের ঘটনা, *সংবাদ, ২৮ ডিসেম্বর ২০০২*
১৮১১. বগুড়ায় শেরপুরে মা ভবানী মন্দিরের দখল হওয়া ৪টি পুকুর ও সম্পত্তি উদ্ধারে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা, *সংবাদ, ২৮ ডিসেম্বর ২০০২*
১৮১২. বোয়ালখালীতে পল্লী চিকিৎসক অপহরণ, মুক্তিপণ দাবি, *আজকের কাগজ, ২৯ ডিসেম্বর ২০০২*
১৮১৩. জবরদখল করা শহীদ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার পৈত্রিক ভিটায় ঘর তুলেছেন বিএনপি নেতা, *ভোরের কাগজ, ৩০ ডিসেম্বর ২০০২*
১৮১৪. ঐক্য পরিষদের আলোচনা সভা ঃ সংখ্যালঘুরা এ দেশে ভয়ের পরিবেশে বসবাস করছে, *প্রথম আলো, ৩১ ডিসেম্বর ২০০২*

জানুয়ারি ২০০৩

১৮১৫. ঝালকাঠির গ্রামে এনজিও কর্মীকে গ্রেফতার হয়রানির অভিযোগ, *জনকণ্ঠ*, *২ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮১৬. স্ত্রীকে উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় বখাটে যুবকের হাতে মৃত্যু, *জনকণ্ঠ*, *৩ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮১৭. সন্ত্রাসীদের এসিড নিক্ষেপে ধুনটে ঝলসে গেছে তরুণী, *জনকণ্ঠ*, *৩ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮১৮. আড়াইহাজারে কালীমূর্তি ভেঙ্গে ফেলেছে দুর্বৃত্তরা, *জনকণ্ঠ*, *৪ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮১৯. আওয়ামী লীগ নেতার রাইসমিলে ডাকাতি, দারোয়ান খুন, *জনকণ্ঠ*, *৪ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮২০. মোহাম্মদপুরে দিনের বেলায় ডাকাতি, কেরানীগঞ্জে যুবকের লাশ উদ্ধার, দুই গৃহবধূর আত্মহত্যা, *জনকণ্ঠ*, *৫ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮২১. বাউফলে সংখ্যালঘু পরিবারের ধান লুট ॥ জমি থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা, *সংবাদ*, *৬ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮২২. ধামরাইয়ের পল্লীতে সন্ত্রাসী চক্রের হুমকির মুখে এক পরিবার, *ইত্তেফাক*, *৬ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮২৩. সংখ্যালঘু তাই নজরুল সঙ্গীতের পরিবর্তে ফোক!, *সংবাদ*, *৭ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮২৪. সম্পত্তি দখলের চক্রান্ত ॥ হয়রানির মুখে পালিয়ে বেড়াচ্ছে অরুণ দেবনাথের পরিবার, *জনকণ্ঠ*, *৭ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮২৫. মিরসরাইয়ে বৌদ্ধমন্দিরে হামলা মূর্তি ও দরজা ভাঙচুর, লুটপাট, *প্রথম আলো*, *৮ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮২৬. অধ্যক্ষ গোপাল মুহুরীর পরিবারকে হত্যার হুমকি, *ভোরের কাগজ*, *৮ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮২৭. উৎকোচ না দেয়ায় নারায়ণগঞ্জে দুশ পরিবারকে ইজারার জমি থেকে উচ্ছেদ, *জনকণ্ঠ*, *৯ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮২৮. মুন্সিগঞ্জে অপহরণের ৫ম দিনে কলেজছাত্রী উদ্ধার, কুখ্যাত সন্ত্রাসী গ্রেফতার, *জনকণ্ঠ*, *৯ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮২৯. কুখ্যাত সন্ত্রাসী গ্রেফতার, *জনকণ্ঠ*, *৯ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮৩০. বেগমগঞ্জে গৃহবধূ খুন, *সংবাদ*, *১০ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮৩১. মুন্সিগঞ্জে কলেজ ছাত্রীকে অপহরণের দায়ে শহরের 'বদমাশের রাজা' গ্রেফতার, *সংবাদ*, *১১ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮৩২. সাভারে মহল্লা ঘেরাও করে ডাকাতি সাত লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট, *যুগান্তর*, *১২ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮৩৩. মুন্সীগঞ্জে সংখ্যালঘুর বাড়ি দখল করে নিয়েছে সন্ত্রাসীরা ॥ আতঙ্ক, *জনকণ্ঠ*, *১৩ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮৩৪. নাটোরে চাঁদার দাবিতে ব্যবসায়ীকে মারধর, *সংবাদ*, *১৩ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮৩৫. সেনাদের হাতে আটক ছাত্রলীগ নেতা শুভ মারা গেলেন, *জনকণ্ঠ*, *১৪ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮৩৬. সেনার হাতে আটকের পর হাসপাতালে মৃত শুভ গোপালের অন্তেষ্টি সম্পন্ন, *জনকণ্ঠ*, *১৫ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮৩৭. লালপুরে পাওনা টাকা বুঝে পেলাম মর্মে অস্ত্রের মুখে ডাক্তারের সই আদায়, *জনকণ্ঠ*, *১৫ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮৩৮. কামারখন্দে উদ্ধারকৃত দুই যুবকের লাশের পরিচয় পাওয়া গেছে, *ইত্তেফাক*, *১৮ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮৩৯. ছবি রাণী মণ্ডল নির্যাতন মামলায় আগের চার্জশিট বহাল রেখেছে ডিবি, *সংবাদ*, *১৮ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮৪০. আটোয়ারীর খ্রিস্টান পল্লীতে ছাত্রী ধর্ষণ ও হত্যা ঘটনায় তোলপাড়, গ্রেফতার-৭, *জনকণ্ঠ*, *১৯ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮৪১. বান্দরবানে আদিবাসী যুবকের লাশ উদ্ধার, *সংবাদ*, *২০ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮৪২. সাংবাদিকদের জানানোয় ওসির হুমকি ঃ 'তোদের ঘর পুড়ামু' ॥ দেবহাটায় সংখ্যালঘু পরিবারের ঘরে লুট আগুন শ্লীলতাহানি, *ভোরের কাগজ*, *২০ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮৪৩. পানছড়িতে ৭ বছরের শিশুকে গণধর্ষণের পর হত্যা, *জনকণ্ঠ*, *২১ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮৪৪. ঝালকাঠিতে ভোটের ক্যানভাসের কথা বলে ঘরে ঢুকে দুই বাড়িতে লুটপাট, মারধর, *জনকণ্ঠ*, *২১ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮৪৫. রাঙ্গুনিয়ায় ডাকাতি, ৫ লাখ টাকার মাল লুট, *জনকণ্ঠ*, *২২ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮৪৬. ৭ বছরের শিশু পদ্মাদেবী ত্রিপুরাকে ধর্ষণ ও হত্যা, *ইত্তেফাক*, *২৩ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮৪৭. ধামরাইয়ে গৃহবধূ খুন ॥ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট, *আজকের কাগজ*, *২৫ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮৪৮. পরশুরামে এক সংখ্যালঘু বিধবার পরিবারকে উচ্ছেদের হুমকি দিচ্ছে সন্ত্রাসীরা, *যুগান্তর*, *২৯ জানুয়ারি ২০০৩*

১৮৪৯. হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের কাউকে রাস্তায় নামতে দেবেন না ॥ চাঁদপুরে কর্নেল আকবর, *জনকণ্ঠ*, *৩০ জানুয়ারি ২০০৩*

ফেব্রুয়ারি ২০০৩

১৮৫০. নান্দাইলে সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ৫শ' টাকা চুরির মামলা, *সংবাদ*, *১ ফেব্রুয়ারি ২০০৩*

১৮৫১. বাজিতপুরে প্রতিমা ভাঙচুর গ্রেফতার ২, *সংবাদ*, *১ ফেব্রুয়ারি ২০০৩*

১৮৫২. ভীতি ও আতংকের মধ্যে বাগেরহাটে ৭ ইউনিয়নে ভোট আজ, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় এক চেয়ারম্যান প্রার্থীকে হত্যার চেষ্টা, অপর প্রার্থীকে অপহরণ, *জনকণ্ঠ*, ২ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৫৩. নির্বাচনী সহিংসতা, চাঁদপুরে বৃদ্ধ খুন, পটুয়াখালীতে হিন্দু পাড়ায় আগুন, কিশোরগঞ্জ,বগুড়ায় আগুন, *জনকণ্ঠ*, ৩ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৫৪. মাগুরায় বিয়ের দাওয়াত না পেয়ে সংখ্যালঘু পরিবারের গরু দিয়ে আনন্দভোজ, *জনকণ্ঠ*, ৩ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৫৫. মান্দায় পরাজিত বিএনপি প্রার্থীর ক্যাডার বাহিনীর তাণ্ডব, *জনকণ্ঠ*, ৩ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৫৬. সাতক্ষীরায় চিংড়িঘের দখল নিয়ে সংঘর্ষে ১০ জন গুলিবিদ্ধ, আহত ৪০, এলাকায় উত্তেজনা, *জনকণ্ঠ*, ৪ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৫৭. স্কুলছাত্রী সম্পাকে পুলিশ চার মাসেও উদ্ধার করতে পারেনি, *জনকণ্ঠ*, ৪ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৫৮. নির্বাচনোত্তর সহিংসতা ঃ মান্দায় পরাজিত বিএনপি নেতার সন্ত্রাসে পালপাড়া পুরুষশূন্য, *সংবাদ*, ৫ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৫৯. সিংড়ায় গুলি করে ১ ব্যক্তিকে হত্যা, *আজকের কাগজ*, ৫ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৬০. ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য চাপ ॥ বাঘায় সংখ্যালঘু পল্লীতে হামলা, মারধর, লুট, *প্রথম আলো*, ৫ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৬১. প্রথম আলোর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধির ওপর হামলার চেষ্টা, *প্রথম আলো*, ৫ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৬২. ৪ শিবির ক্যাডারের ফাঁসি, ৪ জনের যাবজ্জীবন মুহুরী হত্যাকাণ্ডের রায়, *জনকণ্ঠ*, ৭ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৬৩. বাগেরহাটে সরস্বতী প্রতিমা ভাঙচুর, *প্রথম আলো*, ৮ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৬৪. রায়পুরে সরস্বতী পূজামণ্ডপ ভাঙচুর, *আজকের কাগজ*, ৮ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৬৫. বাগাতিপাড়ায় সংখ্যালঘুদের হুমকিদানকারী রশিদ প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, *সংবাদ*, ১০ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৬৬. চিতলমারীতে কালীমূর্তি ভাঙচুর ॥ ১ জন আটক, *সংবাদ*, ১০ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৬৭. ভোট না দেওয়ার অভিযোগ ঃ ঝিনাইদহে ৩ সংখ্যালঘু গৃহবধূকে গণধর্ষণ, *প্রথম আলো*, ১১ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৬৮. রূপগঞ্জে চাঁদা না দেয়ায় স্বর্ণের দোকান লুট ঃ কাঞ্চন বাজারে হরতাল পালিত, *যুগান্তর*, ১৫ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৬৯. যশোরে সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামে নির্বিচারে গুলি চালালে এক মহিলা নিহত ॥ আহত ৭১, *জনকণ্ঠ*, ১৬ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৭০. সীতাকুণ্ডের জেলে পল্লীতে সন্ত্রাসীদের হামলা—ব্র্যাক স্কুল-দোকানপাটে আগুন, আহত ২৫, *প্রথম আলো*, ১৬ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৭১. রাতের আঁধারে মাছ লুট, বাধা দিলে হামলা ॥ গোপালগঞ্জের ঘের মালিকরা সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি, *ভোরের কাগজ*, ১৭ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৭২. তুচ্ছ ঘটনায় ফৌজদারহাট জেলেপাড়ায় ৪ দিনের তাণ্ডব, আহত ১২ জন, *ভোরের কাগজ*, ১৭ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৭৩. সাটুরিয়ায় পরাজিত চেয়ারম্যান প্রার্থী বিএনপি নেতার নির্দেশে ঋষিপাড়ায় তাণ্ডব, *জনকণ্ঠ* ১৭ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৭৪. মানিকছড়ি সেবাশ্রমে ফের সন্ত্রাসী হামলা, গুলি বিনিময়ে কনস্টেবল আহত, *জনকণ্ঠ*, ১৭ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৭৫. শিবচরে এক সংখ্যালঘুকে উচ্ছেদের অভিযোগ প্রশাসন নীরব, *জনকণ্ঠ*, ১৮ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৭৬. ফরিদগঞ্জে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সন্ত্রাসীদের হামলা, প্রতিমা ভাঙচুর, *ভোরের কাগজ*, ১৮ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৭৭. অভয়নগরে মাঘী পূর্ণিমার অনুষ্ঠানে জোট প্রার্থীর হামলা ঃ ৫০ পরিবার এলাকা ছেড়েছে, *যুগান্তর*, ১৮ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৭৮. কচুয়ায় সংখ্যালঘুদের ২০টি দোকান ও মন্দিরে হামলা ঃ আহত ১০ ॥ দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন, *সংবাদ*, ১৯ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৭৯. বান্দরবানে যুবলীগ সভাপতিকে জবাই করে মাথা কেটে নিয়ে গেছে সন্ত্রাসীরা, *আজকের কাগজ*, ১৯ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৮০. রামুতে বৌদ্ধদের মহাসম্মেলন ঃ দুর্বৃত্তদের হামলা ও অপহরণ চেষ্টা ঃ পুলিশ প্রহরায় অনুষ্ঠান সম্পন্ন, *সংবাদ*, ২০ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৮১. খোকসায় সংখ্যালঘুদের ওপর বিএনপি ক্যাডারদের হামলা, আহত ১০, *সংবাদ*, ২০ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৮২. মোল্লাহাটে সহিংসতায় আহত ২০ ॥ পরাজিত চেয়ারম্যান প্রার্থীর ছেলের হাতে সংখ্যালঘু নেতা রক্তাক্ত, *ভোরের কাগজ*, ২০ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৮৩. ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বাড়িতে ঢুকে গুলি করে হত্যা এক ব্যক্তিকে, *ভোরের কাগজ*, ২১ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৮৪. কচুয়ায় পরাজিত বিএনপির চেয়ারম্যান প্রার্থীর সন্ত্রাসীদের হামলায় সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পণ্ড ঃ আহত অর্ধশতাধিক, *ভোরের কাগজ*, ২১ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৮৫. গোপালগঞ্জে সংখ্যালঘুদের ৫টি বাড়িতে পরাজিত চেয়ারম্যান প্রার্থীর সমর্থকদের হামলা ও লুটপাট, আহত ১৫, *ভোরের কাগজ*, ২১ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৮৬. ইউপি নির্বাচনকে ঘিরে মুজিবনগরে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক, *আজকের কাগজ*, ২১ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৮৭. ১৭ দিনেও বরুড়ার স্কুলছাত্রী প্রণতি উদ্ধার হয়নি, *আজকের কাগজ*, ২২ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৮৮. দেখিয়ে ভোট দিতে হবে বলে কতিপয় চেয়ারম্যান প্রার্থীর হুমকি, *সংবাদ*, ২২ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৮৯. বোদার বোয়ালমারির গঙ্গা মন্দিরের মূর্তি ভাঙচুর ॥ স্মারকলিপি পেশ, *সংবাদ*, ২৩ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৯০. লাঠিয়াল বাহিনীর অত্যাচারে বন্ধ হয়ে গেছে জেলে পরিবারগুলোর জীবিকার পথ, *সংবাদ*, ২৩ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৯১. রানী ভবানীর প্রাসাদ চত্বরে ঈদগাহ স্থাপনের পাঁয়তারা!, *জনকণ্ঠ*, ২৩ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৯২. বুড়িচঙে ডাক্তারের কান কেটে দিয়েছে ছাত্রদল ক্যাডাররা, *ভোরের কাগজ*, ২৪ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৯৩. নীলফামারীর সাড়াগ্রামে ইউপি নির্বাচন ঃ সংখ্যালঘু ভোটারদের হুমকি প্রদান—'ভোট দিতে গেলে ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হবে', *সংবাদ*, ২৪ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৯৪. বাঁশতলি ইউনিয়ন ঃ নির্বাচনে সমর্থন না দেয়ায় সংখ্যালঘুসহ অন্যদের ওপর জামাতকর্মীদের নির্যাতন, *সংবাদ*, ২৫ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৯৫. রাঙ্গুনিয়ায় নবনির্বাচিত ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক সাংবাদিক লাঞ্ছিত, *ভোরের কাগজ*, ২৬ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৯৬. চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে সংখ্যালঘু স্কুলছাত্রীকে গণধর্ষণ, *জনকণ্ঠ*, ২৭ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৯৭. মতবিনিময় সভায় নীলফামারী সদর উপজেলার প্রার্থীরা জানালেন ঃ ফতোয়াবাজি সংখ্যালঘুপীড়ন আর এক রাতের নির্বাচন ভীতির কথা, *আজকের কাগজ*, ২৭ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৯৮. কচুয়ার নামযজ্ঞ কীর্তনে হামলা, রহস্যজনক কারণে শুক্কুরকে ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ, *জনকণ্ঠ*, ২৮ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৮৯৯. কুষ্টিয়ায় স্বর্ণের দোকানে ডাকাতি, ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ-ভাংচুর, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত ৩২০, *জনকণ্ঠ*, ২৮ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

১৯০০. আগৈলঝাড়ায় বোমা হামলায় মন্দির ধ্বংস, সংখ্যালঘুদের দোকান ভাংচুর, *জনকণ্ঠ*, ২৮ *ফেব্রুয়ারি* ২০০৩

মার্চ ২০০৩

১৯০১. বেলকুচিতে সন্ত্রাসী হামলা ঃ মন্দিরসহ ৫টি বাড়ি ভাঙচুর, *প্রথম আলো*, ১ *মার্চ* ২০০৩

১৯০২. পাকুন্দিয়ায় প্রভাবশালী এক প্রতিবেশীর নির্যাতনের শিকার একটি সংখ্যালঘু পরিবার, *যুগান্তর*, ১ *মার্চ* ২০০৩

১৯০৩. রাজবাড়ীতে সংখ্যালঘু পরিবারকে বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ, *সংবাদ*, ১ *মার্চ* ২০০৩

১৯০৪. স্বরূপকাঠির জলাবাড়িতে কয়েক হাজার সংখ্যালঘু ভোটার ভোট দিতে পারেননি, *যুগান্তর*, ২ *মার্চ* ২০০৩

১৯০৫. সাভারে সন্ত্রাসী হামলায় আওয়ামী লীগ নেতা গুরুতর আহত, *যুগান্তর*, ২ *মার্চ* ২০০৩

১৯০৬. সাভারে কলেজছাত্রী অপহরণ, ২ সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা, *প্রথম আলো*, ৩ *মার্চ* ২০০৩

১৯০৭. মিরসরাইয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১০০ দোকান হুমকির মুখে বন্ধ!, *প্রথম আলো*, ৪ *মার্চ* ২০০৩

১৯০৮. পুলিশের তাড়া খেয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ১ জনের মৃত্যু, *ইনকিলাব*, ৫ *মার্চ* ২০০৩

১৯০৯. সাতক্ষীরায় চরমপন্থীদের হাতে ঘের মালিক খুন, *যুগান্তর*, ৫ *মার্চ* ২০০৩

১৯১০. সরজমিন বড়ভিটা ইউনিয়ন ঃ আ'লীগ প্রার্থীকে ভোট দেয়ায় হিন্দুদের পূজা করতে দেয়া হচ্ছে না, *সংবাদ*, ৫ *মার্চ* ২০০৩

১৯১১. সোনারগাঁয়ে দুর্গামন্দির ভেঙে দেবোত্তর সম্পত্তি দখল ঃ প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করছে, *আজকের কাগজ*, ৬ *মার্চ* ২০০৩

১৯১২. কাপাসিয়ার কড়িহাতায় নবনির্বাচিত চেয়ারম্যানের তাণ্ডব ঃ ৭০টি সংখ্যালঘু পরিবার সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি, *সংবাদ*, ৬ *মার্চ* ২০০৩

১৯১৩. চাঁদপুরে গির্জার মূর্তি চুরির ঘটনার কিনারা হয়নি ১ সপ্তাহেও, *ভোরের কাগজ*, ৬ *মার্চ* ২০০৩

১৯১৪. নাটোরে পরাজিত বিএনপি সমর্থক ইউপি চেয়ারম্যান-মেম্বার প্রার্থীরা সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে, *সংবাদ*, ৭ *মার্চ* ২০০৩

১৯১৫. কটিয়াদীতে বাড়িঘর ভাঙচুর ও মালামাল লুট, *সংবাদ*, ৮ *মার্চ* ২০০৩

১৯১৬. বাগেরহাটে অধ্যাপক গুলিবিদ্ধ, *ইত্তেফাক*, ৮ *মার্চ* ২০০৩

১৯১৭. নওগাঁয় আদিবাসী নেতাকে কুপিয়ে হত্যা, *জনকণ্ঠ*, ৮ *মার্চ* ২০০৩

১৯১৮. ফাও খেতে না দেওয়ায় রেস্টুরেন্ট ভাঙচুর করেছে বিএনপি সন্ত্রাসীরা, *ভোরের কাগজ*, ৮ *মার্চ* ২০০৩

১৯১৯. কুড়িল বিশ্বরোডে ব্যবসায়ী গুলিবিদ্ধ, *প্রথম আলো*, ৮ *মার্চ* ২০০৩

১৯২০. লক্ষীপুরের কালীমন্দিরে অগ্নিসংযোগ ঃ মূর্তি ভাঙচুর, *আজকের কাগজ*, ৮ *মার্চ* ২০০৩

১৯২১. চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে নির্বাচনোত্তর সহিংসতা ঃ অনেকে বাড়িছাড়া, আতঙ্কে সংখ্যালঘুরা, *প্রথম আলো*, ৯ *মার্চ* ২০০৩

১৯২২. প্রার্থীকে ভোট না দেওয়ার অভিযোগে ঃ মহেশখালীতে সংখ্যালঘু পরিবারের ১৫টি বসতবাড়ি ভাঙচুর, *প্রথম আলো*, ৯ *মার্চ* ২০০৩

১৯২৩. সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন চিতলমারীর হরেকৃষ্ণ, *আজকের কাগজ*, ৯ *মার্চ* ২০০৩

১৯২৪. শিক্ষকের বাড়িতে হামলা ঃ স্ত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ, *সংবাদ*, ৯ *মার্চ* ২০০৩

১৯২৫. নড়াইলে যুবকের গলা কাটা লাশ উদ্ধার, *আজকের কাগজ*, ১০ *মার্চ* ২০০৩

১৯২৬. গভীর রাতে হিন্দুবাড়িতে ঢুকে হত্যা, তিন নারীকে গণধর্ষণ ঃ চরম বর্বরতায় বাগেরহাটে আতঙ্ক ॥ ২ ঘণ্টা ধরে হত্যা ও ধর্ষণযজ্ঞ শেষে অর্ধলক্ষ টাকার স্বর্ণালঙ্কার লুট ॥ গ্রেপ্তার পরাজিত এক মেম্বার প্রার্থী, *ভোরের কাগজ*, ১০ *মার্চ* ২০০৩

১৯২৭. ধর্ষিতা স্কুল ছাত্রীর বক্তব্য ঃ বিএনপি কর্মী ও বিডিআরের এক প্রাক্তন সদস্য সহ তিনজন ধর্ষণ করেছে শুক্লাকে, *জনকণ্ঠ*, ১১ *মার্চ* ২০০৩

১৯২৮. চট্টগ্রামে গার্মেন্টস কর্মীকে বিএনপি সমর্থকদের পালাক্রমে ধর্ষণ ॥ থানা মামলা নেয়নি, *জনকণ্ঠ*, ১২ *মার্চ* ২০০৩

১৯২৯. কুষ্টিয়ায় সম্পত্তি আত্মসাতের জন্য এক মহিলাকে কুপিয়ে হত্যা, *সংবাদ*, ১২ *মার্চ* ২০০৩

১৯৩০. ঘটনা ধামাচাপা দিতে প্রভাবশালীরা তৎপর ঃ পার্বতীপুরে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রী ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ, *ভোরের কাগজ*, ১২ *মার্চ* ২০০৩

১৯৩১. রাজধানীর বেরাইদ ইউপি নির্বাচন ঃ শীর্ষ সন্ত্রাসীদের তৎপরতায় সংখ্যালঘু ভোটাররা আতঙ্কে, *ভোরের কাগজ*, ১৩ মার্চ ২০০৩

১৯৩২. কুতুবদিয়ায় সংখ্যালঘু পাড়ায় হামলা ঃ মহিলাসহ আহত ১২, *প্রথম আলো*, ১৩ মার্চ ২০০৩

১৯৩৩. মানিকগঞ্জে প্রতিমা ভাঙচুর, মামলা, *প্রথম আলো*, ১৩ মার্চ ২০০৩

১৯৩৪. গোয়ালন্দে অপহৃত ছাত্রী ৭ দিনেও উদ্ধার হয়নি। ধরা পড়েনি মূল আসামী, *ইত্তেফাক*, ১৩ মার্চ ২০০৩

১৯৩৫. সাভারে ২ ছাত্রী অপহৃত ॥ পরে ১ জনকে উদ্ধার, *ইত্তেফাক*, ১৪ মার্চ ২০০৩

১৯৩৬. নওগাঁয় সংখ্যালঘু বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি, *ভোরের কাগজ*, ১৬ মার্চ ২০০৩

১৯৩৭. নীলফামারীতে চোরাগোপ্তা হামলায় আহত ৪০, ভোলায় মন্ত্রীর ভাগ্নে সংখ্যালঘুর খালি চেকে সই নিয়েছে, *জনকণ্ঠ*, ১৬ মার্চ ২০০৩

১৯৩৮. বাগমারায় সংখ্যালঘু বাড়িতে সন্ত্রাসীদের লুটপাট, *সংবাদ*, ১৬ মার্চ ২০০৩

১৯৩৯. বাগেরহাট বর্বরতা, আরও তিনজন গ্রেফতার, লুণ্ঠিত কিছু মাল উদ্ধার, ৩ জনকে জেলে প্রেরণ, *জনকণ্ঠ*, ১৭ মার্চ ২০০৩

১৯৪০. যশোরে প্রতিবেশী মহিলার যোগসাজসে যুবতী ধর্ষিত, *জনকণ্ঠ*, ১৭ মার্চ ২০০৩

১৯৪১. হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ ঃ ইউপি নির্বাচন নিয়ে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা নির্যাতনের ব্যাপক ঘটনা ঘটেছে, *জনকণ্ঠ*, ১৮ মার্চ ২০০৩

১৯৪২. জয়পুরহাটে সন্ত্রাসীরা তিন আদিবাসীর বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, *প্রথম আলো*, ১৮ মার্চ ২০০৩

১৯৪৩. আতংকে গৃহবন্দী একটি পরিবার, *ইত্তেফাক*, ১৯ মার্চ ২০০৩

১৯৪৪. বাগেরহাটে অধ্যাপক সর্বজিৎ চক্রবর্তীকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি, *সংবাদ*, ২০ মার্চ ২০০৩

১৯৪৫. কেরানীগঞ্জে সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা ॥ মামলায় জড়িয়ে হয়রানি, *জনকণ্ঠ*, ২২ মার্চ ২০০৩

১৯৪৬. বরিশালে নির্বাচনে হেরে হিন্দু পরিবারে হামলা!, *প্রথম আলো*, ২২ মার্চ ২০০৩

১৯৪৭. মোটর সাইকেল না দেওয়ায়, *আজকের কাগজ*, ২২ মার্চ ২০০৩

১৯৪৮. মোড়েলগঞ্জে মৎস্য ঘের দখলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে আহত ১০, *আজকের কাগজ*, ২২ মার্চ ২০০৩

১৯৪৯. স্কুলের নামে জমি দখলের চেষ্টা ঃ জামালপুরে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর বিএনপি সন্ত্রাসীদের হামলা, আহত ১০, *সংবাদ*, ২৩ মার্চ ২০০৩

১৯৫০. বাগেরহাট বর্বরতা, লাখ টাকার চুক্তিতে হত্যা পরিকল্পনা করা হয়, যুবদল নেতা হারুণের স্বীকারোক্তি, *জনকণ্ঠ*, ২৪ মার্চ ২০০৩

১৯৫১. চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাত করে ২ লাখ টাকা ছিনতাই, *জনকণ্ঠ*, ২৫ মার্চ ২০০৩

১৯৫২. গুরুদাসপুরে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুন ॥ বন্ধু নিখোঁজ, *ইত্তেফাক*, ২৭ মার্চ ২০০৩

১৯৫৩. উজিরপুরে সংখ্যালঘু পরিবারের ৭শ' বিঘা জমি দখল করে ঘের তৈরির চেষ্টা, *আজকের কাগজ*, ২৮ মার্চ ২০০৩

১৯৫৪. ঘুষ দে নয় ...., *আজকের কাগজ*, ২৮ মার্চ ২০০৩

১৯৫৫. দেড় বছরে কয়েক' শ নারী ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ঃ অধিকাংশ ঘটনাই থেকে যায় আড়ালে, মূল টার্গেট সংখ্যালঘুরা, *প্রথম আলো*, ৩০ মার্চ ২০০৩

১৯৫৬. নান্দাইলে সংখ্যালঘু পরিবারের বাসা দখল করেছে পুলিশের এএসআই ঃ বাড়ির মালিককে দগ্ধ করে হত্যার হুমকি, *সংবাদ*, ৩০ মার্চ ২০০৩

১৯৫৭. সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ ঃ সম্পত্তি দখলের জন্যে দুটি সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যদের হত্যার হুমকি, *সংবাদ*, ৩১ মার্চ ২০০৩

১৯৫৮. চট্টগ্রামে খুন, *জনকণ্ঠ*, ৩১ মার্চ ২০০৩

এপ্রিল ২০০৩

১৯৫৯. বানারীপাড়ায় প্রতিপক্ষের হামলায় একই পরিবারের ৩ জন আহত, *আজকের কাগজ*, ১ এপ্রিল ২০০৩

১৯৬০. বালিয়াকান্দিতে সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীকে মারপিট করে জখম, *সংবাদ*, ১ এপ্রিল ২০০৩

১৯৬১. সিলেটে ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে তরুণী অপহরণ, *জনকণ্ঠ*, ২ এপ্রিল ২০০৩

১৯৬২. ঝালকাঠিতে শিব মন্দিরের পুকুর থেকে মাছ লুট, *ইত্তেফাক*, ৩ এপ্রিল ২০০৩

১৯৬৩. ফটিকছড়িতে মুক্তিপণের দাবিতে এক ব্যক্তি অপহরণ, *যুগান্তর*, ৩ এপ্রিল ২০০৩

১৯৬৪. বরিশালে শঙ্কর মঠ থেকে মূল্যবান মূর্তি চুরি, *সংবাদ*, ৩ এপ্রিল ২০০৩

১৯৬৫. মির্জাপুরে বারুণী মেলায় পুলিশি অ্যাকশন, *সংবাদ*, ৩ এপ্রিল ২০০৩

১৯৬৬. কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় কলারোয়ায় সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা, *সংবাদ*, ৪ এপ্রিল ২০০৩

১৯৬৭. চাঁদা না দেয়ায় জগন্নাথ হলের ছাত্র প্রহৃত, *জনকণ্ঠ*, ৫ এপ্রিল ২০০৩

১৯৬৮. কচুয়ায় নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে হামলা, এক মাস পরে থানায় দায়ের হয়েছে অদ্ভুত পাল্টা মামলা, *জনকণ্ঠ*, ৫ এপ্রিল ২০০৩

১৯৬৯. মোড়েলগঞ্জে চিংড়ি ঘের দখলের হিড়িক ॥ সংখ্যালঘুদের ওপর চলছে নির্যাতন, *জনকণ্ঠ*, ৬ এপ্রিল ২০০৩

১৯৭০. সদরপুরে দু'টি সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়ি দখল করেছে সন্ত্রাসীরা, *আজকের কাগজ*, ৬ এপ্রিল ২০০৩

১৯৭১. বগুড়ায় মাড়োয়ারি ধর্মশালা ভাঙার সিদ্ধান্তে উদ্বেগ, *সংবাদ*, ৭ এপ্রিল ২০০৩

১৯৭২. রায়গঞ্জ ও জলঢাকায় মূর্তি ভাংচুর, *ইত্তেফাক*, ৮ এপ্রিল ২০০৩

১৯৭৩. শিবগঞ্জে মন্দিরের ঘর দখল চেষ্টা ঃ বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার, *প্রথম আলো*, ৯ এপ্রিল ২০০৩

১৯৭৪. তানোরে বিএনপি নেতার ভাগ্নে ধর্ষণ করেছে গৃহবধূকে, পার্বতীপুরে তরুণীর রহস্যজনক মৃত্যু, *জনকণ্ঠ*, ১০ এপ্রিল ২০০৩

১৯৭৫. নারায়ণগঞ্জে মন্দির থেকে মূর্তি চুরি, *আজকের কাগজ*, ১১ এপ্রিল ২০০৩

১৯৭৬. পার্বতীপুরে আদিবাসী তরুণীর রহস্যজনক মৃত্যু, *ভোরের কাগজ*, ১১ এপ্রিল ২০০৩

১৯৭৭. খুলনায় আরো এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা, *জনকণ্ঠ*, ১২ এপ্রিল ২০০৩

১৯৭৮. নরসিংদীর শিবপুরে বিএনপি ক্যাডারদের চাঁদা না দেওয়ায় বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর লুট, *আজকের কাগজ*, ১৩ এপ্রিল ২০০৩

১৯৭৯. পাংশায় মূর্তি ভাংচুর, *ইত্তেফাক, ১৩ এপ্রিল ২০০৩*
১৯৮০. বাগেরহাটে চাঁদা না পেয়ে বাড়িতে হামলা, ডাকাতি, *জনকণ্ঠ, ১৪ এপ্রিল ২০০৩*
১৯৮১. সন্ত্রাসমুক্ত ঘোষণার ১২ দিন পর নাটোরে সংখ্যালঘু তরুণী অপহৃত, *ইত্তেফাক, ১৫ এপ্রিল ২০০৩*
১৯৮২. রাঙামাটিতে আওয়ামী লীগ নেতা গুলিবিদ্ধ, *প্রথম আলো, ১৬ এপ্রিল ২০০৩*
১৯৮৩. মিরসরাইয়ে সংখ্যালঘুর স'মিলে ও ফরিদপুরে বাড়িতে হামলা ঃ আহত ১৬, এক পরিবার ঘরছাড়া, *প্রথম আলো, ১৭ এপ্রিল ২০০৩*
১৯৮৪. বাজিতপুরে চাঁদার দাবিতে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সন্ত্রাসীদের হামলা ঃ উপজেলা সদরে ৫ শতাধিক মানুষের আশ্রয় গ্রহণ, *সংবাদ, ১৮ এপ্রিল ২০০৩*
১৯৮৫. বখাটেদের উৎপাতের শিকার খুলনার পাইকগাছায় আরেক স্কুল ছাত্রীর আত্মহনন, *আজকের কাগজ, ১৮ এপ্রিল ২০০৩*
১৯৮৬. ঝালকাঠিতে দুই সংখ্যালঘুর জায়গা দখল করে ঘরবাড়ি নির্মাণের অভিযোগ, *জনকণ্ঠ, ১৯ এপ্রিল ২০০৩*
১৯৮৭. নাটোরে খ্রীস্টান পল্লীতে ফের সন্ত্রাসী হামলায় ৭ জন আহত, *জনকণ্ঠ, ১৯ এপ্রিল ২০০৩*
১৯৮৮. পালিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি ঃ গৌরনদীতে যুবদল ক্যাডার ইট দিয়ে থেঁতলে দিয়েছে কাঠমিস্ত্রির শরীর, *সংবাদ, ১৯ এপ্রিল ২০০৩*
১৯৮৯. ফরিদপুরে নকলে সহায়তা না করায় পরীক্ষার্থীর পিতা কুপিয়ে জখম করেছে শিক্ষককে, *জনকণ্ঠ, ২০ এপ্রিল ২০০৩*
১৯৯০. মির্জাপুরে অসহায় বিধবাকে ভিটা থেকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র, *ভোরের কাগজ, ২০ এপ্রিল ২০০৩*
১৯৯১. স্থানীয় বিএনপি নেত্রী ও সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য ঃ উজিরপুরে মন্দিরের ও আগৈলঝাড়ায় সংখ্যালঘু পরিবারের জমি দখল, *সংবাদ, ২১ এপ্রিল ২০০৩*
১৯৯২. অবশেষে যুবদল নেতার হুমকির মুখে হাসপাতালও ছাড়তে হল গোবিন্দকে, *সংবাদ, ২১ এপ্রিল ২০০৩*
১৯৯৩. চট্টগ্রামে আইনজীবীর পুত্রকে অপহরণের পর হত্যা ঃ বাড়ি দখলকারী সন্ত্রাসী আজিম হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে ?, *প্রথম আলো, ২১ এপ্রিল ২০০৩*
১৯৯৪. অভয়নগরে কলেজ ছাত্রকে গুলি করে হত্যা, *জনকণ্ঠ, ২২ এপ্রিল ২০০৩*
১৯৯৫. চট্টগ্রামে আইনজীবীপুত্র শ্রীকান্ত রক্ষিত হত্যাকাণ্ডে তোলপাড়, নিহতের পরিবারকে সন্ত্রাসীদের ফের হুমকি, *জনকণ্ঠ, ২২ এপ্রিল ২০০৩*
১৯৯৬. আসামী করা হয়েছে ৩৮ জনকে, নাটোরে খ্রিস্টান পল্লিতে হামলার ঘটনায় অবশেষে ২টি মামলা দায়ের, *জনকণ্ঠ, ২২ এপ্রিল ২০০৩*
১৯৯৭. মুক্তাগাছায় সংখ্যালঘু পরিবারের ১ শিশুকে ধর্ষণ, ৪৮ ঘণ্টায় উদ্ধার, *সংবাদ, ২৩ এপ্রিল ২০০৩*
১৯৯৮. পীরগঞ্জে আদিবাসী তরুণী ধর্ষিত, *আজকের কাগজ, ২৩ এপ্রিল ২০০৩*
১৯৯৯. চট্টগ্রামে শ্রীকান্ত হত্যাকাণ্ডের স্থান শনাক্ত, গ্রেফতার-২, কাটা মস্তকের সন্ধান এখনও মিলেনি, *জনকণ্ঠ, ২৪ এপ্রিল ২০০৩*
২০০০. সরিষাবাড়ীতে এক খ্রীস্টান যুবককে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা, *জনকণ্ঠ, ২৫ এপ্রিল ২০০৩*
২০০১. পাওনা টাকা আদায়ের জন্য প্রতিবেশী স্কুল ছাত্রকে অপহরণ!, *ভোরের কাগজ, ২৫ এপ্রিল ২০০৩*
২০০২. *সিঙ্গাইরে সংখ্যালঘু পরিবারের উপর হামলা ॥ আহত ৫, ইত্তেফাক, ২৬ এপ্রিল ২০০৩*
২০০৩. মৌলভীবাজারে সংখ্যালঘুদের ৪ একর জমি দখল করেছে ভূমিহীন নামধারীরা, *প্রথম আলো, ২৭ এপ্রিল ২০০৩*
২০০৪. মির্জাপুরে সন্ত্রাসী হামলার শিকার সবিতার গর্ভের বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেছে ঃ সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক, *সংবাদ, ২৭ এপ্রিল ২০০৩*
২০০৫. মাগুরায় সেবাইতকে মারধর করে প্রাচীন মন্দির দখলের চেষ্টা, *ভোরের কাগজ, ২৭ এপ্রিল ২০০৩*
২০০৬. মানিকগঞ্জে জমি গ্রাস করার জন্য মেয়েকে অপহরণ!, *জনকণ্ঠ, ২৮ এপ্রিল ২০০৩*
২০০৭. ডুমুরিয়ায় ঘুম থেকে ডেকে তুলে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যা, *আজকের কাগজ, ২৮ এপ্রিল ২০০৩*
২০০৮. শ্রীকান্ত রক্ষিত কিলিং স্কোয়াড সদস্য জাহাঙ্গীর সীতাকুণ্ডে গ্রেফতার, আদালতে ভোলার স্বীকারোক্তি, *জনকণ্ঠ, ২৯ এপ্রিল ২০০৩*
২০০৯. নীলফামারীর স্বপ্না রাণীর আত্মহত্যা প্ররোচনা মামলাটি কি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চলছে?, *জনকণ্ঠ, ২৯ এপ্রিল ২০০৩*
২০১০. বর্গাদারের নজর পড়েছে মালিকের জমিতে ॥ মা-বাবার সামনে মেয়েকে ধর্ষণ ঃ পুরোহিত পরিবারটি গ্রামছাড়া, *প্রথম আলো, ৩০ এপ্রিল ২০০৩*
২০১১. রাঙ্গামাটিতে পাহাড়ি এক ছাত্রী ধর্ষণের শিকার, এলাকায় উত্তেজনা, *ভোরের কাগজ, ৩০ এপ্রিল ২০০৩*

মে ২০০৩

২০১২. ধর্ষণের বিচার দাবীতে মানিকগঞ্জে শত শত গ্রামবাসীর বিক্ষোভ ॥ পরিবারটি এলাকা ছাড়া, *জনকণ্ঠ, ১ মে ২০০৩*
২০১৩. লক্ষ্মীপুরে স্কুলছাত্রী অপহৃত, *যুগান্তর, ১ মে ২০০৩*
২০১৪. সরিষাবাড়ীতে যুবক খুন ॥ ৩ জন গ্রেফতার, *ইত্তেফাক, ১ মে ২০০৩*
২০১৫. মামলা করায় ইটনার বয়রা গ্রামে সংখ্যালঘু নির্যাতন অব্যাহত, *সংবাদ, ১ মে ২০০৩*
২০১৬. বাগেরহাটে ছাত্রীকে অপহরণ করে পাশবিক নির্যাতন, সারা অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, *জনকণ্ঠ, ২ মে ২০০৩*
২০১৭. ফটিকছড়িতে বৌদ্ধ ভিক্ষু অপহৃত ॥ আটকে রেখে মারধর, *জনকণ্ঠ, ২ মে ২০০৩*
২০১৮. মূল আসামী ধরা পড়েনি, নওগাঁয় ধর্ষিত স্কুলছাত্রীকে পতিতা বানানোর চেষ্টা ॥ মামলা তুলে নেয়ার হুমকি, *জনকণ্ঠ, ২ মে ২০০৩*
২০১৯. গোয়ালন্দে সংখ্যালঘু কিশোরী অপহরণ, জমি দখল, হামলা ॥ পুলিশ নির্বিকার, *সংবাদ, ৩ মে ২০০৩*
২০২০. রাজবাড়িতে ২ সংখ্যালঘু বাড়িতে ডাকাতি, *সংবাদ, ৩ মে ২০০৩*
২০২১. পিরোজপুর শহরে ডাকাতি ॥ শ্লীলতাহানির অভিযোগ, *সংবাদ, ৩ মে ২০০৩*

২০২২. মাদারীপুরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জমির ধান লুট ॥ দেশত্যাগের হুমকি, *সংবাদ*, *৩ মে ২০০৩*

২০২৩. মুক্তাগাছায় শিশু ধর্ষণকারীর ফাঁসির দাবিতে যৌথ বিক্ষোভ মিছিল, *সংবাদ*, *৩ মে ২০০৩*

২০২৪. ফটিকছড়িতে সন্ত্রাসীদের হাতে বৌদ্ধ ভিক্ষু আহত, *আজকের কাগজ, ৩ মে ২০০৩*

২০২৫. ভাণ্ডারিয়ায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে ১টি সংখ্যালঘু পরিবার, *সংবাদ, ৩ মে ২০০৩*

২০২৬. বাগেরহাটে কলেজ ছাত্রীকে অপহরণ করে পাশবিক নির্যাতন ॥ সারা অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, *জনকণ্ঠ, ৩ মে ২০০৩*

২০২৭. বাগেরহাটের খুন ধর্ষণের ঘটনায় দ্রুত চার্জশিট ঃ যুবদল নেতা-কর্মীসহ আসামি ২২, পলাতক ১৩, কারাগারে ৯, *প্রথম আলো, ৪ মে ২০০৩*

২০২৮. বাগেরহাটের কোমরপুর ঠাকুরবাড়িতে বর্বরতা ॥ ঘাতক ইদ্রিসসহ ২২ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট, *জনকণ্ঠ, ৪ মে ২০০৩*

২০২৯. রামগতিতে এসএসসি পরীক্ষার্থিনী অপহরণ, *ইনকিলাব, ৪ মে ২০০৩*

২০৩০. ভাণ্ডারিয়ায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে ১টি সংখ্যালঘু পরিবার, *সংবাদ, ৪ মে ২০০৩*

২০৩১. বগুড়া শহরে মাড়োয়ারি ধর্মশালা ভাঙার ওপর আদালতের নিষেধাজ্ঞা, *সংবাদ*, *৫ মে ২০০৩*

২০৩২. বাগেরহাটে সংখ্যাগঘুর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ মহিলা ও অন্ধ বৃদ্ধার অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু, *আজকের কাগজ, ৫ মে ২০০৩*

২০৩৩. ফলোআপ ঃ সরিষাবাড়িতে খ্রীস্টান যুবক হত্যা ৩টি গ্রাম ১০ দিন যাবৎ পুরুষ শূন্য, *আজকের কাগজ, ৫ মে ২০০৩*

২০৩৪. নূপুর নিজ গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়েছিল,তাকে বাঁচাতে গিয়ে আরও ১ জনের মৃত্যু ও ৩ জন আহত হয়েছে, *আজকের কাগজ, ৫ মে ২০০৩*

২০৩৫. বালাগঞ্জে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পুরুষেরা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, *সংবাদ, ৬ মে ২০০৩*

২০৩৬. ফলোআপ : সরিষাবাড়িতে খ্রীস্টান যুবক হত্যা ৩টি গ্রাম ১০ দিন যাবৎ পুরুষ শূন্য, *আজকের কাগজ, ৬ মে ২০০৩*

২০৩৭. নবীগঞ্জে কর্মচারীকে খুন করে ফার্মেসী থেকে সিন্দুক লুট, *ভোরের কাগজ*, *৬ মে ২০০৩*

২০৩৮. ফলোআপ ঃ সিংগাইর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় মামলা করায় সংখ্যালঘু পরিবার গ্রামছাড়া, *ভোরের কাগজ, ৬ মে ২০০৩*

২০৩৯. ডুমুরিয়ায় ঘের মালিককে জবাই করে হত্যা, *যুগান্তর, ৬ মে ২০০৩*

২০৪০. ডুমুরিয়ায় খুন ও অপরহণ, *ইত্তেফাক, ৬ মে ২০০৩*

২০৪১. সোনারুপা চা বাগান থেকে শ্রমিকের লাশ উদ্ধার, *ইত্তেফাক, ৬ মে ২০০৩*

২০৪২. বাগেরহাটে ২ হিন্দু মহিলার অগ্নিদগ্ধ হয়ে নিহতের ঘটনায় তোলপাড়, *ইনকিলাব*, *৬ মে ২০০৩*

২০৪৩. খুলনায় যুবককে জবাই করে হত্যা ঃ পাবনায় কৃষক কুমিল্লায় শিশু খুন, *প্রথম আলো*, *৬ মে ২০০৩*

২০৪৪. শাঁখারিবাজরে শতাব্দীপ্রাচীন মন্দিরের জমি নিয়ে উত্তেজনা ঃ আদালতের স্থিতাদেশ সত্ত্বেও দখলের চেষ্টা, *প্রথম আলো, ৬ মে ২০০৩*

২০৪৫. হাইকোর্টের রুল বগুড়ায় ধর্মশালা মন্দির ভাঙচুর কেন অবৈধ নয়?, *ভোরের কাগজ*, *৭ মে ২০০৩*

২০৪৬. কোমরপুরে ডাকাতি, ধর্ষণ হত্যার ঘটনা ঃ পুলিশ চার্জশিট দিলেও হুমকিতে ঐ পরিবারটি নিরাপত্তাহীনতায়, *ভোরের কাগজ, ৭ মে ২০০৩*

২০৪৭. শিবচরে ৩টি মন্দিরের ১৩টি মূর্তি ভাঙচুর ঃ সংখ্যালাঘুরা আতঙ্কিত, *সংবাদ*, *৭ মে ২০০৩*

২০৪৮. ত্রিশালে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধের আহ্বান, *সংবাদ, ৭ মে ২০০৩*

২০৪৯. শিবচরে মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনায় গ্রেফতার ২, *আজকের কাগজ, ৭ মে ২০০৩*

২০৫০. শিবালয়ে পুরোহিত কন্যা গণধর্ষণের প্রতিবাদে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে মানববন্ধন, *আজকের কাগজ, ৭ মে ২০০৩*

২০৫১. কলেজ ছাত্রী লক্ষ্মী রাণী ও স্কুল ছাত্রী তরঙ্গিনীর অপহনন মামলার তদন্ত করছে পুলিশ ॥ নিয়ন্ত্রণ করছে অশুভ শক্তি, *আজকের কাগজ, ৮ মে ২০০৩*

২০৫২. বালাগঞ্জ বাজারের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন বাড়ি-ঘরে থাকতে পারছে না, *আজকের কাগজ, ৮ মে ২০০৩*

২০৫৩. চট্টগ্রামে জ্ঞানজ্যোতি হত্যা মামলার আসামী গ্রেফতার, *আজকের কাগজ*, *৮ মে ২০০৩*

২০৫৪. সোনারগাঁয়ে মূর্তি ভাঙ্গার অভিযোগ, *ইত্তেফাক, ৮ মে ২০০৩*

২০৫৫. দেবোত্তর সম্পত্তি দখলের চেষ্টায় চাঁদাবাজি মামলা সাজিয়ে নিরপরাধ যুবককে পুলিশে দিয়েছে এক কালোবাজারি , *ভোরের কাগজ, ৯ মে ২০০৩*

২০৫৬. ফরিদপুরে সংখ্যালঘু পাড়ায় দু'শতাধিক ব্যক্তির হামলা,১০ গৃহবধূ লাঞ্ছিত ॥ ২৫ বাড়িতে ভাঙচুর, লুট, দু'টি মন্দির বিধ্বস্ত, *আজকের কাগজ, ৯ মে ২০০৩*

২০৫৭. সিংগাইরে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলার ঘটনায় স্বাধীন বাহিনীর ২ জন গ্রেফতার ।, *আজকের কাগজ, ৯ মে ২০০৩*

২০৫৮. সাংসদ খালেকের জবরদস্তি গাবতলীতে আবাসন প্রকল্পের জন্য অন্যের বসতভিটা উচ্ছেদ, *প্রথম আলো, ৯ মে ২০০৩*

২০৫৯. স্কুল ছাত্রকে অপহরণ করে পায়ে শিকল ও তালা দিয়ে আটকিয়ে রাখার অভিযোগ, *ইত্তেফাক, ৯ মে ২০০৩*

২০৬০. ফরিদপুরে আদিবাসীপাড়ায় সন্ত্রাসীদের হামলা ॥ ভাংচুর-লুটপাট দশ মহিলা লাঞ্ছিত, *জনকণ্ঠ, ৯ মে ২০০৩*

২০৬১. ফরিদপুরের আদিবাসী পল্লীতে হামলা ভাঙচুর লুটপাট, *প্রথম আলো, ৯ মে ২০০৩*

২০৬২. বাঁশখালীতে একই পরিবারের ৩ মহিলাকে পুড়িয়ে হত্যা, *ইনকিলাব, ১০ মে ২০০৩*

২০৬৩. *বাঁশখালীতে বদ্ধঘরে আগুন দিয়ে একই পরিবারের ৩ জনকে হত্যা, ইত্তেফাক, ১০ মে ২০০৩*

২০৬৪. *সদরপুরে ২০টি সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদের হুমকি, ইত্তেফাক ১০ মে ২০০৩*

২০৬৫. কানাইপুরে এখনো চরম আতঙ্ক হুমকির মুখে কেউ মামলা করেনি, *ভোরের কাগজ*, *১০ মে ২০০৩*

২০৬৬. অর্পিত সম্পত্তি আইন এখন হিমাগারে, নতুন করে ইজারা দেয়া হচ্ছে, সম্পত্তিহারা হিন্দুরা হতাশ, *জনকণ্ঠ, ১০ মে ২০০৩*

২০৬৭. *বাঁশখালীতে পেট্রোল ঢেলে বিধবার ঘরে আগুন ॥ মা মেয়ে সহ তিনজন জীবন্ত দগ্ধ, জনকণ্ঠ, ১০ মে ২০০৩*

২০৬৮. ফরিদপুরে আদিবাসীপাড়ায় হামলা ॥ তিন দিনেও মামলা হয়নি, *জনকণ্ঠ, ১০ মে ২০০৩*

২০৬৯. মিরসরাইয়ে সংখ্যালঘুদের ১০ দোকান ভাঙচুর লুটপাট, *প্রথম আলো, ১১ মে ২০০৩*

২০৭০. হুমকিদাতা জাহাঙ্গীরকে গ্রেপ্তারে অনীহা ঃ বাঁশখালীতে আগুনে পুড়িয়ে ৩ মহিলাকে হত্যার ঘটনা ভিন্নখাতে নিচ্ছে পুলিশ, *ভোরের কাগজ, ১১ মে ২০০৩*

২০৭১. *খোদ রাজধানীতেই সংখ্যালঘু পরিবারের মেয়েকে ধর্ষণ করেছে বিএনপি নেতা, জনকণ্ঠ, ১২ মে ২০০৩*

২০৭২. *বনায়নের অজুহাতে মধুপুরে ২৯টি আদিবাসী কোচপরিবারকে উচ্ছেদের অভিযোগ, ইত্তেফাক, ১২ মে ২০০৩*

২০৭৩. তৎপর মধুপুর বনবিভাগের কর্মকর্তারা ঃ মস্তান দিয়ে কামারচারার ২৯ টি আদিবাসী পরিবার উচ্ছেদের চেষ্টা, *সংবাদ, ১৩ মে ২০০৩*

২০৭৪. হবিগঞ্জে সংখ্যালঘুর সম্পত্তি জবরদখল নিয়ে তুলকালাম ॥ ডিসি অফিস ঘেরাও, ২৭ সন্ত্রাসী গ্রেফতার ॥ পুলিশসহ আহত ১৫, *জনকণ্ঠ, ১৩ মে ২০০৩*

২০৭৫. হবিগঞ্জে দানবীর শচীন্দ্র লালের বস্ত্র বিপনী দখল, গ্রেপ্তার ২৭, *প্রথম আলো, ১৩ মে ২০০৩*

২০৭৬. শিবালয়ের পুরোহিত মেয়ে ধর্ষণের ঘটনায় উদীচীর মানববন্ধন, *সংবাদ, ১৪ মে ২০০৩*

২০৭৭. মানিকগঞ্জে সরস্বতী হত্যার মামলার আসামিরা ৫দিনেও গ্রেফতার হয়নি, *সংবাদ, ১৪ মে ২০০৩*

২০৭৮. বগুড়ার শেরপুরে মন্দিরে ডাকাতি সিন্দুক ভেঙ্গে টাকা-পয়সা লুট, *সংবাদ, ১৪ মে ২০০৩*

২০৭৯. অপমান সইতে না পেরে আত্মহত্যা করল কালু দাস, *প্রথম আলো, ১৪ মে ২০০৩*

২০৮০. মধুপুরে আদিবাসী উচ্ছেদ খবর প্রকাশিত হওয়ায় মস্তানরা মারমুখো, *সংবাদ, ১৪ মে ২০০৩*

২০৮১. সোনারগাঁওয়ের বারদী লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি ॥ সর্বস্ব হারাচ্ছে তীর্থযাত্রীরা, *আজকের কাগজ, ১৪ মে ২০০৩*

২০৮২. ফলোআপ বাঁশখালীতে ৩ জনকে পুড়িয়ে হত্যা আসামীরা গ্রেফতার হয়নি, এলাকাবাসী সন্ত্রস্ত, *ইত্তেফাক, ১৫ মে ২০০৩*

২০৮৩. সোনাগাজী ও বাজিতপুরে কিশোরী ধর্ষিত ॥ মা মেয়ের শ্লীলতাহানি, *জনকণ্ঠ, ১৫ মে ২০০৩*

২০৮৪. বাজিতপুরের ঋষিপাড়ায় আবার সন্ত্রাসীদের অকথ্য নির্যাতন, *প্রথম আলো, ১৫ মে ২০০৩*

২০৮৫. বান্দরবানের দুর্গম গ্রামের ৭ যুবক ৯ দিন ধরে নিখোঁজ, *প্রথম আলো, ১৫ মে ২০০৩*

২০৮৬. বাজিতপুরে মা-মেয়ের ওপর বিএনপি সন্ত্রাসীর বর্বরতা, *ভোরের কাগজ, ১৫ মে ২০০৩*

২০৮৭. আদিবাসী পাড়ায় হামলা ফরিদপুরে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের মিছিল সমাবেশ ও স্মারকলিপি, *জনকণ্ঠ, ১৫ মে ২০০৩*

২০৮৮. হবিগঞ্জে দানবীর শচীন্দ্রলালের বস্ত্রবিপনি দখল ॥ দখলকারীই উল্টো মামলা করেছে!, *প্রথম আলো, ১৫ মে ২০০৩*

২০৮৯. বান্দরবানে কিশোরকে গলা টিপে খুন, মার্মা পল্লী থেকে ৭ যুবককে ধরে নিয়ে গেছে সন্ত্রাসীরা, *জনকণ্ঠ, ১৬ মে ২০০৩*

২০৯০. লালদিয়ায় অধিবাসীদের উচ্ছেদ নোটিস দিয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ ঃ ব্যাপক আন্দোলনের প্রস্তুতি, *আজকের কাগজ, ১৭ মে ২০০৩*

২০৯১. বরিশালের হাবিবপুরে কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণের ব্যর্থ চেষ্টা ।॥ হত্যার হুমকি, *আজকের কাগজ, ১৭ মে ২০০৩*

২০৯২. বাজিতপুরে শ্লীলতাহানির চেষ্টা ঃ দুর্বৃত্তদের হামলায় মা-মেয়ে আহত, *আজকের কাগজ, ১৭ মে ২০০৩*

২০৯৩. আগৈলঝাড়ায় তরুণী গণধর্ষণের শিকার ঃ গ্রেফতার ১, *সংবাদ, ১৭ মে ২০০৩*

২০৯৪. রাজশাহীর সাহেববাজারে পুলিশের উপস্থিতিতে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা, *সংবাদ, ১৭ মে ২০০৩*

২০৯৫. শাহরিয়ার কবিরসহ বিশিষ্টজনদের ঘটনাস্থল পরিদর্শন ঃ বাঁশখালীর নাথপাড়ায় এখনো আতঙ্ক, পুড়িয়ে হত্যার আসামি জাহাঙ্গীর ধরা পড়েনি, *ভোরের কাগজ, ১৭ মে ২০০৩*

২০৯৬. কুমিল্লায় চাঁদা না পেয়ে সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীর ওপর হামলা ও মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানির চেষ্টা, *সংবাদ, ১৭ মে ২০০৩*

২০৯৭. হবিগঞ্জে ৫ দিনে ২ খুনসহ ৯টি অস্বাভাবিক মৃত্যু, ধর্ষিতা একজন, চুরি ডাকাতির ঘটনা ঘটছে অহরহ, *ভোরের কাগজ, ১৮ মে ২০০৩*

২০৯৮. আড়াইহাজারে স্বর্ণের দোকানে হামলা ও লুটপাট : আহত ৩, *ভোরের কাগজ, ১৮ মে ২০০৩*

২০৯৯. নানিয়ারচরে সন্ত্রাসীদের তান্ডব, বিয়ে বাড়িতে যুবককে গুলি করে হত্যা, *ভোরের কাগজ, ১৮ মে ২০০৩*

২১০০. রাজনগরে সংখ্যালঘুদের জমি দখল দুমাসেও দখলমুক্ত করতে পারেনি প্রশাসন, *প্রথম আলো, ১৮ মে ২০০৩*

২১০১. বাজিতপুর ঋষিপাড়ায় মা-মেয়ের ওপর সন্ত্রাসী বর্বরতা ঃ সন্ত্রাসী দলের নেতা এমপির চাচাতো ভাই হওয়ায় পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না!, *ভোরের কাগজ, ১৯ মে ২০০৩*

২১০২. কানাইপুরে সংখ্যালঘু পাড়ায় হামলা সন্ত্রাসীদের অব্যাহত হুমকি, উল্টো মামলা করে নির্যাতিতদের হয়রানি, *ভোরের কাগজ, ১৯ মে ২০০৩*

২১০৩. চট্টগ্রামে শিশু উজ্জল পাল হত্যা মামলার চার্জ গঠন আজ, বাদীকে প্রাণনাশের হুমকি, *জনকণ্ঠ, ২০ মে ২০০৩*

২১০৪. সিলেটে লালন দেব হত্যা মামলা, বাদীকে প্রাণনাশের হুমকি, *জনকণ্ঠ, ২০ মে ২০০৩*

২১০৫. মাদারীপুরের সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার, আতঙ্ক, *জনকণ্ঠ, ২০ মে ২০০৩*

২১০৬. মধুপুরের বনাঞ্চল থেকে ২৯টি কোচ পরিবারকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র চলছে ঃ কর্মকর্তা ও স্থানীয় মস্তানদের যোগসাজশ, *সংবাদ, ২১ মে ২০০৩*

২১০৭. ঠাকুরগাঁওয়ে দুই কিশোরী অপরহণ ॥ ১জন উদ্ধার, *সংবাদ*, *২২মে ২০০৩*

২১০৮. ফটিকছড়িতে জোড়া খুন ॥ থানায় মামলা, তবে কেউ গ্রেফতার হয়নি, *জনকণ্ঠ*, *২৩ মে ২০০৩*

২১০৯. ফটিকছড়িতে সন্ত্রাসীদের হাতে কাঁচামাল ব্যবসায়ী খুন, *আজকের কাগজ*, *২৪ মে ২০০৩*

২১১০. চট্টগ্রামে মিলশ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যু, *ভোরের কাগজ*, *২৫ মে ২০০৩*

২১১১. *আতঙ্কিত বিভার মনে একটাই প্রশ্ন- এইচ এসসি পরীক্ষা দিতে পারব তো?*, *জনকণ্ঠ*, *২৬ মে ২০০৩*

২১১২. মনসামঙ্গলের কবি বিজয় গুপ্তের কয়েক শ' বছরের প্রাচীন মনসা মন্দিরের জমি দখলের পাঁয়তারা, *জনকণ্ঠ*, *২৭ মে ২০০৩*

২১১৩. তাহিরপুরের অপহৃত শিক্ষক চার দিনেও উদ্ধার হয়নি ॥ ৬ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবী, *জনকণ্ঠ*, *২৭ মে ২০০৩*

২১১৪. মধুপুরে ২৯ আদিবাসী কোচ পরিবারকে উচ্ছেদ নোটিশ : উত্তেজনা, *যুগান্তর*, *২৮ মে ২০০৩*

২১১৫. কেন্দুয়ায় সংখ্যালঘু একটি পরিবারকে উচ্ছেদ করতে নানা ফন্দি, *যুগান্তর*, *২৮ মে ২০০৩*

২১১৬. সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে বাড়িতে ফিরতে পারছেন না নবীনগরের বৃন্দাবন বর্মণ, *যুগান্তর*, *২৮ মে ২০০৩*

২১১৭. খুলনায় পুলিশের পরিচয়ে ঘের ব্যবসায়ীকে অপহরণ, ২৪ ঘন্টায়ও সন্ধান মেলেনি, *জনকণ্ঠ*, *২৯ মে ২০০৩*

২১১৮. পাবনায় বাড়ি ও মন্দির দখলের জন্য সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব, *জনকণ্ঠ*, *২৯ মে ২০০৩*

২১১৯. বাংলাদেশে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন, সেনা হেফাজতে মৃত্যু, বিরোধী রাজনীতি দমন, সংখ্যালঘু নির্যাতন নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা ঃ এমনেস্টির বার্ষিক প্রতিবেদন, *জনকণ্ঠ*, *৩০ মে ২০০৩*

২১২০. সিলেটে রামকৃষ্ণ মিশন মন্দির থেকে কলেজ ছাত্রের লাশ উদ্ধার, *জনকণ্ঠ*, *৩১ মে ২০০৩*

জুন ২০০৩

২১২১. অবশেষে অপহৃত চিত্ত হালদারের লাশ মিলেছে, *জনকণ্ঠ*, *১ জুন ২০০৩*

২১২২. মনিরামপুরে গণডাকাতি, *ইনকিলাব*, *২ জুন ২০০৩*

২১২৩. সিরাজগঞ্জে দুই শিক্ষকের কাছে আবারও সন্ত্রাসীদের চিঠি ঃ খেয়ে দেয়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ, *প্রথম আলো*, *২ জুন ২০০৩*

২১২৪. তুচ্ছ ঘটনার জের ॥ জয়পুরহাটে আদিবাসী পল্লীতে হামলায় আহত ১০, *জনকণ্ঠ*, *২ জুন ২০০৩*

২১২৫. চট্টগ্রামের শ্রীকান্ত হত্যা মামলার চার্জশিট ১৫ জুনের মধ্যে প্রদানে মন্ত্রীর নির্দেশ ॥ ভিকটিমের পিতার আত্মহননের হুমকি, *ইত্তেফাক*, *২ জুন ২০০৩*

২১২৬. দিনাজপুরে বৌদ্ধ ভিক্ষুর ওপর অ্যাসিড নিক্ষেপের ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের গ্রেফতার দাবি, *সংবাদ*, *২ জুন ২০০৩*

২১২৭. সংবাদ সম্মেললে কান্নায় ভেঙে পড়লেন বৃদ্ধ নিরঞ্জন মণ্ডল ঃ দুজনকে পুড়িয়ে মারার মামলা থেকে ৩ আসামিকে অব্যাহতি দেওয়ায় আতঙ্ক, *ভোরের কাগজ*, *৩ জুন ২০০৩*

২১২৮. রায়গঞ্জে ধর্ষিতার স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা, *ভোরের কাগজ*, *৩ জুন ২০০৩*

২১২৯. নানিয়ারচরে দুর্বৃত্তদের হামলায় ২ উপজাতীয় কৃষক আহত, *ভোরের কাগজ*, *৩ জুন ২০০৩*

২১৩০. ঝিনাইদহে দারোগার ছড়ানো গুজবে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, আশ্রম মন্দির ও বাড়িঘর ভাঙচুর, *প্রথম আলো*, *৩ জুন ২০০৩*

২১৩১. ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ ঃ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মামলা করায় নিরঞ্জনের পরিবারকে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে, *আজকের কাগজ*, *৩ জুন ২০০৩*

২১৩২. পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জকে সাসপেন্ড ঃ শৈলকুপায় ২টি আশ্রম ৩ বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, *সংবাদ*, *৩ জুন ২০০৩*

২১৩৩. নেত্রকোনায় হত্যাকারীদের প্রাণনাশের হুমকি ঃ বিবাহযোগ্য কন্যাকে নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন নিহতের বাবা-মা, *প্রথম আলো*, *৪ জুন ২০০৩*

২১৩৪. বনকেসে'র নাগপাশে বাঁধা মধুপুরের আদিবাসী জীবন ঃ যে অরণ্য জীবন, সে অরণ্যই কাল, *ভোরের কাগজ*, *৫ জুন ২০০৩*

২১৩৫. নওগাঁয় লুটের পর গৃহবধূকে ধর্ষণ, *ভোরের কাগজ*, *৫ জুন ২০০৩*

২১৩৬. নাটোরে ২শ' সংখ্যালঘু পরিবারকে ৭২ ঘন্টার মধ্যে বিএনপিতে যোগ দেয়ার নির্দেশ, *সংবাদ*, *৫ জুন ২০০৩*

২১৩৭. রাঙ্গামাটিতে এক ব্যক্তি অপহৃত, *সংবাদ*, *৫ জুন ২০০৩*

২১৩৮. হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে চিতলমারীর ছোটবাবু, *যুগান্তর*, *৫ জুন ২০০৩*

২১৩৯. গণধর্ষণ ও ধর্ষণের পর খুন, *জনকণ্ঠ*, *৬ জুন ২০০৩*

২১৪০. যশোরে খ্রীস্টান ছেলে ও মুসলিম মেয়ের মধ্যে বিয়েকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব ঃ ৭ পরিবার গ্রাম ছাড়া, *জনকণ্ঠ*, *৬ জুন ২০০৩*

২১৪১. বরিশালের চরমোনাইয়ে অর্ধশতাধিক হিন্দু পরিবার সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি, *আজকের কাগজ*, *০৭ জুন ২০০৩*

২১৪২. বানারীপাড়ায় মন্দির দখলের পাঁয়তারা, *ইত্তেফাক*, *০৭ জুন ২০০৩*

২১৪৩. চট্টগ্রামে সংখ্যালঘুদের জমি বেদখল, *প্রথম আলো*, *০৭ জুন ২০০৩*

২১৪৪. পতেঙ্গায় যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু, *যুগান্তর*, *৭ জুন ২০০৩*

২১৪৫. মোড়েলগঞ্জে পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের পর সংখ্যালঘুরা আতঙ্কে, *জনকণ্ঠ*, *৭ জুন ২০০৩*

২১৪৬. একটি মানবাধিকার (!) সংগঠনের কাণ্ডকারখানা! ঃ মানিকগঞ্জে সংখ্যালঘু পরিবারের তরুণী গণধর্ষণ মামলা ভিন্ন খাতে প্রবাহের চেষ্টা, *সংবাদ*, *৭ জুন ২০০৩*

২১৪৭. সিংড়ায় মা-বাবার সামনে সংখ্যালঘু পরিবারের দুই বোনকে গণধর্ষণ, *সংবাদ*, *৭ জুন ২০০৩*

২১৪৮. জয়পুর হাটে আদিবাসী পল্লীতে হামলা অগ্নিসংযোগ ঃ আহত ১০ জন, *সংবাদ*, *৭ জুন ২০০৩*

২১৪৯. ঝিকরগাছায় খ্রিস্টান পল্লীতে সন্ত্রাসী হামলা লুটপাট ॥ শঙ্কিত গ্রামবাসী, *সংবাদ*, ৭ *জুন* ২০০৩
২১৫০. মোড়েলগঞ্জে গণধর্ষণের পর হত্যা ॥ সবিতার স্বামী ফের হামলার আশঙ্কায় শঙ্কিত, থানায় জিডি, *জনকণ্ঠ*, ৮ *জুন* ২০০৩
২১৫১. গত নির্বাচনের আগে-পরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর ব্যাপক নির্যাতন হয়েছে ॥ 'গণতদন্ত কমিশন' রিপোর্ট, *জনকণ্ঠ*, ৯ *জুন* ২০০৩
২১৫২. কুমারখালীতে তিন গ্রামের সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার ॥ প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল, *জনকণ্ঠ*, ৯ *জুন* ২০০৩
২১৫৩. কাপাসিয়ায় বাগান সাবাড়, বেদখল, *প্রথম আলো*, ৯ *জুন* ২০০৩
২১৫৪. দিনাজপুরে পুরোহিতকে কুপিয়ে মুখে এসিড ঢেলেছে সন্ত্রাসীরা, *যুগান্তর*, ৯ *জুন* ২০০৩
২১৫৫. স্বামীর সামনে গণধর্ষণ শেষে গৃহবধূকে হত্যা ঃ মোড়েলগঞ্জের সংখ্যালঘুরা আতঙ্কে ৫ দিনেও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি, *ভোরের কাগজ*, ৯ *জুন* ২০০৩
২১৫৬. মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক গৌরচন্দ্র বালাকে বসতভিটা থেকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা, *ভোরের কাগজ*, ০৯ *জুন* ২০০৩
২১৫৭. বরকলে বৌদ্ধ বিহারের স্থান দখল ও ভাংচুরের প্রতিবাদে বিক্ষোভ ঃ স্মারকলিপি পেশ, *যুগান্তর*, ৯ *জুন* ২০০৩
২১৫৮. 'মনে ভাববো এ দেশ আমাদের জন্য নয়' ঃ মোরেলগঞ্জের পল্লীতে ধর্ষণশেষে হত্যার শিকার সবিতার স্বামী পালিয়ে বেড়াচ্ছে, *সংবাদ*, ১০ *জুন* ২০০৩
২১৫৯. আড়াইহাজারে ডাকাতি ৩০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার লুট, *সংবাদ*, ১০ *জুন* ২০০৩
২১৬০. নওগাঁ শহরে ডাকাতিশেষে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ, *সংবাদ*, ১০ *জুন* ২০০৩
২১৬১. রায়গঞ্জে আদিবাসী গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার, *সংবাদ*, ১০ *জুন* ২০০৩
২১৬২. চট্টগ্রামে অরো এক বৌদ্ধ ভিক্ষু খুন, ড্রেনে পড়েছিল গলিত লাশ, *ভোরের কাগজ*, ১০ *জুন* ২০০৩
২১৬৩. বটিয়াঘাটায় বাড়ি থেকে ধরে এনে ৩ ব্যক্তিকে গুলি করে কুপিয়ে হত্যা, *ভোরের কাগজ*, ১০ *জুন* ২০০৩
২১৬৪. এক লাখ টাকা মুক্তিপণে রফা! ঃ সুনামগঞ্জের অপহৃত স্কুল শিক্ষক ১৬ দিন পর নেত্রকোনায় উদ্ধার, *ভোরের কাগজ*, ১১ *জুন* ২০০৩
২১৬৫. ৫ দিনেও পুলিশ মামলা নেয়নি ঃ নবাবগঞ্জে আদিবাসী পুরোহিতকে ছুরিকাঘাত ও এসিডদগ্ধ করেছে সন্ত্রাসীরা, *ভোরের কাগজ*, ১১ *জুন* ২০০৩
২১৬৬. ভোলায় ৮ মাসে সংখ্যালঘু পরিবারের তিন বোনকে অপহরণ ও ধর্ষণ করেছে এক নরপশু ঃ সাংবাদিক সম্মেলন ও বিক্ষোভ, *জনকণ্ঠ*, ১১ *জুন* ২০০৩
২১৬৭. কাপাসিয়ায় প্রভাবশালী অধ্যাপকের কাণ্ড! ঃ সংখ্যালঘু পরিবারের বাগানের গাছ কেটে জমি জবরদখল, *সংবাদ*, ১১ *জুন* ২০০৩
২১৬৮. নীলফামারীতে ব্যবসায়ীর রহস্যজনক মৃত্যু ॥ লাশ তড়িঘড়ি মাটিচাপা!, *জনকণ্ঠ*, ১২ *জুন* ২০০৩
২১৬৯. ফরিদপুরে ব্যবসায়ীকে অপহরণ, গুলি, *প্রথম আলো*, ১২ *জুন* ২০০৩
২১৭০. ফকিটছড়িতে স্বর্ণকার অপহৃত, *আজকের কাগজ*, ১৩ *জুন* ২০০৩
২১৭১. বান্দরবানে জুম চাষীর লাশ উদ্ধার, *আজকের কাগজ*, ১৩ *জুন* ২০০৩
২১৭২. মগের মুল্লুক!, *যুগান্তর*, ১৩ *জুন* ২০০৩
২১৭৩. বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ৫ কংগ্রেসম্যানকে স্মারকলিপি, *জনকণ্ঠ*, ১৩ *জুন* ২০০৩
২১৭৪. জসিম বাহিনীর হুমকি ॥ রাঙ্গুনিয়ার সংখ্যালঘু এলাকায় চাঁদা দাবি ধর্ষণের হুমকি, *ভোরের কাগজ*, ১৪ *জুন* ২০০৩
২১৭৫. মূর্তি চুরি, *ভোরের কাগজ*, ১৪ *জুন* ২০০৩
২১৭৬. হাটহাজরীতে ব্যবসায়ী খুন এলাকায় ক্ষোভ ব্যারিকেড ঃ চট্টগ্রাম শহরে গণপিটুনিতে চাঁদাবাজ নিহত, *প্রথম আলো*, ১৪ *জুন* ২০০৩
২১৭৭. রামপালের পল্লীতে চাঁদার দাবিতে ১টি সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা ঃ মামলা করায় হুমকি, সদস্যরা নিরাপত্তাহীনতায়, *সংবাদ*, ১৪ *জুন* ২০০৩
২১৭৮. সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্যাতিত মুক্তিযোদ্ধা যোগেন্দ্র নাথ মারা গেছেন, *সংবাদ*, ১৪ *জুন* ২০০৩
২১৭৯. চট্টগ্রামে কোটিপতি ব্যবসায়ীকে খুন করেছে ছাত্রদল সন্ত্রাসীরা, *জনকণ্ঠ*, ১৪ *জুন* ২০০৩
২১৮০. পুলিশ এক বছরেও কণ্ঠশিল্পী বাবন হত্যার চার্জশিট দিতে পারেনি, *ভোরের কাগজ*, ১৫ *জুন* ২০০৩
২১৮১. মুসলিম মেয়ের সঙ্গে প্রেম করায় ১ লাখ টাকা জরিমানা ঃ উজিরপুরের একটি সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা, *ভোরের কাগজ*, ১৫ *জুন* ২০০৩
২১৮২. হাটহাজারীতে ব্যবসায়ীকে খুন করেছে ছাত্রদল ক্যাডার পুলিশ নিশ্চিত, শোক কালো পতাকা, *জনকণ্ঠ*, ১৫ *জুন* ২০০৩
২১৮৩. কালীগঞ্জে সংখ্যালঘু পরিবারের বসতভিটা ও চিংড়িঘের দখল করে নিয়েছে সন্ত্রাসীরা, *সংবাদ*, ১৬ *জুন* ২০০৩
২১৮৪. সংখ্যালঘু কিশোরী অপহরণ ঃ চরফ্যাশন থানা ৬ দিন পর মামলা নিলেও গ্রেফতার নেই, *সংবাদ*, ১৬ *জুন* ২০০৩
২১৮৫. থানার ওসি মামলা নেয়নি ॥ হুমকির মুখে গোটা পরিবার, সাতক্ষীরায় বিএনপি কর্মীরা লুট করেছে স্বপন মণ্ডলের চিংড়ি ঘের, দখল নিয়েছে বসতভিটা, *জনকণ্ঠ*, ১৬ *জুন* ২০০৩
২১৮৬. সুনামগঞ্জে সংখ্যালঘু পরিবারের কোটি টাকার জমি দখল, *জনকণ্ঠ*, ১৭ *জুন* ২০০৩
২১৮৭. ফটিকছড়ির দিদার বাহিনীর অত্যাচারে পালিয়ে বেড়াচ্ছে হাইদচকিয়ার লোকজন, *আজকের কাগজ*, ১৮ *জুন* ২০০৩
২১৮৮. মীর্জাগঞ্জে অপহৃতা ঝর্নাকে পুলিশ এখনও উদ্ধার করতে পারেনি, *আজকের কাগজ*, ১৮ *জুন* ২০০৩
২১৮৯. ফদিরপুরের গ্রামে মন্দির পুড়িয়ে দিয়েছে দুষ্কৃতিকারীরা, *প্রথম আলো*, ১৮ *জুন* ২০০৩
২১৯০. বাঁশখালিতে তিন মহিলাকে আগুনে পুড়িয়ে মারার মামলা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা, *যুগান্তর*, ১৮ *জুন* ২০০৩

২১৯১. প্রেম করে বিয়ের 'অপরাধে' ৪০ হাজার টাকা চাঁদা চেয়েছে ছাত্রদল নেতা ঃ পালিয়ে বেড়াচ্ছে নতুন দম্পতি, *জনকণ্ঠ, ১৯ জুন ২০০৩*

২১৯২. বরগুনার আখড়াবাড়ী মন্দির ভাঙচুর, *আজকের কাগজ, ১৯ জুন ২০০৩*

২১৯৩. লালমনিরহাটে কিশোরী ধর্ষিত, *জনকণ্ঠ, ২০ জুন ২০০৩*

২১৯৪. মানিকগঞ্জে এক প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্র অপহরণের অভিযোগ, *জনকণ্ঠ, ২০ জুন ২০০৩*

২১৯৫. সংখ্যালঘু যুবক প্রেম করে বিয়ে করার অপরাধে, *জনকণ্ঠ, ২০ জুন ২০০৩*

২১৯৬. বাউফলে সংখ্যালঘু পরিবারের উপর হামলা, এলাকা ছাড়ার হুমকি, *জনকণ্ঠ, ২১ জুন ২০০৩*

২১৯৭. দৈত্যরাজের লাঠিয়াল বাহিনীর কাছে জিম্মি সবাই ঃ মিরসরাইয়ে বৌদ্ধদের ১ কোটি টাকার জায়গা দখলের পাঁয়তারা, *সংবাদ, ২১ জুন ২০০৩*

২১৯৮. চিকিৎসা অবহেলায় ডাক্তারের মৃত্যু ॥ রাজশাহী মেডিকেলে ইন্টার্নী ডাক্তার ধর্মঘট, *জনকণ্ঠ, ২২ জুন ২০০৩*

২১৯৯. চট্টগ্রামে কৈবল্যধাম আশ্রমে সেবায়েতদের মারপিট মালামাল লুট, *ভোরের কাগজ, ২৩ জুন ২০০৩*

২২০০. লোহাগড়ায় সন্ত্রাসীরা হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে জখম করেছে একজনকে, *আজকের কাগজ, ২৩ জুন ২০০৩*

২২০১. বাউফলে সংবাদকর্মী ঝর্না রায়ের পরিবার অবরুদ্ধ ॥ হত্যার হুমকি ঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা, *সংবাদ, ২৪ জুন ২০০৩*

২২০২. চাটমোহরে হেলতা নামের এক বৃদ্ধার বাড়ি দখল করে নিয়েছে সন্ত্রাসীরা, *আজকের কাগজ, ২৫ জুন ২০০৩*

২২০৩. জোরারগঞ্জ বাজারে সংখ্যালঘুদের জমি দখলের অভিযোগ, *ইত্তেফাক, ২৬ জুন ২০০৩*

২২০৪. স্কুল পরিচালনা কমিটি ও প্রধান শিক্ষকের কোপানল ঃ সাসপেন্ড হওয়া শিক্ষক রনজিৎ চন্দ্র ১৪ মাস ধরে জীবিকা ভাতা পাচ্ছেন না, *সংবাদ, ২৬ জুন ২০০৩*

২২০৫. দিগপাইতে ফতোয়ার শিকার সংখ্যালঘু মহিলা, *সংবাদ, ২৬ জুন ২০০৩*

২২০৬. শ্রীপুরে সন্ত্রাসীরা এক শিক্ষককে হুমকি দিয়েছে, *আজকের কাগজ, ২৬ জুন ২০০৩*

২২০৭. চাটমোহরে হিন্দু বিধবার বাড়ি দখল, ফরিদগঞ্জে হামলা, *প্রথম আলো, ২৬ জুন ২০০৩*

২২০৮. অবশেষে রঞ্জিতের বাবার আশঙ্কাই সত্য হলো!, *জনকণ্ঠ, ২৬ জুন ২০০৩*

২২০৯. রায়গঞ্জে ধর্ষিতার বিরুদ্ধে পাল্টা অপহরণ মামলা, *ইত্তেফাক, ২৭ জুন ২০০৩*

২২১০. ত্রিশালে জায়গা দখল করে ঘর নির্মাণ, ৩ জনকে কুপিয়ে জখম, *প্রথম আলো, ২৮ জুন ২০০৩*

২২১১. ভূরুঙ্গামারীতে সংখ্যালঘু পরিবারের জমি দখল ভারত পাঠানোর হুমকি ঃ ইউএনওকে জানিয়েও লাভ হয়নি, *সংবাদ, ২৮ জুন ২০০৩*

২২১২. ত্রিশালে সংখ্যালঘু পরিবারের জমি দখলের চেষ্টা ॥ হামলায় ৩ জন আহত, *ইত্তফাক, ২৮ জুন ২০০৩*

২২১৩. নির্বাচনী প্রহসন থেকে সংখ্যালঘুদের বাঁচান, *আজকের কাগজ, ২৮ জুন ২০০৩*

২২১৪. চাটমোহরে সংখ্যালঘু বিধবাকে উচ্ছেদ করে বসত-বাড়ি দখল ॥ গ্রেফতার ১, *সংবাদ, ২৮ জুন ২০০৩*

২২১৫. নওগাঁয় এক মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে ভিটাছাড়া করার পাঁয়তারা, *জনকণ্ঠ, ২৯ জুন ২০০৩*

২২১৬. সাতক্ষীরায় ৫০ সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা ঃ আহত ১৫, ভাঙচুর, চিংড়ি ঘেরে লুটপাট, *ভোরের কাগজ, ২৯ জুন ২০০৩*

২২১৭. বানারীপাড়ায় সংখ্যালঘুদের বাড়িতে ডাকাতি ঃ আহত ২, *যুগান্তর, ৩০ জুন ২০০৩*

২২১৮. চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় মানিকগঞ্জে স্বর্ণ ব্যবসায়ীর বাড়িতে ছাত্রদল ক্যাডার সুমন বাহিনীর হামলা, *জনকণ্ঠ, ৩০ জুন ২০০৩*

২২১৯. শিবিরকর্মীর নেতৃত্বে জলঢাকার সংখ্যালঘু ছাত্রীকে অপহরণ, *সংবাদ, ৩০ জুন ২০০৩*

জুলাই ২০০৩

২২২০. তানোরে খ্রিস্টানপল্লীতে হামলা ঃ উত্তেজনা নিরসনে পুলিশ মোতায়েন, *প্রথম আলো, ১ জুলাই ২০০৩*

২২২১. বানারীপাড়া স্বরূপকাঠি ঝালকাঠি সদরের পাঁচ গ্রামের সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার ঃ অনেকে এলাকাছাড়া, *যুগান্তর, ২ জুলাই ২০০৩*

২২২২. সুজানগরে চর্মকার খুন, *ইত্তেফাক, ৩ জুলাই ২০০৩*

২২২৩. ধামরাইয়ে প্রাচীন কালী মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর, *প্রথম আলো, ৩ জুলাই ২০০৩*

২২২৪. রাজশাহীতে সংখ্যালঘু পরিবারকে ভিটামাটি ছাড়তে ওয়ার্ড কমিশনারের লোকজনের হুমকি, *জনকণ্ঠ, ৩ জুলাই ২০০৩*

২২২৫. সংখ্যালঘু মহিলাকে গণধর্ষণ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তোলপাড় ঃ ছাত্রদলের ৬ কর্মীর বিরুদ্ধে পিটিশন দায়ের, *ভোরের কাগজ, ৩ জুলাই ২০০৩*

২২২৬. কুমারখালীতে মুক্তিপণের দাবিতে যুবক অপহরণ, *ইত্তেফাক, ৪ জুলাই ২০০৩*

২২২৭. মিরসরাইয়ে বৌদ্ধদের ১৬টি দোকানের ভাড়া আজকের মধ্যে দৈত্যরাজের অ্যাকাউন্টে জমা দেয়ার নির্দেশ ঃ নইলে দোকানে তালা, *সংবাদ, ৫ জুলাই ২০০৩*

২২২৮. জলঢাকায় সংখ্যালঘু স্কুলছাত্রী অপহরণ ঘটনায় মামলা ঃ শিবিরকর্মী ও অপহৃতা পুলিশ হেফাজতে, *সংবাদ, ৫ জুলাই ২০০৩*

২২২৯. কথিত সর্বহারা পার্টির অত্যাচার-নির্যাতনে অনেক সংখ্যালঘু পরিবার এলাকাছাড়া ঃ দাবিকৃত টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে পরিবারের মহিলা বা তরুণী দাবি, *সংবাদ, ৫ জুলাই ২০০৩*

২২৩০. অষ্টগ্রামে সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য ঃ সংখ্যালঘুদের দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য হুমকি অব্যাহত, *সংবাদ, ৫ জুলাই ২০০৩*

২২৩১. কুলাউড়ায় ৩ আদিবাসী অপহৃত ঃ পানজুম দখল, *যুগান্তর, ৫ জুলাই ২০০৩*

২২৩২. ধর্ষিতা সংখ্যালঘুর বিবস্ত্র ছবি তোলায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তোলপাড়, *জনকণ্ঠ, ৫ জুলাই ২০০৩*

২২৩৩. চলনবিল এলাকায় আদিবাসী সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন ঃ জমিজমা, বাড়িঘর দখল ও ডাকাতির ঘটনায় মানুষ আতঙ্কে, *ভোরের কাগজ, ৫ জুলাই ২০০৩*

২২৩৪. হাট হাজারীতে ব্যবসায়ী অজিত হত্যার দায় স্বীকার করেছে ছাত্রদল ক্যাডার মইন্যা, *জনকণ্ঠ, ৬ জুলাই ২০০৩*

২২৩৫. বাগেরহাটে ছবিরাণী নির্যাতন মামলার আরও এক আসামী গ্রেফতার, *জনকণ্ঠ, ৬ জুলাই ২০০৩*

২২৩৬. সাতক্ষীরায় সংখ্যালঘুর বাড়ি ভাঙচুর করে খেলার মাঠ দখল, হামলায় আহত ৭, *প্রথম আলো, ৭ জুলাই ২০০৩*

২২৩৭. সাতক্ষীরায় চার সংখ্যালঘু গৃহবধূকে মারধর, বাড়ি জমি দখল মাগুরায় ৩ জনকে হাতুড়িপেটা, *জনকণ্ঠ, ৭ জুলাই ২০০৩*

২২৩৮. বরগুনায় বেতাগী উপজেলা বিএনপি সভাপতি কর্তৃক সংখ্যালঘুর বাড়ি দখলের অভিযোগ, *আজকের কাগজ, ৭ জুলাই ২০০৩*

২২৩৯. ১৫ দিনে অন্তত ২৫টি বাড়িতে হানা, লুটপাট ঃ বরিশালের পেয়ারা বাগান এলাকার সংখ্যালঘুদের মাঝে ডাকাত আতঙ্ক, *ভোরের কাগজ, ৭ জুলাই ২০০৩*

২২৪০. মাগুরায় চাঁদা না পেয়ে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে কৃষককে জখম, *প্রথম আলো, ৮ জুলাই ২০০৩*

২২৪১. সাতক্ষীরায় সংখ্যালঘুর বাড়ি ও মন্দির ভাংচুর ঃ দুই গৃহবধূর ওপর পাশবিক নির্যাতন ঃ বেতাগীতে বৈঠকখানা ভেঙে পাকা ভবন নির্মাণ, *যুগান্তর, ৮ জুলাই ২০০৩*

২২৪২. কুলাউড়ায় আদিবাসীর গির্জা দখলের চেষ্টার অভিযোগ, *ভোরের কাগজ, ৮ জুলাই ২০০৩*

২২৪৩. ৫ হিন্দু পরিবার উচ্ছেদ, মন্দির ভাঙচুর ঃ কালিগঞ্জের তারালি এখনো থমথমে, কেউ গ্রেপ্তার হয়নি, *ভোরের কাগজ, ৮ জুলাই ২০০৩*

২২৪৪. চার সংখ্যালঘু পরিবারের বসতঘর নিশ্চিহ্ন ॥ ধর্মের বাবা ডেকেও রেহাই পায়নি গৃহবধূ ঃ সাতক্ষীরায় সন্ত্রাসীদের মধ্যরাতের তাণ্ডব, *জনকণ্ঠ, ৮ জুলাই ২০০৩*

২২৪৫. আখাউড়ায় মধ্যরাতে ৩টি মন্দিরে হামলা, মূর্তি ভাঙচুর, *প্রথম আলো, ৯ জুলাই ২০০৩*

২২৪৬. চাঁপাইনবাবগঞ্জে এক সরকারি কর্মকর্তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ ১৫টি সংখ্যালঘু পরিবার, *সংবাদ, ৯ জুলাই ২০০৩*

২২৪৭. আখাউড়ায় তিনটি বাড়িতে প্রতিমা ভাঙচুর, *সংবাদ, ৯ জুলাই ২০০৩*

২২৪৮. সাতক্ষীরার কালীগঞ্জে এবার বাড়িঘর ও পূজামণ্ডপ দখল করে খেলার মাঠ বানিয়েছে জোট সন্ত্রাসীরা, *সংবাদ, ৯ জুলাই ২০০৩*

২২৪৯. সাতক্ষীরায় গৃহবধূ ধর্ষণ ও নির্যাতনের ঘটনায় প্রশাসনে তোলপাড় ॥ পুলিশের মামলাগ্রহণ না করা রহস্যজনক, *জনকণ্ঠ, ৯ জুলাই ২০০৩*

২২৫০. মোরেলগঞ্জে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বীভৎস কাহিনী—চাঁদাবাজি শ্লীলতাহানি নিত্যঘটনা, *জনকণ্ঠ, ১০ জুলাই ২০০৩*

২২৫১. মোরেলগঞ্জের ২শ' সংখ্যালঘু পরিবার দেশ ছেড়ে চলে যেতে চায়, *যুগান্তর, ১০ জুলাই ২০০৩*

২২৫২. কালীগঞ্জে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর বর্বর নির্যাতন ঃ পুলিশ কর্মকর্তা ও সাংবাদিকদের ঘটনাস্থল পরিদর্শন ॥ লোমহর্ষক তথ্য প্রকাশ ঃ বাবা বলে পা ধরেও রেহাই পাননি রাধা রানী সরকার, *সংবাদ, ১০ জুলাই ২০০৩*

২২৫৩. আশাশুনিতে ৫ সংখ্যালঘু বাড়িতে ডাকাতি, *সংবাদ, ১০ জুলাই ২০০৩*

২২৫৪. মাইজদীকোর্টে সংখ্যালঘুর ১০ কোটি টাকার সম্পত্তি দখল, *জনকণ্ঠ, ১১ জুলাই ২০০৩*

২২৫৫. দুমকীতে একটি প্রভাবশালী মহলের তৎপরতা ঃ রায়পুকুরটি কৌশলে দখল ॥ ৩টি সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদের চেষ্টা, *সংবাদ, ১১ জুলাই ২০০৩*

২২৫৬. নোয়াখালীতে সংখ্যালঘুর বাড়ি দখল ॥ জনমনে নানা প্রশ্ন, *সংবাদ, ১১ জুলাই ২০০৩*

২২৫৭. সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ ঃ সন্ত্রাসীদের নির্যাতনে দেশ ত্যাগে বাধ্য হচ্ছে বাগেরহাটের সংখ্যালঘুরা, *ভোরের কাগজ, ১২ জুলাই ২০০৩*

২২৫৮. নোয়াখালীতে সংখ্যালঘুর বাড়ি দখল করেছে বিএনপি নেতারা, *ভোরের কাগজ, ১২ জুলাই ২০০৩*

২২৫৯. সংখ্যালঘু নির্যাতনের ৩৫টি অভিযোগ, *ইত্তেফাক, ১৫ জুলাই ২০০৩*

২২৬০. উপজাতীয় চেয়ারম্যান রুই প্রুকে পাঁচ দিনেও উদ্ধার করা গেলনা, *জনকণ্ঠ, ১৪ জুলাই ২০০৩*

২২৬১. আত্রাইয়ের সংখ্যালঘুরা সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি, *জনকণ্ঠ, ১৫ জুলাই ২০০৩*

২২৬২. বালিয়াকান্দিতে সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা ॥ ৩ জনকে কুপিয়ে আহত, *সংবাদ, ১৬ জুলাই ২০০৩*

২২৬৩. রূপগঞ্জের কাঞ্চনে ২শ' সংখ্যালঘু পরিবার সন্ত্রাসী লিটনের হাতে জিম্মি ঃ প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বস্ত্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা, *সংবাদ, ১৬ জুলাই ২০০৩*

২২৬৪. নাজিরপুরে সংখ্যালঘু গৃহবধূকে গণধর্ষণ ॥ থানা মামলা নেয়নি, *সংবাদ, ১৭ জুলাই ২০০৩*

২২৬৫. ঝিনাইদহে সন্ত্রাসীদের লাখ টাকা চাঁদা দাবি ঃ বাড়ি কিনেও উঠতে পারছেন না শচীন, *প্রথম আলো, ১৭ জুলাই ২০০৩*

২২৬৬. কালীমন্দির থেকে দুলাখ টাকার স্বর্ণালংকার চুরি, *সংবাদ, ১৮ জুলাই ২০০৩*

২২৬৭. বাহ্মণবাড়িয়ায় এক সংখ্যালঘুকে খুন করে ঘরেই মাটিচাপা ঃ ৪ জন গ্রেফতার, *যুগান্তর, ১৯ জুলাই ২০০৩*

২২৬৮. জগন্নাথপুরে এক পরিবারকে হয়রানির অভিযোগ, *যুগান্তর, ১৯ জুলাই ২০০৩*

২২৬৯. স্বরূপকাঠিতে ডাকাতি ঃ নগদ টাকাসহ মূল্যবান জিনিসপত্র নেয়া ছাড়াও মহিলাদের ওপর চালানো হয়েছে পাশবিক নির্যাতন, *সংবাদ, ১৯ জুলাই ২০০৩*

২২৭০. সূত্রাপুরে ছাত্রকে কুপিয়ে হত্যা করেছে বোরখাপরা খুনীরা, *ইত্তেফাক, ২০ জুলাই ২০০৩*

২২৭১. সাতক্ষীরায় মাকে বেঁধে রেখে মেয়েকে অপহরণ, *জনকণ্ঠ, ২০ জুলাই ২০০৩*

২২৭২. গোদাগাড়ীতে আদিবাসীকে নির্যাতন করে হত্যার অভিযোগ, *সংবাদ, ২২ জুলাই ২০০৩*

২২৭৩. শেরপুরের এক ব্যবসায়ী পরিবারকে হয়রানির অভিযোগ, *জনকণ্ঠ, ২২ জুলাই ২০০৩*

২২৭৪. মন্দিরে-মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুর হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে আতঙ্ক, *সংবাদ, ২৩ জুলাই ২০০৩*

২২৭৫. বাঙালি দখলদারদের দাপটে খাসিয়ারা বাস্তুচ্যুত হচ্ছে ঃ মিথ্যা মামলার ভয়ে ফেরারি কুলাউড়ার ৪৫ পরিবার, *প্রথম আলো, ২৩ জুলাই ২০০৩*

২২৭৬. মাগুরার নির্যাতিত ২৬টি হিন্দু পরিবার ঃ চাঁদার দাবিতে চরমপন্থীদের হামলা, মারধর, *ভোরের কাগজ, ২৩ জুলাই ২০০৩*

২২৭৭. দখল হতে বসেছে খাসিয়া পাহাড়ের গির্জা স্কুল হাসপাতাল ঃ ২৫ হাজার আদিবাসী উচ্ছেদ আতঙ্কে, *ভোরের কাগজ, ২৪ জুলাই ২০০৩*

২২৭৮. নড়াইলের রায়খালীগ্রামের ঘটনা, বিয়ের ৩ দিন পর গৃহবধূ খুন, *সংবাদ, ২৫ জুলাই ২০০৩*

২২৭৯. কামারচারার ঘটনা, ২৯টি আদিবাসী পরিবার উচ্ছেদের জন্য পুলিশি তৎপরতা শুরু, *সংবাদ, ২৫ জুলাই ২০০৩*

২২৮০. প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় উত্তাল, *সংবাদ, ২৫ জুলাই ২০০৩*

২২৮১. বাগেরহাটে হিন্দু পরিবারের ওপর হামলায় মা-মেয়েসহ আহত ৫, পুলিশ আইনগত ব্যবস্থা না নিয়ে মীমাংসার পরামর্শ দিয়েছে, *ভোরের কাগজ, ২৬ জুলাই ২০০৩*

২২৮২. গলাচিপায় সংখ্যালঘু তরুণী ধর্ষণের শিকার ॥ দু'সপ্তাহ ধরে বাবা-মেয়ে নিখোঁজ ॥ স্থানীয় বিএনপি নেতা জড়িত, *সংবাদ, ২৭ জুলাই ২০০৩*

২২৮৩. খাগড়াছড়িতে অপহৃত শিক্ষকের সন্ধান মেলেনি, আটক-১, *সংবাদ, ২৮ জুলাই ২০০৩*

২২৮৪. সরজমিন আদিবাসী পল্লী শ্যামপুর বনবিভাগ যেভাবে দখল করেছে আদিবাসী মঙ্গল মুর্মুর জমিজমা, *সংবাদ, ২৮ জুলাই ২০০৩*

২২৮৫. নিহত অনিলের লাশ পুঁতে রাখা হয়েছিল মাটির নিচে ॥ একমাত্র পুত্রকে হত্যা করেছে ভূমিখেকোরা বৃদ্ধ মা মনোমোহিনীর এখন কি হবে?, *ভোরের কাগজ, ৩০ জুলাই ২০০৩*

২২৮৬. কমলগঞ্জে আদিবাসীদের ওপর হামলা ঃ পুলিশ মামলা নেয়নি, *যুগান্তর, ৩১ জুলাই ২০০৩*

আগস্ট ২০০৩

২২৮৭. নাচোলে প্রতিপক্ষের হাতে আদিবাসী সাঁওতাল নিহত, *আজকের কাগজ, ১ আগস্ট ২০০৩*

২২৮৮. চুনারুঘাটের চা বাগান থেকে চা শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার, *আজকের কাগজ, ১ আগস্ট ২০০৩*

২২৮৯. আর কারো গঞ্জনা সইতে হবে না কিশোরী মিনতিকে, *প্রথম আলো, ১ আগস্ট ২০০৩*

২২৯০. বাগেরহাটে সংখ্যালঘু পরিবারের স্কুলছাত্রী অপহৃত ॥ থানা মামলা নেয়নি, *সংবাদ, ১ আগস্ট ২০০৩*

২২৯১. নীরব দর্শকের ভূমিকায় পুলিশঃ মামলা তুলে না নিলে ধর্ষিতাকে ফের ধর্ষণের হুমকি, *ভোরের কাগজ, ২ আগস্ট ২০০৩*

২২৯২. সাতক্ষীরায় ৩২ সংখ্যালঘু পরিবার উচ্ছেদ মামলা রাজনৈতিক চাপে প্রত্যাহার, *জনকণ্ঠ, ২ আগস্ট ২০০৩*

২২৯৩. পাহাড়ে ভূমি সমস্যা-১ ॥ পাহাড়িদের উদ্বাস্তু হওয়ার নেপথ্যে, *ভোরের কাগজ, ২ আগস্ট ২০০৩*

২২৯৪. জয়পুরহাটে দুর্ধর্ষ ডাকাতি, *সংবাদ, ৩ আগস্ট ২০০৩*

২২৯৫. রোববার মামলা প্রত্যাহার হলেও সাতক্ষীরায় ৩২টি ভূমিহীন হিন্দু পরিবার অসহায়, *ভোরের কাগজ, ৩ আগস্ট ২০০৩*

২২৯৬. পাহাড়ে ভূমি সমস্যা-২ ॥ আদিবাসীদের ভূমির অধিকার খর্ব হয় সেটেলার অভিবাসনে, *ভোরের কাগজ, ৩ আগস্ট ২০০৩*

২২৯৭. অর্পিত ও অশ্বিনী কুমার হলের ট্রাস্টির সম্পত্তি দখল করে বরিশালে বিএনপি অফিস হচ্ছে, *জনকণ্ঠ, ৪ আগস্ট ২০০৩*

২২৯৮. ত্রিশালে সংখ্যালঘু পরিবারে রাতে হামলা ॥ ১ মাসের মধ্যে ইন্ডিয়া চলে যেতে হুমকি, *সংবাদ, ৪ আগস্ট ২০০৩*

২২৯৯. বলির পাঁঠা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে উমেশ চন্দ্রকে ঃ বস্তাবন্দী লাশের সাথে ২ লাখ টাকা চাঁদা দাবির ঘটনায় জড়িত ৪ সন্ত্রাসীকে পুলিশ আটক করেছে, *সংবাদ, ৫ আগস্ট ২০০৩*

২৩০০. সাতক্ষীরায় মামলা তুলে নিতে ৪ হিন্দু পরিবারের লোকদের বেধড়ক পিটুনি, জনকণ্ঠ, ৫ আগস্ট ২০০৩

২৩০১. অশীতিপর রেনু বালা পালিয়ে থাকেন ঃ 'সই দে— নইলে মাইরা ফেলবো', ইনকিলাব, ৫ আগস্ট ২০০৩

২৩০২. মুন্সীগঞ্জে চাঁদার দাবিতে হিন্দু পরিবারের ওপর নির্যাতন, *ভোরের কাগজ, ৬ আগস্ট ২০০৩*

২৩০৩. এবার রাঙ্গুনিয়ায় ব্যবসায়ী অপহৃত, ৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবী, *জনকণ্ঠ, ৬ আগস্ট ২০০৩*

২৩০৪. জ্ঞানজ্যোতি হত্যা মামলা ॥ সাকা ক্যাডার আজিজুল সহ ৭ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট, *জনকণ্ঠ, ৭ আগস্ট ২০০৩*

২৩০৫. রায়পুরায় সিপিবি নেতা দিলীপ কর্মকার ১ মাস ধরে নিখোঁজ ॥ মামলা প্রত্যাহারের জন্য হুমকি, *সংবাদ, ৭ আগস্ট ২০০৩*

২৩০৬. মাদারীপুরে সংখ্যালঘু পরিবারের জমি দখল ১ সন্ত্রাসী গ্রেফতার, *সংবাদ, ৭ আগস্ট ২০০৩*

২৩০৭. ভাঙ্গায় শ্মশানের মন্দিরের মূর্তি ভাংচুর, *জনকণ্ঠ, ৮ আগস্ট ২০০৪*

২৩০৮. আদিবাসী যুবক-যুবতী অপহরণের ঘটনা রহস্যজনক, ইত্তেফাক, ৮ আগস্ট ২০০৩

২৩০৯. অভয়নগরে দুর্বৃত্তরা পূজা মণ্ডপের বাউন্ডারি ভেঙে দিয়েছে, আজকের কাগজ, ৮ আগস্ট ২০০৩

২৩১০. কালিগঞ্জের ৫ হিন্দু পরিবারকে ভারতে চলে যাওয়ার হুমকি, *ভোরের কাগজ, ৮ আগস্ট ২০০৩*

২৩১১. আদিবাসীরা কেমন আছেন, *যুগান্তর, ৯ আগস্ট ২০০৩*

২৩১২. পটিয়ায় ঘরে আগুন দিয়ে দুই যুবতীকে পুড়িয়ে হত্যা, *প্রথম আলো*, *৯ আগস্ট ২০০৩*

২৩১৩. গভীর রাতে দুর্বৃত্তদের তাণ্ডব ॥ নগরকান্দায় সাত সংখ্যালঘু পরিবার গ্রামছাড়া, জনকণ্ঠ, ৯ আগস্ট ২০০৩

২৩১৪. আদিবাসী নারীরা নানারকম নির্যাতনের শিকার, *প্রথাম আলো, ৯ আগস্ট ২০০৩*

২৩১৫. তদন্ত-জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই ফাইনাল রিপোর্ট দাখিল, *ভোরের কাগজ*, *৯ আগস্ট ২০০৩*

২৩১৬. ঠাকুর বাড়িতে গণধর্ষণ ও হত্যা মামলার চার্জশিটভুক্ত তিন আসামীর আত্মসমর্পণ, *জনকণ্ঠ, ১০ আগস্ট ২০০৩*

২৩১৭. ক্রমেই ভূমিহীন হয়ে পড়ছে মহালীপাড়ার আদিবাসীরা, *ভোরের কাগজ*, *১১ আগস্ট ২০০৩*

২৩১৮. বদরগঞ্জে সংখ্যালঘু পরিবারের বিয়ের অনুষ্ঠানে হামলা, *সংবাদ, ১১ আগস্ট ২০০৩*

২৩১৯. মুন্সীগঞ্জের সংখ্যালঘু এক জনপ্রতিনিধির দুর্দশার কথা, *জনকণ্ঠ, ১২ আগস্ট ২০০৩*

২৩২০. মিলাদে স্কুলের হিন্দু শিক্ষকরা যোগ না দেয়ায় তাণ্ডব, ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু বোরহানউদ্দিনের হাফিজ ইব্রাহীম কলেজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, *জনকণ্ঠ*, *১৩ আগস্ট ২০০৩*

২৩২১. মানিক ছড়ির পুরোহিত হত্যা মামলার প্রধান আসামী সফিক কুমিল্লায় গ্রেফতার, *জনকণ্ঠ, ১৩ আগস্ট ২০০৩*

২৩২২. কলাপাড়ার রাখাইন মন্দির থেকে ৪টি বৌদ্ধ মূর্তি চুরি, *সংবাদ, ১৩ আগস্ট ২০০৩*

২৩২৩. গৌরনদীতে সংখ্যালঘু দিনমজুর খুন, *ভোরের কাগজ, ১৪ আগস্ট ২০০৩*

২৩২৪. গ্রাম সরকার গঠন নীলফামারী স্টাইল ॥ বিএনপি-জামাত সমর্থকরা হামলা করেছে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর, *সংবাদ, ১৪ আগস্ট ২০০৩*

২৩২৫. আগৈলঝাড়ায় জবাই করে যুবক হত্যা, *যুগান্তর, ১৪ আগস্ট ২০০৩*

২৩২৬. বকশীগঞ্জে স্কুলছাত্রী গণধর্ষিত ঃ পাঁচ ধর্ষকের বিরুদ্ধে মামলা, *যুগান্তর*, *১৪ আগস্ট ২০০৩*

২৩২৭. মানিকছড়ির পুরোহিত মদন গোপাল হত্যা মিশনে নেতৃত্বে ছিল বিএনপি সন্ত্রাসী চোরা করিম, *জনকণ্ঠ, ১৫ আগস্ট ২০০৩*

২৩২৮. জমি বিক্রি করতে সম্মত না হওয়ায় গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার, *সংবাদ*, *১৫ আগস্ট ২০০৩*

২৩২৯. হবিগঞ্জে সংখ্যালঘু পরিবারের উপর পুলিশের তাণ্ডব, *জনকণ্ঠ, ১৬ আগস্ট ২০০৩*

২৩৩০. জামালপুরে আদিবাসী পল্লীতে মাকে বেঁধে রেখে মেয়েকে তুলে নিয়ে গণধর্ষণ, *ভোরের কাগজ, ১৭ আগস্ট ২০০৩*

২৩৩১. বগুড়ার শেরপুরে আদিবাসী মহিলা ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ১, *ইত্তেফাক, ১৭ আগস্ট ২০০৩*

২৩৩২. গৌরনদীতে সন্ত্রাসীদের ভয়ে ইউপি সদস্য এলাকা ছাড়া, *ইত্তেফাক*, *১৭ আগস্ট ২০০৩*

২৩৩৩. স্বরূপকাঠিতে হাসান বাহিনীর কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে ৫ গ্রামের মানুষ, *সংবাদ*, *১৭ আগস্ট ২০০৩*

২৩৩৪. চাঁদা গ্রহণকালে গ্রেপ্তার, *ইনকিলাব, ১৮ আগস্ট ২০০৩*

২৩৩৫. শেষ মুহূর্তের প্রচারে মাতোয়ারা সবাই, সংখ্যালঘু ভোটারদের হুমকি, *ভোরের কাগজ*, *১৯ আগস্ট ২০০৩*

২৩৩৬. ফরিদগঞ্জে কিশোরীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার, *আজকের কাগজ, ১৯ আগস্ট ২০০৩*

২৩৩৭. মদ না পেয়ে করিমগঞ্জে মুচি পল্লীতে হামলা ঃ শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পণ্ড, *যুগান্তর*, *১৯ আগস্ট ২০০৩*

২৩৩৮. চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে মামলা করায়, *জনকণ্ঠ, ১৯ আগস্ট ২০০৩*

২৩৩৯. কোর্ট চাঁদপুরে একজনকে জবাই করে হত্যা, *যুগান্তর, ২০ আগস্ট ২০০৩*

২৩৪০. আগৈলঝাড়ায় আশ্রম ও মন্দিরের জায়গা দখলের পাঁয়তারা, ভক্তদের বিক্ষোভ, *আজকের কাগজ, ২০ আগস্ট ২০০৩*

২৩৪১. নিখোঁজ হওয়ার ২ দিন পর ফুলবাড়ীর স্কুলছাত্রী অনিতার লাশ উদ্ধার, *ভোরের কাগজ, ২০ আগস্ট ২০০৩*

২৩৪২. জন্মাষ্টমীর পূর্বের রাতে চকোরিয়ার জেলেপাড়ায় হামলা ॥ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট, আহত ৫ ঃ স্থানীয় বিচারের ব্যবস্থা করেছে পুলিশ, *আজকের কাগজ*, *২০ আগস্ট ২০০৩*

২৩৪৩. বরিশালে সংখ্যালঘুর জমি দখল করে শ্রমিক দলের অফিস নির্মাণ, *আজকের কাগজ*, *২০ আগস্ট ২০০৩*

২৩৪৪. ফকিরহাটে ৮ সংখ্যালঘুর বাড়িতে গণডাকাতি, শ্লীলতাহানি ॥ আহত ৬, *জনকণ্ঠ*, *২০ আগস্ট ২০০৩*

২৩৪৫. রক্তমাখা চাপাতি ও গামছা উদ্ধার ১ ব্যক্তি গ্রেপ্তার, *প্রথম আলো, ২০ আগস্ট ২০০৩*

২৩৪৬. আটপাড়া-কেন্দুয়ায় সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের মহড়া ॥ সংখ্যালঘু এলাকায় মিষ্টি বিতরণ করে চলছে 'ব্লকভোট', *আজকের কাগজ, ২১ আগস্ট ২০০৩*

২৩৪৭. দুমকীর কয়েকটি হিন্দু পরিবারকে ভিটাবাড়ি থেকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা , প্রভাবশালীর দাপটে এলাকায় আতঙ্ক, *ভোরের কাগজ, ২১ আগস্ট ২০০৩*

২৩৪৮. বাঁশখালীতে আশ্রমে সন্ত্রাসী হামলা, পুরোহিতকে পিটিয়ে ১৫ হাজার টাকা লুট, *ভোরের কাগজ, ২১ আগস্ট ২০০৩*

২৩৪৯. বাগেরহাটে আট সংখ্যালঘু বাড়িতে ডাকাতি মা-মেয়েসহ ৩ মহিলার শ্লীলতাহানি, আহত ১৬, *সংবাদ, ২১ আগস্ট ২০০৩*

২৩৫০. মেয়ে লাঞ্ছিত হওয়ার বিচার চাওয়ায় ঃ বানারীপাড়ায় এক পিতার রহস্যজনক মৃত্যু, থানায় মামলা নিহতের স্ত্রীর দাবি তাকে হত্যা করা হয়েছে, *আজকের কাগজ*, *২২ আগস্ট ২০০৩*

২৩৫১. সরজমিন সুখারী ও দুওজ ইউনিয়ন ঃ সংখ্যালঘুদের হাতে ধানের শীষের নম্বর স্লিপ, *আজকের কাগজ, ২২ আগস্ট ২০০৩*

২৩৫২. সিরাজগঞ্জের দুই সংখ্যালঘু পরিবার পালিয়ে বেড়াচ্ছে ॥ জমি দখলের পর জীবননাশের হুমকি, *ভোরের কাগজ, ২২ আগস্ট ২০০৩*

২৩৫৩. শৈলকুপার গ্রামে মন্দিরের সাড়ে ৪ একর খাস জমি রেকর্ড করে নেয়ার পায়তারা, *জনকণ্ঠ, ২৩ আগস্ট, ২০০৩*

২৩৫৪. খুলনায় যৌথ অভিযান ॥ নিরীহ মানুষের ওপর নির্মম নির্যাতনের বিচারদাবী, *জনকণ্ঠ*, *২৩ আগস্ট ২০০৩*

২৩৫৫. জালালপুরের নিহত অনিলের মা-বোনের সংবাদ সম্মেলন ॥ জাল দলিল করে ১৮ বিঘা জমি আত্মসাৎ করার জন্য হত্যাকাণ্ড, *ভোরের কাগজ, ২৩ আগস্ট ২০০৩*

২৩৫৬. খুলনায় যৌথ অভিযান ॥ নিরীহ মানুষের ওপর নির্মম নির্যাতনের বিচার দাবি, *জনকণ্ঠ, ২৩ আগস্ট ২০০৩*

২৩৫৭. কালীগঞ্জে ৪ সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলার ঘটনায় ১৮ জনের নামে চার্জশিট, *সংবাদ, ২৪ আগস্ট ২০০৩*

২৩৫৮. শ্রীরামকাঠিতে সন্ত্রাসী লোকমানকে পিটিয়ে হত্যা, আরও একটি মামলা "হুমকির কারণে সংখ্যালঘুরা বাড়ি ফিরতে পারছে না", *সংবাদ, ২৪ আগস্ট ২০০৩*

২৩৫৯. ৬৫ জন নারী নির্যাতনের শিকার "জুলাই মাসে ৪২টি সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে", *ভোরের কাগজ, ২৪ আগস্ট ২০০৩*

২৩৬০. কালীগঞ্জের পল্লীতে প্রতিবন্ধী তরুণী ধর্ষণের শিকার হয়ে অন্তঃসত্ত্বা, ঘটনা ধামাচাপা দিতে জনৈক বিএনপি নেতা তৎপর, *সংবাদ, ২৫ আগস্ট ২০০৩*

২৩৬১. বকশীগঞ্জে গারো স্কুলছাত্রী ধর্ষিত "গ্রেফতার ২", *সংবাদ, ২৫ আগস্ট ২০০৩*

২৩৬২. মোরেলগঞ্জে বানীকান্তের খুনীরা মামলা তুলে নিতে বাদীকে হুমকি দিচ্ছে, *জনকণ্ঠ, ২৫ আগস্ট ২০০৩*

২৩৬৩. পীরগাছায় সংখ্যালঘুদের বাড়িতে হামলা, লুটপাট অগ্নিসংযোগ, আহত ২৫, *জনকণ্ঠ, ২৫ আগস্ট ২০০৪*

২৩৬৪. সন্ত্রাসীদের ভয়ে দু'সপ্তাহ ধরে শ্রীরামকাঠি ইউনিয়নের ৫ গ্রাম পুরুষশুন্য, *সংবাদ, ২৬ আগস্ট ২০০৩*

২৩৬৫. ফরিদপুরে যুবককে অপহরণের পর দুই পায়ে গুলি, *জনকণ্ঠ, ২৬ আগস্ট*, ২০০৩

২৩৬৬. কলেজ ছাত্রী অপহরণ মামলা, সাতক্ষীরায় আটক সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে চার্জশিট ॥ হয়রানির অভিযোগ, *জনকণ্ঠ, ২৬ আগস্ট ২০০৩*

২৩৬৭. বোরহানউদ্দিনে স্কুল শিক্ষক সুধাংশুর বাড়ি লুটের নেপথ্য কাহিনী, *সংবাদ*, ২৬ *আগস্ট* ২০০৩

২৩৬৮. মহালছড়িতে অপহরণের জের ॥ ২ গ্রামে ১২৫টি বাড়ি ও বৌদ্ধ মন্দিরে আগুন ॥ "নিহত ১", *ইত্তেফাক, ২৭ আগস্ট ২০০৩*

২৩৬৯. সাতক্ষীরায় ভারতে যাবার সময় সংখ্যালঘু পরিবারের ২৭ সদস্য আটক, *জনকণ্ঠ, ২৭ আগস্ট ২০০৩*

২৩৭০. পূর্ণিমা ধর্ষণ মামলায় বিবাদী পক্ষের শুনানি বারবার বিলম্বিত হচ্ছে, *ভোরের কাগজ, ২৮ আগস্ট ২০০৩*

২৩৭১. ঐক্যপরিষদের দাবি দিবস পালন ঃ সংখ্যালঘু নিপিড়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ প্রয়োজন, *প্রথম আলো, ২৯ আগস্ট ২০০৩*

২৩৭২. অপহরণের দায় চাপিয়ে সাতক্ষীরার ৪৫ হিন্দু পরিবারকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র, সাবেক পৌর কমিশনার চালাচ্ছেন নির্যাতন, *ভোরের কাগজ, ২৯ আগস্ট ২০০৩*

২৩৭৩. সাভার পৌরসভার নির্বাচন কাল, সংখ্যালঘু ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের হুমকি, *জনকণ্ঠ, ৩০ আগস্ট ২০০৩*

২৩৭৪. কালীগঞ্জে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা, *সংবাদ, ৩০ আগস্ট ২০০৩*

২৩৭৫. রূপগঞ্জে সংখ্যালঘু মহিলাকে ধর্ষণ ও টাকা লুট, *সংবাদ, ৩০ আগস্ট ২০০৩*

২৩৭৬. মামলা করতে জামায়াতীদের বাধা জলঢাকায় ধর্ষিতার পিতার আত্মহত্যার হুমকি, *জনকণ্ঠ, ৩০ আগস্ট ২০০৩*

২৩৭৭. ধামরাইয়ে ধর্ষণ মামলার আসামি ঘুরে বেড়ালেও গ্রেফতার হচ্ছেনা, *ভোরের কাগজ, ৩১ আগস্ট ২০০৩*

সেপ্টেম্বর- ২০০৩

২৩৭৮. নাটোরে এক রাতে ১২ সংখ্যালঘুর বাড়িতে ডাকাতি, *ভোরের কাগজ, ১সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৩৭৯. নগরীতে দুধর্ষ ডাকাতিঃ ৩ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট, *ভোরের কাগজ, ১সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৩৮০. চট্টগ্রামে দিনে-দুপুরে ডাকাতি, *প্রথম আলো, ১ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৩৮১. মোরেলগঞ্জের কয়েকটি গ্রামে চলছে মামা ভাগ্নের তাণ্ডব, *সংবাদ, ১ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৩৮২. নবাবগঞ্জে সংখ্যালঘু ঋষি সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন, ১'শ পরিবার উচ্ছেদের হুমকি, *আজকের কাগজ, ২ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৩৮৩. ঝিকরগাছায় মন্দিরের জমি দখল, "সেবায়েতকে হত্যার হুমকি", *জনকণ্ঠ*, ২ *সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৩৮৪. সাতক্ষীরায় প্রতিমা ভাংচুর, *জনকণ্ঠ*, ৩ *সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৩৮৫. মুকসুদপুরে নব বিবাহিত তরুণী অপহরণ "হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ", *ভোরের কাগজ, ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৩৮৬. মহালছড়ির পাহাড়ী গ্রামগুলোতে ২৬ আগস্ট চলেছে নির্মম বর্বরোচিত অত্যাচার; অগ্নিসংযোগ, হত্যা, ধর্ষণ, লুট কিছুই বাদ যায়নি, *জনকণ্ঠ, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৩৮৭. মহালছড়ির ঘটনাটি কেন ঘটানো হলো?, *জনকণ্ঠ, ৪ সেপ্টেম্বর* ২০০৩ ২০০৩

২৩৮৮. সাংবাদিকদের ক্যামেরা সব সিজ করো, *জনকণ্ঠ, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৩৮৯. মহালছড়ির ৯ পাহাড়ি গ্রাম বিরানভূমি, ৩৫০ পরিবার জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে, জেলা প্রশাসক বললেন পাহাড়িরা অসহায়, আমি নিরুপায়, *প্রথম আলো, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৩৯০. মহালছড়ির অসহায় মানুষ এখনও দুর্গম জঙ্গলে খোলা আকাশের নীচে মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়নি, *জনকণ্ঠ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৩৯১. বেড়ায় গৃহবধূর গলায় ছুরি ধরে মেয়ের বিয়ের জমানো টাকা স্বর্ণ লুট, *ইত্তেফাক, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৩৯২. জন্মভূমিতে কি থাকতে পারব না, প্রশ্ন পাহাড়িদের, *জনকণ্ঠ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৩৯৩. চিংড়াখালীর সংখ্যালঘু ও নিরীহ মানুষ এখনও শঙ্কিত, *জনকণ্ঠ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৩৯৪. খাগড়াছড়ির দীঘীনালা শরণার্থী ক্যাম্প ঃ প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসন এবং এক অরুণা চাকমার কাহিনী, *আজকের কাগজ, ৫ সেপ্টম্বর ২০০৩*

২৩৯৫. কাশিয়ানীতে প্রতিমা ভাংচুর থানায় মামলা দায়ের, *আজকের কাগজ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৩৯৬. সাতক্ষীরায় মেয়ে অপহরণকারীরা সংখ্যালঘু পরিবারকে হুমকি দিচ্ছে, পুলিশ বলছে মিমাংসা করে ফেলতে, *ভোরের কাগজ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৩৯৭. মহালছড়িতে সর্বত্র আতঙ্ক, শুন্য ভিটায় আগুন, লুটপাটের ছাপ, ধর্ষিতাদের কান্না থামছে না, *ভোরের কাগজ, ৫ সেপ্টম্বর ২০০৩*

২৩৯৮. রেশন পাহাড়ীরা পাচ্ছে না, সেটেলাররা পাচ্ছে, *জনকণ্ঠ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৩৯৯. মহালছড়িতে ভীতির সঙ্গে বসবাস, ঘর নেই, খাবার নেই, কোন জবাবও নেই, *জনকণ্ঠ, ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪০০. সিরাজগঞ্জে ধর্ষিতা আদিবাসী গৃহবধূকে মামলা করতে দেয়নি মাতব্বররা, ৪ ধর্ষকের ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, *ভোরের কাগজ, ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪০১. লজ্জায় মেয়ে ও বাবা নিঁখোজ বানারীপাড়া কলেজে সংখ্যালঘু ছাত্রীর সম্ভ্রমহানী করেছে ছাত্রদল ক্যাডার, *জনকণ্ঠ ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪০২. দিনাজপুরে অপহরণের ১৭ ঘন্টা পর শিশু উদ্ধার, *জনকণ্ঠ, ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪০৩. শর্শদীতে মন্দিরের প্রতিমা ভাংচুর, *জনকণ্ঠ, ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪০৪. ফরিদপুরে ডাকাতি, *জনকণ্ঠ, ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪০৫. খুলনার ফুলতলার পল্লীতে সশস্ত্র চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম, "সংখ্যালঘুরাই প্রধান টার্গেট", *জনকণ্ঠ, ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪০৬. ফকিরহাটে জোড়া খুন, *যুগান্তর, ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪০৭. শ্রীপুরে আদিবাসীদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা, গৃহবধূ আহত, *যুগান্তর, ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪০৮. ফেনীতে তিন মূর্তির মাথা গুড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা, *যুগান্তর, ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪০৯. লামার বিলছড়ি মাহামুনি বৌদ্ধ বিহার থেকে চুরি হওয়া ১৫০টি মুর্তি ১ সপ্তাহেও উদ্ধার হয়নি, *আজকের কাগজ, ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪১০. বেতাগীতে বিএনপি নেতাদের চাঁদা না দেয়ায় সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা, আহত ৫, *সংবাদ, ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪১১. সৈয়দপুরে সংখ্যালঘু এলাকায় হামলা, প্রতিমা ভাংচুর, *যুগান্তর, ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪১২. এমন প্রতাবশালী পক্ষটি কে?, *জনকণ্ঠ, ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪১৩. শ্রীপুরে আদিবাসীদের ওপর সন্ত্রাসী বাহিনীর হামলা, *জনকণ্ঠ, ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪১৪. মহালছড়ির হামলায় ক্ষতি ৩ কেটি টাকা ঃ ১৪ গ্রামের ৫০০ বাড়ি ভষ্মিভূত, ধর্ষিত ১০ জন, *ভোরের কাগজ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪১৫. জমি দখলে ব্যর্থ হয়ে বিধবার বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা, *ভোরের কাগজ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪১৬. বানারীপাড়ায় কলেজ ছাত্রী ধর্ষিত জড়িত ৪ ছাত্রদল ক্যাডার, *আজকের কাগজ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪১৭. মানিকগঞ্জে হামলার শিকার হয়ে মহিলা হাসপাতালে মামলার বাদীকে হুমকি, *সংবাদ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪১৮. চৌগাছায় হাতুড়িপেটা করে আওয়ামী লীগ নেতার হাত-পা ভেঙ্গে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা, *সংবাদ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪১৯. খুলনায় সংখ্যালঘুদের নির্যাতন ও হয়রানীর অভিযোগ, *সংবাদ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪২০. স্বর্ণালংকার ফেরত চাওয়ায় বালাগঞ্জের গোপালকে হত্যা, *প্রথম আলো, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪২১. মহালছড়ির ঘটনা দুঃখজনক ও হৃদয়বিদারক ঃ সংসদীয় কমিটির অভিমত, *যুগান্তর, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪২২. দিনাজপুরে আদিবাসী যুবককে পিটিয়ে হত্যা, *যুগান্তর, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪২৩. এ কোন্ অসভ্য বর্বরতা ॥ মহালছড়ির কান্না- কাকে বলব, কে করবে প্রতিকার, *জনকণ্ঠ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪২৪. প্রতিমা ভাঙচুরের নিন্দা, *সংবাদ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪২৫. পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি গ্রামে হামলা ঃ সর্বস্ব হারিয়ে আদিবাসীরা দিন কাটাচ্ছে আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তায়, *সংবাদ, ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪২৬. নির্বাচনোত্তর সংখ্যালঘু নির্যাতনের স্বীকৃতি ঃ নাবালিকা ধর্ষণের দায়ে দু'জনের যাবজ্জীবন, *সংবাদ, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪২৭. শ্রীপুরে আদিবাসী পরিবারে হামলা সন্ত্রাসীদের নির্যাতনে শ্রবণশক্তি হারিয়েছে অন্ত সত্ত্বা গৃহবধূ মিলন, *সংবাদ, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪২৮. পূর্বধলায় কালিমন্দির প্রাঙ্গণ দখল ও মিথ্যা মামলা, "সংখ্যালঘুরা আতঙ্কিত এ বছর দুর্গাপূজা না করার সিদ্ধান্ত, *সংবাদ, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪২৯. বাঁশখালীর গ্রামে বিধবার বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা, *সংবাদ, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪৩০. সরজমিন পরিদর্শন শেষে ১১ দলের ব্রিফিং ঃ মহালছড়িতে হামলায় ইন্ধন জুগিয়েছে বিএনপি-জামাত, *ভোরের কাগজ, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪৩১. রূমাতে উপ-জাতীয় মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ, *আজকের কাগজ, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪৩২. পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি গ্রামে হামলা ঃ সর্বস্ব হারিয়ে আদিবাসীরা দিন কাটাচ্ছে আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তায়, *১২ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪৩৩. পূর্বধলায় স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার দায়ে আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জশিট, *সংবাদ, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪৩৪. হালুয়া ঘাটায় আদিবাসী তরুণী ধর্ষণের শিকার গ্রেপ্তার-১, *সংবাদ, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪৩৫. পাহাড়ের পরিস্থিতি এখন বিস্ফোরণোমুখ ঃ মহালছড়ির ঘটনার জন্য ৯ নম্বর আর্মড ৬ ব্যাটালিয়ন ও জেলা প্রশাসকের নির্লিপ্ততা দায়ী ঃ সরকারি রিপোর্ট, *যুগান্তর, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪৩৬. জামালগঞ্জে সন্ত্রাসীরা পারিবারিক শ্মশান দখলের পায়তারা করছে, *ভোরের কাগজ, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪৩৭. শিবচরে পূজামণ্ডপে হামলা, প্রতিমা ভাংচুর, *ভোরের কাগজ, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪৩৮. নবীগঞ্জে শ্মশানঘাট দখলের পাঁয়তারা, *ভোরের কাগজ, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪৩৯. ঠাকুরগাঁয়ে গৃহবধূকে ধর্ষণের পর চক্ষু উৎপাটন, *ভোরের কাগজ*, *১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৪০. ফুলবাড়িতে নিখোজ গৃহবধূর লাশ উদ্ধার, আটক ৫, *আজকের কাগজ*, *১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৪১. শিবচরে দুর্গাপূজার ৬টি মূর্তি ভাংচুর, *আজকের কাগজ*, *১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৪২. অপহরণের ১১ দিন পরও শ্রীমঙ্গলের সম্পাকে উদ্ধার করা যায়নি, *যুগান্তর*, *১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৪৩. গাইবান্ধায় প্রতিমা ভাংচুর "যুবক আটক", *জনকণ্ঠ*, *১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৪৪. বেড়ায় গলায় ছুরি ঠেকিয়ে গৃহবধূর সর্বস্ব লুট, *সংবাদ*, *১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৪৫. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী বঙ্গবন্ধুকে আশ্রয়দাতা উখিয়ার সেই উপজাতি পরিবারটি এখন ভিটাছাড়া, *জনকণ্ঠ*, *১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৪৬. আগৈলঝাড়ায় খ্রীস্টান মহিলা ধর্ষণ, "ধর্ষককে আটক করেও ছেড়ে দেয়া হয়েছে", *জনকণ্ঠ*, *১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৪৭. ধর্মোন্মাদের মাইকিং, *প্রথম আলো*, *১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৪৮. পাবনায় মইকিং গ্রেফতার-১ "দুর্গা পূজা করলে হত্যা" হিন্দুদের মুসলমান হওয়ার নির্দেশ, *সংবাদ*, *১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৪৯. পাহাড়ি বাঙালি বিরোধ জিইয়ে রাখতে তৎপর একটি মহল, রূপন মহাজনের ভাগ্যে কি ঘটেছে?, *ভোরের কাগজ*, *১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৫০. ৪৫টি সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে আগস্টে, *ভোরের কাগজ*, *১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৫১. কলাপাড়ায় বৌদ্ধ বিহারের জমি দখল, নির্মাণ করা হচ্ছে বিএনপি অফিস, *সংবাদ*, *১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৫২. আগৈলঝাড়ার গ্রামে তিন সন্তানের জননী ধর্ষিত, *সংবাদ*, *১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৫৩. পাবনায় সংখ্যালঘুর বাড়িতে সশস্ত্র হামলা, *যুগান্তর*, *১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৫৪. পাবনায় চাঁদা না পেয়ে সংখ্যালঘুর পরিবারে ভাংচুর, লুটপাট, *জনকণ্ঠ*, *১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৫৫. সোনাতলার হাটকরমজা গ্রামে মন্দিরে হামলা, প্রতিমা ভাংচুর, গ্রেফতার ২, *ইত্তেফাক*, *১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৫৬. ধামরাইয়ে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসী হামলা, "মহিলাসহ আহত ৬", *জনকণ্ঠ*, *১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৫৭. বগুড়ায় প্রতিমা ভাংচুর, পুনরায় আয়োজন না করার জন্য হুমকি, ওসির ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে অভিযোগ অস্বীকার, *ভোরের কাগজ*, *১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৫৮. আড়াইহাজারে দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর, *যুগান্তর*, *১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৫৯. তিন সংখ্যালঘুর বাড়িতে ডাকাতি, *যুগান্তর*, *১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৬০. ঝিনাইদহে চিকিৎসককে চেম্বারে ঢুকে হত্যা, *ভোরের কাগজ*, *১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৬১. ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগ নেতা অশীতিপর ডাঃ মুখার্জীকে কুপিয়ে হত্যা, *যুগান্তর*, *১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৬২. জুম চাষীদের এখন দুর্দিন, *যুগান্তর*, *২০ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৬৩. মুন্সিগঞ্জে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে কলেজ শিক্ষকের পদত্যাগপত্র আদায় করেছে বিএনপির ক্যাডাররা, *সংবাদ*, *২০ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৬৪. বরিশালে দুই সংখ্যালঘুকে পুড়িয়ে হত্যার মামলাও রাজনৈতিক হয়রানী, *জনকণ্ঠ*, *২১ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৬৫. রাজশাহীর আদিবাসী পল্লীতে হামলা ও ভাংচুর, *প্রথম আলো*, *২১ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৬৬. ত্রিশালে সন্ত্রাসী সুরুজ বাহিনীর দৌরাত্ম্য ঃ কবি সুশীল কুমারের পরিবারটি নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছে, *সংবাদ*, *২২ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৬৭. দেড়বছরে ৭০টি বুদ্ধমূর্তি চুরির ঘটনা ঃ রাখাইনদের ধর্মীয় আচার পালন বিঘ্নিত, পুলিশি টহল এবং মন্দির মেরামতের দাবি, *ভোরের কাগজ*, *২২ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৬৮. জামালপুরে সংখ্যালঘু ঋষিপরিবারের ওপর সন্ত্রাসীদের নির্যাতন, *আজকের কাগজ*, *২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৬৯. বাউফলে স্কুলছাত্রীকে কথিত অপহরণের ঘটনা ঃ দুটি সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা চলছে, ২৩ *সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৭০. চাঁপাই নবাবগঞ্জে দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর, *জনকণ্ঠ*, *২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৭১. শিবগঞ্জে প্রতিমা ভাংচুর, *যুগান্তর*, *২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৭২. সিদ্ধিরগঞ্জে চাঁদার দাবিতে পূজা উদযাপন কমিটির নেতাকে অপহরণ, *যুগান্তর*, *২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৭৩. বোনকে উত্যক্ত করতে বাঁধা দেওয়ায় সন্ত্রাসীরা ভাইয়ের চোখ উপড়ে ফেলেছে, *ভোরের কাগজ*, *২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৭৪. শিবগঞ্জে দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর ঃ "মাদ্রাসা ছাত্র গ্রেফতার", *ইত্তেফাক*, *২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৭৫. চাঁপাই নবাবগঞ্জে মন্দিরের প্রতিমা ভাংচুর, *ভোরের কাগজ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৭৬. ছয় মাস পর লাশ উত্তোলন ঃ হত্যার ঘটনা চাপা দিতে হিন্দু যুবককে দাফন মুসলমান হিসেবে, *জনকণ্ঠ*, *২৬ সেপ্টম্বর ২০০৩*
২৪৭৭. হবিগঞ্জে সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা, আহত ৪, পূজামণ্ডপ ভাংচুর, *জনকণ্ঠ*, *২৬ সেপ্টম্বর ২০০৩*
২৪৭৮. আদিতমারিতে প্রতিমা ভাংচুর, *সংবাদ*, ২৬ *সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৭৯. রণীশংকৈলে আদিবাসী গৃহবধূকে ধর্ষণের পর হত্যা, *যুগান্তর*, ২৬ *সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৮০. মাহিগঞ্জে এক রাতে তিন স্বর্ণের দোকানে ডাকাতি, *যুগান্তর*, *২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৮১. পাহাড়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঃ টেস্ট কেস মহালছড়ি?, *ভোরের কাগজ*, *২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৮২. গগন পাল হত্যা রহস্য যেভাবে উদঘাটিত হলো, *জনকণ্ঠ*, *২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৮৩. সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা, হবিগঞ্জ প্রশাসনের তোলপাড়, গ্রেফতার ২, *জনকণ্ঠ*, *২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৮৪. কুড়িগ্রামে সংখ্যালঘু পরিবারের গাছ কেটে নিয়েছে সন্ত্রাসীরা, দেশ ছাড়ার হুমকি, *জনকণ্ঠ*, *২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৮৫. শেরপুরে আবার তিনবাড়িতে ডাকাতি, লাখ টাকার মাল লুট, *ভোরের কাগজ*, *২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩*
২৪৮৬. নরসিংদী ও নড়াইলে প্রতিমা ভাংচুর, *সংবাদ*, *২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪৮৭. নান্দাইলে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা, *আজকের কাগজ*, *২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪৮৮. পলাশের পূজা মণ্ডপে ৪টি মূর্তি ভাংচুর, *ইত্তেফাক*, *২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪৮৯. বগুড়ার শেরপুরে আবারও গণডাকাতি, লক্ষাধিক টাকার মাল লুট, *জনকণ্ঠ*, *২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪৯০. বিভিন্নভাবে বেদখল হচ্ছে উত্তরাঞ্চলের আদিবাসী-সম্প্রদায়ের জায়গা-জমি, *সংবাদ*, *২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪৯১. সোনারগাঁওয়ে দুর্গোৎসবের প্রতিমা বিসর্জনের জায়গা দখল, *ভোরের কাগজ*, *২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

২৪৯২. সন্দীপে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের হাতে সংখ্যালঘু কিশোরী গণধর্ষিত, *ভোরের কাগজ*, *৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৩*

অক্টোবর ২০০৩

২৪৯৩. গাইবান্ধা পটুয়াখালী, নওগাঁ খাগড়াছড়িতে প্রতিমা ভাংচুর, ক্ষোভ, *জনকণ্ঠ*, *১ অক্টোবর ২০০৩*

২৪৯৪. হবিগঞ্জে সংখ্যালঘু পরিবারে হামলার খবর ধামাচাপা দিতে ডিসির ব্যর্থ চেষ্টা, *জনকণ্ঠ*, *১ অক্টোবর ২০০৩*

২৪৯৫. প্রতিমা ভাংচুর, মন্দিরে হামলা, উত্তরাঞ্চলে সংখ্যালঘুরা আতঙ্কে, *সংবাদ*, *১ অক্টোবর ২০০৩*

২৪৯৬. রানী শংকৈলে ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে দুর্বৃত্তরা হত্যা করেছে নববধূ বিউটি সরেনকে, *সংবাদ*, *১ অক্টোবর ২০০৩*

২৪৯৭. পাবনায় উড়োচিঠি ॥ দুর্গাপুজা না করার নির্দেশ, জয়কালী মন্দির বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার হুমকি, *জনকণ্ঠ ২ অক্টোবর ২০০৩*

২৪৯৮. নাসিরনগরে দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর, *জনকণ্ঠ*, *২ অক্টোবর ২০০৩*

২৪৯৯. গাইবান্ধায় দুর্গা প্রতিমা গুড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা, পুজা বন্ধ, *সংবাদ*, *৩ অক্টোবর ২০০৩*

২৫০০. ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার নবীনগরে পূজামণ্ডপে অগ্নিসংযোগ, হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্ক, *প্রথম আলো*, *৩ অক্টোবর ২০০৩*

২৫০১. চাটমোহরে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নেতাকে নানাভাবে হুমকি, *জনকণ্ঠ*, *৪ অক্টোবর ২০০৩*

২৫০২. পুনরায় হামলা আশঙ্কায় কুলাউড়ায় খাসিয়া আদিবাসীরা শঙ্কিত, *আজকের কাগজ ৪ অক্টোবর ২০০৩*

২৫০৩. কেন্দুয়ায় প্রতিমা ভাংচুর, *ইত্তেফাক ৫ অক্টোবর ২০০৩*

২৫০৪. সাতকানিয়ার অপহৃত চিকিৎসকের হদিস পায়নি পুলিশ, *জনকণ্ঠ*, *৫ অক্টোবর ২০০৩*

২৫০৫. হবিগঞ্জে পূজার আরতিতে নাচতে না দেয়ায় সংখ্যালঘুর বাড়ীতে হামলা ॥ আহত ৫, *জনকণ্ঠ*, *৬ অক্টোবর ২০০৩*

২৫০৬. ঢাকেশ্বরী মন্দির এলাকায় বহনের সময় বোমা বিস্ফোরণ, *সংবাদ*, *৬ অক্টোবর ২০০৩*

২৫০৭. কাপাসিয়ায় পূজামণ্ডপে হামলা ভাংচুর, প্রসাদ ছিনতাই, *আজকের কাগজ*, *৬ অক্টোবর ২০০৩*

২৫০৮. পূজামণ্ডপে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা, খুলনায় অস্ত্রসহ ৪ জন গ্রেফতার, *ভোরের কাগজ*, *৬ অক্টোবর ২০০৩*

২৫০৯. কলাপাড়ায় রাখাইনদের আতঙ্ক এখনও কাটেনি ঃ মন্দিরের জমিতে বিএনপি অফিসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, *জনকণ্ঠ*, *৭ অক্টোবর ২০০৩*

২৫১০. মাগুরায় প্রতিমা বিসর্জন ॥ তরুণী লাঞ্ছিত করার চেষ্টা ভাংচুর মারধর আহত ১০, *জনকণ্ঠ*, *৭ অক্টোবর ২০০৩*

২৫১১. চট্টগ্রামে ওষুধ ব্যবসায়ী উদ্ধার হননি, *ভোরের কাগজ*, *৭ অক্টোবর ২০০৩*

২৫১২. রাঙ্গামাটিতে বাজার ঘেরাও করে তিন ব্যবসায়ী অপহরণ, পালিয়ে আসতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ-১, *জনকণ্ঠ*, *৮ অক্টোবর ২০০৩*

২৫১৩. দশমিনায় গৃহবধূকে পাশবিক নির্যাতন, *যুগান্তর*, *৯ অক্টোবর ২০০৩*

২৫১৪. পূজামণ্ডপে হামলা, কাপাসিয়ায় সংখ্যালঘুরা চরম আতঙ্কে ২ হাজার টাকায় আসামি ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ, *ভোরের কাগজ*, *১০ অক্টোবর ২০০৩*

২৫১৫. চাঁদার দাবীতে অপহৃত ব্যবসায়ীর মস্তকবিহীন লাশ উদ্ধার, *ভোরের কাগজ*, *১০ অক্টোবর ২০০৩*

২৫১৬. মুক্তি পায়নি খাগড়ার অপহৃত দুই ব্যবসায়ী, এলাকায় উত্তেজনা শঙ্কা দুটোই রয়েছে, *সংবাদ*, *১০ অক্টোবর ২০০৩*

২৫১৭. চট্টগ্রামে স্বর্ণের দোকান লুট, *যুগান্তর*, *১০ অক্টোবর ২০০৩*

২৫১৮. দৌলতপুরে গুলি ও বোমা ফাটিয়ে দেড় লাখ টাকা ছিনতাই, *যুগান্তর*, *১০ অক্টোবর ২০০৩*

২৫১৯. রাজধানীতে সংখ্যালঘু পরিবারের ২ কিশোরী অপহরণ, *জনকণ্ঠ*, *১০ অক্টোবর ২০০৩*

২৫২০. মোরেলগঞ্জে ওসি ইউসুফকে বাদ দিয়ে সবিতা ধর্ষণ মামলার গোপন চার্জশিট, *যুগান্তর*, *১০ অক্টোবর ২০০৩*

২৫২১. নওগাঁয় নিরপরাধ স্বামীকে মুক্ত করতে না পেরে স্ত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু, *জনকণ্ঠ*, *১০ অক্টোবর ২০০৩*

২৫২২. চট্টগ্রামে ফের সোনার দোকানে ডাকাতি, ৫ লাখ টাকার মাল লুট, *ভোরের কাগজ*, *১১ অক্টোবর ২০০৩*

২৫২৩. বদরগঞ্জের সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীকে উড়ো চিঠি দিয়ে চাঁদা দাবী, *সংবাদ*, *১১ অক্টোবর ২০০৩*

২৫২৪. আমতলীতে সংখ্যালঘু কিশোরী অপহরণ, *সংবাদ*, *১৩ অক্টোবর ২০০৩*

২৫২৫. জবর দখলকৃত সম্পত্তি ফেরত পেতে সংবাদ সম্মেলন ॥ নিজ ভূমিতেই পরবাসী ধামরাইয়ের বিমল, *ভোরের কাগজ*, *১৪ অক্টোবর ২০০৩*

২৫২৬. বরিশালে হিন্দু বাড়ীতে বিএনপি ক্যাডারদের হামলা, আহত ৪, *ভোরের কাগজ*, *১৫ অক্টোবর ২০০৩*

২৫২৭. বরিশালে এক বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ, *সংবাদ*, *১৫ অক্টোবর ২০০৩*

২৫২৮. শ্রীপুরে কিশোরীকে উত্ত্যক্ত ঃ প্রতিবাদ করায় হামলা ১২ প্রতিমা ভাংচুর, *প্রথম আলো*, *১৫ অক্টোবর ২০০৩*

২৫২৯. মহালছড়িতে গ্রেপ্তারের ভয়ে পালাচ্ছে পাহাড়িরা, *প্রথম আলো*, *১৫ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৩০. গৌরীপুরে গ্রাম সরকার প্রধানের ছেলের কাণ্ড ঃ ৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা সংখ্যালঘু তরুণী পালিয়ে বেড়াচ্ছে, *সংবাদ*, *১৬ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৩১. দুর্গাপুরের পাঁচ কাহনীয়া আদিবাসী আদর্শ গ্রামের ২ হাজার মানুষ মানবেতর জীবন যাপন করছে, *সংবাদ*, *১৬ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৩২. নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পাকা ভবন নির্মাণ অব্যাহত ॥ মাদারীপুরে কালীমন্দিরের সম্পত্তি বেদখল ॥ সংখ্যালঘুরা বিক্ষুব্ধ, *সংবাদ*, *১৬ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৩৩. নিজের ঘরেই সম্ভ্রমহানী, *ইনকিলাব*, *১৬ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৩৪. সাতক্ষীরার গ্রামে শিশুর গলিত লাশ উদ্ধার, *ইনকিলাব*, *১৬ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৩৫. ঠাকুরগাঁয়ে সন্ত্রাসীরা গুড়িয়ে দিয়েছে মন্দির ও প্রতিমা, *জনকণ্ঠ*, *১৭ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৩৬. রাজশাহীতে ধর্ষিত সংখ্যালঘু যুবতীকে উদ্ধারের পর দুই পুলিশ ও কয়েক যুবকের ফের ধর্ষণ, *জনকণ্ঠ*, *১৮ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৩৭. গৃহবধূর শ্লীলতাহানী মামলার আসামীদের হুমকিতে নওগাঁয় সংখ্যালঘু গ্রামে আতঙ্ক, *জনকণ্ঠ*, *১৮ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৩৮. যশোরে বুনো সম্প্রদায়ের ওপর সন্ত্রাসীদের হামলা, পুলিশ মোতায়েন, *ইত্তেফাক*, *১৯ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৩৯. মাগুরছড়া খাসিয়াপুঞ্জীতে সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের হামলা ভাঙচুর, লুট, *জনকণ্ঠ*, *১৯ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৪০. নীলফামারীতে দুই গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার, *জনকণ্ঠ*, *১৯ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৪১. মাগুরছড়া খাসিয়াপুঞ্জিতে সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের হামলা, ভাঙচুর, লুট, *জনকণ্ঠ*, *১৯ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৪২. রাউজানে সংখ্যালঘু পরিবারের সম্পত্তি দখলের অভিযোগ, *ভোরের কাগজ*, *২০ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৪৩. টুঙ্গিপাড়ায় জমি দখল করতে এসে ১৫ জনকে পিটিয়ে জখম ॥ চিকিৎসা নিতেও দেয়নি সন্ত্রাসীরা, *ভোরের কাগজ*, *২০ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৪৪. বরিশালে দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করল সরকারী দলের ক্যাডাররা, *সংবাদ*, *২০ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৪৫. বরিশালের প্রাচীন মুখার্জীর একাংশ দখল করেছে সন্ত্রাসীরা, *প্রথম আলো*, *২০ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৪৬. রংপুরের গ্রামে গৃহবধূ ধর্ষণের চেষ্টা করেছে সাবেক বিডিআর সুবেদার, *জনকণ্ঠ*, *২০ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৪৭. পীরগাছায় স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ করেছে কলেজছাত্র, *জনকণ্ঠ*, *২১ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৪৮. বরিশালে মন্দিরের জমি দখল ॥ ৩৫টি হিন্দু পরিবার নিরাপত্তাহীন, *ইত্তেফাক*, *২২ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৪৯. গৃহবধূকে ধর্ষণের অপচেষ্টা ॥ জনতার হাতে দুই দুর্বৃত্ত আটক, *ইনকিলাব*, *২২ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৫০. মতিহারের জয়পুরে গৃহবধূ ধর্ষিত, *সংবাদ*, *২৩ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৫১. মোংলায় পূজারিকে মারধার ও প্রতিমা ভাংচুর এলাকায় উত্তেজনা, *সংবাদ*, *২৩ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৫২. বরিশালে দেবোত্তর সম্পত্তির ভবন দখল করে মাদক ব্যবসা, জুয়া, হিন্দু বাসিন্দারা আতঙ্কে, কালিপূজা অনিশ্চিত, *ভোরের কাগজ*, *২৩ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৫৩. মানিকগঞ্জ ও নান্দাইলে মন্দিরে অগ্নিসংযোগ ভাংচুর, *ইত্তেফাক*, *২৪ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৫৪. মানিকগঞ্জে কালী মন্দিরে হামলা ॥ মূর্তির গায়ে আগুন, *জনকণ্ঠ*, *২৪ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৫৫. নান্দাইলে কালীপূজা মণ্ডপে ভাংচুর, *ভোরের কাগজ*, *২৫ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৫৬. খুলনায় ৭ সংখ্যালঘু বাড়িতে ডাকাতি, *সংবাদ*, *২৬ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৫৭. হরিনাকুণ্ডুতে চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম বৃদ্ধি ঃ ১১ দিনেও অপহৃত ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করা যায়নি ॥ ১ সংখ্যালঘু পরিবার গ্রামছাড়া, *সংবাদ*, *২৬ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৫৮. কালীগঞ্জে দত্ত পরিবারের কাছে আবারও চাঁদা দাবি । অন্যথায় প্রাণনাশ, *সংবাদ*, *২৭ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৫৯. সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা ও দেশত্যাগের হুমকি ঃ শ্যামাপূজা চলাকালে সোনারগাঁওয়ের পানামে মন্দিরের জমি দখলের ফের চেষ্টা ॥ ১ সন্ত্রাসী গ্রেফতার, *সংবাদ*, *২৭ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৬০. কান কর্তন, *আজকের কাগজ*, *২৭ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৬১. পরশুরামে সংখ্যালঘু মহিলাকে গণধর্ষণ, *জনকণ্ঠ*, *২৮ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৬২. পীরগাছায় সংখ্যালঘু পরিবারের জমি দখল ॥ মালিক পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, *সংবাদ*, *২৯ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৬৩. গণপিটুনির শিকার চোরের পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু ॥ রংপুরে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামে সশস্ত্র হামলা ॥ লুটপাট প্রতিমা ভাংচুর, *সংবাদ*, *২৯ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৬৪. বান্দরবানে সেনা গ্যারিসনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ঃ ৯ শতাধিক আদিবাসী পরিবার উচ্ছেদ আতঙ্কে, *প্রথম আলো*, *৩০ অক্টোবর ২০০৩*

২৫৬৫. বাগেরহাটে ছবি রানী মণ্ডলকে ফের হুমকি দিচ্ছে বিএনপি সন্ত্রাসীরা, *সংবাদ*, *৩১ অক্টোবর ২০০৩*

নবেম্বর ২০০৩

২৫৬৬. কানাইঘাটে মন্দিরের সম্পত্তি দখলের চেষ্টা ঃ হুমকি, *যুগান্তর*, *১ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৬৭. রাজবাড়ীতে এক রাতে ২ সংখ্যালঘুর বাড়িতে ডাকাতি ॥ প্রতিবাদে গভীর রাতে বিক্ষোভ মিছিল, *ইত্তেফাক*, *২ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৬৮. বালিয়াকান্দিতে আদিবাসীর জমি দখলের চেষ্টা, থানা মামলা নেয়নি, *সংবাদ*, *২ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৬৯. পূর্বধলায় কালীমূর্তি ভাংচুর, *সংবাদ ২ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৭০. নারায়ণগঞ্জে ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি, ১ সন্দেহভাজন গ্রেফতার, *ভোরের কাগজ, ২ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৭১. পঞ্চগড়ে গণধর্ষণের শিকার গৃহবধূ ॥ এলাকার পরস্পরবিরোধী বক্তব্য, *জনকণ্ঠ, ৩ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৭২. স্কুলছাত্রী অপহৃত, *জনকণ্ঠ, ৩ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৭৩. ডাকাতি ঃ মালামাল লুট, *জনকণ্ঠ, ৩ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৭৪. চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে স্কুলছাত্রীকে অপহরণ, *প্রথম আলো, ৩ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৭৫. ফটিকছড়িতে স্কুলছাত্রী অপহৃত, *যুগান্তর, ৩ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৭৬. মানিকগঞ্জে হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে হরকতের চিঠি, *জনকণ্ঠ, ৪ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৭৭. নওগাঁয় সংখ্যালঘু বিধবার মাটির ঘর ঘেঁষে জোর করে প্রভাবশালীর ভবন নির্মাণ, *জনকণ্ঠ, ৪ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৭৮. বিচারপতি দেবেশ ভট্টাচার্যের বাড়ির ওপর শকুনের দৃষ্টি, *ইত্তফাক, ৫ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৭৯. মনসামঙ্গলের কবি বিজয় দাস গুপ্তর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের জমি দখলের চেষ্টা, *ভোরের কাগজ, ৫ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৮০. চট্টগ্রামে স্বামীর সামনে গৃহবধূকে গণধর্ষণ, *ভোরের কাগজ, ৫ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৮১. নাটোরের আখক্ষেত থেকে জুয়েলারী কারিগরের লাশ উদ্ধার, *ভোরের কাগজ, ৫ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৮২. নওগাঁয় আদিবাসী পল্লীতে সন্ত্রাসী হামলা ঘরে অগ্নিসংযোগ, *প্রথম আলো, ৬ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৮৩. লালমনিরহাটে সংখ্যালঘুর জমি দখল করে বিএনপি নেতার দোকান নির্মাণ, *সংবাদ, ৬ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৮৪. নাগরপুরে হত্যার হুমকি দিয়ে বিনা মূল্যে রেজিস্ট্রি করে নিলো সংখ্যালঘুর জমি, *ভোরের কাগজ, ৬ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৮৫. বাউফলে মনসা প্রতিমা ভাংচুর, *ভোরের কাগজ, ৬ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৮৬. চিঠি ও টেলিফোনে হুমকি ঃ মানিকগঞ্জের হিন্দু পরিবারগুলো আতঙ্কে, *ভোরের কাগজ, ৬ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৮৭. ফরিদপুরে রামকৃষ্ণ মিশনে হামলা ভাংচুর মারধর, *প্রথম আলো, ৬ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৮৮. ইটনার উন্মুক্ত নদীতে "জল জমিদারের ছত্রছায়ায় চলছে বেপরোয়া চাঁদাবাজি ॥ ২শ সংখ্যালঘু জেলে পরিবারের দুঃসহ জীবনযাপন, *সংবাদ, ৭ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৮৯. ২৫০ বিঘা জমি নিয়ে আদিবাসী বন বিভাগ দ্বন্দ্ব ॥ প্রকৃত উপকারভোগীরা বঞ্চিত, *সংবাদ, ৭ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৯০. রাউজানে সন্ত্রাসীদের নির্যাতনে এক সংখ্যালঘু পরিবার এলাকাছাড়া, *আজকের কাগজ, ৭ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৯১. এবার মনিকগঞ্জে হরকত-ই-ইসলাম আল জিহাদের টেলিফোনে হিন্দুদের হুমকি, *জনকণ্ঠ, ৭ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৯২. মানিকগঞ্জে সংখ্যালঘুদের চিঠি দিয়ে হুমকি, *জনকণ্ঠ, ৮ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৯৩. মানিকগঞ্জে হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশে এসে দাঁড়াল সর্বস্তরের মানুষ, *জনকণ্ঠ, ৮ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৯৪. কুতুবদিয়ায় দ্বীপে সন্ত্রাসীদের শ্মশান দখল, *জনকণ্ঠ, ৯ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৯৫. জুমচাষী অপহৃত ঃ খাগড়াছড়িতে এক আদিবাসী ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা, *প্রথম আলো, ৯ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৯৬. ফেনীতে সংখ্যালঘু হোটেলে শিবির সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব, *ভোরের কাগজ, ৯ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৯৭. আক্কেলপুরে ৫০ হাজার টাকা চাঁদার দাবীতে সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা, *আজকের কাগজ, ৯ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৯৮. তাড়াশে আদিবাসী পল্লীতে সন্ত্রাসীদের হামলা ॥ দশ পরিবার উচ্ছেদ, *জনকণ্ঠ, ১০ নবেম্বর ২০০৩*

২৫৯৯. জামাত নেতার কারিশমা, *আজকের কাগজ, ১০ নবেম্বর ২০০৩*

২৬০০. মনিরামপুরে সংখ্যালঘু মেয়েকে অপহরণ করে ধর্মান্তরের চেষ্টা ॥ পরে উদ্ধার, *জনকণ্ঠ, ১১ নবেম্বর ২০০৩*

২৬০১. বগুড়ায় যুবলীগ নেতাকে কুপিয়ে হত্যা ॥ প্রতিবাদে ধর্মঘট, সড়ক অবরোধ, *প্রথম আলো, ১১ নবেম্বর ২০০৩*

২৬০২. তাড়াশে সন্ত্রাসী হামলায় ১০টি আদিবাসী পরিবার উচ্ছেদ আহত ২০, *ভোরের কাগজ, ১১ নবেম্বর ২০০৩*

২৬০৩. জয়পুরহাটে আদিবাসী পল্লীতে হামলা ঃ মহিলাসহ ৭ জন আহত ॥ ঘরবাড়ি ভাংচুর, গবাদিপশু লুট, *সংবাদ, ১২ নবেম্বর ২০০৩*

২৬০৪. দেবহাটায় সংখ্যালঘুর ঘের দখল করেছে যুবদল ক্যাডারা, *সংবাদ, ১২ নবেম্বর ২০০৩*

২৬০৫. খাগড়াছড়িতে উপজাতীয় পল্লিতে সন্ত্রাসী হামলা ঃ গুলি অগ্নিসংযোগ, *যুগান্তর, ১২ নবেম্বর ২০০৩*

২৬০৬. মুন্সীগঞ্জে সংখ্যালঘু একটি পরিবারকে নজরবন্দী করে রেখেছে প্রভাবশালীরা, *জনকণ্ঠ, ১৩ নবেম্বর ২০০৩*

২৬০৭. চিংড়িঘেরের মালিক সহ ৬ জন খুন, *সংবাদ, ১৩ নবেম্বর ২০০৩*

২৬০৮. ফলো আপ ঃ জয়পুরহাটে আদিবাসী পল্লীতে হামলা ঃ রাত কেটেছে নতুন হামলার আশঙ্কায় ॥ গ্রেফতার নেই, *সংবাদ, ১৩ নবেম্বর ২০০৩*

২৬০৯. পাঁচবিবিতে আদিবাসী পল্লীতে হামলা ॥ গ্রামের অবস্থা থমথমে ভীতিকর, পুনঃহামলার ভয়ে রাত জেগে পাহারা, *আজকের কাগজ, ১৩ নবেম্বর ২০০৩*

২৬১০. বাগেরহাটে গুলি করে ঘের মালিকসহ দু'জনকে হত্যা, *যুগান্তর, ১৩ নবেম্বর ২০০৩*

২৬১১. বাগেরহাটে চিংড়িঘেরের মালিক ও তার কর্মচারীকে গুলি করে হত্যা, *প্রথম আলো, ১৩ নবেম্বর ২০০৩*

২৬১২. বাগেরহাটে চিংড়িঘেরে জোড়া খুন, *ইত্তেফাক, ১৩ নবেম্বর ২০০৩*

২৬১৩. গৌরনদীতে মূর্তি ভাংচুর, *সংবাদ, ১৪ নবেম্বর ২০০৩*

২৬১৪. গৌরনদীতে প্রাচীন মন্দিরের শীতলা প্রতিমা ভেঙ্গেছে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা, *ভোরের কাগজ, ১৪ নম্বের ২০০৩*

২৬১৫. জয়পুরহাটে আদিবাসী পল্লীতে হামলা ঃ ৬ দিনেও কোন আসামী গ্রেফতার হয়নি, *সংবাদ, ১৪ নবেম্বর ২০০৩*
২৬১৬. বানারীপাড়ায় সংখ্যালঘু পরিবারের ৭ সদস্যকে অপহরণ করেছে এক ভূমিগ্রাসী, *জনকণ্ঠ, ১৫ নবেম্বর ২০০৩*
২৬১৭. সংখ্যালঘু পরিবারের গৃহবধূকে ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে জখম ॥ পুলিশ মূল আসামীদের গ্রেফতার করছে না, *সংবাদ, ১৫ নবেম্বর ২০০৩*
২৬১৮. খুলনায় নদী থেকে ৩টি লাশ উদ্ধার, *সংবাদ, ১৫ নবেম্বর ২০০৩*
২৬১৯. কাপাসিয়ায় প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনায় গ্রেফতার ১, *সংবাদ, ১৫ নবেম্বর ২০০৩*
২৬২০. প্রাণনাশের উপর্যুপরি হুমকি ঃ মায়ের শ্রাদ্ধ করতে পারছেননা আইনজীবি, *সংবাদ, ১৫ নবেম্বর ২০০৩*
২৬২১. লালপুরে সংখ্যালঘু নির্যাতন ৩ জন গ্রেফতার, *সংবাদ, ১৫ নবেম্বর ২০০৩*
২৬২২. সুজানগরে সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীর দোকানে ডাকাতি, *সংবাদ, ১৫ নবেম্বর ২০০৩*
২৬২৩. বরগুনায় একটি সংখ্যালঘু পরিবার বসতভিটা হারিয়ে পথে পথে ঘুরছে ॥ সংবাদ সম্মেলন, *আজকের কাগজ, ১৫ নবেম্বর ২০০৩*
২৬২৪. পাঁচবিবির আদিবাসী পল্লীতে হামলার ঘটনায় কেউ গ্রেফতার হয়নি, *আজকের কাগজ, ১৫ নবেম্বর ২০০৩*
২৬২৫. পাঁচবিবির গ্রামে আদিবাসীদের উচ্ছেদের পায়তারা ॥ আবার হামলার আশঙ্কায় রাত জেগে পাহারা, *জনকণ্ঠ, ১৫ নবেম্বর ২০০৩*
২৬২৬. রাজবাড়ীতে মন্দিরে ঢুকে দুটি মূর্তির মাথা কেটে নিয়ে গেছে, *জনকণ্ঠ, ১৫ নবেম্বর ২০০৩*
২৬২৭. ফলোআপ ঃ জয়পুরহাটে ৮ দিনেও গ্রেফতার নেই ঃ হামলাকারীরা আদিবাসীদের ধান কেটে নিয়ে গেছে ॥ পুলিশ নির্বিকার, *সংবাদ, ১৬ নবেম্বর ২০০৩*
২৬২৮. রাজার হাটে ঘুমন্ত বাবা ও ছেলেকে এ্যাসিড নিক্ষেপ, *সংবাদ, ১৬ নবেম্বর ২০০৩*
২৬২৯. মধুপুরে আদিবাসী কোচদের জমিতে জোরপূর্বক বৃক্ষরোপণ ॥ গ্রাম ছাড়া করার হুমকি, *ইত্তেফাক, ১৭ নবেম্বর ২০০৩*
২৬৩০. কাপাসিয়ায় প্রতিমা ভাংচুর মামলায় জিজ্ঞাসা ॥ সম্পাদক গ্রেফতার, *ইত্তেফাক, ১৭ নবেম্বর ২০০৩*
২৬৩১. জয়পুরহাটে আদিবাসী পাড়ায় হামলা ভাংচুর লুটতরাজ, আহত ৫, পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্ত্রাসীদের পক্ষ নেওয়ার, *ভোরের কাগজ, ১৭ নবেম্বর ২০০৩*
২৬৩২. মোল্লাহাটে ঘের মালিক ও তার কর্মচারীকে গুলি করে হত্যা, *দিনকাল ২০০৩*
২৬৩৩. আক্কেলপুরে সন্ত্রাসী চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য ঃ কয়েকটি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা, ভারতে পাঠিয়ে দেয়ার হুমকি, *সংবাদ, ১৮ নবেম্বর ২০০৩*
২৬৩৪. গাইবান্ধায় হরিজনদের বাড়িঘরে সন্ত্রাসী হামলা, *দিনকাল, ১৯ নবেম্বর ২০০৩*
২৬৩৫. জোরপূর্বক দেড় শতাধিক গাছ কেটে নিয়েছে বনবিভাগ ॥ মধুপুরে বনায়নের নামে আদিবাসী উচ্ছেদ অভিযান ॥ ২৯টি পরিবার আতঙ্কগ্রস্ত, *সংবাদ, ১৯ নবেম্বর ২০০৩*
২৬৩৬. সাড়ে ৬ মাসে দ্বিতীয়বার, *ভোরের কাগজ, ২০ নবেম্বর ২০০৩*
২৬৩৭. বাঁশখালীতে ১১ জনকে পুড়িয়ে হত্যা ॥ ঘটনার শিকার এক হিন্দু পরিবার ॥ ৭০ বছরের বৃদ্ধ থেকে শুরু করে ৪ দিনের শিশুও রেহাই পায়নি, *ভোরের কাগজ, ২০ নবেম্বর ২০০৩*
২৬৩৮. একই পরিবারের ১১ জনকে পুড়িয়ে হত্যা ॥ চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে নারকীয় বর্বরতা। পরিবারের নারী ও শিশুসহ সদস্যরা পুড়ে কয়লা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইজিপির ঘটনাস্থল পরিদর্শন, *জনকণ্ঠ, ২০ নবেম্বর ২০০৩*
২৬৩৯. আঁর যাদুরে তোঁয়ারা আনি দে, *জনকণ্ঠ, ২০ নবেম্বর ২০০৩*
২৬৪০. জয়পুরহাটে আদিবাসী সংগঠনের কার্যালয়ে হামলা ॥ টাকা লুট ॥ ভাংচুর, *ইত্তেফাক, ২০ নবেম্বর ২০০৩*
২৬৪১. বাঁশখালীতে নারকীয় তাণ্ডবের নিন্দা ॥ জোট সরকারের আমলে সংখ্যালঘুর ওপর নগ্ন হামলারই ধারাবাহিকতা, *জনকণ্ঠ, ২১ নবেম্বর ২০০৩*
২৬৪২. বাউফলে একটি পরিবারে দুর্বৃত্তদের হানা ॥ মা-ছেলেকে জিম্মি করে লুটপাট ॥ প্রতিমা ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, *প্রথম আলো, ২১ নবেম্বর ২০০৩*
২৬৪৩. বাঁশখালী ট্রাজেডি ঃ ঘটনাস্থলে বিক্ষুব্ধ মানুষের দল ॥ সন্ত্রাসীরা স্টিল আলমারী ভাঙেনি, লুটও করেনি, তাহলে কেন এই বর্বরতা?, *প্রথম আলো, ২১ নবেম্বর ২০০৩*
২৬৪৪. সরজমিন-বাঁশখালী ঃ আগুনে পোড়া ১১টি কঙ্কাল ঘরের বাহিরে পড়ে আছে ॥ আজ সৎকার নিন্দার ঝড়, *সংবাদ, ২১ নবেম্বর ২০০৩*
২৬৪৫. সতীত্ব বাঁচাতে গিয়ে পুড়ে মরল তিন বোন ঃ আমরা নিরীহ, কোথায় যাব?, *বীর চট্টগ্রাম মঞ্চ, ২১ নবেম্বর ২০০৩*
২৬৪৬. পলাশবাড়ীতে ৮ সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসী হামলা, ৫ লাখ টাকার মালামাল লুট, *আজকের কাগজ, ২২ নবেম্বর ২০০৩*
২৬৪৭. আপন ঘরই হল নবজাতক কার্তিকের শ্মশান ঃ বাঁশখালীতে আগুনে পুড়ে নিহত ৯ জনের গণসৎকার, *আজকের কাগজ, ২২ নবেম্বর ২০০৩*
২৬৪৮. বাঁশখালীতে সংখ্যালঘুরাই কেন টার্গেট ॥ ২৮ মাসে ১৮ জনকে পুড়িয়ে হত্যা, *জনকণ্ঠ, ২২ নবেম্বর ২০০৩*
২৬৪৯. অক্টোবরে দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৪৯টি, *জনকণ্ঠ, ২২ নবেম্বর ২০০৩*
২৬৫০. বাঁশখালী ট্রাজেডি কি স্রেফ ডাকাতির ঘটনা, *যুগান্তর, ২২ নবেম্বর ২০০৩*
২৬৫১. 'আঁরা এদেশত ন' থাইককুম', *আজকের কাগজ, ২২ নবেম্বর ২০০৩*
২৬৫২. ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সংখ্যালঘুদের শ্মশানঘাট দখল ॥ পুকুর দখলেরও অপচেষ্টা, *জনকণ্ঠ, ২৩ নবেম্বর ২০০৩*
২৬৫৩. জমি বিক্রিতে রাজি না হওয়াই কি বাঁশখালী ট্রাজেডির কারণ?, *যুগান্তর, ২৩ নবেম্বর ২০০৩*
২৬৫৪. সুনামগঞ্জে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মামলা ॥ সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক, *জনকণ্ঠ, ২৪ নবেম্বর ২০০৩*
২৬৫৫. বাঁশখালী ট্রাজেডির খলনায়ক এক চেয়ারম্যান, আ' লীগ সংসদীয় দলের ঘটনাস্থল পরিদর্শন, *যুগান্তর, ২৪ নবেম্বর ২০০৩*
২৬৫৬. বানারীপাড়ায় সংখ্যালঘু পরিবারকে আটকে রেখে ভূমি গ্রাসের চেষ্টা, *যুগান্তর, ২৪ নবেম্বর ২০০৩*
২৬৫৭. বাঁশখালীর ১১ জনকে পুড়িয়ে মারা হয় গান পাউডার দিয়ে?, *প্রথম আলো, ২৪ নবেম্বর ২০০৩*

২৬৫৮. বাঁশখালী ট্রাজেডি ঃ জমি দখলে ব্যর্থ স্থানীয় বিএনপি নেতা ঘটনার নেপথ্যে? রহস্য উদঘাটনে পুলিশ ব্যর্থ, *সংবাদ, ২৪ নবেম্বর ২০০৩*

২৬৫৯. বাগেরহাটে ২ তরুণী ধর্ষণের শিকার ॥ গ্রেফতার ৪, *সংবাদ, ২৪ নম্বের ২০০৩*

২৬৬০. বাঁশখালীর বিমল শীল নিরাপত্তা চান, *ভোরের কাগজ, ২৪ নবেম্বর ২০০৩*

২৬৬১. বাঁশখালী ট্রাজেডি ঃ চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ৮ জনের গ্রুপ ১১ জনকে পুড়িয়ে মেরেছে ॥ গ্রেফতারকৃত চারজনের চাঞ্চল্যকর তথ্য, *যুগান্তর, ২৫ নবেম্বর ২০০৩*

২৬৬২. মির্জাপুরে গ্রামে মন্দিরে ঢুকে মূর্তি ভাংচুর, নদীতে নিক্ষেপ, সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক, *জনকণ্ঠ ২৯, নবেম্বর ২০০৩*

২৬৬৩. মির্জাপুরের তিন গ্রামের ১০ মন্দিরের মূর্তি ভাংচুর, পূজা বন্ধ, *ইত্তেফাক, ২৯ নবেম্বর ২০০৩*

২৬৬৪. মাদারীপুরে প্রভাবশালী একটি মহল হাতিয়ে নিয়েছে পুরানবাজার কালী মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি, *জনকণ্ঠ, ২৯ নবেম্বর ২০০৩*

২৬৬৫. ভোলায় সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর বিএনপির ক্যাডারদের হামলা ॥ মহিলারা লাঞ্ছিত, *জনকণ্ঠ ৩০, নবেম্বর ২০০৩*

২৬৬৬. বাজিতপুরে সংখ্যালঘু পরিবারে ডাকাতবেশী দুর্বৃত্তদের তাণ্ডব, *সংবাদ, ৩০ নবেম্বর ২০০৩*

২৬৬৭. মির্জাপুরে ১০টি কালীমন্দিরের প্রতিমা গুড়িয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা, *সংবাদ, ৩০ নবেম্বর ২০০৩*

ডিসেম্বর ২০০৩

২৬৬৮. ঝলকাঠির কীর্তিপাশায় দশরার মাঠ দখল, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হুমকির মুখে, *যুগান্তর, ১ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৬৬৯. মূর্তি ভাংচুর ঃ মির্জাপুরে দুই মন্ত্রীর ৮ মন্দির পরিদর্শন, *যুগান্তর, ১ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৬৭০. অধ্যক্ষ মুহুরী হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামী জামিনে মুক্ত, হাইকোর্টে শুনানীতে রাষ্ট্রপক্ষ বিরোধীতা করেনি, *প্রথম আলো, ২ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৬৭১. রাজধানীতে সংখ্যালঘু পরিবারের নববধূ অপহরণ, *জনকণ্ঠ, ২ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৬৭২. নেত্রকোনার আটপাড়ায় স্বামীর হাত-পা বেধে স্ত্রীকে ধর্ষণ, *ইত্তেফাক, ৩ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৬৭৩. অপরাধ শুকর খাওয়া, ঝিকরগাছায় ঋষি সম্প্রদায়ের উপর সন্ত্রাসী হামলা, ১০ জন আহত, ৩টি গরু লুট, *সংবাদ, ৩ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৬৭৪. চিতলমারীতে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুর জমি দখলের অভিযোগ, *আজকের কাগজ, ৩ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৬৭৫. অভয়নগরে সংখ্যালঘু প্রতিবন্ধী ও ভিক্ষুক ধর্ষণ মামলা দু'টির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, *সংবাদ, ৪ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৬৭৬. ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা শঙ্কিত হয়ে পড়েছে বাংলাদেশে, *আজকের কাগজ, ৪ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৬৭৭. শুকর জবাই করে চাঁদা না দেওয়ায় ঋষি সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, মারপিটে আহত-১০, নিরাপত্তা চায় ঋষিরা, *ভোরের কাগজ, ৪ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৬৭৮. ধর্মপাশায় দিনমজুরের স্ত্রীকে ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে অস্ত্রাঘাতে জখম, *ইত্তেফাক, ৫ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৬৭৯. নিয়ামতপুরে আদিবাসীদের ২২ বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা, *জনকণ্ঠ, ৫ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৬৮০. দি ইকোনোমিস্টের মন্তব্য ॥ বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের একমাত্র নিরাপদ স্থান এয়ারপোর্টের ডিপারচার লাউঞ্জ, *জনকণ্ঠ, ৫ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৬৮১. নওগাঁয় ১৭ আদিবাসী পরিবারকে উচ্ছেদ, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, *যুগান্তর, ৫ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৬৮২. বাঁশখালী ট্রাজেডি, কালু নামে এক সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে, *প্রথম আলো, ৫ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৬৮৩. দেশে পুড়িয়ে মারার প্রবণতা বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে, *সংবাদ, ৫ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৬৮৪. বাঁশখালীতে সংখ্যালঘু পরিবারের ১১ জনকে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় চট্টগ্রামে নিন্দা, বিক্ষোভ অব্যাহত, সরকারদলীয় নেতা-মন্ত্রীদের মনগড়া বক্তব্য ও প্রশাসনিক গড়িমসি জাতি বরদাশত করবে না, *সংবাদ, ৫ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৬৮৫. চট্টগ্রামে আদিবাসী কিশোরী নির্যাতনের শিকার, *প্রথম আলো, ৫ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৬৮৬. পুড়িয়ে মারার হুমকি, ভিটাবাড়ি বিক্রি না করায় টাঙ্গাইলে সংখ্যালঘুকে বেদম প্রহার করেছে সন্ত্রাসীরা, *জনকণ্ঠ, ৬ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৬৮৭. স্বরূপকাঠীতে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে সরকারি গাছ কেটে নেওয়ার অভিযোগ, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় গরু চুরির হিড়িক, *সংবাদ, ৬ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৬৮৮. জয়পুরহাটে আদিবাসী পল্লীতে হামলা, ২৮ দিনেও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি, *সংবাদ, ৭ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৬৮৯. ধামরাইয়ে হিন্দু ধর্মীয় স্থান ও জমি জবর দখলের অভিযোগ, *ইত্তেফাক, ৮ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৬৯০. বাউফলে এক সংখ্যালঘু পরিবারকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা, আসামীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, পুলিশ নীরব, *জনকণ্ঠ, ৮ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৬৯১. সাতক্ষীরায় পূজামণ্ডপের জমি দখল করেছে দুই জামায়াত কর্মী, *জনকণ্ঠ, ৮ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৬৯২. হবিগঞ্জে টিপরা পল্লীর ৫টি বসতঘর পুড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা, *জনকণ্ঠ, ৮ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৬৯৩. টাঙ্গাইলে সংখ্যালঘু পরিবারটি এখন নিরাপত্তাহীন, পুলিশ ব্যবস্থা নেয়নি, *জনকণ্ঠ, ৮ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৬৯৪. সেনবাগে সংখ্যালঘুর বাড়িঘর জবর দখল, *যুগান্তর, ৮ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৬৯৫. শ্যামনগরে জামায়াত নেতার বিরুদ্ধে পূজা মণ্ডপের জমি দখলের অভিযোগ, *সংবাদ, ৮ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৬৯৬. পাঁচবিবির কলন্দরপুর আদিবাসী পল্লীতে হামলার একমাসেও পুলিশ কাউকেই গ্রেপ্তার করেতে পারেনি, *আজকের কাগজ, ৮ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৬৯৭. বাগেরহাটে পাঁচ সংখ্যালঘুর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, আহত-৫, উত্তেজনা, *জনকণ্ঠ*, *৯ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৬৯৮. রাজশাহী ও নওগাঁর আদিবাসীদের জীবনচিত্র ঃ প্রভাবশালী ভূমিদস্যুরা গ্রাস করছে জমি, প্রতারণা করছেন নেতারা, *ভোরের কাগজ, ৯ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৬৯৯. বাঁশখালীতে সংখ্যালঘু পরিবারের জমি দখল, *যুগান্তর, ৯ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭০০. সাভারে খ্রিস্টান কলেজে ডাকাতি ও ভাংচুর, *ইত্তেফাক, ১০ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭০১. বাঁশখালীতে সংখ্যালঘুর ২৫ লাখ টাকার জমি জোর করে দখল, *জনকণ্ঠ*, *১০ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭০২. দিনাজপুরে রায় সাহেব বাড়ি দখল চেষ্টার অভিযোগে ১ জন গ্রেপ্তার, ৪টি পুকুরে বিষ প্রয়োগ, *প্রথম আলো, ১০ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭০৩. সাভারে খ্রিস্টান ধর্মশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডাকাতি, ৮০ হাজার টাকা লুট, *ভোরের কাগজ*, *১০ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭০৪. বাঁশখালীর ১১ জন হত্যার নিন্দা জ্ঞাপন ঃ দোষীদের শাস্তি দাবী, *পূর্বকোণ চট্টগ্রাম*, *১০ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭০৫. সাধনপুর শীলপাড়ায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আরো একজন গ্রেপ্তার, *পূর্বকোণ চট্টগ্রাম*, *১০ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭০৬. বাঁশখালী ঘটনায় জড়িত সন্দেহে আরো এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার, *আজাদী চট্টগ্রাম*, *১০ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭০৭. এমনেস্টি কর্মকর্তার সাথে ঐক্য পরিষদ নেতার মতবিনিময়, *বীর চট্টগ্রামমঞ্চ চট্টগ্রাম*, *১১ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭০৮. নওগাঁয় সন্ত্রাসীদের আগুনে আদিবাসী বাড়িঘর পুড়ে ছাই, ব্যাপক লুটপাট, থানায় ব্যর্থ হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা, *প্রথম আলো, ১১ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭০৯. মেয়ের বিয়ের ২০ হাজার টাকা বাঁচাতে প্রাণ দিলেন নীরদ, *ভোরের কাগজ*, *১২ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭১০. রাজশাহীর আদিবাসীরা নানা নির্যাতনের শিকার, তারা মানবেতর জীবন যাপন করছে, *ইত্তেফাক, ১৩ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭১১. একমাত্র মেয়ের কারণেই কি খুন হলেন নিরঞ্জন? অনেক বখাটের নজর ছিল মুকুলের প্রতি, *জনকণ্ঠ, ১৩ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭১২. রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারকে আদিবাসী পরিষদের স্মারকলিপি পেশ, *জনকণ্ঠ*, *১৩ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭১৩. নওগাঁয় সংবাদ সম্মেলন, *জনকণ্ঠ, ১৩ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭১৪. পীরগঞ্জে সংখ্যালঘু দম্পতিকে কুপিয়ে আহত, *সংবাদ, ১৩ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭১৫. লোহাগড়ায় ৪ শিক্ষকের নির্যাতনে স্কুলছাত্রের মৃত্যু, *সংবাদ, ১৫ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭১৬. নাজিরপুরে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, *আজকের কাগজ, ১৫ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭১৭. শিক্ষকের নির্যাতনে ছাত্রের আত্মহত্যা, লোহাগড়ায় হরতাল, চার শিক্ষক বরখাস্ত, *জনকণ্ঠ, ১৫ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭১৮. বাঁশখালীতে ১১ খুনের নারকীয় ঘটনা কি শেষ পর্যন্ত ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছে, *জনকণ্ঠ*, *১৫ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭১৯. পুলিশ অবশেষে অভিযোগটি নিয়মিত মামলা হিসেবে গ্রহণ করেছে, *জনকণ্ঠ*, *১৫ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭২০. শহীদ বুদ্ধিজীবী জোতির্ময় গুহঠাকুরতার স্মৃতিবিজড়িত সম্পত্তি জবর দখল, *ভোরের কাগজ, ১৪ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭২১. নাজিরপুর সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, *আজকের কাগজ, ১৫ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭২২. বাঁশখালীতে ১১ খুনের নারকীয় ঘটনা কি শেষ পর্যন্ত ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছে? *জনকণ্ঠ*, *১৫ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭২৩. সিরাজদিখানে একটি সংখ্যালঘু পরিবারের জীবন বিপন্ন, প্রভাবশালীদের হুমকি, *জনকণ্ঠ, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭২৪. পিরোজপুরে সংখ্যালঘুর মাছের ঘের লুট, বাধা দেয়ায় মারধর, *জনকণ্ঠ*, *১৬ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭২৫. পিরোজপুরে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি বিএনপি নেতার জবর দখল চেষ্টা, ঘের লুট, *জনকণ্ঠ, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭২৬. উচ্ছেদ নির্যাতনের প্রতিবাদে রাজশাহীতে আদিবাসীদের প্রতীক গণঅনশন, *সংবাদ*, *১৬ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭২৭. পিরোজপুরে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, গ্রেফতার-৫, *জনকণ্ঠ, ১৭ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭২৮. চিতলমারী-নাজিরপুর সীমান্তে সংখ্যালঘু পল্লীতে লাঠিয়ালদের হামলা ঃ আহত-১৫, *যুগান্তর, ১৭ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭২৯. টাঙ্গাইলে বাড়ির জমি ও ভূয়াপুরে চাঁদা না দেয়ায় সংখ্যালঘুদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা, মারপিট, *সংবাদ, ১৭ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৩০. চিতলমারী-নাজিরপুর সীমান্তের বলেশ্বর চরে সংখ্যালঘু পল্লীতে লাঠিয়ালদের হামলা, গৃহবধূ-কিশোরীদের সম্ভ্রমহানি, আহত-১৫, *আজকের কাগজ, ১৭ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৩১. মহেশখালীতে পৌর চেয়াম্যান কর্তৃক বৌদ্ধ বিহারের জমি দখলের চেষ্টা, *আজকের কাগজ, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৩২. মঠবাড়িয়ায় শিক্ষকের দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা, *জনকণ্ঠ, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৩৩. সাতক্ষীরায় সংখ্যালঘুর পরিবারের সম্পত্তি দখলের অভিযোগ, *জনকণ্ঠ*, *১৮ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৩৪. ফলোআপ ঃ পিরোজপুর বানিয়ারি গ্রাম ॥ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের এখন প্রাণ নাশের হুমকি দেয়া হচ্ছে, *সংবাদ, ১৯ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৩৫. গলাচিপায় বৌদ্ধ মন্দিরের দেড় একর জমির ধান কেটে নিল প্রভাবশালীরা, *ইত্তেফাক, ২০ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৩৬. সাঁথিয়ায় অজিত হত্যাকাণ্ড, মামলার পর বাদীকে জীবননাশের হুমকি, *জনকণ্ঠ*, *২০ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৩৭. প্রেমের অপবাদ, মেহেরপুরে সংখ্যালঘু তরুণকে উচ্ছেদ ও তরুণীর সম্পত্তি দখলের অপচেষ্টা, *জনকণ্ঠ, ২০ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৩৮. সাতক্ষীরায় সাংবাদিক সম্মেলনে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সংখ্যালঘু পরিবারের এক ভাইকে গুম করে আরেক ভাইয়ের ২৭ বিঘা জমি দখল, *সংবাদ*, *২০ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৩৯. নাজিরপুরে ক্যাডারদের ভয়ে সংখ্যালঘুরা এলাকা ছাড়া, ৮৫ একর ঘেরের মাছ লুটকারীরা সদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে, *সংবাদ, ২০ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৪০. ডোমারে প্রতিমা ভাংচুর, *আজকের কাগজ, ২০ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৪১. নাটোরে একরাতে দুই গ্রামে ২৪ সংখ্যালঘুর বাড়িতে ডাকাতি, গুলিতে ডাকাত নিহত, *জনকণ্ঠ, ২১ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৪২. চট্টগ্রামে মন্দিরের জায়গা দখলের চেষ্টা, সংঘর্ষ, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় আহত-৫, *জনকণ্ঠ, ২১ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৪৩. চট্টগ্রামে রাতের আঁধারে মন্দিরের জায়গা দখল নিয়ে সংঘর্ষ, আহত-১০, *যুগান্তর, ২১ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৪৪. ডোমারে আবারও প্রতিমা ভাংচুর, সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি, *সংবাদ, ২১ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৪৫. চট্টগ্রামে মধ্যরাতে হামলা, আহত-৫, *সংবাদ, ২১ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৪৬. চট্টগ্রামে হাজারী গলীর জয়কালী মন্দির দখলের চেষ্টা দু'পক্ষের সংঘর্ষে আহত-৩, *আজকের কাগজ, ২১ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৪৭. ফলোআপ ঃ নাজিরপুরের চর বানিয়ারী গ্রাম সংখ্যালঘু পল্লীর লোকজন দিনাতিপাত করছে আতঙ্কিত অবস্থায়, আসামীদের গ্রেফতার করছে না পুলিশ, *আজকের কাগজ, ২১ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৪৮. নাটোরের দুই গ্রামে এক রাতে ২৪ সংখ্যালঘুর বাড়িতে ডাকাতি, গ্রামবাসীর গুলিতে এক দুর্বৃত্ত নিহত, আহত- ৫০ জন, *ভোরের কাগজ, ২১ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৪৯. চট্টগ্রামে গভীর রাতে মন্দিরের দখল নিতে সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব, জনতার বাধা, ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল পুলিশ, *ভোরের কাগজ, ২১ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৫০. পিরোজপুরে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের পর তিন ইউনিয়ন পুরুষশূন্য, *জনকণ্ঠ, ২২ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৫১. চট্টগ্রামে মন্দিরের প্রবেশপথে নির্মাণকাজ নিয়ে উত্তেজনা, বিক্ষুব্ধ হিন্দুরা গেট ও দেয়াল ভেঙ্গে দিয়েছে, *প্রথম আলো, ২১ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৫২. ১ ডাকাত নিহত, ৬০ গ্রামবাসী আহত, নাটোরের সিংড়ায় এক রাতে ২৪ বাড়িতে ডাকাতি, *প্রথম আলো, ২১ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৫৩. সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার সময় পুলিশ যথাসময়ে এগিয়ে আসেনা, ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর, *যুগান্তর, ২২ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৫৪. নাটোরে ১৮টি বাড়িতে ডাকাতির ঘটনায় মামলা, *সংবাদ, ২২ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৫৫. নাজিরপুরে সংখ্যালঘু নির্যাতন ঃ সাঈদী বলছেন সাজানো ঘটনা, নির্যাতিতরা দেশত্যাগের কথা ভাবছেন, *ভোরের কাগজ, ২২ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৫৬. সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে পুলিশ ধীরে চলে, বাংলাদেশ সম্পর্কে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর, *ভোরের কাগজ, ২২ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৫৭. গাজীপুরে সংখ্যালঘুদের ৪টি দোকানে সন্ত্রাসীদের অগ্নিসংযোগ, *প্রথম আলো, ২৩ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৫৮. নিরাপত্তা হেফাজতের জন্য আদালতে প্রেরণ ঃ সোনারগাঁয়ে ১০ দিন আটকে রেখে স্কুল ছাত্রীকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেছে জামায়াত নেতা, *সংবাদ, ২৩ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৫৯. ফলো আপ ঃ নাজিরপুরে ঘেরের মাছ লুট, জমি দখল, হামলা, এক সপ্তাহেও বিএনপি সন্ত্রাসীদের পুলিশ গ্রেফতার করেনি, সংখ্যালঘুরা বাড়িছাড়া, *সংবাদ, ২৩ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৬০. তেজগাঁও থানা পুলিশের নাকের ডগায় কাওরান বাজার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসীদের গুলিতে ব্যবসায়ী আহত, *সংবাদ, ২৪ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৬১. গোপালগঞ্জের ৪টি মন্দিরে চুরি, *আজকের কাগজ, ২৪ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৬২. পটিয়ায় মন্দিরের ৩টি মুর্তি ভেঙ্গে ফেলেছে দুর্বৃত্তরা, *যুগান্তর, ২৪ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৬৩. বাঁশখালীর ১১ খুনের ৩৫ দিন, মামলার কোন কিনারা হয়নি, *প্রথম আলো, ২৪ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৬৪. ফলো আপ ঃ সোনারগাঁয়ের স্কুলছাত্রীর বাধ্যতামূলক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ, সুমিতা রায়কে মহিলা আইনজীবী সমিতির জিম্মায় দেয়া হয়েছে, *সংবাদ, ২৪ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৬৫. পটিয়ায় রক্ষা কালীমন্দিরে দুর্বৃত্তদের তাণ্ডব, ৩টি প্রাচীন মূর্তি ভাংচুর, *ভোরের কাগজ, ২৪ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৬৬. বাঁশখালীতে আরো ২টি দুর্ধর্ষ ডাকাতি, *ইত্তেফাক, ২৫ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৬৭. তালায় সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা, অগ্নিসংযোগ,লুট, *সংবাদ, ২৫ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৬৮. সুবল দাস জীবনের নিরাপত্তা চান, *প্রথম আলো, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৬৯. নাটোরে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অভিযোগ গণডাকাতি, চাঁদাবাজি ও পুলিশের হয়রানিতে সংখ্যালঘুরা আতঙ্কিত, *সংবাদ, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৭০. বোয়ালমারীতে নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় সহযোগিতার অভিযোগ ঃ বিভাগীয় মামলায় ওসির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ায় সংখ্যালঘু পরিবারকে দেশ ত্যাগের হুমকি, *সংবাদ, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৭১. সিংড়ায় অব্যাহত সংখ্যালঘু নির্যাতন, পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রত্যাহারের দাবি, *ভোরের কাগজ, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৭২. চট্টগ্রামে জয়কালী মন্দিরে ভাংচুর ও জবরদখলের প্রতিবাদে বিক্ষোভ, *সংবাদ, ২৭ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৭৩. গোপালগঞ্জে ৪টি মন্দিরে চুরি, কষ্টিপাথরের মূর্তি স্বর্ণালংকার লুট, *সংবাদ, ২৭ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৭৪. দেশ ছেড়ে যাবেন না, খুন্তি, কুড়াল নিয়েই রুখে দাঁড়ান, পূজা উদযাপন পরিষদের সভায় বিপ্লবী বিনোদ বিহারী, *ভোরের কাগজ, ২৭ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৭৫. রামুতে শ্মশানের জমি দখলের চেষ্টা, প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে মামলা, *ভোরের কাগজ, ২৭ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৭৬. নাটোরে ২৪ সংখ্যালঘুর বাড়িতে গণডাকাতি, মূল নায়কসহ গ্রেপ্তার-৪, *জনকণ্ঠ, ২৯ ডিসেম্বর ২০০৩*

২৭৭৭. ৩টি সংখ্যালঘু গ্রামে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম, পুরুষরা গ্রামছাড়া, ধর্ষণের অভিযোগ, *সংবাদ*, ২৯ *ডিসেম্বর* ২০০৩

২৭৭৮. বাঁশখালীতে সন্ত্রাসীদের অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত দু'পরিবার দুই মাসেও ভিটেবাড়িতে ফিরতে পারেনি ঃ প্রভাবশালীদের চাপে মামলা নিয়ে গড়িমসি, *ভোরের কাগজ*, ২৯ *ডিসেম্বর* ২০০৩

২৭৭৯. নাটোরে ২৪ সংখ্যালঘু বাড়িতে ডাকাতির ঘটনায় সাবেক সাংসদপুত্রসহ ৪ জন গ্রেপ্তার, *ভোরের কাগজ*, ২৯ *ডিসেম্বর* ২০০৩

২৭৮০. পুলিশ অসহায়, সংখ্যালঘুরা শঙ্কিত, চট্টগ্রামে বেপরোয়া সন্ত্রাস, ১ বছরে ২শ' ৬০ জন খুন, *সংবাদ*, ৩০ *ডিসেম্বর* ২০০৩

২৭৮১. ভোলায় নিখোঁজ এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার, গ্রেপ্তার-২, *সংবাদ*, ৩০ *ডিসেম্বর* ২০০৩

২৭৮২. চট্টগ্রামে ধর্ষণের শিকার সংখ্যালঘু গৃহবধূর পরিবারকে হুমকি দিচ্ছে আসামিরা, *সংবাদ*, ৩০ *ডিসেম্বর* ২০০৩

২৭৮৩. আদিবাসী এক বৃদ্ধার দাবি, *জনকণ্ঠ*, ৩১ *ডিসেম্বর* ২০০৩

২৭৮৪. সাতক্ষীরায় সংখ্যালঘু কিশোরীকে ধর্ষণ, মামলা প্রত্যাহারের হুমকি, *সংবাদ*, ৩১ *ডিসেম্বর* ২০০৩

২৭৮৫. জেলা আ'লীগের সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ আ'লীগমুক্ত স্বরূপকাঠি ঘোষণার পরদিনই সম্মেলনে হামলা, সংখ্যালঘুদের হুমকি, *সংবাদ*, ৩১ *ডিসেম্বর* ২০০৩

২৭৮৬. নওগাঁর আদিবাসী নেতা আলফ্রেড সরেন হত্যা মামলার ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয়, বাদিনীসহ পরিবারসহ পরিবারগুলোর সদস্যরা নিরাপত্তাহীনতায়, *সংবাদ*, ৩১ *ডিসেম্বর* ২০০৩

জানুয়ারি - ২০০৫

৩৬৩৯. তাড়াইলে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ফ্রন্টের নেতাকে হত্যার চেষ্টা, *ভোরের কাগজ*, ২ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৪০. বিয়ানি বাজারে বাহরাম হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী, *আজকের কাগজ*, ২ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৪১. বরিশাল সিটি করপোরেশনের রাস্তা প্রশস্তকরণ, হিন্দু সম্প্রদায়ের আদি শ্মশানের মঠ মন্দির ভাঙার জন্য মেয়রের নির্দেশ, *সংবাদ*, ২ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৪২. পীরেন স্নানের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী আগামীকাল ॥ মধুপুরে ইকোপার্ক বিরোধী আদিবাসীদের হয়রানির অভিযোগ, *প্রথম আলো*, ২ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৪৩. কালিয়াকৈরে মন্দির থেকে স্বর্ণালঙ্কার চুরি, *আজকের কাগজ*, ৩ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৪৪. হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদন, নবেম্বরে সারাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ৪০টি, *ভোরের কাগজ*, ৪ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৪৫. চালিতাতলী গ্রামে সংখ্যালঘুর ভূ-সম্পত্তি গ্রাসাতে উঠে পড়ে লেগেছে স্থানীয় সন্ত্রাসীরা, *আজকের কাগজ*, ৪ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৪৬. শহীদ বুদ্ধিজীবী জিসি দেবের গ্রামের বাড়িটি ৩৩ বছরেও দখলমুক্ত হয়নি, *সংবাদ*, ৪ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৪৭. পীরেন স্নানের মৃত্যুবার্ষিকীতে বক্তারা, রক্তে ভেজা মধুপুরের মাটিতে ইকোপার্ক হতে দেব না, *প্রথম আলো*, ৪ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৪৮. কালিয়াকৈরে মন্দির থেকে স্বর্ণালংকার চুরি, *যুগান্তর*, ৫ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৪৯. হাসিনা হত্যা হুমকির ই-মেইল ঃ পার্থকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য আবেদন হয়েছে, *জনকণ্ঠ*, ৬ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৫০. টাকা না দেওয়াতেই শংকরকে হত্যা করা হয়েছে, শংকরের স্ত্রীর দাবি, *সংবাদ*, ৬ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৫১. বাঁশখালিতে গণহত্যার চার্জশিট নিয়ে পুলিশ বেকায়দায়, *ভোরের কাগজ*, ৬ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৫২. কোটালীপাড়ার খ্রিস্টান পল্লীতে ডাকাতি, *ভোরের কাগজ*, ৮ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৫৩. জামালপুরে জমি দখলের জন্য সংখ্যালঘু পরিবারকে হত্যার হুমকি, *সংবাদ*, ৮ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৫৪. কালী মূর্তি ভাংচুর, *আজকের কাগজ*, ৯ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৫৫. প্রতিপক্ষের সন্ত্রাসীদের হত্যার হুমকি, নড়িয়ার আলোক রাণী কুণ্ডু ও তার পরিবারের সদস্যরা নিরাপত্তাহীনতায়, *সংবাদ*, ১০ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৫৬. মধুপুরে ৯ বছরে ৬ আদিবাসী খুন, বিচার হয়েছে মাত্র ১টির, *আজকের কাগজ*, ১১ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৫৭. পূর্বধলায় ২ লাখ টাকা ছিনতাই, ১ ব্যক্তি আটক, *সংবাদ*, ১২ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৫৮. ধামরাইয়ে হিন্দু নির্যাতনের মামলা প্রত্যাহারের জন্য চাপ দিচ্ছে সন্ত্রাসীরা, *ভোরের কাগজ*, ১৩ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৫৯. নাটোরে মুক্তিযোদ্ধা জিতেন দত্তকে গুলি করে হত্যা, মির্জাপুরে স্বামী-স্ত্রীকে জবাইয়ের পর ঘরে অগ্নি সংযোগ, *জনকণ্ঠ*, ১৪ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৬০. সুনামগঞ্জে কন্যাকে ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে পিতাকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ, *জনকণ্ঠ*, ১৫ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৬১. সীতানাথ মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি গ্রাসের পায়তারা, *সংবাদ*, ১৮ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৬২. মাদারীপুরে দেবোত্তর সম্পত্তি গ্রাসাতের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন, *ইনকিলাব*, ১৯ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৬৩. সিলেটে জমি নিয়ে বিরোধ, ৪ সংখ্যালঘু আহত, *জনকণ্ঠ*, ২০ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৬৪. কক্সবাজারে মন্দিরের জমি দখল করে ঘর নির্মাণ, হামলায় আহত-৮, *জনকণ্ঠ*, *প্রথম আলো*, ২১ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৬৫. আদমদীঘিতে মুক্তিযোদ্ধার বাড়িঘর ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, আহত-৬, *ভোরের কাগজ*, ২১ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৬৬. চকরিয়ায় মন্দিরের উঠান দখল করেছে যুবদল ক্যাডাররা, *সংবাদ*, ২১ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৬৭. চকরিয়া হিন্দু পল্লীতে সন্ত্রাসী হামলা, লক্ষ টাকার মালামাল লুট, *আজকের কাগজ*, ২৫ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৬৮. কুলিয়ারচরে সংখ্যালঘু যুবক ছুরিকাহত, *সংবাদ*, ২৬ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৬৯. ভোলায় বিএনপি ক্যাডারদের তাণ্ডব, সংখ্যালঘু সেলফোন ব্যবসায়ীকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে নির্যাতন ও সর্বস্ব লুট, *জনকণ্ঠ*, ২৭ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৭০. নীলফামারীতে মন্দিরের কালিমূর্তি ভাংচুর, *জনকণ্ঠ*, ২৮ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৭১. ধামরাইয়ে আদর্শ গ্রামের নামে জমি দখল করছে বিএনপি নেতা, *সংবাদ*, ২৯ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৭২. আনচিতে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ৩৩ আদিবাসী শিক্ষিকা কর্তৃপক্ষের প্রতারণার শিকার, *সংবাদ*, ৩০ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৭৩. ঢাকায় অপহৃত সংখ্যালঘু তরুণীকে কুলিয়ারচর থেকে উদ্ধার, *সংবাদ*, ৩০ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৭৪. মধুপুরের ৫ আদিবাসী হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়নি, *যুগান্তর*, ৩০ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৭৫. ডিমলায় সংখ্যালঘুর জমি দখল করে ঘরে অগ্নিসংযোগ লুটপাট, *সংবাদ*, ৩১ *জানুয়ারি ২০০৫*

৩৬৭৬. রাজশাহীতে ছাত্রদল ক্যাডার ধর্ষণ করেছে সংখ্যালঘু শিশুকে, শাস্তি জুতাপেটা, *জনকণ্ঠ*, ৩১ *জানুয়ারি ২০০৫*

ফেব্রুয়ারি ২০০৫

৩৬৭৭. রূপগঞ্জে হিন্দু পরিবারের জমি দখল করেছে আ. লীগ নেতা, *সংবাদ, ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৬৭৮. ঢাকার বিউটি পার্লারে কর্মরত তরুণীকে ফুঁসলিয়ে কুলিয়ারচর এনে ধর্ষণের চেষ্টা, *ইত্তেফাক, ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৬৭৯. হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদন, ডিসেম্বরে ৩৯টি সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনায় নিহত-৩। গণধর্ষণের শিকার-৩, *ভোরের কাগজ, ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৬৮০. ৭২ সাঁওতাল পাড়ায় উন্নয়নের ছোঁয়া নেই, *সংবাদ, ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৬৮১. রাঙ্গামাটিতে পাহাড়ি মহিলার লাশ উদ্ধার, *যুগান্তর ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৬৮২. লোহাগড়ায় হামলার ভয়ে একটি ঋষি পরিবার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে, *সংবাদ, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৬৮৩. গোবিন্দগঞ্জে ছিনতাই, *সংবাদ, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৬৮৪. পার্বত্য আদিবাসীদের ভাষা বিলুপ্ত হওয়ার পথে, *আজকের কাগজ, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৬৮৫. সন্ত্রাসী সিদ্দিক বাহিনীর হাতে জিম্মি দশমিনার আলিপুরা গ্রামের ১৪ সংখ্যালঘু পরিবার, *আজকের কাগজ, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৬৮৬. টাঙ্গাইলে মন্ত্রী গৌতম চক্রবর্তীর মামা বাড়ির মন্দিরে বোমা হামলা, *জনকণ্ঠ, সংবাদ, আজকের কাগজ, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৬৮৭. দশমিনায় ১৪টি সংখ্যালঘু পরিবারকে ঘর বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি, *সংবাদ, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৬৮৮. বাগেরহাটে হিন্দু পরিবারের উপর সরকারদলীয় সন্ত্রাসীর হামলা, *সংবাদ, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৬৮৯. সুনামগঞ্জে আবারও সংখ্যালঘু পরিবারের জমি দখল, *সংবাদ, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৬৯০. বাগেরহাট হিন্দু পরিবারের উপর সরকারদলীয় সন্ত্রাসীদের হামলা, *সংবাদ, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৬৯১. ছিদ্দিক বাহিনীর হাতে দশমিনার ৩৫ সংখ্যালঘু পরিবার জিম্মি, মন্দির শ্মশান উচ্ছেদ, জমি দখল করে উল্টো মামলা, *ভোরের কাগজ, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৬৯২. কলাপাড়ার রাখাইন পল্লিতে কষ্টিপাথরের দুটি বৌদ্ধমূর্তি চুরি, *ভোরের কাগজ, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৬৯৩. দিনাজপুরে আদিবাসী তরুণীকে ধর্ষণ মামলা অবশেষে নিয়েছে পুলিশ, *যুগান্তর, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৬৯৪. মুরাদনগরে আ'লীগ নেতার হুমকিতে একটি সংখ্যালঘু পরিবার আতঙ্কে, *সংবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৬৯৫. বোচাগঞ্জে আদিবাসী তরুণীকে ধর্ষণ করেছে বিএনপি নেতা, *ভোরের কাগজ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৬৯৬. কালিগঞ্জে খুনের মামলার বাদীর বাড়ীতে সন্ত্রাসীদের হামলা ॥ ৬ জন গ্রেফতার, *ইত্তেফাক, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৬৯৭. সীতাকুণ্ডে সন্ত্রাসীদের বর্বরতা ॥ বাড়িতে আটকিয়ে হিন্দু পরিবারকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা, আহত-৬, *ভোরের কাগজ, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৬৯৮. গণপিটুনিতে যুবক নিহত জয়পুরহাটে ৪টি সংখ্যালঘু বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, *সংবাদ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৬৯৯. সুনামগঞ্জে মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনায় দ্রুত বিচার আইনে মামলা গ্রেফতার-৬, *ভোরের কাগজ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৭০০. জয়পুরহাটে যুবতীকে ধর্ষণের চেষ্টা ॥ গণপিটুনিতে যুবক হত ভাংচুর অগ্নি সংযোগ, *জনকণ্ঠ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৭০১. আলফ্রেড সরেন হত্যা মামলা ॥ চারবছরে ১৩ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ পুলিশ ক্যাম্প উঠে গেছে ঃ বাদী সাক্ষীরা আতংকে, *যুগান্তর, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৭০২. জয়পুরহাটের পল্লীতে সন্ত্রাস ॥ সর্বস্ব হারিয়েছে ৩ পরিবারের লোকজন, *যুগান্তর, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৭০৩. আগৈলঝড়ায় মূর্তি ভাংচুর, *আজকের কাগজ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৭০৪. ভূমিহীন আদিবাসীদের গন্তব্য কোথায়, *ভোরের কাগজ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৭০৫. কিশোরগঞ্জের "দিল্লির আখড়ার" সম্পত্তি গ্রাস করার পাঁয়তারা, *প্রথম আলো, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৭০৬. আক্কেলপুরে কিশোরী ধর্ষণ চেষ্টায় যুবক খুনের জের ॥ ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেয়ায় ৩টি সংখ্যালঘু পরিবারের মানবেতর দিনযাপন, *সংবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৭০৭. লাকসামে অমূল্য হত্যাকাণ্ড ॥ ১০ দিনেও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি, *সংবাদ, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৭০৮. সংখ্যালঘু ঘের ব্যবসায়ী, নবজাতক ও অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূসহ নয় জেলায় খুন-১১, *জনকণ্ঠ, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৭০৯. চাঁদার টাকা না দেওয়ায়, *জনকণ্ঠ, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৭১০. দশমিনায় ১৪টি সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদ চেষ্টা ॥ মানবাধিকার সংগঠনের ঘটনাস্থল পরিদর্শনে অভিযোগের সত্যতা মিলছে, *সংবাদ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৭১১. মিরসরাইয়ে মন্দির ভাঙচুর ঘটনায় গ্রেফতার-২, *সংবাদ, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৭১২. রূপগঞ্জে এক হিন্দু পরিবারকে লাঞ্ছিত করেছে সন্ত্রাসীরা । ফরিদপুরে উপাসনালয় ভাঙার ক্ষোভ ॥ ১০ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন, *প্রথম আলো, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

৩৭১৩. কলাপাড়ায় জমি দখল, ৪ জন গ্রেফতার, *সংবাদ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৫*

মার্চ ২০০৫

৩৭১৪. জানুয়ারিতে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ৩৬, *ভোরের কাগজ, ২ মার্চ ২০০৫*

৩৭১৫. তাড়াশে এক আদিবাসীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা, *আজকের কাগজ, ৫ মার্চ ২০০৫*

৩৭১৬. জামায়াত নেতা তাই, *যুগান্তর, ৫ মার্চ ২০০৫*

৩৭১৭. মধুপুরে বিধবা আদিবাসীর ওপর অব্যাহত নির্যাতন, *সংবাদ, ৫ মার্চ ২০০৫*
৩৭১৮. কুষ্টিয়ায় হিন্দুদের নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে ডিবি পুলিশের হামলা, ঠাকুর লাঞ্ছিত, *আজকের কাগজ, ৬ মার্চ ২০০৫*
৩৭১৯. বাঁশখালীতে ১১ জনকে পুড়িয়ে মারার মামলা নিয়ে পুলিশ বেকায়দায় ॥ ১৫ মাসেও মামলার চার্জশীট হয়নি, *আজকের কাগজ, ৭ মার্চ ২০০৫*
৩৭২০. মধুপুরে দুটি আদিবাসী পরিবারকে পুড়িয়ে মারার হুমকি, *সংবাদ, ৭ মার্চ ২০০৫*
৩৭২১. টাঙ্গাইলে ২ আদিবাসী পরিবারকে হত্যার হুমকি ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ, *সংবাদ, ৯ মার্চ ২০০৫*
৩৭২২. পাথরঘাটায় হিন্দু পরিবারের জমি দখল ॥ চেয়ারম্যানের সম্মতে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র, *আজকের কাগজ, ১০ মার্চ ২০০৫*
৩৭২৩. মধুপুর বনাঞ্চলের আদিবাসীরা মামলার আশঙ্কায় ভুগছে, *ভোরের কাগজ, ১২ মার্চ ২০০৫*
৩৭২৪. দুর্গাপুরে ধর্ষণের পর আদিবাসী মহিলা খুন, *সংবাদ, ১৩ মার্চ ২০০৫*
৩৭২৫. দুর্গাপুরে ধর্ষণের পর আদিবাসী মহিলা খুন, *সংবাদ, ১৩ মার্চ ২০০৫*
৩৭২৬. কুষ্টিয়ায় আবারও সংখ্যালঘু পরিবারের কোটি টাকার জমি দখলের পাঁয়তারা, *ভোরের কাগজ, ১৪ মার্চ ২০০৫*
৩৭২৭. সাতক্ষীরায় গৃহবধূ জবাই, নড়াইলে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যা, *জনকণ্ঠ, ১৫ মার্চ ২০০৫*
৩৭২৮. পটুয়াখালীতে ছেলের সামনে মাকে গণধর্ষণ ॥ বাদীকে হুমকি, *জনকণ্ঠ, ১৬ মার্চ ২০০৫*
৩৭২৯. রামপালে জামু বাহিনীর অত্যাচারে ২০ সংখ্যালঘু পরিবারের দেশত্যাগ, *সংবাদ, ১৭ মার্চ ২০০৫*
৩৭৩০. যশোরে সংখ্যালঘু বাড়িতে হামলা ও ভাংচুর, লুটপাট, *জনকণ্ঠ, ১৭ মার্চ ২০০৫*
৩৭৩১. সান্তাহারে মূর্তি ভাংচুর, *জনকণ্ঠ, ১৯ মার্চ ২০০৫*
৩৭৩২. দিনাজপুরে আদিবাসী মহিলার গাছ নিয়ে বিএনপি জামাত মুখোমুখি, *জনকণ্ঠ, ১৯ মার্চ ২০০৫*
৩৭৩৩. সীতাকুণ্ডে পুলিশি হয়রানি ॥ এলাকা ছেড়েছে শতাধিক হিন্দু পরিবার, *সংবাদ, ১৯ মার্চ ২০০৫*
৩৭৩৪. বগুড়ার গ্রামে মন্দিরে হামলা প্রতিমা ভাংচুর, *জনকণ্ঠ, ১৯ মার্চ ২০০৫*
৩৭৩৫. মহাদেবপুরে আদিবাসী পল্লীতে সন্ত্রাসী হামলায় মহিলাসহ আহত-১৫, *আজকের কাগজ, ২০ মার্চ ২০০৫*
৩৭৩৬. কামিনী রায়ের পৈত্রিক বাড়ি উদ্ধারের দাবি জানিয়েছে ২৫ জন কবি সাহিত্যিক, *আজকের কাগজ, ২০ মার্চ ২০০৫*
৩৭৩৭. চট্টগ্রামে কালী মন্দিরের সামনে বোমা বিস্ফোরণ, আহত-৩, *ভোরের কাগজ, ২০ মার্চ ২০০৫*
৩৭৩৮. নীলফামারীতে সংখ্যালঘুর জমি দখল করে রাতেই রাস্তা নির্মাণ, *জনকণ্ঠ, ২১ মার্চ ২০০৫*
৩৭৩৯. মাদারীপুরে শ্মশান ঘাট এলাকায় মসজিদ নির্মাণ নিয়ে বিরোধ ॥ মুসল্লিদের মিছিল সমাবেশ, *জনকণ্ঠ, ২২ মার্চ ২০০৫*
৩৭৪০. মির্জাপুরে কালিপূজা নিয়ে দুই গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা ॥ একজনকে আটকে রাখার অভিযোগ, *ইত্তেফাক, ২৩ মার্চ ২০০৫*
৩৭৪১. লক্ষীপুরে পাশবিকতা ঃ স্বামী দেবরকে বেঁধে গৃহবধূকে গণধর্ষণ, *ভোরের কাগজ, জনকণ্ঠ, ২৩ মার্চ ২০০৫*
৩৭৪২. দিনাজপুরে ৮টি আদিবাসী পরিবার প্রভাবশালীদের হুমকিতে বাড়িছাড়া, *প্রথম আলো, ২৪ মার্চ ২০০৫*
৩৭৪৩. ঢাকায় আলোচনা সভায় সন্তু লারমা ॥ মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসীদের অবদানের স্বীকৃতির বদলে মিলেছে শোষণ অত্যাচার, *ভোরের কাগজ, ২৪ মার্চ ২০০৫*
৩৭৪৪. সাত মাস পর জেল থেকে ছাড়া পেল পার্থ ॥ পাঁচ দিন ছিল চোখ বাঁধা, চলেছে নির্যাতন, *জনকণ্ঠ, ২৪ মার্চ ২০০৫*
৩৭৪৫. দিনাজপুরে মিথ্যা মামলার আসামী হয়ে ২৩ আদিবাসী বাড়ি ছাড়া, *যুগান্তর, ২৫ মার্চ ২০০৫*
৩৭৪৬. সোনারগাঁয়ে প্রতিমা ও পূজা মণ্ডপ ভাঙচুর সন্ত্রাসী গ্রেফতার, *প্রথম আলো, ২৫ মার্চ ২০০৫*
৩৭৪৭. সাতক্ষীরায় স্বাধীনতা দিবসসহ হিন্দুদের অনুষ্ঠানে বোমা হামলার হুমকি, *আজকের কাগজ, ২৫ মার্চ ২০০৫*
৩৭৪৮. এইচ আর সিবিএম এর প্রতিবেদন ॥ সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা আশঙ্কাজনক হয়ে বাড়ছে, *ভোরের কাগজ, ২৬ মার্চ ২০০৫*
৩৭৪৯. গোলটেবিল আলোচনার সমাপণীতে বক্তারা ॥ আদিবাসীদের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি দাবি, *প্রথম আলো, ২৬ মার্চ ২০০৫*
৩৭৫০. আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা ॥ চট্টগ্রামে মন্দিরের জায়গা থেকে ৫ পরিবারকে উচ্ছেদের অভিযোগ, *ভোরের কাগজ, ২৬ মার্চ ২০০৫*
৩৭৫১. হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদন ॥ ফেব্রুয়ারিতে অসংখ্য ধর্ষণ খুন ও মন্দির ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে, *ভোরের কাগজ, ২৬ মার্চ ২০০৫*
৩৭৫২. আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা ॥ চট্টগ্রামে মন্দিরের জায়গা থেকে ৫ পরিবারকে উচ্ছেদের অভিযোগ, *ভোরের কাগজ, ২৬ মার্চ ২০০৫*
৩৭৫৩. দিনাজপুরের চোরগোপাল গ্রামের আদিবাসীদের উচ্ছেদের পাঁয়তারা, *সংবাদ, ২৭ মার্চ ২০০৫*
৩৭৫৪. সন্ত্রাসীদের ভয়ে বাগমারায় আরো এক সংখ্যালঘু পরিবার গ্রামছাড়া, বেলঘরিয়া হাট পুলিশের অভিযান, সন্ত্রাসীরা লাপাত্তা, *প্রথম আলো, ২৮ মার্চ ২০০৫*
৩৭৫৫. দিনাজপুরে আদিবাসীদের ভিটে-মাটি থেকে বিতাড়িত করার ষড়যন্ত্র চলছে, *আজকের কাগজ, ২৯ মার্চ ২০০৫*
৩৭৫৬. চরফ্যাশনে সিদ্দিক বাহিনীর দৌরাত্ম্য ॥ শতাধিক পরিবারের ভিটেমাটি দখল, *সংবাদ, ৩০ মার্চ ২০০৫*

এপ্রিল ২০০৫

৩৭৫৭. রাঙ্গামাটির প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আরও ৬ উপজাতিয়কে অপহরণ করেছে সন্ত্রাসীরা, *জনকণ্ঠ, ২ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৫৮. যুবকের লাশ উদ্ধার, *জনকণ্ঠ, ২ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৫৯. সুনামগঞ্জে সন্ত্রাসীদের হাতে সংখ্যালঘু যুবক মেহেরপুরে তরুণ খুন, *জনকণ্ঠ, ২ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৬০. কমিটি গঠন নিয়ে গণ্ডগোল, দিনাজপুরে মন্দিরে বিএনপি ক্যাডারদের হামলা ॥ মামলা দিতে এসে যুবক গ্রেফতার, *জনকণ্ঠ, ২ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৬১. চার জেলায় কুপিয়ে ও জবাই করে ৪ জনকে খুন, *সংবাদ, ৩ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৬২. বান্দরবানে অস্ত্রের মুখে অপহৃত-৮, *জনকণ্ঠ, ৩ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৬৩. সংবাদ সম্মেলনে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা ॥ বাগেরহাটে চাঁদা পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে ১টি হিন্দু পরিবার গ্রাম ছাড়া ঃ জমি দখল, *সংবাদ, ৩ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৬৪. সংখ্যালঘুর বাড়িতে হামলা, *জনকণ্ঠ, ৪ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৬৫. পূজা বন্ধ, সংখ্যালঘুদের হুমকি, পিরোজপুরে ভূমি দস্যুরা মন্দির দখল করে লাগিয়েছে কলাগাছ, *জনকণ্ঠ, ৬ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৬৬. ভূমি দস্যু সিদ্দিক বাহিনীর দাপটে চরফ্যাশনে কয়েকশ পরিবার ভিটেছাড়া, *জনকণ্ঠ, ৭ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৬৭. পুরনো বটগাছ নিলামে বিক্রির অপচেষ্টা ॥— পাড়ায় উত্তেজনা, *জনকণ্ঠ, ৮ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৬৮. শেরপুরে ভবানী মন্দিরের সম্পত্তি বেদখল হচ্ছে, *প্রথম আলো, ৯ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৬৯. মোহনগঞ্জে মূর্তি ভাংচুরের ঘটনায় গ্রেফতার-১, *ইনকিলাব, ৯ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৭০. নওগাঁর গ্রাম থেকে ভয়ে পালাচ্ছে আদিবাসীরা, *সংবাদ, ১০ এপ্রিল ২০০৫.*

৩৭৭১. ছাত্রী অপহরণের প্রতিবাদে রংপুরে ডিসি ও পুলিশ সুপার অফিস ঘেরাও, *জনকণ্ঠ, ১১ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৭২. বেতাগীতে বিধবার বাড়ী দখল, *যুগান্তর, ১২ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৭৩. সাথিয়ায় বাড়িতে হামলা ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ, *আজকের কাগজ, ১৪ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৭৪. গৌরনদীতে ঐতিহ্যবাহী লক্ষন দাস পরিবারকে উৎখাতের চেষ্টা চালাচ্ছে প্রভাবশালীরা ॥ আতঙ্কে দিন কাটছে পরিবারের সদস্যদের ॥ থানায় পাল্টাপাল্টি অভিযোগ, *আজকের কাগজ, ১৬ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৭৫. মার্চে সংখ্যালঘু নির্যাতন ঘটেছে ৯১টি, *ভোরের কাগজ, ১৬ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৭৬. লক্ষীপুরে বাড়ীতে হামলার ঘটনায় মামলা ॥ বাদীকে প্রাণনাশের হুমকি, *জনকণ্ঠ, ১৭ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৭৭. রূপগঞ্জে চাঁদা না দেওয়ায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে এক সংখ্যালঘু পরিবার, *আজকের কাগজ, ১৮ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৭৮. রাজশাহীতে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম মেয়েকে বিয়ে ॥ ভিটে বিক্রি করে জরিমানার বাকি টাকাও দিতে হলো, *প্রথম আলো, ২০ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৭৯. রাজশাহীতে হিন্দু ছেলের ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম মেয়ে বিয়ে ॥ গ্রাম্য-সালিশে জরিমানার টাকা দিতে বাধ্য হলেন বেগবতী রাণী, *আজকের কাগজ, ২০ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৮০. গোপালগঞ্জে কালীবাড়ি মন্দির বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি, *আজকের কাগজ, ২১ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৮১. পূর্বধলায় আদিবাসী পরিবারের জমি দখলের চেষ্টা ঃ থানা মামলা রেকর্ড করেনি, *সংবাদ, ২১ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৮২. নাটোরে অপহৃত দু'আদিবাসীকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিখোঁজ-৩, *সংবাদ, ২৪ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৮৩. মংলায় আগাম প্রতিমা বিসর্জন, *আজকের কাগজ, ২৪ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৮৪. উল্লা পাড়ার পূর্ণিমা পরিবার এখন কেমন আছে, *আজকের কাগজ, ২৪ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৮৫. রংপুরে আদিবাসী গৃহবধূকে ধর্ষণের পর হত্যা, *আজকের কাগজ, ২৫ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৮৬. সন্ত্রাসী হামলা ও পুলিশি নির্যাতনের ভয় ॥ চাটমোহরের আদিবাসী পল্লী পাঁচ দিন ধরে পুরুষ শুন্য, *ভোরের কাগজ, সংবাদ, ২৬ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৮৭. রংপুরে আদিবাসী গৃহবধূকে ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ, *ইত্তেফাক, ২৬ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৮৮. রাজশাহীতে সংখ্যালঘুর বাড়িতে পেট্রল ঢেলে আগুন, ফের হুমকি, *প্রথম আলো, জনকণ্ঠ, ২৬ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৮৯. চাটমোহরে মন্দিরের জায়গা দখল করে মার্কেট নির্মাণ, *সংবাদ, ২৬ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৯০. চাটমোহরে আদিবাসী অধ্যুষিত বহালবাড়ি গ্রাম পুরুষশূন্য, *সংবাদ, ২৬ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৯১. হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের তথ্য— মার্চে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলায় খুন ৩৩, ধর্ষিত ৩৭ ও অপহৃত ১৫, *ভোরের কাগজ, ২৭ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৯২. রাজশাহীতে সংখ্যালঘু পরিবারকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার নিন্দা, *ভোরের কাগজ, ২৭ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৯৩. সংখ্যালঘুদের ওপর হামলায় ওয়ার্কার্স পার্টির প্রতিবাদ, *যুগান্তর, ২৭ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৯৪. চাটমোহরে কালী প্রতিমা ভাংচুরের রহস্য উদঘাটন ॥ গ্রেফতার-১, হিন্দু সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ ও সংবাদ সম্মেলন, *আজকের কাগজ, ২৮ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৯৫. হুমকির মুখে পালিয়ে বেড়াচ্ছে রাঙ্গামাটির এক পরিবার, *সংবাদ, ৩০ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৯৬. ওসি, ইউএনও অবরুদ্ধ, কবরস্থান ও শ্মশানের জায়গা নিয়ে সাতক্ষীরায় ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ॥ লাঠি চার্জে আহত ১০, *জনকণ্ঠ, ২৯ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৯৭. পি আর সি নিয়ে মত বিনিময় ॥ সংসদে আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত আসন দাবী, *প্রথম আলো, ৩০ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৯৮. নওগাঁর ভীমপুরের ১১ আদিবাসী পরিবারের ১০টিই পালিয়ে গেছে ॥ আলফ্রেড সরেনের বোন রেবেকা পড়ে আছেন জীবনের মায়া উপেক্ষা করে, *যুগান্তর, ৩০ এপ্রিল ২০০৫*

৩৭৯৯. পঞ্চগড়ে জামিনে বেরিয়ে এসে আবার সংখ্যালঘুর বাড়িতে হামলা, *জনকণ্ঠ, ৩০ এপ্রিল ২০০৫*

মে ২০০৫

৩৮০০. *হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সমাবেশ ॥ ধর্মান্ধ শক্তি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে বলেই দেশে সাম্প্রদায়িকতা বাড়ছে, জনকণ্ঠ, ১ মে ২০০৫*

৩৮০১. কিশোরগঞ্জের দিল্লীর আখড়ার সম্পদ গ্রাসের পাঁয়তারা, *ইত্তেফাক, ১ মে ২০০৫*

৩৮০২. জামিন পেয়ে পঞ্চগড়ে সংখ্যালঘুর বাড়িতে ফের হামলা, *সংবাদ, ১ মে ২০০৫*

৩৮০৩. হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সমাবেশ, *ভোরের কাগজ, আজকের কাগজ, ১ মে ২০০৫*

৩৮০৪. গোপালগঞ্জে মন্দিরের মূর্তি ভাঙচুর, মালামাল চুরি ॥ গ্রেফতার-৩, *সংবাদ, আজকের কাগজ, ৪ মে ২০০৫*

৩৮০৫. সমাবেশে নেতৃবৃন্দ ঃ সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের মাধ্যমে দেশছাড়া করার প্রক্রিয়া চলছে, *প্রথম আলো, ৪ মে ২০০৫*

৩৮০৬. ভূমিগ্রাসী সন্ত্রাসীদের হাতে অবরুদ্ধ রাজারহাটের একটি হিন্দু পরিবার, *ভোরের কাগজ, ৪ মে ২০০৫*

৩৮০৭. রাঙ্গামাটিতে সেমিনারে সন্ত লারমা ॥ শোষণ-নিপীড়নে আদিবাসীদের স্বপ্ন হারিয়ে গেছে, *প্রথম আলো ৫ মে ২০০৫*

৩৮০৮. এপ্রিলে দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ১২২টি ॥ এইচ আর সিবিএম এর গবেষণা তথ্য, *সংবাদ, ৬ মে ২০০৫*

৩৮০৯. মোহনপুরে একটি পরিবার নির্যাতিত হয়ে নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছে, *সংবাদ, ৬ মে ২০০৫*

৩৮১০. সংখ্যালঘুদের ভয় দেখানো হচ্ছে, *সংবাদ, ৬ মে ২০০৫*

৩৮১১. জনউদ্যোগের সমাবেশে দাবি ॥ আদিবাসীদের ভূমি ফেরত দিতে হবে, *ভোরের কাগজ, ৬ মে ২০০৫*

৩৮১২. সংখ্যালঘুরা অঙ্কিত ভোট ও নিরাপত্তা নিয়ে ॥ একজনও সংখ্যালঘু প্রিসাইডিং অফিসার নেই, *ভোরের কাগজ, ৬ মে ২০০৫*

৩৮১৩. সিসিসি নির্বাচন ঃ সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের অভিযোগ ॥ দেড়লাখ সংখ্যালঘু ভোটার আতঙ্কে আছে, *আজকের কাগজ, ৭ মে ২০০৫*

৩৮১৪. আদিবাসীদের নামে আনা অর্থ লুটপাটেই শেষ হয়, *সংবাদ, ৭ মে ২০০৫*

৩৮১৫. ঢাকার রামসীতা মন্দির ও আশ্রম বাড়ি দখল করা হচ্ছে, *জনকণ্ঠ, ৮ মে ২০০৫*

৩৮১৬. চট্টগ্রামে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যা ঘটতে থাকে, জনকণ্ঠ, ৯ মে ২০০৫

৩৮১৭. ঘটনাস্থল সোনাইমুড়ী ঃ অপহরণ ও চাঁদাবাজির ৭ দিন পরও থানা মামলা নেয়নি, সংবাদ, ৯ মে ২০০৫

৩৮১৮. সংখ্যালঘু ভোটারদের বাধা, চাপসৃষ্টি, *ভোরের কাগজ, ১০ মে ২০০৫*

৩৮১৯. ছাত্রদল ক্যাডারদের হাতে লাঞ্ছিত মুন্নী বড়ুয়া ॥ জীবনে আর ভোট দিতে আসব না, *যুগান্তর, ১০ মে ২০০৫*

৩৮২০. বাগেরহাটে চাঞ্চল্যকর ঠাকুর বাড়ির গণধর্ষণের মামলায় চার আসামীর ফাঁসি, জনকণ্ঠ, ১২ মে ২০০৫

৩৮২১. বেড়ায় ঋষি সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন, জমি দখলের পাঁয়তারা চালাচ্ছে সন্ত্রাসীরা, *ভোরের কাগজ, ১৪ মে ২০০৫*

৩৮২২. গোবিন্দগঞ্জে মন্দির দখল ॥ দখলদারদের অবিলম্বে উচ্ছেদ করুন, *প্রথম আলো, ১৪ মে ২০০৫*

৩৮২৩. উত্তরায় সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু পরিবারকে প্রাণ নাশের হুমকি দিচ্ছে, *প্রথম আলো, ১৪ মে ২০০৫*

৩৮২৪. বান্দরবানে সেনা গ্যারিসন বড় করা হচ্ছে ঃ উচ্ছেদ আতঙ্কে পাঁচ হাজার আদিবাসী, *সংবাদ, ১৪ মে ২০০৫*

৩৮২৫. চাটমোহরে পাঁচ গ্রামের আদিবাসীদের আল্টিমেটাম, *জনকণ্ঠ, ইনকিলাব, ১৬ মে ২০০৫*

৩৮২৬. সীতাকুণ্ডে সংখ্যালঘু পরিবারের জমি জবর দখলের অভিযোগ, পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে না, *সংবাদ, ১৭ মে ২০০৫*

৩৮২৭. সাতক্ষীরায় সংখ্যালঘুর জমি দখল চেষ্টা, প্রতিবাদে থানা ঘেরাও, *জনকণ্ঠ, ১৭ মে ২০০৫*

৩৮২৮. কালুরঘাটে আদিবাসী তরুণী লাঞ্ছিত ॥ তিন বিডিআর জওয়ানকে প্রত্যাহার করা হয়েছে, *সংবাদ, ১৯ মে ২০০৫*

৩৮২৯. আদিবাসীদের জুমচাষে ধ্বংস হচ্ছে বান্দরবানের বনাঞ্চল, *সংবাদ, ২০ মে ২০০৫*

৩৮৩০. আদিবাসী সাবিনা বাসকি ধর্ষণ ও হত্যা, *সংবাদ, ২০ মে ২০০৫*

৩৮৩১. শরীয়তপুরে সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীকে বোমা মেরে হত্যা, *জনকণ্ঠ, ২০ মে ২০০৫*

৩৮৩২. আদিবাসীদের বাঁচাতে নতুন করে লড়াই করতে হবে ॥ রাঙ্গামাটি সন্তুলারমা, *জনকণ্ঠ, ২১ মে ২০০৫*

৩৮৩৩. নানিয়ারচরে মারমাদের আনারস লুট, কাটতে বাধা, উত্তেজনা, *প্রথম আলো, ২২ মে ২০০৫*

৩৮৩৪. পাঁচ কাহানিয়া গুচ্ছ গ্রামের আদিবাসীদের দুর্দিন, *সংবাদ, ২২ মে ২০০৫*

৩৮৩৫. খাসজমি থেকে উচ্ছেদ চেষ্টা ॥ নাটোরে বিএনপি নেতার নেতৃত্বে সংখ্যালঘু মহিলার ওপর পাশবিক নির্যাতন, *জনকণ্ঠ, ২২ মে ২০০৫*

৩৮৩৬. শরীয়তপুরে নিখিল ঘোষ হত্যার প্রতিবাদে ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট বিক্ষোভ স্মারক লিপি॥ ৭৮ ঘন্টা পরও ঘাতকদের শনাক্ত করা যায়নি, *ভোরের কাগজ, ২২ মে ২০০৫*

৩৮৩৭. কথিত কবলার জোরে দখল হয়ে গেছে বসতবাড়ি মন্দির শ্মশান ॥ পটুয়াখালির দশমিনায় সংখ্যালঘুরা চরম হুমকির মুখে দিন কাটাচ্ছে, *ভোরের কাগজ, ২৩ মে ২০০৫*

৩৮৩৮. ঝালকাঠি, হত্যা ডাকাতি চুরির ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে, *সংবাদ, ২৩ মে ২০০৫*

৩৮৩৯. রাঙ্গামাটিতে লুণ্ঠিত আনারস উদ্ধার ॥ আটক-৩, *জনকণ্ঠ, ২৩ মে ২০০৫*

৩৮৪০. সাতক্ষীরায় বাদীকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করার হুমকি, *জনকণ্ঠ, ২৩ মে ২০০৫*

৩৮৪১. শরীয়তপুরে তিন দিনের শোক কর্মসূচী শেষে ব্যবসায়ীদের ডিসিকে স্মারকলিপি (মিষ্টি ব্যবসায়ী হত্যাকাণ্ড), *জনকণ্ঠ, ২৩ মে ২০০৫*

৩৮৪২. খাগড়াছড়িতে জনসংহতির অফিসে ইউপিডিএফের গুলি, পাল্টা অভিযোগ, *জনকণ্ঠ, ২৩ মে ২০০৫*

৩৮৪৩. খাগড়াছড়িতে পিসিপি কর্মী গুলিবিদ্ধ হওয়ার কথা স্বীকার করেছে পুলিশ, *সংবাদ*, *২৩ মে ২০০৫*

৩৮৪৪. পঞ্চগড়ে সংখ্যালঘু পরিবারকে এলাকা ছাড়ার হুমকি, *সংবাদ*, *২৪ মে ২০০৫*

৩৮৪৫. রাজশাহীর মোহনপুরে সংখ্যালঘু নির্যাতন ॥ বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ ক্যাডারদের হামলা ঃ আহত ২০, তরুণী লাঞ্ছিত, *সংবাদ*, *২৪ মে ২০০৫*

৩৮৪৬. বাড়ির রাস্তা কেটে ঘর তৈরী ॥ শ্যামনগরে ১১ সংখ্যালঘু পরিবার অবরুদ্ধ, *জনকণ্ঠ*, *২৪ মে ২০০৫*

৩৮৪৭. তালায় সংখ্যালঘু পরিবারের উপর হামলায় আহত ৮ জন, *আজকের কাগজ*, *২৫ মে ২০০৫*

৩৮৪৮. সাতক্ষীরায় ১১টি হিন্দু পরিবার দু সপ্তাহ ধরে অবরুদ্ধ, *প্রথম আলো ২৫ মে ২০০৫*

৩৮৪৯. সিঙ্গাইরে দুটি মন্দিরে হামলা প্রতিমা ভাঙচুর, *প্রথম আলো*, *জনকণ্ঠ ২৬ মে ২০০৫*

৩৮৫০. নাটোরে আদিবাসীদের জন্য বরাদ্দকৃত টাকার হদিস নেই, *সংবাদ*, *২৬ মে ২০০৫*

৩৮৫১. সন্ত্রাসীদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন রাজৈরের রীনা রাণী সরকার, *ভোরের কাগজ*, *২৭ মে ২০০৫*

৩৮৫২. হামলায় উচ্ছেদ শ্যামনগরের আটটি পরিবার পথে ঃ পুলিশ মামলা নিচ্ছে না, *যুগান্তর*, *ভোরের কাগজ*, *২৮ মে ২০০৫*

৩৮৫৩. বিরামপুরে এক মুচি পরিবারের ঘর ভেঙ্গে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা ॥ থানা পুলিশ অভিযোগ আমলে নেয়নি, *সংবাদ*, *২৮ মে ২০০৫*

৩৮৫৪. সিংগাইরে মূর্তি ভাংচুর ঘটনায় দুজন গ্রেফতার, *আজকের কাগজ*, *২৮ মে ২০০৫*

৩৮৫৫. চাটমোহরে আদিবাসীরা সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি ঃ গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে অনেকে, *সংবাদ*, *২৮ মে ২০০৫*

৩৮৫৬. রংপুরের বদরগঞ্জে আদিবাসী গৃহবধুকে গণধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ, *আজকের কাগজ*, *জনকণ্ঠ*, *ভোরের কাগজ*, *প্রথম আলো*, *সংবাদ*, *২৯ মে ২০০৫*

৩৮৫৭. সাতক্ষীরায় ঘের সন্ত্রাসীদের হাতে উচ্ছেদ ৮ সংখ্যালঘু পরিবার পাঁচদিন যাবত গ্রাম ছাড়া, *জনকণ্ঠ*, *২৯ মে ২০০৫*

৩৮৫৮. পীরগঞ্জে জাপা এমপি অবরুদ্ধ সংখ্যালঘুদের ঝাটা মিছিল, *সংবাদ*, *৩০ মে ২০০৫*

৩৮৫৯. খুলনায় শত বছরের পুরনো দেবোত্তর সম্পত্তি ইজারা নেয়ার চেষ্টা, *জনকণ্ঠ*, *৩০ মে ২০০৫*

৩৮৬০. সাংসদের নির্দেশে প্রাচির নির্মাণের উদ্যোগ ॥ রংপুরে মন্দিরে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করা নিয়ে সংঘর্ষে আহত-১০, *ভোরের কাগজ*, *৩০ মে ২০০৫*

৩৮৬১. হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সমাবেশ ॥ ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করেই সাম্প্রদায়িকতা রুখতে হবে, *আজকের কাগজ*, *৩১ মে ২০০৫*

৩৮৬২. চাটমোহরে আদিবাসীদের সেই ভাঙা মূর্তি বিসর্জন দেয়া হয়েছে, *সংবাদ*, *৩১ মে ২০০৫*

৩৮৬৩. উল্লাপাড়ায় পূর্ণিমা ধর্ষণ মামলা ॥ দ্বিতীয় দফা চার্জশীটের নারাজি শুনানির তারিখ আবারও পেছাল, *সংবাদ*, *৩১ মে ২০০৫*

৩৮৬৪. হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের তথ্য এপ্রিলে ১২টি হত্যাসহ ৪৫টি সংখ্যালঘু ও নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, *ভোরের কাগজ*, *২১ মে ২০০৫*

জুন ২০০৫

৩৮৬৫. রংপুরে আদিবাসী গৃহবধূকে ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে মিছিল সমাবেশ, *জনকণ্ঠ*, *১ জুন ২০০৫*

৩৮৬৬. মেহেরপুরে হিন্দুপাড়ায় সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব ॥ আহত ১, *জনকণ্ঠ*, *১ জুন ২০০৫*

৩৮৬৭. জমি দখলের পাঁয়তারা, ঝালকাঠির পল্লীতে তিন সন্তানের জননীকে এ্যাসিড নিক্ষেপ, *জনকণ্ঠ*, *১ জুন ২০০৫*

৩৮৬৮. আসামিদের অব্যাহত হুমকিতে নির্যাতিত পরিবার আতঙ্কে, *সংবাদ*, *৫ জুন ২০০৫*

৩৮৬৯. জয়পুরহাটের গ্রামে হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হামলা, ভাংচুর, আতঙ্ক, *জনকণ্ঠ*, *৪ জুন ২০০৫*

৩৮৭০. নওগাঁয় এক সংখ্যালঘু পরিবারকে বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ, *জনকণ্ঠ*, *৪ জুন ২০০৫*

৩৮৭১. বিশ্বনাথে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলায় আহত ১০, *আজকের কাগজ*, *৪ জুন ২০০৫*

৩৮৭২. সিলেটের গ্রামে সংখ্যালঘুর বাড়িতে হামলা ॥ আহত ১০, *জনকণ্ঠ*, *৪ জুন ২০০৫*

৩৮৭৩. নওগাঁয় পূজামণ্ডপের জায়গা দখল করে রাস্তা নির্মাণ, মূর্তি ঝোলানো গাছে, *ভোরের কাগজ*, *৫ জুন ২০০৫*

৩৮৭৪. নওগাঁ মন্দিরের জায়গা দখলের চেষ্টা, *সংবাদ*, *৫ জুন ২০০৫*

৩৮৭৫. গির্জায় বোমা হামলার ঘটনা ফাইলচাপা পড়ে গেছে, *সমকাল*, *৫ জুন ২০০৫*

৩৮৭৬. মির্জাপুর আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে, *সমকাল*, *৫ জুন ২০০৫*

৩৮৭৭. সাভারে সংখ্যালঘুর বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর এলাকা ছাড়ার হুমকি, *প্রথম আলো*, *৬ জুন ২০০৫*

৩৮৭৮. মধুপুরে ৬ বছরে খুন ৫ আদিবাসী, পিরেন হত্যা মামলার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, *সংবাদ*, *৬ জুন ২০০৫*

৩৮৭৯. ঘটনা ভিন্ন খাতে প্রবাহের চেষ্টা, *সংবাদ*, *৬ জুন ২০০৫*

৩৮৮০. সেনবাগে চাঁদা না দেয়ায় সংখ্যালঘু শিক্ষককে রড দিয়ে পিটিয়ে অজ্ঞান, *জনকণ্ঠ*, *৬ জুন ২০০৫*

৩৮৮১. সিলেটে সংখ্যালঘুর বাড়িতে হামলায় মামলা ॥ ১৪ আসামীর গ্রেফতার দাবি, *জনকণ্ঠ*, *৬ জুন ২০০৫*

৩৮৮২. কেশবপুরে জামাত নেতার কথায় পুলিশ হিন্দুদের ধর্মসভা বন্ধ করে দিয়েছে, *সংবাদ*, *৬ জুন ২০০৫*

৩৮৮৩. সাভারে রাতের আঁধারে সংখ্যালঘু পরিবারে সন্ত্রাসী হামলা ভাঙচুর লুটতরাজ ॥ এলাকা ছাড়ার হুমকি, *আজকের কাগজ*, *৬ জুন ২০০৫*

৩৮৮৪. আনোয়ারায় মন্দিরে হামলা লুট আগুন, মামলা হলেও মূল হোতাকে গ্রেফতার করছে না পুলিশ, *ভোরের কাগজ*, *৬ জুন ২০০৫*

৩৮৮৫. গফরগাঁওয়ে সংখ্যালঘু কিশোরীকে বিএনপি ক্যাডারদের গণধর্ষণ, *জনকণ্ঠ, ৭ জুন ২০০৫*

৩৮৮৬. দিনাজপুরে আদিবাসী গৃহবধূকে অপহরণ ও ধর্ষণ, মামলা, *প্রথম আলো, ৮ জুন ২০০৫*

৩৮৮৭. বান্দরবানে আদিবাসীদের সমাবেশ, রুমায় সেনানিবাস সম্প্রসারণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বাতিলের দাবি, *ভোরের কাগজ, ৮ জুন ২০০৫*

৩৮৮৮. নাটোরে আদিবাসী পল্লীতে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট, আহত ৩০, *প্রথম আলো, ৯ জুন ২০০৫*

৩৮৮৯. নাটোরে সন্ত্রাসী হামলায় ১০ আদিবাসী আহত ৫টি দোকান ভাঙচুর, *ভোরের কাগজ, ৯ জুন ২০০৫*

৩৮৯০. ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য কালো দিবস আজ, *ভোরের কাগজ, ৯ জুন ২০০৫*

৩৮৯১. অষ্টম সংশোধনী বাতিলের দাবি করেছে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, *প্রথম আলো, ১০ জুন ২০০৫*

৩৮৯২. নাটোরে নির্যাতিত আদিবাসী জিতেনের মামলা নেয়নি পুলিশ, *সংবাদ, ১০ জুন ২০০৫*

৩৮৯৩. সিংড়ায় আদিবাসীদের ৫ দোকানে ভাঙচুর-লুট আহত ৫, *সংবাদ, ১০ জুন ২০০৫*

৩৮৯৪. হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সমাবেশ ঃ বাহাত্তর সালের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান, *ভোরের কাগজ, ১০ জুন ২০০৫*

৩৮৯৫. সংখ্যালঘু দিবস পালনে বিভিন্ন দেশে ঐক্য পরিষদের বিক্ষোভ, *ভোরের কাগজ, ১১ জুন ২০০৫*

৩৮৯৬. রাজশাহী বিভাগে ৯৫ ভাগ আদিবাসী ভূমির মালিকানা হারিয়ে ভূমিহীন, *আজকের কাগজ, ১২ জুন ২০০৫*

৩৮৯৭. ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাড়িটি অরক্ষিত, *সংবাদ, ১২ জুন ২০০৫*

৩৮৯৮. পাবনায় খ্রিস্টান পল্লীতে হামলা ঃ আদালতে বাদীকে অবরোধ, *সমকাল, ১২ জুন ২০০৫*

৩৮৯৯. পঞ্চগড়ে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর নির্যাতন ঃ মিছিল, *সংবাদ, ১২ জুন ২০০৫*

৩৯০০. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর চরম নির্মমতা, ট্রেনিঙে ভারতে পৌছে দেওয়ার নামে ৩৮৮ সংখ্যালঘু বাঙালিকে হত্যার শোকাবহ ১৩ জুন আজ, *ভোরের কাগজ, ১৩ জুন ২০০৫*

৩৯০১. সাতক্ষীরায় ভূমিদস্যুর কোপানলে ৮শ' সংখ্যালঘু পরিবার, প্রতিকার চেয়ে সংবাদ সম্মেলন, *সংবাদ, ১৩ জুন ২০০৫*

৩৯০২. দিনাজপুরে ২ সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যদের হত্যার চেষ্টা, *সমকাল, ১৪ জুন ২০০৫*

৩৯০৩. কুলিয়ারচরে সংখ্যালঘু পরিবারের জমি দখল করে ঘর নির্মাণ, *সংবাদ, ১৫ জুন ২০০৫*

৩৯০৪. মাদারীপুরে একটি সংখ্যালঘু পরিবারের সম্পত্তি দখল, *সংবাদ, ১৫ জুন ২০০৫*

৩৯০৫. আনোয়ারার মন্দিরে হামলাকারীদের গ্রেফতার দাবি, আজ প্রতিবাদ সমাবেশ, *ভোরের কাগজ, ১৫ জুন ২০০৫*

৩৯০৬. রামগঞ্জে নেশা খাইয়ে ৩ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট, সংবাদ, ১৬ জুন ২০০৫

৩৯০৭. চট্টগ্রামে এসআই পদে সংখ্যালঘু প্রার্থীরা বাদ!, *প্রথম আলো, ১৭ জুন ২০০৫*

৩৯০৮. ধামরাইয়ে মন্দির ভেঙে জমি দখলের হুমকি দিচ্ছে সন্ত্রাসীরা, *প্রথম আলো, ১৭ জুন ২০০৫*

৩৯০৯. সৈয়দপুরে মঙ্গলা দেবী মন্দিরের সম্পত্তি বেদখল হয়ে যাচ্ছে, *সমকাল, ১৮ জুন ২০০৫*

৩৯১০. নওগাঁয় সংখ্যালঘু পরিবার গ্রামছাড়া, *সমকাল, ১৮ জুন ২০০৫*

৩৯১১. রমনা, সীতানাথ ও মদনেশ্বর মন্দিরের জমি দখলদারমুক্ত করুন, *সংবাদ, ১৮ জুন ২০০৫*

৩৯১২. নির্যাতন বন্ধের দাবিতে মাইনোরিটি সংগ্রাম পরিষদের বিক্ষোভ, *প্রথম আলো, ১৮ জুন ২০০৫*

৩৯১৩. আদিবাসীদের জাদুঘর সামগ্রীতে পরিণত করার প্রয়াস চলছে, *যুগান্তর, ১৯ জুন ২০০৫*

৩৯১৪. বিশ্বনাথ ও বালাগঞ্জে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলার প্রতিবাদ জানিয়েছে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, *আজকের কাগজ, ১৯ জুন ২০০৫*

৩৯১৫. সাতক্ষীরায় শ্মশান দখল করে আবাসন প্রকল্প, *প্রথম আলো, ২০ জুন ২০০৫*

৩৯১৬. আদিবাসী শিশুদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার ব্রত নিয়েছে টালীথা কুর্মি, *ইত্তেফাক, ২০ জুন ২০০৫*

৩৯১৭. আদিবাসী পীরেন স্লান হত্যা মামলার ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা, *প্রথম আলো, ২১ জুন ২০০৫*

৩৯১৮. ঠাকুরগাঁওয়ে আদিবাসী গৃহবধূকে মধ্যযুগীয় নির্যাতন, *সংবাদ, ২১ জুন ২০০৫*

৩৯১৯. ঠাকুরগাঁওয়ে আদিবাসী গৃহবধূ নির্যাতিত ঃ প্রতিবাদ বিক্ষোভ, *যুগান্তর, ২১ জুন ২০০৫*

৩৯২০. মিরসরাইয়ে সংখ্যালঘুর ৪ একর জায়গা দখলের অভিযোগ, *প্রথম আলো, ২২ জুন ২০০৫*

৩৯২১. কোটালীপাড়ায় মন্দিরের সেবাইতকে উচ্ছেদ ও প্রাণনাশের হুমকি, *সংবাদ, ২২ জুন ২০০৫*

৩৯২২. আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি নিরাপত্তার দাবিতে সমাবেশ অনুষ্ঠিত, *সংবাদ, ২৪ জুন ২০০৫*

৩৯২৩. দিনাজপুরে আবাসন প্রকল্পের জন্য ৬৫ সংখ্যালঘু পরিবার উচ্ছেদ, *জনকণ্ঠ, ২৪ জুন ২০০৫*

৩৯২৪. দুর্গাপুর দশভূজা মন্দির থেকে মূর্তি চুরি, *সংবাদ, ২৪ জুন ২০০৫*

৩৯২৫. তাড়াশে মন্দিরের গাছ কেটে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা, *সংবাদ, ২৪ জুন ২০০৫*

৩৯২৬. মন্দির ভাঙচুর ও স্কুলছাত্রী অপহরণের প্রতিবাদ করেছে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, *ভোরের কাগজ, ২৫ জুন ২০০৫*

৩৯২৭. মিরসরাইয়ে ১১ একর জমির বিরোধকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু পরিবারকে পুড়িয়ে মারার হুমকি, *ভোরের কাগজ, ২৫ জুন ২০০৫*

৩৯২৮. দিনাজপুরে ৫ বাড়িতে হামলা কারণ উদ্ঘাটন হয়নি এখনও, *সংবাদ, ২৫ জুন ২০০৫*

৩৯২৯. সন্ত্রাসীদের ভয়ে সোনাপুর বাজারের অনেক ব্যবসায়ী পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, *সংবাদ, ২৫ জুন ২০০৫*

৩৯৩০. পার্বতীপুরে ভূমিহীন ৬৫টি সংখ্যালঘু পরিবার উচ্ছেদ, *আজকের কাগজ, ২৬ জুন ২০০৫*

৩৯৩১. সোনাইমুড়ীতে শ্রী গদাধর মন্দিরে চুরি ॥ গ্রেফতার ২, *আজকের কাগজ, ২৬ জুন ২০০৫*

৩৯৩২. পার্বতীপুরে আরও ১২ সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদ, *জনকণ্ঠ, ২৬ জুন ২০০৫*

৩৯৩৩. পীরেন স্নান হত্যা মামলা, তদন্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে নারাজি আবেদনের শুনানি আবার পেছাল, *প্রথম আলো, ২৬ জুন ২০০৫*

৩৯৩৪. ভোলায় সংখ্যালঘু কিশোরীকে ধর্ষণ ॥ আটকের পর ধর্ষকের পলায়ন, *জনকণ্ঠ, ২৬ জুন ২০০৫*

৩৯৩৫. পার্বতীপুরে আরও ১২ সংখ্যালঘু পরিবারকে উচ্ছেদ, *জনকণ্ঠ, ২৬ জুন ২০০৫*

৩৯৩৬. নাটোরে পুলিশের সহযোগিতায় ১০ সংখ্যালঘুর বাড়িতে সন্ত্রাসী হামলা, *জনকণ্ঠ, ২৬ জুন ২০০৫*

৩৯৩৭. প্রধানমন্ত্রীর 'আদর্শ গ্রাম প্রকল্প' বাস্তবায়ন! দিনাজপুরে ৬৫টি ভূমিহীন সংখ্যালঘু পরিবার উচ্ছেদ, *প্রথম আলো, ২৬ জুন ২০০৫*

৩৯৩৮. মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারির বিভিন্ন পর্যায়ে বৈঠক, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও বিচারবহির্ভূত হত্যায় উদ্বেগ, *সমকাল, ২৭ জুন ২০০৫*

৩৯৩৯. পার্বতীপুরের খাস জমি থেকে আরও ১২ সংখ্যালঘু পরিবার উচ্ছেদ, *আজকের কাগজ, ২৭ জুন ২০০৫*

৩৯৪০. নিরাপত্তা চেয়ে ময়মনসিংহে এক সংখ্যালঘু পরিবারের সাংবাদিক সম্মেলন, *জনকণ্ঠ, ২৮ জুন ২০০৫*

৩৯৪১. আদিবাসীদের বিরুদ্ধে চার হাজার মামলা, *জনকণ্ঠ, ২৮ জুন ২০০৫*

৩৯৪২. আদিবাসীদের ভূমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে ৪০ গ্রাম হুমকির মুখে, *প্রথম আলো, ২৮ জুন ২০০৫*

৩৯৪৩. সংখ্যালঘু নির্যাতন ঃ মে মাসে ৪১ ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘন, *সংবাদ, ২৮ জুন ২০০৫*

৩৯৪৪. ময়মনসিংহে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু পরিবারের জমি দখলের অভিযোগ, *সমকাল, ২৮ জুন ২০০৫*

৩৯৪৫. সভাপতির বদলির নির্দেশ অমান্য করার জের, ছাত্রছাত্রীদের সামনে লাঞ্ছিত হয়ে স্কুল ছেড়েছেন রায়পুরের এক প্রবীণ শিক্ষক, *ভোরের কাগজ, ২৯ জুন ২০০৫*

৩৯৪৬. ময়মনসিংহে সংখ্যালঘুদের মারধর ঃ হত্যার হুমকি, *সংবাদ, ২৯ জুন ২০০৫*

৩৯৪৭. কুড়িগ্রামে মন্দিরের জমি দখল ভাঙচুর মারধর, *সংবাদ, ৩০ জুন ২০০৫*

৩৯৪৮. সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৫০তম বার্ষিকী, আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলবেই, *প্রথম আলো, ৩০ জুন ২০০৫*

৩৯৪৯. বান্দরবানে বিএনপি-আওয়ামী লীগ নেতার কান্ড; বোমাং রাজবংশের এক পরিবারের জমি দখলের পাঁয়তারা, *প্রথম আলো, ৫ জুন ২০০৫*

জুলাই ২০০৫

৩৯৫০. পার্বতীপুরে উচ্ছেদ হওয়া ১৫ আদিবাসী পরিবার খোলা আকাশের নিচে, *জনকণ্ঠ, ১ জুলাই ২০০৫*

৩৯৫১. নীলফামারীর পল্লীতে বিএনপি নেতার পুত্র কর্তৃক বিধবাকে ধর্ষণের অভিযোগ, *আজকের কাগজ, ২ জুলাই ২০০৫*

৩৯৫২. কাপাসিয়ায় সংখ্যালঘুর বাড়িতে হামলা আহত ৬, *আজকের কাগজ, ২ জুলাই ২০০৫*

৩৯৫৩. উল্লাপাড়ায় একটি সংখ্যালঘু পরিবারের বসতবাড়ি জবরদখল ॥ কয়েক দফা বৈঠকেও ফয়সালা হয়নি ॥ প্রতিনিধি সভায় আদিবাসী ইউনিয়ন গঠন, *আজকের কাগজ, ৩ জুলাই ২০০৫*

৩৯৫৪. সাংবিধানিক স্বীকৃতি, দখল-উচ্ছেদ বন্ধ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অক্ষুন্ন রেখে উন্নয়নের দাবি, *আজকের কাগজ, ৩ জুলাই ২০০৫*

৩৯৫৫. কসবায় গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে মৃত্যু, *প্রথম আলো, ৩ জুলাই ২০০৫*

৩৯৫৬. সন্ত্রাসীদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে মংলার এক খ্রিস্টান পরিবার, *সমকাল, ৪ জুলাই ২০০৫*

৩৯৫৭. সন্দীপ পৌর নির্বাচনে জোট ক্যাডারদের তাণ্ডব কেন্দ্র দখল জালভোট, *সংবাদ, ৫ জুলাই ২০০৫*

৩৯৫৮. মহাদেবপুরে এক সংখ্যালঘু মৎস ব্যবসায়ীর লিজ নেওয়া পুকুর থেকে মাছ লুট, *আজকের কাগজ, ৫ জুলাই ২০০৫*

৩৯৫৯. সন্দীপ পৌরসভা নির্বাচন সাংসদ সমর্থক প্রার্থীই জিতলেন, *প্রথম আলো, ৫ জুলাই ২০০৫*

৩৯৬০. ঐক্য পরিষদের সংবাদ সম্মেলন ঃ মুন্সিগঞ্জে হিন্দুদের নির্যাতন ও সম্পত্তি দখলের অভিযোগ, *প্রথম আলো, ৫ জুলাই ২০০৫*

৩৯৬১. মংলায় নির্যাতনের বিচার চেয়ে উল্টো হয়রান হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, *জনকণ্ঠ, ৫ জুলাই ২০০৫*

৩৯৬২. ভোলায় ধর্ষণের অভিযোগ এনে দেড় লাখ টাকা আদায়, *সংবাদ, ৭ জুলাই ২০০৫*

৩৯৬৩. সাংবাদিক কল্যাণ সাহাকে হুমকি দেয়ায় নিন্দা, *সংবাদ, ৭ জুলাই ২০০৫*

৩৯৬৪. গলাচিপার এক সংখ্যালঘু পরিবারকে দেশছাড়া করার পাঁয়তারা, *যুগান্তর, ৭ জুলাই ২০০৫*

৩৯৬৫. পার্বতীপুরে আদর্শ গ্রাম প্রকল্প ঃ উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলোর সংবাদ সম্মেলন, স্মারকলিপি, *প্রথম আলো, ১২ জুলাই ২০০৫*

৩৯৬৬. যশোরে সংখ্যালঘু গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার, *জনকণ্ঠ, ৭ জুলাই ২০০৫*

৩৯৬৭. যশোরে সংখ্যালঘু দম্পত্তি, রংপুর ও রাঙ্গামাটিতে আরও দুই খুন, *জনকণ্ঠ, ১২ জুলাই ২০০৫*

৩৯৬৮. শরণখোলায় মন্দিরে হামলা ভাঙচুর, রথযাত্রা পণ্ড, *জনকণ্ঠ, ১২ জুলাই ২০০৫*

৩৯৬৯. নাটোরে আদিবাসী পল্লীতে বিএনপি ক্যাডারদের হামলা আহত ১০, *সংবাদ, ১২ জুলাই ২০০৫*

৩৯৭০. রাজশাহীতে সংবাদ সম্মেলন, এসপির কাছে অভিযোগ, সন্ত্রাসীদের হুমকিতে সংখ্যালঘু ও আদিবাসী ৫০ পরিবার আতঙ্কে, *প্রথম আলো, ১৩ জুলাই ২০০৫*
৩৯৭১. সুজানগরে আবারও ৫ সংখ্যালঘুর বাড়িতে ডাকাতি, *আজকের কাগজ, ১৪ জুলাই ২০০৫*
৩৯৭২. গলাচিপায় পরেশ চন্দ্রকে দেশছাড়া করতে প্রভাবশালীরা মরিয়া, *জনকণ্ঠ, ১৬ জুলাই ২০০৫*
৩৯৭৩. দেবীদ্বারে ডাকাতের ভয়ে ৮ সংখ্যালঘু পরিবার বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে, *জনকণ্ঠ, ১৬ জুলাই ২০০৫*
৩৯৭৪. দেবীদ্বারে ডাকাতের ভয়ে ৮ সংখ্যালঘু পরিবার বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে, *জনকণ্ঠ, ১৬ জুলাই ২০০৫*
৩৯৭৫. মাদারীপুরে ৪ সংখ্যালঘু পরিবারকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা, *যুগান্তর, ১৭ জুলাই ২০০৫*
৩৯৭৬. পার্বতীপুরে হুমকির মুখে কনের বিয়ে হলো বরের বাড়িতে, *জনকণ্ঠ, ১৭ জুলাই ২০০৫*
৩৯৭৭. শাজহাদপুরে কালীমন্দিরের বটগাছটি দুর্বৃত্তরা কেটে নিয়ে গেছে, *সংবাদ, ১৮ জুলাই ২০০৫*
৩৯৭৮. কমলগঞ্জে চা শ্রমিককে অপহরণ, ধর্ষণ ও ছবি তুলে স্ট্যাম্পে সাক্ষর আদায়ের অভিযোগ, *ভোরের কাগজ, ১৯ জুলাই ২০০৫*
৩৯৭৯. উজিরপুরের মুক্তিযোদ্ধা বাবু লাল শীল হত্যা মামলার তদন্ত ঝিমিয়ে পড়েছে, ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টার অভিযোগ, *ভোরের কাগজ, ১৯ জুলাই ২০০৫*
৩৯৮০. বাঁশখালীতে ১১ জনকে পুড়িয়ে হত্যা মামলা, মূল হোতাদের বাদ দিয়ে চার্জশিট তৈরি আজ মনিটরিং সেলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, *যুগান্তর ২০ জুলাই ২০০৫*
৩৯৮১. দেবীদ্বারে ডাকাত ও নারী নির্যাতন, গ্রামছাড়া পরিবারগুলো বাড়ি ফেরেনি ডাকাতরা বহাল তবিয়তে, *প্রথম আলো, ২০ জুলাই ২০০৫*
৩৯৮২. বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু নির্যাতনে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের উদ্বেগ প্রকাশ, *ভোরের কাগজ, ২০ জুলাই ২০০৫*
৩৯৮৩. দাউদকান্দিতে বসতভিটা দখলের জন্য গৃহবধূকে কুপিয়ে জখম, *সংবাদ, ২১ জুলাই ২০০৫*
৩৯৮৪. দেবিদ্বারে হিন্দুদের গ্রামছাড়া, সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ খুলল হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, *যুগান্তর, ২১ জুলাই ২০০৫*
৩৯৮৫. মধুপুরে আদিবাসীদের আনারস ক্ষেত লুট করে নিয়েছে বিএনপির সন্ত্রাসীরা, *জনকণ্ঠ, ২৩ জুলাই ২০০৫*
৩৯৮৬. দেবিদ্বারে ডাকাতি ও নারী নির্যাতন, ঐক্যফ্রন্ট নেতাদের বক্তব্যে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ে ক্ষোভ ঃ ঠাকুরগাঁওয়ে আদিবাসী গৃহবধূকে নির্যাতনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ, *প্রথম আলো, ২৩ জুলাই ২০০৫*
৩৯৮৭. বিএনপি নেতাদের রোষানলে এক সংখ্যালঘু পরিবার, *সংবাদ, ২৪ জুলাই ২০০৫*
৩৯৮৮. উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের উচ্ছেদ বন্ধের দাবি, *প্রথম আলো, ২৪ জুলাই ২০০৫*
৩৯৮৯. বরিশালে খ্রিস্টান পল্লীতে অগ্নিসংযোগ ৫ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে ছাই, *ভোরের কাগজ, ২৫ জুলাই ২০০৫*
৩৯৯০. প্রতিবেশীর সঙ্গে বিরোধ ও নির্যাতনের জের, মুক্তাগাছায় একটি পরিবার ১৮ দিন ধরে বাড়িছাড়া, *প্রথম আলো, ২৫ জুলাই ২০০৫*
৩৯৯১. বরিশালে খ্রিস্টান পল্লীর তিন দোকান জ্বালিয়ে দিয়েছে ছাত্রদল ক্যাডাররা, হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়েছে, *জনকণ্ঠ, ২৫ জুলাই ২০০৫*
৩৯৯২. বেড়ায় কালীমন্দিরের জমি জবরদখলের প্রতিযোগিতা, *সংবাদ, ২৫ জুলাই ২০০৫*
৩৯৯৩. দিনাজপুরে ৬৫ সংখ্যালঘু পরিবার উচ্ছেদের প্রতিবাদে সুশীল সমাজের সমাবেশ, *জনকণ্ঠ, ২৬ জুলাই ২০০৫*
৩৯৯৪. পুড়িয়ে মারার হুমকি, গাজীপুরে ঘুম নেই আদিবাসীদের চোখে ঃ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে জামায়াত-বিএনপি পল্লী গড়ার পাঁয়তারা, *জনকণ্ঠ, ২৬ জুলাই ২০০৫*
৩৯৯৫. পার্বতীপুরে উচ্ছেদকৃত ৬৫ ভূমিহীন পরিবারের পুনর্বাসন দাবি, *সংবাদ, ২৬ জুলাই ২০০৫*
৩৯৯৬. বরিশালে উত্ত্যক্ত করার জের ধরে ৪টি দোকানে অগ্নিসংযোগ ॥ গ্রেফতার ৪, *আজকের কাগজ, ২৬ জুলাই ২০০৫*
৩৯৯৭. বরিশালে খ্রিস্টান পল্লীর বাসিন্দারা এখনো আতঙ্কে, ৭ আসামীর মাল ক্রোক ঃ আরো ৫ জন গ্রেফতার, *সমকাল, ২৬ জুলাই ২০০৫*
৩৯৯৮. বাঁশখালীর একই পরিবারের ১১ জনকে পুড়িয়ে হত্যা মামলার ২ বছর তদন্তকারী কর্মকর্তাই জানেন না কখন চার্জশিট দেওয়া হবে!, *সমকাল, ২৭ জুলাই ২০০৫*
৩৯৯৯. কাপাসিয়ায় জামিন পেয়েই আসামীরা দখল করেছে বাদির বসতভিটা, *আজকের কাগজ, ২৭ জুলাই ২০০৫*
৪০০০. মাগুরায় অস্ত্রের মুখে সংখ্যালঘু শিক্ষকের জমি রেজিস্ট্রি!, *সংবাদ, ২৭ জুলাই ২০০৫*
৪০০১. তর্তীপুর মহাশ্মশানঘাট দখলের চেষ্টা, *সংবাদ, ২৭ জুলাই ২০০৫*
৪০০২. নাটোরে মন্দিরে ধর্মীয় উৎসবে মহিলাদের ওপর হামলা, *সংবাদ, ২৭ জুলাই ২০০৫*
৪০০৩. উত্ত্যক্ত করায় চড়, নাটোরে বখাটেরা কলেজছাত্রীকে অপহরণে ব্যর্থ হয়ে বেধড়ক মারপিট, *জনকণ্ঠ, ২৮ জুলাই ২০০৫*
৪০০৪. লালপুরে মন্দিরে হামলা, জড়িতদের ৩ দিনের মধ্যে গ্রেফতারের নির্দেশ দিলেন প্রতিমন্ত্রী, *সংবাদ, ২৮ জুলাই ২০০৫*
৪০০৫. রাজবাড়ীতে আদিবাসী পরিবারে যুবদল ক্যাডারদের হামলা ঃ আহত ৭, *সংবাদ, ২৮ জুলাই ২০০৫*
৪০০৬. ঠাকুরগাঁওয়ে আদিবাসী গৃহবধূ নির্যাতনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ ॥ ডিসি ও এসপি অফিস ঘেরাও, *আজকের কাগজ, ২৮ জুলাই ২০০৫*
৪০০৭. নীলফামারীর হংসরাজ প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে মামলা করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, *সংবাদ, ২৮ জুলাই ২০০৫*
৪০০৮. চাঁদা না দেওয়ার জের, ধামরাইয়ে সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীসহ ৩ জনকে পিটিয়ে-কুপিয়ে জখম, *প্রথম আলো, ২৮ জুলাই ২০০৫*
৪০০৯. খুলনায় মানিকচন্দ্র সাহার নামে নির্মিত সড়কের ফলক ভেঙে ফেলেছে দুর্বৃত্তরা, *প্রথম আলো, ২৮ জুলাই ২০০৫*

৪০১০. অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিলের দাবি, হিন্দুদের হারানো ২১ লাখ একর জমির প্রায় পুরোটাই বেহাত, *প্রথম আলো*, *২৯ জুলাই ২০০৫*

৪০১১. সাতক্ষীরায় আদিবাসী মুণ্ডাদের উচ্ছেদ করে মৎস চাষের পাঁয়তারা, অত্যাচারী জামাত এমপির নিকটাত্মীয়, *সংবাদ*, *২৯ জুলাই ২০০৫*

৪০১২. যশোরের দেওয়াপাড়ায় সংখ্যালঘু দম্পতি হত্যা মামলা নিয়ে পুলিশের ঘুষ বাণিজ্য, *সংবাদ*, *২৯ জুলাই ২০০৫*

৪০১৩. বিলিয়া ও প্রতিরোধ আন্দোলনের আলোচনা সভায় অভিমত, অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইনের প্রয়োগ বঞ্চনার সৃষ্টি করেছে, *ভোরের কাগজ*, *২৯ জুলাই ২০০৫*

৪০১৪. আলোচনা সভায় বক্তারা, ৪ লাখ জবর দখলকারীর হাতে ১০ লাখ হিন্দু পরিবার বহু ধরনের সম্পদ খুইয়েছেন, *আজকের কাগজ*, *২৯ জুলাই ২০০৫*

৪০১৫. সন্ত্রাসী গ্রেফতারে গিয়ে সেনা সদস্যদের হামলা মানিকছড়িতে ৩২ আদিবাসী আহত, *ভোরের কাগজ*, *২৯ জুলাই ২০০৫*

৪০১৬. অর্পিত সম্পত্তি আইনের কবলে পড়ে হিন্দুদের দেড় লাখ কোটি টাকার ভূমি ক্ষতিগ্রস্ত, *জনকণ্ঠ*, *৩০ জুলাই ২০০৫*

৪০১৭. বোয়ালমারীতে খ্রিস্টান এনজিওর দুই কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা, *জনকণ্ঠ*, *৩০ জুলাই ২০০৫*

৪০১৮. ফরিদপুরে দুই খ্রিস্টান এনজিওকর্মীকে হত্যা, *প্রথম আলো*, *৩০ জুলাই ২০০৫*

৪০১৯. হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ১১ আগস্ট নির্যাতনবিরোধী দিবস পালন করবে, *ভোরের কাগজ*, *৩০ জুলাই ২০০৫*

৪০২০. গণধর্ষণের বিচার চাইতে গিয়ে পুনরায় পুলিশ কর্তৃক ধর্ষিত এক আদিবাসী গৃহবধূ, গোদাগাড়ী থানা মামলা নেয়নি, *আজকের কাগজ*, *৩১ জুলাই ২০০৫*

৪০২১. টাকা ধার নিয়ে শোধ দিয়েও রক্ষা মিলছে না, টাউট-বাটপারদের হুমকিতে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কলাপাড়ার সংখ্যালঘু পরিবার, *ভোরের কাগজ*, *৩১ জুলাই ২০০৫*

৪০২২. সম্পত্তির মালিকের সাংবাদিক সম্মেলন, আমতলীতে বিএনপি কর্মীর বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুর ভিটেবাড়ি দখলের অভিযোগ, *ভোরের কাগজ*, *৩১ জুলাই ২০০৫*

আগস্ট ২০০৫

৪০২৩. গণধর্ষণের বিচার চাইতে গিয়ে রাজশাহীতে আদিবাসী গৃহবধূ পুলিশের ধর্ষণের শিকার, *জনকণ্ঠ*, *১ আগস্ট ২০০৫*

৪০২৪. বোয়ালমারীতে খুনের দায়ে আটক ভ্যানচালক পুলিশ রিমান্ডে ॥ মাদ্রাসা সুপার পলাতক, *জনকণ্ঠ*, *১ আগস্ট ২০০৫*

৪০২৫. নবীনগর ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি প্রকাশকে নৃশংসভাবে খুন, *ভোরের কাগজ*, *১ আগস্ট ২০০৫*

৪০২৬. বরিশালে খ্রিস্টান পল্লীতে হামলার নিন্দায় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, *ইত্তেফাক*, *১ আগস্ট ২০০৫*

৪০২৭. বান্দরবানে আদিবাসীদের ভূমি দখল করে মসজিদ নির্মাণের কাজ চলছে, *আজকের কাগজ*, *১ আগস্ট ২০০৫*

৪০২৮. রাজৈরে ভূমিদস্যুর কাছে জিম্মি চার সংখ্যালঘু পরিবার, কিশোরীর স্কুল বন্ধ, *জনকণ্ঠ*, *২ আগস্ট ২০০৫*

৪০২৯. সাভারে সংখ্যালঘু পরিবারে মহিলাদের শ্লীলতাহানি, দেশছাড়া করার হুমকি, *জনকণ্ঠ*, *২ আগস্ট ২০০৫*

৪০৩০. আদিবাসী নেতা সরেনের খুনীদের ১৮ আগস্টের মধ্যে গ্রেফতার দাবি, *জনকণ্ঠ*, *২ আগস্ট ২০০৫*

৪০৩১. আলফ্রেড সরেন হত্যার বিচার ও নির্যাতন বন্ধের দাবি, *ভোরের কাগজ*, *২ আগস্ট ২০০৫*

৪০৩২. জুন মাসে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ২ জন খুন ও ৭ জন ধর্ষিত, *ভোরের কাগজ*, *২ আগস্ট ২০০৫*

৪০৩৩. রহস্য এখনো অনুদঘাটিত, হুমকিদাতা মাদ্রাসা সুপারের হদিস মেলেনি, *ভোরের কাগজ*, *২ আগস্ট ২০০৫*

৪০৩৪. হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশনের বিক্ষোভ সমাবেশ, *প্রথম আলো*, *২ আগস্ট ২০০৫*

৪০৩৫. হয়রানি ও মহিলাদের ধর্ষণের হুমকি, *আজকের কাগজ*, *২ আগস্ট ২০০৫*

৪০৩৬. বোয়ালমারীতে এনজিও কর্মী হত্যার বিচার দাবিতে খ্রিস্টানদের মিছিল, *জনকণ্ঠ*, *৩ আগস্ট ২০০৫*

৪০৩৭. ঈশ্বরগঞ্জে মন্দির থেকে মূল্যবান কষ্টিপাথরের শিবলিঙ্গ চুরি, *ইত্তেফাক*, *৩ আগস্ট ২০০৫*

৪০৩৮. আমিন চেয়ারম্যানের নির্দেশে গান পাউডার দিয়ে আগুন লাগানো হয়, *প্রথম আলো*, *৪ আগস্ট ২০০৫*

৪০৩৯. বান্দরবানে লুসাই পরিবারের জমি দখল করে পাহাড় কাটার অভিযোগ, মারাত্মক ঝুকিতে শতাধিক পরিবার, *প্রথম আলো*, *৪ আগস্ট ২০০৫*

৪০৪০. ফরিদপুরে দুই খ্রিস্টান হত্যায় দূতাবাসের উদ্বেগ, *জনকণ্ঠ*, *৪ আগস্ট ২০০৫*

৪০৪১. বিএনপি নেতা আমিনুলই বাঁশাখালীর ১১ খুনের মূল হোতা, *জনকণ্ঠ*, *৪ আগস্ট ২০০৫*

৪০৪২. ফরিদপুরে দুই খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীর খুনের ঘটনায় মার্কিন দূতাবাসের শোক, *ইত্তেফাক*, *৪ আগস্ট ২০০৫*

৪০৪৩. সংখ্যালঘুদের হয়রানির প্রতিবাদে যশোরে ডিসি এসপি অফিস ঘেরাও, *সংবাদ*, *৪ আগস্ট ২০০৫*

৪০৪৪. চট্টগ্রামে খুন করতে এসে বাঁশখালী হত্যা মামলার আসামি গ্রেফতার, *সংবাদ*, *৪ আগস্ট ২০০৫*

৪০৪৫. ফরিদপুরে নিহত দুই এনজিও কর্মী ধর্মীয় উগ্রবাদের শিকার, *ভোরের কাগজ*, *৪ আগস্ট ২০০৫*

৪০৪৬. বাঁশখালীর বহু নৃশংস অপরাধের পেছনে আমিন চেয়ারম্যান, *সমকাল*, *৪ আগস্ট ২০০৫*

৪০৪৭. সংখ্যালঘু পরিবার উচ্ছেদের প্রতিবাদে পার্বতীপুরের বড়দলে আওয়ামী লীগের সমাবেশ, *আজকের কাগজ, ৪ আগস্ট ২০০৫*

৪০৪৮. সাতকানিয়ায় পুলিশের উপস্থিতিতে বিয়েবাড়িতে ডাকাতি ঃ আহত ২৩, *সমকাল, ৫ আগস্ট ২০০৫*

৪০৪৯. হত্যা পরিকল্পনার অভিযোগে আমিনের বিরুদ্ধে মামলা, বাঁশখালীর ১১ হত্যা ঘটনার আরো তথ্য, *সমকাল, ৫ আগস্ট ২০০৫*

৪০৫০. প্রতিমন্ত্রীর ভাইয়ের নাম ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তোলপাড়, *সংবাদ, ৫ আগস্ট ২০০৫*

৪০৫১. নাটোরে সংখ্যালঘু পরিবারকে গ্রাম ছাড়ার নির্দেশ, *জনকণ্ঠ, ৫ আগস্ট ২০০৫*

৪০৫২. বাঁশখালী হত্যাকাণ্ড ভিন্ন খাতে নিতে উঠেপড়ে লেগেছে একটি মহল, ইউনুস ও দুদু মেম্বারের রিমাণ্ড চেয়েছে পুলিশ, *ভোরের কাগজ, ৬ আগস্ট ২০০৫*

৪০৫৩. ডোমারে একটি সংখ্যালঘু পরিবারের ভিটেবাড়ি দখলে দাঙ্গা বাধানোর উস্কানি দিচ্ছে জামাতিরা, *আজকের কাগজ, ৬ আগস্ট ২০০৫*

৪০৫৪. বগুড়ায় ধরেরবাড়িতে বসবাসরত ২৫ পরিবার উচ্ছেদ আতঙ্কে, *জনকণ্ঠ,* ৬ *আগস্ট ২০০৫*

৪০৫৫. নড়াইলে সংখ্যালঘুদের বাড়িতে একের পর এক ডাকাতি, *জনকণ্ঠ, ৬ আগস্ট ২০০৫*

৪০৫৬. বাঁশখালীর ১১ খুনের সঙ্গে বিএনপি নেতা আমিনুর জড়িত থাকায় চট্টগ্রামে চাঞ্চল্য, গ্রেফতার বা জিজ্ঞাসাবাদের উদ্যোগ নিচ্ছে না পুলিশ, *জনকণ্ঠ, ৬ আগস্ট ২০০৫*

৪০৫৭. ময়মনসিংহে সংখ্যালঘু পরিবারকে ভিটে থেকে উচ্ছেদ ॥ মুন্সীগঞ্জে সর্বস্ব লুট, *জনকণ্ঠ, ৬ আগস্ট ২০০৫*

৪০৫৮. নবাবগঞ্জে সংখ্যালঘুদের মার্কেট দখলের পাঁয়তারা করছে প্রভাবশালী মহল, *যুগান্তর, ৬ আগস্ট ২০০৪*

৪০৫৯. কুলাউড়ায় আদিবাসী পল্লীতে চরম আতঙ্ক, বনবিভাগের উচ্ছেদ অভিযান, *সমকাল, ৬ আগস্ট ২০০৫*

৪০৬০. ভারতে পাচারের সময় আদিবাসী তরুণী উদ্ধার, আটক ১, *জনকণ্ঠ, ৭ আগস্ট ২০০৫*

৪০৬১. বরিশালে খ্রিস্টান পল্লীতে হামলা মামলার বাদিনীর স্বামীকে অপহরণ, *জনকণ্ঠ, ৭ আগস্ট ২০০৫*

৪০৬২. পার্বত্য অঞ্চলে এখনও সামরিক শাসন চলছে, আদিবাসীরা অস্তিত্বের সঙ্কটে ॥ সন্তু লারমা, *জনকণ্ঠ, ৭ আগস্ট ২০০৫*

৪০৬৩. মান্দায় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্ট নেতার ওপর হামলার বিচার দাবি, *সংবাদ, ৭ আগস্ট ২০০৫*

৪০৬৪. এবার হামলা প্রতিরোধের শপথ নিয়েছে কুলাউড়ার খাসিয়া আদিবাসীরা, *সমকাল, ৮ আগস্ট ২০০৫*

৪০৬৫. সিরাজগঞ্জের আদিবাসীরা নানা বঞ্চনার শিকার, *ভোরের কাগজ, ৯ আগস্ট ২০০৫*

৪০৬৬. স্বনিয়ন্ত্রণাধিকার মুক্তির প্রধান শর্ত ঃ সন্তু লারমা, নিজভূমে পরবাসী আদিবাসী জনগোষ্ঠী, *ভোরের কাগজ, ৯ আগস্ট ২০০৫*

৪০৬৭. দিনাজপুরের সমাবেশে দাবি, আদিবাসীদের রক্ষায় সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে, *সংবাদ, ৯ আগস্ট ২০০৫*

৪০৬৮. পাঠচক্রে বক্তারা, পাঠ্যবইয়ে আদিবাসীদের খণ্ডিত তথ্য দেয়া হয়েছে, *সংবাদ, ৯ আগস্ট ২০০৫*

৪০৬৯. আদিবাসী তরুণীর ভাসমান লাশ নিয়ে রাঙামাটিতে রহস্য, *প্রথম আলো, ৯ আগস্ট ২০০৫*

৪০৭০. ব্যরিস্টার মওদুদের সঙ্গে একমত পোষণ করে, *প্রথম আলো, ৯ আগস্ট ২০০৫*

৪০৭১. কুলাউড়ায় পানপুঞ্জিতে বন বিভাগের অভিযান, পাঁচ দিনেও আদিবাসীরা ঘরে ফিরতে পারেননি, আবার উচ্ছেদ আতঙ্ক, *প্রথম আলো, ৯ আগস্ট ২০০৫*

৪০৭২. আদিবাসী দিবস পালন, বিশ্বব্যাপী ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান, *সংবাদ, ১০ আগস্ট ২০০৫*

৪০৭৩. আদিবাসী দিবসে আলোচনাসভা, সামরিক বাহিনী আদিবাসীদের ভূমি দখলে নেবে-এটা অনাকাঙ্খিত ॥ ইইউ মিশনপ্রধান, *জনকণ্ঠ, ১০ আগস্ট ২০০৫*

৪০৭৪. চাঁদা না পেয়ে চাঁদপুরে সংখ্যালঘুর বিয়ের অনুষ্ঠানে হামলা, *জনকণ্ঠ, ১০ আগস্ট ২০০৫*

৪০৭৫. ফরিদপুরে এতিমখানার নামে সংখ্যালঘুদের খেলার মাঠ দখল ॥ বিক্ষোভ, *জনকণ্ঠ, ১০ আগস্ট ২০০৫*

৪০৭৬. সাধন কি বিচার পাবে না?, *জনকণ্ঠ, ১১ আগস্ট ২০০৫*

৪০৭৭. ২ এনজিও কর্মী হত্যা, ফরিদপুরে আজ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মানববন্ধন, *প্রথম আলো, ১১ আগস্ট ২০০৫*

৪০৭৮. বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি মাহবুবে আলমের উল্লাপাড়ায় পূর্ণিমার পরিবারের সাথে সাক্ষাত, *আজকের কাগজ, ১১ আগস্ট ২০০৫*

৪০৭৯. সংখ্যালঘু নির্যাতকদের শাস্তি চাই ॥ আমিন চেয়ারম্যানের গ্রেফতার দাবি, চট্টগ্রামে হিন্দু বৌদ্ধ খিস্টান ঐক্য পরিষদের মানববন্ধন, *ভোরের কাগজ, ১২ আগস্ট ২০০৫*

৪০৮০. ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের ওপর নির্যাতন বন্ধের আহ্বান ॥ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সমাবেশ, *ভোরের কাগজ, ১২ আগস্ট ২০০৫*

৪০৮১. ঐক্য পরিষদে বক্তারা, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নানাভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে, *সংবাদ, ১৩ আগস্ট ২০০৫*

৪০৮২. সংখ্যালঘুদের উচ্ছেদ করায় টাকা দেবে না ইউরোপীয় কমিশন, *সংবাদ, ১৩ আগস্ট ২০০৫*

৪০৮৩. চট্টগ্রামে দু'উপজাতীয় তরুণী ধর্ষিত ঃ এক ধর্ষক গ্রেফতার, *যুগান্তর, ১৩ আগস্ট ২০০৫*

৪০৮৪. আদিতমারীতে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর নির্যাতনের কাহিনী, *আজকের কাগজ, ১৪ আগস্ট ২০০৫*

৪০৮৫. ঠাকুরগাঁওয়ে আদিবাসী মহল্লায় হামলা, ইউএনও অফিস ঘেরাও, *আজকের কাগজ, ১৫ আগস্ট ২০০৫*

৪০৮৬. আদিতমারীতে স্কুলের নৈশপ্রহরীর প্রতারণা, সংখ্যালঘু কিশোরীকে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে ঃ মামলা প্রত্যাহারের জন্য হুমকি, *সংবাদ, ১৫ আগস্ট ২০০৫*

৪০৮৭. ঠাকুরগাঁওয়ে আদিবাসী মহিলার শ্লীলতাহানির প্রতিবাদে ইউএনও অফিস ঘেরাও, *সংবাদ, ১৫ আগস্ট ২০০৫*

৪০৮৮. সাদুল্যাপুরে ৮টি মূর্তি ভেঙে ঘরে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা, *সংবাদ*, *১৬ আগস্ট ২০০৫*

৪০৮৯. রামপালের সেই নির্যাতিত ছবি রাণী বাঁচতে চান ঃ স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা, *জনকণ্ঠ*, *১৭ আগস্ট ২০০৫*

৪০৯০. নওগাঁর গ্রামে সংখ্যালঘুর বাড়িতে রাতভর তাণ্ডব ঃ বোমার আঘাতে মহিলাসহ ৫ জন আহত, আজকের কাগজ, ১৭ আগস্ট ২০০৫

৪০৯১. নেত্রকোনায় ৮০০ আদিবাসী পরিবারকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা, ১৫টি ভিটেছাড়া, *প্রথম আলো*, *২০ আগস্ট ২০০৫*

৪০৯২. সংখ্যালঘু উপেন মিস্ত্রীর চিংড়ি ঘের দখল ঃ দাকোপে ছাত্রদল সভাপতি মান্নান দখলের রাজত্ব কায়েম করলেও পুলিশ নিরব, *আজকের কাগজ*, *২৫ আগস্ট ২০০৫*

সংখ্যালঘু নির্যাতন
পরিশিষ্ট

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ও অন্যান্য সংগঠনের দলিল ও ঘোষণা

পরিশিষ্ট-১

৯ অক্টোবর ২০০১ অনুষ্ঠিত একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির গোলটেবিল বৈঠকের ধারণাপত্র*

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে করণীয়

১ অক্টোবর ২০০১ তারিখে অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ও বিদেশী পর্যবেক্ষকরা অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ বললেও বাস্তবতা হচ্ছে, এই নির্বাচনে যে ধরনের কারচুপি হয়েছে তা এক কথায় নজিরবিহীন। যে কারণে বাংলাদেশের সিভিল সমাজ নির্বাচনের ফলাফল স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি।

বাংলাদেশের সিভিল সমাজের নেতৃবৃন্দ সংবাদপত্রে লেখালেখির মাধ্যমে, বিভিন্ন সমাবেশের বক্তৃতায় ও বিবৃতির মাধ্যমে নির্বাচনের আড়াই মাস আগে থেকেই বলেছেন বিচারপতি লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মকাণ্ড নিরপেক্ষ নয়, তারা একটি বিশেষ জোটকে ক্ষমতায় আনার জন্য সমগ্র প্রশাসনকে ঢেলে সাজিয়েছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তির ভরাডুবির নীল নকশা তৈরি করেছেন।

অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের স্বার্থে প্রশাসনের যে সকল বিভাগ নির্বাচনী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সেখানে কিছু রদবদল হতেই পারে। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে, বিশেষ করে যে সব শীর্ষপদে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের কর্মকর্তারা ছিলেন তাঁদের প্রায় সকলকে বদলি করেছেন কিংবা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। তাদের এই নজিরবিহীন কর্মকাণ্ড থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরাও রেহাই পাননি। এর ফলে প্রশাসনের সর্বস্তরে এই ধারণা জন্মেছে

*প্রথম পর্বে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী এবং দ্বিতীয় পর্বে বিচারপতি কে এম সোবহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই গোলটেবিল বৈঠকে ধারণাপত্র উত্থাপন করেন শাহরিয়ার কবির। আলোচনায় সিভিল সমাজের নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশে নির্বাচনকেন্দ্রিক মানবাধিকার লংঘন এবং বিশেষভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নজিরবিহীন নির্যাতনের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ, অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সাংবাদিক সন্তোষ গুপ্ত, কলাম লেখক সঙ্গীতজ্ঞ ওয়াহিদুল হক, লেখক সৈয়দ শামসুল হক, অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, অধ্যাপক অজয় রায়, সঙ্গীতশিল্পী ডঃ সনজিদা খাতুন, অধ্যাপক রঙ্গলাল সেন, মওলানা আবদুল আউয়াল, কথাশিল্পী ডাঃ আনোয়ারা সৈয়দ হক, স্থপতি রবিউল হুসেইন, কবি আসাদ চৌধুরী, নারীনেত্রী আয়শা খানম, অধ্যাপিকা পান্না কায়সার, স্থপতি শামসুল ওয়ারেস, কবি মোঃ আবদুল খালেক, সমাজকর্মী আরমা দত্ত, অধ্যাপিকা জারিনা রহমান খান, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক, শিক্ষাবিদ শহীদজায়া শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী, এডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, চিত্রকর অধ্যাপক আবুল বারক আলভী, লেখক ফ র আল সিদ্দিক, চলচ্চিত্রনির্মাতা শামীম আখতার, সমাজকর্মী কাজী মুকুল, চিত্রকর মনিরুজ্জামান, সমাজকর্মী নার্গিস জাহান, অধ্যক্ষ দুলালচন্দ্র সাহা, সমাজকর্মী শহীদজায়া সালমা হক, সাংবাদিক সোহরাব হাসান, এডভোকেট বি এ রশিদ, সাংবাদিক শাহীন রেজা নূর, অধ্যাপক মুনীর হোসেন, এডভোকেট প্রণয় কান্তি রায়, সমাজকর্মী দৌলতআরা মান্নান, এডভোকেট সৈকত আচার্য, সমাজকর্মী সেলিনা তর্কবাগিশ, সমাজকর্মী মায়ারাণী সরকার এবং নির্মূল কমিটি সহ বিভিন্ন ছাত্র-যুব-নারী ও মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ।

যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেহেতু প্রকারান্তরে চার দলীয় জোটের পক্ষাবলম্বন করেছে সেহেতু প্রশাসনকে চার দলীয় জোটের স্বার্থে কাজ করতে হবে। এর প্রতিফলন আমরা নির্বাচনের দিন ভোট গ্রহণ থেকে শুরু করে ভোট কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা— সর্বক্ষেত্রে দেখেছি। যার ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল ধারণা এক প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন থেকে দুই রকমের ভোটার তালিকা সরবরাহ, ভোটার তালিকা থেকে হাজার হাজার প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ পড়া, বিশেষ জোটের সমর্থক এনজিও ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের লোকদের নির্বাচন পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দেয়া, বুথ জ্যাম করে প্রকৃত ভোটারদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখা, সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়কে আগে থেকে ভয়ভীতি ও হুমকি প্রদান করে ভোট প্রদানে বাধা দেয়া, বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রচারণার দ্বারা নির্বাচকমণ্ডলীকে ভোটদানে নিরুৎসাহিত করা, প্রিসাইডিং অফিসারসহ বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিশেষ জোটের হয়ে কাজ করা, জাল ভোট প্রদান, বিশেষ দলের প্রতীকে ছাপ দেয়া ব্যালট পেপার গণনার আগে ব্যালট বাক্স থেকে ফেলে দেয়া, কোথাও ভোটারের চেয়ে বেশি ভোট গ্রহণ, প্রিসাইডিং অফিসারের সই ছাড়া ফলাফল ঘোষণা, বহু কেন্দ্রে ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা বিলম্বিত করা, ভোট গণনার সময় পর্যবেক্ষকদের থাকতে না দেয়া, মোবাইল টেলিফোন ও যানবাহন চলাচল বন্ধ করে কারচুপির পথ সুগম করা, বিশেষ দলের এজেন্টদের মারধর করে ভোট কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া সহ নির্বাচনে অনিয়ম, দুর্নীতি ও কারচুপির আরও অনেক তথ্য সংবাদপত্রে ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ও চরম অমানবিক ঘটনা ঘটেছে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নজিরবিহীন হামলা ও নির্যাতনের ঘটনাবলীতে। বিশেষভাবে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাসমূহে শারীরিক নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ, গৃহে অগ্নিসংযোগ, বলপূর্বক চাঁদা আদায়, লুণ্ঠন প্রভৃতি সুপরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়েছে, যাতে তারা নির্বাচনের দিন ভোট দিতে না যায়। গ্রেফতার দূরে থাক সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগ পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে থানায় গ্রহণ করা হয়নি, যার ফলে দুষ্কৃতকারীরা প্রশ্রয় পেয়েছে; আরও সহিংস হয়েছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের এই প্র্রিয়া নির্বাচনের দেড় মাস আগে থেকে শুরু হয়েছে, যা এখনও অব্যাহত আছে। নির্বাচনের পরদিন থেকে সারা দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু, বিশেষভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নির্বিচারে হামলা, নির্যাতন, ধর্ষণ, হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহে অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি যে হারে শুরু হয়েছে তার ফলে ইতিমধ্যে বহু এলাকায় তারা ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। নতুনভাবে শুরু হয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ। একইভাবে আদিবাসী সম্প্রদায়ের উপরও কিছু এলাকায় হামলার খবর আমরা পত্রিকায় দেখেছি। নির্বাচনোত্তর এইসব হামলার কারণ হচ্ছে সকল ভয়ভীতি উপেক্ষা করেও আদিবাসী ও সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ১৫ থেকে ২০ ভাগ ভোটার এবার ভোট দিতে গিয়েছিলেন। রাজধানী ও শহরাঞ্চলে সাংবাদিক ও দেশী বিদেশী পর্যবেক্ষকদের দেখানোর জন্য প্রশাসনও তাদের একটি অংশকে ভোট কেন্দ্রে যেতে উৎসাহিত করেছিল।

নির্বাচনের পর ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পাশাপাশি দেশের সর্বত্র আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের উপরও একই ধরনের নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছে। তাদের ঘরবাড়ি লুট করা হচ্ছে, দলীয় কার্যালয় দখল করা হচ্ছে, যেভাবে চার দলীয় জোটের সন্ত্রাসীরা দখল করছে শৌচাগার থেকে ছাত্রাবাস পর্যন্ত। নির্বাচনের পর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের উপর এ ধরনের নির্যাতন অতীতে কখনও দেখা যায়নি, অথচ এ বিষয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিংবা কোনও দেশী বিদেশী পর্যবেক্ষক ও মানবাধিকার সংগঠন ব্যবস্থা গ্রহণ দূরে থাক সামান্যতম উদ্বেগও প্রকাশ করেনি।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার জন্য এবার রেকর্ড সংখ্যক বিদেশী পর্যবেক্ষক

এসেছিলেন। কয়েক লক্ষ দেশী পর্যবেক্ষকও নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছেন। নির্বাচনী সংবাদ প্রচারের জন্য গণমাধ্যমের সংখ্যাও এবার বেশি ছিল। এত কিছু সত্ত্বেও গণমাধ্যম ও বিদেশী পর্যবেক্ষকরা বলেছেন কিছু ব্যতি□ম ছাড়া নির্বাচন 'অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু' হয়েছে। নির্বাচনের দিন প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত ভোট কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করে আমাদের প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষক কিংবা সাংবাদিকরা কেউ গ্রামাঞ্চলে যাননি, বিশেষ করে যেসব এলাকায় যেতে হয় পায়ে হেঁটে বা নৌকায়। নির্বাচনের দিন যাবতীয় কারচুপি হয়েছে গ্রামাঞ্চলের ভোটকেন্দ্রগুলোতে। দেশী বিদেশী পর্যবেক্ষক ও প্রচার মাধ্যমকে দেখাবার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশাসন রাজধানীসহ শহরাঞ্চলের নির্বাচন কেন্দ্রগুলো স্বাভাবিক রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। বুথের ভেতর সূক্ষ্ম কারচুপি ছাড়া এসব এলাকায় তেমন কোন অপ্রীতিকর ও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু গ্রাম বাংলার পরিস্থিতি ছিল এর বিপরীত, যা গণমাধ্যমে সামান্যই প্রতিফলিত হয়েছে। এ সবের কারণে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফলকে গণরায় হিসেবে মেনে নেয়া যায় না।

নজিরবিহীন কারচুপির দ্বারা জাতীয় সংসদে যেভাবে একাত্তরের চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধী, রাজাকার ও মৌলবাদী তালেবানদের আনা হয়েছে তাতে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বোধ করছি। চার দলীয় জোটকে এ কারণেই দুই তৃতীয়াংশ আসনে জয়ী করানো হয়েছে যাতে তারা সংবিধান পরিবর্তন করে বাংলাদেশকে দ্বিতীয় পাকিস্তানে রূপান্তরিত করতে পারে, যাতে পাকিস্তানের মতো শরিয়া আইন, ব-াশফেমী আইন কিংবা ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা যেতে পারে। চার দলীয় জোটের শরিক জামাতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোটকে গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর কোনও মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হলে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনার নাম নিশানা থাকবে না। মন্ত্রিপরিষদে যোগ না দিলেও ক্ষমতাসীন চার দলীয় জোটের শরিক হিসেবে এ কাজগুলো তারা করতে পারে। তারা ক্ষমতায় না গিয়েও পাকিস্তানে এসব কাজ করেছে। যার পরিণতি হচ্ছে ধর্মের নামে হানাহানি, সন্ত্রাস, অরাজকতা, নারী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুর অধিকার হরণ, গ্রামাঞ্চলে এনজিওদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত হওয়া সহ সেক্যুলার, গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধের অপমৃত্যু।

সংবিধানে হাত না দিলেও বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিএনপি-জামাতের চার দলীয় জোটের সরকার বাংলাদেশের রাজনীতি ও সমাজের তালেবানিকরণ, জেহাদীকরণ ও পাকিস্তানিকরণ প্র□িয়া বিস্তৃত করবে। নির্বাচনী ওয়াদা অনুযায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। মাদ্রাসাগুলোকে তালেবানদের সামরিক প্রশিক্ষণের ঘাঁটিতে পরিণত করবে। পাকিস্তানের মতো সারা দেশে অসংখ্য মৌলবাদী সন্ত্রাসী জেহাদী গ্রুপ তৈরি হবে। অন্ধ ভারত-বিদ্বেষী প্রচারণা অব্যাহত রাখবে। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের আমলে বন্ধ করে দেয়া উত্তর-পূর্ব ভারতের বৈরি নাগা-মিজোদের গোপন সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো আবার চালু করবে।

এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হলে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আন্দোলনরত সিভিল সমাজের উদ্যোগগুলোর শক্তি সংহত করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের সকল রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক দল ও শক্তির সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে, প্রস্তুত হতে হবে বাংলাদেশকে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান বানাবার সকল চ□ান্ত প্রতিহত করার জন্য। মুক্তিযুদ্ধের যাবতীয় অর্জন রক্ষার জন্য সর্বশক্তি সংহত করে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে বৃহত্তর আন্দোলন ও সংগ্রামের।

শাহরিয়ার কবির
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ
একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি

পরিশিষ্ট-২

২০ অক্টোবর ২০০১ সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্য নির্বাচনোত্তর সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস প্রতিরোধের ক্ষেত্রে নির্মূল কমিটির পর্যবেক্ষণ ও কর্মসূচি

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে, নির্বাচনের দিন এবং নির্বাচনের পরে সারা দেশে যে নজিরবিহীন সাম্প্রদায়িক নির্যাতন চলছে এ বিষয়ে আপনারা অবগত আছেন। প্রকৃতপক্ষে সংবাদপত্রের কারণে দেশবাসী এই ভয়াবহ সমস্যা সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-পেশাজীবী সংগঠন ও ব্যক্তি প্রতিদিন উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করছেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সন্ত্রাস দমনকে চারদলীয় জোট সরকারের এজেণ্ডার প্রথমে স্থান দিলেও তাদের দায়িত্ব গ্রহণের দশ দিন পরও সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির উলে-খযোগ্য উন্নতি হয়নি। প্রতিদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের সংবাদ।

দেশে বিরাজমান সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের প্রেক্ষিতে সচেতন নাগরিকদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গত ৯ অক্টোবর বরেণ্য শিল্পী সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেছিল। বৈঠকে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্মূল কমিটি তাৎক্ষণিকভাবে দু'টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। (১) দ্রুত উপদ্রুত এলাকাসমূহ সফর করে আ□ান্ত বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানো, তাদের সান্ত্বনা ও সাহস জোগানো এবং (২) তাদের জবানবন্দির ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের উপর শ্বেতপত্র প্রকাশ করা।

গত দশ দিনে নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দ দেশের শতাধিক ভুক্তভোগীর জবানবন্দি নথিবদ্ধ করেছেন যার অধিকাংশই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি। কখনও কোনও ঘটনায় একবার উলে-খ হলেও পর্যায়□মিক অনুসন্ধানে প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে না, কারণ (১) পত্রিকার পাতায় স্থানাভাব এবং (২) পত্রিকার নীতি।

সাংবাদিক বন্ধুগণ

গতকাল শু□বার একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন এলাকা সফর করেছেন। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার তুলনায় সিরাজগঞ্জের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে সংবাদপত্রে খুব কমই লেখা হয়েছে। সিরাজগঞ্জের পরিস্থিতি সম্পর্কে শহরের একজন হিন্দু ব্যবসায়ী বলেছেন—'এখানে চলছে নিরব সন্ত্রাস।' গ্রামে গ্রামে হুমকি দেয়া, চাঁদা আদায়ের নামে ডাকাতি প্রভৃতি ঘটনা ঘটলেও প্রাণভয়ে আ□ান্তরা থানায় অভিযোগ জানায় না। অভিযোগ না পেলে প্রশাসনের কাছে সমস্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

গত কয়েক দিন ধরে সিরাজগঞ্জে বিএনপির নেতা ও কর্মীরা হিন্দু সম্প্রদায়কে হুমকি দিচ্ছে সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা করবার জন্য, অন্যথায় তাদের দেশছাড়া করা হবে। বলপূর্বক চাঁদা আদায়ের সময় তারা বলে, এটা হচ্ছে নৌকায় ভোট দেয়ার মাশুল। সিরাজগঞ্জের বহু পরিবার এই মাশুল গুণতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেও খুব কম সংখ্যকই থানায় অভিযোগ জানিয়েছে।

থানায় অভিযোগ জানাবার পরিণতি যে কী ভয়াবহ হতে পারে তার একটি হৃদয়বিদারক উদাহরণ সিরাজগঞ্জ জেলার উল-াপাড়া থানার পূর্ব দেলুয়া গ্রামের অনিল কুমার শীলের পরিবার। নির্বাচনের ৭ দিন পর গত ৮ অক্টোবর ২৫/৩০ জনের একটি সন্ত্রাসী দল রাতের অন্ধকারে তার পরিবারের ওপর হামলা চালিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করেছে তাকে। ছোট মেয়ে পূর্ণিমা রানী শীলকে সন্ত্রাসীরা অপহরণ করতে গেলে বাধা দিতে গিয়ে নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন অনিল কুমারের স্ত্রী বাসনা রানী শীল। পিতার বাড়িতে আশ্রয় নেয়া মেজ মেয়ে গীতা রানীকেও সন্ত্রাসীরা বেদম প্রহার করেছে। ওই রাতে পাশবিক অত্যাচারের শিকার হয় অনিল কুমার শীলের ছোট মেয়ে ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী পনের বছর বয়সের পূর্ণিমা রানী শীল। পরিবারের সবাইকে পিটিয়ে অজ্ঞান করে পূর্ণিমাকে তুলে নিয়ে যায় তারা। তারপর পালা করে তাকে তারা ধর্ষণ করে। প্রায় দু'ঘণ্টা পর পূর্ণিমাকে উদ্ধার করা হয়। ওই ঘটনার কথা কারো কাছে যেন না বলতে পারে সেজন্য পরের দিন ৯ অক্টোবর সকাল পর্যন্ত ওই পরিবারটিকে তাদের বাড়ির মধ্যেই অবরুদ্ধ করে রাখে সন্ত্রাসীরা। সন্ত্রাসী এবং তাদের অভিভাবকরা অনিল কুমারের ওপর নানাবিধ চাপ দিতে থাকে ঘটনাটি মিটিয়ে ফেলার জন্য। কিন্তু এরই মধ্যে ঘটনা জানাজানি হয়ে যায়। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্থানীয় উল-াপাড়া থানার পুলিশ উদ্যোগী হয় একটি মামলা গ্রহণ করতে। কিন্তু ধর্ষণের মামলা থানা গ্রহণ করে নি।

এরপর একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সিরাজগঞ্জ জেলা শাখার আহবায়ক বিশিষ্ট সাংবাদিক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী উদ্যোগী হয়ে পূর্ণিমাকে সিরাজগঞ্জ শহরে এনে সিভিল সার্জন অফিসে মেডিক্যাল চেক আপ করান। ডাক্তারী পরীক্ষায় ধর্ষণের যাবতীয় চিহ্ন পাওয়া গেছে। আমিনুল ইসলামের সহযোগিতায় ১৪ অক্টোবর পূর্ণিমা বাদী হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেছে।* ১৬৪ ধারায় ম্যাজিস্ট্রেট তার জবানবন্দি রেকর্ড করেছেন এবং অভিযুক্ত যে পনেরো জনের নাম পূর্ণিমা বলতে পেরেছে তাদের গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছেন। এ পর্যন্ত আবদুর রব নামে একজন আসামীকে পুলিশ গ্রেফতার করতে পেরেছে।

এদিকে ওই মামলা করার পর অসহায় এই পরিবারটির ওপর অবর্ণনীয় দুর্যোগ নেমে এসেছে। সর্বস্ব হারিয়ে তারা একবস্ত্রে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে সন্ত্রাসীদের হুমকির কারণে। দুবেলা দু'মুঠো অন্নের সংস্থান নেই, পরনে কাপড় নেই, সন্ত্রাসীদের আক্রমণে প্রায় পঙ্গু অনিল কুমার তার পরিবার নিয়ে এখন আশ্রয় নিয়েছেন উল-াপাড়া সদরে এক আত্মীয়'র বাসায়। এখানেও নিরাপদ নেই তার পরিবার। থানা থেকে পুলিশ আসে, স্থানীয় বিএনপির এমপি এম আকবর আলী লোক পাঠান যেন মামলাটি মিটমাট করে ফেলা হয়। হুমকি দেয়া হচ্ছে মামলা প্রত্যাহার করা না হলে পরিণতি খুব খারাপ হবে। সন্ত্রাসীরা দফায় দফায় লোক পাঠাচ্ছে যেন এ নিয়ে কেউ বাড়াবাড়ি না করে। পূর্ণিমা রাণী তার জবাববন্দিতে বলেছে তার নির্যাতনকারীদের যে কয়েকজনকে সে চিনেছে তারা সবাই বিএনপির কর্মী।

গত শুক্রবার (১৯ অক্টোবর ২০০১) দুপুরে আমরা অনিল কুমার শীল ও তার পরিবারের

*আমিনুল ইসলাম চৌধুরীর এই মানবিক আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে সরকার গত ৩০ জানুয়ারি ২০০২ তারিখে তাঁকে বিদ্যুৎ বিল প্রদান না করার মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে।

নির্যাতিতদের জবানবন্দী রেকর্ড করি। আজ নির্যাতিত পূর্ণিমা রানীসহ অনিল কুমার শীলের পরিবারের কয়েকজন সদস্যকে আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি সত্যতা যাচাইয়ের জন্য।

সাংবাদিক বন্ধুগণ

আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা পত্রিকায় অতিরঞ্জিত করে লেখা হচ্ছে। তাঁর মতে পত্রিকায় সাম্প্রদায়িক সহিংসতার যে সব খবর প্রকাশিত হচ্ছে তার ৮০ থেকে ৯০ ভাগই নাকি অসত্য। পত্রিকায় সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের সংবাদ প্রেরণের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয় দৈনিকসমূহের স্থানীয় প্রতিনিধিদের নানা ধরনের হুমকি দেয়া হচ্ছে। এদিকে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও গতকাল জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বলেছেন 'চার দলীয় জোটের বিশাল বিজয়ের পেছনে এ দেশের সকল ধর্মের বর্ণের এবং নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অকুণ্ঠ সমর্থন আছে।' প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য যদি সত্য হয় তাহলে সারা দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর এই নজিরবিহীন হামলা ও নির্যাতন কেন এর জবাব তাঁকে দিতে হবে। সর্বত্র আক্রান্ত হিন্দুরা বলছেন নৌকায় ভোট দেয়ার অপরাধে তাদের উপর এই নির্যাতন। আমরা সারা দেশে একজন হিন্দুও পাইনি যিনি বলেছেন আওয়ামী লীগের কেউ তাদের উপর হামলা করেছে। সাম্প্রদায়িক হামলার জন্য সারা দেশে যে কটি অভিযোগ থানায় নথিবদ্ধ করা হয়েছে সেখানে হামলাকারী যে কজনের পরিচয় জানা গেছে তারা সবাই বিএনপির কর্মী। যে কজন গ্রেফতার হয়েছে তারাও বিএনপিরই ক্যাডার।

গতকাল ভাষণে প্রধানমন্ত্রী হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন বাংলাদেশে কেউ সংখ্যালঘু নয়, সংখ্যালঘু, সংখ্যাগুরু বলে জাতিকে কেউ যেন বিভক্ত না করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমরা এ প্রসঙ্গে বলতে চাই, বাংলাদেশে কেউ সংখ্যালঘু পরিচয়ের বিড়ম্বনা নিয়ে থাকুক এটা আমরা কেউ চাই না। বাংলাদেশে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সবাই জাতিগত পরিচয়ে বাঙালি এবং নাগরিকত্বের পরিচয়ে বাংলাদেশী। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান কিংবা আদিবাসী কেউ সংখ্যালঘু পরিচয় নিয়ে বাংলাদেশে বাস করতে চান না। দুর্ভাগ্যের বিষয় রাষ্ট্র তাদের কপালে সংখ্যালঘুত্বের ছাপ এমনভাবে এঁকে দিয়েছে যে সেটা সহজে মুছে ফেলা যাবে না। প্রথমে সংবিধান থেকে ৫ম সংশোধনীর দ্বারা ধর্ম নিরপেক্ষতা খারিজ করে মুখবন্ধে 'বিসমিল-াহ ....' সংযোজন করে, তারপর অষ্টম সংশোধনীর দ্বারা রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' ঘোষণার মাধ্যমে অমুসলিম সম্প্রদায় ও জাতিসত্তাসমূহকে এটা স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে তারা এদেশে 'সংখ্যালঘু' ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। সংখ্যায় লঘু বলেই হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের উপরে ইচ্ছামত হামলা ও নির্যাতন করা যায়। বিশেষ করে হিন্দুদের উপর হামলার অজুহাত দাঁড় করানো হয় তারা আওয়ামী লীগের সমর্থক, যদিও নির্বাচনে হিন্দুরা বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও অন্যান্য দলকেও ভোট দেয়। সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে তারা পরিণত হয়েছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে—আক্রান্ত হলেও যাদের প্রতিবাদ জানাবার সাহস নেই। রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও তাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য বাধ্য করা হয় দেশত্যাগে।

সাংবাদিক বন্ধুগণ

প্রশাসন অন্ধ হলেও প্রলয় বন্ধ থাকেনি। সারা দেশে সাম্প্রাদায়িক হামলা ও নির্যাতনের যে সব ঘটনা ঘটছে তার অর্ধেকও পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে না। আক্রান্তদের নিরবতা ছাড়াও দুর্গম এলাকায় সংঘটিত ঘটনাবলী সাংবাদিকদের পক্ষে জানা সব সময় সম্ভব হয় না। অনেক সময় খবর পাঠালেও সব পত্রিকায় তা ছাপা হয় না।

গতকাল বিকেলে আমরা উল-াপাড়ার ঘোষপাড়ায় গিয়েছিলাম, সিরাজগঞ্জ শহর থেকে যার

দূরত্ব প্রায় তিরিশ কিলোমিটার, কিছু পথ যেতে হয় নৌকায়। ঘোষপাড়ার চিত্তরঞ্জন ঘোষের বাড়িতে পরশু রাতে মুখোশধারী সন্ত্রাসীরা হামলা করে নগদ ৫০ হাজার টাকা, ৭/৮ ভরি স্বর্ণালঙ্কারসহ ঘরের যাবতীয় মূল্যবান সামগ্রী লুট করে নিয়ে গেছে। যাবার সময় হুমকি দিয়েছে থানায় অভিযোগ না করার জন্য। তারপরও থানায় তারা অভিযোগ করেছেন এবং আতঙ্কের ভেতর দিন যাপন করছেন। এই গ্রামের হিন্দুরা দুর্গাপূজার আয়োজন করছে এবং চিত্তরঞ্জন ঘোষের বাড়িতে ছিল পূজার তহবিল ও যাবতীয় সামগ্রী যা ১৮ অক্টোবর রাতে লুণ্ঠিত হয়েছে। আমাদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা কেঁদেছেন, বার বার বলেছেন, কীভাবে পূজা করব, মায়ের কাপড় পর্যন্ত নিয়ে গেছে। এই সব পরিবারকে এরপরও সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা করতে বলার মত নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা আর কিছু হতে পারে না।

সাংবাদিক বন্ধুগণ

অনিল শীলের ধর্ষিতা কন্যা ও তার পরিবারকে আমরা ঢাকা এনেছি এদের নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য, তাদের আর্থিক পুনর্বাসনের জন্য এবং সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। অনিল শীলের মতো শত শত পরিবার সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার হয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। এসব পরিবারের জীবনের নিরাপত্তার পাশাপাশি আর্থিক পুনর্বাসন সম্পর্কে আমরা সরকাররের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য দাবি করছি। বিশেষ করে যারা থানায় অভিযোগ করেছে, কিংবা যাদের কথা পত্রিকায় লেখা হয়েছে তাদের ক্ষমতাসীন দল ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন করা হচ্ছে মামলা ও অভিযোগ তুলে নেয়া এবং পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ করার জন্য। আশা করি সরকার বিষয়টিকে রাজনৈতিক দল বিশেষের 'সাজানো নাটক' বলে অভিহিত না করে সমস্যার রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক দিকগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে।

একইভাবে আমরা আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল এবং বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সমূহের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছি সর্বস্বহারা নির্যাতিত মানুষদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের বিষয়টিকে দ্রুত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করার জন্য।*

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

শাহরিয়ার কবির
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ
একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি

*সংবাদ সম্মেলনের পর নির্মূল কমিটি ও ফারিয়া লারা ফাউণ্ডেশনের পক্ষ থেকে অনিল শীলের পরিবারকে ২০ হাজার টাকা ও পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করা হয়। নির্মূল কমিটি পূর্ণিমার পড়ালেখার ব্যয় বহনের কথাও বলে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত একজন প্রকৌশলী সুধীরচন্দ্র দাস দুর্গাপূজার জন্য সঞ্চিত ৫ হাজার টাকা পূর্ণিমাকে প্রদান করে বলেন, এবার আমি দুর্গাপূজা করব না, আমি তোমার পূজা করব। তুমি যে সাহস দেখিয়েছ আমাদের সকলের উচিৎ তোমার পূজা করা।

পরিশিষ্ট-৩

বাংলাদেশের 'কারাবন্দী বিবেক' লেখক, সাংবাদিক, চলচ্চিত্রনির্মাতা শাহরিয়ার কবিরের মুক্তি, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন বন্ধের দাবিতে নাগরিক সমাবেশের ঘোষণা

প্রিয় দেশবাসী

আমাদের সংগ্রামী শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। দেশের এই ান্তিলগ্নে কিছু বক্তব্য তুলে ধরার প্রয়োজন মনে করছি। আপনারা জানেন দেশের বরেণ্য লেখক, সাংবাদিক, চলচ্চিত্রনির্মাতা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহরিয়ার কবির দীর্ঘ একমাসের বেশি সময় ধরে কারাবন্দী। বর্তমান সরকার ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মিথ্যা রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দায়ের করে দেশের মুক্তবুদ্ধির বিকাশে নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়া দেশপ্রেমিক শাহরিয়ার কবিরকে কারা অভ্যন্তরে আটকে রেখেছে। স্পষ্টভাষী, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার অকুণ্ঠচিত্ত শাহরিয়ার কবিরকে কারাগারের অন্ধকার কুঠুরিতে বন্দী রাখার এই ঘটনা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও ন্যাক্কারজনক। আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন, শুধু বাংলাদেশের সচেতন নাগরিকরাই নন, বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোসহ বহু দেশের লেখক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দও শাহরিয়ার কবিরকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে তার নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেছেন।

সংগ্রামী সাথীরা

সাংবাদিক, সাহিত্যিক শাহরিয়ার কবিরকে গ্রেফতার শুধুমাত্র ব্যক্তি শাহরিয়ার কবিরকে আটকে রাখা নয়। এটা মুক্তচিন্তা ও সুস্থ বিবেককে বন্দী করে রাখার সামিল। বাংলাদেশের যাঁরাই প্রগতিশীল ভাবনা-চিন্তা লালন করেন, যাঁরা মুক্তবুদ্ধির চর্চা করেন, একটি প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন তাঁদের কণ্ঠরোধ করা, লেখনী বন্ধ করা আর কর্মকাণ্ডকে স্তব্ধ করে দেওয়ার এক সুদূরপ্রসারী চান্তের অংশই হচ্ছে শাহরিয়ার কবিরের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের ও তাঁকে গ্রেফতারের ঘটনা। শাহরিয়ার কবিরের কার্যমকে স্তব্ধ করার অপচেষ্টা দেশের সকল মুক্তচিন্তার মানুষের জন্য হুমকি।

প্রিয় দেশবাসী

আপনারা জানেন গত ১লা অক্টোবরের নির্বাচনের পর দেশে নজিরবিহীন সাম্প্রদায়িক নির্যাতন চালানো হয়। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর বর্বর হামলা, নারীদের ধর্ষণ, ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট এবং গ্রামছাড়া ও দেশছাড়া করা হয়েছে অগণিত হিন্দু পরিবারকে। শিশুরাও এসব পাশবিক নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। বিএনপি-জামাতসহ ৪ দলীয় জোট সরকারের সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীরাই এই কলংকজনক অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছেন বলে পত্রিকান্তরে দেশের মানুষ জানতে পেরেছে। নির্বাচনের আগে ও পরে সংখ্যালঘুদের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতনের কাহিনী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমগুলোতে ব্যাপকভাবে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। মানবতাবিরোধী এমন ঘৃণ্যতম ঘটনায় অন্য সকলের মতই লেখক, সাংবাদিক ও চলচ্চিত্রনির্মাতা শাহরিয়ার কবিরের পক্ষে চুপ থাকা সম্ভব হয়নি। একজন বিবেকবান লেখক

হিসেবে বিবেকের তাড়না থেকে তিনিও লেখালেখি ও অন্যান্য সৃজনশীল কাজ করেছেন। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ বাঙালী আত্মাহুতি দিয়েছে, আড়াই লাখ মা-বোন অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করেছেন, অগণিত নারী-পুরুষ, শিশু পঙ্গুত্ব বরণসহ চরমতম ত্যাগ স্বীকার করেন। বাঙালি জাতির এমন বিশাল রক্তক্ষয়ী ত্যাগের ৩০ বছর পর লোমহর্ষক সাম্প্রদায়িক নির্যাতন মুক্তিযুদ্ধের অর্জনগুলোকে ম্লান করে দেয়, শহীদদের আত্মদানকে উপহাস করে। তাই জাতি হিসেবে নিজেদের সম্মান রক্ষার্থে এবং মুক্তিযুদ্ধের মহান ত্যাগ স্বীকারকে সার্থক করতে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিবেকবান বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। অন্যথায় হয়তো আফগানিস্তানের মতো ধর্মান্ধ তালেবানী রাষ্ট্রের দুঃখজনক পরিণতি বরণ করতে হবে বাংলাদেশকেও।

প্রিয় বন্ধুরা

একটি সুস্থ, সুন্দর, অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ার জন্য আমরা আমাদের প্রত্যেকের অবস্থান থেকে সংগঠিতভাবে কাজ করি। ৩০ লাখ বাঙালীর প্রাণের বিনিময়ে যে স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল সেই চেতনায় দেশ গড়তে না পারলে তা শুধু শহীদদের অবমাননাই নয় একজন বিবেকবান মানুষ হিসেবে আমরা এই দায় থেকে মুক্তি পাব না। জাতি হিসেবে আমাদের জন্য চির অপমানের বিষয় হয়ে থাকবে। একাত্তরের ঘাতক, যুদ্ধাপরাধীদের দল জামাতে ইসলামী বিএনপির ঘাড়ে ভর করে এখন অন্যতম ক্ষমতাসীন দল। তারা বাংলাদেশকে আবারও পাকিস্তানে পরিণত করার জন্য তাদের দীর্ঘদিনের চক্রান্ত এখন বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এসব চক্রান্তেরই অংশ সাম্প্রদায়িক নির্যাতন, প্রশাসন থেকে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের চাকরিচ্যুত করা, লেখক, সাংবাদিক শাহরিয়ার কবিরকে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা দিয়ে আটকে রাখা। এখনই যদি এসব রুখতে না পারি তাহলে অচিরেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বপ্নের বাংলাদেশকে হারাতে পারি। এই লজ্জা, অপমান থেকে মুক্তির জন্য আমাদের লড়াই সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের অর্জনকে ধরে রাখতে, একটি সুখী, সুন্দর, সন্ত্রাসবিহীন, দুর্নীতিবিহীন বাংলাদেশের জন্য ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে।

আমরা অবিলম্বে 'কারাবন্দী বিবেক' লেখক, সাংবাদিক, চলচ্চিত্রনির্মাতা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহরিয়ার কবিরের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করছি। একইসঙ্গে দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও প্রশাসন থেকে মুক্তিযোদ্ধা খেদাও নীতি বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছি।*

৩০ ডিসেম্বর ২০০১ **সচেতন নাগরিক সমাজ**

*৩০ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের চত্বরে আয়োজিত, অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই নাগরিক সমাবেশের ঘোষণা পাঠ করেন অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন। দেশের বরেণ্য নাগরিকদের ভেতর উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ, বিচারপতি কে এম সোবহান, ব্যারিস্টার শওকত আলী খান, অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী, সাংবাদিক ওয়াহিদুল হক, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক, সঙ্গীতশিল্পী ডঃ সনজিদা খাতুন, নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, প্রাক্তণ কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, শিল্পী হাশেম খান, সাংবাদিক আবেদ খান, অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূর এমপি, কলামিস্ট মোনায়েম সরকার, সঙ্গীতশিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, সমাজকর্মী খুশী কবির, ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, শিক্ষাবিদ শহীদজায়া শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী, এডভোকেট তারানা হালিম প্রমূখ।

পরিশিষ্ট-৪

৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩ তারিখে জাতীয় প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স কক্ষে আয়োজিত 'বাংলাদেশে জঙ্গী মৌলবাদের উত্থান এবং সাম্প্রদায়িক নির্যাতন' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনার ধারণাপত্র

বাংলাদেশে জঙ্গী মৌলবাদী তৎপরতার সাম্প্রতিক বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে ১৪ আগস্ট (২০০৩) রাতে জয়পুরহাটের ক্ষেতলালে পুলিশ বাহিনীর উপর নিষিদ্ধ ঘোষিত জামায়াতুল মুজাহিদিনের আক্রমণ। আক্রমণকারীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সহ সাতজন পুলিশকে আহত করে। পুলিশের তিনটি বন্দুক, গুলি ও অয়্যারলেস ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ১৬ আগস্ট দেশের জাতীয় দৈনিকসমূহের প্রধান সংবাদ ছিল পুলিশের উপর জঙ্গী মৌলবাদীদের হামলা, যার সূত্র ধরে আমরা পরবর্তী দিনগুলোতে জানতে পেরেছি সারা দেশে এই একটি জঙ্গী সংগঠনের কর্মকাণ্ড কতদূর বিস্তার লাভ করেছে।[১]

পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের হিসেবে সারা দেশে **১১টি** জঙ্গী মৌলবাদী সংগঠন রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে সংবাদপত্রের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এই সংখ্যা অন্ততপক্ষে **১৫টি**।[২] বাংলাদেশে এদের তৎপরতা কখন শুরু হয়েছে সে বিষয়ে সঠিক দিনক্ষণ জানা না গেলেও ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে বরেণ্য কবি শামসুর রাহমানের উপর হরকতুল জিহাদের হামলার সূত্র ধরে বিভিন্ন

১। আজকের (৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩) গোলটেবিল আলোচনার জন্য আমরা ১৬ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্ট ২০০৩ পর্যন্ত) ৭টি বাংলা ও ইংরেজি জাতীয় দৈনিকের সংবাদ ও সম্পাদকীয় মন্তব্য নথিবদ্ধ করেছি, যার সংখ্যা ২৭৫। এ ছাড়াও অন্যান্য জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিকে এ বিষয়ে শতাধিক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। জয়পুরহাটে জামায়াতুল মুজাহিদিন কর্তৃক পুলিশের উপর সশস্ত্র হামলার পর এই জঙ্গী মৌলবাদী সংগঠনের যে সব নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের বক্তব্য থেকে জানা গেছে এই সংগঠনের নেটওয়ার্ক দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, বগুড়া, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, বাগেরহাট, যশোর, রাজবাড়ি, টাঙ্গাইল, জামালপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, বেগমগঞ্জ ও চট্টগ্রাম সহ ৫২টি জেলায় বিস্তৃত রয়েছে। পুলিশকে তারা আরও জানিয়েছে উত্তরাঞ্চল হচ্ছে তাদের মূল এলাকা। মূলত মসজিদ ও কওমি মাদ্রাসাকে ভিত্তি করে তারা তাদের সংগঠন গড়ে তুলেছে। তাদের সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ৫ হাজার অতিক্রম করেছে। (সংবাদ, ২১ আগস্ট ২০০৩)

২। গোয়েন্দা সংস্থার তালিকাভুক্ত জঙ্গী মৌলবাদী সংগঠনগুলোর ভেতর রয়েছে ১) জামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ, ২) শাহাদাত-ই-আল হিকমা, ৩) জামায়াত-ই-ইয়াহিয়া আল তুরাত, ৪) হিজবুত তওহিদ, ৫) আল হারাকাত আল ইসলামিয়া, ৬) আল মারকাজুল আল ইসলামী, ৭) জামায়তুল ফালাইয়া, ৮) তাওহিদী জনতা, ৯) বিশ্ব ইসলামী ফ্রন্ট, ১০) জুম্মাতুল আল-সাদাত ও ১১) শাহাদত-ই-নব্যুয়ত। (জনকণ্ঠ, ১৯ আগস্ট ২০০৩)
গোয়েন্দা বিভাগের এই তালিকা অসম্পূর্ণ, কারণ মৌলবাদী জঙ্গীদের সবচেয়ে বড় সংগঠন 'হরকতুল জিহাদ'-এর নাম এই তালিকায় নেই। এ ছাড়া এবার খবরের কাগজে সুনামগঞ্জ থেকে 'আল-হরদল'-এর পাঁচ জঙ্গীকে গ্রেফতারের সংবাদ বেরিয়েছে, যাদের লক্ষ্য হচ্ছে— সকল সার্বভৌমত্বের

পত্রিকায় তখন খবর বেরিয়েছে আশির দশকের শেষার্ধ থেকেই এদের তৎপরতা আরম্ভ হয়েছে।

জামায়াতে ইসলামী ও অপরাপর কয়েকটি মৌলবাদী সংগঠন ইতিপূর্বে কবি শামসুর রাহমান, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ও বেগম সুফিয়া কামালসহ বেশ কয়েকজন প্রগতিবাদী শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও সমাজকর্মীকে মুরতাদ আখ্যা দিয়েছিল। ১৯৯৯ সালের ১৮ জানুয়ারি হত্যার উদ্দেশ্যে কবি শামসুর রাহমানের উপর জঙ্গী মৌলবাদীদের সশস্ত্র হামলা ছিল তারই ফলশ্রুতি।[৩] এই হামলার পর হরকতুল জিহাদের ৪৮ জন জঙ্গী মৌলবাদীকে গ্রেফতার করা হয় যাদের ভেতর দুজন ছিল বিদেশী— ১ জন পাকিস্তানের মোহাম্মদ সাজিদ এবং অপরজন দক্ষিণ আফ্রিকার আহমদ সাদিক আহমদ। গ্রেফতারের পর এই দুই বিদেশী নাগরিক জিজ্ঞাসাবাদের সময় পুলিশকে জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশে একটি জঙ্গী বাহিনী গঠন করার জন্য ওসামা বিন লাদেন নিয়মিতভাবে অর্থ সরবরাহ করেছেন। সাদেককে উদ্ধৃত করে পুলিশের একজন কর্মকর্তা রয়টার্সকে জানিয়েছিলেন, তখন পর্যন্ত লাদেন তাকে এই খাতে দুই কোটি টাকা দিয়েছেন যা দেশের ৪২১টি মাদ্রাসায় বিতরণ করা হয়েছে। (ঢাকা, ২৮ জানুয়ারি, রয়টার্স)[৪]

সেই সময় ঢাকার একটি শীর্ষস্থানীয় দৈনিকের খবর ছিল সারা দেশে হরকতুল জেহাদের কর্মী সংখ্যা ১৫ হাজারেরও বেশি, যাদের সংগঠনের পরিধি সরকারের বিভিন্ন দফতর পর্যন্ত বিস্তৃত। (দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ জানুয়ারি ১৯৯৯) ঢাকার শীর্ষ স্থানীয় ইংরেজি দৈনিকের প্রতিবেদন অনুযায়ী চট্টগ্রামের একটি ট্রেনিং ক্যাম্পে হরকতুল জিহাদ গত ১৪ বছরে ২৫ হাজার যুবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। (ডেইলি স্টার, ২৮ জানুয়ারি ১৯৯৯)

২০০১ সালে খালেদা-নিজামীর মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক অপশক্তি অধ্যুষিত চার দলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে আমরা হরকতুল জিহাদ ছাড়া তিনটি জঙ্গী মৌলবাদী সংগঠনের বিক্ষিপ্ত কার্যকলাপের বিবরণ পত্রিকায় দেখেছি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এদের সংখ্যা যেমন পাঁচগুণ বেড়েছে তেমনি সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটেছে সমগ্র বাংলাদেশে।

হামলাকারীদের আস্তানা থেকে পাওয়া গেছে জামায়াতে ইসলামীর আদর্শিক গুরু গোলাম আযমের লেখা 'ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টা' জামায়াতের রুকন/রুকন প্রার্থীর রিপোর্ট বই, জামায়াতে

উপর আঘাত হেনে আল-হর সার্বভৌমত্ব প্রদর্শন, সামরিক অঙ্গীকার— আল-হর শক্তি ক্ষমতা প্রদর্শন করা ইত্যাদি। (ভোরের কাগজ, ২২ আগস্ট ২০০৩)

২০০১ সালে নির্বাচনের পর ঢাকায় 'জইশে মোস্তফা বাংলাদেশ' নামক একটি জঙ্গী মৌলবাদী সংগঠনের বিক্ষোভ মিছিল দেখা গেছে। (এএফপি, ৫ এপ্রিল, নবেম্বর ৩, ২০০১)

ওসামা বিন লাদেন এবং বাংলাদেশে আলকায়দা নেটওয়ার্ক সং[illegible]ান্ত শতাধিক ওয়েব সাইটে 'আল জিহাদ বাংলাদেশ' নামক একটি জঙ্গী মৌলবাদী সংগঠনের উলে-খ রয়েছে যে দলের প্রধান ফজলুর রহমান তার সংগঠন সহ ৪টি জঙ্গী সংগঠন মিলে ১৯৯৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে একটি যুক্ত ইশতেহারে সাক্ষর করে 'ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ফ্রন্ট ফর জিহাদ' গঠন করেছেন। (www.ebc.ca/news/indepth/targetterrorism/afghanistan/html) এসব ওয়েব সাইটে বাংলাদেশে 'আল কায়দা'র সাংগঠনিক অবস্থানের কথাও বলা হয়েছে।

৩। ২৪ জানুয়ারি ১৯৯৯ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে গোয়েন্দা সংস্থার বরাত দিয়ে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে কবি শামসুর রাহমানের হত্যা প্রচেষ্টাকারী হরকাতুল জিহাদের হত্যা তালিকায় ২৮ জন শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীর নাম রয়েছে।

৪। জিজ্ঞাসাবাদের সময় পাকিস্তানি নাগরিক মোহাম্মদ সাজিদ জানিয়েছেন বিন লাদেনের কাছ থেকে পাওয়া দুই কোটি টাকা তিনি সিরাজগঞ্জ থেকে গ্রেফতারকৃত সরদার বখতিয়ারকে দিয়েছেন। বখতিয়ার পুলিশের কাছে স্বীকার করেছেন এ টাকা তিনি ৪২১ টি মাদ্রাসার হরকতুল জিহাদের জন্য কর্মী রি[illegible]ট ও প্রশিক্ষণের জন্য ব্যয় করেছেন। (www.saag.org/papers3/paper232.html)

ইসলামীর ইউনিট সংগঠনের মাসিক রিপোর্ট ফরম, মাসিক পৃথিবী পত্রিকাসহ আরও কিছু কাগজ পত্র। জব্দকৃত বইয়ের ভেতর আরও রয়েছে 'সশস্ত্র পাহারা (লেখক মওলানা মাসউদ আজহার)[৫], 'কেন জিহাদ করব' (২য় খণ্ড), 'জিহাদের চলি-শ হাদিস', 'জিহাদের অর্থ জয়', 'মাসিক আল মুজাহিদ', ডায়েরি ২০০৩ (ইসলামী ছাত্র শিবির) ইত্যাদি। ('সংবাদ', 'ভোরের কাগজ', 'আজকের কাগজ', 'প্রথম আলো', ২৭ আগস্ট ২০০৩)

অন্যান্য জঙ্গী মৌলবাদী হামলার পর পুলিশকে যেমন প্রথম দিকে খুবই তৎপর দেখা যায়, বেশ কিছু গ্রেফতার হয়, জিজ্ঞাসাবাদের সময় ভয়ঙ্কর উদ্বেগজনক সব তথ্য প্রকাশিত হয়, তারপর দেখা যায় উপরতলার অদৃশ্য সূতোর টানে যাবতীয় পুলিশী তদন্ত ও তৎপরতায় ভাটা পড়তে। ক্ষেতলালে পুলিশের উপর হামলাকারীদের ঘটা করে গ্রেফতার করা হলেও তাদের কীভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে তার বিবরণও পত্রিকায় বেরিয়েছে। স্থানীয় পুলিশের একজন কর্মকর্তা সাংবাদিকদের বলেছেন, 'যখনই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করি জঙ্গীরা আল-হু আকবর, আল-হু আকবর বলতে থাকে। একজন মুসলমান হয়ে তখন কি আর করা যায়?' ('সংবাদ', 'আজকের কাগজ', ২০ আগস্ট, ২০০৩)

ক্ষমতাসীন জোট সরকারের অন্যতম শরিক জামায়াতে ইসলামী কোন কোন ক্ষেত্রে যে বিএনপির চেয়েও শক্তিশালী তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন সময়ে জঙ্গী মৌলবাদীদের গ্রেফতারের পর যেভাবে তারা ছাড়া পেয়ে যায় কিম্বা তদন্ত ধামাচাপা পড়ে যাওয়া এবং মামলা দুর্বলভাবে নথিবদ্ধ হওয়ার ঘটনায়। গত ফেব্রুয়ারিতে দিনাজপুরের পঞ্চগড়ে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার পর যাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল তারা জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততার কথা বলেছিল। তারপর পঞ্চগড়ের ঘটনা ধামাচাপা পড়ে গেছে। এবার ক্ষেতলালে পুলিশের উপর হামলার কারণে যে সব জঙ্গী মৌলবাদীদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের নেতারা জামাতে ইসলামীর সঙ্গে যুক্ত বলে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে।[৬] জামাতের নেতারা অবশ্য বরাবরের মতো এসব জঙ্গীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেছেন। জামাতের নেতারা অবশ্য এ কথাও এখন স্বীকার করতে চান না যে— '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা রাজাকার, আলবদর, আলশামস প্রভৃতি ঘাতক বাহিনী গঠন করেছেন এবং গণহত্যা ও নারী নির্যাতন সহ যাবতীয়

৫। মওলানা মাসউদ আজহারের তিনটি বই জামায়াতুল মুজাহিদিনের ডেরা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। পাকিস্তান ভিত্তিক 'জইশে মুহাম্মদ'-এর কমাণ্ডার মাসউদ আজহারের নাম পত্রিকায় প্রথম শিরোনাম হয় '৯৯-এর ডিসেম্বরে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স-এর বিমান (IC414) ছিনতাই করার ঘটনায়। ছিনতাইকারীরা ভারতে আটক এই জঙ্গী নেতার মুক্তির দাবিতে ভারতীয় যাত্রীবাহী বিমান ছিনতাই করে আফগানিস্থান নিয়ে গিয়েছিল এবং ভারত সরকার ছিনতাইকারীদের দাবি অনুযায়ী মাসউদ আজহারকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ভারতে গ্রেফতারের পর মাসউদ আজহার তার জবানবন্দিতে বলেছেন— পাকিস্তানের ভাওয়াল পুরে ১৯৬৮ সালের ১০ জুলাই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছিলেন একজন দেওবন্দী গোঁড়া ধার্মিক ব্যক্তি। ছাত্রজীবনে তিনি হরকতুল মুজাহিদিনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং সংগঠনের প্রধান মওলানা ফজলুর রহমান খলিলের নির্দেশে আফগানিস্তানে জেহাদে যুক্ত হন। ১৯৯৩ সালের জানুয়ারিতে তিনি আমিরাতের ফ্লাইটে বাংলাদেশে আসেন। তার সঙ্গে ছিলেন সাজ্জাদ আফগানী। পরে ঢাকা থেকে তিনি করাচী যান, সাজ্জাদ আফগানী যান ভারতে। '৯৪ সালের জানুয়ারিতে তিনি পাকিস্তান থেকে পর্তুগীজ পাসপোর্ট নিয়ে আবার বাংলাদেশে আসেন ভারতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। ২৯ জানুয়ারি বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে তিনি দিলী যান। ফেব্রুয়ারিতে দিলী থেকে শ্রীনগর যাওয়ার সময় গ্রেফতার হন। (www.stratmag.com/issue2nov-15/kargil-html)

৬। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে ক্ষেতলালের জঙ্গী হামলার প্রধান আসামী মন্তেজারকে দু বছর দল থেকে বহিষ্কারের কথা বলা হলেও পত্রিকার খবর অনুযায়ী 'একই সময়ে মন্তেজার জামাতের

ধ্বংসযজ্ঞে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে যেভাবে প্ররোচিত করেছেন নিজেরাও সক্রিয়ভাবে তাতে অংশগ্রহণ করেছেন। গত ১৭ আগস্ট থেকে ২৮ আগস্ট পর্যন্ত ক্ষেতলালের জঙ্গী মৌলবাদী তৎপরতার সূত্র ধরে কয়েকটি দৈনিকের সংবাদ পাঠ করলেই বোঝা যাবে সন্ত্রাসের অভিযোগে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে যুক্ত কাউকে গ্রেফতার করা কিংবা গ্রেফতারের পর তাকে ধরে রাখা এবং নিরপেক্ষভাবে মামলা পরিচালনার ক্ষমতা প্রশাসনের নেই। ১৮ আগস্ট (২০০৩) 'ভোরের কাগজ'-এ প্রকাশিত 'জামাত শিবিরের কর্মীদের সাত খুন মাফ' শিরোনামে এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে— 'অধিকাংশ অপরাধের ক্ষেত্রে ধরা পড়ছে জামাত শিবিরের কর্মীরা কিন্তু তাদের আটকে রাখতে পারছে না পুলিশ।' ১৭ আগস্ট (২০০৩) 'জনকণ্ঠে' প্রকাশিত এতদসংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম হচ্ছে, 'ইসলামের নামে জঙ্গী তৎপরতায় জড়িতরা বার বার ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে কোন সুতার টানে?' ২৮ আগস্ট 'প্রথম আলো'র সংবাদ শিরোনাম হচ্ছে— 'জঙ্গীরা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে'। সকল প্রতিবেদনের মূল বক্তব্য হচ্ছে জামায়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ততার কারণে জঙ্গীরা ছাড়া পেয়ে যায়।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সন্ত্রাস ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে গ্রেফতারকৃত কয়েকজন জঙ্গী মৌলবাদীর সাজা হলেও এ সরকারের আমলে তারা সরকারের আশ্রয় ও প্রশ্রয় ষোলআনা উপভোগ করছে। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে কলের গানের ভাঙা রেকর্ডের মতো বার বার বলছে চার দলীয় জোটে কোন মৌলবাদী নেই, বাংলাদেশেও কোন মৌলবাদী নেই। শুধু এইটুকু বলেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, যারা বলছে সরকারের ভেতর মৌলবাদীরা

রোকন হওয়ার আবেদন করেছিল, এ সংক্রান্ত কাগজ পুলিশ উদ্ধার করেছে। পুলিশ জমা'তুল মুজাহিদিনের সঙ্গে জামাতের সংশি-ষ্টতা আছে এমন কথা সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার করছে না। তবে পুলিশ একথা স্বীকার করে যে, জঙ্গিদের আস্তানা থেকে উদ্ধারকৃত ডায়েরিতে শিবির ও জামাত নেতাকর্মীদের নামের তালিকা রয়েছে।

'.... এখানে উদ্ধার করা হয়েছে জামাতের সাবেক আমির আব্বাস আলী খানের নির্বাচনী লিফলেট, জামাতের তহবিল বায়তুল মাল থেকে স্থানীয় বানিয়াপাড়া এবতেদায়ী মাদ্রাসার ছাত্র সিরাজুল ইসলামের আর্থিক সাহায্য চেয়ে পাঠানো চিঠি, বানিয়াপাড়া আহমদিয়া মাদ্রাসার চাঁদা আদায়ের পরিমাণ উলে-খ সংবলিত চাঁদা আদায়ের রসিদ। এছাড়াও ১৯৯৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত এক কপি ভোরের কাগজ। ঐদিন প্রকাশিত পত্রিকায় শিরোনাম ছিল 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা, ছাত্রদল-শিবির সংঘর্ষে নিহত ২, আহত দেড় শতাধিক। এ ছাড়াও পুলিশ জানায়, জঙ্গি-পুলিশ সংঘর্ষের পর দিন ঐ আস্তানা থেকে জামাত-শিবিরের একাধিক বই, প্রকাশনা ও শিবিরের মনোগ্রামযুক্ত কর্মীদের ডায়েরি উদ্ধার করা হয়।

'এদিকে গতকাল দিনভর অনুসন্ধান চালিয়ে জানা গেছে, যে বাড়িতে জঙ্গিরা প্রশিক্ষণের জন্য জড়ো হয়েছিল সে বাড়ির মালিক মুজাহিদিন নেতা মুন্তেজার। গত ২০ জানুয়ারি ২০০৩ জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলার বেগুনবাড়ি গ্রামের পীরের আস্তানায় ৫ মুরিদ খুনের ঘটনার মাসাধিককাল আগে জামাতের নেতাকর্মীদের নিয়ে সংশি-ষ্ট এলাকায় মন্তেজারের নেতৃত্বে মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এসব সমাবেশে সে প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়, যেখানে ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ হবে সেখানে প্রতিরোধ করা হবে। এর পরে ঐ পীরের আস্তানায় বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়। পলাতক জঙ্গি নেতা প্রকাশ্যে জামাত নেতাদের সঙ্গে ওঠাবসা ও মিছিল-সমাবেশ করার পাশাপাশি সশস্ত্র সংগঠন জামা'তুল মুজাহিদনি গড়ে তোলার দায়িত্ব নেয়। সে তার বাসায় শতাধিক ব্যক্তিকে নিয়মিত সামরিক ও গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিতো বলে এলাকার বিভিন্ন সূত্র জানায়। এছাড়াও জামা'তুল মুজাহিদিনের সঙ্গে জামাতের সংশি-ষ্টতা রয়েছে এমন একটি চিঠি উদ্ধার করা হয়েছে। এই চিঠিতে জেলা জামাতের সেক্রেটারি আবদুল মতিন সরদার মন্তেজারকে বেশ কিছু সাংগঠনিক নির্দেশনা দেন তা উলে-খ রয়েছে।' (ভোরের কাগজ ২০ আগস্ট ২০০৩)

রয়েছে, বাংলাদেশে মৌলবাদীদের তৎপরতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে— সরকার তাদের ধরে কারাগারে নিক্ষেপ করছে। কিন্তু এ ধরনের কথা তো চার দলীয় জোটের শীর্ষ নেতারা সব সময় বলছেন যে, তারা ওসামা বিন লাদেন ও তালেবানদের অনুসারী, বাংলাদেশে যারা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে তাদের সমূলে উৎখাত করা হবে, তারা চান কোরানের আইন ও ফতোয়ার দ্বারা দেশ শাসন করতে। জোট সরকারের শীর্ষ নেতারা যদি এ ধরনের কথা বলেন— পুলিশের সাধ্য নেই তাদের উপর আক্রমণকারী কিংবা হত্যা ও বোমাহামলাকারী জেহাদী জঙ্গীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী জামায়াতুল মুজাহিদিনের সাম্প্রতিক আক্রমণকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বললেও জয়পুরহাট জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বলছেন, 'জামাতুল মুজাহিদিন সরকার উৎখাতে লিপ্ত। তারা যে কোন সময়ে অভ্যুত্থান করে বসবে।' (সংবাদ, ভোরের কাগজ, ২৬ আগস্ট ২০০৩)

জঙ্গী মৌলবাদীদের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত চালু করা। তারা বলছে যা কিছু ইসলামবিরোধী তা উৎখাত ও ধ্বংস করা হবে। এই আদর্শিক প্রণোদনা ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর থেকে বাংলাদেশে অমুসলিম ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের উপর ধারাবাহিক নির্যাতনের ক্ষেত্র তৈরি করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ সহ মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সংগঠন ও ব্যক্তিকে শায়েস্তা করা। যদিও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যারা গত নির্বাচনে ভোট দিতে পেরেছে তারা আওয়ামী লীগকে যেমন ভোট দিয়েছে, বাম দলগুলোকেও দিয়েছে এবং কোথাও কোথাও চার দলীয় জোটের প্রার্থীদেরও দিয়েছে। কিন্তু নির্বাচনের পর যে সব হিন্দু বিএনপিকে ভোট দিয়েছে বলে জানিয়েছে তারাও নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে পারেনি। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে সিরাজগঞ্জের বহুল আলোচিত ধর্ষিতা পূর্ণিমার পরিবার। পূর্ণিমার মা হামলাকারীদের জানিয়েছিলেন যে, তারা ধানের শীষে ভোট দিয়েছেন, কিন্তু তাতে রেহাই মেলেনি।

বাংলাদেশে জঙ্গী মৌলবাদী তৎপরতা অস্বীকার করার পাশপাশি খালেদা-নিজামীর জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশিত সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের যাবতীয় ঘটনাকে 'মিথ্যা', 'বানোয়াট', 'অতিরঞ্জিত' এবং 'বিরোধী দলের সাজানো নাটক' বলে অস্বীকার করছে। সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের প্রতিবাদ করার জন্য সরকার প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে আমার উপর কী ধরনের নির্যাতন করেছে এ বিষয়ে আপনারা অবহিত আছেন। গত ২২ মাসে গড়ে প্রতিদিন কোথাও না কোথাও সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, নারীর সম্ভ্রমহানি ঘটেছে, সঞ্চিত অর্থ ও সম্পদ লুণ্ঠিত হয়েছে, গৃহে অগ্নিসংযোগ ঘটেছে এবং এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তারা— বিশেষভাবে হিন্দু সম্প্রদায় বাধ্য হয় দেশ ছেড়ে চলে যেতে।

অনেকে মনে করেন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম কয়েক মাস সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের কিছু ঘটনা ঘটেছিল তবে পরে তা থেমে গেছে। এ কথা সত্য যে নির্বাচনের পর প্রথম তিন মাস বিভিন্ন পত্রিকায় সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের খবর যেভাবে বেরিয়েছে এখন তা বেরুচ্ছে না। কিন্তু এ থেকে এমন ধারণা করা ঠিক হবে না যে, সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে।

সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা এখনও ঘটছে, বিশেষ করে দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে। পত্রিকায় সব খবর না আসার কারণ হচ্ছে— ১) অর্থহীন জেনে কিংবা অধিকতর নির্যাতনের আশঙ্কায় নির্যাতিতরা থানায় অভিযোগ করে না এবং থানায় অভিযোগ লিপিবদ্ধ না হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় সাংবাদিকরা সে সব নির্যাতনের খবর পাঠাতে আগ্রহী হন না। ২) যে সব নির্যাতিতরা মরিয়া হয়ে থানায় অভিযোগ জানাতে যান তাদের অভিযোগ যথাযথভাবে

নথিবদ্ধ করা হয় না— বিশেষ ভাবে ধর্ষণের ক্ষেত্রে। ৩) স্থানীয় যে সব সাংবাদিক কর্তব্য ও বিবেকের তাড়নায় এ ধরনের নির্যাতনের খবর পত্রিকায় পাঠান তারা স্থানীয় প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন জোটের সন্ত্রাসীদের দ্বারা প্রায়শই আক্রান্ত হন, হুমকির সম্মুখীন হন কিংবা মিথ্যা মামলার শিকার হন। ৪) কোন সংখ্যালঘু পরিবার যদি উপর্যুপরি হামলা ও হুমকির শিকার হয় তার খবর একবারের বেশি দুবার বা তিনবার পত্রিকায় ছাপা হয় না বিষয়ের পুনরাবৃত্তি বা নতুনত্ব না থাকার কারণে। ৫) যে সব পত্রিকা এক সময় গুরুত্বের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের সংবাদ ছেপেছে তারা সরকারের বিভিন্ন ধরনের চাপ, হুমকি, মামলা এবং সরকারী বিজ্ঞাপন হারাবার কারণে এখন নির্যাতনের খবর তুলনামূলকভাবে কম ছাপছে।

আমরা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বিভিন্ন এলাকায় তদন্ত করে দেখেছি সাম্প্রদায়িক নির্যাতন এখনও অব্যাহত আছে তবে এর ধরন বদলেছে। এখন সংখ্যালঘুদের উপর হত্যা, ধর্ষণ ও দৈহিক নির্যাতন তুলনামূলকভাবে কম হচ্ছে, বেড়েছে মানসিক নির্যাতন। এখন তাদের বলা হচ্ছে— ক) এ দেশ মুসলমানদের, এদেশে অমুসলমানদের জায়গা নেই। খ) এদেশে থাকতে হলে অমুসলমানরা কখনও স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না। হয় তারা ক্ষমতাসীন জোটের প্রার্থীকে ভোট দেবে, নয় তারা ভোটকেন্দ্রে যেতে পারবে না। এবং গ) অমুসলিমরা উচ্চতর শিক্ষা এবং প্রতিযোগতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে ফল যতই ভাল করুক উপযুক্ত সরকারী চাকরি তারা পাবে না। এ ছাড়া অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে নতুনভাবে হিন্দুদের সম্পত্তির অধিগ্রহণ আওয়ামী লীগ আমলে নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও বর্তমানে তা আবার চালু হয়েছে, অর্থাৎ হিন্দুরা এই কালাকানুনের শিকার হয়ে সম্পত্তিহারা হচ্ছে। এর পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন না করার ফলে সেখানকার এথনিক সম্প্রদায় নানাভাবে বিড়ম্বিত, লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হচ্ছে, যা সেখানে ক্রমশঃ বিস্ফোরণ্মুখ পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে।

জঙ্গী মৌলবাদীদের রাজনৈতিক, সাংগঠনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আদর্শিক বিস্তারের কারণে আমাদের হাজার বছরের সহিষ্ণুতা ও অসাম্প্রদায়িকতার চেতনা আজ বিপন্ন। যে চেতনা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি এবং বাংলাদেশ অর্জন করেছি ক্ষমতাসীন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার ধারাবাহিক বিকাশের ফলে তা ধ্বংস হতে চলেছে। বাংলাদেশে জঙ্গী মৌলবাদের উত্থান ও সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনার প্রতিক্রিয়া অবধারিতভাবে প্রতিবেশী দেশসমূহে পড়বে। উপমহাদেশে মুসলিম মৌলবাদ ও হিন্দু মৌলবাদের স্বার্থ যে অভিন্ন এ বিষয়ে আমরা সকলেই জানি। সকল মৌলবাদের লক্ষ্য সেক্যুলার গণতন্ত্র ধ্বংস করে ফ্যাসিবাদ কায়েম করা।

বাংলাদেশের তালেবানিকরণ ও পাকিস্তানিকরণ প্রতিহত করতে হলে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিনাশী মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক তৎপরতা প্রতিহত করতে হলে, স্বাধীনতা সার্বভৌত্ব রক্ষা করতে হলে এবং সেক্যুলার গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের হৃত ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সকল রাজনৈতিক দল ও সামাজিক শক্তিকে এক জোট হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তির বিভেদ ও অনৈক্যের কারণেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিনাশী, একাত্তরের ঘাতক, দালাল, যুদ্ধাপরাধী, মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক অপশক্তি আজ ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তে ভেজা বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পেরেছে। আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছি, বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে তুলতে চাই— তারা ধ্বংসের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারি না।

আমরা জানি ক্ষমতায় যাওয়ার প্রশ্নে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বাম ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতর মতপার্থক্য আছে। বামদের নিজেদের ভেতরও মতপার্থক্য আছে এবং থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ এবং বাঙালির হাজার বছরের অর্জনসমূহ আসন্ন বিনাশ

থেকে রক্ষা করতে হলে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই হবে এবং তা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে বিচ্ছিন্নভাবে নয়, একাত্তরের মতো একজোট হয়ে। এমনকি বিরানব্বইয়ে শহীদ জননী জাহানরা ইমামের নেতৃত্বে যেভাবে আমরা একজোট হয়ে দাঁড়িয়েছিলোম তাতে জামায়াতে ইসলামী সহ তাবৎ মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তির ভিত নড়ে গিয়েছিল। সেই ঐক্য কেন আমরা ধরে রাখতে পারিনি তা নিয়ে অনেক আলোচনা সমালোচনা হতে পারে এবং হওয়া প্রয়োজনও। কিন্তু এসব আলোচনা যদি মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তির তাণ্ডবের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে রুখে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়া বিলম্বিত করে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।

আজকের এই গোল টেবিল আলোচনায় প্রধানত মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনৈতিক দলের শীর্ষনেতাদের কাছে আমাদের একান্ত আবেদন— জঙ্গী মৌলবাদের উত্থান ও সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার প্রতিহত করার ক্ষেত্রে আমরা অবিলম্বে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি এ বিষয়ে আলোকপাত করুন এবং দিক নির্দেশনা দিন। মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমাদের দর্শন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, অর্থনীতি সর্বক্ষেত্রে লড়তে হবে এবং সেকুলার গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে; কিন্তু মূল লড়াই রাজনৈতিক এবং এ কারণেই জাতির এই চরম সংকট মুহূর্তে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে এগিয়ে আসতে হবে সুস্পষ্ট, বলিষ্ঠ বক্তব্য নিয়ে। স্থির করতে হবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কোন বাংলাদেশ আমরা রেখে যাব।

শাহরিয়ার কবির
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ
একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি

পরিশিষ্ট-৫

নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি'র ঘোষণাপত্র

সাম্প্রদায়িক বর্বরতা রুখে দাড়াও

সকল নাগিরকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করো

বর্তমানে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর যে-নির্যাতন চলছে তাতে আমরা লজ্জিত, মর্মাহত, উদ্বিগ্ন ও ক্ষুব্ধ। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, সমতলবাসী ও পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর ওপর যে-সন্ত্রাস বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জুড়ে প্রায় দু'মাস ধরে অব্যাহত গতিতে চালু রয়েছে তার প্রতিবিধানে সরকারের ব্যর্থতা ইচ্ছাকৃত বলে মনে সন্দেহ জাগে, কারণ এমন ভয়ঙ্কর অমানবিক ঘটনাকে সরকার লঘু করে দেখছেন ও যথোচিত গুরুত্ব দিচ্ছেন না। আমরা সরকারের এমন সংবেদনহীন মনোভাব, নিষ্ক্রিয়তা, নাগরিকজনের একাংশের প্রতি অত্যাচার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লালন করার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করি। সরকারের নিকট আমাদের দাবি : ঘটনার জন্য দায়ী দুর্বৃত্তদের যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করুণ, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও পরিবারের পুনর্বাসনে দ্রুত ব্যবস্থা নিন এবং তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিন। এ বিষয়ে তদন্ত কমিশন গঠনের জন্য আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব যাতে দেশের ও বিশ্বের বিবেকবান মানুষ বাংলাদেশে ঘৃণ্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের গভীরতা, ব্যাপ্তি ও নৃশংসতার মাত্রা সম্যকরূপে বুঝতে পারে।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংরাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূলে যে-সব আদর্শ িয়াশীল ছিল তার মধ্যে একটি হল সকল নাগরিকের সমান অধিকারের ধারণা। সাম্প্রতিক নির্মম ঘটনাবলি সে-আদর্শকে নিদারুণভাবে আঘাত করেছে এবং এ দেশে গণতন্ত্রের চর্চা ও মানবাধিকার ভোগের পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। এ ধরনের হামলা, নিরীহ প্রতিবেশীর ঘরবাড়ি লুণ্ঠন ও সম্পত্তি ধ্বংশ, হিংস্র পশুর মতো নারী মাত্রেরই সম্ভ্রমহানি করা যে-কোন সভ্য সমাজের পরিপন্থী। তাই আমাদের সকলেরই কর্তব্য আজ এইসব অন্যায়ের প্রতিরোধ করা, সুস্থ ও স্বাভাবিক মনুষ্যবাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তোলা এবং উপদ্রুত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তার আস্থা ফিরিয়ে আনা। এই লক্ষ্যে জাতীয় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সর্বত্র শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিবেকবান মানুষের প্রতিরোধ রচনার আহ্বান আমরা জানাই।

শুধু বাংলাদেশ নয়, সমগ্র দক্ষিণ-এশীয় অঞ্চলে যাতে এ ধরণের বর্বর ঘটনা না ঘটতে পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখাও সকল গণতন্ত্রমনা ও বিবেকবান মানুষের জন্য জরুরি।

সালাহউদ্দীন আহমদ শেখ, মোহাম্মদ শহীদুল-ইহ, রোকেয়া কবীর, গোলাম মহিউদ্দীন, খান সারওয়ার মুরশিদ, সন্তোষ গুপ্ত, এ এন রাশেদা, বেলাল চৌধুরী, কবীর চৌধুরী, ওয়াহিদুল হক, দৌলত আরা মান্নান, (ডা.) সারোয়ার আলী, সরদার ফজলুল করিম, (কর্ণেল) শওকত আলী, জামিল চৌধুরী, শফি আহমেদ, জিল-ুর রহমান সিদ্দিকী, কাজী খলীকুজ্জামান আহমেদ, রামেন্দু

মজুমদার, হারুন হাবীব, রেহমান সোবহান, আলী যাকের, মামুনর রশীদ, সোহরাব হাসান, মুশাররফ হোসেন, আসাদুজ্জামান নূর, মফিদুল হক, মুহাম্মদ সামাদ, এ এম হারুন অর রশীদ, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, নাসিরউদ্দিন ইউসুফ, হেলাল চৌধুরী, ফয়েজ আহমদ, মেসবাহ কামাল, গোলাম কুদ্দুছ, ওয়াজেদুল ইসলাম খান, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী, জিয়াউদ্দিন তারিক আলী, চৌধুরী খুরশীদ আলম

শামসুর রাহমান, হামিদা হোসেন, আলী আকসাদ, সুব্রত চৌধুরী, আনিসুজ্জামান (আহ্বায়ক) আয়শা খানম, আবদুল আলী, মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী, হায়াৎ মামুদ, খুশী কবির, এম এম আকাশ, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, সালমা সোবহান, আবদুল আলী, দুলালচন্দ্র ভৌমিক, আহমেদ কামাল, সুলতানা কামাল, আবদুল গফুর, সজীব দ্রং, অজয় রায়, (ড.) মালেকা বানু, মমতাজ লতিফ, সালাম আজাদ, অজয় রায় (অধ্যাপক), শওকত আরা হোসেন, মালেকা বেগম, ফিলিপ গাইন, আর আই এম আমিনুর রশীদ, রাখী দাশ পুরকায়স্থ, জাহেদা আহমদ।

নাগরিক অধিকার-সংরক্ষণ ও সাম্প্রদায়িকতা-প্রতিরোধ কমিটি
৭৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক, এলাকা, ঢাকা-১০০০
তারিখ ঃ ০৬.১১.০১

পরিশিষ্ট-৬
‘মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলন’-এর উদ্যোগে ২৮ জানুয়ারি ২০০৪ তারিখে ঢাকার পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী মিলনায়তনে আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনার ধারণাপত্র
বহুমাত্রিক সাম্প্রদায়িক নির্যাতন এবং প্রস্তাবিত ব্লাসফেমী আইন

২০০১ সালে খালেদা-নিজামীদের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক-যুদ্ধাপরাধী অধ্যুষিত চার দলীয় জোট ক্ষমতায় আসার পর থেকে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের উপর যে নজিরবিহীন নির্যাতন শুরু হয়েছে বর্তমানে তা বহুমাত্রিক রূপ ধারণ করেছে। প্রথমে শুরু হয়েছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন, তারপর তা ছড়িয়েছে খৃস্টান, বৌদ্ধ এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভেতর। সম্প্রতি নির্যাতনের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় পর্যন্ত।

মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বপ্রদানকারী দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগও চরম নির্যাতনের শিকার হয়েছে এবং নির্যাতন চলছে সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী, বুদ্ধিজীবী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সরকারী-আধাসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপর। শেষোক্ত নির্যাতন মূলতঃ রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপ্রসূত। সংখ্যালঘু নির্যাতনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার চেয়ে অধিকতর ক্রিয়াশীল—দুর্বল, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর যৎসামান্য জমি ও অর্থ আত্মসাৎ এবং সহিংস, ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করে বাংলাদেশকে একটি মৌলবাদী মনোলিথিক মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করার নীলনকশা।

২০০৪ সাল শুরু হয়েছে মধুপুরের আদিবাসী নেতা পিরেন স্নাল হত্যার মাধ্যমে। মধুপুরের জঙ্গলে আদিবাসী গারো সম্প্রদায়কে উৎখাত করে সেখানে ইকো পার্ক নির্মাণের বিরোধিতা করতে গিয়ে ৩ জানুয়ারি জোট সরকারের পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন পিরেন। এরপর ১৫ জানুয়ারি খুলনায় বোমা মেরে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠ, সিপিবির স্থানীয় নেতা, বিবিসির সাংবাদিক মাণিক সাহাকে। সিপিবি এই ঘটনার জন্য সরাসরি জামাত-শিবির চক্রকে দায়ী করেছে। মধুপুরে পুলিশের গুলিতে পিরেন হত্যা এবং খুলনায় জামাতের ভাড়াটে খুনীদের হাতে মাণিক সাহা হত্যা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। যারা পিরেন ও মাণিককে হত্যা করেছে তারা জানে তাদের কিছু হবে না। খালেদা-নিজামীদের জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের সদস্যদের যারা হত্যা করেছে, যারা নারী ধর্ষণ সহ যাবতীয় নির্যাতন, লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ সাধন করেছে তাদের কিছুই হয়নি। ক্ষমতাসীন দল বা জোট যখন সহায় তখন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের পক্ষেও সম্ভব নয়। বরং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার কারণে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও এ ধরনের নির্যাতনে কম আগ্রহী নয়, যার নির্মম নিদর্শন হচ্ছে সেনা অভিযানে কাস্টডিতে ৫৮ জন নিরীহ মানুষের মৃত্যু এবং এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচার থেকে

অব্যাহতি দানের জন্য ইনডেমনিটি ঘোষণা।

নতুন বছরে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের নতুন মাত্রা আমরা লক্ষ্য করেছি আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের যাবতীয় প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণার সরকারী নির্দেশে। (৯ জানুয়ারি ২০০৪) একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রকাশনা ও প্রচার নিষিদ্ধ করা বাংলাদেশের সংবিধান[১] এবং জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার সনদের[২] পরিপন্থী। যে সব দেশ শান্তিপূর্ণভাবে নাগরিকদের ধর্ম পালন ও প্রচারের অধিকার দেয় না সেই সব দেশ সভ্যজগতে বর্বর হিসেবে পরিচিত। একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য জোট সরকার সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রক্রিয়ায় আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে বাংলাদেশকে একটি বর্বর দেশ হিসেবে বিশ্বসভায় পরিচিত করতে চাইছে।

আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করার পর এই সম্প্রদায়ের সংক্ষুব্ধ নেতারা যখন উচ্চতর আদালতে যাওয়ার কথা বলেছেন জোট সরকারের শরিক মৌলবাদী দলের এক শীর্ষস্থানীয় নেতা বলেছেন তারা এক্ষেত্রে হাই কোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের কোন নির্দেশই মানবেন না— যদি তা আহমদীয়া সম্প্রদায়ের পক্ষে যায়।[৩] এর আগে সুপ্রিম কোর্টের দুজন বিচারপতি ফতোয়াকে অবৈধ ঘোষণা করায় এই নেতা তাঁদের মুরতাদ আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন বাংলাদেশ ফতোয়ার আইনে চলবে। জোট সরকারের মৌলবাদী শরিকরা একটি সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জনসভায় ক্রমাগত বিদ্বেষমূলক উক্তি এবং তাদের ধ্বংস করার হুমকি দিয়ে এক ধরনের সামাজিক উন্মাদনা সৃষ্টি করতে চাইছে, যেমনটি আমরা দেখেছি হিটলার ও মুসোলিনির সময় জার্মানি ও ইটালিতে। মৌলবাদীরা ক্রমাগত হুমকি দিচ্ছে যারা

১। বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য সম্পর্কে ২৮। (ক) ধারায় বলা হয়েছে ‘কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।’

চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা সম্পর্কে ৩৯। (১) ধারায় বলা হয়েছে ‘চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল। (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্‌ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের এবং (খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।’

২। সর্বজনীন মানবাধিকার সনদের ১৮ নং ধারায় বলা হয়েছে ‘প্রত্যেকের চিন্তা, চেতনা ও ধর্মপালনের অধিকার রয়েছে, যে অধিকারের ভেতর এককভাবে ও গোষ্ঠীগতভাবে ধর্মান্তরিত হওয়ার স্বাধীনতা, ধর্ম পালন, শিক্ষা ও প্রচার রয়েছে।’

১৯ ধারায় বলা হয়েছে ‘প্রত্যেকের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার আছে, যে অধিকারের ভেতর কোনরকম প্রতিবন্ধকতা ব্যতিত যে কোন মাধ্যমে যে কোন দেশ থেকে তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা।’

৩। ‘ইসলামী ঐক্যজোটের একাংশের চেয়ারম্যান মুফতি ফজলুল হক আমিনী এমপি রবিবার নোয়াখালীতে এক ইসলামী সমাবেশে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন, কাদিয়ানীদের ব্যাপারে সরকারী নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে কোন তৎপরতা চললে দেশে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হবে। এমন কি সুপ্রীমকোর্টেও যদি কাদিয়ানীদের পক্ষাবলম্বন করা হয় তাহলে দেশজুড়ে যে আগুন জ্বলবে তা নেভানোর শক্তি কারও নেই। আমিনী হুঁশিয়ার করে বলেন, সংবিধান রক্ষার নামে কাদিয়ানীদের পক্ষ নেবার কোন সুযোগ নেই। বাংলাদেশের সংবিধান আমাদের রক্ষা করতে হবে। তার চেয়ে বড় কথা হলো মেনে চলতে হবে আল-াহর সংবিধান কোরানকে। কোরানকে অমান্য করে কোন রায় ঘোষণার অধিকার কারও নেই। যেমন হাইকোর্টের ফতোয়াবিরোধী রায়ও সহ্য করা হয়নি। আমিনী বলেন,

আহমদীয়া সম্প্রদায়ের পক্ষে কথা বলবে তাদেরও নির্মূল করা হবে। জামায়াতে ইসলামীর সাংসদ দেলোয়ার হোসেন সাঈদী এক ধর্মীয় সমাবেশে বলেছেন, 'কাদিয়ানীদের পক্ষাবলম্বনকারীরা ইসলামের দুষমন'। (ইনকিলাব ২২ জানুয়ারি, ২০০৪)

এর আগে মৌলবাদী নেতারা প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা করেছেন বাংলাদেশে কোরান ও সুন্নাহবিরোধী কোন আইন তারা মানবেন না। দুর্ভাগ্যের বিষয় এভাবে ‍মাগত আদালত অবমাননাকর, সংবিধানবিরোধী বক্তব্য প্রদানের পরও এইসব মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তিবিনাশী কর্মকাণ্ডের সাম্প্রতিক নিদর্শন হচ্ছে জাতীয় সংসদে 'ব-াসফেমী আইন' পাশের উদ্যোগ।[৪] ২২ জানুয়ারি বিএনপির একজন সাংসদ সংসদে ব-াসফেমী আইন প্রণয়নের বিল জমা দিয়েছেন। ২৫ জানুয়ারি ২০০৪ তারিখে জাতীয় সংসদের জামায়াত নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী ব-াসফেমী আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়েছেন। (ভোরের কাগজ, সংবাদ, যুগান্তর, ইনকিলাব, ২৬ জানুয়ারি ২০০৪)

ক্ষমতায় আসার পর থেকে খালেদা-নিজামীদের জোট সরকার মুক্তিযুদ্ধের যাবতীয় অর্জন একের পর এক ধ্বংস করে দিচ্ছে। এখানে ব-াসফেমী আইন চালু হওয়ার অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতি পাকিস্তানিকরণের ক্ষেত্রে এক বৃহৎ উল-ম্ফন। এই আইন অমুসলিম জনগোষ্ঠীর নিজ নিজ ধর্মপালন ও ধর্মপ্রচার কার্যতঃ বন্ধ করে দেবে। 'ব-াসফেমী আইন' প্রবর্তিত হলে সরকার সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের পাশাপাশি সেক্যুলার মুসলমানদের নির্যাতন করার লাইসেন্স প্রাপ্ত হবে। পাকিস্তানে ব-াশফেমী আইন চালু হওয়ার পর

কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণাই শুধু নয়, তাদের মূল লক্ষ্য হলো আল-াহর আইন রাষ্ট্রীয়ভাবে বাস্তবায়ন করা।' (জনকণ্ঠ, ১২ জানুয়ারি ২০০৪)

৪। ২২ জানুয়ারি ২০০৪ তারিখে জাতীয় সংসদে বিএনপির সাংসদ আবদুল মান্নান এই বিল জমা দিয়েছেন। 'ধর্ম অবমাননা নিষিদ্ধ আইনের কারণ ও উদ্দেশ্য সংবলিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইসলামসহ অন্যান্য ধর্মের প্রতি কটাক্ষ রোধকল্পে এ বিল সংসদে উত্থাপন করা হচ্ছে। বিলে এ ধরনের অপরাধের জন্য অনুর্ধ্ব ২ বছর কারাদণ্ড বা অনধিক এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। দেড় পৃষ্ঠায় সংক্ষিপ্ত বিলটির ৪ দফায় বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি (ক) কটুক্তি, ব‍াক্তি, বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য, অবমাননাকর উক্তি লিখিতভাবে বা অন্য কোনভাবে কোন প্রচার মাধ্যমে অথবা প্রকাশ্যে প্রচার করবেন না। (খ) বিদ্বেষমূলক অথবা বিদ্রুপাত্মক কোন ছবি, চলচ্চিত্র অথবা শিল্পকর্ম প্রকাশ করবেন না এবং (গ) বিদ্রুপাত্মক আচরণ করবেন না। এর ব্যাখ্যায় আরও বলা হয়েছে কোন ব্যক্তি যদি কোরআন, সুন্নাহ বা ইসলামী শরিয়তের প্রতি কোন অবমাননাকর উক্তি লিখিতভাবে বা অন্য কোনভাবে কোন প্রচার মাধ্যমে প্রকাশ্যে প্রচার করেন অথবা বিদ্বেষমূলক, বিদ্রুপাত্মক কোন ছবি, চলচ্চিত্র অথবা শিল্পকর্ম প্রকাশ করেন, তাহলে তিনি ধর্ম অবমাননা করছেন বলে গণ্য হবেন। আইনের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকলে 'শরিয়ত অর্থ ইসলামী আইন এবং রীতি এবং সুন্নাহ অর্থ হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর বাণী, কাজ এবং অনুমোদনসমূহ। বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সাংবিধানিকভাবে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয়েছে এবং সকল ধর্ম শান্তিতে পালন করার অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। এ দেশের শতকরা নব্বই ভাগ নাগরিক মুসলমান। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী নাগরিক মুসলমানদের পাশাপাশি শান্তিপূর্ণভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করছেন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে কিছু সংখ্যক ধর্মবিরোধী ও সমাজবিরোধী ব্যক্তি বিভিন্ন সময় দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি নষ্ট করার হীন উদ্দেশ্যে ইসলামসহ অন্যান্য ধর্মের প্রতি কটাক্ষ করে থাকে। যা কোনভাবেই

থেকে শতকরা আশিভাগ ভিকটিম হচ্ছেন সেখানকার সেক্যুলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও সমাজকর্মীরা, যার সাম্প্রতিক উদাহরণ হচ্ছেন ডঃ ইউনুস শেখ।[৫]

বিভিন্ন সরকারপন্থী দৈনিকে প্রস্তাবিত ব-াসফেমী আইনের ভাষ্য যতটুকু আমরা দেখেছি তাতে যদিও এক জায়গায় বলা হয়েছে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সহ হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি 'কটুক্তি', 'ব‍াক্তি', 'বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য' ইত্যাদি করা যাবে না, আরেক জায়গায় বলা হয়েছে কোরান, সুন্নাহ বা ইসলামী শরিয়তের প্রতি কোন অবমাননাকর উক্তি ... লিখিতভাবে বা অন্য কোনভাবে করা যাবে না। আমাদের প্রশ্ন— ১) ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার শাস্তির বিধান বাংলাদেশের পেনাল কোড এর ২৯৫-ক ধারায়[৬] অনেক আগে থেকেই রয়েছে। আইনের এই বিধান কার্যকর থাকা সত্ত্বেও স্বতন্ত্রভাবে এই মুহূর্তে 'ব-াসফেমী আইন' প্রণয়নের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য কি? ২) হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টানদের কথা প্রথমে বলা হলেও পরে নির্দিষ্টভাবে কোরান, সুন্নাহ ও ইসলামী শরিয়তের কথা বলা হয়েছে। এখানে ইসলামী শরিয়তের সংজ্ঞা কে দেবে? ৩) যে জামায়াতীরা এখন সংসদে ব-াসফেমী আইন পাশ করতে চাইছে তারা যে প্রকৃত মুসলমান নয় এ বিষয়ে বাংলাদেশের হাফেজ্জি হুজুর সহ উপমহাদেশের আলেম সম্প্রদায় বহু ফতোয়া দিয়েছেন।[৭] ব-াসফেমী আইন চালু হলে এদেশে মুসলমানদের ভেতর যে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে না এর নিশ্চয়তা কে দেবে?

মুসলমানদের মতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান সবাই মুশরিক। হিন্দু ও বৌদ্ধরা মূর্তিপূজারী, খৃস্টানরা ত্রিত্ববাদী। এই বিল পাশ হলে যে কোন হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান বা অমুসলিমকে অতি তুচ্ছ কারণে এবং অকারণে জেল-জরিমানা করা যাবে।

অভিপ্রেত নয়। এ ধরনের হীন চ‍াান্ত রোধকল্পে এ বিল সংসদে উত্থাপন করা হচ্ছে।' (দৈনিক মানবজমিন, ২৩ জানুয়ারি ২০০৪)

৫। ২০ আগস্ট ২০০২ সালে লাহোর হাইকোর্টে 'মোহাম্মদ মাহবুব ওরফে বুবা বনাম রাষ্ট্র' শীর্ষক ব-াশফেমী মামলায় বিচারপতি আলী নেওয়াজ চৌহান ও বিচারপতি রুস্তম আলী প্রদত্ত রায়ে বলা হয়েছে— "It appears that ever since the law became more stringent, there has been an increase in the number of registration of the blasphemy cases. A report from the Daily Dawn of 18th July, 2002, says that between 1948 and 1979, 11 cases of blasphemy were registered. Three cases were reported between the period 1979 and 1986., Forty four cases were registered between 1987 and 1999. In 2000, fifty two cases were registered and strangely, 43 cases had been registered against the Muslims while 9 cases were registered against the non-Muslims. The report further states that this shows that the law was being abused more blatantly by the Muslims against the Muslims to settle their scores." (All Pakistan legal Decisions , Vol. LIV, PLD 2002 Lahore, p. 590)

৬। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পেনাল কোডের ২৯৫ ক ধারায় বলা হয়েছে—' Whoever, with deliberate and malicious intention of outraging the religious feelings of any class of the citizens of Bangladesh, by words, either spoken or written, or by visible representations insults or attempts to insult the religion or the religious beliefs of that class, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.'

৭। খেলাফত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মওলানা মোহাম্মদ উল-াহ হাফেজ্জী হুজুর মওদুদী জামাত সম্পর্কে 'সতর্ক বাণী' শিরোনামে একটি পুস্তক লিখেছেন। তাতে তিনি মওদুদীর ভ্রান্ত মতবাদ ও জামাতে

মুসলমানদের ভেতর ৭৩টি ফেরকা আছে। প্রত্যেক ফেরকার ভেতর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও মতের অনুসারীরা আছে। যখন জামায়াতীরা ব-াসফেমী আইন প্রয়োগ করে কাউকে শাস্তি দিতে চাইবে তখন সুন্নি তরিকা পালন করেও রেহাই পাওয়া যাবে না যদি সেই ব্যক্তি অন্য কোন দলে অবস্থান করে।

পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি ব-াসফেমীর অভিযোগে যাদের গ্রেফতার করা হয় সে সব মামলার কোন স্বাভাবিক তদন্ত হয় না। লাহোর হাইকোর্টের বিজ্ঞ বিচারপতি আলী নেওয়াজ চৌহান এক মামলার রায়ে মন্তব্য করেছেন 'ব-াসফেমী আইনের আওতায় বিচারাধীন মামলাগুলোতে মোল-াদের তাণ্ডবের ভয়ে একে তো পুলিশ সঠিক তদন্ত করতে চায় না, অন্যদিকে বিচারকরা সঠিক রায় প্রদান করতেও সাহস পান না।'[৮]

ক্ষমতায় আসার পর থেকে বর্তমান জোট সরকার সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের সকল মৌলিক অধিকার হরণ করে, তাদের উপর নজিরবিহীন নির্যাতন চালিয়ে ইতিমধ্যে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি যথেষ্ট পরিমাণে বিনষ্ট করেছে। ব-াসফেমী আইন পাশ হলে, কিংবা আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়কে সরকারীভাবে অমুসলিম ঘোষণা করা হলে বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে বিশ্বসভায় অসভ্য ও বর্বর দেশসমূহের পঙক্তিতে স্থানলাভ করবে। এবং এভাবেই একাত্তরে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর দোসররা তাদের পরাজয়ের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে পারবে।

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে সুপরিকল্পিত ভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মহান অর্জনসমূহ ধ্বংস করে দিচ্ছে। দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদানকারী আওয়ামী লীগ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক অন্যান্য রাজনৈতিক দল জোট সরকারের এইসব নির্যাতন, নিপীড়ন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিনাশী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে কোন কার্যকর প্রতিরোধ রচনা করতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ অবস্থানে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করছে ঠিকই তবে এসব নিস্ফল প্রতিবাদ সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর জোট সরকারের সহিংসতা বিন্দুমাত্র প্রশমিত করতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিসমূহের অনৈক্য মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে অধিকতর সহিংস ও নৃশংস হতে সাহায্য করছে।

বাংলাদেশের সচেতন নাগরিকদের ভাবতে হবে দেশ ও জাতির সংকট মুহূর্তে নিরব দর্শকের ভূমিকা পরিহার করে সরকারের গণবিরোধী, সংবিধানবিরোধী এবং সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কীভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির ঐক্যের অন্তরায়সমূহ অপসারণ করার দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে। ঐক্যবিরোধীদের চিহ্নিত করতে হবে, দাঁড় করাতে হবে ইতিহাসের কাঠগড়ায়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের সকল শক্তির ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ ছাড়া জোট সরকারের সহিংসতার কবল থেকে পরিত্রাণের কোন পথ সামনে খোলা নেই।

ইসলামীকে মুসলমানদের ঈমান ও ধর্ম বিশ্বাস ধ্বংসকারী ফিতনা হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি মুসলমানদেরকে ইসলামের মুখোশধারী এই দল থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান। হাফেজ্জী হুজুরের এই পুস্তকে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় চার শতাধিক আলেম অভিন্ন মত প্রকাশ করে স্বাক্ষর করেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মওলানা আজিজুল হক, মুহাদ্দেস, লালবাগ জামেয়া, ঢাকা। মওলানা আমিনুল ইসলাম, খতিব, লালবাগ ঢাকা। মওলানা আবদুল ওয়াহাব, প্রিন্সিপাল হাটহাজারী মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম। মওলানা মুফতি মহিউদ্দীন, বড় কাঁটরা মাদ্রাসা, ঢাকা। মওলানা মুফতি আহমাদুল হক, মুফতি হাটহাজারি মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম। মওলানা নেসারউদ্দীন, প্রিন্সিপাল, মাহমুদিয়া মাদ্রাসা, বরিশাল। মওলানা আজিজুর রহমান, প্রিন্সিপাল, নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদ্রাসা। মওলানা নুরুল ইসলাম প্রিন্সিপাল, জামেয়া আশরাফিয়া মোমেনশাহী। মুফতি মওলানা আবদুস কাদের, প্রিন্সিপাল, শামসুল উলুম ফরিদপুর। মুফতি মওলানা মোঃ ওয়াক্কাস, দারুল উলুম ইসলামিয়া (প্রাক্তন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী) খুলনা প্রমুখ। (দ্রষ্টব্য ঃ জামাতের আসল চেহারা, মওলানা আবদুল আউয়াল, পৃঃ ....)
মওদুদী ও মওদুদী জামাত সম্পর্কে দারুল-উলুম দেওবন্দ থেকে বিভিন্ন সময়ে একাধিক ফতোয়া প্রকাশিত হয়েছে। সেখানকার শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ ব্যক্তিগতভাবেও তাঁদের অভিমত প্রকাশ করেছেন। একটি ফতোয়ার শিরোনাম হচ্ছে 'সাহারানপুর থেকে মওদুদী ফেতনা নির্মূল করে দাও। মওদুদী আন্দোলন ধ্বংসসাধনকারী ও জীবন সংহারক বিষ। মওদুদীর অনুসারীরা পথভ্রষ্ট। তাদের পিছনে নামাজ পড়বে না।' (মাকতুবাতে শেখুল ইসলাম, প্রথম খণ্ড, ৪৫৬ পৃঃ) উদ্ধৃত ঃ ঐ
দেওবন্দের ওলামা কেরামের অপর একটি ফতোয়ায় বলা হয়েছে 'মওদুদী জামাত ও তাদের বই পুস্তক সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ইমামদের অনুসরণ থেকে মানুষকে সম্পর্কহীন করে ফেলে। এটা জনসাধারণের জন্য ধ্বংস ও পথভ্রষ্টতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মের সাথে সঠিক সম্পৃক্ততা রাখার জন্য সাহাবা কেরাম ও ইমাম-মুজতাহিদদের সাথে যে সম্পর্ক থাকা দরকার জামাতের বই পুস্তক তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। আর এটা নিঃসন্দেহে মুসলমানদের ধর্মের জন্য ক্ষতিকর ব্যাপার। এ জন্য মওদুদীর বই পুস্তক ও সেসবের উপর ভিত্তি করে গঠিত আন্দোলনকে (জামাতকে) আমরা ভ্রান্ত এবং মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর মনে করি। এ জন্য আমরা এসবের সাথে সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করছি। (দু'মাসআলে, ১৬ পৃঃ, দারুল উলুম দেওবন্দ)
দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান মুফতি মওলানা সৈয়দ মাহদী হাসান প্রদত্ত অপর একটি ফতোয়ায় মওদুদী জামাত সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'এই আন্দোলনে মুসলমানদের শরীক হওয়া কখনো উচিত হবে না। এটা তাদের জন্য জীবন সংহারক বিষ। মানুষকে এই আন্দোলনে শরীক হওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে। নতুবা তারা গোমরাহ হয়ে যাবে। এটা তাদের জন্য কল্যাণের পরিবর্তে ক্ষতিকর। শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ মোটেও জায়েজ নয়। যে ব্যক্তি এই জামাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রচার প্রসার করে সে কল্যাণের পরিবর্তে পাপ কাজ করে। সে এ ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতে পারে না এবং মানুষকে পাপের দিকে আহ্বান জানিয়ে থাকে। যদি কোন মসজিদের ইমাম মওদুদী সাহেবের সমমনা হয়, তাহলে তার পিছনে নামাজ পড়া মকরূহ।' (জামাতে ইসলামী কা রুখে কেরদার, ১৬৮ পৃঃ) উদ্ধৃত ঃ ঐ

৮। প্রাগুক্ত

পরিশিষ্ট-৭

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(Special Original Jurisdiction)

WRIT PETITION NO 6556 OF 2001

IN THE MATTER OF
An application under Article 102 of the Constitution of The People's Republic of Bangladesh.

AND

IN THE MATTER OF
Ain O Salish Kendro (ASK), represented by its Executive Director of 26/3 Purana Paltan Line, Police Station - Motijheel, District - Dhaka.

...................Petitioner

-VERSUS-

1. Government OF Bangladesh, represented by the Secretary, Ministry of Home Affairs, Bangladesh Secretariat, Dhaka.
2. Inspector General of Police, Police Bhaban, Fulbaria, P .S. Ramna, Dhaka.

.... Respondents

AND

IN THE MATTER OF .
Continuing failure of the respondents to discharge their constitutional and legal obligations to protect the person and property of citizens belonging to the religious minority communities, particularly the Hindus, especially in the aftermath of the recently held general elections.

To
Mr. Justice Mahmudul Amin Choudhury, Hon'ble Chief Justice and his companion Justices of this Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the petitioner above named most respectfully.

SHEWETH

1. That the petitioner Ain-o-Salish Kendro (ASK),'a well known national human rights and legal aid organization, is actively engaged in advocacy against violations of fundamental human rights, and in upholding the supremacy of the Constitution and rule of law including taking action in the public interest to protect the fundamental human rights of different vulnerable sections of the society, including the religious minority communities. Since its inception in 1986, ASK has provided legal aid and support to victims of fundamental rights violations, including members of different religious communities, through its panel of lawyers who regularly take up fundamental rights matters before the High Court Division. ASK's advocacy programmes include raising awareness among citizens of their rights and obligations, and undertaking activities aimed at the promotion and protection of human rights at the national, regional and international levels.. ASK also carries out activities of monitoring the electoral process of the country and investigating into the predicament of various vulnerable sections in the post-election scenario. ASK has undertaken and conducted, on various occasions and on behalf of the victims of violation of fundamental human rights, public interest litigation cases with a view to invoking the jurisdiction of the Supreme Court, as the guardian of the Constitution and of the rights guaranteed by it, to enforce those rights and to uphold the rule of law.

2. That the Respondent no. 1 is the Secretary, Ministry of Home Affairs, Bangladesh Secretariat, Dhaka. The. Respondent No.2 is the Inspector General of police, police Bhaban, Fulbaria, P .S. Ramna, Dhaka.

3. That the addresses of the petitioner and the respondents given in the cause title of this petition are correct and genuine for the purpose of service upon them of summons, notices, affidavits and other allied matters.

4. That since the declaration of the schedule of the 8th General Election, which was held on October 1, 2001, there have been a number of reported incidents of assault, intimidation and arson on the person and property of citizens belonging to the religious minority communities, especially the Hindu community, across the country. It has been reported in different national newspapers that such acts of assault, ill-treatment, torture and intimidation were being conducted with the motive of preventing the voters belonging to the minority religious communities from exercising their voting right freely and fearlessly.

5. That even on the day of election on October 1, there were reports of attempts to prevent voters from the minority communities from casting their votes freely, and in different areas across the country, they were compelled to take the shelter of the law enforcing agencies in order to approach the polling centres. Different election observation bodies, both national and international, also have pointed out in their reports that religious minority community in different areas of the country were pressurised, intimidated and persecuted on the day of election so that they could not exercise their franchise freely and to cast their votes according to their own choice. In many areas they were obstructed while approaching the polling centres.

6. That after the General Elections, the situation deteriorated rapidly. Various national daily newspapers have been publishing reports of assault, torture, humiliation and intimidation of the members of the Hindu community in several areas of the country. Both person and property of the Hindu citizens are being specifically targeted by miscreants in the aftermath of the general elections. The daily Prothom Alo, on October 7, 200l, has published a report stating that in Chandina, Devidwar, Chouddogram and Nangolkot Thana of Comilla District, all the possessions of the poor members of Hindu community have been robbed by the miscreants and they are starving now in fear and agony. The same newspaper has also reported, on October 6, 2001, incidents of persecution of religious minorities in Kishoregonj, Sharankhola of Bagerhat, Baufol of Patuakhali, Jhalkathi, Manikgonj, and Narail. On October 11,2001 the same newspaper reported that the house of the Hindu inhabitants were looted, the idols were damaged and females were ravaged in Nagarkanda and Bhanga of Faridpur District and in Patharghata and Amtoli of Borguna District. On October 12, it published reports of attacks on Hindu people in Kishoregonj, Bagerhat, Potuakhali, Jhalkathi, Manikgonj and Norail. On that day it also published news of attacks on, and looting of, the houses of Hindu community and of extortion in Munshigonj, Bagerhat, Shariatpur and Nowabgonj Districts. On 15 October, 2001 this daily published report stating that in Bujrukkola in Bagmara Upazila in Rajshahi District, the terrorists were posing threats against the Hindu community in the very presence of police. The news also disclosed incidences of looting and attacks on the person and property of the poor Hindu people. The Daily Jugantar published a news report on 12 October, 2001 which said that in the aftermath of the general elections, the members of the Hindu community were being persecuted in several parts of the country including Agoiljhara of Barisal District, in Alfadanga of Faridpur District, in Kaligonj of Jhenaidaha District, in Kapasia of Gazipur District. In Faridpur District, there were reportedly incidents of damaging idols of worship and sacred religious books of the Hindu Community. The Daily Janakantha reported on 12 October, 2001 that a total of at least fifteen thousand Hindu from five districts of the area took refuge in Ramshil of Gopalgonj district being under attacks, ill-treatment and threat by the miscreants since after the 1st October general elections. The daily Ittefaq on 15 October, 2001 published report stating that in Jhalkathi District, the members of the Hindu community were persistently being under attacks and the temples were damaged by the alleged supporters of the ruling party. The Daily Bhorer Kagoj reported on 13 October, 2001 that the families who had taken refuge in Ramshil were not convinced by the assurance of the local administration to return to their homestead, and they were apprehending malicious proceedings in case they returned to their homestead. The Daily Sangbad on 11 October published a report that the Hindu persons and persons belonging to ethnic minority community were facing assaults and threats in Rajshahi District, and the temples and idols of worships were also damaged by the miscreants. Photocopies of the newspaper reports are annexed hereto and marked as Annexure-A.

7. That there have also been reports of rape of the females of the Hindu community, but their families are now so intimidated that they are not even disclosing such incidents. It has been reported in Daily Sangbad on 16 October, 2001 that in Khanjapur Union of Gouronodi Upazila in Barisal District, two persons, who happened to be brothers, were forced at gunpoint by a gang of miscreants to come out of their house, and then their wives were raped. The reason of this torture was their alleged support for a particular political party. The Daily Bhorer Kagoj also published a news item on 16 October, 2001 which stated that in Ajimnagar village of Bhanga Upazila in Faridpur District, a college-going Hindu girl was raped in front of her mother for the same alleged

reason. Another report published in Daily Prothom Alo on 24 October, 2001 divulged that in Vendorbari village of Lalmohan Upazila in Bhola District', Hindu females from different villages around the locality took shelter because of the impending threat on them. But, on October 2, 2001, the Hindu females, including girls of even 8 years, were ravaged by miscreants, and at least 4 females were raped that night. In almost all of these incidents, the victims were threatened not to take resort of police, and therefore, the families of the victims, apart from a few exceptions, refrained from filing cases against the criminals. The Daily Sangbad reported on 12 October, 2001 that in Banglabazar of Sadar Upazila of Munshigonj District, one college going and two school going Hindu girls were abducted, and there whereabouts could not be discovered till the publication of that report. The daily Janakantha on 13 October disclosed several incidents of rape in Bagerhat District. It reported that in village Gaola of Rampal Upazila, there have been massive' rape incidents of Hindu girls. In Baroipara village, even a pregnant housewife, who also happened to be Hindu, was raped by a gang of 20/22 persons. The daily Ittefaq published report on 15 October, **2001** that in Village Rajarchar of Chormonai Union of Kotwali Thana of Barisal District, wife, sister and daughter of one Pobitra Kumar were raped by the miscreants, and their house was looted just four days before. It was reported in Daily Bhorer Kagoj on 19 October, 2001 that a Hindu girl was raped in Hoglapasha village of Patharghata Upazila of Borguna District. The Daily Janakantha on 29 October published another pathetic story of a school-going girl named Purnima Rani Shil who was raped in Purbo Delua village of Ullapara Thana of Sirajgonj District. The photocopies of the news paper reports are annexed hereto and marked as Annexure - B. B-7.

8. That the documentation unit of the petitioner organization has compiled a tabular chart with the information of various forms of persecution on the Hindu community of the country on the basis of the reports published in various national daily newspapers. This table gives an impression of the magnitude of the oppression imposed upon the Hindu community over the recent days. The tabular chart is annexed hereto and marked as Annexure - C.

9. That receiving news of persecution on the Hindu community in the aftermath of the general elections, investigating teams of the petitioner organisation conducted field-investigation in different parts of the country. The team visiting Ramshil Union of Kotalipara Upazila of Gopalgonj District interviewed a number of Hindu persons among

hundreds of others who were inhabitants of Gouronodi and Agoiljhara Upazila of Barisal District, but had to take refuge in Ramshil because of torture and threat against the members of the Hindu community. They found in their investigation that the almost all the interviewees were either personally ill-treated by the miscreants, or their property was damaged by them. Many others were under threat of being persecuted. The investigating teams also visited Keshobpur Thana of Jessore District and Manirampur Thana of Jessore District and found that the person and property of the members of the Hindu community in those areas were seriously affected as an after-effect of the general elections. The investigative reports are annexed hereto and marked as Annexure-D, D1 and D2.

10. That in the backdrop of these atrocious activities against the Hindu community in several areas, the Government announced certain steps to be taken by the administration for the protection of the members of the Hindu community and for facilitating the observation of the Durga Puja festival in befitting manner. The Hon'ble Prime Minister and the Home Minister on several occasions assured the Hindu Community that their person and property will be accorded due protection by the law enforcing agencies.

11. That even after the assurance given by the Prime Minister and the Home Minister, the situation has not improved, and persecution on the Hindu community continues in different parts of the country. The most recent and the most alarming incident of torture on the Hindu people has taken place in Daspara village of Mirersorai Upazila Chittagong on November 5, 2001. An investigating team of the petitioner-organisation in their field-visit found that on that day, a person named Sunil Das Sadhu, aged about 28 years, was killed and several others were seriously injured, all of whom were Hindus, on an attack by a group of miscreants. The miscreants also caused serious damage to the house holds and other property belonging to the Hindu families. They also threatened the Hindu people to convert themselves into Muslim by the 10th day of that month. But, the victims of the attack were so intimidated by the atrocities of the miscreants that they did not dare to divulge the identity of the terrors and refrained from filing any case with the local police station. This unveils the true state of the predicament of the Hindu community of the country that has initiated since before the general elections. The investigative field report prepared by the petitioner organisation is annexed hereto and marked as Annexure - E.

12. That it has been reported in the media, both electronic and press, on several occasions that many of the members of the Hindu community, who have been victims of assaults and ill-treatment, and who are under the threat of such ill-treatment have crossed the borders and are taking refuge in our neighbouring country India in large numbers, and many others are preparing for such exodus. The Daily Star on 30 October, 2001 reported that hundreds of Bangladeshi Hindu families have fled across the border into India because of the torture in the post-election period, and are now taking shelter in camps or with their distant relatives. The Daily Jugantar on 10 October, 2001 published a report that Hindu families in large number from villages of greater Dinajpur, Rangpur, Pabna and Rajshahi Districts have started to leave the country for neighbouring India on the face of continuing torture and ill-treatment. The same newspaper published report on 8 November, 2001 stating that hundreds of Bangladeshi Hindus are crossing the south-western borders into India everyday. The Daily Bhorer Kagoj on 15 October, 2001 published a report which stated that about two thousand people living in Barisal, Mymensingh, Tangail and Rangpur Districts crossed borders in Kurigram and Lalmonirhat Districts into India over a period of seven days. The Daily Prothom Alo reported on 14 October, 2001 that 99 Hindu persons have been captured by BDR while trying to cross the Satkhira border. The Daily Janakantha published news on 7 November stating that another 124 persons were arrested in the same area while trying to cross into India. The Daily Prothom Alo reported on 11 November, 2001 that at the time a Hindu family was trying to cross the Roygonj border, Indian border saving force opened fire and one boy and one girl were shot dead. This newspaper published another report on 14 November, 2001 which stated that 22 Hindu persons were out into custody by BDR while trying to infiltrate into India. Latest on 20 November, 2001, Daily Sangbad published a report that 14 members of 3 Hindu families were captured by Bangladesh Rifles while they were trying to cross over to India in the darkness of night. Inhabitants of village Govindapur of Bochagonj Upazila of Dinajpur District, the captives submitted that since after the general election on 1st October, they had been facing various forms of ill-treatment, and were also threatened by the local terrorists to leave the country. Even the Deputy High Commissioner of Bangladesh in Kolkata, West Bengal, India has admitted before the Indian media that a number of Bangladeshi citizens have taken refuge in India after elections and that they will be taken back by Bangladesh Government. A news to this effect was published in Daily Janakantha on November 8, 2001. All these reports manifests the deplorable plight of the Hindu people of the country who are so much under religious persecution and who are facing suck lack of security that they are opting to leave their motherland and take refuge in another country. Photocopies of the newspaper reports describing such facts are annexed hereto and marked as Annexure F. F(9)

13. That it is submitted that the respondents' duty is to uphold rule of law in a democracy and to develop an orderly society. Though the Hon'ble Prime Minister and the Hon'ble Home Minister assured the nation to bring back normally in the Hindu dominated area, but unfortunately the respondents are not discharging their duties as envisaged by the Constitution and has been declared by the Hon'ble Prime Minister and Home Minister. On the contrary the powers of the respondents are being misused for different ulterior purposes in a partisan manner inasmuch as they are failing to take any action to prevent the attacks on minorities, or to investigate the same, or to initiate criminal prosecutions against those responsible.

14. That it is submitted that inaction of the respondents in the facts and circumstance of the matter stated above results not only in gross violation of the Constitution and fundamental rights guaranteed by the Constitution, but is increasingly leading towards a situation in which the existence of a society "free from exploitation -a society in which the rule of law, fundamental human rights and freedom, equality and justice, political, economic and social, will be secured for all citizens" as envisaged by the Preamble to the Constitution is at stake.

15. That it is submitted that in these circumstances little is being done by the concerned authorities to establish the necessary control and in such a situation it is respectfully submitted that judicial protection is urgently needed to protect the person and property belonging to the religious minorities in order to ensure that the law enforcing agencies operate within the purview of law and they do not hesitate to perform their duties to investigate these allegations of criminal offences having taken place, to initiate prosecutions and punish those responsible, as required under the law.

16. That it is submitted that the facts already stated are evidence of persistent acts of terrorism and violation of fundamental rights which include violation of the right to life, liberty, property and to equal protection of law and it is imperative, if the safeguard are not to become illusory, that the Supreme Court to discharge its duty under article 44 as the guardian of the Constitution.

17. That it is submitted that the facts stated in this petition and papers annexed hereto clearly establish that the people of Hindu community are facing serious oppression and violence in the hands of miscreants and the respondents have totally failed to take action against them and as such an order from this Court is urgently necessary, so that those people are protected from further assault to their life and property guaranteed by the Constitution.
18. That it is submitted that the respondents are obliged by the Constitution to take proper and adequate steps for the protection of the rights of all citizens, including religious minorities, from damage to their life and properties, but they are not taking sufficient steps regarding this and as such their inaction in this respect should be declared as violation of legal duty and they should be directed by this Hon'ble Court to do what they are lawfully required to do as per the Constitution and the law of the state.

19. That the Petitioner through it's learned lawyer Mr. Tabarak Hussain issued a notice demanding Justice upon the respondents on 14.11.2001, asking them to take immediate steps to investigate into these incidents and to apprehend and prosecute and punish those responsible for such incidents and to make adequate compensation to those affected and to identify areas where the members of the Hindu Community are in a vulnerable state and to arrange special and additional protection by the law enforcing agencies and to intimate the learned lawyer of the Petitioner, what steps has been taken by 10 a.m. on November 21, 2001 and the respondents have not made any reply to the said notice, and thereby, it is clear that the Justice has been denied. A copy of the said Demand of Justice Notice is annexed hereto and marked as Annexure - G.

20. That in the circumstances narrated above, the petitioner is aggrieved by the persistent and continuing failure on the part of the respondents to discharge their constitutional duty to protect the member of minority community from gross violations of their fundamenta1 rights guaranteed by the Constitution including the right to equal protection of law (Article 27). Denial of the express provision which directs that the State shall not discriminate against citizens on grounds only of religion, violation of their life, personal security and liberty, the right to protection against torture and their right to property, the petitioner begs to file this Writ Petition in the public interest and to enforce constitutional mandates, in particular the mandates in Article 44 and 102 of the Constitution which guarantees to citizens the right to move the High Court Division for the enforcement of fundamental rights for appropriate directions, and since the situation is aggravating very rapidly and the poor Hindus have been being led to a position to leave the country in order to save their lives, and there being no other equally efficacious and speedy remedy, intervention of this Hon'ble Court in writ jurisdiction is necessary on the following amongst other grounds.

GROUND'S

1. For that the respondents having failed to discharge their constitutional and legal obligation to protect the rights of the minority community elements guaranteed by Article 27 and 28 of the Constitution from the assaults and depredation by terrorist, the petitioners call for appropriate orders and directions to be issued by the High Court Division as envisaged by Article 44 and 102 of the Constitution.

II. For that the respondents having failed to discharge their constitutiona1 and legal obligation to protect the rights of minority community from assault and depredation by terrorist elements, the members of such communities have been deprived of the right to protection of the law guaranteed to them by Article 31 of the Constitution, and the petitioners accordingly call for as appropriate orders and directions to be issue by the High Court Division envisaged by Article 44 and 102 of the Constitution.

III. For that .the respondents having failed to discharge their constitutional and legal obligation to protect the rights of the minority community from assault and depredation by terrorists elements, the minority communities are deprived of their rights to life, liberty and personal security guaranteed by Article 32 of the Constitution, and the petitioners accordingly call for appropriate orders and directions to be issued by the High Court Division as envisaged by Article 44 and 102 of the Constitution.

IV. For that the respondents having failed to discharge their constitutional and legal obligation to protect the rights of the minority community from assaults and depredation by terrorist elements as a consequence of which they are deprived of their right to hold transfer and dispose of property guaranteed by Article 35 of the Constitution, the petitioners call for appropriate orders and directions to be issued by the High Court Division as envisaged by Article 44 and 102 of the Constitution.

Wherefore, it is prayed that your lordships may graciously be pleased to

A) Issue a Rule Nisi calling upon the respondents to show cause as to why their persistent and continuing inaction to protect the Hindu community, being a religious minority in the country, against the assaults and depredations of terrorist elements should not be declared to constitute a failure to discharge their Constitutional duties towards the citizen guaranteed by Articles 27, 28, 31, 32, 35 and 42 of the Constitution and why appropriate orders and directions should not be issued upon the respondents in accordance with Article 44 and 102 of the Constitution to require them to discharge their Constitutional duties for the enforcement of the rights of the Hindu community.

B) Why the respondent no-l should not be directed to make adequate compensation to the victims of criminal acts committed against them as a result of the respondents failure to discharge their constitutional duties.

C) Pending hearing of the rule, the respondents should be directed to take immediate steps to investigate into the incidents reported in print and electronic media and to initiate prosecution and punishment of those responsible for such incidents.

D) To identify areas where the members of the Hindu community are in a vulnerable state and to arrange special and additional protection by the law enforcing agencies for them.

E) After hearing the parties and perusing the records, make the rule absolute.

F) Award costs of the petition to the petitioner and/or to pass such other or further order or orders as Your Lordships may deem fit and proper.

And for this act of kindness your petitioner as in duty bound shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Sultana Kamal, Wife of Supriya Chakraborty, Executive Director of Ain 0 Salish Kendro (ASK) of 26/3 Purana Paltan Line, P.S. Motijheel, District Dhaka, aged about 52 years, by faith Muslim, by profession social worker solemnly affirm and say as follows :

1. That I am the Executive Director of the petitioner organization Ain 0 Salish Kendro (ASK) and I am conversant with the facts and circumstances of this petition and competent to swear this affidavit.

2. That the statements made in this petition are true to my knowledge and belief and rest are submissions before this Hon'ble Court.

Prepared in my office

DEPONENT

Advocate

The Deponent is known to me
and identified by me and has
signed in my presence

Solemnly affirmed before me
Advocate
this the........... day of November, 2001
at about.............a.m/p.m**.**

COMMISSIONER OF AFFIDAVITS,
SUPREME COURT OF BANGLADESH